শ্রীমদ্ভাগবত

চতুর্থ স্কন্ধ

"পোষণম্"

(ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

ভগবৎ ধর্মের আদর্শ প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী,
মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি
SRIMAD BHAGABATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রথম অধ্যায়

মনুকন্যাদের বংশাবলী

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

মনোস্তু শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে ।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি বিশ্রুতাঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **মনোঃ তু**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **শতরূপায়াম্**—তাঁর পত্নী শতরূপা থেকে; **তিস্রঃ**—তিন; **কন্যাঃ চ**—কন্যাও; **জজ্ঞিরে**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **আকূতিঃ**—আকূতি নামক; **দেবহূতিঃ**—দেবহূতি নামক; **চ**—ও; **প্রসূতিঃ**—প্রসূতি নামক; **ইতি**—এইভাবে; **বিশ্রুতাঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী শতরূপা থেকে তিনটি কন্যা লাভ করেছিলেন, এবং তাঁদের নাম হচ্ছে—আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতি।

তাৎপর্য

সর্বপ্রথমে আমি আমার গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর আদেশে আমি ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য নামক *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্য রচনার বিশাল কার্যে ব্রতী হয়েছি। তাঁর কৃপায় তিনটি স্কন্ধ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে এবং আমি এখন চতুর্থ স্কন্ধের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। তাঁরই কৃপায় আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পাঁচ শত বছর পূর্বে, ভাগবত ধর্মের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর কৃপায় আমি ষড়গোস্বামীগণকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, তার পর আমি চিন্ময় যুগল রাধা এবং কৃষ্ণকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা বৃন্দাবনে গোপবালক এবং গোপবালিকাদের সঙ্গে নিত্য বিহার করেন।

আমি সমস্ত ভক্ত এবং পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত সেবকদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিশটি অধ্যায় রয়েছে, এবং এই সমস্ত অধ্যায়গুলিতে ব্রহ্মা এবং মনুর গৌণ সৃষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তাঁর জড়া প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করে প্রকৃত সৃষ্টি আরম্ভ করেন, এবং তার পর, তাঁর নির্দেশে, এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা বিভিন্ন লোক এবং সেখানকার অধিবাসীদের সৃষ্টি করেন, এবং পরমেশ্বর ভগবানের আদেশে নিরন্তর যাঁরা কার্য করেন, সেই মনু আদি প্রজাপতিদের দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে, স্বায়ম্ভুব মনুর তিন কন্যা এবং তাঁদের বংশধরদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তার পরবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে, মহারাজ দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং সেই যজ্ঞ পণ্ড হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। তার পর পাঁচটি অধ্যায়ে, ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ বর্ণনা করা হয়েছে। তার পর এগারটি অধ্যায়ে, মহারাজ পৃথুর কার্যকলাপ বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তার পরের আটটি অধ্যায়ে, প্রচেতা রাজাদের কার্যকলাপ বর্ণনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতি নামক স্বায়ম্ভুব মনুর তিনটি কন্যা ছিল। তাঁদের মধ্যে পতি কর্দম মুনি এবং পুত্র কপিল মুনি সহ দেবহূতির বৃত্তান্ত ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এই শ্লোকে প্রথমা কন্যা আকূতির বংশধরদের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হবে। স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মার অন্য আরও অনেক পুত্র ছিল, কিন্তু মনুর নাম বিশেষ করে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত। এই শ্লোকে *চ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর এই তিনটি কন্যা ছাড়া আরও দুটি পুত্রও ছিল।

শ্লোক ২

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাদপি ভ্রাতৃমতীং নৃপঃ ।
পুত্রিকাধর্মমাশ্রিত্য শতরূপানুমোদিতঃ ॥ ২ ॥

আকূতিম্—আকূতি; **রুচয়ে**—মহর্ষি রুচিকে; **প্রাদাৎ**—সম্প্রদান করেছিলেন; **অপি**—যদিও; **ভ্রাতৃ-মতীম্**—যে কন্যার ভ্রাতা রয়েছে; **নৃপঃ**—রাজা; **পুত্রিকা**—তাঁর পুত্রকে পাওয়ার জন্য; **ধর্মম্**—ধর্ম অনুষ্ঠান; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **শতরূপা**—স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নীর দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত।

অনুবাদ

আকূতির দুজন ভাই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বায়ম্ভুব মনু এই শর্তে তাঁকে প্রজাপতি রুচির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন যে, তাঁর থেকে যে পুত্রের জন্ম হবে, তাকে মনুর কাছে তাঁর পুত্ররূপে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর পত্নী শতরূপা এই শর্তটিকে অনুমোদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও অপুত্রক ব্যক্তি তাঁর কন্যাকে এই শর্তে পতির হস্তে সম্প্রদান করেন যে, তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, তাঁর পৌত্রকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। একে বলা হয় *পুত্রিকা-ধর্ম,* অর্থাৎ পত্নীর দ্বারা পুত্র লাভ না করার ফলে, ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুত্র লাভ। কিন্তু এখানে মনুর অস্বাভাবিক আচরণ দেখতে পাচ্ছি, কারণ তাঁর দুই পুত্র থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর প্রথমা কন্যাকে প্রজাপতি রুচির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন এই শর্তে যে, তাঁর কন্যার পুত্রকে তাঁর পুত্ররূপে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মহারাজ মনু জানতেন যে, আকূতির গর্ভে পরমেশ্বর ভগবান জন্মগ্রহণ করবেন; তাই দুই পুত্র থাকা সত্ত্বেও, আকূতির গর্ভজাত সেই বিশেষ পুত্রটিকে তিনি লাভ করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্র এবং পৌত্ররূপে প্রাপ্ত হওয়ার অভিলাষী ছিলেন। মনু হচ্ছেন মানব-সমাজের আইন প্রণয়নকর্তা, এবং যেহেতু তিনি স্বয়ং *পুত্রিকা-ধর্ম* আচরণ করেছিলেন, তার ফলে আমরা বুঝতে পারি যে, এই প্রকার প্রথা মানব-জাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য। অতএব, পুত্র থাকা সত্ত্বেও, কেউ যদি তাঁর কন্যার পুত্রকে প্রাপ্ত হতে চান, তা হলে সেই শর্তে তিনি তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করতে পারেন। সেটি শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত।

শ্লোক ৩

প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্যামজীজনৎ ।
মিথুনং ব্রহ্মবর্চস্বী পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩ ॥

প্রজাপতিঃ—যাঁকে সন্তান উৎপাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরম ঐশ্বর্যশালী; **রুচিঃ**—মহর্ষি রুচি; **তস্যাম্**—তাতে; **অজীজনৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **মিথুনম্**—যুগল; **ব্রহ্ম-বর্চস্বী**—আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী; **পরমেণ**—মহাবলের দ্বারা; **সমাধিনা**—সমাধিতে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন রুচি প্রজাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর পত্নী আকূতির গর্ভে তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-বর্চস্বী শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রুচি ছিলেন ব্রাহ্মণ, এবং তিনি গভীর নিষ্ঠা সহকারে তাঁর ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের গুণাবলী হচ্ছে—ইন্দ্রিয়-সংযম, মনঃসংযম, অন্তরে এবং বাইরে শুচিতা, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক জ্ঞানের বিকাশ, সরলতা, সত্যতা, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ইত্যাদি। এই প্রকার অনেক গুণ রয়েছে, যার দ্বারা ব্রাহ্মণোচিত ব্যক্তিকে চেনা যায়, এবং রুচি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত নীতিগুলি গভীর নিষ্ঠা সহকারে পালন করেছিলেন। তাই এখানে তাঁকে বিশেষভাবে *ব্রহ্ম-বর্চস্বী* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ পিতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও, কেউ যদি ব্রাহ্মণের মতো আচরণ না করে, তা হলে বৈদিক ভাষায় তাকে বলা হয় *ব্রহ্ম-বন্ধু* এবং সে শূদ্র এবং স্ত্রীর সমপর্যায়ভুক্ত। এইভাবে আমরা *ভাগবতে* দেখতে পাই যে, ব্যাসদেব *মহাভারত* রচনা করেছিলেন, বিশেষভাবে *স্ত্রী-শূদ্র-ব্রহ্মবন্ধুদের* জন্য। এই তিন শ্রেণীর মানুষদের বলা হয় অল্পজ্ঞ; তাদের বেদ অধ্যয়ন করার যোগ্যতা নেই, যা বিশেষ করে ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। এই কঠোরতা জাতির ভিত্তিতে নয়, গুণের ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করলে, বৈদিক শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাই, এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যে-সমস্ত মানুষদের ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী নেই এবং যারা কখনও সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেনি, তারাও *শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ* আদি বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের মতামত প্রকাশ করে। এই ধরনের মানুষেরা কখনই এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রকৃত বাণী প্রদান করতে পারে না। রুচি ছিলেন সর্বোত্তম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; তাই এখানে তাঁকে *ব্রহ্ম-বর্চস্বী* বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ যাঁর পূর্ণরূপে ব্রহ্মণ্য শক্তি রয়েছে।

শ্লোক ৪

যস্তয়োঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যজ্ঞস্বরূপধৃক্ ।
যা স্ত্রী সা দক্ষিণা ভূতেরংশভূতানপায়িনী ॥ ৪ ॥

যঃ—যিনি; **তয়োঃ**—তাদের মধ্যে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষ; **বিষ্ণুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **স্বরূপ-ধৃক্**—রূপধারী; **যা**—অন্যজন; **স্ত্রী**—নারী; **সা**—তিনি; **দক্ষিণা**—দক্ষিণা; **ভূতেঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **অংশ-ভূতা**—অংশ হওয়ার ফলে; **অনপায়িনী**—কখনও পৃথক হবে না।

অনুবাদ

আকৃতির দুটি সন্তানের মধ্যে, পুত্রসন্তানটি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের অবতার এবং তাঁর নাম ছিল যজ্ঞ, যা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর আর একটি নাম। আর কন্যাসন্তানটি ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর অংশাবতার।

তাৎপর্য

সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্য সঙ্গিনী। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান এবং লক্ষ্মীদেবী, যাঁরা নিত্য সঙ্গী, তাঁরা উভয়েই একসঙ্গে আকৃতির গর্ভ থেকে প্রকট হয়েছিলেন। ভগবান এবং তাঁর সঙ্গিনী উভয়েই এই জড় সৃষ্টির অতীত, যা মহাজনেরা প্রতিপন্ন করে গেছেন (*নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*); অতএব তাঁদের নিত্য সম্পর্ক কখনও পরিবর্তন হয় না, এবং আকৃতির পুত্র যজ্ঞ পরবর্তী কালে লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

আনিন্যে স্বগৃহং পুত্র্যাঃ পুত্রং বিততরোচিষম্ ।
স্বায়ম্ভুবো মুদা যুক্তো রুচির্জগ্রাহ দক্ষিণাম্ ॥ ৫ ॥

আনিন্যে—নিয়ে এসেছিলেন; **স্ব-গৃহম্**—গৃহে; **পুত্র্যাঃ**—পুত্রী থেকে জাত; **পুত্রম্**—পুত্র; **বিতত-রোচিষম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **স্বায়ম্ভুবঃ**—স্বায়ম্ভুব নামক মনু; **মুদা**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **যুক্তঃ**—সহ; **রুচিঃ**—মহর্ষি রুচি; **জগ্রাহ**—রেখেছিলেন; **দক্ষিণাম্**—দক্ষিণা নামক কন্যাকে।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত প্রসন্নতাপূর্বক যজ্ঞ নামক অপূর্ব সুন্দর বালকটিকে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন, এবং তাঁর জামাতা রুচি তাঁর কন্যা দক্ষিণাকে তাঁর কাছে রেখেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকূতি একটি পুত্র এবং একটি কন্যারও জন্ম দেওয়ার ফলে, স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর ভয় ছিল, যদি একমাত্র পুত্র সন্তানকে তিনি নিয়ে নেন, তা হলে তাঁর জামাতা রুচি দুঃখিত হতে পারেন। তাই যখন তিনি শুনলেন যে, পুত্রটির সঙ্গে একটি কন্যারও জন্ম হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। রুচি তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে, তাঁর পুত্রসন্তানটিকে স্বায়ম্ভুব মনুর হাতে দিয়েছিলেন এবং কন্যাটিকে নিজের কাছে রাখতে মনস্থ করেছিলেন, যাঁর নাম ছিল দক্ষিণা। বিষ্ণুর একটি নাম যজ্ঞ, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত বেদের প্রভু। যজ্ঞ নামটি আসছে *যজুষাং পতিঃ* থেকে, যার অর্থ হচ্ছে, 'সমস্ত যজ্ঞের প্রভু'। *যজুর্বেদে* যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিধি রয়েছে, এবং সেই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ*—কর্ম করা উচিত, কিন্তু সেই কর্তব্য কর্ম কেবল যজ্ঞ বা শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই করা উচিত। মানুষ যদি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য বা ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের জন্য কর্ম না করে, তা হলে তার সমস্ত কর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হবে। সেই কর্মের ফল ভাল অথবা খারাপ তাতে কিছু যায় আসে না; আমাদের কর্ম যদি পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত না হয়, অথবা আমরা যদি কৃষ্ণভাবনায় কর্ম না করি, তা হলে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের ফলের জন্য আমরা দায়ী হব। প্রত্যেক প্রকার ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয়, কিন্তু যদি সেই ক্রিয়া যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। তাই কেউ যখন যজ্ঞ বা পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কর্ম করেন, তখন তিনি জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হন না, কারণ *বেদে* এবং *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যত প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান রয়েছে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য। প্রথম থেকেই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করার চেষ্টা করা উচিত; তার ফলে জাগতিক কার্যকলাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৬

তাং কাময়ানাং ভগবানুবাহ যজুষাং পতিঃ ।
তুষ্টায়াং তোষমাপন্নোঽজনয়দ্ দ্বাদশাত্মজান্ ॥ ৬ ॥

তাম্—তাঁর; **কাময়ানাম্**—বাসনা করে; **ভগবান্**—ভগবান; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **যজুষাম্**—সমস্ত যজ্ঞের; **পতিঃ**—প্রভু; **তুষ্টায়াম্**—তাঁর পত্নীকে, যিনি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন; **তোষম্**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **আপন্নঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **অজনয়ৎ**—জন্ম দিয়েছিলেন; **দ্বাদশ**—বার; **আত্মজান্**—পুত্রদের।

অনুবাদ

যজ্ঞের ঈশ্বর ভগবান পরবর্তী কালে দক্ষিণাকে বিবাহ করেছিলেন, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পতিরূপে লাভ করার কামনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, বারটি পুত্র লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

আদর্শ পতি-পত্নীর তুলনা সাধারণত লক্ষ্মী-নারায়ণের সঙ্গে করা হয়, কারণ লক্ষ্মী-নারায়ণ পতি-পত্নীরূপে সর্বদাই সুখী। পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা তাঁর পতির প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, এবং পতির কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা তাঁর পত্নীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। চাণক্য তাঁর উপদেশ প্রদান করে একটি শ্লোকে বলেছেন যে, পতি এবং পত্নী যদি পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলে লক্ষ্মীদেবী আপনা থেকেই আসেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, পতি এবং পত্নীর মধ্যে যদি বিরোধ না থাকে, তা হলে সমস্ত ঐশ্বর্য সেখানে উপস্থিত থাকে, এবং সুসন্তানের জন্ম হয়। সাধারণত, বৈদিক সভ্যতা অনুসারে, পত্নীকে সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রসন্ন থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, পতির কর্তব্য—যথেষ্ট আহার, গহনা এবং বস্ত্রের দ্বারা পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখা। যদি এইভাবে তাঁরা পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলে সুসন্তানের জন্ম হয়। এইভাবে সারা পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই কলিযুগে আদর্শ পতি-পত্নীর অভাব। তার ফলে অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপন্ন হয়, এবং তাই আজকের পৃথিবীতে কোথাও শান্তি এবং সমৃদ্ধি নেই।

শ্লোক ৭

তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভদ্রঃ শান্তিরিড়স্পতিঃ ।
ইধ্মঃ কবির্বিভুঃ স্বহ্নঃ সুদেবো রোচনো দ্বিষট্ ॥ ৭ ॥

তোষঃ—তোষ; **প্রতোষঃ**—প্রতোষ; **সন্তোষঃ**—সন্তোষ; **ভদ্রঃ**—ভদ্র; **শান্তিঃ**—শান্তি; **ইড়স্পতিঃ**—ইড়স্পতি; **ইধ্মঃ**—ইধ্ম; **কবিঃ**—কবি; **বিভুঃ**—বিভু; **স্বহ্নঃ**—স্বহ্ন; **সুদেবঃ**—সুদেব; **রোচনঃ**—রোচন; **দ্বি-ষট্**—দ্বাদশ।

অনুবাদ

যজ্ঞ এবং দক্ষিণার বারটি পুত্রের নাম ছিল—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বহ্ন, সুদেব এবং রোচন।

শ্লোক ৮

তুষিতা নাম তে দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবান্তরে ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো যজ্ঞঃ সুরগণেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥

তুষিতাঃ—তুষিত শ্রেণীর; **নাম**—নামক; **তে**—তাঁরা সকলে; **দেবাঃ**—দেবতা; **আসন্**—হয়েছিলেন; **স্বায়ম্ভুব**—মনুর নাম; **অন্তরে**—সেই সময়ে; **মরীচি-মিশ্রাঃ**—মরীচি আদি; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **যজ্ঞঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার; **সুর-গণ-ঈশ্বরঃ**—দেবতাদের রাজা।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই পুত্রেরা দেবতা হয়েছিলেন, যাঁদের যৌথভাবে তুষিত বলা হয়। মরীচি সপ্তর্ষিদের প্রধান হয়েছিলেন, এবং যজ্ঞ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, তুষিত নামক দেবতাদের থেকে, মরীচি আদি ঋষিদের থেকে, এবং দেবতাদের রাজা যজ্ঞের বংশধরদের থেকে ছয় প্রকার জীবাত্মা উৎপন্ন হয়েছিল, এবং তাঁরা সকলেই ভগবানের আদেশ অনুসারে জীবেদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করার জন্য সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। এই ছয় প্রকার জীব হচ্ছে—মনু, দেব, মনু-পুত্র, অংশাবতার, সুরেশ্বর এবং ঋষি। যজ্ঞ ভগবানের অবতার হওয়ার ফলে, দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্র হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ ।
তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৄণামনুবৃত্তং তদন্তরম্ ॥ ৯ ॥

প্রিয়ব্রত—প্রিয়ব্রত; **উত্তানপাদৌ**—উত্তানপাদ; **মনু-পুত্রৌ**—মনুর পুত্রগণ; **মহা-ওজসৌ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **তৎ**—তাঁদের; **পুত্র**—পুত্র; **পৌত্র**—পৌত্র; **নপ্তৄণাম্**—কন্যার দিকের নাতি; **অনুবৃত্তম্**—অনুসরণ করে; **তৎ-অন্তরম্**—সেই মন্বন্তরে।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা হয়েছিলেন, এবং তাঁদের পুত্র ও পৌত্রেরা সমগ্র ত্রিভুবন জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল।

শ্লোক ১০

দেবহূতিমদাত্তাত কর্দমায়াত্মজাং মনুঃ ।
তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতো মম ॥ ১০ ॥

দেবহূতিম্—দেবহূতি; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **তাত**—হে প্রিয় বৎস; **কর্দমায়**—মহর্ষি কর্দমকে; **আত্মজাম্**—কন্যা; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **তৎ-সম্বন্ধি**—সেই সম্পর্কে; **শ্রুত-প্রায়ম্**—প্রায় পূর্ণরূপে শোনা গিয়েছিল; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **গদতঃ**—উক্ত; **মম**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

হে বৎস! স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কন্যা দেবহূতিকে কর্দম মুনির কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। সেই কথা আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছি, এবং আপনিও তা প্রায় সম্পূর্ণ শ্রবণ করেছেন।

শ্লোক ১১

দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্মনুঃ ।
প্রায়চ্ছদ্যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রিলোক্যাং বিততো মহান্ ॥ ১১ ॥

দক্ষায়—প্রজাপতি দক্ষকে; **ব্রহ্ম-পুত্রায়**—ব্রহ্মার পুত্র; **প্রসূতিম্**—প্রসূতিকে; **ভগবান্**—মহান ব্যক্তি; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **প্রায়চ্ছৎ**—প্রদান করেছিলেন; **যৎ-কৃতঃ**—যাঁর দ্বারা করা হয়েছে; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **ত্রি-লোক্যাম্**—তিন লোকে; **বিততঃ**—বিস্তৃত; **মহান্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যা প্রসূতিকে ব্রহ্মার পুত্র এবং প্রজাপতিদের অন্যতম দক্ষের হস্তে দান করেছিলেন। দক্ষের বংশধরেরা ত্রিলোক জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে।

শ্লোক ১২

যাঃ কর্দমসুতাঃ প্রোক্তা নব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ ।
তাসাং প্রসূতিপ্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে ॥ ১২ ॥

যাঃ—যাঁরা; **কর্দম-সুতাঃ**—কর্দমের কন্যারা; **প্রোক্তাঃ**—উল্লেখ করা হয়েছে; **নব**—নয়; **ব্রহ্ম-ঋষি**—চিন্ময় জ্ঞান-সমন্বিত মহর্ষিগণ; **পত্নয়ঃ**—পত্নীগণ; **তাসাম্**—তাঁদের; **প্রসূতি-প্রসবম্**—পুত্র এবং পৌত্রদের বংশ; **প্রোচ্যমানম্**—বর্ণনা করে; **নিবোধ**—বোঝবার চেষ্টা করুন, **মে**—আমার কাছ থেকে।

অনুবাদ

আমি আপনাকে কর্দম মুনির নয়টি কন্যার বিষয়ে পূর্বেই বলেছি, যাঁদের নয়জন ব্রহ্মর্ষিকে দান করা হয়েছিল। এখন আমি সেই নয়জন কন্যার বংশধরদের কথা বর্ণনা করব। দয়া করে আপনি তা আমার কাছে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

তৃতীয় স্কন্ধে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কিভাবে কর্দম মুনি দেবহূতির গর্ভে নয়টি কন্যাসন্তানের জন্মদান করেছিলেন এবং কিভাবে পরবর্তী কালে তাঁদের মরীচি, অত্রি, বশিষ্ঠ আদি নয়জন মহর্ষির হস্তে সম্প্রদান করা হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দমাত্মজা ।
কশ্যপং পূর্ণিমানং চ যয়োরাপূরিতং জগৎ ॥ ১৩ ॥

পত্নী—পত্নী; **মরীচেঃ**—মরীচি নামক ঋষির; **তু**—ও; **কলা**—কলা নামক; **সুষুবে**—জন্ম দিয়েছিল; **কর্দম-আত্মজা**—কর্দম মুনির কন্যা; **কশ্যপম্**—কশ্যপ নামক; **পূর্ণিমানম্ চ**—এবং পূর্ণিমা নামক; **যয়োঃ**—যাঁর দ্বারা; **আপূরিতম্**—সর্বত্র পূর্ণ হয়েছিল; **জগৎ**—বিশ্ব।

অনুবাদ

কর্দম মুনির কন্যা কলা, মরীচির সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়েছিল, তিনি কশ্যপ এবং পূর্ণিমা নামক দুটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। তাঁদের বংশধরেরা সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৪

পূর্ণিমাসূত বিরজং বিশ্বগং চ পরন্তপ ।
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্যাভূৎসরিদ্দিবঃ ॥ ১৪ ॥

পূর্ণিমা—পূর্ণিমা; **অসূত**—উৎপন্ন হয়েছিল; **বিরজম্**—বিরজ নামক এক পুত্র; **বিশ্বগম্ চ**—এবং বিশ্বগ নামক; **পরম্-তপ**—হে শত্রু-সংহারক; **দেবকুল্যাম্**—দেবকুল্যা নামক একটি কন্যা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পাদ-শৌচাৎ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম-ধৌত জলের দ্বারা; **যা**—তিনি; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সরিৎ দিবঃ**—গঙ্গার তটের অন্তর্গত দিব্য জল।

অনুবাদ

হে বিদুর! কশ্যপ এবং পূর্ণিমা নামক দুই সন্তানের মধ্যে পূর্ণিমার বিরজ, বিশ্বগ এবং দেবকুল্যা নামক তিনটি সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দেবকুল্যা ছিল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-ধৌত জল, যা পরবর্তী কালে স্বর্গলোকে গঙ্গায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কশ্যপ এবং পূর্ণিমা এই দুই সন্তানের মধ্যে এখানে পূর্ণিমার বংশধরদের বর্ণনা করা হয়েছে। এই বংশধরদের বিস্তৃত বর্ণনা ষষ্ঠ স্কন্ধে দেওয়া হবে। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, দেবকুল্যা হচ্ছেন গঙ্গানদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এই নদী স্বর্গলোক থেকে এই লোকে নেমে এসেছে এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করার ফলে, তাকে পবিত্র বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ১৫

অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীঞ্জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্ ।
দত্তং দুর্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ ॥ ১৫ ॥

অত্রেঃ—অত্রি মুনির; **পত্নী**—পত্নী; **অনসূয়া**—অনসূয়া নামক; **ত্রীন্**—তিন; **জজ্ঞে**—বহন করেছিল; **সু-যশসঃ**—অত্যন্ত যশস্বী; **সুতান্**—পুত্রগণ; **দত্তম্**—দত্তাত্রেয়; **দুর্বাসসম্**—দুর্বাসা; **সোমম্**—সোম (চন্দ্র-দেবতা); **আত্ম**—পরমাত্মা; **ঈশ**—শ্রীশিব; **ব্রহ্ম**—শ্রীব্রহ্মা; **সম্ভবান্**—অবতার।

অনুবাদ

অত্রি মুনির পত্নী অনসূয়া তিনজন অতি প্রসিদ্ধ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, যথা— সোম, দত্তাত্রেয় এবং দুর্বাসা, যাঁরা ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের অংশাবতার। সোম ব্রহ্মার, দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর এবং দুর্বাসা শিবের অংশাবতার ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আমরা *আত্ম-ঈশ-ব্রহ্ম সম্ভবান্* শব্দগুলি দেখতে পাই। *আত্ম* মানে পরমাত্মা বা বিষ্ণু, *ঈশ* মানে হচ্ছে শ্রীশিব, এবং *ব্রহ্ম* মানে হচ্ছে চতুর্মুখ শ্রীব্রহ্মা। অনসূয়ার তিন পুত্র—দত্তাত্রেয়, দুর্বাসা এবং সোম, এই তিনজন দেবতার অংশাবতার। *আত্ম*, দেবতা অথবা জীবের পর্যায়ভুক্ত নন, কারণ তিনি হচ্ছেন বিষ্ণু; তাই তাঁকে *বিভিন্নাংশ-ভূতানাম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাত্মা বা বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জীবের, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবেরও বীজ-প্রদানকারী পিতা। *আত্ম* শব্দটির আর একটি অর্থ এইভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে—যে তত্ত্ব পরমাত্মারূপে প্রত্যেক আত্মায় রয়েছেন, অথবা যিনি সকলের আত্মা, তিনি দত্তাত্রেয়রূপে প্রকট হয়েছেন, কারণ এখানে *অংশ* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ভগবদ্গীতায় জীবাত্মাকেও পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মার অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলে দত্তাত্রেয়কে সেই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে না কেন? শিব এবং ব্রহ্মাকেও এখানে অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং তাঁদের সকলকেই সাধারণ জীবাত্মা বলে স্বীকার করা হচ্ছে না কেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, বিষ্ণুর প্রকাশ এবং সাধারণ জীব নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়, কিন্তু অংশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। *বরাহ পুরাণে* সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কতকগুলি অংশ হচ্ছে *স্বাংশ* এবং অন্যগুলি *বিভিন্নাংশ*। *বিভিন্নাংশ* অংশদের বলা হয় *জীব*, এবং *স্বাংশ* অংশদের বলা হয় *বিষ্ণুতত্ত্ব*। এই বিভিন্নাংশ জীবদের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। তা *বিষ্ণু পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে, যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের স্বতন্ত্র বিভিন্ন অংশগুলি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে। এই সমস্ত স্বতন্ত্র বিভিন্ন অংশ, যারা ভগবানের সৃষ্টির যে-কোন স্থানে বিচরণ করতে পারে, তাদের বলা হয় *সর্ব-গত* এবং তারা জড়-জাগতিক অস্তিত্বের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তারা বিভিন্ন গুণের বশীভূত হয়ে, তাদের নিজেদের কর্ম অনুসারে অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত হয়। যেমন, তমোগুণে স্থিত জীবের ক্লেশ থেকে সত্ত্বগুণে স্থিত জীবের ক্লেশ কম। কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সমস্ত জীবের

জন্মগত অধিকার, কারণ প্রতিটি জীবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবানের চেতনাও তাঁর বিভিন্ন অংশে রয়েছে, এবং সেই চেতনা যে অনুপাতে অনুসারে জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়, জীবাত্মারা সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অধিষ্ঠিত হয়। *বেদান্ত-সূত্রে* বিভিন্ন শ্রেণীর জীবাত্মাদের ভিন্ন ভিন্ন দীপ্তি-সমন্বিত প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন, কোন কোন ইলেকট্রিক বাল্‌বের এক হাজার প্রদীপের শক্তি রয়েছে, অন্য কয়েকটির পাঁচ শত দীপের শক্তি রয়েছে, অন্য আর কতকগুলির এক শত দীপের, পঞ্চাশ দীপের ইত্যাদি, কিন্তু সব কটি ইলেকট্রিক বাল্‌বেরই আলো রয়েছে। তবে, তাদের দীপ্তির মাত্রার তারতম্য রয়েছে। তেমনই, ব্রহ্মের শ্রেণী-বিভাগ হয়েছে। বিভিন্ন বিষ্ণুরূপে পরমেশ্বর ভগবানের স্বাংশ প্রকাশ দীপের মতো, শিবও একটি দীপের মতো, এবং পরম দীপশক্তি বা শতকরা একশত ভাগ দীপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুতত্ত্বদের মধ্যে শতকরা চুরানব্বই ভাগ রয়েছে, শিবতত্ত্বে শতকরা চুরাশি ভাগ রয়েছে, এবং ব্রহ্মার মধ্যে শতকরা আটাত্তর ভাগ রয়েছে। জীবেরাও ব্রহ্মার মতো কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় তাদের দীপ্তি আরও স্তিমিত। নিঃসন্দেহে ব্রহ্মের শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে, এবং তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। তাই *আত্মেশ-ব্রহ্ম-সম্ভবান্* শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, দত্তাত্রেয় ছিলেন সরাসরিভাবে শ্রীবিষ্ণুর অবতার, এবং দুর্বাসা ও সোম যথাক্রমে শিব ও ব্রহ্মার অংশ।

শ্লোক ১৬

বিদুর উবাচ

অত্রের্গৃহে সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ ।
কিঞ্চিচ্চিকীর্ষবো জাতা এতদাখ্যাহি মে গুরো ॥ ১৬ ॥

বিদুরঃ উবাচ—শ্রীবিদুর বললেন; **অত্রেঃ গৃহে**—অত্রির গৃহে; **সুর-শ্রেষ্ঠাঃ**—প্রধান দেবতাগণ; **স্থিতি**—পালন; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অন্ত**—বিনাশ; **হেতবঃ**—কারণ; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **চিকীর্ষবঃ**—করার ইচ্ছা করে; **জাতাঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **এতৎ**—এই; **আখ্যাহি**—বলুন; **মে**—আমাকে; **গুরো**—হে গুরুদেব।

অনুবাদ

তা শোনার পর, বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে গুরুদেব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, যাঁরা সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা, তাঁরা অত্রি মুনির পত্নীর সন্তান কিভাবে হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

বিদুরের এই অনুসন্ধিৎসা খুবই স্বাভাবিক, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরমাত্মা, ব্রহ্মা এবং শিব যখন অত্রি মুনির পত্নী অনসূয়ার শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন নিশ্চয়ই কোন মহান উদ্দেশ্য ছিল। তা না হলে, কেন তাঁরা এইভাবে আবির্ভূত হবেন?

শ্লোক ১৭

মৈত্রেয় উবাচ

ব্রহ্মণা চোদিতঃ সৃষ্টাবত্রির্ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
সহ পত্ন্যা যযাবৃক্ষং কুলাদ্রিং তপসি স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বললেন; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **সৃষ্টৌ**—সৃষ্টির জন্য; **অত্রিঃ**—অত্রি; **ব্রহ্ম-বিদাম্**—ব্রহ্মজ্ঞান-সমন্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **সহ**—সঙ্গে; **পত্ন্যা**—পত্নী; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **ঋক্ষম্**—ঋক্ষ নামক পর্বতে; **কুল-অদ্রিম্**—বিশাল পর্বত; **তপসি**—তপস্যার জন্য; **স্থিতঃ**—অবস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—অত্রি মুনি যখন অনসূয়াকে বিবাহ করেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দেন। তখন অত্রি মুনি তাঁর পত্নী সহ কঠোর তপস্যা করার জন্য ঋক্ষ নামক পর্বতের উপত্যকায় গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

তস্মিন্ প্রসূনস্তবকপলাশাশোককাননে ।
বার্ভিঃ স্রবদ্ভিরুদ্‌ঘুষ্টে নির্বিন্ধ্যায়াঃ সমন্ততঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্—তাতে; **প্রসূন-স্তবক**—ফুলের গুচ্ছ; **পলাশ**—পলাশ বৃক্ষ; **অশোক**—অশোক বৃক্ষ; **কাননে**—বনের উদ্যানে; **বার্ভিঃ**—জলের দ্বারা; **স্রবদ্ভিঃ**—প্রবাহিত; **উদ্‌ঘুষ্টে**—ধ্বনিতে; **নির্বিন্ধ্যায়াঃ**—নির্বিন্ধ্যা নদীর; **সমন্ততঃ**—সর্বত্র।

অনুবাদ

সেই পর্বতের উপত্যকায় নির্বিন্ধ্যা নামক নদী প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নদীর তটে অশোক, পলাশ আদি পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত ছিল, এবং সেখানে ঝরনার জল সর্বদা মধুর ধ্বনি উৎপন্ন করে প্রবাহিত হচ্ছিল। পতি এবং পত্নী সেই অতি সুন্দর স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

প্রাণায়ামেন সংযম্য মনো বর্ষশতং মুনিঃ ।
অতিষ্ঠদেকপাদেন নির্দ্বন্দ্বোঽনিলভোজনঃ ॥ ১৯ ॥

প্রাণায়ামেন—প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা; **সংযম্য**—নিয়ন্ত্রণ করে; **মনঃ**—মন; **বর্ষ-শতম্**—এক শত বছর; **মুনিঃ**—মহর্ষি, **অতিষ্ঠৎ**—সেখানে ছিলেন; **এক-পাদেন**—এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয়ে; **নির্দ্বন্দ্বঃ**—দ্বৈতভাব বিনা; **অনিল**—বায়ু; **ভোজনঃ**—আহার করে।

অনুবাদ

সেই মহর্ষি সেখানে প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা তাঁর মনকে একাগ্র করেছিলেন। এবং এইভাবে তাঁর সমস্ত আসক্তি সংযত করে, এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয়ে, কেবল বায়ু আহার করে এক শত বছর তপস্যা করেছিলেন।

শ্লোক ২০

শরণং তং প্রপদ্যেঽহং য এব জগদীশ্বরঃ ।
প্রজামাত্মসমাং মহ্যং প্রযচ্ছত্বিতি চিন্তয়ন্ ॥ ২০ ॥

শরণম্—আশ্রয় গ্রহণ করে; **তম্**—তাঁর; **প্রপদ্যে**—শরণাগত হয়েছি; **অহম্**—আমি; **যঃ**—যিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **জগৎ-ঈশ্বরঃ**—সমস্ত জগতের প্রভু; **প্রজাম্**—পুত্র; **আত্ম-সমাম্**—তাঁরই মতো; **মহ্যম্**—আমাকে; **প্রযচ্ছতু**—তিনি প্রদান করুন; **ইতি**—এইভাবে; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করে।

অনুবাদ

তিনি কামনা করেছিলেন—আমি যাঁর শরণ গ্রহণ করেছি, সেই জগদীশ্বর কৃপাপূর্বক আমাকে ঠিক তাঁরই মতো একটি পুত্র প্রদান করুন।

তাৎপর্য

এখানে মনে হয় যে, মহর্ষি অত্রি মুনির পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল না। তিনি অবশ্যই বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, একজন পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, যাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে, যিনি এই সৃষ্ট জগৎ পালন করেন, এবং প্রলয়ের পরে যাঁর মধ্যে সমগ্র জগৎ লীন হয়ে যাবে। *যতো বা ইমানি ভূতানি* (*তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ৩/১/১)। বৈদিক মন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রদান করে, অতএব অত্রি মুনি তাঁর নাম না জানলেও, সেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর মনকে একাগ্র করে, ঠিক তাঁরই মতো একটি পুত্র লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবানের নাম পর্যন্ত না জেনে যে ভগবদ্ভক্তি, সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। ভগবান সেখানে বলেছেন যে, চার প্রকার সুকৃতিসম্পন্ন মানুষ তাঁদেব ঈপ্সিত বস্তু লাভের আশায় তাঁর ভজনা করেন। অত্রি মুনি ঠিক ভগবানের মতো একটি পুত্র কামনা করেছিলেন, এবং তাই বোঝা যায় যে, তিনি শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন না, কারণ তাঁর বাসনা চরিতার্থ করার অভিলাষ ছিল, এবং সেই বাসনাটি ছিল জড়-জাগতিক। যদিও তিনি ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের মতো একটি পুত্র কামনা করেছিলেন, সেই বাসনাটি ছিল জড়-জাগতিক, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে চাননি, ঠিক তাঁর মতো একটি পুত্র চেয়েছিলেন। তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে কামনা করতেন, তা হলে তিনি সমস্ত জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতেন, কারণ তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকেই কামনা করতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর মতো একটি পুত্র চেয়েছিলেন, তাই তাঁর সেই বাসনা ছিল জড়-জাগতিক। সেই জন্য অত্রি মুনিকে শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে গণনা করা যায় না।

শ্লোক ২১

তপ্যমানং ত্রিভুবনং প্রাণায়ামৈধসাগ্নিনা ।
নির্গতেন মুনের্মূর্ধ্নঃ সমীক্ষ্য প্রভবস্ত্রয়ঃ ॥ ২১ ॥

তপ্যমানম্—তপস্যা করার সময়; **ত্রি-ভুবনম্**—ত্রিভুবন; **প্রাণায়াম্**—প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা; **এধসা**—ইন্ধন; **অগ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **নির্গতেন**—নির্গত হয়ে; **মুনেঃ**—মুনির; **মূর্ধ্নঃ**—মস্তকের উপরিভাগ; **সমীক্ষ্য**—দেখে; **প্রভবঃ ত্রয়ঃ**—তিনজন মহান দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর)।

অনুবাদ

অত্রি মুনি যখন এইভাবে কঠোর তপস্যায় যুক্ত ছিলেন, তখন প্রাণায়ামের প্রভাবে তাঁর মস্তক থেকে এক প্রজ্বলিত অগ্নি নির্গত হয়েছিল, এবং ত্রিভুবনের তিনজন মুখ্য দেবতা সেই অগ্নি দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, প্রাণায়ামের অগ্নি হচ্ছে মানসিক তৃপ্তি। পরমাত্মা বিষ্ণু সেই অগ্নি দর্শন করেছিলেন এবং তার ফলে ব্রহ্মা এবং শিবও তা দর্শন করেছিলেন। প্রাণায়ামের দ্বারা অত্রি মুনি পরমাত্মা বা জগদীশ্বরের প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জগতের ঈশ্বর হচ্ছেন বাসুদেব (*বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি*), এবং, বাসুদেবের নির্দেশনায় শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীশিব কার্য করেন। তাই, বাসুদেবের নির্দেশে, ব্রহ্মা এবং শিব অত্রি মুনির কঠোর তপস্যা দর্শন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা প্রসন্ন হয়ে নীচে নেমে এসেছিলেন, যে-কথা পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

অপ্সরোমুনিগন্ধর্বসিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ ।
বিতায়মানযশসস্তদাশ্রমপদং যযুঃ ॥ ২২ ॥

অপ্সরঃ—স্বর্গের অপ্সরারা; **মুনি**—মহান ঋষিগণ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বলোকের অধিবাসীরা; **সিদ্ধ**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা; **বিদ্যাধর**—অন্যান্য দেবতারা; **উরগৈঃ**—নাগলোকের অধিবাসীরা; **বিতায়মান**—বিস্তৃত হয়ে; **যশসঃ**—যশ, খ্যাতি; **তৎ**—তাঁর; **আশ্রম-পদম্**—আশ্রম; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

সেই সময়ে, অপ্সরা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ প্রভৃতি স্বর্গবাসীগণ সহ তিন দেবতা অত্রি মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। তপস্যার প্রভাবে বিখ্যাত সেই মহর্ষির আশ্রমে তাঁরা এইভাবে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সাহিত্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা, যিনি সমস্ত জগতের প্রভু এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের

ঈশ্বর। তিনি পরমাত্মারূপে পরিচিত, এবং কেউ যখন পরমাত্মার আরাধনা করেন, তখন ব্রহ্মা, শিব আদি অন্যান্য দেবতারাও শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে আসেন, কারণ তাঁরা পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত।

শ্লোক ২৩

তৎপ্রাদুর্ভাবসংযোগবিদ্যোতিতমনা মুনিঃ ।
উত্তিষ্ঠন্নেকপাদেন দদর্শ বিবুধর্ষভান্ ॥ ২৩ ॥

তৎ—তাঁদের; **প্রাদুর্ভাব**—আবির্ভাব; **সংযোগ**—একসঙ্গে; **বিদ্যোতিত**—প্রকাশিত; **মনাঃ**—মনে; **মুনিঃ**—মহামুনি; **উত্তিষ্ঠন্**—জাগ্রত হয়ে; **এক-পাদেন**—এক পায়ে; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **বিবুধ**—দেবতারা; **ঋষভান্**—মহাপুরুষগণ।

অনুবাদ

ঋষি এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু সেই তিনজন দেবতাদের একত্রে তাঁর কাছে আসতে দেখে, তিনি এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, অত্যন্ত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক পায়ে তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমাবুপতস্থেঽর্হণাঞ্জলিঃ ।
বৃষহংসসুপর্ণস্থান্ স্বৈঃ স্বৈশ্চিহ্নৈশ্চ চিহ্নিতান্ ॥ ২৪ ॥

প্রণম্য—প্রণতি নিবেদন করে; **দণ্ড-বৎ**—দণ্ডবৎ; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **উপতস্থে**—পতিত হয়েছিলেন; **অর্হণ**—পূজার সমস্ত উপচার; **অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **বৃষ**—ষাঁড়; **হংস**—হংস; **সুপর্ণ**—গরুড় পাখি; **স্থান্**—স্থিত; **স্বৈঃ**—নিজের; **স্বৈঃ**—নিজের; **চিহ্নৈঃ**—চিহ্নের দ্বারা; **চ**—এবং; **চিহ্নিতান্**—চিনতে পারা গিয়েছিল।

অনুবাদ

তার পর তিনি সেই তিনজন দেবতাদের বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন, যাঁরা তাঁদের বাহন—বৃষ, হংস ও গরুড়ে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের হাতে ডমরু, কুশ ঘাস ও চক্র ছিল। মুনি ভূমিতে পতিত হয়ে, তাঁদের দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

দণ্ডের মতো পতিত হয়ে যখন প্রণতি নিবেদন করা হয়, তখন তাকে বলা হয় দণ্ডবৎ। গুরুজনদের সম্মুখে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করতে হয়, এবং এই প্রকার শ্রদ্ধা নিবেদনকে বলা হয় দণ্ডবৎ। অত্রি ঋষি সেইভাবেই সেই তিনজন দেবতাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তাঁদের বাহন এবং চিহ্নের দ্বারা তাঁদের চেনা যায়। সেই সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণু গরুড়ের উপর আসীন ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল চক্র, ব্রহ্মা হংসের উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল কুশ ঘাস, এবং শিব বৃষের উপর আসীন ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল ডমরু। অত্রি ঋষি তাঁদের চিহ্ন এবং বাহন দেখে তাঁদের চিনতে পেরেছিলেন, এবং তিনি এইভাবে তাঁদের বন্দনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

কৃপাবলোকেন হসদ্বদনেনোপলম্ভিতান্ ।
তদ্রোচিষা প্রতিহতে নিমীল্য মুনিরক্ষিণী ॥ ২৫ ॥

কৃপা-অবলোকেন—কৃপাপূর্বক দৃষ্টিপাত করে; **হসৎ**—হেসে; **বদনেন**—মুখে; **উপলম্ভিতান্**—অত্যন্ত প্রসন্নভাবে; **তৎ**—তাঁদের; **রোচিষা**—উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা; **প্রতিহতে**—চোখ ঝলসে গিয়েছিল; **নিমীল্য**—নিমীলিত করে; **মুনিঃ**—মুনি; **অক্ষিণী**—তাঁর চক্ষু।

অনুবাদ

সেই তিনজন দেবতাকে তাঁর প্রতি প্রসন্ন দেখে অত্রি মুনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁদের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় তাঁর চোখ ঝলসে গিয়েছিল, এবং তাই তিনি সেই সময় তাঁর নেত্র নিমীলিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু সেই দেবতারা হাসছিলেন, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। তাঁদের দেহনির্গত তীব্র জ্যোতি তাঁর চোখে অসহনীয় ছিল, তাই তিনি কিছুক্ষণের জন্য তাঁর চক্ষু নিমীলিত করেছিলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

চেতস্তৎপ্রবণং যুঞ্জন্নস্তাবীৎসংহতাঞ্জলিঃ ।
শ্লক্ষ্ণয়া সূক্তয়া বাচা সর্বলোকগরীয়সঃ ॥ ২৬ ॥

অত্রিরুবাচ
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু বিভজ্যমানৈ-
র্মায়াগুণৈরনুযুগং বিগৃহীতদেহাঃ ।
তে ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাঃ প্রণতোঽস্ম্যহং ব-
স্তেভ্যঃ ক এব ভবতাং ম ইহোপহূতঃ ॥ ২৭ ॥

চেতঃ—হৃদয়; **তৎ-প্রবণম্**—তাঁদের উপর নিবদ্ধ হয়ে; **যুঞ্জন্**—করে; **অস্তাবীৎ**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; **সংহত-অঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলিপুটে; **শ্লক্ষ্ণয়া**—ভাব-বিহ্বল হয়ে; **সূক্তয়া**—প্রার্থনা; **বাচা**—শব্দ; **সর্ব-লোক**—সমস্ত জগৎ জুড়ে; **গরীয়সঃ**—সম্মানীয়; **অত্রিঃ উবাচ**—অত্রি বলেছিলেন; **বিশ্ব**—জগৎ; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **লয়েষু**—প্রলয়ে; **বিভজ্যমানৈঃ**—বিভক্ত হয়ে; **মায়া-গুণৈঃ**—প্রকৃতির বাহ্য গুণের দ্বারা; **অনুযুগম্**—বিভিন্ন কল্প অনুসারে; **বিগৃহীত**—ধারণ করেছেন; **দেহাঃ**—শরীর; **তে**—তাঁরা; **ব্রহ্ম**—শ্রীব্রহ্মা; **বিষ্ণু**—ভগবান বিষ্ণু; **গিরিশাঃ**—শ্রীশিব; **প্রণতঃ**—অবনত; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি; **বঃ**—আপনাদের; **তেভ্যঃ**—তাঁদের থেকে; **কঃ**—কে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভবতাম্**—আপনাদের মধ্যে; **মে**—আমার দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **উপহূতঃ**—আহূত।

অনুবাদ

কিন্তু যেহেতু তাঁর হৃদয় পূর্বেই সেই দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তাই তিনি কোনক্রমে সচেতন হয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর শব্দের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান দেবতাদের বন্দনা করতে লাগলেন। মহর্ষি অত্রি বললেন—হে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীশিব, আপনারা প্রকৃতির তিন গুণ স্বীকার করে তিন ভাগে আপনাদেরকে বিভক্ত করেছেন, যেভাবে আপনারা প্রতি কল্পে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য করে থাকেন। আমি আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, আমার প্রার্থনার দ্বারা আপনাদের তিনজনের মধ্যে কাকে আমি আহ্বান করেছি।

তাৎপর্য

অত্রি ঋষি জগদীশ্বর অর্থাৎ সমগ্র জগতের প্রভুকে আহ্বান করেছিলেন। ভগবান নিশ্চয়ই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, তা না হলে তিনি কিভাবে জগতের ঈশ্বর হতে পারেন? কেউ যখন একটি বিরাট বাড়ি বানায়, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সেই বাড়িটি তৈরি করার পূর্বে তিনি ছিলেন। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান নিশ্চয়ই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। কিন্তু জানা যায় যে, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের, ব্রহ্মা রজোগুণের এবং শিব তমোগুণের অধ্যক্ষ। তাই অত্রি মুনি বলেছেন, "সেই জগদীশ্বর অবশ্যই আপনাদের মধ্যে কোন একজন, কিন্তু যেহেতু আপনারা তিন জন এসেছেন, আমি বুঝতে পারছি না কাকে আমি আহ্বান করেছি। আপনারা সকলেই অত্যন্ত কৃপাময়। দয়া করে আমাকে বলুন প্রকৃত জগদীশ্বর কে।" বাস্তবিকপক্ষে, অত্রি ঋষি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জগদীশ্বর মায়ার দ্বারা সৃষ্ট কোন প্রাণী হতে পারেন না। তিনি কাকে আহ্বান করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ছিল। তাই তিনি তাঁদের তিনজনের কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন, "দয়া করে আমাকে বলুন ব্রহ্মাণ্ডের অপ্রাকৃত অধীশ্বর কে।" অবশ্য তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তাঁরা তিনজনেই জগদীশ্বর হতে পারেন না, তবে জগদীশ্বর তাঁদের তিনজনের মধ্যে কোন একজন হবেন।

শ্লোক ২৮

একো ময়েহ ভগবান্ বিবিধপ্রধানৈ-
শ্চিত্তীকৃতঃ প্রজননায় কথং নু যূয়ম্ ।
অত্রাগতাস্তনুভৃতাং মনসোঽপি দূরাদ্
ব্রূত প্রসীদত মহানিহ বিস্ময়ো মে ॥ ২৮ ॥

একঃ—এক; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **ভগবান্**—মহান ব্যক্তি; **বিবিধ**—অনেক প্রকার; **প্রধানৈঃ**—সামগ্রীর দ্বারা; **চিত্তী-কৃতঃ**—মনে স্থির করে; **প্রজননায়**—সন্তান উৎপাদনের জন্য; **কথম্**—কেন; **নু**—কিন্তু; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে; **অত্র**—এখানে; **আগতাঃ**—এসেছেন; **তনু-ভৃতাম্**—দেহীর; **মনসঃ**—মন; **অপি**—যদিও; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **ব্রূত**—দয়া করে বলুন; **প্রসীদত**—আমার প্রতি কৃপাপূর্বক; **মহান্**—অত্যন্ত মহৎ; **ইহ**—এই; **বিস্ময়ঃ**—সংশয়; **মে**—আমার।

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর ভগবানের মতো পুত্র লাভের বাসনা করে তাঁকে আহ্বান করেছি, এবং আমি কেবল তাঁরই কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু যদিও তিনি মানুষের মনের কল্পনার অতীত, তবুও আপনারা তিনজন এখানে এসেছেন। দয়া করে আমাকে বলুন কিভাবে আপনারা এসেছেন, কারণ সেই বিষয়ে আমি অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছি।

তাৎপর্য

অত্রি মুনি সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে অবগত ছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জগতের ঈশ্বর, তাই তিনি একজন পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। সুতরাং, তাঁদের তিনজনকে আবির্ভূত হতে দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্তে বিবুধর্ষভাঃ ।
প্রত্যাহুঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রহস্য তমৃষিং প্রভো ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **তস্য**—তাঁর; **বচঃ**—বাণী; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ত্রয়ঃ তে**—তাঁরা তিনজন; **বিবুধ**—দেবতা; **ঋষভাঃ**—প্রধান; **প্রত্যাহুঃ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **শ্লক্ষ্ণয়া**—স্নিগ্ধ; **বাচা**—স্বরে; **প্রহস্য**—হেসে; **তম্**—তাঁকে; **ঋষিম্**—মহর্ষিকে; **প্রভো**—হে শক্তিমান।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—অত্রি মুনির সেই কথা শুনে, তিনজন মহান দেবতা মৃদু হেসেছিলেন, এবং তাঁরা মধুর স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

দেবা ঊচুঃ

যথা কৃতস্তে সঙ্কল্পো ভাব্যং তেনৈব নান্যথা ।
সৎসঙ্কল্পস্য তে ব্রহ্মন্ যদ্বৈ ধ্যায়তি তে বয়ম্ ॥ ৩০ ॥

দেবাঃ ঊচুঃ—দেবতারা উত্তর দিলেন; **যথা**—যেমন; **কৃতঃ**—করা হয়েছে; **তে**—তোমার দ্বারা; **সঙ্কল্পঃ**—সঙ্কল্প; **ভাব্যম্**—হওয়া উচিত; **তেন এব**—তার দ্বারা; **ন অন্যথা**—অন্যভাবে নয়; **সৎ-সঙ্কল্পস্য**—যার সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হয় না; **তে**—তোমার; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **যৎ**—যা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ধ্যায়তি**—ধ্যান করে; **তে**—তাঁরা সকলে; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

তিনজন দেবতা অত্রি মুনিকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ! তুমি সত্যসঙ্কল্প, এবং তাই তুমি যা চেয়েছ, তা হবে; তার কোন অন্যথা হবে না। আমরা সকলেই সেই পুরুষ যাঁর ধ্যান তুমি করেছ, এবং তাই আমরা সকলে তোমার কাছে এসেছি।

তাৎপর্য

জগদীশ্বর সম্বন্ধে এবং তাঁর রূপ সম্বন্ধে অত্রি মুনির কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, এবং তাই তিনি অনিশ্চিতভাবে পরমেশ্বর ভগবান জগদীশ্বরের চিন্তা করেছিলেন। যাঁর নিঃশ্বাস থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয় এবং তাঁর মধ্যে পুনরায় লীন হয়ে যায়, সেই মহাবিষ্ণুকে জগদীশ্বর বলে স্বীকার করা যেতে পারে। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, যাঁর নাভি থেকে উদ্ভূত পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়, তাঁকেও জগদীশ্বর বলে মনে করা যেতে পারে। তেমনই, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা, তাঁকেও জগদীশ্বর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তার পর, এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বিষ্ণুরূপ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর নির্দেশে, ব্রহ্মা এবং শিবকেও জগতের ঈশ্বর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিষ্ণু হচ্ছেন জগতের ঈশ্বর কারণ তিনি তা পালন করেন। তেমনই, ব্রহ্মা বিভিন্ন লোক এবং প্রজা সৃষ্টি করেন, তাই তাঁকেও জগদীশ্বর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। অথবা শিব, যিনি চরমে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন, তাঁকেও ঈশ্বর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। অতএব, অত্রি মুনি যেহেতু বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি কাকে তিনি চেয়েছিলেন, তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—তাঁরা তিনজনেই তাঁর সম্মুখে এসেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "যেহেতু তুমি ঠিক জগদীশ্বরের মতো পুত্র কামনা করেছ, তোমার সেই সঙ্কল্প সার্থক হবে।" পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মানুষের ভক্তির বল অনুসারে তার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) যেমন বলা হয়েছে—*যান্তি দেব-ব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃ-ব্রতাঃ*। কেউ যদি কোন বিশেষ দেবতার প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তিনি সেই দেবতার লোকে উন্নীত হবেন; কেউ যদি পিতা বা পূর্বপুরুষদের প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তিনি তাঁদের

লোকে উন্নীত হবেন; এবং কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তিনি কৃষ্ণলোকে উন্নীত হবেন। জগদীশ্বর সম্বন্ধে অত্রি মুনির কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাই তিনজন প্রধান দেবতা, যাঁরা জগতের তিনটি গুণের অধ্যক্ষ, তাঁরা তিনজনেই তাঁর কাছে এসেছিলেন। এখন, তাঁর পুত্র লাভের সঙ্কল্পের বল অনুসারে, তাঁর বাসনা ভগবানের কৃপায় পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৩১

অথাস্মদংশভূতাস্তে আত্মজা লোকবিশ্রুতাঃ ।
ভবিতারোঽঙ্গ ভদ্রং তে বিস্রপ্স্যন্তি চ তে যশঃ ॥ ৩১ ॥

অথ—অতএব; **অস্মৎ**—আমাদের; **অংশ-ভূতাঃ**—অংশ-প্রকাশ; **তে**—তোমার; **আত্মজাঃ**—পুত্র; **লোক-বিশ্রুতাঃ**—এই জগতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; **ভবিতারঃ**—ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে; **অঙ্গ**—হে মহর্ষি; **ভদ্রম্**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল; **তে**—তোমাকে; **বিস্রপ্স্যন্তি**—বিস্তৃত হবে; **চ**—ও; **তে**—তোমার; **যশঃ**—খ্যাতি।

অনুবাদ

আমাদের শক্তির অংশ-স্বরূপ পুত্র তুমি লাভ করবে, এবং যেহেতু আমরা তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি, তাই তোমার সেই পুত্রেরা সমগ্র জগৎ জুড়ে তোমার যশ বিস্তার করবে।

শ্লোক ৩২

এবং কামবরং দত্ত্বা প্রতিজগ্মুঃ সুরেশ্বরাঃ ।
সভাজিতাস্তয়োঃ সম্যগ্‌দম্পত্যোর্মিষতোস্ততঃ ॥ ৩২ ॥

এবম্—এইভাবে; **কাম-বরম্**—অভিলষিত বর; **দত্ত্বা**—দান করে; **প্রতিজগ্মুঃ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **সুর-ঈশ্বরাঃ**—প্রধান দেবতারা; **সভাজিতাঃ**—পূজিত হয়ে; **তয়োঃ**—তাঁরা যখন; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **দম্পত্যোঃ**—পতি এবং পত্নী; **মিষতোঃ**—দেখছিলেন; **ততঃ**—সেখান থেকে।

অনুবাদ

এইভাবে, অত্রি মুনিকে তাঁর অভিলষিত বর প্রদান করে, সেই তিনজন সুরেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সেই দম্পতির দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

শ্লোক ৩৩

সোমোঽভূদ্ব্রহ্মণোঽংশেন দত্তো বিষ্ণোস্তু যোগবিৎ ।
দুর্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশো নিবোধাঙ্গিরসঃ প্রজাঃ ॥ ৩৩ ॥

সোমঃ—চন্দ্রলোকের অধিপতি; **অভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **অংশেন**—অংশ থেকে; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয়; **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর; **তু**—কিন্তু; **যোগ-বিৎ**—অত্যন্ত শক্তিশালী যোগী; **দুর্বাসাঃ**—দুর্বাসা; **শঙ্করস্য অংশঃ**—শিবের অংশ; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা করুন; **অঙ্গিরসঃ**—মহর্ষি অঙ্গিরার; **প্রজাঃ**—বংশধর।

অনুবাদ

তার পর ব্রহ্মার অংশে থেকে সোমের জন্ম হয়েছিল; বিষ্ণুর অংশে থেকে মহাযোগী দত্তাত্রেয়র জন্ম হয়েছিল, এবং শঙ্করের অংশ থেকে দুর্বাসার জন্ম হয়েছিল। এখন আপনি আমার কাছ থেকে অঙ্গিরার অনেক পুত্র সম্বন্ধে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৩৪

শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ ।
সিনীবালী কুহূ রাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা ॥ ৩৪ ॥

শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; **তু**—কিন্তু; **অঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরা ঋষির; **পত্নী**—পত্নী; **চতস্রঃ**—চার; **অসূত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **কন্যকাঃ**—কন্যা; **সিনীবালী**—সিনীবালী; **কুহূঃ**—কুহূ; **রাকা**—রাকা; **চতুর্থী**—চতুর্থ; **অনুমতিঃ**—অনুমতি; **তথা**—ও।

অনুবাদ

অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা চারটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁদের নাম ছিল—সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতি।

শ্লোক ৩৫

তৎপুত্রাবপরাবাস্তাং খ্যাতৌ স্বারোচিষেঽন্তরে ।
উতথ্যো ভগবান্ সাক্ষাদ্ব্রহ্মিষ্ঠশ্চ বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৫ ॥

তৎ—তাঁর; **পুত্রৌ**—পুত্র; **অপরৌ**—অন্য; **আস্তাম্**—জন্ম হয়েছিল; **খ্যাতৌ**—অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; **স্বারোচিষে**—স্বারোচিষ মন্বন্তরে; **অন্তরে**—মনুর; **উতথ্যঃ**—উতথ্য;

ভগবান্—অত্যন্ত শক্তিশালী; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ব্রহ্মিষ্ঠঃ চ**—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে পূর্ণরূপে উন্নত; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি।

অনুবাদ

এই চারটি কন্যা ব্যতীত তাঁর আরও দুটি পুত্র হয়েছিল। তাঁদের একজনের নাম উতথ্য, এবং অন্যজন হচ্ছেন পরম বিদ্বান বৃহস্পতি।

শ্লোক ৩৬

পুলস্ত্যোঽজনয়ৎপত্ন্যামগস্ত্যং চ হবির্ভুবি ।
সোঽন্যজন্মনি দহ্রাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৩৬ ॥

পুলস্ত্যঃ—ঋষি পুলস্ত্য; **অজনয়ৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **পত্ন্যাম্**—তাঁর পত্নীতে; **অগস্ত্যম্**—মহর্ষি অগস্ত্য; **চ**—ও; **হবির্ভুবি**—হবির্ভূ; **সঃ**—তিনি (অগস্ত্য); **অন্য-জন্মনি**—পরবর্তী জন্মে; **দহ্র-অগ্নিঃ**—জঠরাগ্নি; **বিশ্রবাঃ**—বিশ্রবা; **চ**—এবং; **মহা-তপাঃ**—তপস্যার প্রভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

পুলস্ত্য তাঁর পত্নী হবির্ভূর মাধ্যমে অগস্ত্য নামক এক পুত্র লাভ করেছিলেন, যিনি পরবর্তী জন্মে দহ্রাগ্নি হয়েছিলেন। তা ছাড়া পুলস্ত্যের আর একটি মহান সাধু প্রকৃতির পুত্র হয়েছিল, যার নাম ছিল বিশ্রবা।

শ্লোক ৩৭

তস্য যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্ত্বিড়বিড়াসুতঃ ।
রাবণ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্যাং বিভীষণঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্য—তাঁর; **যক্ষ-পতিঃ**—যক্ষদের রাজা; **দেবঃ**—দেবতা; **কুবেরঃ**—কুবের; **তু**—এবং; **ইড়বিড়া**—ইড়বিড়ার; **সুতঃ**—পুত্র; **রাবণঃ**—রাবণ; **কুম্ভকর্ণঃ**—কুম্ভকর্ণ; **চ**—ও; **তথা**—এইভাবে; **অন্যস্যাম্**—অন্য; **বিভীষণঃ**—বিভীষণ।

অনুবাদ

বিশ্রবার দুই পত্নী ছিলেন। প্রথম পত্নী ইড়বিড়া থেকে যক্ষপতি কুবেরের জন্ম হয়েছিল, এবং অন্য পত্নী কেশিনী থেকে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, এই তিন পুত্রের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

পুলহস্য গতির্ভার্যা ত্রীনসূত সতী সুতান্ ।
কর্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংসং সহিষ্ণুং চ মহামতে ॥ ৩৮ ॥

পুলহস্য—পুলহের; **গতিঃ**—গতি; **ভার্যা**—পত্নী; **ত্রীন্**—তিন; **অসূত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **সতী**—সাধ্বী; **সুতান্**—পুত্র; **কর্ম-শ্রেষ্ঠম্**—সকাম কর্মে অত্যন্ত দক্ষ; **বরীয়াংসম্**—অত্যন্ত সম্মানীয়; **সহিষ্ণুম্**—অত্যন্ত সহিষ্ণু; **চ**—ও; **মহা-মতে**—হে মহান বিদুর।

অনুবাদ

পুলহ ঋষির পত্নী গতি তিনটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁদের নাম ছিল—কর্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান এবং সহিষ্ণু, এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান ঋষি।

তাৎপর্য

পুলহের পত্নী গতি ছিলেন কর্দম মুনির পঞ্চম কন্যা। তিনি অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন এবং তাঁর সব কটি পুত্রই তাঁর পতির মতো শ্রেষ্ঠ ছিল।

শ্লোক ৩৯

ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্যা বালখিল্যানসূয়ত ।
ঋষীন্ষষ্টিসহস্রাণি জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৯ ॥

ক্রতোঃ—মহর্ষি ক্রতুর; **অপি**—ও; **ক্রিয়া**—ক্রিয়া; **ভার্যা**—পত্নী; **বালখিল্যান্**—ঠিক বালখিল্যের মতো; **অসূয়ত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **ঋষীন্**—ঋষিদের; **ষষ্টি**—ষাট; **সহস্রাণি**—হাজার; **জ্বলতঃ**—অতি উজ্জ্বল; **ব্রহ্ম-তেজসা**—ব্রহ্মতেজের প্রভাবে।

অনুবাদ

ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া বালখিল্য নামক ষাট হাজার মহর্ষির জন্ম দিয়েছিলেন। এই সমস্ত ঋষিরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, এবং তাঁদের জ্ঞানের প্রভাবে তাঁদের শরীর জ্যোতির্ময় ছিল।

তাৎপর্য

ক্রিয়া ছিলেন কর্দম মুনির ষষ্ঠ কন্যা। তিনি ষাট হাজার ঋষির জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁরা বালখিল্য নামে পরিচিত ছিলেন, কারণ তাঁরা গৃহস্থ জীবন পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

ঊর্জায়াং জজ্ঞিরে পুত্রা বসিষ্ঠস্য পরন্তপ ।
চিত্রকেতুপ্রধানাস্তে সপ্ত ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৪০ ॥

ঊর্জায়াম্—ঊর্জায়; **জজ্ঞিরে**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **বসিষ্ঠস্য**—মহর্ষি বশিষ্ঠের; **পরন্তপ**—হে মহাত্মা; **চিত্রকেতু**—চিত্রকেতু; **প্রধানাঃ**—প্রমুখ; **তে**—সমস্ত পুত্রেরা; **সপ্ত**—সাত; **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণ; **অমলাঃ**—নির্মল।

অনুবাদ

মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর পত্নী ঊর্জা, যাঁর আর এক নাম অরুন্ধতী, তাঁর থেকে চিত্রকেতু আদি সাতটি নির্মল মহর্ষির জন্ম দান করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

চিত্রকেতুঃ সুরোচিশ্চ বিরজা মিত্র এব চ ।
উল্বণো বসুভৃদ্যানো দ্যুমান্ শক্ত্যাদয়োঽপরে ॥ ৪১ ॥

চিত্রকেতুঃ—চিত্রকেতু; **সুরোচিঃ চ**—এবং সুরোচি; **বিরজাঃ**—বিরজা; **মিত্রঃ**—মিত্র; **এব**—ও; **চ**—এবং; **উল্বণঃ**—উল্বণ; **বসুভৃদ্যানঃ**—বসুভৃদ্যান; **দ্যুমান্**—দ্যুমান; **শক্তি-আদয়ঃ**—শক্তি আদি পুত্রগণ; **অপরে**—তাঁর অন্য পত্নী থেকে।

অনুবাদ

সেই সাতজন মহর্ষির নাম—চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্যান এবং দ্যুমান। বশিষ্ঠের অন্য পত্নী থেকে আরও কয়েকজন অত্যন্ত যোগ্য পুত্র হয়েছিল।

তাৎপর্য

বশিষ্ঠের পত্নী ঊর্জা, যিনি অরুন্ধতী নামেও পরিচিতা, তিনি ছিলেন কর্দম মুনির নবম কন্যা।

শ্লোক ৪২

চিত্তিস্ত্বথর্বণঃ পত্নী লেভে পুত্রং ধৃতব্রতম্ ।
দধ্যঞ্চমশ্বশিরসং ভৃগোর্বংশং নিবোধ মে ॥ ৪২ ॥

চিত্তিঃ—চিত্তি, **তু**—ও; **অথর্বণঃ**—অথর্বার; **পত্নী**—পত্নী, **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পুত্রম্**—পুত্র; **ধৃত-ব্রতম্**—ব্রত পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ; **দধ্যঞ্চম্**—দধ্যঞ্চ; **অশ্বশিরসম্**—অশ্বশিরা; **ভৃগোঃ বংশম্**—ভৃগুর বংশ; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা করুন; **মে**—আমার কাছ থেকে।

অনুবাদ

অথর্বার পত্নী চিত্তি দধ্যঞ্চ নামক ব্রত ধারণ করে অশ্বশিরা নামক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এখন আপনি আমার কাছে মহর্ষি ভৃগুর বংশধরদের সম্বন্ধে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

অথর্বার পত্নী চিত্তি শান্তি নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন কর্দম মুনির অষ্টম কন্যা।

শ্লোক ৪৩

ভৃগুঃ খ্যাত্যাং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ ।
ধাতারং চ বিধাতারং শ্রিয়ং চ ভগবৎপরাম্ ॥ ৪৩ ॥

ভৃগুঃ—মহর্ষি ভৃগু; **খ্যাত্যাম্**—তাঁর পত্নী খ্যাতি থেকে; **মহা-ভাগঃ**—অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী; **পত্ন্যাম্**—পত্নীকে; **পুত্রান্**—পুত্র; **অজীজনৎ**—জন্ম দিয়েছিলেন, **ধাতারম্**—ধাতা; **চ**—এবং; **বিধাতারম্**—বিধাতা; **শ্রিয়ম্**—শ্রী নাম্নী একটি কন্যা; **চ ভগবৎ-পরাম্**—এবং ভগবানের এক পরম ভক্ত।

অনুবাদ

ভৃগু মুনি ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান। তিনি তাঁর পত্নী খ্যাতি থেকে ধাতা এবং বিধাতা নামক দুই পুত্র এবং শ্রী নাম্নী এক কন্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই কন্যাটি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন।

শ্লোক ৪৪

আয়তিং নিয়তিং চৈব সুতে মেরুস্তয়োরদাৎ ।
তাভ্যাং তয়োরভবতাং মৃকণ্ডঃ প্রাণ এব চ ॥ ৪৪ ॥

আয়তিম্—আয়তি; **নিয়তিম্**—নিয়তি; **চ এব**—ও; **সুতে**—কন্যা; **মেরুঃ**—মহর্ষি মেরু; **তয়োঃ**—তাঁদের দুজনকে; **অদাৎ**—সম্প্রদান করেছিলেন; **তাভ্যাম্**—তাঁদের থেকে; **তয়োঃ**—তারা উভয়ে; **অভবতাম্**—আবির্ভূত হয়েছিল; **মৃকণ্ডঃ**—মৃকণ্ড; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

মহর্ষি মেরু তাঁর দুই কন্যা আয়তি এবং নিয়তিকে ধাতা এবং বিধাতার হস্তে সম্প্রদান করেন। আয়তি এবং নিয়তি থেকে মৃকণ্ড এবং প্রাণ নামক দুটি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪৫

মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডস্য প্রাণাদ্বেদশিরা মুনিঃ ।
কবিশ্চ ভার্গবো যস্য ভগবানুশনা সুতঃ ॥ ৪৫ ॥

মার্কণ্ডেয়ঃ—মার্কণ্ডেয়; **মৃকণ্ডস্য**—মৃকণ্ডের; **প্রাণাৎ**—প্রাণ থেকে; **বেদশিরাঃ**—বেদশিরা; **মুনিঃ**—মহর্ষি; **কবিঃ চ**—কবি নামক; **ভার্গবঃ**—ভার্গব নামক; **যস্য**—যাঁর; **ভগবান্**—মহাশক্তিশালী; **উশনা**—শুক্রাচার্য; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

মৃকণ্ড থেকে মার্কণ্ডেয় ঋষির জন্ম হয়, এবং প্রাণ থেকে বেদশিরা ঋষির জন্ম হয়, যাঁর পুত্র ছিলেন উশনা (শুক্রাচার্য), যিনি কবি নামেও পরিচিত। এইভাবে কবিও ভৃগু-বংশীয়।

শ্লোক ৪৬-৪৭

ত এতে মুনয়ঃ ক্ষত্তর্লোকান্ সর্গৈরভাবয়ন্ ।
এষ কর্দমদৌহিত্রসন্তানঃ কথিতস্তব ॥ ৪৬ ॥
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য সদ্যঃ পাপহরঃ পরঃ ।
প্রসূতিং মানবীং দক্ষ উপযেমে হ্যজাত্মজঃ ॥ ৪৭ ॥

তে—তাঁরা; **এতে**—সকলে; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **লোকান্**—ত্রিলোকের; **সর্গৈঃ**—তাঁদের বংশধরগণ সহ; **অভাবয়ন্**—পূর্ণ করেছিলেন; **এষঃ**—

এই, **কর্দম**—কর্দম মুনির; **দৌহিত্র**—পৌত্রগণ; **সন্তানঃ**—সন্তান; **কথিতঃ**—ইতিপূর্বে বলা হয়েছে; **তব**—আপনাকে; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণ করে; **শ্রদ্দধানস্য**—শ্রদ্ধালুর; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **পাপ-হরঃ**—সমস্ত পাপ হরণ করে; **পরঃ**—মহান; **প্রসূতিম্**—প্রসূতি; **মানবীম্**—মনুর কন্যা, **দক্ষঃ**—মহারাজ দক্ষ; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অজ-আত্মজঃ**—ব্রহ্মার পুত্র।

অনুবাদ

হে বিদুর! এইভাবে মহান ঋষিদের এবং কর্দম মুনির কন্যাদের সন্তানদের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা বৃদ্ধি হয়েছিল। যে-ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এই বংশের আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। প্রসূতি নামক মনুর অপর কন্যার বিবাহ হয়েছিল ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের সঙ্গে।

শ্লোক ৪৮

তস্যাং সসর্জ দুহিতৄঃ ষোড়শামললোচনাঃ ।
ত্রয়োদশাদাদ্ধর্মায় তথৈকামগ্নয়ে বিভুঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্যাম্—তাঁকে; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **দুহিতৄঃ**—কন্যাগণ; **ষোড়শ**—ষোল; **অমল-লোচনাঃ**—কমল-নয়না; **ত্রয়োদশ**—তের; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন; **ধর্মায়**—ধর্মকে; **তথা**—এইভাবে; **একাম্**—একটি কন্যা; **অগ্নয়ে**—অগ্নিকে; **বিভুঃ**—দক্ষ।

অনুবাদ

তাঁর পত্নী প্রসূতি থেকে দক্ষের অত্যন্ত সুন্দরী কমল-নয়না ষোলটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। ষোলটি কন্যার মধ্যে তেরটিকে তিনি ধর্মকে এবং একটি কন্যা অগ্নিকে সম্প্রদান করেন।

শ্লোক ৪৯-৫২

পিতৃভ্য একাং যুক্তেভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে ।
শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ ॥ ৪৯ ॥
বুদ্ধির্মেধা তিতিক্ষা হ্রীর্মূর্তির্ধর্মস্য পত্নয়ঃ ।
শ্রদ্ধাসূত শুভং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়া ॥ ৫০ ॥

শান্তিঃ সুখং মুদং তুষ্টিঃ স্ময়ং পুষ্টিরসূয়ত ।
যোগং ক্রিয়োন্নতির্দর্পমর্থং বুদ্ধিরসূয়ত ॥ ৫১ ॥
মেধা স্মৃতিং তিতিক্ষা তু ক্ষেমং হ্রীঃ প্রশ্রয়ং সুতম্ ।
মূর্তিঃ সর্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী ॥ ৫২ ॥

পিতৃভ্যঃ—পিতৃদের; **একাম্**—একটি কন্যা, **যুক্তেভ্যঃ**—সমস্ত; **ভবায়**—শিবকে; **একাম্**—একটি কন্যা; **ভবচ্ছিদে**—যিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন; **শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তিঃ, তুষ্টিঃ, পুষ্টিঃ, ক্রিয়া, উন্নতিঃ, বুদ্ধিঃ, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রীঃ, মূর্তিঃ**—দক্ষের তেরটি কন্যার নাম; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ, **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা, **অসূত**—জন্ম দিয়েছিল; **শুভম্**—শুভ; **মৈত্রী**—মৈত্রী; **প্রসাদম্**—প্রসাদ, **অভয়ম্**—অভয়, **দয়া**—দয়া, **শান্তিঃ**—শান্তি; **সুখম্**—সুখ, **মুদম্**—মুদ, **তুষ্টিঃ**—তুষ্টি; **স্ময়ম্**—স্ময়; **পুষ্টিঃ**—পুষ্টি; **অসূয়ত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **যোগম্**—যোগ; **ক্রিয়া**—ক্রিয়া, **উন্নতিঃ**—উন্নতি; **দর্পম্**—দর্প; **অর্থম্**—অর্থ, **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি, **অসূয়ত**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **মেধা**—মেধা; **স্মৃতিম্**—স্মৃতি; **তিতিক্ষা**—তিতিক্ষা; **তু**—ও, **ক্ষেমম্**—ক্ষেম; **হ্রীঃ**—হ্রী; **প্রশ্রয়ম্**—প্রশ্রয়; **সুতম্**—পুত্র; **মূর্তিঃ**—মূর্তি; **সর্ব-গুণ**—সমস্ত সদ্গুণের; **উৎপত্তিঃ**—উৎস; **নর-নারায়ণৌ**—নর এবং নারায়ণ উভয়ে, **ঋষি**—দুজন মহর্ষি।

অনুবাদ

অবশিষ্ট দুই কন্যার একটিকে তিনি পিতৃলোককে দান করেছিলেন, যেখানে তিনি অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক বাস করছেন, এবং অপর কন্যাটিকে তিনি শিবের হস্তে সম্প্রদান করেন, যিনি পাপী ব্যক্তিদের ভববন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। দক্ষ যে তেরটি কন্যা ধর্মকে দান করেছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী এবং মূর্তি। এই তেরটি কন্যা যে-সমস্ত সন্তানদের জন্ম দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—শ্রদ্ধা থেকে শুভ, মৈত্রী থেকে প্রসাদ, দয়া থেকে অভয়, শান্তি থেকে সুখ, তুষ্টি থেকে মুদ, পুষ্টি থেকে স্ময়, ক্রিয়া থেকে যোগ, উন্নতি থেকে দর্প, বুদ্ধি থেকে অর্থ, মেধা থেকে স্মৃতি, তিতিক্ষা থেকে ক্ষেম এবং হ্রী থেকে প্রশ্রয়। সমস্ত সদ্গুণের আধার মূর্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনর-নারায়ণের জন্ম দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎসুনির্বৃতম্ ।
মনাংসি ককুভো বাতাঃ প্রসেদুঃ সরিতোঽদ্রয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

যয়োঃ—তাঁদের উভয়ের (নর এবং নারায়ণ); **জন্মনি**—আবির্ভাবে, **অদঃ**—সেই; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **অভ্যনন্দৎ**—আনন্দিত হয়েছিল; **সু-নির্বৃতম্**—আনন্দে পূর্ণ; **মনাংসি**—সকলের মন; **ককুভঃ**—দিকসমূহ; **বাতাঃ**—বায়ু; **প্রসেদুঃ**—মনোরম হয়েছিল; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **অদ্রয়ঃ**—পর্বতসমূহ।

অনুবাদ

নর-নারায়ণের আবির্ভাবের ফলে, সমগ্র জগৎ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সকলের মন প্রশান্ত হয়েছিল, এবং এইভাবে সর্বত্র বায়ু, নদীসমূহ, পর্বতসমূহ অত্যন্ত মনোহর হয়েছিল।

শ্লোক ৫৪-৫৫

দিব্যবাদ্যন্ত তূর্যাণি পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ।
মুনয়স্তুষ্টুবুস্তুষ্টা জগুর্গন্ধর্বকিন্নরাঃ ॥ ৫৪ ॥
নৃত্যন্তি স্ম স্ত্রিয়ো দেব্য আসীৎপরমমঙ্গলম্ ।
দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে উপতস্থুরভিষ্টবৈঃ ॥ ৫৫ ॥

দিবি—স্বর্গলোকে; **অবাদ্যন্ত**—বেজে উঠেছিল; **তূর্যাণি**—তূর্য; **পেতুঃ**—বর্ষণ করেছিল; **কুসুম**—ফুল; **বৃষ্টয়ঃ**—বৃষ্টি; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **তুষ্টুবুঃ**—বৈদিক স্তব উচ্চারণ করেছিলেন; **তুষ্টাঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **জগুঃ**—গাইতে শুরু করেছিলেন; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ, **কিন্নরাঃ**—কিন্নরগণ; **নৃত্যন্তি স্ম**—নাচতে শুরু করেছিলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—সুন্দরী রমণীরা; **দেব্যঃ**—স্বর্গলোকের; **আসীৎ**—দৃষ্টিগোচর হয়েছিল; **পরম-মঙ্গলম্**—পরম মঙ্গল; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা এবং অন্যেরা; **সর্বে**—সকলে; **উপতস্থুঃ**—পূজা করেছিলেন; **অভিষ্টবৈঃ**—প্রার্থনা সহকারে।

অনুবাদ

স্বর্গলোকে বাজনা বাজতে শুরু করেছিল, এবং আকাশ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হয়েছিল। ঋষিরা প্রসন্ন হয়ে বৈদিক স্তব উচ্চারণ করেছিলেন, গন্ধর্ব এবং কিন্নরেরা গান

গাইতে শুরু করেছিলেন, এবং স্বর্গের অপ্সরারা নাচতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে নর-নারায়ণের আবির্ভাবের সময় সমস্ত মঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। সেই সময় ব্রহ্মা আদি মহান দেবতারাও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৬

দেবা উচুঃ

যো মায়য়া বিরচিতং নিজয়াত্মনীদং
খে রূপভেদমিব তৎপ্রতিচক্ষণায় ।
এতেন ধর্মসদনে ঋষিমূর্তিনাদ্য
প্রাদুশ্চকার পুরুষায় নমঃ পরস্মৈ ॥ ৫৬ ॥

দেবাঃ—দেবতারা, **উচুঃ**—বলেছিলেন, **যঃ**—যিনি; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **বিরচিতম্**—সৃষ্টি হয়েছে; **নিজয়া**—তাঁর নিজের দ্বারা; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে স্থিত হয়ে; **ইদম্**—এই, **খে**—আকাশে; **রূপ-ভেদম্**—মেঘমালা; **ইব**—যেন; **তৎ**—নিজের; **প্রতিচক্ষণায়**—প্রকাশ করবার জন্য; **এতেন**—এর দ্বারা; **ধর্ম-সদনে**—ধর্মের গৃহে, **ঋষি-মূর্তিনা**—ঋষিরূপে; **অদ্য**—আজ; **প্রাদুশ্চকার**—আবির্ভূত হয়েছেন; **পুরুষায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পরস্মৈ**—পরম।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিরূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বায়ু এবং মেঘ যেমন অন্তরীক্ষে অবস্থিত, এই সৃষ্টিও তেমন তাঁর মধ্যে অবস্থিত। এখন তিনি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে ধর্মের গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিশ্বরূপ হচ্ছে এই জগৎ, যা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রদর্শন। অন্তরীক্ষে অসংখ্য গ্রহলোক রয়েছে এবং বায়ুও রয়েছে, এবং বায়ুতে বিভিন্ন রঙের মেঘ রয়েছে, এবং কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিমান উড়ে যাচ্ছে। এইভাবে সমগ্র সৃষ্টি বৈচিত্র্যে পূর্ণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বৈচিত্র্য হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, এবং সেই শক্তি তাঁর মধ্যে

অবস্থিত। এখন, তাঁর শক্তি প্রকাশ করার পর, ভগবান স্বয়ং তাঁর সেই সৃষ্টিতে আবির্ভূত হয়েছেন, যা যুগপৎ তাঁর থেকে ভিন্ন ও অভিন্ন, এবং তাই দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যিনি এই প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। অদ্বৈতবাদী নামক কিছু দার্শনিক রয়েছে, যারা তাদের নির্বিশেষ ধারণার ফলে মনে করে যে, এই বৈচিত্র্য মিথ্যা। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *যো মায়য়া বিরচিতম্* । অর্থাৎ এই বৈচিত্র্য পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। অতএব, যেহেতু শক্তি ভগবান থেকে অভিন্ন, তাই এই বৈচিত্র্যও বাস্তব। জড়-জাগতিক বৈচিত্র্য অনিত্য হতে পারে, কিন্তু তা মিথ্যা নয়। তা হচ্ছে চিন্ময় বৈচিত্র্যের প্রতিবিম্ব। এখানে *প্রতিচক্ষণায়,* 'সেখানে বৈচিত্র্য রয়েছে', যা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা ঘোষণা করে, যিনি নব-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং যিনি হচ্ছেন জড় জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের উৎস।

শ্লোক ৫৭

সোঽয়ং স্থিতিব্যতিকরোপশমায় সৃষ্টান্
সত্ত্বেন নঃ সুরগণাননুমেয়তত্ত্বঃ ।
দৃশ্যাদদভ্রকরুণেন বিলোকনেন
যচ্ছ্রীনিকেতমমলং ক্ষিপতারবিন্দম্ ॥ ৫৭ ॥

সঃ—সেই; **অয়ম্**—তিনি; **স্থিতি**—সৃষ্টির; **ব্যতিকর**—চরম দুঃখ-দুর্দশা; **উপশমায়**—উপশম করার জন্য; **সৃষ্টান্**—সৃষ্টি করেছেন; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **নঃ**—আমাদের; **সুর-গণান্**—দেবতাদের; **অনুমেয়-তত্ত্বঃ**—বেদের দ্বারা জ্ঞেয়; **দৃশ্যাৎ**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **অদভ্র-করুণেন**—কৃপাপূর্ণ; **বিলোকনেন**—দৃষ্টিপাত; **যৎ**—যা; **শ্রী-নিকেতম্**—লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থল; **অমলম্**—নির্মল; **ক্ষিপত**—অতিক্রম করে; **অরবিন্দম্**—পদ্ম।

অনুবাদ

বিশুদ্ধ প্রামাণিক শাস্ত্র বেদের দ্বারা যাঁকে জানা যায় এবং যিনি জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তির জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের উপর তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুন। তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত লক্ষ্মীদেবীর আলয় নির্মল পদ্মের সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে।

তাৎপর্য

দৃশ্য জগতের আদি উৎস পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির বিচিত্র কার্যকলাপের দ্বারা আচ্ছাদিত, ঠিক যেমন আকাশ অথবা সূর্য এবং চন্দ্রের কিরণ কখনও কখনও মেঘ অথবা ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। সৃষ্টির আদি খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন; তাই জড় বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করে যে, প্রকৃতিই হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির পরম কারণ। কিন্তু *ভগবদ্গীতা* আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই বিচিত্র দৃশ্য জগতের পিছনে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং এই জগতের নিয়মগুলি রক্ষা করার জন্য এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের দৃষ্টির গোচরীভূত হওয়ার জন্য ভগবান আবির্ভূত হন। তিনি জগতের সৃষ্টি এবং বিনাশের কারণ। দেবতারা তাই তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার জন্য তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের প্রার্থনা করেছেন।

শ্লোক ৫৮

এবং সুরগণৈস্তাত ভগবন্তাবভিষ্টুতৌ ।
লব্ধাবলোকৈর্যযতুরর্চিতৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ৫৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **সুর-গণৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **তাত**—হে বিদুর; **ভগবন্তৌ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অভিষ্টুতৌ**—বন্দিত হয়ে; **লব্ধ**—লাভ করে; **অবলোকৈঃ**—দৃষ্টিপাত (কৃপার); **যযতুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **অর্চিতৌ**—পূজিত হয়ে; **গন্ধ-মাদনম্**—গন্ধমাদন পর্বতে।

অনুবাদ

(মৈত্রেয় বললেন—) হে বিদুর ! নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে দেবতাদের বন্দনার দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। ভগবান তখন তাঁদের উপর তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তার পর গন্ধমাদন পর্বতে চলে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৯

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥ ৫৯ ॥

তৌ—উভয়ে; **ইমৌ**—এই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **হরেঃ**—হরির; **অংশৌ**—অংশ-প্রকাশ; **ইহ**—এখানে (এই ব্রহ্মাণ্ডে); **আগতৌ**—

আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ভার-ব্যয়ায়**—ভার হরণের জন্য; **চ**—এবং; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **কৃষ্ণৌ**—দুই কৃষ্ণ (কৃষ্ণ এবং অর্জুন); **যদু-কুরু-উদ্বহৌ**—যাঁরা যদু এবং কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ বংশধর।

অনুবাদ

সেই নর-নারায়ণ ঋষি, যাঁরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ, সম্প্রতি তাঁরা ভূভার হরণের জন্য যদু এবং কুরুবংশে কৃষ্ণ ও অর্জুনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং নর হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের অংশ। এইভাবে শক্তি এবং শক্তিমান একত্রে হয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান। মৈত্রেয় বিদুরকে জানিয়েছিলেন যে, নারায়ণের অংশ নর কুরুবংশে আবির্ভূত হয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ যদুবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষদের উদ্ধার করার জন্য। অর্থাৎ, নর-নারায়ণ ঋষি এখন পৃথিবীতে কৃষ্ণ এবং অর্জুনরূপে বিরাজ করছেন।

শ্লোক ৬০

স্বাহাভিমানিনশ্চাগ্নেরাত্মজাংস্ত্রীনজীজনৎ ।
পাবকং পবমানং চ শুচিং চ হুতভোজনম্ ॥ ৬০ ॥

স্বাহা—স্বাহা, অগ্নির পত্নী, **অভিমানিনঃ**—অগ্নির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **চ**—এবং; **অগ্নেঃ**—অগ্নি থেকে; **আত্মজান্**—পুত্রদের; **ত্রীন্**—তিন; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **পাবকম্**—পাবক; **পবমানম্ চ**—এবং পবমান; **শুচিম্ চ**—এবং শুচি; **হুত-ভোজনম্**—যজ্ঞের আহুতি ভোজন করে।

অনুবাদ

অগ্নিদেব তাঁর পত্নী স্বাহাতে পাবক, পবমান এবং শুচি নামক তিনটি সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, যাঁরা যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত আহুতি ভোজন করেন।

তাৎপর্য

ধর্মের পত্নী তেরজন দক্ষকন্যার বংশধরদের সম্বন্ধে বর্ণনা করার পর, মৈত্রেয় ঋষি এখন দক্ষের চতুর্দশতম কন্যা স্বাহা এবং তাঁর তিন পুত্রের কথা বর্ণনা করছেন।

যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত আহুতি দেবতাদের জন্য, এবং দেবতাদের হয়ে অগ্নি ও স্বাহার তিন পুত্র—পাবক, পবমান ও শুচি তা গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৬১

তেভ্যোঽগ্নয়ঃ সমভবন্ চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।
ত এবৈকোনপঞ্চাশৎসাকং পিতৃপিতামহৈঃ ॥ ৬১ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের থেকে; **অগ্নয়ঃ**—অগ্নিদেব; **সমভবন্**—উৎপন্ন হয়েছেন; **চত্বারিংশৎ**—চল্লিশ; **চ**—এবং; **পঞ্চ**—পাঁচ; **চ**—এবং; **তে**—তাঁরা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **একোন-পঞ্চাশৎ**—উনপঞ্চাশ; **সাকম্**—সহ; **পিতৃ-পিতামহৈঃ**—পিতা এবং পিতামহগণ সহ।

অনুবাদ

এই তিন পুত্র থেকে পঁয়তাল্লিশ বংশধরের জন্ম হয়েছে, এবং তাঁরাও হচ্ছেন অগ্নিদেব। পিতা এবং পিতামহ সহ অগ্নিদেবের সংখ্যা মোট উনপঞ্চাশ।

তাৎপর্য

অগ্নি হচ্ছেন পিতামহ, এবং তাঁর পুত্রেরা হচ্ছেন পাবক, পবমান এবং শুচি। এই চার জন এবং পঁয়তাল্লিশজন পৌত্র, সব মিলে উনপঞ্চাশজন অগ্নিদেব রয়েছেন।

শ্লোক ৬২

বৈতানিকে কর্মণি যন্নামভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
আগ্নেয্য ইষ্টয়ো যজ্ঞে নিরূপ্যন্তেঽগ্নয়স্তু তে ॥ ৬২ ॥

বৈতানিকে—আহুতি প্রদান; **কর্মণি**—কার্যকলাপ; **যৎ**—অগ্নিদেবতাদের; **নামভিঃ**—নামগুলির দ্বারা; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—নির্বিশেষবাদী ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **আগ্নেয্যঃ**—অগ্নির জন্য; **ইষ্টয়ঃ**—যজ্ঞাদি; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **নিরূপ্যন্তে**—নিরূপিত হয়; **অগ্নয়ঃ**—উনপঞ্চাশজন অগ্নিদেবতা; **তু**—কিন্তু; **তে**—সেইগুলি।

অনুবাদ

নির্বিশেষবাদী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নিতে অর্পিত আহুতির ভোক্তা এই উনপঞ্চাশজন অগ্নিদেবতা।

তাৎপর্য

যে নির্বিশেষবাদীরা বৈদিক ফলাশ্রয়ী সকাম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে, তারা বিভিন্ন অগ্নিদেবতার প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁদের নামে আহুতি অর্পণ করে থাকে। সেই উনপঞ্চাশজন অগ্নিদেবতাদের বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৬৩

অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সৌম্যাঃ পিতর আজ্যপাঃ ।
স্বাগ্নয়োঽনগ্নয়স্তেষাং পত্নী দাক্ষায়ণী স্বধা ॥ ৬৩ ॥

অগ্নিষ্বাত্তাঃ—অগ্নিষ্বাত্তাগণ; **বর্হিষদঃ**—বর্হিষদগণ; **সৌম্যাঃ**—সৌম্যগণ; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **আজ্যপাঃ**—আজ্যপগণ; **স-অগ্নয়ঃ**—সাগ্নিক; **অনগ্নয়ঃ**—নিরগ্নিক, **তেষাম্**—তাঁদের; **পত্নী**—পত্নী; **দাক্ষায়ণী**—দক্ষের কন্যা; **স্বধা**—স্বধা।

অনুবাদ

অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, সৌম্য এবং আজ্যপগণ হচ্ছেন পিতা। তাঁরা সাগ্নিক অথবা নিরগ্নিক। এই সমস্ত পিতৃদের পত্নী হচ্ছেন রাজা দক্ষের কন্যা স্বধা।

শ্লোক ৬৪

তেভ্যো দধার কন্যে দ্বে বয়ুনাং ধারিণীং স্বধা ।
উভে তে ব্রহ্মবাদিন্যৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগে ॥ ৬৪ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের থেকে; **দধার**—উৎপন্ন হয়েছিল; **কন্যে**—কন্যাগণ; **দ্বে**—দুটি; **বয়ুনাম্**—বয়ুনা; **ধারিণীম্**—ধারিণী; **স্বধা**—স্বধা; **উভে**—উভয়ে; **তে**—তাঁরা; **ব্রহ্ম-বাদিন্যৌ**—নির্বিশেষবাদী; **জ্ঞান-বিজ্ঞান-পার-গে**—দিব্য এবং বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী।

অনুবাদ

স্বধা, যাঁকে পিতৃদের সম্প্রদান করা হয়েছিল, তাঁর বয়ুনা এবং ধারিণী নামক দুটি কন্যা হয়। তাঁরা উভয়েই ছিলেন নির্বিশেষবাদী এবং দিব্য ও বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী।

শ্লোক ৬৫

ভবস্য পত্নী তু সতী ভবং দেবমনুব্রতা ।
আত্মনঃ সদৃশং পুত্রং ন লেভে গুণশীলতঃ ॥ ৬৫ ॥

ভবস্য—ভবের (শিবের); **পত্নী**—পত্নী; **তু**—কিন্তু; **সতী**—সতী নামক; **ভবম্**—ভবকে; **দেবম্**—দেবতা; **অনুব্রতা**—শ্রদ্ধাপূর্বক সেবায় যুক্ত; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **সদৃশম্**—সদৃশ; **পুত্রম্**—একটি পুত্র; **ন লেভে**—প্রাপ্ত হননি; **গুণ-শীলতঃ**—সদ্‌গুণ এবং চরিত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

সতী নামক ষোড়শতম কন্যাটি ছিলেন শিবের পত্নী। তিনি যদিও সর্বদা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পতির সেবায় যুক্ত ছিলেন, তবুও তাঁর কোন পুত্র হয়নি।

শ্লোক ৬৬

পিতর্যপ্রতিরূপে স্বে ভবায়ানাগসে রুষা ।
অপ্রৌঢ়ৈবাত্মনাত্মানমজহাদ্‌যোগসংযুতা ॥ ৬৬ ॥

পিতরি—পিতারূপে; **অপ্রতিরূপে**—অনুকূল নয়; **স্বে**—তাঁর নিজের; **ভবায়**—শিবকে; **অনাগসে**—নির্দোষ; **রুষা**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **অপ্রৌঢ়া**—প্রৌঢ় অবস্থা লাভের পূর্বে; **এব**—এমন কি; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **আত্মানম্**—শরীর; **অজহাৎ**—ত্যাগ করেছিলেন; **যোগ-সংযুতা**—যোগের দ্বারা।

অনুবাদ

শিব নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও সতীর পিতা দক্ষ তাঁর নিন্দা করতেন। তাই, প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই, সতী যোগ প্রভাবে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত যোগীদের মধ্যে শিব প্রধান হওয়ার ফলে, কখনও তাঁর আবাস নির্মাণ করেননি। সতী ছিলেন একজন মহান রাজা দক্ষের কন্যা, এবং যেহেতু দক্ষের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সতী শিবকে তাঁর পতিরূপে মনোনয়ন করেছিলেন, তাই রাজা দক্ষ তাঁর প্রতি খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেই হেতু যখনই তাঁর পিতার

সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হত, তখনই তাঁর পিতা অনর্থক তাঁর পতির নিন্দা করতেন, যদিও শিব ছিলেন নির্দোষ। সেই কারণে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই সতী তাঁর পিতৃদত্ত শরীর ত্যাগ করেছিলেন, এবং তাই তাঁর কোন সন্তান হয়নি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'মনুকন্যাদের বংশাবলী' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিবের প্রতি দক্ষের অভিশাপ

শ্লোক ১

বিদুর উবাচ

ভবে শীলবতাং শ্রেষ্ঠে দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ ।
বিদ্বেষমকরোৎকস্মাদনাদৃত্যাত্মজাং সতীম্ ॥ ১ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **ভবে**—শিবের প্রতি; **শীলবতাম্**—সুশীল ব্যক্তিদের মধ্যে; **শ্রেষ্ঠে**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **দক্ষঃ**—দক্ষ, **দুহিতৃ-বৎসলঃ**—তাঁর কন্যার প্রতি স্নেহ পরায়ণ হয়ে; **বিদ্বেষম্**—শত্রুতা; **অকরোৎ**—প্রদর্শন করেছিলেন; **কস্মাৎ**—কেন; **অনাদৃত্য**—অবহেলা করে; **আত্মজাম্**—তাঁর নিজের কন্যা; **সতীম্**—সতী।

অনুবাদ

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—দক্ষ তাঁর কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও কেন সতীকে অবহেলা করেছিলেন, এবং সুশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

চতুর্থ স্কন্ধের এই দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শান্তির জন্য দক্ষ যে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে শিবের বিরোধের কারণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে শিবকে সুশীলব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি কারোর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী, এবং অন্য সমস্ত সদ্গুণ তাঁর মধ্যে বিরাজমান। *শিব* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মঙ্গলময়' । কেউই শিবের শত্রু হতে পারে না, কেননা তিনি এত শান্ত এবং ত্যাগী যে, তিনি তাঁর বসবাসের জন্য একটি গৃহ পর্যন্ত নির্মাণ না করে, সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় থেকে সর্বদা বিরক্ত থাকেন। তা হলে দক্ষ যিনি তাঁর প্রিয়

কন্যাকে এমন একজন সুশীল ব্যক্তির কাছে সম্প্রদান করেছিলেন, তিনি কেন সেই শিবের প্রতি এত প্রবল শত্রুতা প্রদর্শন করেছিলেন যে, তাঁর কন্যা এবং শিবের পত্নী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন?

শ্লোক ২

কস্তং চরাচরগুরুং নির্বৈরং শান্তবিগ্রহম্ ।
আত্মারামং কথং দ্বেষ্টি জগতো দৈবতং মহৎ ॥ ২ ॥

কঃ—কে (দক্ষ); **তম্**—তাঁকে (শিব); **চর-অচর**—সমগ্র জগতের (স্থাবর এবং জঙ্গম); **গুরুম্**—গুরু; **নির্বৈরম্**—শত্রুতা-রহিত, **শান্ত-বিগ্রহম্**—শান্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন; **আত্ম-আরামম্**—যিনি নিজে নিজেই সন্তুষ্ট; **কথম্**—কিভাবে; **দ্বেষ্টি**—ঘৃণা করে; **জগতঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের, **দৈবতম্**—দেবতা; **মহৎ**—মহান।

অনুবাদ

সমগ্র জগতের গুরু শিব নির্বৈরী, শান্ত এবং আত্মারাম। তিনি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দক্ষ কেন এই প্রকার একজন মঙ্গলময় ব্যক্তির প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

শিবকে এখানে *চরাচর-গুরু*, অর্থাৎ স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছুর গুরু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও তাঁকে ভূতনাথ বলা হয়, যার অর্থ হচ্ছে 'মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধ্য দেবতা'। ভূত বলতে কখনও কখনও প্রেতাত্মাদেরও বোঝায়। ভূত এবং অসুরদের সংশোধন করার দায়িত্ব শিব গ্রহণ করেন, অতএব দৈব ভাব-সমন্বিত ব্যক্তিদের আর কি কথা; তাই স্থূলবুদ্ধি, আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের থেকে শুরু করে অত্যন্ত বিদ্বান বৈষ্ণব পর্যন্ত সকলের গুরু হচ্ছেন তিনি। এও বলা হয়, *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—শিব হচ্ছেন সমস্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একদিকে তিনি হচ্ছেন মূঢ় অসুরদের আরাধ্য, এবং অন্যদিক দিয়ে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বা ভক্ত, এবং তাঁর একটি *সম্প্রদায়* রয়েছে, যাকে বলা হয় রুদ্র-সম্প্রদায়। এমন কি তিনি যদি শত্রুও হন অথবা কখনও ক্রুদ্ধ হন, তবুও এই প্রকার ব্যক্তি কখনও ঈর্ষার পাত্র হতে পারেন না, তাই বিদুর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, দক্ষ কেন তাঁর প্রতি এইভাবে আচরণ করেছিলেন। দক্ষ কোন সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি

একজন প্রজাপতি, এবং তাঁর সমস্ত কন্যারা, বিশেষ করে সতী ছিলেন অত্যন্ত উন্নত। *সতী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম সাধ্বী'। যখনই সতীত্বের প্রশ্ন ওঠে, তখন শিবের পত্নী এবং দক্ষের কন্যা সতীকেই সর্ব অগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করা হয়। তাই, বিদুর অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, "দক্ষ একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তি, এবং তিনি সতীর পিতা; এবং শিব হচ্ছেন সকলের গুরু। তা হলে তাঁদের মধ্যে এই রকম শত্রুতা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল, যার ফলে অত্যন্ত সাধ্বী দেবী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন?"

শ্লোক ৩

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ জামাতুঃ শ্বশুরস্য চ।
বিদ্বেষস্তু যতঃ প্রাণাংস্তত্যজে দুস্ত্যজান্‌সতী ॥ ৩ ॥

এতৎ—এইভাবে; **আখ্যাহি**—দয়া করে বলুন, **মে**—আমাকে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **জামাতুঃ**—জামাতা (শিব); **শ্বশুরস্য**—শ্বশুরের (দক্ষ); **চ**—এবং; **বিদ্বেষঃ**—কলহ; **তু**—কিন্তু; **যতঃ**—যে কারণে; **প্রাণান্**—তাঁর প্রাণ; **তত্যজে**—ত্যাগ করেছিলেন; **দুস্ত্যজান্**—যা ত্যাগ করা অসম্ভব; **সতী**—সতী।

অনুবাদ

হে মৈত্রেয়! দেহত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। আপনি কি দয়া করে আমার কাছে বর্ণনা করবেন, কি কারণে শ্বশুর এবং জামাতা এমনই তিক্ত কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন, যার ফলে মহাদেবী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন?

শ্লোক ৪

মৈত্রেয় উবাচ
পুরা বিশ্বসৃজাং সত্রে সমেতাঃ পরমর্ষয়ঃ।
তথামরগণাঃ সর্বে সানুগা মুনয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, **পুরা**—পূর্বে (স্বায়ম্ভুব মনুর সময়) **বিশ্ব-সৃজাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তাদের; **সত্রে**—যজ্ঞে; **সমেতাঃ**—সমবেত হয়েছিলেন; **পরম-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **তথা**—এবং; **অমর-গণাঃ**—দেবতাগণ; **সর্বে**—সমস্ত; **স-অনুগাঃ**—তাঁদের অনুগামীগণ সহ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **অগ্নয়ঃ**—অগ্নিদেবতাগণ।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—পুরাকালে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাতে সমস্ত মহর্ষিগণ, মুনিগণ, দেবতাগণ এবং অগ্নিদেবগণ তাঁদের অনুগামীগণ সহ সমবেত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শিব এবং দক্ষের যে কলহের ফলে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন, সেই মনোমালিন্যের কারণ, বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে, মহর্ষি মৈত্রেয় বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যের অধিপতি মরীচি, দক্ষ এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক আয়োজিত এক মহাযজ্ঞের ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল সেই মহাযজ্ঞে ইন্দ্র আদি দেবতাগণ এবং অগ্নিদেবগণ তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা এবং শিবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্লোক ৫

তত্র প্রবিষ্টমৃষয়ো দৃষ্ট্বার্কমিব রোচিষা ।
ভ্রাজমানং বিতিমিরং কুর্বন্তং তন্মহৎসদঃ ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করে, **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অর্কম্** -সূর্য; **ইব** মতো, **রোচিষা**—কান্তির দ্বারা, **ভ্রাজমানম্** উজ্জ্বল, **বিতিমিরম্**—অন্ধকার থেকে মুক্ত; **কুর্বন্তম্**—করেছিলেন, **তৎ**—তা; **মহৎ**—মহান; **সদঃ**—সভা।

অনুবাদ

প্রজাপতিদের অধিপতি দক্ষ যখন সেই সভায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন সূর্যের মতো তাঁর উজ্জ্বল অঙ্গ-প্রভায় সমগ্র সভা আলোকিত হয়েছিল, এবং তাঁর সামনে সভায় সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের নিতান্তই নগণ্য বলে মনে হয়েছিল।

শ্লোক ৬

উদতিষ্ঠন্ সদস্যাস্তে স্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ সহাগ্নয়ঃ ।
ঋতে বিরিঞ্চাং শর্বং চ তদ্ভাসাক্ষিপ্তচেতসঃ ॥ ৬ ॥

উদতিষ্ঠন্—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **সদস্যাঃ**—সভাসদ্‌গণ; **তে**—তাঁরা; **স্ব-ধিষ্ণ্যেভ্যঃ**—তাঁদের আসন থেকে; **সহ-অগ্নয়ঃ**—অগ্নিদেবগণ সহ; **ঋতে**—ব্যতীত; **বিরিঞ্চাম্**—ব্রহ্মা; **শর্বম্**—শিব; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর (দক্ষের); **ভাস**—কান্তির দ্বারা; **আক্ষিপ্ত**—প্রভাবিত; **চেতসঃ**—যাঁদের মন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা এবং শিব ব্যতীত, সমস্ত অগ্নিদেবগণ এবং সেই মহাসভায় অন্যান্য সমবেত সদস্যগণ তাঁর শরীরের জ্যোতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

সদসস্পতিভির্দক্ষো ভগবান্ সাধু সৎকৃতঃ ।
অজং লোকগুরুং নত্বা নিষসাদ তদাজ্ঞয়া ॥ ৭ ॥

সদসঃ—সভার; **পতিভিঃ**—নেতাদের দ্বারা; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **ভগবান্**—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারি; **সাধু**—যথাযথভাবে; **সৎ-কৃতঃ**—সম্মানিত হয়েছিলেন; **অজম্**—অজকে (ব্রহ্মাকে); **লোক-গুরুম্**—ব্রহ্মাণ্ডের গুরু; **নত্বা**—প্রণাম করে; **নিষসাদ**—উপবেশন করেছিলেন; **তৎ-আজ্ঞয়া**—তাঁর (ব্রহ্মার) নির্দেশে।

অনুবাদ

সেই মহান সভার সভাপতি ব্রহ্মা দক্ষকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ব্রহ্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দক্ষ তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮

প্রাঙ্‌নিষণ্ণং মৃড়ং দৃষ্ট্বা নামৃষ্যত্তদনাদৃতঃ ।
উবাচ বামং চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষ্য দহন্নিব ॥ ৮ ॥

প্রাক্—পূর্বে, **নিষণ্ণম্**—উপবেশন করে, **মৃড়ম্**—শ্রীশিবকে, **দৃষ্ট্বা**—দেখে, **ন অমৃষ্যৎ**—সহ্য করেননি; **তৎ**—তাঁর দ্বারা (শিবের দ্বারা); **অনাদৃতঃ**—সম্মান প্রদর্শন না করায়; **উবাচ**—বলেছিলেন; **বামম্**—অসাধু; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—দুই চক্ষুর দ্বারা; **অভিবীক্ষ্য**—দেখে, **দহন্**—জ্বলন্ত, **ইব**—যেন।

অনুবাদ

কিন্তু আসন গ্রহণ করার পূর্বে, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন না করে শিবকে বসে থাকতে দেখে দক্ষ অত্যন্ত অপমানিত হয়েছিলেন। তখন দক্ষ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর চোখ দুটি জ্বলছিল। তিনি তখন অত্যন্ত কঠোরভাবে শিবের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

দক্ষের জামাতা হওয়ার ফলে, আশা করা হয়েছিল যে, শিব অন্যদের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর শ্বশুরকে সম্মান প্রদর্শন করবেন, কিন্তু যেহেতু ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের মধ্যে মুখ্য, তাই তাঁদের পদ দক্ষের থেকেও বড়। কিন্তু দক্ষ তা সহ্য করতে পারেননি, এবং তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর জামাতা এইভাবে তাঁকে অসম্মান করেছেন। পূর্বেও তিনি শিবের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ শিবের বেশ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র এবং জীর্ণ।

শ্লোক ৯

শ্রূয়তাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহাগ্নয়ঃ ।
সাধূনাং ব্রুবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান্ন চ মৎসরাৎ ॥ ৯ ॥

শ্রূয়তাম্—শ্রবণ; **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—হে ব্রহ্মর্ষিগণ, **মে**—আমাকে; **সহ-দেবাঃ**—হে দেবতাগণ; **সহ-অগ্নয়ঃ**—হে অগ্নিদেবগণ ; **সাধূনাম্**—সাধুর; **ব্রুবতঃ**—বলে; **বৃত্তম্**—আচার; **ন**—না; **অজ্ঞানাৎ**—অজ্ঞান থেকে; **ন চ**—এবং না; **মৎসরাৎ**—মাৎসর্য থেকে।

অনুবাদ

উপস্থিত সমস্ত ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং অগ্নিদেবগণ! দয়া করে মনোযোগ সহকারে আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি অজ্ঞানতা অথবা মাৎসর্যের ফলে তা বলছি না।

তাৎপর্য

শিবের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে, দক্ষ সভাস্থ ব্যক্তিদের শান্ত করার চেষ্টায় অত্যন্ত চতুরতাপূর্বক ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি শিষ্টাচার সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছেন,

যদিও স্বাভাবিকভাবেই তা কোন অভদ্র ভুঁইফোড় ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে, এবং সভার সদস্যরা হয়তো চান না যে, কোন অশিষ্ট ব্যক্তিও অপমানিত বোধ করুক, এবং তাই তাঁদের অপমান করা হলে, সভায় সমবেত ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে, শিবের চরিত্র নিষ্কলুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি শিবের বিরুদ্ধে বলতে যাচ্ছেন। দক্ষ শুরু থেকেই শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন; তাই তিনি তাঁর নিজের ঈর্ষা দর্শন করতে পারেননি। যদিও তিনি ঠিক একজন অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তির মতো কথা বলছিলেন, তবুও তিনি তাঁর মনোভাব গোপন করে বলেছিলেন যে, তিনি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে অথবা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে সেই কথাগুলি বলছেন না।

শ্লোক ১০

অয়ং তু লোকপালানাং যশোঘ্নো নিরপত্রপঃ ।
সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থা যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ ॥ ১০ ॥

অয়ম্—সে (শিব); **তু**—কিন্তু; **লোক-পালানাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের পালকদের; **যশঃ ঘ্নঃ**—যশ বিনাশকারী, **নিরপত্রপঃ**—নির্লজ্জ; **সদ্ভিঃ**—সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা; **আচরিতঃ**—আচরিত; **পন্থাঃ**—পথ; যেন—যাঁর দ্বারা (শিব); **স্তব্ধেন**—যথাযথ আচরণ-বিহীন; **দূষিতঃ**—কলুষিত।

অনুবাদ

লোকপালদের নাম এবং যশ শিব বিনষ্ট করেছে, এবং সদাচারের পন্থা কলুষিত করেছে। যেহেতু সে নির্লজ্জ, তাই সে জানে না কিভাবে আচরণ করা উচিত।

তাৎপর্য

দক্ষ সেই সভায় সমবেত সমস্ত মহর্ষিদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, শিব একজন দেবতা হওয়ার ফলে, তাঁর অভদ্র আচরণের দ্বারা সমস্ত দেবতাদের সুখ্যাতি বিনষ্ট করেছেন। শিবের বিরুদ্ধে দক্ষের উক্তির অন্য আর একটি ভাল অর্থ হতে পারে। যেমন, তিনি বলেছেন যে, শিব *যশো ঘ্ন* , যার অর্থ হচ্ছে 'যিনি নাম এবং যশ বিনাশ করেন'। অর্থাৎ তার অর্থ এইভাবে করা যায়, যিনি এত যশস্বী যে, তাঁর যশ অন্য সকলের যশ বিনাশ করে। দক্ষ *নিরপত্রপ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে 'যিনি নির্বোধ', এবং অন্য অর্থটি হচ্ছে

'যিনি আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের পালন করেন'। সাধারণত শিবকে বলা হয় ভূতনাথ, অর্থাৎ নিম্ন স্তরের জীবদের তিনি পালন করেন। তারা শিবের আশ্রয় গ্রহণ করে, কারণ তিনি সকলের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু এবং তিনি অতি সহজেই সন্তুষ্ট হন। তাই তাঁর আর এক নাম আশুতোষ। যারা অন্যান্য দেবতা অথবা বিষ্ণুর কাছে যেতে পারে না, শিব তাদের আশ্রয় দেন তাই সেই অর্থে *নিরপত্রপ* শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্লোক ১১

এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ ॥ ১১ ॥

এষঃ—সে (শিব), **মে**—আমার; **শিষ্যতাম্**—নিকৃষ্ট পদ; **প্রাপ্তঃ**—স্বীকার করেছে; **যৎ**—কারণ; **মে দুহিতুঃ**—আমার কন্যার; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছে; **পাণিম্**—হাত; **বিপ্র-অগ্নি**—ব্রাহ্মণদের এবং অগ্নির; **মুখতঃ**—সমক্ষে, **সাবিত্র্যাঃ**—গায়ত্রী; **ইব**—মতো; **সাধুবৎ**—একজন সাধু ব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

সে অগ্নি এবং ব্রাহ্মণদের সমক্ষে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করার ফলে, আমি তার গুরুজন। সে আমার গায়ত্রী সদৃশ কন্যাকে বিবাহ করেছে, এবং তখন সে ঠিক একজন সাধুর মতো ভান করেছিল।

তাৎপর্য

শিব সাধু ব্যক্তির মতো ভান করেছিলেন, দক্ষের এই উক্তির দ্বারা তিনি বোঝাতে চাইছেন যে, শিব ছিলেন অসাধু, কারণ তাঁর জামাতার পদ স্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি দক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন।

শ্লোক ১২

গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কটলোচনঃ ।
প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃত নোচিতম্ ॥ ১২ ॥

গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; **মৃগ-শাব**—মৃগশাবকের মতো; **অক্ষ্যাঃ**—নয়না; **পাণিম্**—হস্ত; **মর্কট**—বানরের; **লোচনঃ**—নেত্রযুক্ত; **প্রত্যুত্থান**—আসন থেকে উঠে, **অভিবাদ**—

অভিবাদন; **অর্হে**—আমার মতো যোগ্য পাত্রকে; **বাচা**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **অপি**—ও; **অকৃত ন**—করেনি; **উচিতম্**—সম্মান।

অনুবাদ

তার চোখ ঠিক বানরের মতো, তবুও সে আমার মৃগনয়না কন্যাকে বিবাহ করেছে। তা সত্ত্বেও সে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন করেনি, এবং মিষ্ট বাক্যের দ্বারা আমাকে স্বাগত জানানো উপযুক্ত বলেও মনে করেনি।

শ্লোক ১৩

লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয়ে মানিনে ভিন্নসেতবে ।
অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্ ॥ ১৩ ॥

লুপ্ত-ক্রিয়ায়—শিষ্টাচার পালন না করে; **অশুচয়ে**—অপবিত্র; **মানিনে**—গর্বিত; **ভিন্ন-সেতবে**—সমস্ত মর্যাদা লঙ্ঘন করে; **অনিচ্ছন্**—ইচ্ছা না করে; **অপি**—যদিও; **অদাম্**—প্রদান করেছি; **বালাম্**—আমার কন্যাকে; **শূদ্রায়**—শূদ্রকে; **ইব** সদৃশ; **উশতীম্ গিরম্**—বেদের বাণী।

অনুবাদ

শিষ্টাচারের সমস্ত নিয়ম-ভঙ্গকারী এই ব্যক্তিটিকে আমার কন্যাদান করার কোন রকম ইচ্ছা ছিল না। কারণ বাঞ্ছিত বিধি-নিষেধগুলি পালন না করার ফলে, সে অপবিত্র, কিন্তু শূদ্রকে বেদ পাঠ করানোর মতো আমি আমার কন্যাকে তার হস্তে সম্প্রদান করেছি।

তাৎপর্য

শূদ্রের নিকট বেদ পাঠ করা নিষেধ, কারণ শূদ্র তার অপবিত্র স্বভাবের জন্য সেই উপদেশ শ্রবণের যোগ্য নয়। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করলে, বেদ পাঠ করা উচিত নয়। নিম্ন স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পাঠ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না, এই নিষেধাজ্ঞাও ঠিক সেই রকম। দক্ষের দৃষ্টিতে শিব ছিলেন অশুচি, এবং তাঁর জ্ঞানবতী, সুন্দরী এবং সাধ্বী কন্যা সতীর পাণিগ্রহণের অযোগ্য। এই প্রসঙ্গে *ভিন্নসেতবে* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে-ব্যক্তি বৈদিক নিয়ম পালন না করার ফলে, শিষ্টাচারের সমস্ত বিধিগুলি ভঙ্গ করেছে পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দক্ষের বিচারে শিবের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ সঙ্গত হয়নি।

শ্লোক ১৪-১৫

প্রেতাবাসেষু ঘোরেষু প্রেতৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ ।
অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্ ॥ ১৪ ॥
চিতাভস্মকৃতস্নানঃ প্রেতস্রঙ্ন্রস্থিভূষণঃ ।
শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়ঃ ।
পতিঃ প্রমথনাথানাং তমোমাত্রাত্মকাত্মনাম্ ॥ ১৫ ॥

প্রেত-আবাসেষু—যেখানে মৃত দেহ দাহ করা হয়; **ঘোরেষু**—ভয়ঙ্কর; **প্রেতৈঃ**—প্রেতাত্মাদের দ্বারা; **ভূত-গণৈঃ**—ভূতদের দ্বারা, **বৃতঃ**—পরিবৃত; **অটতি**—বিচরণ করে; **উন্মত্ত-বৎ**—পাগলের মতো; **নগ্নঃ**—নগ্ন; **ব্যুপ্ত-কেশঃ**—আলুলায়িত কেশ; **হসন্**—হাসতে হাসতে; **রুদন্**—ক্রন্দন করে; **চিতা**—চিতার; **ভস্ম**—ভস্মের দ্বারা; **কৃত-স্নানঃ**—স্নান করে ; **প্রেত**—মৃত ব্যক্তির মুণ্ড; **স্রক্**—মালা; **নৃ-অস্থি-ভূষণঃ**—শবের অস্থির দ্বারা অলঙ্কৃত; **শিব-অপদেশঃ**—যে কেবল নামে মাত্রই শিব বা শুভ; **হি**—কারণ, **অশিবঃ**—অশুভ; **মত্তঃ**—উন্মাদ; **মত্ত-জন-প্রিয়ঃ**—উন্মাদ ব্যক্তিদের অত্যন্ত প্রিয়; **পতিঃ**—নায়ক; **প্রমথ-নাথানাম্**—প্রমথদের ঈশ্বরদেব; **তমঃ-মাত্র-আত্মক-আত্মনাম্**—তমোগুণাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

সে শ্মশানের মতো অপবিত্র স্থানে বাস করে, এবং ভূত-প্রেতেরা হচ্ছে তার সহচর। সারা শরীরে চিতাভস্ম মেখে, উন্মাদের মতো নগ্ন হয়ে, সে কখনও হাসে এবং কখনও কাঁদে। সে নিয়মিতভাবে স্নান করে না, এবং তার অঙ্গের ভূষণ হচ্ছে মুণ্ডমালা এবং অস্থি। তাই সে কেবল নামেই শিব বা শুভ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সে সব চাইতে উন্মত্ত এবং অশুভ। তাই সে তমোগুণাচ্ছন্ন উন্মাদ ব্যক্তিদের অত্যন্ত প্রিয়, এবং তাদের অধিপতি।

তাৎপর্য

যারা নিয়মিতভাবে স্নান করে না, তারা ভূত এবং উন্মাদ ব্যক্তিদের সহচর বলে বিবেচনা করা হয়। শিবকে ঠিক সেই রকমই মনে হয়, কিন্তু তাঁর শিব নামটি অত্যন্ত উপযুক্ত, কারণ তিনি তমোগুণাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, যেমন যারা নিয়মিতভাবে স্নান করে না, সেই সমস্ত অশুচি নেশাখোরদের প্রতি শিব এতই কৃপালু যে, তিনি এই সমস্ত প্রাণীদের আশ্রয় প্রদান করেন এবং ধীরে ধীরে তাদের

আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নীত করেন। যদিও এই প্রকার ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও শিব তাদের দায়িত্বভাব গ্রহণ করেন, তাই *বেদের* বর্ণনা অনুসারে, তিনি হচ্ছেন শিব বা সর্ব মঙ্গলময়। এইভাবে তাঁর সঙ্গ প্রভাবে অধঃপতিত জীবেরা পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মহান ব্যক্তিরা অত্যন্ত পতিত জীবদেব সঙ্গ করছেন। তাঁবা ব্যক্তিগত স্বার্থে তাদেব সঙ্গ করেন না, পক্ষান্তরে, সেই সমস্ত পতিত জীবদের মঙ্গলের জন্য তাদের সঙ্গ করেন। ভগবানের সৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রকারের জীব রয়েছে। তাদের কেউ সত্ত্বগুণে, কেউ রজোগুণে এবং কেউ তমোগুণে রয়েছে। যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় উন্নত বৈষ্ণব, তাঁদের দায়িত্ব ভগবান শ্রীবিষ্ণু গ্রহণ করেন, যারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অত্যন্ত আসক্ত, তাদের দায়িত্বভার শ্রীব্রহ্মা গ্রহণ করেন, কিন্তু শিব এতই কৃপাময় যে, তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাদের যারা ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন এবং যাদের আচরণ পশুদেব থেকেও অধম। তাই শিবকে বিশেষভাবে মঙ্গলময় বলা হয়।

শ্লোক ১৬

তস্মা উন্মাদনাথায় নষ্টশৌচায় দুর্হৃদে ।
দত্তা বত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৬ ॥

তস্মৈ—তাকে; **উন্মাদ-নাথায়**—ভূতদের পতিকে; **নষ্ট-শৌচায়**—সমস্ত শুচিতা-রহিত; **দুর্হৃদে**—যাব হৃদয় মলে পূর্ণ; **দত্তা**—দেওয়া হয়েছে; **বত**—হায়; **ময়া**—আমার দ্বারা, **সাধ্বী**—সতী, **চোদিতে** অনুরোধের ফলে, **পরমেষ্ঠিনা**—পরম গুরু (ব্রহ্মার) দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রহ্মার অনুরোধে আমি আমার কন্যাকে তার হস্তে সম্প্রদান করেছি, যদিও সে সমস্ত প্রকার শৌচরহিত এবং তার হৃদয় জঘন্যতম নোংরায় পূর্ণ।

তাৎপর্য

পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে শুচিতা, শিষ্টাচার, ধন-সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদিতে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে তাদের পরিবারের কন্যাকে সম্প্রদান করা দক্ষ অনুশোচনা করেছিলেন যে, তাঁর পিতা ব্রহ্মাব অনুরোধে, তিনি তাঁর কন্যাকে এমন একজন অযোগ্য পাত্রের হাতে দান করেছিলেন, তাঁর বিচারে যিনি ছিলেন অপরিচ্ছন্ন। তিনি

এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি বিবেচনা করেননি সেই অনুরোধটি ছিল তাঁর পিতার। পক্ষান্তরে, তিনি ব্রহ্মাকে *পরমেষ্ঠি* বা ব্রহ্মাণ্ডের পরম গুরু বলে সম্বোধন করেছেন; কিন্তু ক্রোধের বশে তিনি তাঁকে তাঁর পিতা বলে স্বীকার করতে চাননি। অর্থাৎ, তিনি ব্রহ্মাকে পর্যন্ত নির্বোধ বলেছিলেন, কারণ তাঁর উপদেশে তিনি তাঁর সুন্দরী কন্যাকে এই রকম একজন কদর্য ব্যক্তির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন। ক্রোধের ফলে মানুষ সব কিছু ভুলে যায়, এবং তাই ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ কেবল মহাদেবেরই নিন্দা করেননি, তিনি তাঁর পিতা ব্রহ্মারও সমালোচনা করেছিলেন, কারণ তাঁরই অদূরদর্শী উপদেশের ফলে, তিনি শিবের হস্তে তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

মৈত্রেয় উবাচ

বিনিন্দ্যৈবং স গিরিশমপ্রতীপমবস্থিতম্ ।
দক্ষোহথাপ উপস্পৃশ্য ক্রুদ্ধঃ শপ্তুং প্রচক্রমে ॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **বিনিন্দ্য**—নিন্দা করে; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি (দক্ষ); **গিরিশম্**—শিব; **অপ্রতীপম্**—শত্রুতা-রহিত; **অবস্থিতম্**—স্থির থেকে; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **অথ**—এখন; **অপঃ**—জল; **উপস্পৃশ্য**—আচমন করে, হাত এবং মুখ ধুয়ে; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **শপ্তুম্**—শাপ দেওয়ার জন্য; **প্রচক্রমে**—শুরু করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে শিবকে তাঁর শত্রু বলে মনে করে দক্ষ জল নিয়ে আচমন করে শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

অয়ং তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ ।
সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ ॥ ১৮ ॥

অয়ম্—সেই; **তু**—কিন্তু; **দেব-যজনে**—দেবতাদের যজ্ঞে; **ইন্দ্র-উপেন্দ্র-আদিভিঃ**—ইন্দ্র, উপেন্দ্র এবং অন্যদের সঙ্গে; **ভবঃ**—শিব; **সহ**—সঙ্গে; **ভাগম্**—এক অংশ; **ন**—না; **লভতাম্** প্রাপ্ত হবে; **দেবৈঃ**—দেবতাগণ সহ; **দেব-গণ-অধমঃ**—সমস্ত দেবতাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম।

অনুবাদ

দেবতারা যজ্ঞের নৈবেদ্য লাভের অধিকারি, কিন্তু সমস্ত দেবতার মধ্যে সব চাইতে অধম শিব যজ্ঞভাগ পাবে না।

তাৎপর্য

এই শাপের ফলে, শিব যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত হন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে বলেছেন যে, দক্ষের অভিশাপের ফলে, জড় জাগতিক বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শিব অংশ গ্রহণ করার দুর্দশা থেকে রক্ষা পেয়েছেন। শিব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এবং দেবতাদের মতো বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে একাসনে বসা অথবা আহার করা তাঁর উপযুক্ত নয়। এইভাবে দক্ষের এই অভিশাপ পরোক্ষভাবে শিবের পক্ষে একটি আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে, কারণ এই অভিশাপের ফলে, শিবকে অত্যন্ত বিষয়াসক্ত অন্য দেবতাদের সঙ্গ করতে হয়নি অথবা তাঁদের সঙ্গে আহার করতে হয়নি। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ আমাদের জন্য একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন—তিনি শৌচালয়ের পাশে বসে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতেন বহু বিষয়াসক্ত ব্যক্তি এসে তাঁকে বিরক্ত করত এবং তাঁর দৈনন্দিন জপে বাধা দিত, তাই তাদের সঙ্গ এড়াবার জন্য শৌচালয়ের পাশে গিয়ে বসতেন, যে স্থানটি নোংরা বলে এবং পূতিগন্ধময় বলে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সেখানে যেত না। কিন্তু, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এমনই একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের মতো একজন মহাপুরুষ তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। মূল কথা হচ্ছে যে, শিব তাঁর ভক্তির অনুশীলনে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ এড়াবার জন্য জেনেশুনে এইভাবে আচরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

নিষিধ্যমানঃ স সদস্যমুখ্যৈ-
র্দক্ষো গিরিত্রায় বিসৃজ্য শাপম্।
তস্মাদ্বিনিষ্ক্রম্য বিবৃদ্ধমন্যু-
র্জগাম কৌরব্য নিজং নিকেতনম্ ॥ ১৯ ॥

নিষিধ্যমানঃ—তাকে না করতে অনুরোধ করা হয়; **সঃ**—তিনি (দক্ষ); **সদস্য-মুখ্যৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সদস্যদের দ্বারা; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **গিরিত্রায়**—শিবকে;

বিসৃজ্য—দিয়ে; **শাপম্**—অভিশাপ; **তস্মাৎ**—সেই স্থান থেকে; **বিনিষ্ক্রম্য**—বেরিয়ে গিয়ে; **বিবৃদ্ধ-মন্যুঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **কৌরব্য**—হে বিদুর, **নিজম্**—তাঁর নিজের; **নিকেতনম্**—গৃহে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! যজ্ঞসভার সদস্যদের অনুরোধ সত্ত্বেও, দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তার পর সেই সভা ত্যাগ করে তাঁর গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ক্রোধ এমনই ক্ষতিকর যে, দক্ষের মতো মহান ব্যক্তিও ক্রোধের ফলে সেই যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করেছিলেন, যার সভাপতিত্ব করছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং যেখানে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য মহর্ষি এবং পুণ্যবান মহাত্মারা। তাঁরা সকলে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন সেখান থেকে না যেতে, কিন্তু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, সেই পবিত্র স্থানটি তাঁর উপযুক্ত নয়। তাঁর উচ্চ পদের গর্বে গর্বিত হয়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর থেকে বড় কেউ নেই। এখানে মনে হয় যে, সেই সভার সমস্ত সদস্যরা, এমন কি ব্রহ্মা পর্যন্ত তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ক্রুদ্ধ না হতে এবং তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে না যেতে, কিন্তু সমস্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। নিষ্ঠুর ক্রোধের এটি হচ্ছে পরিণাম। *ভগবদ্গীতায়* তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে তিনটি বস্তু পরিত্যাগ করতে হবে—কাম, ক্রোধ এবং রজোগুণ। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পাই যে, কাম, ক্রোধ এবং রজোগুণ মানুষকে উন্মাদে পরিণত করে, এমন কি দক্ষের মতো একজন মহান ব্যক্তিকেও। তাঁর দক্ষ নামটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি সব রকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অত্যন্ত পটু ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, শিবের মতো একজন মহাত্মার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, তিনি ক্রোধ, কাম এবং রজোগুণ—এই তিনটি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যেন কখনও বৈষ্ণব অপরাধ না করেন। তিনি বৈষ্ণব অপরাধকে একটি মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মত্ত হস্তী যেমন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কিছু করতে পারে, তেমনই কেউ যখন বৈষ্ণব অপরাধ করে, তখন সে যে-কোন ঘৃণ্য কর্ম করতে পারে।

শ্লোক ২০

বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রণী-
র্নন্দীশ্বরো রোষকষায়দূষিতঃ ।
দক্ষায় শাপং বিসসর্জ দারুণং
যে চান্বমোদংস্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ২০ ॥

বিজ্ঞায়—জানতে পেরে; **শাপম্**—শাপ; **গিরিশ**—শিবের; **অনুগ-অগ্রণীঃ**—মুখ্য পার্ষদদের অন্যতম; **নন্দীশ্বরঃ**—নন্দীশ্বর; **রোষ**—ক্রোধ, **কষায়**—আরক্তিম; **দূষিতঃ**—অন্ধ; **দক্ষায়**—দক্ষকে, **শাপম্** অভিশাপ; **বিসসর্জ**—দিয়েছিলেন; **দারুণম্**—কঠোর; **যে**—যিনি; **চ**—এবং; **অন্বমোদন্**—সহ্য করেছিলেন; **তৎ-অবাচ্যতাম্**—শিবকে অভিশাপ; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

শিবকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে জানতে পেরে, শিবের প্রধান পার্ষদদের অন্যতম নন্দীশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ক্রোধে তাঁর চক্ষু আরক্তিম হয়ে ওঠে, এবং দক্ষ ও সেখানে উপস্থিত যে-সমস্ত ব্রাহ্মণেরা দক্ষের কর্কশ বাক্যে শিবকে অভিশাপ দেওয়া সহ্য করেছিলেন, তিনি তাঁদের সকলকেই অভিশাপ দিতে মনস্থ করেন।

তাৎপর্য

কিছু কনিষ্ঠ অধিকারি বৈষ্ণব এবং শৈবের মধ্যে দীর্ঘকালীন মতভেদ চলে আসছে, তারা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে। দক্ষ যখন শিবকে কর্কশ বাক্যে অভিশাপ দেন, তখন সেখানে উপস্থিত কিছু ব্রাহ্মণ হয়তো তা উপভোগ করেছিলেন, কারণ তাঁরা শিবকে খুব একটা পছন্দ করেন না। তার কারণ হচ্ছে, শিবের অতি উন্নত স্থিতি সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা। এই শাপের ফলে নন্দীশ্বর অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং তিনি সেখানে উপস্থিত শিবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেননি যদিও দক্ষকে একইভাবে শিবও অভিশাপ দিতে পারতেন, তিনি তা না করে নীরবে সহ্য করেছিলেন; কিন্তু তাঁর অনুচর নন্দীশ্বর সহ্য করতে পারেননি। অবশ্যই, একজন অনুচররূপে তাঁর প্রভুর নিন্দা সহ্য না করা তাঁর পক্ষে উচিতই হয়েছিল, কিন্তু সেখানে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের অভিশাপ দেওয়া তাঁর পক্ষে ঠিক হয়নি। সমস্ত ব্যাপারটি এত জটিল ছিল যে, যাঁরা আধ্যাত্মিক বলে যথেষ্ট বলীয়ান ছিলেন না, তাঁরা তাঁদের পদের কথা ভুলে গিয়ে সেই মহান সভায় পরস্পরকে

অভিশাপ দিতে থাকেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জড়-জাগতিক ক্ষেত্রটি এতই অস্থির যে, নন্দীশ্বর, দক্ষ এবং সেখানে উপস্থিত বহু ব্রাহ্মণদেব মতো ব্যক্তিরাও সেই ক্রোধোন্মত্ত পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

শ্লোক ২১

য এতন্মর্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি ।
দ্রুহ্যত্যজ্ঞঃ পৃথগ্‌দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ ॥ ২১ ॥

যঃ—যিনি (দক্ষ); **এতৎ মর্ত্যম্**—এই শরীর; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশ্যে, **ভগবতি**—শিবকে; **অপ্রতিদ্রুহি**—যিনি ঈর্ষাপরায়ণ নন, **দ্রুহ্যতি**—বিদ্বেষভাব পোষণ করে; **অজ্ঞঃ** মূর্খ ব্যক্তি; **পৃথক্-দৃষ্টিঃ**—ভেদভাব; **তত্ত্বতঃ**—দিব্য জ্ঞান থেকে; **বিমুখঃ**—বঞ্চিত; **ভবেৎ**—হয়ে যাবে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি দক্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে করে ঈর্ষাবশত শিবকে অবহেলা করেছে, সে মূর্খ, তার এই ভেদভাবের ফলে সে দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে।

তাৎপর্য

নন্দীশ্বরের প্রথম শাপটি ছিল যে, দক্ষকে যারা সমর্থন করছে, তারা দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং যেহেতু দক্ষের কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই, তাই তাঁর সমর্থকেরা দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে। নন্দীশ্বর বলেছিলেন যে, অন্য সমস্ত বিষয়ী ব্যক্তিদের মতো দক্ষ তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেছিলেন এবং তার ফলে দেহের সমস্ত সুখ-সুবিধা লাভ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দেহের প্রতি, এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ ইত্যাদির প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, যা আত্মা থেকে ভিন্ন। তাই নন্দীশ্বর অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যারা দক্ষকে সমর্থন করেছে, তারা আত্মার দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার ফলে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে।

শ্লোক ২২

গৃহেষু কূটধর্মেষু সক্তো গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া ।
কর্মতন্ত্রং বিতনুতে বেদবাদবিপন্নধীঃ ॥ ২২ ॥

গৃহেষু—গৃহস্থ-জীবনে; **কূট-ধর্মেষু**—কপট ধর্ম আচরণে; **সক্তঃ**—আকৃষ্ট হয়ে; **গ্রাম্য-সুখ-ইচ্ছয়া**—জড়-জাগতিক সুখের বাসনায়; **কর্ম-তন্ত্রম্**—সকাম কর্ম; **বিতনুতে**—অনুষ্ঠান করেন, **বেদ-বাদ**—বেদের ব্যাখ্যার দ্বারা; **বিপন্ন-ধীঃ**—নষ্টবুদ্ধি।

অনুবাদ

কপট ধর্মপরায়ণ যে-গৃহস্থ-জীবনে মানুষ জড়-জাগতিক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং তার ফলে বেদের আপাত ব্যাখ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাতেই তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় এবং সে সকাম কর্মকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে তাতে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, তারা বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন, বেদে বলা হয়েছে যে, যারা চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করে, তারা স্বর্গলোকে নিত্য সুখ লাভ করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, বেদের এই পুষ্পিত বাণীসমূহ দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আকৃষ্ট করে। তাদের কাছে স্বর্গসুখই হচ্ছে চরম প্রাপ্তি; তারা জানে না যে, তার ঊর্ধ্বে চিৎ-জগৎ বা ভগবদ্ধাম রয়েছে, এবং মানুষ যে সেখানে যেতে পারে, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞানই নেই এইভাবে তারা সমস্ত দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। এই প্রকার ব্যক্তিরা পরবর্তী জীবনে চন্দ্রলোক অথবা অন্যান্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য গৃহস্থ-জীবনে সমস্ত বিধি নিষেধগুলি পালন করার ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রকার ব্যক্তিরা *গ্রাম্য-সুখ* -এর প্রতি আসক্ত, যার অর্থ হচ্ছে 'জড়-জাগতিক সুখ'। তাদের নিত্য, আনন্দময়, চিন্ময় জীবন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই।

শ্লোক ২৩

বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির দ্বারা; **পর-অভিধ্যায়িন্যা**—দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা, **বিস্মৃত-আত্ম-গতিঃ**—বিষ্ণুর জ্ঞান ভুলে; **পশুঃ**—পশু; **স্ত্রী-কামঃ**—যৌন জীবনের প্রতি আসক্ত; **সঃ**—তিনি (দক্ষ); **অস্তু**—হোক; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **বস্ত-মুখঃ**—ছাগলের মুখ; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র।

অনুবাদ

দক্ষ তার দেহকেই সর্বস্ব বলে মনে করেছে। তাই যেহেতু সে বিষ্ণুপাদ বা বিষ্ণুগতির কথা ভুলে গেছে, এবং কেবল স্ত্রীসম্ভোগের প্রতি আসক্ত হয়েছে, তাই অচিরেই সে একটি ছাগলের মুখ প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ২৪

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াং কর্মময্যামসৌ জড়ঃ ।
সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্বাবমানিনম্ ॥ ২৪ ॥

বিদ্যা-বুদ্ধিঃ—জড়-জাগতিক বিদ্যা এবং বুদ্ধি; **অবিদ্যায়াম্**—অজ্ঞানে; **কর্ম-ময্যাম্**—সকাম কর্মজনিত; **অসৌ**—সে (দক্ষ); **জড়ঃ**—স্থূল বুদ্ধি; **সংসরন্তু**—বার বার জন্মগ্রহণ করুক; **ইহ**—এই জগতে; **যে**—যে; **চ**—এবং; **অমুম্**—দক্ষ; **অনু**—অনুগামী; **শর্ব** শিব; **অবমানিনম্** অপমান করার ফলে

অনুবাদ

যারা জড় বিদ্যা এবং বুদ্ধির অনুশীলনের ফলে জড়ের মতো নির্বোধ হয়ে গেছে, তারা অজ্ঞানতাবশত সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। তারা জেনেশুনে শিবের নিন্দা করেছে, তাই তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার আবর্তিত হতে থাকুক।

তাৎপর্য

মানুষকে পাথরের মতো জড়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত এবং জড় বিদ্যায় (যা প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা) মগ্ন থাকার পক্ষে এখানে বর্ণিত তিনটি অভিশাপই যথেষ্ট। এইভাবে তাদের অভিশাপ দেওয়ার পর, নন্দীশ্বর ব্রাহ্মণদের অভিশাপ দেন যে, তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকবেন, কারণ তাঁরা দক্ষের শিব-নিন্দার সমর্থন করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

গিরঃ শ্রুতায়াঃ পুষ্পিণ্যা মধুগন্ধেন ভূরিণা ।
মথ্না চোন্মথিতাত্মানঃ সম্মুহ্যন্তু হরদ্বিষঃ ॥ ২৫ ॥

গিরঃ—বাণী, **শ্রুতায়াঃ**—বেদের; **পুষ্পিণ্যাঃ**—পুষ্পিত; **মধু-গন্ধেন**—মধুর গন্ধযুক্ত; **ভূরিণা**—প্রচুর; **মথ্না**—মোহজনক; **চ**—এবং; **উন্মথিত-আত্মানঃ**—যার মন জড় হয়ে গেছে; **সম্মুহ্যন্তু**—তারা আসক্ত থাকুক; **হর-দ্বিষঃ**—শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

অনুবাদ

যারা বেদের মোহময়ী প্রতিজ্ঞার পুষ্পময়ী ভাষায় আকৃষ্ট, এবং তার ফলে জড়তে পরিণত হয়ে শিবের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়েছে, তারা সর্বদা সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত থাকুক।

তাৎপর্য

উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়ে উন্নততর জড়-জাগতিক জীবন লাভের যে বৈদিক প্রতিজ্ঞা, তাকে পুষ্পময়ী বাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কেননা ফুলে অবশ্যই সৌরভ রয়েছে, কিন্তু সেই সৌরভ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ফুলে মধু রয়েছে, কিন্তু সেই মধু চিরস্থায়ী নয়।

শ্লোক ২৬

সর্বভক্ষা দ্বিজা বৃত্ত্যৈ ধৃতবিদ্যাতপোব্রতাঃ ।
বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামা যাচকা বিচরন্ত্বিহ ॥ ২৬ ॥

সর্ব-ভক্ষাঃ—সর্বভুক্; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **বৃত্ত্যৈ**—দেহ ধারণের জন্য; **ধৃত-বিদ্যা**—শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **ব্রতাঃ**—ব্রত; **বিত্ত**—ধন; **দেহ**—শরীর, **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আরামাঃ**—তৃপ্তি; **যাচকাঃ**—ভিক্ষুকরূপে; **বিচরন্তু**—বিচরণ করুক; **ইহ**—এখানে।

অনুবাদ

এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা কেবল তাদের দেহ ধারণের জন্য শিক্ষকতা, তপশ্চর্যা এবং ব্রত গ্রহণ করে। তাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার থাকবে না। তারা কেবল দেহ-সুখের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করে ধন সংগ্রহ করবে।

তাৎপর্য

দক্ষকে সমর্থনকারী ব্রাহ্মণদের নন্দীশ্বর যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তা এই কলিযুগে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয়েছে। তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা পরমব্রহ্মের স্বরূপ জানবার জন্য একেবারেই আগ্রহী নয়, যদিও ব্রাহ্মণ মানে হচ্ছে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। *বেদান্ত-সূত্রেও* বলা হয়েছে *অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা*—মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বকে জানা, অথবা, পক্ষান্তরে বলা যায় যে,

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ স্তরে উন্নীত হওয়া। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক যুগের ব্রাহ্মণেরা অথবা তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা, যাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে, তারা তাদের বর্ণাশ্রমোচিত বৃত্তি পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু তারা অন্য কাউকে ব্রাহ্মণের পদ গ্রহণ করতে দিতে চায় না। *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ কোন বংশানুক্রমিক উপাধি বা পদ নয়। অব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, যেমন শূদ্র পরিবারে যার জন্ম হয়েছে) যদি সদ্গুরুর উপদেশ পালন করার মাধ্যমে, যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করে ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা প্রতিবাদ করে। এই প্রকার ব্রাহ্মণেরা নন্দীশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে এমন একটি স্তরে উপনীত হয়েছে যে, তাদের কোন রকম ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নেই, এবং তারা তাদের নশ্বর জড় দেহটি এবং সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যই কেবল জীবন ধারণ করে। এই প্রকার অধঃপতিত বদ্ধ জীবেরা ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নয়। কিন্তু কলিযুগে তারা ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে, এবং কেউ যদি সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা করে, তা হলে তারা তার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এটি হচ্ছে আধুনিক যুগের অবস্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রথার প্রবল নিন্দা করেছেন। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনার সময়, তিনি বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হোক অথবা শূদ্র পরিবারে জন্ম হোক, তিনি গৃহস্থ হোন অথবা সন্ন্যাসী হোন, যদি তিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে তত্ত্বগতভাবে অবগত থাকেন, তা হলে তিনি অবশ্যই গুরু হতে পারেন। হরিদাস ঠাকুর এবং রামানন্দ রায়ের মতো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহু তথাকথিত শূদ্র শিষ্য ছিলেন। এমন কি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান শিষ্য গোস্বামীগণও ব্রাহ্মণদের দ্বারা সমাজচ্যুত হয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কৃপার প্রভাবে, তাঁদের সর্বোচ্চ স্তরের বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তস্যৈবং বদতঃ শাপং শ্রুত্বা দ্বিজকুলায় বৈ ।
ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্ ॥ ২৭ ॥

তস্য—তাঁর (নন্দীশ্বরের); **এবম্**—এই প্রকার; **বদতঃ**—বাক্য; **শাপম্**—অভিশাপ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দ্বিজ-কুলায়**—ব্রাহ্মণদিগকে; **বৈ**—বস্তুত; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **প্রত্যসৃজৎ**—তৈরি করেছিলেন; **শাপম্**—অভিশাপ; **ব্রহ্ম-দণ্ডম্**—ব্রাহ্মণ প্রদত্ত দণ্ড; **দুরত্যয়ম্**—দুর্লঙ্ঘ্য।

অনুবাদ

নন্দীশ্বর জাতিব্রাহ্মণদের এইভাবে অভিশাপ প্রদান করলে, ভৃগু মুনি তখন শিবের অনুগামীদের ভর্ৎসনা করে প্রচণ্ড ব্রহ্মশাপ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *দুরত্যয়* শব্দটি *ব্রহ্মদণ্ড* অর্থাৎ ব্রহ্মশাপ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণের অভিশাপ অত্যন্ত প্রবল; তাই তাকে বলা হয় *দুরত্যয়* বা দুর্লঙ্ঘ্য। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান যেমন বলেছেন যে, জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম দুর্লঙ্ঘ্য, তেমনই ব্রহ্মশাপও দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* এও বলা হয়েছে যে, জড় জগতে শাপ অথবা বর উভয়ই ভৌতিক সৃষ্টি। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃততে* বলা হয়েছে যে, জড় জগতে যা আশীর্বাদ বলে মনে করা হয় অথবা অভিশাপ বলে মনে করা হয় তা উভয়ই সমান, কারণ তা জড়। এই জড় জগতের কলুষিত পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে হলে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হয়, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলা হয়েছে—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে জড় জগতের অভিশাপ এবং আশীর্বাদ উভয়েরই অতীত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া, এবং চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন, তাঁরা সর্বদাই শান্তিপূর্ণ; তাঁরা কখনও কারোর দ্বারা অভিশপ্ত হন না, এবং তাঁরাও কখনও কাউকে অভিশাপ দেন না। সেটিই হচ্ছে চিন্ময় স্থিতি।

শ্লোক ২৮

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ॥ ২৮ ॥

ভব-ব্রত-ধরাঃ—শ্রীশিবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্রতধারণকারী; **যে**—যারা; **চ**—এবং; **যে**—যারা; **চ**—এবং; **তান্**—এই প্রকার নিয়ম, **সমনুব্রতাঃ**—অনুসরণ করে; **পাষণ্ডিনঃ**—নাস্তিক; **তে**—তারা, **ভবন্তু**—হোক; **সৎ-শাস্ত্র-পরিপন্থিনঃ**—দিব্য শাস্ত্র-নির্দেশের প্রতিকূল।

অনুবাদ

যারা শিবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্রত গ্রহণ করেছে অথবা যারা এই নিয়ম পালন করে, তারা নিশ্চিতভাবে নাস্তিক হবে এবং দিব্য শাস্ত্র-নির্দেশের বিরুদ্ধ আচরণ করবে।

তাৎপর্য

কখনও কখনও দেখা যায় যে, শিবের ভক্তরা শিবের চরিত্রের অনুকরণ করে। যেমন, শিব সমুদ্রের বিষপান করেছিলেন, তাই তাঁর কিছু অনুগামীরা তাঁর অনুকরণ করে গাঁজা আদি মাদক দ্রব্য সেবনের প্রয়াস করে। এখানে তাদের অভিশাপ দেওয়া হয়েছে যে, যারা এই পন্থা গ্রহণ করে, তারা নাস্তিক হয়ে যায় এবং বৈদিক নীতির বিরুদ্ধ আচরণ করবে। বলা হয়েছে যে, শিবের এই প্রকার ভক্তরা *সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থিনঃ*— হবে, অর্থাৎ, 'শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরোধী হবে'। সেই কথা *পদ্ম পুরাণেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। শাস্ত্রে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান বুদ্ধদেব যেমন শূন্যবাদ প্রচার করেছিলেন, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান শিবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নির্বিশেষবাদ বা মায়াবাদ প্রচার করার জন্য।

কখনও কখনও বেদবিরুদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রচার করার প্রয়োজন হয়। *শিব পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শিব পার্বতীকে বলেছেন যে, কলিযুগে ব্রাহ্মণরূপে তিনি মায়াবাদ দর্শন প্রচার করবেন। তাই সাধারণত দেখা যায় যে, শিবের উপাসকেরা মায়াবাদী। শিব নিজেও বলেছেন, *মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রম্*। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, *অসৎ-শাস্ত্র* মানে নির্বিশেষ মায়াবাদ দর্শন, অথবা পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। ভৃগু মুনি অভিশাপ দিয়েছেন যে, যারা শিবের উপাসক, তারা এই মায়াবাদ *অসৎ-শাস্ত্রের* অনুগামী হবে, যা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ, নিরাকার, নিঃশক্তিক, নির্গুণ। আর তা ছাড়া, শিবের উপাসকদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা আসুরিক জীবন যাপন করবে। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *নারদ-পঞ্চরাত্র* হচ্ছে প্রামাণিক শাস্ত্র, যাদের *সৎ-শাস্ত্র* বলে বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ যে শাস্ত্র মানুষকে ভগবৎ উপলব্ধির পথে পরিচালিত করে। *অসৎ-শাস্ত্র* ঠিক তার বিপরীত।

শ্লোক ২৯

নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্ ॥ ২৯ ॥

নষ্ট-শৌচাঃ—পবিত্রতা পরিত্যাগ করে; **মূঢ়-ধিয়ঃ**—মূর্খ; **জটা-ভস্ম-অস্থি-ধারিণঃ**—জটা, ভস্ম এবং অস্থি ধারণ করে; **বিশন্তু**—প্রবেশ করতে পারে; **শিব-দীক্ষায়াম্**—শিব-পূজার দীক্ষায়; **যত্র**—যেখানে; **দৈবম্**—দিব্য, **সুরা-আসবম্**—মদ এবং আসব।

অনুবাদ

যারা শিব-পূজার ব্রত গ্রহণ করে, তারা এতই মূর্খ যে, তারা জটা, ভস্ম এবং অস্থি ধারণ করে তাঁর অনুকরণ করে। তারা যখন শিবের উপাসনায় দীক্ষিত হয়, তখন তারা মদ, মাংস, এই প্রকার বস্তু গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনকারী মূর্খ ব্যক্তিরা মদ এবং মাংস গ্রহণ করে, মাথায় লম্বা চুল রাখে, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে স্নান করে না এবং গাঁজা খায়। এই প্রকার আচরণের ফলে, তারা দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। শিব-মন্ত্রে দীক্ষায় *মুদ্রিকাষ্টক* রয়েছে, যেখানে কখনও কখনও অনুমোদন করা হয়েছে যে, যে-কেউ যোনিতে আসন স্থাপন করে *নির্বাণ* লাভের বাসনা করতে পারে। এই প্রকার উপাসনায় মদ অথবা তাড়ির আবশ্যকতা হয়। শিবের উপাসনা করার বিধি সমন্বিত শাস্ত্র *শিব-আগমেও* এই প্রকার নিবেদনের নির্দেশ রয়েছে।

শ্লোক ৩০

ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ ।
সেতুং বিধারণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্ম—বেদ; **চ**—এবং; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণগণ; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যৎ**—যেহেতু; **যূয়ম্**—তুমি; **পরিনিন্দথ**—নিন্দা করেছ; **সেতুম্**—বৈদিক বিধান; **বিধারণম্**—ধারণা করে; **পুংসাম্**—মানব জাতির; **অতঃ**—অতএব; **পাষণ্ডম্**—নাস্তিকতা; **আশ্রিতাঃ**—শরণ গ্রহণ করেছ।

অনুবাদ

ভৃগু মুনি বললেন—যেহেতু তুমি বেদ এবং বৈদিক নির্দেশের অনুসরণকারী ব্রাহ্মণদের নিন্দা করেছ, তাই বুঝতে হবে যে, তুমি নাস্তিক মতবাদ অবলম্বন করেছ।

তাৎপর্য

নন্দীশ্বরকে অভিশাপ দিয়ে ভৃগু মুনি বলেছিলেন যে, তার শাপের ফলেই যে তারা কেবল অধঃপতিত হয়ে নাস্তিক হয়ে যাবে তাই নয়, মানব-সভ্যতার ভিত্তি-স্বরূপ

বেদের নিন্দা করার ফলে, তারা ইতিমধ্যেই নাস্তিক হয়ে গেছে। গুণ অনুসারে বিভক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই বর্ণধর্মের ভিত্তিতে মানব-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। অর্থ এবং কামের চরিতার্থতার মাধ্যমে ক্রমে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে তার চিন্ময় স্বরূপে *(অহং ব্রহ্মাস্মি)* অধিষ্ঠিত হওয়ার সন্মার্গ *বেদ* প্রদর্শন করে। জীব যতক্ষণ জড় অস্তিত্বের প্রভাবে কলুষিত থাকে, ততক্ষণ তাকে জলচর প্রাণী থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত হতে হয়, কিন্তু এই জগতে মনুষ্য-শরীর হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের জীবন। *বেদ* পথ প্রদর্শন করে, যার ফলে পরবর্তী জীবনে উন্নতি সাধন করা যায়। এই প্রকার উপদেশের মাতা হচ্ছেন *বেদ*, এবং ব্রাহ্মণ বা বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা হচ্ছেন পিতা। তাই কেউ যদি *বেদ* এবং ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে, তা হলে সে স্বাভাবিকভাবে নাস্তিকতার স্তরে অধঃপতিত হয়। নাস্তিক হচ্ছে তারা যারা *বেদকে* বিশ্বাস না করে নিজেদের মনগড়া ধর্ম তৈরি করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, বৌদ্ধমতের অনুগামীরাও নাস্তিক। অহিংসার ধর্ম প্রবর্তন করার জন্য বুদ্ধদেব *বেদ* অস্বীকার করেছিলেন, এবং তার ফলে পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষে এই ধর্মের অনুশীলন বন্ধ করে দেন, এবং বলপূর্বক তা ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কৃত করেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—*ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণান্*। *ব্রহ্ম* মানে হচ্ছে *বেদ*। *অহং ব্রহ্মাস্মি* মানে হচ্ছে 'আমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছি'। *বেদের* নির্দেশ হচ্ছে যে, নিজেকে ব্রহ্ম বলে মনে করা উচিত, কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম। যদি *ব্রহ্ম* বা বৈদিক জ্ঞানের নিন্দা করা হয়, এবং সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিক্ষক ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা হয়, তা হলে মানব-সভ্যতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ভৃগু মুনি বলেছেন, "এমন নয় যে আমার অভিশাপের ফলে তোমরা নাস্তিক হবে, তোমরা ইতিমধ্যেই নাস্তিক হয়ে গেছ। তাই তোমরা অভিশপ্ত।"

শ্লোক ৩১

এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ ।
যং পূর্বে চানুসংতস্থুর্যৎপ্রমাণং জনার্দনঃ ॥ ৩১ ॥

এষঃ—বেদ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—কারণ; **লোকানাম্**—সমস্ত মানুষদের, **শিবঃ**—মঙ্গলময়; **পন্থাঃ**—পথ; **সনাতনঃ**—শাশ্বত; **যম্**—যা (বৈদিক পন্থা), **পূর্বে**—পূর্বে; **চ**—এবং; **অনুসংতস্থুঃ**—নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা হয়েছে; **যৎ**—যাতে; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **জনার্দনঃ**—জনার্দন।

অনুবাদ

মানব-সভ্যতার কল্যাণের জন্য *বেদ* শাশ্বত বিধান প্রদান করে, যা পুরাকাল থেকে নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা হয়েছে। তার সুদৃঢ় প্রমাণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে যাঁকে জনার্দন বলা হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, রূপ এবং আকার নির্বিশেষে সমস্ত প্রাণীর জনক হচ্ছেন তিনি। চুরাশি লক্ষ যোনি রয়েছে, এবং শ্রীকৃষ্ণ দাবি করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সকলের পিতা। জীবেরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তারা সকলেই ভগবানের সন্তান, এবং যেহেতু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে, তারা দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, তাই তাদের মঙ্গলের জন্য এবং, তাদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে *বেদ* প্রদান করা হয়েছে। তাই *বেদকে* বলা হয় *অপৌরুষেয়*, কারণ তা কোন মানুষ, দেবতা, এমন কি প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার দ্বারাও রচিত হয়নি। ব্রহ্মা *বেদের* রচয়িতা বা প্রণেতা নন। তিনিও এই জড় জগতের একজন জীব; তাই তাঁর স্বতন্ত্রভাবে *বেদ* রচনা করার অথবা সেই জ্ঞান প্রদান করার কোন ক্ষমতা নেই। এই জড় জগতের প্রতিটি জীবই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব এবং বিপ্রলিপ্সা—এই চারটি দোষের দ্বারা দুষ্ট। কিন্তু, এই জড় জগতের কোন জীবের দ্বারা *বেদ* রচিত হয়নি। তাই তাকে বলা হয় *অপৌরুষেয়*। *বেদের* ইতিহাস কেউ নিরূপণ করতে পারে না। স্বভাবতই, আধুনিক মানব সভ্যতায় পৃথিবীর অথবা ব্রহ্মাণ্ডের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস বড়জোর তিন হাজার বছরের ঘটনাবলী। কিন্তু *বেদ* যে কবে লেখা হয়েছিল তা কেউই নিরূপণ করতে পারে না, কারণ *বেদ* এই জড় জগতের কোন জীবের দ্বারা রচিত হয়নি। জ্ঞানের অন্য সমস্ত পন্থা ভ্রান্তিপূর্ণ, কারণ তা এই জড় জগতের মানুষ অথবা দেবতাদের দ্বারা রচিত, কিন্তু *ভগবদ্গীতা অপৌরুষেয়*, কারণ তা এই জড় সৃষ্টির কোন মানুষ অথবা দেবতার মুখনিঃসৃত বাণী নয়; তা শ্রীকৃষ্ণের বাণী, যিনি জড় সৃষ্টির অতীত। যে-কথা শঙ্করাচার্যের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত স্বীকার করেছেন; রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য প্রমুখ আচার্যদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শঙ্করাচার্যও স্বীকার করেছেন যে, নারায়ণ বা কৃষ্ণ জড়া প্রকৃতির অতীত। *ভগবদ্গীতায়ও* শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমি সব কিছুর উৎস; আমার থেকেই সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে।" এই জড় জগতের সমস্ত সৃষ্টি, এমন কি ব্রহ্মা, শিব

এবং অন্যান্য দেবতাদেরও তিনিই সৃষ্টি করেছেন, কারণ তাঁর থেকেই সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, সমস্ত *বেদের* উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*) তিনিই হচ্ছেন আদি *বেদবিৎ* বা বেদজ্ঞ, এবং *বেদান্তকৃৎ* বা বেদের প্রণেতা। ব্রহ্মা বেদের প্রণেতা নন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে, *তেনে ব্রহ্মহৃদা*—পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেন। সুতরাং, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপটব এবং বিপ্রলিপ্সা, এই চারটি ত্রুটি থেকে বৈদিক জ্ঞান যে মুক্ত তার প্রমাণ হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান জনার্দন তা বলেছিলেন এবং অনাদিকাল থেকে অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তা অনুসরণ করা হচ্ছে। ভারতের অতি উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা *বেদের* তত্ত্ব বা *বেদের* ধর্ম অনুসরণ করে আসছেন। বৈদিক ধর্মের ইতিহাস কেউই খুঁজে বার করতে পারে না। তাই তা সনাতন, এবং *বেদের* যে-কোন প্রকার নিন্দাকে নাস্তিকতা বলে গণনা করা হয়। *বেদকে সেতু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ কেউ যদি এই জড় জগৎ থেকে চিৎ-জগতে যেতে চান, তা হলে দুস্তর ভব-সমুদ্র পার হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে *বেদ* ।

গুণ এবং কর্ম অনুসারে কিভাবে মানব-জাতিকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে তা *বেদে* বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পন্থা, এবং তা *সনাতনও*, কারণ এর উৎপত্তির ইতিহাস কারও জানা নেই এবং এর বিনাশও কখনও হয় না। বর্ণাশ্রমের পন্থা কেউই রোধ করতে পারে না। যেমন, *ব্রাহ্মণ* নামটি স্বীকার করা হোক বা না হোক, সমাজে পারমার্থিক জ্ঞান এবং দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী এক প্রকার বুদ্ধিমান শ্রেণীর অস্তিত্ব সব সময়ই রয়েছে। তেমনই, এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা অন্যদের শাসন করতে এবং পরিচালিত করতে আগ্রহী বৈদিক প্রথায় সেই শ্রেণীর মানুষদের বলা হয় *ক্ষত্রিয়* তেমনই, সর্বত্রই এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ব্যবসায় উদ্যোগ এবং অর্থ উপার্জনে আগ্রহী, তাদের বলা হয় *বৈশ্য* এবং আর এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা বুদ্ধিমান নয়, পরাক্রমশালী নয় অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে ক্ষমতাসম্পন্ন নয়, কিন্তু যারা কেবল অন্যদের সেবা করতে পারে; তাদের বলা হয় *শূদ্র* বা শ্রমিক শ্রেণী। এই প্রথা *সনাতন*—অনাদি কাল ধরে তা চলে আসছে, এবং এইভাবেই তা চলতে থাকবে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা এই প্রথাকে রোধ করতে পারে। তাই, যেহেতু এই *সনাতন-ধর্ম* শাশ্বত, তাই বৈদিক নীতি অনুসরণ করার ফলে, পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরাকালে ঋষিরা এই প্রথা অনুসরণ করতেন; তাই, বৈদিক প্রথার অনুশীলন করার অর্থ হচ্ছে সমাজের আদর্শ শিষ্টাচার পালন করা। কিন্তু শিবের অনুগামীরা, যারা মদ্যপ, নেশাখোর, অবৈধ যৌনসঙ্গে আসক্ত, যারা স্নান করে না এবং গাঁজা ভাঙ খায়, তারা সমস্ত সদাচারের বিরোধী। মূল কথা হচ্ছে যে, যারা বৈদিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা নিজেরাই প্রমাণ করে যে, *বেদ* প্রামাণিক, কারণ বৈদিক নিয়ম অনুসরণ না করা হলে, তারা পশুর মতো হয়ে যায়। এই প্রকার পাশবিক ব্যক্তিরাই সাক্ষাৎভাবে বেদের বিধানের সর্বোৎকর্ষতা প্রমাণ করে।

শ্লোক ৩২

তদ্ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং সতাং বর্ত্ম সনাতনম্ ।
বিগর্হ্য যাত পাষণ্ডং দৈবং বো যত্র ভূতরাট্ ॥ ৩২ ॥

তৎ—তা, **ব্রহ্ম**—বেদ, **পরমম্**—পরম, **শুদ্ধম্**—পবিত্র, **সতাম্**—সাধু ব্যক্তিদের; **বর্ত্ম**—পথ; **সনাতনম্**—শাশ্বত; **বিগর্হ্য**—নিন্দা করে; **যাত**—যাও; **পাষণ্ডম্**—নাস্তিকতাব; **দৈবম্**—দৈব; **বঃ**—তোমরা সকলে; **যত্র**—যেখানে; **ভূত-রাট্**—ভূতনাথ।

অনুবাদ

সাধু ব্যক্তিদের বিশুদ্ধ এবং পরম পথরূপ বৈদিক নিয়মের নিন্দা করে, ভূত-পতি শিবের অনুগামী তোমরা সকলে নিঃসন্দেহে অধঃপতিত হয়ে পাষণ্ডীতে পরিণত হবে।

তাৎপর্য

এখানে শিবকে *ভূত-রাট্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভূতপ্রেত, পিশাচেরা এবং যারা জড়া প্রকৃতির তমোগুণে অবস্থিত, তাদেরকে বলা হয় ভূতস্; তাই জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্টতম গুণে যারা রয়েছে, তাদের অধিপতিকে *ভূত-রাট্* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভূত শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে এই জড় জগতে যে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা যার উৎপত্তি হয়েছে, সুতরাং, সেই সূত্রে শিবকে এই জড় জগতের পিতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। এখানে অবশ্য ভৃগু মুনি শ্রীশিবকে নিকৃষ্টতম প্রাণীদের পিতা বলে গ্রহণ করেছেন। নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের স্বভাব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে—তারা স্নান করে না, তাদের মাথার চুল লম্বা এবং তারা নেশাসক্ত।

ভূতনাথের অনুগামীদের গৃহীত পথের তুলনায় বৈদিক প্রথা অবশ্যই অপূর্ব, কারণ তা মানুষকে মানব-সভ্যতার পারমার্থিক জীবনের শাশ্বত পন্থার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে। কেউ যদি সেই বৈদিক পন্থার নিন্দা করে, তা হলে সে নাস্তিকতার স্তরে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৩৩

মৈত্রেয় উবাচ

তস্যৈবং বদতঃ শাপং ভৃগোঃ স ভগবান্ ভবঃ ।
নিশ্চক্রাম ততঃ কিঞ্চিদ্বিমনা ইব সানুগঃ ॥ ৩৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **তস্য**—তাঁর; **এবম্**—এইভাবে; **বদতঃ**—বলা হলে; **শাপম্**—অভিশাপ; **ভৃগোঃ**—ভৃগুর; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—সর্ব ঐশ্বর্য-সমন্বিত; **ভবঃ**—শিব; **নিশ্চক্রাম**—চলে গিয়েছিলেন; **ততঃ**—সেখান থেকে; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **বিমনাঃ**—বিষণ্ণ; **ইব**—যেন; **স-অনুগঃ**—তাঁর শিষ্যগণ সহ।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—যখন শিবের অনুচর এবং দক্ষ ও ভৃগুর পক্ষ অবলম্বনকারীদের মধ্যে শাপ-শাপান্ত হচ্ছিল, তখন ভগবান শিব অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। কিছু না বলে, তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে সেই যজ্ঞস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে শিবের অপূর্ব সুন্দর চরিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে। দক্ষ এবং শিবের দলের মধ্যে যদিও শাপ-শাপান্ত হচ্ছিল, কিন্তু শিব সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হওয়ার ফলে তিনি এতই বিনম্র যে, তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। বৈষ্ণব সর্বদাই সহিষ্ণু, এবং শিবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে বিবেচনা করা হয়, তাই এখানে যেভাবে তাঁর চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তা অপূর্ব সুন্দর। তিনি বিষণ্ণ হয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর অনুচর এবং দক্ষের অনুচরেরা পারমার্থিক জীবনের প্রতি আগ্রহী না হয়ে, অনর্থক পরস্পরকে শাপ-শাপান্ত করছিল। তাঁর দৃষ্টিতে কেউই উঁচু বা নীচ ছিল না, কারণ তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। ভগবদ্‌গীতায় (৫/১৮) বলা হয়েছে, *পণ্ডিতাঃ সম-দর্শিনঃ*—যিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি কাউকে ছোট অথবা

বড বলে দেখেন না, কারণ তিনি সকলকেই চিন্ময় স্তর থেকে দর্শন করেন। তাই শিবের একমাত্র বিকল্প ছিল, তাঁর অনুচর নন্দীশ্বর এবং ভৃগু মুনিকে পরস্পর অভিশাপ দেওয়া থেকে নিরস্ত করার জন্য সেই স্থান ত্যাগ করা।

শ্লোক ৩৪

তেঽপি বিশ্বসৃজঃ সত্রং সহস্রপরিবৎসরান্ ।
সংবিধায় মহেষ্বাস যত্রেজ্য ঋষভো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

তে—তাঁরা; **অপি**—সত্ত্বেও; **বিশ্ব-সৃজঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা সৃজনকারী; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **সহস্র**—এক হাজার; **পরিবৎসরান্**—বৎসর, **সংবিধায়**—অনুষ্ঠান করে, **মহেষ্বাস**—হে বিদুর; **যত্র**—যাতে; **ইজ্যঃ**—পূজ্য; **ঋষভঃ**—সমস্ত দেবতাদের মুখ্য দেব; **হরিঃ**—হরি।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর! ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রজাপতিরা এইভাবে সহস্র বৎসর ধরে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পূজা করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে যজ্ঞ

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বের সমস্ত প্রজাপতিরা যজ্ঞের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানে আগ্রহী। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) ভগবানও বলেছেন—*ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাম্*। মানুষ সিদ্ধি লাভের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা কঠোর তপস্যা করতে পারে, কিন্তু তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করা। এই সমস্ত কার্যকলাপ যদি নিজের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে সেই অনুষ্ঠান হচ্ছে *পাষণ্ড* বা নাস্তিক অনুষ্ঠান। কিন্তু তা যখন পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন বৈদিক নিয়ম পালন করা হয়। সেখানে সমবেত সমস্ত ঋষিরা এক হাজার বছর ধরে যজ্ঞ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

আপ্লুত্যাবভৃথং যত্র গঙ্গা যমুনয়ান্বিতা ।
বিরজেনাত্মনা সর্বে স্বং স্বং ধাম যযুস্ততঃ ॥ ৩৫ ॥

আপ্লুত্য—স্নান করে; **অবভৃথম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পরে যে স্নান করা হয়; **যত্র**—যেখানে; **গঙ্গা**—গঙ্গানদী; **যমুনয়া**—যমুনা নদীর দ্বারা, **অন্বিতা**—মিলিত; **বিরজেন**—স্পর্শ ব্যতীত; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **সর্বে**—সকলে; **স্বম্ স্বম্**—তাদের নিজেদের; **ধাম**—নিবাসস্থান; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন; **ততঃ**—সেখান থেকে।

অনুবাদ

হে ধনুর্বাণধারী বিদুর! যজ্ঞকর্তা সমস্ত দেবতারা যজ্ঞ সমাপ্তির পর, গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গমে স্নান করেছিলেন। এই স্নানকে বলা হয় অবভৃথ-স্নান। এইভাবে অন্তরে পবিত্র হয়ে, তাঁরা তাঁদের স্ব-স্ব ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রথমে দক্ষ এবং তার পর শিব যজ্ঞস্থল থেকে চলে যাওয়ার পরেও যজ্ঞ বন্ধ হয়নি, ঋষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য বহু বৎসর ধরে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। শিব এবং দক্ষ না থাকার ফলে যজ্ঞ নষ্ট হয়ে যায়নি, ঋষিরা তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, অনুমান করা যায় যে, কেউ যদি দেবতাদের, এমন কি শিব এবং ব্রহ্মারও পূজা না করেন, তা হলেও তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (৭/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ* । কামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ কিছু জড়-জাগতিক লাভের জন্য দেবতাদের কাছে যায়। *ভগবদ্গীতায় নষ্টবুদ্ধিঃ* এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ 'যারা তাদের জ্ঞান অথবা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।' এই প্রকার ব্যক্তিরাই কেবল দেব-দেবীদের শরণাপন্ন হয়ে, তাঁদের কাছ থেকে জড়-জাগতিক বিষয় লাভ করে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দেবতাদের শ্রদ্ধা করতে হবে না, না, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে কিন্তু তাদের পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই। সৎ ব্যক্তি সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়, কিন্তু তা বলে তাকে সরকারি কর্মচারীদের উৎকোচ দিতে হয় না। উৎকোচ দেওয়া বেআইনী; সরকারি কর্মচারীকে উৎকোচ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে না। তেমনই, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁকে অন্য কোন দেবতার পূজা করতে হয় না, সেই সঙ্গে তিনি আবার তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রদর্শন করেন না। *ভগবদ্গীতার* অন্যত্র (৯/২৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ* । ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরা তাঁরও পূজা করেন, কিন্তু এই

পূজা *অবিধি পূর্বকম্*, অর্থাৎ, 'সেই পূজা বিধিপূর্বক সম্পাদিত হয় না'। বিধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। দেব-দেবীদের পূজা পরোক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা হতে পারে, কিন্তু তা বিধিপূর্বক নয়। পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার ফলে আপনা থেকেই সমস্ত দেব-দেবীদের সেবা হয়ে যায়, কারণ তাঁরা সকলেই হচ্ছেন পরম পূর্ণের ভিন্ন অংশ। গাছের গোড়ায় জল দেওয়া হলে যেমন ডালপালা, পাতা ইত্যাদি গাছের সব কটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়ে যায়, এবং উদরে আহার দেওয়া হলে যেমন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদির পুষ্টি সাধন হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার ফলে সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করা যায়, কিন্তু সমস্ত দেবতাদের পূজা করা হলেও পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা হয় না। তাই দেবতাদের পূজা অবিধিপূর্বক, এবং তা করা হলে শাস্ত্র নির্দেশের অসম্মান করা হয়।

এই কলিযুগে দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। তার ফলে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই যুগের জন্য সংকীর্তন যজ্ঞের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২)। 'এই যুগে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করার মাধ্যমে সর্ব প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।' *তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ*—'যখন ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন, তখন তাঁর বিভিন্ন অংশরূপ সমস্ত দেবতারাও তৃপ্ত হন।'

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে 'শিবের প্রতি দক্ষের অভিশাপ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

তৃতীয় অধ্যায়

শিব এবং সতীর বার্তালাপ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

সদা বিদ্বিষতোরেবং কালো বৈ ধ্রিয়মাণয়োঃ ।
জামাতুঃ শ্বশুরস্যাপি সুমহানতিচক্রমে ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **সদা**—নিরন্তর; **বিদ্বিষতোঃ**—বিদ্বেষভাব; **এবম্**—এইভাবে; **কালঃ**—কাল; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ধ্রিয়-মাণয়োঃ**—সহ্য করেছিলেন; **জামাতুঃ**—জামাতার ; **শ্বশুরস্য**—শ্বশুরের; **অপি**—ও; **সু-মহান্**—অত্যন্ত মহান; **অতিচক্রমে**—অতিবাহিত হয়েছিল।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে শ্বশুর এবং জামাতা, অর্থাৎ দক্ষ এবং শিবের বিদ্বেষভাব বর্তমান ছিল।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে ইতিমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিব এবং দক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণ সম্বন্ধে বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর একটি প্রশ্ন ছিল, দক্ষ এবং তাঁর জামাতার মধ্যে এই কলহের ফলে সতী কেন দেহত্যাগ করেছিলেন। সতীর দেহত্যাগের প্রধান কারণ ছিল যে, তাঁর পিতা দক্ষ আর একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাতে শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। সাধারণত, যদিও প্রতিটি যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা, তবুও সমস্ত দেবতারাও, বিশেষ করে ব্রহ্মা, শিব, এবং ইন্দ্র, চন্দ্র আদি অন্যান্য মুখ্য দেবতারা নিমন্ত্রিত হন, এবং তাঁরা যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেন। বলা হয় যে, সমস্ত দেবতারা যদি উপস্থিত না থাকেন, তা হলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। কিন্তু শ্বশুর এবং

জামাতার মধ্যে এই বিদ্বেষের ফলে, দক্ষ আর একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাতে শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। ব্রহ্মা দক্ষকে মুখ্য প্রজাপতিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন, এবং তিনি ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র, তাই তাঁর পদটি ছিল অতি উচ্চ, এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক হয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

যদাভিষিক্তো দক্ষস্তু ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ।
প্রজাপতীনাং সর্বেষামাধিপত্যে স্ময়োঽভবৎ ॥ ২ ॥

যদা—যখন; **অভিষিক্তঃ**—নিযুক্ত; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **তু**—কিন্তু; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **পরমেষ্ঠিনা**—পরম গুরু; **প্রজাপতীনাম্**—প্রজাপতিদের; **সর্বেষাম্**—সমস্ত; **আধিপত্যে**—প্রধানরূপে; **স্ময়ঃ**—গর্বিত; **অভবৎ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন দক্ষকে সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতির পদে অভিষিক্ত করেন, তখন দক্ষ অত্যন্ত গর্বোদ্ধত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দক্ষ যদিও ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন এবং শিবের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন, তবুও তাঁকে প্রজাপতিদের অধিপতির পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেটি ছিল তাঁর অত্যধিক গর্বের কারণ। কেউ যখন তার জড়-জাগতিক সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়, তখন সে যে-কোন ভয়ঙ্কর কার্য করতে পারে, এবং তাই দক্ষ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আচরণ করেছিলেন। এই অধ্যায়ে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩

ইষ্ট্বা স বাজপেয়েন ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় চ ।
বৃহস্পতিসবং নাম সমারেভে ক্রতূত্তমম্ ॥ ৩ ॥

ইষ্ট্বা—অনুষ্ঠান করে; **সঃ**—তিনি (দক্ষ); **বাজপেয়েন**—বাজপেয় যজ্ঞের দ্বারা; **ব্রহ্মিষ্ঠান**—শিব এবং তাঁর অনুগামীদের; **অভিভূয়**—অবজ্ঞা করে; **চ**—এবং; **বৃহস্পতি-সবম্**—বৃহস্পতিসব; **নাম**—নামক; **সমারেভে**—শুরু করেছিলেন; **ক্রতু-উত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

অনুবাদ

দক্ষ বাজপেয় নামক এক যজ্ঞ শুরু করেছিলেন, এবং ব্রহ্মার সমর্থন সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল। তার পর তিনি বৃহস্পতিসব নামক আর একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, *বৃহস্পতিসব* যজ্ঞ করার পূর্বে *বাজপেয়* নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময়, দক্ষ শিবের মতো একজন মহান ভক্তকে উপেক্ষা করেছিলেন। বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, দেবতারা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের এবং যজ্ঞভাগ লাভের অধিকারি, কিন্তু দক্ষ তাঁদের উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সমস্ত যজ্ঞেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধান করা, কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর সমস্ত ভক্তরাও রয়েছেন। ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশ্বস্ত সেবক; তাই তাঁদের ছাড়া বিষ্ণু কখনও সন্তুষ্ট হন না। কিন্তু দক্ষ তাঁর ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে, ব্রহ্মা এবং শিবকে এই যজ্ঞ থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধান করা হলে, আর তাঁর অনুগামীদের সন্তুষ্টি-বিধান করার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সেটি পন্থা নয়। বিষ্ণু চান যে, তাঁর অনুগামীরা সর্ব প্রথমে সন্তুষ্ট হোন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মদ্-ভক্ত-পূজাভ্যধিকা*—"আমার ভক্তের পূজা আমার পূজার থেকেও শ্রেষ্ঠ।" তেমনই, *শিব পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে বিষ্ণুর আরাধনা, কিন্তু তার থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে কৃষ্ণভক্তের পূজা। তাই দক্ষ যে-সমস্ত যজ্ঞে শিবকে উপেক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তা যথাযথ ছিল না।

শ্লোক ৪

তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ ।
আসন্ কৃতস্বস্ত্যয়নাস্তৎপত্ন্যশ্চ সভর্তৃকাঃ ॥ ৪ ॥

তস্মিন্—সেই (যজ্ঞে); **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—ব্রহ্মর্ষিগণ; **সর্বে**—সকলে; **দেবর্ষি**—দেবর্ষিগণ; **পিতৃ**—পিতৃগণ; **দেবতাঃ**—দেবতাগণ; **আসন্**—ছিলেন; **কৃত-স্বস্তি-অয়নাঃ**—অলঙ্কারের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত; **তৎ-পত্ন্যঃ**—তাঁদের পত্নীগণ; **চ**—এবং; **স-ভর্তৃকাঃ**—তাঁদের পতিগণ সহ।

অনুবাদ

যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল, তখন বহু ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃ এবং দেবতাগণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত তাঁদের পত্নীগণ সহ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে এসে সমবেত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বিবাহ, যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি যে-কোন শুভ অনুষ্ঠানে বিবাহিতা রমণীরা যখন অলঙ্কার, সুন্দর বস্ত্র এবং অঙ্গরাগের দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে অংশ গ্রহণ করেন, তখন তা শুভ বলে মনে করা হয়। এইগুলি হচ্ছে শুভ লক্ষণ। *বৃহস্পতিসব* নামক সেই মহান যজ্ঞে বহু স্বর্গ-রমণীরা তাঁদের দেবর্ষি, দেবতা এবং রাজর্ষি পতিগণ সহ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের পতিদের সঙ্গে সেখানে এসেছিলেন, কারণ কোন রমণী যখন সুন্দরভাবে সজ্জিতা হন, তখন তাঁর পতি অত্যন্ত আনন্দিত হন। দেবপত্নী এবং ঋষিপত্নীদের সজ্জা, তাঁদের অলঙ্কার ও বেশভূষা, এবং দেবতা ও ঋষিদের প্রসন্নতা, এই সমস্ত ছিল সেই উৎসবের শুভ চিহ্ন।

শ্লোক ৫-৭

তদুপশ্রুত্য নভসি খেচরাণাং প্রজল্পতাম্ ।
সতী দাক্ষায়ণী দেবী পিতৃযজ্ঞমহোৎসবম্ ॥ ৫ ॥
ব্রজন্তীঃ সর্বতো দিগ্‌ভ্য উপদেববরস্ত্রিয়ঃ ।
বিমানযানাঃ সপ্রেষ্ঠা নিষ্ককণ্ঠীঃ সুবাসসঃ ॥ ৬ ॥
দৃষ্ট্বা স্বনিলয়াভ্যাশে লোলাক্ষীর্মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ।
পতিং ভূতপতিং দেবমৌৎসুক্যাদভ্যভাষত ॥ ৭ ॥

তৎ—তখন; **উপশ্রুত্য**—শুনে; **নভসি**—আকাশে; **খে-চরাণাম্**—গগন-মার্গে বিচরণকারী (গন্ধর্বগণ); **প্রজল্পতাম্**—সংলাপ; **সতী**—সতী; **দাক্ষায়ণী**—দক্ষকন্যা; **দেবী**—শিবের পত্নী; **পিতৃ-যজ্ঞ-মহা-উৎসবম্**—তাঁর পিতার দ্বারা অনুষ্ঠিত মহান যজ্ঞ উৎসব; **ব্রজন্তীঃ**—যাচ্ছিলেন; **সর্বতঃ**—সমস্ত; **দিগ্‌ভ্যঃ**—দিক থেকে; **উপদেব-বর-স্ত্রিয়ঃ**—দেবতাদের সুন্দরী পত্নীগণ; **বিমান-যানাঃ**—তাঁদের বিমানে

চড়ে; **স-প্রেষ্ঠাঃ**—তাঁদের পতিগণ সহ; **নিষ্ক-কণ্ঠীঃ**—রত্নখচিত সম্পুটযুক্ত কণ্ঠহার-শোভিত; **সু-বাসসঃ**—সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **স্ব-নিলয়-অভ্যাশে**—তাঁর গৃহের নিকটে; **লোল-অক্ষীঃ**—উজ্জ্বল-নয়না; **মৃষ্ট-কুণ্ডলাঃ**—সুন্দর কর্ণ-কুণ্ডল; **পতিম্**—পতি; **ভূত-পতিম্**—ভূতনাথ; **দেবম্**—দেবতা; **ঔৎসুক্যাৎ**—গভীর ঔৎসুক্য সহকারে; **অভ্যভাষত**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

পরম সাধ্বী দক্ষকন্যা সতী গগন-মার্গে বিচরণকারী স্বর্গলোকবাসীদের পরস্পর আলোচনায় শুনতে পেয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা এক মহান যজ্ঞ করছেন। যখন তিনি দেখলেন যে, সমস্ত দিক থেকে স্বর্গবাসীদের উজ্জ্বল মৃগনয়না পত্নীগণ অতি সুন্দর বসনে এবং কণ্ঠহার ও কর্ণকুণ্ডলে বিভূষিতা হয়ে, তাঁদের পতিদের সঙ্গে সেই যজ্ঞে যোগদান করার জন্য চলেছেন, তখন তিনি তাঁর পতি ভূতনাথের কাছে গিয়ে পরম ঔৎসুক্য সহকারে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, শিবের আলয় এই লোকে নয়, অন্তরীক্ষে অন্য কোথাও। তা না হলে, সতী কিভাবে বিভিন্ন দিক থেকে এই লোকের দিকে বিমানগুলিকে উড়ে আসতে দেখেছিলেন এবং বিমানের যাত্রীদের দক্ষের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের কথা আলোচনা করতে শুনেছিলেন? সতীকে এখানে *দাক্ষায়ণী* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন দক্ষের কন্যা। *উপদেব-বর* শব্দে গন্ধর্ব, কিন্নর এবং উরগদের মতো নিকৃষ্ট স্তরের দেবতাদের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা ঠিক দেবতা নন—দেবতা এবং মনুষ্যদের মাঝামাঝি স্তরের প্রাণী। তাঁরাও বিমানে চড়ে আসছিলেন। *স্ব-নিলয়াভ্যাশে* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁরা তাঁদের আবাসস্থলের খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানে স্বর্গবাসীদের পত্নীদের বেশভূষা এবং তাঁদের শারীরিক গঠনের খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের নেত্র ছিল চঞ্চল, তাঁদের কুণ্ডল এবং অন্যান্য অলঙ্কার উজ্জ্বলভাবে তাঁদের অঙ্গে শোভা পাচ্ছিল, তাঁদের পরনে ছিল অতি সুন্দর বস্ত্র, এবং তাঁদের সকলেরই কণ্ঠহারের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল বিশেষ প্রকারের সম্পুট। প্রতিটি রমণী তাঁদের পতির সঙ্গে ছিলেন। এইভাবে তাঁদের এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, *দাক্ষায়ণী* সতীর ইচ্ছা হয়েছিল তাঁদেরই মতো সজ্জিত হয়ে তাঁর পতি সহ সেই যজ্ঞে যাওয়ার। এটি স্ত্রীলোকদের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

শ্লোক ৮

সত্যুবাচ
প্রজাপতেস্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং
নির্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল ।
বয়ং চ তত্রাভিসরাম বাম তে
যদ্যর্থিতামী বিবুধা ব্রজন্তি হি ॥ ৮ ॥

সতী উবাচ—সতী বললেন; **প্রজাপতেঃ**—দক্ষের; **তে**—আপনার; **শ্বশুরস্য**—শ্বশুরের; **সাম্প্রতম্**—ইদানীং; **নির্যাপিতঃ**—শুরু হয়েছে; **যজ্ঞ-মহা-উৎসবঃ**—মহাযজ্ঞ; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—এবং; **তত্র**—সেখানে; **অভিসরাম**—যেতে পারি; **বাম**—হে প্রিয় পতি শিব; **তে**—আপনার; **যদি**—যদি; **অর্থিতা**—ইচ্ছা; **অমী**—এই সমস্ত; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণ; **ব্রজন্তি**—যাচ্ছে; **হি**—কারণ।

অনুবাদ

সতী বললেন—হে প্রিয় পতি শিব! আপনার শ্বশুর এখন এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করছেন, এবং সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে সমস্ত দেবতারা সেখানে যাচ্ছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন, আমরাও সেখানে যাই।

তাৎপর্য

সতী তাঁর পিতা এবং পতির মধ্যে যে মনোমালিন্য চলছিল তা জানতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পতি শিবকে বলেছিলেন যে, যেহেতু তাঁর পিতার গৃহে এই রকম একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল এবং সমস্ত দেবতারা সেখানে যাচ্ছিলেন, তাই তিনিও সেখানে যেতে চান। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা সরাসরিভাবে প্রকাশ করতে পারেননি, এবং তাই তিনি তাঁর পতিকে বলেছিলেন যে, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, তা হলে তিনিও তাঁর সঙ্গে যেতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি তাঁর পতির কাছে তাঁর মনোবাঞ্ছা অত্যন্ত বিনীতভাবে ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৯

তস্মিন্ ভগিন্যো মম ভর্তৃভিঃ স্বকৈ-
র্ধ্রুবং গমিষ্যন্তি সুহৃদ্দিদৃক্ষবঃ ।
অহং চ তস্মিন্ ভবতাভিকাময়ে
সহোপনীতং পরিবর্হমর্হিতুম্ ॥ ৯ ॥

তস্মিন্—সেই যজ্ঞে; **ভগিন্যঃ**—ভগ্নীগণ; **মম**—আমার; **ভর্তৃভিঃ**—তাঁদের পতিগণ সহ; **স্বকৈঃ**—তাঁদের; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে; **গমিষ্যন্তি**—যাবে; **সুহৃৎ-দিদৃক্ষবঃ**—আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার বাসনায়; **অহম্**—আমি; **চ**—এবং; **তস্মিন্**—সেই সভায়; **ভবতা**—আপনার সঙ্গে (শিবের সঙ্গে); **অভিকাময়ে**—অভিলাষ করি; **সহ**—সঙ্গে; **উপনীতম্**—প্রদত্ত; **পরিবর্হম্**—অলঙ্কার; **অর্হিতুম্**—গ্রহণ করতে।

অনুবাদ

মনে হয় আমার ভগিনীরাও তাঁদের পতিদের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার বাসনায় সেই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। আমার পিতৃ-প্রদত্ত অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, আমিও সেই সভায় যোগদান করার জন্য যেতে চাই।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিকভাবে অলঙ্কার এবং সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে, তাঁদের পতিদের সঙ্গে সামাজিক উৎসবে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগদান করতে চান, এবং এইভাবে জীবনে আনন্দ উপভোগ করতে চান। এই প্রবণতাটি অস্বাভাবিক নয়, কারণ জড় সুখভোগের মূল হচ্ছে নারী। তাই সংস্কৃত ভাষায় *স্ত্রী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যে জড় সুখভোগের ক্ষেত্র বিস্তার করে'। জড় জগতে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে এক আকর্ষণ রয়েছে। সেটি বদ্ধ জীবনের ব্যবস্থা। স্ত্রী পুরুষকে আকর্ষণ করে, এবং তার ফলে গৃহ, বিত্ত, সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র বর্ধিত হতে থাকে, এবং তাই জড়-জাগতিক আবশ্যকতাগুলি কমাবার পরিবর্তে, মানুষ জড় সুখভোগে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু, শ্রীশিব ভিন্ন প্রকৃতির; তাই তাঁর নাম শিব। যদিও তাঁর পত্নী সতী ছিলেন একজন মহান প্রজাপতির কন্যা এবং ব্রহ্মার অনুরোধে তাঁর হস্তে সতীকে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তবুও তিনি জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি একেবারেই আসক্ত ছিলেন না। কিন্তু শিব অনাসক্ত হলেও, একজন স্ত্রী এবং রাজকন্যারূপে, সতী সুখভোগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য ভগিনীদের মতো তিনিও তাঁর পিতৃগৃহে যেতে চেয়েছিলেন, এবং সেখানে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সামাজিক জীবনের সুখ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। এখানে, তিনি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর পিতৃদত্ত অলঙ্কারে তিনি সজ্জিত হতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেননি যে, তিনি তাঁর পতিদত্ত অলঙ্কারে সজ্জিত হবেন, কারণ তাঁর পতি এই সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিলেন। তিনি জানতেন না কিভাবে তাঁর

পত্নীকে সাজাতে হয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়, কারণ তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় আনন্দমগ্ন ছিলেন। বৈদিক প্রথা অনুসারে, বিবাহের সময় কন্যাকে যথেষ্ট যৌতুক দেওয়া হয়, এবং তাই সতীও তাঁর পিতার কাছ থেকে বহুবিধ অলঙ্কার আদি যৌতুক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সাধারণত পতিও অলঙ্কার প্রদান করেন, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর পতির কোন রকম জড়-জাগতিক সম্পদ না থাকার ফলে, তিনি তাঁকে কিছুই দিতে পারেননি; তাই তিনি তাঁর পিতৃ-প্রদত্ত অলঙ্কারের দ্বারা নিজেকে সাজাতে চেয়েছিলেন। এটি সতীর সৌভাগ্য যে, শিব গাঁজা কেনার জন্য তাঁর পত্নীর কাছ থেকে গহনা নিয়ে বিক্রি করেননি, কারণ যারা শিবের অনুকরণ করে গাঁজা খায়, তারা তাদেব গৃহস্থালির সর্বনাশ করে; তারা তাদের পত্নীদের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদিব নেশায় এবং ঐ ধরনের কার্যকলাপে তা নষ্ট করে দেয়।

শ্লোক ১০

তত্র স্বসৃর্মে ননু ভর্তৃসম্মিতা
মাতৃষ্বসৃঃ ক্লিন্নধিয়ং চ মাতরম্ ।
দ্রক্ষ্যে চিরোৎকণ্ঠমনা মহর্ষিভি-
রুন্নীয়মানং চ মৃড়াধ্বরধ্বজম্ ॥ ১০ ॥

তত্র—সেখানে; **স্বসৃঃ**—স্বীয় ভগ্নীগণ; **মে**—আমার; **ননু**—নিশ্চিতভাবে; **ভর্তৃ-সম্মিতাঃ**—তাঁদের পতিগণ সহ; **মাতৃ-স্বসৃঃ**—মাতৃষ্বসাগণ; **ক্লিন্ন-ধিয়ম্**—স্নেহপরায়ণ; **চ**—এবং; **মাতরম্**—মাতা; **দ্রক্ষ্যে**—দর্শন করব; **চির-উৎকণ্ঠ-মনাঃ**—দীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে; **মহা-ঋষিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **উন্নীয়মানম্**—উন্নীত; **চ**—এবং; **মৃড়**—হে শিব; **অধ্বর**—যজ্ঞ; **ধ্বজম্**—পতাকা।

অনুবাদ

আমার ভগিনীগণ, মাতৃষ্বসাগণ, তাঁদের পতিগণ, এবং অন্যান্য স্নেহপরায়ণ আত্মীয়-স্বজনগণ সেখানে নিশ্চয়ই সমবেত হয়েছেন, তাই আমি যদি সেখানে যাই, তা হলে আমি তাঁদের দেখতে পাব। সেখানে আমি উড্ডীয়মান যজ্ঞধ্বজা এবং মহর্ষিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞও দর্শন করতে পারব। হে প্রিয় পতি, সেই সমস্ত কারণে আমি সেখানে যেতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্বশুর এবং জামাতার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে মনোমালিন্য চলছিল। তাই, সতী দীর্ঘকাল তাঁর পিতৃগৃহে যাননি। তার ফলে তিনি তাঁর পিতার গৃহে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে তাঁদের পতি সহ তাঁর ভগিনীগণ এবং তাঁর মাতৃস্বসাগণ যখন সেখানে উপস্থিত থাকবেন। স্ত্রীজনোচিত স্বভাববশত তাঁর ভগিনীদের মতো সজ্জিত হয়ে, তাঁর পতি সহ তিনি সেখানে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি অবশ্যই সেখানে একলা যেতে চাননি।

শ্লোক ১১

ত্বয্যেতদাশ্চর্যমজাত্মমায়য়া
বিনির্মিতং ভাতি গুণত্রয়াত্মকম্ ।
তথাপ্যহং যোষিদতত্ত্ববিচ্চ তে
দীনা দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ষিতিম্ ॥ ১১ ॥

ত্বয়ি—আপনাতে; **এতৎ**—এই; **আশ্চর্যম্**—বিস্ময়জনক; **অজ**—হে শিব; **আত্ম-মায়য়া**—পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **বিনির্মিতম্**—সৃষ্ট; **ভাতি**—প্রতীত হয়; **গুণ-ত্রয়-আত্মকম্**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণেব পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে; **তথা অপি**—তবুও; **অহম্**—আমি; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **অতত্ত্ব-বিৎ**—তত্ত্বজ্ঞানহীনা; **চ**—এবং; **তে**—আপনার; **দীনা**—দরিদ্র; **দিদৃক্ষে**—দর্শন করতে ইচ্ছা করি; **ভব**—হে শিব; **মে**—আমার; **ভব-ক্ষিতিম্**—জন্মভূমি।

অনুবাদ

এই দৃশ্য জগৎ ত্রিগুণের পারস্পরিক ক্রিয়া বা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির এক আশ্চর্যজনক সৃষ্টি। সেই তত্ত্ব আপনি সম্পূর্ণরূপে অবগত। কিন্তু আপনি জানেন যে, আমি একজন তত্ত্বজ্ঞানহীনা অবলা স্ত্রী। তাই আমি আর একবার আমার জন্মভূমি দর্শন করতে চাই।

তাৎপর্য

দাক্ষায়ণী সতী ভালভাবেই জানতেন যে, তাঁর পতি শিব প্রকৃতির তিন গুণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রকাশিত চাকচিক্যময় জড় জগতের প্রতি বিশেষ আগ্রহী নন। তাই তিনি তাঁর পতিকে অজ বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে যিনি জন্ম-

মৃত্যুর বন্ধনের অতীত, অথবা যিনি তাঁর শাশ্বত স্থিতি উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই দৃশ্য জগৎকে সত্য বলে মনে করার মোহ আপনার মধ্যে নেই, কারণ আপনি আত্ম-তত্ত্ববেত্তা। আপনার কাছে সামাজিক জীবনের আকর্ষণ এবং কেউ পিতা, কেউ মাতা, আর কেউ ভগিনী, এই যে সমস্ত মায়িক সম্পর্কের বিবেচনা, তা দূরীভূত হয়েছে; কিন্তু যেহেতু আমি একজন অবলা রমণী, তাই আমি পারমার্থিক উপলব্ধিতে ততটা উন্নত নই। আমার কাছে এইগুলি স্বাভাবিকভাবেই সত্য বলে প্রতীত হয়।" অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল চিৎ-জগতের এই বিকৃত প্রতিফলনকে সত্য বলে মনে করে। যারা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত, তারাই কেবল এই জগৎকে বাস্তব বলে মনে করে, কিন্তু যাঁরা পারমার্থিক উপলব্ধিতে উন্নত, তাঁরা জানেন যে, এটি মায়িক। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তব সত্য অন্য কোথাও রয়েছে—চিৎ-জগতে। সতী বলেছেন, "আমার বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান নেই। আমি দীন, কারণ বাস্তব তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই। আমি আমার জন্মভূমির প্রতি আসক্ত, এবং আমি তা দর্শন করতে চাই।" *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা তাদের জন্মভূমি, দেহ, এবং এই প্রকার বস্তুর প্রতি আসক্ত, তাদের বুদ্ধি গাধা অথবা গরুর মতো। সেই কথা সতী হয়তো তাঁর পতি শিবের কাছ থেকে বহুবার শুনেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন একজন *যোষিৎ* বা রমণী, তাই তিনি সেই সমস্ত জড় বস্তুর প্রতি তাঁর আসক্তি বজায় রেখেছিলেন। *যোষিৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভোগ্য'। তাই স্ত্রীদের *যোষিৎ* বলা হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে *যোষিৎসঙ্গ* সর্বতোভাবে বর্জনীয়, কারণ কেউ যদি যোষিতের হস্তে ক্রীড়নক হয়, তা হলে তার পারমার্থিক উন্নতি সর্বতোভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, "যারা যোষিতের হাতে ক্রীড়নকের মতো *(যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগেষু)*, তারা পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারে না।"

শ্লোক ১২

পশ্য প্রয়ান্তীরভবান্যযোষিতো
ঽপ্যলঙ্কৃতাঃ কান্তসখা বরূথশঃ ।
যাসাং ব্রজদ্ভিঃ শিতিকণ্ঠ মণ্ডিতং
নভো বিমানৈঃ কলহংসপাণ্ডুভিঃ ॥ ১২ ॥

পশ্য—দেখুন; **প্রয়ান্তীঃ**—যাচ্ছে; **অভব**—হে অজ; **অন্য-যোষিতঃ**—অন্য রমণীরা; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **অলঙ্কৃতাঃ**—বিভূষিতা; **কান্ত-সখাঃ**—তাঁদের পতি এবং বন্ধু-

বান্ধবদের সঙ্গে; **বহুশঃ**—বহু সংখ্যক; **যাসাম্**—যাঁদের; **ব্রজন্তিঃ**—উড়ন্ত; **শিতি-কণ্ঠ**—হে নীলকণ্ঠ; **মণ্ডিতম্**—সুশোভিত; **নভঃ**—আকাশে; **বিমানৈঃ**—বিমানে; **কল-হংস**—হংস; **পাণ্ডুভিঃ**—শ্বেত।

অনুবাদ

হে অভব, হে নীলকণ্ঠ। কেবল আমার আত্মীয়-স্বজনেরাই নয়, অন্য রমণীরাও সুন্দর অলঙ্কার এবং বেশভূষায় বিভূষিতা হয়ে, তাঁদের পতি এবং বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে যাচ্ছেন। দেখুন, তাঁদের শ্বেত বিমানসমূহ কিভাবে সমস্ত আকাশকে সুশোভিত করেছে।

তাৎপর্য

শিব যদিও সাধারণত *ভব* নামে পরিচিত, 'যাঁর জন্ম হয়েছে', তবু এখানে তাঁকে *অভব* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'যাঁর কখনও জন্ম হয় না'। প্রকৃতপক্ষে, রুদ্র বা শিবের জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার ভ্রূযুগলের মধ্যে থেকে, আর ব্রহ্মাকে স্বয়ম্ভু বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তিনি কোন মানুষ বা জড় জগতের কোন প্রাণীর থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, পক্ষান্তরে শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উত্থিত কমলের মধ্যে সরাসরিভাবে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এখানে শিবকে *অভব* বলে যে সম্বোধন করা হয়েছে, তার অর্থ এইভাবে করা যায়, 'যিনি কখনও জড়-জাগতিক ক্লেশ অনুভব করেননি'। সতী তাঁর পতিকে এই কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যাঁরা তাঁর পিতার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন না, তাঁরা পর্যন্ত সেখানে যাচ্ছিলেন, সুতরাং তাঁর সম্পর্কে কি আর বলার আছে, যিনি অন্তরঙ্গভাবে তাঁর (দক্ষের) সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে শিবকে নীলকণ্ঠ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সমুদ্র মন্থনের ফলে উত্থিত বিষ শিব পান করেছিলেন এবং তা তাঁর উদরে যেতে না দিয়ে, তিনি তাঁর কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর কণ্ঠ নীল বর্ণ হয়েছিল। সেই থেকে তিনি *নীলকণ্ঠ* নামে পরিচিত। শিব অন্যদের কল্যাণের জন্য বিষের সমুদ্র পান করেছিলেন। দেবতা এবং দানবেরা যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, তখন প্রথমে বিষ উত্থিত হয়েছিল, যেহেতু সেই বিষের সমুদ্র অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের অনিষ্ট করতে পারে, তাই শিব সেই বিষের সমুদ্র পান করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি যদি অন্যদের মঙ্গলের জন্য এত পরিমাণ বিষ পান করতে পারেন, তা হলে এখন যখন তাঁর পত্নী তাঁকে তাঁর পিতার গৃহে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন, তা হলে অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও, তিনি যেন তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করেন।

শ্লোক ১৩

কথং সুতায়াঃ পিতৃগেহকৌতুকং
নিশম্য দেহঃ সুরবর্য নেঙ্গতে ।
অনাহুতা অপ্যভিযন্তি সৌহৃদং
ভর্তুর্গুরোর্দেহকৃতশ্চ কেতনম্ ॥ ১৩ ॥

কথম্—কিভাবে; **সুতায়াঃ**—কন্যার; **পিতৃ-গেহ-কৌতুকম্**—পিতৃগৃহের উৎসব; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **দেহঃ**—শরীর; **সুর-বর্য**—হে সুরশ্রেষ্ঠ; **ন**—না; **ইঙ্গতে**—বিচলিত; **অনাহুতাঃ**—বিনা আহ্বানে; **অপি**—যদিও; **অভিযন্তি**—যায়; **সৌহৃদম্**—সুহৃদ; **ভর্তুঃ**—পতির; **গুরোঃ**—গুরুদেবের; **দেহ-কৃতঃ**—পিতার; **চ**—এবং; **কেতনম্**—গৃহ।

অনুবাদ

হে দেবশ্রেষ্ঠ। পিতৃগৃহে উৎসবের কথা শুনে কন্যার দেহ কিভাবে অবিচলিত থাকতে পারে? আপনি যদি মনে করেন যে, আমাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, কিন্তু বন্ধু, স্বামী, গুরু অথবা পিতার গৃহে তো বিনা নিমন্ত্রণেও যাওয়া যায়।

শ্লোক ১৪

তন্মে প্রসীদেদমমর্ত্য বাঞ্ছিতং
কর্তুং ভবান্‌কারুণিকো বতার্হতি ।
ত্বয়াত্মনোঽর্ধেঽহমদভ্রচক্ষুষা
নিরূপিতা মানুগৃহাণ যাচিতঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ—অতএব; **মে**—আমার প্রতি; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হোন; **ইদম্**—এই; **অমর্ত্য**—হে অমর; **বাঞ্ছিতম্**—বাসনা; **কর্তুম্**—করার জন্য; **ভবান্**—আপনি; **কারুণিকঃ**—দয়ালু; **বত**—হে প্রভু; **অর্হতি**—সক্ষম; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **আত্মনঃ**—আপনাব স্বীয় শরীরের; **অর্ধে**—অর্ধভাগে; **অহম্**—আমি; **অদভ্র-চক্ষুষা**—সমস্ত জ্ঞান-সমন্বিত; **নিরূপিতা**—স্থিত; **মা**—আমাকে; **অনুগৃহাণ**—কৃপা প্রদর্শন করুন; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত।

অনুবাদ

হে অমর শিব! কৃপাপূর্বক আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আপনি আমাকে আপনার অর্ধাঙ্গিনীরূপে স্বীকার করেছেন; অতএব আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্বক আপনি আমার অনুরোধ স্বীকার করুন।

শ্লোক ১৫

ঋষিরুবাচ

এবং গিরিত্রঃ প্রিয়য়াভিভাষিতঃ
প্রত্যভ্যধত্ত প্রহসন্ সুহৃৎপ্রিয়ঃ ।
সংস্মারিতো মর্মভিদঃ কুবাগিষূন্
যানাহ কো বিশ্বসৃজাং সমক্ষতঃ ॥ ১৫ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **গিরিত্রঃ**—শিব; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয় পত্নীর দ্বারা; **অভিভাষিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **প্রত্যভ্যধত্ত**—উত্তর দিয়েছিলেন; **প্রহসন্**—হেসে; **সুহৃৎ-প্রিয়ঃ**—আত্মীয়-স্বজনদের প্রিয়; **সংস্মারিতঃ**—স্মরণ করে; **মর্ম-ভিদঃ**—হৃদয়-বিদারক; **কুবাক্-ইষূন্**—কুবাক্যরূপ বাণ; **যান্**—যা (বাক্য); **আহ**—বলেছিলেন; **কঃ**—যিনি (দক্ষ); **বিশ্ব-সৃজাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাদের; **সমক্ষতঃ**—উপস্থিতিতে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—কৈলাস পর্বতের ত্রাণকারী শিবের যদিও তখন বিশ্বস্রষ্টাদের সম্মুখে তাঁর প্রতি দক্ষের মর্মভেদী কটূক্তির কথা স্মরণ হয়েছিল, তবু তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর বাক্য শ্রবণ করে, হেসে উত্তর দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

তাঁর পত্নীর মুখে দক্ষের কথা শুনে, শিবের তৎক্ষণাৎ বিশ্বস্রষ্টাদের সম্মুখে তাঁর প্রতি যে-সব কুবাক্য প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেই কথা তাঁর স্মরণ হয়েছিল, এবং তার ফলে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পত্নীর প্রসন্নতা বিধানের জন্য তিনি হেসেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মুক্ত পুরুষ সর্বদাই এই জড় জগতের সুখ এবং দুঃখে অবিচলিত থাকেন। তাই এখানে প্রশ্ন হতে পারে, শিবের মতো একজন মুক্ত পুরুষ তা হলে কেন দক্ষের কথায় মর্মাহত

হয়েছিলেন। তার উত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীশিব হচ্ছেন *আত্মারাম*, বা পূর্ণ আত্ম-উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত, কিন্তু যেহেতু তিনি তমোগুণের দায়িত্বভার-সমন্বিত ভগবানের গুণাবতার, তাই তিনি কখনও কখনও জড় জগতের সুখ-দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন। জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের সুখ ও দুঃখের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, চিৎ-জগতে তার প্রভাব গুণগতভাবে চিন্ময়। তাই, চিৎ-জগতেও দুঃখ অনুভব হতে পারে, কিন্তু তথাকথিত সেই দুঃখ পূর্ণ আনন্দময়। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শৈশবে এক সময় মা যশোদার দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন ক্রন্দন করেছিলেন। কিন্তু তিনি যদিও অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন, তবুও তা জড় জগতের তমোগুণের প্রভাবে হয়নি। কারণ সেই ঘটনাটি ছিল দিব্য আনন্দে পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলায় কখনও কখনও প্রতীত হয় যে, তিনি যেন গোপিকাদের ব্যথা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার আচরণ ছিল দিব্য আনন্দে পূর্ণ। সেটি হচ্ছে জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের পার্থক্য। চিৎ-জগতে, যেখানে সব কিছুই বিশুদ্ধ, এই জড় জগতে তা বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়। যেহেতু চিৎ-জগতে সব কিছুই পরম, তাই সেখানে সুখ অথবা দুঃখে আনন্দ ব্যতীত অন্য কোন অনুভূতি হয় না, কিন্তু জড় জগতে, যেহেতু সব কিছুই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত, তাই সেখানে সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি রয়েছে। তাই শিব আত্মারাম হওয়া সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির তমোগুণের অধ্যক্ষ হওয়ার ফলে, তিনি বিষাদ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বয়োদিতং শোভনমেব শোভনে
অনাহুতা অপ্যভিযন্তি বন্ধুষু ।
তে যদ্যনুৎপাদিতদোষদৃষ্টয়ো
বলীয়সানাত্ম্যমদেন মন্যুনা ॥ ১৬ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—মহাদেব উত্তর দিলেন; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **উদিতম্**—উক্ত; **শোভনম্**—সত্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **শোভনে**—হে সুন্দরী; **অনাহুতাঃ**—অনিমন্ত্রিত; **অপি**—যদিও; **অভিযন্তি**—যাও; **বন্ধুষু**—বন্ধুদের মধ্যে; **তে**—তারা (বন্ধুরা); **যদি**—যদি; **অনুৎপাদিত-দোষ-দৃষ্টয়ঃ**—অদোষদর্শী; **বলীয়সা**—অধিক গুরুত্বপূর্ণ; **অনাত্ম্য-মদেন**—দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত দম্ভের ফলে; **মন্যুনা**—ক্রোধের দ্বারা।

অনুবাদ

মহাদেব উত্তর দিয়েছিলেন—হে সুন্দরী! তুমি বলেছ যে, অনাহূত হয়েও বন্ধুর গৃহে যাওয়া যায়। সেই কথা সত্যি, যদি সেই বন্ধু দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত অহঙ্কারের ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে দোষ দর্শন না করে।

তাৎপর্য

শিব পূর্বেই দর্শন করেছিলেন যে, সতী তাঁর পিতার গৃহে যাওয়া মাত্রই, তাঁর পিতা দক্ষ দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত দম্ভের ফলে, সতী নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি নির্দয়ভাবে ক্রুদ্ধ হবেন। শিব সতীকে সাবধান করেছিলেন যে, তাঁর পিতা ধনমদে মত্ত হয়ে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, এবং তাঁর পক্ষে তা অসহনীয় হবে। তাই সেখানে তাঁর না যাওয়াই শ্রেয়। শিব তা ইতিপূর্বেই অনুভব করেছিলেন কারণ তিনি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও, দক্ষ তাঁকে নানা প্রকার কর্কশ বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

বিদ্যাতপোবিত্তবপুর্বয়ঃকুলৈঃ
সতাং গুণৈঃ ষড়্‌ভিরসত্তমেতরৈঃ ।
স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমানদুর্দৃশঃ
স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্‌ ॥ ১৭ ॥

বিদ্যা—বিদ্যা; **তপঃ**—তপস্যা; **বিত্ত**—ধন; **বপুঃ**—দেহের সৌন্দর্য আদি; **বয়ঃ**—যৌবন; **কুলৈঃ**—আভিজাত্য; **সতাম্‌**—পুণ্যবান ব্যক্তির; **গুণৈঃ**—এই প্রকার গুণের দ্বারা; **ষড়্‌ভিঃ**—ছয়; **অসত্তম-ইতরৈঃ**—যারা মহাত্মা নয়, তাদের বিপরীত ফল লাভ হয়; **স্মৃতৌ**—বিবেক; **হতায়াম্‌**—নষ্ট হওয়ায়; **ভৃত-মান-দুর্দৃশঃ**—গর্বান্ধ; **স্তব্ধাঃ**—গর্বিত হয়ে; **ন**—না; **পশ্যন্তি**—দেখে; **হি**—কারণ; **ধাম**—মহিমা; **ভূয়সাম্‌**—মহাত্মাদের।

অনুবাদ

বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, সৌন্দর্য, যৌবন এবং আভিজাত্য—এই ছয়টি মহাত্মাদের গুণ, কিন্তু যারা সেইগুলি লাভ করার ফলে গর্বান্ধ হয়, এবং তার ফলে তাদের সদ্‌বুদ্ধি বা বিবেক হারিয়ে ফেলে, তখন তারা মহৎ ব্যক্তিদের মহিমা দর্শন করতে পারে না।

তাৎপর্য

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, দক্ষ যেহেতু অত্যন্ত বিদ্বান, ধনবান, এবং তপস্বী ছিলেন, এবং অতি উচ্চ কুলে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তা হলে তিনি কিভাবে অনর্থক অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, বিদ্যা, আভিজাত্য, সৌন্দর্য এবং বিত্ত লাভ করার ফলে কেউ যখন গর্বোদ্ধত হয়, তখন তা অত্যন্ত খারাপ ফল প্রসব করে। দুধ অমৃতবৎ, কিন্তু সেই দুধ যখন বিষধর সর্পের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তখন তা গরলে পরিণত হয়। তেমনই বিদ্যা, ধন, সৌন্দর্য, আভিজাত্য ইত্যাদি গুণগুলি নিঃসন্দেহে খুবই ভাল, কিন্তু সেইগুলি যখন কোন বিদ্বেষ-পরায়ণ ব্যক্তিকে অলঙ্কৃত করে, তখন তা বিপরীতভাবে ক্রিয়া করে। সেই সম্পর্কে চাণক্য পণ্ডিত আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—সর্পের মাথায় মণি থাকলেও তা ভয়ঙ্কর, কারণ সে হচ্ছে একটি সর্প। সর্প স্বভাবতই অন্য প্রাণীদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তারা নির্দোষ হলেও সর্প তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। সর্পের স্বভাবই হচ্ছে নিরীহ প্রাণীদের দংশন করা। তেমনই দক্ষ যদিও বহু জড়-জাগতিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর সম্পদের গর্বে গর্বিত হওয়ার ফলে এবং ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার ফলে, তাঁর সমস্ত গুণগুলি কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। তাই কখনও কখনও পারমার্থিক চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতিকামী ব্যক্তিদের পক্ষে এই সমস্ত জড়-জাগতিক সম্পদ প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করার সময় কুন্তীদেবী তাঁকে *অকিঞ্চন-গোচর* বলে সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ জড়-জাগতিক বিষয়ে যারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তাদের পক্ষে তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া সহজ। কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করার জন্য জড়-জাগতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া লাভজনক, যদিও কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক অবগত হয়ে, তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক সম্পদ, যেমন—বিদ্যা, সৌন্দর্য, আভিজাত্য ইত্যাদি ভগবানের সেবায় সদ্ব্যবহার করতে পারেন, তখন এই সমস্ত সম্পদ মহিমান্বিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনাময় না হলে, এই সমস্ত জড়-জাগতিক সম্পদ শূন্যে পরিণত হয়, কিন্তু যখন সেই শূন্য পরম একের (পরমেশ্বর ভগবানের) সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তার মান দশগুণ বৃদ্ধি পায়। পরম একের পাশে অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত, শূন্য সর্বদা শূন্যই থাকে, তা শত-সহস্র যত শূন্যই যোগ দেওয়া হোক না কেন, তার মূল্য শূন্যই থাকে। জড়-জাগতিক সম্পদ যদি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত না হয়, তা হলে তা সেই সম্পদের অধিকারিকে অধঃপতিত করে সর্বনাশ সাধন করতে পারে।

শ্লোক ১৮

নৈতাদৃশানাং স্বজনব্যপেক্ষয়া
গৃহান্ প্রতীয়াদনবস্থিতাত্মনাম্ ।
যেঽভ্যাগতান্ বক্রধিয়াভিচক্ষতে
আরোপিতভ্রূভিরমর্ষণাক্ষিভিঃ ॥ ১৮ ॥

ন—না; **এতাদৃশানাম্**—এই প্রকার; **স্ব-জন**—কুটুম্ব; **ব্যপেক্ষয়া**—তার উপর নির্ভর করে; **গৃহান্**—গৃহে; **প্রতীয়াৎ**—যাওয়া উচিত; **অনবস্থিত**—বিচলিত; **আত্মনাম্**—মন; **যে**—যারা; **অভ্যাগতান্**—অতিথিগণ; **বক্র-ধিয়া**—অনাদর করে; **অভিচক্ষতে**—দেখে; **আরোপিত-ভ্রূভিঃ**—ভ্রূকুটি সহকারে; **অমর্ষণ**—ক্রুদ্ধ; **অক্ষিভিঃ**—চক্ষুর দ্বারা।

অনুবাদ

যারা অসংযত-চিত্ত হওয়ার ফলে, অতিথিদের ভ্রূকুটি-করাল ক্রোধনেত্রে দর্শন করে, তাদের আত্মীয় বা বন্ধু বলে মনে করেও, তাদের গৃহে যাওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

মানুষ যতই নীচ হোক না কেন, সে কখনও তার সন্তান, পত্নী অথবা নিকট আত্মীয়দের প্রতি নির্দয় হয় না। এমন কি একটি বাঘও তার শাবকদের প্রতি দয়ালু হয়, কারণ পশুরাও তাদের শাবকদের খুব ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে। সতী যেহেতু ছিলেন দক্ষের কন্যা, তাই দক্ষ যতই নিষ্ঠুর এবং কলুষিত হোক না কেন, স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হয়েছিল যে, তিনি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করবেন। কিন্তু এখানে *অনবস্থিত* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রকার ব্যক্তিদের কখনও বিশ্বাস করা যায় না। বাঘেরা তাদের শাবকদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, কিন্তু তারা কখনও কখনও আবার তাদের খেয়েও ফেলে। বিদ্বেষ পরায়ণ ব্যক্তিদের কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ তাদের মনোভাব স্থির নয়। তাই শিব সতীকে উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর পিতৃগৃহে না যেতে, কারণ এই প্রকার ব্যক্তিকে পিতা বা আত্মীয় বলে মনে করে, নিমন্ত্রিত না হয়ে তাঁদের গৃহে যাওয়া উপযুক্ত নয়।

শ্লোক ১৯

তথারিভির্ন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ
শেতেঽর্দিতাঙ্গো হৃদয়েন দূয়তা ।
স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভি-
র্দিবানিশং তপ্যতি মর্মতাড়িতঃ ॥ ১৯ ॥

তথা—অতএব; **অরিভিঃ**—শত্রু; **ন**—না; **ব্যথতে**—আহত; **শিলীমুখৈঃ**—বাণের দ্বারা; **শেতে**—শয়ন করে; **অর্দিত**—ব্যথিত; **অঙ্গঃ**—অংশ; **হৃদয়েন**—হৃদয়ের দ্বারা; **দূয়তা**—ব্যথাতুর; **স্বানাম্**—আত্মীয়দের; **যথা**—যেমন; **বক্র-ধিয়াম্**—কুটিল বুদ্ধি; **দুরুক্তিভিঃ**—কর্কশ বাক্যের দ্বারা; **দিবা-নিশম্**—দিবারাত্র; **তপ্যতি**—সন্তপ্ত; **মর্ম-তাড়িতঃ**—মর্মাহত।

অনুবাদ

শিব বললেন—আত্মীয়দের কটূক্তি দ্বারা মর্মাহত হলে যে রকম ব্যথা অনুভূত হয়, শত্রুর বাণের দ্বারা আহত হলেও সেই প্রকার ব্যথা হয় না, কেননা সেই ব্যথা দিনরাত হৃদয়কে বিদীর্ণ করে।

তাৎপর্য

সতী হয়তো মনে করেছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতৃগৃহে যাওয়ার ঝুঁকি নেবেন, এবং যদি তাঁর পিতা কিছু কটু কথা বলেনও, তা হলে তিনি তা সহ্য করবেন, ঠিক যেমন পুত্র কখনও কখনও তার পিতা-মাতার তিরস্কার সহ্য করে। কিন্তু শিব তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি সেই সমস্ত কটূক্তি সহ্য করতে পারবেন না, কারণ যদিও কেউ শত্রুর আঘাত সহ্য করতে পারে, এবং তাতে সে তেমন কিছু মনে করে না কারণ শত্রুর দেওয়া আঘাত স্বাভাবিক, কিন্তু আত্মীয়দের কটূবাক্য-জনিত যে আঘাত, তার বেদনা সর্বক্ষণ দিনরাত অনুভূত হয়, এবং কখনও কখনও সেই আঘাত এতই অসহ্য হয় যে, তার ফলে মানুষ আত্মহত্যাও করে।

শ্লোক ২০

ব্যক্তং ত্বমুৎকৃষ্টগতেঃ প্রজাপতেঃ
প্রিয়াত্মজানামসি সুভ্রু মে মতা ।
তথাপি মানং ন পিতুঃ প্রপৎস্যসে
মদাশ্রয়াৎকঃ পরিতপ্যতে যতঃ ॥ ২০ ॥

ব্যক্তম্—স্পষ্ট, **ত্বম্**—তুমি; **উৎকৃষ্ট-গতেঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ আচরণসম্পন্ন; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতি দক্ষের; **প্রিয়া**—আদরের; **আত্মজানাম্**—কন্যাদের; **অসি**—হও; **সুভ্রূ**—হে সুন্দর ভ্রূ-সমন্বিতা; **মে**—আমার; **মতা**—বিবেচনা করে; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **মানম্**—সম্মান; **ন**—না; **পিতুঃ**—তোমার পিতার কাছ থেকে; **প্রপৎস্যসে**—প্রাপ্ত হবে; **মৎ-আশ্রয়াৎ**—আমার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে; **কঃ**—দক্ষ; **পরিতপ্যতে**—বেদনা অনুভব করছেন; **যতঃ**—যার থেকে।

অনুবাদ

হে সুন্দরী! আমি জানি যে, দক্ষের সমস্ত কন্যাদের মধ্যে তুমি হচ্ছ সব চাইতে আদরের কন্যা, কিন্তু আমার পত্নী বলে তুমি তাঁর গৃহে সম্মান লাভ করবে না। পক্ষান্তরে, আমার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে তুমি দুঃখিত বোধ করবে।

তাৎপর্য

শিব এই যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন যে, সতী যদিও তাঁর পতি বিনা একাকী যেতে চেয়েছিলেন, তবুও তাঁর প্রতি ভালভাবে আচরণ করা হবে না, কারণ তিনি ছিলেন শিবের পত্নী তিনি যদিও একলা সেখানে যেতে চেয়েছিলেন, তবুও দুর্ঘটনার সমস্ত সম্ভাবনা ছিল। তাই শিব তাঁকে পরোক্ষভাবে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর পিতৃগৃহে না যাওয়ার জন্য।

শ্লোক ২১

পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ
সমৃদ্ধিভিঃ পূরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্ ।
অকল্প এষামধিরোঢুমঞ্জসা
পরং পদং দ্বেষ্টি যথাসুরা হরিম্ ॥ ২১ ॥

পাপচ্যমানেন—দগ্ধ; **হৃদা**—হৃদয়ে; **আতুর-ইন্দ্রিয়ঃ**—দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত; **সমৃদ্ধিভিঃ**—পুণ্যকীর্তি ইত্যাদির দ্বারা; **পুরুষ-বুদ্ধি-সাক্ষিণাম্**—যাঁরা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাঁদের; **অকল্পঃ**—অসমর্থ হয়ে; **এষাম্**—সেই ব্যক্তিদের; **অধিরোঢুম্**—উন্নীত হওয়ার জন্য; **অঞ্জসা**—শীঘ্র; **পরম্**—কেবল; **পদম্**—স্তরে; **দ্বেষ্টি**—ঈর্ষা; **যথা**—যতখানি; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

যারা অহঙ্কারের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে, সর্বদা মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সন্তপ্ত হয়, তারা কখনও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐশ্বর্য সহ্য করতে পারে না। আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে অক্ষম হয়ে তারা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, ঠিক যেমন অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানকে ঈর্ষা করে।

তাৎপর্য

শিব এবং দক্ষের শত্রুতার প্রকৃত কারণ এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দক্ষ শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, কারণ শিব ভগবানের গুণাবতার হওয়ার ফলে এবং সরাসরিভাবে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁকে অধিকতর সম্মান এবং উচ্চতর আসন প্রদান করা হয়েছিল। এ ছাড়া আরও অন্য অনেক কারণও ছিল। দক্ষ অত্যন্ত দাম্ভিক হওয়ার ফলে শিবের উচ্চ পদ সহ্য করতে পারেননি, তাই তাঁর উপস্থিতিতে শিবের উঠে না দাঁড়ানোর ফলে তাঁর যে ক্রোধ, তা ছিল তাঁর ঈর্ষার অন্তিম প্রকাশ। শিব সর্বদাই ধ্যানমগ্ন থাকেন এবং নিরন্তর পরমাত্মাকে দর্শন করেন, যে-কথা এখানে *পুরুষ-বুদ্ধি-সাক্ষিণাম্* শব্দগুলির দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। যাঁর বুদ্ধি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাকে, তিনি অত্যন্ত মহান এবং কেউই তাঁর অনুকরণ করতে পারে না, বিশেষ করে সাধারণ মানুষেরা। দক্ষ যখন যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেছিলেন, তখন শিব ধ্যানমগ্ন ছিলেন এবং তাই হয়তো দক্ষকে প্রবেশ করতে দেখতে পাননি, কিন্তু দক্ষ সেই সুযোগে শিবের নিন্দা করেছিলেন, কারণ তিনি দীর্ঘকাল ধরে শিবের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে আসছিলেন। যাঁরা প্রকৃতই আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তাঁরা প্রতিটি শরীরকে পরমেশ্বর ভগবানের মন্দিররূপে দর্শন করেন, কারণ পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি শরীরে বিরাজ করেন।

কেউ যখন কোন শরীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তখন সেই সম্মান জড় দেহটিকে করা হয় না, পক্ষান্তরে সেই দেহে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানকে করা হয়। তাই যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন, তিনি সর্বক্ষণই তাঁকে প্রণতি নিবেদন করছেন। কিন্তু দক্ষ যেহেতু খুব একটা উন্নত চেতনাসম্পন্ন ছিলেন না, তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, জড় দেহটিকে প্রণতি নিবেদন করা হয়, এবং যেহেতু শিব তাঁর জড় দেহটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননি, তাই তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হয়েছিলেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা শিবের মতো আত্ম-তত্ত্ববেত্তা পুরুষদের স্তরে উন্নীত হতে অক্ষম হয়ে, সর্বদা তাঁদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। অসুর অথবা নাস্তিকেরা

সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ; তারা কেবল তাঁকে হত্যা করতে চায়। এই যুগেও আমরা দেখতে পাই যে, কিছু তথাকথিত বিদ্বান, যারা কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তারাও *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনা করছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৫)—"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও এবং আমার শরণাগত হও"—এই বাণীর কদর্থ করে সেই সমস্ত তথাকথিত পণ্ডিতেরা বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সেটিই হচ্ছে ঈর্ষা। অসুরেরা অথবা নাস্তিকেরা অকারণে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। তেমনই, আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, মূর্খ লোকেরা, যারা আত্ম উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে কখনও পৌঁছাতে পারে না, তারা অকারণে তাঁদের প্রতি সর্বদা ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

শ্লোক ২২

প্রত্যুদ্গমপ্রশ্রয়ণাভিবাদনং
বিধীয়তে সাধু মিথঃ সুমধ্যমে ।
প্রাজ্ঞৈঃ পরস্মৈ পুরুষায় চেতসা
গুহাশয়ায়ৈব ন দেহমানিনে ॥ ২২ ॥

প্রত্যুদ্গম—আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে; **প্রশ্রয়ণ**—স্বাগত জানানো; **অভিবাদনম্**—অভিবাদন; **বিধীয়তে**—করণীয়; **সাধু**—উপযুক্ত; **মিথঃ**—পরস্পর; **সু-মধ্যমে**—হে সুন্দরী; **প্রাজ্ঞৈঃ**—বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা; **পরস্মৈ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পুরুষায়**—পরমাত্মাকে; **চেতসা**—বুদ্ধির দ্বারা; **গুহা-শয়ায়**—দেহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ন**—না; **দেহ-মানিনে**—দেহাভিমানী ব্যক্তিকে।

অনুবাদ

হে সুন্দরী! আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা অবশ্যই পরস্পরের প্রতি প্রত্যুত্থান, নমস্কার ও অভিবাদনাদি করে থাকেন। কিন্তু যাঁরা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে, সেই সম্মান দেহাভিমানী ব্যক্তিদের না করে, দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মাকে করে থাকেন।

তাৎপর্য

কেউ এখানে যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, দক্ষ যেহেতু ছিলেন শিবের শ্বশুর, তাই তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা শিবের কর্তব্য ছিল। তার উত্তরে এখানে বিশ্লেষণ

করা হয়েছে যে, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন প্রত্যুত্থান করে অথবা প্রণতি নিবেদন করে কাউকে অভিবাদন করেন, তখন সেই সম্মান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে করা হয়। তাই বৈষ্ণব সমাজে দেখা যায় যে, যখন শিষ্য গুরুকে প্রণতি নিবেদন করে, তখন গুরুও তাকে প্রত্যভিবাদন করেন, কারণ সেই প্রণতি শরীরকে করা হয় না, পরমাত্মাকে করা হয়। তাই গুরুদেবও শিষ্যের দেহস্থ পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবান বলেছেন যে, তাঁর ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তের দেহাভিমান নেই, তাই বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মানে হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈষ্ণবকে দর্শন করা মাত্রই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত, এটি হচ্ছে শিষ্টাচার, এবং তা ইঙ্গিত করে যে, তাঁর হৃদয়ে পরমাত্মা বিরাজ করছেন। বৈষ্ণব দেহকে বিষ্ণুর মন্দিররূপে দর্শন করেন। শিব যেহেতু কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তাই দেহাভিমানযুক্ত দক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইতিমধ্যেই করা হয়েছিল। তাঁর দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ সেই রকম কোন নির্দেশ বেদে দেওয়া হয়নি।

শ্লোক ২৩

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥ ২৩ ॥

সত্ত্বম্—চেতনা; **বিশুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **বসুদেব**—বসুদেব; **শব্দিতম্**—বলা হয়; **যৎ**—যেহেতু; **ঈয়তে**—প্রকাশিত হয়; **তত্র**—সেখানে, **পুমান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অপাবৃতঃ**—অনাবৃত; **সত্ত্বে**—চেতনায়; **চ**—এবং; **তস্মিন্**—তাতে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবঃ**—বাসুদেব; **হি**—কারণ; **অধোক্ষজঃ**—চিন্ময়; **মে**—আমার দ্বারা; **নমসা**—প্রণতি সহকারে; **বিধীয়তে**—পূজিত।

অনুবাদ

আমি সর্বদা শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় ভগবান বাসুদেবকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। কৃষ্ণচেতনাই হচ্ছে শুদ্ধ চেতনা, যাতে বাসুদেব নামে অভিহিত পরমেশ্বর ভগবান আবরণশূন্য হয়ে প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

জীব তার স্বরূপে শুদ্ধ। *অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ* । বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আত্মা সর্বদা শুদ্ধ এবং জড়-জাগতিক আসক্তির কলুষ থেকে মুক্ত। অজ্ঞানতার বশে দেহে আত্ম-বুদ্ধি হয়। জীব যখনই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সে তার শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এই স্থিতিকে বলা হয় *শুদ্ধ-সত্ত্ব*, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। যেহেতু এই *শুদ্ধ-সত্ত্ব* স্থিতি সবাসরিভাবে অন্তরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই এই স্তরে জড় চেতনার সমস্ত বৃত্তি স্তব্ধ হয়ে যায়। যেমন, লোহা যখন আগুনে রাখা হয়, তখন আগুনের তাপে লোহাও উত্তপ্ত হয়ে যায়, এবং সেই লোহা যখন লাল হয়ে যায়, তখন তা লোহা হলেও অগ্নির মতো কার্য করে। তেমনই, তামার মাধ্যমে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তখন তাতে তামার ধর্ম দৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে বিদ্যুতের ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। *ভগবদ্গীতায়ও* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যখন অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই তিনি ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

অতএব এই শ্লোকে বর্ণিত *শুদ্ধ-সত্ত্ব* হচ্ছে চিন্ময় স্থিতি, যাকে বলা হয় *বসুদেব* । বসুদেব হচ্ছে সেই ব্যক্তির নাম, যাঁর থেকে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুদ্ধ স্থিতিকে *বসুদেব* বলা হয়, কারণ সেই স্থিতিতে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব আবরণমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হন। তাই অব্যভিচারী ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের সব রকম জড় জাগতিক লাভের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধ পালন করতে হবে।

শুদ্ধ ভক্তিতে কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে, অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পাদিত হয়। তাকে বলা হয় *শুদ্ধ-সত্ত্ব* বা *বসুদেব*, কারণ সেই স্তরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ভগবৎ-সন্দর্ভে* এই *বসুদেব* বা *শুদ্ধ-সত্ত্বের* অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, গুরুদেব যে *শুদ্ধ-সত্ত্ব* বা *চিন্ময় বসুদেব* স্তরে অধিষ্ঠিত, তা সূচিত করার জন্য গুরুদেবের নামের পূর্বে *অষ্টোত্তর-শত* (১০৮) যুক্ত করা হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যেও *বসুদেব* শব্দটির ব্যবহার হয়। যেমন, *বসুদেব* মানে হচ্ছে যিনি সর্বব্যাপ্ত। সূর্যকেও *বসুদেব-শব্দিতম্* বলা হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে *বসুদেব* শব্দটির ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই তা

ব্যবহার করা হোক না কেন, *বসুদেব* মানে হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত বা অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান, *ভগবদ্গীতায়ও* (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে—*বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি*। বাস্তবিক উপলব্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে জানা এবং তাঁর শরণাগত হওয়া *বসুদেব* হচ্ছে সেই ক্ষেত্র যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব প্রকাশিত হন। কেউ যখন জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় বা *বসুদেব শব্দে* অধিষ্ঠিত হন, তখন পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব প্রকাশিত হন সেই স্থিতিকে *কৈবল্যও* বলা হয়, যার অর্থ হচ্ছে 'শুদ্ধ চেতনা'। *জ্ঞানং সাত্ত্বিকং কৈবল্যম্*। কেউ যখন শুদ্ধ, চিন্ময় জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখন তিনি *কৈবল্যে* অবস্থিত হন। অতএব *বসুদেবের* অর্থ হচ্ছে *কৈবল্য*, সাধারণত নির্বিশেষবাদীরা এই শব্দটির ব্যবহার করেন। নির্বিশেষ *কৈবল্য* আত্ম উপলব্ধির চরম স্তর নয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় *কৈবল্যে* যখন কেউ পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তখন তিনি সার্থক হন। সেই শুদ্ধ স্থিতিতে, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদির দ্বারা কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই সমস্ত কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির নির্দেশনায় হয়।

এই শ্লোকে অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়াকে *অপাবৃতঃ*—'সমস্ত আবরণ থেকে মুক্ত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ইত্যাদি চিন্ময়, তাই তা জড়া প্রকৃতির অতীত, এবং জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেইগুলির কোনটিই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে ইন্দ্রিয়গুলি যখন নির্মল হয়, তখন সেই শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবরণমুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায় *(হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে)*, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবরণমুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায়। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, ভক্তের শরীর যেহেতু প্রকৃতপক্ষে জড়, তা হলে তাঁর জড় চক্ষু কিভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ হতে পারে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, তা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন করার মতো। স্বচ্ছ দর্পণে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিজের মুখ দর্শন করা যায়। তেমনই চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৮) উল্লেখ করা হয়েছে—*অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন*। ভক্তি সহকারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের ফলে, *চেতসা নান্য-গামিনা*, অথবা ভগবানের কথা শ্রবণ এবং তাঁর মহিমা কীর্তনের ফলে মন যখন শ্রবণ এবং কীর্তনে মগ্ন হয়, তখন আর তাঁর মনকে অন্য কোথাও বিক্ষিপ্ত হতে দেওয়া হয় না, তখন পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে, শ্রবণ

এবং কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তিযোগ শুরু হয় এবং এই পদ্ধতির দ্বারা হৃদয় ও মন নির্মল হয়, যার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের মুখমণ্ডল স্পষ্টভাবে দর্শন করা যায়।

শিব বলেছেন যে, যেহেতু তাঁর হৃদয় সর্বদা ভগবান বাসুদেবের ভাবনায় পূর্ণ, এবং যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর হৃদয় ও মনে উপস্থিত রয়েছেন, তাই তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শিব সর্বদাই সমাধিমগ্ন। এই সমাধি ভক্তের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তা বাসুদেবের নিয়ন্ত্রণাধীন, কারণ ভগবানের নির্দেশেই তাঁর সমগ্র অন্তরঙ্গা শক্তি কার্য করে। জড়া প্রকৃতিও ভগবানের নির্দেশে কার্য করে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা শক্তি প্রত্যক্ষরূপে বিশেষভাবে চিৎ-শক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এইভাবে তাঁর চিন্ময় শক্তি তাঁকে প্রকাশ করে। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৬) বর্ণনা করা হয়েছে, *সম্ভবামি আত্ম-মায়য়া* । *আত্ম-মায়য়া* মানে হচ্ছে 'অন্তরঙ্গা শক্তি'। তাঁর ভক্তের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে, তিনি তাঁর স্বীয় ইচ্ছার বশে, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিজেকে প্রকাশিত করেন। ভক্ত কখনও দাবি করেন না, "হে ভগবান, আপনি দয়া করে এখানে আসুন যাতে আমি আপনাকে দর্শন করতে পারি।" ভগবানকে তাঁর কাছে আসার জন্য অথবা তাঁর সম্মুখে নৃত্য করার জন্য আদেশ দেওয়া ভক্তের কার্য নয়। তথাকথিত বহু ভক্ত রয়েছে যারা ভগবানকে আদেশ দেয়, তিনি যেন তাদের সম্মুখে এসে নৃত্য করেন। ভগবান কিন্তু কারও আদেশের অধীন নন, কিন্তু তিনি যখন কারও শুদ্ধ ভক্তিতে সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি নিজেকে তাঁর কাছে প্রকাশিত করেন। তাই এই শ্লোকে *অধোক্ষজ* শব্দটির ব্যবহার অর্থবাচক, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধির ব্যাপারে আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ হবে। কল্পনাপ্রবণ মনের দ্বারা কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু কেউ যদি চায়, তা হলে সে তার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ভৌতিক বৃত্তিগুলি দমন করতে পারে, এবং ভগবান তাঁর চিন্ময় শক্তি প্রকাশ করার দ্বারা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা ছাড়া ভক্তের আর অন্য কোন কর্তব্য থাকে না। পরমতত্ত্ব তাঁর ভক্তের কাছে তাঁর রূপ প্রকাশ করেন। তিনি নিরাকার নন। বাসুদেব নিরাকার নন, কারণ এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান যখন নিজেকে প্রকাশিত করেন, তখন ভক্ত তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন। প্রণতি কোন ব্যক্তিকে নিবেদন করা হয়, নিরাকার বা নির্বিশেষ কোন কিছুকে করা হয় না। মায়াবাদীরা ব্যাখ্যা করে যে, বাসুদেব হচ্ছেন নির্বিশেষ, সেই মতবাদ কখনও স্বীকার করা উচিত নয়।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে *প্রপদ্যতে,* অর্থাৎ মানুষ শরণাগত হয়। ব্যক্তির কাছেই শরণাগত হওয়া যায়, নির্বিশেষ অদ্বয়ের কাছে নয়। যখনই শরণাগতি বা প্রণতি নিবেদনের প্রশ্ন হয়, তখন শরণাগত হওয়ার বা প্রণতি নিবেদন করার মতো কোন ব্যক্তি অবশ্যই থাকেন।

শ্লোক ২৪

তত্তে নিরীক্ষ্যো ন পিতাপি দেহকৃদ্
দক্ষো মম দ্বিট্ তদনুব্রতাশ্চ যে ।
যো বিশ্বসৃগ্‌যজ্ঞগতং বরোরু মা-
মনাগসং দুর্বচসাকরোত্তিরঃ ॥ ২৪ ॥

তৎ—অতএব; **তে**—তোমার; **নিরীক্ষ্যঃ**—দেখার; **ন**—না; **পিতা**—তোমার পিতা; **অপি**—যদিও; **দেহ-কৃৎ**—তোমার দেহদাতা; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **মম**—আমার; **দ্বিট্**—বিদ্বেষী; **তৎ-অনুব্রতাঃ**—তাঁর (দক্ষের) অনুগামীগণ; **চ**—ও; **যে**—যারা; **যঃ**—যিনি (দক্ষ); **বিশ্ব-সৃক্**—বিশ্বসৃকদের; **যজ্ঞ-গতম্**—যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে; **বর-উরু**—হে সতী; **মাম্**—আমাকে; **অনাগসম্**—নিরপরাধ; **দুর্বচসা**—নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা; **অকরোৎ তিরঃ**—তিরস্কার করেছেন।

অনুবাদ

তোমার পিতা যদিও তোমার দেহের জন্মদাতা, তবুও যেহেতু তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তাই তাঁকে দর্শন করা তোমার উচিত নয়। হে বরাঙ্গনে! মাৎসর্য-পরায়ণ হওয়ার ফলে, আমার কোন অপরাধ না থাকলেও, নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা তিনি আমাকে তিরস্কার করেছেন।

তাৎপর্য

স্ত্রীর কাছে পতি এবং পিতা সমানভাবে পূজ্য। পতি যৌবনাবস্থায় স্ত্রীর রক্ষক, কিন্তু পিতা হচ্ছেন তার বাল্যাবস্থার রক্ষক। অতএব তাঁরা উভয়েই পূজনীয়, কিন্তু পিতা দেহের জন্মদাতা হওয়ার ফলে বিশেষভাবে পূজনীয়। শিব সতীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "তোমার পিতা নিঃসন্দেহে তোমার পূজনীয়, এমন কি আমার থেকেও অধিক পূজনীয়, কিন্তু সাবধান থেকো, কারণ যদিও তিনি তোমার দেহদাতা, তবুও তিনি তোমার শরীরটি নিয়েও নিতে পারেন, কারণ তুমি যখন

তোমার পিতাকে দর্শন করতে যাবে, তখন আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কের ফলে, তিনি তোমাকে অপমান করতে পারেন। স্বজনকৃত অপমান মৃত্যুর থেকেও নিকৃষ্ট, বিশেষ করে কেউ যখন সুন্দর পরিস্থিতিতে অবস্থিত।"

শ্লোক ২৫

যদি ব্রজিষ্যস্যতিহায় মদ্বচো
ভদ্রং ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি ।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎপরাভবো
যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে ॥ ২৫ ॥

যদি—যদি; **ব্রজিষ্যসি**—তুমি যাও; **অতিহায়**—উপেক্ষা করে; **মৎ-বচঃ**—আমার বচন; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **ভবত্যাঃ**—তোমার ; **ন**—না; **ততঃ**—তখন; **ভবিষ্যতি**—হবে; **সম্ভাবিতস্য**—অত্যন্ত সম্মানিত; **স্বজনাৎ**—তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা ; **পরাভবঃ**—অপমানিত; **যদা**—যখন; **সঃ**—সেই অপমান; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **মরণায়**—মৃত্যুর; **কল্পতে**—সমান।

অনুবাদ

আমার এই উপদেশ সত্ত্বেও যদি তুমি আমার বাণী উপেক্ষা করে সেখানে যাও, তা হলে ভবিষ্যতে তোমার ভাল হবে না। তুমি অত্যন্ত সম্মানীয়া, এবং তুমি যদি তোমার স্বজনের দ্বারা অপমানিত হও, তা হলে সেই অপমান তৎক্ষণাৎ মৃত্যুতুল্য হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'শিব এবং সতীর বার্তালাপ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

চতুর্থ অধ্যায়

সতীর দেহত্যাগ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

এতাবদুক্ত্বা বিররাম শঙ্করঃ
পত্ন্যঙ্গনাশং হ্যুভয়ত্র চিন্তয়ন্ ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ পরিশঙ্কিতা ভবা-
ন্নিষ্ক্রামতী নির্বিশতী দ্বিধাস সা ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **এতাবৎ**—এতখানি; **উক্ত্বা**—বলে; **বিররাম**—নীরব হলেন; **শঙ্করঃ**—শিব; **পত্নী-অঙ্গ-নাশম্**—তাঁর পত্নীর দেহের বিনাশ; **হি**—যেহেতু; **উভয়ত্র**—উভয় ক্ষেত্রে; **চিন্তয়ন্**—বুঝতে পেরে; **সুহৃৎ-দিদৃক্ষুঃ**—তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করতে অত্যন্ত উৎসুক; **পরিশঙ্কিতা**—ভয়ভীতা হয়ে; **ভবাৎ**—শিবের; **নিষ্ক্রামতী**—বহির্গত হয়ে; **নির্বিশতী**—প্রবেশ করে; **দ্বিধা**—দ্বিধা; **আস**—ছিলেন; **সা**—তিনি (সতী)।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—দ্বিধাগ্রস্ত সতীকে এইভাবে উপদেশ দিয়ে শিব নীরব হলেন। সতী তাঁর পিতৃগৃহে আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি শিবের সাবধান বাণীতেও ভয়ভীতা হয়েছিলেন। দোদুল্যমান চিত্তে তিনি একবার গৃহ থেকে নির্গত হয়ে পর মুহূর্তে আবার গৃহে প্রবেশ করছিলেন।

তাৎপর্য

সতী তাঁর পিতৃগৃহে যাবেন, না তাঁর পতি শিবের আদেশ পালন করবেন, সেই চিন্তায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। এই দ্বন্দ্ব এতই প্রবল হয়েছিল যে, তিনি কখনও ঘরের বাইরে এবং কখনও ঘরের ভিতরে যাতায়াত করছিলেন। তিনি ঘড়ির দোলকের মতো দোদুল্যমান হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

সুহৃদ্দিদৃক্ষাপ্রতিঘাতদুর্মনাঃ
স্নেহাদ্রুদত্যশ্রুকলাতিবিহ্বলা ।
ভবং ভবান্যপ্রতিপূরুষং রুষা
প্রধক্ষ্যতীবৈক্ষত জাতবেপথুঃ ॥ ২ ॥

সুহৃৎ-দিদৃক্ষা—আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার বাসনায়; **প্রতিঘাত**—প্রতিহত হয়ে; **দুর্মনাঃ**—বিষণ্ণ হয়ে; **স্নেহাৎ**—স্নেহের বশে; **রুদতী**—ক্রন্দন করে; **অশ্রু-কলা**—অশ্রুবিন্দুর দ্বারা; **অতিবিহ্বলা**—অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে; **ভবম্**—শিব; **ভবানী**—সতী; **অপ্রতি-পূরুষম্**—অদ্বিতীয়; **রুষা**—ক্রোধভরে; **প্রধক্ষ্যতী**—ভস্ম করতে; **ইব**—যেন; **ঐক্ষত**—দৃষ্টিপাত করেছিলেন; **জাত-বেপথুঃ**—কম্পিত কলেবরে।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর পিতার গৃহে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শনের বাসনায় ব্যাঘাত হওয়ার ফলে, সতী অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এবং তাঁদের প্রতি প্রেমাতিশয্যবশত তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল। অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং ক্রোধভরে তাঁর অসমোর্ধ্ব পতি শিবের প্রতি এমনভাবে তাকিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর সেই ক্রোধাগ্নির দ্বারা তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ব্যবহৃত *অপ্রতিপূরুষম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাঁর সমান কেউ নেই'। এই জড় জগতে সমদর্শিতার ব্যাপারে শিবের সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর পত্নী সতী জানতেন যে, তাঁর পতি সকলের প্রতি সমদর্শী, তা হলে কেন তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি এত নির্দয় হয়েছিলেন যে, তাঁকে তাঁর পিতৃগৃহে যেতে অনুমতি দিচ্ছিলেন না? তার ফলে তিনি অসহনীয় বেদনা অনুভব করেছিলেন, এবং তিনি এমনভাবে তাঁর পতির প্রতি তাকিয়েছিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন তিনি তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শিব যেহেতু *আত্মা* (শিব মানে আত্মাও), তা এখানে ইঙ্গিত করে যে, সতী আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। *অপ্রতিপূরুষ* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী'। শিবের অনুমতি না পাওয়ার ফলে, স্ত্রীর অন্তিম অস্ত্র রোদনের আশ্রয় সতী অবলম্বন করেছিলেন, যার প্রভাবে পত্নীর প্রস্তাব গ্রহণে পতি বাধ্য হয়।

শ্লোক ৩

ততো বিনিঃশ্বস্য সতী বিহায় তং
শোকেন রোষেণ চ দূয়তা হৃদা ।
পিত্রোরগাৎস্ত্রৈণবিমূঢ়ধীর্গৃহান্
প্রেম্ণাত্মনো যোঽর্ধমদাৎসতাং প্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

ততঃ—তখন; **বিনিঃশ্বস্য**—দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে; **সতী**—সতী; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **তম্**—তাঁকে (শিবকে); **শোকেন**—শোকের দ্বারা; **রোষেণ**—ক্রোধের দ্বারা; **চ**—এবং; **দূয়তা**—বিহ্বল হয়ে; **হৃদা**—হৃদয়ে; **পিত্রোঃ**—তাঁর পিতার; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **স্ত্রৈণ**—তাঁর স্ত্রীসুলভ স্বভাবের বশে; **বিমূঢ়**—মোহিত হয়ে; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **গৃহান্**—গৃহে; **প্রেম্ণা**—প্রেমের বশে; **আত্মনঃ**—তাঁর শরীরের; **যঃ**—যিনি; **অর্ধম**—অর্ধ; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন; **সতাম্**—সাধুদের; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

অনুবাদ

তার পর সতী তাঁর পতি, যিনি প্রেমের বশে তাঁকে তাঁর অর্ধাঙ্গ প্রদান করেছিলেন, সেই শিবকে পরিত্যাগ করে, ক্রোধ এবং শোকের ফলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে তাঁর পিতার গৃহে গমন করেছিলেন। দুর্বল স্ত্রীস্বভাববশত তিনি এই প্রকার নির্বোধের মতো আচরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক বিচারধারা অনুসারে, পতি তাঁর দেহের অর্ধাংশ পত্নীকে দান করেন, এবং পত্নী তাঁর দেহের অর্ধাংশ পতিকে দান করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পত্নীবিহীন পতি এবং পতিবিহীন পত্নী অপূর্ণ। শিব এবং সতীর মধ্যে বৈদিক বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, কিন্তু কখনও কখনও দুর্বলতাবশত, স্ত্রী তাঁর পিতৃ-গৃহের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন, এবং সতীর ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সতী তাঁর স্ত্রীসুলভ দুর্বলতাবশত শিবের মতো মহান পতিকে তিনি ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পতি-পত্নীর সম্পর্কের মাঝেও স্ত্রীসুলভ দুর্বলতা থাকে। সাধারণত, স্ত্রীর দুর্বলতার ফলেই পতি-পত্নীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। স্ত্রীর পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পতির আদেশ পালন করা। তার ফলে পারিবারিক জীবন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কখনও কখনও পতি-পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, যেমন শিব এবং

সতীর পরম পবিত্র সম্পর্কের মধ্যেও হয়েছিল, কিন্তু এই প্রকার ভুল বোঝাবুঝির ফলে, পত্নীর কখনই পতির আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি যদি তা করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার কারণ হচ্ছে তাঁর স্ত্রীসুলভ দুর্বলতা।

শ্লোক ৪

তামন্বগচ্ছন্ দ্রুতবিক্রমাং সতী-
মেকাং ত্রিনেত্রানুচরাঃ সহস্রশঃ ।
সপার্ষদযক্ষা মণিমন্মদাদয়ঃ
পুরোবৃষেন্দ্রাস্তরসা গতব্যথাঃ ॥ ৪ ॥

তাম্—তাঁর (সতী); **অন্বগচ্ছন্**—অনুগমন করেছিলেন; **দ্রুত-বিক্রমাম্**—দ্রুত গতিতে প্রস্থানকারী; **সতীম্**—সতী; **একাম্**—একাকী; **ত্রি-নেত্র**—শিবের (যাঁর তিনটি চক্ষু); **অনুচরাঃ**—অনুগামীগণ; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **সপার্ষদ-যক্ষাঃ**—তাঁর পার্ষদবর্গ এবং যক্ষগণ সহ; **মণিমৎ-মদ-আদয়ঃ**—মণিমান, মদ ইত্যাদি; **পুরঃ-বৃষ-ইন্দ্রাঃ**—বৃষেন্দ্র নন্দীকে সম্মুখে নিয়ে; **তরসা**—দ্রুত গতিতে; **গত-ব্যথাঃ**—নির্ভীক।

অনুবাদ

মণিমান, মদ আদি শিবের হাজার হাজার অনুচরেরা এবং যক্ষ পার্ষদেরা যখন দেখলেন যে, সতী একাকিনী দ্রুত গতিতে প্রস্থান করছেন, তখন তাঁরা বৃষেন্দ্র নন্দীকে অগ্রে করে সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন।

তাৎপর্য

সতী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গমন করছিলেন যাতে তাঁর পতি তাঁকে বাধা দিতে না পারেন, কিন্তু যক্ষ, মণিমান, মদ প্রমুখ শিবের শত-সহস্র অনুচরেরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। এই শ্লোকে *গতব্যথাঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নির্ভয়ে'। সতী একলা যেতে ভয় পাননি; তাই তিনি ছিলেন প্রায় নির্ভীক। এখানে *অনুচরাঃ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, শিবের শিষ্যেরা তাঁর জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা সকলেই শিবের মনোভাব জানতেন, যিনি চাননি যে, সতী একাকী তাঁর পিতৃগৃহে গমন করুন। *অনুচরাঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাঁরা তাঁদের প্রভুর উদ্দেশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন'।

শ্লোক ৫

তাং সারিকাকন্দুকদর্পণাম্বুজ-
শ্বেতাতপত্রব্যজনস্রগাদিভিঃ ।
গীতায়নৈর্দুন্দুভিশঙ্খবেণুভি-
র্বৃষেন্দ্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ ॥ ৫ ॥

তাম্—তাঁর (সতীর); **সারিকা**—পালিত পক্ষী; **কন্দুক**—খেলার গোলক; **দর্পণ**—দর্পণ; **অম্বুজ**—পদ্মফুল; **শ্বেত-আতপত্র**—শ্বেত ছত্র; **ব্যজন**—চামর; **স্রক্**—মালা; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **গীতা-অয়নৈঃ**—সঙ্গীত সহকারে; **দুন্দুভি**—দুন্দুভি; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **বেণুভিঃ**—বংশী; **বৃষ-ইন্দ্রম্**—বৃষের পৃষ্ঠে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **বিটঙ্কিতাঃ**—সজ্জিত; **যযুঃ**—তাঁরা গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শিবের অনুচররা সতীকে বৃষের উপর বসিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর পোষা পাখিটি দিয়েছিলেন। তাঁরা কমল, দর্পণ, ইত্যাদি তাঁর উপভোগের সমস্ত সামগ্রীগুলি নিয়েছিলেন এবং তাঁর মাথার উপর একটি বিশাল চন্দ্রাতপ টাঙিয়েছিলেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, বেণু ইত্যাদি সহকারে তাঁরা তাঁর সঙ্গে গমন করেছিলেন, এবং তাঁদের সেই যাত্রাকে এক অতি আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় শোভাযাত্রার মতো মনে হয়েছিল।

শ্লোক ৬

আব্রহ্মঘোষোর্জিতযজ্ঞবৈশসং
বিপ্রর্ষিজুষ্টং বিবুধৈশ্চ সর্বশঃ ।
মৃদ্দার্বয়ঃকাঞ্চনদর্ভচর্মভি-
র্নিসৃষ্টভাণ্ডং যজনং সমাবিশৎ ॥ ৬ ॥

আ—সমস্ত দিক থেকে; **ব্রহ্ম-ঘোষ**—বৈদিক মন্ত্রের ধ্বনির দ্বারা; **ঊর্জিত**—সজ্জিত; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **বৈশসম্**—পশুবলি; **বিপ্রর্ষি-জুষ্টম্**—সমবেত মহর্ষিদের দ্বারা; **বিবুধৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **সর্বশঃ**—সর্ব দিকে; **মৃৎ**—মাটি; **দারু**—কাঠ; **অয়ঃ**—লৌহ; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **দর্ভ**—কুশ ঘাস; **চর্মভিঃ**—চর্ম; **নিসৃষ্ট**—নির্মিত; **ভাণ্ডম্**—যজ্ঞের পশু এবং ভাণ্ড; **যজনম্**—যজ্ঞ; **সমাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

সতী যখন তাঁর পিতৃগৃহে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল, এবং সেই যজ্ঞস্থলে তখন সকলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। সেখানে মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও দেবতাগণ সমবেত হয়েছিলেন, এবং যজ্ঞের জন্য সেখানে বহু পশু রাখা হয়েছিল, এবং মৃত্তিকা, লৌহ, স্বর্ণ, কাষ্ঠ, কুশ ও চর্মনির্মিত ভাণ্ডসমূহ সাজানো হয়েছিল।

তাৎপর্য

বিদ্বান ঋষি এবং ব্রাহ্মণেরা যখন সমবেত হয়ে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন তাঁদের কেউ কেউ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হন তাই কোন কোন ঋষি এবং ব্রাহ্মণেরা তর্ক করছিলেন, এবং অন্যেরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তার ফলে সমগ্র পরিবেশ দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পূর্ণ হয়েছিল। এই দিব্য ধ্বনি সরলরূপ প্রাপ্ত হয়ে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গের রূপ গ্রহণ করেছে। এই যুগে মানুষেরা অত্যন্ত অলস, মন্দমতি এবং মন্দভাগ্য হওয়ার ফলে, বৈদিক জ্ঞানের উন্নত উপলব্ধি লাভের যোগ্য নয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১১/৫/৩২) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*। বর্তমান সময়ে জনসাধারণের দারিদ্র্যগ্রস্ত অবস্থার জন্য এবং বৈদিক মন্ত্রের জ্ঞানের অভাবের জন্য যজ্ঞের সামগ্রী সংগ্রহ করা অসম্ভব, তাই এই যুগের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যেন একত্রিত হয়ে পার্ষদ-পরিবৃত পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে। পরোক্ষভাবে তা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আদি পার্ষদ সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে এই যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা

এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব হচ্ছে যে, সেখানে বলি দেওয়ার জন্য পশু সংগ্রহ করা হয়েছিল। যজ্ঞে সেই সমস্ত পশুদের উৎসর্গ করার অর্থ এই নয় যে, তাদের বধ করা হয়েছিল। সেখানে যে সমস্ত মহর্ষি এবং তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের উপলব্ধির পরীক্ষা হত পশু বলির মাধ্যমে, ঠিক যেমন আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের আবিষ্কৃত ঔষধের কার্যকারিতা নিরূপণ করার জন্য পশুদের উপর তা পরীক্ষা করে থাকেন। যে-সমস্ত ব্রাহ্মণদের উপর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ, এবং তাঁদের উপলব্ধি পরীক্ষা করার জন্য যজ্ঞাগ্নিতে বৃদ্ধ

পশু উৎসর্গ করে তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হত। এইভাবে বৈদিক মন্ত্রের পরীক্ষা করা হত। পশুদের হত্যা করে আহার করার জন্য সেখানে পশুদের সংগ্রহ করা হয়নি। পশুহত্যা করা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, পক্ষান্তরে উৎসর্গীকৃত পশুকে নবজীবন দান করে বৈদিক মন্ত্রের পরীক্ষা করা হত। বৈদিক মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পশুদের ব্যবহার করা হত, মাংসের জন্য নয়।

শ্লোক ৭

তামাগতাং তত্র ন কশ্চনাদ্রিয়দ্
বিমানিতাং যজ্ঞকৃতো ভয়াজ্জনঃ ।
ঋতে স্বসৄর্বৈ জননীং চ সাদরাঃ
প্রেমাশ্রুকণ্ঠ্যঃ পরিষস্বজুর্মুদা ॥ ৭ ॥

তাম্—তাঁকে (সতীকে); **আগতাম্**—সমাগতা; **তত্র**—সেখানে; **ন**—না; **কশ্চন**—কেউ; **আদ্রিয়ৎ**—স্বাগত জানালেন; **বিমানিতাম্**—শ্রদ্ধা প্রাপ্ত না হয়ে; **যজ্ঞ-কৃতঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর (দক্ষের); **ভয়াৎ**—ভয়ে; **জনঃ**—ব্যক্তি; **ঋতে**—ব্যতীত; **স্বসৄঃ**—তাঁর ভগ্নীগণ; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **জননীম্**—মাতা; **চ**—এবং; **স-আদরাঃ**—আদরের সঙ্গে; **প্রেম-অশ্রু-কণ্ঠ্যঃ**—প্রেমাশ্রুর দ্বারা যাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে; **পরিষস্বজুঃ**—আলিঙ্গন করেছিলেন; **মুদা**—হর্ষোৎফুল্ল বদনে।

অনুবাদ

সতী যখন তাঁর অনুচরদের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, তখন দক্ষের ভয়ে কেউই তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন না। কিন্তু তাঁর মাতা এবং ভগ্নীরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে এবং হর্ষোৎফুল্ল বদনে তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং অত্যন্ত মধুর বচনে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যাঁরা সতীকে সাদরে সম্ভাষণ করেননি, সতীর মাতা এবং ভগিনীরা তাঁদের অনুসরণ করেননি। স্বাভাবিক প্রীতিবশত তাঁরা তৎক্ষণাৎ অশ্রুপূর্ণ নয়নে এবং প্রেমানুভূতি সহকারে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, রমণীরা স্বভাবতই কোমল হৃদয়সম্পন্না; তাঁদের ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবণতা কৃত্রিম উপায়ে রোধ করা যায় না। যদিও সেখানে সমবেত পুরুষেরা ছিলেন অতি বিদ্বান ব্রাহ্মণ এবং

দেবতা, তবুও তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ দক্ষের ভয়ে তাঁরা ভীত ছিলেন, এবং যেহেতু তাঁরা জানতেন যে, সতীকে স্বাগত জানালে দক্ষ তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, তাই তাঁরা অন্তরে তাঁকে স্বাগত জানাতে চাইলেও, তা করতে পারেননি। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই কোমল হৃদয়সম্পন্না, কিন্তু পুরুষেরা কখনও কখনও অত্যন্ত কঠোর হৃদয়সম্পন্ন হতে পারেন।

শ্লোক ৮

সৌদর্যসম্প্রশ্নসমর্থবার্তয়া
মাত্রা চ মাতৃস্বসৃভিশ্চ সাদরম্ ।
দত্তাং সপর্যাং বরমাসনং চ সা
নাদত্ত পিত্রাপ্রতিনন্দিতা সতী ॥ ৮ ॥

সৌদর্য—তাঁর ভগ্নীদের; **সম্প্রশ্ন**—সম্ভাষণ; **সমর্থ**—উপযুক্ত; **বার্তয়া**—কুশল প্রশ্ন; **মাত্রা**—তাঁর মাতার; **চ**—এবং; **মাতৃ-স্বসৃভিঃ**—মাতৃস্বসাদের; **চ**—এবং; **স-আদরম্**—আদর সহকারে; **দত্তাম্**—যা প্রদত্ত হয়েছিল; **সপর্যাম্**—পূজা; **বরম্**—উপহার; **আসনম্**—আসন; **চ**—এবং; **সা**—তিনি (সতী); **ন আদত্ত**—গ্রহণ করেননি; **পিত্রা**—তাঁর পিতার; **অপ্রতিনন্দিতা**—অনাদৃতা; **সতী**—সতী।

অনুবাদ

যদিও তাঁর ভগ্নী এবং মাতা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সতী তাঁদের স্বাগত বচনের কোন উত্তর দেননি, এবং যদিও তাঁকে আসন ও উপহার প্রদান করা হয়েছিল, তিনি সেগুলির কোনটিই গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁর পিতা তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলেননি এবং কুশল প্রশ্নের দ্বারা তাঁকে স্বাগত জানাননি।

তাৎপর্য

সতী তাঁর ভগ্নী এবং মাতার প্রদত্ত সম্ভাষণ গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁর পিতার নীরবতায় তিনি একটুও সন্তুষ্ট হননি. সতী ছিলেন দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা, এবং তিনি জানতেন যে, তিনি ছিলেন তাঁর অতি প্রিয়। কিন্তু এখন, শিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ফলে, দক্ষ তাঁর কন্যার প্রতি তাঁর সমস্ত স্নেহ বিস্মৃত হয়েছেন, এবং তা সতীকে গভীরভাবে ব্যথাতুর করেছিল। দেহাত্মবুদ্ধি মানুষকে এমনভাবে কলুষিত করে যে, অতি অল্প উত্তেজনার ফলে, প্রেম এবং স্নেহের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। দেহের সম্পর্ক এতই ক্ষণস্থায়ী যে, অল্প একটু মনোমালিন্যের ফলে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।

শ্লোক ৯

অরুদ্রভাগং তমবেক্ষ্য চাধ্বরং
পিত্রা চ দেবে কৃতহেলনং বিভৌ ।
অনাদৃতা যজ্ঞসদস্যধীশ্বরী
চুকোপ লোকানিব ধক্ষ্যতী রুষা ॥ ৯ ॥

অরুদ্র-ভাগম্—শিবের যজ্ঞভাগ না থাকায়; **তম্**—সেই; **অবেক্ষ্য**—দর্শন করে; **চ**—এবং; **অধ্বরম্**—যজ্ঞস্থল; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **চ**—এবং; **দেবে**—শিবকে; **কৃত-হেলনম্**—অবহেলা করে; **বিভৌ**—প্রভুকে; **অনাদৃতা**—অনাদর করার ফলে; **যজ্ঞ-সদসি**—যজ্ঞ-সভায়; **অধীশ্বরী**—সতী; **চুকোপ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **লোকান্**—চতুর্দশ ভুবন; **ইব**—যেন; **ধক্ষ্যতী**—দগ্ধ করতে; **রুষা**—ক্রোধের দ্বারা।

অনুবাদ

যজ্ঞস্থলে গিয়ে সতী দেখলেন যে, তাঁর পতি শিবকে কোন যজ্ঞভাগ দেওয়া হয়নি। তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিবকে তাঁর পিতা যজ্ঞে আমন্ত্রণ না করে কেবল অবজ্ঞাই করেননি, অধিকন্তু তাঁর মহীয়সী পত্নীকেও অনাদর করেছেন। তার ফলে তিনি এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন যেন তিনি তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন।

তাৎপর্য

বৈদিক মন্ত্র *স্বাহা* উচ্চারণ করে যখন অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করা হয়, তখন ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু সহ সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ এবং পিতৃদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই প্রথা অনুসারে যাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, তাঁদের মধ্যে শিব একজন, কিন্তু সতী সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখেছিলেন যে, *নমঃ শিবায় স্বাহা* মন্ত্র উচ্চারণ করে ব্রাহ্মণেরা শিবের উদ্দেশ্যে আহুতি দেননি। তিনি নিজের জন্য কোন রকম দুঃখ অনুভব করেননি, কারণ তিনি নিমন্ত্রিত না হলেও তাঁর পিতার গৃহে আসতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর পতিকে সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে কি না। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, মাতা এবং ভগ্নীদের দর্শন করা ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; এমন কি তাঁর মাতা এবং ভগ্নীগণ যখন তাঁকে স্নেহভরে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তখন তিনি তার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেননি, কিন্তু যে বিষয় তাঁকে সব চাইতে বিচলিত করেছিল তা হচ্ছে যে, সেই যজ্ঞে তাঁর পতিকে অপমান

করা হয়েছিল। তা দর্শন করে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং তিনি এমনভাবে তাঁর পিতা দক্ষের দিকে তাকিয়েছিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে দক্ষ ভস্মীভূত হয়ে যাবেন।

শ্লোক ১০

জগর্হ সামর্ষবিপন্নয়া গিরা
শিবদ্বিষং ধূমপথশ্রমস্ময়ম্ ।
স্বতেজসা ভূতগণান্ সমুত্থিতান্
নিগৃহ্য দেবী জগতোঽভিশৃণ্বতঃ ॥ ১০ ॥

জগর্হ—নিন্দা করতে লাগলেন; **সা**—তিনি; **অমর্ষ-বিপন্নয়া**—ক্রোধের ফলে অস্পষ্ট; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **শিব-দ্বিষম্**—শিবের শত্রু; **ধূম-পথ**—যজ্ঞে; **শ্রম**—কষ্টের দ্বারা; **স্ময়ম্**—অত্যন্ত গর্বিত; **স্ব-তেজসা**—তাঁর আদেশের দ্বারা; **ভূত-গণান্**—ভূতদের; **সমুত্থিতান্**—প্রস্তুত হয়েছিল (দক্ষকে মারার জন্য); **নিগৃহ্য**—নিবারণ করে; **দেবী**—সতী; **জগতঃ**—সকলের উপস্থিতিতে; **অভিশৃণ্বতঃ**—শোনা গিয়েছিল।

অনুবাদ

শিবের অনুচর ভূতেরা দক্ষকে আঘাত করতে অথবা হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সতী তাদের নিবৃত্ত হওয়ার আদেশ দেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এবং তখন তিনি কর্ম-মার্গে যজ্ঞ-পন্থার নিন্দা এবং যাঁরা সেই অর্থহীন ও কষ্টকর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে অত্যন্ত গর্বোদ্ধত হয়, তাঁদের ভর্ৎসনা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে সকলের সমক্ষে তাঁর পিতার নিন্দা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা, যাঁর একটি নাম হচ্ছে যজ্ঞেশ, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। *ভগবদ্গীতায়ও* (৫/২৯) এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাম্* । তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের প্রকৃত ভোক্তা। সেই তত্ত্ব না জানার ফলে, মূর্খ মানুষেরা কোন জড় জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে। দক্ষের মতো ব্যক্তিরা এবং তাঁদের অনুগামীরা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যক্তিগত জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। সেই প্রকার যজ্ঞকে এখানে অর্থহীন পরিশ্রম বলে নিন্দা করা হয়েছে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে। কেউ বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা সকাম কর্ম সম্পাদন করতে পারেন, কিন্তু সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের ফলে যদি শ্রীবিষ্ণুর প্রতি আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে সেইগুলি কেবল পণ্ডশ্রম। বিষ্ণুর প্রতি যাঁর প্রেমের উদয় হয়েছে, তিনি অবশ্যই বিষ্ণুর ভক্তদের প্রতিও প্রীতি এবং শ্রদ্ধাপরায়ণ হবেন। শিবকে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*। তাই সতী যখন দেখেছিলেন যে, তাঁর পিতা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিবের প্রতি তাঁর কোন রকম শ্রদ্ধা নেই, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই আচরণ যথাযথ; যখন বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবের নিন্দা হয়, তখন ক্রুদ্ধ হওয়াই উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি সর্বদা অহিংসা, বিনয় এবং নম্রতার আদর্শ প্রচার করেছেন, নিত্যানন্দ প্রভুব চরণে অপরাধ করার ফলে জগাই ও মাধাইয়ের প্রতি তিনিও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, এবং তাদের সংহার করতে উদ্যত হন। যখন বিষ্ণু বা কোনও বৈষ্ণবের নিন্দা করা হয় অথবা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষি জনে*। আমাদের ক্রোধ রয়েছে, এবং সেই ক্রোধ ভগবান এবং ভগবানের ভক্তদের প্রতি যারা বিদ্বেষী, তাদের প্রতি প্রয়োগ করার ফলে এক মহৎ গুণে পর্যবসিত হয়। কেউ যখন বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ করে, তখন তা সহ্য করা উচিত নয়। তাঁর পিতার প্রতি সতীর ক্রোধ আপত্তিজনক ছিল না, কারণ তিনি তাঁর পিতা হলেও তিনি এক মহান বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ করেছিলেন। তাই তাঁব পিতার প্রতি সতীর ক্রোধ সমর্থনযোগ্য ছিল।

শ্লোক ১১

দেব্যুবাচ

ন যস্য লোকেঽস্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়-
স্তথাপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ ।
তস্মিন্ সমস্তাত্মনি মুক্তবৈরকে
ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ ॥ ১১ ॥

দেবী উবাচ—মহাদেবী বললেন; **ন**—না; **যস্য**—যাঁর; **লোকে**—জড় জগতে; **অস্তি**—হয়; **অতিশায়নঃ**—অপ্রতিদ্বন্দ্বী; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **তথা**—তেমনই; **অপ্রিয়ঃ**—

শত্রু; **দেহ-ভৃতাম্**—দেহধারী; **প্রিয়-আত্মনঃ**—প্রিয়তম; **তস্মিন্**—সেই শিবের প্রতি; **সমস্ত-আত্মনি**—সমস্ত বিশ্বের আত্মা; **মুক্ত-বৈরকে**—যিনি সমস্ত শত্রুতা থেকে মুক্ত; **ঋতে**—বিনা; **ভবন্তম্**—আপনার জন্য; **কতমঃ**—কে; **প্রতীপয়েৎ**—মাৎসর্য-পরায়ণ হবে।

অনুবাদ

দেবী বললেন—শিব সমস্ত জীবের প্রিয়তম। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কেউ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় নয়, আবার কেউ তাঁর শত্রুও নয়। আপনি ছাড়া আর কেউই সেই সর্ব প্রকার শত্রুতা থেকে মুক্ত এই প্রকার বিশ্বাত্মার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, *সমোঽহং সর্ব-ভূতেষু*—"আমি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী।" শিব পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার, তাই তাঁর মধ্যে ভগবানের প্রায় সব ক'টি গুণই রয়েছে। তাই তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, কেউই তাঁর শত্রু নয় এবং কেউই তাঁর বন্ধু নয়, কিন্তু যে মাৎসর্য পরায়ণ, সে শিবের শত্রু হতে পারে। তাই সতী তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, "আপনিই কেবল শিবের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হতে পারেন অথবা শত্রু হতে পারেন।" অন্যান্য ঋষিগণ এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা দক্ষের আশ্রিত হলেও শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন না। অতএব দক্ষই কেবল শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারেন। সেটিই ছিল সতীর অভিযোগ।

শ্লোক ১২

দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্ণন্তি কেচিন্ন ভবাদৃশো দ্বিজ ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলীকরিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্ ॥ ১২ ॥

দোষান্—দোষ, **পরেষাম্**—অন্যাদের; **হি**—কারণ; **গুণেষু**—গুণের মধ্যে; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করেন; **কেচিৎ**—কিছু; **ন**—না; **ভবাদৃশঃ**—আপনার মতো; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ; **গুণান্**—গুণ; **চ**—এবং; **ফল্গূন্**—ক্ষুদ্র; **বহুলী-**

করিষ্ণবঃ—ব্যাপকভাবে বর্ধিত করেন; **মহৎ-তমাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; **তেষু**—তাঁদের মধ্যে; **অবিদৎ**—বিদিত হয়েছেন; **ভবান্**—আপনি; **অঘম্**—দোষ।

অনুবাদ

হে দ্বিজ (দক্ষ)! আপনার মতো ব্যক্তিরাই অন্যের গুণের মধ্যে দোষ দর্শন করেন। কিন্তু শিব কেবল অদোষদর্শীই নন, যদি কারও মধ্যে একটুও গুণ থাকে, তা হলে তিনি তা মহৎ বলে প্রশংসা করেন। দুর্ভাগ্যবশত, আপনি সেই প্রকার একজন মহাত্মার দোষ দর্শন করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে রাজা দক্ষকে তাঁর কন্যা সতী *দ্বিজ* বলে সম্বোধন করেছেন। *দ্বিজ* বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই ধরনের উচ্চ বর্ণের মানুষদের বোঝায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দ্বিজ কোন সাধারণ মানুষ নন, যিনি সদ্গুরুর কাছে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং সৎ ও অসৎ-এর পার্থক্য নিরূপণে সমর্থ, তিনিই হচ্ছেন দ্বিজ। অতএব আশা করা যায় যে, তিনি ন্যায় এবং দর্শন হৃদয়ঙ্গম করেছেন। দক্ষকন্যা সতী তাঁর পিতার সমক্ষে প্রবল যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন। অত্যন্ত গুণবান কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা কেবল অপরের সদ্গুণগুলি দর্শন করেন। মধুকর যেমন ফুলের মধু সংগ্রহে আগ্রহী কিন্তু ফুলের কাঁটা এবং রঙের বিবেচনা করে না, তেমনই অত্যন্ত বিরল মহাত্মাগণ কেবল অন্যের সদ্গুণগুলিই দর্শন করেন, তাঁরা তাদের দোষের বিচার করেন না, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা দোষ এবং গুণের বিচার করে।

অসাধারণ মহাত্মাদেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে, এবং সর্বোত্তম মহাত্মা হচ্ছেন তিনি, যিনি মানুষের তুচ্ছ গুণকেও মহৎ বলে প্রশংসা করেন। শিবের আর একটি নাম আশুতোষ, যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি সহজেই সন্তুষ্ট হন এবং যে-কোন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ স্তরের বর দান করেন। যেমন, এক সময় শিবের এক ভক্ত বর চেয়েছিল যে, সে যারই মস্তক স্পর্শ করবে, তৎক্ষণাৎ তার মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শিব তাতে রাজি হন। যদিও সেই বরটি মোটেই প্রশংসনীয় ছিল না, কারণ শিবের সেই ভক্তটি তার শত্রুদের হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু শিব সেই ভক্তটির সদ্গুণগুলির কথা বিবেচনা করে তাকে সেই বর দান করেছিলেন। শিব তার দোষগুলিকেও সদ্গুণ বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সতী তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, "আপনি ঠিক তার বিপরীত। যদিও শিব সমস্ত সদ্গুণে পূর্ণ, এবং তাঁর কোন দোষ নেই, তবুও আপনি তাঁকে খারাপ বলে মনে

করেছেন এবং তাঁর দোষ দর্শন করেছেন। তাঁর সদ্‌গুণগুলিকে দোষ বলে গ্রহণ করার ফলে, আপনি মহাত্মা হওয়ার পরিবর্তে দুরাত্মায় পরিণত হয়েছেন এবং সব চাইতে অধঃপতিত হয়েছেন। অন্য ব্যক্তিদের সদ্‌গুণগুলি গ্রহণ করার ফলে মানুষ মহাত্মায় পরিণত হন, কিন্তু অনর্থক অন্যের সদ্‌গুণগুলিকে দোষ বলে বিবেচনা করার ফলে, আপনি সব চাইতে অধঃপতিত হয়েছেন।"

শ্লোক ১৩

নাশ্চর্যমেতদ্‌যদসৎসু সর্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু ।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংসুভি-
র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥ ১৩ ॥

ন—না; **আশ্চর্যম্**—বিস্ময়জনক; **এতৎ**—এই; **যৎ**—যা; **অসৎসু**—অসৎ ব্যক্তি; **সর্বদা**—সর্বদা; **মহৎ-বিনিন্দা**—মহাত্মাদের নিন্দা; **কুণপ-আত্ম-বাদিষু**—যারা মৃত দেহটিকে তাদের আত্মা বলে মনে করে; **স-ঈর্ষ্যম্**—ঈর্ষা; **মহা-পুরুষ**—মহাপুরুষদের; **পাদ-পাংসুভিঃ**—পদধূলির দ্বারা; **নিরস্ত-তেজঃসু**—যার মহিমা বিনষ্ট হয়েছে; **তৎ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **শোভনম্**—অতি উত্তম।

অনুবাদ

যারা নশ্বর জড় দেহটিকে আত্মা বলে মনে করে, তারা যে সর্বদা মহাত্মাদের নিন্দা করে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জড় বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিদের এই প্রকার ঈর্ষা অতি উত্তম, কারণ তার ফলে তারা অধঃপতিত হয়। মহাপুরুষদের পদরেণুসমূহ তাদের তেজ নাশ করে।

তাৎপর্য

সব কিছুই নির্ভর করে গ্রহণকর্তার শক্তির উপর। যেমন, প্রচণ্ড সূর্যকিরণে বহু বনস্পতি এবং ফুল শুকিয়ে যায়, আবার অন্য অনেক বনস্পতি খুব সুন্দরভাবে বৃদ্ধি পায়। এইভাবে বৃদ্ধি এবং হ্রাস নির্ভর করে গ্রহীতার উপর। তেমনই, *মহীয়সাং পাদ-রজোঽভিষেকম্*—মহাপুরুষের পাদপদ্মের রজ গ্রহীতাকে সর্ববিধ মঙ্গল প্রদান করে, কিন্তু সেই রজই আবার ক্ষতি করতে পারে। যাঁরা মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেন, তাঁদের সমস্ত দিব্য সদ্‌গুণগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং

তারা শুকিয়ে যায়। মহাত্মা অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাপুরুষের চরণ-কমলের ধূলির প্রতি কৃত অপরাধ ক্ষমা করেন না, ঠিক যেমন কেউ তাঁর মস্তকে প্রচণ্ড সূর্যকিরণ সহ্য করতে পারেন কিন্তু তাঁর চরণে সেই তীব্র সূর্যকিরণ সহ্য করতে পারেন না। অপরাধী ক্রমশই অধঃপতিত হতে থাকে; সে স্বাভাবিকভাবেই মহাত্মার চরণে অপরাধ করতে থাকে। অপরাধ সাধারণত তারাই করে, যারা ভ্রান্তভাবে তাদের নশ্বর দেহটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। রাজা দক্ষ তাঁর দেহকে তাঁর আত্মা বলে মনে করে সেই ভ্রান্ত ধারণায় গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। তিনি শিবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর দেহটি সতীর দেহের পিতা হওয়ার ফলে, শিবের থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ। সাধারণত, মূর্খ মানুষেরা এই ভ্রান্ত ধারণায় মগ্ন থাকে, এবং তারা দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে আচরণ করে। তার ফলে তারা মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মে অধিক থেকে অধিকতর অপরাধ করতে থাকে। যারা এই প্রকার ধারণা-সমন্বিত, তাদের গরু এবং গাধার মতো পশুদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ১৪

যদ্‌দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎপ্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ ।
পবিত্রকীর্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥ ১৪ ॥

যৎ—যা; **দ্বি-অক্ষরম্**—দুই অক্ষর-সমন্বিত; **নাম**—নামক; **গিরা-ঈরিতম্**—কেবলমাত্র জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণের ফলে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **সকৃৎ**—একবার মাত্র, **প্রসঙ্গাৎ**—হৃদয় থেকে; **অঘম্**—পাপকর্ম; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **হন্তি**—বিনাশ করে; **তৎ**—তা; **পবিত্র-কীর্তিম্**—যাঁর যশ অতি পবিত্র; **তম্**—তাঁকে; **অলঙ্ঘ্য-শাসনম্**—যাঁর আদেশ কখনও উপেক্ষা করা যায় না; **ভবান্**—আপনি; **অহো**—হায়; **দ্বেষ্টি**—দ্বেষ; **শিবম্**—শিব; **শিব-ইতরঃ**—অশুভ।

অনুবাদ

সতী বললেন—হে পিতা! দুই অক্ষর-সমন্বিত যাঁর নাম উচ্চারণের ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং মানুষ পবিত্র হয়, যাঁর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করা যায়

না, সেই শিবের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে, আপনি ঘোরতম অপরাধ করছেন। শিব সর্বদাই পবিত্র এবং মঙ্গল-স্বরূপ, এবং আপনি ছাড়া আর কেউ তাঁর প্রতি দ্বেষ করেন না।

তাৎপর্য

যেহেতু শিব এই জড় জগতে সমস্ত জীবদের মধ্যে সব চাইতে মহান আত্মা, তাই তাঁর শিব এই নামটি তাদের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলময়, যারা তাদের দেহকে তাদের আত্মা বলে মনে করে। এই প্রকার ব্যক্তিবা যদি শিবের আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে যে, তাদের জড় দেহটি তাদের স্বরূপ নয়, তাদেব প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। *শিব* মানে হচ্ছে *মঙ্গল*। এই দেহে অবস্থিত আত্মা হচ্ছে মঙ্গলময়. *অহং ব্রহ্মাস্মি*—'আমি ব্রহ্ম।' এই উপলব্ধিটি মঙ্গলময়। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মাকে তার স্বরূপ বলে উপলব্ধি কবতে না পাবে, ততক্ষণ সে যা কিছু করে তা সবই অমঙ্গলজনক। *শিব* মানে "মঙ্গলময়" এবং শিবের ভক্তরা ধীরে ধীরে সেই চিন্ময় উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন। কিন্তু সেটি সব কিছু নয়। চিন্ময় উপলব্ধির স্তর থেকে মঙ্গলময় জীবন শুরু হয়। তার পর আরও অনেক কর্তব্য থাকে—পরমাত্মার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক উপলব্ধি করতে হয়। কেউ যদি প্রকৃতই শিবের ভক্ত হন, তা হলে তিনি চিন্ময় উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন, কিন্তু যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান না হন, তা হলে আমি চিন্ময় আত্মা *(অহং ব্রহ্মাস্মি)* এইটুকু মাত্র উপলব্ধি করেই তাঁর প্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হন, তা হলে তিনি শিবের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। শিব যেমন সর্বদাই বাসুদেবের চিন্তায় মগ্ন, তিনিও তেমনই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হবেন। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *সত্ত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেব-শব্দিতম্*—শিব সর্বদাই বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এইভাবে বিষ্ণুর আরাধনা করার ফলে, শিবেব মঙ্গলময় স্থিতি হৃদয়ঙ্গম কবা যায়, কারণ *শিব পুরাণে* শিব বলেছেন যে, সমস্ত আরাধনাব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আবাধনা। শিব পূজ্য কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। কখনই শিব এবং বিষ্ণুকে সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে ভুল করা উচিত নয় এবং কাউকে তাঁর সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। সেটি একটি নাস্তিক মতবাদ। *বৈষ্ণবীয় পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে যে, বিষ্ণু বা নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা করা উচিত নয় এবং কাউকে তাঁর সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। এমন কি শিব অথবা ব্রহ্মাকেও তাঁর সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়, অতএব অন্যান্য দেবতাদের আর কি কথা।

শ্লোক ১৫

যৎপাদপদ্মং মহতাং মনোহলিভি-
নির্ষেবিতং ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ ।
লোকস্য যদ্বর্ষতি চাশিষোহর্থিন-
স্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে ॥ ১৫ ॥

যৎ-পাদ-পদ্মম্—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **মহতাম্**—মহাপুরুষের; **মনঃ-অলিভিঃ**—মনরূপ ভ্রমরদের দ্বারা; **নিষেবিতম্**—নিরন্তর সেবিত; **ব্রহ্ম-রস**—ব্রহ্মানন্দ; **আসব-অর্থিভিঃ**—অমৃতের অন্বেষণকারী; **লোকস্য**—সাধারণ মানুষদের; **যৎ**—যা; **বর্ষতি**—তিনি পূর্ণ করেন; **চ**—এবং; **আশিষঃ**—বাসনা; **অর্থিনঃ**—অন্বেষণ করে; **তস্মৈ**—তাঁর প্রতি (শিব); **ভবান্**—আপনি, **দ্রুহ্যতি**—হিংসা করছেন; **বিশ্ব-বন্ধবে**—ত্রিভুবনের সমস্ত জীবদের যিনি বন্ধু তাঁর প্রতি।

অনুবাদ

আপনি সেই শিবের প্রতি হিংসা করছেন, যিনি ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণীদের বন্ধু। তিনি সাধারণ মানুষদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন, এবং যাঁরা ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতের অন্বেষণে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন, সেই সমস্ত মহাত্মাদেরও তিনি কৃপা করেন।

তাৎপর্য

সাধারণত দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে যারা গভীরভাবে বিষয়াসক্ত এবং জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের অভিলাষী, তারা যদি শিবের পূজা করে তা হলে তাদের বাসনা পূর্ণ হয়। শিব অল্পতেই সন্তুষ্ট হন বলে, অচিরেই সাধারণ মানুষের জড়-জাগতিক বাসনা পূর্ণ করেন। তাই দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষেরা শিবের পূজায় অত্যন্ত তৎপর। এর পরে, অন্য শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে তারা, যারা জড়-জাগতিক জীবনে বিরক্ত হয়ে অথবা নিরাশ হয়ে মুক্তি লাভের জন্য শিবের পূজা করে। এই মুক্তির অর্থ হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্তি। যে-ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি তাঁর জড় দেহ নন, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা, তিনি অবিদ্যা থেকে মুক্ত হয়েছেন। শিব এই সুবিধাটিও প্রদান করেন। সাধারণত মানুষ অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য, কিছু টাকা-পয়সা লাভ করার জন্য ধর্ম আচরণ করে, কারণ অর্থের দ্বারা তারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করতে

পারে। কিন্তু তারা যখন তাদের সেই চেষ্টায় নিরাশ হয়, তখন তারা ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে চায় অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি জড়-জাগতিক জীবনের পুরুষার্থ, এবং বিষয়াসক্ত সাধারণ মানুষ ও দিব্য জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী মানুষ, উভয়েরই বন্ধু হচ্ছেন শিব। তাই শিবের সঙ্গে শত্রুতা করা দক্ষের পক্ষে উচিত ছিল না। এমন কি বৈষ্ণবরাও, যাঁরা এই জড় জগতের সাধারণ মানুষ এবং উন্নত স্তরেব মানুষ, উভয়েরই ঊর্ধ্বে, তাঁরাও সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে শিবের পূজা করেন। অতএব, সাধারণ মানুষ, উন্নত স্তরের মানুষ এবং ভগবদ্ভক্ত, সকলেরই বন্ধু শিব—তাই শিবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অথবা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা কারোরই উচিত নয়।

শ্লোক ১৬

কিং বা শিবাখ্যমশিবং ন বিদুস্ত্বদন্যে
ব্রহ্মাদয়স্তমবকীর্য জটাঃ শ্মশানে ।
তন্মাল্যভস্মনৃকপাল্যবসৎপিশাচৈ-
র্যে মূর্ধভির্দধতি তচ্চরণাবসৃষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

কিম্ বা—অথবা; **শিব-আখ্যম্**—শিব নামক; **অশিবম্**—অশুভ; **ন বিদুঃ**—জানে না; **ত্বৎ অন্যে**—আপনাকে ছাড়া; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি; **তম্**—তাঁকে (শিব); **অবকীর্য**—বিক্ষিপ্ত; **জটাঃ**—জটা; **শ্মশানে**—শ্মশানে; **তৎ-মাল্য-ভস্ম-নৃ-কপালী**—যিনি নরমুণ্ডমালা ধারণ করেন এবং যাঁর অঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত; **অবসৎ**—সঙ্গ করেন; **পিশাচৈঃ**—পিশাচদের; **যে**—যিনি; **মূর্ধভিঃ**—মস্তকের দ্বারা; **দধতি**—স্থাপন করেন; **তৎ-চরণ-অবসৃষ্টম্**—তাঁর চরণ-কমল থেকে পতিত।

অনুবাদ

আপনি কি মনে করেন, যিনি শ্মশানে পিশাচদের সঙ্গে থাকেন, যাঁর জটাজুট তাঁর সারা শরীরে বিক্ষিপ্ত, যাঁর গলায় মুণ্ডমালা এবং শ্মশানের ভস্ম যাঁর সর্বাঙ্গে লিপ্ত, শিব নামক সেই অশিব (অমঙ্গলজনক) ব্যক্তিটিকে আপনার থেকে অনেক বেশি সম্মানিত ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ জানেন না? তাঁর এই সমস্ত অশুভ গুণ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষেরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত পুষ্প মস্তকে ধারণ করেন।

তাৎপর্য

শিবের মতো মহাপুরুষের নিন্দা করা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন, এবং সতী তাঁর পতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য এখানে সেই কথা বলেছেন। তিনি প্রথমে বলেছেন, "শিব শ্মশানে পিশাচদের সঙ্গে থাকেন বলে, চিতাভস্ম তাঁর অঙ্গে লেপন করেন বলে এবং নরমুণ্ডমালা ধারণ করেন বলে আপনি তাঁকে অশিব বলেছেন। আপনি তাঁর অনেক দোষ প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু আপনি জানেন না যে, তাঁর স্থিতি সর্বদাই চিন্ময়। তিনি অমঙ্গলজনক বলে মনে হলেও, ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষেরা কেন গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি মস্তকে ধারণ করেন, এবং আপনি যে নির্মাল্যের নিন্দা করেছেন, কেন তাঁরা পরম শ্রদ্ধা সহকারে তা মস্তকে ধারণ করেন?" সতী যেহেতু একজন সাধ্বী রমণী এবং শিবের পত্নী, তাই শিবের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি কেবল ভাবাবেগের দ্বারা তা করার চেষ্টা করেননি, পক্ষান্তরে, যথাযথ তত্ত্বের দ্বারা তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিব কোন সাধারণ জীব নন। সেটি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত নন, আবার সাধারণ জীবও নন। ব্রহ্মা প্রায় একজন সাধারণ জীবের মতো। অবশ্য যখন ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত জীব পাওয়া না যায়, তখন বিষ্ণুর অংশ-প্রকাশ ব্রহ্মার পদ অধিকার করেন। কিন্তু সাধারণত এই ব্রহ্মাণ্ডের অত্যন্ত পবিত্র কোন জীব সেই পদে নিযুক্ত হন। তাই শিবের পদ ব্রহ্মার পদ থেকেও উচ্চ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে শিব ব্রহ্মার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষেরাও শিবের তথাকথিত অশুভ নির্মাল্য এবং পদধূলি গ্রহণ করেন। ব্রহ্মার পুত্র—মরীচি, অত্রি, ভৃগু আদি নয়জন মহর্ষি, তাঁরা সকলেই এইভাবে শিবকে সম্মান করেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, শিব কোন সাধারণ জীব নন।

বহু *পুরাণে* কখনও কখনও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন দেবতা এত উন্নত স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন যে, তিনি প্রায় পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত, কিন্তু বিষ্ণু যে পরমেশ্বর ভগবান, সেই কথা প্রতিটি শাস্ত্রেই প্রতিপন্ন হয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* শিবকে দধির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দধি দুধ থেকে অভিন্ন। যেহেতু দুধই বিকারপ্রাপ্ত হয়ে দধিতে পরিণত হয়, সেই বিচারে দধিও একদিক থেকে দুগ্ধ। তেমনই, একদিক দিয়ে শিব পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি ভগবান নন, ঠিক যেমন দধিও দুধ, যদিও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে এই সমস্ত বর্ণনা রয়েছে। যখন দেখা যায় যে, কোন দেবতা আপাতদৃষ্টিতে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে উন্নত, তখন বুঝতে হবে যে,

সেই বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এইভাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/২৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন কোন বিশেষ দেবতার পূজা করতে চান, তখন অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে সেই দেবতার প্রতি অধিক থেকে অধিকতর আসক্তি প্রদান করেন, যাতে তিনি দেবলোকে উন্নীত হতে পারেন। *যান্তি দেব-ব্রতা দেবান্* : দেবতাদের পূজা করার ফলে, দেবতাদের লোকে উন্নীত হওয়া যায়; তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার ফলে, ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়া যায়। বৈদিক শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সতী এখানে শিবের প্রশংসা করেছেন, তার একটি কারণ হচ্ছে, শিব তাঁর পতি হওয়ার ফলে, তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণা, এবং অন্য কারণটি হচ্ছে শিবের স্থিতি সাধারণ জীবদের থেকে, এমন কি ব্রহ্মার থেকেও অনেক ঊর্ধ্বে।

শিবের অতি উন্নত পদ ব্রহ্মা স্বীকার করেছেন, তাই সতীর পিতা দক্ষেরও তাঁকে স্বীকার করা উচিত। সেটি ছিল সতীর বক্তব্য। সতী যদিও তাঁব পিতৃগৃহে আসার পূর্বে শিবের কাছে অনুনয় করে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর ভগিনী এবং মাতাকে দর্শন করার জন্য সেখানে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আসেননি। সেটি ছিল একটি অজুহাত মাত্র, কারণ প্রকৃতপক্ষে শিবের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হওয়ার জন্য তাঁর পিতা দক্ষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, এবং সেই বাসনা হৃদয়ে ধারণ করে তিনি সেখানে এসেছিলেন সেটি ছিল তাঁর সেখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি যখন তাঁর পিতাকে বোঝাতে অক্ষম হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতৃ-প্রদত্ত দেহটি ত্যাগ করেছিলেন, যা পরবর্তী শ্লোকগুলি থেকে আমরা জানতে পারব।

শ্লোক ১৭

কর্ণৌ পিধায় নিরয়াদ্‌যদকল্প ঈশে
ধর্মাবিতর্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে ।
ছিন্দ্যাৎপ্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎস ধর্মঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ণৌ—উভয় কর্ণ; **পিধায়**—বন্ধ করে; **নিরয়াৎ**—চলে যাওয়া উচিত; **যৎ**—যদি; **অকল্পঃ**—অসমর্থ; **ঈশে**—স্বামী; **ধর্ম-অবিতরি**—ধর্মরক্ষক; **অসৃণিভিঃ**—দায়িত্বজ্ঞানহীন; **নৃভিঃ**—ব্যক্তিদের; **অস্যমানে**—নিন্দা করা হলে; **ছিন্দ্যাৎ**—কেটে

ফেলা উচিত; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **রুশতীম্**—অকল্যাণবাদিনী; **অসতীম্**—নিন্দুকের; **প্রভুঃ**—সমর্থ; **চেৎ**—যদি; **জিহ্বাম্**—জিহ্বা; **অসূন্**—(নিজের) জীবন; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ততঃ**—তখন; **বিসৃজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **সঃ**—সেই; **ধর্মঃ**—কর্তব্য।

অনুবাদ

সতী বললেন—যদি কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি ধর্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করে, তা হলে ভৃত্যের কর্তব্য হচ্ছে তাকে দণ্ডদান করতে সমর্থ না হলে, তাঁর কান আচ্ছাদন করে সেখান থেকে চলে যাওয়া। কিন্তু তিনি যদি মারতে সক্ষম হন, তা হলে বলপূর্বক সেই নিন্দুকের জিহ্বা ছেদন করা উচিত অথবা তাকে বধ করা উচিত। তার পর নিজের জীবন ত্যাগ করা উচিত।

তাৎপর্য

সতী যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন মহাপুরুষের নিন্দা করে, তা হলে সে হচ্ছে সব চাইতে অধম। কিন্তু, দক্ষও আত্মপক্ষ সমর্থন করে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারতেন যে, যেহেতু তিনি একজন প্রজাপতি, বহু জীবের প্রভু এবং ব্রহ্মাণ্ডের একজন মহান অধ্যক্ষ, তাই তাঁর অতি উচ্চ পদের মর্যাদা প্রদর্শন করে, তাঁর নিন্দা না করে সতীর তাঁর সদ্‌গুণাবলী দর্শন করা উচিত। এই যুক্তির উত্তর হচ্ছে যে, সতী তাঁর নিন্দা করছিলেন না, তাঁর অভিযোগের জবাব দিচ্ছিলেন। যদি সম্ভব হত তা হলে তিনি দক্ষের জিহ্বা কেটে ফেলতেন, কারণ দক্ষ শিবের নিন্দা করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শিব যেহেতু ধর্মরক্ষক, তাই কেউ যদি তাঁর নিন্দা করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা উচিত, এবং এই প্রকার ব্যক্তিকে হত্যা করার পর, নিজের জীবন ত্যাগ করা উচিত। সেটিই হচ্ছে পন্থা, কিন্তু যেহেতু দক্ষ ছিলেন সতীর পিতা, তাই সতী মনস্থ করেছিলেন যে, তাঁকে হত্যা না করে, শিবনিন্দা শ্রবণ করার ফলে তাঁর যে মহা পাপ হয়েছিল, তা ক্ষালনের জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করবেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এখানে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই মহাপুরুষের নিন্দা সহ্য করা উচিত নয়। কেউ যদি ব্রাহ্মণ হয়, তা হলে তাঁর দেহত্যাগ কবা উচিত নয়, কারণ তা হলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে; অতএব ব্রাহ্মণের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর কর্ণ আচ্ছাদন করে সেখান থেকে চলে যাওয়া, যাতে সেই নিন্দা তাঁকে আর না শুনতে হয়। অপরাধীর দণ্ডদান করার ক্ষমতা ক্ষত্রিয়ের রয়েছে, তাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে নিন্দুকের জিহ্বা কেটে ফেলা এবং তাকে বধ করা। কিন্তু বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্তব্য হচ্ছে তৎক্ষণাৎ

দেহত্যাগ করা। সতী দেহত্যাগ করতে স্থির করেছিলেন, কারণ তিনি নিজেকে শূদ্র এবং বৈশ্যের সমান বলে মনে করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) যেমন বলা হয়েছে, *স্ত্রীয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ*। স্ত্রী, শূদ্র এবং বৈশ্য সমপর্যায়ভুক্ত। যেহেতু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিবের মতো একজন মহাপুরুষের নিন্দা শ্রবণ করলে বৈশ্য এবং শূদ্রদের তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করা উচিত, তাই সতী দেহত্যাগ করবেন বলে স্থির করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

অতস্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং
ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ ।
জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধিমন্ধসো
জুগুপ্সিতস্যোদ্ধরণং প্রচক্ষতে ॥ ১৮ ॥

অতঃ—অতএব; **তব**—আপনার থেকে; **উৎপন্নম্**—প্রাপ্ত; **ইদম্**—এই; **কলেবরম্**—দেহ; **ন ধারয়িষ্যে**—ধারণ করব না; **শিতি-কণ্ঠ-গর্হিণঃ**—যে শিবের নিন্দা করেছে; **জগ্ধস্য**—যা ভক্ষণ করা হয়েছে; **মোহাৎ**—ভ্রান্তিবশত; **হি**—কারণ; **বিশুদ্ধিম্**—শুদ্ধি; **অন্ধসঃ**—খাদ্যের; **জুগুপ্সিতস্য**—বিষাক্ত; **উদ্ধরণম্**—বমন; **প্রচক্ষতে**—ঘোষণা করা হয়।

অনুবাদ

তাই আমি আর এই অযোগ্য শরীর ধারণ করব না, যা আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, কারণ আপনি শিবের নিন্দা করেছেন। কেউ যদি ভ্রান্তিবশত কোন বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণ করে ফেলে, তা হলে তা বমন করাই তার নিরাময়ের শ্রেষ্ঠ উপায়।

তাৎপর্য

সতী যেহেতু ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির মূর্ত প্রতীক, তাই তাঁর পক্ষে বহু দক্ষ-সমন্বিত বহু ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তা হলে হয়তো কেউ তাঁর পতি শিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারত যে, তিনি নিজে অক্ষম বলে তাঁর পত্নী সতীর দ্বারা দক্ষকে সংহার করেছিলেন। এই অপবাদ থেকে তাঁর পতিকে রক্ষা করার জন্য সতী দেহত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

ন বেদবাদাননুবর্ততে মতিঃ
স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ ।
যথা গতির্দেবমনুষ্যয়োঃ পৃথক্
স্ব এব ধর্মে ন পরং ক্ষিপেৎস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

ন—না; **বেদ-বাদান্**—বেদের বিধি-নিষেধ; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে; **মতিঃ**—মন; **স্বে**—নিজের; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **লোকে**—আত্মায়; **রমতঃ**—রমণ করে; **মহা-মুনেঃ**—মহান মুনিগণের; **যথা**—যেমন; **গতিঃ**—পন্থা; **দেব-মনুষ্যয়োঃ**—মানুষ এবং দেবতাদের; **পৃথক্**—ভিন্ন; **স্বে**—তোমার নিজের; **এব**—একলা; **ধর্মে**—কর্তব্য, **ন**—না; **পরম**—অন্য; **ক্ষিপেৎ**—সমালোচনা করা উচিত; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে।

অনুবাদ

অন্যের সমালোচনা না করে নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করাই শ্রেয়। অতি উচ্চ স্তরের পরমার্থবাদীরা কখনও কখনও বেদের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করেন, কারণ তাঁদের সেইগুলি অনুসরণ করার আবশ্যকতা হয় না, ঠিক যেমন দেবতারা অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে।

তাৎপর্য

সর্বোচ্চ স্তরের পরমার্থবাদী এবং সব চাইতে অধঃপতিত বদ্ধ জীবের আচরণ একই রকম বলে মনে হয়। অতি উন্নত পরমার্থবাদী বেদের সমস্ত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করতে পারেন, ঠিক যেমন অন্তরীক্ষে বিচরণকারী দেবতারা ভূপৃষ্ঠের অরণ্য এবং পাহাড়-পর্বতের প্রতিবন্ধকতার দ্বারা প্রতিহত হন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে, যাদের অন্তরীক্ষে বিচরণ করার ক্ষমতা নেই, তাদের এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলির সম্মুখীন হতে হয়। যদিও মনে হয় যে, পরম প্রিয় শিব বেদের বিধি-নিষেধগুলি পালন করছেন না, তবুও এইভাবে বেদবিধি লঙ্ঘন করার ফলে তাঁর কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু কোনও সাধারণ মানুষ যদি শিবের অনুকরণ করতে চায়, তা হলে মস্ত বড় ভুল হবে। সাধারণ মানুষদের পক্ষে বেদের সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করা অবশ্যকর্তব্য, কিন্তু চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে সেইগুলি পালন করার আবশ্যকতা থাকে না। শিব বেদের কঠোর বিধি-বিধানের অনুসরণ করেননি বলে, দক্ষ তাঁর দোষ দর্শন করেছিলেন, কিন্তু সতী প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, তাঁর

পক্ষে সেই সমস্ত নিয়ম পালন করার কোন আবশ্যকতা ছিল না। বলা হয় যে, যিনি সূর্য বা অগ্নির মতো তেজস্বী, তাঁর কাছে শুদ্ধ বা অশুদ্ধের বিচার থাকে না। সূর্যকিরণ অপবিত্র স্থানকে পবিত্র করে দিতে পারে, কিন্তু অন্য কেউ যদি সেই স্থান দিয়ে যায়, তা হলে সে প্রভাবিত হবে। শিবের অনুকরণ করা উচিত নয়; পক্ষান্তরে, নিষ্ঠা সহকারে তার স্বধর্ম আচরণ করা উচিত। কখনই শিবের মতো একজন মহাপুরুষের নিন্দা করা উচিত নয়।

শ্লোক ২০

কর্ম প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তমপ্যৃতং
বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাশ্রিতম্ ।
বিরোধি তদ্‌যৌগপদৈককর্তরি
দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম নর্চ্ছতি ॥ ২০ ॥

কর্ম—কার্যকলাপ; **প্রবৃত্তম্**—জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত; **চ**—এবং; **নিবৃত্তম্**—জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ঋতম্**—সত্য; **বেদে**—বেদে; **বিবিচ্য**—পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে; **উভয়-লিঙ্গম্**—উভয়ের লক্ষণ; **আশ্রিতম্**—নির্দেশিত; **বিরোধি**—বিরোধী; **তৎ**—তা; **যৌগপদ-এক-কর্তরি**—একই ব্যক্তিতে উভয় কর্ম; **দ্বয়ম্**—দুই; **তথা**—অতএব; **ব্রহ্মণি**—যিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **ন ঋচ্ছতি**—উপেক্ষিত হয়।

অনুবাদ

বেদে দুই প্রকার কর্মের নির্দেশ রয়েছে—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রবৃত্তি মার্গ এবং বিষয় বিরক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিবৃত্তি মার্গ। এই দুই প্রকার কর্ম অনুসারে, ভিন্ন লক্ষণ-সমন্বিত দুই প্রকার মানুষ রয়েছে। যদি কেউ একই ব্যক্তিতে দুই প্রকার কর্ম দেখতে চান, তা হলে পরস্পর-বিরোধী হবে। কিন্তু যিনি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তিনি এই দুই প্রকার কার্যকলাপই উপেক্ষা করেন।

তাৎপর্য

বৈদিক কর্ম এমনইভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে, এই জড় জগতে ভোগ করতে এসেছে যে বদ্ধ জীব, সে, বেদের নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে জড় সুখভোগ করার পর, চরমে বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে চিৎ-জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা

অর্জন করতে পারে। চারটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস ধীরে ধীরে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার শিক্ষা দান করে। গৃহস্থের কর্ম এবং বেশ সন্ন্যাসীর থেকে ভিন্ন একই ব্যক্তির পক্ষে এই দুটি আশ্রম গ্রহণ করা অসম্ভব। সন্ন্যাসী গৃহস্থের মতো আচরণ করতে পারে না, এবং গৃহস্থও সন্ন্যাসীর মতো আচরণ করতে পারে না গৃহস্থ বৈষয়িক কার্যকলাপে লিপ্ত, এবং সন্ন্যাসী জড় জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু এই উভয় স্তরের অতীত আর একটি স্তর রয়েছে। শিব সেই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, কারণ, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সর্বদাই তাঁর অন্তরে বাসুদেবের ভাবনায় মগ্ন। তাই গৃহস্থের কার্যকলাপ অথবা সন্ন্যাসীর কার্যকলাপের কোনটিই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি পরম হংস স্তরে অবস্থিত, যা হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর। *ভগবদ্গীতায়* (২/৫২-৫৩) শিবের দিব্য স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন ফলের বাসনা ত্যাগ করে সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করবেন, তখন তিনি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন তখন তাঁর আর বৈদিক নির্দেশ বা বেদের বিবিধ বিধি নিষেধ পালন করার আবশ্যকতা থাকে না। কেউ যখন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান করার স্তর অতিক্রম পূর্বক সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্ময় ভাবনায় মগ্ন হন, অর্থাৎ ভগবানের প্রেমময়ী সেবার চিন্তায় মগ্ন হন, তখন তাঁর সেই স্থিতিকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ বা সমাধি বা ভাব। যে ব্যক্তি এই স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর ক্ষেত্রে বেদের প্রবৃত্তি মার্গ অথবা নিবৃত্তি মার্গ, কোনটিই প্রযোজ্য নয়।

শ্লোক ২১

মা বঃ পদব্যঃ পিতরস্মদাস্থিতা
যা যজ্ঞশালাসু ন ধূমবর্ত্মভিঃ ।
তদন্নতৃপ্তৈরসুভৃদ্ভিরীড়িতা
অব্যক্তলিঙ্গা অবধূতসেবিতাঃ ॥ ২১ ॥

মা—নয়; **বঃ**—আপনাদের; **পদব্যঃ**—ঐশ্বর্য; **পিতঃ**—হে পিতা; **অস্মৎ-আস্থিতাঃ**—আমাদের দ্বারা প্রাপ্ত; **যাঃ**—যা (ঐশ্বর্য); **যজ্ঞ-শালাসু**—যজ্ঞাগ্নিতে; **ন**—না; **ধূম-বর্ত্মভিঃ**—যজ্ঞপথের দ্বারা; **তৎ-অন্ন-তৃপ্তৈঃ**—যজ্ঞান্নের দ্বারা তৃপ্ত; **অসু-ভৃদ্ভিঃ**—দেহের আবশ্যকতা পূরণকারী; **ইড়িতাঃ**—প্রশংসিত; **অব্যক্ত-লিঙ্গাঃ**—যাঁর কারণ প্রকাশিত হয়নি; **অবধূত-সেবিতাঃ**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাপ্ত।

অনুবাদ

হে পিতা! আমাদের কাছে যে ঐশ্বর্য রয়েছে, তা আপনার এবং আপনার তোষামোদকারীদের কল্পনারও অতীত। যারা মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তারা কেবল যজ্ঞান্ন ভোজন করে তাদের দেহের আবশ্যকতাগুলিই চরিতার্থ করার ব্যাপারে মগ্ন থাকে, কিন্তু আমরা কেবল ইচ্ছার দ্বারা আমাদের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারি। বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষেরাই কেবল সেই প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

সতীর পিতা দক্ষ মনে করেছিলেন যে, প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, এবং তিনি তাঁর কন্যাকে এমন এক ব্যক্তির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন, যিনি কেবল দরিদ্রই নন, অধিকন্তু সমস্ত সংস্কৃতিবিহীন ছিলেন। তাঁর পিতা হয়তো মনে করেছিলেন যে, যদিও তাঁর কন্যা ছিলেন পরম সাধ্বী এবং পতিপরায়ণা, কিন্তু তাঁর পতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁর সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করার জন্য সতী বলেছিলেন যে, তাঁর পতির যে ঐশ্বর্য আছে তা দক্ষ এবং সকাম কর্মে লিপ্ত তাঁর তোষামোদকারী অনুগামীদের মতো জড়বাদীদের পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব। তাঁর পতির স্থিতি ছিল ভিন্ন তিনি ছিলেন সর্ব ঐশ্বর্য-সমন্বিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা প্রদর্শন করতে চানানি তাই এই প্রকার ঐশ্বর্যকে বলা হয় অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত। কিন্তু যদি প্রয়োজন হত, তা হলে কেবল ইচ্ছার দ্বারা, শিব তাঁর আশ্চর্যজনক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারতেন, এবং সেই প্রকার ঘটনার ইঙ্গিত তিনি এখানে দিয়েছিলেন, কারণ তা অচিরেই ঘটতে যাচ্ছিল। শিবের যে ঐশ্বর্য তা কেবল বৈরাগ্য এবং ভগবৎ প্রেমের দ্বারা উপভোগ করা যায়, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পন্থার ভৌতিক প্রদর্শনে নয়। এই প্রকার ঐশ্বর্যের অধিকারি হচ্ছেন চতুঃসন, নারদ, শিব আদি মহাপুরুষগণ, অন্যেরা নয়।

এই শ্লোকে বৈদিক সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদের এখানে *ধূম-বর্ত্মভিঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। যজ্ঞে দুই প্রকার অন্ন নিবেদন করা হয়। একটি হচ্ছে সকাম আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে নিবেদিত অন্ন এবং অন্যটি হচ্ছে বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন, যা সর্বোত্তম। যদিও যজ্ঞবেদিতে বিষ্ণুই হচ্ছেন সর্বতোভাবে মুখ্য দেবতা, কিন্তু সকাম অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন দেব-দেবীদের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে কিছু জড় জাগতিক সমৃদ্ধি লাভ করা। কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা, এবং এই প্রকার যজ্ঞের অবশিষ্ট ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধনের জন্য লাভজনক। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা পারমার্থিক উন্নতি সাধন অত্যন্ত মন্থর, এবং তাই এই শ্লোকে তার নিন্দা করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সকাম যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাদের কাকের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কারণ কাক আবর্জনার পাত্রে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট দ্রব্য আহার করে আনন্দ উপভোগ করে। সতী সেই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণদেরও নিন্দা করেছেন।

রাজা দক্ষ এবং তাঁর তোষামোদকারীরা শিবের অবস্থান বুঝে থাকুক অথবা না বুঝে থাকুক, সতী তাঁর পিতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর পতিকে ঐশ্বর্যহীন বলে মনে না করেন। শিবের পরম অনুরক্তা পত্নী সতী শিবের উপাসকদের সব রকম জড় ঐশ্বর্য প্রদান করেন। সেই তত্ত্বের বিশ্লেষণ *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে করা হয়েছে। কখনও কখনও শিবের উপাসকদের বিষ্ণুর উপাসকদের থেকেও অধিক ঐশ্বর্যশালী বলে মনে হয়, কারণ দুর্গা বা সতী জড় জগতের অধ্যক্ষা হওয়ার ফলে তাঁর পতিকে মহিমান্বিত করার জন্য শিবের উপাসকদের সমস্ত জড় ঐশ্বর্য প্রদান করেন, কিন্তু বিষ্ণুর উপাসকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা, এবং তাই তাঁদের ক্ষেত্রে কখনও কখনও জড় ঐশ্বর্য হ্রাস পেতে দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয় দশম স্কন্ধে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো
দেহোদ্ভবেনালমলং কুজন্মনা ।
ব্রীড়া মমাভূৎকুজনপ্রসঙ্গত-
স্তজ্জন্ম ধিগ্ যো মহতামবদ্যকৃৎ ॥ ২২ ॥

ন—না; **এতেন**—এই; **দেহেন**—দেহের দ্বারা; **হরে**—শিবকে; **কৃত-আগসঃ**—অপরাধ করে; **দেহ-উদ্ভবেন**—আপনার শরীর থেকে উৎপন্ন; **অলম্-অলম্**—যথেষ্ট, যথেষ্ট; **কু-জন্মনা**—নিন্দনীয় জন্মের ফলে; **ব্রীড়া**—লজ্জা; **মম**—আমার; **অভূৎ**—হয়েছিল; **কু-জন-প্রসঙ্গতঃ**—অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ফলে; **তৎ জন্ম**—সেই জন্ম; **ধিক্**—লজ্জাকর; **যঃ**—যে; **মহতাম্**—মহাপুরুষদের; **অবদ্য-কৃৎ**—অপরাধী।

অনুবাদ

আপনি শিবের চরণ-কমলে অপরাধ করেছেন, এবং দুর্ভাগ্যবশত আমার এই শরীর আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার এই দৈহিক সম্পর্কের ফলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত। মহাপুরুষের চরণ-কমলের প্রতি অপরাধী ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ফলে, আমার এই দেহ দূষিত হয়েছে বলে আমি নিজেকে ধিক্কার দিই।

তাৎপর্য

শিব হচ্ছেন সমস্ত বিষ্ণুভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বলা হয়েছে—*বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*। *শম্ভু* বা শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। পূর্ববর্তী শ্লোকে সতী বর্ণনা করেছেন যে, শিব শুদ্ধ *বসুদেব* সত্ত্বে অবস্থিত হওয়ার ফলে সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। *বসুদেব* হচ্ছে সেই অবস্থা যার থেকে শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবের জন্ম হয়। সুতরাং শিব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এবং সতীর আচরণ আদর্শ স্বরূপ, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা তাঁর ভক্তের নিন্দা কখনই সহ্য করা উচিত নয়। শিবের সঙ্গিনী হওয়ার ফলে সতীর ক্ষোভ হয়নি, কিন্তু এই জন্য হয়েছিল যে, তাঁর দেহ শিবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী দক্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, কারণ দক্ষ থেকে তাঁর সেই শরীরের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ২৩

গোত্রং ত্বদীয়ং ভগবান্ বৃষধ্বজো
দাক্ষায়ণীত্যাহ যদা সুদুর্মনাঃ ।
ব্যপেতনর্মস্মিতমাশু তদাহহং
ব্যুৎস্রক্ষ্য এতৎকুণপং ত্বদঙ্গজম্ ॥ ২৩ ॥

গোত্রম্—পারিবারিক সম্পর্ক; **ত্বদীয়ম্**—আপনার; **ভগবান্**—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; **বৃষধ্বজঃ**—শিব; **দাক্ষায়ণী**—দাক্ষায়ণী (দক্ষের কন্যা); **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলে; **যদা**—যখন; **সুদুর্মনাঃ**—অত্যন্ত বিষণ্ণ; **ব্যপেত**—অদৃশ্য হয়ে যায়; **নর্ম-স্মিতম্**—পরিহাস এবং হাস্য; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **তদা**—তখন; **অহম্**—আমি; **বুৎস্রক্ষ্যে**—পরিত্যাগ করব; **এতৎ**—এই (শরীর); **কুণপম্**—মৃত দেহ; **তৎ-অঙ্গ জম্**—আপনার দেহ থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

শিব যখন আমাকে দাক্ষায়ণী বলে সম্বোধন করেন, তখন আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা মনে হলে, আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হই, এবং আমার আনন্দ ও হাসি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। একটি থলির মতো আমার এই দেহটি যে আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়। তাই আমি এই শরীর ত্যাগ করব।

তাৎপর্য

দাক্ষায়ণী শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'রাজা দক্ষের কন্যা'। পতি-পত্নীর মধ্যে যখন কখনও কখনও হাস্য-পরিহাস হত, তখন শিব সতীকে 'দক্ষনন্দিনী' বলে সম্বোধন করতেন, এবং সেই শব্দটি তাঁকে দক্ষের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিত বলে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হতেন, কারণ দক্ষ ছিলেন সমস্ত অপরাধের মূর্তবিগ্রহ। দক্ষ ছিলেন ঈর্ষার মূর্তিমান প্রতীক, কারণ তিনি অনর্থক শিবের মতো একজন মহাপুরুষের নিন্দা করেছিলেন *দাক্ষায়ণী* শব্দটি শোনা মাত্রই তিনি বিষণ্ণ হতেন, কারণ দক্ষের থেকে তাঁর শরীর উৎপন্ন হওয়ার ফলে তাঁর শরীরও দক্ষের সমস্ত অপরাধের প্রতীক হয়েছিল। যেহেতু তাঁর শরীর নিরন্তর অপ্রসন্নতার কারণ হয়েছিল, তাই তিনি তা ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যধ্বরে দক্ষমনূদ্য শত্রুহন্
ক্ষিতাবুদীচীং নিষসাদ শান্তবাক্ ।
স্পৃষ্ট্বা জলং পীতদুকূলসংবৃতা
নিমীল্য দৃগ্‌যোগপথং সমাবিশৎ ॥ ২৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অধ্বরে**—যজ্ঞস্থলে; **দক্ষম্**—দক্ষকে; **অনূদ্য**—বলে; **শত্রু-হন্**—হে শত্রুবিনাশকারী; **ক্ষিতৌ**—ভূমির উপর; **উদীচীম্**—উত্তরমুখী হয়ে; **নিষসাদ**—উপবিষ্ট হয়েছিলেন; **শান্ত-বাক্**—নীরবে; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করে; **জলম্**—জল; **পীত-দুকূল-সংবৃতা**—পীত বসন পরিহিতা;

নিমীল্য—নিমীলিত করে; **দৃক্**—দৃষ্টি; **যোগ-পথম্**—যৌগিক পন্থা; **সমাবিশৎ**—মগ্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বললেন—হে শত্রুসংহারক! যজ্ঞস্থলে তাঁর পিতাকে এইভাবে বলে, সতী উত্তরমুখী হয়ে ভূমিতে উপবেশন করেছিলেন। গৈরিক বসন পরিহিতা সতী তার পর জল স্পর্শ দ্বারা নিজে পবিত্র হয়ে, চক্ষু নিমীলিত করে যৌগিক পন্থায় ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কোন মানুষ যখন তাঁর শরীর ত্যাগ করতে চান, তখন তিনি গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন। তাই মনে হয় যে, সতী দক্ষ প্রদত্ত তাঁর দেহ ত্যাগ করার জন্য, তাঁর বসন পরিবর্তন করেছিলেন। দক্ষ ছিলেন সতীর পিতা, তাই দক্ষকে হত্যা করার পরিবর্তে তিনি তাঁর প্রদত্ত শরীর ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলে মনে করেছিলেন। এইভাবে তিনি যৌগিক পন্থায় দক্ষের দেওয়া শরীর ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন। সতী ছিলেন যোগীশ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর শিবের পত্নী। যেহেতু শিব যোগের সমস্ত পন্থা জানতেন, তাই মনে হয় যে, সতীও তা জানতেন। সতী হয় তাঁর পতির কাছ থেকে যোগের পন্থা শিখেছিলেন, অথবা দক্ষের মতো একজন মহান সম্রাটের কন্যা হওয়ার ফলে, তিনি সেই পন্থা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। যোগসিদ্ধির ফলে যোগী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দেহত্যাগ করতে পারেন অথবা জড় তত্ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। সিদ্ধযোগীরা প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যুর অধীন নন; এই প্রকার সিদ্ধযোগীরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে দেহত্যাগ করতে পারেন। সাধারণত যোগীরা প্রথমে দেহের অভ্যন্তরে বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং তার ফলে আত্মাকে মস্তিষ্কের উপরে নিয়ে আসেন। তার পর দেহ যখন অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হয়, তখন যোগী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে-কোন স্থানে যেতে পারেন। এই যোগপদ্ধতি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, এবং তার ফলে আধুনিক যুগে শরীরের কোষগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে তথাকথিত যোগপদ্ধতি, তার থেকে এই যোগপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃত যোগপদ্ধতিতে এক লোক থেকে আর এক লোকে অথবা এক দেহ থেকে আর এক দেহে আত্মার দেহান্তরিত হওয়ার পন্থা স্বীকার করা হয়; এবং এই ঘটনা থেকে মনে হয় যে, সতী অন্য শরীরে অথবা লোকে তাঁর আত্মাকে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

কৃত্বা সমানাবনিলৌ জিতাসনা
সৌদানমুত্থাপ্য চ নাভিচক্রতঃ ।
শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসি স্থিতং
কণ্ঠাদ্ ভ্রুবোর্মধ্যমনিন্দিতানয়ৎ ॥ ২৫ ॥

কৃত্বা—স্থাপন করে; **সমানৌ**—সাম্যাবস্থায়; **অনিলৌ**—প্রাণ এবং অপান বায়ু; **জিত-আসনা**—উপবেশনের পন্থা নিয়ন্ত্রণ করে; **সা**—সতী; **উদানম্**—উদান বায়ু; **উত্থাপ্য**—উত্তোলন করে; **চ**—এবং; **নাভি-চক্রতঃ**—নাভিচক্রের; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **স্থাপ্য**—স্থাপন করে; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **উরসি**—ফুসফুস মার্গের প্রতি; **স্থিতম্**—স্থাপন করে; **কণ্ঠাৎ**—কণ্ঠ থেকে; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূর; **মধ্যম্**—মধ্যে; **অনিন্দিতা**—নিষ্কলঙ্ক (সতী); **আনয়ৎ**—আনয়ন করেছিলেন।

অনুবাদ

প্রথমে তিনি নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে আসনে উপবেশন করেছিলেন, এবং তার পর তিনি প্রাণ বায়ুকে ঊর্ধ্বগামী করে নাভিচক্রে সাম্যাবস্থায় স্থাপন করেছিলেন। তার পর তিনি বুদ্ধি সহ প্রাণ বায়ুকে হৃদয়ে, এবং তার পর ধীরে ধীরে ফুসফুস মার্গ থেকে ভ্রূযুগলের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যৌগিক পন্থা হচ্ছে দেহের ভিতর ষট্-চক্রে বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা। বায়ুকে উদর থেকে নাভিতে, নাভি থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে কণ্ঠে, কণ্ঠ থেকে দুই ভ্রূর মধ্যে, এবং ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে মস্তিষ্কের শীর্ষভাগে উত্তোলন করা হয়। এটি হচ্ছে যোগ অভ্যাসের মূল কথা। প্রকৃত যোগ অভ্যাস করার পূর্বে যোগীকে আসনের অভ্যাস করতে হয়, কারণ তা প্রাণায়ামের দ্বারা ঊর্ধ্ব এবং নিম্নগামী বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এটি একটি মহান পদ্ধতি যা যোগের চরম সিদ্ধি লাভের জন্য অভ্যাস করতে হয়, কিন্তু এই প্রকার অভ্যাস এই যুগের জন্য নয়। এই যুগে কেউই এই প্রকার যোগের সিদ্ধি লাভ করতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ আসন করার অভ্যাস করে, যা হচ্ছে এক প্রকার শারীরিক ব্যায়াম। এই প্রকার ব্যায়ামের দ্বারা ভালভাবে রক্ত সঞ্চালন হতে পারে এবং শরীর সুস্থ

থাকতে পারে, কিন্তু কেউ যদি এই ব্যায়াম পর্যন্তই যোগ অভ্যাস সীমিত রাখে, তা হলে সে কখনই যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। কেশব-শ্রুতিতে যোগের পন্থা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, প্রাণশক্তিকে ইচ্ছা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এক দেহ থেকে আর এক দেহে অথবা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দেহকে সুস্থ রাখাই যোগ অভ্যাসের উদ্দেশ্য নয়। অধ্যাত্ম উপলব্ধির যে-কোন দিব্য প্রক্রিয়া আপনা থেকে শরীরকে সুস্থ রাখে, কারণ আত্মাই সর্বদা দেহকে সুস্থ রাখে। যে মুহূর্তে আত্মা দেহ থেকে চলে যায়, তৎক্ষণাৎ জড় দেহটি পচতে শুরু করে। যে-কোন আধ্যাত্মিক পন্থা অন্য কোন রকম প্রয়াস ব্যতীতই দেহকে সুস্থ রাখে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে, যোগ অভ্যাসের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে সুস্থ রাখা, তা হলে তিনি ভুল করছেন। যোগের প্রকৃত সিদ্ধি হচ্ছে আত্মাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করা। কোন কোন যোগী আত্মাকে উচ্চতর লোকে উন্নীত করার চেষ্টা করেন, যেখানে জীবনের মান এই লোক থেকে ভিন্ন এবং যেখানে জড় জাগতিক সুবিধা, আয়ু এবং আত্ম-উপলব্ধির অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি অধিক, এবং অন্য যোগীরা চিৎ-জগতে বৈকুণ্ঠ লোকে তাঁদের আত্মাকে উন্নীত করার চেষ্টা করেন। ভক্তিযোগের পন্থা সরাসরিভাবে আত্মাকে চিন্ময় লোকে উন্নীত করে, যেখানে জীবন নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময়; তাই ভক্তিযোগকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগপদ্ধতি বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ২৬

এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা
মুহুঃ সমারোপিতমঙ্কমাদরাৎ ।
জিহাসতী দক্ষরুষা মনস্বিনী
দধার গাত্রেষ্বনিলাগ্নিধারণাম্ ॥ ২৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ব-দেহম্**—তাঁর দেহ; **মহতাম্**—মহাত্মাদের; **মহীয়সা**—পরম পূজ্য; **মুহুঃ**—বার বার; **সমারোপিতম্**—উপবিষ্ট; **অঙ্কম্**—কোলে; **আদরাৎ**—শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে; **জিহাসতী**—ত্যাগ করার বাসনায়; **দক্ষ-রুষা**—দক্ষের প্রতি ক্রোধের ফলে; **মনস্বিনী**—স্বেচ্ছায়; **দধার**—স্থাপন করেছিলেন; **গাত্রেষু**—শরীরের অঙ্গে; **অনিল-অগ্নি-ধারণাম্**—অগ্নি এবং বায়ুর ধ্যান করে।

অনুবাদ

মহর্ষি এবং মহাত্মাদের পূজ্যতম শিব যে দেহ অত্যন্ত আদর এবং প্রীতি সহকারে তাঁর কোলে স্থাপন করতেন, তাঁর পিতা দক্ষের প্রতি ক্রোধবশত সেই দেহ ত্যাগ করার জন্য সতী তাঁর দেহের ভিতর অগ্নিময় বায়ুর ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে শিবকে সমস্ত মহাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও সতীর দেহের জন্ম হয়েছিল দক্ষ থেকে, কিন্তু শিব তাঁকে আদর করে তাঁর কোলে স্থাপন করতেন। সেটি শ্রদ্ধার একটি মহান প্রতীক বলে বিবেচনা করা হয়। এইভাবে সতীর দেহ সাধারণ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও দক্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে, সেই দেহটি তাঁর দুঃখের কারণ হয়েছিল বলে সতী তা ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন। সতীর এই কঠোর দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করা উচিত। মহাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদের সঙ্গ করার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। তাই, বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নাস্তিক এবং অভক্তদের সঙ্গ থেকে সর্বদাই দূরে থাকা উচিত, এবং ভক্তদেব সঙ্গ করাব চেষ্টা করা উচিত, কারণ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু স্থানে এই নির্দেশটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি জড় জগতেব বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে মহাত্মাদের সঙ্গ করতে হবে; আর কেউ যদি জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চান, তা হলে তিনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ করতে পাবেন। জড়-জাগতিক জীবন যৌন জীবনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই বৈদিক শাস্ত্রে স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে নিন্দা করা হয়েছে, কারণ এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে পারমার্থিক প্রগতি ব্যাহত হয়। কিন্তু, মহাপুরুষের সঙ্গ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত মহাত্মার সঙ্গ প্রভাবে মানুষ চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে। সতীদেবী দক্ষের শরীর থেকে জাত তাঁর দেহটি ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন, এবং তিনি চেয়েছিলেন অন্য আর একটি শরীরে দেহান্তরিত হতে, যাতে তিনি সম্পূর্ণ নির্মলভাবে শিবের সঙ্গে সঙ্গ করতে পারেন। নিঃসন্দেহে বোঝা গিয়েছিল যে, পরবর্তী জীবনে তিনি হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং পুনরায় শিবকে তাঁর পতিরূপে বরণ করবেন। সতী এবং শিবের সম্পর্ক নিত্য; দেহের পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁদের সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয় না।

শ্লোক ২৭

ততঃ স্বভর্তুশ্চরণাম্বুজাসবং
জগদ্গুরোশ্চিন্তয়তী ন চাপরম্ ।
দদর্শ দেহো হতকল্মষঃ সতী
সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা ॥ ২৭ ॥

ততঃ—সেখানে; **স্ব-ভর্তুঃ**—তাঁর পতির; **চরণ-অম্বুজ-আসবম্**—শ্রীপাদপদ্মের অমৃতের, **জগৎ-গুরোঃ**—সমগ্র বিশ্বের গুরু; **চিন্তয়তী**—ধ্যান করে; **ন**—না; **চ**—এবং; **অপরম্**—অন্য (তাঁর পতি ব্যতীত); **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **দেহঃ**—শরীর; **হত-কল্মষঃ**—পাপমুক্ত; **সতী**—সতী, **সদ্যঃ**—শীঘ্র; **প্রজজ্বাল**—প্রজ্বলিত; **সমাধি-জ-অগ্নিনা**—সমাধিজাত অগ্নির দ্বারা।

অনুবাদ

সতী তাঁর চেতনাকে একাগ্রীভূত করে তাঁর পতি জগদ্গুরু শিবের পবিত্র চরণ-কমলের ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত অনর্থ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং অগ্নিময় তত্ত্বের ধ্যান করে প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সতী তৎক্ষণাৎ তাঁর পতি শিবের চরণ-কমলের ধ্যান করেছিলেন, এবং শিব হচ্ছেন জড় জগতের কার্যকলাপ পরিচালনার অধ্যক্ষ তিনজন গুণাবতারের অন্যতম। কেবল তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার মাধ্যমে সতী এমন আনন্দ অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এই আনন্দ নিশ্চিতভাবে ভৌতিক ছিল, কারণ তিনি অন্য আর একটি জড় শরীর লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সেই শরীরটি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, কিভাবে ভগবদ্ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু বা কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মনকে একাগ্র করার ফলে আনন্দ উপভোগ করেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে এমনই দিব্য আনন্দ রয়েছে যে, তার ফলে ভগবানের চিন্ময় রূপ ব্যতীত অন্য আর কোন কিছুর কথাই তখন আর মনে থাকে না। সেটিই হচ্ছে যোগ সমাধির সিদ্ধি। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রকার ধ্যানের দ্বারা সতী তাঁর সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। সেই কলুষটি কি? সেই কলুষটি ছিল দক্ষ থেকে প্রাপ্ত দেহটিতে আত্মবুদ্ধি, কিন্তু সমাধিমগ্ন হয়ে তিনি সেই দৈহিক সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তার মর্মার্থ হচ্ছে যে, কেউ যখন এই জড়

জগতে দেহের সমস্ত সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাসত্বে অধিষ্ঠিত হন, তখন দিব্য আনন্দের প্রজ্বলিত অগ্নিতে জড় আসক্তিজনিত সমস্ত কলুষ দগ্ধ হয়ে যায়। বাহ্যিকভাবে এই প্রজ্বলিত অগ্নি প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় না, কারণ কেউ যদি এই জড় জগতে তাঁর দেহের সমস্ত সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়ে, তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, কথিত হয় যে, তিনি তখন যোগসমাধি বা দিব্য আনন্দের প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাঁর সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। সেটি হচ্ছে যোগের পরম সিদ্ধি। কেউ যদি এই জড় জগতে তার দৈহিক সম্পর্ক বজায় রাখে এবং সেই সঙ্গে একজন মহাযোগী হওয়ার অভিনয় করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে যোগী নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৫) বর্ণিত হয়েছে, *যৎ-কীর্তনং যৎ-স্মরণম্*। পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম-কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ, এবং পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে বন্দনা নিবেদন করার মাধ্যমেই কেবল জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়; দিব্য আনন্দরূপ জ্বলন্ত অগ্নিতে তখন জড় দেহের সমস্ত ধারণা দগ্ধীভূত হয়ে যায়। নিমেষের মধ্যে তা সংঘটিত হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, সতীর দেহত্যাগের অর্থ হচ্ছে তিনি তাঁর হৃদয়ে দক্ষের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও মন্তব্য করেছেন যে, সতী যেহেতু হচ্ছেন বহিরঙ্গা শক্তির মূর্তবিগ্রহ, তিনি যখন তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন তখন তিনি চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হননি, পক্ষান্তরে তিনি দক্ষ থেকে প্রাপ্ত দেহটির কেবল পরিবর্তন করেছিলেন। অন্যান্য ভাষ্যকারেরাও বলেছেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ভাবী মাতা মেনকার গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি দক্ষ থেকে প্রাপ্ত দেহটি পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্য আর একটি উন্নততর শরীরে দেহান্তরিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

তৎপশ্যতাং খে ভুবি চাদ্ভুতং মহদ্
হাহেতি বাদঃ সুমহানজায়ত ।
হন্ত প্রিয়া দৈবতমস্য দেবী
জহাবসূন্ কেন সতী প্রকোপিতা ॥ ২৮ ॥

তৎ—তা; **পশ্যতাম্**—যাঁরা দর্শন করেছিলেন; **খে**—আকাশে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **চ**—এবং; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **মহৎ**—অত্যন্ত; **হা হা**—হাহাকার; **ইতি**—

এইভাবে; **বাদঃ**—আর্তনাদ; **সু-মহান্**—অতি উচ্চ; **অজায়ত**—হয়েছিল; **হন্ত**—হায়; **প্রিয়া**—প্রিয়তমা; **দৈব-তমস্য**—পূজ্যতম দেবতা (শিব); **দেবী**—সতী; **জহৌ**—ত্যাগ করেছিলেন; **অসূন্**—প্রাণ; **কেন**—দক্ষের দ্বারা; **সতী**—সতী; **প্রকোপিতা**—ক্রুদ্ধা হয়ে।

অনুবাদ

সতী যখন ক্রোধবশে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন, তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এক সুমহান হা হা রব সমুত্থিত হয়েছিল। সকলেই বলতে লাগলেন—হায়! পূজ্যতম দেবতা শিবের পত্নী সতী কেন এইভাবে দেহত্যাগ করলেন?

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে দেবতারা হাহাকার করেছিলেন, কারণ সতী ছিলেন রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দক্ষের কন্যা এবং সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিবের পত্নী। তিনি কেন এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, যার ফলে এইভাবে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন? যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মহান ব্যক্তির কন্যা এবং একজন মহাপুরুষের পত্নী, তাই তাঁর কোন বাসনাই অপূর্ণ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। সেটি অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায় না। দক্ষ ছিলেন তাঁর পিতা এবং দেবাদিদেব মহাদেব ছিলেন তাঁর পতি, তাই সতীর পক্ষে অপ্রাপ্য কিছুই ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও, কোন না কোন কারণে তিনি অতৃপ্ত ছিলেন। তাই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মানুষকে প্রকৃত সন্তোষ লাভ করতে হয় *(যয়াত্মাসুপ্রসীদতি)*, কিন্তু *আত্মা* অর্থাৎ শরীর, মন এবং আত্মা সবই সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয় যখন কেবল পরমতত্ত্বের প্রতি ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়। *স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।* *অধোক্ষজ* মানে হচ্ছে পরম তত্ত্ব। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর অনন্য প্রেম বিকশিত করতে পারেন, তাই কেবল পূর্ণ সন্তোষ প্রদান করতে পারে, অন্যথায় এই জড় জগতে অথবা অন্য কোথাও পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ২৯

অহো অনাত্ম্যং মহদস্য পশ্যত
প্রজাপতের্যস্য চরাচরং প্রজাঃ।
জহাবসূন্ যদ্বিমতাত্মজা সতী
মনস্বিনী মানমভীক্ষ্ণমর্হতি ॥ ২৯ ॥

অহো—আহা; **অনাত্ম্যম্**—অবহেলা; **মহৎ**—অত্যন্ত; **অস্য**—দক্ষের; **পশ্যত**—দেখ, **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির; **যস্য**—যাঁর; **চর-অচরম্**—সমস্ত জীব; **প্রজাঃ**—সন্তান; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছে; **অসূন্**—তাঁর দেহ; **যৎ**—যার দ্বারা; **বিমতা**—অনাদৃত; **আত্ম-জা**—স্বীয় কন্যা; **সতী**—সতী; **মনস্বিনী**—স্বেচ্ছায়; **মানম্**—সম্মান; **অভীক্ষ্ণম্**—বারংবার; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রজাপতি দক্ষ, যিনি সমস্ত জীবের পালনকর্তা, তিনি তাঁর অতি সাধ্বী এবং মনস্বিনী কন্যা সতীর প্রতি এত অনাদর করেছিলেন যে, তাঁর সেই অবজ্ঞার ফলে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে *অনাত্ম্য* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *আত্ম্য* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আত্মার জীবন', অতএব এই শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, যদিও দক্ষকে জীবিত বলে মনে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মৃত, তা না হলে কিভাবে তিনি তাঁর স্বীয় কন্যা সতীকে অবহেলা করেছিলেন? দক্ষের কর্তব্য ছিল সমস্ত জীবের পালন এবং সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করা, কারণ তিনি প্রজাপতির পদে আসীন ছিলেন। যে কন্যাটি সমস্ত সাধ্বী রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং একজন মনস্বিনী, এবং তাই তাঁর পিতার কাছ থেকে সব চাইতে বেশি আদর পাওয়ার পাত্রী, কেমন করে তিনি তাঁর সেই কন্যাটিকে অবহেলা করেছিলেন? তাঁর পিতা দক্ষের উপেক্ষার ফলে সতীর মৃত্যু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহান দেবতাদের কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল।

শ্লোক ৩০

সোঽয়ং দুর্মর্ষহৃদয়ো ব্রহ্মধ্রুক্ চ
লোকেঽপকীর্তিং মহতীমবাপ্স্যতি ।
যদঙ্গজাং স্বাং পুরুষদ্বিড়ুদ্যতাং
ন প্রত্যষেধন্মৃতয়েঽপরাধতঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ—তিনি; **অয়ম্**—সেই; **দুর্মর্ষ-হৃদয়ঃ**—কঠোর হৃদয়; **ব্রহ্ম-ধ্রুক্**—ব্রাহ্মণ হওয়ার অযোগ্য; **চ**—এবং; **লোকে**—জগতে; **অপকীর্তিম্**—অপযশ; **মহতীম্**—অত্যন্ত, **অবাপ্স্যতি**—প্রাপ্ত হবে; **যৎ-অঙ্গ-জাম্**—তাঁর কন্যা; **স্বাম্**—নিজের; **পুরুষ-দ্বিট্**—শিবের শত্রু, **উদ্যতাম্**—উদ্যত; **ন-প্রত্যষেধৎ**—নিবারণ করেননি; **মৃতয়ে**—মৃত্যুর জন্য; **অপরাধতঃ**—তাঁর অপরাধের ফলে।

অনুবাদ

দক্ষ এতই কঠোর হৃদয় যে, তিনি ব্রাহ্মণ হওয়ার অযোগ্য। তাঁর কন্যাকে দেহত্যাগ থেকে নিবারণ না করার ফলে কন্যার প্রতি অপরাধের জন্য, এবং ভগবান শিবের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ করার ফলে, তাঁর অশেষ অপযশ লাভ হবে।

তাৎপর্য

এখানে দক্ষকে অত্যন্ত কঠোর হৃদয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ হওয়ার অযোগ্য। কোন কোন ভাষ্যকার *ব্রহ্ম-ধ্রুক্* শব্দটির অর্থ *ব্রহ্ম-বন্ধু* বলে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু যার ব্রাহ্মণোচিত গুণ নেই, তাকে বলা হয় *ব্রহ্ম-বন্ধু*। ব্রাহ্মণেরা সাধারণত অত্যন্ত কোমল হৃদয় এবং সহনশীল, কারণ তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে দমন করার ক্ষমতা রয়েছে। দক্ষ কিন্তু একেবারেই সহিষ্ণু ছিলেন না। তাঁর জামাতা শিব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান না করার মতো একটি অতি তুচ্ছ কারণে তিনি এত ক্রুদ্ধ এবং কঠোর হৃদয় হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রিয়তম কন্যাকে দেহত্যাগ করতে দেখেও নিবারণ করেননি। শ্বশুর এবং জামাতার বিরোধের মীমাংসা করার জন্য সতী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, নিমন্ত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পিতার গৃহে এসেছিলেন, এবং দক্ষের উচিত ছিল পূর্বের সমস্ত বিরোধ ভুলে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো। কিন্তু তিনি এতই কঠোর হৃদয় ছিলেন যে, তিনি আর্য বা ব্রাহ্মণ উপাধির অযোগ্য ছিলেন। তাই তাঁর অপযশ আজও ঘোষিত হচ্ছে। দক্ষ মানে 'পটু', এবং শত-সহস্র সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করার ক্ষমতার জন্য তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। যে সমস্ত মানুষ যৌন জীবনের প্রতি এবং জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা এতই কঠোর হৃদয় হয়ে যায় যে, তাদের সম্মানের অল্প একটু হানিও তারা সহ্য করতে পারে না, সেই জন্য যদি তাদের সন্তানের মৃত্যুও হয়, তাতেও তারা ভ্রূক্ষেপ করে না।

শ্লোক ৩১

বদত্যেবং জনে সত্যা দৃষ্ট্বাসুত্যাগমদ্ভুতম্ ।
দক্ষং তৎপার্ষদা হন্তুমুদতিষ্ঠন্নুদায়ুধাঃ ॥ ৩১ ॥

বদতি—বলছিল; **এবম্**—এইভাবে; **জনে**—মানুষেরা যখন; **সত্যাঃ**—সতীর; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অসু-ত্যাগম্**—মৃত্যু; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **দক্ষম্**—দক্ষ; **তৎ-**

পার্ষদাঃ—শিবের পার্ষদেরা; **হন্তুম্**—হত্যা করার জন্য; **উদতিষ্ঠন্**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **উদায়ুধাঃ**—অস্ত্র উত্তোলন করে।

অনুবাদ

সতীর এই আশ্চর্যজনক স্বেচ্ছা মৃত্যুতে যখন সকলে এইভাবে কথা বলছিলেন, তখন সতীর সঙ্গে শিবের যে-সমস্ত অনুচরেরা এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দক্ষকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সতীর সঙ্গে যে সমস্ত পার্ষদেরা এসেছিলেন, তাঁদের কর্তব্য ছিল সমস্ত বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করা, কিন্তু যেহেতু তাঁরা তাঁদের প্রভুর পত্নীকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছিলেন, তাই তাঁরা তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করতে মনস্থ করেছিলেন, এবং মৃত্যুবরণ করার পূর্বে তাঁরা দক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। অনুচরদের কর্তব্য হচ্ছে প্রভুকে রক্ষা করা, এবং তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে তাঁদের মৃত্যুবরণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩২

তেষামাপততাং বেগং নিশাম্য ভগবান্ ভৃগুঃ ।
যজ্ঞঘ্নঘ্নেন যজুষা দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব হ ॥ ৩২ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **আপততাম্**—যারা এগিয়ে আসছিল; **বেগম্**—প্রবল বেগে, **নিশাম্য**—দর্শন করে; **ভগবান্**—সমগ্র ঐশ্বর্যশালী; **ভৃগুঃ**—ভৃগু মুনি; **যজ্ঞ-ঘ্ন-ঘ্নেন**—যজ্ঞ-পণ্ডকারীদের বিনাশ করার জন্য; **যজুষা**—যজুর্বেদীয় মন্ত্রের দ্বারা; **দক্ষিণ-অগ্নৌ**—দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে, **জুহাব**—আহুতি প্রদান করেছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

তাদের প্রবল বেগে আসতে দেখে, ভৃগু মুনি বিপদ আশঙ্কা করে, যজ্ঞ-বিনাশকারীদের অচিরে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ যজুর্বেদীয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে বৈদিক মন্ত্রের আশ্চর্যজনক শক্তির একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বর্তমান কলিযুগে সুদক্ষ মন্ত্র-উচ্চারণকারী ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না; তাই বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান

এই যুগে নিষিদ্ধ হয়েছে। এই যুগের একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ সংকীর্তন যজ্ঞ, কারণ এই যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত বস্তুর আবশ্যকতা হয়, সেইগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, এবং যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণে দক্ষ ব্রাহ্মণ পাওয়া তো আরও কঠিন।

শ্লোক ৩৩

অথর্বর্যুণা হূয়মানে দেবা উৎপেতুরোজসা ।
ঋভবো নাম তপসা সোমং প্রাপ্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৩ ॥

অথর্বর্যুণা—পুরোহিত ভৃগুর দ্বারা; **হূয়মানে**—আহুতি নিবেদন করা হলে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **উৎপেতুঃ**—প্রকট হয়েছিলেন; **ওজসা**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ঋভবঃ**—ঋভুগণ; **নাম**—নামক; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **সোমম্**—সোম; **প্রাপ্তাঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

ভৃগু মুনি যখন যজ্ঞে আহুতি দিলেন, তৎক্ষণাৎ ঋভু নামক হাজার হাজার দেবতা প্রকট হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং তাঁরা সোম অর্থাৎ চন্দ্রদেব থেকে তাঁদের শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করার ফলে, ঋভু নামক হাজার হাজার দেবতা প্রকট হয়েছিলেন। ভৃগু মুনির মতো ব্রাহ্মণেরা এত শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা এই প্রকার শক্তিশালী দেবতাদের সৃষ্টি করতে পারতেন। বৈদিক মন্ত্র এখনও সুলভ, কিন্তু সেই মন্ত্র উচ্চারণ করার মতো ব্যক্তি নেই। বৈদিক মন্ত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র বা ঋগ্ মন্ত্র উচ্চারণের ফলে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায়। এই কলিযুগে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সর্বসিদ্ধি লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৪

তৈরলাতায়ুধৈঃ সর্বে প্রমথাঃ সহগুহ্যকাঃ ।
হন্যমানা দিশো ভেজুরুশদ্ভির্ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৪ ॥

তৈঃ—তাঁদের দ্বারা; **অলাত-আয়ুধৈঃ**—জ্বলন্ত কাষ্ঠরূপ অস্ত্র সহ; **সর্বে**—সকলে; **প্রমথাঃ**—ভূত; **সহ-গুহ্যকাঃ**—গুহ্যকগণ সহ; **হন্যমানাঃ**—আক্রান্ত হয়ে; **দিশঃ**—বিভিন্ন দিক থেকে; **ভেজুঃ**—পলায়ন করেছিল; **উশদ্ভিঃ**—দেদীপ্যমান; **ব্রহ্ম-তেজসা**—ব্রহ্মতেজের দ্বারা।

অনুবাদ

ঋভু দেবতারা যখন যজ্ঞাগ্নি থেকে জ্বলন্ত সমিধ্ নিয়ে ভূত এবং গুহ্যকদের আক্রমণ করেছিলেন, তখন সতীর সেই সমস্ত অনুচরেরা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেছিলেন। তা সম্ভব হয়েছিল কেবল ব্রহ্মতেজের জন্য।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ব্যবহৃত *ব্রহ্মতেজসা* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণেরা এত শক্তিশালী ছিলেন যে, কেবল ইচ্ছার দ্বারা এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা তাঁরা আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান অধঃপতিত যুগে সেই প্রকার ব্রাহ্মণ নেই। *পাঞ্চরাত্রিক* পদ্ধতি অনুসারে, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে, এই যুগের সমগ্র জনসাধারণ শূদ্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ঙ্গম করার লক্ষণ প্রদর্শন করেন, তা হলে বৈষ্ণব স্মৃতির বিধান অনুসারে, তাঁকে একজন সম্ভাব্য ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে এবং সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য তাঁকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাবদান্য উপহার হচ্ছে যে, এই অধঃপতিত যুগেও কেউ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করেন, যা আত্ম-উপলব্ধির সমস্ত কার্যকলাপের সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম, তা হলে তিনি মানুষ জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'সতীর দেহত্যাগ' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষযজ্ঞ নাশ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ভবো ভবান্যা নিধনং প্রজাপতে-
রসংকৃতায়া অবগম্য নারদাৎ ।
স্বপার্ষদসৈন্যং চ তদধ্বরর্ভুভি-
র্বিদ্রাবিতং ক্রোধমপারমাদধে ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ভবঃ**—শিব; **ভবান্যাঃ**—সতীর; **নিধনম্**—মৃত্যু; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতি দক্ষের কারণে; **অসৎ-কৃতায়াঃ**—অপমানিতা হয়ে; **অবগম্য**—শুনে; **নারদাৎ**—নারদের কাছ থেকে; **স্ব-পার্ষদ-সৈন্যম্**—তাঁর পার্ষদদের সৈন্যগণ; **চ**—এবং; **তৎ-অধ্বর**—তাঁর (দক্ষের) যজ্ঞ থেকে (উৎপন্ন); **ঋভুভিঃ**—ঋভুদের দ্বারা; **বিদ্রাবিতম্**—বিতাড়িত করেছে; **ক্রোধম্**—ক্রোধ; **অপারম্**—অসীম; **আদধে**—প্রদর্শন করেছেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—শিব যখন নারদের কাছ থেকে শুনলেন যে, তাঁর পত্নী সতী প্রজাপতি দক্ষের দ্বারা অপমানিতা হওয়ার ফলে দেহত্যাগ করেছেন এবং তাঁর সৈন্যরা ঋভু দেবতাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শিব বুঝতে পেরেছিলেন যে, দক্ষের সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা হওয়ার ফলে, সতী শিবের শুদ্ধতা প্রমাণ করতে পারবেন এবং তার ফলে দক্ষ এবং তাঁর মধ্যে মনোমালিন্যের মীমাংসা হবে। কিন্তু সেই মীমাংসা হয়নি। পক্ষান্তরে, সতী অনাহূতা হয়ে তাঁর পিতৃগৃহে গিয়ে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা না পেয়ে তাঁর পিতা কর্তৃক অপমানিতা

হয়েছিলেন। সতী নিজেই তাঁর পিতা দক্ষকে বধ করতে পারতেন, কারণ তিনি হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির মূর্ত প্রকাশ, এবং এই জড় জগতে সৃষ্টি এবং ধ্বংস করার অসীম শক্তি তাঁর রয়েছে। তাঁর শক্তির বর্ণনা করে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে— তিনি বহু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এবং ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এত শক্তিশালিনী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছায়ারূপে তাঁর নির্দেশনায় কার্য করেন। তাঁর পিতাকে দণ্ড দেওয়া সতীর পক্ষে কোন কঠিন কাজ ছিল না, কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে, যেহেতু তিনি তাঁর কন্যা, তাই তাঁর পক্ষে তাঁকে বধ করা উচিত নয়। তাই তিনি তাঁর নিজের দেহ ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন, যা তিনি দক্ষের থেকে লাভ করেছিলেন সতীকে এইভাবে দেহত্যাগ করতে উদ্যত দেখেও দক্ষ তাঁকে নিরস্ত করবার কোন চেষ্টা করেননি।

সতী যখন দেহত্যাগ করেন, তখন সেই সংবাদ নারদ শিবকে দেন। নারদ মুনি সর্বদাই এই প্রকার ঘটনার সংবাদ বহন করেন, কারণ তিনি এর গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত। শিব যখন জানতে পারেন যে, তাঁর সাধ্বী পত্নী সতী দেহত্যাগ করেছেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি এও জানতে পেরেছিলেন যে, ভৃগু মুনি যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে ঋভু দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত তাঁর সমস্ত সৈন্যদের বিতাড়িত করেছে। তাই তিনি এই অপমানের প্রত্যুত্তর দিতে মনস্থ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি দক্ষকে বধ করবেন বলে স্থির করেছিলেন, কেননা দক্ষই ছিল সতীর মৃত্যুর কারণ।

শ্লোক ২

ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জটি-
র্জটাং তড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্ ।
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্
গম্ভীরনাদো বিসসর্জ তাং ভুবি ॥ ২ ॥

ক্রুদ্ধঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **সু-দষ্ট-ওষ্ঠ-পুটঃ**—দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে; **সঃ**—তিনি (শিব); **ধূঃ-জটিঃ**—মস্তকে জটা-সমন্বিত; **জটাম্**—এক গুচ্ছ চুল; **তড়িৎ**—বিদ্যুতের; **বহ্নি**—অগ্নির; **সটা**—অগ্নিশিখা; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **রোচিষম্**—প্রজ্বলিত; **উৎকৃত্য**—উৎপাটন করে; **রুদ্রঃ**—শিব; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থিতঃ**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **হসন্**—হেসে; **গম্ভীর**—গভীর; **নাদঃ**—ধ্বনি, **বিসসর্জ**—নিক্ষেপ করেছিলেন; **তাম্**—সেই (চুল); **ভুবি**—ভূমিতে।

অনুবাদ

শিব তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অধর দংশন করেছিলেন এবং তড়িৎ ও বহ্নিশিখার মতো দীপ্তিশালী এক গুচ্ছ চুল তাঁর মস্তক থেকে উৎপাটন করলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করে গম্ভীর শব্দে অট্টহাস্য করতে করতে সেই জটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন।

শ্লোক ৩

ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্দিবং
সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ ত্রিসূর্যদৃক্ ।
করালদংষ্ট্রো জ্বলদগ্নিমূর্ধজঃ
কপালমালী বিবিধোদ্যতায়ুধঃ ॥ ৩ ॥

ততঃ—সেই সময়; **অতিকায়ঃ**—এক বিশালকায় পুরুষ (বীরভদ্র); **তনুবা**—তাঁর দেহের দ্বারা; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **দিবম্**—আকাশ; **সহস্র**—এক হাজার; **বাহুঃ**—হাত; **ঘন-রুক্**—কৃষ্ণবর্ণ; **ত্রি-সূর্য-দৃক্**—তিনটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল; **করাল-দংষ্ট্রঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দন্ত-সমন্বিত; **জ্বলৎ-অগ্নি**—প্রজ্বলিত অগ্নির মতো; **মূর্ধজঃ**—মস্তকে কেশ-সমন্বিত; **কপাল-মালী**—নরমুণ্ডমালা পরিহিত; **বিবিধ**—বিভিন্ন প্রকার; **উদ্যত**—উদ্যত; **আয়ুধঃ**—অস্ত্রশস্ত্র।

অনুবাদ

তখন আকাশের মতো উঁচু এবং তিনটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক ভয়ঙ্কর শ্যামবর্ণ অসুরের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর দাঁতগুলি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তাঁর মাথার কেশরাশি ছিল জ্বলন্ত অগ্নির মতো। বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রধারী সহস্র বাহু-সমন্বিত তাঁর গলায় ছিল নরমুণ্ডের মালা।

শ্লোক ৪

তং কিং করোমীতি গৃণন্তমাহ
বদ্ধাঞ্জলিং ভগবান্ ভূতনাথঃ ।
দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্ভটানাং
ত্বমগ্রণী রুদ্র ভটাংশকো মে ॥ ৪ ॥

তম্—তাঁকে (বীরভদ্র); **কিম্**—কি; **করোমি**—করব; **ইতি**—এইভাবে; **গৃণন্তম্**—জিজ্ঞাসা করে; **আহ**—আদেশ করেছিলেন; **বদ্ধ-অঞ্জলিম্**—কৃতাঞ্জলিপুটে; **ভগবান্**—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর (শিব); **ভূত-নাথঃ**—ভূতদের ঈশ্বর; **দক্ষম্**—দক্ষকে; **স-যজ্ঞম্**—তাঁর যজ্ঞ সহ; **জহি**—হত্যা কর; **মৎ-ভটানাম্**—আমার সমস্ত পার্ষদদের; **ত্বম্**—তুমি; **অগ্রণীঃ**—মুখ্য; **রুদ্র**—হে রুদ্র; **ভট**—হে রণকুশল; **অংশকঃ**—আমার দেহ থেকে উৎপন্ন; **মে**—আমার।

অনুবাদ

সেই মহাকায় অসুর যখন কৃতাঞ্জলিপুটে শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে প্রভু, এখন আমি কি করব?" তখনই ভূতনাথ শিব তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন, "যেহেতু তুমি আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তাই তুমি হচ্ছ আমার সমস্ত পার্ষদদের অধিনায়ক। অতএব, যজ্ঞস্থলে গিয়ে তুমি দক্ষ এবং তার সৈনিকদের সংহার কর।"

তাৎপর্য

এখানে *ব্রহ্ম তেজ* এবং *শিব-তেজের* মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। ব্রহ্ম-তেজের দ্বারা ভৃগু মুনি ঋভু দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা সেই যজ্ঞস্থল থেকে শিবের সৈনিকদের বিতাড়িত করেছিলেন। শিব যখন জানতে পারেন যে, তাঁর সৈনিকেরা বিতাড়িত হয়েছে, তখন তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি বিশালকায়, কৃষ্ণবর্ণ বীরভদ্র অসুরকে সৃষ্টি করেছিলেন। কখনও কখনও সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। সেটি হচ্ছে সংসারের রীতি। কেউ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলেও তা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা মিশ্রিত অথবা আক্রান্ত হওয়া সম্ভব। সেটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতির নিয়ম। যদিও সত্ত্ব হচ্ছে চিৎ-জগতের মূলীভূত তত্ত্ব, কিন্তু এই জড় জগতে সত্ত্বগুণের শুদ্ধ প্রকাশ সম্ভব নয়। তার ফলে বিভিন্ন গুণের মধ্যে সংঘর্ষ সর্বদাই হতে থাকে। প্রজাপতি দক্ষকে কেন্দ্র করে শিব এবং ভৃগু মুনির মধ্যে এই যে সংঘর্ষ, তা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মধ্যে প্রতিযোগিতার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৫

আজ্ঞপ্ত এবং কুপিতেন মন্যুনা
স দেবদেবং পরিচক্রমে বিভুম্ ।
মেনে তদাত্মানমসঙ্গরংহসা
মহীয়সাং তাত সহঃ সহিষ্ণুম্ ॥ ৫ ॥

আজ্ঞপ্তঃ—আদিষ্ট হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **কুপিতেন**—ক্রুদ্ধ; **মন্যুনা**—শিবের দ্বারা (যিনি হচ্ছেন মূর্তিমান ক্রোধ); **সঃ**—তিনি (বীরভদ্র); **দেব-দেবম্**—যিনি দেবতাদের দ্বারা পূজিত; **পরিচক্রমে**—পরিক্রমা করেছিলেন; **বিভুম্**—শিবকে; **মেনে**—বিবেচনা করেছিলেন; **তদা**—তখন; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অসঙ্গ-রংহসা**—শিবের অপ্রতিহত শক্তির দ্বারা; **মহীয়সাম্**—অত্যন্ত শক্তিশালীর; **তাত**—হে বিদুর; **সহঃ**—শক্তি; **সহিষ্ণুম্**—সহ্য করতে সমর্থ।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর। সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের ক্রোধের মূর্তিমান প্রকাশ, এবং তিনি শিবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন। এইভাবে, তিনি যে-কোন বিরোধী শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে নিজেকে সমর্থ বলে মনে করে শিবকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

অন্বীয়মানঃ স তু রুদ্রপার্ষদৈ-
র্ভৃশং নদদ্ভির্ব্যনদৎসুভৈরবম্ ।
উদ্যম্য শূলং জগদন্তকান্তকং
সম্প্রাদ্রবদ্ ঘোষণভূষণাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বীয়মানঃ—যাঁকে অনুসরণ করা হয়েছিল; **সঃ**—তিনি (বীরভদ্র); **তু**—কিন্তু; **রুদ্র-পার্ষদৈঃ**—শিবের সৈনিকদের দ্বারা; **ভৃশম্**—ভয়ঙ্কর, **নদদ্ভিঃ**—গর্জন করে; **ব্যনদৎ**—শব্দ করেছিল; **সু-ভৈরবম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **উদ্যম্য**—বহন করে; **শূলম্**—ত্রিশূল; **জগৎ-অন্তক**—মৃত্যু; **অন্তকম্**—সংহার করে; **সম্প্রাদ্রবৎ**—অতি বেগে (দক্ষের যজ্ঞাভিমুখে) ধাবিত হয়েছিলেন; **ঘোষণ**—গর্জন করতে করতে; **ভূষণ-অঙ্ঘ্রিঃ**—পায়ে নূপুর পরে।

অনুবাদ

প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে শিবের অন্য বহু সৈনিকেরা সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে লাগল। তাঁর হাতে ছিল এক বিশাল ত্রিশূল, যা মৃত্যুকে পর্যন্ত বধ করতে সমর্থ ছিল, এবং তাঁর পদক্ষেপের ফলে তাঁর পায়ের নূপুরগুলিও যেন গর্জন করছিল।

শ্লোক ৭

অথর্ত্বিজো যজমানঃ সদস্যাঃ
ককুভ্যুদীচ্যাং প্রসমীক্ষ্য রেণুম্ ।
তমঃ কিমেতৎকুত এতদ্রজোঽভূ-
দিতি দ্বিজা দ্বিজপত্ন্যশ্চ দধ্যুঃ ॥ ৭ ॥

অথ—সেই সময়; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **যজমানঃ**—প্রধান যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারী (দক্ষ); **সদস্যাঃ**—যজ্ঞস্থলে সমবেত সমস্ত ব্যক্তিগণ; **ককুভি উদীচ্যাম্**—উত্তর দিকে; **প্রসমীক্ষ্য**—দর্শন করে; **রেণুম্**—ধূলির ঝড়; **তমঃ**—অন্ধকার; **কিম্**—কি, **এতৎ**—এই; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **এতৎ**—এই; **রজঃ**—ধূলি; **অভূৎ**—এসেছে; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **দ্বিজ-পত্ন্যঃ**—ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ; **চ**—এবং; **দধ্যুঃ**—অনুমান করতে শুরু করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন, সেই যজ্ঞে উপস্থিত পুরোহিত, যজমান, ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের পত্নীরা সকলে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই অন্ধকার এল কোথা থেকে। তার পর তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল একটি ধূলির ঝড়, এবং তখন তাঁরা সকলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

বাতা ন বান্তি ন হি সন্তি দস্যবঃ
প্রাচীনবর্হির্জীবতি হোগ্রদণ্ডঃ ।
গাবো ন কাল্যন্ত ইদং কুতো রজো
লোকোঽধুনা কিং প্রলয়ায় কল্পতে ॥ ৮ ॥

বাতাঃ—বায়ু; **ন বান্তি**—প্রবাহিত হচ্ছে না; **ন**—না; **হি**—কারণ; **সন্তি**—সম্ভব; **দস্যবঃ**—দস্যুগণ; **প্রাচীন-বর্হিঃ**—প্রাচীন রাজা বর্হি; **জীবতি**—জীবিত রয়েছেন; **হ**—তা সত্ত্বেও; **উগ্র-দণ্ডঃ**—যিনি কঠোরভাবে দণ্ড দেবেন; **গাবঃ**—গাভীগণ; **ন কাল্যন্তে**—তাড়না করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না; **ইদম্**—এই; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **রজঃ**—ধূলি; **লোকঃ**—গ্রহলোক; **অধুনা**—এখন; **কিম্**—কি; **প্রলয়ায়**—প্রলয়ের জন্য; **কল্পতে**—আসন্ন বলে মনে করতে হবে।

অনুবাদ

সেই ঝড়ের কারণ সম্বন্ধে অনুমান করে তাঁরা বলেছিলেন—বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে না, কেউ গাভীর পাল তাড়না করেও নিয়ে যাচ্ছে না, দস্যুদের দৌরাত্ম্যের ফলেও এই ঝড় সম্ভব নয়, কারণ এখনও প্রবল পরাক্রমশালী রাজা বর্হি তাদের দণ্ড দেওয়ার জন্য জীবিত রয়েছেন। তা হলে এই ধূলির ঝড় সমুত্থিত হচ্ছে কোথা থেকে? তা হলে কি এই গ্রহের প্রলয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রাচীন-বর্হি জীবতি* বাক্যাংশটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সেই ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন বর্হি, এবং বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তখনও জীবিত ছিলেন, এবং তিনি ছিলেন একজন মহাপরাক্রমশালী শাসক। তাই দস্যু-তস্করদের আক্রমণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। পরোক্ষভাবে এখানে বলা হয়েছে যে, যে-রাজ্যে শক্তিশালী শাসক নেই, সেখানেই দস্যু, তস্কর এবং অবাঞ্ছিত জনগণ থাকতে পারে। যখন ন্যায়ের নামে চোরদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখনই এই প্রকার দস্যু এবং অবাঞ্ছিত জনগণ রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে। শিবের সৈনিক এবং অনুচরেরা যে রকম ধূলির ঝড় সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে তখনকার অবস্থা এই বিশ্বের প্রলয়কালীন অবস্থার মতো হয়েছিল। যখন সৃষ্টির বিনাশের প্রয়োজন হয়, তখন শিব সেই কার্যটি সম্পাদন করেন। তাই, তখন তাঁর দ্বারা যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা জগতের প্রলয়কালীন অবস্থার মতো হয়েছিল।

শ্লোক ৯

প্রসূতিমিশ্রাঃ স্ত্রিয় উদ্বিগ্নচিত্তা
উচুর্বিপাকো বৃজিনস্যৈব তস্য ।
যৎপশ্যন্তীনাং দুহিতৄণাং প্রজেশঃ
সুতাং সতীমবদধ্যাবনাগাম্ ॥ ৯ ॥

প্রসূতি-মিশ্রাঃ—প্রসূতি আদি; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **উদ্বিগ্ন-চিত্তাঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে; **উচুঃ**—বলেছিলেন; **বিপাকঃ**—কুফল; **বৃজিনস্য**—পাপকর্মের; **এব**—বাস্তবিকপক্ষে; **তস্য**—তাঁর (দক্ষের); **যৎ**—যেহেতু; **পশ্যন্তীনাম্**—সমক্ষে; **দুহিতৄণাম্**—তাঁর ভগিনীদের; **প্রজেশঃ**—প্রজাপতি (দক্ষ); **সুতাম্**—তাঁর কন্যাকে; **সতীম্**—সতীকে; **অবদধ্যৌ**—অপমান করেছেন; **অনাগাম্**—সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ।

অনুবাদ

দক্ষের পত্নী প্রসূতি এবং সেখানে সমবেত অন্য সমস্ত স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন—প্রজাপতি দক্ষ নিরপরাধ সতীকে অবজ্ঞা করার ফলে, সতী যে তাঁর ভগিনীদের সমক্ষে দেহত্যাগ করেছেন, সেই পাপেরই ফলে এই সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে।

তাৎপর্য

কোমল হৃদয়সম্পন্না প্রসূতি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কঠোর হৃদয় প্রজাপতি দক্ষের পাপকর্মের ফলেই সেই আসন্ন বিপদ উপস্থিত হয়েছিল। দক্ষ এতই নিষ্ঠুর ছিলেন যে, তিনি তাঁর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সতীকে তাঁর ভগিনীদের সমক্ষে আত্মহত্যা করা থেকে রক্ষা করেননি। সতীর মা বুঝতে পেরেছিলেন সতী তাঁর পিতা কর্তৃক অপমানিত হয়ে কত গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। সতী দক্ষের অন্যান্য কন্যাদের সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু দক্ষ ইচ্ছা করে সতীকে ছাড়া আর সকলকে সম্ভাষণ করেছিলেন। সতীর প্রতি তাঁর এই অবজ্ঞার কারণ হচ্ছে, সতী ছিলেন শিবের পত্নী। সেই কথা বিবেচনা করে দক্ষের পত্নী স্থির নিশ্চিতরূপে সেই আসন্ন সঙ্কটের কারণ উপলব্ধি করেছিলেন, এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই জঘন্য কার্যের জন্য দক্ষকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

শ্লোক ১০

যস্ত্বন্তকালে ব্যুপ্তজটাকলাপঃ
স্বশূলসূচ্যর্পিতদিগ্‌গজেন্দ্রঃ ।
বিতত্য নৃত্যত্যুদিতাস্ত্রদোর্ধ্বজা-
নুচ্চাট্টহাসস্তনয়িত্নুভিন্নদিক্ ॥ ১০ ॥

যঃ—যিনি (শিব); **তু**—কিন্তু; **অন্ত-কালে**—প্রলয়ের সময়; **ব্যুপ্ত**—বিকীর্ণ করে; **জটা-কলাপঃ**—জটাজুট; **স্ব-শূল**—তাঁর ত্রিশূল; **সূচি**—অগ্রভাগে; **অর্পিত**—বিদ্ধ; **দিক্-গজেন্দ্রঃ**—দিক্‌সমূহের শাসক গজেন্দ্র; **বিতত্য**—বিক্ষিপ্ত করে; **নৃত্যতি**—নৃত্য করে; **উদিত**—উত্তোলিত; **অস্ত্র**—অস্ত্রশস্ত্র; **দোঃ**—বাহু; **ধ্বজান্**—পতাকা; **উচ্চ**—উচ্চস্বরে; **অট্ট-হাস**—অট্টহাস্য; **স্তনয়িত্নু**—প্রচণ্ড গর্জনের দ্বারা; **ভিন্ন**—বিভক্ত; **দিক্**—দিকমণ্ডল।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময়, শিবের জটাকলাপ বিক্ষিপ্ত হয়, এবং তিনি তাঁর ত্রিশূলের দ্বারা দিক্‌-গজেন্দ্রদের বিদ্ধ করেন। বজ্র যেমন মেঘসমূহকে সর্বত্র বিক্ষিপ্ত করে, তেমনভাবেই তাঁর বাহুরূপ ধ্বজাসমূহ বিস্তার করে তিনি অট্টহাস্য করতে করতে নৃত্য করেন।

তাৎপর্য

প্রসূতি, যিনি তাঁর জামাতা শিবের শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তিনি এখানে বর্ণনা করছেন যে, প্রলয়ের সময় শিব কি করেন। এই বর্ণনা ইঙ্গিত করে যে, শিব এমনই মহান শক্তিশালী, তাঁর সঙ্গে দক্ষের কোন তুলনাই হয় না। প্রলয়ের সময় শিব ত্রিশূল হস্তে বিভিন্ন গ্রহাদির দিকপালদের উপর নৃত্য করেন এবং তখন নিরন্তর বর্ষণের দ্বারা গ্রহলোকসমূহকে প্লাবিতকারী মেঘের মতোই তাঁর জটাকলাপ বিক্ষিপ্ত হয়। প্রলয়ের অন্তিম অবস্থায় সমস্ত গ্রহলোক জলমগ্ন হয়, এবং সেই প্লাবন হয় শিবের নৃত্যের ফলে। সেই নৃত্যকে বলা হয় *প্রলয়* নৃত্য। প্রসূতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দক্ষ তাঁর কন্যাকে উপেক্ষা করার ফলেই নয়, অধিকন্তু শিবের প্রতিষ্ঠা এবং সম্মানের অবহেলা করার ফলেও সেই বিপদ উপস্থিত হয়েছে।

শ্লোক ১১

অমর্ষয়িত্বা তমসহ্যতেজসং
মন্যুপ্লুতং দুর্নিরীক্ষ্যং ভ্রুকুট্যা ।
করালদংষ্ট্রাভিরুদস্তভাগণং
স্যাৎস্বস্তি কিং কোপয়তো বিধাতুঃ ॥ ১১ ॥

অমর্ষয়িত্বা—প্রকোপিত করে; **তম্**—তাঁকে (শিবকে); **অসহ্য-তেজসম্**—যাঁর তেজ অসহনীয়; **মন্যু-প্লুতম্**—ক্রোধপূর্ণ; **দুর্নিরীক্ষ্যম্**—দেখতে অসমর্থ; **ভ্রু-কুট্যা**—তাঁর ভ্রূকুটির দ্বারা; **করাল-দংষ্ট্রাভিঃ**—তাঁর ভয়ঙ্কর দন্তরাজির দ্বারা; **উদস্ত-ভাগণম্**—নক্ষত্রসমূহকে বিক্ষিপ্ত করে; **স্যাৎ**—হতে পারে; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **কিম্**—কিভাবে; **কোপয়তঃ**—(শিবকে) ক্রোধান্বিত করে; **বিধাতুঃ**—ব্রহ্মার।

অনুবাদ

সেই বিশাল কৃষ্ণকায় ব্যক্তিটি তাঁর ভয়ঙ্কর দন্তরাজি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর ভ্রূকুটির প্রভাবে নক্ষত্রসমূহ কক্ষচ্যুত হয়েছিল, এবং তিনি তাঁর প্রচণ্ড তেজের

দ্বারা তাদের আচ্ছাদিত করেছিলেন। দক্ষের অসৎ আচরণের ফলে, তাঁর পিতা ব্রহ্মা পর্যন্ত সেই প্রচণ্ড ক্রোধ প্রদর্শন থেকে নিস্তার লাভ করতে পারতেন না।

শ্লোক ১২

বহ্বেবমুদ্বিগ্নদৃশোচ্যমানে
জনেন দক্ষস্য মুহুর্মহাত্মনঃ ।
উৎপেতুরুৎপাততমাঃ সহস্রশো
ভয়াবহা দিবি ভূমৌ চ পর্যক্ ॥ ১২ ॥

বহু—অনেক; **এবম্**—এইভাবে; **উদ্বিগ্ন-দৃশা**—ভয়ার্ত দৃষ্টিতে; **উচ্যমানে**—যখন এইভাবে বলছিলেন, **জনেন**—(যজ্ঞে সমবেত) ব্যক্তিদের দ্বারা; **দক্ষস্য**—দক্ষের; **মুহুঃ**—বারংবার; **মহা-আত্মনঃ**—কঠিন হৃদয়, **উৎপেতুঃ**—প্রকট হয়েছিল; **উৎপাত-তমাঃ**—অত্যন্ত বলশালী লক্ষণসমূহ, **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **ভয়-আবহাঃ**—ভয় উৎপাদনকারী; **দিবি**—আকাশে; **ভূমৌ**—পৃথিবীতে; **চ**—এবং; **পর্যক্**—সমস্ত দিক থেকে।

অনুবাদ

এইভাবে যখন সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তখন দক্ষ পৃথিবীতে এবং আকাশে ভয়ঙ্কর সমস্ত অশুভ ইঙ্গিত দেখতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দক্ষকে *মহাত্মা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে এই *মহাত্মা* শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্নভাবে করেছেন। বীররাঘব আচার্য বলেছেন যে, এই মহাত্মা শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'স্থির হৃদয়'। অর্থাৎ, দক্ষ এতই কঠোর হৃদয় ছিলেন যে, তাঁর প্রিয় কন্যা যখন প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখনও তিনি স্থির এবং অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু এত কঠোর হৃদয় হওয়া সত্ত্বেও, তিনি যখন সেই বিশাল কৃষ্ণকায় অসুরটির প্রভাবে নানা রকম উৎপাত দর্শন করতে লাগলেন, তখন তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, কাউকে যদি *মহাত্মা* বলে সম্বোধন করাও হয়, কিন্তু তিনি যদি মহাত্মার লক্ষণসমূহ প্রদর্শন না করেন, তা হলে তাঁকে *দুরাত্মা* বলে বিবেচনা করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৩) *মহাত্মা* শব্দে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে বর্ণনা করা

হয়েছে—*মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।* *মহাত্মা* সর্বদাই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হন, অতএব দক্ষের মতো একজন অন্যায় আচরণকারী ব্যক্তি কিভাবে *মহাত্মা* হতে পারেন? *মহাত্মার* মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণ থাকা উচিত, এবং তাই দক্ষের মধ্যে সেই সমস্ত গুণগুলির অভাবের ফলে, তাঁকে *মহাত্মা* বলা যায় না; পক্ষান্তরে তাঁকে *দুরাত্মা* বলা উচিত। এখানে দক্ষের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে *মহাত্মা* শব্দটি ব্যঙ্গপূর্বক ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৩

তাবৎ স রুদ্রানুচরৈর্মহামখো
নানায়ুধৈর্বামনকৈরুদায়ুধৈঃ।
পিঙ্গৈঃ পিশঙ্গৈর্মকরোদরাননৈঃ
পর্যাদ্রবদ্ভির্বিদুরান্বরুধ্যত ॥ ১৩ ॥

তাবৎ—অতি শীঘ্র; **সঃ**—তা; **রুদ্র-অনুচরৈঃ**—শিবের অনুচরদের দ্বারা; **মহা-মখঃ**—মহান যজ্ঞস্থল; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **আয়ুধৈঃ**—অস্ত্রের দ্বারা; **বামনকৈঃ**—খর্বাকৃতি; **উদায়ুধৈঃ**—উত্তোলন করে; **পিঙ্গৈঃ**—কৃষ্ণকায়; **পিশঙ্গৈঃ**—পীত বর্ণাভ, **মকর-উদর-আননৈঃ**—মকরের মতো উদর এবং মুখ সমন্বিত, **পর্যাদ্রবদ্ভিঃ**—চতুর্দিকে ছুটাছুটি করে; **বিদুর**—হে বিদুর; **অন্বরুধ্যত**—বেষ্টন করেছিল।

অনুবাদ

হে বিদুর! শিবের সমস্ত অনুচরেরা সেই যজ্ঞভূমি বেষ্টন করেছিল। তারা ছিল খর্বাকৃতি এবং বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; তাদের উদর এবং মুখ মকরের মতো কৃষ্ণ এবং পীত বর্ণাভ ছিল। তারা যজ্ঞভূমির সর্বত্র ছুটাছুটি করে মহা উৎপাত সৃষ্টি করেছিল।

শ্লোক ১৪

কেচিদ্বভঞ্জুঃ প্রাগ্বংশং পত্নীশালাং তথাপরে।
সদ আগ্নীধ্রশালাং চ তদ্বিহারং মহানসম্ ॥ ১৪ ॥

কেচিৎ—কেউ; **বভঞ্জুঃ**—ভেঙে ফেলেছিল; **প্রাক্-বংশম্**—যজ্ঞ-মণ্ডপের স্তম্ভ; **পত্নী-শালাম্**—মহিলাদের কক্ষ; **তথা**—ও; **অপরে**—অন্যেরা; **সদঃ**—যজ্ঞস্থল;

আগ্নীধ্র-শালাম্—পুরোহিতদের গৃহ; **চ**—এবং; **তৎ-বিহারম্**—যজমানের গৃহ; **মহা-অনসম্**—পাকশালা।

অনুবাদ

কিছু সৈন্য যজ্ঞ-মণ্ডপের স্তম্ভ ভেঙে ফেলেছিল, কেউ কেউ পত্নীশালায় ঢুকে পড়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থল বিনষ্ট করতে শুরু করেছিল এবং কেউ আবাসস্থল ও পাকশালায় প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ১৫

রুরুজুর্যজ্ঞপাত্রাণি তথৈকেঽগ্নীননাশয়ন্ ।
কুণ্ডেষ্বমূত্রয়ন্ কেচিদ্বিভিদুর্বেদিমেখলাঃ ॥ ১৫ ॥

রুরুজুঃ—ভেঙে ফেলেছিল; **যজ্ঞ-পাত্রাণি**—যজ্ঞে ব্যবহৃত পাত্রসমূহ; **তথা**—তেমনই; **একে**—কেউ কেউ; **অগ্নীন্**—যজ্ঞাগ্নি, **অনাশয়ন্**—নিভিয়ে দিয়েছিল; **কুণ্ডেষু**—যজ্ঞকুণ্ডে; **অমূত্রয়ন্**—মূত্রত্যাগ করেছিল; **কেচিৎ**—কেউ কেউ, **বিভিদুঃ**—ছিঁড়ে ফেলেছিল, **বেদি-মেখলাঃ**—যজ্ঞস্থলের সীমাসূত্র।

অনুবাদ

তারা যজ্ঞপাত্র ভেঙে ফেলেছিল, কেউ কেউ যজ্ঞাগ্নি নিভিয়ে দিয়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থলের সীমাসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছিল, এবং কেউ কেউ যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করেছিল।

শ্লোক ১৬

অবাধন্ত মুনীনন্যে একে পত্নীরতর্জয়ন্ ।
অপরে জগৃহুর্দেবান্ প্রত্যাসন্নান্ পলায়িতান্ ॥ ১৬ ॥

অবাধন্ত—পথ রোধ করেছিল; **মুনীন্**—মুনিদের; **অন্যে**—অন্যেরা; **একে**—কেউ; **পত্নীঃ**—স্ত্রীদের; **অতর্জয়ন্**—তিরস্কার করেছিল; **অপরে**—অন্যরা; **জগৃহুঃ**—বন্দি করেছিল; **দেবান্**—দেবতাদের; **প্রত্যাসন্নান্**—নিকটবর্তী; **পলায়িতান্**—পলায়নকারী।

অনুবাদ

কেউ কেউ পলায়নকারী মুনিদের পথ রোধ করেছিল, কেউ কেউ সেখানে সমবেত স্ত্রীদের তিরস্কার করেছিল, এবং কেউ কেউ মণ্ডপ থেকে পলায়নকারী দেবতাদের বন্দি করেছিল।

শ্লোক ১৭

ভৃগুং ববন্ধ মণিমান্ বীরভদ্রঃ প্রজাপতিম্ ।
চণ্ডেশঃ পূষণং দেবং ভগং নন্দীশ্বরোঽগ্রহীৎ ॥ ১৭ ॥

ভৃগুম্—ভৃগু মুনিকে; **ববন্ধ**—বন্দি করেছিল; **মণিমান্**—মণিমান; **বীরভদ্রঃ**—বীরভদ্র; **প্রজাপতিম্**—প্রজাপতি দক্ষকে; **চণ্ডেশঃ**—চণ্ডেশ; **পূষণম্**—পূষাকে; **দেবম্**—দেবতা; **ভগম্**—ভগকে; **নন্দীশ্বরঃ**—নন্দীশ্বর; **অগ্রহীৎ**—বন্দি করেছিলেন।

অনুবাদ

শিবের এক অনুচর মণিমান ভৃগু মুনিকে বন্দি করেছিলেন, এবং কৃষ্ণকায় অসুর বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে বন্দি করেছিলেন। চণ্ডেশ নামক শিবের আর একজন অনুচর পূষাকে বন্দি করেছিলেন, এবং নন্দীশ্বর ভগ দেবতাকে বন্দি করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

সর্ব এবর্ত্বিজো দৃষ্ট্বা সদস্যাঃ সদিবৌকসঃ ।
তৈরর্দ্যমানাঃ সুভৃশং গ্রাবভির্নৈকধাদ্রবন্ ॥ ১৮ ॥

সর্বে—সকলে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সদস্যাঃ**—যজ্ঞে সমবেত সমস্ত সদস্যদের; **স-দিবৌকসঃ**—দেবতাগণ সহ; **তৈঃ**—সেই সমস্ত (পাথরের) দ্বারা; **অর্দ্যমানাঃ**—উপদ্রুত হয়ে; **সু-ভৃশম্**—অত্যন্ত; **গ্রাবভিঃ**—পাথরের দ্বারা; **ন একধা**—বিভিন্ন দিকে; **অদ্রবন্**—পলায়ন করতে লাগলেন।

অনুবাদ

নিরন্তর প্রস্তর বর্ষিত হচ্ছিল, এবং সমস্ত পুরোহিত ও যজ্ঞস্থলে সমবেত সমস্ত সদস্যরা তার ফলে এক মহা সঙ্কটে পতিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের ভয়ে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

জুহ্বতঃ স্রুবহস্তস্য শ্মশ্রূণি ভগবান্ ভবঃ ।
ভৃগোর্লুলুঞ্চে সদসি যোঽহসচ্ছ্মশ্রু দর্শয়ন্ ॥ ১৯ ॥

জুহুতঃ—যজ্ঞাহুতি নিবেদন করে; **স্রুব-হস্তস্য**—যজ্ঞীয় স্রুব হস্তে; **শ্মশ্রূণি**—শ্মশ্রুরাজি; **ভগবান্**—সমস্ত ঐশ্বর্য-সমন্বিত; **ভবঃ**—বীরভদ্র; **ভৃগোঃ**—ভৃগু মুনির; **লুলুঞ্চে**—উৎপাটন করেছিলেন; **সদসি**—সেই সভায়; **যঃ**—যিনি (ভৃগু মুনি); **অহসৎ**—হেসেছিলেন; **শ্মশ্রু**—শ্মশ্রু; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

যিনি স্রুব হস্তে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করছিলেন, বীরভদ্র সেই ভৃগু মুনির শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

ভগস্য নেত্রে ভগবান্ পাতিতস্য রুষা ভুবি ।
উজ্জহার সদস্থোঽক্ষ্ণা যঃ শপন্তমসূসুচৎ ॥ ২০ ॥

ভগস্য—ভগের; **নেত্রে**—উভয় চক্ষু; **ভগবান্**—বীরভদ্র, **পাতিতস্য**—নিক্ষেপ করে, **রুষা**—মহা ক্রোধে; **ভুবি**—ভূমিতে, **উজ্জহার**—উৎপাটন করেছিলেন; **সদ-স্থঃ**—বিশ্বসৃকদের সভায় স্থিত; **অক্ষ্ণা**—ভ্রূ সঞ্চালনের দ্বারা; **যঃ**—যিনি (ভগ); **শপন্তম্**—(শিবকে) শাপ প্রদানকারী (দক্ষ); **অসূসুচৎ**—অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

অনুবাদ

দক্ষ যখন শিবের নিন্দা করছিলেন, তখন ভগ দক্ষকে উৎসাহিত করেছিলেন, সেই কারণে বীরভদ্র ক্রোধভরে তাঁকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে তাঁর চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করেছিলেন।

শ্লোক ২১

পূষ্ণো হ্যপাতয়দ্দন্তান্ কালিঙ্গস্য যথা বলঃ ।
শপ্যমানে গরিমণি যোঽহসদ্দর্শয়ন্দতঃ ॥ ২১ ॥

পূষ্ণঃ—পূষার; **হি**—যেহেতু; **অপাতয়ৎ**—উৎপাটন করেছিলেন; **দন্তান্**—দন্তরাজি; **কালিঙ্গস্য**—কলিঙ্গরাজের; **যথা**—যেমন; **বলঃ**—বলদেব; **শপ্যমানে**—নিন্দা করার সময়; **গরিমণি**—শিব; **যঃ**—যিনি (পূষা); **অহসৎ**—হেসেছিলেন; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **দতঃ**—তাঁর দন্তরাজি।

অনুবাদ

অনিরুদ্ধের বিবাহের সময় দ্যূতক্রীড়াকালে বলদেব যেভাবে কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্তরাজি উৎপাটন করেছিলেন, সেইভাবে যে দক্ষ শিবের নিন্দার সময়ে দন্ত প্রকাশ করেছিলেন, এবং তখন সেই নিন্দার সমর্থন করে যে পূষাও তাঁর দন্তরাজি প্রদর্শন করে হেসেছিলেন, বীরভদ্র তাঁদের উভয়েরই দন্তরাজি উৎপাটন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে তিনি দন্তবক্রের কন্যাকে হরণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁকে বন্দি করা হয়। সেই জন্য তাঁকে যখন দণ্ড দেওয়ার আয়োজন করা হচ্ছিল, তখন বলরামের নেতৃত্বে দ্বারকা থেকে সৈন্যরা এসে সেখানে উপস্থিত হয়, এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই প্রকার যুদ্ধ খুবই স্বাভাবিক ছিল, বিশেষ করে বিবাহ উৎসবের সময়, যখন সকলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করতেন। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যুদ্ধ হত, এবং সেই যুদ্ধে অনেকে মারা যেত এবং অনেকে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হত। যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের মধ্যে আপস মীমাংসা হত, এবং সব কিছুরই সমাধান হয়ে যেত। দক্ষ যজ্ঞও সেই রকম ঘটনার মতোই ছিল এখন দক্ষ, ভগদেব, পূষা, ভৃগু মুনি, তাঁরা সকলে শিবের সৈন্যদের দ্বারা দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার পর ক্রমে সব কিছুরই শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে। তাই পরস্পরের সঙ্গে এই প্রকার যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে শত্রুতাপূর্ণ ছিল না। যেহেতু সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বৈদিক মন্ত্র বা যোগশক্তির দ্বারা তাঁদের শক্তি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই দক্ষযজ্ঞে উভয় পক্ষই ব্যাপকভাবে তাঁদের যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

আক্রম্যোরসি দক্ষস্য শিতধারেণ হেতিনা ।
ছিন্দন্নপি তদুদ্ধর্তুং নাশক্নোৎ ত্র্যম্বকস্তদা ॥ ২২ ॥

আক্রম্য—বসে, **উরসি**—বক্ষে, **দক্ষস্য**—দক্ষের; **শিত-ধারেণ**—তীক্ষ্ণধার, **হেতিনা**—খড়্গের দ্বারা; **ছিন্দন্**—কাটতে; **অপি**—যদিও; **তৎ**—তা (মস্তক); **উদ্ধর্তুম্**—বিচ্ছিন্ন করতে; **ন অশক্নোৎ**—সক্ষম হননি; **ত্রি-অম্বকঃ**—বীরভদ্র (যাঁর তিনটি চক্ষু ছিল); **তদা**—তার পর।

অনুবাদ

তখন সেই বিশালকায় বীরভদ্র দক্ষের বুকের উপর বসে তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা তাঁর মস্তক ছেদন করতে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু দক্ষের শরীর থেকে তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না।

শ্লোক ২৩

শস্ত্রৈরস্ত্রান্বিতৈরেবমনির্ভিন্নত্বচং হরঃ ।
বিস্ময়ং পরমাপন্নো দধ্যৌ পশুপতিশ্চিরম্ ॥ ২৩ ॥

শস্ত্রৈঃ—অস্ত্রের দ্বারা; **অস্ত্র-অন্বিতৈঃ**—মন্ত্রের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **অনির্ভিন্ন**—না কাটতে পেরে; **ত্বচম্**—ত্বক; **হরঃ**—বীরভদ্র; **বিস্ময়ম্**—বিস্মিত; **পরম্**—অত্যন্ত; **আপন্নঃ**—আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; **দধ্যৌ**—চিন্তা করেছিলেন; **পশুপতিঃ**—বীরভদ্র; **চিরম্**—দীর্ঘকাল।

অনুবাদ

তিনি অস্ত্র এবং মন্ত্রের দ্বারাও দক্ষের মস্তক ছেদন করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চর্ম মাত্রও ছেদন করতে পারলেন না। তার ফলে বীরভদ্র অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

দৃষ্ট্বা সংজ্ঞপনং যোগং পশূনাং স পতির্মখে ।
যজমানপশোঃ কস্য কায়াত্তেনাহরচ্ছিরঃ ॥ ২৪ ॥

দৃষ্ট্বা—দেখে; **সংজ্ঞপনম্**—যজ্ঞে পশুবলির জন্য; **যোগম্**—যন্ত্র; **পশূনাম্**—পশুদের; **সঃ**—তিনি (বীরভদ্র); **পতিঃ**—প্রভু; **মখে**—যজ্ঞে; **যজমান-পশোঃ**—যজ্ঞমানরূপী পশু; **কস্য**—দক্ষের, **কায়াৎ**—দেহ থেকে; **তেন**—সেই (যন্ত্রের) দ্বারা; **অহরৎ**—ছেদন করেছিলেন; **শিরঃ**—তাঁর মস্তক।

অনুবাদ

তখন বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে পশুবলি দেওয়ার যূপকাষ্ঠ দর্শন করে তার দ্বারা দক্ষের মস্তক ছেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যজ্ঞে পশুবলি দেওয়ার যে কৌশলগত ব্যবস্থা ছিল, তা মাংস আহারের সুবিধার জন্য নয়। পশুবলিব বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক মন্ত্রের প্রভাবে উৎসর্গীকৃত পশুকে নবীন জীবন দান করা। পশুবলি দেওয়া হত বৈদিক মন্ত্রের শক্তি পবীক্ষা করার জন্য, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হত মন্ত্রের পরীক্ষার জন্য। আধুনিক যুগেও শাবীরবৃত্তীয় গবেষণাগারে পশুর শরীরের উপর ওষুধ ইত্যাদির পরীক্ষা করা হয়। তেমনই, ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র সঠিকভাবে উচ্চারণ করছেন কি না, তার পরীক্ষা হত যজ্ঞস্থলে। চরমে, এইভাবে উৎসর্গীকৃত পশুর কোন রকম ক্ষতি হত না। বৃদ্ধ পশুদেব বলি দেওযা হত, কিন্তু পরিণামে তাদের জরাগ্রস্ত শরীরের পরিবর্তে তারা নতুন শবীর প্রাপ্ত হত। সেটিই ছিল বৈদিক মন্ত্রের পরীক্ষা। বীরভদ্র যূপকাষ্ঠে পশু বলি দেওয়ার পবিবর্তে, সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে দক্ষকে বলি দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

সাধুবাদস্তদা তেষাং কর্ম তত্তস্য পশ্যতাম্ ।
ভূতপ্রেতপিশাচানামন্যেষাং তদ্বিপর্যয়ঃ ॥ ২৫ ॥

সাধু-বাদঃ—আনন্দময় কোলাহল; **তদা**—সেই সময়; **তেষাম্**—তাঁদের (শিবের অনুচরদের); **কর্ম**—ক্রিয়া; **তৎ**—সেই; **তস্য**—তাঁর (বীরভদ্রেব); **পশ্যতাম্**—দর্শন করে; **ভূত-প্রেত-পিশাচানাম্**—ভূত, প্রেত এবং পিশাচদেব; **অন্যেষাম্**—অন্যদের (দক্ষ পক্ষীয়দের); **তৎ-বিপর্যয়ঃ**—তার বিপরীত (হাহাকার)।

অনুবাদ

বীরভদ্রের সেই কার্য দর্শন করে, শিবপক্ষীয় ভূত, প্রেত এবং পিশাচেরা সাধু সাধু বলে কোলাহল করে উঠল; কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা দক্ষের মৃত্যুতে হাহাকার করে উঠল।

শ্লোক ২৬

জুহাবৈতচ্ছিরস্তস্মিন্দক্ষিণাগ্নাবমর্ষিতঃ ।
তদ্দেবযজনং দগ্ধ্বা প্রাতিষ্ঠদ্ গুহ্যকালয়ম্ ॥ ২৬ ॥

জুহাব—আহুতিরূপে উৎসর্গীকৃত; **এতৎ**—সেই; **শিরঃ**—মস্তক; **তস্মিন্**—তাতে; **দক্ষিণ-অগ্নৌ**—দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে; **অমর্ষিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বীরভদ্র; **তৎ**—দক্ষের; **দেব-যজনম্**—দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের আয়োজন; **দগ্ধ্বা**—আগুন জ্বালিয়ে; **প্রাতিষ্ঠৎ**—প্রস্থান করেছিলেন; **গুহ্যক-আলয়ম্**—গুহ্যকদের আলয় (কৈলাস)।

অনুবাদ

বীরভদ্র তখন মহা ক্রোধে দক্ষের মস্তকটি নিয়ে দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে তা আহুতির মতো নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে শিবের অনুচরেরা যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন তচনছ করে, এবং সমস্ত যজ্ঞস্থলে আগুন জ্বালিয়ে তাঁদের প্রভুর ধাম কৈলাসের উদ্দেশে প্রস্থান করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'দক্ষযজ্ঞ নাশ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করলেন

শ্লোক ১-২

মৈত্রেয় উবাচ

অথ দেবগণাঃ সর্বে রুদ্রানীকৈঃ পরাজিতাঃ ।
শূলপট্টিশনিস্ত্রিংশগদাপরিঘমুদ্গরৈঃ ॥ ১ ॥
সংছিন্নভিন্নসর্বাঙ্গাঃ সর্ত্বিক্‌সভ্যা ভয়াকুলাঃ ।
স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য কার্ৎস্ন্যেনৈতন্ন্যবেদয়ন্ ॥ ২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **অথ**—তার পর; **দেব-গণাঃ**—দেবতাগণ; **সর্বে**—সকলে; **রুদ্র-অনীকৈঃ**—শিবের সৈন্যদের দ্বারা; **পরাজিতাঃ**—পরাভূত হয়ে; **শূল**—ত্রিশূল; **পট্টিশ**—তীক্ষ্ণধার বল্লম; **নিস্ত্রিংশ**—তরবারি; **গদা**—গদা; **পরিঘ**—পরিঘ; **মুদ্গরৈঃ**—মুগুর; **সংছিন্ন-ভিন্ন-সর্ব-অঙ্গাঃ**—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আহত; **স-ঋত্বিক্-সভ্যাঃ**—যজ্ঞসভার সমস্ত পুরোহিত এবং সদস্যগণ সহ; **ভয়-আকুলাঃ**—অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে; **স্বয়ম্ভুবে**—ব্রহ্মাকে; **নমস্কৃত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **কার্ৎস্ন্যেন**—বিস্তারিতভাবে; **এতৎ**—দক্ষযজ্ঞের এই সমস্ত ঘটনাবলী; **ন্যবেদয়ন্**—নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—সমস্ত পুরোহিত, যজ্ঞসভার সদস্য এবং দেবতারা শিবের সৈন্যদের দ্বারা পরাজিত হয়ে ত্রিশূল, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্রের দ্বারা সর্বাঙ্গে আহত হয়ে, ভয়বিহ্বল চিত্তে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে প্রণতি নিবেদন করার পরে, দক্ষের যজ্ঞে যা কিছু হয়েছিল তা সবিস্তারে তাঁরা নিবেদন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩

উপলভ্য পুরৈবৈতদ্ভগবানজসম্ভবঃ ।
নারায়ণশ্চ বিশ্বাত্মা ন কস্যাধ্বরমীয়তুঃ ॥ ৩ ॥

উপলভ্য—জেনে; **পুরা**—পূর্বেই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **এতৎ**—দক্ষযজ্ঞের এই সমস্ত ঘটনা; **ভগবান্**—সর্ব ঐশ্বর্য-সমন্বিত; **অজ-সম্ভবঃ**—পদ্মফুলে যাঁর জন্ম হয়েছিল (শ্রীব্রহ্মা); **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **চ**—এবং; **বিশ্ব-আত্মা**—সমগ্র বিশ্বের পরমাত্মা; **ন**—না; **কস্য**—দক্ষের; **অধ্বরম্**—যজ্ঞে; **ঈয়তুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়ে পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন যে, দক্ষযজ্ঞে এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটবে, তাই তাঁরা সেই যজ্ঞে যাননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২৬) ভগবান বলেছেন, *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন*—"অতীতে যা কিছু ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে, তা সবই আমি জানি।" ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বজ্ঞ, এবং তাই দক্ষের যজ্ঞস্থলে যা ঘটবে তা তিনি জানতেন। সেই কারণে নারায়ণ এবং ব্রহ্মা কেউই দক্ষের সেই মহান যজ্ঞে যোগদান করেননি।

শ্লোক ৪

তদাকর্ণ্য বিভুঃ প্রাহ তেজীয়সি কৃতাগসি ।
ক্ষেমায় তত্র সা ভূয়ান্ন প্রায়েণ বুভূষতাম্ ॥ ৪ ॥

তৎ—দেবতারা এবং অন্যেরা যে ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন; **আকর্ণ্য**—শুনে; **বিভুঃ**—ব্রহ্মা; **প্রাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তেজীয়সি**—মহাপুরুষ; **কৃত-আগসি**—অপরাধ করা হয়েছে; **ক্ষেমায়**—তোমাদের সুখের জন্য; **তত্র**—সেইভাবে; **সা**—সেই; **ভূয়াৎ ন**—অনুকূল নয়; **প্রায়েণ**—সাধারণত; **বুভূষতাম্**—জীবন ধারণের ইচ্ছা।

অনুবাদ

দেবতা এবং সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করে ব্রহ্মা বললেন—মহাপুরুষের নিন্দা করে, এবং তার ফলে তাঁর চরণ-কমলে অপরাধ

করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা কখনই সুখী হতে পারবে না। এইভাবে তোমরা কখনই সুখ লাভ করতে পারবে না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা দেবতাদের বলেছিলেন যে, দক্ষ যদিও তাঁর সকাম যজ্ঞের ফল উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শিবের মতো একজন মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করে তা উপভোগ করা কখনও সম্ভব নয়। যুদ্ধে দক্ষের মৃত্যু হওয়াটাই ভাল হয়েছে, কারণ সে বেঁচে থাকলে বার বার মহাপুরুষদের চরণে এইভাবে অপরাধ করত। মনু প্রদত্ত আইন অনুসারে, হত্যাকারীকে দণ্ড দেওয়া তার পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ তাকে বধ করা না হলে সে আরও মানুষদের হত্যা করবে, এবং এইভাবে এত মানুষকে হত্যা করার ফলে বহু জন্ম ধরে তার ফল ভোগ করবে। তাই হত্যাকারীকে রাজার দণ্ডদান করা উপযুক্ত। যদি কেউ অত্যন্ত অপরাধী হয়, এবং ভগবানের কৃপায় তাদের হত্যা করা হয়, তা হলে তাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্মা দেবতাদের কাছে বলেছিলেন যে, দক্ষের মৃত্যু হওয়াটাই ভাল হয়েছে।

শ্লোক ৫

অথাপি যূয়ং কৃতকিল্বিষা ভবং
যে বর্হিষো ভাগভাজং পরাদুঃ ।
প্রসাদয়ধ্বং পরিশুদ্ধচেতসা
ক্ষিপ্রপ্রসাদং প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥ ৫ ॥

অথ অপি—তা সত্ত্বেও; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **কৃত-কিল্বিষাঃ**—অপরাধ করে; **ভবম্**—শিব; **যে**—তোমরা সকলে; **বর্হিষঃ**—যজ্ঞের; **ভাগ-ভাজম্**—অংশভাগী; **পরাদুঃ**—বঞ্চিত করেছ; **প্রসাদয়ধ্বম্**—তোমরা সকলে তাঁকে প্রসন্ন কর; **পরিশুদ্ধ-চেতসা**—শুদ্ধ অন্তঃকরণে; **ক্ষিপ্র-প্রসাদম্**—আশু সন্তোষ; **প্রগৃহীত-অঙ্ঘ্রি-পদ্মম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করে।

অনুবাদ

শিবকে তাঁর যজ্ঞাংশ থেকে বঞ্চিত করার ফলে, তোমরা সকলেই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেছ। তবুও যদি তোমরা শুদ্ধ অন্তঃকরণে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ কর, তা হলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন।

তাৎপর্য

শিবের আর একটি নাম আশুতোষ। *আশু* মানে 'অতি শীঘ্র', এবং *তোষ* মানে 'প্রসন্ন হওয়া'। দেবতাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁরা যেন শিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং যেহেতু তিনি অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন, তাই অবশ্যই তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন হবে। ব্রহ্মা শিবের মনোভাব খুব ভালভাবেই জানতেন, এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অপরাধী দেবতারা যদি শুদ্ধ চিত্তে শিবের শরণাগত হন, তা হলে তিনি তাঁদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবেন।

শ্লোক ৬

আশাসানা জীবিতমধ্বরস্য
লোকঃ সপালঃ কুপিতে ন যস্মিন্ ।
তমাশু দেবং প্রিয়য়া বিহীনং
ক্ষমাপয়ধ্বং হৃদি বিদ্ধং দুরুক্তৈঃ ॥ ৬ ॥

আশাসানাঃ—জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছায়; **জীবিতম্**—আয়ুষ্কাল; **অধ্বরস্য**—যজ্ঞের; **লোকঃ**—সমস্ত লোক; **স-পালঃ**—পালকগণ সহ; **কুপিতে**—ক্রুদ্ধ হলে; **ন**—না; **যস্মিন্**—যিনি; **তম্**—তা; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **দেবম্**—শিব; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয় পত্নীর; **বিহীনম্**—বিহীন হয়ে; **ক্ষমাপয়ধ্বম্**—ক্ষমা ভিক্ষা কর; **হৃদি**—তাঁর হৃদয়ে; **বিদ্ধম্**—অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন; **দুরুক্তৈঃ**—কটূক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তাঁদের উপদেশ দিয়ে বললেন যে, শিব এতই শক্তিশালী যে, তিনি ক্রুদ্ধ হলে লোকপাল সহ সমস্ত গ্রহলোক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করতে পারেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, শিব তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন এবং দক্ষের নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছেন। এই অবস্থায়, ব্রহ্মা তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ শিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করাই তাঁদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

শ্লোক ৭

নাহং ন যজ্ঞো ন চ যূয়মন্যে
যে দেহভাজো মুনয়শ্চ তত্ত্বম্ ।
বিদুঃ প্রমাণং বলবীর্যয়োর্বা
যস্যাত্মতন্ত্রস্য ক উপায়ং বিধিৎসেৎ ॥ ৭ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **ন**—না; **যজ্ঞঃ**—ইন্দ্র; **ন**—না; **চ**—এবং; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **অন্যে**—অন্যেরা; **যে**—যে; **দেহ-ভাজঃ**—জড় দেহধারী; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **চ**—এবং; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **বিদুঃ**—জানে; **প্রমাণম্**—ইয়ত্তা; **বল-বীর্যয়োঃ**—বল এবং বীর্যের; **বা**—অথবা; **যস্য**—শিবের; **আত্ম-তন্ত্রস্য**—আত্ম-নির্ভরশীল শিবের; **কঃ**—কি; **উপায়ম্**—উপায়; **বিধিৎসেৎ**—বিধান করতে ইচ্ছা করা উচিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলেছিলেন যে, শিব যে কত শক্তিশালী তা তিনি স্বয়ং, ইন্দ্র, যজ্ঞসভায় সমবেত সমস্ত সদস্যেরা, অথবা সমস্ত মুনি-ঋষিরা, কেউই জানেন না। সেই অবস্থায় কে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করতে সাহস করবে?

তাৎপর্য

শিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করার উপদেশ দেওয়ার পর, ব্রহ্মা দেবতাদের বলেছিলেন কিভাবে শিবের কাছে গিয়ে সেই বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে এবং কিভাবে তাঁকে প্রসন্ন করতে হবে। ব্রহ্মা এও বলেছিলেন যে, কোন বদ্ধ জীব, এমন কি তিনি এবং সমস্ত দেবতারাও জানেন না কিভাবে শিবকে সন্তুষ্ট করতে হয়। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, "শিব যে অতি সহজে সন্তুষ্ট হন তা আমাদের জানা আছে, তাই চল, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে আমরা তাঁর প্রসন্নতা বিধানে চেষ্টা করি।"

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া। *ভগবদ্গীতায়* সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবান বলেছেন, সকলেই যেন তাদের মনগড়া সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁর শরণাগত হয়। তার ফলে জীব তার সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হতে পারবে। তেমনই, এখানেও ব্রহ্মা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন শিবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন, কারণ তিনি যেহেতু অত্যন্ত কৃপালু এবং সহজেই প্রসন্ন হন, তার ফলে তাঁদের বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে।

শ্লোক ৮

স ইত্থমাদিশ্য সুরানজস্তু তৈঃ
সমন্বিতঃ পিতৃভিঃ সপ্রজেশৈঃ ।
যযৌ স্বধিষ্ণ্যান্নিলয়ং পুরদ্বিষঃ
কৈলাসমদ্রিপ্রবরং প্রিয়ং প্রভোঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); **ইত্থম্**—এইভাবে; **আদিশ্য**—উপদেশ দিয়ে; **সুরান্**—দেবতাদের; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **তু**—তখন; **তৈঃ**—তাঁদের; **সমন্বিতঃ**—সঙ্গে; **পিতৃভিঃ**—পিতৃগণ; **স-প্রজেশৈঃ**—প্রজাপতিগণ; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **স্ব-ধিষ্ণ্যাৎ**—তাঁর নিজের স্থান থেকে; **নিলয়ম্**—আলয়; **পুর-দ্বিষঃ**—শিবের; **কৈলাসম্**—কৈলাস; **অদ্রি-প্রবরম্**—গিরিশ্রেষ্ঠ; **প্রিয়ম্**—প্রিয়তম; **প্রভোঃ**—প্রভুর (শিবের)।

অনুবাদ

এইভাবে দেবতাদের উপদেশ দিয়ে, পিতৃগণ, প্রজাপতিগণ এবং দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা তাঁর স্বধাম থেকে শিবের প্রিয়তম আলয় গিরিরাজ কৈলাসের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

শিবের ধাম কৈলাসের বর্ণনা পরবর্তী চৌদ্দটি শ্লোকে করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রযোগসিদ্ধৈর্নরেতরৈঃ ।
জুষ্টং কিন্নরগন্ধর্বৈরপ্সরোভির্বৃতং সদা ॥ ৯ ॥

জন্ম—জন্ম; **ঔষধি**—ওষধি; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **মন্ত্র**—বৈদিক মন্ত্র; **যোগ**—যোগ অভ্যাস; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধগণ সহ; **নর-ইতরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **জুষ্টম্**—সেবিত; **কিন্নর-গন্ধর্বৈঃ**—কিন্নর এবং গন্ধর্বগণ দ্বারা; **অপ্সরোভিঃ**—অপ্সরাদের দ্বারা; **বৃতম্**—পূর্ণ; **সদা**—সর্বদা।

অনুবাদ

কৈলাস নামক ধাম বিভিন্ন ওষধি এবং বনস্পতিতে পূর্ণ, তা বৈদিক মন্ত্র এবং যোগ অভ্যাসের দ্বারা পবিত্র। তাই সেই ধামের অধিবাসীরা জন্মসূত্রে দেবতা

এবং তাঁরা সমস্ত যোগশক্তি সমন্বিত। তা ছাড়া সেখানে অন্য মানুষেরা রয়েছেন, যাঁদের বলা হয় কিন্নর এবং গন্ধর্ব, সেখানে তাঁরা তাঁদের অপ্সরা নামক সুন্দরী স্ত্রীদের সঙ্গে বিরাজ করেন।

শ্লোক ১০

নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নানাধাতুবিচিত্রিতৈঃ ।
নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নানামৃগগণাবৃতৈঃ ॥ ১০ ॥

নানা—বিভিন্ন প্রকার; মণি—রত্ন; ময়ৈঃ—নির্মিত; শৃঙ্গৈঃ—শৃঙ্গ-সমন্বিত; নানা-ধাতু-বিচিত্রিতৈঃ—বিভিন্ন প্রকার ধাতুর দ্বারা রঞ্জিত; নানা—বিভিন্ন প্রকার; দ্রুম—বৃক্ষ; লতা—লতা; গুল্মৈঃ—গুল্ম; নানা—নানা প্রকার; মৃগগণ—হরিণসমূহের দ্বারা; আবৃতৈঃ—পরিবৃত।

অনুবাদ

কৈলাস সমস্ত প্রকার বহুমূল্য মণিরত্ন এবং ধাতুতে পূর্ণ পর্বত-সমন্বিত, এবং নানা প্রকার মূল্যবান বৃক্ষ এবং লতার দ্বারা পরিবৃত। সেই পর্বতশৃঙ্গ বিভিন্ন প্রকার হরিণদের দ্বারা বিভূষিত।

শ্লোক ১১

নানামলপ্রস্রবণৈর্নানাকন্দরসানুভিঃ ।
রমণং বিহরন্তীনাং রমণৈঃ সিদ্ধযোষিতাম্ ॥ ১১ ॥

নানা—বিবিধ প্রকার; অমল—নির্মল; প্রস্রবণৈঃ—জলপ্রপাত; নানা—বিবিধ প্রকার; কন্দর—গুহা; সানুভিঃ—শিখরসমূহ; রমণম্—আনন্দপ্রদ; বিহরন্তীনাম্—ক্রীড়াশীল; রমণৈঃ—তাঁদের প্রেমিকদের সঙ্গে; সিদ্ধ-যোষিতাম্—সিদ্ধ রমণীদের।

অনুবাদ

সেখানে বহু ঝরনা রয়েছে, এবং পর্বতে অনেক সুন্দর গুহা রয়েছে, যেখানে সিদ্ধ রমণীগণ তাঁদের কান্ত সহ বিহার করেন।

শ্লোক ১২

ময়ূরকেকাভিরুতং মদান্ধালিবিমূর্চ্ছিতম্ ।
প্লাবিতৈ রক্তকণ্ঠানাং কূজিতৈশ্চ পতত্রিণাম্ ॥ ১২ ॥

ময়ূর—ময়ূরদের; **কেকা**—কেকারব; **অভিরুতম্**—গুঞ্জায়মান; **মদ**—মদমত্ত; **অন্ধ**—অন্ধ; **অলি**—অলিকুলের দ্বারা; **বিমূর্চ্ছিতম্**—গুঞ্জায়মান; **প্লাবিতৈঃ**—সঙ্গীতের দ্বারা; **রক্ত-কণ্ঠানাম্**—কোকিলদের; **কূজিতৈঃ**—কূজন; **চ**—এবং; **পতত্রিণাম্**—অন্যান্য পাখিদের।

অনুবাদ

কৈলাস পর্বত সর্বদা ময়ূরের কেকারব, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুরব এবং অন্যান্য পক্ষীদের কূজনে মুখরিত।

শ্লোক ১৩

আহ্বয়ন্তমিবোদ্ধস্তৈর্দ্বিজান্ কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ ।
ব্রজন্তমিব মাতঙ্গৈর্গৃণন্তমিব নির্ঝরৈঃ ॥ ১৩ ॥

আহ্বয়ন্তম্—আহ্বান করে; **ইব**—যেন; **উৎ-হস্তৈঃ**—উত্তোলিত হস্ত (শাখা); **দ্বিজান্**—পক্ষীগণ; **কাম-দুঘৈঃ**—মনোবাসনা পূর্ণকারী; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষসমূহ; **ব্রজন্তম্**—চলমান; **ইব**—যেন; **মাতঙ্গৈঃ**—হস্তীদের দ্বারা; **গৃণন্তম্**—গুঞ্জায়মান; **ইব**—যেন; **নির্ঝরৈঃ**—ঝরনার দ্বারা।

অনুবাদ

কৈলাস পর্বতের ঋজু শাখা-সমন্বিত সুউচ্চ বৃক্ষগুলি যেন হস্ত প্রসারণ করে বিহঙ্গদের আহ্বান করে। মাতঙ্গগণ যখন ইতস্তত ভ্রমণ করে, তখন মনে হয় যেন কৈলাস পর্বত মন্থর গতিতে তাদের সাথে গমন করছেন। ঝরনা থেকে যখন সশব্দে জল পড়ে, তখন মনে হয় যেন কৈলাস পর্বতও কলকণ্ঠে কীর্তন করছেন।

শ্লোক ১৪-১৫

মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ সরলৈশ্চোপশোভিতম্ ।
তমালৈঃ শালতালৈশ্চ কোবিদারাসনার্জুনৈঃ ॥ ১৪ ॥

চূতৈঃ কদম্বৈর্নীপৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ ।
পাটলাশোকবকুলৈঃ কুন্দৈঃ কুরবকৈরপি ॥ ১৫ ॥

মন্দারৈঃ—মন্দারের দ্বারা; **পারিজাতৈঃ**—পারিজাতের দ্বারা; **চ**—এবং; **সরলৈঃ**—সরলের দ্বারা; **চ**—এবং; **উপশোভিতম্**—শোভিত; **তমালৈঃ**—তমাল বৃক্ষের দ্বারা; **শাল-তালৈঃ**—শাল এবং তাল বৃক্ষের দ্বারা; **চ**—এবং; **কোবিদার-আসন-অর্জুনৈঃ**—কোবিদার, আসন (বিজয়-সারস) এবং অর্জুন (কাঞ্চনারক) বৃক্ষের দ্বারা; **চূতৈঃ**—আম্র; **কদম্বৈঃ**—কদম্বের দ্বারা; **নীপৈঃ**—নীপ (ধূলি-কদম্ব) দ্বারা; **চ**—এবং; **নাগ-পুন্নাগ-চম্পকৈঃ**—নাগ, পুন্নাগ এবং চম্পকের দ্বারা; **পাটল-অশোক-বকুলৈঃ**—পাটল, অশোক এবং বকুলের দ্বারা; **কুন্দৈঃ**—কুন্দের দ্বারা; **কুরবকৈঃ**—কুরবকের দ্বারা; **অপি**—ও।

অনুবাদ

সমগ্র কৈলাস পর্বতটি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের দ্বারা শোভিত। তাদের কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—মন্দার, পারিজাত, সরল, তমাল, তাল, কোবিদার, আসন, অর্জুন, আম্র, কদম্ব, ধূলি-কদম্ব, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ এবং কুরবক। সমগ্র পর্বতটি এই সমস্ত বৃক্ষের দ্বারা শোভিত যাতে সুরভিত ফুল ফোটে।

শ্লোক ১৬

স্বর্ণার্ণশতপত্রৈশ্চ বররেণুকজাতিভিঃ ।
কুব্জকৈর্মল্লিকাভিশ্চ মাধবীভিশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ১৬ ॥

স্বর্ণার্ণ—স্বর্ণবর্ণ; **শত-পত্রৈঃ**—পদ্মের দ্বারা; **চ**—এবং; **বর-রেণুক-জাতিভিঃ**—বর, রেণুক এবং মালতীর দ্বারা; **কুব্জকৈঃ**—কুব্জকের দ্বারা; **মল্লিকাভিঃ**—মল্লিকার দ্বারা; **চ**—এবং; **মাধবীভিঃ**—মাধবীর দ্বারা; **চ**—এবং; **মণ্ডিতম্**—শোভিত।

অনুবাদ

অন্যান্য বৃক্ষও সেই পর্বতকে সুশোভিত করেছে, যথা—স্বর্ণবর্ণ কমল, দারুচিনি, মালতী, কুব্জ, মল্লিকা এবং মাধবী।

শ্লোক ১৭

পনসোদুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষন্যগ্রোধহিঙ্গুভিঃ ।
ভূর্জৈরোষধিভিঃ পূগৈ রাজপূগৈশ্চ জম্বুভিঃ ॥ ১৭ ॥

পনস-উদুম্বর-অশ্বত্থ-প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ-হিঙ্গুভিঃ—পনস (কাঁঠাল), উদুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ এবং হিং উৎপাদক বৃক্ষের দ্বারা; **ভূর্জৈঃ**—ভূর্জ দ্বারা; **ওষধিভিঃ**—সুপারি গাছের দ্বারা; **পূগৈঃ**—পূগের দ্বারা; **রাজপূগৈঃ**—রাজপূগের দ্বারা; **চ**—এবং; **জম্বুভিঃ**—জম্বুর দ্বারা।

অনুবাদ

কৈলাস পর্বত অন্যান্য যে-সমস্ত বৃক্ষের দ্বারা শোভিত, সেগুলি হচ্ছে কাঁঠাল, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ এবং হিং-উৎপাদনকারী বৃক্ষ। সেখানে সুপারি, ভূর্জপত্র, পূগ, রাজপূগ, জম্বু ইত্যাদি বৃক্ষও রয়েছে।

শ্লোক ১৮

খর্জূরাম্রাতকাম্রাদ্যৈঃ প্রিয়ালমধুকেঙ্গুদৈঃ ।
দ্রুমজাতিভিরন্যৈশ্চ রাজিতং বেণুকীচকৈঃ ॥ ১৮ ॥

খর্জূর-আম্রাতক-আম্র-আদ্যৈঃ—খর্জূর, আম্রাতক, আম্র ইত্যাদির দ্বারা; **প্রিয়াল-মধুক-ইঙ্গুদৈঃ**—প্রিয়াল, মধুক এবং ইঙ্গুদের দ্বারা; **দ্রুম-জাতিভিঃ**—বিভিন্ন বৃক্ষের দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্য; **চ**—এবং; **রাজিতম্**—শোভিত; **বেণু-কীচকৈঃ**—বেণু (বাঁশ) এবং কীচক (ফাঁপা বাঁশ) দ্বারা।

অনুবাদ

সেখানে আম, প্রিয়াল, মধুক এবং ইঙ্গুদ বৃক্ষ আছে। আর তা ছাড়া বেণু, কীচক এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার বাঁশ গাছ রয়েছে, যা কৈলাস পর্বতকে পরিশোভিত করে আছে।

শ্লোক ১৯-২০

কুমুদোৎপলকহ্লারশতপত্রবনর্দ্ধিভিঃ ।
নলিনীষু কলং কূজৎখগবৃন্দোপশোভিতম্ ॥ ১৯ ॥

মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ ক্রোড়ৈর্মৃগেন্দ্রৈর্ঋক্ষশল্যকৈঃ ।
গবয়ৈঃ শরভৈর্ব্যাঘ্রৈ রুরুভির্মহিষাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

কুমুদ—কুমুদ; **উৎপল**—উৎপল; **কহ্লার**—কহ্লার; **শতপত্র**—পদ্ম; **বন**—বন; **ঋদ্ধিভিঃ**—আচ্ছাদিত; **নলিনীষু**—সরোবরে; **কলম্**—অত্যন্ত মধুর স্বরে; **কূজৎ**—কাকলি; **খগ**—পক্ষীদের; **বৃন্দ**—সমূহ; **উপশোভিতম্**—অলঙ্কৃত; **মৃগৈঃ**—হরিণের দ্বারা; **শাখা-মৃগৈঃ**—বানরদের দ্বারা; **ক্রোড়ৈঃ**—শূকরদের দ্বারা; **মৃগ-ইন্দ্রৈঃ**—সিংহদের দ্বারা; **ঋক্ষ-শল্যকৈঃ**—ঋক্ষ এবং শল্যকদের দ্বারা; **গবয়ৈঃ**—নীল গাইদের দ্বারা; **শরভৈঃ**—বন্য গর্দভদের দ্বারা; **ব্যাঘ্রৈঃ**—বাঘেদের দ্বারা; **রুরুভিঃ**—এক প্রকার ছোট হরিণদের দ্বারা; **মহিষ-আদিভিঃ**—মহিষ ইত্যাদির দ্বারা;

অনুবাদ

সেখানে কুমুদ, উৎপল, শতপত্র আদি নানা প্রকার পদ্ম রয়েছে। সেই বন সুশোভিত উদ্যানের মতো প্রতীত হয়, এবং সেখানকার ছোট ছোট সরোবরগুলি বিভিন্ন প্রকার পাখির অতি মধুর কূজনে মুখরিত। সেই স্থানটি হরিণ, বানর, শূকর, সিংহ, ঋক্ষ, শল্যক, নীল গাই, বন্য গর্দভ, ব্যাঘ্র, রুরু, মহিষ ইত্যাদি নানা প্রকার পশুতে পূর্ণ, তারা সেখানে তাদের জীবন উপভোগ করে থাকে।

শ্লোক ২১

কর্ণান্ত্রৈকপদাশ্বাস্যৈর্নির্জুষ্টং বৃকনাভিভিঃ ।
কদলীখণ্ডসংরুদ্ধনলিনীপুলিনশ্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥

কর্ণান্ত্র—কর্ণান্ত্রের দ্বারা; **একপদ**—একপদ; **অশ্বাস্যৈঃ**—অশ্বাস্যের দ্বারা; **নির্জুষ্টম্**—পূর্ণরূপে উপভোগ করে; **বৃক-নাভিভিঃ**—বৃক এবং নাভি বা কস্তুরী মৃগ; **কদলী**—কদলী বৃক্ষের; **খণ্ড**—সমূহ; **সংরুদ্ধ**—আচ্ছাদিত; **নলিনী**—পদ্মফুলে পূর্ণ ক্ষুদ্র সরোবর; **পুলিন**—বালুকাময় তটভূমি-সমন্বিত; **শ্রিয়ম্**—অত্যন্ত সুন্দর।

অনুবাদ

সেখানে কর্ণান্ত্র, একপদ, অশ্বাস্য, বৃক এবং কস্তুরী প্রভৃতি নানাবিধ মৃগ বাস করছে। পাহাড়ের গায়ে সরোবরের তীরে বহু কদলী বৃক্ষ অপূর্ব সুষমা বিস্তার করছে।

শ্লোক ২২

পর্যস্তং নন্দয়া সত্যাঃ স্নানপুণ্যতরোদয়া ।
বিলোক্য ভূতেশগিরিং বিবুধা বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ২২ ॥

পর্যস্তম্—পরিবেষ্টিত; **নন্দয়া**—নন্দার দ্বারা; **সত্যাঃ**—সতীর; **স্নান**—স্নানের ফলে; **পুণ্য-তর**—বিশেষভাবে সুগন্ধিত; **উদয়া**—জলের দ্বারা; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **ভূত-ঈশ**—ভূতদের ঈশ্বর শিবের; **গিরিম্**—পর্বত; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণ; **বিস্ময়ম্**—আশ্চর্য; **যযুঃ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সেখানে অলকনন্দা নামে ছোট হ্রদটিতে সতী স্নান করতেন, এবং সেই হ্রদটি বিশেষভাবে পবিত্র। কৈলাস পর্বতের অপূর্ব সৌন্দর্য এবং মহান ঐশ্বর্য দর্শন করে দেবতারা বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা নামক ভাষ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সতী যে জলে স্নান করতেন তা ছিল গঙ্গা। অর্থাৎ গঙ্গা কৈলাস পর্বত দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই বর্ণনা স্বীকার করতে কোন অসুবিধা নেই, কারণ গঙ্গা শিবের জটা থেকেও প্রবাহিত হচ্ছে। গঙ্গা যেহেতু শিবের জটা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য অংশে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই এটি সম্পূর্ণ সম্ভব যে, যে-জলে সতী স্নান করতেন তা অবশ্যই অতি সুগন্ধিত ছিল এবং তা ছিল গঙ্গাজল।

শ্লোক ২৩

দদৃশুস্তত্র তে রম্যামলকাং নাম বৈ পুরীম্ ।
বনং সৌগন্ধিকং চাপি যত্র তন্নাম পঙ্কজম্ ॥ ২৩ ॥

দদৃশুঃ—দেখেছিলেন; **তত্র**—সেখানে (কৈলাসে); **তে**—তাঁরা (দেবতারা); **রম্যাম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **অলকাম্**—অলকা; **নাম**—নামক; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **পুরীম্**—পুরী; **বনম্**—বন; **সৌগন্ধিকম্**—সৌগন্ধিক; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **যত্র**—যে-স্থানে; **তৎ-নাম**—সেই নামে পরিচিত; **পঙ্কজম্**—এক জাতের পদ্মফুল।

অনুবাদ

দেবতারা সৌগন্ধিক নামক, অর্থাৎ সুগন্ধে পরিপূর্ণ এক বনে অলকা নামক এক অপূর্ব সুন্দর স্থান দর্শন করেছিলেন। সেই বনে প্রচুর পদ্মফুলের জন্য তার নাম হয়েছিল সৌগন্ধিক।

তাৎপর্য

অলকা কখনও কখনও অলকাপুরী নামেও প্রসিদ্ধ, যা কুবেরের আবাসস্থলের নাম। কুবেরের আলয় কিন্তু কৈলাস থেকে দেখা যায় না। অতএব এখানে যে অলকা নামক স্থানের বর্ণনা করা হয়েছে, তা কুবেরের অলকাপুরী থেকে ভিন্ন। বীর-রাঘব আচার্যের মতে, *অলকা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অসাধারণ সৌন্দর্যময়'। দেবতারা যে অলকা ভূভাগ দর্শন করেছিলেন, সেখানে সৌগন্ধিক নামক এক প্রকার পদ্মফুল পাওয়া যায়, যা বিশেষ সৌরভ বিস্তার করে।

শ্লোক ২৪

নন্দা চালকনন্দা চ সরিতৌ বাহ্যতঃ পুরঃ ।
তীর্থপাদপদাম্ভোজরজসাতীব পাবনে ॥ ২৪ ॥

নন্দা—নন্দা; **চ**—এবং; **অলকনন্দা**—অলকনন্দা; **চ**—এবং; **সরিতৌ**—দুটি নদী; **বাহ্যতঃ**—বহির্ভাগে; **পুরঃ**—সেই নগরীর; **তীর্থ-পাদ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদ-অম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্মের; **রজসা**—ধূলির দ্বারা; **অতীব**—অত্যন্ত; **পাবনে**—পবিত্র।

অনুবাদ

তাঁরা নন্দা এবং অলকনন্দা নামক দুটি নদীও দর্শন করেছিলেন। এই নদী দুটি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার দ্বারা বিশেষভাবে পবিত্র।

শ্লোক ২৫

যয়োঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ক্ষত্তরবরুহ্য স্বধিষ্ণ্যতঃ ।
ক্রীড়ন্তি পুংসঃ সিঞ্চন্ত্যো বিগাহ্য রতিকর্শিতাঃ ॥ ২৫ ॥

যয়োঃ—যেই দুটি নদীতে; **সুর-স্ত্রিয়ঃ**—তাঁদের পতিগণ সহ স্বর্গের রমণীগণ; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **অবরুহ্য**—অবতরণ করে; **স্ব-ধিষ্ণ্যতঃ**—তাঁদের বিমান থেকে;

ক্রীড়ন্তি—খেলা করেন; **পুংসঃ**—তাঁদের পতিগণ; **সিঞ্চন্ত্যঃ**—জল সিঞ্চন করে; **বিগাহ্য**—জলে প্রবেশ করে; **রতি-কর্শিতাঃ**—সম্ভোগশ্রান্তা।

অনুবাদ

হে বিদুর! স্বর্গের সুন্দরীরা তাঁদের পতিগণ সহ বিমানে চড়ে এই নদীতে অবতরণ করেন, এবং কামক্রীড়ার পর, জলে প্রবেশ করে তাঁদের পতিদের অঙ্গে জল সিঞ্চন করে তাঁরা আনন্দ উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, স্বর্গলোকের রমণীরাও যৌন সুখের চিন্তার দ্বারা কলুষিত এবং তাই তাঁরা বিমানে চড়ে নন্দা এবং অলকনন্দা নদীতে স্নান করতে আসেন। এই নন্দা এবং অলকনন্দা নদীগুলি পরমেশ্বর ভগবানের পদরজের দ্বারা পবিত্র হওয়ার ফলে মাহাত্ম্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, গঙ্গা যেমন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের পদনখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে পবিত্র, তেমনই জল অথবা অন্য কোন বস্তু যখন ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সংস্পর্শে আসে, তখন তা পবিত্র হয় এবং চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্ভক্তির বিধি-বিধানগুলি এই তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—কোন কিছু যখন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ তা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

স্বর্গ-সুন্দরীরা যৌন ভাবনার দ্বারা কলুষিত হয়ে সেই পবিত্র নদীতে স্নান করতে আসেন এবং তাঁদের কান্তদের অঙ্গে জল সিঞ্চন করে আনন্দ উপভোগ করেন। এই সম্পর্কে দুটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *রতি-কর্শিতাঃ* মানে হচ্ছে যৌন সুখ উপভোগের পর সেই সুন্দরীরা বিষণ্ণ হন। যদিও তাঁরা দেহের আবেদনে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হন, কিন্তু তার পর তাঁরা সুখী হন না।

আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দকে এখানে তীর্থপাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *তীর্থ* মানে হচ্ছে 'পবিত্র স্থান' এবং *পাদ* মানে হচ্ছে 'ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম'। মানুষ পবিত্র তীর্থে যায় তাদের পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। অর্থাৎ, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অনুরক্ত, তাঁরা আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে যান। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে বলা হয় *তীর্থপাদ*, কারণ তাঁর আশ্রয়ে হাজার হাজার মহাত্মা রয়েছেন, যাঁরা তীর্থস্থানসমূহকে পবিত্র করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহান আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর আমাদের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ না করার উপদেশ দিয়েছেন। এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কষ্টকর, কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান, তিনি গোবিন্দের

শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন এবং তার ফলে তিনি তীর্থযাত্রার পরিণাম-স্বরূপ আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে যেতে পারেন। যিনি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছেন, তাঁকে বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণ করতে হয় না, কারণ কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলেই তিনি এই প্রকার তীর্থ-ভ্রমণের সমস্ত সুফল লাভ করতে পারেন। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত, যাঁর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিক ভক্তি রয়েছে, তিনি পৃথিবীর যেখানেই থাকেন না কেন, সেই স্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়। *তীর্থী-কুর্বন্তি তীর্থানি* (ভাগবত ১/১৩/১০)। শুদ্ধ ভক্তের উপস্থিতির ফলে সমস্ত স্থান পবিত্র হয়ে যায়; যে স্থানে ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্ত অবস্থান করেন বা বাস করেন, সেই স্থান আপনা থেকেই পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়। অর্থাৎ সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন স্থানে থাকতে পারেন, এবং ভগবানের ইচ্ছায় শান্তিপূর্ণভাবে ভগবানের সেবা করার ফলে, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়ে যায়।

শ্লোক ২৬

যয়োস্তৎস্নানবিভ্রষ্টনবকুঙ্কুমপিঞ্জরম্ ।
বিতৃষোঽপি পিবন্ত্যম্ভঃ পায়য়ন্তো গজা গজীঃ ॥ ২৬ ॥

যয়োঃ—সেই দুটি নদীতে; **তৎ-স্নান**—সুর-কামিনীদের স্নানের ফলে; **বিভ্রষ্ট**—বিগলিত; **নব**—নতুন; **কুঙ্কুম**—কুমকুম চূর্ণের দ্বারা; **পিঞ্জরম্**—পীতবর্ণ; **বিতৃষঃ**—তৃষ্ণার্ত না হয়ে; **অপি**—সত্ত্বেও; **পিবন্তি**—পান করে; **অম্ভঃ**—জল; **পায়য়ন্তঃ**—পান করায়; **গজাঃ**—হস্তী; **গজীঃ**—হস্তিনী।

অনুবাদ

দিব্যাঙ্গনাদের স্নানের ফলে, তাঁদের গাত্রভ্রষ্ট নব কুমকুমের সংযোগে সেই দুটি নদীর জল পীতবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন স্নানের জন্য সেখানে আগত হস্তিনীগণ সহ হস্তীরা তৃষ্ণার্ত না হলেও, সেই জল পান করে।

শ্লোক ২৭

তারহেমমহারত্নবিমানশতসঙ্কুলাম্ ।
জুষ্টাং পুণ্যজনস্ত্রীভির্যথা খং সতড়িদ্ঘনম্ ॥ ২৭ ॥

তার-হেম—মুক্তা এবং সোনা; **মহা-রত্ন**—বহুমূল্য রত্ন; **বিমান**—বিমানের; **শত**—শত-শত; **সঙ্কুলাম্**—ঝাঁক; **জুষ্টাম্**—নিষেবিত; **পুণ্যজন-স্ত্রীভিঃ**—যক্ষপত্নীদের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **খম্**—আকাশ; **স-তড়িৎ-ঘনম্**—বিদ্যুৎ এবং মেঘ-সমন্বিত।

অনুবাদ

স্বর্গবাসীদের বিমানগুলি মুক্তা, সোনা এবং বহুমূল্য রত্নখচিত। আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-ঝলকের দ্বারা উদ্ভাসিত মেঘরাজির সঙ্গে সেই স্বর্গবাসীদের তুলনা করা হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে বিমানের বর্ণনা করা হয়েছে, তা আমাদের পরিচিত বিমান থেকে ভিন্ন। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বিমানের বহু বর্ণনা রয়েছে। বিভিন্ন গ্রহলোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিমান রয়েছে। এই স্থূল পৃথিবীর বিমান যন্ত্রচালিত, কিন্তু অন্যান্য লোকের বিমানসমূহ যন্ত্রচালিত নয়, সেইগুলি মন্ত্রের দ্বারা চালিত হয়। স্বর্গবাসীরা এক লোক থেকে আর এক লোকে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করার জন্য সেইগুলির ব্যবহার করেন। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা বিমানের সাহায্য ব্যতীতই এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করতে পারেন। স্বর্গলোকের সুন্দর বিমানগুলির তুলনা আকাশের সঙ্গে করা হয়েছে, কারণ সেইগুলি আকাশে বিচরণ করে; আর সেই বিমানের যাত্রীদের মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্বর্গবাসীদের সুন্দরী স্ত্রীদের তুলনা করা হয়েছে বিদ্যুতের সঙ্গে। মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, স্বর্গলোক যাত্রীদের নিয়ে যে সমস্ত বিমান কৈলাসে এসেছিল, সেইগুলি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল।

শ্লোক ২৮

হিত্বা যক্ষেশ্বরপুরীং বনং সৌগন্ধিকং চ তৎ ।
দ্রুমৈঃ কামদুঘৈর্হৃদ্যং চিত্রমাল্যফলচ্ছদৈঃ ॥ ২৮ ॥

হিত্বা—অতিক্রম করে; **যক্ষ-ঈশ্বর**—যক্ষদের ঈশ্বর (কুবের); **পুরীম্**—বাসস্থান; **বনম্**—বন; **সৌগন্ধিকম্**—সৌগন্ধিক নামক; **চ**—এবং; **তৎ**—তা; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষের দ্বারা; **কাম-দুঘৈঃ**—বাসনা-পূর্ণকারী; **হৃদ্যম্**—আকর্ষণীয়; **চিত্র**—বিচিত্র; **মাল্য**—পুষ্প; **ফল**—ফল; **ছদৈঃ**—পত্র।

অনুবাদ

ভ্রমণকালে দেবতারা সৌগন্ধিক নামক সেই বনটি অতিক্রম করলেন, যা বিবিধ প্রকার ফুল, ফল এবং কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। সেই বনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে, তাঁরা যক্ষেশ্বর কুবেরের পুরীও দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

যক্ষেশ্বর কুবের নামেও পরিচিত, এবং তিনি হচ্ছেন দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত ধনবান। এই শ্লোকগুলি থেকে প্রতীত হয় যে, কৈলাস কুবেরের বাসস্থানের নিকটেই অবস্থিত। এখানে এই কথাও বলা হয়েছে যে, সেই বনটি ছিল কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, কল্পবৃক্ষ বৈকুণ্ঠলোকে, বিশেষ করে কৃষ্ণলোকে পাওয়া যায়। এখানে আমরা জানতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, শিবের আলয় কৈলাসেও তেমন কল্পবৃক্ষ দেখা যায়। তা থেকে বোঝা যায় যে, কৈলাস একটি বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান; তা প্রায় শ্রীকৃষ্ণের ধামেরই মতো।

শ্লোক ২৯

রক্তকণ্ঠখগানীকস্বরমণ্ডিতষট্‌পদম্ ।
কলহংসকুলপ্রেষ্ঠং খরদণ্ডজলাশয়ম্ ॥ ২৯ ॥

রক্ত—রক্তাভ; **কণ্ঠ**—কণ্ঠ; **খগ-অনীক**—অনেক পক্ষীর; **স্বর**—মধুর স্বরের দ্বারা; **মণ্ডিত**—সুশোভিত; **ষট্‌-পদম্**—ভ্রমর; **কলহংস-কুল**—কলহংসের ঝাঁক; **প্রেষ্ঠম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **খর-দণ্ড**—পদ্মফুল; **জল-আশয়ম্**—সরোবর।

অনুবাদ

সেই দিব্য বনে বহু পাখি ছিল যাদের গলার রং ছিল লাল এবং তাদের মধুর স্বরের সঙ্গে ভ্রমরকুলের গুঞ্জন মিশ্রিত হয়েছিল। সেখানকার সরোবরগুলি কলহংস এবং খরদণ্ড মৃণালসমূহের দ্বারা সুশোভিত ছিল।

তাৎপর্য

সেখানে বহু সরোবর ছিল বলে সেই বনের সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছিল। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই সরোবরগুলি পদ্মফুলের দ্বারা সুশোভিত ছিল, এবং

সেখানে হংসকুল অন্যান্য পক্ষী ও গুঞ্জনরত ভ্রমরদের সঙ্গে খেলা করে গান করত। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে, আমরা অনুমান করতে পারি সেই স্থান কত সুন্দর ছিল, এবং সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দেবতারা সেই পরিবেশ কিভাবে উপভোগ করেছিলেন। এই পৃথিবীতে মানুষ বহু পথ এবং সুন্দর স্থান নির্মাণ করেছে, কিন্তু এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তার কোনটিই কৈলাসের সৌন্দর্য অতিক্রম করতে পারে না।

শ্লোক ৩০

বনকুঞ্জরসংঘৃষ্টহরিচন্দনবায়ুনা ।
অধি পুণ্যজনস্ত্রীণাং মুহুরুন্মথয়ন্মনঃ ॥ ৩০ ॥

বন-কুঞ্জর—বন্য হস্তী; **সংঘৃষ্ট**—গাত্র ঘর্ষণ করেছে; **হরিচন্দন**—চন্দন বৃক্ষ; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **অধি**—অধিকন্তু; **পুণ্যজন-স্ত্রীণাম্**—যক্ষপত্নীদের; **মুহুঃ**—বারংবার; **উন্মথয়ৎ**—ক্ষোভিত; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

সেই পরিবেশ চন্দন বনে সমবেত বন্য হস্তীর পালকে প্রভাবিত করে, এবং সেখানকার সমীরণ যক্ষপত্নীদের চিত্ত রতি সুখের জন্য উন্মথিত করে।

তাৎপর্য

জড় জগতে যখনই সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ বিষয়াসক্ত মানুষদের মনে যৌন বাসনার উদয় হয়। এই প্রবৃত্তি কেবল এই পৃথিবীতেই নয়, উচ্চতর লোকেও দেখা যায়। জড় জগতের জীবদের মনে এই পরিবেশগত প্রভাবের ঠিক বিপরীত হচ্ছে চিৎ-জগতের বর্ণনা। সেখানকার রমণীরা শত-সহস্রগুণ অধিক সুন্দরী, এবং সেখানকার চিন্ময় পরিবেশও বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। তা সত্ত্বেও সেখানকার অধিবাসীদের মন কখনই কামোদ্দীপ্ত হয় না, কারণ তাঁদের চিন্ময় চেতনা ভগবানের মহিমা কীর্তনে এতই মগ্ন থাকে যে, কোন রকম সুখই, এমন কি জড় জগতের চরম সুখ, যৌন সুখও সেই আনন্দের কাছে নিতান্তই নগণ্য বলে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ, বৈকুণ্ঠলোকের পরিবেশ এবং সুযোগ-সুবিধা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, সেখানে যৌন জীবনের প্রতি কোন রকম প্রবণতা নেই। *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*—সেখানকার অধিবাসীরা চিন্ময় চেতনায় এমনই উদ্ভাসিত যে, তার তুলনায় রতি সুখ নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়।

শ্লোক ৩১

বৈদূর্যকৃতসোপানা বাপ্য উৎপলমালিনীঃ ।
প্রাপ্তং কিম্পুরুষৈর্দৃষ্ট্বা ত আরাদ্দদৃশুর্বটম্ ॥ ৩১ ॥

বৈদূর্য-কৃত—বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত; **সোপানাঃ**—সিঁড়ি; **বাপ্যঃ**—সরোবর; **উৎপল**—পদ্মফুলের; **মালিনীঃ**—শ্রেণীবদ্ধ; **প্রাপ্তম্**—অধ্যুষিত; **কিম্পুরুষৈঃ**—কিম্পুরুষদের দ্বারা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তে**—সেই দেবতারা; **আরাৎ**—অদূরে; **দদৃশুঃ**—দেখেছিলেন; **বটম্**—একটি বট বৃক্ষ।

অনুবাদ

তাঁরা আরও দেখেছিলেন যে, সেখানকার স্নানের ঘাট ও সেগুলির সোপানশ্রেণী বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত। সেখানকার সরোবরগুলি ছিল পদ্মে পূর্ণ। ঐ সমস্ত সরোবর অতিক্রম করে দেবতারা একটি বিশাল বট বৃক্ষ দর্শন করলেন।

শ্লোক ৩২

স যোজনশতোৎসেধঃ পাদোনবিটপায়তঃ ।
পর্যক্কৃতাচলচ্ছায়ো নির্নীড়স্তাপবর্জিতঃ ॥ ৩২ ॥

সঃ—সেই বট বৃক্ষটি; **যোজন-শত**—এক শত যোজন (আট শত মাইল); **উৎসেধঃ**—উচ্চ; **পাদ-ঊন**—এক-চতুর্থাংশ কম (ছয় শত মাইল); **বিটপ**—শাখাসমূহের দ্বারা; **আয়তঃ**—বিস্তীর্ণ; **পর্যক্**—সর্বত্র; **কৃত**—নির্মিত; **অচল**—স্থির; **ছায়ঃ**—ছায়া; **নির্নীড়ঃ**—পাখির নীড়বিহীন; **তাপ-বর্জিতঃ**—তাপ-রহিত।

অনুবাদ

সেই বট বৃক্ষটি ছিল আট শত মাইল দীর্ঘ, এবং তার শাখাগুলি ছয় শত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই বৃক্ষটি অপূর্ব সুন্দর শীতল ছায়া বিস্তার করেছিল, কিন্তু তবুও সেখানে কোন পাখির কোলাহল ছিল না।

তাৎপর্য

সাধারণত প্রত্যেক বৃক্ষে পাখির নীড় থাকে, এবং সন্ধ্যাবেলা পাখিরা সেখানে জড় হয়ে কলরব সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই বট বৃক্ষটিতে কোন পাখির নীড় ছিল না,

এবং তাই সেটি ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ এবং নীরব। সেখানে কোন রকম কোলাহল অথবা তাপের উপদ্রব ছিল না, এবং তাই সেই স্থানটি ধ্যানের পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিল।

শ্লোক ৩৩

তস্মিন্মহাযোগময়ে মুমুক্ষুশরণে সুরাঃ ।
দদৃশুঃ শিবমাসীনং ত্যক্তামর্ষমিবান্তকম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্মিন্—সেই বৃক্ষের নীচে; **মহা-যোগ-ময়ে**—পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে যুক্ত বহু যোগী-সমন্বিত; **মুমুক্ষু**—মুক্তিকামীদের; **শরণে**—আশ্রয়; **সুরাঃ**—দেবতাগণ; **দদৃশুঃ**—দেখেছিলেন; **শিবম্**—শিবকে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **ত্যক্ত-অমর্ষম্**—ক্রোধরহিত; **ইব**—যেন; **অন্তকম্**—অনন্ত কাল।

অনুবাদ

দেবতারা দেখেছিলেন যে, শিব সেই বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট ছিলেন, যে বৃক্ষটি যোগীদের সিদ্ধি প্রদান করতে এবং সমস্ত মানুষদের মুক্ত করতে সক্ষম। অনন্ত কালের মতো গম্ভীর শিবকে তখন সমস্ত ক্রোধ থেকে মুক্ত বলে মনে হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মহা-যোগময়ে* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *যোগ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান, এবং *মহা যোগ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি ভগবান বিষ্ণুর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। ধ্যান মানে হচ্ছে স্মরণ। ভক্তি নয় প্রকার, তার মধ্যে স্মরণ হচ্ছে একটি। যোগী তাঁর হৃদয়ে বিষ্ণুরূপ স্মরণ করেন। তাই সেই বিশাল বট বৃক্ষের নীচে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন বহু ভক্ত ছিলেন।

মহা শব্দটি এসেছে *মহৎ* উপসর্গটি থেকে। অত্যন্ত অধিক সংখ্যা বা মাত্রা বোঝাবার উদ্দেশ্যে এই উপসর্গটির ব্যবহার হয়। অতএব, *মহা-যোগ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সেখানে বহু মহান যোগী এবং ভক্ত শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করছিলেন। সাধারণত এই প্রকার ধ্যানীগণ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের অভিলাষী, এবং তাঁরা চিৎ-জগৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন। মুক্তির অর্থ হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন বা অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, এই জড় জগতে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি, এবং মুক্তি হচ্ছে সেই দুঃখময় অবস্থার নিবৃত্তি।

শ্লোক ৩৪

সনন্দনাদ্যৈর্মহাসিদ্ধৈঃ শান্তৈঃ সংশান্তবিগ্রহম্ ।
উপাস্যমানং সখ্যা চ ভর্ত্রা গুহ্যকরক্ষসাম্ ॥ ৩৪ ॥

সনন্দন-আদ্যৈঃ—সনন্দন আদি চার কুমারগণ; **মহা-সিদ্ধৈঃ**—মুক্তাত্মাগণ; **শান্তৈঃ**—শান্ত প্রকৃতি; **সংশান্ত-বিগ্রহম্**—প্রশান্ত বিগ্রহ শিব; **উপাস্যমানম্**—স্তূয়মান; **সখ্যা**—কুবেরের দ্বারা; **চ**—এবং; **ভর্ত্রা**—প্রভুর দ্বারা; **গুহ্যক-রক্ষসাম্**—গুহ্যক এবং রাক্ষসদের।

অনুবাদ

প্রশান্তবিগ্রহ শিব গুহ্যকদের পালক কুবের, এবং চার কুমারদের মতো মুক্তাত্মাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেখানে বসে ছিলেন।

তাৎপর্য

শিবের সঙ্গে উপবিষ্ট পুরুষগণ ছিলেন মহত্ত্বপূর্ণ, কারণ চার কুমারেরা জন্ম থেকেই মুক্ত ছিলেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই কুমারদের জন্মের পরেই নব সৃজিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা বৃদ্ধির জন্য, বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করতে তাঁদের পিতা তাঁদেরকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ব্রহ্মা তখন ক্রুদ্ধ হন। সেই ক্রোধ থেকে রুদ্র বা শিবের জন্ম হয়। সেই সূত্রে চতুঃসন এবং শিব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের অত্যন্ত ধনবান। এইভাবে কুমারগণ এবং কুবেরের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক ইঙ্গিত করে যে, তাঁর কাছে সমস্ত চিন্ময় এবং ভৌতিক ঐশ্বর্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার; অতএব তাঁর পদমর্যাদা অত্যন্ত উন্নত।

শ্লোক ৩৫

বিদ্যাতপোযোগপথমাস্থিতং তমধীশ্বরম্ ।
চরন্তং বিশ্বসুহৃদং বাৎসল্যাল্লোকমঙ্গলম্ ॥ ৩৫ ॥

বিদ্যা—জ্ঞান; **তপঃ**—তপস্যা; **যোগ-পথম্**—ভক্তিমার্গ; **আস্থিতম্**—অবস্থিত; **তম্**—তাঁকে (শিবকে); **অধীশ্বরম্**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; **চরন্তম্**—(তপশ্চর্যা ইত্যাদি) অনুষ্ঠান করে; **বিশ্ব-সুহৃদম্**—সমগ্র জগতের বন্ধু; **বাৎসল্যাৎ**—পূর্ণ স্নেহের ফলে; **লোক-মঙ্গলম্**—সকলের জন্য কল্যাণকর।

অনুবাদ

দেবতারা দেখলেন, শিব ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, সকাম কর্ম এবং সিদ্ধিমার্গের অধীশ্বররূপে অবস্থিত। তিনি ছিলেন সমগ্র জগতের সুহৃদ, এবং সকলের প্রতি পূর্ণরূপে স্নেহপরায়ণ হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত কল্যাণকারী।

তাৎপর্য

শিব জ্ঞান এবং তপস্যায় পূর্ণ। যিনি কর্মের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমার্গে অবস্থিত। ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের উপায় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা যায় না।

এখানে শিবকে *অধীশ্বর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ঈশ্বর* মানে হচ্ছে 'নিয়ন্তা', এবং *অধীশ্বর* শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা'। সাধারণত আমাদের কলুষিত ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার প্রবণতাসম্পন্ন, কিন্তু কেউ যখন জ্ঞান এবং তপস্যার দ্বারা উন্নত হন, তখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র হয় এবং সেইগুলি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। শিব হচ্ছেন এই প্রকার সিদ্ধির প্রতীক, এবং তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—শিব হচ্ছেন বৈষ্ণব। এই জড় জগতে শিব তাঁর কার্যকলাপের দ্বারা সমস্ত বদ্ধ জীবদের শিক্ষা দেন কিভাবে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে হয়। তাই এখানে তাঁকে *লোক-মঙ্গল,* অর্থাৎ সমস্ত বদ্ধ জীবদের মঙ্গলের মূর্ত বিগ্রহ স্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

লিঙ্গং চ তাপসাভীষ্টং ভস্মদণ্ডজটাজিনম্ ।
অঙ্গেন সন্ধ্যাভ্ররুচা চন্দ্রলেখাং চ বিভ্রতম্ ॥ ৩৬ ॥

লিঙ্গম্—লক্ষণ; **চ**—এবং; **তাপস-অভীষ্টম্**—শৈব তপস্বীদের বাঞ্ছিত; **ভস্ম**—ভস্ম; **দণ্ড**—দণ্ড; **জটা**—জটাজুট; **অজিনম্**—মৃগচর্ম; **অঙ্গেন**—শরীরের দ্বারা; **সন্ধ্যা-অভ্র**—রক্তিম; **রুচা**—বর্ণ; **চন্দ্র-লেখাম্**—চন্দ্রলেখা; **চ**—এবং; **বিভ্রতম্**—ধারণকারী।

অনুবাদ

তিনি একটি মৃগচর্মে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সব রকম তপস্যা করছিলেন। তাঁর দেহ ভস্মাচ্ছাদিত ছিল বলে, তাঁকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো দেখাচ্ছিল। তিনি তাঁর ললাটে চন্দ্রলেখা প্রতীকী-চিহ্ন ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শিবের তপস্যার চিহ্নগুলি ঠিক বৈষ্ণবের মতো নয়। শিব নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, কিন্তু বৈষ্ণব রীতি পালনে অক্ষম মানুষদের জন্য তিনি এক বিশেষরূপ ধারণ করেন। শিবভক্ত বা শৈবেরা সাধারণত শিবের মতো বেশভূষা ধারণ করে, এবং তারা কখনও কখনও ধূমপান ও মাদক দ্রব্য সেবন করে। বৈষ্ণব প্রথার অনুগামীরা কখনও এই প্রকার আচরণ করেন না।

শ্লোক ৩৭

উপবিষ্টং দর্ভময্যাং বৃস্যাং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নারদায় প্রবোচন্তং পৃচ্ছতে শৃণ্বতাং সতাম্ ॥ ৩৭ ॥

উপবিষ্টম্—উপবিষ্ট; **দর্ভ-ময্যাম্**—কুশ-নির্মিত; **বৃস্যাম্**—আসনে; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **সনাতনম্**—শাশ্বত; **নারদায়**—নারদকে; **প্রবোচন্তম্**—উপদেশ করছেন; **পৃচ্ছতে**—প্রশ্ন করছেন; **শৃণ্বতাম্**—শ্রবণ করছেন; **সতাম্**—মহর্ষিদের।

অনুবাদ

তিনি কুশাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সেখানে উপস্থিত নারদ আদি মহর্ষিদের কাছে পরমতত্ত্ব উপদেশ দিচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

শিব কুশাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কারণ পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যাঁরা তপস্যা করেন, তাঁরা এই প্রকার আসন গ্রহণ করেন। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বিখ্যাত ভক্ত দেবর্ষি নারদকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। নারদ ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিবকে প্রশ্ন করছিলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শিব তাঁকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। অর্থাৎ, শিব এবং নারদ বৈদিক জ্ঞান আলোচনা করছিলেন, কিন্তু তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল ভগবদ্ভক্তি। এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, শিব হচ্ছেন পরম উপদেষ্টা এবং নারদ মুনি হচ্ছেন পরম শ্রোতা। অতএব, বৈদিক জ্ঞানের পরম বিষয় হচ্ছে ভক্তি।

শ্লোক ৩৮

কৃত্বোরৌ দক্ষিণে সব্যং পাদপদ্মং চ জানুনি ।
বাহুং প্রকোষ্ঠেঽক্ষমালামাসীনং তর্কমুদ্রয়া ॥ ৩৮ ॥

কৃত্বা—স্থাপন করে; **উরৌ**—উরুতে; **দক্ষিণে**—দক্ষিণ দিকে; **সব্যম্**—বাম; **পাদ-পদ্মম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **চ**—এবং; **জানুনি**—তাঁর জানুতে; **বাহুম্**—হস্ত; **প্রকোষ্ঠে**—দক্ষিণ বাহুর মণিবন্ধ স্থানে; **অক্ষ-মালাম্**—রুদ্রাক্ষের মালা; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **তর্ক-মুদ্রয়া**—তর্কমুদ্রার দ্বারা।

অনুবাদ

তাঁর বাম পাদপদ্ম দক্ষিণ উরুদেশে এবং বামহস্ত বাম উরুদেশে স্থাপিত ছিল। তাঁর ডান হাতে ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। এই আসনকে বলা হয় বীরাসন। তিনি অঙ্গুলিতে তর্কমুদ্রা ধারণ করে বীরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে আসনের উল্লেখ করা হয়েছে, অষ্টাঙ্গ যোগের পন্থা অনুসারে তাকে বলা হয় *বীরাসন* । যোগ অনুশীলনে যম, নিয়ম আদি আটটি বিভাগ রয়েছে। *বীরাসন* ছাড়াও *পদ্মাসন* ও *সিদ্ধাসন* প্রভৃতি আসন রয়েছে। পরমাত্মা বিষ্ণুকে উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া ব্যতীত, এই সমস্ত আসনের অনুশীলন যোগের সিদ্ধাবস্থা নয়। শিবকে বলা হয় *যোগীশ্বর,* এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় *যোগেশ্বর* । *যোগীশ্বর* শব্দে বোঝানো হয় যে, যোগ অভ্যাসের ক্ষেত্রে কেউ শিবকে অতিক্রম করতে পারে না, এবং *যোগেশ্বর* বলতে বোঝানো হয় যে, যোগসিদ্ধিতে কেউই শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করতে পারে না। এখানে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *তর্কমুদ্রা* । এই মুদ্রায় হাতের আঙুলগুলি খোলা রাখা হয় এবং বাহু সহ তর্জনী উপরে ওঠানো হয়, শ্রোতাদের কাছে কোনও বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মুদ্রা বিশেষ।

শ্লোক ৩৯

তং ব্রহ্মনির্বাণসমাধিমাশ্রিতং
ব্যুপাশ্রিতং গিরিশং যোগকক্ষাম্ ।
সলোকপালা মুনয়ো মনূনা-
মাদ্যং মনুং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ ॥ ৩৯ ॥

তম্—তাঁকে (শিবকে); **ব্রহ্ম-নির্বাণ**—ব্রহ্মানন্দে; **সমাধিম্**—সমাধিতে; **আশ্রিতম্**—মগ্ন; **ব্যুপাশ্রিতম্**—বিশেষভাবে উপাশ্রিত; **গিরিশম্**—শিবকে; **যোগ-কক্ষাম্**—বাম

জানু দৃঢ়ীকরণের জন্য যোগপট্ট; **স-লোক-পালাঃ**—(ইন্দ্র প্রমুখ) দেবতাগণ সহ; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **মনূনাম্**—মননশীলদের; **আদ্যম্**—অগ্রগণ্য; **মনুম্**—মননশীল; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—কৃতাঞ্জলিপুটে; **প্রণেমুঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

সমস্ত মুনি এবং ইন্দ্রাদি দেবতারা কৃতাঞ্জলিপুটে শিবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। সমস্ত মননশীল মুনিদের অগ্রগণ্য মহাদেব তখন যোগপট্ট অবলম্বন করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ব্রহ্মানন্দ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই *ব্রহ্মানন্দ* বা *ব্রহ্ম-নির্বাণের* বিশ্লেষণ প্রহ্লাদ মহারাজ করেছেন। কেউ যখন অধোক্ষজে, বা জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হন, তখন তিনি *ব্রহ্মানন্দে* অবস্থিত হন।

পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব, নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা উপলব্ধি করা অসম্ভব, কারণ তিনি জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ধারণার অতীত চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের কল্পনা অথবা ধারণা করতে পারে না, তাই তারা মনে করে যে, ভগবান মরে গেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ-স্বরূপে তিনি নিত্য বিরাজমান। নিরন্তর ভগবানের রূপের ধ্যানকে বলা হয় *সমাধি* । *সমাধির* অর্থ হচ্ছে মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করা, অতএব যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করেন, তিনি নিরন্তর *ব্রহ্ম-নির্বাণ* বা *ব্রহ্মানন্দ* উপভোগ করে সমাধিমগ্ন থাকেন। শিব এই সমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ছিলেন।

আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *যোগ-কক্ষাম্* । *যোগ-কক্ষা* হচ্ছে একটি আসন যাতে বাম জানু গৈরিক বস্ত্রের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। *মনূনাম্ আদ্যম্* শব্দগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ঐগুলির অর্থ হচ্ছে মুনি, বা মননশীল কোনও ব্যক্তি। এই প্রকার মানুষকে বলা হয় *মনু* । এই শ্লোকে শিবকে সমস্ত মুনিদের অগ্রগণ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শিব অবশ্য অর্থহীন মনোধর্মীয় জল্পনা-কল্পনায় কালক্ষয় করেন না, কিন্তু পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, অসুরদের অধঃপতিত বদ্ধ অবস্থা থেকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়, তিনি সর্বদা তাতেই চিন্তান্বিত থাকেন। কথিত হয় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় সদাশিব অদ্বৈত প্রভুরূপে

এসেছিলেন, এবং অদ্বৈত প্রভুর প্রধান চিন্তা ছিল কিভাবে অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করা যায়। যেহেতু মানুষেরা অর্থহীন কার্যকলাপে ব্যস্ত এবং তার ফলে তারা সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তাই অদ্বৈত আচার্যরূপে শিব ভগবানের কাছে আবেদন করেছিলেন, তিনি যেন সেই সমস্ত মোহাচ্ছন্ন জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অনুরোধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তেমনই, রুদ্র সম্প্রদায় নামক শিবের একটি সম্প্রদায় রয়েছে। তিনি সর্বদা পতিত জীবদের উদ্ধারের বিষয়ে চিন্তা করেন, যেমন অদ্বৈত প্রভু করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

স তূপলভ্যাগতমাত্মযোনিং
সুরাসুরেশৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ ।
উত্থায় চক্রে শিরসাভিবন্দন-
মর্হত্তমঃ কস্য যথৈব বিষ্ণুঃ ॥ ৪০ ॥

সঃ—শিব; **তু**—কিন্তু; **উপলভ্য**—দর্শন করে; **আগতম্**—এসেছিলেন; **আত্ম-যোনিম্**—ব্রহ্মা; **সুর-অসুর-ঈশৈঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা; **অভিবন্দিত-অঙ্ঘ্রিঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হয়; **উত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **চক্রে**—করেছিলেন; **শিরসা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **অভিবন্দনম্**—সশ্রদ্ধ; **অর্হত্তমঃ**—বামনদেব; **কস্য**—কশ্যপের; **যথা এব**—ঠিক যেমন; **বিষ্ণুঃ**—বিষ্ণু।

অনুবাদ

শিবের শ্রীপাদপদ্ম দেবতা এবং অসুর উভয়ের দ্বারাই পূজিত হয়। কিন্তু তাঁর অতি উচ্চ পদ সত্ত্বেও, অন্য সমস্ত দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মাকে দর্শন করা মাত্রই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে বামনদেব কশ্যপ মুনিকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি ছিলেন জীব, কিন্তু তাঁর দিব্য পুত্র বামনদেব ছিলেন বিষ্ণুর অবতার। তাই পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্ত্বেও বিষ্ণু কশ্যপ মুনিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ যখন ছোট ছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজ এবং

মাতা যশোদাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েও, শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাদ স্পর্শ করেছিলেন, কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান, শিব এবং অন্যান্য ভক্তরা তাঁদের উচ্চ পদ সত্ত্বেও, ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করতে হয়। শিব ব্রহ্মাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, কারণ ব্রহ্মা হচ্ছেন তাঁর পিতা, ঠিক যেমন কশ্যপ মুনি ছিলেন বামনদেবের পিতা।

শ্লোক ৪১

তথাপরে সিদ্ধগণা মহর্ষিভি-
র্যে বৈ সমন্তাদনু নীললোহিতম্ ।
নমস্কৃতঃ প্রাহ শশাঙ্কশেখরং
কৃতপ্রণামং প্রহসন্নিবাত্মভূঃ ॥ ৪১ ॥

তথা—সেইভাবে; **অপরে**—অন্যদের; **সিদ্ধ-গণাঃ**—সিদ্ধ-গণ; **মহা-ঋষিভিঃ**—মহর্ষিগণ সহ; **যে**—যিনি; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **সমন্তাৎ**—সর্বদিক থেকে; **অনু**—পরে; **নীললোহিতম্**—শিবকে; **নমস্কৃতঃ**—নমস্কার করে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **শশাঙ্ক-শেখরম্**—শিবকে; **কৃত-প্রণামম্**—প্রণতি নিবেদন করে; **প্রহসন্**—হেসে; **ইব**—যেন; **আত্মভূঃ**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

নারদ আদি অন্য যে-সমস্ত ঋষিরা শিবের চারিপাশে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁরাও ব্রহ্মাকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে পূজিত হয়ে, ব্রহ্মা ঈষৎ হেসে শিবকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হাসছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে, শিব যেমন অল্পেই সন্তুষ্ট হন, তেমনই আবার তিনি সহজেই রুষ্ট হন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর পত্নীর বিয়োগে এবং দক্ষের দ্বারা অপমানিত হওয়ার ফলে, তিনি হয়তো ক্রুদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন। তাঁর সেই ভয় গোপন করার জন্য তিনি হেসেছিলেন, এবং শিবকে নিম্নলিখিত শ্লোকে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

ব্রহ্মোবাচ

জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ ।
শক্তেঃ শিবস্য চ পরং যত্তদ্ব্রহ্ম নিরন্তরম্ ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **জানে**—আমি জানি; **ত্বাম্**—আপনাকে (শিব); **ঈশম্**—নিয়ন্তা; **বিশ্বস্য**—সমগ্র জড় জগতের; **জগতঃ**—দৃশ্য জগতের; **যোনি-বীজয়োঃ**—মাতা এবং পিতা উভয়েই; **শক্তেঃ**—শক্তির; **শিবস্য**—শিবের; **চ**—এবং; **পরম্**—পরমব্রহ্ম; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম**—অপরিবর্তনীয়; **নিরন্তরম্**—জড় গুণরহিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান শিব! আমি জানি যে, আপনি সমগ্র জড় জগতের নিয়ন্তা। জড় সৃষ্টির পিতা এবং মাতা উভয়ই হচ্ছেন আপনি, এবং আপনি জড় সৃষ্টির অতীত পরমব্রহ্মও। এইভাবে আমি আপনার তত্ত্ব অবগত আছি।

তাৎপর্য

শিব যদিও ব্রহ্মাকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, তবুও ব্রহ্মা জানতেন যে, শিবের পদ তাঁর থেকে উর্ধ্বে। *ব্রহ্মসংহিতায়* শিবের পদের বর্ণনা করা হয়েছে—ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং শিবের মূল স্থিতিতে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিব বিষ্ণু থেকে ভিন্ন। সেই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, দুধ যেমন বিকার প্রাপ্ত হয়ে দধিতে পরিণত হয়, তেমনই বিষ্ণু শম্ভুতে পরিণত হয়েছেন.

শ্লোক ৪৩

ত্বমেব ভগবন্নেতচ্ছিবশক্ত্যোঃ স্বরূপয়োঃ ।
বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপটো যথা ॥ ৪৩ ॥

ত্বম্—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবন্**—হে প্রভু; **এতৎ**—এই; **শিব-শক্ত্যোঃ**—আপনার শুভ শক্তিতে স্থিত হয়ে; **স্বরূপয়োঃ**—আপনার ব্যক্তিগত বিস্তারের দ্বারা; **বিশ্বম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **সৃজসি**—সৃষ্টি করেন; **পাসি**—পালন করেন; **অৎসি**—ধ্বংস করেন; **ক্রীড়ন্**—খেলা করে; **উর্ণ-পটঃ**—মাকড়সার জাল; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি আপনার ব্যক্তিগত বিস্তারের দ্বারা এই দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন, ঠিক যেমন উর্ণনাভ তার জাল রচনা করে, সেটি পালন করে এবং অবশেষে তা গুটিয়ে নেয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *শিব-শক্তি* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *শিব* মানে হচ্ছে 'মঙ্গলময়', এবং *শক্তি* মানে 'শক্তি'। পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন প্রকার শক্তি রয়েছে, এবং সেই সমস্ত শক্তিই মঙ্গলময়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে বলা হয় গুণাবতার। জড় জগতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিভিন্ন অবতারদের তুলনা করা হয়, কিন্তু যেহেতু তাঁরা সকলেই পরম মঙ্গলময়ের প্রকাশ, তাই তাঁরা সকলেই মঙ্গলময়, যদিও কখনও কখনও একটি গুণকে অন্য গুণটি থেকে উচ্চ অথবা নীচ বলে বর্ণনা করা হয়। তমোগুণকে অন্য গুণগুলি থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয়, কিন্তু উন্নত বিচারে তাও মঙ্গলময়। এই সম্পর্কে সরকারের শিক্ষা বিভাগ এবং অপরাধ বিভাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বাইরে থেকে কেউ মনে করতে পারে যে, অপরাধ বিভাগটি অশুভ, কিন্তু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা শিক্ষা বিভাগেরই মতো গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই সরকার পক্ষপাতশূন্য হয়ে উভয় বিভাগকেই সমানভাবে অর্থানুকূল্য করে থাকে।

শ্লোক ৪৪

ত্বমেব ধর্মার্থদুঘাভিপত্তয়ে
দক্ষেণ সূত্রেণ সসর্জিথাধ্বরম্ ।
ত্বয়েব লোকেঽবসিতাশ্চ সেতবো
যান্ব্রাহ্মণাঃ শ্রদ্দধতে ধৃতব্রতাঃ ॥ ৪৪ ॥

ত্বম্—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধর্ম-অর্থ-দুঘ**—ধর্ম এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে প্রাপ্ত লাভ; **অভিপত্তয়ে**—তাদের রক্ষা করার জন্য; **দক্ষেণ**—দক্ষের দ্বারা; **সূত্রেণ**—তাকে নিমিত্ত করে; **সসর্জিথ**—সৃষ্টি করেছেন; **অধ্বরম্**—যজ্ঞ; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **লোকে**—এই জগতে; **অবসিতাঃ**—নিয়ন্ত্রিত; **চ**—এবং; **সেতবঃ**—বর্ণাশ্রম প্রথার মর্যাদা; **যান্**—যা; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **শ্রদ্দধতে**—অত্যন্ত সম্মান করেন; **ধৃত-ব্রতাঃ**—ব্রত গ্রহণপূর্বক।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনিই দক্ষের মাধ্যমে যজ্ঞপ্রথা প্রবর্তন করেছেন, যাতে মানুষ ধর্ম অনুষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ফল লাভ করতে পারে। আপনার বিধি-বিধানেই চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের মর্যাদা নির্ণীত হয়েছে। তাই ব্রাহ্মণেরা ব্রতধারণপূর্বক নিষ্ঠা সহকারে সেই প্রথা পালন করেন।

তাৎপর্য

বৈদিক বর্ণাশ্রমের প্রথা কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ মানব-সমাজে সামাজিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই বিভাগ সৃষ্টি করেছেন। সমাজের বুদ্ধিজীবী বর্ণ রূপে ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠা সহকারে এই প্রথা অনুসরণ করার ব্রত গ্রহণ করা উচিত। এই কলিযুগে বর্ণ এবং আশ্রমের সিদ্ধান্ত না মেনে, বর্ণবিহীন সমাজ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা একটি অসম্ভব স্বপ্ন মাত্র। সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা বিনাশ করার ফলে, বর্ণহীন সমাজের ধারণা কখনই সার্থক হবে না। সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলন করা উচিত, কারণ *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমাজের চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই বিধি অনুসারে মানুষের আচরণ করা উচিত এবং পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা উচিত, ঠিক যেমন শরীরে বিভিন্ন অঙ্গগুলি সমগ্র শরীরের সেবায় যুক্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের *বিরাটরূপ* হচ্ছে পূর্ণ রূপ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা যথাক্রমে ভগবানের সেই বিরাটরূপের মুখ, বাহু, উদর এবং পা। যতক্ষণ তারা পূর্ণ রূপের সেবায় যুক্ত থাকে, ততক্ষণ তাদের স্থিতি সুরক্ষিত থাকে। অন্যথায় তারা তাদের স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৪৫

ত্বং কর্মণাং মঙ্গল মঙ্গলানাং
কর্তুঃ স্বলোকং তনুষে স্বঃ পরং বা।
অমঙ্গলানাং চ তমিস্রমুল্বণং
বিপর্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ ॥ ৪৫ ॥

ত্বম্—আপনি; **কর্মণাম্**—কর্তব্য কর্মের; **মঙ্গল**—হে পরম মঙ্গলময়; **মঙ্গলানাম্**—মঙ্গলের; **কর্তুঃ**—অনুষ্ঠাতার; **স্ব-লোকম্**—উচ্চতর লোক; **তনুষে**—বিস্তার করে;

স্বঃ—স্বর্গলোক; **পরম্**—চিৎ-জগৎ; **বা**—অথবা; **অমঙ্গলানাম্**—অমঙ্গলের; **চ**—এবং; **তমিস্রম্**—তমিস্র নরকের; **উল্বণম্**—ভীষণ; **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত; **কেন**—কেন; **তৎ-এব**—নিশ্চিতভাবে তা; **কস্যচিৎ**—কারও জন্য।

অনুবাদ

হে পরম মঙ্গলময় ভগবান! আপনি স্বর্গলোক, বৈকুণ্ঠলোক এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়ার মঙ্গলময় কার্যকলাপের বিধান প্রদান করেছেন। তেমনই, যারা অশুভ কর্মের অনুষ্ঠানকারী দুষ্কৃতকারী, তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ভয়ঙ্কর নরকের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তবুও কখনও কখনও দেখা যায় যে, উক্ত নিয়মের বিপর্যয় হয়। তার কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে পরম ইচ্ছা বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার ফলেই সব কিছু হচ্ছে। তাই বলা হয় যে, তাঁর পরম ইচ্ছা ব্যতীত একটি ঘাস পর্যন্ত নড়ে না। সাধারণত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানকারীরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন, ভগবদ্ভক্তরা বৈকুণ্ঠলোক বা চিৎ-জগতে উন্নীত হন, এবং নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হন; কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, অজামিলের মতো পাপী কেবলমাত্র নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, অচিরে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন। অজামিল যদিও তাঁর পুত্র নারায়ণকে ডেকেছিলেন, কিন্তু ভগবান নারায়ণ তা ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পাপপূর্ণ জীবন সত্ত্বেও তাঁকে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত করেছিলেন। তেমনই রাজা দক্ষ সর্বদাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে পুণ্য কর্মে লিপ্ত ছিলেন, তবু শিবের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে তাঁকে কঠোর দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছাই হচ্ছে চরম বিচার; সেই সম্পর্কে কোন তর্ক করা যায় না। তাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছাকে সর্ব মঙ্গলময় বলে স্বীকার করে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই তাঁর শরণাগত থাকেন।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(ভাঃ ১০/১৪/৮)

এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভক্ত যখন কোন সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, তখন তিনি মনে করেন যে, তাঁর কারণ হচ্ছে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্ম, এবং তিনি সেই পরিস্থিতিকে ভগবানেরই কৃপাশীর্বাদ বলে মনে করেন। সেই অবস্থাতেও অবিচলিতভাবে তিনি ভগবানের সেবা করতে থাকেন। যিনি এই মনোভাব নিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, তিনি চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য। অর্থাৎ, এই প্রকার ভক্তের সর্ব অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়া সুনিশ্চিত।

শ্লোক ৪৬

ন বৈ সতাং ত্বচ্চরণার্পিতাত্মনাং
ভূতেষু সর্বেষ্বভিপশ্যতাং তব ।
ভূতানি চাত্মন্যপৃথগ্দিদৃক্ষতাং
প্রায়েণ রোষোঽভিভবেদ্যথা পশুম্ ॥ ৪৬ ॥

ন—না; **বৈ**—কিন্তু; **সতাম্**—ভক্তদের; **ত্বৎ-চরণ-অর্পিত-আত্মনাম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত ব্যক্তিদের; **ভূতেষু**—জীবদের মধ্যে; **সর্বেষু**—সমস্ত প্রকার; **অভিপশ্যতাম্**—পূর্ণরূপে দর্শন করে; **তব**—আপনার; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **চ**—এবং; **আত্মনি**—পরব্রহ্মে; **অপৃথক্**—অভিন্ন; **দিদৃক্ষতাম্**—যারা এই ভাবে দর্শন করে; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **রোষঃ**—ক্রোধ; **অভিভবেৎ**—হয়; **যথা**—ঠিক যেমন; **পশুম্**—পশু।

অনুবাদ

হে ভগবান! যে সমস্ত ভক্তরা সর্বতোভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের জীবন অর্পণ করেছেন, তাঁরা প্রতিটি জীবের মধ্যে পরমাত্মারূপে আপনার উপস্থিতি দর্শন করেন, এবং তার ফলে তাঁরা বিভিন্ন জীবের মধ্যে কোন রকম ভেদ দর্শন করেন না। এই প্রকার ব্যক্তিরা সমস্ত জীবের প্রতিই সমদর্শী। তাঁরা কখনই পশুর মতো ক্রোধের বশীভূত হন না, কারণ পশুরা ভেদভাব ব্যতীত কোন কিছুই দর্শন করতে পারে না।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যখন অসুরদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন অথবা তাদের সংহার করেন, তখন জড়-জাগতিক দৃষ্টিতে সেটি প্রতিকূল বলে মনে হলেও চিন্ময় দৃষ্টিতে তা

তাদের প্রতি তাঁর আনন্দময় আশীর্বাদ। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা ভগবানের ক্রোধ এবং আশীর্বাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। তাঁরা অন্যের সাথে ও নিজেদের সাথে ভগবানের আচরণকে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখেন। ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই ভগবানের আচরণের দোষ দর্শন করেন না।

শ্লোক ৪৭

পৃথগ্ধিয়ঃ কর্মদৃশো দুরাশয়াঃ
পরোদয়েনার্পিতহৃদ্রুজোঽনিশম্ ।
পরান্ দুরুক্তৈর্বিতুদন্ত্যরুন্তুদা-
স্তান্মাবধীদ্দৈববধান্ ভবদ্বিধঃ ॥ ৪৭ ॥

পৃথক্—ভিন্নরূপে; **ধিয়ঃ**—যারা মনে করে; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **দৃশঃ**—দর্শী; **দুরাশয়াঃ**—দুষ্টচিত্ত; **পর-উদয়েন**—অন্যের উন্নতিতে; **অর্পিত**—অর্পিত; **হৃৎ**—হৃদয়; **রুজঃ**—ক্রোধ; **অনিশম্**—সর্বদা; **পরান্**—অন্যদের; **দুরুক্তৈঃ**—কর্কশ বাক্য; **বিতুদন্তি**—বেদনা দেয়; **অরুন্তুদাঃ**—কর্কশ বাক্যের দ্বারা; **তান্**—তাদের; **মা**—না; **অবধীৎ**—বধ করা; **দৈব**—দৈবের দ্বারা; **বধান্**—ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে; **ভবৎ**—আপনার; **বিধঃ**—মতো।

অনুবাদ

যে-সমস্ত ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি সহকারে সব কিছু দর্শন করে, যারা কেবল সকাম কর্মে লিপ্ত, যারা দুষ্ট আশয় যুক্ত, যারা অন্যের উন্নতি দর্শনে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে এবং যারা কর্কশ ও মর্মভেদী বাক্যের দ্বারা অন্যদের ব্যথা দেয়, তারা ইতিমধ্যেই দৈব কর্তৃক নিহত হয়েছে। তাই আপনার মতো মহান ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় তাদের বধ করার কোনও প্রয়োজন হয় না।

তাৎপর্য

যারা জড়বাদী এবং সর্বদা জাগতিক লাভের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত, তারা কখনও অন্যদের উন্নতি সহ্য করতে পারে না। কেবল কয়েকজন কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত, সারা জগৎ এই প্রকার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিতে পূর্ণ, যারা আত্ম উপলব্ধি-রহিত হয়ে জড় দেহের প্রতি আসক্তির ফলে, নিরন্তর উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। যেহেতু তাদের হৃদয় সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, তখন বুঝতে হবে যে, তারা ইতিমধ্যেই দৈব কর্তৃক নিহত হয়েছে। তাই শিবকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন আত্ম-তত্ত্ববেত্তা বৈষ্ণবরূপে তিনি

যেন দক্ষকে হত্যা না করেন। বৈষ্ণবকে বলা হয় পরদুঃখে দুঃখী, কারণ যদিও তিনি জীবনের কোন অবস্থাতেই স্বয়ং দুঃখিত হন না, তবুও অন্যের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে তিনি দুঃখ অনুভব করেন। তাই বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দেহ অথবা মনের কোন ক্রিয়ার দ্বারা কাউকে হত্যা করার চেষ্টা না করা, বরং অন্যদের প্রতি করুণাবশত তাদের কৃষ্ণভাবনায় জাগরিত করার চেষ্টা করা উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন জগতের সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য শুরু করা হয়েছে, এবং ভক্তদের যদিও কখনও কখনও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, তবুও তাঁরা সব কিছু সহ্য করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করে, বিনীত মনোভাব সহকারে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা উচিত। তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, সর্বতোভাবে অমানী হয়ে অন্যদের সমস্ত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। সেই প্রকার মনোভাব সহকারেই কেবল নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন করা যায়।" *(শিক্ষাষ্টক ৩)*

বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে হরিদাস ঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু এবং যিশু খ্রিস্টের মতো বৈষ্ণবদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা। যে ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে, তাকে আর হত্যা করার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, বৈষ্ণবের পক্ষে কখনও বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবদের নিন্দা সহ্য করা উচিত নয়, যদিও তাঁর নিজের নিন্দা তিনি সহ্য করেন।

শ্লোক ৪৮

যস্মিন্ যদা পুষ্করনাভমায়য়া
দুরন্তয়া স্পৃষ্টধিয়ঃ পৃথগ্‌দৃশঃ ।
কুর্বন্তি তত্র হ্যনুকম্পয়া কৃপাং
ন সাধবো দৈববলাৎকৃতে ক্রমম্ ॥ ৪৮ ॥

যস্মিন্—কোন স্থানে; **যদা**—যখন; **পুষ্কর-নাভ-মায়য়া**—পরমেশ্বর ভগবান পুষ্করনাভের মায়ার দ্বারা; **দুরন্তয়া**—দুর্লঙ্ঘ্য; **স্পৃষ্ট-ধিয়ঃ**—মোহিত; **পৃথক্ দৃশঃ**—ভেদদর্শী; **কুর্বন্তি**—করে; **তত্র**—সেখানে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনুকম্পয়া**—দয়ার

বশে; **কৃপাম্**—কৃপা; **ন**—কখনই না; **সাধবঃ**—সাধু পুরুষগণ; **দৈব-বলাৎ**—দৈবের দ্বারা; **কৃতে**—কৃত; **ক্রমম্**—পরাক্রম।

অনুবাদ

হে ভগবান! পরমেশ্বরের দুর্লঙ্ঘ্য মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যদি কখনও কোন অপরাধ করে, সাধু পুরুষ দয়াবশত তাদের সেই অপরাধ গুরুতরভাবে গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন যে, মায়ার বশীভূত হয়ে তারা অপরাধ করে, তাই তাদের বিনাশ করার জন্য তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করেন না।

তাৎপর্য

কথিত হয় যে, তপস্বী বা সাধু ব্যক্তির ভূষণ হচ্ছে ক্ষমাশীলতা। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে সাধুদের অনর্থক উৎপীড়ন করা হয়েছে, কিন্তু সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কোন রকম প্রতিকার করেননি। যেমন পরীক্ষিৎ মহারাজ অনর্থক একজন ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, এবং সেই বালকটির পিতা সেই জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই অভিশাপ গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ-বালকের ইচ্ছা অনুসারে এক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে স্বীকার করেছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন একজন সম্রাট, এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে তিনি পূর্ণ ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান এবং দয়া প্রদর্শন করে, তিনি ব্রাহ্মণ-বালকের সেই কর্মের প্রতিকার না করে সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে স্বীকার করেছিলেন। যেহেতু কৃষ্ণ চেয়েছিলেন, পরীক্ষিৎ মহারাজ যেন সেই দণ্ড স্বীকার করেন, যাতে এই পৃথিবীতে *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপদেশ প্রকাশিত হয়, তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই অভিশাপের কোন প্রতিকার করেননি। বৈষ্ণব অন্যের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত সহিষ্ণু হন। তিনি যখন তাঁর নিজের পরাক্রম প্রদর্শন করেন না, তখন মনে করা উচিত নয় যে, তাঁর মধ্যে শক্তির অভাব রয়েছে; পক্ষান্তরে তা ইঙ্গিত করে যে, সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি সহিষ্ণু।

শ্লোক ৪৯

ভবাংস্তু পুংসঃ পরমস্য মায়য়া
দুরন্তয়াস্পৃষ্টমতিঃ সমস্তদৃক্।
তয়া হতাত্মস্বনুকর্মচেতঃ-
স্বনুগ্রহং কর্তুমিহার্হসি প্রভো ॥ ৪৯ ॥

ভবান্—আপনি; **তু**—কিন্তু; **পুংসঃ**—পুরুষের; **পরমস্য**—পরম; **মায়য়া**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **দুরন্তয়া**—মহা শক্তির; **অস্পৃষ্ট**—অপ্রভাবিত; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **সমস্ত-দৃক্**—সব কিছুর দ্রষ্টা অথবা জ্ঞাতা; **তয়া**—সেই মায়ার দ্বারা; **হৃত-আত্মসু**—হৃদয়ে মোহিত; **অনুকর্ম-চেতঃসু**—যার হৃদয় সকাম কর্মের দ্বারা আকৃষ্ট; **অনুগ্রহম্**—কৃপা; **কর্তুম্**—করার জন্য; **ইহ**—এই প্রসঙ্গে; **অর্হসি**—আকাঙ্ক্ষা করে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি কখনও পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য প্রভাবশালিনী মায়ার দ্বারা বিমোহিত হন না। তাই আপনি সর্বজ্ঞ, এবং যারা সেই মায়ার দ্বারা মোহিত এবং সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের প্রতি আপনার কৃপাপরবশ হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব কখনও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে মোহিত হন না, কারণ তিনি ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত হয়েছে, তারা অনায়াসে তা অতিক্রম করতে পারে।" বৈষ্ণবেব কর্তব্য হচ্ছে, যারা মায়ার দ্বারা মোহিত, তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া, কারণ বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় তাদের নেই। যারা মায়ার দ্বারা দণ্ডিত হয়েছে, তারা কেবল ভক্তের কৃপার ফলেই উদ্ধার পেতে পারে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

"আমি সমস্ত বৈষ্ণব-ভক্তদের চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁরা ঠিক কল্পবৃক্ষের মতো সকলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন, এবং তাঁরা অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ।" যারা মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা সকাম কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বৈষ্ণব-প্রচারক তাদের হৃদয়কে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করেন।

শ্লোক ৫০

কুর্বধ্বরস্যোদ্ধরণং হতস্য ভোঃ
ত্বয়াসমাপ্তস্য মনো প্রজাপতেঃ ।
ন যত্র ভাগং তব ভাগিনো দদুঃ
কুযাজিনো যেন মখো নিনীয়তে ॥ ৫০ ॥

কুরু—করুন; **অধ্বরস্য**—যজ্ঞের; **উদ্ধরণম্**—যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য; **হতস্য**—যে হত হয়েছে তার; **ভোঃ**—হে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অসমাপ্তস্য**—অসম্পূর্ণ যজ্ঞের; **মনো**—হে শিব; **প্রজাপতেঃ**—মহারাজ দক্ষের; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **ভাগম্**—অংশ; **তব**—আপনার; **ভাগিনঃ**—ভাগের পাত্র; **দদুঃ**—প্রদান করেনি; **কু-যাজিনঃ**—দুষ্ট পুরোহিতেরা; **যেন**—দাতার দ্বারা; **মখঃ**—যজ্ঞ; **নিনীয়তে**—ফল প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান শিব! আপনি যজ্ঞভাগের অধিকারি, এবং আপনি ফল প্রদানকারী। কু-যাজ্ঞিকেরা আপনাকে আপনার ভাগ প্রদান করেনি, তাই আপনি সব কিছু ধ্বংস করেছেন, এবং তার ফলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখন আপনি যা প্রয়োজন তা করুন এবং আপনার ন্যায্য ভাগ গ্রহণ করুন।

শ্লোক ৫১

জীবতাদ্যজমানোঽয়ং প্রপদ্যেতাক্ষিণী ভগঃ ।
ভৃগোঃ শ্মশ্রূণি রোহন্তু পূষ্ণো দন্তাশ্চ পূর্ববৎ ॥ ৫১ ॥

জীবতাৎ—জীবিত হোক; **যজমানঃ**—যজমান (দক্ষ); **অয়ম্**—এই; **প্রপদ্যেত**—পুনরায় প্রাপ্ত হোক; **অক্ষিণী**—চক্ষু; **ভগঃ**—ভগদেব; **ভৃগোঃ**—ভৃগু মুনির; **শ্মশ্রূণি**—শ্মশ্রু; **রোহন্তু**—পূর্ববৎ হোক; **পূষ্ণঃ**—পূষাদেবের; **দন্তাঃ**—দন্তরাজি; **চ**—এবং; **পূর্ব-বৎ**—পূর্বের মতো।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার কৃপায় যজমান (রাজা দক্ষ) পুনর্জীবিত হোন, ভগদেব তাঁর চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হোন, ভৃগু মুনির শ্মশ্রু এবং পূষাদেবের দন্তরাজি পুনরায় পূর্ববৎ হোক।

শ্লোক ৫২

**দেবানাং ভগ্নগাত্রাণামৃত্বিজাং চায়ুধাশ্মভিঃ ।
ভবতানুগৃহীতানামাশু মন্যোহস্ত্বনাতুরম্ ॥ ৫২ ॥**

দেবানাম্—দেবতাদের; **ভগ্ন-গাত্রাণাম্**—যাঁদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে গেছে; **ঋত্বিজাম্**—পুরোহিতদের; **চ**—এবং; **আয়ুধ-অশ্মভিঃ**—অস্ত্র এবং প্রস্তরের দ্বারা; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **অনুগৃহীতানাম্**—অনুগৃহীত হয়ে; **আশু**—শীঘ্র; **মন্যো**—হে ভগবান শিব (ক্রুদ্ধরূপে); **অস্তু**—হোক; **অনাতুরম্**—আঘাতের আরোগ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান শিব! আপনার সৈন্যদের অস্ত্র এবং প্রস্তরের আঘাতে যে-সমস্ত দেবতা এবং পুরোহিতদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ভগ্ন হয়েছে, তাঁরা আপনার অনুগ্রহে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন।

শ্লোক ৫৩

**এষ তে রুদ্র ভাগোহস্তু যদুচ্ছিষ্টোহধ্বরস্য বৈ ।
যজ্ঞস্তে রুদ্রভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্ ॥ ৫৩ ॥**

এষঃ—এই; **তে**—আপনার; **রুদ্র**—হে শিব; **ভাগঃ**—ভাগ; **অস্তু**—হোক; **যৎ**—যা কিছু; **উচ্ছিষ্টঃ**—অবশিষ্ট; **অধ্বরস্য**—যজ্ঞের; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **তে**—আপনার; **রুদ্র**—হে রুদ্র; **ভাগেন**—ভাগের দ্বারা; **কল্পতাম্**—পূর্ণ হোক; **অদ্য**—আজ; **যজ্ঞ-হন্**—হে যজ্ঞনাশক।

অনুবাদ

হে যজ্ঞনাশক! দয়া করে আপনি আপনার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন এবং কৃপাপূর্বক যজ্ঞ পূর্ণ হতে দিন।

তাৎপর্য

ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বুঝতে চেষ্টা করা উচিত যে, তার কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান সন্তুষ্ট হয়েছেন কি না। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করাই আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য

হওয়া উচিত। কোনও কার্যালয়ে প্রতিটি কর্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে মালিক অথবা কর্মকর্তার সন্তুষ্টি বিধান করা, তেমনই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তার কর্মের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করার উপদেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, এবং সেই প্রকার কর্ম সম্পাদনকে বলা হয় *যজ্ঞ*। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের জন্য যে কর্ম তাকেই বলা হয় *যজ্ঞ*। সকলেরই ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, *যজ্ঞ* ব্যতীত অন্য যে কর্ম করা হয়, তা ভব-বন্ধনের কারণ হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*। *কর্মবন্ধনঃ* মানে হচ্ছে আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম না করি, তা হলে সেই কর্মের ফল আমাদের বন্ধনের কারণ হবে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কারও কর্ম করা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করা। তাকেই বলা হয় *যজ্ঞ*।

দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত *যজ্ঞের* পর, সমস্ত দেবতারা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রসাদের প্রত্যাশা করেছিলেন। শিব হচ্ছেন দেবতাদের অন্যতম, তাই স্বাভাবিকভাবে তিনিও *যজ্ঞের* প্রসাদের প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু দক্ষ শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, শিবকে সেই *যজ্ঞে* অংশ গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করেননি এবং তাঁকে তাঁর যজ্ঞভাগও অর্পণ করেননি। কিন্তু শিবের অনুচরদের দ্বারা সেই *যজ্ঞ* পণ্ড হওয়ার পর, ব্রহ্মা শিবকে শান্ত করেছিলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রসাদের অংশ লাভ করবেন। এইভাবে তিনি তাঁর কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর অনুচরেরা যা ধ্বংস করেছে তা যেন তিনি সংশোধন করে দেন।

ভগবদ্গীতায় (৩/১১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা হলে সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হন। দেবতারা যেহেতু *যজ্ঞের* প্রসাদ প্রত্যাশা করেন, তাই *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। যারা ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত, তাদের পক্ষে *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য, তা না হলে তারা তাদের সেই কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। প্রজাপতি দক্ষ তাই *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং শিব তাঁর ভাগ প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, তাই উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় অবশ্য সব কিছুরই সন্তোষজনকভাবে সমাধান হয়েছিল।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন কার্য, কারণ *যজ্ঞে* সমস্ত দেবতাদের অংশ গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই কলিযুগে সেই প্রকার ব্যয় সাপেক্ষ *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়, এমন কি সেই *যজ্ঞে* অংশ গ্রহণ করার

জন্য দেবতাদেরও নিমন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই এই কলিযুগের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে—*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (ভাঃ ১১/৫/৩২)। যারা বুদ্ধিমান তাদের জানা উচিত যে, কলিযুগে বৈদিক *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেবতাদের সন্তুষ্ট করা না হলে, নিয়মিতভাবে ঋতুর কার্যকলাপ বা বৃষ্টি হবে না। সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় দেবতাদের দ্বারা। সেই অবস্থায়, এই যুগে সমাজের শান্তি এবং সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য, সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা সংকীর্তন *যজ্ঞ* অনুষ্ঠান করা। সকলকে নিমন্ত্রণ করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত, এবং তার পর প্রসাদ বিতরণ করা উচিত। এই *যজ্ঞ* অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হবেন, এবং তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তি এবং সমৃদ্ধি দেখা দেবে। বৈদিক অনুষ্ঠানের আর একটি অসুবিধা হচ্ছে যে, শত-সহস্র দেবতাদের মধ্যে যদি একজন দেবতারও সন্তুষ্টি বিধানে কেউ ব্যর্থ হন, ঠিক যেমন দক্ষ শিবকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তা হলে সর্বনাশ হবে। কিন্তু এই যুগে *যজ্ঞ* অনুষ্ঠানের পন্থা সরল করা হয়েছে। কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা আপনা থেকেই সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করা যায়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করলেন' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তম অধ্যায়

দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যজেনানুনীতেন ভবেন পরিতুষ্যতা ।
অভ্যধায়ি মহাবাহো প্রহস্য শ্রূয়তামিতি ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অজেন**—ব্রহ্মার দ্বারা; **অনুনীতেন**—প্রার্থিত হয়ে; **ভবেন**—শিবের দ্বারা; **পরিতুষ্যতা**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে; **অভ্যধায়ি**—বলেছিলেন; **মহা-বাহো**—হে বিদুর; **প্রহস্য**—হাস্যপূর্বক; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে মহাবাহো বিদুর! ব্রহ্মার অনুনয়ের দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে, তার উত্তরে শিব হাস্যপূর্বক বলেছিলেন।

শ্লোক ২

মহাদেব উবাচ

নাঘং প্রজেশ বালানাং বর্ণয়ে নানুচিন্তয়ে ।
দেবমায়াভিভূতানাং দণ্ডস্তত্র ধৃতো ময়া ॥ ২ ॥

মহাদেবঃ—শিব; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ন**—না; **অঘম্**—অপরাধ; **প্রজা-ঈশ**—হে সৃষ্ট জীবদের ঈশ্বর; **বালানাম্**—বালকদের; **বর্ণয়ে**—মনে করি; **ন**—না; **অনুচিন্তয়ে**—চিন্তা করি; **দেব-মায়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি; **অভিভূতানাম্**—বিমোহিতদের; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **তত্র**—সেখানে; **ধৃতঃ**—ব্যবহৃত; **ময়া**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

শিব বললেন—হে পূজ্য পিতা ব্রহ্মা! দেবতারা যে অপরাধ করেছেন, সেই জন্য আমি কিছু মনে করি না। কারণ এই দেবতারা শিশুসুলভ নির্বোধ, তাঁদের অপরাধের গুরুত্ব আমি তেমন দিই না। তাঁদের সংশোধন করার জন্যই কেবল আমি দণ্ড দিয়েছি।

তাৎপর্য

দণ্ড দুই প্রকার। তার একটি হচ্ছে বিজেতা কর্তৃক তার শত্রুকে দেওয়া দণ্ড, এবং অন্যটি হচ্ছে পিতার পুত্রকে দেওয়া দণ্ড। এই দুই প্রকার দণ্ডের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। শিব প্রকৃতপক্ষে একজন বৈষ্ণব, ভগবানের এক মহান ভক্ত, এবং সেই সূত্রে তাঁর নাম আশুতোষ। তিনি সর্বদাই সন্তুষ্ট, এবং তাই তিনি কারও প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন হয়ে ক্রুদ্ধ হন না। তিনি কোন জীবের প্রতিই বৈরী-ভাবাপন্ন নন; পক্ষান্তরে, তিনি সর্বদা সকলের শুভ কামনা করেন। তিনি যখনই কোন ব্যক্তিকে দণ্ড দেন, সেই দণ্ড পিতা কর্তৃক পুত্রকে প্রদত্ত দণ্ডেরই মতো। পিতাতুল্য শিব কোন জীবের, বিশেষ করে দেবতাদের কোন অপরাধ গুরুতরভাবে গ্রহণ করেন না।

শ্লোক ৩

প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষ্ণো ভবত্বজমুখং শিরঃ ।
মিত্রস্য চক্ষুষেক্ষেত ভাগং স্বং বর্হিষো ভগঃ ॥ ৩ ॥

প্রজাপতেঃ—প্রজাপতি দক্ষের; **দগ্ধ-শীর্ষ্ণঃ**—যাঁর মস্তক দগ্ধীভূত হয়ে ভস্মসাৎ হয়েছে; **ভবতু**—হোক; **অজ-মুখম্**—ছাগলের মুখ; **শিরঃ**—মস্তক; **মিত্রস্য**—মিত্রের; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা; **ঈক্ষেত**—দর্শন করুক; **ভাগম্**—ভাগ; **স্বম্**—তাঁর; **বর্হিষঃ**—যজ্ঞের; **ভগঃ**—ভগ।

অনুবাদ

শ্রীশিব বললেন—যেহেতু দক্ষের মস্তক দগ্ধীভূত হয়ে ভস্মসাৎ হয়েছে, তাই তিনি একটি ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হবেন। ভগ নামক দেবতা মিত্রের নেত্রের দ্বারা তাঁর যজ্ঞভাগ দেখতে পাবেন।

শ্লোক ৪

পূষা তু যজমানস্য দদ্ভির্জক্ষতু পিষ্টভুক্ ।
দেবাঃ প্রকৃতসর্বাঙ্গা যে ম উচ্ছেষণং দদুঃ ॥ ৪ ॥

পূষা—পূষা; **তু**—কিন্তু; **যজমানস্য**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর; **দদ্ভিঃ**—দাঁতের দ্বারা; **যক্ষতু**—চর্বণ; **পিষ্ট-ভুক্**—পিষ্টকভোজী; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **প্রকৃত**—নির্মিত; **সর্ব-অঙ্গাঃ**—পূর্ণ; **যে**—যাঁরা; **মে**—আমাকে; **উচ্ছেষণম্**—যজ্ঞভাগ; **দদুঃ**—দিয়েছে

অনুবাদ

পূষা কেবল তাঁর শিষ্যদের দন্তের দ্বারা চর্বণ করতে পারবেন, এবং তিনি যখন একলা থাকবেন, তখন তাঁকে কেবল পিষ্টক ভোজন করেই সন্তুষ্ট হতে হবে। কিন্তু যে-সমস্ত দেবতারা আমাকে যজ্ঞভাগ দিতে সম্মত হয়েছেন, তাঁদের সর্বাঙ্গের ক্ষত থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তাৎপর্য

পূষার চর্বণ করার জন্য তাঁর শিষ্যদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। অন্যথায় তিনি কেবল পিষ্টক ভোজনে সমর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর দণ্ড চলতে থাকে। যেহেতু তিনি তাঁর দন্ত প্রদর্শন করে শিবের প্রতি অবজ্ঞা করে হেসেছিলেন, তাই তিনি আহারের জন্য তাঁর দন্ত আর ব্যবহার করতে পারেননি। পক্ষান্তরে বলা যায়, শিবের বিরুদ্ধে তাঁর দাঁত ব্যবহার করার ফলে, তাঁর দাঁত না থাকাই ভাল ছিল।

শ্লোক ৫

বাহুভ্যামশ্বিনোঃ পূষ্ণো হস্তাভ্যাং কৃতবাহবঃ ।
ভবন্ত্বধ্বর্যবশ্চান্যে বস্তশ্মশ্রুর্ভৃগুর্ভবেৎ ॥ ৫ ॥

বাহুভ্যাম্—বাহুযুগলের দ্বারা; **অশ্বিনোঃ**—অশ্বিনীকুমারদের; **পূষ্ণঃ**—পূষার; **হস্তাভ্যাম্**—দুই হস্তের দ্বারা; **কৃত-বাহবঃ**—যাঁদের বাহুর প্রয়োজন; **ভবন্তু**—হতে হবে; **অধ্বর্যবঃ**—পুরোহিতগণ; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যেরা; **বস্ত-শ্মশ্রুঃ**—ছাগলের দাড়ি; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **ভবেৎ**—হোক।

অনুবাদ

যাঁদের বাহু কেটে গেছে, তাঁদের অশ্বিনীকুমারদের বাহুর দ্বারা কাজ করতে হবে, এবং যাঁদের হাত কাটা গেছে, তাঁদের পূষার হস্তের দ্বারা কর্ম করতে হবে। পুরোহিতদেরও সেইভাবে কার্য করতে হবে, আর ভৃগু ছাগলের দাড়ি প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

দক্ষ যে ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ছাগলের দাড়ি লাভ করেছিলেন দক্ষের একজন মস্ত বড় সমর্থক ভৃগু মুনি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, মস্তিষ্কই বুদ্ধিমত্তার কারণ, কিন্তু দক্ষের মস্তক বিনিময় থেকে প্রতীত হয় তা ঠিক নয়। দক্ষের মস্তিষ্ক এবং একটি ছাগলের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, কিন্তু দক্ষ একটি ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজের মতোই কার্য করেছিলেন। তা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জীবাত্মার চেতনাই বুদ্ধিমত্তার কারণ। মস্তিষ্ক হচ্ছে কেবল একটি যন্ত্র, যার সঙ্গে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার কোনও সম্পর্ক নেই। প্রকৃত বুদ্ধি, মন এবং চেতনা স্বতন্ত্র জীবাত্মার অংশ। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দেখা যাবে যে, দক্ষ তাঁর নিজের মস্তক হারিয়ে একটি ছাগলের মস্তক পাওয়া সত্ত্বেও পূর্বের মতোই বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি শিব এবং বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, যা একটি ছাগলের পক্ষে সম্ভব নয়। তার ফলে, স্থির নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মস্তিষ্ক বুদ্ধিমত্তার কেন্দ্র নয়; জীবাত্মার চেতনাই বুদ্ধিমত্তা সহকারে কার্য করে। সমগ্র কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে চেতনাকে শুদ্ধ করা। মানুষের কি ধরনের মস্তিষ্ক আছে তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ তিনি যদি তাঁর চেতনাকে জড় বিষয় থেকে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণে স্থানান্তরিত করেন, তা হলে তাঁর জীবন সফল হয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন যে, কেউ যখন কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করেন, তখন তিনি যতই অধঃপতিত হোন না কেন, তিনি জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেন। বিশেষ করে, কেউ যখন কৃষ্ণভাবনা লাভ করেন, তাঁর বর্তমান জড় শরীর ত্যাগ করার পর, তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৬

মৈত্রেয় উবাচ

তদা সর্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢুষ্টমোদিতম্ ।
পরিতুষ্টাত্মভিস্তাত সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্ ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয় ঋষি; **উবাচ**—বললেন; **তদা**—তখন; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ভূতানি**—ব্যক্তিগণ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **মীঢ়ুঃ-টম**—বরদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (শিব), **উদিতম্**—উক্ত; **পরিতুষ্ট**—সন্তুষ্ট হয়ে; **আত্মভিঃ**—হৃদয় এবং আত্মার দ্বারা; **তাত**—হে প্রিয় বিদুর; **সাধু সাধু**—সাধুবাদ; **ইতি**—এইভাবে; **অথ অব্রুবন্**—যা আমরা বলেছি।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! সেখানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিরা বরদানকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবের বাণী শ্রবণ করে অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শিবকে *মীঢ়ুষ্টম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সমস্ত বরদানকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আশুতোষ নামেও পরিচিত, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি খুব তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট হন, আবার খুব তাড়াতাড়ি ক্রুদ্ধও হন *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, বুদ্ধিহীন মানুষেরা জড় জাগতিক বর লাভের আশায় দেবতাদের শরণাগত হয়। সেই উদ্দেশ্যে মানুষেরা সাধারণত শিবের কাছে যায়, এবং যেহেতু তিনি খুব তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হয়ে যান, তাই তিনি কোন কিছু বিবেচনা না করেই তাঁর ভক্তদের বর দিয়ে দেন, সেই জন্য তাঁকে বলা হয় *মীঢ়ুষ্টম*, অথবা সমস্ত বরদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা সর্বদা জড়-জাগতিক লাভের জন্য উদ্গ্রীব, কিন্তু পারমার্থিক লাভের জন্য তারা আগ্রহী নয়।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, শিব আধ্যাত্মিক জীবনেরও শ্রেষ্ঠ বরদাতা হন। কথিত আছে যে, এক সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বর লাভের আশায় শিবের পূজা করেছিলেন, এবং শিব তাঁর সেই ভক্তটিকে সনাতন গোস্বামীর কাছে যাওয়ার উপদেশ দেন। ভক্তটি সনাতন গোস্বামীর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেন যে, শিব তাঁকে তাঁর কাছে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ করার জন্য। সনাতন গোস্বামীর একটি পরশমণি ছিল, যা তিনি আবর্জনার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণটির অনুরোধে সনাতন গোস্বামী তাঁকে সেই পরশমণিটি দেন, এবং তার ফলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। এখন তিনি সেই পরশমণিটির স্পর্শের দ্বারা লোহাকে সোনায় পরিণত করে যত ইচ্ছা স্বর্ণ সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর, তিনি ভাবতে লাগলেন, "এই পরশমণিটি লাভ করাই যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ হয়, তা

হলে সনাতন গোস্বামী কেন সেটি আবর্জনার মধ্যে রেখেছিলেন?" তাই তিনি সনাতন গোস্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "প্রভু, এইটিই যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ হয়ে থাকে, তা হলে আপনি কেন এটি আবর্জনার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন?" সনাতন গোস্বামী তখন তাঁকে বলেছিলেন, "প্রকৃতপক্ষে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ বর প্রাপ্তি নয়। কিন্তু আপনি কি আমার কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ করার জন্য প্রস্তুত আছেন?" ব্রাহ্মণটি বলেছিলেন, "হ্যাঁ প্রভু, শিব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ করার জন্য।" সনাতন গোস্বামী তখন তাঁকে বলেছিলেন, সেই পরশমণিটিকে নিকটবর্তী কুণ্ডের জলে ফেলে দিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসতে। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি তাই করেছিলেন, এবং তিনি যখন ফিরে এসেছিলেন, তখন সনাতন গোস্বামী তাঁকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। এইভাবে শিবের আশীর্বাদে ব্রাহ্মণটি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের সঙ্গ লাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

ততো মীঢ়াংসমামন্ত্র্য শুনাসীরাঃ সহর্ষিভিঃ ।
ভূয়স্তদ্‌দেবযজনং সমীঢ়দ্বেধসো যযুঃ ॥ ৭ ॥

ততঃ—তার পর; **মীঢ়াংসম্**—শিব; **আমন্ত্র্য**—নিমন্ত্রণ করে; **শুনাসীরাঃ**—ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের; **সহ ঋষিভিঃ**—ভৃগু আদি মহর্ষিগণ সহ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তৎ**—তা; **দেব-যজনম্**—যেখানে দেবতাগণ পূজিত হন সেই স্থানে; **স-মীঢ়ৎ**—শিব সহ; **বেধসঃ**—ব্রহ্মা সহ; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তার পর, মহর্ষি-প্রধান ভৃগু শিবকে যজ্ঞস্থলে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এইভাবে ঋষিগণ, শিব ও ব্রহ্মা সহ দেবতারা সেই স্থানে গিয়েছিলেন যেখানে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

দক্ষের দ্বারা আয়োজিত যজ্ঞ শিবের প্রভাবে পণ্ড হয়েছিল। তাই সেখানে ব্রহ্মা এবং মহর্ষিগণ সহ উপস্থিত সমস্ত দেবতারা শিবকে বিশেষভাবে অনুরোধ

করেছিলেন, যাতে সেখানে এসে তিনি পুনরায় যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। *'শিবহীন যজ্ঞ'* বলে একটি প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে—শিবের উপস্থিতি ব্যতীত যজ্ঞ অসফল হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন যজ্ঞেশ্বর, তবুও প্রতিটি যজ্ঞে ব্রহ্মা এবং শিব প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের উপস্থিতি আবশ্যক হয়।

শ্লোক ৮

বিধায় কার্ৎস্ন্যেন চ তদ্‌যদাহ ভগবান্ ভবঃ ।
সন্দধুঃ কস্য কায়েন সবনীয়পশোঃ শিরঃ ॥ ৮ ॥

বিধায়—সম্পাদন করে; **কার্ৎস্ন্যেন**—সর্বেসর্বা; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **যৎ**—যা; **আহ**—বলেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **ভবঃ**—শিব; **সন্দধুঃ**—সম্পন্ন করেছিলেন; **কস্য**—দক্ষের; **কায়েন**—দেহে; **সবনীয়**—যজ্ঞের নিমিত্ত; **পশোঃ**—পশুর মতো; **শিরঃ**—মস্তক।

অনুবাদ

সব কিছু ঠিক শিবের নির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন হওয়ার পর, দক্ষের দেহে যজ্ঞের নিমিত্ত পশুর মস্তক যোজনা করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

এইবার, সমস্ত দেবতা এবং মহর্ষিরা অত্যন্ত সাবধান ছিলেন যাতে শিব ক্রুদ্ধ না হন। তাই তিনি যা বলেছিলেন, ঠিক তাই করা হয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, দক্ষের শরীরে একটি পশুর (ছাগলের) মুণ্ড যোজনা করা হয়েছিল।

শ্লোক ৯

সন্ধীয়মানে শিরসি দক্ষো রুদ্রাভিবীক্ষিতঃ ।
সদ্যঃ সুপ্ত ইবোত্তস্থৌ দদৃশে চাগ্রতো মৃড়ম্ ॥ ৯ ॥

সন্ধীয়মানে—সংযোজিত হয়ে; **শিরসি**—মস্তকের দ্বারা; **দক্ষঃ**—রাজা দক্ষ; **রুদ্র-অভিবীক্ষিতঃ**—রুদ্রের (শিবের) দ্বারা দৃষ্ট হয়ে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সুপ্তে**—নিদ্রিত; **ইব**—মতো; **উত্তস্থৌ**—জাগরিত হয়েছিলেন; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **চ**—ও; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **মৃড়ম্**—শিব।

অনুবাদ

যখন দক্ষের শরীরে পশুর মস্তক সংযোজিত হয়েছিল, তখনই তিনি চেতনা প্রাপ্ত হয়ে সুপ্তোত্থিতের মতো জাগরিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সম্মুখে শিবকে দণ্ডায়মান দেখতে পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে এই উদারহণটি দেওয়া হয়েছে যে, দক্ষ যেন গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিলেন। সংস্কৃত শব্দে তাকে বলা হয় *সুপ্ত ইবোত্তস্থৌ*। অর্থাৎ, কোন মানুষ যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তৎক্ষণাৎ সে তার সমস্ত কর্তব্য কর্ম স্মরণ করে। দক্ষ নিহত হয়েছিলেন, এবং তাঁর মস্তকটি নিয়ে ভস্মীভূত করা হয়েছিল। তাঁর দেহটি মৃত পড়ে ছিল, কিন্তু শিবের কৃপায় তাঁর দেহে ছাগলের মুণ্ড সংযোজন করা মাত্রই, দক্ষ তাঁর চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন। এতে বোঝায় যে, চেতনাও স্বতন্ত্র। ছাগলের মুণ্ড ধারণ করার পর, দক্ষ প্রকৃতপক্ষে আর একটি দেহ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু চেতনা স্বতন্ত্র, তাই তাঁর দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও তাঁর চেতনা একই ছিল। এইভাবে বোঝা যায় যে, দেহের গঠনের সঙ্গে চেতনার বিকাশের কোনই সম্পর্ক নেই। আত্মার দেহান্তরের সাথে চেতনাও বাহিত হয়। বৈদিক ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন—মহারাজ ভরত তাঁর দেহত্যাগের পর একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চেতনা পূর্ববৎ ছিল। তিনি জানতেন যে, যদিও পূর্বে তিনি ছিলেন মহারাজ ভরত, তবুও মৃত্যুর সময় একটি হরিণের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, তিনি একটি হরিণের দেহে দেহান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু হরিণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর চেতনা মহারাজ ভরতের শরীরের চেতনার মতোই ছিল। ভগবানের আয়োজন এতই উত্তম যে, কারও চেতনা যদি কৃষ্ণচেতনায় পরিণত হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে তাঁর পরবর্তী জীবনে ভিন্ন ধরনের শরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি একজন মহান কৃষ্ণভক্ত হবেন।

শ্লোক ১০

তদা বৃষধ্বজদ্বেষকলিলাত্মা প্রজাপতিঃ।
শিবাবলোকাদভবচ্ছরদ্ধ্রদ ইবামলঃ ॥ ১০ ॥

তদা—সেই সময়; **বৃষ-ধ্বজ**—বৃষারোহী শিব; **দ্বেষ**—বিদ্বেষ; **কলিল-আত্মা**—কলুষিত হৃদয়; **প্রজাপতিঃ**—রাজা দক্ষ; **শিব**—শিব; **অবলোকাৎ**—তাঁকে দর্শন

করে; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **শরৎ**—শরৎকালীন; **হ্রদঃ**—সরোবর; **ইব**—মতো; **অমলঃ**—নির্মল।

অনুবাদ

তখন বৃষধ্বজ শিবকে দর্শন করে, শিবদ্বেষী দক্ষের কলুষিত হৃদয় তৎক্ষণাৎ শরৎকালীন সরোবরের মতো নির্মল হয়েছিল।

তাৎপর্য

শিবকে কেন মঙ্গলময় বলা হয়, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে শিবকে দর্শন করেন, তা হলে তাঁর হৃদয় তৎক্ষণাৎ নির্মল হয়ে যায়। শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার ফলে, দক্ষের হৃদয় কলুষিত হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও অল্প প্রেম এবং ভক্তি সহকারে শিবকে দর্শন করার ফলে, তৎক্ষণাৎ তাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছিল। বর্ষার সময় সরোবরের জল নোংরা এবং কর্দমাক্ত হয়ে যায়, কিন্তু যখনই শরৎকালীন বৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ সেই জল স্বচ্ছ এবং নির্মল হয়। তেমনই, দক্ষের হৃদয় যদিও শিবের নিন্দা করার ফলে অপবিত্র হয়েছিল, এবং যে জন্য তিনি কঠোরভাবে দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চেতনা ফিরে পেয়ে, শ্রদ্ধা সহকারে শিবকে দর্শন করা মাত্রই তাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছিল।

শ্লোক ১১

ভবস্তবায় কৃতধীর্নাশক্লোদনুরাগতঃ ।
ঔৎকণ্ঠ্যাদ্বাষ্পকলয়া সম্পরেতাং সুতাং স্মরন্ ॥ ১১ ॥

ভব-স্তবায়—শিবের স্তব করার জন্য; **কৃত-ধীঃ**—সঙ্কল্প করা সত্ত্বেও; **ন**—না; **অশক্লোৎ**—সক্ষম হয়েছিলেন; **অনুরাগতঃ**—অনুরাগবশত; **ঔৎকণ্ঠ্যাৎ**—উৎকণ্ঠার ফলে; **বাষ্প-কলয়া**—অশ্রুধারায়; **সম্পরেতাম্**—মৃত; **সুতাম্**—কন্যা; **স্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

রাজা দক্ষ শিবের স্তব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কন্যা সতীর মৃত্যুর কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর চোখ অশ্রুধারায় পূর্ণ হয়েছিল, এবং গভীর শোকে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল, এবং তিনি স্তব করতে সমর্থ হননি।

শ্লোক ১২

কৃচ্ছ্রাৎসংস্তভ্য চ মনঃ প্রেমবিহ্বলিতঃ সুধীঃ ।
শশংস নির্ব্যলীকেন ভাবেনেশং প্রজাপতিঃ ॥ ১২ ॥

কৃচ্ছ্রাৎ—অতি কষ্টে; **সংস্তভ্য**—সংযত করে; **চ**—ও; **মনঃ**—মন; **প্রেম-বিহ্বলিতঃ**—স্নেহ ও অনুরাগের ফলে বিহ্বল; **সু-ধীঃ**—শুদ্ধ বুদ্ধি; **শশংস**—প্রশংসা করেছিলেন; **নির্ব্যলীকেন**—নিষ্কপটে অথবা গভীর প্রেমে; **ভাবেন**—অনুভূতি সহকারে; **ঈশম্**—শিবকে; **প্রজাপতিঃ**—রাজা দক্ষ।

অনুবাদ

সেই সময় রাজা দক্ষ স্নেহ ও অনুরাগের দ্বারা বিহ্বল হয়েছিলেন, এবং তখন তাঁর শুদ্ধ বুদ্ধি জাগরিত হয়েছিল। অতি কষ্টে তিনি তাঁর মনকে শান্ত করেছিলেন, তাঁর ভাবাবেগ সংযত করেছিলেন, এবং শুদ্ধ চেতনায় তিনি শিবের স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

দক্ষ উবাচ

ভূয়াননুগ্রহ অহো ভবতা কৃতো মে
দণ্ডস্ত্বয়া ময়ি ভৃতো যদপি প্রলব্ধঃ ।
ন ব্রহ্মবন্ধুষু চ বাং ভগবন্নবজ্ঞা
তুভ্যং হরেশ্চ কুত এব ধৃতব্রতেষু ॥ ১৩ ॥

দক্ষঃ—রাজা দক্ষ; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ভূয়ান্**—অত্যন্ত; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **অহো**—হায়; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **কৃতঃ**—করা হয়েছে; **মে**—আমার প্রতি; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ময়ি**—আমাকে; **ভৃতঃ**—করা হয়েছে; **যৎ অপি**—যদিও; **প্রলব্ধঃ**—পরাজিত; **ন**—না; **ব্রহ্ম-বন্ধুষু**—অযোগ্য ব্রাহ্মণকে; **চ**—ও; **বাম্**—আপনারা উভয়ে; **ভগবন্**—হে প্রভু; **অবজ্ঞা**—অনাদর; **তুভ্যম্**—আপনার; **হরেঃ চ**—শ্রীবিষ্ণুর; **কুতঃ**—কোথায়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধৃত-ব্রতেষু**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যিনি ব্রতী হয়েছেন।

অনুবাদ

রাজা দক্ষ বললেন—হে ভগবান শিব! আমি আপনার চরণে মহা অপরাধ করেছি, কিন্তু আপনি এতই কৃপাময় যে, আপনার অনুগ্রহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করার পরিবর্তে, আপনি আমাকে দণ্ডদান করে আমার প্রতি অসীম কৃপা প্রদর্শন করেছেন। আপনি এবং শ্রীবিষ্ণু কখনও অযোগ্য ব্রাহ্মণদেরও উপেক্ষা করেন না। অতএব যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যুক্ত আমাকে আপনি কেন উপেক্ষা করবেন?

তাৎপর্য

দক্ষ যদিও নিজেকে পরাজিত বলে মনে করেছিলেন, তবুও তিনি জানতেন যে, তিনি যে দণ্ডভোগ করেছেন তা ছিল শিবের মহান কৃপা। তিনি স্মরণ করেছিলেন যে, শিব এবং বিষ্ণু কখনও ব্রাহ্মণদের উপেক্ষা করেন না, এমন কি সেই ব্রাহ্মণেরা অযোগ্য হলেও নয়। বৈদিক সভ্যতা অনুসারে, ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে কখনও কঠোরভাবে দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। সেই দৃষ্টান্ত দেখা যায় অশ্বত্থামার প্রতি অর্জুনের আচরণে। অশ্বত্থামা ছিলেন একজন মহান ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের পুত্র, এবং তিনি যদিও পাণ্ডবদের সব কটি ঘুমন্ত পুত্রদের হত্যা করার মহা পাপ করেছিলেন, যে জন্য শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন ব্রাহ্মণের পুত্র বলে, অর্জুন তাঁকে বধ না করে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন। এখানে ব্যবহৃত *ব্রহ্ম-বন্ধুষু* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ব্রহ্ম-বন্ধু* মানে হচ্ছে, যে-ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু যাঁর কার্যকলাপ ব্রাহ্মণোচিত নয়। এই প্রকার ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নন, *ব্রহ্ম-বন্ধু* । দক্ষ নিজেকে *ব্রহ্ম-বন্ধু* বলে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি একজন মহান ব্রাহ্মণ পিতা ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন, কিন্তু শিবের প্রতি তাঁর আচরণ ঠিক ব্রাহ্মণোচিত ছিল না; তাই তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শিব এবং বিষ্ণু কিন্তু অযোগ্য ব্রাহ্মণদেরও কৃপা করেন। শিব দক্ষকে শত্রুবৎ দণ্ড দেননি; পক্ষান্তরে দক্ষকে তাঁর শুদ্ধ বুদ্ধিতে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি দণ্ড দিয়েছিলেন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি ভুল করেছেন। দক্ষ তা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাঁরই মতো পতিত ব্রাহ্মণদের প্রতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শিবের মহান কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি ছিলেন পতিত, তবুও তিনি যজ্ঞ করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, যেটি হচ্ছে ব্রাহ্মণের কর্তব্য, এবং এইভাবে তিনি শিবের প্রতি তাঁর স্তব শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

বিদ্যাতপোব্রতধরান্ মুখতঃ স্ম বিপ্রান্
ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবিতুং প্রথমং ত্বমস্রাক্ ।
তদ্ব্রাহ্মণান্ পরম সর্ববিপৎসু পাসি
পালঃ পশূনিব বিভো প্রগৃহীতদণ্ডঃ ॥ ১৪ ॥

বিদ্যা—বিদ্যা; **তপঃ**—তপস্যা; **ব্রত**—ব্রত; **ধরান্**—অনুসরণকারী; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **স্ম**—ছিল; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণ; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **আত্ম-তত্ত্বম্**—আত্ম উপলব্ধি; **অবিতুম্**—বিতরণ করার জন্য; **প্রথমম্**—প্রথমে; **ত্বম্**—আপনাকে; **অস্রাক্**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তৎ**—তাই; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণগণ; **পরম**—হে মহান; **সর্ব**—সমস্ত; **বিপৎসু**—বিপদে; **পাসি**—আপনি রক্ষা করেন; **পালঃ**—রক্ষকের মতো; **পশূন্**—পশুদের; **ইব**—মতো; **বিভো**—হে মহান; **প্রগৃহীত**—হস্তধৃত; **দণ্ডঃ**—দণ্ড।

অনুবাদ

হে মহান এবং শক্তিশালী শিব! বিদ্যা, তপ, ব্রত এবং আত্ম-তত্ত্বপরায়ণ ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর মুখ থেকে আপনাকে সৃষ্টি করেছিলেন। গোপালক যেমন দণ্ড হস্তে গাভীদের রক্ষা করে, তেমনই আপনিও ব্রাহ্মণদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার ফলে ধর্মকে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

সমাজে মানুষের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, সামাজিক স্থিতি নির্বিশেষে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের অভ্যাস করা। শিবকে বলা হয় *পশুপতি*, কারণ তিনি উন্নত চেতনার স্তরে জীবদের রক্ষা করেন, যাতে তারা বৈদিক পদ্ধতিতে বর্ণ এবং আশ্রমের বিধি অনুসরণ করতে পারে। পশু শব্দে পশু এবং মানুষদেরও বোঝানো হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা আধ্যাত্মিক চেতনায় বিশেষ উন্নত নয়, সেই সমস্ত পশু এবং পশুসদৃশ জীবদের শিব সর্বদাই রক্ষা করেন। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের মুখ থেকে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শিবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতিনিধি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুর বিরাট-রূপের মুখ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, ক্ষত্রিয়রা তাঁর বাহু থেকে, বৈশ্যরা তাঁর উদর বা কোমর থেকে, এবং শূদ্ররা তাঁর পা থেকে

উৎপন্ন হয়েছেন। শরীরের মধ্যে মস্তক হচ্ছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। বিষ্ণুর পূজার উদ্দেশ্যে দান গ্রহণ করার জন্য এবং বৈদিক জ্ঞান বিতরণ করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের মুখ থেকে ব্রাহ্মণেরা উৎপন্ন হয়েছেন। শিব *পশুপতি* নামে পরিচিত, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জীবদের রক্ষাকর্তা। তিনি অব্রাহ্মণ বা আত্ম-উপলব্ধির বিরোধী সংস্কৃতিহীন মানুষদের আক্রমণ থেকে তাঁদের রক্ষা করেন।

এই শব্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, যারা কেবল বেদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার প্রতি আসক্ত, এবং পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি বুঝতে পারে না, তারা পশুদের থেকে অধিক উন্নত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যদি বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও কৃষ্ণচেতনার বিকাশ না করে, তা হলে তার সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। শিবের দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষকে দণ্ড দেওয়া, কারণ তিনি শিবকে উপেক্ষা করে মহা অপরাধ করেছিলেন। শিবের এই দণ্ড ঠিক রাখাল বালকের পশুদের ভয় দেখাবার জন্য হাতে লগুড় রাখার মতো। সাধারণত বলা হয় যে, পশুদের রক্ষা করতে হলে দণ্ডের প্রয়োজন, কারণ পশুরা যুক্তি-তর্ক বোঝে না। যতক্ষণ লাঠি না থাকবে, ততক্ষণ তারা আজ্ঞা পালন করবে না। পাশবিক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের জন্য বল প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়, কিন্তু যারা উন্নত চেতনাসম্পন্ন, তাদের যুক্তি, তর্ক এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা বোঝানো যায়। যে-সমস্ত মানুষেরা ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণচেতনায় উন্নতি সাধন না করে কেবল বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, তারা প্রায় পশুসদৃশ, এবং তাদের রক্ষা করার ভার শিবের উপর। তাই তিনি কখনও কখনও তাদের দণ্ড দেন, ঠিক যেভাবে তিনি দক্ষকে দণ্ড দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং
ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্ ।
অর্বাক্ পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাদ্
দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ ॥ ১৫ ॥

যঃ—যিনি; **অসৌ**—সেই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অবিদিত-তত্ত্ব**—প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে; **দৃশা**—অভিজ্ঞতার দ্বারা; **সভায়াম্**—সভায়; **ক্ষিপ্তঃ**—তিরস্কৃত হয়েছিলেন; **দুরুক্তি**—কটূক্তি; **বিশিখৈঃ**—বাণের দ্বারা; **বিগণয্য**—গ্রাহ্য না করে; **তৎ**—তা; **মাম্**—আমাকে; **অর্বাক্**—অধঃ; **পতন্তম্**—নরকে পতিত; **অর্হৎ-তম**—সব চাইতে শ্রদ্ধেয়;

নিন্দয়া—নিন্দা করার দ্বারা ; **অপাৎ**—রক্ষা করেছিলেন; **দৃষ্ট্যা**—দর্শন করে; **আর্দ্রয়া**—কৃপার বশে; **সঃ**—সেই ; **ভগবান্**—ভগবন্; **স্ব-কৃতেন**—আপনার কৃপার দ্বারা; **তুষ্যেৎ**—প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

আমি আপনার পূর্ণ মহিমা জানতাম না। তাই সভাস্থলে আপনার উপর আমি দুর্বাক্যরূপ বাণ বর্ষণ করেছিলাম, যদিও আপনি তা গ্রাহ্য করেননি। আপনার মতো পরম পূজ্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করার ফলে, আমি নরকে অধঃপতিত হতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে দণ্ডদান করে রক্ষা করেছেন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনি কৃপাপূর্বক প্রসন্ন হোন, কারণ আমার কথার দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করার ক্ষমতা আমার নেই।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন বিপত্তির সম্মুখীন হন, তখন তিনি সেই অবস্থাকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে, দক্ষ শিবের প্রতি যেরকম অপমানজনক বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন, তা তাঁকে অন্তহীন নরকে নিক্ষিপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতি দয়ালু হওয়ার ফলে, শিব তাঁর অপরাধ মোচনের জন্য তাঁকে দণ্ডদান করেছিলেন। রাজা দক্ষ তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং শিবের উদার আচরণের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে তা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। কখনও কখনও পিতা তাঁর শিশুপুত্রকে দণ্ড দেন, এবং পুত্র যখন বড় হয় তখন সে বুঝতে পারে যে, তার পিতা তাকে যে দণ্ড দিয়েছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে দণ্ড ছিল না, তা ছিল তাঁর কৃপার প্রকাশ। তেমনই, দক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিব তাঁকে যে দণ্ড দিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর প্রতি শিবের করুণার প্রকাশ। সেটি কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ। বলা হয় যে, কৃষ্ণভক্ত কোন দুর্দশাকে ভগবানের দেওয়া দণ্ড বলে কখনই মনে করেন না। জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের কৃপা বলেই তিনি মেনে নেন। তিনি মনে করেন, "আমার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে, আমার দণ্ডিত হওয়াই উচিত ছিল অথবা আরও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন। তাই আমি কর্মের নিয়মে নামমাত্র দণ্ডভোগ করেছি।" এইভাবে ভগবানের কৃপা অনুভব করে ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই অধিক থেকে অধিকতর নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শরণাগত হন, এবং তথাকথিত দণ্ডের দ্বারা একটুও বিচলিত হন না।

শ্লোক ১৬

মৈত্রেয় উবাচ
ক্ষমাপ্যৈবং স মীঢ় াংসং ব্রহ্মণা চানুমন্ত্রিতঃ ।
কর্ম সন্তানয়ামাস সোপাধ্যায়র্ত্বিগাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয় ঋষি; **উবাচ**—বললেন; **ক্ষমা**—ক্ষমা; **আপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—রাজা দক্ষ; **মীঢ়াংসম্**—শিবকে; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মা সহ; **চ**—ও; **অনুমন্ত্রিতঃ**—অনুমতি পেয়ে; **কর্ম**—যজ্ঞ; **সন্তানয়াম্ আস**—পুনরায় শুরু করেছিলেন; **স**—সহ; **উপাধ্যায়**—বিদ্বান ঋষিগণ; **ঋত্বিক্**—পুরোহিত; **আদিভিঃ**—এবং অন্যারা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে শিব দক্ষকে ক্ষমা করলে, এবং রাজা দক্ষ ব্রহ্মার আজ্ঞায় উপাধ্যায় ও ঋত্বিকগণ সহ পুনরায় যজ্ঞকার্য আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ১৭

বৈষ্ণবং যজ্ঞসন্তত্যৈ ত্রিকপালং দ্বিজোত্তমাঃ ।
পুরোডাশং নিরবপন্ বীরসংসর্গশুদ্ধয়ে ॥ ১৭ ॥

বৈষ্ণবম্—বিষ্ণু অথবা তাঁর ভক্তদের জন্য; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **সন্তত্যৈ**—অনুষ্ঠানের জন্য; **ত্রি-কপালম্**—তিন প্রকার নৈবেদ্য; **দ্বিজ-উত্তমাঃ**—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **পুরোডাশম্**—পুরোডাশ নামক আহুতি; **নিরবপন্**—নিবেদন করেছিলেন; **বীর**—বীরভদ্র এবং শিবের অন্যান্য অনুচরেরা; **সংসর্গ**—স্পর্শজনিত দোষ; **শুদ্ধয়ে**—শুদ্ধির জন্য।

অনুবাদ

তার পর, যজ্ঞকার্য শুরু করার জন্য ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বীরভদ্র এবং শিবের অন্যান্য প্রেত পার্ষদদের স্পর্শজনিত দোষের শুদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। তার পর তাঁরা অগ্নিতে পুরোডাশ নামক আহুতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাৎপর্য

বীরভদ্র আদি শিবের অনুচর ও ভক্তদের *বীর* বলা হয়, এবং তারা হচ্ছে ভূত, প্রেত ও পিশাচ। তারা কেবল তাদের উপস্থিতির দ্বারাই যজ্ঞস্থল দূষিত করেনি, উপরন্তু মল-মূত্র ত্যাগ করে সমস্ত ব্যবস্থায় উৎপাত করেছিল। তাই, প্রথমে

পুরোডাশ আহুতি দিয়ে সেই দোষ নির্মল করতে হয়েছিল। বিষ্ণুযজ্ঞ বা বিষ্ণুর প্রতি নৈবেদ্য অর্পণ অশুচি অবস্থায় অনুষ্ঠান করা যায় না। অশুদ্ধ অবস্থায় কোন কিছু নিবেদন করাকে বলা হয় সেবাপরাধ। মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহের আরাধনাও বিষ্ণুযজ্ঞ। তাই, সমস্ত বিষ্ণু মন্দিরে, যে-সমস্ত পুরোহিতরা অর্চনা-বিধির অনুষ্ঠান করেন, তাঁদের খুব পরিষ্কার থাকতে হয়। প্রতিটি সামগ্রী সব সময় খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, এবং ভোগও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে তৈরি করতে হয় এই সমস্ত বিধিগুলি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। *অর্চনা* সেবায় বত্রিশটি অপরাধ রয়েছে। তাই, অশুচি না হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। সাধারণত, যখন কোন অনুষ্ঠান শুরু হয়, তখন শুদ্ধির জন্য সর্ব প্রথমে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করা হয়। কেউ যদি বাইরে অথবা অন্তরে পবিত্র অথবা অপবিত্র থাকেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য নাম উচ্চারণ অথবা স্মরণ করলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যান। বীরভদ্র আদি শিবের অনুচরদের উপস্থিতির ফলে যজ্ঞস্থল অপবিত্র হয়েছিল, তাই সমস্ত যজ্ঞস্থল পবিত্র করতে হয়েছিল। যদিও শিব সেখানে ছিলেন এবং তিনি হচ্ছেন মঙ্গলময়, কিন্তু সেই স্থান পবিত্র করার প্রয়োজন ছিল, কারণ তাঁর অনুচরেরা বলপূর্বক সেখানে প্রবেশ করে বহু ঘৃণিত কার্য করেছিল। কেবল শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নাম *ত্রিকপাল* উচ্চারণ করার দ্বারা সেই স্থান পবিত্র করা সম্ভব হয়েছিল, যা ত্রিভুবন পবিত্র করে। অর্থাৎ, এখানে স্বীকার করা হয়েছে যে, শিবের অনুচরেরা সাধারণত অপবিত্র। এমন কি, তারা সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিও পালন করে না; তারা নিয়মিতভাবে স্নান করে না, তারা লম্বা চুল রাখে, এবং গাঁজা খায়। এই প্রকার অসংযতভাবে যারা আচরণ করে, তাদেরকে ভূত-প্রেতের মধ্যে গণ্য করা হয়। যেহেতু তারা সেই যজ্ঞস্থানে উপস্থিত ছিল, তাই সেখানকার সমস্ত পরিবেশ দূষিত হয়ে গিয়েছিল, এবং *ত্রিকপাল* আহুতির দ্বারা সেই পরিবেশ শুদ্ধ করতে হয়েছিল, যা বিষ্ণুর মঙ্গলাচরণ সূচিত করে।

শ্লোক ১৮

অধ্বর্যুণাত্তহবিষা যজমানো বিশাম্পতে ।
ধিয়া বিশুদ্ধয়া দধ্যৌ তথা প্রাদুরভূদ্ধরিঃ ॥ ১৮ ॥

অধ্বর্যুণা—যজুর্বেদ সহ; **আত্ত**—গ্রহণ করে; **হবিষা**—ঘৃত সহ; **যজমানঃ**—রাজা দক্ষ; **বিশাম্-পতে**—হে বিদুর; **ধিয়া**—ধ্যানে; **বিশুদ্ধয়া**—শুদ্ধ; **দধ্যৌ**—নিবেদন করেছিলেন; **তথা**—তৎক্ষণাৎ; **প্রাদুঃ**—প্রকট; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—প্রিয় বিদুর! বিশুদ্ধ চিত্তে রাজা দক্ষ যজুর্বেদীয় মন্ত্র সহ যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দেওয়া মাত্রই, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর আদি নারায়ণরূপে সেখানে প্রকট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু সর্বব্যাপ্ত। কোন ভক্ত যখন পবিত্র চিত্তে, বিধি-নিষেধ পালন করে ভক্তি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন তিনি শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করতে পারেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্ত ভগবৎ প্রেমরূপ অঞ্জনে রঞ্জিত চক্ষুর দ্বারা সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। ভগবান শ্যামসুন্দর তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপালু।

শ্লোক ১৯

তদা স্বপ্রভয়া তেষাং দ্যোতয়ন্ত্যা দিশো দশ ।
মুষ্ণংস্তেজ উপানীতস্তার্ক্ষ্যেণ স্তোত্রবাজিনা ॥ ১৯ ॥

তদা—সেই সময়; **স্ব-প্রভয়া**—তাঁর নিজ প্রভার দ্বারা; **তেষাম্**—তাঁদের সকলকে; **দ্যোতয়ন্ত্যা**—জ্যোতির দ্বারা; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **দশ**—দশ; **মুষ্ণন্**—খর্ব করে; **তেজঃ**—জ্যোতি; **উপানীতঃ**—উপনীত হয়েছিলেন; **তার্ক্ষ্যেণ**—গরুড়ের দ্বারা; **স্তোত্র-বাজিনা**—যাঁর পক্ষদ্বয়কে বলা হয় বৃহৎ এবং রথন্তর।

অনুবাদ

ভগবান নারায়ণ বিশাল পক্ষযুক্ত তার্ক্ষ্য বা গরুড়ের স্কন্ধে আরূঢ় ছিলেন। ভগবান সেখানে আবির্ভূত হওয়া মাত্রই সমস্ত দিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, এবং তার ফলে সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মা এবং অন্য সকলের জ্যোতি খর্ব হয়েছিল।

তাৎপর্য

পরবর্তী দুটি শ্লোকে নারায়ণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২০

শ্যামো হিরণ্যরশনোঽর্ককিরীটজুষ্টো
নীলালকভ্রমরমণ্ডিতকুণ্ডলাস্যঃ ।
শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম-
ব্যগ্রৈর্হিরণ্ময়ভুজৈরিব কর্ণিকারঃ ॥ ২০ ॥

শ্যামঃ—শ্যামবর্ণ; **হিরণ্য-রশনঃ**—স্বর্ণবৎ কটিভূষণ; **অর্ক-কিরীট-জুষ্টঃ**—সূর্যের মতো উজ্জ্বল মুকুট; **নীল-অলক**—নীলাভ কেশদাম; **ভ্রমর**—ভ্রমর; **মণ্ডিত-কুণ্ডল-আস্যঃ**—কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা সুশোভিত মুখ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **অব্জ**—পদ্মফুল; **চক্র**—চক্র; **শর**—বাণ; **চাপ**—ধনুক; **গদা**—গদা; **অসি**—তরবারি; **চর্ম**—ঢাল; **ব্যগ্রৈঃ**—পূর্ণ; **হিরন্ময়**—স্বর্ণময় বলয় ও অঙ্গদ; **ভুজৈঃ**—বাহুসমূহ; **ইব**—যেন; **কর্ণিকারঃ**—পুষ্পবৃক্ষ।

অনুবাদ

তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, বস্ত্র স্বর্ণের মতো পীত, এবং তাঁর কিরীট সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। তাঁর কেশরাশি ভ্রমরের মতো নীলাভ, এবং তাঁর মুখমণ্ডল কর্ণকুণ্ডল-শোভিত। তাঁর আট হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুক, বাণ, ঢাল ও তরবারি, এবং তাঁর বাহুসকল বলয়, অঙ্গদ আদি স্বর্ণ আভরণে সজ্জিত। তাঁর সারা অঙ্গ পুষ্পিত বৃক্ষের মতো শোভা ধারণ করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মুখমণ্ডলকে গুঞ্জনরত ভ্রমর-বেষ্টিত পদ্মফুলের মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর শ্রীঅঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার রক্তিম স্বর্ণসদৃশ প্রাতঃকালীন সূর্যের আভা-সমন্বিত। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য ভগবান ঠিক প্রাতঃকালীন সূর্যের মতো আবির্ভূত হন। তাঁর হাতে তিনি বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র ধারণ করেন, এবং তাঁর আটটি হাতের সঙ্গে পদ্মফুলের আটটি পাপড়ির তুলনা করা হয়েছে। এখানে যে-সমস্ত অস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলি সবই তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য।

সাধারণত বিষ্ণুর চার হাতে চক্র, গদা, শঙ্খ এবং পদ্ম থাকে। এই চারটি প্রতীক বিষ্ণুর চারটি হাতে বিভিন্ন আয়োজনে সুবিন্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তাঁর হাতের চক্র ও গদা অসুর ও দুষ্কৃতকারীদের দণ্ড দেওয়ার জন্য, এবং পদ্ম ও

শঙ্খ ভক্তদের আশীর্বাদ করার জন্য। সর্বদাই দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—ভক্ত এবং অসুর। *ভগবদ্গীতায়* যে-কথা প্রতিপন্ন হয়েছে *(পরিত্রাণায় সাধুনাম্)*, ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অসুরদের বিনাশ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই জড় জগতে অসুর এবং ভক্ত রয়েছে, কিন্তু চিৎ-জগতে এই রকম কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু জড় এবং চিৎ উভয় জগতেরই অধীশ্বর। জড় জগতে প্রায় সকলেই আসুরিক ভাবাপন্ন, কিন্তু ভক্তও রয়েছেন, যাঁরা এই জড় জগতে রয়েছেন বলে মনে হলেও, তাঁরা সর্বদাই চিৎ-জগতে অবস্থিত। ভক্তের স্থিতি সর্বদাই জড়াতীত, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে সর্বদা রক্ষা করেন।

শ্লোক ২১

বক্ষস্যধিশ্রিতবধূর্বনমাল্যুদার-
হাসাবলোককলয়া রময়ংশ্চ বিশ্বম্ ।
পার্শ্বভ্রমদ্ব্যজনচামররাজহংসঃ
শ্বেতাতপত্রশশিনোপরি রজ্যমানঃ ॥ ২১ ॥

বক্ষসি—বক্ষে; **অধিশ্রিত**—অবস্থিত; **বধূঃ**—বধূ (লক্ষ্মীদেবী); **বন-মালী**—বনফুলের মালা পরিহিত; **উদার**—সুন্দর; **হাস**—হাস্য; **অবলোক**—অবলোকন; **কলয়া**—কলা; **রময়ন্**—মনোহর; **চ**—এবং; **বিশ্বম্**—সারা জগৎ; **পার্শ্ব**—পার্শ্বে; **ভ্রমৎ**—আন্দোলিত; **ব্যজন-চামর**—ব্যজনের জন্য চমরী গাভীর শ্বেত পুচ্ছ; **রাজ-হংসঃ**—রাজহংসে; **শ্বেত-আতপত্র-শশিনা**—চন্দ্রের মতো শ্বেত চন্দ্রাতপ; **উপরি**—উপরে; **রজ্য-মানঃ**—শোভমান।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বক্ষস্থলে লক্ষ্মীদেবী এবং কণ্ঠে বনফুলের মালা বিরাজিত ছিল, তাই তাঁকে অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত দেখাচ্ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল মধুর হাসির দ্বারা সুশোভিত ছিল, যা সারা জগৎকে, বিশেষ করে ভক্তদের মোহিত করতে পারে। তাঁর উভয় পার্শ্বে শ্বেত হংসের মতো শ্বেত চামর আন্দোলিত হচ্ছে, এবং তাঁর মাথার উপরে চন্দ্রের মতো শ্বেত চন্দ্রাতপ বিরাজ করছে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল সমগ্র জগৎকে মোহিত করে। কেবল ভক্তরাই নয়, অভক্তরাও তাঁর এই মধুর হাসির দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে

সূর্য, চন্দ্র, অষ্টদল-কমল এবং গুঞ্জনরত ভ্রমরের সঙ্গে চামর, চন্দ্রাতপ, মুখের পাশে দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডল, এবং তাঁর কৃষ্ণবর্ণ কেশদামের তুলনা করা হয়েছে। এই সব সহ তাঁর আট হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুক, বাণ, ঢাল এবং তরোয়াল সমন্বিত বিষ্ণুর রূপ এতই চমৎকার ও সুন্দর ছিল যে, তা দক্ষ এবং ব্রহ্মা আদি দেবতা সহ সকলকেই মোহিত করেছিল।

শ্লোক ২২

তমুপাগতমালক্ষ্য সর্বে সুরগণাদয়ঃ ।
প্রণেমুঃ সহসোত্থায় ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ ॥ ২২ ॥

তম্—তাঁকে; **উপাগতম্**—আগত; **আলক্ষ্য**—দেখে; **সর্বে**—সকলে; **সুর-গণ-আদয়ঃ**—দেবতা এবং অন্যরা; **প্রণেমুঃ**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মা; **ইন্দ্র**—ইন্দ্র; **ত্রি-অক্ষ**—শিব (ত্রিলোচন); **নায়কাঃ**—প্রমুখ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সমাগত দেখে ব্রহ্মা, শিব, গন্ধর্ব এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত দেবতাগণ সকলে তাঁদের সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন শিব এবং ব্রহ্মারও পরম ঈশ্বর, অতএব দেবতা, গন্ধর্ব এবং সাধারণ জীবদের আর কি কথা। একটি বন্দনায় বলা হয়েছে, *যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতাঃ*—সমস্ত দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন। তেমনই, *ধ্যানাবস্থিত-তদ্-গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*—ধ্যানস্থ হয়ে যোগীরা তাঁদের অন্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করেন। এইভাবে শ্রীবিষ্ণু সমস্ত দেবতাদের, সমস্ত গন্ধর্বদেব এমন কি শিব এবং ব্রহ্মারও আরাধ্য। *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*—তাই বিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যদিও পূর্বে, ব্রহ্মার প্রার্থনায় শিবকে পরম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও শ্রীবিষ্ণুর আগমনে শিবও তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ২৩

তত্তেজসা হতরুচঃ সন্নজিহ্বাঃ সসাধ্বসাঃ ।
মূর্ধ্না ধৃতাঞ্জলিপুটা উপতস্থুরধোক্ষজম্ ॥ ২৩ ॥

তৎ-তেজসা—তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার দ্বারা; **হত-রুচঃ**—যাঁদের প্রভাব ম্লান হয়েছিল; **সন্ন-জিহ্বাঃ**—বাক্ রুদ্ধ হয়ে; **স-সাধ্বসাঃ**—তাঁর ভয়ে ভীত; **মূর্ধ্না**—মস্তকের দ্বারা; **ধৃত-অঞ্জলি-পুটাঃ**—অঞ্জলিবদ্ধ হাত মস্তকে স্পর্শ করে; **উপতস্থুঃ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **অধোক্ষজম্**—অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

নারায়ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় সকলের প্রভাব ম্লান হয়েছিল, এবং সকলেই নীরব হয়েছিলেন। সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধায় ভয়ভীত হয়ে, উপস্থিত সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের স্তব করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

অপ্যর্বাগ্‌বৃত্তয়ো যস্য মহি ত্বাত্মভুবাদয়ঃ ।
যথামতি গৃণন্তি স্ম কৃতানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ২৪ ॥

অপি—তবুও; **অর্বাক্-বৃত্তয়ঃ**—মানসিক ক্রিয়াকলাপের অতীত; **যস্য**—যাঁর; **মহি**—মহিমা, **তু**—কিন্তু; **আত্মভূ-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি; **যথা-মতি**—তাঁদের সামর্থ্য অনুসারে; **গৃণন্তি স্ম**—স্তব করেছিলেন, **কৃত-অনুগ্রহ**—তাঁর কৃপায় প্রকাশিত; **বিগ্রহম্**—চিন্ময় রূপ।

অনুবাদ

যদিও ব্রহ্মাদি দেবতারাও ভগবানের অনন্ত মহিমা অনুমান করতে অসমর্থ, তবুও ভগবানের কৃপায় তাঁরা তাঁর চিন্ময় রূপ দর্শন করতে পেরেছিলেন। কেবল তাঁর সেই কৃপার প্রভাবেই তাঁরা তাঁদের সামর্থ্য অনুসারে তাঁর প্রতি স্তব নিবেদন করতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই অনন্ত, এবং তাঁর মহিমা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, এমন কি ব্রহ্মার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও নয়। বলা হয় যে, ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার অনন্তদেবও তাঁর অনন্ত মুখে অনন্ত কাল ধরে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করার চেষ্টা করেও তার অন্ত খুঁজে পাননি। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষ তার বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের স্তব করতে পারে অথবা সেবা করতে

পারে। সেবার ভাবের দ্বারা এই ক্ষমতা বর্ধিত হয়। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ* মানে হচ্ছে ভগবানের সেবা শুরু হয় জিহ্বা থেকে। অর্থাৎ কীর্তন থেকে। হরে কৃষ্ণ কীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের সেবা শুরু হয়। জিহ্বার আর একটি ক্রিয়া হচ্ছে ভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করা বা গ্রহণ করা। অনন্তের সেবা শুরু জিহ্বা দ্বারা, এবং তার পূর্ণতা হয় কীর্তন ও প্রসাদ গ্রহণে। ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। জিহ্বা হচ্ছে সব চাইতে অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়, কারণ তা অনেক অভক্ষ্য খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তার ফলে জীবকে বদ্ধ জীবনের অন্ধকূপে বলপূর্বক প্রক্ষিপ্ত করে। জীব যখন এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, তখন তাকে এত সমস্ত ঘৃণিত বস্তু খেতে হয় যার কোন অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। জিহ্বাকে ভগবানের মহিমা কীর্তনে এবং ভগবানের প্রসাদ গ্রহণে যুক্ত করা উচিত, যাতে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও সংযত হয়। কীর্তন হচ্ছে ঔষধ এবং প্রসাদ হচ্ছে পথ্য। এইভাবে আমরা ভগবানের সেবা শুরু করতে পারি, এবং সেবা যত বাড়তে থাকে, ভগবানও ভক্তের কাছে ততই নিজেকে প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর মহিমার কোন অন্ত নেই, এবং তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে রাখারও কোন অন্ত নেই।

শ্লোক ২৫

দক্ষো গৃহীতার্হণসাদনোত্তমং
যজ্ঞেশ্বরং বিশ্বসৃজাং পরং গুরুম্ ।
সুনন্দনন্দাদ্যনুগৈর্বৃতং মুদা
গৃণন্ প্রপেদে প্রযতঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫ ॥

দক্ষঃ—দক্ষ; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছিলেন; **অর্হণ**—ন্যায্য; **সাদন-উত্তমম্**—যজ্ঞপাত্র; **যজ্ঞ-ঈশ্বরম্**—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বরকে; **বিশ্ব-সৃজাম্**—সমস্ত প্রজাপতিদের; **পরম্**—পরম; **গুরুম্**—গুরু; **সুনন্দ-নন্দ-আদি-অনুগৈঃ**—সনন্দ এবং নন্দ আদি পার্ষদদের দ্বারা; **বৃতম্**—পরিবৃত; **মুদা**—মহা আনন্দে; **গৃণন্**—স্তব করে; **প্রপেদে**—শরণ গ্রহণ করেছিলেন; **প্রযতঃ**—বিনীতভাবে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—করজোড়ে।

অনুবাদ

যখন ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞে নিবেদিত আহুতি গ্রহণ করলেন, তখন প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁর স্তুতি করতে আরম্ভ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর এবং সমস্ত প্রজাপতিদের গুরু, এবং তিনি নন্দ ও সুনন্দ আদি পার্ষদদের দ্বারাও সেবিত।

শ্লোক ২৬

দক্ষ উবাচ

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং
চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্ ।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যা-
মাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ ॥ ২৬ ॥

দক্ষঃ—দক্ষ; **উবাচ**—বললেন; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **স্ব-ধাম্নি**—আপনার নিজের ধামে; **উপরত-অখিল**—সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত; **বুদ্ধি-অবস্থম্**—মনোধর্মী কল্পনার অবস্থা; **চিৎ-মাত্রম্**—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, **একম্**—অদ্বিতীয়, **অভয়ম্**—নির্ভয়, **প্রতিষিধ্য**—নিয়ন্ত্রণ করে; **মায়াম্**—জড় শক্তি; **তিষ্ঠন্**—অবস্থিত হয়ে; **তয়া**—মায়া সহ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষত্বম্**—পর্যবেক্ষক; **উপেত্য**—প্রবেশ করে; **তস্যাম্**—তাঁর; **আস্তে**—উপস্থিত; **ভবান্**—আপনি, **অপরিশুদ্ধঃ**—অশুদ্ধ; **ইব**—যেন; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—আত্মনির্ভর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানকে সম্বোধন করে দক্ষ বললেন—হে প্রভু! আপনি কল্পনাপ্রসূত সমস্ত অবস্থার অতীত। আপনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, নির্ভয়, এবং সর্ব অবস্থাতেই আপনি মায়াধীশ। যদিও আপনি জড়া প্রকৃতিতে আবির্ভূত হন, কিন্তু আপনি মায়াতীত। আপনি সর্বদাই জড় কলুষ থেকে মুক্ত কেননা আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র।

শ্লোক ২৭

ঋত্বিজ উচুঃ

তত্ত্বং ন তে বয়মনঞ্জন রুদ্রশাপাৎ
কর্মণ্যবগ্রহধিয়ো ভগবন্‌বিদামঃ ।
ধর্মোপলক্ষণমিদং ত্রিবৃদধ্বরাখ্যং
জ্ঞাতং যদর্থমধিদৈবমদোব্যবস্থাঃ ॥ ২৭ ॥

ঋত্বিজঃ—পুরোহিতগণ; **উচুঃ**—বলতে শুরু করলেন; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **ন**—না, তে—আপনার; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **অনঞ্জন**—জড় কলুষ-রহিত; **রুদ্র**—শিব, **শাপাৎ**—তাঁর অভিশাপের দ্বারা, **কর্মণি**—সকাম কর্মে, **অবগ্রহ**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে, **ধিয়ঃ**—এই প্রকার বুদ্ধিমত্তার, **ভগবন্**—হে ভগবান, **বিদামঃ**—জানি; **ধর্ম**—ধর্ম; **উপলক্ষণম্**—লক্ষণ; **ইদম্**—এই; **ত্রি-বৃৎ**—বৈদিক জ্ঞানের তিনটি বিভাগ; **অধ্বর**—যজ্ঞ, **আখ্যম্**— নামক; **জ্ঞাতম্**—জ্ঞাত; **যৎ**—যা; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **অধিদৈবম্**—দেবতাদের পূজা করার জন্য; **অদঃ**—এই; **ব্যবস্থাঃ**—আয়োজন।

অনুবাদ

ভগবানকে সম্বোধন করে ঋত্বিকেরা বললেন—হে ভগবান! আপনি জড় কলুষের অতীত, শিবের অনুচরদের অভিশাপের ফলে আমরা সকাম কর্মে আসক্ত হয়েছি, এবং তার ফলে আমরা এখন অধঃপতিত হয়েছি এবং আপনার বিষয়ে তাই আমরা কিছুই জানি না। যজ্ঞ করার অজুহাতে আমরা এখন বৈদিক জ্ঞানের তিনটি বিভাগের অনুশাসনে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা জানি যে, আপনি দেবতাদের স্বীয় ভাগ প্রদান করার আয়োজন করেছেন।

তাৎপর্য

বেদকে বলা হয় *ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদাঃ* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪৫)। যারা *বেদের* ঐকান্তিক অধ্যয়নকারী, তারা *বেদে* বর্ণিত অনুষ্ঠানসমূহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তাই এই বেদবাদীরা বুঝতে পারে না যে, বেদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে জানা। কিন্তু, যাঁরা বেদের গুণময়ী আকর্ষণ অতিক্রম করেছেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, যিনি কখনই জড় জগতের গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তাই এখানে শ্রীবিষ্ণুকে *অনঞ্জন* (জড় কলুষ থেকে মুক্ত) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪২) শ্রীকৃষ্ণ অপরিণত বেদবাদীদের নিন্দা করে বলেছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥

"অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা বেদের আলঙ্কারিক বাণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তারা বলে তার অতীত আর কিছু নেই।"

শ্লোক ২৮

সদস্যা ঊচুঃ

উৎপত্ত্যধ্বন্যশরণ উরুক্লেশদুর্গেঽন্তকোগ্র-
ব্যালান্বিষ্টে বিষয়মৃগতৃষ্যাত্মগেহোরুভারঃ ।
দ্বন্দ্বশ্বভ্রে খলমৃগভয়ে শোকদাবেঽজ্ঞসার্থঃ
পাদৌকস্তে শরণদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ ॥ ২৮ ॥

সদস্যাঃ—সভার সদস্যরা; **ঊচুঃ**—বললেন; **উৎপত্তি**—জন্ম-মৃত্যুর চক্র; **অধ্বনি**—মার্গে; **অশরণে**—নিরাশ্রয়; **উরু**—মহান; **ক্লেশ**—কষ্টকর; **দুর্গে**—দুর্ভেদ্য দুর্গে; **অন্তক**—অন্ত; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **ব্যাল**—সর্প; **অন্বিষ্টে**—পরিপূর্ণ; **বিষয়**—জড় সুখ; **মৃগ-তৃষি**—মরীচিকা; **আত্ম**—দেহ; **গেহ**—গৃহ; **উরু**—ভারি; **ভারঃ**—বোঝা; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্ব; **শ্বভ্রে**—তথাকথিত সুখ-দুঃখের গর্ত; **খল**—বঞ্চক; **মৃগ**—পশু; **ভয়ে**—ভীত হয়ে; **শোক-দাবে**—শোকরূপ দাবাগ্নি; **অজ্ঞ-স-অর্থঃ**—অজ্ঞ ব্যক্তিদের স্বার্থে; **পাদ-ওকঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়; **তে**—আপনাকে; **শরণ-দ**—শরণ প্রদানকারী; **কদা**—কখন; **যাতি**—গিয়েছিল; **কাম-উপসৃষ্টঃ**—সব রকম বাসনার দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে।

অনুবাদ

সভার সদস্যরা ভগবানকে সম্বোধন করে বললেন—হে সন্তপ্ত জীবদের একমাত্র আশ্রয়। বদ্ধ জীবনের এই দুর্ভেদ্য দুর্গে কালরূপী সর্প সর্বদা দংশন করতে উদ্যত হয়ে রয়েছে। এই জগৎ তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের গর্তে পূর্ণ, এবং সেখানে বহু হিংস্র পশু সর্বদা আক্রমণ করতে উদ্যত। শোকরূপী অগ্নি সর্বদা সেখানে জ্বলছে, এবং অলীক সুখের মরীচিকা সর্বদা জীবকে প্রলোভিত করছে, কিন্তু তা থেকে কারও আশ্রয়ের কোন স্থান নেই। তাই অজ্ঞ ব্যক্তিরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে, সর্বদা তাদের তথাকথিত কর্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বাস করছে, এবং আমরা জানি না কখন তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে।

তাৎপর্য

যারা কৃষ্ণভক্ত নয়, তাদের জীবন অত্যন্ত শোচনীয়, যার বর্ণনা এই শ্লোকে করা হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত পরিস্থিতির কারণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হওয়া। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত মোহাচ্ছন্ন এবং দুর্দশাক্লিষ্ট

ব্যক্তিদের ত্রাণ করা। তাই সমগ্র মানব-সমাজের জন্য এটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণ কার্য, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সংস্থায় যাঁরা কর্ম করছেন, তাঁরাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী, কারণ তাঁরা সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন।

শ্লোক ২৯

রুদ্র উবাচ

তব বরদ বরাঙ্ঘ্রাবাশিষেহাখিলার্থে
হ্যপি মুনিভিরসক্তৈরাদরেণার্হণীয়ে ।
যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যলোকোঽপবিদ্ধং
জপতি ন গণয়ে তত্ত্বৎপরানুগ্রহেণ ॥ ২৯ ॥

রুদ্রঃ উবাচ—শ্রীশিব বললেন; **তব**—আপনার; **বর-দ**—হে পরম হিতৈষী; **বর-অঙ্ঘ্রৌ**—অমূল্য চরণ-কমল; **আশিষা**—ইচ্ছার দ্বারা; **ইহ**—জড় জগতে; **অখিল-অর্থে**—পূর্ণ করার জন্য; **হি অপি**—নিশ্চিতভাবে; **মুনিভিঃ**—মুনিদের দ্বারা; **অসক্তৈঃ**—মুক্ত; **আদরেণ**—আদরপূর্বক; **অর্হণীয়ে**—পূজ্য; **যদি**—যদি; **রচিত-ধিয়ম্**—মন স্থির; **মা**—আমাকে; **অবিদ্য-লোকঃ**—অজ্ঞানী ব্যক্তিরা; **অপবিদ্ধম্**—অশুদ্ধ কর্ম; **জপতি**—উচ্চারণ করে; **ন গণয়ে**—গ্রাহ্য করি না; **তৎ**—তা; **ত্বৎ-পর-অনুগ্রহেণ**—আপনার মতো কৃপার দ্বারা।

অনুবাদ

শিব বললেন—হে ভগবান! আমার মন এবং চেতনা নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকে, যা সমস্ত অভীষ্টপ্রদ হওয়ার ফলে সমস্ত মুক্ত মহর্ষিদের দ্বারা পূজিত। আপনার চরণ-কমলে আমার মন স্থির হয়েছে বলে, যারা আমার কার্যকলাপ অশুভ বলে আমার নিন্দা করে, তাদের দ্বারা আমি আর বিচলিত হই না। তাদের দোষারোপে আমি কিছু মনে করি না, এবং দয়াবশত আমি তাদের ক্ষমা করি, ঠিক যেমন আপনি সমস্ত জীবদের প্রতি আপনার করুণা প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

এখানে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার জন্য খেদ প্রকাশ করছেন। রাজা দক্ষ তাঁকে নানাভাবে অপমান করেছিলেন, এবং তার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সমস্ত

যজ্ঞ তচনচ করে দিয়েছিলেন। পরে, তিনি যখন প্রসন্ন হয়েছিলেন, তখন পুনরায় যজ্ঞের আয়োজন করা হয়, এবং তাই তিনি তাঁর কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনা করেছিলেন। এখন তিনি বলছেন যে, যেহেতু তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে স্থির হয়েছে, তাই তাঁর আচরণের সমালোচনায় তিনি আর বিচলিত হন না। শিবের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, যতক্ষণ মানুষ জড়-জাগতিক স্তরে থাকে, ততক্ষণ সে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু যখনই সে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়, তখন আর এই প্রকার জড় কার্যকলাপের দ্বারা সে প্রভাবিত হয় না। তাই সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় স্থির হওয়া উচিত। এই প্রকার ভক্ত যে কখনও জড়া প্রকৃতির তিন গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না, নিশ্চিতভাবে সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—যিনি ভগবানের চিন্ময় সেবায় স্থির হয়েছেন, তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্ম উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর আর জড় বিষয়ের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা বা অনুশোচনা থাকে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া উচিত এবং কখনই ভগবানের সঙ্গে চিন্ময় সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে এই কার্যক্রম নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। শিবের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনাময়, এবং তার ফলে তিনি জড়-জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত থাকেন। অতএব জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে, সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা।

শ্লোক ৩০

ভৃগুরুবাচ

যন্মায়য়া গহনয়াপহৃতাত্মবোধা
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতস্তমসি স্বপন্তঃ ।
নাত্মনশ্রিতং তব বিদন্ত্যধুনাপি তত্ত্বং
সোঽয়ং প্রসীদতু ভবান্ প্রণতাত্মবন্ধুঃ ॥ ৩০ ॥

ভৃগুঃ উবাচ—শ্রীভৃগু বললেন; **যৎ**—যিনি; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **গহনয়া**—দুর্লঙ্ঘ্য; **অপহৃত**—অপহৃত; **আত্ম-বোধাঃ**—স্বরূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি; **তনু-ভৃতঃ**—জীবাত্মা সহ; **তমসি**—মোহের অন্ধকারে; **স্বপন্তঃ**—সুপ্ত; **ন**—না;

আত্মন্—জীবাত্মায়; **শ্রিতম্**—অবস্থিত, **তব**—আপনার; **বিদন্তি**—জানে; **অধুনা**—এখন; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **তত্ত্বম্**—পরম পদ; **সঃ**—আপনি; **অয়ম্**—এই; **প্রসীদতু**—প্রসন্ন হন; **ভবান্**—আপনি; **প্রণত-আত্ম**—শরণাগত আত্মা; **বন্ধুঃ**—সখা।

অনুবাদ

শ্রীভৃগু বললেন—হে ভগবান! ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই আপনার দুর্লঙ্ঘ্য মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন, এবং তার ফলে তারা তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নয়। প্রত্যেকেই তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার ফলে তারা মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আপনি যে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন, তা তারা বস্তুত বুঝতে পারে না, এমন কি তারা আপনার পরম পদও বুঝতে পারে না। কিন্তু আপনি হচ্ছেন সমস্ত শরণাগত জীবের সুহৃৎ এবং রক্ষক। তাই, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

তাৎপর্য

দক্ষযজ্ঞে ব্রহ্মা এবং শিব সমেত সকলেই যে কলঙ্কজনক আচরণ করেছিলেন, ভৃগু মুনি সেই কথা অবগত ছিলেন। এই জড় জগতে সমস্ত জীবদের মধ্যে প্রধান ব্রহ্মার নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই জড় জগতে সকলেই, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিব পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির প্রভাবে দেহাত্মবুদ্ধি-সমন্বিত—বিষ্ণুই কেবল দেহাত্মবুদ্ধির অতীত। সেটিই হচ্ছে ভৃগুর বিচার। মানুষ যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধির অধীন হয়ে থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে পরমাত্মা বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা খুব কঠিন। তিনি যে ব্রহ্মার থেকে মহান নন, সেই কথা ভালভাবে অবগত হয়ে, ভৃগু নিজেকেও সেই অপরাধীদের তালিকাভুক্ত করেছেন। অজ্ঞ ব্যক্তি বা বদ্ধ জীবদের মায়ার বশীভূত হয়ে তাদের শোচনীয় অবস্থা স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। একমাত্র উপায় হচ্ছে বিষ্ণুর শরণাগত হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। উদ্ধারের জন্য কেবল ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপর নির্ভর করা উচিত এবং নিজের শক্তির উপর লেশমাত্রও নির্ভর করা উচিত নয়। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির আদর্শ স্থিতি। ভগবান সকলেরই সুহৃৎ, কিন্তু তিনি শরণাগত আত্মার প্রতি বিশেষভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ। তাই, জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের পক্ষে সব চাইতে সরল উপায় হচ্ছে সর্বদা ভগবানের শরণাগত হয়ে থাকা, তা হলে

ভগবান জড় কলুষের বন্ধন থেকে উদ্ধার করার জন্য তাকে সর্বতোভাবে প্রতিরক্ষা প্রদান করবেন।

শ্লোক ৩১

ব্রহ্মোবাচ

নৈতৎস্বরূপং ভবতোঽসৌ পদার্থ-
ভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ ।
জ্ঞানস্য চার্থস্য গুণস্য চাশ্রয়ো
মায়াময়াদ্ ব্যতিরিক্তো মতস্ত্বম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **ন**—না; **এতৎ**—এই; **স্বরূপম্**—নিত্য স্বরূপ; **ভবতঃ**—আপনার; **অসৌ**—সেই; **পদ-অর্থ**—জ্ঞান; **ভেদ**—ভিন্ন; **গ্রহৈঃ**—প্রাপ্তির ফলে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ঈক্ষেৎ**—দর্শন করতে চায়; **জ্ঞানস্য**—জ্ঞানের; **চ**—ও; **অর্থস্য**—উদ্দেশ্যে; **গুণস্য**—জ্ঞান লাভের উপায়; **চ**—ও; **আশ্রয়ঃ**—আধার; **মায়া-ময়াৎ**—মায়ার দ্বারা নির্মিত; **ব্যতিরিক্তঃ**—ভিন্ন; **মতঃ**—অভিমত; **ত্বম্**—আপনি।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—যদি কেউ জ্ঞান লাভের বিভিন্ন পন্থার মাধ্যমে আপনাকে জানার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি কখনই আপনার ব্যক্তিত্ব এবং নিত্য স্বরূপ বুঝতে পারবেন না। আপনার স্থিতি সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত, কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানার প্রয়াস হচ্ছে ভৌতিক, কারণ সেই জ্ঞান অর্জনের উপায় এবং উদ্দেশ্যও ভৌতিক।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, ভগবানের দিব্য নাম, গুণ, লীলা, উপকরণ ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। জ্ঞানীরা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা পবমতত্ত্বকে জানার যে প্রয়াস করেন তা সর্বদাই ব্যর্থ হয়, কারণ পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা, উদ্দেশ্য এবং উপায় সবই ভৌতিক। ভগবান জড় সৃষ্টির অতীত অপ্রাকৃত। এই তত্ত্ব মহান নির্বিশেষবাদী শঙ্করাচার্যও স্বীকার করেছেন—*নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদ্ অণ্ডম্ অব্যক্ত-সম্ভবম্* । অব্যক্ত, অর্থাৎ আদি উপাদান কারণ হচ্ছে জড় সৃষ্টির

অতীত এবং তা হচ্ছে জড় জগতের কারণ। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ জড় জগতের অতীত, তাই কোন রকম জড়-জাগতিক উপায়ে তাঁর সম্বন্ধে কেউ জল্পনা-কল্পনা করতে পারে না। কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তির চিন্ময় পন্থার দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। নির্বিশেষবাদী এবং সবিশেষবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, নির্বিশেষবাদীরা তাদের সীমিত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারে না, কিন্তু সবিশেষবাদী ভগবদ্ভক্তরা চিন্ময় প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করেন। *সেবোন্মুখে হি*—ভক্তের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। জড়বাদী মানুষেরা কখনও ভগবানকে জানতে পারে না, যদিও তিনি তাদের সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই এই প্রকার জড়বাদীদের মূঢ় বলে নিন্দা করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, "মূঢ়রাই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য স্থিতি অথবা তাঁর চিন্ময় শক্তি যে কি, সেই সম্বন্ধে অবগত নয়।" তাঁর পরম ভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার ফলে, নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু ভক্তরা তাঁদের সেবা বৃত্তির দ্বারা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে জানতে পারেন। *ভগবদ্গীতার* দশম অধ্যায়ে, অর্জুনও প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৩২

ইন্দ্র উবাচ

ইদমপ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং
বপুরানন্দকরং মনোদৃশাম্ ।
সুরবিদ্বিট্ক্ষপণৈরুদায়ুধৈ-
র্ভুজদণ্ডৈরুপপন্নমষ্টভিঃ ॥ ৩২ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ—দেবরাজ ইন্দ্র বললেন; **ইদম্**—এই; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **বিশ্ব-ভাবনম্**—বিশ্বের কল্যাণের জন্য; **বপুঃ**—চিন্ময় রূপ; **আনন্দ-করম্**—আনন্দের কারণ; **মনঃ-দৃশাম্**—মন এবং চক্ষুর; **সুর-বিদ্বিট্**—ভক্ত এবং

বিদ্বেষী; **দণ্ডৈঃ**—দণ্ডদান করার দ্বারা; **উদ্-আয়ুধৈঃ**—উদ্যত অস্ত্রের দ্বারা; **ভুজ-দণ্ডৈঃ**—বাহুর দ্বারা; **উপপনম্**—যুক্ত; **অষ্টভিঃ**—আটটি।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—হে ভগবান! প্রতিটি হস্তে অস্ত্র-সমন্বিত আপনার এই অষ্টভুজ দিব্য রূপ সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রকট হয়, এবং তা মন ও নেত্রের অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই রূপে আপনি ভক্ত-বিদ্বেষী অসুরদের দণ্ড দেওয়ার জন্য সর্বদা তৎপর।

তাৎপর্য

শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু চতুর্ভুজরূপে প্রকট হন, কিন্তু এই বিশেষ যজ্ঞস্থলে বিষ্ণু অষ্টভুজ রূপে এসেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বলেছেন, "যদিও আমরা আপনার চতুর্ভুজ রূপ দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু আপনার এই অষ্টভুজ রূপও চতুর্ভুজ রূপের মতোই বাস্তব।" যেমন ব্রহ্মা বলেছেন, ভগবানের চিন্ময় রূপ উপলব্ধি করা ইন্দ্রিয় শক্তির অতীত ব্রহ্মার সেই উক্তির উত্তরে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছেন যে, যদিও ভগবানের দিব্য স্বরূপ জড় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নয়, তবুও তাঁর কার্যকলাপ এবং তাঁর চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভগবানের অসামান্য রূপ, অসামান্য কার্যকলাপ এবং অসামান্য সৌন্দর্য সাধারণ মানুষেরাও দর্শন করতে পারে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে একটি ছয় কিংবা সাত বছর বয়সের বালকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রজবাসীরা তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন। সেখানে প্রচণ্ড বারি বর্ষণ হচ্ছিল এবং ভগবান তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের উপর গোবর্ধন পর্বতকে সাত দিন ধারণ করে বৃন্দাবনবাসীদের রক্ষা করেছিলেন। ভগবানের এই অসামান্য গুণ জড় ইন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে জল্পনা-কল্পনাকারী জড়বাদীদের অন্তরেও বিশ্বাস উৎপাদন করবে। ভগবানের কার্যকলাপ ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও মনোমুগ্ধকর। কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা তাঁর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না, কারণ তারা তাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে চর্চা করে। যেহেতু এই জড় জগতে কোন মানুষই একটি পর্বত উঠাতে পারে না, তাই তারা বিশ্বাস করে না যে, ভগবান তা করতে পারেন। তারা মনে করে যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* কাহিনী হচ্ছে রূপক এবং তারা তাদের নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে তার অর্থ নিরূপণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান সমস্ত বৃন্দাবনবাসীদের সমক্ষে গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন, যা ব্যাসদেব, নারদ প্রমুখ আচার্যেরা প্রতিপন্ন করেছেন। ভগবানের কার্যকলাপ, লীলা, এবং

অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে গ্রহণ করা উচিত, এবং তার ফলে আমাদের বর্তমান অবস্থাতেই আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারব। এখানে দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিপন্ন করেছেন, "আপনার অষ্টভুজ রূপ আপনার চতুর্ভুজেরই মতো।" সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৩৩

পত্ন্য উচুঃ

যজ্ঞোঽয়ং তব যজনায় কেন সৃষ্টো
বিধ্বস্তঃ পশুপতিনাদ্য দক্ষকোপাৎ ।
তং নস্ত্বং শবশয়নাভশান্তমেধং
যজ্ঞাত্মন্নলিনরুচা দৃশা পুনীহি ॥ ৩৩ ॥

পত্ন্যঃ উচুঃ—ঋত্বিক-পত্নীরা বললেন; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **অয়ম্**—এই; **তব**—আপনার; **যজনায়**—পূজার জন্য; **কেন**—ব্রহ্মার দ্বারা; **সৃষ্টঃ**—আয়োজিত; **বিধ্বস্তঃ**—নষ্ট; **পশুপতিনা**—শিবের দ্বারা; **অদ্য**—আজ; **দক্ষ-কোপাৎ**—দক্ষের প্রতি ক্রোধ থেকে; **তম্**—তা; **নঃ**—আমাদের; **ত্বম্**—আপনি; **শব-শয়ন্**—মৃত দেহ; **আভ**—মতো; **শান্ত-মেধম্**—নিশ্চল বলির পশু; **যজ্ঞ-আত্মন্**—হে যজ্ঞেশ্বর; **নলিন**—পদ্ম; **রুচা**—সুন্দর; **দৃশা**—আপনার দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **পুনীহি**—পবিত্র করে।

অনুবাদ

ঋত্বিক-পত্নীগণ বললেন—হে ভগবান! ব্রহ্মার নির্দেশে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে শিব এই যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন, এবং তাঁর ক্রোধের ফলে যজ্ঞে বলির পশুরা মৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই যজ্ঞের সমস্ত প্রস্তুতি নষ্ট হয়েছে। এখন আপনার পদ্মপলাশ-লোচনের দৃষ্টিপাতের দ্বারা এই যজ্ঞস্থলকে পুনঃ পবিত্র করুন।

তাৎপর্য

যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া হত তাদের নব জীবন দান করার উদ্দেশ্যে, সেখানে পশুদের আনার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। যজ্ঞে পশু উৎসর্গ করে তাদের নব জীবন প্রদানের মন্ত্রোচ্চারণের শক্তি প্রমাণিত হত। দুর্ভাগ্যবশত, শিব যখন দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করে দেন, তখন কিছু পশুও নিহত হয়েছিল। (একটি পশু বধ করা হয়েছিল দক্ষেরই শরীরে তার মাথাটি লাগাবার জন্য)। সেই মৃত পশুদের শরীর ইতস্তত

বিক্ষিপ্ত থাকার জন্য যজ্ঞস্থল শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। তার ফলে যজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল।

যেহেতু বিষ্ণু হচ্ছেন এই ধরনের যজ্ঞের চরম লক্ষ্য, তাই ঋত্বিকদের পত্নীরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন তাঁর অহৈতুকী কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা যজ্ঞস্থলকে পবিত্র করেন, যার ফলে যজ্ঞের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে চলতে পারে এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, অনর্থক পশু হত্যা করা উচিত নয়। পশুবলি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করা, এবং মন্ত্রের প্রভাবে উৎসর্গীকৃত পশুদের নবজীবন দান করা উচিত ছিল। তাদের হত্যা করা উচিত হয়নি, যেমন শিব দক্ষের শরীরে একটি পশুর মস্তক লাগাবার জন্য করেছিলেন। যজ্ঞে পশুবলির মাধ্যমে পশুকে নবীন জীবন দান দর্শন করা আনন্দদায়ক দৃশ্য, কিন্তু সেই আনন্দদায়ক পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঋত্বিকদের পত্নীরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা পশুদের পুনর্জীবন দান করেন এবং তার ফলে সেই যজ্ঞকে আনন্দদায়ক করেন।

শ্লোক ৩৪

ঋষয় ঊচুঃ

অনন্বিতং তে ভগবন্ বিচেষ্টিতং
যদাত্মনা চরসি হি কর্ম নাজ্যসে ।
বিভূতয়ে যত উপসেদুরীশ্বরীং
ন মন্যতে স্বয়মনুবর্ততীং ভবান্ ॥ ৩৪ ॥

ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; **ঊচুঃ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **অনন্বিতম্**—আশ্চর্যজনক; **তে**—আপনার; **ভগবন্**—হে সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; **বিচেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **যৎ**—যা; **আত্মনা**—আপনার শক্তির দ্বারা; **চরসি**—আপনি সম্পাদন করেন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কর্ম**—এই প্রকার কর্মের; **ন অজ্যসে**—আপনি আসক্ত নন; **বিভূতয়ে**—তাঁর কৃপার জন্য; **যতঃ**—যার থেকে; **উপসেদুঃ**—পূজিত; **ঈশ্বরীম্**—লক্ষ্মী; **ন মন্যতে**—আসক্ত নন; **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **অনুবর্ততীম্**—আপনার আজ্ঞাকারী দাসীকে (লক্ষ্মীকে); **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন—হে ভগবান! আপনার কার্যকলাপ পরম অদ্ভুত, এবং যদিও আপনি আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সব কিছু সম্পাদন করেন, তবুও

আপনি সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি মোটেই আসক্ত নন। এমন কি আপনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতিও আসক্ত নন, যাঁর কৃপা লাভের জন্য ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও তাঁর পূজা করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবানের আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ থেকে কোন রকম ফল লাভ করার প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নেই, এমন কি সেইগুলি অনুষ্ঠান করারও কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জনসাধারণকে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কখনও কখনও কার্য করেন এবং সেই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তিনি কোনও কিছুর প্রতি আসক্ত নন। *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি* —যদিও তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে কার্য করেন, তবু তিনি কোনও কিছুর প্রতি আসক্ত নন (*ভগবদ্গীতা* ৪/১৪)। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, লক্ষ্মীদেবী সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁর প্রতি আসক্ত নন। ব্রহ্মা আদি মহান দেবতারাও লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভের জন্য তাঁর পূজা করেন, কিন্তু ভগবান যদিও শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীব দ্বারা পূজিত হন, তবু তিনি তাঁদের একজনের প্রতিও আসক্ত নন। ঋষিরা ভগবানের এই অতি উচ্চ চিন্ময় স্থিতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন; তিনি পুণ্যকর্মের ফলের প্রতি আসক্ত সাধারণ জীবের মতো নন।

শ্লোক ৩৫

সিদ্ধা ঊচুঃ

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধাঃ—সিদ্ধগণ; **ঊচুঃ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **অয়ম্**—এই; **ত্বৎ-কথা**—আপনার লীলাসমূহ; **মৃষ্ট**—শুদ্ধ; **পীযূষ**—অমৃতের; **নদ্যাম্**—নদীতে; **মনঃ**—মনের; **বারণঃ**—হস্তী; **ক্লেশ**—দুঃখ-কষ্ট; **দাব-অগ্নি**—দাবানলের দ্বারা; **দগ্ধঃ**—দগ্ধ; **তৃষা**—তৃষ্ণা; **আর্তঃ**—পীড়িত; **অবগাঢ়ঃ**—নিমজ্জিত; **ন সস্মার**—স্মরণ করে না; **দাবম্**—দাবানল অথবা কষ্টের; **ন নিষ্ক্রামতি**—নির্গত হয় না; **ব্রহ্ম**—পরম; **সম্পন্ন-বৎ**—লীন হয়ে যাওয়ার মতো; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

সিদ্ধগণ প্রার্থনা করেছিলেন—হে ভগবান! দাবানলক্লিষ্ট হস্তী যেমন নদীর জলে প্রবেশ করে তার সমস্ত ক্লেশ ভুলে যায়, তেমনই আমাদের মন আপনার দিব্য লীলামৃতের নদীতে সর্বদা নিমজ্জিত থাকার ফলে, সেই চিন্ময় আনন্দ কখনই পরিত্যাগ করতে চায় না, যা ব্রহ্মানন্দের থেকেও অধিক আনন্দদায়ক।

তাৎপর্য

এটি সিদ্ধলোকবাসী অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত সিদ্ধদের উক্তি। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা সকলেই আটটি যোগসিদ্ধি পূর্ণরূপে লাভ করেছেন, কিন্তু তাঁদের উক্তি থেকে প্রতীত হয় যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। তাঁরা সর্বদাই ভগবানের লীলা শ্রবণের অমৃতময়ী নদীতে নিমজ্জিত। ভগবানের লীলা শ্রবণকে বলা হয় কৃষ্ণকথা। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, যাঁরা সর্বদাই ভগবানের লীলাকথারূপ সমুদ্রে ডুবে থাকেন তাঁরা মুক্ত এবং তাঁদের জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবনের কোন ভয় থাকে না। সিদ্ধরা বলেছেন যে, সাধারণ মানুষের মন সর্বদা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। এখানে দাবাগ্নি-পীড়িত হস্তীর তাপ নিরাময়ের জন্য নদীতে প্রবেশ করার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। যারা সংসার দাবানলে দগ্ধ, তারা যদি কেবল ভগবানের লীলার অমৃতময় নদীতে প্রবেশ করে, তা হলে তারা তাদের জড় অস্তিত্বের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ভুলে যাবে। সিদ্ধরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান ইত্যাদির দ্বারা শুভ ফল লাভের প্রতি আগ্রহী নন। তাঁরা কেবল ভগবানের চিন্ময় লীলাকথার আলোচনায় মগ্ন থাকেন। তার ফলে তাঁরা পাপ অথবা পুণ্যকর্মের অপেক্ষা না করে সম্পূর্ণরূপে সুখী হন। যাঁরা সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, তাঁদের কোন রকম পাপ অথবা পুণ্যকর্ম বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণভাবনামৃত সর্বতোভাবে পূর্ণ, কারণ বেদ-বর্ণিত সমস্ত শুভ কর্ম তার অন্তর্গত।

শ্লোক ৩৬

যজমান্যুবাচ

স্বাগতং তে প্রসীদেশ তুভ্যং নমঃ
শ্রীনিবাস শ্রিয়া কান্তয়া ত্রাহি নঃ ।
ত্বামৃতেঽধীশ নাঙ্গৈর্মখঃ শোভতে
শীর্ষহীনঃ কবন্ধো যথা পুরুষঃ ॥ ৩৬ ॥

যজমানী—দক্ষের পত্নী; **উবাচ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **সু-আগতম্**—শুভ আগমন; **তে**—আপনার; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হোন; **ঈশ**—হে ভগবান; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **শ্রী-নিবাস**—হে লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থল; **শ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী সহ; **কান্তয়া**—আপনার পত্নী; **ত্রাহি**—রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের; **ত্বাম্**—আপনি; **ঋতে**—বিনা; **অধীশ**—হে পরম নিয়ন্তা; **ন**—না; **অঙ্গৈঃ**—দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা; **মখঃ**—যজ্ঞস্থল; **শোভতে**—সুন্দর; **শীর্ষ-হীনঃ**—মস্তকবিহীন; **ক-বন্ধঃ**—কেবল দেহ-সমন্বিত; **যথা**—যেমন; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

দক্ষপত্নী প্রার্থনা করেছিলেন—হে ভগবান! আপনি যে যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছেন তা অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, এবং আমি আপনার কাছে অনুরোধ করি যেন আপনি এই উপলক্ষ্যে প্রসন্ন হোন। আপনি ব্যতীত এই যজ্ঞস্থল ঠিক একটি মস্তকহীন কবন্ধের মতো শ্রীহীন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুর আর এক নাম যজ্ঞেশ্বর। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য বিষ্ণু-যজ্ঞরূপে সমস্ত কর্ম করা উচিত। তাঁকে প্রসন্ন না করে আমরা যা কিছু করি, তা সবই আমাদের জড় জগতের বন্ধনের কারণ। সেই কথা এখানে দক্ষপত্নীর দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে—"আপনার উপস্থিতি বিনা, এই যজ্ঞের বিশাল আয়োজন সম্পূর্ণ অর্থহীন, ঠিক যেমন দেহ যত সুন্দরভাবেই সজ্জিত হোক না কেন, মস্তক বিনা তা অর্থহীন।" এই উপমা সামাজিক শরীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জড় সভ্যতা তার প্রগতির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মস্তকহীন শরীরের মতো অর্থহীন। কৃষ্ণভক্তি বিনা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বাদ দিয়ে যে সভ্যতা, তা যতই উন্নত বলে মনে হোক না কেন, তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন। *হরিভক্তিসুধোদয়ে* (৩/১১) উল্লেখ করা হয়েছে—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

অর্থাৎ, যখন কোন আত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যু হয়, বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে, তখন মৃত দেহটিকে খুব সুন্দর করে সাজান হয়। সুন্দরভাবে বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত সেই মৃত দেহটিকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে মৃত দেহটিকে সাজাবার কোন অর্থ হয় না, কারণ সেই দেহটি থেকে প্রাণ

ইতিমধ্যেই নির্গত হয়ে গেছে। তেমনই, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আভিজাত্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অথবা জাগতিক সভ্যতার উন্নতি কেবল মৃত দেহকে সাজাবার মতো। দক্ষের পত্নীর নাম ছিল প্রসূতি এবং তিনি ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। তাঁর ভগিনী দেবহূতির সঙ্গে কর্দম মুনির বিবাহ হয়েছিল, এবং ভগবান কপিলদেব তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সূত্রে প্রসূতি হচ্ছেন ভগবান বিষ্ণুর মাসী। তিনি স্নেহের বশে ভগবান বিষ্ণুর কাছে এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিলেন; যেহেতু তিনি ছিলেন তাঁর মাসী, তাই তিনি তাঁর কাছে একটি বিশেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছিলেন। এই শ্লোকে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, লক্ষ্মীদেবী সহ ভগবানকে প্রশংসা করা হয়েছে। যেখানে ভগবান বিষ্ণুর পূজা হয়, সেখানে স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা থাকে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে অমৃত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দেবতারা, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবও সৃষ্টির পরে উৎপন্ন হয়েছেন, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাই তাঁকে অমৃত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। শ্রীবিষ্ণু তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সহ বৈষ্ণবদের দ্বারা পূজিত হন। দক্ষপত্নী প্রসূতি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন পুরোহিতদের কতকগুলি জড়-জাগতিক ফল লাভের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী সকাম কর্মী থেকে বৈষ্ণবে পরিণত করেন।

শ্লোক ৩৭

লোকপালা ঊচুঃ

দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্‌ভিরসদ্‌গ্রহৈস্ত্বং
প্রত্যগ্‌দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন বিশ্বম্ ।
মায়া হ্যেষা ভবদীয়া হি ভূমন্
যস্ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ ॥ ৩৭ ॥

লোক-পালাঃ—বিভিন্ন লোকের পালকগণ; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **দৃষ্টঃ**—দেখে; **কিম্**—কি না; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **দৃগ্‌ভিঃ**—জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **অসৎ-গ্রহৈঃ**—দৃশ্য জগৎ প্রকাশকারী; **ত্বম্**—আপনি; **প্রত্যক্-দ্রষ্টা**—অন্তরের সাক্ষী; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **যেন**—যার দ্বারা; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **মায়া**—জড় জগৎ; **হি**—কারণ; **এষা**—এই; **ভবদীয়া**—আপনার; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ভূমন্**—হে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; **যঃ**—যেহেতু; **ত্বম্**—আপনি; **ষষ্ঠঃ**—ষষ্ঠ; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচ; **ভাসি**—প্রকট হন; **ভূতৈঃ**—তত্ত্বের দ্বারা।

অনুবাদ

বিভিন্ন লোকপালেরা বললেন—হে ভগবান! আমরা কেবল আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই বিশ্বাস করি, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমরা জানি না যে, আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনাকে দর্শন করেছি কি না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কেবল এই দৃশ্য জগৎই দর্শন করতে পারি, কিন্তু আপনি পঞ্চভূতের অতীত। আপনি ষষ্ঠ তত্ত্ব। তাই আমরা আপনাকে জড় জগতের সৃষ্টিরূপে দর্শন করছি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন লোকের পালকেরা অবশ্যই জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য সমন্বিত এবং অত্যন্ত দাম্ভিক। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের চিন্ময় শাশ্বত রূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, যাঁদের চক্ষু ভগবৎ প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে, তাঁরাই কেবল তাঁদের কার্যকলাপের প্রতি পদক্ষেপে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। কুন্তীদেবীও তাঁর প্রার্থনায় (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৮/২৬) উল্লেখ করেছেন যে, যাঁরা *অকিঞ্চন-গোচরম্,* অর্থাৎ যাঁরা ধনমদে মত্ত নন, তাঁরাই ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। আর যারা মোহাচ্ছন্ন, তারা পরম তত্ত্বের কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না।

শ্লোক ৩৮

যোগেশ্বরা উচুঃ

প্রেয়ান্ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো
বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ।
অথাপি ভক্ত্যেশতয়োপধাবতা-
মনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল ॥ ৩৮ ॥

যোগ-ঈশ্বরাঃ—মহাযোগীগণ; **উচুঃ**—বললেন; **প্রেয়ান্**—অত্যন্ত প্রিয়; **ন**—না; **তে**—আপনার; **অন্যঃ**—অন্য; **অস্তি**—হয়; **অমুতঃ**—তা থেকে; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **প্রভো**—হে ভগবান; **বিশ্ব-আত্মনি**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **ঈক্ষেৎ**—দেখেন; **ন**—না; **পৃথক্**—ভিন্ন; **যঃ**—যিনি; **আত্মনঃ**—জীব; **অথ অপি**—অনেক বেশি; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **ঈশ**—হে ভগবান; **তয়া**—তার দ্বারা;

উপধাবতাম্—যাঁরা পূজা করেন; **অনন্য-বৃত্ত্যা**—অব্যভিচারিণী; **অনুগৃহাণ**—কৃপা; **বৎসল**—হে ভক্তবৎসল ভগবান।

অনুবাদ

মহাযোগীগণ বললেন—হে ভগবান! যাঁরা আপনাকে সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে জেনে, আপনাকে তাঁদের থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার অত্যন্ত প্রিয়। যাঁরা আপনাকে প্রভু বলে মনে করে এবং নিজেদেরকে আপনার দাস বলে মনে করে আপনার ভক্তিময়ী সেবায় যুক্ত থাকে, তাঁদের প্রতি আপনি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হন। আপনি তাদের প্রতি সর্বদা অনুকূল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অদ্বৈতবাদী এবং মহান যোগীরা পরমেশ্বর ভগবানকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে জানেন। জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সর্বতোভাবে এক হওয়ার যে ভ্রান্ত মতবাদ, তা থেকে এই একত্ব ভিন্ন। এই অদ্বৈতবাদ শুদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৭) বর্ণিত এবং প্রতিপন্ন হয়েছে—*প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ*। ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা দিব্য জ্ঞান-সমন্বিত এবং ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, এবং তিনিও তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, তাঁরা জানেন যে, জীব হচ্ছে ভগবানের পরা শক্তি। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—জড়া প্রকৃতি নিকৃষ্টা, এবং জীব হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্টা প্রকৃতি। শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন; তাই শক্তিও শক্তিমানের গুণসমন্বিত। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁরা তাঁর বিভিন্ন শক্তি বিশ্লেষণ করে তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত, এবং তাঁরা নিশ্চিতভাবে ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু, যাঁরা ভগবানের সম্বন্ধে ততটা না জানলেও, প্রীতি ও বিশ্বাস সহকারে সর্বদা তাঁর কথা চিন্তা করেন, এবং অনুভব করেন যে, তিনি মহান এবং তাঁরা হচ্ছেন তাঁর বিভিন্ন অংশস্বরূপ তাঁর নিত্য দাস, তাঁদের ভগবান আরও অধিক কৃপা করেন। এই শ্লোকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ভগবানকে এখানে *বৎসল* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। *বৎসল* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি সর্বদা অনুকূল'। ভগবানের নাম *ভক্ত-বৎসল*। ভগবান *ভক্ত-বৎসল* নামে বিখ্যাত, কারণ তিনি সর্বদা ভক্তদের প্রতি অনুকূল। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের কোথাও তাঁকে *জ্ঞানী-বৎসল* বলে সম্বোধন করা হয়নি।

শ্লোক ৩৯

জগদুদ্ভবস্থিতিলয়েষু দৈবতো
বহুভিদ্যমানগুণয়াত্মমায়য়া ।
রচিতাত্মভেদমতয়ে স্বসংস্থয়া
বিনিবর্তিতভ্রমগুণাত্মনে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

জগৎ—জড় জগৎ; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **লয়েষু**—সংহারে; **দৈবতঃ**—অদৃষ্ট; **বহু**—বহু; **ভিদ্যমান**—বিভিন্ন হয়ে; **গুণয়া**—জড় গুণের দ্বারা; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর জড়া শক্তির দ্বারা; **রচিত**—উৎপন্ন; **আত্ম**—জীবে; **ভেদ-মতয়ে**—ভিন্ন মত সৃষ্টিকারী; **স্ব-সংস্থয়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **বিনিবর্তিত**—নিবৃত্তি সাধন করেছে; **ভ্রম**—মিথষ্ক্রিয়া; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণে; **আত্মনে**—তাঁর স্বরূপে; **নমঃ**—প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি বিভিন্ন প্রকার বস্তু উৎপন্ন করেছেন, এবং তাদের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তাদের জড় জগতের তিনটি গুণের বশীভূত করেছেন। তিনি স্বয়ং বহিরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নন; তাঁর স্বরূপে তিনি জড় গুণের বৈচিত্র্য থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এবং মায়ার ভ্রান্ত পরিচিতি থেকে মুক্ত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুটি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশ, এবং অন্যটি হচ্ছে ভগবানের স্বীয় স্থিতি। ভগবানের স্বীয় ধামেও গুণ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, গোলোক হচ্ছে তাঁর নিজের স্থান। গোলোকেও গুণ রয়েছে, কিন্তু সেই গুণ সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের দ্বারা বিভক্ত নয়। বহিরঙ্গা প্রকৃতিতে, তিনটি গুণের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্ভব হয়। কিন্তু চিৎ-জগতে বা ভগবদ্ধামে, যেহেতু সব কিছুই নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়, তাই সেখানে এই ধরনের কোন প্রদর্শন নেই। এক শ্রেণীর দার্শনিক রয়েছে, যারা এই জড় জগতে ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করে। তারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি অন্য সমস্ত জীবের মতো প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। সেটি হচ্ছে তাদের ভ্রান্ত

ধারণা; সেই সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (*স্ব-সংস্থয়া*), তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তিনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। তেমনই, *ভগবদ্গীতায়ও* ভগবান বলেছেন, "আমার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আমি আবির্ভূত হই।" অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা উভয় শক্তিই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, সুতরাং তিনি এই শক্তি দুটির কোনটির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হন না। পক্ষান্তরে, সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা এবং পরিকর প্রকাশ করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে সক্রিয় করেন। তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির বৈচিত্র্যের ফলে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের প্রকাশ হয়, এবং মানুষেরা তাদের জড় গুণ অনুসারে, এই সমস্ত দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কেউ যখন জড়া প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করেন বা দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি পরমেশ্বরর ভগবানের আরাধনায় নিষ্ঠাপরায়ণ হন। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে—ভগবানের সেবায় যিনি যুক্ত হয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই জড়া প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার এবং বৈচিত্র্যের অতীত হয়েছেন। মূল তত্ত্ব হচ্ছে যে, বদ্ধ জীবেরা জড়া প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং এই গুণসমূহ শক্তির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। কিন্তু চিৎ-জগতে একমাত্র আরাধ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্য কেউ নয়।

শ্লোক ৪০

ব্রহ্মোবাচ

নমস্তে শ্রিতসত্ত্বায় ধর্মাদীনাং চ সূতয়ে ।
নির্গুণায় চ যৎকাষ্ঠাং নাহং বেদাপরেঽপি চ ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্ম—মূর্তিমান বেদগণ; **উবাচ**—বললেন; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **শ্রিত-সত্ত্বায়**—সত্ত্বগুণের আশ্রয়; **ধর্ম-আদীনাম্**—সমস্ত ধর্ম, তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্র সাধনের; **চ**—এবং; **সূতয়ে**—উৎস; **নির্গুণায়**—জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **চ**—এবং; **যৎ**—যাঁকে (পরমেশ্বর ভগবানের); **কাষ্ঠাম্**—স্থিতি; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানি; **অপরে**—অন্যে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

মূর্তিমান বেদগণ বললেন—হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সত্ত্বগুণের আশ্রয় হওয়ার ফলে সমস্ত ধর্ম, তপস্যা এবং কৃচ্ছ্র সাধনের উৎস। আপনি সমস্ত ভৌতিক গুণের অতীত এবং কেউই আপনাকে অথবা আপনার প্রকৃত স্থিতি জানে না।

তাৎপর্য

জড় জগতে তিনটি গুণের তিনজন ঈশ্বর রয়েছেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন ধর্ম, জ্ঞান, তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ইত্যাদির উৎস সত্ত্বগুণের পর্যবেক্ষক। সেই কারণে, জীব যখন সত্ত্বগুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তখন বাস্তবিক শান্তি, সমৃদ্ধি, জ্ঞান এবং ধর্ম লাভ হয়। যখনই তাঁরা অন্য দুটি গুণ, রজ এবং তমের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তখন তাদের বদ্ধ জীবনের সঙ্কটজনক অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর আদি স্থিতিতে সর্বদাই *নির্গুণ,* অর্থাৎ জড় গুণের অতীত। *নির্গুণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'গুণরহিত'। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবানের কোন গুণ নেই। তাঁর দিব্য গুণাবলী রয়েছে যার দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন এবং তাঁর লীলা-বিলাস সম্পাদন করেন। তাঁর দিব্য গুণাবলীর প্রকাশ বেদবিৎদের নিকট এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবের মতো মহান দেবতাদেরও অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে, দিব্য গুণাবলী কেবল ভক্তদের কাছেই প্রকাশিত হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যাঁরা সত্ত্বগুণে রয়েছেন, তাঁরা আংশিকভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারেন, কিন্তু *ভগবদ্‌গীতায়* উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেই স্তরও অতিক্রম করতে হবে। বৈদিক তত্ত্ব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিনটি গুণ অতিক্রম করতে হবে, এবং তখন শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিন্ময় জীবনে অধিষ্ঠিত হওয়া যাবে।

শ্লোক ৪১

অগ্নিরুবাচ

যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা
হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্ ।
তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধং চ পঞ্চভিঃ
স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোহস্মি যজ্ঞম্ ॥ ৪১ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নিদেব; **উবাচ**—বললেন; **যৎ-তেজসা**—যাঁর তেজের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **সু-সমিদ্ধ-তেজাঃ**—প্রজ্বলিত অগ্নির মতো তেজস্বী; **হব্যম্**—হবি; **বহে**—আমি গ্রহণ করছি; **সু-অধ্বরে**—যজ্ঞে; **আজ্য-সিক্তম্**—ঘৃত মিশ্রিত; **তম্**—তা; **যজ্ঞিয়ম্**—যজ্ঞের রক্ষক; **পঞ্চ-বিধম্**—পাঁচ প্রকার; **চ**—এবং; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচের দ্বারা; **সু-ইষ্টম্**—পূজিত; **যজুর্ভিঃ**—বৈদিক মন্ত্র; **প্রণতঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **অস্মি**—আমি; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞকে (বিষ্ণুকে)।

অনুবাদ

অগ্নিদেব বললেন—হে ভগবান! আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনার কৃপায় আমি প্রজ্বলিত অগ্নির মতো তেজস্বী, এবং যজ্ঞে নিবেদিত ঘৃত মিশ্রিত হবি স্বীকার করি। যজুর্বেদ অনুসারে পাঁচ প্রকার হবি আপনারই বিভিন্ন শক্তি, এবং পাঁচ প্রকার বৈদিক মন্ত্রে আপনি পূজিত হন। যজ্ঞ বলতে পরমেশ্বর ভগবান আপনাকেই বোঝানো হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। শ্রীবিষ্ণুর সুবিদিত সহস্র দিব্য নাম রয়েছে, এবং তার মধ্যে একটি নাম হচ্ছে *যজ্ঞ*। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যজ্ঞ বা বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্যই সব কিছু করা উচিত। মানুষ অন্য যা কিছুই করে তা সবই তার বন্ধনের কারণ. প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক মন্ত্র অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। *উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, অগ্নি, যজ্ঞবেদি, পূর্ণচন্দ্র, চাতুর্মাস্য, বলির পশু এবং সোমরস—এইগুলি যজ্ঞের আবশ্যকীয় বস্তু, তেমনই প্রয়োজন চতুবক্ষরযুক্ত বিশেষ বৈদিক মন্ত্র. একটি মন্ত্র হচ্ছে—*আশ্রাবয়েতি চতুরক্ষরং অস্তু শ্রৌষড়িতি চতুরক্ষরং যজেতি দ্বাভ্যাং যে যজামহঃ*। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্যই কেবল *শ্রুতি* এবং *স্মৃতি* শাস্ত্র অনুসারে এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারিত হয় *বেদে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ এবং জড় সুখের প্রতি আসক্ত, তাদের মুক্তির জন্য যজ্ঞ করা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা আবশ্যক। *বিষ্ণু পুরাণে* বলা হয়েছে যে, বিষ্ণুর জন্য যজ্ঞ করার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে মুক্ত হতে পারে। অতএব, সমগ্র জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। সেটিই হচ্ছে যজ্ঞ। যিনি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে, সমস্ত বিষ্ণুরূপের আদি উৎস শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন, এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ভগবানের পূজা করেন এবং ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পাদনকারী। *শ্রীমদ্ভাগবতে* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কলিযুগে একমাত্র সার্থক যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈঃ*—সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করা। অন্যান্য যজ্ঞ যেমন বিষ্ণুর সমক্ষে নিবেদন করা হয়, এই যজ্ঞ কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমক্ষে নিবেদন করা হয়। এই নির্দেশ *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে পাওয়া যায়। অধিকন্তু, এই যজ্ঞ

অনুষ্ঠান প্রতিপন্ন করে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু। শ্রীবিষ্ণু যেমন বহুকাল পূর্বে দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হয়েছিলেন, এই যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সংকীর্তন যজ্ঞ গ্রহণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৪২

দেবা ঊচুঃ

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং
ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে ।
পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ
স এবাদ্যাক্ষ্ণোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ ॥ ৪২ ॥

দেবাঃ—দেবতারা; **ঊচুঃ**—বললেন; **পুরা**—পূর্বে; **কল্প-অপায়ে**—কল্পান্তে; **স্ব-কৃতম্**—নিজের থেকে উৎপন্ন; **উদরীকৃত্য**—উদরস্থ করে; **বিকৃতম্**—প্রভাব; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আদ্যঃ**—আদি; **তস্মিন্**—তাতে; **সলিলে**—জলে; **উরগ-ইন্দ্র**—শেষনাগের উপর; **অধিশয়নে**—শয্যায়; **পুমান্**—পুরুষ; **শেষে**—শয়ন করেন; **সিদ্ধৈঃ**—(সনকাদি) মুক্ত পুরুষদের দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিমৃশিত**—ধ্যান করা হয়; **অধ্যাত্ম-পদবিঃ**—দার্শনিক জ্ঞানের মার্গ; **সঃ**—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অদ্য**—এখন; **অক্ষ্ণোঃ**—দুই চক্ষুর; **যঃ**—যিনি; **পথি**—পথে; **চরসি**—বিচরণ করেন; **ভৃত্যান্**—ভৃত্যগণ; **অবসি**—রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—হে ভগবান! পূর্বে, প্রলয়ের সময় আপনি জড় জগতের বিভিন্ন শক্তি সংরক্ষণ করেছিলেন। সেই সময়, সনকাদি ঊর্ধ্ব লোকবাসীরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা আপনার ধ্যান করেছিলেন। অতএব আপনি হচ্ছেন আদি পুরুষ, এবং আপনি প্রলয়-বারিতে শেষনাগ-শয্যায় শয়ন করেন। এখন আপনি আপনার সেবক আমাদের সম্মুখে প্রকট হয়েছেন। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে প্রলয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের আংশিক প্রলয়। ব্রহ্মা যখন নিদ্রা যান, তখন এই প্রলয় হয় এবং তার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নতর লোকগুলি ধ্বংস হয়। এই প্রলয়ে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক আদি উচ্চতর লোকগুলি প্লাবিত হয় না। ভগবান হচ্ছেন স্রষ্টা, যে-কথা এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে,

কারণ সৃষ্টিশক্তি তাঁর দেহ থেকে প্রকাশিত হয়, এবং প্রলয়ের পর সমস্ত শক্তি তিনি উদরস্থ করে নেন।

এই শ্লোকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, দেবতারা বলেছেন, "আমরা সকলেই আপনার ভৃত্য। আপনি দয়া করে আমাদের রক্ষা করুন।" দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভর করেন; তাঁরা স্বতন্ত্র নন। তাই *ভগবদ্গীতায়* দেবতা-পূজার নিন্দা করা হয়েছে, কারণ সেইগুলির কোন আবশ্যকতা নেই, এবং সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা তাদের চেতনা হারিয়েছে, তারাই দেবতাদের কৃপা ভিক্ষা করে। সাধারণত, কারও যদি কোন জড় বাসনা চরিতার্থ করার থাকে, তা হলে তিনি দেবতাদের শরণাগত না হয়ে, বিষ্ণুর কাছে তা চাইতে পারেন। যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা খুব একটা বুদ্ধিমান নয়। আর তা ছাড়া, দেবতারা বলেছেন, "আমরা আপনার নিত্য দাস।" অতএব যাঁরা দাস বা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা সকাম কর্ম, যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের প্রতি খুব একটা আগ্রহী নন। তাঁরা কেবল প্রীতি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সব কিছুর অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে তাঁর সেবা করেন, এবং এই প্রকার ভক্তদের ভগবান স্বয়ং রক্ষা করেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কেবল আমার শরণাগত হও, তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে রক্ষা করব।" এই জড় জগৎ এমনইভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সকলকেই পাপকর্ম করতে হয়, এবং বিষ্ণুর শরণাগত না হওয়া পর্যন্ত, তার সমস্ত পাপকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন, তখন ভগবান স্বয়ং তাঁকে রক্ষা করেন। তখন আর তাঁর কোন রকম পাপকর্মের ফল ভোগ করার ভয় থাকে না, তখন আর তিনি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পাপকর্ম করতে চান না।

শ্লোক ৪৩

গন্ধর্বা ঊচুঃ

অংশাংশাস্তে দেব মরীচ্যাদয় এতে
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্রপুরোগাঃ ।
ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূমন্
তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম ॥ ৪৩ ॥

গন্ধর্বাঃ—গন্ধর্বগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **অংশ-অংশাঃ**—আপনার দেহের বিভিন্ন অংশ; **তে**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **মরীচি-আদয়ঃ**—মরীচি এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ; **এতে**—এই সমস্ত; **ব্রহ্ম-ইন্দ্র-আদ্যাঃ**—ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি; **দেব-গণাঃ**—দেবতাগণ; **রুদ্র-পুরোগাঃ**—রুদ্র যাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন; **ক্রীড়া-ভাণ্ডম্**—ক্রীড়ার উপকরণ; **বিশ্বম্**—সমগ্র সৃষ্টি; **ইদম্**—এই; **যস্য**—যাঁর; **বিভূমন্**—পরম শক্তিমান ভগবান; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **নাথ**—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **করবাম**—আমরা নিবেদন করি।

অনুবাদ

গন্ধর্বেরা বললেন—হে ভগবান! শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাগণ এবং মরীচি আদি মহর্ষিগণ কেবল আপনার দেহের বিভিন্ন অংশ। আপনি হচ্ছেন পরম শক্তিমান বিভু; সমগ্র বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার উপকরণ মাত্র। আমরা সর্বদাই আপনাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করি, এবং আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা থেকে শুরু করে নিম্নলোকের বহু লোকপাল, মন্ত্রী, সভাপতি, রাজা থাকতে পারেন। বস্তুত, তাঁরা নিজেদের ভগবান বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু তা জড় জগতের প্রভাবে তাঁদের দাম্ভিক ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু বিষ্ণুরও উর্ধ্বে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, কারণ বিষ্ণু হচ্ছেন তাঁর অংশ। এই শ্লোকে সেই সম্বন্ধে *অংশাংশাঃ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে অংশেরও অংশ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* ঐরকম বহু শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে ভগবানের অংশ পুনরায় অংশ বিস্তার করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিষ্ণুর বহু প্রকাশ রয়েছে, এবং তাঁর থেকে বহু জীবও প্রকাশিত হয়েছে। বিষ্ণুর প্রকাশকে বলা হয় *স্বাংশ* এবং জীবকে বলা হয় *বিভিন্নাংশ*। ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি দেবতাদের বহু পুণ্যকর্ম এবং তপস্যার ফলে এই প্রকার উচ্চ পদ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু বা কৃষ্ণই হচ্ছেন সকলের প্রভু। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে—*একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং অন্য সকলে, এমন কি বিষ্ণুতত্ত্বরাও এবং নিশ্চিতভাবে জীবেরা তাঁর ভৃত্য। বলদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, অতএব সাধারণ জীবেরা নিশ্চিতভাবে

তাঁর সেবক। স্বরূপত সকলকেই সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য। এখানে গন্ধর্বরা স্বীকার করেছেন যে, দেবতারা যদিও নিজেদের পরম বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পরম নন। প্রকৃত পরমেশ্বরত্ব শ্রীকৃষ্ণের। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*—"শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান।" তাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলে, তাঁর অংশেরও পূজা হয়ে যায়, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে ডালপালা, পাতা, ফুল ইত্যাদিতেও জল দেওয়া হয়ে যায়।

শ্লোক ৪৪

বিদ্যাধরা ঊচুঃ
ত্বন্মায়য়ার্থমভিপদ্য কলেবরেঽস্মিন্
কৃত্বা মমাহমিতি দুর্মতিরুৎপথৈঃ স্বৈঃ ।
ক্ষিপ্তোঽপ্যসদ্বিষয়লালস আত্মমোহং
যুষ্মৎকথামৃতনিষেবক উদ্ব্যুদস্যেৎ ॥ ৪৪ ॥

বিদ্যাধরাঃ—বিদ্যাধরগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **অর্থম্**—মানব শরীর; **অভিপদ্য**—লাভ করে; **কলেবরে**—শরীরে; **অস্মিন্**—এই; **কৃত্বা**—ভ্রান্ত পরিচিতির ফলে; **মম**—আমার; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **দুর্মতিঃ**—অজ্ঞ ব্যক্তি; **উৎপথৈঃ**—ভ্রান্ত পথের দ্বারা; **স্বৈঃ**—স্বীয় বস্তুসমূহের দ্বারা; **ক্ষিপ্তঃ**—বিক্ষিপ্ত; **অপি**—ও; **অসৎ**—অনিত্য; **বিষয়-লালসঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগ বাসনা; **আত্ম-মোহম্**—দেহকে আত্মা বলে মনে করার মোহ; **যুষ্মৎ**—আপনার; **কথা**—বিষয়; **অমৃত**—অমৃত; **নিষেবকঃ**—আস্বাদন করে; **উৎ**—দূর থেকে; **ব্যুদস্যেৎ**—উদ্ধার লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

বিদ্যাধরেরা বললেন—হে ভগবান! এই মনুষ্য শরীর সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য, কিন্তু আপনার বহিরঙ্গা শক্তির বশীভূত হয়ে জীব ভ্রান্তিবশত তার দেহকে আত্মা বলে মনে করে, এবং তার ফলে মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে জড় সুখভোগের মাধ্যমে সুখী হতে চায়। পথভ্রষ্ট হয়ে সে সর্বদা অনিত্য, মায়িক সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আপনার দিব্য কার্যকলাপ এতই প্রবল প্রভাবসম্পন্ন যে, কেউ যদি সেই বিষয়ে শ্রবণ এবং কীর্তনে যুক্ত হন, তা হলে তিনি এই মোহ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

মনুষ্য জীবনকে *অর্থদ* বলা হয়, কারণ এই শরীর দেহী আত্মাকে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য খুব সুন্দরভাবে সাহায্য করতে পারে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, মনুষ্য শরীর যদিও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শরীর আমাদের সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রদান করতে পারে। নিম্ন স্তরের জীবন থেকে উচ্চ স্তরের জীবনে জীবের বিবর্তনের পন্থায়, মনুষ্য জীবন হচ্ছে এক মহান আশীর্বাদ। কিন্তু মায়া এতই প্রবল যে, মনুষ্য শরীর লাভ করার এই মহৎ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা অনিত্য জড় সুখের দ্বারা প্রভাবিত হই, এবং আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে যাই। আমরা এমন সমস্ত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হই, যা নশ্বর। এই আকর্ষণের কারণ হচ্ছে অনিত্য জড় শরীর। জীবনের ভয়ঙ্কর এই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভের কেবল একটি মাত্র উপায় রয়েছে—পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হবে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তনে এবং শ্রবণে যুক্ত হওয়া। *যুষ্মৎ-কথামৃত-নিষেবকঃ* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে—'যাঁরা আপনার অমৃতময় কথা আস্বাদনে যুক্ত।' শ্রীকৃষ্ণের বাণী এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করে দুটি গ্রন্থ। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত উপদেশ, এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের কথা। এই দুটি গ্রন্থ হচ্ছে কৃষ্ণকথার বিশেষ অমৃত সম্বলিত। যাঁরা এই দুটি বৈদিক শাস্ত্রের বাণী প্রচারে যুক্ত, তাদের পক্ষে মায়া রচিত বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত সরল। বদ্ধ জীবের মায়া হচ্ছে যে, সে তার চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না। সে তার বাহ্য শরীরের প্রতি অধিক মনোযোগী, যা হচ্ছে কেবল একটি মাংসপিণ্ড, এবং নির্দিষ্ট কালের পর তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। জীবাত্মাকে যখন এক শরীর থেকে আর এক শরীরে দেহান্তরিত হতে হয়, তখন সমস্ত পরিবেশের পরিবর্তন হয়। মায়ার প্রভাবে সে পুনরায় অন্য আর একটি ভিন্ন পরিবেশে সন্তুষ্ট হবে। মায়ার এই প্রভাবকে বলা হয় *আবরণাত্মিকা শক্তি*, কারণ তা এত প্রবল যে, যে-কোন জঘন্য অবস্থাতেও জীব সন্তুষ্ট থাকে। সে যদি একটি কৃমিকীট হয়ে উদরে বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তবুও সে সন্তুষ্ট থাকে এবং মনে করে যে, সে কত আনন্দ অনুভব করছে। এটিই হচ্ছে মায়ার *আবরণাত্মিকা* প্রভাব। কিন্তু মনুষ্য-জীবন হচ্ছে সেই কথা বুঝতে পারার একটি সুযোগ, এবং কেউ যদি সেই সুযোগটি হারায়, তা হলে সে সব চাইতে দুর্ভাগা। মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণকথায় মগ্ন হওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই একটি পন্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে সকলেই তাদের বর্তমান স্থিতির

পরিবর্তন না করে, কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা মহাজনদের শ্রীমুখ থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে কৃষ্ণকথা প্রচার করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, *"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।"* সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা কাউকেই বলি না যে, প্রথমে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে এবং তার পর আমাদের কাছে আসতে হবে। পক্ষান্তরে, আমরা সকলকেই নিমন্ত্রণ জানাই, তাঁরা যেন এসে আমাদের সাথে কেবল জপ করেন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। কারণ আমরা জানি যে, কেবলমাত্র কৃষ্ণকথা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে, মানুষের জীবনের আমূল পরিবর্তন হবে; তিনি নতুন আলোক দেখতে পাবেন এবং তাঁর জীবন সফল হবে।

শ্লোক ৪৫

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং
ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ।
ত্বং সদস্যার্ত্বিজো দম্পতী দেবতা
অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **ত্বম্**—আপনি; **ক্রতুঃ**—যজ্ঞ; **ত্বম্**—আপনি; **হবিঃ**—ঘৃতের আহুতি; **ত্বম্**—আপনি; **হুত-আশঃ**—অগ্নি; **স্বয়ম্**—সাক্ষাৎ; **ত্বম্**—আপনি; **হি**—কারণ; **মন্ত্রঃ**—বৈদিক মন্ত্র; **সমিৎ-দর্ভ-পাত্রাণি**—ইন্ধন, কুশ এবং যজ্ঞ-পাত্রসমূহ; **চ**—এবং; **ত্বম্**—আপনি; **সদস্য**—সভার সদস্যগণ; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **দম্পতী**—যজ্ঞের যজমান এবং তাঁর পত্নী; **দেবতা**—দেবতাগণ; **অগ্নি-হোত্রম্**—অগ্নিহোত্র; **স্বধা**—পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন; **সোমঃ**—সোম লতা; **আজ্যম্**—ঘৃত; **পশুঃ**—যজ্ঞের পশু।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ বললেন—হে ভগবান! আপনি সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ। আপনি হবি, আপনি অগ্নি, আপনি বৈদিক যজ্ঞমন্ত্র, আপনি সমিধ, আপনি শিখা, আপনি কুশ,

এবং আপনি যজ্ঞপাত্র। আপনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিত, আপনি ইন্দ্রাদি দেবতা, এবং আপনি যজ্ঞের পশু। যজ্ঞে যা কিছু উৎসর্গ করা হয় তা আপনি অথবা আপনার শক্তি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান বিষ্ণুর সর্বব্যাপকতা আংশিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণে* বলা হয়েছে যে, অগ্নি যেমন এক স্থানে স্থিত হয়ে তার তাপ এবং আলোক সর্বত্র বিকিরণ করে, তেমনই এই জড় জগতে অথবা চিৎ-জগতে আমরা যা কিছু দর্শন করি, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। ব্রাহ্মণগণ বলেছেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুই সব কিছু—অগ্নি, হবি, ঘৃত, পাত্র, যজ্ঞস্থল এবং কুশ। তিনি হচ্ছেন সব কিছু। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এই যুগের সংকীর্তন যজ্ঞ অন্য সমস্ত যুগে অনুষ্ঠিত অন্য সমস্ত যজ্ঞেরই সমান উত্তম। কেউ যদি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তা হলে আর বেদে বর্ণিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সমস্ত সামগ্রীর বিশাল আয়োজন করার প্রয়োজন হয় না। হরে এবং কৃষ্ণ, ভগবানের এই দিব্য নাম কীর্তনে, হরে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং কৃষ্ণ হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁরা একত্রে সব কিছু। এই যুগে, কলির প্রভাবে সকলেই পীড়িত, এবং কারও পক্ষেই যজ্ঞ করার জন্য বেদে উল্লিখিত সমস্ত সামগ্রীর আয়োজন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি সর্ব প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, কারণ আমাদের দৃষ্টিতে হরে (শ্রীকৃষ্ণের শক্তি) এবং কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব সব কিছুই যেহেতু তাঁর শক্তির প্রকাশ, তাই বুঝতে হবে যে, সব কিছুই কৃষ্ণ। সব কিছু কেবল কৃষ্ণভাবনায় গ্রহণ করতে হবে, এবং যিনি তা করেন, তিনি হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ। তা বলে ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু, সুতরাং তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বরূপ নেই। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ, তাই তাঁর শক্তি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রেখেও তিনিই সব কিছু। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* নবম অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে তিনি নিজেকে বিস্তার করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সব কিছু নন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত দর্শন হচ্ছে তিনি যুগপৎভাবে ভেদ এবং অভেদ।

শ্লোক ৪৬

ত্বং পুরা গাং রসায়া মহাসূকরো
দংষ্ট্রয়া পদ্মিনীং বারণেন্দ্রো যথা ।
স্তূয়মানো নদল্লীলয়া যোগিভি-
র্ব্যুজ্জহর্থ ত্রয়ীগাত্র যজ্ঞক্রতুঃ ॥ ৪৬ ॥

ত্বম্—আপনি; **পুরা**—পূর্বে; **গাম্**—পৃথিবীকে; **রসায়াঃ**—জলের ভিতর থেকে; **মহা-সূকরঃ**—মহান বরাহ অবতারে; **দংষ্ট্রয়া**—দন্তের দ্বারা; **পদ্মিনীম্**—পদ্ম; **বারণ-ইন্দ্রঃ**—হাতি; **যথা**—যেমন; **স্তূয়মানঃ**—প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছিল; **নদন্**—গর্জন করে, **লীলয়া**—অনায়াসে; **যোগিভিঃ**—সনকাদি মহর্ষিদের দ্বারা; **ব্যুজ্জহর্থ**—উত্তোলন করেছিলেন; **ত্রয়ী-গাত্র**—হে মূর্তিমান বৈদিক জ্ঞান; **যজ্ঞ-ক্রতুঃ**—যজ্ঞরূপে।

অনুবাদ

হে ভগবান! হে মূর্তিমান বৈদিক জ্ঞান! বহুকাল পূর্বে মহান বরাহ অবতারে আপনি পৃথিবীকে জল থেকে উত্তোলন করেছিলেন, ঠিক যেমন একটি হস্তী অনায়াসে সরোবর থেকে একটি পদ্মফুল উত্তোলন করে। বিশাল বরাহরূপে আপনি যখন গর্জন করেছিলেন, সেই দিব্য শব্দতরঙ্গ যজ্ঞমন্ত্র বলে স্বীকার করা হয়েছিল, এবং সনকাদি মহর্ষিগণ তার ধ্যান করে আপনার স্তব করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *ত্রয়ী-গাত্র,* অর্থাৎ, ভগবানের চিন্ময় রূপ হচ্ছে বেদ। কেউ যখন মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ অথবা রূপের পূজা করেন, তখন বুঝতে হবে যে, সেখানে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সমস্ত বেদ পাঠ করা হচ্ছে। মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার করার ফলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বৈদিক নির্দেশ অধ্যয়ন করা হয়। এমন কি যদি কোন নবীন ভক্তও অর্চা বিগ্রহের আরাধনায় যুক্ত হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি বৈদিক জ্ঞানের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যিনি সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন অথবা সেবা করেন, বুঝতে হবে যে, তিনি বেদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

শ্লোক ৪৭

স প্রসীদ ত্বমস্মাকমাকাঙ্ক্ষতাং
দর্শনং তে পরিভ্রষ্টসৎকর্মণাম্ ।
কীর্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে
যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ ॥ ৪৭ ॥

সঃ—সেই পুরুষ; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হোন; **ত্বম্**—আপনি; **অস্মাকম্**—আমাদের উপর; **আকাঙ্ক্ষতাম্**—প্রতীক্ষা করে; **দর্শনম্**—দর্শনের; **তে**—আপনার; **পরিভ্রষ্ট**—পতিত; **সৎ-কর্মণাম্**—যাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **কীর্ত্যমানে**—কীর্তিত হয়ে; **নৃভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **নাম্নি**—আপনার পবিত্র নাম; **যজ্ঞ-ঈশ**—হে যজ্ঞেশ্বর; **তে**—আপনার; **যজ্ঞ-বিঘ্নাঃ**—যজ্ঞের বাধা; **ক্ষয়ম্**—বিনাশের জন্য; **যান্তি**—লাভ করেন; **তস্মৈ**—আপনাকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমরা আপনার দর্শনের প্রতীক্ষা করছিলাম, কারণ আমরা বৈদিক বিধি অনুসারে যজ্ঞ করতে অসমর্থ হয়েছিলাম। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। কেবল আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা যায়। আমরা আপনার সমক্ষে আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছিলেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপস্থিতির ফলে, এখন তাঁদের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে। এই শ্লোকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্রাহ্মণদের উক্তি হচ্ছে, "কেবল আপনার দিব্য নাম কীর্তন করার ফলেই আমরা সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে পারি, কিন্তু এখন আপনি সাক্ষাৎ উপস্থিত রয়েছেন।" শিবের অনুচররা দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণরা পরোক্ষভাবে শিবের অনুচরেদের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণরা যেহেতু সর্বদা ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত, তাই শিবের অনুচরেরা তাঁদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। একটি প্রবাদ রয়েছে 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।' তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাবণ। রাবণ ছিলেন শিবের পরম ভক্ত, কিন্তু যখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে সংহার করতে চেয়েছিলেন, তখন শিব তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি। শিব এবং ব্রহ্মার মতো দেবতারাও যদি ভক্তের অনিষ্ট

করতে চান, তা হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কাউকে সংহার করতে চান, যেমন রাবণ অথবা হিরণ্যকশিপু, তখন কোন দেবতাও তাকে রক্ষা করতে পারেন না।

শ্লোক ৪৮

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি দক্ষঃ কবির্যজ্ঞং ভদ্র রুদ্রাভিমর্শিতম্ ।
কীর্ত্যমানে হৃষীকেশে সংনিন্যে যজ্ঞভাবনে ॥ ৪৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **কবিঃ**—শুদ্ধ চেতনা লাভ করে; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **ভদ্র**—হে বিদুর; **রুদ্র-অভিমর্শিতম্**—বীরভদ্র কর্তৃক বিনষ্ট; **কীর্ত্যমানে**—কীর্তিত হয়ে; **হৃষীকেশে**—হৃষীকেশ (ভগবান বিষ্ণু), **সংনিন্যে**—পুনরায় শুরু করার আয়োজন করেছিলেন; **যজ্ঞ-ভাবনে**—যজ্ঞের রক্ষক

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—সেখানে উপস্থিত সকলের দ্বারা এইভাবে ভগবান বিষ্ণু বন্দিত হওয়ার পর, দক্ষ শুদ্ধ অন্তঃকরণে পুনরায় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, যা শিবের অনুচরদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৯

ভগবান স্বেন ভাগেন সর্বাত্মা সর্বভাগভুক্ ।
দক্ষং বভাষ আভাষ্য প্রীয়মাণ ইবানঘ ॥ ৪৯ ॥

ভগবান্—শ্রীবিষ্ণু; **স্বেন**—তাঁর নিজের; **ভাগেন**—অংশের দ্বারা; **সর্ব-আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **সর্ব-ভাগ-ভুক্**—সমস্ত যজ্ঞের ফলভোক্তা; **দক্ষম্**—দক্ষকে; **বভাষে**—বলেছিলেন; **আভাষ্য**—সম্বোধন করে; **প্রীয়মাণঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ বিদুর।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে নিষ্পাপ বিদুর! ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত জীবের পরমাত্মা হওয়ার ফলে, তিনি কেবল যজ্ঞের তাঁর অংশ প্রাপ্ত হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাই প্রসন্নভাবে দক্ষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) বলা হয়েছে, *ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাম্*—ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যজ্ঞ এবং তপস্যার সমস্ত ফলের পরম ভোক্তা। মানুষ যে কর্মেই প্রবৃত্ত হোক না কেন, তার চরম লক্ষ্য হচ্ছে বিষ্ণু। কেউ যদি তা না জানে, তা হলে সে বিপথগামী। পরমেশ্বর ভগবানরূপে বিষ্ণুর কারও কাছ থেকে কিছু চাওয়ার নেই। তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু জীবের প্রতি সৌহার্দ্যবশত তিনি যজ্ঞের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। যখন তাঁর যজ্ঞভাগ তাঁকে নিবেদন করা হয়েছিল, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) উল্লেখ করা হয়েছে, *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি*—ভক্ত যদি তাঁকে একটি ছোট পাতা, অথবা একটি ফুল বা একটু জল নিবেদন করেন, এবং সেই নিবেদন যদি প্রীতি এবং অনুরাগ সহকারে হয়ে থাকে, তা হলে ভগবান তা গ্রহণ করেন এবং প্রসন্ন হন। যদিও তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কারও কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার আবশ্যকতা তাঁর নেই, তবুও তিনি তা গ্রহণ করেন, কারণ পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের সঙ্গে তাঁর এক অতি গভীর সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব রয়েছে। এখানে আব একটি বিষয় হচ্ছে যে, তিনি কখনও অবৈধভাবে অন্যের ভাগ গ্রহণ করেন না। যজ্ঞে দেবতাদের, শিবের এবং ব্রহ্মার ভাগ রয়েছে, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুরও ভাগ রয়েছে। ভগবান তাঁর নিজের ভাগ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি কখনও অবৈধভাবে অন্যের ভাগ গ্রহণ করতে চান না। পরোক্ষভাবে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, দক্ষ শিবকে তাঁর যজ্ঞভাগ প্রদান করতে অস্বীকার করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মৈত্রেয় এখানে বিদুরকে নিষ্পাপ বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ বিদুর ছিলেন একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং তিনি কখনও কোন দেবতাদের প্রতি অপরাধ করেননি। বৈষ্ণবেরা যদিও শ্রীবিষ্ণুকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁরা কখনও দেবতাদের চরণে অপরাধ করেন না। তাঁরা দেবতাদের যথাযথ সম্মান প্রদান করেন। বৈষ্ণবেরা শিবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে স্বীকার করেন। বৈষ্ণবের পক্ষে কোন দেবতার প্রতি অপরাধ করার সম্ভাবনা নেই, এবং দেবতারাও বৈষ্ণবদের প্রতি সর্বদা প্রসন্ন, কারণ বৈষ্ণবেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্মল ভক্ত।

শ্লোক ৫০

শ্রীভগবানুবাচ

অহং ব্রহ্মা চ শর্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্ ।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীভগবান্—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **উবাচ**—বললেন; **অহম্**—আমি; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **চ**—এবং, **শর্বঃ**—শিব; **চ**—এবং, **জগতঃ**—জড় জগতের; **কারণম্**—কারণ; **পরম্**—পরম; **আত্ম-ঈশ্বরঃ**—পরমাত্মা; **উপদ্রষ্টা**—সাক্ষী; **স্বয়ংদৃক্**—স্বয়ংসম্পূর্ণ, **অবিশেষণঃ**—পার্থক্য-রহিত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু উত্তর দিলেন—ব্রহ্মা, শিব এবং আমি জড় জগতের পরম কারণ। আমি পরমাত্মা, স্বয়ংসম্পূর্ণ সাক্ষী। কিন্তু নির্বিশেষভাবে ব্রহ্মা, শিব এবং আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় শরীর থেকে, এবং শিবের জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার শরীর থেকে। অতএব, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরম কারণ। *বেদেও* উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিতে কেবল বিষ্ণু বা নারায়ণ ছিলেন; ব্রহ্মা অথবা শিব ছিলেন না। তেমনই, শঙ্করাচার্য প্রতিপন্ন করেছেন—*নারায়ণঃ পরঃ*। নারায়ণ বা শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন আদি উৎস, এবং ব্রহ্মা ও শিব সৃষ্টির পরে প্রকাশিত হয়েছেন। তা ছাড়া, শ্রীবিষ্ণু আত্মেশ্বর বা সকলের পরমাত্মা। তাঁরই পরিচালনায়, অন্তর থেকে সমস্ত কিছুর অনুপ্রেরণা হয়। যেমন, *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, *তেনে ব্রহ্ম হৃদা*—তিনি প্রথমে অন্তর থেকে ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ভগবদ্গীতায় (১০/২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহম্ আদির্হি দেবানাম্*—শ্রীবিষ্ণু বা কৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেবতাদের উৎস। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"সব কিছু আমার থেকে উৎপন্ন হয়েছে।" তার মধ্যে দেবতারাও অন্তর্ভুক্ত। তেমনই, *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ*। এবং *উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে*। সব কিছুই ভগবান শ্রীবিষ্ণু থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তিনি সব কিছুর পালন করেন, এবং তাঁরই শক্তির দ্বারা সব কিছু ধ্বংস হয়। তাই তাঁর থেকে যে শক্তিসমূহ উদ্ভূত হয়, তাদের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া এই জড় জগৎ সৃষ্টি করে এবং সেই সৃষ্টিকে আবার ধ্বংস করে। এইভাবে ভগবান হচ্ছেন কার্য এবং কারণও। যা কিছু প্রভাব আমরা দেখি তা তাঁর শক্তির মিথষ্ক্রিয়া, এবং যেহেতু শক্তি তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়, তাই তিনি কার্য এবং কারণ উভয়ই। যুগপৎভাবে সব কিছুই ভিন্ন এবং অভিন্ন। বলা হয় যে, প্রত্যেক বস্তু হচ্ছে ব্রহ্ম—*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। সর্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে, কোন কিছুই ব্রহ্মের অতীত নয়, এবং তাই ব্রহ্মা এবং শিব নিশ্চিতরূপে তাঁর থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ৫১

**আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥ ৫১ ॥**

আত্ম-মায়াম্—আমার শক্তি; **সমাবিশ্য**—প্রবেশ করে; **সঃ**—স্বয়ং; **অহম্**—আমি; **গুণ-ময়ীম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা রচিত; **দ্বি-জ**—হে দুই জন্মবিশিষ্ট দক্ষ; **সৃজন্**—সৃষ্টি করে; **রক্ষন্**—পালন করে; **হরন্**—বিনাশ করে; **বিশ্বম্**—জড় জগৎ; **দধ্রে**—ধারণ করি; **সংজ্ঞাম্**—নাম; **ক্রিয়া-উচিতাম্**—ক্রিয়া অনুসারে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে দক্ষ দ্বিজ! আমি হচ্ছি আদি ভগবান, কিন্তু এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কার্য আমি আমার জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে করে থাকি, এবং বিভিন্ন প্রকার কার্য অনুসারে, আমার প্রতিনিধিদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৫) বর্ণনা করা হয়েছে, *জীবভূতাং মহাবাহো*—সমগ্র জগৎ হচ্ছে পরম উৎস পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত শক্তি। সেই শক্তি সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা পরা এবং অপরা শক্তিরূপে কার্য করে। পরা শক্তি হচ্ছে জীব, যারা ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে জীব ভগবান থেকে অভিন্ন; তাঁর থেকে প্রকাশিত শক্তি তাঁর থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু এই জড় জগতের প্রকৃত কার্যকলাপের মধ্যে জীব বিভিন্নরূপে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। চুরাশি লক্ষ রকমের রূপসমন্বিত জীব রয়েছে। সেই জীবই জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কার্য করে। বিভিন্ন প্রকার জীব দেহ রয়েছে, কিন্তু সৃষ্টির আদিতে শ্রীবিষ্ণু ছিলেন একা। সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মার প্রকাশ হয়, এবং সংহারের জন্য শিবের প্রকাশ হয়। জড় জগতে চিন্ময় সত্তার প্রবেশ প্রসঙ্গে বলা চলে, সমস্ত জীবেরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু জীব যখন জড় জগতে প্রবেশ করে, তখন সে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণুর গুণাবতার, এবং বিষ্ণু স্বয়ং সত্ত্বগুণের নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করেন; তাই তিনিও শিব এবং ব্রহ্মার মতো গুণাবতার হন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নাম রয়েছে, কিন্তু তাদের উৎস একই।

শ্লোক ৫২

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি ।
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥ ৫২ ॥

তস্মিন্—তাঁকে; **ব্রহ্মণি**—পরমব্রহ্ম; **অদ্বিতীয়ে**—অদ্বিতীয়; **কেবলে**—এক হওয়ায়; **পরম-আত্মনি**—পরম আত্মা; **ব্রহ্ম-রুদ্রৌ**—ব্রহ্মা এবং শিব উভয়ে; **চ**—এবং; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **ভেদেন**—ভিন্ন; **অজ্ঞঃ**—যথাযথ জ্ঞানরহিত; **অনুপশ্যতি**—মনে করে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের আমার থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, এমন কি জীবদেরও স্বতন্ত্র বলে মনে করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা সহ সমস্ত জীবরা স্বতন্ত্র নয়, পক্ষান্তরে তারা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তির অন্তর্গত। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবেরও পরমাত্মা হওয়ার ফলে, জড়া প্রকৃতির গুণের কার্যকলাপের অন্তর্গত সকলকেই পরিচালনা করেন। ভগবানের অনুমতি ব্যতীত কেউই স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না, এবং তাই, পরোক্ষভাবে, কেউই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়—এমন কি ব্রহ্মা এবং রুদ্রও নন, যাঁরা হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির রজ এবং তমোগুণের অবতার।

শ্লোক ৫৩

যথা পুমান্ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥ ৫৩ ॥

যথা—যেমন; **পুমান্**—পুরুষ; **ন**—না; **স্ব-অঙ্গেষু**—তার নিজের শরীরে; **শিরঃ-পাণি-আদিষু**—মাথা, হাত, এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **পারক্য-বুদ্ধিম্**—পার্থক্য; **কুরুতে**—করা হয়; **এবম্**—এইভাবে; **ভূতেষু**—জীবদের মধ্যে; **মৎ-পরঃ**—আমার ভক্ত।

অনুবাদ

সাধারণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষ মস্তক এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য দর্শন করে না। তেমনই, আমার ভক্তরা সর্বব্যাপ্ত ভগবান বিষ্ণু এবং অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে কোন রকম ভেদ দর্শন করেন না।

তাৎপর্য

যখনই শরীরের কোন অঙ্গে রোগ হয়, তখন সারা শরীর সেই অঙ্গের যত্ন করে। তেমনই, ভক্তের সমদর্শিতা প্রকাশ পায় সমস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি তাঁর করুণার মাধ্যমে। *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) বলা হয়েছে, *পণ্ডিতাঃ সম-দর্শিনঃ*—যাঁরা তত্ত্বজ্ঞান-সমন্বিত, তাঁরা সমস্ত জীবদের সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন। ভক্তরা সমস্ত বদ্ধ জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ এবং তাই তাঁরা *অপারক্য-বুদ্ধি* নামে পরিচিত। যেহেতু ভক্তরা হচ্ছেন তত্ত্বজ্ঞানী এবং তাঁরা জানেন যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তাঁরা সকলের কাছে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেন, যাতে সকলেই সুখী হতে পারে। দেহের কোন অঙ্গ যদি রোগগ্রস্ত হয়, তা হলে সারা শরীরের সমস্ত চেতনা সেই অঙ্গের প্রতি একাগ্রীভূত হয়। তেমনই, যারা কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে জড় চেতনায় আবদ্ধ হয়েছে, ভক্তরা তাদের প্রতি যত্নবান হন। ভক্তের সমদর্শিতা হচ্ছে যে, সমস্ত জীবদের তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সর্বদা সক্রিয়।

শ্লোক ৫৪

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্ ।
সর্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥

ত্রয়াণাম্—তিনের; **এক-ভাবানাম্**—এক স্বভাব-সমন্বিত; **যঃ**—যিনি; **ন পশ্যতি**—দেখেন না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভিদাম্**—পার্থক্য; **সর্ব-ভূত-আত্মনাম্**—সমস্ত জীবের পরমাত্মার; **ব্রহ্মন্**—হে দক্ষ; **সঃ**—তিনি; **শান্তিম্**—শান্তি; **অধিগচ্ছতি**—উপলব্ধি করেন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং জীবাত্মাদের পরব্রহ্ম থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করেন না, এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে শান্তি উপলব্ধি করেন; অন্যরা করে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ত্রয়াণাম্* অর্থে 'তিন', যথা ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু। *ভিদাম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভিন্ন'। তাঁরা তিন, অতএব তাঁরা ভিন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এক। সেটি হচ্ছে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব*। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, দুধ এবং দই যেমন যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন; উভয়েই দুধ, কিন্তু দই রূপান্তরিত হয়েছে। বাস্তবিক শান্তি লাভ করার জন্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সব কিছু, এবং ব্রহ্মা ও শিব সহ সমস্ত জীবাত্মাদের পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করা। কেউই স্বতন্ত্র নয়। আমরা সকলেই হচ্ছি পরমেশ্বর ভগবানের বিস্তার। সেই সূত্রে বিবিধের মধ্যে একতা সিদ্ধ হয়। বিভিন্ন প্রকাশ রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষ্ণুর মধ্যে সকলে এক। সব কিছুই বিষ্ণুর শক্তির বিস্তার।

শ্লোক ৫৫

মৈত্রেয় উবাচ

এবং ভগবতাদিষ্টঃ প্রজাপতিপতির্হরিম্ ।
অর্চিত্বা ক্রতুনা স্বেন দেবানুভয়তোহযজৎ ॥ ৫৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **আদিষ্টঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **প্রজাপতি-পতিঃ**—সমস্ত প্রজাপতিদের প্রধান; **হরিম্**—হরিকে; **অর্চিত্বা**—অর্চনা করে; **ক্রতুনা**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **স্বেন**—স্বীয়; **দেবান্**—দেবতাগণ; **উভয়তঃ**—পৃথক পৃথকভাবে; **অযজৎ**—পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—এইভাবে ভগবান কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে আদিষ্ট হয়ে, সমস্ত প্রজাপতিদের প্রধান দক্ষ শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন। যজ্ঞবিধির দ্বারা তাঁকে পূজা করার পর, দক্ষ পৃথকভাবে ব্রহ্মা এবং শিবের পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সব কিছু অর্পণ করা উচিত, এবং সমস্ত দেবতাদের তাঁর প্রসাদ বিতরণ করা উচিত। এই প্রথা পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে এখনও প্রচলিত রয়েছে। জগন্নাথের প্রধান মন্দিরের চারপাশে বহু দেবতাদের মন্দির রয়েছে, এবং জগন্নাথকে নিবেদন করার পর, তাঁর প্রসাদ সমস্ত দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিষ্ণুর

প্রসাদের দ্বারা শিবের বিগ্রহের পূজা হয় এবং ভুবনেশ্বরে প্রসিদ্ধ শিব মন্দিরেও বিষ্ণু বা জগন্নাথের প্রসাদ শিবকে নিবেদন করা হয়। সেটি হচ্ছে বৈষ্ণব প্রথা। বৈষ্ণব কোন সাধারণ জীবকে পর্যন্ত অবহেলা করেন না, এমন কি ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও নয়; বৈষ্ণব সকলকেই তাদের মর্যাদা অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করেন। তবে সেই সম্মান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে নিবেদন করা হয়। যে ভক্ত অত্যন্ত উন্নত, তিনি প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক দর্শন করেন; তিনি কোন কিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করেন না। সেটি হচ্ছে তাঁর একত্বের দর্শন।

শ্লোক ৫৬

রুদ্রং চ স্বেন ভাগেন হ্যুপাধাবৎসমাহিতঃ ।
কর্মণোদবসানেন সোমপানিতরানপি ।
উদবস্য সহর্ত্বিগ্‌ভিঃ সস্নাববভৃথং ততঃ ॥ ৫৬ ॥

রুদ্রম্—শিব; **চ**—এবং; **স্বেন**—নিজের; **ভাগেন**—অংশ; **হি**—যেহেতু; **উপাধাবৎ**—পূজা করেছিলেন; **সমাহিতঃ**—ধ্যানস্থ চিত্তে; **কর্মণা**—অনুষ্ঠানের দ্বারা; **উদবসানেন**—সমাপ্ত করার কার্যের দ্বারা; **সোম-পান**—দেবতা; **ইতরান্**—অন্যান্য; **অপি**—ও; **উদবস্য**—সমাপ্ত করে; **সহ**—সঙ্গে; **ঋত্বিগ্‌ভিঃ**—পুরোহিতগণ সহ; **সস্নৌ**—স্নান করেছিলেন; **অবভৃথম্**—অবভৃথ স্নান; **ততঃ**—তার পর।

অনুবাদ

দক্ষ শিবকে তাঁর যজ্ঞভাগ নিবেদন করে, সম্মানপূর্বক সর্বতোভাবে পূজা করেছিলেন। যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত করার পর, তিনি অন্য সমস্ত দেবতা এবং সেখানে সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। তার পর, পুরোহিতগণ সহ সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করার পর, তিনি স্নান করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞভাগের দ্বারা যথাযথভাবে রুদ্রের পূজা করা হয়েছিল। যজ্ঞ হচ্ছেন বিষ্ণু, এবং বিষ্ণুকে নিবেদিত প্রসাদ সকলকে বিতরণ করা হয়, এমন কি শিবকে পর্যন্ত। এই সম্পর্কে শ্রীধর স্বামীও তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, *স্বেন ভাগেন*—যজ্ঞাবশেষ সমস্ত দেবতা এবং অন্য সকলকে নিবেদন করা হয়।

শ্লোক ৫৭

তস্মা অপ্যনুভাবেন স্বেনৈবাবাপ্তরাধসে ।
ধর্ম এব মতিং দত্ত্বা ত্রিদশাস্তে দিবং যযুঃ ॥ ৫৭ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (দক্ষকে); **অপি**—ও; **অনুভাবেন**—পরমেশ্বর ভগবানের পূজার দ্বারা; **স্বেন**—নিজের দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবাপ্ত-রাধসে**—সিদ্ধি লাভ করে; **ধর্মে**—ধর্ম অনুষ্ঠানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মতিম্**—বুদ্ধি; **দত্ত্বা**—দান করে; **ত্রিদশাঃ**—দেবতাগণ; **তে**—তাঁরা; **দিবম্**—স্বর্গলোকে; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে বিধিপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করার পর, দক্ষ সম্পূর্ণরূপে ধর্মপথে স্থিত হয়েছিলেন। অধিকন্তু, সেই যজ্ঞে সমাগত সমস্ত দেবতারা তাঁকে পুণ্য লাভের আশীর্বাদ করে, স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দক্ষ যদিও ধর্মের পথে যথেষ্ট উন্নত ছিলেন, তবুও তিনি দেবতাদের আশীর্বাদের অপেক্ষা করেছিলেন। এইভাবে দক্ষযজ্ঞ শান্তি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৮

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্বকলেবরম্ ।
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম ॥ ৫৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **দাক্ষায়ণী**—দক্ষকন্যা; **হিত্বা**—ত্যাগ করার পর; **সতী**—সতী; **পূর্ব-কলেবরম্**—তাঁর পূর্বের শরীর; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **হিমবতঃ**—হিমালয়ের; **ক্ষেত্রে**—পত্নীতে; **মেনায়াম্**—মেনার; **ইতি**—এইভাবে; **শুশ্রুম**—আমি শুনেছি।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—আমি শুনেছি যে, দক্ষ থেকে প্রাপ্ত শরীর ত্যাগ করার পর, দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা) হিমালয়ের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মেনার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই কথা আমি প্রামাণ্য সূত্রে শুনেছি।

তাৎপর্য

মেনা মেনকা নামেও পরিচিত। তিনি হচ্ছেন হিমালয়ের রাজার পত্নী।

শ্লোক ৫৯

তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙ্‌ক্তে পতিমম্বিকা ।
অনন্যভাবৈকগতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পূরুষম্ ॥ ৫৯ ॥

তম্—তাঁকে (শিবকে); **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দয়িতম্**—প্রিয়; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **আবৃঙ্‌ক্তে**—গ্রহণ করেছিলেন; **পতিম্**—পতিরূপে; **অম্বিকা**—অম্বিকা বা সতী; **অনন্য-ভাবা**—অন্য সকলের প্রতি আসক্তি-রহিত; **এক-গতিম্**—একমাত্র লক্ষ্য; **শক্তিঃ**—স্ত্রী (তটস্থা এবং বহিরঙ্গা) শক্তি; **সুপ্তা**—নিষ্ক্রিয়; **ইব**—যেন; **পূরুষম্**—পুরুষ (পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে শিব)।

অনুবাদ

অম্বিকা (দুর্গাদেবী), যিনি দাক্ষায়ণী (সতী) রূপে পরিচিতা ছিলেন, তিনি শিবকে পুনরায় তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি নতুন সৃষ্টির সময় কার্য করে।

তাৎপর্য

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—এই বৈদিক মন্ত্র অনুসারে, ভগবানের বিভিন্ন শক্তি রয়েছে। শক্তি হচ্ছেন স্ত্রী, এবং ভগবান হচ্ছেন পুরুষ। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষের অধীনে সেবা করা। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি। তাই সমস্ত জীবাত্মাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই পরম পুরুষের সেবা করা। দুর্গা হচ্ছেন এই জড় জগতে তটস্থা এবং বহিরঙ্গা উভয় শক্তির প্রতীক, এবং শিব হচ্ছেন পরম পুরুষের প্রতিনিধি। শিবের সঙ্গে অম্বিকা বা দুর্গার সম্পর্ক নিত্য। সতী শিব ব্যতীত অন্য কাউকে পতিরূপে বরণ করতে পারেন না। শিব হিমালয়ের কন্যা হিমবতীরূপে দুর্গাকে কিভাবে বিবাহ করেছিলেন এবং কিভাবে কার্তিকের জন্ম হয়েছিল তা একটি মহান উপাখ্যান।

শ্লোক ৬০

এতদ্ভগবতঃ শম্ভোঃ কর্ম দক্ষাধ্বরদ্রুহঃ ।
শ্রুতং ভাগবতাচ্ছিষ্যাদুদ্ধবান্মে বৃহস্পতেঃ ॥ ৬০ ॥

এতৎ—এই; **ভগবতঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; **শম্ভোঃ**—শম্ভুর (শিবের); **কর্ম**—কাহিনী; **দক্ষ-অধ্বর-দ্রুহঃ**—যিনি দক্ষযজ্ঞ বিধ্বস্ত করেছিলেন; **শ্রুতম্**—শোনা

গিয়েছে; **ভাগবতাৎ**—পরম ভক্ত থেকে; **শিষ্যাৎ**—শিষ্য থেকে; **উদ্ধবাৎ**—উদ্ধব থেকে; **মে**—আমার দ্বারা; **বৃহস্পতেঃ**—বৃহস্পতির।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! শিবের দ্বারা বিধ্বস্ত দক্ষযজ্ঞের এই কাহিনী আমি বৃহস্পতির শিষ্য মহাভাগবত উদ্ধবের কাছে শুনেছিলাম।

শ্লোক ৬১

ইদং পবিত্রং পরমীশচেষ্টিতং
যশস্যমায়ুষ্যমঘৌঘমর্ষণম্ ।
যো নিত্যদাকর্ণ্য নরোঽনুকীর্তয়েদ্
ধুনোত্যঘং কৌরব ভক্তিভাবতঃ ॥ ৬১ ॥

ইদম্—এই; **পবিত্রম্**—পুণ্য; **পরম্**—পরম; **ঈশ-চেষ্টিতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের লীলা; **যশস্যম্**—যশ; **আয়ুষ্যম্**—দীর্ঘ আয়ু; **অঘ-ওঘ-মর্ষণম্**—পাপনাশক; **যঃ**—যিনি; **নিত্যদা**—সর্বদা; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **নরঃ**—ব্যক্তি; **অনুকর্তয়েৎ**—বর্ণনা করা উচিত; **ধুনোতি**—নির্মল করে; **অঘম্**—জড় কলুষ; **কৌরব**—হে কুরু-বংশীয়; **ভক্তি-ভাবতঃ**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করে বললেন—হে কুরুনন্দন! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক পরিচালিত এই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী যদি কেউ শ্রবণ করেন এবং তা অন্যদের শোনান, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টম অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগ ও বনগমন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

সনকাদ্যা নারদশ্চ ঋভুর্হংসোঽরুণির্যতিঃ ।
নৈতে গৃহান্ ব্রহ্মসুতা হ্যাবসন্নূর্ধ্বরেতসঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **সনক-আদ্যাঃ**—সনকাদি; **নারদঃ**—নারদ; **চ**—এবং; **ঋভুঃ**—ঋভু; **হংসঃ**—হংস, **অরুণিঃ**—অরুণি; **যতিঃ**—যতি, **ন**—না; **এতে**—এই সমস্ত; **গৃহান্**—গৃহে; **ব্রহ্ম-সুতাঃ**—ব্রহ্মার পুত্রগণ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আবসন্**—বাস করেছিলেন; **ঊর্ধ্ব-রেতসঃ**—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—সনকাদি চার কুমার, নারদ, ঋভু, হংস, অরুণি এবং যতি—ব্রহ্মার এই সমস্ত পুত্ররা গৃহে অবস্থান না করে ঊর্ধ্বরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার জন্মের সময় থেকেই ব্রহ্মচর্যের প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষেরা, বিশেষ করে পুরুষেরা একেবারেই বিবাহ করেন না। তাঁরা তাঁদের বীর্য অধোমুখী হতে না দিয়ে, তা ঊর্ধ্বগামী করে মস্তিষ্কে উত্তোলন করেন। তাঁদের বলা হয় *ঊর্ধ্ব-রেতসঃ*, অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের বীর্য ঊর্ধ্বগামী করেন। বীর্য এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কেউ যৌগিক পন্থার দ্বারা বীর্য মস্তিষ্কে উন্নীত করতে পারেন, তা হলে তিনি অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারেন—তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীব্র হয়, এবং তাঁর আয়ু বৃদ্ধি হয়। তার ফলে যোগীরা নিষ্ঠা সহকারে কঠোর তপস্যা করতে পারেন এবং সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারেন, এমন কি

তাঁরা চিৎ-জগতে পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন। এই প্রকার ব্রহ্মচারীর কয়েকজন আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমাব, নারদ প্রভৃতি।

এই শ্লোকে আর একটি উল্লেখযোগ্য পদাংশ হচ্ছে *নৈতে গৃহান্ হি আবসন্*, 'তাঁরা গৃহে বাস করেননি।' *গৃহ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ঘর' এবং 'পত্নী'। প্রকৃতপক্ষে, 'গৃহ' মানে হচ্ছে পত্নী; 'গৃহ' মানে ঘর অথবা বাড়ি নয়। যিনি পত্নী সহ বাস করেন, তিনি গৃহে বাস করেন, অন্যথায় সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচারী ঘর অথবা বাড়িতে বাস করলেও গৃহে বাস করেন না। তাঁরা গৃহে থাকেন না বলতে বোঝায় যে, তাঁরা পত্নীর পাণিগ্রহণ করেননি, এবং তাই তাঁদের বীর্য স্খলনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যখন গৃহ-ও পত্নী থাকে, এবং সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য থাকে, তখনই কেবল বীর্য স্খলন করতে হয়, তা না হলে বীর্য স্খলনের কোন নির্দেশ নেই। সৃষ্টির আদি থেকেই এই নিয়ম পালন করা হচ্ছে, এবং তাই এই প্রকার ব্রহ্মচারীবা কখনও সন্তান উৎপাদন করেননি। এই আখ্যান মনুর কন্যা প্রসূতি থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মার বংশধরদের বিষয়। প্রসূতির কন্যা ছিলেন দাক্ষায়ণী বা সতী, যাঁর সম্পর্কে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মৈত্রেয় এখন ব্রহ্মার পুত্রদের সন্তান-সন্ততির বিষয়ে বর্ণনা করছেন। ব্রহ্মার বহু পুত্রের মধ্যে সনকাদি চতুঃসন এবং নারদ বিবাহ করেননি, তাই তাঁদের বংশধরদেব ইতিহাস বর্ণনার প্রশ্ন ওঠে না।

শ্লোক ২

মৃষাধর্মস্য ভার্যাসীদ্দম্ভং মায়াং চ শত্রুহন্ ।
অসূত মিথুনং তত্তু নির্ঋতির্জগৃহেঽপ্রজঃ ॥ ২ ॥

মৃষা—মৃষা; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **ভার্যা**—পত্নী; **আসীৎ**—ছিলেন, **দম্ভম্**—গর্ব; **মায়াম্**—প্রতাবণা; **চ**—এবং; **শত্রু-হন্**—হে শত্রু সংহারক; **অসূত**—উৎপন্ন করেছিলেন; **মিথুনম্**—যুগল; **তৎ**—তা; **তু**—কিন্তু; **নির্ঋতিঃ**—নির্ঋতি; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **অপ্রজঃ**—সন্তানহীন।

অনুবাদ

ব্রহ্মার আর এক পুত্র হচ্ছেন অধর্ম, যাঁর পত্নীর নাম হচ্ছে মিথ্যা। তাঁদের মিলনের ফলে দম্ভ এবং মায়া নামক দুটি আসুরিক পুত্র এবং কন্যার জন্ম হয়। নির্ঋতি নামক অসুর যার কোন সন্তান ছিল না, সে ঐ দুটি অসুরকে গ্রহণ করেছিল।

তাৎপর্য

এখানে জানা যায় যে, অধর্মও হচ্ছে ব্রহ্মার পুত্র, এবং সে তার ভগিনী মৃষা বা মিথ্যাকে বিবাহ করেছিল। সেটি হচ্ছে ভাই এবং বোনের মধ্যে যৌন সম্পর্কের সূচনা। মানব-সমাজে যেখানে অধর্ম রয়েছে, সেখানেই এই প্রকার অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক সম্ভব। এখানে জানা যায় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা কেবল সনক, সনাতন এবং নারদের মতো সাধু পুত্রই উৎপন্ন করেননি, তিনি নির্ঋতি, অধর্ম, দম্ভ, মৃষা প্রভৃতি আসুরিক সন্তানদেরও জন্ম দিয়েছিলেন। সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মা সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন। নারদ সম্বন্ধে জানা যায় যে, পূর্ব জীবনে তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ছিলেন এবং মহাত্মাদের সঙ্গ লাভ করেছিলেন, তার ফলে তিনি নারদরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অন্য পুত্ররাও তাঁদের নিজেদের ক্ষমতা বা পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কর্মের নিয়ম জন্ম জন্মান্তর ধরে চলতে থাকে, এবং যখন নতুন সৃষ্টি হয়, তখন জীবাত্মার সঙ্গে তার কর্মও ফিরে আসে। তাদের কর্ম অনুসারে তারা বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, যদিও তাদের পিতা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার ব্রহ্মা।

শ্লোক ৩

তয়োঃ সমভবল্লোভো নিকৃতিশ্চ মহামতে ।
তাভ্যাং ক্রোধশ্চ হিংসা চ যদ্দুরুক্তিঃ স্বসা কলিঃ ॥ ৩ ॥

তয়োঃ—সেই দুই জনের; **সমভবৎ**—জন্ম হয়েছিল; **লোভঃ**—লোভ; **নিকৃতিঃ**—শঠতা; **চ**—এবং; **মহা-মতে**—হে মহাত্মা; **তাভ্যাম্**—তাদের দুই জনের থেকে; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **চ**—এবং; **হিংসা**—হিংসা; **চ**—এবং; **যৎ**—যাদের থেকে; **দুরুক্তিঃ**—দুরুক্তি; **স্বসা**—ভগিনী; **কলিঃ**—কলি।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—হে মহাত্মা! দম্ভ ও মায়া থেকে লোভ এবং শঠতা জন্মায়। তাদের মিলনের ফলে ক্রোধ এবং হিংসার জন্ম হয়, এবং তাদের মিলনের ফলে কলি এবং তার ভগিনী দুরুক্তির জন্ম হয়।

শ্লোক ৪

দুরুক্তৌ কলিরাধত্ত ভয়ং মৃত্যুং চ সত্তম ।
তয়োশ্চ মিথুনং জজ্ঞে যাতনা নিরয়স্তথা ॥ ৪ ॥

দুরুক্তৌ—দুরুক্তিতে; **কলিঃ**—কলি; **আধত্ত**—উৎপাদন করেছিল; **ভয়ম্**—ভয়; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **চ**—এবং; **সৎ-তম্**—হে উত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ; **তয়োঃ**—তাদের দুই জনের; **চ**—এবং; **মিথুনম্**—মিলনের ফলে; **জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **যাতনা**—যাতনা; **নিরয়ঃ**—নরক; **তথা**—ও।

অনুবাদ

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! কলি এবং দুরুক্তির মিলনের ফলে মৃত্যু এবং ভীতি নামক সন্তানের জন্ম হয়। মৃত্যু এবং ভীতির মিলনের ফলে যাতনা এবং নিরয় নামক সন্তানের জন্ম হয়।

শ্লোক ৫

সংগ্রহেণ ময়াখ্যাতঃ প্রতিসর্গস্তবানঘ ।
ত্রিঃশ্রুত্বৈতৎপুমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনো মলম্ ॥ ৫ ॥

সংগ্রহেণ—সংক্ষেপে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আখ্যাতঃ**—বিশ্লেষিত হয়েছে; **প্রতিসর্গঃ**—প্রলয়ের কারণ; **তব**—আপনার; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **ত্রিঃ**—তিনবার; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই বর্ণনা; **পুমান্**—যিনি; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **বিধুনোতি**—ধৌত হয়; **আত্মনঃ**—আত্মার; **মলম্**—মল।

অনুবাদ

হে বিদুর! আমি সংক্ষেপে প্রলয়ের কারণ বিশ্লেষণ করেছি। যে ব্যক্তি এই বর্ণনা তিনবার শ্রবণ করেন, তাঁর আত্মার সমস্ত কলুষ বিধৌত হয় এবং তিনি পুণ্য অর্জন করেন।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়, কিন্তু বিনাশ হয় অধর্মের ফলে। সেটি জড় সৃষ্টি এবং প্রলয়ের নিয়ম। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধ্বংসের কারণ হচ্ছে অধর্ম। অধর্ম এবং মৃষা থেকে ক্রমশ দম্ভ, মায়া, লোভ, নিকৃতি, ক্রোধ, হিংসা, কলি, দুরুক্তি, মৃত্যু, ভীতি, যাতনা, এবং নিরয়ের জন্ম হয়। এই সমস্ত বংশধরদের ধ্বংসের প্রতীক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হন এবং ধ্বংসের এই সমস্ত কারণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি সেইগুলির প্রতি ঘৃণা বোধ করবেন, এবং তার ফলে তিনি পবিত্র জীবনের প্রতি অগ্রসর হবেন।

পুণ্য হচ্ছে হৃদয় নির্মল করার পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করতে, তা হলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এখানেও সেই পন্থারই অনুমোদন করা হয়েছে। *মলম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কলুষ'। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ধ্বংসের সমস্ত কারণকে ঘৃণা করা, যার শুরু হয় অধর্ম এবং প্রতারণা থেকে, তা হলে আমরা পুণ্যময় জীবনের প্রতি অগ্রসর হতে পারব। তখন কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করা সহজ হবে, এবং বার বার বিনাশের বশবর্তী হতে হবে না। আমাদের বর্তমান জীবন জন্ম মৃত্যুর চক্রসমন্বিত, কিন্তু আমরা যদি মুক্তির পথ অন্বেষণ করি, তা হলে এই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত সংসার-চক্র থেকে আমরা উদ্ধার লাভ করতে পারব।

শ্লোক ৬

অথাতঃ কীর্তয়ে বংশং পুণ্যকীর্তেঃ কুরূদ্বহ ।
স্বায়ম্ভুবস্যাপি মনোর্হরেরংশাংশজন্মনঃ ॥ ৬ ॥

অথ—এখন; **অতঃ**—তার পর; **কীর্তয়ে**—আমি বর্ণনা করব; **বংশম্**—বংশ; **পুণ্য-কীর্তেঃ**—কীর্তিময় কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **স্বায়ম্ভুবস্য**—স্বায়ম্ভুবের; **অপি**—ও; **মনোঃ**—মনুর; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অংশ**—অংশ; **অংশ**—অংশের; **জন্মনঃ**—জন্মগ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি এখন আপনার কাছে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করব, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের অংশের অংশরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের এক শক্তিশালী অংশ। ব্রহ্মা যদিও জীবতত্ত্ব, তিনি ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট, এবং তাই তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে গণনা করা হয়। কখনও কখনও ব্রহ্মার কার্য সম্পাদন করার উপযুক্ত জীব যখন না থাকে, তখন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, এবং স্বায়ম্ভুব মনু হচ্ছেন ব্রহ্মার পুত্র। মহর্ষি মৈত্রেয় এখন মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করতে যাচ্ছেন, যাঁরা সকলেই তাঁদের পুণ্যকর্মের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই পবিত্র বংশধরদের কথা বর্ণনা করার পূর্বে,

মৈত্রেয় ঋষি ক্রোধ, মৃষা, দুরুক্তি, হিংসা, ভয়, এবং মৃত্যু আদি অধর্মের বংশধরদের কথা ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছেন। অতএব তিনি জেনেশুনে তার পর ধ্রুব মহারাজের জীবন ইতিহাস বর্ণনা করছেন, যিনি ছিলেন এই বিশ্বের সব চাইতে পুণ্যবান রাজা।

শ্লোক ৭

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ শতরূপাপতেঃ সুতৌ ।
বাসুদেবস্য কলয়া রক্ষায়াং জগতঃ স্থিতৌ ॥ ৭ ॥

প্রিয়ব্রত—প্রিয়ব্রত; **উত্তানপাদৌ**—উত্তানপাদ; **শতরূপা-পতেঃ**—মহারাণী শতরূপা এবং তাঁর পতি মনুর; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **বাসুদেবস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কলয়া**—অংশের দ্বারা; **রক্ষায়াম্**—রক্ষার জন্য; **জগতঃ**—জগতের; **স্থিতৌ**—পালনের জন্য।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর পত্নী শতরূপার উত্তানপাদ এবং প্রিয়ব্রত নামক দুটি পুত্র ছিল। যেহেতু তাঁরা উভয়েই ছিলেন ভগবান বাসুদেবের অংশের বংশধর, তাই তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে এবং প্রজাদের পালন ও রক্ষা করতে অত্যন্ত সমর্থ ছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, উত্তানপাদ এবং প্রিয়ব্রত, এই দুইজন রাজা ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে বিশেষভাবে আদিষ্ট। তাঁরা অবশ্য মহান রাজা ঋষভদেবের মতো স্বয়ং ভগবান ছিলেন না।

শ্লোক ৮

জায়ে উত্তানপাদস্য সুনীতিঃ সুরুচিস্তয়োঃ ।
সুরুচিঃ প্রেয়সী পত্যুর্নেতরা যৎসুতো ধ্রুবঃ ॥ ৮ ॥

জায়ে—দুই পত্নীর; **উত্তানপাদস্য**—মহারাজ উত্তানপাদের; **সুনীতিঃ**—সুনীতি; **সুরুচিঃ**—সুরুচি; **তয়োঃ**—তাঁদের উভয়ের; **সুরুচিঃ**—সুরুচি; **প্রেয়সী**—অত্যন্ত প্রিয়; **পত্যুঃ**—পতির; **ন ইতরা**—অন্যজন নন; **যৎ**—যাঁর; **সুতঃ**—পুত্র; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদের সুনীতি এবং সুরুচি নামক দুই পত্নী ছিলেন। সুরুচি ছিলেন মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়; কিন্তু সুনীতি, যাঁর পুত্র ছিলেন ধ্রুব, তিনি রাজার ততটা প্রিয় ছিলেন না।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় রাজাদের পুণ্যকর্মের কথা বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। প্রিয়ব্রত ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর প্রথম পুত্র এবং উত্তানপাদ ছিলেন দ্বিতীয়, কিন্তু মহর্ষি মৈত্রেয় প্রথমেই উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কারণ মৈত্রেয় পুণ্য কার্যকলাপের বর্ণনা করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ধ্রুব মহারাজের জীবনের ঘটনাবলী ভক্তদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর পবিত্র কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা লাভ করা যায়, কিভাবে জড় বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করা যায়। পুণ্যবান ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ শ্রবণের ফলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়, পরমেশ্বর ভগবানের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং অচিরেই ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ধ্রুব মহারাজের তপস্যার দৃষ্টান্ত শ্রোতার হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ ভক্তিভাব উৎপন্ন করতে পারে।

শ্লোক ৯

একদা সুরুচেঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য লালয়ন্ ।
উত্তমং নারুরুক্ষন্তং ধ্রুবং রাজাভ্যনন্দত ॥ ৯ ॥

একদা—এক সময়; **সুরুচেঃ**—সুরুচির; **পুত্রম্**—পুত্র; **অঙ্কম্**—কোলে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **লালয়ন্**—আদর করছিলেন; **উত্তমম্**—উত্তমকে; **ন**—করেননি; **আরুরুক্ষন্তম্**—উঠতে চেষ্টা করেছিলেন; **ধ্রুবম্**—ধ্রুবকে; **রাজা**—রাজা; **অভ্যনন্দত**—স্বাগত।

অনুবাদ

এক সময় মহারাজ উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে তাঁর অঙ্কে স্থাপন করে আদর করছিলেন, সেই সময় ধ্রুব মহারাজও রাজার কোলে উঠবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁকে বিশেষ সমাদর করেননি।

শ্লোক ১০

তথা চিকীর্ষমাণং তং সপত্ন্যাস্তনয়ং ধ্রুবম্ ।
সুরুচিঃ শৃণ্বতো রাজ্ঞঃ সের্ষ্যমাহাতিগর্বিতা ॥ ১০ ॥

তথা—এইভাবে; **চিকীর্ষমাণম্**—শিশু ধ্রুব, যিনি কোলে ওঠবার চেষ্টা করছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **স-পত্ন্যাঃ**—তাঁর সপত্নীর (সুনীতির); **তনয়ম্**—পুত্র; **ধ্রুবম্**—ধ্রুবকে; **সুরুচিঃ**—রানী সুরুচি; **শৃণ্বতঃ**—শুনে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **স-ঈর্ষ্যম্**—ঈর্ষা সহকারে; **আহ**—বলেছিলেন; **অতি-গর্বিতা**—অত্যন্ত গর্বিত হয়ে।

অনুবাদ

যখন শিশু ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার কোলে ওঠার চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁর বিমাতা সুরুচি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, অত্যন্ত গর্বিতভাবে রাজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

রাজা অবশ্য তাঁর দুই পুত্র উত্তম এবং ধ্রুব উভয়ের প্রতিই সমান স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তাই তিনি ধ্রুব এবং উত্তম উভয়কেই কোলে নেওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু রানী সুরুচির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে, তিনি অন্তরে চাইলেও ধ্রুব মহারাজকে স্বাগত জানাতে পারেননি। মহারাজ উত্তানপাদের মনোভাব সুরুচি বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি মহা গর্বভরে তাঁর প্রতি রাজার অনুরাগের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। নারীদের স্বভাবই এই রকম। কোন স্ত্রী যখন বুঝতে পারেন যে, তিনি তাঁর পতির প্রিয়, তখন তিনি অন্যায়ভাবে সেই সুযোগের অসদ্ব্যবহার করতে চান। এই প্রবণতা স্বায়ম্ভুব মনুর অতি উন্নত পরিবারেও পরিলক্ষিত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই প্রকার স্ত্রীস্বভাব সর্বত্রই বিদ্যমান।

শ্লোক ১১

ন বৎস নৃপতের্ধিষ্ণ্যং ভবানারোঢুমর্হতি ।
ন গৃহীতো ময়া যত্ত্বং কুক্ষাবপি নৃপাত্মজঃ ॥ ১১ ॥

ন—না; **বৎস**—হে পুত্র; **নৃপতেঃ**—রাজার; **ধিষ্ণ্যম্**—আসন; **ভবান্**—তুমি নিজে; **আরোঢুম্**—চড়তে হলে; **অর্হতি**—যোগ্য; **ন**—না; **গৃহীতঃ**—গৃহীত; **ময়া**—আমার

দ্বারা; যৎ—যেহেতু; ত্বম্—তুমি; কুক্ষৌ—গর্ভে; অপি—যদিও; নৃপ-আত্মজঃ—রাজার পুত্র।

অনুবাদ

রানী সুরুচি ধ্রুব মহারাজকে বললেন—হে বৎস! তুমি রাজসিংহাসনে অথবা রাজার কোলে বসার যোগ্য নও। নিঃসন্দেহে তুমি রাজার পুত্র, কিন্তু যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করনি, তাই তুমি তোমার পিতার কোলে বসার যোগ্য নও।

তাৎপর্য

সুরুচি অত্যন্ত গর্বভরে ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন যে, রাজার পুত্র হওয়াই রাজার কোলে অথবা রাজসিংহাসনে বসার যোগ্যতা নয়, সেই যোগ্যতা নির্ভর করে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার উপর। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি পরোক্ষভাবে ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন যে, তিনি রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেও অন্য রানীর গর্ভে তাঁর জন্ম হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর বৈধ পুত্র ছিলেন না।

শ্লোক ১২

বালোঽসি বত নাত্মানমন্যস্ত্রীগর্ভসম্ভৃতম্ ।
নূনং বেদ ভবান্ যস্য দুর্লভেঽর্থে মনোরথঃ ॥ ১২ ॥

বালঃ—শিশু; অসি—হও; বত—সত্ত্বেও; ন—না; আত্মানম্—আমার; অন্য—অন্য; স্ত্রী—স্ত্রী; গর্ভ—গর্ভ; সম্ভৃতম্—জাত; নূনম্—কিন্তু; বেদ—জানতে চেষ্টা কর; ভবান্—তুমি নিজে; যস্য—যার; দুর্লভে—অপ্রাপ্য; অর্থে—বিষয়ে; মনঃ-রথঃ—আকাঙ্ক্ষী।

অনুবাদ

হে বৎস! তুমি জান না যে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করে, তুমি অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহন করেছ। তাই তোমার জেনে রাখা উচিত যে, তোমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ। তুমি এমন একটি বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করছ, যা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

তাৎপর্য

শিশু ধ্রুব মহারাজ স্বভাবতই তাঁর পিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাঁর জানা ছিল না যে, তাঁর দুই মাতার মধ্যে পার্থক্য ছিল। সুরুচি সেই পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁকে

জানিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি যেহেতু একজন অবোধ শিশু ছিলেন, তাই তিনি দুই রানীর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেননি। এটি সুরুচির আর একটি গর্বোক্তি।

শ্লোক ১৩

তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে ।
গর্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদীচ্ছসি নৃপাসনম্ ॥ ১৩ ॥

তপসা—তপস্যার দ্বারা; **আরাধ্য**—সন্তুষ্ট করে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **তস্য**—তাঁর দ্বারা; **এব**—কেবল; **অনুগ্রহেণ**—কৃপার দ্বারা; **মে**—আমার; **গর্ভে**—গর্ভে; **ত্বম্**—তুমি; **সাধয়**—স্থাপিত কর; **আত্মানম্**—নিজেকে; **যদি**—যদি; **ইচ্ছসি**—তুমি ইচ্ছা কর; **নৃপ-আসনম্**—রাজসিংহাসনে।

অনুবাদ

তুমি যদি রাজসিংহাসনে আরোহণ করতে চাও, তা হলে তোমাকে কঠোর তপস্যা করতে হবে। প্রথমে তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রসন্ন করতে হবে, এবং তার পর তাঁর কৃপায় তোমাকে পরবর্তী জন্মে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

তাৎপর্য

সুরুচি ধ্রুব মহারাজের প্রতি এতই ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি পরোক্ষভাবে তাঁকে তাঁর দেহ পরিবর্তন করতে বলেছিলেন। তাঁর মতে, প্রথমে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং তার পর পরবর্তী জন্মে তাঁকে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে, তা হলে কেবল ধ্রুব মহারাজের পক্ষে তাঁর পিতার সিংহাসনে আরোহণ করা সম্ভব হবে।

শ্লোক ১৪

মৈত্রেয় উবাচ

মাতুঃ সপত্ন্যাঃ স দুরুক্তিবিদ্ধঃ
শ্বসন্ রুষা দণ্ডহতো যথাহিঃ ।
হিত্বা মিষন্তং পিতরং সন্নবাচং
জগাম মাতুঃ প্ররুদন্ সকাশম্ ॥ ১৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **মাতুঃ**—তাঁর মাতার; **স-পত্ন্যাঃ**—সতীনের; **সঃ**—তিনি; **দুরুক্তি**—কর্কশবাক্য; **বিদ্ধঃ**—বিদ্ধ হয়ে; **শ্বসন্**—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে; **রুষা**—ক্রোধে; **দণ্ড-হতঃ**—দণ্ডের দ্বারা আহত; **যথা**—যেমন; **অহিঃ**—সর্প; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **মিষন্তম্**—দেখে; **পিতরম্**—তাঁর পিতাকে; **সন্ন-বাচম্**—নিঃশব্দে; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **মাতুঃ**—তাঁর মায়ের; **প্ররুদন্**—ক্রন্দন করতে করতে; **সকাশম্**—সন্নিধানে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর! তাঁর বিমাতার কর্কশ বাক্যের দ্বারা আহত হয়ে, ধ্রুব মহারাজ দণ্ডাহত সর্পের মতো মহাক্রোধে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পিতা কোন প্রতিবাদ না করে নীরব রয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

তং নিঃশ্বসন্তং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং
সুনীতিরুৎসঙ্গ উদূহ্য বালম্ ।
নিশম্য তৎপৌরমুখান্নিতান্তং
সা বিব্যথে যদ্গদিতং সপত্ন্যা ॥ ১৫ ॥

তম্—তাঁকে; **নিঃশ্বসন্তম্**—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে; **স্ফুরিত**—কম্পিত; **অধর-ওষ্ঠম্**—ওষ্ঠাধর; **সুনীতিঃ**—সুনীতি; **উৎসঙ্গে**—তাঁর কোলে; **উদূহ্য**—উঠিয়ে নিয়ে; **বালম্**—তাঁর পুত্রকে; **নিশম্য**—শুনে; **তৎ-পৌর-মুখাৎ**—অন্তঃপুরের অন্যান্যদের মুখ থেকে; **নিতান্তম্**—সমস্ত বর্ণনা; **সা**—তিনি; **বিব্যথে**—অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন; **যৎ**—যা; **গদিতম্**—বলা হয়েছে; **স-পত্ন্যা**—তাঁর সতীনের দ্বারা।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন, তখন ক্রোধে তাঁর অধরোষ্ঠ কম্পিত হচ্ছিল এবং তিনি অত্যন্ত করুণভাবে ক্রন্দন করছিলেন। সুনীতি তখনই তাঁকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন, এবং অন্তঃপুরবাসীরা তাঁর কাছে তখন সুরুচির সমস্ত দুরুক্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। তার ফলে সুনীতিও অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

সোৎসৃজ্য ধৈর্যং বিললাপ শোক-
দাবাগ্নিনা দাবলতেব বালা ।
বাক্যং সপত্ন্যাঃ স্মরতী সরোজ-
শ্রিয়া দৃশা বাষ্পকলামুবাহ ॥ ১৬ ॥

সা—তিনি; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **ধৈর্যম্**—ধৈর্য; **বিললাপ**—বিলাপ করেছিলেন; **শোক-দাব-অগ্নিনা**—শোকরূপ অগ্নির দ্বারা; **দাব-লতা ইব**—দগ্ধ পত্রের মতো; **বালা**—রমণী; **বাক্যম্**—কথা; **স-পত্ন্যাঃ**—তাঁর সতীনের দ্বারা উক্ত; **স্মরতী**—স্মরণ করে; **সরোজ-শ্রিয়া**—কমলের মতো সুন্দর মুখ; **দৃশা**—দেখে; **বাষ্প-কলাম্**—অশ্রুধারা; **উবাহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

এই ঘটনা সুনীতির কাছে অসহ্য হয়েছিল। তিনি দাবাগ্নির মধ্যে স্থিত লতিকার মতো শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে রোদন করেছিলেন। তাঁর সপত্নীর বাক্য যতই তাঁর স্মরণপথে উদিত হতে লাগল, ততই তাঁর কমলের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছিল, এবং তখন তিনি এইভাবে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষ যখন ব্যথিত হয়, তখন সে ঠিক দাবাগ্নিতে দগ্ধপত্রের মতো অনুভব করে। সুনীতির অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়েছিল। যদিও তাঁর মুখমণ্ডল ছিল পদ্মের মতো সুন্দর, তবুও তা তাঁর সতীনের দুরুক্তিরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে শুষ্ক হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃজিনস্য পার-
মপশ্যতী বালকমাহ বালা ।
মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা
ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎপরদুঃখদস্তৎ ॥ ১৭ ॥

দীর্ঘম্—গভীর; **শ্বসন্তী**—নিঃশ্বাস; **বৃজিনস্য**—বিপদের; **পারম্**—সীমা; **অপশ্যতী**—না পেয়ে; **বালকম্**—তাঁর পুত্রকে; **আহ**—বলেছিলেন; **বালা**—স্ত্রী; **মা**—না হোক; **অমঙ্গলম্**—দুর্ভাগ্য; **তাত**—হে পুত্র; **পরেষু**—অন্যকে; **মংস্থাঃ**—কামনা;

ভুঙ্‌ক্তে—ভোগ করে; **জনঃ**—ব্যক্তি; **যৎ**—যা; **পর-দুঃখদঃ**—যা অন্যকে দুঃখ দেয়; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

তিনিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, এবং সেই দুঃখদায়ক পরিস্থিতি নিরসনের কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন—"হে বৎস! তুমি কখনও অন্যের অমঙ্গল কর না। কেউ যখন অন্যকে দুঃখ দেয়, তখন সে নিজেই সেই কষ্ট ভোগ করে।"

শ্লোক ১৮

সত্যং সুরুচ্যাভিহিতং ভবান্মে
যদ্ দুর্ভগায়া উদরে গৃহীতঃ ।
স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ বিলজ্জতে যাং
ভার্যেতি বা বোঢুমিড়স্পতির্মাম্ ॥ ১৮ ॥

সত্যম্—সত্য; **সুরুচ্যা**—সুরুচির দ্বারা; **অভিহিতম্**—বর্ণিত; **ভবান্**—তোমাকে; **মে**—আমার; **যৎ**—যেহেতু; **দুর্ভগায়াঃ**—দুর্ভাগার; **উদরে**—গর্ভে; **গৃহীতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **স্তন্যেন**—স্তনের দুগ্ধের দ্বারা; **বৃদ্ধঃ চ**—বর্ধিত হয়ে; **বিলজ্জতে**—লজ্জিত হয়; **যাম্**—যাকে; **ভার্যা**—পত্নী; **ইতি**—এইভাবে; **বা**—অথবা; **বোঢুম্**—গ্রহণ করার জন্য; **ইড়ঃ-পতিঃ**—রাজা; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

সুনীতি বললেন—হে বৎস! সুরুচি যা বলেছে তা ঠিকই, কারণ তোমার পিতা রাজা আমাকে তাঁর পত্নী কেন, তাঁর দাসী বলেও মনে করেন না। আমাকে স্বীকার করতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। তাই, তুমি যে একজন দুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ এবং তার স্তন পান করে বড় হয়েছ, সেই কথা ঠিকই।

শ্লোক ১৯

আতিষ্ঠ তত্তাত বিমৎসরস্ত্ব-
মুক্তং সমাত্রাপি যদব্যলীকম্ ।
আরাধয়াধোক্ষজপাদপদ্মং
যদীচ্ছসেঽধ্যাসনমুত্তমো যথা ॥ ১৯ ॥

আতিষ্ঠ—পালন কর; **তৎ**—তা; **তাত**—হে পুত্র; **বিমৎসরঃ**—নির্মৎসর হয়ে; **ত্বম্**—তোমাকে; **উক্তম্**—বলা হয়েছে; **সমাত্রা অপি**—তোমার বিমাতার দ্বারা; **যৎ**—যা কিছু; **অব্যলীকম্**—তা সবই সত্য; **আরাধয়**—আরাধনা করতে শুরু কর; **অধোক্ষজ**—ভগবানের; **পাদ-পদ্মম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **যদি**—যদি; **ইচ্ছসে**—কামনা কর; **অধ্যাসনম্**—সঙ্গে বসার; **উত্তমঃ**—তোমার সৎভাইয়ের; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

হে বৎস! তোমার বিমাতা সুরুচি তোমাকে যা বলেছেন, তা শুনতে অত্যন্ত কটু হলেও তা সত্য। তাই, তুমি যদি তোমার সৎভাই উত্তমের মতো রাজ-সিংহাসন লাভ করতে চাও, তা হলে মাৎসর্য পরিত্যাগ করে এখনই তোমার বিমাতার আদেশ পালন করতে চেষ্টা কর। তুমি অবিলম্বে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা কর।

তাৎপর্য

সুরুচি তাঁর সতীনের পুত্রকে যে কটু কথা বলেছিলেন তা সত্য ছিল, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীবনে সাফল্য লাভ করা যায় না। মানুষ আবেদন করে, ভগবান তা অনুমোদন করেন। ধ্রুব মহারাজকে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার জন্য তাঁর সতীনের উপদেশ সম্বন্ধে ধ্রুব মহারাজের মাতা সুনীতি একমত ছিলেন। পরোক্ষভাবে, সুরুচির বাক্য ধ্রুব মহারাজের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ ছিল, কারণ তাঁর বিমাতার বাক্যে প্রভাবিত হয়ে তিনি একজন মহান ভক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং পরিচর্য বিশ্ব-
বিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ ।
অজোঽধ্যতিষ্ঠৎখলু পারমেষ্ঠ্যং
পদং জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যম্ ॥ ২০ ॥

যস্য—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি**—পাদ; **পদ্মম্**—পদ্ম; **পরিচর্য**—পূজা করে; **বিশ্ব**—ব্রহ্মাণ্ড; **বিভাবনায়**—সৃষ্টি করার জন্য; **আত্ত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **গুণ-অভিপত্তেঃ**—বাঞ্ছিত যোগ্যতা লাভ করার জন্য; **অজঃ**—জন্মরহিত (ব্রহ্মা); **অধ্যতিষ্ঠৎ**—অধিষ্ঠিত

হয়েছিলেন; **খলু**—নিঃসন্দেহে; **পারমেষ্ঠ্যম্**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ পদ; **পদম্**—পদ; **জিত-আত্ম**—যিনি তাঁর মনকে জয় করেছেন; **শসন্**—প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা; **অভিবন্দ্যম্**—পূজ্য।

অনুবাদ

সুনীতি বললেন—পরমেশ্বর ভগবান এতই মহান যে, কেবল তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আরাধনা করার দ্বারা তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃষ্টি করার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যদিও তিনি অজ এবং সমস্ত জীবদের মধ্যে প্রধান, তবুও তিনি তাঁর সেই সুমহান পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, কেবলমাত্র সেই ভগবানেরই কৃপায়, যাঁকে মহান যোগীরাও তাঁদের প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা মন সংযমের মাধ্যমে আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

সুনীতি ধ্রুব মহারাজের প্রপিতামহ ব্রহ্মার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ব্রহ্মা যদিও জীব, তবুও তাঁর তপস্যার প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার অতি উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। যে-কোন প্রচেষ্টায় সফল হতে হলে কেবল কঠোর তপস্যাই নয়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার উপরেও নির্ভর করতে হয়। ধ্রুব মহারাজের বিমাতা তাঁকে সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এবং তাঁর মাতা সুনীতি সেই কথা সমর্থন করেছেন।

শ্লোক ২১

তথা মনুর্বো ভগবান্ পিতামহো
যমেকমত্যা পুরুদক্ষিণৈর্মখৈঃ ।
ইষ্ট্বাভিপেদে দুরবাপমন্যতো
ভৌমং সুখং দিব্যমথাপবর্গ্যম্ ॥ ২১ ॥

তথা—তেমনই; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **বঃ**—তোমার; **ভগবান্**—পূজ্য; **পিতামহঃ**—পিতামহ; **যম্**—যাঁকে; **এক-মত্যা**—একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা; **পুরু**—মহান; **দক্ষিণৈঃ**—দান; **মখৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **ইষ্ট্বা**—পূজা করে; **অভিপেদে**—লাভ করেছিলেন; **দুরবাপম্**—দুষ্প্রাপ্য; **অন্যতঃ**—অন্য কোন উপায়ে; **ভৌমম্**—ভৌতিক; **সুখম্**—সুখ; **দিব্যম্**—দিব্য; **অথ**—তার পর; **আপবর্গ্যম্**—মুক্তি।

অনুবাদ

সুনীতি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন—তোমার পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু প্রচুর দানের মাধ্যমে মহান যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করে, একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ভৌতিক সুখ এবং তার পর মুক্তি লাভ করেছিলেন, যা দেবতাদের পূজা করার দ্বারা লাভ করা অসম্ভব।

তাৎপর্য

মানুষের জীবনের সাফল্য বিচার করা হয় ইহজীবনে জড় সুখ এবং পরলোকে মুক্তির মাধ্যমে। সেই সাফল্য লাভ করা যায় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার দ্বারা। *এক-মত্যা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে অবিচলিতভাবে মনকে ভগবানে একাগ্র করা। এইভাবে অবিচলিতচিত্তে ভগবানের আরাধনাকে *ভগবদ্গীতায় অনন্য-ভাক্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'অন্য কোন উপায়ে যা লাভ করা অসম্ভব।' 'অন্য উপায়' বলতে এখানে দেবতাদের আরাধনার কথা বলা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, মনুর ঐশ্বর্য লাভের কারণ ছিল ভগবানের দিব্য সেবায় তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায় যার মন বিক্ষিপ্ত, তাকে বুদ্ধিহীন বলে বিবেচনা করা হয়। কেউ যদি জড়-জাগতিক সুখও চান, তা হলে তিনি অবিচলিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে পারেন, এবং যাঁরা মুক্তি লাভের বাসনা করেন, তাঁরাও তাঁদের জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে পারেন।

শ্লোক ২২

তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং
মুমুক্ষুভির্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিম্ ।
অনন্যভাবে নিজধর্মভাবিতে
মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পূরুষম্ ॥ ২২ ॥

তম্—তাঁকে; **এব**—ও; **বৎস**—হে পুত্র; **আশ্রয়**—আশ্রয় গ্রহণ কর; **ভৃত্য-বৎসলম্**—পরমেশ্বর ভগবানের, যিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু; **মুমুক্ষুভিঃ**—মুক্তিকামীদেরও; **মৃগ্য**—অন্বেষণীয়; **পদ-অব্জ**—শ্রীপাদপদ্ম; **পদ্ধতিম্**—প্রণালী; **অনন্য-ভাবে**—অবিচলিতভাবে; **নিজ-ধর্ম-ভাবিতে**—নিজ স্বরূপে অধিষ্ঠিত

হয়ে; **মনসি**—মনকে; **অবস্থাপ্য**—স্থাপন করে; **ভজস্ব**—ভক্তি সম্পাদন করতে থাক; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

হে বৎস! তুমিও ভক্তবৎসল ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। যাঁরা সংসার-চক্র থেকে মুক্তি লাভের অন্বেষণ করেন, তাঁরাও সর্বদা ভক্তিযোগে ভগবানের চরণ-কমলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বধর্ম অনুশীলনের দ্বারা পবিত্র হয়ে, তুমি তোমার হৃদয়ে ভগবানকে স্থাপন কর এবং অবিচলিত চিত্তে তাঁর সেবায় সর্বদা যুক্ত হও।

তাৎপর্য

সুনীতি তাঁর পুত্রকে যে ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তা ভগবৎ উপলব্ধির আদর্শ বিধি। সকলেই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করে, তাঁদের নিজ-নিজ বৃত্তি সম্পাদন করতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* ভগবানও অর্জুনকে বলেছিলেন—"লড়াই করতে থাক, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে মনে রেখো।" কৃষ্ণভাবনায় সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষী প্রতিটি সৎ ব্যক্তির সেই আদর্শ হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে রানী সুনীতি তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান *ভৃত্য-বৎসল* নামে পরিচিত, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তিনি বলেছেন, "তুমি তোমার বিমাতার দ্বারা অপমানিত হয়ে, ক্রন্দন করতে করতে আমার কাছে এসেছ, কিন্তু তোমার জন্য ভাল কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তুমি যদি তাঁর কাছে যাও, তা হলে দেখবে যে, তাঁর স্নেহপূর্ণ বিনম্র ব্যবহার আমাদের মতো কোটি-কোটি মায়ের বাৎসল্যকেও অতিক্রম করে। কেউই যখন দুঃখ দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করতে পারে না, তখন কৃষ্ণই কেবল তাঁর ভক্তদের সাহায্য করতে পারেন।" সুনীতি আরও বলেছিলেন যে, ভগবানের কাছে যাওয়ার পন্থা সহজ নয়। পারমার্থিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত মহর্ষিরাও তাঁর অন্বেষণ করেন। রানী সুনীতি এও বলেছিলেন যে, ধ্রুব মহারাজ এখন একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালক, তাই কর্মকাণ্ডের দ্বারা পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর ছিল না। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা পাঁচ বছরের থেকে কম বয়সের একটি শিশুও, অথবা যে কোন বয়সের যে-কোন মানুষ পবিত্র হতে পারে। সেটি হচ্ছে ভক্তিযোগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন দেবতাদের পূজা অথবা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন না করতে, কিন্তু কেবল পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। কেউ যখন সর্বান্তঃকরণে পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে স্থাপন করেন, তখন তাঁর পক্ষে সব কিছুই সহজ এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্লোক ২৩

নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্
দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন ।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্মযা
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া ॥ ২৩ ॥

ন অন্যম্—অন্য কাউকে নয়; **ততঃ**—তাই; **পদ্ম-পলাশ-লোচনাৎ**—কমল-নয়ন ভগবান থেকে; **দুঃখ-ছিদম্**—যিনি অন্যের দুঃখ-কষ্ট অপনোদন করতে পারেন; **তে**—আপনার; **মৃগয়ামি**—আমি অন্বেষণ করছি; **কঞ্চন**—অন্য কেউ; **যঃ**—যিনি; **মৃগ্যতে**—অন্বেষণ করেন; **হস্ত-গৃহীত-পদ্ময়া**—পদ্মফুল হাতে নিয়ে; **শ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী, **ইতরৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অঙ্গ**—হে বৎস; **বিমৃগ্যমাণয়া**—আরাধ্য।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! কমল-নয়ন ভগবান ব্যতীত অন্য আর কাউকে আমি দেখি না, যিনি তোমার দুঃখ অপনোদন করতে পারেন। ব্রহ্মা আদি দেবতারা যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা অন্বেষণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও পদ্মহস্তে সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য তৎপর থাকেন।

তাৎপর্য

সুনীতি এখানে ইঙ্গিত করেছেন যে, ভগবানের কৃপা এবং অন্য দেবতাদের কৃপা সমপর্যায়ভুক্ত নয়। মূর্খ মানুষেরা বলে যে, যাঁরই পূজা করা হোক না কেন, তার ফল একই হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয় *ভগবদ্গীতায়ও* বলা হয়েছে যে, দেবতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বর ক্ষণস্থায়ী এবং তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য। অর্থাৎ, যেহেতু দেবতারা হচ্ছেন বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীব, তাই অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেও তাঁদের প্রদত্ত বর চিরস্থায়ী হতে পারে না। চিরস্থায়ী কৃপা হচ্ছে আধ্যাত্মিক, কারণ আত্মা হচ্ছে নিত্য শাশ্বত। *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে যে, যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়েছে, তারাই দেবতাদের পূজা করে। তাই সুনীতি তাঁর পুত্রকে বলেছেন যে, তিনি যেন তাঁর দুঃখ-দুর্দশা অপনোদনের জন্য দেবতাদের কৃপার অন্বেষণ না করে, সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন।

পরমেশ্বর ভগবান জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা, বিশেষ করে লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা। তাই, যাঁরা জড় ঐশ্বর্য লাভে আকাঙ্ক্ষী, তাঁরা

লক্ষ্মীদেবীর কৃপা অন্বেষণ করেন। এমন কি অতি উচ্চপদস্থ দেবতারাও লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করেন, কিন্তু মহালক্ষ্মী স্বয়ং সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পাদনের জন্য উন্মুখ থাকেন। অতএব, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই লক্ষ্মীদেবীর আশীর্বাদ লাভ করেন। যেহেতু ধ্রুব মহারাজ তাঁর বর্তমান বয়সেই জড় ঐশ্বর্যের অন্বেষণ করছিলেন, তাই তাঁর মাতা তাঁকে যথাযথভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, জড় ঐশ্বর্য লাভের জন্যও দেবতাদের পূজা না করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে।

শুদ্ধ ভক্তরা যদিও জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করেন না, তবুও *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক লাভের আশায় ভগবানের শরণাগত হন। জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হলেও, ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে তাঁর মনোভাব নির্মল হয়। এইভাবে তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, আধ্যাত্মিক জীবনের স্তরে উন্নীত হন। আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত না হলে, সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

ধ্রুব মহারাজের মাতা সুনীতি দেবী দূরদর্শী নারী ছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর পুত্রকে কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই আরাধনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এখানে ভগবানকে *পদ্ম-পলাশ-লোচন* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশ্রান্ত মানুষ যখন পদ্মফুল দর্শন করে, তখন তার সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। তেমনই, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কমল-সদৃশ পরমেশ্বর ভগবানের মুখমণ্ডল দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিরসন হয়। কমল হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেবীর হস্তধৃত প্রতীক। যাঁরা একত্রে লক্ষ্মীদেবী এবং ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁরা অবশ্যই সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যশালী, এমন কি জড়-জাগতিক জীবনেও। ভগবানকে কখনও কখনও *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্* বলে বর্ণনা করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে যে, শিব এবং ব্রহ্মাও পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন।

শ্লোক ২৪

মৈত্রেয় উবাচ

এবং সংজল্পিতং মাতুরাকর্ণ্যার্থাগমং বচঃ ।
সংনিয়ম্যাত্মনাত্মানং নিশ্চক্রাম পিতুঃ পুরাৎ ॥ ২৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এই প্রকার; **সংজল্পিতম্**—উক্তি; **মাতুঃ**—মাতার; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **অর্থ-আগমম্**—সার্থক; **বচঃ**—বাণী; **সংনিয়ম্য**—সংযত করে; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **আত্মানম্**—নিজেকে; **নিশ্চক্রাম**—বহির্গত হয়েছিলেন; **পিতুঃ**—পিতার; **পুরাৎ**—গৃহ থেকে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব মহারাজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁর মাতা সুনীতি তাঁকে সেই উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই, সেই সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করে এবং বুদ্ধির দ্বারা সংকল্প স্থির করে, তিনি তাঁর পিতার গৃহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের বিমাতা ধ্রুব মহারাজকে অপমান করায় এবং তাঁর পিতা সেই বিষয়ে সংশোধনের কোন চেষ্টা না করায়, ধ্রুব মহারাজ এবং তাঁর মাতা উভয়েই শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু কেবল শোক করা নিরর্থক—শোক নিরসনের উপায় অন্বেষণ করা কর্তব্য। তাই মাতা এবং পুত্র উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার সংকল্প করেছিলেন, কারণ সেটিই কেবল সমস্ত জড়-জাগতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ধ্রুব মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের অন্বেষণে, তাঁর পিতার রাজধানী পরিত্যাগ করে এক নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজও উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি মনের শান্তির অন্বেষণ করেন, তা হলে তাঁকে সংসার জীবনের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, বনে গিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে এই বন হচ্ছে বৃন্দার বন বা বৃন্দাবন। কেউ যদি বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর আশ্রয়ে বৃন্দাবনের শরণ গ্রহণ করেন, তা হলে নিশ্চিতভাবে অনায়াসে তাঁর জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

শ্লোক ২৫

নারদস্তদুপাকর্ণ্য জ্ঞাত্বা তস্য চিকীর্ষিতম্ ।
স্পৃষ্ট্বা মূর্ধন্যঘঘ্নেন পাণিনা প্রাহ বিস্মিতঃ ॥ ২৫ ॥

নারদঃ—মহর্ষি নারদ; **তৎ**—তা; **উপাকর্ণ্য**—শুনে; **জ্ঞাত্বা**—এবং জেনে; **তস্য**—তাঁর (ধ্রুব মহারাজের); **চিকীর্ষিতম্**—কার্যকলাপ; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করে; **মূর্ধনি**—

মস্তকে; **অঘ-ঘ্নেন**—সমস্ত পাপ দূরকারী; **পাণিনা**—হস্তের দ্বারা; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি নারদ সেই সংবাদ শুনেছিলেন, এবং ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে, তিনি বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। তিনি ধ্রুবের কাছে গিয়ে তাঁর পবিত্র হস্তের দ্বারা তাঁর মস্তক স্পর্শ করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর মাতা সুনীতির কাছে রাজপ্রাসাদের সমস্ত ঘটনা বলছিলেন, তখন নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে, নারদ মুনি কিভাবে সেই বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। তার উত্তর হচ্ছে যে, নারদ মুনি হচ্ছেন *ত্রিকালজ্ঞ*; তিনি এতই শক্তিশালী যে, ঠিক পরমাত্মার মতো তিনি সকলের হৃদয়ের অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তাই ধ্রুব মহারাজের দৃঢ় সংকল্পের কথা অবগত হয়ে, নারদ মুনি তাঁকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলেন। এই বিষয়ের বিশ্লেষণ এইভাবে করা যায়—পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং যখনই তিনি বুঝতে পারেন যে, কোন জীব ভগবদ্ভক্তির মার্গে প্রবেশ করার জন্য নিষ্ঠাপরায়ণ, তখন তিনি তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দেন। সেইভাবে ভগবান নারদ মুনিকে ধ্রুব মহারাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেই কথা *চৈতন্য-চরিতামৃতে* বর্ণিত হয়েছে—*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*—গুরুদেব এবং কৃষ্ণের কৃপায় ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ করা যায়। ধ্রুব মহারাজের দৃঢ় সংকল্পের জন্য ভগবান তাঁর প্রতিনিধি নারদ মুনিকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য।

শ্লোক ২৬

অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃষ্যতাম্ ।
বালোঽপ্যয়ং হৃদা ধত্তে যৎসমাতুরসদ্বচঃ ॥ ২৬ ॥

অহো—কী আশ্চর্য; **তেজঃ**—শক্তি; **ক্ষত্রিয়াণাম্**—ক্ষত্রিয়দের; **মান-ভঙ্গম্**—সম্মানহানি; **অমৃষ্যতাম্**—সহ্য করতে অক্ষম; **বালঃ**—শিশু; **অপি**—সত্ত্বেও; **অয়ম্**—

এই; **হৃদা**—হৃদয়ে; **ধত্তে**—ধারণ করেছে; **যৎ**—যা; **স-মাতুঃ**—বিমাতার; **অসৎ**—অপ্রীতিকর; **বচঃ**—বাণী।

অনুবাদ

আহা! ক্ষত্রিয়দের তেজ কী অদ্ভুত! তাঁরা তাঁদের সম্মানের স্বল্প হানিও সহ্য করতে পারেন না। অনুমান করে দেখুন! এই বালকটি একটি ছোট শিশু, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বিমাতার দুরুক্তি তার কাছে অসহ্য হয়েছে।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয়দের গুণের বর্ণনা *ভগবদ্গীতায়* দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দুটি প্রধান গুণ হচ্ছে আত্মসম্মান এবং যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া। এখানে প্রতীত হয় যে, ধ্রুব মহারাজের শরীরে ক্ষত্রিয়ের রক্ত স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। যদি পরিবারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সংস্কৃতির পালন হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সেই বংশের সন্তান-সন্ততিরা সেই বিশেষ বর্ণের গুণাবলী অর্জন করবে। তাই বৈদিক পদ্ধতিতে সংস্কারের পন্থা বা পবিত্রীকরণের পন্থা অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে পালন করা হয়। কেউ যদি পরিবারে প্রচলিত পবিত্রীকরণের পন্থা অনুশীলন না করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ নিম্নস্তরের জীবনে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ২৭

নারদ উবাচ

নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানং বাপি পুত্রক ।
লক্ষয়ামঃ কুমারস্য সক্তস্য ক্রীড়নাদিষু ॥ ২৭ ॥

নারদঃ উবাচ—মহর্ষি নারদ বললেন; **ন**—না; **অধুনা**—এখন; **অপি**—যদিও; **অবমানম্**—অপমান; **তে**—তোমাকে; **সম্মানম্**—শ্রদ্ধা নিবেদন; **বা**—অথবা; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **পুত্রক**—হে বৎস; **লক্ষয়ামঃ**—আমি দেখতে পাচ্ছি; **কুমারস্য**—তোমার মতো বালকের; **সক্তস্য**—আসক্ত হয়ে; **ক্রীড়ন-আদিষু**—খেলাধুলায়।

অনুবাদ

মহর্ষি নারদ ধ্রুবকে বললেন—হে বৎস! তুমি একটি বালক মাত্র, যার এখন খেলাধুলায় আসক্ত থাকার কথা। তোমার সম্মান হানিকর কথায় তুমি এইভাবে বিচলিত হচ্ছ কেন?

তাৎপর্য

সাধারণত যখন কোন শিশুকে দুষ্ট বা মূর্খ বলে তিরস্কার করা হয়, তখন সেই অসম্মানজনক শব্দের গুরুত্ব না দিয়ে সে হাসে। তেমনই, যদি তার প্রতি সম্মানসূচক শব্দ নিবেদন করা হয়, তা হলেও সে তার তেমন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজেব ক্ষেত্রে, ক্ষত্রিয়-তেজ এতই প্রবল ছিল যে, তাঁর ক্ষত্রিয়-সম্মানে আঘাতকারী বিমাতার স্বল্প অপমানও তিনি সহ্য করতে পারেননি।

শ্লোক ২৮

বিকল্পে বিদ্যমানেঽপি ন হ্যসন্তোষহেতবঃ ।
পুংসো মোহমৃতে ভিন্না যল্লোকে নিজকর্মভিঃ ॥ ২৮ ॥

বিকল্পে—অন্য উপায়; **বিদ্যমানে অপি**—থাকা সত্ত্বেও; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অসন্তোষ**—অপ্রসন্নতা; **হেতবঃ**—কারণ; **পুংসঃ**—ব্যক্তির; **মোহম্ ঋতে**—মোহিত না হয়ে; **ভিন্নাঃ**—পৃথক; **যৎ লোকে**—এই পৃথিবীতে; **নিজ-কর্মভিঃ**—তার নিজের কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! তুমি যদি মনে কর যে, তোমার আত্ম-সম্মানের হানি হয়েছে, তা হলেও তোমার অসন্তোষের কোন কারণ নেই। এই প্রকার অসন্তোষ মায়ারই আর একটি লক্ষণ; প্রতিটি জীবই তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং তাই সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে, জীব কখনই জড়-জাগতিক সঙ্গের দ্বারা কলুষিত হয় না অথবা প্রভাবিত হয় না। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেউ যখন বুঝতে পারে যে, জীবাত্মারূপে সুখ অথবা দুঃখের প্রতি তার কোন রকম প্রবণতা নেই, তখন তাকে মুক্ত পুরুষ বলে বিবেচনা করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ব্রহ্ম-ভূতঃ প্রসন্নাত্মা*—কেউ যখন চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, তখন তাঁর অনুশোচনা করার এবং আকাঙ্ক্ষা করার কিছু থাকে না। নারদ ঋষি প্রথমে ধ্রুব মহারাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন একটি শিশু; তাই অপমানজনক অথবা সম্মান-হানিকারক বাক্যে

এইভাবে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। আর তাঁর চিন্তাধারা যদি এতই বিকশিত হয়ে থাকে যে, তিনি মান এবং অপমান সম্বন্ধে বুঝতে পারেন, তা হলে সেই জ্ঞান তাঁর নিজের জীবনে প্রয়োগ করা উচিত, তাঁর বোঝা উচিত যে, মান এবং অপমান উভয়ই পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে নির্ধারিত হয়; অতএব কোন অবস্থাতেই দুঃখিত বা প্রসন্ন হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৯

পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পূরুষঃ ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥ ২৯ ॥

পরিতুষ্যেৎ—প্রসন্ন হওয়া উচিত; **ততঃ**—অতএব; **তাত**—হে বৎস, **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **মাত্রেণ**—গুণ; **পূরুষ**—ব্যক্তি; **দৈব**—নিয়তি; **উপসাদিতম্**—প্রদত্ত; **যাবৎ**—যেমন; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ঈশ্বর-গতিম্**—ভগবানের প্রদর্শিত পন্থা; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের গতিবিধি অত্যন্ত বিচিত্র। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য সেই পন্থা অবলম্বন করে, অনুকূল বা প্রতিকূলতার বিচার না করে, সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করে সন্তুষ্ট থাকা।

তাৎপর্য

মহর্ষি নারদ ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সমস্ত পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যারা বুদ্ধিমান তাদের জানা উচিত যে, দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আমাদের এই সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়। যিনি দেহাত্মবুদ্ধির অতীত চিন্ময় চেতনায় অবস্থিত, তিনিই বুদ্ধিমান ভগবদ্ভক্ত সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। ভক্ত যখন দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হন, তখন তিনি তা ভগবানের কৃপা বলে মনে করে, তাঁর দেহ, মন এবং বুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে বার বার প্রণতি নিবেদন করেন। অতএব, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে সর্বদা প্রসন্ন থাকা।

শ্লোক ৩০

অথ মাত্রোপদিষ্টেন যোগেনাবরুরুৎসসি ।
যৎপ্রসাদং স বৈ পুংসাং দুরারাধ্যো মতো মম ॥ ৩০ ॥

অথ—অতএব; **মাত্রা**—মাতার দ্বারা; **উপদিষ্টেন**—উপদিষ্ট হয়ে; **যোগেন**—যোগ সমাধির দ্বারা; **অবরুরুৎসসি**—উন্নতি সাধন করতে চাও; **যৎ-প্রসাদম্**—যাঁর কৃপায়; **সঃ**—তা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **পুংসাম্**—জীবের; **দুরারাধ্যঃ**—অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন; **মতঃ**—মত; **মম**—আমার।

অনুবাদ

তুমি তোমার মাতার উপদেশ অনুসারে, ভগবানের কৃপা লাভের জন্য, ধ্যান-যোগের পন্থা অবলম্বন করতে মনস্থ করেছ, কিন্তু আমার মতে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই প্রকার তপশ্চর্যা সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের পন্থা যুগপৎ অত্যন্ত কঠিন এবং অত্যন্ত সরল। পরম গুরু নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ব্যাপারে তিনি কতটা বদ্ধপরিকর ছিলেন। শিষ্য গ্রহণের এটিই হচ্ছে বিধি। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে মহর্ষি নারদ ধ্রুব মহারাজের কাছে এসেছিলেন তাঁকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য, তবুও তিনি ধ্রুব মহারাজকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন, সেই পন্থা অনুশীলনে তাঁর সংকল্প কতটা দৃঢ় ছিল। কিন্তু, এও সত্য যে, নিষ্ঠাবান ব্যক্তির পক্ষে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অত্যন্ত সরল। কিন্তু যারা নিষ্ঠাপরায়ণ এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ নয়, তাদের পক্ষে এই পন্থা অত্যন্ত কঠিন ।

শ্লোক ৩১

মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনোরুজন্মভিঃ ।
ন বিদুর্মৃগয়ন্তোঽপি তীব্রযোগসমাধিনা ॥ ৩১ ॥

মুনয়ঃ—মহর্ষি; **পদবীম্**—পন্থা; **যস্য**—যার; **নিঃসঙ্গেন**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **উরু-জন্মভিঃ**—বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর; **ন**—কখনই না; **বিদুঃ**—জেনে রেখো; **মৃগয়ন্তঃ**—অন্বেষণ করে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **তীব্র-যোগ**—কঠোর তপস্যা; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—সমস্ত জড় কলুষ-রহিত হয়ে, বহু তপস্যা করে এবং নিরন্তর সমাধিমগ্ন হয়ে, বহু যোগী জন্ম-জন্মান্তর ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভগবানকে উপলব্ধি করার পথ খুঁজে পাননি।

শ্লোক ৩২

অতো নিবর্ততামেষ নির্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ ।
যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে ॥ ৩২ ॥

অতঃ—সেই হেতু, **নিবর্ততাম্**—নিবৃত্ত হও; **এষঃ**—এই; **নির্বন্ধঃ**—সংকল্প; **তব**—তোমার; **নিষ্ফলঃ**—বৃথা; **যতিষ্যতি**—ভবিষ্যতে তুমি চেষ্টা কর; **ভবান্**—স্বয়ং; **কালে**—যথা সময়ে; **শ্রেয়সাম্**—সুযোগ; **সমুপস্থিতে**—উপস্থিত হলে।

অনুবাদ

অতএব, হে বৎস! এই বৃথা প্রচেষ্টা থেকে তুমি নিবৃত্ত হও; এই কাজ সফল হবে না। তোমার পক্ষে এখন গৃহে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়স্কর হবে। যখন তুমি বড় হবে, তখন ভগবানের কৃপায় তুমি এই যোগ অনুশীলনের সুযোগ পাবে। তখন তুমি এই কার্য সম্পাদন কর।

তাৎপর্য

সাধারণত যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর জীবনের অন্তে পারমার্থিক সিদ্ধির পন্থা অবলম্বন করেন। তাই, বৈদিক প্রথা অনুসারে জীবন চারটি স্তরে বিভক্ত। প্রথমে ব্রহ্মচারীরূপে শিক্ষার্থী সদ্গুরুর প্রামাণিক তত্ত্বাবধানে বৈদিক জ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তার পর তিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে বৈদিক পন্থা অনুসারে গৃহস্থের কর্তব্য সম্পাদন করেন। তার পর গৃহস্থ বানপ্রস্থ হন, এবং ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন।

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, শৈশব জীবনে খেলাধুলায় মত্ত থাকার সময়, যৌবনে যুবতী রমণীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করার সময়, এবং বার্ধক্যে বা মৃত্যুর সময়ে, ভগবদ্ভক্তি বা যোগ সাধন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিষ্ঠাবান ভক্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ধ্রুব মহারাজকে মহর্ষি নারদ এই উপদেশ দিয়েছিলেন কেবল তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যক্ষ উপদেশ হচ্ছে জীবনের যে-কোন সময় থেকেই ভগবদ্ভক্তি শুরু করা উচিত। কিন্তু গুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে শিষ্যের ঐকান্তিক বাসনা পরীক্ষা করে দেখা। তার পর তাকে দীক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

শ্লোক ৩৩

যস্য যদ্ দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ ।
আত্মানং তোষয়ন্দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

যস্য—যে-কেউ; **যৎ**—যা-কিছু; **দৈব**—নিয়তির দ্বারা; **বিহিতম্**—নির্ধারিত; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **তেন**—তার দ্বারা; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ অথবা দুঃখ; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **তোষয়ন্**—সন্তুষ্ট হয়ে; **দেহী**—দেহস্থ আত্মা; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পারম্**—পরপারে; **ঋচ্ছতি**—উত্তীর্ণ হয়।

অনুবাদ

জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই, তা দুঃখদায়ক হোক অথবা সুখদায়ক হোক, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা প্রদত্ত বলে জেনে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এইভাবে যে-ব্যক্তি সহিষ্ণু হয়, সে অনায়াসে অজ্ঞানতার অন্ধকার অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

তাৎপর্য

পাপ ও পুণ্যময় সকাম কর্ম নিয়ে জড় অস্তিত্ব বিদ্যমান। মানুষ যতক্ষণ ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ এই জড় জগতের সুখ-দুঃখই হবে তার পরিণাম। আমরা যখন তথাকথিত জড়-জাগতিক সুখে জীবন উপভোগ করি, তখন বুঝতে হবে যে, আমাদের পুণ্যকর্মের ফল ক্ষয় হচ্ছে। আর যখন আমরা দুঃখভোগ করি, তখন বুঝতে হবে যে, আমাদের পাপকর্মের ফল ক্ষয় হচ্ছে। পাপ অথবা পুণ্যকর্মজনিত সুখ-দুঃখের প্রতি আসক্ত না হয়ে, আমরা যদি অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাই, তা হলে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, তা ভগবানের ইচ্ছা বলে স্বীকার করে নিতে হবে। এইভাবে আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, তা হলে আমরা এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব।

শ্লোক ৩৪

গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ ।
মৈত্রীং সমানাদন্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে ॥ ৩৪ ॥

গুণ-অধিকাৎ—যিনি অধিক গুণবান; **মুদম্**—আনন্দ; **লিপ্সেৎ**—অনুভব করা উচিত; **অনুক্রোশম্**—দয়া; **গুণ-অধমাৎ**—কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তি; **মৈত্রীম্**—বন্ধুত্ব; **সমানাৎ**—সমান গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি; **অন্বিচ্ছেৎ**—ইচ্ছা করা উচিত; **ন**—না; **তাপৈঃ**—ক্লেশের দ্বারা; **অভিভূয়তে**—অভিভূত হন।

অনুবাদ

সকলেরই কর্তব্য নিজের থেকে অধিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া; নিজের থেকে কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে দর্শন করে তার প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া; এবং নিজের সমান গুণযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা। তা হলে এই জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ কখনই তাকে অভিভূত করতে পারবে না।

তাৎপর্য

সাধারণত আমরা যখন আমাদের থেকে অধিক গুণসম্পন্ন কাউকে দেখি, তখন আমরা তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হই; যখন আমরা আমাদের থেকে কম গুণসম্পন্ন কাউকে দেখি, তখন তাকে অবজ্ঞা করি; এবং যখন আমরা আমাদের সমান গুণসম্পন্ন কাউকে দেখি, তখন আমরা আমাদের কার্যকলাপের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হই। এটি হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। তাই মহর্ষি নারদ ভক্তদের আদর্শ আচরণের উপদেশ দিয়েছেন। অধিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে, প্রীতিপূর্বক তাঁকে স্বাগত জানানো উচিত। কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি পীড়াদায়ক না হয়ে, তাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া উচিত যাতে তারা উপযুক্ত স্তরে উন্নীত হতে পারে। আর সমগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, তাঁদের সম্মুখে নিজের কার্যকলাপের জন্য গর্বিত না হয়ে, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করা উচিত। কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত সাধারণ মানুষদের প্রতি সকলেরই কর্তব্য কৃপাপরায়ণ হওয়া। এইভাবে আচরণ করলে, মানুষ এই জগতে সুখী হতে পারবে।

শ্লোক ৩৫

ধ্রুব উবাচ

সোঽয়ং শমো ভগবতা সুখদুঃখহতাত্মনাম্ ।
দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসাং দুর্দর্শোঽস্মদ্বিধৈস্তু যঃ ॥ ৩৫ ॥

ধ্রুবঃ উবাচ—ধ্রুব মহারাজ বললেন; **সঃ**—তা; **অয়ম্**—এই; **শমঃ**—মনের সাম্য; **ভগবতা**—আপনার দ্বারা; **সুখ-দুঃখ**—সুখ এবং দুঃখ; **হত-আত্মনাম্**—যারা প্রভাবিত হয়েছে; **দর্শিতঃ**—প্রদর্শিত; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **পুংসাম্**—মানুষদের; **দুর্দর্শঃ**—দর্শন করা অত্যন্ত কঠিন; **অস্মৎ-বিধৈঃ**—আমাদের মতো ব্যক্তিদের দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **যঃ**—আপনি যা কিছু বলেছেন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ বললেন—হে নারদ ঋষি! যাদের হৃদয় জড় জগতের সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত, তাদের মনের শান্তি লাভের জন্য আপনি কৃপাপূর্বক যে উপদেশ দিয়েছেন, তা অবশ্যই অত্যন্ত মঙ্গলজনক। কিন্তু আমি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং তাই এই প্রকার দর্শন আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণীব মানুষকে বলা হয় *অকামী*, অর্থাৎ যাদের কোন রকম জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা নেই। জড়-জাগতিক হোক বা আধ্যাত্মিক হোক, বাসনা অবশ্যই থাকবে। মানুষ যখন তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন জড় বাসনার উদয় হয়। যিনি পবমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, তাঁর বাসনা চিন্ময়। মহাত্মা নারদের উপদেশ ধ্রুব মহারাজ গ্রহণ করেননি, কারণ সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা নিরস্ত করার এই উপদেশ পালনে, তিনি নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু, এই কথা সত্য নয় যে, যাদের জড় বাসনা রয়েছে তারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে পারবে না। ধ্রুব মহারাজেব জীবন কাহিনীর এইটি হচ্ছে মূল শিক্ষা। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তাঁব হৃদয় জড় বাসনায় পূর্ণ। তিনি তাঁর বিমাতার দুরুক্তির দ্বারা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন, কিন্তু যাঁরা পারমার্থিক মার্গে উন্নত, তাঁরা কখনও কারও নিন্দা অথবা স্তুতির পরোয়া করেন না।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত, তাঁরা জড় জগতের দ্বৈতভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখের অতীত নন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, নারদ মুনির উপদেশ ছিল অত্যন্ত মূল্যবান, তবুও তিনি তা গ্রহণ করতে পারেননি। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, জড় বাসনাগ্রস্ত ব্যক্তিরা ভগবানের পূজা করা যোগ্য কি না। তার উত্তর হচ্ছে যে, সকলেই ভগবানের পূজা করার যোগ্য। কারও যদি জড়-জাগতিক বহু কামনা-বাসনা থেকেও থাকে, তা হলেও তার উচিত

ভক্তিসহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা, যিনি কৃপাপূর্বক সকলের বাসনা পূর্ণ করেন। এই বর্ণনা থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা থেকে কেউ বঞ্চিত নয়, তার হৃদয়ে যতই কামনা-বাসনা থাকুক না কেন।

শ্লোক ৩৬

অথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ।
সুরুচ্যা দুর্বচোবাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি ॥ ৩৬ ॥

অথ অপি—অতএব; **মে**—আমার; **অবিনীতস্য**—বিনীত নয়; **ক্ষাত্রম্**—ক্ষত্রিয় ভাব; **ঘোরম্**—অসহিষ্ণু; **উপেয়ুষঃ**—প্রাপ্ত; **সুরুচ্যাঃ**—রানী সুরুচির; **দুর্বচঃ**—দুরুক্তি; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **ন**—না; **ভিন্নে**—বিদ্ধ হয়ে; **শ্রয়তে**—বিরাজমান; **হৃদি**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আমি অত্যন্ত দুর্বিনীত, তাই আপনার উপদেশ গ্রহণ করছি না, কিন্তু এটি আমার দোষ নয়। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে, আমি এমন হয়েছি। আমার বিমাতা সুরুচি তাঁর দুরুক্তিরূপ বাণের দ্বারা আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছেন, তাই আপনার মূল্যবান উপদেশ আমার হৃদয়ে স্থান পাচ্ছে না।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, হৃদয় বা মন ঠিক একটি মাটির পাত্রের মতো; একবার তা ভেঙ্গে গেলে, তাকে আর কোন উপায়েই সারানো যায় না। ধ্রুব মহারাজ নারদ মুনিকে এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর বিমাতার দুরুক্তিরূপ বাণের দ্বারা তাঁর হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় তা এমনই মর্মাহত হয়েছে যে, সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা ছাড়া আর কোন কিছুতে তাঁর রুচি নেই। তাঁর বিমাতা তাঁকে বলেছিলেন যে, যেহেতু মহারাজ উত্তানপাদের অবহেলিত রানী সুনীতির গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাই ধ্রুব মহারাজ রাজসিংহাসনে অথবা তাঁর পিতার কোলে বসার উপযুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ, তাঁর বিমাতার মত অনুসারে, তিনি রাজা হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। তাই ধ্রুব মহারাজ দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার পদ থেকেও উচ্চতর লোকের রাজা হওয়ার সংকল্প করেছিলেন।

ধ্রুব মহারাজ পরোক্ষভাবে মহর্ষি নারদকে জানিয়েছিলেন যে, চার প্রকার মানবোচিত মনোভাব রয়েছে—ব্রাহ্মণোচিত মনোভাব, ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব,

বৈশ্যোচিত মনোভাব এবং শূদ্রোচিত মনোভাব। এক বর্ণের মনোভাব অন্য বর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারদ মুনি যে দার্শনিক মনোভাবের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ব্রাহ্মণের উপযুক্ত হলেও ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত নয়। ধ্রুব মহারাজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত বিনয়ের অভাব ছিল, এবং তাই তিনি নারদ মুনির দর্শন স্বীকার করতে অক্ষম ছিলেন।

ধ্রুব মহাবাজের উক্তিটি ইঙ্গিত করে যে, শিশুকে যদি তার প্রবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা না দেওয়া হয়, তা হলে তার পক্ষে কোন বিশেষ মনোভাব বিকশিত করা সম্ভব নয়। গুরুদেব বা শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে, বিশেষ বালকের মনোবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে তাকে বিশেষ বৃত্তি অনুসারে শিক্ষাদান করা। ধ্রুব মহারাজ ইতিমধ্যেই ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব অনুসারে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, এবং তাঁর পক্ষে ব্রহ্মণ্য দর্শন গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আমেরিকায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাবের বৈষম্যের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আমাদেব রয়েছে। যে-সমস্ত আমেরিকান বালকেরা শূদ্রোচিত শিক্ষালাভ করেছে, তারা রণভূমিতে যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়। তাই, যখন তাদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করাব জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, কাবণ তাদের মনোভাব ক্ষত্রিয়োচিত নয়। সমাজে এটিই হচ্ছে মহা অসন্তোষের কারণ।

বালকদের ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব না থাকার অর্থ এই নয় যে, তারা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে শিক্ষিত হয়েছে; তাদের শূদ্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এবং তার ফলে নিরাশ হয়ে তারা হিপি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, তারা শূদ্রত্বের সর্ব নিম্নস্তরে অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী লাভের শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বার সকলেরই জন্য খোলা রয়েছে, তাই সকলেই ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে পারে। বর্তমান সময়ে এটি সব চাইতে বড় প্রয়োজন, কারণ এখন প্রকৃতপক্ষে কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নেই, কেবল রয়েছে কিছু বৈশ্য আর অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে সমাজকে বিভক্ত করার পন্থাটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। মানব সমাজরূপ শরীরে ব্রাহ্মণরা হচ্ছেন মাথা, ক্ষত্রিয়রা বাহু, বৈশ্যরা উদর এবং শূদ্ররা পা। বর্তমান সময়ে সেই শরীরটিতে পা রয়েছে আর উদর রয়েছে, কিন্তু তাতে মাথা নেই অথবা বাহু নেই, এবং তাই এই সমাজের সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গেছে। এই অধঃপতিত মানব-সমাজকে আধ্যাত্মিক চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার জন্য ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

শ্লোক ৩৭

পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে ।
ব্রূহ্যস্মৎপিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্ ॥ ৩৭ ॥

পদম্—পদ; **ত্রি-ভুবন**—ত্রিলোক; **উৎকৃষ্টম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ, **জিগীষোঃ**—আকাঙ্ক্ষী; **সাধু**—সৎ, **বর্ত্ম**—পথ; **মে**—আমাকে; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **অস্মৎ**—আমাদের; **পিতৃভিঃ**—পিতা, পিতামহ আদি পূর্বপুরুষদের দ্বারা; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অপি**—সত্ত্বেও; **অনধিষ্ঠিতম্**—লাভ করতে পারিনি।

অনুবাদ

হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ! আমি এমনই একটি পদ অধিকার করতে চাই, যা আজ পর্যন্ত এই ত্রিভুবনের কেউ লাভ করতে পারেননি, এমন কি আমার পিতা এবং পিতামহও পারেননি। আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করতে চান, তা হলে দয়া করে আপনি আমাকে সেই সৎ পন্থা প্রদর্শন করুন, যা অনুসরণ করে আমি আমার জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারব।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন নারদ মুনির সেই ব্রাহ্মণোচিত উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, তা হলে তিনি কি ধরনের উপদেশ চেয়েছিলেন। তাই নারদ মুনির জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই, ধ্রুব মহারাজ তাঁর আন্তরিক বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর পিতা অবশ্য ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, আর তাঁর প্রপিতামহ ব্রহ্মা ছিলেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতা এবং প্রপিতামহের থেকেও শ্রেষ্ঠ রাজ্য লাভ করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তিনি এমন একটি রাজ্য চান যার প্রতিযোগী ত্রিভুবনে কেউ নেই। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন ব্রহ্মা, এবং ধ্রুব মহারাজ তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করতে চেয়েছিলেন। তিনি নারদ মুনির উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত নারদ মুনি যদি তাঁকে আশীর্বাদ করেন অথবা তাঁকে পথ-প্রদর্শন করেন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে এই ত্রিভুবনের যে-কোন ব্যক্তির থেকে উচ্চতর পদ লাভ করতে সক্ষম হবেন। তাই সেই পদ লাভের জন্য তিনি নারদ মুনির সাহায্য চেয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ ব্রহ্মার থেকেও মহৎ পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, তা ছিল একটি অসম্ভব প্রস্তাব, কিন্তু ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে ভক্ত অসম্ভবকেও লাভ করতে পারেন।

এখানে একটি বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে যে, ধ্রুব মহারাজ যেন-তেন প্রকারেণ সেই উচ্চ পদ লাভ করতে চেয়েছিলেন তা নয়, বরং সৎ উপায়ে তিনি তা লাভ করতে চেয়েছিলেন। এটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁকে সেই পদ প্রদান করেন, তা হলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। সেটি হচ্ছে ভক্তের স্বভাব। তিনি জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা কবতে পারেন, কিন্তু তিনি তখনই তা স্বীকার করেন, যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তা দান করেন। ধ্রুব মহারাজ নারদ মুনির উপদেশ প্রত্যাখ্যান করাব ফলে দুঃখ অনুভব করেছিলেন; তাই তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে সেই পথ-প্রদর্শন করেন, যার দ্বারা তিনি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পাবেন।

শ্লোক ৩৮

নূনং ভবান্ ভগবতো যোঽঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
বিতুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোঽর্কবৎ ॥ ৩৮ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **ভবান্**—আপনি; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **যঃ**—যা; **অঙ্গ-জঃ**—দেহ থেকে জাত; **পরমেষ্ঠিনঃ**—ব্রহ্মা; **বিতুদন্**—বাজিয়ে; **অটতে**—সর্বত্র ভ্রমণ করেন; **বীণাম্**—বীণা; **হিতায়**—মঙ্গলের জন্য; **জগতঃ**—সারা জগতের; **অর্ক-বৎ**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

হে ভগবন্। আপনি ব্রহ্মার যোগ্য পুত্র, এবং আপনি সারা জগতের মঙ্গলের জন্য বীণা বাজিয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। আপনি ঠিক সূর্যের মতো, যে সূর্য সমস্ত জীবের উপকারের জন্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে আবর্তন করে।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ একটি ছোট বালক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, তিনি যেন এমন একটি রাজ্য লাভের বর প্রাপ্ত হন, যার ঐশ্বর্য তাঁর পিতা এবং পিতামহের ঐশ্বর্য থেকেও অধিক হবে। তিনি নাবদ মুনির মতো একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করায় তাঁর আনন্দ ব্যক্ত করেছেন, যাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সূর্যের মতো সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করে, সারা জগতের মানুষদেব কল্যাণ সাধন করা। সারা জগতের মানুষদের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার করার উদ্দেশ্যে, নারদ মুনি সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করেন। তাই ধ্রুব মহারাজ পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, নারদ মুনি তাঁর বাসনা পূর্ণ করতে পারেন, যদিও তাঁর সেই বাসনাটি ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

এখানে সূর্যের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূর্য এতই কৃপাময় যে, তিনি কোন ভেদভাব না করে তাঁর কিরণ সর্বত্র বিতরণ করেন। ধ্রুব মহারাজ তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হওয়ার জন্য নারদ মুনিকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, নারদ মুনি সমস্ত বদ্ধ জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিচরণ করেন। তিনি অনুরোধ করেছিলেন, নারদ মুনি যেন তাঁর বিশেষ বাসনা পূর্ণ করে তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। ধ্রুব মহারাজ তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গৃহ এবং প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যুদাহৃতমাকর্ণ্য ভগবান্নারদস্তদা ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তং বালং সদ্বাক্যমনুকম্পয়া ॥ ৩৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদাহৃতম্**—কথিত হয়ে; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **ভগবান্ নারদঃ**—মহাত্মা নারদ; **তদা**—তখন; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **বালম্**—বালক; **সৎ-বাক্যম্**—সৎ উপদেশ; **অনুকম্পয়া**—কৃপাপরায়ণ হয়ে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—ধ্রুব মহারাজের উক্তি শ্রবণ করে মহাত্মা নারদ মুনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু মহর্ষি নারদ হচ্ছেন সর্বাগ্রগণ্য গুরু, তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর একমাত্র কার্য হচ্ছে যার সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তারই পরম উপকার করা। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একটি শিশু, এবং তাই তাঁর চাওয়াও ছিল একটি ক্রীড়াশীল শিশুর মতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মহান ঋষি তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়েছিলেন, এবং তাঁর মঙ্গলের জন্য তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৪০

নারদ উবাচ

জনন্যাভিহিতঃ পন্থাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্য তে ।
ভগবান্ বাসুদেবস্তং ভজ তং প্রবণাত্মনা ॥ ৪০ ॥

নারদঃ উবাচ—মহর্ষি নারদ বললেন; **জনন্যা**—তোমার মাতার দ্বারা; **অভিহিতঃ**—কথিত; **পন্থাঃ**—পথ; **সঃ**—তা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **নিঃশ্রেয়সস্য**—জীবনের পরম লক্ষ্য; **তে**—তোমার জন্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **তম্**—তাঁকে; **ভজ**—সেবা কর; **তম্**—তাঁর দ্বারা; **প্রবণ-আত্মনা**—তোমার মনে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি নারদ ধ্রুব মহারাজকে বললেন—তোমার মা সুনীতি তোমাকে যে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন, তা তোমার জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত। তাই তোমার উচিত ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে মগ্ন হওয়া।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠতর ধাম প্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার পদ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের মধ্যে প্রধান, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠতর রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তাই কোন দেবতার পূজার দ্বারা তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ হওয়ার ছিল না। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেবতাদের প্রদত্ত বর ক্ষণস্থায়ী। তাই ধ্রুব মহারাজকে তাঁর মায়ের উপদেশ অনুসারে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার পন্থা অনুসরণ করতে নারদ মুনি বলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন কিছু দান করেন, তা ভক্তের আশার অতীত। সুনীতি এবং নারদ মুনি উভয়েই জানতেন যে, ধ্রুব মহারাজের চাহিদা পূর্ণ করা কোন দেবতার পক্ষে সম্ভব ছিল না, এবং তাই তাঁরা উভয়েই তাঁকে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

নারদ মুনিকে এখানে *ভগবান্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তিনি ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের মতো যে কোন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করতে পারেন। তিনি ধ্রুব মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তিনি নিজেই তৎক্ষণাৎ তাঁর মনোবাঞ্ছা সবই পূর্ণ করতে পারতেন, কিন্তু সেটি গুরুদেবের কর্তব্য নয়। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে শাস্ত্রানুমোদিত রীতি অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করা। একইভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, এবং যদিও তিনি তাঁকে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ না করেই জয়লাভের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন, তবুও তিনি তা করেননি; পক্ষান্তরে, তিনি অর্জুনকে যুদ্ধ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তেমনই, ধ্রুব মহারাজকে তাঁর ঈপ্সিত ফল লাভ করার জন্য নারদ মুনি তাঁকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪১

ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ।
একং হ্যেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্ ॥ ৪১ ॥

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—ধর্ম আচরণ, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং মুক্তি এই চতুর্বর্গ; **আখ্যম্**—নামক; **যঃ**—যিনি; **ইচ্ছেৎ**—ইচ্ছা করেন; **শ্রেয়ঃ**—জীবনের উদ্দেশ্য; **আত্মনঃ**—আত্মার; **একম্ হি এব**—একমাত্র; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তত্র**—তাতে; **কারণম্**—কারণ; **পাদ-সেবনম্**—শ্রীপাদপদ্মের পূজা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ কামনা করেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত হওয়া, কারণ তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আরাধনার ফলে এই সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদনের ফলেই দেবতারা বরদান করতে পারেন। তাই, যখন কোন দেবতাকে কোন কিছু নিবেদন করা হয়, তখন সেই নিবেদন দর্শন করার জন্য তাঁর সম্মুখে নারায়ণ শিলা বা শালগ্রাম শিলারূপে পরমেশ্বর ভগবানকে স্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত দেবতারা কোন বর দিতে পারেন না। তাই নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছেন যে, ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষ লাভের জন্য ভগবানের বন্দনা করে মানুষের উচিত তার মনোবাসনা পূর্তির জন্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করে তাঁর সমীপবর্তী হওয়া। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও দেবতাদের কাছে গিয়ে কোন কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি সোজা সমস্ত আশীর্বাদের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, লৌকিক আচার-আচরণের অনুষ্ঠান করা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নয়। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া। কারণ, যিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত, তাঁর পক্ষে পৃথকভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্তকে কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের ব্যাপারে নিরাশ হতে হয় না। তিনি যদি তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করতে চান, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

সেই বাসনা পূর্ণ করেন। মুক্তি সম্বন্ধেও বলা যায় যে, ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত ভক্ত ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন; তাই তাঁকে মুক্তির জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াস করতে হয় না।

নারদ মুনি তাই ধ্রুব মহারাজকে তাঁর মায়ের নির্দেশমতো বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, কারণ তার ফলে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। এই শ্লোকে নারদ মুনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে একমাত্র পন্থা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কারও যদি জড়-জাগতিক বাসনা থাকে, তা হলেও তিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করতে পারেন, এবং তার ফলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৪২

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি ।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৪২ ॥

তৎ—তা; **তাত**—বৎস; **গচ্ছ**—যাও; **ভদ্রম্**—মঙ্গল হোক; **তে**—তোমার; **যমুনায়াঃ**—যমুনায়; **তটম্**—তট; **শুচি**—শুদ্ধ হয়ে; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **মধু-বনম্**—মধুবন নামক স্থানে; **যত্র**—যেখানে; **সান্নিধ্যম্**—নিকটবর্তী হয়ে; **নিত্যদা**—সর্বদা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

হে বৎস! তোমার কল্যাণ হোক। তুমি যমুনার তটে মধুবন নামক বনে যাও, এবং সেখানে গিয়ে পবিত্র হও। সেখানে যাওয়ার ফলে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের নিকটবর্তী হয়, কারণ ভগবান সেখানে সর্বদা বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনি এবং ধ্রুব মহারাজের মাতা সুনীতি উভয়েই ধ্রুব মহারাজকে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এখন, নারদ মুনি তাঁকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন কিভাবে সেই আরাধনা অতি শীঘ্র ফলপ্রসূ হতে পারে। তিনি ধ্রুব মহারাজকে নির্দেশ দিয়েছেন, যমুনার তটে মধুবনে ভগবানের ধ্যান এবং আরাধনা করতে।

ভক্তের পারমার্থিক জীবনে দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য পবিত্র তীর্থের প্রভাব বিশেষ ফল প্রদান করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই বিরাজ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও পবিত্র তীর্থে তাঁর সমীপবর্তী হওয়া অত্যন্ত সহজ, সেই সমস্ত স্থানে মহান ঋষিগণ বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর ভক্তরা যেখানেই তাঁর চিন্ময় কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন, সেখানে তিনি বাস করেন। ভারতবর্ষে বহু তীর্থস্থান রয়েছে, তার মধ্যে বদ্রীনারায়ণ, দ্বারকা, রামেশ্বর এবং জগন্নাথপুরী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই পবিত্র স্থানগুলিকে বলা হয় *চতুর্ধাম*। *ধাম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যেখানে অচিরেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। বদ্রীনারায়ণে যেতে হলে হরিদ্বার বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির দুয়ার হয়ে যেতে হয়। তেমনই প্রয়াগ (এলাহাবাদ) এবং মথুরা আদি বহু তীর্থস্থান রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে বৃন্দাবন। পারমার্থিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত না হলে, এই সমস্ত পবিত্র স্থানে বাস করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার উপদেশ দেওয়া হয় না। কিন্তু সর্বদা ভগবানের বাণী প্রচারে নিযুক্ত নারদ মুনির মতো উন্নত ভক্ত যে-কোন স্থানে ভগবানের সেবা করতে পারেন। কখনও কখনও তিনি পাতাল লোকে পর্যন্ত যান। সেখানকার নারকীয় পরিবেশ নারদ মুনিকে প্রভাবিত করতে পারে না, কারণ তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের মহান দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। নারদ মুনির বর্ণনা অনুসারে, মথুরা প্রদেশের বৃন্দাবন অঞ্চলে আজও বিরাজমান মধুবন হচ্ছে সব চাইতে পবিত্র স্থান। বহু মহাত্মা আজও সেখানে বাস করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন।

বৃন্দাবন অঞ্চলে বারটি বন রয়েছে, এবং মধুবন হচ্ছে তাদের একটি। ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা সেখানে সমবেত হয়ে এই বারটি বন দর্শন করেন। যমুনার পূর্ব তটে রয়েছে পাঁচটি বন—ভদ্রবন, বিলবন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন এবং মহাবন। যমুনার পশ্চিম তটে রয়েছে সাতটি বন—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন এবং বৃন্দাবন। ঐ বারটি বনে বিভিন্ন ঘাট রয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিকঢ়, (৩) গুহ্যতীর্থ, (৪) প্রয়াগ-তীর্থ, (৫) কনখল, (৬) তিন্দুক-তীর্থ, (৭) সূর্যতীর্থ, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট (বহু সুন্দর ফুল এবং ফলের বৃক্ষশোভিত ধ্রুবঘাট ধ্রুব মহারাজের ধ্যান এবং কঠোর তপস্যার জন্য প্রসিদ্ধ), (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ, (১২) বুধতীর্থ, (১৩) গোকর্ণ, (১৪) কৃষ্ণগঙ্গা, (১৫) বৈকুণ্ঠ, (১৬) অসি-কুণ্ড, (১৭) চতুঃ-সামুদ্রিক-কূপ, (১৮) অক্রূর-তীর্থ (অক্রূর চালিত রথে কৃষ্ণ-বলরাম যখন মথুরায় যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা এই ঘাটে স্নান করেন), (১৯) যাজ্ঞিক-বিপ্র-স্থান, (২০) কুব্জা-কূপ, (২১) রঙ্গস্থল, (২২) মঞ্চস্থল, (২৩) মল্লযুদ্ধ স্থান এবং (২৪) দশাশ্বমেধ।

শ্লোক ৪৩

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ কালিন্দ্যাঃ সলিলে শিবে ।
কৃত্বোচিতানি নিবসন্নাত্মনঃ কল্পিতাসনঃ ॥ ৪৩ ॥

স্নাত্বা—স্নান করে; **অনুসবনম্**—তিনবার; **তস্মিন্**—সেই; **কালিন্দ্যাঃ**—কালিন্দী (যমুনা) নদীতে; **সলিলে**—জলে; **শিবে**—অত্যন্ত শুভ; **কৃত্বা**—অনুষ্ঠান করে; **উচিতানি**—উপযুক্ত; **নিবসন্**—বসে; **আত্মনঃ**—নিজের; **কল্পিত-আসনঃ**—আসন বানিয়ে।

অনুবাদ

নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন—হে বৎস! কালিন্দী বা যমুনার জলে তুমি প্রতিদিন তিনবার স্নান কর, কারণ সেই জল অত্যন্ত শুভ, পবিত্র এবং নির্মল। স্নান করার পর, তুমি অষ্টাঙ্গ-যোগের আবশ্যকীয় বিধিগুলি পালন করে, কোন নির্জন স্থানে আসনে উপবেশন কর।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি থেকে মনে হয় যে, ধ্রুব মহারাজ ইতিমধ্যেই অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুশীলনের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতা যথাযথের* সাংখ্য-যোগ নামক অধ্যায়ের এগার থেকে পনের শ্লোকে এই পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অষ্টাঙ্গ-যোগে মনকে স্থির করে তার পর শ্রীবিষ্ণুর রূপের ধ্যান করা হয়, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হবে। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ কোন শারীরিক ব্যায়াম নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর রূপে মনকে কেন্দ্রীভূত করার অভ্যাস। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে যে, আসনে উপবেশন করার পূর্বে, পবিত্র এবং নির্মল জলে খুব ভালভাবে স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করতে হয়। যমুনার জল স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত নির্মল ও পবিত্র, তাই কেউ যদি দিনে তিনবার সেই জলে স্নান করেন, তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে বাহ্যিক দিক দিয়ে অত্যন্ত শুদ্ধ হয়ে যাবেন। নারদ মুনি সেই জন্য ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যমুনার তটে গিয়ে বাহ্যিক দিক দিয়ে পবিত্র হওয়ার। এটি অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুশীলনের ক্রমিক বিধির একটি অঙ্গ।

শ্লোক ৪৪

প্রাণায়ামেন ত্রিবৃতা প্রাণেন্দ্রিয়মনোমলম্ ।
শনৈর্ব্যুদস্যাভিধ্যায়েন্মনসা গুরুণা গুরুম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রাণায়ামেন—প্রাণায়ামের দ্বারা; **ত্রি-বৃতা**—তিনটি অনুমোদিত প্রক্রিয়ার দ্বারা; **প্রাণ-ইন্দ্রিয়**—প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—মন; **মলম্**—কলুষ; **শনৈঃ**—ক্রমশ; **ব্যুদস্য**—পরিত্যাগ করে; **অভিধ্যায়েৎ**—ধ্যান কর; **মনসা**—মনের দ্বারা; **গুরুণা**—অবিচলিতভাবে; **গুরুম্**—পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণকে।

অনুবাদ

আসনে উপবেশন করে, প্রাণায়ামের তিনটি অভ্যাস অনুশীলন করে ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত কর। এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, গভীর ধৈর্য সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান শুরু কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সংক্ষেপে সমগ্র যোগপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, এবং চিত্তের চাঞ্চল্য দমন করার জন্য প্রাণায়াম অভ্যাসের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। মন চঞ্চল হওয়ার ফলে স্বভাবতই অস্থির, কিন্তু প্রাণায়ামের অভ্যাস হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বে যখন ধ্রুব মহারাজ প্রাণায়ামের অভ্যাস করেছিলেন, তখন এই পন্থার দ্বারা মনকে সংযত করা সম্ভব ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে মনঃসংযমের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের নাম কীর্তনের দ্বারা সরাসরিভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মনকে নিবদ্ধ করা। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে, মনকে তৎক্ষণাৎ সেই দিব্য শব্দতরঙ্গে একাগ্রীভূত করা যায় এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করা যায়। এইভাবে অতি শীঘ্রই সমাধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কেউ যদি ভগবানের নাম কীর্তন করেন, যা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়।

এখানে ধ্রুব মহারাজকে নারদ মুনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন পরম গুরুদেবের ধ্যান করেন। পরম গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁকে বলা হয় চৈত্যগুরু। যার অর্থ হচ্ছে পরমাত্মা, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি অন্তর থেকে সাহায্য করেন, এবং গুরুদেবকে পাঠিয়ে দেন, যিনি বাহির থেকে সহায়তা করেন। গুরুদেব হচ্ছেন সকলের হৃদয়ে স্থিত চৈত্যগুরুর বাহ্যিক প্রকাশ

যে বিধির দ্বারা জড় বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করা হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যাহার, যার অর্থ হচ্ছে সমস্ত জড় চিন্তা এবং কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়া। এই শ্লোকের *অভিধ্যায়েৎ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মন যতক্ষণ পর্যন্ত না স্থির হয়, ততক্ষণ ধ্যান করা সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ধ্যান করার অর্থ অন্তরে ভগবানের

বিষয়ে চিন্তা করা। অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারাই হোক অথবা শাস্ত্র-নির্দেশিত এই যুগের পন্থা নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তনের দ্বারাই হোক, চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা।

শ্লোক ৪৫

প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎপ্রসন্নবদনেক্ষণম্ ।
সুনাসং সুভ্রুবং চারুকপোলং সুরসুন্দরম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রসাদ-অভিমুখম্—সর্বদা অহৈতুকী কৃপা প্রদান করতে প্রস্তুত; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **প্রসন্ন**—প্রসন্ন; **বদন**—মুখমণ্ডল; **ঈক্ষণম্**—দৃষ্টি; **সু-নাসম্**—সুন্দর নাক; **সু-ভ্রুবম্**—সুন্দর ভ্রূ; **চারু**—সুন্দর; **কপোলম্**—কপোল; **সুর**—দেবতা; **সুন্দরম্**—সুন্দর।

অনুবাদ

(এখানে ভগবানের রূপ বর্ণনা করা হয়েছে।) ভগবানের মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং নিরন্তর প্রসন্ন। ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁকে কখনও অপ্রসন্ন বলে মনে হয় না, এবং তিনি সর্বদাই তাঁদের কৃপা করতে প্রস্তুত থাকেন। তাঁর নয়ন, তাঁর সুন্দর ভ্রূযুগল, তাঁর উন্নত নাসিকা এবং তাঁর গণ্ডদেশ অত্যন্ত সুন্দর। তিনি সমস্ত দেবতাদের থেকেও অধিক সুন্দর।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবানের রূপের ধ্যান করতে হয়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। নির্বিশেষের ধ্যান আধুনিক যুগের এক অসৎ আবিষ্কার। কোন বৈদিক শাস্ত্রে নির্বিশেষের ধ্যান করবার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। *ভগবদ্গীতায়* যেখানে ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে *মৎ-পরঃ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'আমার সম্বন্ধে' যে-কোন বিষ্ণুরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি বিষ্ণুরূপ। কখনও কখনও কেউ কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করার চেষ্টা করে, *ভগবদ্গীতায়* যাকে *অব্যক্ত*, অর্থাৎ 'অপ্রকাশিত' অথবা 'নির্বিশেষ' বলা হয়েছে। কিন্তু ভগবান নিজেই সেখানে বলেছেন যে, যারা সেই নির্বিশেষের ধ্যানের প্রতি আসক্ত, তাদের সেই প্রচেষ্টা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, কেননা নির্বিশেষ রূপে মনকে কেউ একাগ্র করতে পারে না। মনকে একাগ্র করতে হয় ভগবানের রূপের উপর, যা ধ্রুব মহারাজের ধ্যান সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, ধ্রুব মহারাজ এই প্রকার ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং তাঁর যোগ সফল হয়েছিল।

শ্লোক ৪৬

তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্ ।
প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্ণং শরণ্যং করুণার্ণবম্ ॥ ৪৬ ॥

তরুণম্—তরুণ; **রমনীয়**—আকর্ষণীয়; **অঙ্গম্**—দেহের সমস্ত অঙ্গ; **অরুণ-ওষ্ঠ**—উদীয়মান সূর্যের মতো রক্তিম ওষ্ঠ; **ঈক্ষণ-অধরম্**—তাঁর নয়ন-যুগলও তেমনই; **প্রণত**—শরণাগত; **আশ্রয়ণম্**—শরণাগতের আশ্রয়; **নৃম্ণম্**—সর্বতোভাবে দিব্য আনন্দদায়ক; **শরণ্যম্**—শরণযোগ্য; **করুণা**—করুণাপূর্ণ; **অর্ণবম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—ভগবানের রূপ সর্বদাই তরুণ। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুন্দরভাবে গঠিত এবং নিখুঁত। তাঁর চক্ষু এবং ওষ্ঠাধর উদীয়মান সূর্যের মতো রক্তিম। তিনি সর্বদাই শরণাগতকে আশ্রয়দান করতে প্রস্তুত, এবং যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁকে অবলোকন করেন, তিনি পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করেন। তিনি সর্বদাই শরণাগতের প্রভু হওয়ার যোগ্য, কারণ তিনি হচ্ছেন করুণার সিন্ধু।

তাৎপর্য

প্রতিটি ব্যক্তিকেই কোন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির শরণাগত হতে হয়। আমাদের জীবনের সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা। বর্তমান অবস্থায় আমরা সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, রাজ্য বা সরকারের কারও না কারোর শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করছি। শরণাগতির এই পন্থা বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তা কখনই পূর্ণ নয়, কারণ যে-ব্যক্তি বা সংস্থার শরণাগত আমরা হচ্ছি তা অপূর্ণ, এবং আমাদের শরণাগতিও বহু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়ার ফলে অপূর্ণ। জড় জগতে কেউই শরণ গ্রহণের যোগ্য নয়, এবং কেউই একেবারে বাধ্য না হলে, পূর্ণরূপে কারও শরণাগত হতে চায় না। কিন্তু শরণাগতির এই পন্থা হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত, এবং ভগবান হচ্ছেন পূর্ণরূপে শরণযোগ্য। জীব যখন ভগবানের সুন্দর তরুণ রূপ দর্শন করে, তখন আপনা থেকেই সে তাঁর শরণাগত হয়।

নারদ মুনি যে ভগবানের বর্ণনা এখানে দিয়েছেন তা কল্পনাপ্রসূত নয়। পরম্পরা ধারায় ভগবানের রূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মায়াবাদীরা বলে যে, ভগবানের রূপের কল্পনা করতে হয়, কিন্তু এখানে নারদ মুনি সেই কথা বলেননি। পক্ষান্তরে তিনি প্রামাণিক সূত্র থেকে ভগবানের রূপের এই বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি নিজেই হচ্ছেন একজন মহাজন, এবং বৈকুণ্ঠলোকে গিয়ে তিনি স্বয়ং ভগবানকে দর্শন করতে

পারেন; তাই ভগবানের শ্রীঅঙ্গের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা কল্পনাপ্রসূত নয়। কখনও কখনও আমরা আমাদের শিষ্যদের ভগবানের রূপের বর্ণনা দিই, এবং সেই অনুসারে তারা তাঁর ছবি আঁকে। তাদের সেই ছবিগুলি কল্পনাপ্রসূত নয়। সেই বর্ণনা গুরু-পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত, ঠিক যেমন ভগবানকে দর্শন করে তাঁর দৈহিক রূপের বর্ণনা নারদ মুনি দিয়েছেন। তাই এই বর্ণনা স্বীকার করা উচিত, এবং তা যদি আঁকাও হয়, তা কোন কাল্পনিক চিত্র নয়।

শ্লোক ৪৭

শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্তচতুর্ভুজম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবৎস-অঙ্কম্—ভগবানের বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন; **ঘন-শ্যামম্**—ঘন নীল বর্ণ; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **বনমালিনম্**—ফুলের মালা; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—গদা; **পদ্মৈঃ**—পদ্মফুল; **অভিব্যক্ত**—প্রকাশিত; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ।

অনুবাদ

ভগবান হচ্ছেন শ্রীবৎস বা লক্ষ্মীদেবীর আসনরূপ চিহ্নসমন্বিত, এবং তাঁর অঙ্গ কান্তি ঘন নীলবর্ণ। তিনি পুরুষ, তাঁর গলায় বনফুলের মালা, এবং তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে নিত্য প্রকটিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পুরুষম্ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান কখনই স্ত্রী নন। তিনি সর্বদাই পুরুষ। তাই নির্বিশেষবাদীরা যে স্ত্রীরূপে ভগবানের কল্পনা করে তা ভ্রান্ত। প্রয়োজন হলে ভগবান স্ত্রীরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু তাঁর নিত্য রূপে তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ। ভগবানের স্ত্রীরূপ হচ্ছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, রাধারাণী, সীতা প্রভৃতি দেবীগণ। এই সমস্ত সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ ভগবানের সেবিকা; তাঁরা পরম পুরুষ নন, যা নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তভাবে কল্পনা করে। নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা চতুর্ভুজ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে তাঁর এই চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ প্রদর্শন করেছিলেন। কোন কোন ভক্ত মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নারায়ণের অবতার, কিন্তু ভাগবত মতাবলম্বীরা বলেন যে, নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ।

শ্লোক ৪৮

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্ ।
কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ৪৮ ॥

কিরীটিনম্—ভগবান রত্নখচিত মুকুট-শোভিত; **কুণ্ডলিনম্**—মুক্তার কর্ণভূষণ; **কেয়ূর**—রত্নখচিত কণ্ঠহার; **বলয়-অন্বিতম্**—রত্নখচিত বলয়-শোভিত; **কৌস্তুভ-আভরণ-গ্রীবম্**—তাঁর কণ্ঠ কৌস্তুভ মণির দ্বারা বিভূষিত; **পীত-কৌশেয়-বাসসম্**—এবং তিনি পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্রে সজ্জিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের সমগ্র অঙ্গ রত্নভূষণে বিভূষিত। তাঁর মাথায় রত্নখচিত মুকুট, গলায় কণ্ঠহার এবং হাতে বলয়, তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছে, এবং তাঁর পরনে পীত পট্টবস্ত্র।

শ্লোক ৪৯

কাঞ্চীকলাপপর্যস্তং লসৎকাঞ্চননূপুরম্ ।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্ধনম্ ॥ ৪৯ ॥

কাঞ্চী-কলাপ—মেখলা; **পর্যস্তম্**—পরিবেষ্টিত; **লসৎ-কাঞ্চন-নূপুরম্**—তাঁর পদযুগল স্বর্ণ-নূপুরে সুশোভিত; **দর্শনীয়-তমম্**—অত্যন্ত দর্শনীয়; **শান্তম্**—শান্ত; **মনঃ-নয়ন-বর্ধনম্**—নয়ন এবং মনের অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

অনুবাদ

তাঁর নিতম্বদেশ মেখলার দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং চরণযুগল স্বর্ণ-নূপুরে সুশোভিত। তাঁর দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। তিনি সর্বদা শান্ত ও স্নিগ্ধ এবং তাঁর রূপ নয়ন ও মনের আনন্দদায়ক।

শ্লোক ৫০

পদ্ভ্যাং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যাং সমর্চতাম্ ।
হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যমাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতম্ ॥ ৫০ ॥

পদ্‌ভ্যাম্—তাঁর পদযুগল; **নখ-মণি-শ্রেণ্যা**—মণিসদৃশ পদনখের কিরণের দ্বারা; **বিলসদ্‌ভ্যাম্**—উজ্জ্বল চরণ কমল; **সমর্চতাম্**—যাঁরা তাঁর আরাধনায় যুক্ত; **হৃৎ-পদ্ম-কর্ণিকা**—হৃদয়রূপ পদ্মের কর্ণিকার; **ধিষ্ণ্যম্**—অবস্থিত; **আক্রম্য**—অধিকার করে; **আত্মনি**—হৃদয়ে; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত।

অনুবাদ

প্রকৃত যোগী হৃদয়রূপ পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থিত ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যান করেন, যাঁর পদযুগল মণিসদৃশ পদনখের কিরণে উদ্ভাসিত।

শ্লোক ৫১

স্ময়মানমভিধ্যায়েৎসানুরাগাবলোকনম্ ।
নিয়তেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্ ॥ ৫১ ॥

স্ময়মানম্—ভগবানের হাসি; **অভিধ্যায়েৎ**—তাঁর ধ্যান করা উচিত; **স-অনুরাগ-অবলোকনম্**—যিনি গভীর অনুরাগ সহকারে তাঁর ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; **নিয়তেন**—এই প্রকার নিয়মিতভাবে; **এক-ভূতেন**—গভীর মনোযোগ সহকারে, **মনসা**—মন দিয়ে; **বর-দর্ষভম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতার ধ্যান করা উচিত।

অনুবাদ

ভগবানের মুখমণ্ডল সর্বদাই মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত, এবং ভক্তের কর্তব্য ভগবানের সেই ভক্তবৎসল রূপ নিরন্তর দর্শন করা। ধ্যানকারীর কর্তব্য সমস্ত বরপ্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবানকে এইভাবে দর্শন করা।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *নিয়তেন* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, উপরোক্ত বিধিতে ধ্যান অভ্যাস করা কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার নতুন কোন পন্থা উদ্ভাবন না করে, প্রামাণিক শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করাই কর্তব্য। এই অনুমোদিত পন্থায় নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের রূপের চিন্তা করে মনকে একাগ্রীভূত করতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মন সমাধিতে স্থির হয়। এখানে *এক-ভূতেন* শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'গভীর মনোযোগ এবং একাগ্রতা সহকারে'। কেউ যদি ভগবানের শ্রীঅঙ্গের ধ্যানে মনকে একাগ্রীভূত করেন, তা হলে তাঁর কখনও অধঃপতন হবে না।

শ্লোক ৫২

এবং ভগবতো রূপং সুভদ্রং ধ্যায়তো মনঃ ।
নির্বৃত্যা পরয়া তূর্ণং সম্পন্নং ন নিবর্ততে ॥ ৫২ ॥

এবম্—এইভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **সু-ভদ্রম্**—অত্যন্ত মঙ্গলজনক; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করে; **মনঃ**—মন; **নির্বৃত্যা**—সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; **পরয়া**—চিন্ময়; **তূর্ণম্**—অতি শীঘ্র; **সম্পন্নম্**—সমৃদ্ধ হয়ে; **ন**—কখনই না; **নিবর্ততে**—বিচ্যুত হয়।

অনুবাদ

যিনি এইভাবে সর্বদা ভগবানের মঙ্গলময় রূপের ধ্যানে মনকে একাগ্রীভূত করেন, তিনি অচিরেই সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, এবং তিনি কখনও ভগবানের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হন না।

তাৎপর্য

নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানকে বলা হয় সমাধি। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি কখনই এখানকার বর্ণনা অনুসারে ভগবানের রূপের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না। পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে অর্চনমার্গে, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মাধ্যমে, ভক্ত নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করেন; সেটিই হচ্ছে সমাধি। যিনি এইভাবে অভ্যাস করেন, তিনি কখনও ভগবানের সেবা থেকে বিচলিত হতে পারেন না, এবং তার ফলে তাঁর মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়।

শ্লোক ৫৩

জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্ ॥ ৫৩ ॥

জপঃ চ—এই প্রসঙ্গে মন্ত্রজপ; **পরমঃ**—অত্যন্ত; **গুহ্যঃ**—গোপনীয়; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ কর; **মে**—আমার থেকে; **নৃপ-আত্মজ**—হে রাজপুত্র; **যম্**—যা; **সপ্ত-রাত্রম্**—সাত রাত্রি; **প্রপঠন্**—জপ করার ফলে; **পুমান্**—মানুষ; **পশ্যতি**—দেখতে পারে; **খে-চরান্**—যে সমস্ত মানুষ অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন।

অনুবাদ

হে রাজপুত্র! আমি তোমাকে এখন সেই মন্ত্র সম্বন্ধে বলব, যা এই ধ্যানের পন্থায় জপ করা কর্তব্য। সাবধানতার সঙ্গে সাত রাত্রি এই মন্ত্র জপ করলে, অন্তরীক্ষে বিচরণকারী সিদ্ধপুরুষদের দর্শন করা যায়।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডে সিদ্ধলোক নামে একটি স্থান রয়েছে। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা স্বভাবতই যোগসিদ্ধ। এই সিদ্ধি আট প্রকার—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য ইত্যাদি। লঘিমা সিদ্ধির দ্বারা অথবা লঘু থেকে লঘুতর হওয়ার ক্ষমতার দ্বারা সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা বিমান অথবা অন্তরীক্ষ যান ব্যতীত গগনমার্গে বিচরণ করতে পারেন। এখানে নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যানের দ্বারা এবং মন্ত্রজপের দ্বারা সাত দিনের মধ্যে এমনই সিদ্ধি লাভ করা যায় যে, গগনমার্গে বিচরণকাবী মানুষদের দেখতে পাওয়া যায়। নারদ মুনি জপ শব্দটির ব্যবহার করেছেন, যা ইঙ্গিত করে যে, মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "তা যদি এতই গোপনীয় হয়, তা হলে কেন তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে?" সেই মন্ত্র গোপনীয় হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, গ্রন্থে প্রকাশিত মন্ত্র যে-কোন স্থানে লাভ করা করা যেতে পারে, কিন্তু তা গুরুপরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত না হলে, সেই মন্ত্র কার্যকরী হয় না। প্রামাণ্য সূত্রে বলা হয়েছে যে, গুরুপরম্পরার মাধ্যমে মন্ত্র প্রাপ্ত না হলে, তার কোন প্রভাব থাকে না।

এই শ্লোকে আর একটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মন্ত্রজপ সহকারে ধ্যান করতে হয়। এই যুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ হচ্ছে ধ্যান করার সব চাইতে সহজ পন্থা। হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ, রাম এবং তাঁদের শক্তির রূপ দর্শন করা যায়, এবং সেটিই হচ্ছে সমাধির সিদ্ধ অবস্থা। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সময় কৃত্রিমভাবে ভগবানের রূপ দর্শনের চেষ্টা করা উচিত নয়, কিন্তু যখন নিরপরাধে নাম জপ হবে, তখন আপনা থেকেই ভগবান জপকারীর কাছে তাঁর নিজের রূপ প্রকাশ করবেন। তাই জপকারীর কর্তব্য হচ্ছে সেই শব্দতরঙ্গ শ্রবণে মনকে একাগ্রীভূত করা, এবং তখন তাঁর দিক থেকে কোন রকম প্রয়াস ব্যতীতই ভগবান আপনা থেকেই তাঁর কাছে আবির্ভূত হবেন।

শ্লোক ৫৪

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।
মন্ত্রেণানেন দেবস্য কুর্যাদ্ দ্রব্যময়ীং বুধঃ ।
সপর্যাং বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৫৪ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—বাসুদেবকে; **মন্ত্রেণ**—এই মন্ত্রের দ্বারা; **অনেন**—এই; **দেবস্য**—ভগবানের; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **দ্রব্যময়ীম্**—দ্রব্যময়ী; **বুধঃ**—বিদ্বান; **সপর্যাম্**—অনুমোদিত বিধির দ্বারা পূজা; **বিবিধৈঃ**—অনেক প্রকার; **দ্রব্যৈঃ**—দ্রব্যের দ্বারা; **দেশ**—স্থান অনুসারে; **কাল**—সময়; **বিভাগ-বিৎ**—বিভাগ সম্বন্ধে যিনি অবগত।

অনুবাদ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এটি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে ফুল, ফল ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রামাণিক বিধি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। তবে তা দেশ, কাল এবং সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করে করা উচিত।

তাৎপর্য

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র নামে পরিচিত। বৈষ্ণব ভক্তরা এই মন্ত্র জপ করেন, এবং তা শুরু হয় *প্রণব* বা *ওঁকার* সহকারে। নির্দেশ রয়েছে যে, যাঁরা ব্রাহ্মণ নন, তাঁরা *প্রণব* মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজের জন্ম হয়েছিল ক্ষত্রিয়রূপে। তিনি তাই নারদ মুনিকে বলেছিলেন যে, ক্ষত্রিয় হওয়ার ফলে, ত্যাগ এবং মনের সাম্য সম্বন্ধে নারদ মুনির উপদেশ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তা ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ না হওয়া সত্ত্বেও নারদ মুনির নির্দেশে ধ্রুব মহারাজের *প্রণব* বা *ওঁকার* উচ্চারণ করার অনুমতি লাভ হয়েছিল। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত ভারতবর্ষে, যখন অন্য বর্ণের মানুষেরা *প্রণব* মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন জাতি ব্রাহ্মণেরা প্রবলভাবে আপত্তি করে। কিন্তু এখানে সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেউ যদি বৈষ্ণব মন্ত্র বা বৈষ্ণব পন্থায় ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন, তখন তিনি *প্রণব* মন্ত্র জপ করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, যথাযথভাবে

আরাধনা করার ফলে, যে কেউ, এমন কি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

নারদ মুনি যে এখানে প্রামাণিক বিধির কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে মন্ত্র গ্রহণ করতে হয় সদ্‌গুরুর কাছ থেকে এবং সেই মন্ত্র শ্রবণ করতে হয় দক্ষিণ কর্ণে। কেবল মন্ত্র উচ্চারণ করলেই হবে না, তা অবশ্যই শ্রীবিগ্রহ বা ভগবানের রূপের সম্মুখে করতে হবে। অবশ্য, ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর সেই রূপ কোন ভৌতিক রূপ নয়। যেমন, লোহা যখন আগুনে গরম হয়ে লাল হয়ে যায়, তখন আর তা লোহা থাকে না; তা আগুনে পরিণত হয়। তেমনই, আমরা যখন ভগবানের রূপ তৈরি করি, তখন তা কাঠ, পাথর, ধাতু, মণি বা চিত্রের অথবা এমন কি মনের মধ্যে কোন রূপ হোক না কেন, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য চিন্ময় রূপ। নারদ মুনির মতো অথবা গুরুপরম্পরা ধারায় তাঁর প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, সেই মন্ত্র জপও করতে হবে। আর কেবল জপ করলেই চলবে না, স্থান, কাল এবং সুবিধা অনুসারে যে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তাও ভগবানকে নিবেদন করতে হবে।

মন্ত্রজপ, এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ আদি অর্চনবিধি কোন বাঁধাধরা নিয়মে করার দরকার হয় না, এমন কি তা সর্বত্রই একভাবেও করতে হয় না। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থান, কাল এবং সুযোগ সুবিধা অনুসারে তা করা যায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে, এবং আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে আমরাও ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করছি। আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা তাঁদের মনগড়া ধারণায় গর্বিত হয়ে কখনও কখনও সমালোচনা করে, "এটা করা হয়নি, ওটা করা হয়নি।" কিন্তু অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ধ্রুব মহারাজকে দেওয়া নারদ মুনির উপদেশ তারা ভুলে যায়। বিশেষ দেশ, কাল এবং সুযোগ-সুবিধার বিচার করা কর্তব্য। ভারতবর্ষে যা সুবিধাজনক, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তা নাও হতে পারে। যাঁরা আচার্য পরম্পরার অন্তর্গত নন, অথবা আচার্যের ভূমিকায় কিভাবে আচরণ করতে হয়, সেই সম্বন্ধে যাঁদের ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান নেই, তাঁরা অনর্থক ভারতবর্ষের বাইরের দেশগুলিতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কার্যকলাপের সমালোচনা করেন। আসল কথা হচ্ছে যে, এই প্রকার সমালোচকেরা ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণভাবনার প্রচারকার্যে কোন কিছুই করতে পারে না। কেউ যদি সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এবং স্থান ও কালের বিবেচনা করে ভগবানের বাণী প্রচার করতে যান, তা হলে হয়তো কখনও কখনও তাঁকে পূজা-পদ্ধতির ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন সাধন করতে হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের মতে তা

কিঞ্চিৎমাত্র ত্রুটিপূর্ণ নয়। রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন প্রখ্যাত আচার্য শ্রীমৎ বীররাঘব আচার্য তাঁর ভাষ্যে লিখেছেন যে, চণ্ডাল অথবা শূদ্রাধম কুলোদ্ভূত জীবও পরিস্থিতি অনুসারে দীক্ষিত হতে পারেন। তাদের বৈষ্ণব করার ব্যাপারে বিধির স্বল্প পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর নাম যেন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে শোনা যায়। সর্বত্র যদি প্রচার না হয়, তা হলে তা কিভাবে সম্ভব? ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায় হচ্ছে ভাগবত-ধর্ম, এবং তিনি কৃষ্ণকথা বা *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণীর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি ভারতবাসী যেন এই পরোপকারের ব্রত গ্রহণ করে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদেব কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেন। 'পৃথিবীর অন্য অধিবাসীরা' বলতে কেবল ভারতীয় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, অথবা ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত জাতি ব্রাহ্মণদেরই বোঝায় না। কেবল ভারতীয়রা এবং হিন্দুরাই বৈষ্ণব হবে, সেই ধারণাটি ভ্রান্ত। সকলকেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত করার জন্য প্রচার করতে হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ অথবা যবন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিদের কাছেও কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে কোন বাধা নেই। এমন কি ভারতবর্ষেও শ্রীল সনাতন গোস্বামী সেই কথা তাঁর *হরিভক্তিবিলাস* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা হচ্ছে বৈষ্ণবদের দৈনন্দিন আচার-আচরণের প্রামাণিক বৈদিক পথ-প্রদর্শিকা। সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পারদের সংযোগে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনই যথাযথ দীক্ষাবিধির দ্বারা যে-কেউ বৈষ্ণবে পরিণত হতে পারে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে গুরুপরম্পরা ধারায় সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করা। একে বলে দীক্ষা-বিধান। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ব্যপাশ্রিত্য*—সদ্গুরু গ্রহণ করা কর্তব্য। এই পন্থায় সারা পৃথিবীকে কৃষ্ণভাবনায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

শ্লোক ৫৫

সলিলৈঃ শুচিভির্মাল্যৈর্বন্যৈর্মূলফলাদিভিঃ ।
শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চেত্তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভুম্ ॥ ৫৫ ॥

সলিলৈঃ—জলের দ্বারা; **শুচিভিঃ**—পবিত্র করে; **মাল্যৈঃ**—মালার দ্বারা; **বন্যৈঃ**—বনফুলের; **মূল**—শিকড়; **ফল-আদিভিঃ**—বিবিধ প্রকার শাক-সবজি এবং ফলের দ্বারা; **শস্ত**—নবীন দূর্বাঘাস; **অঙ্কুর**—কলি; **অংশুকৈঃ**—ভূর্জ আদি বৃক্ষ বল্কল দ্বারা;

চ—এবং; **অর্চেৎ**—আরাধনা করা উচিত; **তুলস্যা**—তুলসীপত্রের দ্বারা; **প্রিয়য়া**—যা অত্যন্ত প্রিয়; **প্রভুম্**—ভগবানের।

অনুবাদ

শুদ্ধ জল, শুদ্ধ ফুলমালা, ফল, ফুল এবং শাক-সবজির দ্বারা, যা বনে পাওয়া যায়, অথবা নবীন দূর্বাঘাস, পুষ্পের কলি, এমন কি গাছের ছাল দিয়ে পর্যন্ত ভগবানের পূজা করা উচিত, আর যদি সম্ভব হয়, তা হলে তুলসীপত্র নিবেদন করা উচিত, যা পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুলসীদল ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। প্রত্যেক মন্দিরে অথবা ভগবানের আরাধনার কেন্দ্রে তুলসীপত্র রাখার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভক্তদের বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করার ব্যাপারে, আমাদের সব চাইতে বড় দুঃখের কারণ হয়েছিল যে, সেখানে তুলসীপত্র পাওয়া যেত না। তাই, এখানে বীজ থেকে তুলসীর চারা তৈরি করার জন্য আমরা আমাদের শিষ্যা শ্রীমতী গোবিন্দ দাসীর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এখন আমাদের আন্দোলনের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রেই তুলসীদেবী সেবিত হচ্ছেন।

পরমেশ্বর ভগবানের পূজায় তুলসীপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্লোকে *সলিলৈঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জলের দ্বারা'। ধ্রুব মহারাজ যমুনার তটে ভগবানের আরাধনা করছিলেন। যমুনা ও গঙ্গা পবিত্র, এবং কখনও কখনও ভারতের ভক্তরা ঐকান্তিকভাবে চান যে, গঙ্গা অথবা যমুনার জলে যেন ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা হয়। কিন্তু এখানে *দেশ-কাল* শব্দ ইঙ্গিত করে 'সময় এবং স্থান অনুসারে'। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে গঙ্গা অথবা যমুনা নদী নেই, তাই সেখানে সেই পবিত্র নদীর জল পাওয়া যায় না। তা হলে কি অর্চাবিগ্রহের অর্চনা বন্ধ করে দেওয়া হবে? না। *সলিলৈঃ* বলতে যে কোন জলকে বোঝায়—যা পাওয়া যায়—তবে অবশ্যই অত্যন্ত নির্মল এবং শুদ্ধভাবে তা সংগ্রহ করতে হবে। সেই জল ব্যবহার করা যাবে। দেশ এবং কখন কি পাওয়া যায় সেই অনুসারে, অন্যান্য উপচারগুলি, যেমন, ফুলের মালা, ফল এবং শাক-সবজি সংগ্রহ করা উচিত। তুলসীদল ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাই যতদূর সম্ভব তুলসী উৎপাদনের ব্যবস্থার চেষ্টা করতে হবে। ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, বনে যে ফল এবং ফুল পাওয়া যায়, তা দিয়ে ভগবানের আরাধনা করতে

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি শাক-সবজি, ফল, ফুল ইত্যাদি গ্রহণ করেন। এখানে মহান আচার্য নারদ মুনি যে উপদেশ দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কিছু ভগবান বাসুদেবকে নিবেদন করা উচিত নয়। নিজের খেয়াল-খুশিমতো ভগবানকে নৈবেদ্য নিবেদন করা যায় না; যেহেতু ফল এবং শাক-সবজি বিশ্বের সর্বত্র পাওয়া যায়, তাই এই ছোট বিষয়টি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পালন করতে হবে।

শ্লোক ৫৬

লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চাং ক্ষিত্যম্ব্বাদিষু বার্চয়েৎ ।
আভৃতাত্মা মুনিঃ শান্তো যতবাঙ্‌মিতবন্যভুক্ ॥ ৫৬ ॥

লব্ধ্বা—প্রাপ্ত হয়ে; **দ্রব্য-ময়ীম্**—ভৌতিক উপাদানের দ্বারা নির্মিত; **অর্চাম্**—আরাধ্য বিগ্রহ; **ক্ষিতি**—পৃথিবী; **অম্বু**—জল; **আদিষু**—ইত্যাদি; **বা**—অথবা; **অর্চয়েৎ**—পূজা করা উচিত; **আভৃত-আত্মা**—সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযত; **মুনিঃ**—মহাত্মা; **শান্তঃ**—শান্তিপূর্বক; **যতবাক্**—কথা বলার প্রবণতা সংযত করে; **মিত**—অল্প; **বন্য-ভুক্**—বনে যা পাওয়া যায় তা আহার করে।

অনুবাদ

মাটি, জল, মণ্ড, কাঠ, এবং ধাতু ইত্যাদি ভৌতিক উপাদান দিয়ে নির্মিত ভগবানের রূপের আরাধনা করা সম্ভব। বনে মাটি এবং জলের অতিরিক্ত অন্য কিছু দিয়ে অর্চাবিগ্রহ তৈরি করা সম্ভব নয়, তাই তা দিয়ে তৈরি বিগ্রহেরই উপরোক্ত বিধি অনুসারে আরাধনা করা উচিত। যে ভক্ত পূর্ণরূপে আত্মসংযত, তাঁর অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরচিত্ত হওয়া উচিত, এবং বনে যে ফলমূল পাওয়া যায়, তা খেয়েই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

তাৎপর্য

ভক্তের পক্ষে ভগবানের স্বরূপের পূজা করা অপরিহার্য। কেবল গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে মনে মনে ভগবানের রূপের ধ্যান করাই যথেষ্ট নয়। ভগবানের স্বরূপের পূজা অবশ্য কর্তব্য। নির্বিশেষবাদীরা অনর্থক কোন অব্যক্ত রূপের ধ্যান করে অথবা পূজা করে, কিন্তু এই পন্থা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং বিপজ্জনক। নির্বিশেষবাদীদের অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য নয়। ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল মাটি এবং জল থেকে তৈরি ভগবানের রূপের ধ্যান করতে, কারণ

ধাতু, কাঠ অথবা পাথরের মূর্তি তৈরি করা বনে সম্ভব নয়। সেখানে সব চাইতে সহজ পন্থা হচ্ছে জল আর মাটি মিশিয়ে ভগবানের মূর্তি তৈরি করে তাঁর পূজা করা। আহার্য রান্না করার জন্য ভক্তের উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়; বনে অথবা শহরে ফল এবং শাক-সবজি জাতীয় যা কিছু পাওয়া যায়, তাই শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করা উচিত, এবং তা গ্রহণ করেই ভক্তের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া তাঁর উচিত নয়। তবে যেখানে সম্ভব, সেখানে অবশ্যই ফল, দুধ এবং শাক-সবজি থেকে তৈরি রন্ধন করা অথবা রন্ধন না করা সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা কর্তব্য। ভক্তের পক্ষে *মিতভুক্* হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটি ভক্তের একটি গুণ। কোন বিশেষ খাদ্যের দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করা তার পক্ষে উচিত নয়। ভগবানের কৃপায় যে প্রসাদ পাওয়া যায়, তা আহার করেই তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শ্লোক ৫৭

স্বেচ্ছাবতারচরিতৈরচিন্ত্যনিজমায়য়া ।
করিষ্যত্যুত্তমশ্লোকস্তদ্ ধ্যায়েদ্ধৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ৫৭ ॥

স্ব-ইচ্ছা—তাঁর নিজের পরম ইচ্ছার দ্বারা; **অবতার**—অবতার; **চরিতৈঃ**—কার্যকলাপ, **অচিন্ত্য**—অচিন্ত্য; **নিজ-মায়য়া**—স্বীয় শক্তি দ্বারা; **করিষ্যতি**—অনুষ্ঠান করে; **উত্তম-শ্লোকঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, **তৎ**—তা; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **হৃদয়ঙ্গমম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! প্রতিদিন তিনবার ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা এবং মন্ত্র জপ করা ব্যতীত, তাঁর পরম ইচ্ছা এবং স্বীয় শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত ভগবানের বিভিন্ন অবতারের চিন্ময় কার্যকলাপের ধ্যান করাও তোমার কর্তব্য।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি নয় প্রকার নির্ধারিত বিধির অনুশীলন সমন্বিত—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন। এখানে ধ্রুব মহারাজকে কেবল ভগবানের রূপের ধ্যান করার উপদেশই দেওয়া হয়নি, অধিকন্তু বিভিন্ন অবতারে ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপের কথা চিন্তা করারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মায়াবাদীরা ভগবানের অবতারদের সাধারণ জীবের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে।

সেটি একটি মস্তবড় ভুল। ভগবানের অবতারেরা প্রকৃতির নিয়মে কর্ম করতে বাধ্য নন। ভগবান যে তাঁর পরম ইচ্ছার প্রভাবে আবির্ভূত হন, সেই কথা বোঝাবার জন্য এখানে *স্বেচ্ছা* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতির নিয়মে, বদ্ধ জীবকে তার কর্ম অনুসারে কোন বিশেষ প্রকার শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁকে প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য হতে হয় না; তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হন। সেটি হচ্ছে পার্থক্য। বদ্ধ জীবকে তার কর্ম অনুসারে এবং দৈবের বিধান অনুসারে শূকর আদি বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন বরাহরূপে অবতরণ করেন, তখন তাঁর সেই রূপ কোন সাধারণ পশু শূকরের রূপ নয়। তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব আমাদের অচিন্ত্য *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অভক্তদের বিনাশ করার জন্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হন। ভক্তের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ কখনও একজন সাধারণ মানুষরূপে অথবা পশুরূপে আবির্ভূত হন না; তাঁর বরাহমূর্তি অথবা হয়গ্রীব-মূর্তি বা কূর্মমূর্তি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রদর্শন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভিঃ*—কখনও ভ্রান্তিবশত ভগবানের অবতারকে একজন সাধারণ মানুষ অথবা পশুর জন্ম গ্রহণের মতো বলে মনে করা উচিত নয়। সাধারণ বদ্ধ জীবদের, তা সে পশুই হোক, মানুষ হোক অথবা দেবতা হোক, প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা দেহ ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়। ভগবানকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করা অপরাধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদীদের কৃষ্ণ-অপরাধী বলে নিন্দা করেছেন, কারণ তারা মনে করে, ভগবান এবং বদ্ধ জীবেরা এক।

নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছেন ভগবানের লীলার ধ্যান করতে, যা ভগবানের রূপের ধ্যানেরই তুল্য। ভগবানের রূপের ধ্যান করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই হরি, গোবিন্দ, নারায়ণ আদি ভগবানের বিভিন্ন নাম কীর্তন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই যুগে আমাদের বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার জন্য। শাস্ত্রের বর্ণনায় সেই মহামন্ত্র হচ্ছে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

শ্লোক ৫৮

পরিচর্যা ভগবতো যাবত্যঃ পূর্বসেবিতাঃ ।
তা মন্ত্রহৃদয়েনৈব প্রযুঞ্জ্যান্মন্ত্রমূর্তয়ে ॥ ৫৮ ॥

পরিচর্যাঃ—সেবা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যাবত্যঃ**—নির্দেশ অনুসারে; **পূর্ব-সেবিতাঃ**—পূর্বতন আচার্যদের দ্বারা উপদিষ্ট অথবা কৃত; **তাঃ**—সেই; **মন্ত্র**—মন্ত্র; **হৃদয়েন**—হৃদয়ে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **প্রযুঞ্জ্যাৎ**—পূজা করা উচিত; **মন্ত্র-মূর্তয়ে**—যিনি মন্ত্র থেকে অভিন্ন।

অনুবাদ

নির্দিষ্ট উপচার সহকারে কিভাবে ভগবানের আরাধনা করা উচিত, সেই সম্পর্কে পূর্বতন ভগবদ্ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত, অথবা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে মন্ত্র থেকে অভিন্ন ভগবানকে মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা পূজা করা উচিত।

তাৎপর্য

এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি নির্দিষ্ট উপচারের দ্বারা ভগবানের স্বরূপের আরাধনা করার আয়োজন না করতে পারেন, তা হলে তিনি কেবল ভগবানের স্বরূপের ধ্যান করে এবং মানসে শাস্ত্রবর্ণিত সমস্ত উপচার, যথা—ফুল, চন্দন, শঙ্খ, ছত্র, ব্যজন, চামর ইত্যাদি নিবেদন করে ভগবানের আরাধনা করতে পারেন। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* উচ্চারণ করে ধ্যানের মাধ্যমে তা নিবেদন করতে হয়। যেহেতু মন্ত্র এবং পরমেশ্বর ভগবান অভিন্ন, তাই উপচারগুলি না থাকলেও মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের স্বরূপের আরাধনা করা যায়। এই প্রসঙ্গে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে মানসে ভগবানের পূজায় নিরত ব্রাহ্মণের কাহিনীটি বিবেচনা করা যায়। উপচারগুলি না থাকলেও মানসে সেইগুলির চিন্তা করে, মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে তা নিবেদন করা যায়। ভগবদ্ভক্তির পন্থা এতই উদার এবং সুবিধাজনক।

শ্লোক ৫৯-৬০

এবং কায়েন মনসা বচসা চ মনোগতম্ ।
পরিচর্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমৎপরিচর্যয়া ॥ ৫৯ ॥
পুংসামমায়িনাং সম্যগ্ভজতাং ভাববর্ধনঃ ।
শ্রেয়ো দিশত্যভিমতং যদ্ধর্মাদিষু দেহিনাম্ ॥ ৬০ ॥

এবম্—এইভাবে; **কায়েন**—দেহের দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বচসা**—বাণীর দ্বারা; **চ**—ও; **মনঃ-গতম্**—কেবল ভগবানের কথা চিন্তা করে; **পরিচর্যমাণঃ**—ভগবানের সেবায় যুক্ত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তি-মৎ**—ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুসারে;

পরিচর্যয়া—ভগবানের আরাধনার দ্বারা; **পুংসাম্**—ভক্তের; **অমায়িনাম্**—একনিষ্ঠ এবং ঐকান্তিক; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **ভজতাম্**—ভগবানের সেবায় যুক্ত; **ভাব-বর্ধনঃ**—ভগবান, যিনি তাঁর ভক্তের আনন্দ বর্ধন করেন; **শ্রেয়ঃ**—চরণ লক্ষ্য; **দিশতি**—প্রদান করেন; **অভিমতম্**—বাসনা; **যৎ**—যেভাবে; **ধর্ম-আদিষু**—ধর্ম ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে; **দেহিনাম্**—বদ্ধ জীবের।

অনুবাদ

এইভাবে যিনি ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, এবং বিধি অনুসারে ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপে যুক্ত, ভগবান তাঁকে তাঁর বাসনা অনুসারে বরদান করেন। ভক্ত যদি জড় ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে চান, তা হলে ভগবান তাঁকে তাঁর বাসনা অনুসারে সেই ফল প্রদান করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি এতই শক্তিশালী যে, তা সম্পাদন করার ফলে, যে-কোন ব্যক্তি ভগবানের কাছ থেকে তাঁর যা ইচ্ছা তাই লাভ করতে পারেন। বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট, এবং তাই তারা জড়-জাগতিক লাভের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করে।

শ্লোক ৬১

বিরক্তশ্চেন্দ্রিয়রতৌ ভক্তিযোগেন ভূয়সা ।
তং নিরন্তরভাবেন ভজেতাদ্ধা বিমুক্তয়ে ॥ ৬১ ॥

বিরক্তঃ চ—সম্পূর্ণরূপে বৈরাগ্যময় জীবন, **ইন্দ্রিয়-রতৌ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়ে; **ভক্তি-যোগেন**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **ভূয়সা**—অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে; **তম্**—তাঁকে (পরমেশ্বরকে); **নিরন্তর**—নিরন্তর, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা; **ভাবেন**—দিব্য আনন্দের সর্বোচ্চ স্তরে; **ভজেত**—আরাধনা করা অবশ্য কর্তব্য; **অদ্ধা**—সরাসরিভাবে; **বিমুক্তয়ে**—মুক্তির জন্য।

অনুবাদ

কেউ যদি মুক্তি লাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হন, তা হলে তাঁর পক্ষে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভাবাবিষ্ট হয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত, এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে অবশ্যই দূরে থাকা উচিত।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য অনুসারে, বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তির সিদ্ধির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সাধারণত মানুষেরা হচ্ছে কর্মী, কারণ তারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কার্যকলাপে যুক্ত। কর্মীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন জ্ঞানী, যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। যোগীরা তাঁদের থেকেও উন্নত, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন। আর তাঁদেরও ঊর্ধ্বে হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত, যিনি কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবাতেই যুক্ত, তিনি দিব্য ভাবের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত।

এখানে ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কোন বাসনা থাকে, তা হলে তিনি যেন সরাসরিভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। অপবর্গ বা মুক্তির পন্থা শুরু হয় মোক্ষের স্তর থেকে। এই শ্লোকে *বিমুক্তয়ে* শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি এই জড় জগতে সুখী হতে চান, তা হলে তিনি বিভিন্ন উচ্চতর লোকে যাওয়ার অভিলাষ করতে পারেন, যেখানকার ইন্দ্রিয় সুখভোগের মান অনেক উন্নত স্তরের, কিন্তু প্রকৃত মোক্ষ সম্পাদিত হয় এই প্রকার কোন বাসনা ব্যতীত। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* বলা হয়েছে *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*, 'ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনারহিত'। যাঁরা তা সত্ত্বেও জড়-জাগতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে অথবা বিভিন্ন লোকে সুখভোগ করতে চান, তাঁদের জন্য ভক্তিযোগের মাধ্যমে মুক্তির উপদেশ দেওয়া হয়নি। যাঁরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, তাঁরাই কেবল অত্যন্ত শুদ্ধভাবে ভক্তিযোগ বা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারেন। ধর্ম, অর্থ এবং কাম পর্যন্ত চতুর্বর্গের পন্থা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য, কিন্তু কেউ যখন মোক্ষ বা নির্বিশেষ মুক্তির স্তরে আসেন, তখন তিনি ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চান। কিন্তু সেটিও এক প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। কিন্তু কেউ যখন মুক্তির স্তর অতিক্রম করেন, তখন তিনি ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের জন্য ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করেন। সেটিকে বলা হয় বিমুক্তি। সেই বিশেষ বিমুক্তির জন্য নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৬২

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ নৃপার্ভকঃ ।
যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচর্চিতম্ ॥ ৬২ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত; **তম্**—তাঁকে (নারদ মুনিকে); **পরিক্রম্য**—পরিক্রমা করে; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **চ**—ও; **নৃপ-অর্ভকঃ**—রাজকুমার; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **মধুবনম্**—বৃন্দাবনে মধুবন নামক বনে; **পুণ্যম্**—পবিত্র এবং কল্যাণজনক; **হরেঃ**—ভগবানের; **চরণ-চর্চিতম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের চিহ্নসমন্বিত।

অনুবাদ

রাজপুত্র ধ্রুব মহারাজ যখন এইভাবে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট হলেন, তখন তিনি তাঁর শ্রীগুরুদেব নারদ মুনিকে পরিক্রমা করে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তার পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হওয়ার ফলে, বিশেষভাবে পবিত্র সেই মধুবনের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

তপোবনং গতে তস্মিন্প্রবিষ্টোঽন্তঃপুরং মুনিঃ ।
অর্হিতার্হণকো রাজ্ঞা সুখাসীন উবাচ তম্ ॥ ৬৩ ॥

তপঃ-বনম্—যে বনে ধ্রুব মহারাজ তপস্যা করেছিলেন; **গতে**—গিয়ে; **তস্মিন্**—সেখানে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **অন্তঃ-পুরম্**—অন্তঃপুরে; **মুনিঃ**—মহামুনি নারদ; **অর্হিত**—পূজিত হয়ে; **অর্হণকঃ**—শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের দ্বারা; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **সুখ-আসীনঃ**—যখন তিনি আরামপূর্বক আসনে উপবিষ্ট ছিলেন; **উবাচ**—বলেছিলেন; **তম্**—তাঁকে (রাজাকে)।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য মধুবনে গিয়েছিলেন, তখন নারদ মুনি প্রাসাদে রাজা কিভাবে আছেন তা দেখতে যেতে মনস্থ করেছিলেন। নারদ মুনি যখন সেখানে গেলেন, তখন রাজা তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। সুখে আসনে উপবিষ্ট হয়ে নারদ মুনি বলেছিলেন।

শ্লোক ৬৪

নারদ উবাচ

রাজন্ কিং ধ্যায়সে দীর্ঘং মুখেন পরিশুষ্যতা ।
কিং বা ন রিষ্যতে কামো ধর্মো বার্থেন সংযুতঃ ॥ ৬৪ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বলেছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ; **কিম্**—কি; **ধ্যায়সে**—চিন্তা করছেন; **দীর্ঘম্**—অত্যন্ত গভীরভাবে; **মুখেন**—আপনার মুখ; **পরিশুষ্যতা**—যেন শুকিয়ে গেছে; **কিম্ বা**—অথবা; **ন**—না; **রিষ্যতে**—হারিয়ে গেছে; **কামঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **ধর্মঃ**—ধর্মানুষ্ঠান; **বা**—অথবা; **অর্থেন**—অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারা; **সংযুতঃ**—সহ।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহারাজ! আপনার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক বলে মনে হচ্ছে, এবং আপনি যেন দীর্ঘকাল ধরে কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। কিন্তু কেন এই অবস্থা হয়েছে? আপনার ধর্ম অনুষ্ঠানে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে কি কোন বাধা সৃষ্টি হয়েছে?

তাৎপর্য

মানব জীবনের উন্নতির চারটি স্তর হচ্ছে—ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং কারও ক্ষেত্রে, মুক্তি। নারদ মুনি রাজার কাছে মুক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেননি, কেবল রাজ্য শাসন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যা ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের উন্নতি সাধনের জন্য। যেহেতু এই প্রকার কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিরা মুক্তির বিষয়ে আগ্রহী নন, তাই নারদ মুনি রাজার কাছে সেই সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করেননি। মুক্তি কেবল তাঁদেরই জন্য, যাঁরা ধর্ম, অর্থ এবং কামের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়েছেন।

শ্লোক ৬৫

রাজোবাচ

সুতো মে বালকো ব্রহ্মন্ স্ত্রৈণেনাকরুণাত্মনা ।
নির্বাসিতঃ পঞ্চবর্ষঃ সহ মাত্রা মহান্‌কবিঃ ॥ ৬৫ ॥

রাজা উবাচ—রাজা উত্তর দিলেন; **সুতঃ**—পুত্র; **মে**—আমার; **বালকঃ**—অল্পবয়স্ক বালক; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **স্ত্রৈণেন**—স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তির; **অকরুণা-আত্মনা**—অত্যন্ত কঠোর হৃদয় এবং নির্দয়; **নির্বাসিতঃ**—নির্বাসিত; **পঞ্চ-বর্ষঃ**—মাত্র পঞ্চবর্ষীয় বালক হওয়া সত্ত্বেও; **সহ**—সহ; **মাত্রা**—মাতা; **মহান্**—মহাত্মা; **কবিঃ**—ভক্ত।

অনুবাদ

রাজা উত্তর দিলেন—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি অত্যন্ত স্ত্রৈণ, এবং আমি এতই অধঃপতিত যে, আমি আমার পঞ্চবর্ষীয় বালকের প্রতিও অত্যন্ত নির্দয় হয়েছি। সে যদিও একজন মহাত্মা এবং ভগবানের এক মহান ভক্ত, তবুও তার মাতা সহ তাকে আমি নির্বাসিত করেছি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কয়েকটি বিশেষ শব্দ রয়েছে, যেগুলি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে বোঝা উচিত। রাজা বলেছেন, যেহেতু তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাই তিনি নির্দয় হয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফল। রাজার দুই পত্নী ছিলেন; প্রথম পত্নী সুনীতি এবং দ্বিতীয় পত্নী সুরুচি। তিনি তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাই তিনি ধ্রুব মহারাজের প্রতি যথাযথভাবে আচরণ করতে পারেননি। সেটি ছিল তপস্যা করার জন্য ধ্রুব মহারাজের গৃহ ত্যাগের কারণ। যদিও রাজা একজন পিতারূপে তাঁর পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তবুও তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, ধ্রুব মহারাজের প্রতি তাঁর স্নেহ হ্রাস পেয়েছিল। এখন ধ্রুব মহারাজ এবং তাঁর মাতা সুনীতি, যাঁরা এক প্রকার গৃহ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন, তাঁদের জন্য তিনি অনুতাপ করছেন। ধ্রুব মহারাজ বনে গিয়েছিলেন, এবং যেহেতু তাঁর মাতা রাজা কর্তৃক অবহেলিত হয়েছিলেন, তাই তিনিও প্রায় নির্বাসিতই ছিলেন রাজা তাঁর পঞ্চবর্ষীয় পুত্র ধ্রুবকে নির্বাসিত করার ফলে অনুতাপ করছিলেন। পিতার পক্ষে কখনই তাঁর পুত্র অথবা পত্নীকে নির্বাসিত করা অথবা তাঁদের ভরণপোষণে অবহেলা করা উচিত নয় তাঁদের উভয়ের প্রতি অবহেলা করার ফলে, তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এবং তাঁর মুখ শুষ্ক বলে মনে হয়েছিল। মনু স্মৃতি অনুসারে, কখনও পত্নী এবং সন্তানদের পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যদি পত্নী এবং সন্তানেরা অবাধ্য হয় এবং গৃহস্থ-জীবনের বিধিগুলি অনুসরণ না করে, তা হলে কখনও কখনও তাদের পরিত্যাগ করা যেতে পারে। কিন্তু ধ্রুব মহারাজের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিল না, কারণ ধ্রুব মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত শিষ্ট এবং বাধ্য। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত। এই প্রকার ব্যক্তিকে কখনই অবহেলা করা উচিত নয়, তবুও তাঁকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি এখন অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করছেন।

শ্লোক ৬৬

অপ্যনাথং বনে ব্রহ্মন্মাস্মাদন্ত্যর্ভকং বৃকাঃ ।
শ্রান্তং শয়ানং ক্ষুধিতং পরিম্লানমুখাম্বুজম্ ॥ ৬৬ ॥

অপি—নিশ্চিতভাবে; **অনাথম্**—অরক্ষিত; **বনে**—বনে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **মা**—নয় কি; **স্ম**—করেনি; **অদন্তি**—ভক্ষণ করেছে; **অর্ভকম্**—অসহায় বালককে; **বৃকাঃ**—নেকড়ে বাঘ; **শ্রান্তম্**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **শয়ানম্**—শয়ন করেছে; **ক্ষুধিতম্**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **পরিম্লান**—শুষ্ক; **মুখ-অম্বুজম্**—পদ্মসদৃশ মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! আমার পুত্রের মুখমণ্ডল ঠিক একটি পদ্মফুলের মতো। আমি তার বিপজ্জনক অবস্থার কথা চিন্তা করছি। সে অরক্ষিত, এবং সে হয়তো অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। বনের কোথাও সে হয়তো শুয়ে আছে এবং নেকড়েরা তাকে খাওয়ার জন্য হয়তো আক্রমণ করেছে।

শ্লোক ৬৭

অহো মে বত দৌরাত্ম্যং স্ত্রীজিতস্যোপধারয় ।
যোঽঙ্কং প্রেম্ণারুরুক্ষন্তং নাভ্যনন্দমসত্তমঃ ॥ ৬৭ ॥

অহো—হায়; **মে**—আমার; **বত**—নিশ্চিতভাবে; **দৌরাত্ম্যম্**—নিষ্ঠুরতা; **স্ত্রী-জিতস্য**—স্ত্রীর বশীভূত; **উপধারয়**—এই বিষয়ে আমার কথা একটু চিন্তা করুন; **যঃ**—যে; **অঙ্কম্**—কোলে; **প্রেম্ণা**—প্রেমের বশে; **আরুরুক্ষন্তম্**—উঠতে চেষ্টা করে; **ন**—না; **অভ্যনন্দম্**—যথাযথ আদর; **অসৎ-তমঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

অনুবাদ

হায়! ভেবে দেখুন আমি আমার স্ত্রীর কত বশীভূত। আমার নিষ্ঠুরতার কথা একটু কল্পনা করুন। প্রেমবশে আমার সেই সুপুত্র আমার কোলে ওঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি তাকে আদর করিনি, এমন কি ক্ষণিকের জন্যও আমি তাকে স্নেহ-সম্ভাষণ করিনি। ভেবে দেখুন আমি কত নির্দয়।

শ্লোক ৬৮

নারদ উবাচ

মা মা শুচঃ স্বতনয়ং দেবগুপ্তং বিশাম্পতে ।
তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবৃঙ্‌ক্তে যদ্‌যশো জগৎ ॥ ৬৮ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **মা**—করো না; **মা**—করো না; **শুচঃ**—শোক; **স্ব-তনয়ম্**—আপনার পুত্রের; **দেব-গুপ্তম্**—ভগবান কর্তৃক রক্ষিত; **বিশাম্-পতে**—হে মানব-সমাজের প্রভু; **তৎ**—তার; **প্রভাবম্**—প্রভাব; **অবিজ্ঞায়**—অজ্ঞাত; **প্রাবৃঙ্‌ক্তে**—পরিব্যাপ্ত; **যৎ**—যার; **যশঃ**—কীর্তি; **জগৎ**—সারা জগৎ জুড়ে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ উত্তর দিলেন—হে রাজন্! আপনি আপনার পুত্রের জন্য শোক করবেন না। সে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পূর্ণরূপে রক্ষিত। আপনি যদিও তার প্রভাব সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নন, কিন্তু তার কীর্তি ইতিমধ্যে সারা জগৎ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

কখনও কখনও আমরা যখন শুনি যে, কোন মহান ঋষি বা ভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য অথবা ধ্যান করার জন্য বনে গিয়েছেন, তখন আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হই—সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত হয়ে বনে থাকা কি করে সম্ভব? সেই প্রশ্নের উত্তরে মহান আচার্য নারদ মুনি বলেছেন যে, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হন। শরণাগতি বা আত্ম-সমর্পণের অর্থ হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান যে শরণাগত আত্মাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, সেই সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা। তাই ভগবদ্ভক্ত কখনই নিঃসঙ্গ বা অরক্ষিত নন। ধ্রুব মহারাজের স্নেহপরায়ণ পিতা মনে করেছিলেন যে, তাঁর পাঁচ বছর বয়স্ক শিশু-পুত্রটি হয়তো বনে এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে, কিন্তু নারদ মুনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "আপনার পুত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আপনার যথাযথ ধারণা নেই।" এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন স্থানে কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তিনি কখনই অরক্ষিত থাকেন না।

শ্লোক ৬৯

সুদুষ্করং কর্ম কৃত্বা লোকপালৈরপি প্রভুঃ ।
ঐষ্যত্যচিরতো রাজন্ যশো বিপুলয়ংস্তব ॥ ৬৯ ॥

সু-দুষ্করম্—অসম্ভব; **কর্ম**—কার্য; **কৃত্বা**—অনুষ্ঠান করে; **লোক-পালৈঃ**—মহাপুরুষদের দ্বারা; **অপি**—ও; **প্রভুঃ**—সুযোগ্য; **ঐষ্যতি**—ফিরে আসবে; **অচিরতঃ**—শীঘ্রই; **রাজন্**—হে রাজন্; **যশঃ**—কীর্তি; **বিপুলয়ন্**—বিস্তার করবে; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার পুত্র অত্যন্ত সুযোগ্য। সে এমন কার্য সম্পাদন করবে, যা মহান রাজা এবং ঋষিদের পক্ষেও অসম্ভব। অচিরেই সে তার কার্য সম্পাদন করে গৃহে ফিরে আসবে। আপনি জেনে রাখুন যে, সে সারা জগৎ জুড়ে আপনার যশও বিস্তার করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ধ্রুব মহারাজকে নারদ মুনি প্রভু বলে বর্ণনা করেছেন। এই শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কখনও কখনও শ্রীগুরুদেবকে প্রভুপাদ বলে সম্বোধন করা হয়। প্রভু মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবান' এবং *পাদ* মানে হচ্ছে 'পদ'। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে শ্রীগুরুদেব পরমেশ্বর ভগবানের স্থান গ্রহণ করেন, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। ধ্রুব মহারাজকেও এখানে প্রভু বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তিনি হচ্ছেন একজন বৈষ্ণব আচার্য। প্রভু শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়ের স্বামী', ঠিক *স্বামী* শব্দটির মতো। এখানে আর একটি মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *সুদুষ্করম্*, 'যা করা অত্যন্ত কঠিন'। ধ্রুব মহারাজ কি কার্য গ্রহণ করেছিলেন? জীবনের সব চাইতে কঠিন কাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা, এবং ধ্রুব মহারাজ তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ধ্রুব মহারাজ চঞ্চল ছিলেন না; তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং সেই কার্য সম্পাদন করার পরেই কেবল তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন। অতএব প্রতিটি ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে, এই জীবনেই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। সেটিই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য সাধন।

শ্লোক ৭০

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং বিশ্রুত্য জগতীপতিঃ ।
রাজলক্ষ্মীমনাদৃত্য পুত্রমেবান্বচিন্তয়ৎ ॥ ৭০ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দেবর্ষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **প্রোক্তম্**—কথিত হয়ে; **বিশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **জগতী-পতিঃ**—রাজা; **রাজ-লক্ষ্মীম্**—তাঁর বিশাল রাজ্যের ঐশ্বর্য; **অনাদৃত্য**—অবহেলা করে; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্রকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্বচিন্তয়ৎ**—চিন্তা করতে লাগলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—নারদ মুনির দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে, রাজা উত্তানপাদ তাঁর বিশাল ঐশ্বর্যময় রাজ্যের সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করে, কেবল তাঁর পুত্র ধ্রুবের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭১

তত্রাভিষিক্তঃ প্রযতস্তামুপোষ্য বিভাবরীম্ ।
সমাহিতঃ পর্যচরদৃষ্যাদেশেন পুরুষম্ ॥ ৭১ ॥

তত্র—তার পর; **অভিষিক্তঃ**—স্নান করে; **প্রযতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **তাম্**—তা; **উপোষ্য**—উপবাস করে; **বিভাবরীম্**—রাত্রি; **সমাহিতঃ**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; **পর্যচরৎ**—আরাধনা করেছিলেন; **ঋষি**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **আদেশেন**—উপদেশ অনুসারে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

এদিকে ধ্রুব মহারাজ মধুবনে পৌঁছে, যমুনা নদীতে স্নান করেছিলেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে সেই রাত্রে উপবাস করেছিলেন। তার পর দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই বিশেষ শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর গুরুদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে আচরণ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চাই, তা হলে আমাদের অবশ্যই অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্বক শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের উপায়। সিদ্ধি লাভের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা কেউ যদি গুরুদেবের উপদেশ পালন করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করবেন।

গুরুদেবের আদেশ কিভাবে পালন করা যায়, সেটিই আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত। গুরুদেব তাঁর প্রতিটি শিষ্যকে বিশেষ আদেশ প্রদানে অত্যন্ত পারদর্শী, এবং শিষ্য যদি গুরুদেবের আদেশ পালন করে, তা হলে সেটিই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের পন্থা।

শ্লোক ৭২

ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিত্থবদরাশনঃ ।
আত্মবৃত্ত্যনুসারেণ মাসং নিন্যেঽর্চয়ন্‌হরিম্ ॥ ৭২ ॥

ত্রি—তিন; **রাত্র-অন্তে**—রাত্রি অতিবাহিত হলে; **ত্রি**—তিন; **রাত্র-অন্তে**—রাত্রির পর; **কপিত্থ-বদর**—কপিত্থ এবং বদর ফল; **অশনঃ**—আহার করে; **আত্ম-বৃত্তি**—কেবল দেহ ধারণের জন্য; **অনুসারেণ**—আবশ্যকতা অনুসারে বা ন্যূনতম; **মাসম্**—এক মাস; **নিন্যে**—অতিবাহিত হয়; **অর্চয়ন্**—আরাধনা করে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

প্রথম মাসে ধ্রুব মহারাজ কেবল তাঁর দেহ ধারণের জন্য, প্রতি তিন দিন অন্তর কেবল কপিত্থ এবং বদরী ফল ভক্ষণ করেন। এইভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় উন্নতি সাধন করতে থাকেন।

তাৎপর্য

কপিত্থ এক প্রকার ফল, যাকে প্রচলিত বাংলায় বলা হয় কয়েতবেল। মানুষ সাধারণত এই ফলটি খায় না; এটি বনের বানরদের খাদ্য। ধ্রুব মহাবাজ কিন্তু কেবল তাঁর শরীর ধারণের জন্য এই প্রকার ফলই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কোন রকম সুস্বাদু আহারের অন্বেষণ করেননি। দেহ ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, কিন্তু ভক্তের পক্ষে তাঁর রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য আহার করা উচিত নয়। *ভগবদ্‌গীতায়* উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, শরীর সুস্থ রাখার জন্য কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আহার করা উচিত, ভোগবিলাসিতার জন্য নয়। ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন একজন আচার্য, এবং কঠোর তপস্যা করে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা উচিত। ধ্রুব মহারাজের ভক্তি আমাদের সাবধানতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত; তিনি যে কত কষ্টে তাঁর দিন অতিবাহিত করেছিলেন তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হবে। আমাদের সব

সময় মনে রাখা উচিত যে, ভগবানের ভক্ত হওয়া সহজ কার্য নয়, কিন্তু এই যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি উদার উপদেশগুলিও পালন না করি, তা হলে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের আশা আমরা কিভাবে করতে পারি? এই যুগে ধ্রুব মহারাজের মতো তপস্যা করা সম্ভব নয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির বিধিগুলি পালন করা অবশ্য কর্তব্য; গুরুদেবের আদিষ্ট বিধি-নিষেধগুলি কখনও লঙ্ঘন করা উচিত নয়, কারণ সেইগুলি পালন করার ফলে, বদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবদ্ভক্তির পন্থা সরল হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে, কেবল চারটি নিয়ম পালন করে প্রতিদিন ষোল মালা জপ করতে আমরা বলি, এবং রসনা তৃপ্তির জন্য বিলাসবহুল আহার না করে, ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করতে বলি। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা উপবাস করছি বলে ভগবানকেও উপবাস করতে হবে। ভগবানকে যথাসাধ্য সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করতে হবে। কিন্তু আমরা সব সময় চেষ্টা করব আমাদের জিহ্বার তৃপ্তিসাধন না করার। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে, যতদূর সম্ভব সাদাসিধে আহার করতে হবে.

আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ধ্রুব মহারাজের তুলনায় আমরা অত্যন্ত নগণ্য। আত্ম-উপলব্ধির জন্য ধ্রুব মহারাজ যা করেছিলেন তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই যুগের জন্য বিশেষ সুবিধা লাভ করেছি, তাই আমাদের অন্তত সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ভগবদ্ভক্তির নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্মগুলি সম্পাদন করা না হলে, আমাদের উদ্দেশ্য কখনই সাধন হবে না। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ধ্রুব মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, কারণ তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ব্রত ছিলেন। এই জীবনেই ভগবদ্ভক্তির কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত; আমাদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পরবর্তী জীবনের প্রতীক্ষা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৭৩

দ্বিতীয়ং চ তথা মাসং ষষ্ঠে ষষ্ঠেঽর্ভকো দিনে ।
তৃণপর্ণাদিভিঃ শীর্ণৈঃ কৃতান্নোঽভ্যর্চয়ন্বিভুম্ ॥ ৭৩ ॥

দ্বিতীয়ম্—পরবর্তী মাসে; **চ**—ও; **তথা**—উপরোক্ত বিধি অনুসারে; **মাসম্**—মাস; **ষষ্ঠে ষষ্ঠে**—প্রতি ছয় দিন অন্তর; **অর্ভকঃ**—নিরীহ বালক; **দিনে**—দিনে; **তৃণ-পর্ণ-আদিভিঃ**—ঘাস এবং পাতা; **শীর্ণৈঃ**—শুষ্ক; **কৃত-অন্নঃ**—অন্নরূপে; **অভ্যর্চয়ন্**—এইভাবে আরাধনা করতে থাকে; **বিভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানের জন্য।

অনুবাদ

দ্বিতীয় মাসে ধ্রুব মহারাজ প্রতি ছয় দিন অন্তর কেবল শুষ্ক তৃণ এবং পত্র আহার করতে থাকেন। এইভাবে তিনি ভগবানের আরাধনা করতে থাকেন।

শ্লোক ৭৪

তৃতীয়ং চানয়ন্মাসং নবমে নবমেঽহনি ।
অব্ভক্ষ উত্তমশ্লোকমুপাধাবৎসমাধিনা ॥ ৭৪ ॥

তৃতীয়ম্—তৃতীয় মাসে; **চ**—ও; **আনয়ন্**—অতিবাহিত হলে; **মাসম্**—এক মাস; **নবমে নবমে**—প্রতি নবম; **অহনি**—দিনে; **অপ্-ভক্ষঃ**—কেবল জল পান করে; **উত্তম-শ্লোকম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে, যিনি সুন্দরভাবে মনোনীত শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন; **উপাধাবৎ**—পূজিত; **সমাধিনা**—সমাধিতে।

অনুবাদ

তৃতীয় মাসে প্রতি নয় দিন অন্তর তিনি কেবল জলপান করেছিলেন। এইভাবে পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হয়ে, তিনি উত্তমশ্লোক পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৭৫

চতুর্থমপি বৈ মাসং দ্বাদশে দ্বাদশেঽহনি ।
বায়ুভক্ষো জিতশ্বাসো ধ্যায়ন্দেবমধারয়ৎ ॥ ৭৫ ॥

চতুর্থম্—চতুর্থ; **অপি**—ও; **বৈ**—এইভাবে; **মাসম্**—মাসে; **দ্বাদশে দ্বাদশে অহনি**—প্রতি বারো দিন অন্তর; **বায়ু**—বায়ু; **ভক্ষঃ**—আহার করে; **জিত-শ্বাসঃ**—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অধারয়ৎ**—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

চতুর্থ মাসে ধ্রুব মহারাজ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি কেবল প্রতি বারো দিন অন্তর শ্বাসগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্যানমগ্ন হয়ে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৭৬

পঞ্চমে মাস্যনুপ্রাপ্তে জিতশ্বাসো নৃপাত্মজঃ ।
ধ্যায়ন্ ব্রহ্ম পদৈকেন তস্থৌ স্থাণুরিবাচলঃ ॥ ৭৬ ॥

পঞ্চমে—পঞ্চম; **মাসি**—মাসে; **অনুপ্রাপ্তে**—স্থিত হয়ে; **জিত-শ্বাসঃ**—এবং তাঁর শ্বাস পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে; **নৃপ-আত্মজঃ**—রাজপুত্র; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **ব্রহ্ম**—পরমেশ্বর ভগবান; **পদা-একেন**—এক পায়ে; **তস্থৌ**—দাঁড়িয়ে ছিলেন; **স্থাণুঃ**—ঠিক একটি স্তম্ভের মতো; **ইব**—মতো; **অচলঃ**—নিশ্চলভাবে।

অনুবাদ

পঞ্চম মাসে, রাজপুত্র ধ্রুব তাঁর শ্বাস এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যে, তিনি একটি স্তম্ভের মতো নিশ্চলভাবে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মনকে পরব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করেছিলেন।

শ্লোক ৭৭

সর্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্ ।
ধ্যায়ন্‌ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎকিঞ্চনাপরম্ ॥ ৭৭ ॥

সর্বতঃ—সর্বতোভাবে; **মনঃ**—মন; **আকৃষ্য**—একাগ্র করে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ভূত-ইন্দ্রিয়-আশয়ম্**—ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের আশ্রয়; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **ন অদ্রাক্ষীৎ**—দেখেননি; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **অপরম্**—অন্য।

অনুবাদ

তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইন্দ্রিয়সকল ও তাদের বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, এবং এইভাবে তাঁর মনকে অন্য কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হতে দিয়ে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের রূপে একাগ্র করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্যানের যৌগিক তত্ত্ব এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্য কোন বিষয়ে মনকে বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের রূপে স্থির করতে হয়। এমন

নয় যে, কোন নিরাকার বস্তুতে মনকে একাগ্রীভূত করা যায় অথবা ধ্যান করা যায়। সেই চেষ্টা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা তাতে কেবল অনর্থক ক্লেশই লাভ হয়, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৭৮

আধারং মহদাদীনাং প্রধানপুরুষেশ্বরম্ ।
ব্রহ্ম ধারয়মাণস্য ত্রয়ো লোকাশ্চকম্পিরে ॥ ৭৮ ॥

আধারম্—আশ্রয়; **মহৎ-আদীনাম্**—সমস্ত জড় উপাদানের আদি উৎস মহত্তত্ত্ব; **প্রধান**—মুখ্য; **পুরুষ-ঈশ্বরম্**—সমস্ত জীবের প্রভু; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্ম, পরমেশ্বর ভগবান; **ধারয়মাণস্য**—হৃদয়ে ধারণ করে; **ত্রয়ঃ**—ত্রিভুবন; **লোকাঃ**—সমস্ত লোক; **চকম্পিরে**—কম্পিত হতে শুরু করেছিল।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন এইভাবে সমগ্র জড় সৃষ্টির আশ্রয় এবং সমস্ত জীবের প্রভু ভগবানকে ধারণ করেছিলেন, তখন ত্রিভুবন কম্পিত হতে শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ব্রহ্ম* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ব্রহ্মন্* শব্দের অর্থ কেবল বৃহত্তমই নয়, অধিকন্তু যার অন্তহীনভাবে বিস্তৃত হওয়ার শক্তি রয়েছে। তা হলে ধ্রুব মহারাজের পক্ষে ব্রহ্মকে তাঁর হৃদয় অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করা কি করে সম্ভব হয়েছিল? সেই প্রশ্নটির উত্তর শ্রীল জীব গোস্বামী খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন ব্রহ্মের উৎস। যেহেতু জড় এবং চেতন সব কিছুই তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাই কোন কিছুই তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। *ভগবদ্গীতাতেও* পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, "আমি হচ্ছি ব্রহ্মের আশ্রয়।" বহু মানুষ, বিশেষ করে মায়াবাদীরা ব্রহ্মকে মহত্তম, সর্বব্যাপক বলে মনে করে, কিন্তু এই শ্লোকটিতে এবং *ভগবদ্গীতা* আদি অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন ব্রহ্মের আশ্রয়, ঠিক যেমন সূর্যকিরণের আশ্রয় হচ্ছে সূর্যগোলক। তাই শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবানের চিন্ময় রূপ যেহেতু সমস্ত মহত্ত্বের বীজ, তাই তিনি হচ্ছেন পরমব্রহ্ম। যেহেতু ধ্রুব মহারাজের হৃদয়ে পরমব্রহ্ম অবস্থিত হয়েছিলেন, তাই তিনি গুরুতম থেকেও গুরুতর হয়েছিলেন, সেই জন্য ত্রিভুবনে এবং চিৎ-জগতেও সব কিছু কম্পিত হয়েছিল।

মহত্তত্ত্ব হচ্ছে সমস্ত জীব সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের চরম পরিণতি। ব্রহ্ম এই মহত্তত্ত্বেরও আশ্রয়, সমস্ত জড় এবং জীব যার অন্তর্গত। এই সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *প্রধান* এবং *পুরুষ* উভয়েরই প্রভু। *প্রধান* মানে হচ্ছে আকাশ আদি সূক্ষ্ম বস্তু, এবং *পুরুষ* মানে হচ্ছে চিৎ-স্ফুলিঙ্গ জীব, যারা সূক্ষ্ম জড় অস্তিত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা অনুসারে, তাদেরকে পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতিও বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ উভয় প্রকৃতিরই নিয়ন্তা, তাই তিনি *প্রধান* এবং *পুরুষের* প্রভু। বৈদিক মন্ত্রেও পরমব্রহ্মকে *অন্তঃ-প্রবিষ্টঃ শাস্তা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তিনি সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। *ব্রহ্ম-সংহিতাতেও* (৫/৩৫) তা প্রতিপন্ন হয়েছে। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*— তিনি কেবল ব্রহ্মাণ্ডেই নয়, প্রতিটি পরমাণুতে পর্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েছেন। *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/৪২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নম্*। সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর হৃদয়ে ভগবানের সঙ্গে নিরন্তর সাহচর্যের ফলে, ধ্রুব মহারাজ সর্ব বৃহত্তম ব্রহ্মের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি সব চাইতে ভারী হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়েছিল। চরমে বলা যায় যে, যিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় রূপের ধ্যান করেন, তিনি অনায়াসে তাঁর কার্যকলাপের দ্বারা সমগ্র জগৎকে বিস্ময়ে অভিভূত করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে যোগের সিদ্ধি, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) প্রতিপন্ন হয়েছে। *যোগিনাম্ অপি সর্বেষাম্*—সমস্ত যোগীদের মধ্যে ভক্তিযোগী, যিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সাধারণ যোগীরা কোন আশ্চর্যজনক ভৌতিক কার্য প্রদর্শন করতে পারেন, যাকে বলা হয় অষ্টসিদ্ধি, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত সিদ্ধির অতীত এমন কার্য সম্পাদন করতে পারেন, যার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়।

শ্লোক ৭৯

যদৈকপাদেন সপার্থিবার্ভক-
স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী ।
ননাম তত্রার্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা
তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥ ৭৯ ॥

যদা—যখন; **এক**—এক; **পাদেন**—পায়ে; **সঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **পার্থিব**—রাজার; **অর্ভকঃ**—বালক; **তস্থৌ**—দাঁড়িয়েছিলেন; **তৎ-অঙ্গুষ্ঠ**—তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠে; **নিপীড়িতা**—চাপের ফলে; **মহী**—পৃথিবী; **ননাম**—অবনত হয়েছিল; **তত্র**—তখন; **অর্ধম্**—অর্ধ; **ইভ-ইন্দ্র**—গজেন্দ্র; **ধিষ্ঠিতা**—স্থিত হয়ে; **তরী ইব**—নৌকার মতো, **সব্য-ইতরতঃ**—ডাইনে এবং বাঁয়ে; **পদে পদে**—প্রতি পদক্ষেপে।

অনুবাদ

রাজপুত্র ধ্রুব যখন তাঁর এক পায়ের উপর অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের পীড়নে নিপীড়িতা হয়ে ধরিত্রীর অর্ধাংশ অবনত হয়েছিল, ঠিক যেমন একটি হাতিকে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়ার সময়, তার দক্ষিণ এবং বামপদ পরিবর্তনে নৌকাটি প্রকম্পিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ পদটি হচ্ছে *পার্থিবার্ভকঃ,* অর্থাৎ রাজার পুত্র . ধ্রুব মহারাজ যখন গৃহে ছিলেন, তখন রাজার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পিতার কোলে উঠতে পারেননি কিন্তু তিনি যখন আত্ম-উপলব্ধির মার্গে বা ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করেছিলেন, তখন তাঁর পায়ের আঙ্গুলের চাপে সারা পৃথিবীকে অবনত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে সাধারণ চেতনা এবং কৃষ্ণভাবনার মধ্যে পার্থক্য। সাধারণ চেতনায় একটি রাজার পুত্রকেও তাঁর পিতা কোন কিছু দিতে অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু তিনি যখন পূর্ণরূপে তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন তিনি তাঁর পায়ের আঙ্গুলের চাপে পৃথিবীকে পর্যন্ত অবনমিত করতে পারেন।

কেউ তর্ক করতে পারে, "ধ্রুব মহারাজ, যিনি তাঁর পিতার কোলে পর্যন্ত উঠতে পারেননি, তিনি কিভাবে সারা পৃথিবীকে অবনমিত করতে পেরেছিলেন?" বিজ্ঞ জনেরা কখনও এই প্রকার তর্কের গুরুত্ব দেন না। কারণ এই প্রকার যুক্তিকে বলা হয় *নগ্ন মাতৃকা ন্যায়*। এই ন্যায় অনুসারে মনে করা যেতে পারে যে, যেহেতু মা তাঁর শৈশবে নগ্ন ছিলেন, তাই তিনি বড় হয়েও নগ্ন থাকবেন। ধ্রুব মহারাজের বিমাতা এইভাবে চিন্তা করে থাকতে পারেন—যেহেতু তিনি তাঁকে তাঁর পিতার কোলে উঠবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, তাই ধ্রুব সারা পৃথিবীকে অবনত করার মতো আশ্চর্যজনক কার্য কিভাবে সম্পাদন করতে পারেন? তিনি যখন জানতে পেরেছিলেন যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর হৃদয়ে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার ফলে, সারা পৃথিবীকে তাঁর পায়ের চাপে অবনত করতে পেরেছিলেন,

ঠিক যেমন নৌকায় করে একটি হাতিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার পায়ের চাপে নৌকাটি টলমল করতে থাকে, তখন তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮০

তস্মিন্নভিধ্যায়তি বিশ্বমাত্মনো
দ্বারং নিরুধ্যাসুমনন্যয়া ধিয়া ।
লোকা নিরুচ্ছ্বাসনিপীড়িতা ভৃশং
সলোকপালাঃ শরণং যযুর্হরিম্ ॥ ৮০ ॥

তস্মিন্—ধ্রুব মহারাজ; **অভিধ্যায়তি**—পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে যখন ধ্যান করছিলেন; **বিশ্বম্ আত্মনঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ শরীর; **দ্বারম্**—ছিদ্র; **নিরুধ্য**—রোধ করে; **অসুম্**—প্রাণবায়ু; **অনন্যয়া**—অবিচলিতভাবে; **ধিয়া**—ধ্যান; **লোকাঃ**—সমস্ত লোকসমূহ; **নিরুচ্ছ্বাস**—শ্বাসরোধ করে; **নিপীড়িতাঃ**—এইভাবে রুদ্ধশ্বাস হওয়ায়; **ভৃশম্**—অতি শীঘ্র; **স-লোক-পালাঃ**—বিভিন্ন লোকের সমস্ত মহান দেবতাগণ; **শরণম্**—আশ্রয়; **যযুঃ**—নিলেন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর পূর্ণ একাগ্রতার প্রভাবে, সমগ্র চেতনার উৎস ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মতো ভারী হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর দেহের দ্বারগুলি রুদ্ধ করার ফলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল। সমগ্র লোকের সমস্ত মহান দেবতারা এইভাবে রুদ্ধশ্বাস হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কয়েক শত মানুষ যখন বিমানে বসে থাকে, যদিও তারা ব্যষ্টি, তবুও তারা প্রত্যেকেই বিমানের সমষ্টিগত শক্তির অংশীদার, যা ঘণ্টায় হাজার হাজার মাইল বেগে উড়ে চলে; তেমনই একক শক্তি যখন পূর্ণ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন একক শক্তিও পূর্ণ শক্তিরই মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে, সমগ্র গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর চাপে সমগ্র পৃথিবী অবনমিত হয়েছিল। অধিকন্তু, তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে, তাঁর একক শরীরটি ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র শরীরে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে তিনি যখন তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানের উপর দৃঢ়ভাবে একাগ্রীভূত করার জন্য তাঁর দেহের দ্বারগুলি রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের

সমস্ত জীবেরা, এমন কি মহান দেবতারা পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন যে, তাঁদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁরা কি যে হচ্ছে তা বুঝতে না পেরে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর দেহের রন্ধ্রগুলি বন্ধ করার মাধ্যমে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শ্বাসরন্ধ্র রুদ্ধ করার যে দৃষ্টান্তটি আমরা ধ্রুব মহারাজের মাধ্যমে এখানে পাচ্ছি, তা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর ভক্তির দ্বারা সারা বিশ্বের সমস্ত জীবেদের ভগবদ্ভক্ত হতে প্রভাবিত করতে পারেন। শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত কেবল একজন শুদ্ধ ভক্তই সমগ্র বিশ্বের চেতনাকে কৃষ্ণভাবনায় পরিবর্তিত করতে পারেন। ধ্রুব মহারাজের চরিত্র অধ্যয়ন করলে, সেই কথা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ৮১

দেবা ঊচুঃ

নৈবং বিদামো ভগবন্ প্রাণরোধং
চরাচরস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ ।
বিধেহি তন্নো বৃজিনাদ্বিমোক্ষং
প্রাপ্তা বয়ং ত্বাং শরণং শরণ্যম্ ॥ ৮১ ॥

দেবাঃ ঊচুঃ—সমস্ত দেবতারা বললেন; **ন**—না; **এবম্**—এইভাবে; **বিদামঃ**—আমরা বুঝতে পারি; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **প্রাণ-রোধম্**—কিভাবে আমাদের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে; **চর**—জঙ্গম; **অচরস্য**—স্থাবর; **অখিল**—বিশ্বজনীন; **সত্ত্ব**—অস্তিত্ব; **ধাম্নঃ**—আগার; **বিধেহি**—কৃপাপূর্বক যা করণীয় তা করুন; **তৎ**—অতএব, **নঃ**—আমাদের; **বৃজিনাৎ**—সঙ্কট থেকে; **বিমোক্ষম্**—উদ্ধার; **প্রাপ্তাঃ**—নিকটবর্তী হয়ে; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **শরণম্**—আশ্রয়; **শরণ্যম্**—শরণ গ্রহণের যোগ্য।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—হে ভগবান! আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবেদের আশ্রয়। আমরা অনুভব করছি যে, সমস্ত জীবেদের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে। পূর্বে আমাদের কখনও এই রকম কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। যেহেতু আপনি সমস্ত শরণাগত জীবেদের চরম আশ্রয়, তাই আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি; দয়া করে আপনি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, ধ্রুব মহারাজের প্রভাব দেবতারা পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন, যা পূর্বে কখনও তাঁরা অনুভব করেননি। যেহেতু ধ্রুব মহারাজ তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবেরা যেখানে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে না, চিন্ময় জীবেরা সেখানে শ্বাস গ্রহণ করতে সক্ষম; জড় জগতের বদ্ধ জীবেরা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিসম্ভূত, কিন্তু চিন্ময় জীবেরা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিসম্ভূত। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবেদের শ্বাস কেন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তা জানবার জন্য দেবতারা উভয় প্রকার জীবেরই নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের কাছে গিয়েছিলেন। এই জড় জগতে সমস্ত সমস্যা সমাধানের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান। চিৎ-জগতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু জড়জগৎ সর্বদাই সমস্যায় পূর্ণ। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান জড় ও চিৎ উভয় জগতেরই প্রভু, তাই সমস্ত সমস্যাজনক পরিস্থিতির জন্য তাঁর কাছে যাওয়াই শ্রেয়। যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁদের এই জড় জগতে কোন সমস্যা নেই। *বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে* (*চৈতন্যচন্দ্রামৃত*); ভগবদ্ভক্ত সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত। ভক্তের কাছে এই পৃথিবীর সব কিছুই অত্যন্ত সুখকর, কারণ তিনি জানেন কিভাবে সব কিছু পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ব্যবহার করতে হয়।

শ্লোক ৮২

শ্রীভগবানুবাচ

মা ভৈষ্ট বালং তপসো দুরত্যয়া-
ন্নিবর্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম ।
যতো হি বঃ প্রাণনিরোধ আসী-
দৌত্তানপাদির্ময়ি সঙ্গতাত্মা ॥ ৮২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন; **মা ভৈষ্ট**—ভয় পেয়ো না; **বালম্**—বালক ধ্রুব; **তপসঃ**—তার কঠোর তপস্যার দ্বারা; **দুরত্যয়াৎ**—দৃঢ় সঙ্কল্প পরায়ণ; **নিবর্তয়িষ্যে**—আমি তাকে নিবৃত্ত হতে বলব; **প্রতিযাত**—তোমরা ফিরে যেতে পার; **স্ব-ধাম**—তোমাদের নিজ নিজ গৃহে; **যতঃ**—যার থেকে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বঃ**—তোমার; **প্রাণ-নিরোধঃ**—প্রাণবায়ুর রোধ; **আসীৎ**—হয়েছিল; **ঔত্তানপাদিঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের পুত্রের প্রভাবে; **ময়ি**—আমাকে; **সঙ্গত-আত্মা**—সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন—হে দেবতাগণ! তোমরা বিচলিত হয়ো না। মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র, যে এখন সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়েছে, তার কঠোর তপস্যা এবং দৃঢ় সংকল্পের ফলে তা হয়েছে। সে ব্রহ্মাণ্ডের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া রোধ করেছে। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গৃহে এখন নিরাপদে ফিরে যেতে পার। আমি সেই বালকটিকে এই কঠোর তপস্যা থেকে নিরস্ত করব, এবং তার ফলে তোমরা এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবে।

তাৎপর্য

এখানে *সঙ্গতাত্মা* শব্দটির কদর্থ করে মায়াবাদীরা বলে যে, পরম আত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ধ্রুব মহারাজের আত্মা এক হয়ে গিয়েছিল। এই শব্দটির দ্বারা মায়াবাদীরা প্রমাণ করতে চায় যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা এক হয়ে যায় এবং তখন আর জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ধ্রুব মহারাজ এমনভাবে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন যে, বিশ্বজনীন চেতনা বা তিনি নিজে ধ্রুব মহারাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেবতাদের প্রসন্ন করার জন্য, ধ্রুব মহারাজকে তাঁর এই কঠোর তপস্যা থেকে নিরস্ত করতে তিনি স্বয়ং সেখানে যাচ্ছিলেন। পরমাত্মা এবং জীবাত্মার এক হয়ে যাওয়ার মায়াবাদী সিদ্ধান্ত এই উক্তিতে সমর্থিত হয়নি। পক্ষান্তরে, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান ধ্রুব মহারাজকে এই কঠোর তপস্যা থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা সকলের প্রসন্নতা সাধন হয়, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে, গাছের প্রতিটি ডালপালা এবং পাতার সন্তুষ্টি বিধান হয়। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে আকর্ষণ করতে পারেন, তা হলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আকর্ষণ করতে পারেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ। সমস্ত দেবতারা শ্বাসরোধের ফলে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন তাঁর এক মহান ভক্ত এবং তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকলের বিনাশ সাধন করতে উদ্যত হননি। ভগবদ্ভক্ত কখনও অন্য জীবের প্রতি হিংসা করেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগ ও বনগমন' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

নবম অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের গৃহে প্রত্যাবর্তন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ত এবমুৎসন্নভয়া উরুক্রমে
কৃতাবনামাঃ প্রযযুস্ত্রিবিষ্টপম্ ।
সহস্রশীর্ষাপি ততো গরুত্মতা
মধোর্বনং ভৃত্যদিদৃক্ষয়া গতঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন; **তে**—দেবতারা; **এবম্**—এইভাবে; **উৎসন্ন-ভয়াঃ**—সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে; **উরুক্রমে**—পরমেশ্বর ভগবানকে, যাঁর কার্যকলাপ অসাধারণ; **কৃত-অবনামাঃ**—তাঁরা তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **প্রযযুঃ**—তাঁরা প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **ত্রি-বিষ্টপম্**—স্বর্গলোকে তাঁদের নিজ নিজ স্থানে; **সহস্র-শীর্ষা অপি**—সহস্রশীর্ষা নামক পরমেশ্বর ভগবানও; **ততঃ**—সেখান থেকে; **গরুত্মতা**—গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে; **মধোঃ বনম্**—মধুবনে; **ভৃত্য**—সেবক; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শনের ইচ্ছায়; **গতঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—ভগবান যখন এইভাবে দেবতাদের আশ্বাস দিলেন, তখন তাঁরা সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে আপন আপন স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তার পর পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সহস্রশীর্ষা অবতার থেকে অভিন্ন, তিনি গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর সেবক ধ্রুবকে দর্শন করার জন্য মধুবনে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সহস্রশীর্ষা শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানের গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপকে ইঙ্গিত করেছে। ভগবান যদিও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও এখানে তাঁকে

সহস্রশীর্ষা বিষ্ণু বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে অভিন্ন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর *ভাগবতামৃত* গ্রন্থে বিষ্ণুর এই রূপকে পৃশ্নিগর্ভ অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ধ্রুব মহারাজের বসবাসের জন্য ধ্রুবলোক সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ২

স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া
হৃৎপদ্মকোশে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্ ।
তিরোহিতং সহসৈবোপলক্ষ্য
বহিঃস্থিতং তদবস্থং দদর্শ ॥ ২ ॥

সঃ—ধ্রুব মহারাজ; **বৈ**—ও; **ধিয়া**—ধ্যানের দ্বারা; **যোগ-বিপাক-তীব্রয়া**—যোগ অভ্যাসের পরিপক্ক উপলব্ধির প্রভাবে; **হৃৎ**—হৃদয়; **পদ্ম-কোশে**—পদ্মে; **স্ফুরিতম্**—প্রকাশিত; **তড়িৎ-প্রভম্**—বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল; **তিরোহিতম্**—অন্তর্হিত হয়ে; **সহসা**—অকস্মাৎ; **এব**—ও; **উপলক্ষ্য**—দেখে; **বহিঃ-স্থিতম্**—বাহিরে অবস্থিত; **তৎ-অবস্থম্**—সেইভাবে; **দদর্শ**—দেখতে পেয়েছিলেন।

অনুবাদ

যোগসিদ্ধির প্রভাবে ধ্রুব মহারাজ বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল ভগবানের যে রূপের ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন, সেই রূপ সহসা অন্তর্হিত হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করা মাত্রই তিনি ঠিক যেভাবে তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে তাঁকে তাঁর সম্মুখে দেখতে পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর যোগসিদ্ধির প্রভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে দর্শন করছিলেন, কিন্তু সহসা পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর হৃদয় থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁকে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ধ্রুব মহারাজ তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করা মাত্রই তিনি ধ্যানস্থ অবস্থায় যেভাবে ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে

তাঁকে তাঁর সম্মুখে দেখতে পেয়েছিলেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে, *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন*—যে সাধু ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ভগবৎ প্রেম প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি সর্বদাই ভগবানের চিন্ময় শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেন। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের এই শ্যামসুন্দর রূপ কল্পনাপ্রসূত নয়। ভক্ত যখন ভগবদ্ভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের সময় যে শ্যামসুন্দরের কথা নিরন্তর চিন্তা করেছিলেন, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই ভক্তের হৃদয়ে তাঁর যে রূপ, মন্দিরে তাঁর যে রূপ এবং বৈকুণ্ঠ বা বৃন্দাবনধামে তাঁর যে স্বরূপ, সবই অভিন্ন। তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৩

তদ্দর্শনেনাগতসাধ্বসঃ ক্ষিতা-
ববন্দতাঙ্গং বিনময্য দণ্ডবৎ ।
দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভক-
শ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্ ॥ ৩ ॥

তৎ-দর্শনেন—ভগবানকে দর্শন করার পর; **আগত-সাধ্বসঃ**—ধ্রুব মহারাজ, অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে; **ক্ষিতৌ**—ভূমিতে; **অবন্দত**—নিবেদন করেছিলেন; **অঙ্গম্**—তাঁর দেহ; **বিনময্য**—অবনত হয়ে; **দণ্ডবৎ**—ঠিক একটি দণ্ডের মতো; **দৃগ্‌ভ্যাম্**—তাঁর চক্ষুদ্বয়; **প্রপশ্যন্**—দেখে; **প্রপিবন্**—পান করেছিল; **ইব**—মতো; **অর্ভকঃ**—বালক; **চুম্বন্**—চুম্বন করে; **ইব**—মতো; **আস্যেন**—তাঁর মুখের দ্বারা; **ভুজৈঃ**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **ইব**—মতো; **আশ্লিষন্**—আলিঙ্গন করে।

অনুবাদ

ভগবানকে সম্মুখে দর্শন করে ধ্রুব মহারাজ অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে, তিনি ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ ভাবাবিষ্ট হয়ে ভগবানকে এমনভাবে দর্শন করছিলেন, যেন তিনি তাঁর চক্ষুর দ্বারা ভগবানের সৌন্দর্য পান করছিলেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম চুম্বন করে, তিনি তাঁর বাহুর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন প্রত্যক্ষরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন, এবং তখন তিনি এমনভাবে ভগবানকে দর্শন করছিলেন, যেন মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর চক্ষুর দ্বারা তাঁর সমগ্র শরীর পান করছেন। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম এতই প্রবল যে, তিনি নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম চুম্বন করতে চান, তাঁর নখাগ্র স্পর্শ করতে চান এবং নিরন্তর তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আলিঙ্গন করতে চান। ধ্রুব মহারাজের এই সমস্ত আঙ্গিক অভিব্যক্তিগুলি ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার পর, তিনি ভগবদ্ভক্তিজনিত অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

স তং বিবক্ষন্তমতদ্বিদং হরি-
র্জ্ঞাত্বাস্য সর্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ ।
কৃতাঞ্জলিং ব্রহ্মময়েন কম্বুনা
পস্পর্শ বালং কৃপয়া কপোলে ॥ ৪ ॥

সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **তম্**—ধ্রুব মহারাজকে; **বিবক্ষন্তম্**—তাঁর গুণগান করার বাসনায়; **অ-তৎ-বিদম্**—সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **জ্ঞাত্বা**—বুঝতে পেরে; **অস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **সর্বস্য**—সকলের; **চ**—এবং; **হৃদি**—হৃদয়ে; **অবস্থিতঃ**—স্থিত হয়ে; **কৃত-অঞ্জলিম্**—হাত জোড় করে; **ব্রহ্ম-ময়েন**—বৈদিক মন্ত্রের শব্দযুক্ত; **কম্বুনা**—তাঁর শঙ্খের দ্বারা; **পস্পর্শ**—স্পর্শ করেছিলেন; **বালম্**—বালককে; **কৃপয়া**—তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **কপোলে**—গণ্ডে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যদিও ছিলেন একটি ছোট্ট বালক, তবুও তিনি উপযুক্ত শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ যথাযথভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারেননি। সর্ব অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান ধ্রুব মহারাজের সেই বিহ্বল অবস্থা বুঝতে পেরে, তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর শঙ্খের দ্বারা তাঁর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ধ্রুব মহারাজের মস্তক স্পর্শ করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রতিটি ভক্তই ভগবানের দিব্য গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করতে চান। ভক্তরা সর্বদাই ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী শ্রবণে আগ্রহী, এবং তাঁরা সর্বদাই তাঁর সেই গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করতে চান, কিন্তু কখনও কখনও বিনম্রতাবশত তাঁরা সেই কার্যে অক্ষমতা অনুভব করেন। সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান বিশেষভাবে তাঁর ভক্তকে তাঁর মহিমা বর্ণনা করার বুদ্ধি প্রদান করেন। তাই, ভক্ত যখন ভগবান সম্বন্ধে লেখেন অথবা বলেন, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁর সেই বর্ণনা অন্তর্যামী ভগবানের অনুপ্রেরণার ফল। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* দশম অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হয়েছে—যাঁরা নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, ভগবান তাঁদের অন্তর থেকে নির্দেশ দেন, কিভাবে তাঁর সেবা করতে হবে। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে, কিভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে হয় তা না জানার ফলে, ধ্রুব মহারাজ যখন বিহ্বল হয়েছিলেন, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর শঙ্খের দ্বারা ধ্রুব মহারাজের মস্তক স্পর্শ করেছিলেন, এবং তার ফলে ধ্রুব মহারাজ চিন্ময় অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। এই চিন্ময় অনুপ্রেরণাকে বলা হয় *ব্রহ্ম-ময়,* কারণ এই প্রকার অনুপ্রেরণার ফলে যে বাণী নির্গত হয়, তা বেদমন্ত্র থেকে অভিন্ন। তা এই জড় জগতের কোন সাধারণ ধ্বনি নয়। তাই, হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের যে শব্দতরঙ্গ, তা সাধারণ বর্ণের দ্বারা প্রকাশিত হলেও, কখনও তা জড় বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫

স বৈ তদৈব প্রতিপাদিতাং গিরং
দৈবীং পরিজ্ঞাতপরাত্মনির্ণয়ঃ ।
তং ভক্তিভাবোঽভ্যগৃণাদসত্বরং
পরিশ্রুতোরুশ্রবসং ধ্রুবক্ষিতিঃ ॥ ৫ ॥

সঃ—ধ্রুব মহারাজ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **তদা**—তখন; **এব**—ঠিক; **প্রতিপাদিতাম্**—লাভ করে; **গিরম্**—বাণী; **দৈবীম্**—দিব্য; **পরিজ্ঞাত**—হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন; **পর-আত্ম**—পরমাত্মা; **নির্ণয়ঃ**—সিদ্ধান্ত; **তম্**—ভগবানকে; **ভক্তি-ভাবঃ**—ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হয়ে; **অভ্যগৃণাৎ**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; **অসত্বরম্**—হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত না করে; **পরিশ্রুত**—বিখ্যাত; **উরু-শ্রবসম্**—যাঁর খ্যাতি; **ধ্রুব-ক্ষিতিঃ**—ধ্রুব, যাঁর লোক কখনও বিনষ্ট হবে না।

অনুবাদ

সেই সময় ধ্রুব মহারাজ বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়েছিলেন এবং পরমতত্ত্বকে ও সমস্ত জীবের সঙ্গে পরমতত্ত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন। সর্ব বিখ্যাত বিপুল কীর্তি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিজনিত প্রেমে পরিপ্লুত হয়ে, ধ্রুব মহারাজ, যিনি ভবিষ্যতে এমন একটি লোক প্রাপ্ত হবেন, যা প্রলয়ের সময়েও বিনষ্ট হবে না, তিনি মননশীল এবং নির্ণয়াত্মক প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বহু বিচার্য বিষয় রয়েছে। সর্ব প্রথমে, বৈদিক শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি পরমতত্ত্বের সঙ্গে আপেক্ষিক জড় শক্তি এবং চিন্ময় শক্তির সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ধ্রুব মহারাজকে বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের জন্য কোন স্কুলে অথবা অধ্যাপকের কাছে যেতে হয়নি, পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি তাঁর ভক্তির প্রভাবে, ভগবান যখন তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁর শঙ্খের দ্বারা তাঁর মস্তক স্পর্শ করেছিলেন, তখন আপনা থেকেই বৈদিক সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। বৈদিক শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করার এটিই হচ্ছে পন্থা। স্কুল-কলেজের শিক্ষার দ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *বেদ* নির্দেশ করে যে, পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবে যাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা রয়েছে, তাঁর কাছে বৈদিক সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়।

ধ্রুব মহারাজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর দৃঢ় সংকল্প এবং তপস্যার ফলস্বরূপ ভগবান স্বয়ং তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একটি শিশু, তাই সুন্দরভাবে ভগবানের বন্দনা করতে চাইলেও, পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে তিনি সঙ্কোচবোধ করেছিলেন; কিন্তু ভগবান কৃপাপূর্বক তাঁর শঙ্খের দ্বারা তাঁর মস্তক স্পর্শ করা মাত্র, তিনি পূর্ণরূপে বৈদিক সিদ্ধান্ত অবগত হয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য, যথাযথভাবে অবগত হওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মা হচ্ছে পরমাত্মার নিত্য দাস, এবং তাই পরমাত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক হচ্ছে সেবার সম্পর্ক। তাকে বলা হয় *ভক্তিযোগ* বা *ভক্তিভাব*। ধ্রুব মহারাজ নির্বিশেষবাদীর মতো ভগবানের স্তুতি করেননি, পক্ষান্তরে ভক্তরূপে করেছিলেন। তাই এখানে স্পষ্টভাবে *ভক্তিভাব* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। বন্দনা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিই নিবেদন

করা উচিত, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার রাজ্য কামনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে তাঁর কোলে ওঠার অধিকার থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য ভগবান ইতিমধ্যে ধ্রুবলোক নামক একটি গ্রহলোক সৃষ্টি করেছিলেন, যা ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের সময়েও ধ্বংস হয় না। ধ্রুব মহারাজ এই সিদ্ধি সহজে লাভ করেননি। ধৈর্য সহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করার ফলে, তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এখন তিনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, যথাযথভাবে ভগবানের বন্দনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল ভগবানের মহিমা কীর্তন করা যায় অথবা তাঁর প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করা যায়। ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ না হলে, ভগবানের মহিমা বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ৬

ধ্রুব উবাচ

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না ।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥ ৬ ॥

ধ্রুবঃ উবাচ—ধ্রুব মহারাজ বললেন; **যঃ**—যে পরমেশ্বর ভগবান; **অন্তঃ**—অন্তরে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **মম**—আমার; **বাচম্**—বাণী, **ইমাম্**—এই সমস্ত; **প্রসুপ্তাম্**—নিষ্ক্রিয় বা মৃত; **সঞ্জীবয়তি**—পুনরুজ্জীবিত করে; **অখিল**—সমগ্র; **শক্তি**—শক্তি; **ধরঃ**—ধারী; **স্ব-ধাম্না**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা; **অন্যান্ চ**—অন্যান্য অঙ্গও; **হস্ত**—হাত; **চরণ**—পা; **শ্রবণ**—কর্ণ; **ত্বক্**—চর্ম; **আদীন্**—ইত্যাদি; **প্রাণান্**—প্রাণশক্তি; **নমঃ**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পুরুষায়**—পরম পুরুষ; **তুভ্যম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ বললেন—হে ভগবান। আপনি সর্বশক্তিমান। আমার অন্তরে প্রবেশ করে আপনি আমার হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক, আদি সুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জাগরিত করেছেন, বিশেষ করে আমার বাক্ শক্তিকে। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে, দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বের এবং পরের অবস্থাটির পার্থক্য অতি সহজে নিরূপণ করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জীবনীশক্তি এবং কার্যকলাপ সুপ্ত অবস্থায় ছিল। চিন্ময় স্তরে না আসা পর্যন্ত, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মন এবং দেহের অন্যান্য ক্রিয়া সুপ্ত অবস্থায় থাকে। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, সমস্ত কার্যকলাপ মৃত ব্যক্তির কার্যকলাপ অথবা প্রেতাত্মার কার্যকলাপের মতো। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজেকে সম্বোধন করে গেয়েছেন—*"জীব জাগ! জীব জাগ! কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে? ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে!"* বেদেও ঘোষিত হয়েছে *উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত*—"ওঠ। জাগ। এখন তুমি মনুষ্য জীবন লাভের এক অপূর্ব সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছ—এখন তুমি নিজেকে জান।" এইগুলি হচ্ছে বেদের নির্দেশ।

ধ্রুব মহারাজ বাস্তবিকভাবে অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি চিন্ময় স্তরে জাগরিত হওয়ার ফলে, তিনি বৈদিক নির্দেশের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ; তিনি নির্বিশেষ বা নিরাকার নন। সেই সত্য ধ্রুব মহারাজ তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, দীর্ঘকাল ধরে তিনি প্রায় নিদ্রিত ছিলেন, এবং বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভগবানের মহিমা কীর্তন করার প্রবণতা তখন তিনি অনুভব করেছিলেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও ভগবানের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করতে পারে না অথবা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারে না। কেননা তারা বৈদিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করতে পারেনি।

তাই ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর নিজের মধ্যে এই পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়েছে। পূর্ণরূপে তাঁর প্রতি ভগবানের কৃপা হৃদয়ঙ্গম করে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তিনি ভগবানের প্রতি প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের মন এবং ইন্দ্রিয়ের এই চিন্ময় জাগরণ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সাধিত হয়েছিল। তাই এই শ্লোকে *স্ব-ধাম্না* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'চিন্ময় শক্তির দ্বারা'। পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রভাবেই কেবল দিব্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। হরেকৃষ্ণ মন্ত্রে সর্ব প্রথমে ভগবানের পরা শক্তি হরাকে সম্বোধন করা হয়েছে। জীব যখন ভগবানের নিত্য দাসরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন এই চিন্ময় শক্তি সক্রিয়

হয়। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করেন অথবা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁকে বলা হয় *সেবোন্মুখ*; সেই সময় চিন্ময় শক্তি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে ভগবানকে প্রকাশ করে।

চিন্ময় শক্তির প্রকাশ ব্যতীত, ভগবানের মহিমা কীর্তন করে প্রার্থনা করা যায় না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সমস্ত দার্শনিক জল্পনা কল্পনা অথবা কাব্য রচনা জড়া শক্তিরই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। কেউ যখন বাস্তবিকরূপে চিন্ময় শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, তখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র হয়, এবং তিনি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। তখন তাঁর হাত, পা, কর্ণ, জিহ্বা, মন, উপস্থ—সব কিছুই—ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। এই প্রকার দিব্য চেতনা-সমন্বিত ভক্ত আর জড় কার্যকলাপে লিপ্ত হন না অথবা জড় বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষাও তাঁর থাকে না। ইন্দ্রিয়সমূহ পবিত্র করার এবং ভগবানের সেবায় তাদের যুক্ত করার এই পন্থাকে বলা হয় ভক্তি। প্রাথমিক স্তরে গুরুদেব এবং শাস্ত্রের নির্দেশে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা হয়, এবং তার পর আত্ম উপলব্ধির পর, ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখনও সেই সেবা চলতে থাকে। পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথমে যান্ত্রিকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে যুক্ত করা হয়, কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির পর, দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তা স্বতস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়।

শ্লোক ৭

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্ ।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্‌গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি ॥ ৭ ॥

একঃ—এক; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **আত্ম-শক্ত্যা**—আপনার নিজের শক্তির দ্বারা; **মায়া-আখ্যয়া**—মায়া নামক; **উরু**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **গুণয়া**—জড়া প্রকৃতির গুণসমন্বিত; **মহৎ-আদি**—মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি; **অশেষম্**—অসীম; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করার পর; **অনুবিশ্য**—প্রবেশ করে; **পুরুষঃ**—পরমাত্মা; **তৎ**—মায়ার; **অসৎ-গুণেষু**—ক্ষণিকের জন্য প্রকাশিত গুণে; **নানা**—নানা প্রকার; **ইব**—যেন; **দারুষু**—কাষ্ঠ খণ্ডে; **বিভাবসু-বৎ**—অগ্নির মতো; **বিভাসি**—আপনি প্রকাশিত হন।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা আপনি চিৎ-জগতে এবং জড় জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হন। আপনি আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় জগতে মহৎ আদি শক্তি সৃষ্টি করে, পরমাত্মারূপে এই জড় জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। আপনি পরম পুরুষ, এবং জড়া প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী গুণের মাধ্যমে আপনি নানা প্রকার রূপ প্রকাশ করেন, ঠিক যেমন অগ্নি বিভিন্ন আকৃতির কাষ্ঠখণ্ডে প্রবিষ্ট হয়ে বিভিন্নরূপে প্রজ্বলিত হয়।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে কার্য করেন। এমন নয় যে, তিনি শূন্য বা নির্বিশেষ হয়ে যান এবং তার ফলে সর্বব্যাপ্ত হন। মায়াবাদীরা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হওয়ার ফলে, তাঁর কোন সবিশেষ রূপ নেই। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ এখানে বৈদিক সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করে বলেছেন, "আপনি আপনার শক্তির দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে পরিব্যাপ্ত।" এই শক্তি মূলত চিন্ময়, কিন্তু যেহেতু তা ক্ষণিকের জন্য জড় জগতে কার্যশীল হয়, তাই তাকে বলা হয় মায়া বা মোহিনী শক্তি। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য সকলের কাছেই ভগবানের শক্তি বহিরঙ্গা শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল হয়। সেই তত্ত্ব ধ্রুব মহারাজ খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, শক্তি এবং শক্তিমান এক ও অভিন্ন। শক্তিকে শক্তিমান থেকে পৃথক করা যায় না।

পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানের পরিচয় এখানে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর আদি চিন্ময় শক্তি জড়া প্রকৃতিকে জাগরিত করে, এবং তাই জড় শরীরকে সজীব বলে মনে হয়। শূন্যবাদীরা মনে করে যে, কোন ভৌতিক পরিস্থিতিতে জড় দেহে জীবনের লক্ষণ প্রকট হয়, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, জড় শরীর নিজে নিজে সক্রিয় হতে পারে না। ঠিক যেমন একটি যন্ত্র নিজে নিজে সক্রিয় হতে পারে না; ক্রিয়াশীল হতে হলে পৃথক শক্তির (যেমন বিদ্যুৎ, বাষ্প ইত্যাদির) প্রয়োজন হয়। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জড় শক্তি নানা প্রকার জড় বস্তুতে কার্য করে, ঠিক যেমন অগ্নি বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠের আয়তন এবং পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রজ্বলিত হয়। সেই একই শক্তি ভক্তদের ক্ষেত্রে চিৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, কারণ সেই শক্তি মূলত চিন্ময়, জড় নয়। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *বিষ্ণু-শক্তিঃ পরা প্রোক্তা*। আদি শক্তি ভক্তকে অনুপ্রাণিত করে, এবং

তার ফলে তিনি তাঁর দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন। বহিরঙ্গা শক্তিরূপে সেই শক্তিই অভক্তদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত করে। *মায়া* এবং *স্ব-ধাম*-এর পার্থক্য নিরূপণ করা উচিত। ভক্তদের ক্ষেত্রে *স্ব ধাম* কার্যশীল হয়, আর অভক্তদের ক্ষেত্রে *মায়াশক্তি* কার্যশীল হয়।

শ্লোক ৮

ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্তপ্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ ।
তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং
বিস্মর্যতে কৃতবিদা কথমার্তবন্ধো ॥ ৮ ॥

ত্বৎ-দত্তয়া—আপনার দ্বারা প্রদত্ত; **বয়ুনয়া**—জ্ঞানের দ্বারা; **ইদম্**—এই; **অচষ্ট**—দেখা যায়; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **সুপ্ত-প্রবুদ্ধঃ**—সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি; **ইব**—মতো; **নাথ**—হে প্রভু; **ভবৎ-প্রপন্নঃ**—ব্রহ্মা, যিনি আপনার শরণাগত; **তস্য**—তাঁর; **আপবর্গ্য**—মুক্তিকামী ব্যক্তিদের; **শরণম্**—আশ্রয়; **তব**—আপনার; **পাদ-মূলম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **বিস্মর্যতে**—বিস্মৃত হতে পারে; **কৃত-বিদা**—বিদ্বান ব্যক্তির দ্বারা; **কথম্**—কিভাবে; **আর্ত-বন্ধো**—হে দীনবন্ধু।

অনুবাদ

হে প্রভু! ব্রহ্মা পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত। সৃষ্টির আদিতে আপনি তাঁকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তার ফলে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করতে পেরেছিলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, ঠিক যেমন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরেই তার কর্তব্য উপলব্ধি করতে পারে। আপনি মুক্তিকামীদের একমাত্র আশ্রয়, এবং আপনি সমস্ত আর্ত ব্যক্তিদের বন্ধু। অতএব পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি কিভাবে আপনাকে বিস্মৃত হতে পারেন?

তাৎপর্য

ভগবানের শরণাগত ভক্ত ক্ষণিকের জন্যও ভগবানকে ভুলতে পারেন না। ভক্ত জানেন যে, ভগবানের অহৈতুকী কৃপা তাঁর অনুমানের অতীত; ভগবানের কৃপায় তাঁর যে কি লাভ হয়েছে, তা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ভক্ত যতই ভগবানের

সেবায় যুক্ত হন, ভগবানের শক্তি তাঁকে ততই অনুপ্রেরণা প্রদান করতে থাকেন *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা নিরন্তর প্রীতিপূর্বক তাঁর ভজনা করেন, তিনি তাঁদের অন্তর থেকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, এবং তার ফলে তাঁরা পারমার্থিক মার্গে অধিক থেকে অধিকতর উন্নতি সাধন করেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্ত ক্ষণিকের জন্যও ভগবানকে ভুলতে পারেন না তিনি তাঁর কৃপায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে অধিক থেকে অধিকতর শক্তি প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন। ভগবানের কৃপায়, ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সনক, সনাতন আদি ব্রহ্মার মহাত্মা পুত্রেরা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে সারা দিন বিনিদ্র থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত না হন, তা হলে তিনি প্রকৃতপক্ষে নিদ্রিত তিনি রাত্রে নিদ্রিত থেকে দিনের বেলায় তাঁর কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের স্তরে সক্রিয় হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে নিদ্রিত বলেই বিবেচনা করতে হবে। ভগবদ্ভক্ত তাই ভগবানের কাছ থেকে যে কৃপা লাভ করেছেন, সেই কথা তিনি কখনও ভোলেন না।

এখানে ভগবানকে *আর্ত বন্ধু* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, জ্ঞানের অন্বেষণে জন্ম জন্মান্তর ধরে কঠোর তপস্যা করার পর, কেউ যখন প্রকৃত জ্ঞানের স্তরে এসে যথার্থ প্রজ্ঞা লাভ করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন। ভগবানের শরণাগত হয় না যে মায়াবাদী, তার প্রকৃত জ্ঞানের অভাব রয়েছে বলে বুঝতে হবে পূর্ণ প্রজ্ঞাসমন্বিত ভক্ত ক্ষণিকের জন্যও ভগবানের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা ভুলতে পারেন না।

শ্লোক ৯

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ ।
অর্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎস্পর্শজং নিরয়েঽপি নৃণাম্ ॥ ৯ ॥

নূনম্—অবশ্যই, **বিমুষ্ট-মতয়ঃ**—যারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে; **তব**—আপনার; **মায়য়া**—মায়ার প্রভাবে; **তে**—তারা, **যে**—যারা; **ত্বাম্**—আপনি; **ভব**—জন্ম থেকে; **অপ্যয়**—এবং মৃত্যু, **বিমোক্ষণম্**—মুক্তির কারণ; **অন্য-হেতোঃ**—অন্য উদ্দেশ্যে;

অর্চন্তি—পূজা করে; **কল্পক-তরুম্**—কল্পতরু-সদৃশ; **কুণপ**—এই মৃত শরীরের; **উপভোগ্যম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **ইচ্ছন্তি**—কামনা করে; **যৎ**—যা; **স্পর্শ-জম্**—স্পর্শ থেকে উৎপন্ন; **নিরয়ে**—নরকে; **অপি**—ও; **নৃণাম**—মানুষদের জন্য

অনুবাদ

যারা এই চামড়ার থলিটির ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কেবল আপনার পূজা করে, তারা অবশ্যই আপনার মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কারণ-স্বরূপ আপনার মতো কল্পবৃক্ষকে পাওয়া সত্ত্বেও, আমার মতো মূর্খ ব্যক্তিরা সেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য আপনার কাছে বর প্রার্থনা করে, যা নরকেও লাভ হয়।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য ধ্রুব মহারাজ অনুতাপ করেছেন। এখানে তিনি তাঁর এই প্রবৃত্তিকে ভর্ৎসনা করেছেন। অজ্ঞানতার বশেই কেবল মানুষ ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে অথবা জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের আরাধনা করে। ভগবান কল্পবৃক্ষ সদৃশ। তাঁর কাছে যাই কামনা করা যায় তাই পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না তাঁর কাছে কি বর প্রার্থনা করা উচিত। স্পর্শজনিত সুখ বা ইন্দ্রিয়সুখ শূকর এবং কুকুরেরাও লাভ করে থাকে। এই প্রকার সুখ অত্যন্ত তুচ্ছ। ভক্ত যদি এই প্রকার তুচ্ছ সুখের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন, তা বুঝতে হবে যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন।

শ্লোক ১০

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিং ত্বন্তকাসিলুলিতাৎপততাং বিমানাৎ ॥ ১০ ॥

যা—যা; **নির্বৃতিঃ**—আনন্দ; **তনু-ভৃতাম্**—দেহধারীর; **তব**—আপনার; **পাদ-পদ্ম**—শ্রীপাদপদ্ম; **ধ্যানাৎ**—ধ্যান করার ফলে; **ভবৎ-জন**—আপনার অন্তরঙ্গ ভক্ত থেকে; **কথা**—বিষয়; **শ্রবণেন**—শ্রবণের দ্বারা; **বা**—অথবা; **স্যাৎ**—সম্ভব হয়; **সা**—সেই

আনন্দ; **ব্রহ্মণি**—নির্বিশেষ ব্রহ্মে; **স্ব-মহিমনি**—আপনার স্বীয় মহিমা; **অপি**—সত্ত্বেও; **নাথ**—হে ভগবান; **মা**—কখনই নয়; **ভূৎ**—বিরাজ করে; **কিম্**—আর কি বলার আছে; **তু**—তা হলে; **অন্তক-অসি**—মৃত্যুরূপ তরবারির দ্বারা, **লুলিতাৎ**—ধ্বংস হয়ে; **পততাম্**—অধঃপতিতদের, **বিমানাৎ**—বিমান থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানের ফলে, অথবা আপনার শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার ফলে, যে চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়, তা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে বলে মনে করার বা পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার আনন্দ থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক। যেহেতু ভগবৎ প্রেমানন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দও পরাভূত হয়ে যায়, সুতরাং কালরূপ তরবারির দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায় যে ক্ষণস্থায়ী স্বর্গসুখ, সেই সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও কালক্রমে পুনরায় স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্যলোকে অধঃপতিত হতে হয়।

তাৎপর্য

শ্রবণ, কীর্তন আদি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয়, তার সঙ্গে কর্মীদের স্বর্গসুখ অথবা জ্ঞানী ও যোগীদের নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার আনন্দের কোন তুলনা করা যায় না। যোগীরা সাধারণত শ্রীবিষ্ণুর দিব্য রূপের ধ্যান করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের ধ্যানই করেন না, উপরন্তু বাস্তবিকভাবে তাঁর সেবাও করেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা *ভবাপ্যয়* শব্দটি পেয়েছি, যার অর্থ হচ্ছে জন্ম এবং মৃত্যু। ভগবান জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারেন। অদ্বৈতবাদীরা মনে করে যে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হলে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া যায়, সেটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্ত যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন, তার তুলনা ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে হতে পারে না।

কর্মীদের অবস্থা আরও নিকৃষ্ট। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়া। বলা হয়েছে, *যান্তি দেবব্রতা দেবান্*—যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তারা স্বর্গলোকে উন্নীত হয় (*ভগবদ্গীতা* ৯/৫)। তবে *ভগবদ্গীতার* অন্যত্র (৯/২১) আমরা দেখতে পাই, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—যারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়, তাদের পুণ্যকর্ম ক্ষয় হয়ে গেলে, তারা পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসে। তাদের অবস্থা ঠিক আধুনিক যুগের মহাকাশচারীদের মতো যারা চন্দ্রলোকে যায়,

কিন্তু তাদের ইন্ধন ফুরিয়ে গেলেই তাদের এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। আণবিক শক্তির প্রভাবে আধুনিক যুগের মহাকাশচারীরা চন্দ্রলোকে বা অন্যান্য উচ্চতর লোকে যায়, কিন্তু তাদের ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে, তাদের আবার নীচে নেমে আসতে হয়, তেমনই যারা যজ্ঞ এবং পুণ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, তাদেরও সেই রকম অবস্থা। *অন্তকাসি-লুলিতাৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, কালের তরবারির দ্বারা এই জড় জগতে লব্ধ উচ্চ পদ কেটে ফেলা হয়, এবং তখন তাকে আবার অধঃপতিত হতে হয়। ধ্রুব মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবদ্ভক্তির ফল নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার অথবা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার থেকে অনেক অনেক বেশি মূল্যবান। এখানে *পততাং বিমানাৎ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *বিমান* মানে হচ্ছে আকাশযান। যারা স্বর্গলোকে উন্নীত হয় তারা যেন এক-একটি বিমানের মতো, ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে যেগুলিকে নীচে নেমে আসতে হয়।

শ্লোক ১১

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্ ।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥ ১১ ॥

ভক্তিম্—ভক্তি; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **প্রবহতাম্**—অনুষ্ঠানকারীদের; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **মে**—আমার; **প্রসঙ্গঃ**—অন্তরঙ্গ সঙ্গ; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **মহতাম্**—মহান ভক্তদের; **অমল-আশয়ানাম্**—যাঁদের হৃদয় জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **যেন**—যার দ্বারা; **অঞ্জসা**—সহজে; **উল্বণম্**—ভয়ঙ্কর; **উরু**—মহৎ; **ব্যসনম্**—সঙ্কটপূর্ণ; **ভব-অব্ধিম্**—সংসার-সমুদ্র; **নেষ্যে**—আমি পার হব; **ভবৎ**—আপনার; **গুণ**—দিব্য গুণাবলী; **কথা**—লীলাসমূহ; **অমৃত**—অমৃত, শাশ্বত; **পান**—পান করে; **মত্তঃ**—উন্মত্ত।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ বলতে লাগলেন—হে অনন্ত ভগবান! কৃপা করে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন নিরন্তর আপনার সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ আমি লাভ করতে পারি। এই প্রকার দিব্য ভক্তরা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আমি জ্বলন্ত অগ্নির তরঙ্গ-সমন্বিত ভয়ঙ্কর

ভবসমুদ্র পার হতে পারব। তা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে, কেননা আমি আপনার শাশ্বত দিব্য গুণাবলী এবং লীলাসমূহ শ্রবণ করার জন্য উন্মত্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের উক্তির বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে যে, তিনি শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করতে চেয়েছেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ হতে পারে না অথবা আস্বাদ্য হতে পারে না, তাই আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছি। যারা এই কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ থেকে পৃথক হয়ে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতে চায়, তারা এক মহা মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন, কেননা তা সম্ভব নয়। ধ্রুব মহারাজের এই উক্তিটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি পুষ্ট হতে পারে না; জড় কার্যকলাপ থেকে তা পৃথক হয় না। ভগবান বলেছেন, *সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্য সংবিদো ভবন্তি হৃৎ কর্ণ রসায়নাঃ (শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২৫)। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গেই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী পূর্ণ শক্তিসমন্বিত হয় এবং হৃদয় ও কর্ণের আস্বাদনীয় হয়। ধ্রুব মহারাজ ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করতে চেয়েছেন। ভক্তিকার্যে ভক্তের সঙ্গ ঠিক একটি প্রবহমান নদীর ঢেউয়ের মতো। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। আমাদের সময়ের প্রতিটি ক্ষণ ভগবানের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত রাখতে হয়। একে বলা হয় অপ্রতিহতা ভক্তি।

মায়াবাদীরা প্রশ্ন করতে পারে, "আপনারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে অত্যন্ত প্রসন্ন থাকতে পারেন, কিন্তু ভবসাগর পার হওয়ার জন্য আপনারা কি করছেন?" সেই প্রসঙ্গে ধ্রুব মহারাজ উত্তর দিয়েছেন যে, তা খুব একটা কঠিন নয়। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, ভগবানের মহিমা শ্রবণে উন্মত্ত হওয়ার ফলে, অনায়াসেই এই সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। *ভবদ্-গুণ-কথা*—যিনি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *চৈতন্য চরিতামৃত* থেকে ভগবানের কথা শ্রবণে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, এবং যিনি প্রকৃতপক্ষে সেই পন্থার প্রতি ঠিক একজন নেশাখোরের মতো আসক্ত, তাঁর পক্ষে অজ্ঞানরূপী সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত সহজ। তমসাচ্ছন্ন ভবসাগরকে প্রজ্বলিত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পক্ষে এই অগ্নি নিতান্তই নগণ্য কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে ভক্তিতে মগ্ন থাকেন। যদিও এই জড় জগৎ প্রজ্বলিত অগ্নির মতো, কিন্তু ভক্তের কাছে তা পূর্ণ আনন্দময় বলে প্রতীত হয় *(বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে)*।

ধ্রুব মহারাজের এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভক্তসঙ্গে ভগবানের সেবাই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধনের উপায়। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল অপ্রাকৃত

গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হওয়া যায়, এবং সেখানেও ভগবদ্ভক্তিই সম্পাদন করতে হয়, কারণ এই জগতে এবং চিন্ময় জগতে ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপ এক এবং অভিন্ন। ভক্তির কখনও পরিবর্তন হয় না। এই সূত্রে একটি আমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একটি আম কাঁচা অবস্থাতেও আম, এবং যখন তা পাকে, তখন তা আমই থাকে, তবে তা আরও সুস্বাদু এবং আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। তেমনই, সদ্‌গুরুর নির্দেশে এবং শাস্ত্রবিধির নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন হয়, আবার চিৎ-জগতে সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ করে ভগবানের সেবা হয়। কিন্তু তা উভয়ই এক। তাতে কোন পরিবর্তন হয় না। পার্থক্য কেবল একটি স্তরে তা অপক্ক এবং অন্য স্তরে তা সুপক্ক এবং অধিকতর আস্বাদ্য। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা লাভ করা যায়।

শ্লোক ১২

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ১২ ॥

তে—তারা, **ন**—কখনই না; **স্মরন্তি**—স্মরণ করে; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **ঈশ**—হে ভগবান; **মর্ত্যম্**—জড় শরীর; **যে**—যারা, **চ**—ও; **অনু**—অনুসারে; **অদঃ**—তা; **সুত**—পুত্র; **সুহৃৎ**—বন্ধুবান্ধব, **গৃহ**—গৃহ; **বিত্ত**—সম্পদ; **দারাঃ**—পত্নী, **যে**—যারা; **তু**—তা হলে; **অব্জ-নাভ**—হে কমলনাভ ভগবান; **ভবদীয়**—আপনার; **পদ-অরবিন্দ**—চরণ-কমল, **সৌগন্ধ্য**—সৌরভ; **লুব্ধ**—লাভ করেছে; **হৃদয়েষু**—যে ভক্তের হৃদয়; **কৃত-প্রসঙ্গাঃ**—সঙ্গ করেন।

অনুবাদ

হে কমলনাভ ভগবান! যিনি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সৌরভে নিরন্তর লোলুপ ভক্তের সঙ্গ করেন, তিনি কখনও বিষয়াসক্ত মানুষদের অত্যন্ত প্রিয় যে দেহ, এবং সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধব, গৃহ, বিত্ত ও পত্নীর প্রতি আসক্ত হন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেইগুলি গ্রাহ্যই করেন না।

তাৎপর্য

ভক্তির বিশেষ লাভ হচ্ছে এই যে, ভক্ত ভগবানের দিব্য লীলার শ্রবণ এবং মহিমা কীর্তন করে কেবল আনন্দ উপভোগই করেন না, অধিকন্তু তিনি তাঁর শরীরের প্রতিও অনাসক্ত থাকেন। পক্ষান্তরে, যোগীরা কিন্তু তাঁদের দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তাঁরা মনে করেন যে, দেহের কতকগুলি যোগব্যায়াম করে তাঁরা পারমার্থিক মার্গে উন্নতি সাধন করতে পারবেন। যোগীরা সাধারণত ভক্তির অনুশীলনে আগ্রহী নন; তাঁরা তাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে চান। এইগুলি কেবল শারীরিক ব্যাপার মাত্র। ধ্রুব মহারাজ এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ভক্তের তাঁর শরীরের প্রতি আর কোন রকম আসক্তি থাকে না। তিনি জানেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন, তাই শুরু থেকেই, তিনি শরীর চর্চায় সময়ের অপচয় না করে একজন শুদ্ধ ভক্তের অন্বেষণ করেন এবং কেবলমাত্র তাঁর সঙ্গ করার মাধ্যমে যোগীদের থেকে অনেক উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত যেহেতু জানেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন, তাই তিনি কখনও তাঁর দেহের সুখ এবং দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি তাঁর দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, সন্তান-সন্ততি, গৃহ, ধন-সম্পদ ইত্যাদির প্রতি আগ্রহশীল হন না, অথবা এই সমস্ত বিষয় থেকে যে সুখ এবং দুঃখের উদয় হয় তার প্রতিও আসক্ত হন না। এটিই ভগবদ্ভক্ত হওয়ার এক বিশেষ লাভ। জীবনের এই অবস্থা তখনই লাভ করা যায়, যখন মানুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সৌরভ সর্বদা আস্বাদনকারী শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভে আগ্রহশীল হয়।

শ্লোক ১৩

তির্যঙ্‌নগদ্বিজসরীসৃপদেবদৈত্য-
মর্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষম্ ।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ ॥ ১৩ ॥

তির্যক্—পশুদের দ্বারা; **নগ**—বৃক্ষসমূহ; **দ্বিজ**—পক্ষী; **সরীসৃপ**—সরীসৃপ; **দেব**—দেবতা; **দৈত্য**—দৈত্য; **মর্ত্য-আদিভিঃ**—মনুষ্য আদির দ্বারা; **পরিচিতম্**—পরিব্যাপ্ত; **সৎ-অসৎ-বিশেষম্**—প্রকট এবং অপ্রকট বৈচিত্র্যের দ্বারা; **রূপম্**—রূপ; **স্থবিষ্ঠম্**—স্থূল বিশ্বের; **অজ**—হে জন্মরহিত; **তে**—আপনার; **মহৎ-আদি**—মহত্তত্ত্ব আদি

কারণের দ্বারা; **অনেকম্**—অনেক কারণ; **ন**—না; **অতঃ**—তা থেকে; **পরম্**—দিব্য; **পরম**—হে পরমেশ্বর; **বেদ্মি**—আমি জানি; **ন**—না; **যত্র**—সেখানে; **বাদঃ**—বিভিন্ন প্রকার বিতর্ক।

অনুবাদ

হে ভগবন্! হে অজ! আমি জানি যে, পশু, বৃক্ষ, পক্ষী, সরীসৃপ, দেব, দানব, মানুষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার জীবাত্মারা মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। আমি জানি যে, সেই জীবাত্মারা কখনও ব্যক্ত এবং কখনও অব্যক্ত; কিন্তু আমি এই প্রকার পরম রূপ কখনও দর্শন করিনি যা আমি এখন দেখছি। এখন মতবাদ সৃষ্টি করার জন্য তর্ক-বিতর্কের সমাপ্তি হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু সব কিছুই যদিও তাঁকে আশ্রয় করে রয়েছে, তবুও তিনি সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র। সেই একই বিচার এখানে ধ্রুব মহারাজও ব্যক্ত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করার পূর্বে, তিনি কেবল নানা প্রকার জড় রূপই দর্শন করেছিলেন, এবং জলচর, পক্ষী, পশু ইত্যাদিরূপে যার সংখ্যা হচ্ছে চুরাশি লক্ষ। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে যে, ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, ভগবানের অনন্ত রূপ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—ভক্তি ব্যতীত, পবম সত্য, পরম পুরুষকে অন্য কোন পন্থার দ্বারা লাভ কবা যায় না।

এখানে ধ্রুব মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে যে পূর্ণজ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী জ্ঞানের অবস্থার তুলনা করেছেন। জীবের কার্য হচ্ছে সেবা করা; যতক্ষণ পর্যন্ত জীব ভগবানকে জানতে না পারে, ততক্ষণ সে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, সরীসৃপ, দেব-দেবী, মানুষ, দানব ইত্যাদির সেবা করে। দেখা যায় যে, কোন মানুষ একটি কুকুরের সেবা করছে, অন্য কেউ বৃক্ষ এবং লতার সেবা করছে, কেউ দেবতার সেবা করছে। অন্য কেউ মানব-সমাজের সেবা করছে, অথবা অফিসে তার মনিবের সেবা করছে—কিন্তু কেউই কৃষ্ণের সেবা করছে না। সাধারণ মানুষদের কি কথা, এমন কি যারা পারমার্থিক উপলব্ধিতে উন্নত, তারাও বড়জোর বিরাটরূপের সেবা করছে, অথবা, ভগবানের পরম রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, ধ্যানের দ্বারা শূন্যের আরাধনা কবছে। ধ্রুব মহারাজ কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছেন। ভগবান যখন তাঁর শঙ্খের দ্বাবা ধ্রুব মহারাজের মস্তক

স্পর্শ করেছিলেন, তখন তাঁর হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল, এবং ধ্রুব মহারাজ ভগবানের চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ এখানে স্বীকার করেছেন যে, তিনি কেবল অজ্ঞানাচ্ছন্নই ছিলেন না, বয়সেও তিনি ছিলেন শিশু। ভগবান যদি তাঁর শঙ্খের দ্বারা ধ্রুব মহরাজের কপাল স্পর্শ করে তাঁকে আশীর্বাদ না করতেন, তা হলে তাঁর মতো একজন অজ্ঞান শিশুর পক্ষে ভগবানের পরম রূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হত না।

শ্লোক ১৪

কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্নন্
শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে ।
যন্নাভিসিন্ধুরুহকাঞ্চনলোকপদ্ম-
গর্ভেদ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ ॥ ১৪ ॥

কল্প-অন্তে—কল্প শেষে; **এতৎ**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **অখিলম্**—সমগ্র; **জঠরেণ**—উদরে; **গৃহ্নন্**—সংবরণ করে; **শেতে**—শয়ন করেন; **পুমান্**—পরম পুরুষ; **স্ব-দৃক্**—নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করে; **অনন্ত**—অনন্তশেষ; **সখঃ**—সঙ্গে; **তৎ-অঙ্কে**—তাঁর কোলে; **যৎ**—যাঁর থেকে; **নাভি**—নাভি; **সিন্ধু**—সমুদ্র; **রুহ**—উদ্ভূত হয়েছিল; **কাঞ্চন**—স্বর্ণময়; **লোক**—লোক; **পদ্ম**—পদ্মের; **গর্ভে**—কর্ণিকায়; **দ্যুমান্**—ব্রহ্মা; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **প্রণতঃ**—প্রণতি নিবেদন করি; **অস্মি**—আমি; **তস্মৈ**—তাঁকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! কল্পান্তে ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁর উদরের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। তিনি শেষনাগের শয্যায় শয়ন করেন, এবং তখন তাঁর নাভি থেকে একটি স্বর্ণময় কমল উত্থিত হয় এবং তাতে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি হচ্ছেন সেই পরমেশ্বর ভগবান। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে ধ্রুব মহারাজের জ্ঞান পূর্ণ। *বেদে* বলা হয়েছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বম্ এবং বিজ্ঞাতং ভবতি*—ভগবানের দিব্য, অহৈতুকী কৃপার ফলে প্রাপ্ত জ্ঞান এমনই পূর্ণ যে, ভক্তরা সেই জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সমগ্র

সৃষ্টিকে জানতে পারেন। ধ্রুব মহারাজের সামনে ভগবান ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ ভগবানের অন্য দুটি রূপ, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং কারণোদকশায়ী (মহা) বিষ্ণু সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। মহাবিষ্ণু সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৮) বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তিলোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

প্রতি কল্পান্তে, সমগ্র জগৎ যখন বিলীন হয়ে যায়, তখন সব কিছু গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে, যিনি ভগবানের আদিরূপ শেষনাগের অঙ্কে শয়ন করেন।

যারা ভক্ত নয় তারা বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপ এবং সৃষ্টির বিষয়ে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। কখনও কখনও নাস্তিকেরা তর্ক করে, "গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি পুষ্পের নাল উদ্ভব হওয়া কি করে সম্ভব?" তারা মনে করে যে, শাস্ত্রের সমস্ত বাণী হচ্ছে গল্পকথা। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের অনভিজ্ঞতার ফলে এবং মহাজনদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করার ফলে, তারা আরও বেশি করে নাস্তিক হয়ে পড়ে; তারা পরমেশ্বর ভগবানকে বুঝতে পারে না। কিন্তু ভগবানের কৃপায়, ধ্রুব মহারাজের মতো ভক্ত ভগবানের সমস্ত সৃষ্টি এবং তাদের বিভিন্ন স্থিতি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হন। বলা হয় যে, ভগবানের স্বল্প কৃপাও যিনি লাভ করেছেন, তিনি তাঁর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন; আর অন্যরা যুগ যুগান্ত ধরে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে যেতে পারে, কিন্তু তারা কখনই ভগবানকে জানতে পারবে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্য ব্যতীত ভগবানের দিব্য রূপ অথবা চিৎ-জগৎ এবং সেই জগতের চিন্ময় কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৫

ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আসসে ॥ ১৫ ॥

ত্বম্—আপনি; **নিত্য**—নিত্য; **মুক্ত**—মুক্ত; **পরিশুদ্ধ**—নিষ্কলুষ; **বিবুদ্ধঃ**—পূর্ণ জ্ঞানময়; **আত্মা**—পরমাত্মা; **কূট-স্থঃ**—পরিবর্তন-রহিত; **আদি**—মূল; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **ভগবান্**—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান; **ত্রি-অধীশঃ**—তিন গুণের অধীশ্বর; **যৎ**—যেখান থেকে; **বুদ্ধি**—বুদ্ধির ক্রিয়া; **অবস্থিতিম্**—সমস্ত অবস্থা; **অখণ্ডিতয়া**—অখণ্ডিত; **স্ব-দৃষ্ট্যা**—চিন্ময় দৃষ্টির দ্বারা; **দ্রষ্টা**—আপনি সাক্ষী থাকেন; **স্থিতৌ**—(ব্রহ্মাণ্ডের) পালনের জন্য; **অধিমখঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **ব্যতিরিক্তঃ**—ভিন্ন ভিন্নভাবে; **আস্সে**—আপনি অবস্থিত।

অনুবাদ

হে ভগবান। আপনার অখণ্ড চিন্ময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা আপনি বুদ্ধির কার্যের সমস্ত অবস্থার পরম সাক্ষী। আপনি নিত্য মুক্ত, আপনার অস্তিত্ব শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত, এবং পরমাত্মারূপে আপনার অস্তিত্ব অপরিবর্তনীয়। আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ আদি পরমেশ্বর ভগবান, এবং আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের শাশ্বত ঈশ্বর। তাই আপনি সমস্ত সাধারণ জীব থেকে ভিন্ন। শ্রীবিষ্ণুরূপে আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে পালন করেন, এবং আপনি স্বতন্ত্র থাকলেও সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের পরমেশ্বরত্বের বিরুদ্ধে নাস্তিকেরা তর্ক করে বলে যে, ভগবানের যদি আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, এবং তিনি যদি নিদ্রা যান এবং জাগরিত হন, তা হলে জীবের সঙ্গে ভগবানের পার্থক্য কোথায়? ধ্রুব মহারাজ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে জীবের অস্তিত্বের সঙ্গে ভগবানের অস্তিত্বের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তিনি নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখিয়েছেন। ভগবান নিত্য মুক্ত। যখনই তিনি আসেন, এমন কি এই জড় জগতেও, তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ হন না। তাই তাঁর নাম *ত্র্যধীশ* বা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের ঈশ্বর। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলা হয়েছে, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*—সমস্ত জীবেরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ভগবান জড়া প্রকৃতির তিন গুণের ঈশ্বর হওয়ার ফলে, সর্বদাই এই সমস্ত গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত। তাই তিনি নিষ্কলুষ, যে-কথা *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে। জড় জগতের কলুষ পরমেশ্বর ভগবানকে কখনও প্রভাবিত করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, যারা দুরাচারী এবং মূর্খ, তারা তাঁর পরম ভাব না জেনে, তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। পরম ভাব বলতে বোঝায় যে, তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। জড়া প্রকৃতির কলুষ কখনই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না।

ভগবান এবং জীবের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হচ্ছে যে, জীব সর্বদাই অজ্ঞানাচ্ছন্ন। সে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলেও অনেক কিছুই তার অজ্ঞাত। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে তা নয়। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানেন, এবং সকলের হৃদয়ের সব কথা তিনি জানেন। সেই সত্য *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে *(বেদাহং সমতীতানি)*। ভগবান আত্মার অংশ নন—তিনি অপরিবর্তনীয় পরমাত্মা, এবং জীবেরা হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ। জীবেরা দৈবী মায়ার পরিচালনায় এই জড় জগতে আসতে বাধ্য হয়, কিন্তু ভগবান যখন আসেন, তখন তিনি *আত্মমায়া* অর্থাৎ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সাহায্যে আসেন। আর তা ছাড়া, জীব অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-সমন্বিত কালের অধীন। তার জীবনের শুরু রয়েছে, সেই শুরু হচ্ছে জন্ম, এবং বদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুতে তার জীবনের সমাপ্তি হয়। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন আদি পুরুষ। *ব্রহ্মসংহিতায়* ব্রহ্মা আদিপুরুষ গোবিন্দকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। জড় জাগতিক সৃষ্টির আদি রয়েছে কিন্তু ভগবানের আদি নেই। *বেদান্তে* বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—সব কিছুরই জন্ম হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান থেকে, কিন্তু তাঁর জন্ম হয় না। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং কারও সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা যায় না। তিনি জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর, তাঁর বুদ্ধিমত্তা সর্ব অবস্থাতেই অখণ্ড, এবং সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা থেকে পৃথক। বেদে (*কঠ উপনিষদ* ২/২/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। ভগবান হচ্ছেন পরম পালনকর্তা। জীবের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞের দ্বারা তাঁর সেবা করা, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞফলের প্রকৃত ভোক্তা। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের জীবন, ধন, বুদ্ধি এবং বাণীর দ্বারা ভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া। সেটি হচ্ছে জীবের স্বরূপগত ধর্ম। কারণ-সমুদ্রে পরমেশ্বর ভগবানের নিদ্রার সঙ্গে সাধারণ জীবের নিদ্রার কখনও তুলনা করা উচিত নয়। কোন অবস্থাতেই জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের তুলনা করা যায় না। সেই কথা বুঝতে না পেরে, মায়াবাদীরা নির্বিশেষবাদ বা শূন্যবাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

শ্লোক ১৬

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যাৎ ।
তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥ ১৬ ॥

যস্মিন্—যাতে; **বিরুদ্ধ-গতয়ঃ**—পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবের, **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনিশম্**—সর্বদা; **পতন্তি**—প্রকাশিত; **বিদ্যা-আদয়ঃ**—জ্ঞান এবং অবিদ্যা ইত্যাদি; **বিবিধ**—বিভিন্ন; **শক্তয়ঃ**—শক্তিসমূহ, **আনুপূর্ব্যাৎ**—নিরন্তর; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **বিশ্ব-ভবম্**—জড় সৃষ্টির কারণ; **একম্**—এক; **অনন্তম্**—অসীম; **আদ্যম্**—আদি; **আনন্দ-মাত্রম্**—কেবল আনন্দময়; **অবিকারম্**—অপরিবর্তনীয়; **অহম্**—আমি; **প্রপদ্যে**—আমার প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রকাশে দুটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব—জ্ঞান এবং অবিদ্যা সতত বিরাজমান। আপনার বিবিধ শক্তি নিরন্তর প্রকাশিত, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা অখণ্ড, আদি, অপরিবর্তনীয়, অসীম এবং আনন্দময়, তা হচ্ছে জড় জগতের কারণ। যেহেতু আপনি হচ্ছেন সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, অন্তহীন নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে গোবিন্দের দিব্য দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। পরমেশ্বর ভগবানের সেই অন্তহীন জ্যোতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য গ্রহলোক-সমন্বিত অগণিত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান যদিও সর্বকারণের পরম কারণ, ব্রহ্ম নামক তাঁর নির্বিশেষ জ্যোতি হচ্ছে জড় জগতের আপাত কারণ। তাই ধ্রুব মহারাজ ভগবানের সেই নির্বিশেষ রূপের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। যিনি সেই নির্গুণ স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তিনি অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, যাকে এখানে চিন্ময় আনন্দ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের এই নির্বিশেষ রূপ তাদেরই জন্য, যারা পারমার্থিক মার্গে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের সবিশেষ রূপ অথবা চিৎ জগতের বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। এই প্রকার ভক্তদের বলা হয় জ্ঞানমিশ্র ভক্ত। যেহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি পরমতত্ত্বের আংশিক অনুভূতি, তাই ধ্রুব মহারাজ তার প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধিকে দূর থেকে পরমতত্ত্বের উপলব্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা এবং অবিদ্যার অধীনে তার বিভিন্ন শক্তি কার্য করছে এই সমস্ত বিভিন্ন শক্তির ফলে, নিরন্তর বিদ্যা এবং অবিদ্যার প্রকাশ হয়। *ঈশোপনিষদে* বিদ্যা এবং অবিদ্যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, অবিদ্যার

ফলে অথবা জ্ঞানের অভাবে, মানুষ পরমতত্ত্বকে নির্বিশেষ বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভক্তির বিকাশের অনুপাতে নির্বিশেষ এবং সবিশেষ উপলব্ধির বিকাশ হয়। ভক্তিমার্গে আমাদের যতই উন্নতি হয়, ততই আমরা পরমতত্ত্বের সমীপবর্তী হই, যা শুরুতে দূর থেকে দেখার ফলে, নির্বিশেষ বলে মনে হয়।

মানুষ সাধারণত অবিদ্যাশক্তি বা মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকার ফলে, তার জ্ঞান এবং ভক্তি থাকে না। কিন্তু কিছুটা উন্নতির ফলে যখন তিনি জ্ঞানী হন, তখন অধিকতর উন্নতি সাধনের ফলে, তিনি জ্ঞানমিশ্র ভক্তে পরিণত হন। আরও উন্নতি সাধনের পর, তিনি পরমতত্ত্বকে বিবিধ শক্তিসমন্বিত পুরুষ বলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। উন্নত স্তরের ভক্ত ভগবানকে এবং তাঁর সৃজনীশক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যখন পরমতত্ত্বের সৃজনীশক্তি স্বীকার করা হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যও উপলব্ধ হয়। আরও উন্নত যে ভক্ত তিনি পূর্ণজ্ঞানে ভগবানের চিন্ময় লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সেই স্তরে কেবল দিব্য আনন্দ পূর্ণরূপে আস্বাদন করা যায়। সেই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন যে মানুষ তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কেউ যখন একটি শহর অভিমুখে যাত্রা করে, তখন সে দূর থেকে শহরটি দেখতে পায়। তখন সে বুঝতে পারে যে, শহরটি দূরে অবস্থিত। কিন্তু সে যখন কাছে আসে, তখন সেই শহরের বাড়িগুলির গম্বুজ এবং পতাকা সে দেখতে পায়। কিন্তু সে যখন শহরে প্রবেশ করে, তখন সেখানে বিভিন্ন পথ, উদ্যান, সরোবর, দোকানপাট সমন্বিত বাজার, এবং সেই বাজারে ক্রয়-বিক্রয়রত মানুষদের সে দেখতে পায়। সে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ দর্শন করে, এবং নৃত্যগীতে আনন্দ-পরায়ণ মানুষদের দেখতে পায়। কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে শহরে প্রবেশ করে শহরের সমস্ত কার্যকলাপ দর্শন করে, তখন সে সন্তুষ্ট হয়।

শ্লোক ১৭

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ ।
অপ্যেবমর্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্ ॥ ১৭ ॥

সত্য—বাস্তব; **আশিষঃ**—অন্যান্য আশীর্বাদের তুলনায়; **হি**—নিশ্চয়ই; **ভগবন্**—হে ভগবান; **তব**—আপনার; **পাদ-পদ্মম্**—চরণ-কমল; **আশীঃ**—বর; **তথা**—

সেইভাবে; **অনুভজতঃ**—ভক্তদের জন্য; **পুরুষ-অর্থ**—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য; **মূর্তেঃ**—মূর্ত; **অপি**—যদিও; **এবম্**—এইভাবে; **অর্য**—হে ভগবান; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরিপাতি**—পালন করে; **দীনান্**—দীন জনকে; **বাশ্রা**—গাভী; **ইব**—মতো; **বৎসকম্**—বৎসকে; **অনুগ্রহ**—কৃপা করার জন্য; **কাতরঃ**—উৎসুক; **অস্মান্**—আমাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! হে পরমেশ্বর! আপনি সমস্ত আশীর্বাদের মূর্ত রূপ। তাই, যিনি অন্য সমস্ত বাসনা-রহিত হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন তাঁর কাছে রাজপদও নিতান্ত নগণ্য হয়ে যায়। আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার এমনই আশীর্বাদ। গাভী যেমন তার নবজাত বৎসকে দুগ্ধদান করে এবং সমস্ত আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা করে পালন করে, আপনিও তেমন আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আমার মতো অজ্ঞান ভক্তকে পালন করুন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর ভক্তির ত্রুটি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। শুদ্ধ ভক্তিতে কোন রকম জড় বাসনা থাকে না, এবং তা মনোধর্মী জ্ঞান অথবা সকাম কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত। শুদ্ধ ভক্তিকে তাই বলা হয় অহৈতুকী। ধ্রুব মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর পিতার রাজ্য লাভের আশায়, ভক্তিযোগে ভগবানের আরাধনা করতে এসেছিলেন। এই প্রকার মিশ্র ভক্ত কখনও প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন না। তাই তিনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার জন্য তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি অজ্ঞান এবং জড় কামনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ভক্তের বাসনাই কেবল পূর্ণ করেন না, অধিকন্তু তিনি এই প্রকার ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, ঠিক যেমন একটি গাভী তার নবজাত বৎসকে দুগ্ধদান করে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যে ভক্ত সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁকে তিনি বুদ্ধিযোগ দান করেন, যার ফলে তিনি অনায়াসে তাঁর কাছে আসতে পারেন। ভক্তের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে অত্যন্ত ঐকান্তিক হওয়া অবশ্য কর্তব্য; তা হলে, তাঁর নানা রকম ভুলত্রুটি হলেও, কৃষ্ণ তাঁকে পরিচালিত করে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেন।

ধ্রুব মহারাজ এখানে ভগবানকে *পুরুষার্থ-মূর্তি* বলে সম্বোধন করেছেন। সাধারণ পুরুষার্থ বলতে ধর্মের অনুশাসন পালন করা অথবা জড়-জাগতিক বর লাভের জন্য ভগবানের পূজা করাকে বোঝায়। জড়-জাগতিক বর লাভের জন্য

প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন। সব রকম প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও কেউ যখন তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে নিরাশ হয়, তখন সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বাসনা করে। এই সমস্ত কার্যকলাপকে বলা হয় *পুরুষার্থ*। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। তাকে বলা হয় *পঞ্চম-পুরুষার্থ* বা জীবনের চরম লক্ষ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ধন-সম্পদ, নামযশ অথবা সুন্দরী স্ত্রী লাভের বর প্রার্থনা করা উচিত নয়। নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সেবা লাভের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। ধ্রুব মহারাজ তাঁর জড়-জাগতিক লাভের বাসনা সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁকে রক্ষা করেন, যাতে তিনি জড়-জাগতিক কামনা-বাসনার প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে কখনও বিচ্যুত না হন।

শ্লোক ১৮

মৈত্রেয় উবাচ

অথাভিষ্টুত এবং বৈ সৎসংকল্পেন ধীমতা ।
ভৃত্যানুরক্তো ভগবান্ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **অথ**—তার পর; **অভিষ্টুতঃ**—পূজিত হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **সৎ-সংকল্পেন**—ধ্রুব মহারাজের দ্বারা, যাঁর হৃদয়ে কেবল সৎ বাসনাই ছিল; **ধী-মতা**—যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান; **ভৃত্য-অনুরক্তঃ**—ভক্তের প্রতি যিনি অত্যন্ত অনুকূল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রতিনন্দ্য**—তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বলেছিলেন—হে বিদুর! সৎ বাসনায় পূর্ণ অন্তঃকরণ-সমন্বিত ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজন্যবালক ।
তৎপ্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি সুব্রত ॥ ১৯ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বেদ**—জানি; **অহম্**—আমি; **তে**—তোমার; **ব্যবসিতম্**—দৃঢ়সঙ্কল্প; **হৃদি**—হৃদয়ে; **রাজন্য-বালক**—হে রাজপুত্র; **তৎ**—তা; **প্রযচ্ছামি**—আমি তোমাকে দান করব; **ভদ্রম্**—সর্ব সৌভাগ্য; **তে**—তোমাকে; **দুরাপম্**—যদিও তা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন; **অপি**—সত্ত্বেও; **সু-ব্রত**—যে পবিত্র ব্রত ধারণ করেছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে রাজপুত্র ধ্রুব! তুমি পবিত্র ব্রত পালন করেছ, এবং আমি তোমার অন্তরের বাসনা সম্বন্ধে অবগত। যদিও তোমার অভিলাষ অত্যন্ত উচ্চ এবং পূর্ণ করা অত্যন্ত কঠিন, তা সত্ত্বেও আমি তোমার সেই বাসনা পূর্ণ করব। তোমার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন, "তোমার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক।" প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব মহারাজ অন্তরে অত্যন্ত ভয়ভীত ছিলেন, কেননা তিনি জড়-জাগতিক লাভের আশায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং তা তাঁর ভগবৎ প্রেম লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৪) বলা হয়েছে, *ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাম্*—যারা জড় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, তারা ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না। ধ্রুব মহারাজ এমন একটি রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, যা ব্রহ্মলোক থেকেও উত্তম, সেই কথা সত্য। এটি ক্ষত্রিয়ের একটি স্বাভাবিক বাসনা। তিনি তখন ছিলেন মাত্র পাঁচ বছর বয়স্ক একটি বালক, এবং তাঁর শিশুসুলভ চপলতায় তিনি এমন একটি রাজ্য লাভের কামনা করেছিলেন, যা তাঁর পিতার, পিতামহের অথবা প্রপিতামহের রাজ্য থেকেও অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ। তাঁর পিতা উত্তানপাদ ছিলেন মনুর পুত্র এবং মনু ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র। ধ্রুব মহারাজ তাঁর এই সমস্ত মহান পূর্বপুরুষদের অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজের শিশুসুলভ উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে ভগবান অবগত ছিলেন, কিন্তু ধ্রুব মহারাজকে ব্রহ্মার থেকেও উন্নত পদ প্রদান করা কি করে সম্ভব?

ভগবান ধ্রুব মহারাজকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি ভগবৎ প্রেম থেকে বঞ্চিত হবেন না। ধ্রুব মহারাজ যে শিশুসুলভ উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে, জড় জাগতিক বাসনা পোষণ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে একজন মহান ভক্ত হওয়ার শুদ্ধ অভিলাষ করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে চিন্তা না করতে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন।

সাধারণত ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য দান করেন না। শুদ্ধ ভক্ত চাইলেও তিনি তা দান করেন না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজের ক্ষেত্রে তিনি তা করেননি। ভগবান জানতেন যে, তিনি ছিলেন এমনই একজন মহান ভক্ত, যিনি জড় ঐশ্বর্য লাভ করা সত্ত্বেও ভগবৎ প্রেম থেকে বিচলিত হবেন না। এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে বোঝা যায় যে, অত্যন্ত যোগ্য ভক্ত জড় সুখভোগের সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও ভগবানের প্রেমময়ী ভক্তি সম্পাদন করেন। এটি অবশ্য ধ্রুব মহারাজের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা।

শ্লোক ২০-২১

নান্যৈরধিষ্ঠিতং ভদ্র যদ্ভ্রাজিষ্ণু ধ্রুবক্ষিতি ।
যত্র গ্রহর্ক্ষতারাণাং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্ ॥ ২০ ॥
মেঢ্যাং গোচক্রবৎস্থাস্নু পরস্তাৎকল্পবাসিনাম্ ।
ধর্মোঽগ্নিঃ কশ্যপঃ শুক্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ ।
চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎসতারকাঃ ॥ ২১ ॥

ন—কখনই না; **অন্যৈঃ**—অন্যের দ্বারা; **অধিষ্ঠিতম্**—শাসিত; **ভদ্র**—প্রিয় বালক; **যৎ**—যা, **ভ্রাজিষ্ণু**—দেদীপ্যমান; **ধ্রুব-ক্ষিতি**—ধ্রুবলোক নামক স্থান; **যত্র**—যেখানে; **গ্রহ**—গ্রহ; **ঋক্ষ**—নক্ষত্রপুঞ্জ; **তারাণাম্**—তারকারাজির; **জ্যোতিষাম্**—জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দ্বারা; **চক্রম্**—পরিবেষ্টিত; **আহিতম্**—করা হয়, **মেঢ্যাম্**—মধ্যবর্তী দণ্ডের চারপাশে; **গো**—বলদসমূহের; **চক্র**—বহু সংখ্যক; **বৎ**—সদৃশ; **স্থাস্নু**—স্থির; **পরস্তাৎ**—অতীত, **কল্প**—ব্রহ্মার একদিন (কল্প); **বাসিনাম্**—বসবাসকারীদের; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **কশ্যপঃ**—কশ্যপ; **শুক্র**—শুক্র; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **যে**—যাঁরা সকলে; **বন-ওকসঃ**—বনবাসী; **চরন্তি**—বিচরণ করে; **দক্ষিণী-কৃত্য**—ডান দিকে রেখে; **ভ্রমন্তঃ**—প্রদক্ষিণ করে; **যৎ**—যে গ্রহ; **স-তারকাঃ**—সমস্ত তারকারাজি সহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ধ্রুব! আমি তোমাকে ধ্রুবলোক নামক এক উজ্জ্বল গ্রহ প্রদান করব, যার অস্তিত্ব কল্পান্তে প্রলয়ের পরেও অক্ষুণ্ণ থাকবে। সমস্ত সৌরমণ্ডল, গ্রহ এবং নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত সেই লোকে এখনও পর্যন্ত কেউ আধিপত্য করেনি। নভোমণ্ডলের সমস্ত জ্যোতিষ্ক সেই গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে,

ঠিক যেমন বলদসমূহ শস্য মাড়াইয়ের সময় মেধীদণ্ডের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। ধর্ম, অগ্নি, কশ্যপ, শুক্র আদি মহর্ষিগণ অধ্যুষিত নক্ষত্ররাজি সেই ধ্রুব নক্ষত্রকে দক্ষিণে রেখে সতত প্রদক্ষিণ করে।

তাৎপর্য

যদিও ধ্রুব নক্ষত্র ধ্রুব মহারাজ অধিকার করার পূর্বেও বিরাজমান ছিল, কিন্তু তার কোন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ছিল না। ধ্রুবলোক হচ্ছে সমস্ত নক্ষত্ররাজি এবং সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র, কারণ বলদ যেমন শস্য মাড়াইয়ের সময় মেধীদণ্ডের চারপাশে পরিভ্রমণ করে, তারা সকলেই ঠিক তেমনইভাবে ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করে। ধ্রুব মহারাজ সমস্ত লোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, এবং যদিও তা ছিল তাঁর শিশুসুলভ প্রার্থনা, তবুও ভগবান তাঁর সেই আবেদনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। একটি শিশু তার পিতার কাছে এমন কোন বস্তু চাইতে পারে, যা তিনি পূর্বে কাউকে দেননি, তবুও তার সন্তানের প্রতি স্নেহবশত পিতা তাকে তা দিতে পারেন; তেমনই, এই অনুপম ধ্রুবলোকটি ভগবান ধ্রুব মহারাজকে দান করেছিলেন। এই গ্রহটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড লয় হয়ে যাওয়ার পরেও এই গ্রহটি বর্তমান থাকে, এমন কি ব্রহ্মার দিনান্তে যে প্রলয় হয়, তখনও তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রলয় দুই প্রকার, একটি হচ্ছে ব্রহ্মার রাত্রিতে এবং অন্যটি ব্রহ্মার জীবনান্তে। ব্রহ্মার আয়ু শেষ হয়ে গেলে, বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। ধ্রুব মহারাজ তাঁদের মধ্যে একজন। ভগবান ধ্রুব মহারাজকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের আংশিক প্রলয়ের পরেও তিনি থাকবেন। এইভাবে পূর্ণ প্রলয়ের পর, ধ্রুব মহারাজ চিদাকাশে চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবেন। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর টীকায় লিখেছেন যে, ধ্রুবলোক হচ্ছে শ্বেতদ্বীপ, মথুরা অথবা দ্বারকার মতো একটি লোক। এইগুলি হচ্ছে ভগবদ্ধামের শাশ্বত লোক, যার বর্ণনা *ভগবদ্গীতায়* করা হয়েছে *(তদ্ধাম পরমম্)* এবং *বেদে* বলা হয়েছে *(ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ)*। *পরস্তাৎ কল্প-বাসিনাম্* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে, 'প্রলয়ের পর যে-সমস্ত স্থান বিনষ্ট হয়ে যায় তার অতীত,' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ধ্রুব মহারাজ যে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হবেন, সেই সম্বন্ধে পরমেশ্বর ভগবান আশ্বাস দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

প্রস্থিতে তু বনং পিত্রা দত্ত্বা গাং ধর্মসংশ্রয়ঃ ।
ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং রক্ষিতাব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

প্রস্থিতে—প্রস্থান করার পর; **তু**—কিন্তু; **বনম্**—বনে; **পিত্রা**—তোমার পিতার দ্বারা; **দত্ত্বা**—প্রদত্ত; **গাম**—সমগ্র পৃথিবী; **ধর্ম-সংশ্রয়ঃ**—ধর্মের দ্বারা রক্ষিত; **ষট্-ত্রিংশৎ**—ছত্রিশ; **বর্ষ**—বছর; **সাহস্রম্**—এক হাজার; **রক্ষিতা**—তুমি শাসন করবে; **অব্যাহত**—অবিচলিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি।

অনুবাদ

যখন তোমার পিতা তোমার হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করে বনে গমন করবেন, তখন তুমি ছত্রিশ হাজার বছর ধরে অপ্রতিহতভাবে সমগ্র পৃথিবী শাসন করবে। তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এখনকার মতোই শক্তিশালী থাকবে। তুমি কখনও বৃদ্ধ হবে না।

তাৎপর্য

সত্যযুগে মানুষ সাধারণত এক লক্ষ বছর জীবিত থাকতেন। তাই, ধ্রুব মহারাজের পক্ষে ছত্রিশ হাজার বছর ধরে রাজ্যশাসন করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল।

শ্লোক ২৩

ত্বদ্ভ্রাতর্যুত্তমে নষ্টে মৃগয়ায়াং তু তন্মনাঃ ।
অন্বেষন্তী বনং মাতা দাবাগ্নিং সা প্রবেক্ষ্যতি ॥ ২৩ ॥

ত্বৎ—তোমার; **ভ্রাতরি**—ভ্রাতা; **উত্তমে**—উত্তম; **নষ্টে**—নিহত হলে; **মৃগয়ায়াম্**—মৃগয়ার সময়; **তু**—তখন; **তৎ-মনাঃ**—অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে; **অন্বেষন্তী**—তাকে খুঁজতে; **বনম্**—বনে, **মাতা**—মাতা; **দাব-অগ্নিম্**—দাবাগ্নিতে; **সা**—সে; **প্রবেক্ষ্যতি**—প্রবেশ করবেন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে, তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করতে বনে গিয়ে নিহত হবে, এবং তখন তোমার বিমাতা সুরুচি তার পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে তাকে খুঁজতে বনের মধ্যে দাবানলে প্রবেশ করবে।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবানকে খুঁজতে বনে এসেছিলেন। ধ্রুবকে তাঁর বিমাতা অপমান করেছিলেন, যিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, এবং যিনি ছিলেন একজন মহান বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের চরণ-কমলে

অপরাধ সব চাইতে বড় অপরাধ। ধ্রুব মহারাজকে অপমান করার ফলে, সুরুচি তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে শোকে পাগলিনীর মতো বনে দাবানলে প্রবেশ করবেন, এবং এইভাবে তাঁর জীবন অবসান হবে। ভগবান ধ্রুবকে সেই কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, কারণ তিনি তার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, আমরা যেন কখনও কোন বৈষ্ণবকে অপমান না করি। কেবল বৈষ্ণবকেই নয়, অনর্থক কোন প্রাণীকেই অপমান করা উচিত নয়। সুরুচি যখন ধ্রুব মহারাজকে অপমান করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন একজন শিশু। সুরুচি অবশ্য জানতেন না যে, ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন একজন মহান বৈষ্ণব। অতএব তিনি অজ্ঞাতসারে অপরাধ করেছিলেন। কেউ যখন অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবের সেবা করেন, তখন তিনি সুফল লাভ করেন, এবং কেউ যদি অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণব অপরাধ করে, তখন তাকে তার কুফল ভোগ করতে হয়। বৈষ্ণব ভগবানের বিশেষ কৃপা পাত্র। বৈষ্ণবকে প্রসন্ন অথবা অপ্রসন্ন করলে, প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা অথবা অপ্রসন্নতা সাধিত হয় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর রচিত গুর্বষ্টকে গেয়েছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদঃ*—শুদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের ফলে ভগবান প্রসন্ন হন, কিন্তু কেউ যদি শ্রীগুরুদেবকে অপ্রসন্ন করেন, তা হলে তার যে কি গতি হবে তা কেউ বলতে পারে না।

শ্লোক ২৪

ইষ্ট্বা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুষ্কলদক্ষিণৈঃ ।
ভুক্ত্বা চেহাশিষঃ সত্যা অন্তে মাং সংস্মরিষ্যসি ॥ ২৪ ॥

ইষ্ট্বা—পূজা করে; **মাম্**—আমাকে; **যজ্ঞ-হৃদয়ম্**—সমস্ত যজ্ঞের হৃদয়; **যজ্ঞৈঃ**—মহান যজ্ঞের দ্বারা; **পুষ্কল-দক্ষিণৈঃ**—প্রভূত দান বিতরণ করে; **ভুক্ত্বা**—ভোগ করার পর; **চ**—ও; **ইহ**—এই জগতে, **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **সত্যাঃ**—সত্য; **অন্তে**—শেষে; **মাম্**—আমাকে, **সংস্মরিষ্যসি**—স্মরণ করতে সমর্থ হবে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—আমি সমস্ত যজ্ঞের হৃদয়। তুমি বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবে এবং প্রভূত দানও করবে। এইভাবে এই জীবনে জড়-জাগতিক সুখের আশীর্বাদ ভোগ করতে পারবে, এবং জীবনান্তে তুমি আমাকে স্মরণ করতে পারবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হচ্ছে কিভাবে অন্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে হয়। *অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ*—আমাদের সমস্ত পারমার্থিক কার্যকলাপের সার্থকতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে স্মরণ করা। নিরন্তর ভগবৎ স্মৃতি বিভিন্নভাবে ব্যাহত হতে পারে, কিন্তু ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ধ্রুব মহারাজের জীবন এতই পবিত্র হবে যে, তিনি কখনও ভগবানকে ভুলবেন না। এইভাবে তিনি অন্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করবেন, এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই জড় জগৎকে উপভোগ করবেন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য নয়, পক্ষান্তরে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য। *বেদে* বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যখন মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে দান করা। সেই দান কেবল ব্রাহ্মণদেরই নয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদেরও দেওয়া হয়। এখানে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, ধ্রুব মহারাজ এই সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবেন। এই কলিযুগের মহাযজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের সঠিক উপদেশ মানুষদের শিক্ষা দেওয়া (এবং নিজেরাও সেই শিক্ষা লাভ করা)। এইভাবে আমরা নিরন্তর সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারব এবং নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারব। তা হলে অন্তিম সময়ে আমরা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে সক্ষম হব, এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এই যুগে অর্থদানের পরিবর্তে প্রসাদ বিতরণ করাই বিধি। দান করার মতো যথেষ্ট অর্থ কারোরই নেই, কিন্তু আমরা যদি যথাসম্ভব কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করি, তা হলে তা অর্থ বিতরণের থেকেও অধিক মহত্ত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৫

ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্বলোকনমস্কৃতম্ ।
উপরিষ্টাদৃষিভ্যস্ত্বং যতো নাবর্ততে গতঃ ॥ ২৫ ॥

ততঃ—তার পর; **গন্তা অসি**—তুমি যাবে; **মৎ-স্থানম্**—আমার ধামে; **সর্ব-লোক**—সমস্ত গ্রহমণ্ডলীর দ্বারা; **নমঃ-কৃতম্**—পূজিত, **উপরিষ্টাৎ**—উপরে অবস্থিত; **ঋষিভ্যঃ**—ঋষিদের গ্রহলোক থেকেও, **ত্বম্**—তুমি; **যতঃ**—যেখান থেকে; **ন**—কখনই না; **আবর্ততে**—ফিরে আসে; **গতঃ**—একবার সেখানে যাওয়ার পর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ধ্রুব! তোমার জড়-জাগতিক জীবনের পর এই শরীরে তুমি আমার লোকে যাবে, যা সর্বদা অন্য সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা নমস্কৃত। তা সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে এবং সেখানে একবার গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নাবর্ততে* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান বলেছেন, "তোমাকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হবে না, কারণ তুমি *মৎস্থানম্* অর্থাৎ আমার ধাম প্রাপ্ত হবে।" অতএব ধ্রুবলোক হচ্ছে এই জড় জগতে শ্রীবিষ্ণুর ধাম। তার উপরে রয়েছে ক্ষীর সমুদ্র, এবং সেই সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামক একটি দ্বীপ রয়েছে। স্পষ্টভাবে সূচিত হয়েছে যে, এই লোক সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে, এবং যেহেতু এই গ্রহটি হচ্ছে বিষ্ণুলোক, তাই অন্য সমস্ত গ্রহের দ্বারা তা পূজিত হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের সময় ধ্রুবলোকের কি হবে। তার উত্তরটি অত্যন্ত সরল—এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বৈকুণ্ঠলোকের মতো ধ্রুবলোক বিরাজমান থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে তাঁর টীকায় লিখেছেন যে, *নাবর্ততে* শব্দটি সূচিত করে যে, সেই গ্রহলোক শাশ্বত।

শ্লোক ২৬

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যর্চিতঃ স ভগবানতিদিশ্যাত্মনঃ পদম্ ।
বালস্য পশ্যতো ধাম স্বমগাদ্‌গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অর্চিত**—সম্মানিত এবং পূজিত হয়ে; **সঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভগবান্**—ভগবান; **অতিদিশ্য**—প্রদান করে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **পদম্**—বাসস্থান; **বালস্য**—যখন সেই বালকটি; **পশ্যতঃ**—দেখছিল; **ধাম**—তাঁর ধামে; **স্বম্**—নিজের; **অগাৎ**—তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **গরুড়-ধ্বজঃ**—ভগবান বিষ্ণু, যাঁর ধ্বজা গরুড় চিহ্নসমন্বিত

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—বালক ধ্রুব মহারাজ দ্বারা পূজিত এবং সম্মানিত হয়ে এবং তাঁকে তাঁর স্বীয় ধাম প্রদান করে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে তাঁর স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ধ্রুব মহারাজকে তাঁর স্বীয় ধাম প্রদান করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৬) তাঁর সেই ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।*

শ্লোক ২৭

সোঽপি সংকল্পজং বিষ্ণোঃ পাদসেবোপসাদিতম্ ।
প্রাপ্য সংকল্পনির্বাণং নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎপুরম্ ॥ ২৭ ॥

সঃ—তিনি (ধ্রুব মহারাজ); **অপি**—যদিও; **সংকল্প-জম্**—ঈপ্সিত ফল; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পাদ-সেবা**—চরণ-কমলের সেবার দ্বারা; **উপসাদিতম্**—লাভ করেছিলেন; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **সংকল্প**—তাঁর ঈপ্সিত; **নির্বাণম্**—সন্তুষ্টি; **ন**—না; **অতিপ্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন; **অভ্যগাৎ**—তিনি ফিরে গিয়েছিলেন; **পুরম্**—তাঁর গৃহে।

অনুবাদ

ভগবানের চরণ-কমলের উপাসনার দ্বারা ধ্রুব মহারাজ তাঁর ঈপ্সিত ফল লাভ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রসন্ন হননি। এইভাবে তিনি তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে, ভক্তিপূর্বক ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের থেকেও উচ্চতর কোন পদ প্রাপ্ত হতে, এবং যদিও ধ্রুব মহারাজ একটি ছোট্ট শিশু ছিলেন বলে তাঁর সেই সংকল্পটি শিশুসুলভ ছিল, তবুও পরমেশ্বর ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ এমনই একটি উচ্চপদ চেয়েছিলেন, যা তাঁর পরিবারের কেউ কখনও পূর্বে প্রাপ্ত হননি। তাই ভগবান তাঁকে সেই লোক প্রদান করেছিলেন, যেখানে তিনি স্বয়ং বাস করেন, এবং তার ফলে ধ্রুব মহারাজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তিনি খুব একটা প্রসন্নতাবোধ করেননি, কারণ শুদ্ধ ভক্তিতে যদিও ভগবানের

কাছ থেকে কোন কিছু চাওয়া উচিত নয়, তবুও তিনি তাঁর শিশুসুলভ স্বভাবের ফলে, ভগবানের কাছে কিছু পাওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান যদিও তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করেছিলেন, তবুও তিনি প্রসন্নতা অনুভব করেননি। পক্ষান্তরে ভগবানের কাছে কিছু চাওয়ার ফলে, এবং সেই চাওয়াটি অনুচিত ছিল বলে, তিনি লজ্জাবোধ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

বিদুর উবাচ

সুদুর্লভং যৎপরমং পদং হরে-
র্মায়াবিনস্তচ্চরণার্চনার্জিতম্ ।
লব্ধ্বাপ্যসিদ্ধার্থমিবৈকজন্মনা
কথং স্বমাত্মানমমন্যতার্থবিৎ ॥ ২৮ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর প্রশ্ন করলেন; **সুদুর্লভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **যৎ**—যা; **পরমম্**—পরম; **পদম্**—পদ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়া-বিনঃ**—অত্যন্ত স্নেহশীল; **তৎ**—তাঁর; **চরণ**—পাদপদ্ম; **অর্চন**—পূজা করার দ্বারা; **অর্জিতম্**—লাভ করেছিলেন; **লব্ধ্বা**—প্রাপ্ত হয়ে; **অপি**—যদিও; **অসিদ্ধ-অর্থম্**—অপূর্ণ; **ইব**—যেন; **এক-জন্মনা**—এক জন্মে, **কথম্**—কেন; **স্বম্**—নিজের; **আত্মানম্**—হৃদয়; **অমন্যত**—অনুভব করেছিলেন; **অর্থ-বিৎ**—তত্ত্বজ্ঞ।

অনুবাদ

শ্রীবিদুর প্রশ্ন করলেন—হে ব্রাহ্মণ! ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এবং কৃপাময় ভগবানের প্রসন্নতা বিধানকারী শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই কেবল তা লাভ করা যায়। এক জন্মেই ধ্রুব মহারাজ তা লাভ করেছিলেন, এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বিবেকী। তা হলে, কেন তিনি প্রসন্ন হননি?

তাৎপর্য

মহাত্মা বিদুরের প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই প্রসঙ্গে *অর্থ-বিৎ* শব্দটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে বাস্তব এবং অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম। *অর্থ-বিৎ*কে পরমহংসও বলা হয়। পরমহংস কেবল প্রত্যেক বস্তুর সার গ্রহণ করেন। হংস যেমন দুধ ও জলের মিশ্রণ থেকে কেবল দুধ গ্রহণ করে, ঠিক

তেমনই পরমহংস সমস্ত জড়-জাগতিক বস্তু পরিত্যাগ করে ভগবানকে কেবল তাঁর জীবনের সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেন। ধ্রুব মহারাজ সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন, এবং তাঁর সংকল্পের ফলে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যখন ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অপ্রসন্ন ছিলেন

শ্লোক ২৯

মৈত্রেয় উবাচ

মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্বাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্ ।
নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং তস্মাত্তাপমুপেয়িবান্ ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচঃ—মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিলেন; **মাতুঃ**—তাঁর মাতার; **স-পত্ন্যাঃ**—সতীনের; **বাক্-বাণৈঃ**—কটু বচনরূপী বাণের দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিদ্ধঃ**—বিদ্ধ; **তু**—তখন; **তান্**—তারা সকলে; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **ন**—না; **ঐচ্ছৎ**—বাসনা করেছিলেন; **মুক্তি-পতেঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম মুক্তিদান করে, সেই ভগবানের থেকে; **মুক্তিম্**—মুক্তি; **তস্মাৎ**—অতএব; **তাপম্**—শোক; **উপেয়িবান্**—ভোগ করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় উত্তর দিলেন—ধ্রুব মহারাজের হৃদয় তাঁর বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি যখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত করেছিলেন, তখনও তিনি তাঁর বিমাতার দুর্ব্যবহার ভুলতে পারেননি। তিনি এই জড় জগৎ থেকে প্রকৃত মুক্তি প্রার্থনা করেননি। তাই তাঁর ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর সামনে এসেছিলেন, তখন তাঁর অন্তরের জড় বাসনার জন্য তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই মহত্ত্বপূর্ণ শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বহু মহান আচার্য ভাষ্য প্রদান করেছেন। জীবনের বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ধ্রুব মহারাজ কেন প্রসন্ন হননি? শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই সব রকম জড় বাসনা থেকে মুক্ত জড় জগতে মানুষের জড় বাসনাগুলির সব কটিই প্রায় আসুরিক, মানুষ পরস্পরের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন, এবং তারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়, তারা এই জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতে চায়, এবং এইভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। *ভগবদ্গীতার* ষোড়শ অধ্যায়ে তা আসুরিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধ

ভক্ত ভগবানের কাছ থেকে কিছুই চান না। তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করা, এবং ভবিষ্যতে যে কি হবে, সেই সম্বন্ধে তিনি কোন চিন্তাই করেন না। *মুকুন্দমালা-স্তোত্রে* মহারাজ কুলশেখর প্রার্থনা করেছেন—"হে ভগবান। আমি এই জড় জগতে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কোন পদ লাভ করতে চাই না। আমি কেবল চাই, যেন নিরন্তর আপনার সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।" তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* প্রার্থনা করেছেন, "হে ভগবান! আমি ধন চাই না, জন চাই না, এবং সুন্দরী স্ত্রীও চাই না। আমি কেবল চাই যে, জন্ম-জন্মান্তরে যেন আপনার সেবা করতে পারি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুক্তিও কামনা করেননি।

এই শ্লোকে বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় বলেছেন যে, তাঁর বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ধ্রুব মহারাজ মুক্তির কথা চিন্তা করেননি, এবং মুক্তি যে কি তা'ও তিনি জানতেন না। তাই তিনি মুক্তিকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করতে পারেননি। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তও মুক্তি চান না। তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত, তাই তিনি ভগবানের কাছ থেকে কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না। ধ্রুব মহারাজ যখন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সম্মুখে পরমেশ্বর ভগবানকে দেখেছিলেন, তখন তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ তখন তিনি *বসুদেব* স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। বসুদেব পদ হচ্ছে সেই অবস্থা যাতে জড়-জাগতিক কলুষ অনুপস্থিত থাকে, অর্থাৎ তখন আর সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণের কোন রকম প্রভাব থাকে না, তাই তখন পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়। যেহেতু বসুদেব স্তরে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়, তাই ভগবানের আর এক নাম বাসুদেব।

ধ্রুব মহারাজ এমনই একটি উচ্চ পদ লাভ করতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর প্রপিতামহ ব্রহ্মা পর্যন্ত লাভ করতে পারেননি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের প্রতি এতই কৃপাময়, বিশেষ করে ধ্রুব মহারাজের মতো ভক্তের প্রতি, যিনি পাঁচ বছর বয়সে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার জন্য বনে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে নির্মল না হতে পারে, কিন্তু ভগবান তাঁর সেই উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করেননি; তিনি কেবল তাঁর সেবাই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভক্তের যদি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তা জানতে পারেন, এবং তাই তিনি ভক্তের জড়-জাগতিক বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। এইগুলি ভক্তের প্রতি ভগবানের কয়েকটি বিশেষ অনুগ্রহ।

ধ্রুব মহারাজকে ধ্রুবলোক দান করা হয়েছিল, যেখানে কোন বদ্ধ জীব কখনও

বাস করেনি। ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলেও ধ্রুবলোকে প্রবেশাধিকার পাননি। এই ব্রহ্মাণ্ডে যখনই কোন সঙ্কট দেখা দেয়, তখন দেবতারা পরমেশ্বর ভগবান ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুকে দর্শন করতে যান, এবং তাঁরা ক্ষীর সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেন। তাঁরা ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই তাঁর প্রপিতামহ ব্রহ্মার থেকেও উচ্চতর পদ লাভ করার জন্য ধ্রুব মহারাজের যে বাসনা তা পূর্ণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ভগবান তাঁকে তাঁর স্বীয় লোক দান করেছিলেন।

এই শ্লোকে ভগবানকে *মুক্তি-পতি* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, 'সর্ব প্রকার মুক্তি যাঁর শ্রীপাদপদ্মের নীচে থাকে।' মুক্তি পাঁচ প্রকার—সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি। এই পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিটি ভগবানের সেবায় যুক্ত ভগবদ্ভক্ত কখনও গ্রহণ করেন না। মায়াবাদীরাই কেবল সাযুজ্য মুক্তি লাভ করতে চায়; কারণ তারা ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়। বহু তত্ত্বজ্ঞ মনীষীদের মতে, এই সাযুজ্য মুক্তিকে পাঁচ প্রকার মুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে গণনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মুক্তি নয়, কারণ সাযুজ্য মুক্তি থেকে পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইকথা আমরা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) দেখতে পাই, যেখানে বলা হয়েছে *পতন্তি অধঃ*, অর্থাৎ, 'তাদের পুনরায় অধঃপতন হয়।' অদ্বৈতবাদীরা কঠোর তপস্যা করার পর, ভগবানের নির্বিশেষ জ্যোতিতে লীন হয়ে যায়, কিন্তু জীব সর্বদাই প্রেমের আদান-প্রদান করতে চায়। তাই, ভগবানের দেহনির্গত জ্যোতির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অদ্বৈতবাদীরা ভগবানের সঙ্গ করার সুযোগ না পাওয়ার ফলে এবং তাঁর সেবা করতে না পারার ফলে, পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়, এবং মানবতাবাদ, পরার্থবাদ এবং লোকহিতৈষণা ইত্যাদি জড় জাগতিক পরোপকারের মাধ্যমে তারা তাদের সেবা করার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। এই প্রকার অধঃপতনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এমন কি বড় বড় মায়াবাদী সন্ন্যাসীদেরও অধঃপতনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বৈষ্ণব দার্শনিকেরা তাই সাযুজ্য মুক্তিকে মুক্তির স্তরে গণনা করেন না। তাঁদের মতে, মুক্তির অর্থ হচ্ছে মায়ার সেবার পরিবর্তে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছেন যে, জীবের স্বরূপ হচ্ছে ভগবানের দাসত্ব করা। সেটি হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। কেউ যখন তাঁর কৃত্রিম অবস্থা ত্যাগ করে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁকে বলা হয় মুক্ত। *ভগবদ্গীতায়* সেই সত্য প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—যিনি ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত

হয়েছেন, তাঁকে মুক্ত বা *ব্রহ্মভূত* বলে মনে করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্ত যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হন। *পদ্মপুরাণেও* সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে, মুক্তি মানে হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

মহর্ষি মৈত্রেয় বিশ্লেষণ করেছেন যে, ধ্রুব মহারাজ প্রথমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার বাসনা করেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর প্রপিতামহের থেকেও উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিলেন। সেটি ভগবানের সেবা নয়, সেটি ইন্দ্রিয়ের সেবা। কেউ যদি ব্রহ্মার পদও প্রাপ্ত হন, যা এই জড় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ, তা সত্ত্বেও তিনি বদ্ধ জীব। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন যে, কেউ যখন প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি দেবতাদের একটি পিপীলিকার সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। তার কারণ হচ্ছে যে, একটি পিপীলিকারও যেমন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের বাসনা রয়েছে, তেমনি ব্রহ্মার মতো মহান ব্যক্তিরও জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার বাসনা রয়েছে।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করা। বদ্ধ জীবেদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তার মূল কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের জ্ঞানের গর্বে গর্বিত, কারণ তাঁরা জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, এটিই হচ্ছে মানব-সভ্যতার প্রগতি—যত বেশি করে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা যায়, ততই তাঁরা উন্নত হয়েছেন বলে মনে করেন। প্রথমে ধ্রুব মহারাজের প্রবৃত্তিও সেই রকমই ছিল। তিনি ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়ে, এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চেয়েছিলেন। তাই অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের আবির্ভাবের পর, যখন ধ্রুব মহারাজ তাঁর সংকল্প এবং অন্তিমরূপে প্রাপ্ত পুরস্কারের তুলনা করেছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি কেবল কতকগুলি ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো চেয়েছিলেন কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বহু দুর্মূল্য হীরক রত্ন পেয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যে ভগবানের কাছে ব্রহ্মার থেকেও উচ্চ পদ প্রার্থনা করেছিলেন তা কত নগণ্য।

ধ্রুব মহারাজ ভগবানকে দর্শন করে যখন বসুদেব পদে স্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কি চেয়েছিলেন এবং কি পেয়েছেন তা বুঝতে পেরে, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার রাজ্য ত্যাগ করে, মধুবনে গিয়ে নারদ মুনির মতো সদ্গুরু প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও,

তিনি যে তখনও তাঁর বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন এবং এই জড় জগতে এক অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন, সেই কথা মনে করে তাঁর সব চাইতে বেশি লজ্জা হয়েছিল। ভগবানের কাছ থেকে বাঞ্ছিত বর লাভ করা সত্ত্বেও এইগুলি ছিল তাঁর বিষণ্ণ হওয়ার কারণ।

ধ্রুব মহারাজ যখন বাস্তবিকভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁর বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারের বাসনা পোষণ করার কোন প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি জানতেন ধ্রুব মহারাজ তা চেয়েছিলেন এবং তাই তিনি তাঁকে তা দান করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজকে নির্দেশ দেওয়ার সময়, ভগবান *বেদাহম্* শব্দটির প্রয়োগ করেছেন, কারণ যেহেতু ধ্রুব মহারাজ জড় জাগতিক লাভের বাসনা করেছিলেন, তাই ভগবান তাঁর হৃদয়ের সমস্ত কথা জানতেন মানুষের মনের সমস্ত কথা ভগবান জানেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে— *বেদাহং সমতীতানি*।

ভগবান ধ্রুব মহারাজের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতার প্রতি প্রতিশোধের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল, তাঁর প্রপিতামহের থেকেও শ্রেষ্ঠ পদ লাভের বাসনাও পূর্ণ হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে ধ্রুবলোকে তাঁর নিত্য স্থিতিও নির্ধারিত হয়েছিল। যদিও ধ্রুব মহারাজ শাশ্বত লোক প্রাপ্তির কল্পনাও করেননি, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিচার করেছিলেন, "এই জড় জগতে উচ্চ পদ লাভ করে ধ্রুব কি করবে?" তাই তিনি ধ্রুব মহারাজকে ছত্রিশ হাজার বছর ধরে, অপরিবর্তনীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এই জড় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজারূপে বিখ্যাত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। আর, তার পর সমস্ত জড় সুখভোগ করার পর, ধ্রুব চিৎ-জগতের অন্তর্গত ধ্রুবলোকে উন্নীত হবেন।

শ্লোক ৩০

ধ্রুব উবাচ

সমাধিনা নৈকভবেন যৎপদং
বিদুঃ সনন্দাদয় ঊর্ধ্বরেতসঃ ।
মাসৈরহং ষড়্ভিরমুষ্য পাদয়ো-
শ্ছায়ামুপেত্যাপগতঃ পৃথঙ্মতিঃ ॥ ৩০ ॥

ধ্রুবঃ উবাচ—ধ্রুব মহারাজ বললেন; **সমাধিনা**—সমাধি যোগের দ্বারা; **ন**—কখনই নয়; **এক-ভবেন**—এক জন্মে; **যৎ**—যা; **পদম্**—পদ; **বিদুঃ**—উপলব্ধ হয়েছে; **সনন্দ-আদয়ঃ**—সনন্দন প্রমুখ চার ব্রহ্মচারী; **ঊর্ধ্ব-রেতসঃ**—ঊর্ধ্বরেতা; **মাসৈঃ**—কয়েক মাসের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **ষড়্ভিঃ**—ছয়; **অমুষ্য**—তাঁর; **পাদয়োঃ**—পাদপদ্মের; **ছায়াম্**—আশ্রয়; **উপেত্য**—লাভ করে; **অপগতঃ**—অধঃপতিত; **পৃথক্-মতিঃ**—ভগবান ব্যতীত অন্য বস্তুতে স্থিত আমার মন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ মনে মনে ভাবলেন—ভগবানের চরণ-কমলের আশ্রয় লাভের প্রচেষ্টা করা কোন সহজ কাজ নয়, কারণ সনন্দন প্রমুখ মহান ব্রহ্মচারীরাও সমাধিতে অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনা করে বহু জন্মের পর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমি কেবল ছয় মাসের মধ্যেই সেই ফল প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু তবুও, ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয়ে অভিলাষ থাকার ফলে, আমি অধঃপতিত হয়েছি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ধ্রুব মহারাজ স্বয়ং তাঁর বিষণ্ণতার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমে তিনি অনুতাপ করেছেন যে, প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা সহজ নয়। সনন্দন, সনক, সনাতন এবং সনৎকুমার—এই চারজন ব্রহ্মচারীর মতো মহাপুরুষদেরও বহু বহু জন্ম ধরে যোগ অভ্যাস করে সমাধিমগ্ন থাকার পর, পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ কেবল ছয় মাস ধরে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার ফলে, প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আশা করেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই ভগবান অবিলম্বে তাঁকে তাঁর ধামে নিয়ে যাবেন। ধ্রুব মহারাজ স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান তাঁকে ছত্রিশ হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করার বর দিয়েছিলেন, কারণ তিনি প্রথমে মায়াচ্ছন্ন হয়ে তাঁর বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর পিতার রাজ্য শাসন করতে চেয়েছিলেন। এই দুটি বিষয়ের জন্য ধ্রুব মহারাজের গভীর অনুতাপ হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

অহো বত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত ।
ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বাযাচে যদন্তবৎ ॥ ৩১ ॥

অহো—আহা; **বত**—হায়; **মম**—আমার; **অনাত্মাম্**—দেহাত্মবোধ; **মন্দ-ভাগ্যস্য**—দুর্ভাগার; **পশ্যত**—দেখ; **ভব**—জড় অস্তিত্ব; **ছিদঃ**—ভগবানের, যিনি ছেদন করতে পারেন; **পাদ-মূলম্**—পাদপদ্ম; **গত্বা**—সমীপবর্তী হয়ে, **যাচে**—আমি প্রার্থনা করেছি; **যৎ**—যা; **অন্ত-বৎ**—বিনাশশীল।

অনুবাদ

হায়! দেখ আমি কত দুর্ভাগা। আমি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সমীপবর্তী হয়েছিলাম, যিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন অচিরে ছেদন করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, মূর্খতাবশত, আমি তাঁর কাছে এমন বস্তু প্রার্থনা করেছি যা নশ্বর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অনাত্মাম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যার অর্থ হচ্ছে 'আত্মা সম্বন্ধে কোন রকম ধারণা রহিত।' শ্রীল ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা বা তার আধ্যাত্মিক স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যাই করে তা সবই অবিদ্যা, এবং তার ফলে তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ধ্রুব মহারাজ তাঁর দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার জন্য অনুতাপ করেছেন, কারণ যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হয়েছিলেন, যিনি সর্বদা তাঁর ভক্তকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ প্রদান করতে পারেন, যা কোন দেবতাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও তিনি মূর্খতাবশত কতকগুলি নশ্বর বস্তু ভিক্ষা করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু যখন ব্রহ্মার কাছে অমরত্ব লাভের বর প্রার্থনা করেছিল, তখন ব্রহ্মা সেই প্রকার বরদানে তাঁর অক্ষমতা ব্যক্ত করেছিলেন, কারণ তিনি স্বয়ং অমর নন; অতএব অমরত্ব বা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে পূর্ণ মুক্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবানই দিতে পারেন, অন্য কেউ তা পারে না। *হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি*। বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আশীর্বাদ ব্যতীত, কেউই এই জড় জগতে জন্ম মৃত্যুর চক্র রোধ করতে পারে না। তাই ভগবানকে বলা হয় *ভব-চ্ছিৎ*। কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থায় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তকে সব রকম জড়-জাগতিক আকাঙ্ক্ষা বর্জন করার উপদেশ দেওয়া হয়। বৈষ্ণবভক্তকে সর্বদা *অন্যাভিলাষিতা-শূন্য* হতে হয়, অর্থাৎ সব রকম সকাম কর্ম বা মনোধর্মী জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হতে হয়। ধ্রুব মহারাজ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব নারদ মুনির কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁকে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* মন্ত্র জপ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এই মন্ত্রটি বিষ্ণুমন্ত্র, কারণ

এই মন্ত্র জপের ফলে বিষ্ণুলোকে উন্নীত হওয়া যায়। ধ্রুব মহারাজ অনুতাপ করেছিলেন যে, যদিও তিনি বৈষ্ণবের কাছ থেকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি জড় জাগতিক লাভের বাসনা করেছিলেন, এবং সেটি তাঁর অনুতাপের আর একটি কারণ। ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় যদিও তিনি বিষ্ণুমন্ত্রের ফল লাভ করেছিলেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের সময় জড়-জাগতিক বাসনা পোষণ করার মূর্খতার জন্য তিনি অনুতাপ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, আমরা সকলে, যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছি, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড়-জাগতিক কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া। তা না হলে, আমাদের ধ্রুব মহারাজের মতো অনুতাপ করতে হবে।

শ্লোক ৩২

মতির্বিদূষিতা দেবৈঃ পতদ্ভিরসহিষ্ণুভিঃ ।
যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রাহিষমসত্তমঃ ॥ ৩২ ॥

মতিঃ—বুদ্ধি, **বিদূষিতা**—দূষিত; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা, **পতদ্ভিঃ**—যারা অধঃপতিত হবে, **অসহিষ্ণুভিঃ**—অসহিষ্ণু; **যঃ**—যে আমি; **নারদ**—মহর্ষি নারদের; **বচঃ**—উপদেশের; **তথ্যম্**—সত্যতা; **ন**—না; **অগ্রাহিষম্**—গ্রহণ করা; **অসৎ-তমঃ**—সব চাইতে অসৎ।

অনুবাদ

স্বর্গের দেবতারা, যাঁদের আবার অধঃপতিত হতে হবে, তাঁরা আমাকে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছেন। এই সমস্ত অসহিষ্ণু দেবতারা আমার বুদ্ধি বিকৃত করে দিয়েছেন, এবং তাই আমি নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে যথার্থ বর প্রার্থনা করতে পারিনি।

তাৎপর্য

বৈদিক সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কোন মানুষ যখন কঠোর তপস্যা করে, তখন দেবতারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, কারণ তাঁরা স্বর্গলোকে তাঁদের উচ্চ পদ হারাবার ভয়ে সর্বদা ভীত। তাঁরা জানেন যে, স্বর্গলোকে তাঁদের পদ অনিত্য, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*। *ভগবদ্গীতার* এই বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে,

পুণ্যকর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে, স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। দেবতারা যে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন তা সত্য। প্রকৃতপক্ষে আমাদের চোখের পলক ফেলার স্বাধীনতাও নেই। সব কিছুই তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধ্রুব মহারাজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, দেবতারা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে লব্ধ তাঁর উন্নত পদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁর বুদ্ধিকে বিকৃত করে দিয়েছিলেন, এবং তাই যদিও তিনি নারদ মুনির মতো একজন মহান বৈষ্ণবের শিষ্য ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি নারদ মুনির উপদেশ গ্রহণ করতে পারেননি। সেই উপদেশ অবহেলা করার ফলে, ধ্রুব মহারাজ গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। নারদ মুনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার বিমাতা তোমাকে অপমান করুক অথবা প্রশংসা করুক, তাতে তোমার বিচলিত হওয়ার কি আছে?" তিনি অবশ্য ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন যে, যেহেতু ধ্রুব একটি শিশু, তাই এই প্রকার অপমান অথবা প্রশংসায় তাঁর কি করার আছে? কিন্তু ধ্রুব মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে বর লাভের জন্য অত্যন্ত বদ্ধপরিকর ছিলেন, এবং তাই নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন এখন ঘরে ফিরে যান এবং উপযুক্ত সময়ে তিনি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার চেষ্টা করতে পারেন। নারদ মুনির সেই উপদেশ অবজ্ঞা করার জন্য এবং বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার এবং তাঁর পিতার রাজ্য অধিকার করার মতো কতকগুলি অনিত্য বস্তু লাভ করতে বদ্ধপরিকর হওয়ার জন্য তিনি অনুতাপ করেছেন।

ধ্রুব মহারাজ যে তাঁর গুরুদেবের উপদেশ ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি এবং তাই তাঁর চেতনা যে কলুষিত হয়েছিল, সেই জন্য ধ্রুব মহারাজ গভীরভাবে অনুতাপ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভগবান এতই কৃপাময় যে, ধ্রুব মহারাজ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন বলে, তাঁকে সর্বোচ্চ বৈষ্ণব পদ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

দৈবীং মায়ামুপাশ্রিত্য প্রসুপ্ত ইব ভিন্নদৃক্ ।
তপ্যে দ্বিতীয়েঽপ্যসতি ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যহৃদ্রুজা ॥ ৩৩ ॥

দৈবীম্—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়াম্**—মায়া; **উপাশ্রিত্য**—শরণ গ্রহণ করে; **প্রসুপ্তঃ**—নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখা; **ইব**—সদৃশ; **ভিন্ন-দৃক্**—ভেদদর্শী;

তপ্যে—আমি অনুতাপ করেছি; **দ্বিতীয়ে**—মায়ায়; **অপি**—যদিও; **অসতি**—অনিত্য; **ভ্রাতৃ**—ভাই; **ভ্রাতৃব্য**—শত্রু; **হৃৎ**—হৃদয়ে; **রুজা**—অনুতাপের দ্বারা

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ অনুতাপ করেছিলেন—আমি মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলাম; প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতার ফলে, আমি মায়ার কোলে নিদ্রিত ছিলাম। দ্বিতীয় অভিনিবেশ-জনিত ভেদ দর্শনের ফলে, আমি আমার ভাইকে শত্রু বলে মনে করেছিলাম, এবং ভ্রান্তিবশত অন্তরে ব্যথিত হয়ে মনে করেছিলাম, "তারা আমার শত্রু।"

তাৎপর্য

ভক্তের কাছে প্রকৃত জ্ঞান তখনই প্রকাশিত হয়, যখন তিনি ভগবানের কৃপায় জীবন সম্বন্ধে বাস্তবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই জড় জগতে আমরা যে বন্ধু এবং শত্রুর সৃষ্টি করি, তা অনেকটা রাত্রে স্বপ্ন দর্শনের মতো। স্বপ্নে আমরা আমাদের অবচেতন মনের বিভিন্ন ধারণা থেকে কত কিছু সৃষ্টি করি, কিন্তু সেই সমস্ত সৃষ্টি অনিত্য এবং অবাস্তব। তেমনই, আমরা যদিও জড়-জাগতিক জীবনে জাগ্রত, তবুও যেহেতু আমাদের আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, তাই আমরা আমাদের কল্পনা থেকে বহু বন্ধু এবং শত্রু সৃষ্টি করি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, এই জড় জগতে অথবা জড় চেতনায় ভাল এবং মন্দ দুই সমান। ভাল এবং মন্দের পার্থক্য কেবল মনের ভ্রম মাত্র। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে সমস্ত জীবই ভগবানের সন্তান, অথবা তাঁর তটস্থা শক্তিসম্ভূত। যেহেতু আমবা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হয়েছি, তাই আমরা একটি চিৎ-স্ফুলিঙ্গকে অন্য চিৎ-স্ফুলিঙ্গ থেকে ভিন্ন বলে মনে করি। সেটিও আর এক প্রকার স্বপ্ন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যাঁরা প্রকৃতই তত্ত্বজ্ঞ তাঁরা একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। তাঁরা বাহ্য দেহের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করেন না; পক্ষান্তরে, চিন্ময় আত্মারূপে সকলকে দর্শন করেন। উন্নত জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, জড় দেহটি কেবল পাঁচটি জড় উপাদানের সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়। সেই সূত্রে একটি মানুষের শরীর এবং একটি দেবতার শরীব এক এবং অভিন্ন। চিন্ময় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সকলেই চিৎ-স্ফুলিঙ্গ, এবং পরম আত্মা বা ভগবানের বিভিন্ন অংশ। জড়-জাগতিক দৃষ্টিতে অথবা চিন্ময় দৃষ্টিতে আমরা মূলত এক, কিন্তু মায়ার প্রভাবে আমরা বন্ধু এবং শত্রু সৃষ্টি করি। তাই ধ্রুব মহারাজ বলেছেন, *দৈবীং মায়াম্ উপাশ্রিত্য*—তাঁর মোহের কারণ হচ্ছে মায়া বা জড়া প্রকৃতির সঙ্গ।

শ্লোক ৩৪

ময়ৈতৎপ্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি ।
প্রসাদ্য জগদাত্মানং তপসা দুষ্প্রসাদনম্ ।
ভবচ্ছিদমযাচেঽহং ভবং ভাগ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৩৪ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **এতৎ**—এই; **প্রার্থিতম্**—প্রার্থিত, **ব্যর্থম্**—বৃথা; **চিকিৎসা**—চিকিৎসা; **ইব**—সদৃশ; **গত**—সমাপ্ত হয়েছে; **আয়ুষি**—যার আয়ু; **প্রসাদ্য**—প্রসন্ন করে; **জগৎ-আত্মানম্**—ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **দুষ্প্রসাদনম্**—যাকে প্রসন্ন করা অত্যন্ত কঠিন; **ভব-ছিদম্**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছেদন করতে পারেন; **অযাচে**—প্রার্থনা করেছি; **অহম্**—আমি; **ভবম্**—জন্ম-মৃত্যুর চক্র; **ভাগ্য**—ভাগ্য; **বিবর্জিতঃ**—রহিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মাকে প্রসন্ন করা সত্ত্বেও তাঁর কাছে কেবল কয়েকটি অর্থহীন বস্তু প্রার্থনা করেছি। আমার কার্যকলাপ ঠিক একটি মৃত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার মতো। দেখ আমি কি দুর্ভাগা, কারণ, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছেদনকারী পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও আমি কেবল সেই বন্ধনই প্রার্থনা করেছি।

তাৎপর্য

কখনও কখনও ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভগবদ্ভক্ত তাঁর সেবার বিনিময়ে কিছু জড়-জাগতিক লাভ কামনা করে। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের যথার্থ পন্থা এটি নয়। অজ্ঞানতাবশত অবশ্য কখনও কখনও ভক্তরা তা করে, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ তাঁর এই আচরণের জন্য অনুতাপ করেছেন।

শ্লোক ৩৫

স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত ।
ঈশ্বরাৎক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বারাজ্যম্—তাঁর ভক্তি; **যচ্ছতঃ**—ভগবান থেকে, যিনি দান করতে ইচ্ছুক ছিলেন; **মৌঢ্যাৎ**—মূর্খতাবশত; **মানঃ**—জড়-জাগতিক উন্নতি; **মে**—আমার দ্বারা; **ভিক্ষিতঃ**—প্রার্থিত; **বত**—হায়; **ঈশ্বরাৎ**—মহান সম্রাট থেকে; **ক্ষীণ**—ক্ষয়প্রাপ্ত; **পুণ্যেন**—যাঁর পবিত্র কর্ম; **ফলী-কারান্**—খুদ; **ইব**—সদৃশ; **অধনঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি।

অনুবাদ

ভগবান যদিও আমাকে তাঁর সেবা-সম্পদ প্রদান করেছিলেন, তবুও নিতান্ত মূর্খতাবশত এবং পুণ্যের অভাববশত, আমি কেবল নাম-যশ এবং জাগতিক উন্নতি কামনা করেছি। আমার অবস্থা ঠিক এক দরিদ্র ব্যক্তির মতো, যিনি এক মহান সম্রাটের কাছে মূর্খতাবশত কেবল একটু খুদ ভিক্ষা করেন, যদিও তাঁর প্রতি প্রসন্নতাবশত সম্রাট তাঁকে যে কোন কিছু দিতে ইচ্ছুক।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *স্বারাজ্যম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র'। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য যে কি তা বদ্ধ জীব জানে না। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশসম্ভূত জীবের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভবশীল হয়ে থাকা। ঠিক যেমন একটি শিশু তার পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে খেলা করে বেড়ায়। বদ্ধ জীবের স্বাতন্ত্র্যের অর্থ মায়া প্রদত্ত প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নয়, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। জড় জগতে সকলেই মায়া প্রদত্ত প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা কবছে। তাকে বলা হয় জীবন-সংগ্রাম। প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। কেউ যখন বৈকুণ্ঠলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে যান, তখন তিনি মুক্তভাবে ভগবানেব সেবা করেন। সেটিই হচ্ছে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। তার ঠিক বিপরীত অবস্থা হচ্ছে জড় জগতের উপর আধিপত্য করা, যাকে আমরা ভ্রান্তিবশত স্বাতন্ত্র্য বলে মনে করি। অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতা সেই প্রকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই প্রকার তথাকথিত স্বাধীনতার ফলে, মানুষের পরাধীনতাই কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে। জীব কখনই জড় জগতে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে সুখী হতে পারে না। তাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শবণাগত হয়ে, তাঁর চিরন্তন সেবায় যুক্ত হতে হয়।

ধ্রুব মহারাজ অনুশোচনা করেছেন যে, তিনি তাঁর প্রপিতামহ ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ পদ এবং ঐশ্বর্য লাভ করতে চেয়েছিলেন। ভগবানের কাছে তাঁর এই ভিক্ষা ঠিক একটি দরিদ্র ব্যক্তির একজন মহান সম্রাটের কাছে কয়েক দানা খুদ ভিক্ষা করার মতো। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যারা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত তাদের কখনও ভগবানের কাছে কোন জড়-জাগতিক সম্পদ ভিক্ষা করা উচিত নয়। জড়-জাগতিক উন্নতি প্রদান করা বহিরঙ্গা শক্তির কঠোর নিয়মের উপর নির্ভর করে।

শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের কাছে কেবল তাঁর সেবা করার সুযোগ প্রার্থনা করে। সেটিই আমাদের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য। আমরা যদি অন্য আর কিছু চাই, তা হলে তা আমাদের দুর্ভাগ্যের সূচক।

শ্লোক ৩৬

মৈত্রেয় উবাচ

ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো
রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ ।
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো
যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ন**—কখনই না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **মুকুন্দস্য**—মুক্তিদাতা ভগবানের; **পদ-অরবিন্দয়োঃ**—শ্রীপাদপদ্মের; **রজঃ-জুষঃ**—ধূলিকণা আস্বাদনে উৎসুক ব্যক্তি; **তাত**—হে প্রিয় বিদুর; **ভবাদৃশাঃ**—তোমার মতো; **জনাঃ**—ব্যক্তি; **বাঞ্ছন্তি**—কামনা করে; **তৎ**—তাঁর; **দাস্যম্**—দাস্য; **ঋতে**—বিনা; **অর্থম্**—স্বার্থ; **আত্মনঃ**—তাঁদের নিজেদের জন্য; **যদৃচ্ছয়া**—আপনা থেকে; **লব্ধ**—যা লাভ হয়েছে তার দ্বারা, **মনঃ-সমৃদ্ধয়ঃ**—নিজেদের অত্যন্ত ধনী বলে মনে করে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! তোমার মতো ব্যক্তিরা, যাঁরা মুকুন্দের (যিনি মুক্তি দান করতে পারেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের) শ্রীপাদপদ্মের শুদ্ধ ভক্ত, এবং যাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের মধুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেই প্রসন্ন থাকেন। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই এই প্রকার ভক্তরা সন্তুষ্ট থাকেন, এবং তাই তাঁরা ভগবানের কাছে কখনও জড়-জাগতিক উন্নতি প্রার্থনা করেন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সর্ব লোকের মহেশ্বর, পরম ভোক্তা এবং সকলের পরম সুহৃৎ। সেই কথা যখন কেউ পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও কোন রকম জাগতিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন না। কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগীরা কিন্তু সর্বদাই তাদের ব্যক্তিগত সুখের চেষ্টায় ব্যস্ত। কর্মীরা তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে, জ্ঞানীরা মুক্তিলাভের জন্য কঠোর

তপস্যা করে, এবং যোগীরা যোগসিদ্ধির জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে যোগ অভ্যাস করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত এই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি মোটেই আগ্রহী নন। তিনি যোগসিদ্ধি, মুক্তি অথবা জড়-জাগতিক উন্নতি, এর কোনটিই চান না। তিনি জীবনের যে কোন অবস্থাতেই নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থেকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত ভগবানের পদযুগলকে কেশর বর্ণের রেণুসমন্বিত পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু পান করেন। সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত না হলে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু আস্বাদন করা যায় না। জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা বিচলিত না হয়ে, ভগবদ্ভক্তির কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। জড় উন্নতি সাধনের প্রতি এই উদাসীনতাকে বলা হয় নিষ্কাম। ভ্রান্তিবশত কখনও মনে করা উচিত নয় যে, নিষ্কাম শব্দটির অর্থ হচ্ছে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করা। সেটি কখনই সম্ভব নয়। জীবাত্মা নিত্য, এবং সে কখনও বাসনা-রহিত হতে পারে না। জীবের বাসনা থাকবেই; সেটি হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। যখন বাসনা-রহিত হওয়ার কথা বলা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোন রকম বাসনা করা উচিত নয়। ভক্তের পক্ষে মনের এই নিঃস্পৃহ অবস্থাই হচ্ছে আদর্শ স্থিতি। প্রকৃতপক্ষে সকলেরই জড়-জাগতিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করে রাখা হয়েছে। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবান তাঁর জন্য যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা। যে-সম্বন্ধে *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে, *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*। তার ফলে, কৃষ্ণসেবা সম্পাদনের জন্য সময় বাঁচানো যায়।

শ্লোক ৩৭

আকর্ণ্যাত্মজমায়ান্তং সম্পরেত্য যথাগতম্ ।
রাজা ন শ্রদ্দধে ভদ্রমভদ্রস্য কুতো মম ॥ ৩৭ ॥

আকর্ণ্য—শ্রবণ করে; **আত্ম-জম্**—তাঁর পুত্র; **আয়ান্তম্**—ফিরে আসছে; **সম্পরেত্য**—মৃত্যুর পর; **যথা**—যেন; **আগতম্**—ফিরে আসছে; **রাজা**—মহারাজ উত্তানপাদ; **ন**—করেননি; **শ্রদ্দধে**—বিশ্বাস; **ভদ্রম্**—সৌভাগ্য; **অভদ্রস্য**—পুণ্যহীনের; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **মম**—আমার।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদ যখন শুনলেন যে, পুত্র ধ্রুব গৃহে ফিরে আসছেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যেন ধ্রুব তাঁর মৃত্যুর পর ফিরে আসছেন। তিনি সেই সংবাদ

বিশ্বাস করতে পারেননি, কারণ তিনি ভেবেছিলেন কি করে তা সম্ভব। তিনি নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলে মনে করেছিলেন, এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ করা অসম্ভব।

তাৎপর্য

পাঁচ বছর বয়স্ক বালক ধ্রুব মহারাজ যখন তপস্যা করার জন্য বনে গিয়েছিলেন, তখন রাজা বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এই রকম একটি শিশুর পক্ষে জঙ্গলে বেঁচে থাকা সম্ভব। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ধ্রুবের মৃত্যু হয়েছে। তাই তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, ধ্রুব মহারাজ পুনরায় গৃহে ফিরে আসছেন, তখন তিনি সেই কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁর কাছে তখন মনে হয়েছিল, সেটি যেন এক মৃত ব্যক্তির গৃহে ফিরে আসার সংবাদের মতো, এবং তাই তিনি তা বিশ্বাস করতে পারেননি। ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগের পর রাজা উত্তানপাদ মনে করেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন ধ্রুবের গৃহত্যাগের কারণ, তাই তিনি নিজেকে সব চাইতে হতভাগ্য বলে মনে করেছিলেন। অতএব, যদিও তাঁর হারানো পুত্র মৃত্যুলোক থেকে ফিরে আসছিল, তবুও তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর মতো এত বড় একজন পাপীর পক্ষে সেই সৌভাগ্য লাভ কি করে সম্ভব।

শ্লোক ৩৮

শ্রদ্ধায় বাক্যং দেবর্ষের্হর্ষবেগেন ধর্ষিতঃ ।
বার্তাহর্তুরতিপ্রীতো হারং প্রাদান্মহাধনম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধায়—শ্রদ্ধা রেখে; **বাক্যম্**—বাণীতে; **দেবর্ষেঃ**—দেবর্ষি নারদের; **হর্ষ-বেগেন**—পরম সন্তোষের দ্বারা; **ধর্ষিতঃ**—বিহ্বল হয়ে; **বার্তা-হর্তুঃ**—যে বার্তাবাহক সেই সংবাদ এনেছিল; **অতিপ্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **হারম্**—একটি মুক্তার মালা; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **মহা-ধনম্**—অত্যন্ত মূল্যবান।

অনুবাদ

তিনি যদিও সেই বার্তাবাহকের কথায় বিশ্বাস করতে পারেননি, তবুও দেবর্ষি নারদের বাণীতে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাই সেই সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বার্তাবাহকের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তিনি তাকে এক অতি মূল্যবান মুক্তার কণ্ঠহার দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

সদশ্বং রথমারুহ্য কার্তস্বরপরিষ্কৃতম্ ।
ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ পর্যস্তোঽমাত্যবন্ধুভিঃ ॥ ৩৯ ॥
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ বেণুভিঃ ।
নিশ্চক্রাম পুরাত্তূর্ণমাত্মজাভীক্ষণোৎসুকঃ ॥ ৪০ ॥

সৎ-অশ্বম্—অতি উত্তম অশ্বযুক্ত; **রথম্**—রথে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **কার্তস্বর-পরিষ্কৃতম্**—স্বর্ণভূষিত; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ সহ; **কুল-বৃদ্ধৈঃ**—পরিবারের বৃদ্ধ সদস্যগণ সহ; **চ**—ও; **পর্যস্তঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **অমাত্য**—রাজকর্মচারী এবং মন্ত্রীদের দ্বারা; **বন্ধুভিঃ**—এবং বন্ধুগণ সহ; **শঙ্খ**—শঙ্খের; **দুন্দুভি**—দুন্দুভি; **নাদেন**—ধ্বনি সহকারে; **ব্রহ্ম-ঘোষেণ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **বেণুভিঃ**—বংশীর দ্বারা; **নিশ্চক্রাম**—তিনি বেরিয়ে এলেন; **পুরাৎ**—নগরী থেকে; **তূর্ণম্**—অতি শীঘ্র; **আত্ম-জ**—পুত্র; **অভীক্ষণ**—দেখার জন্য; **উৎসুকঃ**—অত্যন্ত উৎসুক হয়ে।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদ তাঁর হারানো পুত্রের মুখ দর্শন করতে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে, তখন অতি উত্তম অশ্বযুক্ত, স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ করে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পরিবারের সমস্ত প্রবীণ সদস্যগণ, রাজকর্মচারী, মন্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুগণসহ তৎক্ষণাৎ নগরী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। শোভাযাত্রা সহকারে তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন শঙ্খ, দুন্দুভি, বংশী আদি মঙ্গলজনক বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছিল, এবং সৌভাগ্যসূচক বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৪১

সুনীতিঃ সুরুচিশ্চাস্য মহিষ্যৌ রুক্মভূষিতে ।
আরুহ্য শিবিকাং সার্ধমুত্তমেনাভিজগ্মতুঃ ॥ ৪১ ॥

সুনীতিঃ—রানী সুনীতি; **সুরুচিঃ**—রানী সুরুচি; **চ**—ও; **অস্য**—রাজার; **মহিষ্যৌ**—মহিষীগণ; **রুক্ম-ভূষিতে**—স্বর্ণ অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **শিবিকাম্**—পালকিতে; **সার্ধম্**—সহ; **উত্তমেন**—রাজার অপর পুত্র উত্তম; **অভিজগ্মতুঃ**—সকলে সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদের উভয় পত্নী সুনীতি এবং সুরুচি এবং তাঁর অন্য পুত্র উত্তম সহ শিবিকায় আরোহণ করে সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

রাজপ্রাসাদ থেকে ধ্রুব মহারাজের চলে যাওয়ার পর, রাজা অত্যন্ত শোকাতুর হয়েছিলেন। তখন দেবর্ষি নারদের সদয় বাক্যে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী সুনীতির মহা সৌভাগ্য এবং রানী সুরুচির মহা দুর্ভাগ্যের কথা বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ রাজপ্রাসাদে এই ধরনের কথা গোপন থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজপ্রাসাদে যখন ধ্রুব মহারাজের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পৌঁছেছিল, তখন তাঁর মা সুনীতি গভীর অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে এবং একজন মহান বৈষ্ণবের মাতা হওয়ার ফলে হৃদয়ের স্বাভাবিক সরলতাবশত, তাঁর সপত্নী সুরুচি এবং তাঁর পুত্র উত্তমকে তাঁর সঙ্গে একই শিবিকায় তুলে নিতে দ্বিধা করেননি। সেটি হচ্ছে মহান ধ্রুব মহারাজের মাতা মহারানী সুনীতির মহানুভবতা।

শ্লোক ৪২-৪৩

তং দৃষ্ট্বোপবনাভ্যাশ আয়ান্তং তরসা রথাৎ ।
অবরুহ্য নৃপস্তূর্ণমাসাদ্য প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৪২ ॥
পরিরেভেঽঙ্গজং দোর্ভ্যাং দীর্ঘোৎকণ্ঠমনাঃ শ্বসন্ ।
বিষ্বক্সেনাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শহতাশেষাঘবন্ধনম্ ॥ ৪৩ ॥

তম্—তাঁকে (ধ্রুব মহারাজকে); **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **উপবন**—উপবন; **অভ্যাসে**—নিকটবর্তী; **আয়ান্তম্**—আগমন করেছে; **তরসা**—অতি শীঘ্র; **রথাৎ**—রথ থেকে; **অবরুহ্য**—অবতরণ করে; **নৃপঃ**—রাজা; **তূর্ণম্**—তৎক্ষণাৎ; **আসাদ্য**—নিকটে এসে; **প্রেম**—প্রেমপূর্ণ; **বিহ্বলঃ**—আকুল; **পরিরেভে**—তিনি আলিঙ্গন করেছিলেন; **অঙ্গ-জম্**—তাঁর পুত্রকে; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকাল; **উৎকণ্ঠ**—উৎসুক; **মনাঃ**—রাজা, যাঁর মন; **শ্বসন্**—দীর্ঘ নিঃশ্বাস; **বিষ্বক্সেন**—ভগবানের; **অঙ্ঘ্রি**—শ্রীপাদপদ্মের দ্বারা; **সংস্পর্শ**—স্পর্শে; **হত**—বিনষ্ট, **অশেষ**—অনন্ত; **অঘ**—জড় কলুষ; **বন্ধনম্**—যাঁর বন্ধন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজকে উপবনের সন্নিকটে আগত দেখে মহারাজ উত্তানপাদ অতি শীঘ্র তাঁর রথ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি তাঁর পুত্র ধ্রুবকে দীর্ঘকাল না দেখার

ফলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এবং তাই গভীর প্রেমে তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তিনি তাঁর হারানো পুত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মহারাজ দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ধ্রুব মহারাজ কিন্তু পূর্বের মতো ছিলেন না; পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

অথাজিঘ্রন্মুহুর্মূর্ধ্নি শীতৈর্নয়নবারিভিঃ ।
স্নাপয়ামাস তনয়ং জাতোদ্দামমনোরথঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ—তার পর; **আজিঘ্রন্**—আঘ্রাণ করে; **মুহুঃ**—বার বার; **মূর্ধ্নি**—মস্তক; **শীতৈঃ**—শীতল; **নয়ন**—চক্ষুর; **বারিভিঃ**—জলের দ্বারা; **স্নাপয়াম্ আস**—তিনি স্নান করিয়েছিলেন; **তনয়ম্**—পুত্রকে; **জাত**—পূর্ণ; **উদ্দাম**—মহা; **মনঃ-রথঃ**—তাঁর বাসনা।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের সঙ্গে মিলনের ফলে, রাজা উত্তানপাদের দীর্ঘকালের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল, এবং তাই তিনি বার বার ধ্রুবের মস্তক আঘ্রাণ করেছিলেন এবং আনন্দাশ্রুর দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্বভাবত দুটি কারণে মানুষ কাঁদে। মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার ফলে গভীর আনন্দে কেউ কাঁদে, এবং সেই আনন্দাশ্রু হচ্ছে অত্যন্ত শীতল ও স্নিগ্ধ, কিন্তু দুঃখজনিত যে অশ্রু তা অত্যন্ত উষ্ণ।

শ্লোক ৪৫

অভিবন্দ্য পিতুঃ পাদাবাশীর্ভিশ্চাভিমন্ত্রিতঃ ।
ননাম মাতরৌ শীর্ষ্ণা সৎকৃতঃ সজ্জনাগ্রণীঃ ॥ ৪৫ ॥

অভিবন্দ্য—বন্দনা করে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **পাদৌ**—পদযুগল; **আশীর্ভিঃ**—আশীর্বাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **অভিমন্ত্রিতঃ**—সম্বোধিত; **ননাম**—তিনি প্রণাম করেছিলেন; **মাতরৌ**—তাঁর দুই মাতাকে; **শীর্ষ্ণা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **সৎ-কৃতঃ**—সম্মানিত হয়েছিলেন; **সৎ-জন**—সজ্জনগণের; **অগ্রণীঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

সজ্জনাগ্রগণ্য ধ্রুব মহারাজ প্রথমে তাঁর পিতার চরণযুগল বন্দনা করলেন, এবং উত্তানপাদ আশীর্বাদ ও কুশল প্রশ্নাদির দ্বারা তাঁর পুত্রকে সম্ভাষণ করলেন। তার পর ধ্রুব মহারাজ তাঁর মাতৃদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ধ্রুব মহারাজ কেন কেবল তাঁর মাকে প্রণাম না করে, যে বিমাতার দুর্ব্যবহারের ফলে, গৃহত্যাগ করেছিলেন, তাঁকেও প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তার উত্তর হচ্ছে যে, আত্ম-উপলব্ধির সিদ্ধি লাভ করার ফলে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার ফলে, ধ্রুব মহারাজ সমস্ত জড় কলুষ থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। ভক্ত কখনও এই জড় জগতের মান এবং অপমানের দ্বারা প্রভাবিত হন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, তৃণ থেকেও দীনতর হতে হবে এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হতে হবে। তাই এই শ্লোকে ধ্রুব মহারাজকে *সজ্জনাগ্রণীঃ* বা সমস্ত সজ্জনগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সজ্জন, এবং কারও প্রতি তিনি বৈরীভাব পোষণ করেন না বৈরীভাব থেকে উৎপন্ন দ্বৈতভাবই এই জড় জগতের সৃষ্টির কারণ। পরম বাস্তব চিৎ জগতে সেই ভাব অবর্তমান।

শ্লোক ৪৬

সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্ ।
পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা ॥ ৪৬ ॥

সুরুচিঃ—রানী সুরুচি; **তম্**—তাঁকে; **সমুত্থাপ্য**—উত্তোলন করে; **পাদ-অবনতম্**—তাঁর চরণে প্রণত; **অর্ভকম্**—নিষ্পাপ বালকটি; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **আহ**—বলেছিলেন; **জীব**—দীর্ঘজীবী হও; **ইতি**—এইভাবে; **বাষ্প**—অশ্রুর দ্বারা; **গদ্‌গদয়া**—রুদ্ধ; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের ছোট মা সুরুচি যখন দেখলেন যে, সেই নিষ্পাপ বালকটি তাঁর চরণে প্রণত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন, এবং অশ্রু গদ্‌গদ স্বরে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "হে প্রিয় পুত্র! তুমি চিরজীবী হও।"

শ্লোক ৪৭

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

যস্য—যাঁর প্রতি; **প্রসন্নঃ**—প্রসন্ন হন, **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গুণৈঃ**—গুণাবলীর দ্বারা; **মৈত্রী-আদিভিঃ**—মৈত্রী ইত্যাদির দ্বারা; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমন্তি**—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **নিম্নম্**—নিম্নগামী; **আপঃ**—জল, **ইব**—ঠিক যেমন; **স্বয়ম্**—স্বাভাবিকভাবে।

অনুবাদ

জল যেমন স্বাভাবিকভাবেই নিম্নগামী হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মৈত্রী-ভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত ব্যক্তির প্রতি সমস্ত জীব শ্রদ্ধাশীল হয়।

তাৎপর্য

এই সূত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, সুরুচি, যিনি ধ্রুব মহারাজের প্রতি একেবারেই সদয় ছিলেন না, কেন তিনি তাঁকে "দীর্ঘজীবী হও" বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনিও তাঁর কল্যাণ কামনা করেছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ধ্রুব মহারাজ ভগবানের কৃপা লাভ করেছিলেন, তাই তাঁর দিব্য গুণাবলীর জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য ছিলেন, ঠিক যেমন জল স্বাভাবিকভাবেই নিম্নগামী হয়। ভগবদ্ভক্ত কারও কাছ থেকে সম্মান প্রত্যাশা করেন না, কিন্তু পৃথিবীর যেখানেই তিনি যান, সেখানেই তাঁকে সকলে সম্মান করেন। শ্রীনিবাস আচার্য বলেছেন যে, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীগণ সারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পূজিত ছিলেন, কারণ ভক্ত যখন সমস্ত সৃষ্টির উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তখন সকলেই প্রসন্ন হন, এবং তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্লোক ৪৮

উত্তমশ্চ ধ্রুবশ্চোভাবন্যোন্যং প্রেমবিহ্বলৌ ।
অঙ্গসঙ্গাদুৎপুলকাবস্রৌঘং মুহুরূহতুঃ ॥ ৪৮ ॥

উত্তমঃ চ—উত্তমও; **ধ্রুবঃ চ**—ধ্রুবও; **উভৌ**—উভয়ে; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরকে; **প্রেম-বিহ্বলৌ**—স্নেহাভিভূত হয়ে; **অঙ্গ-সঙ্গাৎ**—আলিঙ্গনের দ্বারা; **উৎপুলকৌ**—তাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল; **অস্র**—অশ্রুর; **ওঘম্**—ধারা; **মুহুঃ**—বারংবার; **ঊহতুঃ**—আদান-প্রদান করেছিল।

অনুবাদ

উত্তম এবং ধ্রুব মহারাজ দুই ভাইও প্রেমে বিহ্বল হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিল। উভয়ের অঙ্গস্পর্শে তাঁদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল, এবং উভয়েই মুহুর্মুহু আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

সুনীতিরস্য জননী প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং সুতম্ ।
উপগুহ্য জহাবাধিং তদঙ্গস্পর্শনির্বৃতা ॥ ৪৯ ॥

সুনীতিঃ—ধ্রুব মহারাজের জননী সুনীতি; **অস্য**—তাঁর; **জননী**—মাতা; **প্রাণেভ্যঃ**—প্রাণের থেকেও; **অপি**—অধিকতব; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **সুতম্**—পুত্রকে; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **আধিম্**—সমস্ত শোক; **তৎ-অঙ্গ**—তার দেহ; **স্পর্শ**—স্পর্শ করে; **নির্বৃতা**—সন্তুষ্ট হয়ে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের জননী সুনীতি তাঁর প্রাণের থেকেও অধিক প্রিয় পুত্রের সুকোমল অঙ্গ স্পর্শ করে, গভীর প্রসন্নতায় তাঁর সমস্ত বেদনা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

পয়ঃস্তনাভ্যাং সুস্রাব নেত্রজৈঃ সলিলৈঃ শিবৈঃ ।
তদাভিষিচ্যমানাভ্যাং বীর বীরসুবো মুহুঃ ॥ ৫০ ॥

পয়ঃ—দুধ; **স্তনাভ্যাম্**—তাঁর স্তনযুগল থেকে; **সুস্রাব**—প্রবাহিত হতে লাগল; **নেত্র-জৈঃ**—তাঁর নয়ন থেকে; **সলিলৈঃ**—অশ্রুর দ্বারা; **শিবৈঃ**—শুভ; **তদা**—তখন; **অভিষিচ্যমানাভ্যাম্**—আর্দ্র হয়েছিল; **বীর**—হে বিদুর; **বীর-সুবঃ**—বীর-প্রসবিনী; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

হে বিদুর! বীর-প্রসবিনী সুনীতির স্তনযুগল থেকে ক্ষরিত দুগ্ধের সঙ্গে তাঁর অশ্রুধারা মিশ্রিত হয়ে ধ্রুব মহারাজের সমগ্র অঙ্গ সিক্ত করেছিল। সেটি ছিল একটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ।

তাৎপর্য

যখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন দুধ, দই আদি পঞ্চামৃতের দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে স্নান করানো হয়। সেই অনুষ্ঠানকে বলা হয় অভিষেক। এই শ্লোকেও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুনীতির অশ্রুধারায় এবং দুগ্ধধারায় ধ্রুব মহারাজের অভিষেক হয়েছিল, এবং সেই শুভ লক্ষণটি ইঙ্গিত করেছিল যে, অচিরেই ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। ধ্রুব মহারাজের পিতা তাঁকে তাঁর কোলে বসতে দেননি বলে, তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, এবং ধ্রুব মহারাজ বদ্ধপরিকর ছিলেন যে, যদি তিনি তাঁর পিতার সিংহাসন না পান, তা হলে তিনি আর ফিরে আসবেন না। এখন তাঁর স্নেহময়ী জননীর দ্বারা তাঁর যে অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা সূচিত করেছিল যে, তিনি মহারাজ উত্তানপাদের সিংহাসন অধিকার করবেন।

এখানে ধ্রুব মহারাজের মাতা সুনীতিকে যে *বীর-সূ* বা বীর-প্রসবিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীতে বহু বীরের জন্ম হয়েছে, কিন্তু ধ্রুব মহারাজের সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। তিনি কেবল এই পৃথিবীর একজন বীর সম্রাটই ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি ছিলেন একজন মহান ভক্তও। ভগবদ্ভক্ত হচ্ছেন মহাবীর, কারণ তিনি মায়ার প্রভাব জয় করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই জগতে সব চাইতে যশস্বী কে, তখন রামানন্দ রায় উত্তর দিয়েছিলেন যে, যিনি ভগবানের মহান ভক্ত বলে পরিচিত, তিনিই হচ্ছেন সব চাইতে যশস্বী।

শ্লোক ৫১

তাং শশংসুর্জনা রাজ্ঞীং দিষ্ট্যা তে পুত্র আর্তিহা ।
প্রতিলব্ধশ্চিরং নষ্টো রক্ষিতা মণ্ডলং ভুবঃ ॥ ৫১ ॥

তাম্—রানী সুনীতিকে; **শশংসুঃ**—প্রশংসা করে; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **রাজ্ঞীম্**—রানীকে; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যের দ্বারা; **তে**—আপনার; **পুত্রঃ**—পুত্র; **আর্তি-হা**—

আপনার সমস্ত দুঃখ দূর করবে; **প্রতিলব্ধ**—এখন ফিরে এসেছে; **চিরম্**—দীর্ঘকাল যাবৎ; **নষ্টঃ**—হারানো; **রক্ষিতা**—রক্ষা করবে; **মণ্ডলম্**—মণ্ডল; **ভুবঃ**—পৃথিবী।

অনুবাদ

পুরবাসীরা রাজমহিষী সুনীতির প্রশংসা করে বললেন—হে রাজ্ঞী! দীর্ঘকাল পূর্বে আপনার প্রিয় পুত্র হারিয়ে গিয়েছিল, এবং আপনার মহা সৌভাগ্যের ফলে, এখন তাঁকে ফিরে পেয়েছেন। আপনার এই পুত্র দীর্ঘকাল আপনাকে রক্ষা করবে এবং আপনার সমস্ত শোক দূর করবে।

শ্লোক ৫২

অভ্যর্চিতস্ত্বয়া নূনং ভগবান্ প্রণতার্তিহা ।
যদনুধ্যায়িনো ধীরা মৃত্যুং জিগ্যুঃ সুদুর্জয়ম্ ॥ ৫২ ॥

অভ্যর্চিতঃ—পূজিত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রণত-আর্তি-হা**—যিনি তাঁর ভক্তদের মহা বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন; **যৎ**—যাঁকে; **অনুধ্যায়িনঃ**—নিরন্তর ধ্যান করে; **ধীরাঃ**—মহাপুরুষগণ; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **জিগ্যুঃ**—জয় করেন; **সুদুর্জয়ম্**—যাঁকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন।

অনুবাদ

হে রানী! আপনি নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেছেন, যিনি তাঁর ভক্তদের মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেন। যাঁরা নিরন্তর তাঁর ধ্যান করেন, তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর পথ অতিক্রম করেন। এই প্রকার সিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন রাজমহিষী সুনীতির হারানো সন্তান, কিন্তু ধ্রুবের অনুপস্থিতি কালে তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতেন, যিনি তাঁর ভক্তকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর গৃহ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন, তখন তিনিই কেবল মধুবনে কঠোর তপস্যা করেননি, তাঁর গৃহে তাঁর মাতাও তাঁর সুরক্ষার জন্য এবং সৌভাগ্যের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। অর্থাৎ মাতা এবং পুত্র উভয়ের দ্বারাই ভগবান আরাধিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে পরম আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। এখানে

সুদুর্জয়ম্ এই বিশেষণটি ইঙ্গিত করে যে, মৃত্যুকে কেউই জয় করতে পারে না, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধ্রুব মহারাজ যখন গৃহ থেকে নিরুদ্দেশ ছিলেন, তখন তাঁর পিতা মনে করেছিলেন যে, ধ্রুবের মৃত্যু হয়েছে। সাধারণত পাঁচ বছর বয়সের রাজপুত্র যদি গৃহত্যাগ করে বনে যায়, তা হলে নিশ্চিতভাবে মনে করা হবে যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, তিনি কেবল সুরক্ষিতই ছিলেন না, পরম সিদ্ধি লাভের আশীর্বাদও তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

লাল্যমানং জনৈরেবং ধ্রুবং সভ্রাতরং নৃপঃ ।
আরোপ্য করিণীং হৃষ্টঃ স্তূয়মানোঽবিশৎপুরম্ ॥ ৫৩ ॥

লাল্যমানম্—এইভাবে প্রশংসিত হয়ে; **জনৈঃ**—জনসাধারণের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **ধ্রুবম্**—মহারাজ ধ্রুবকে; **স-ভ্রাতরম্**—তাঁর ভ্রাতা সহ; **নৃপঃ**—রাজা; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **করিণীম্**—হস্তিনীর পৃষ্ঠে; **হৃষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **স্তূয়মানঃ**—এবং প্রশংসিত হয়ে; **অবিশৎ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **পুরম্**—তাঁর রাজধানীতে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর। এইভাবে সকলে যখন ধ্রুব মহারাজের প্রশংসা করছিলেন, তখন রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং ধ্রুব ও তাঁর ভ্রাতা উত্তমকে একটি হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে তিনি তাঁর রাজধানীতে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে সকলেই তাঁর প্রশংসা করছিল।

শ্লোক ৫৪

তত্র তত্রোপসংক্লৃপ্তৈর্লসন্মকরতোরণৈঃ ।
সবৃন্দৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈশ্চ তদ্বিধৈঃ ॥ ৫৪ ॥

তত্র তত্র—ইতস্তত; **উপসংক্লৃপ্তৈঃ**—সাজানো হয়েছিল; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **মকর**—মকর আকৃতি; **তোরণৈঃ**—তোরণের দ্বারা; **স-বৃন্দৈঃ**—ফুল এবং ফলের গুচ্ছের দ্বারা; **কদলী**—কদলী বৃক্ষের; **স্তম্ভৈঃ**—স্তম্ভের দ্বারা; **পূগ-পোতৈঃ**—নবীন সুপারিবৃক্ষের দ্বারা; **চ**—ও; **তৎ-বিধৈঃ**—সেই প্রকার।

অনুবাদ

সমগ্র নগরী ফুল ও ফলের গুচ্ছসমন্বিত কদলী বৃক্ষের স্তম্ভ এবং নবীন গুবাক তরুর দ্বারা সাজানো হয়েছিল, এবং প্রাসাদদ্বারে মকর-তোরণ রচিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে শুভ অনুষ্ঠানে তাল, নারকেল, সুপারি, কদলী ইত্যাদি বৃক্ষের সবুজ পত্র এবং ফল, ফুল ইত্যাদি দিয়ে সাজানোর প্রথা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। তাঁর মহান পুত্র ধ্রুব মহারাজকে স্বাগত জানাবার জন্য মহারাজ উত্তানপাদ এক অতি সুন্দর আয়োজন করেছিলেন, এবং সেই অনুষ্ঠানে সমস্ত নাগরিকেরা পরম উৎসাহে ও মহা আনন্দে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

চূতপল্লববাসঃস্রঙ্মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ ।
উপস্কৃতং প্রতিদ্বারমপাং কুম্ভৈঃ সদীপকৈঃ ॥ ৫৫ ॥

চূত-পল্লব—আম্রপল্লবের দ্বারা; **বাসঃ**—বস্ত্র; **স্রক্**—ফুলের মালা; **মুক্তা-দাম**—মুক্তাদাম; **বিলম্বিভিঃ**—ঝুলন্ত; **উপস্কৃতম্**—সুসজ্জিত; **প্রতি-দ্বারম্**—প্রতি দ্বারে; **অপাম্**—জলপূর্ণ; **কুম্ভৈঃ**—কলসের দ্বারা; **স-দীপকৈঃ**—দীপাবলীর দ্বারা।

অনুবাদ

প্রতিটি দ্বার আম্রপল্লব, বস্ত্র, মাল্য ও মুক্তাদামের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং বহির্দেশে সারি সারি জলপূর্ণ কলস এবং তার সামনে দীপাবলী শোভা পাচ্ছিল।

শ্লোক ৫৬

প্রাকারৈর্গোপুরাগারৈঃ শাতকুম্ভপরিচ্ছদৈঃ ।
সর্বতোঽলঙ্কৃতং শ্রীমদ্বিমানশিখরদ্যুভিঃ ॥ ৫৬ ॥

প্রাকারৈঃ—প্রাচীরে; **গোপুর**—নগরদ্বার; **আগারৈঃ**—গৃহে; **শাতকুম্ভ**—স্বর্ণময়; **পরিচ্ছদৈঃ**—অলঙ্কৃত; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **অলঙ্কৃতম্**—সুসজ্জিত; **শ্রীমৎ**—মূল্যবান, সুন্দর; **বিমান**—বিমানসমূহ; **শিখর**—গম্বুজ; **দ্যুভিঃ**—উজ্জ্বল।

অনুবাদ

নগরীর সমস্ত প্রাসাদ নগরদ্বার এবং প্রাচীর স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হয়েছিল। প্রাসাদের শিখরগুলি উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল এবং নগরীর চতুর্দিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল যে সমস্ত বিমান, সেগুলির শিখরগুলিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এখানে বিমানের উল্লেখ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ বিজয়ধ্বজ তীর্থ বলেছেন যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার রাজধানীতে ফিরে আসায়, তাঁকে আশীর্বাদ করার জন্য স্বর্গের দেবতারা তাঁদের বিমানে চড়ে সেখানে এসেছিলেন। এই বর্ণনা থেকে এও প্রতীত হয় যে, নগরীর সমস্ত প্রাসাদগুলির শিখর এবং বিমানের চূড়াগুলি স্বর্ণমণ্ডিত ছিল, এবং সূর্যকিরণে সেইগুলি ঝলমল করছিল। ধ্রুব মহারাজের সময়ের সঙ্গে এখনকার সময়ের পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। তখনকার দিনের বিমানগুলি সোনা দিয়ে তৈরি ছিল, আর এখনকার বিমানগুলি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ধ্রুব মহারাজের সময়ের ঐশ্বর্যের তুলনায় বর্তমান সমাজ কত দরিদ্র।

শ্লোক ৫৭

মৃষ্টচত্বররথ্যাট্টমার্গং চন্দনচর্চিতম্ ।
লাজাক্ষতৈঃ পুষ্পফলৈস্তণ্ডুলৈর্বলিভির্যুতম্ ॥ ৫৭ ॥

মৃষ্ট—পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত; **চত্বর**—চত্বর; **রথ্যা**—রাজপথ; **অট্ট**—বসার উচ্চ স্থান; **মার্গম্**—পথ; **চন্দন**—চন্দনের দ্বারা; **চর্চিতম্**—সিক্ত; **লাজ**—খই; **অক্ষতৈঃ**—যব; **পুষ্প**—ফুল; **ফলৈঃ**—এবং ফল; **তাণ্ডুলৈঃ**—চালের দ্বারা; **বলিভিঃ**—উপহারের সামগ্রী; **যুতম্**—যুক্ত।

অনুবাদ

নগরের সমস্ত চত্বর, রাজপথ, গলি এবং রাস্তার মোড়ে বসবার উচ্চ স্থানগুলি খুব ভাল করে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং চন্দন জলে সিক্ত করা হয়েছিল; আর খই, যব, ধান, ফুল, ফল এবং অন্য অনেক প্রকার মাঙ্গলিক উপহার সামগ্রী নগরীর সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল।

শ্লোক ৫৮-৫৯

ধ্রুবায় পথি দৃষ্টায় তত্র তত্র পুরস্ত্রিয়ঃ ।
সিদ্ধার্থাক্ষতদধ্যম্বুদূর্বাপুষ্পফলানি চ ॥ ৫৮ ॥
উপজহ্রুঃ প্রযুঞ্জানা বাৎসল্যাদাশিষঃ সতীঃ ।
শৃণ্বংস্তদ্বল্গুগীতানি প্রাবিশদ্ভবনং পিতুঃ ॥ ৫৯ ॥

ধ্রুবায়—ধ্রুবের উপর; **পথি**—পথে; **দৃষ্টায়**—দেখে; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **পুর-স্ত্রিয়ঃ**—পুরললনাগণ; **সিদ্ধার্থ**—শ্বেত সরিষা; **অক্ষত**—যব; **দধি**—দই; **অম্বু**—জল; **দূর্বা**—দূর্বা; **পুষ্প**—ফুল; **ফলানি**—ফল; **চ**—ও; **উপজহ্রুঃ**—বর্ষণ করেছিলেন; **প্রযুঞ্জানাঃ**—উচ্চারণ করে; **বাৎসল্যাৎ**—বাৎসল্য স্নেহে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **সতীঃ**—সাধ্বী রমণীগণ; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **তৎ**—তাঁদের; **বল্গু**—অত্যন্ত মধুর; **গীতানি**—সঙ্গীত; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **ভবনম্**—প্রাসাদে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার।

অনুবাদ

এইভাবে যখন ধ্রুব মহারাজ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সমস্ত সতী পুরললনাগণ তাঁকে দর্শন করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন, এবং বাৎসল্য স্নেহে তাঁরা তাঁকে আশীর্বাদ করে তাঁর উপর শ্বেত সর্ষপ, যব, দই, জল, দূর্বা, ফল এবং ফুল বর্ষণ করেছিলেন। এইভাবে ধ্রুব মহারাজ তাঁদের মনোহর গীত শ্রবণ করতে করতে তাঁর পিতার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৬০

মহামণিব্রাতময়ে স তস্মিন্ ভবনোত্তমে ।
লালিতো নিতরাং পিত্রা ন্যবসদ্দিবি দেববৎ ॥ ৬০ ॥

মহা-মণি—মহা মূল্যবান রত্ন; **ব্রাত**—সমূহ; **ময়ে**—সজ্জিত; **সঃ**—তিনি (ধ্রুব মহারাজ); **তস্মিন্**—তাতে; **ভবন-উত্তমে**—অতি উত্তম ভবনে; **লালিতঃ**—পালিত; **নিতরাম্**—সর্বদা; **পিত্রা**—পিতার দ্বারা; **ন্যবসৎ**—সেখানে বাস করেছিলেন; **দিবি**—স্বর্গে; **দেব-বৎ**—দেবতাদের মতো।

অনুবাদ

তার পর ধ্রুব মহারাজ বহু মূল্যবান মণিরত্নে সজ্জিত তাঁর পিতার প্রাসাদে বাস করেছিলেন। তাঁর স্নেহশীল পিতা অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন, এবং তিনি সেই প্রাসাদে স্বর্গের দেবতাদের মতো সুখে বাস করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬১

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ ।
আসনানি মহার্হাণি যত্র রৌক্মা উপস্করাঃ ॥ ৬১ ॥

পয়ঃ—দুধ; **ফেন**—ফেনা; **নিভাঃ**—সদৃশ; **শয্যাঃ**—বিছানা; **দান্তাঃ**—হাতির দাঁতের তৈরি; **রুক্ম**—স্বর্ণময়; **পরিচ্ছদাঃ**—বিভূষিত; **আসনানি**—বসার স্থান; **মহা-অর্হাণি**—অত্যন্ত মূল্যবান; **যত্র**—যেখানে; **রৌক্মাঃ**—স্বর্ণময়; **উপস্করাঃ**—আসবাবপত্র।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ অত্যন্ত শুভ্র হস্তিদন্ত নির্মিত, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ বিশিষ্ট শয্যা, মহামূল্য আসন এবং সোনার আসবাবপত্র বিদ্যমান ছিল।

শ্লোক ৬২

যত্র স্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ ।
মণিপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ ॥ ৬২ ॥

যত্র—যেখানে; **স্ফটিক**—শ্বেত মর্মর নির্মিত; **কুড্যেষু**—দেওয়ালে; **মহা-মারকতেষু**—ইন্দ্রনীল আদি বহু মূল্যবান মণিরত্নের দ্বারা বিভূষিত; **চ**—ও; **মণি-প্রদীপাঃ**—মণিরত্ন-নির্মিত দীপ; **আভান্তি**—দীপ্তি; **ললনা**—স্ত্রীমূর্তি; **রত্ন**—রত্ননির্মিত; **সংযুতাঃ**—ধৃত।

অনুবাদ

সেই রাজপ্রাসাদ মরকত আদি মণিরত্ন-খচিত স্ফটিকের প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, এবং তাতে হাতে প্রদীপ্ত রত্নময় দীপসমন্বিত সুন্দর স্ত্রীমূর্তিখচিত ছিল।

তাৎপর্য

মহারাজ উত্তানপাদের প্রাসাদের এই বিবরণ শত-সহস্র বছর পূর্বে, *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনারও বহু আগের অবস্থা বর্ণনা করেছে। যেহেতু বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহারাজ ছত্রিশ হাজার বছর ধরে রাজত্ব করবেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই সত্যযুগে বাস করেছিলেন, যখন মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর। বৈদিক শাস্ত্রে চারটি যুগের আয়ুষ্কালও বর্ণনা করা হয়েছে। সত্যযুগে মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর, ত্রেতাযুগে দশ হাজার বছর, দ্বাপরযুগে এক হাজার বছর, এবং এই কলিযুগে বড়জোর এক শত বছর। প্রতিটি যুগে মানুষের আয়ুষ্কাল শতকরা নব্বই ভাগ কমে যায়—এক লক্ষ বছর থেকে দশ হাজার বছর, দশ হাজার বছর থেকে এক হাজার বছর, এবং এক হাজার বছর থেকে এক শত বছর।

বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধ্রুব মহারাজ ছিলেন ব্রহ্মার প্রপৌত্র। তার ফলে সূচিত হয় যে, ধ্রুব মহারাজ সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্যযুগে বিদ্যমান ছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার একদিনে বহু সত্যযুগ হয়। বৈদিক গণনা অনুসারে এখন অষ্টবিংশতি কল্প চলছে। গণনা করে বিচার করা যায় যে, ধ্রুব মহারাজ বহু কোটি বছর পূর্বে ছিলেন, কিন্তু ধ্রুব মহারাজের পিতার প্রাসাদের বর্ণনা এমনই মহিমামণ্ডিত যে, তা শোনার পর বিশ্বাসই করা যায় না যে, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার বছর আগে উন্নত মানব-সভ্যতা ছিল না। সম্প্রতি মোঘল আমলেও মহারাজ উত্তানপাদের প্রাসাদের মতো প্রাচীর ছিল। যাঁরা দিল্লীর লালকেল্লা দেখেছেন, তাঁরাই দেখে থাকবেন যে, সেখানকার প্রাচীর শ্বেত পাথরের তৈরি ছিল এবং তা এক সময় মূল্যবান মণিরত্ন খচিত ছিল। ইংরেজদের রাজত্বকালে এই সমস্ত মণিরত্নগুলি সেখান থেকে খুলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীনকালে মণিরত্ন, স্ফটিক, রেশম, হাতির দাঁত, সোনা, রূপা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জড়-জাগতিক বৈভব নির্ভর করত। বড় বড় মোটর গাড়ীর উপর তখনকার অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি ছিল না। মানব-সভ্যতার প্রগতি কলকারখানার উপর নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে, এবং যা সরবরাহ করেন পরমেশ্বর ভগবান, যাতে আমরা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আমাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করে মানব-জন্ম সার্থক করতে পারি।

এই শ্লোকের আর একটি তত্ত্ব হচ্ছে যে, ধ্রুব মহারাজের পিতা মহারাজ উত্তানপাদ শীঘ্রই তাঁর প্রাসাদের আসক্তি পরিত্যাগ করে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বনবাসী হবেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বর্ণনা থেকে আমরা আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর অন্য সমস্ত যুগের মানব-সভ্যতার তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে পারি।

শ্লোক ৬৩

উদ্যানানি চ রম্যাণি বিচিত্রৈরমরদ্রুমৈঃ ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ ॥ ৬৩ ॥

উদ্যানানি—উদ্যানসমূহ; **চ**—ও; **রম্যাণি**—অত্যন্ত সুন্দর; **বিচিত্রৈঃ**—বিবিধ; **অমর-দ্রুমৈঃ**—স্বর্গ থেকে আনা বৃক্ষসমূহের দ্বারা; **কূজৎ**—কূজন করেছিল; **বিহঙ্গ**—পাখি; **মিথুনৈঃ**—মিথুন; **গায়ৎ**—গুঞ্জন করে; **মত্ত**—উন্মত্ত; **মধু-ব্রতৈঃ**—মধুকরদের দ্বারা।

অনুবাদ

রাজার প্রাসাদ উদ্যানসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, যেখানে স্বর্গলোক থেকে নিয়ে আসা বহু বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষে বিহঙ্গ-মিথুন সুস্বরে কূজন করছিল এবং মধুপানোন্মত্ত মধুকরেরা গুন্‌গুন্ স্বরে গান করছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অমর-দ্রুমৈঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'স্বর্গলোক থেকে আনীত বৃক্ষের দ্বারা'। স্বর্গলোককে অমরলোক বলা হয়, যেখানে বহু দেরিতে মৃত্যু হয়, কারণ সেখানকার অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল দেবতাদের গণনা অনুসারে দশ হাজার বছর, এবং আমাদের গণনার ছয় মাসে তাদের একদিন হয়। স্বর্গলোকে দেবতারা তাঁদের মাস এবং বছরের গণনার বিচারে দশ সহস্র বছর বেঁচে থাকেন, এবং তার পর তাঁদের পুণ্যকর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে, তাঁদের আবার এই পৃথিবীতে অধঃপতিত হতে হয়। সেই সমস্ত তত্ত্ব বৈদিক শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়। সেখানকার মানুষদের আয়ু যেমন দশ হাজার বছর, তেমনই গাছেদের আয়ুও। এই পৃথিবীতে অবশ্য বহু গাছ রয়েছে, যেগুলি দশ হাজার বছর বাঁচে, সুতরাং স্বর্গলোকের গাছেদের আর কি কথা? সেইগুলি নিশ্চয়ই দশ হাজারেরও অধিক বছর বাঁচে, এবং কখনও কখনও, যেমন আজও প্রচলিত রয়েছে, মূল্যবান বৃক্ষগুলিকে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর পত্নী সত্যভামা সহ স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সেখান থেকে পারিজাত বৃক্ষ এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন। সেই জন্য তখন দেবতাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের যে প্রাসাদে রানী সত্যভামা থাকতেন, সেখানে পারিজাত রোপণ করা

হয়েছিল। স্বর্গের ফুল এবং ফলের বৃক্ষ উৎকৃষ্টতর, কারণ সেইগুলি অত্যন্ত মনোহর এবং সুস্বাদু। এখানকার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মহারাজ উত্তানপাদের প্রাসাদ এই প্রকার বহু বৃক্ষে শোভিত ছিল।

শ্লোক ৬৪

বাপ্যো বৈদূর্যসোপানাঃ পদ্মোৎপলকুমুদ্বতীঃ ।
হংসকারণ্ডবকুলৈর্জুষ্টাশ্চক্রাহ্বসারসৈঃ ॥ ৬৪ ॥

বাপ্যঃ—সরোবর; **বৈদূর্য**—পান্না; **সোপানাঃ**—সিঁড়ির দ্বারা, **পদ্ম**—কমল; **উৎপল**—নীল পদ্ম; **কুমুৎ-বতীঃ**—কুমুদিনীতে পূর্ণ; **হংস**—হংস; **কারণ্ডব**—কারণ্ডব; **কুলৈঃ**—ঝাঁক; **জুষ্টাঃ**—নিবাসকারী; **চক্রাহ্ব**—চক্রবাক (রাজহাঁস); **সারসৈঃ**—এবং সারস পক্ষীদের দ্বারা।

অনুবাদ

সেখানকার সরোবরগুলি পান্নার তৈরি সোপানাবলীর দ্বারা শোভিত ছিল, তাতে পদ্ম, উৎপল, ও কুমুদরাজি প্রস্ফুটিত ছিল, এবং হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস ইত্যাদি পক্ষীকুল সেই জলে বিহার করছিল।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাসাদের চারপাশে কেবল বিচিত্র বৃক্ষসমন্বিত উদ্যান এবং বাগানই ছিল না, সেখানে অনেক মনুষ্য-নির্মিত সরোবরও ছিল, যা বিচিত্র বর্ণের কমল, কুমুদ আদি ফুলের দ্বারা শোভিত ছিল, এবং সেই জলে নামার জন্য পান্না আদি মূল্যবান মণির তৈরি সোপান ছিল। উদ্যান-বেষ্টিত সেই সমস্ত সুন্দর সরোবরে হংস, চক্রবাক, কারণ্ডব, সারস আদি সুন্দর পক্ষীকুল বিরাজ করত। এই সমস্ত পাখিরা কাকেদের মতো নোংরা জায়গায় থাকে না। এই বর্ণনা থেকে সহজে অনুমান করা যায়, সেই নগরীর পরিবেশ কত স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর ছিল।

শ্লোক ৬৫

উত্তানপাদো রাজর্ষিঃ প্রভাবং তনয়স্য তম্ ।
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাদ্ভুততমং প্রপেদে বিস্ময়ং পরম্ ॥ ৬৫ ॥

উত্তানপাদঃ—মহারাজ উত্তানপাদ; **রাজ-ঋষিঃ**—মহান ঋষিতুল্য রাজা; **প্রভাবম্**—প্রভাব; **তনয়স্য**—তাঁর পুত্রের; **তম্**—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে;

অদ্ভুত—আশ্চর্যজনক; **তমম্**—সর্বোত্তম; **প্রপেদে**—সুখপূর্বক অনুভব করেছিলেন; **বিস্ময়ম্**—বিস্ময়; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

রাজর্ষি উত্তানপাদ তাঁর পুত্র ধ্রুবের মহিমা শ্রবণ করে এবং তাঁর প্রভাব দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ ধ্রুবের কার্যকলাপ ছিল আশ্চর্যতম।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন বনে তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর পিতা উত্তানপাদ তাঁর অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের কথা শুনেছিলেন। যদিও ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন রাজার পুত্র এবং তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর, তবুও তিনি কঠোর তপস্যা করার জন্য বনে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, এবং তিনি যখন গৃহে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর চিন্ময় গুণাবলীর জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই নাগরিকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন ভগবানের কৃপায় তিনি অবশ্যই অনেক অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন। কেউ যখন মহান কার্যকলাপের জন্য স্বীকৃতি লাভ করেন, তখন তাঁর পিতাই সব চাইতে বেশি প্রসন্ন হন। মহারাজ উত্তানপাদ একজন সাধারণ রাজা ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন রাজর্ষি। পূর্বে সারা পৃথিবী কেবল একজন রাজর্ষির দ্বারা শাসিত হত। রাজারা ঋষিদের মতো মহাত্মা হওয়ার শিক্ষা লাভ করতেন, তাই জনসাধারণের মঙ্গল সাধন ব্যতীত তাঁদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এই সমস্ত রাজর্ষিরা যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করতেন, এবং *ভগবদ্গীতায়ও* যে-কথা বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান বা *ভগবদ্গীতা* নামে পরিচিত ভক্তিযোগের পন্থা সূর্যলোকের রাজর্ষিকে প্রথম বলা হয়েছিল, এবং তা যথাক্রমে সূর্য এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান যদি মহাত্মা হন, তা হলে জনসাধারণও অবশ্যই সৎ হন, এবং তাঁরা অত্যন্ত সুখী হন, কারণ তাঁদের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক সমস্ত প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি যথাযথভাবে তৃপ্ত হয়।

শ্লোক ৬৬

বীক্ষ্যোঢ়বয়সং তং চ প্রকৃতীনাং চ সম্মতম্ ।
অনুরক্তপ্রজং রাজা ধ্রুবং চক্রে ভুবঃ পতিম্ ॥ ৬৬ ॥

বীক্ষ্য—দেখে; **উঢ়-বয়সম্**—পরিণত বয়স; **তম্**—ধ্রুব; **চ**—এবং; **প্রকৃতীনাম্**—মন্ত্রীদের দ্বারা; **চ**—ও; **সম্মতম্**—অনুমোদিত; **অনুরক্ত**—প্রিয়; **প্রজম্**—প্রজাদের; **রাজা**—রাজা; **ধ্রুবম্**—ধ্রুব মহারাজকে; **চক্রে**—করেছিলেন; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **পতিম্**—প্রভু।

অনুবাদ

তারপর মহারাজ উত্তানপাদ বিচার করে দেখলেন যে, ধ্রুব মহারাজ রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয়েছেন এবং মন্ত্রীরা সম্মত আছেন এবং প্রজারাও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, তখন তিনি ধ্রুবকে সারা পৃথিবীর সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করলেন।

তাৎপর্য

যদিও ভ্রান্তিবশত অনেকে মনে করে যে, পূর্বে রাজতন্ত্র ছিল স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, মহারাজ উত্তানপাদ কেবল রাজর্ষিই ছিলেন না, তাঁর প্রিয় পুত্র ধ্রুবকে সারা পৃথিবীর সম্রাটরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পূর্বে, তিনি তাঁর অমাত্যবর্গের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, প্রজাদের মতামত বিবেচনা করেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং ধ্রুব মহারাজের চরিত্র পরীক্ষা করেছিলেন। তার পর তিনি তাঁকে পৃথিবীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

ধ্রুব মহারাজের মতো বৈষ্ণব রাজা যখন সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব করেন, তখন পৃথিবী যে কত সুখী হয়, তা কল্পনা করা যায় না অথবা বর্ণনা করা যায় না। এখনও যদি মানুষ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়, তা হলে আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক সরকার ঠিক স্বর্গরাজ্যের মতো হয়ে উঠবে। সমস্ত মানুষেরা যদি কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়, তা হলে তারা ধ্রুব মহারাজের মতো ব্যক্তিকে ভোট দেবেন। যদি এই প্রকার বৈষ্ণব নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তা হলে আসুরিক সরকারের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যুবক সম্প্রদায় সেখানকার সরকারকে উচ্ছেদ করতে অত্যন্ত উৎসাহী। কিন্তু মানুষ যদি ধ্রুব মহারাজের মতো কৃষ্ণভক্ত না হন, তা হলে সেই সমস্ত সরকার কোন বিশেষ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হবে না, কারণ যারা যেন-তেন প্রকারেণ রাজনৈতিক পদ অধিকার করতে উৎসুক, তারা জনসাধারণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে পারে না। তারা কেবল তাদের পদ এবং অর্থনৈতিক লাভের ব্যাপারেই ব্যস্ত থাকে। নাগরিকদের মঙ্গল সাধনের কথা চিন্তা করার কোন সময় তাদের থাকে না।

শ্লোক ৬৭

আত্মানং চ প্রবয়সমাকলয্য বিশাম্পতিঃ ।
বনং বিরক্তঃ প্রাতিষ্ঠদ্বিমৃশন্নাত্মনো গতিম্ ॥ ৬৭ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **চ**—ও; **প্রবয়সম্**—বৃদ্ধাবস্থা; **আকলয্য**—বিবেচনা করে; **বিশাম্পতিঃ**—মহারাজ উত্তানপাদ; **বনম্**—বনে; **বিরক্তঃ**—অনাসক্ত; **প্রাতিষ্ঠৎ**—প্রস্থান করেছিলেন; **বিমৃশন্**—বিবেচনা করে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গতিম্**—মুক্তি।

অনুবাদ

তাঁর বৃদ্ধাবস্থা বিবেচনা করে এবং তাঁর আত্মার কল্যাণের কথা চিন্তা করে, মহারাজ উত্তানপাদ বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে বনে গমন করলেন।

তাৎপর্য

এটি হচ্ছে রাজর্ষির লক্ষণ। মহারাজ উত্তানপাদ ছিলেন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী এবং সারা পৃথিবীর সম্রাট, অতএব এই প্রকার আসক্তি স্বভাবতই অত্যন্ত গভীর। আধুনিক যুগের রাজনীতিবিদেরা মহারাজ উত্তানপাদের মতো মহান নয়। কিছু দিনের জন্য একটু রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে তারা তাদের পদের প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়ে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ঠুর মৃত্যু তাদের গ্রাস না করে অথবা বিরোধী রাজনৈতিক দল তাদের হত্যা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অবসর গ্রহণ করতে চায় না। আমাদের অভিজ্ঞতাতেই আমরা দেখেছি যে, ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদেরা মৃত্যু পর্যন্ত তাদের পদ ত্যাগ করতে চায় না। প্রাচীনকালে এই রকম প্রথা ছিল না, যা এখানে মহারাজ উত্তানপাদের আচরণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাঁর উপযুক্ত পুত্র ধ্রুব মহারাজকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবার পরেই, তিনি তাঁর প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে প্রৌঢ় অবস্থায় রাজাদের রাজ্য ত্যাগ করে, তপস্যা করার জন্য বনে যাওয়ার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত রয়েছে। মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তপস্যা করা। ধ্রুব মহারাজ যেমন তাঁর শৈশবে তপস্যা করেছিলেন, তাঁর পিতা মহারাজ উত্তানপাদও বার্ধক্যে বনে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগে তপস্যা করার জন্য গৃহত্যাগ করে বনে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সকল বয়সের মানুষেরাই যদি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ করে অবৈধ যৌন জীবন, আসবপান, দ্যূতক্রীড়া এবং আমিষ আহার বর্জন করার সহজ তপস্যা অনুশীলন করেন, এবং নিয়মিতভাবে

(প্রতিদিন ষোল মালা) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন, তা হলে তাঁরা অনায়াসে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ধ্রুব মহারাজের গৃহে প্রত্যাবর্তন' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দশম অধ্যায়

যক্ষদের সঙ্গে ধ্রুব মহারাজের যুদ্ধ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

প্রজাপতের্দুহিতরং শিশুমারস্য বৈ ধ্রুবঃ ।
উপয়েমে ভ্রমিং নাম তৎসুতৌ কল্পবৎসরৌ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির; **দুহিতরম্**—কন্যা; **শিশুমারস্য**—শিশুমারের; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **উপয়েমে**—বিবাহ করেছিলেন; **ভ্রমিম্**—ভ্রমি, **নাম**—নামক; **তৎ-সুতৌ**—তাঁর পুত্রগণ; **কল্প**—কল্প; **বৎসরৌ**—বৎসর।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! তার পর ধ্রুব মহারাজ প্রজাপতি শিশুমারের কন্যা ভ্রমিকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কল্প এবং বৎসর নামক দুই পুত্র হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবং আত্ম উপলব্ধির জন্য তাঁর পিতার গৃহত্যাগ করে বনে প্রস্থান করার পর বিবাহ করেছিলেন। এই সূত্রে লক্ষ্যণীয় যে, মহারাজ উত্তানপাদ তাঁর পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতার কর্তব্য, তা সত্ত্বেও কেন তিনি গৃহত্যাগ করার পূর্বে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেননি? তার উত্তর হচ্ছে যে, মহারাজ উত্তানপাদ ছিলেন একজন রাজর্ষি। যদিও তিনি তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন, তবুও তিনি তাঁর আত্ম-উপলব্ধির বিষয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই তাঁর পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করা মাত্রই তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, ঠিক যেমন তাঁর পুত্র মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই আত্ম উপলব্ধির জন্য নির্ভয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

এই প্রকার বিরল দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের গুরুত্ব অন্য সমস্ত জরুরী কাজের থেকে উর্ধ্বে। মহারাজ উত্তানপাদ ভালভাবেই জানতেন যে, তাঁর পুত্র ধ্রুব মহারাজের বিবাহ দেওয়া আত্ম-উপলব্ধির জন্য বনে যাওয়ার থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

শ্লোক ২

ইলায়ামপি ভার্যায়াং বায়োঃ পুত্র্যাং মহাবলঃ ।
পুত্রমুৎকলনামানং যোষিদ্রত্নমজীজনৎ ॥ ২ ॥

ইলায়াম্—ইলা নামক তাঁর পত্নীকে; **অপি**—ও; **ভার্যায়াম্**—পত্নীকে; **বায়োঃ**—বায়ুদেবতার; **পুত্র্যাম্**—কন্যাকে; **মহা-বলঃ**—অত্যন্ত বলবান ধ্রুব মহারাজ; **পুত্রম্**—পুত্র; **উৎকল**—উৎকল; **নামানম্**—নামক; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **রত্নম্**—রত্ন; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

অত্যন্ত শক্তিশালী ধ্রুব মহারাজের ইলা নামক অন্য আর একজন পত্নী ছিল, যিনি ছিলেন বায়ুদেবতার কন্যা। তাঁর গর্ভে তিনি উৎকল নামক একটি পুত্র এবং এক অতি সুন্দরী কন্যারত্ন উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

উত্তমস্ত্বকৃতোদ্বাহো মৃগয়ায়াং বলীয়সা ।
হতঃ পুণ্যজনেনাদ্রৌ তন্মাতাস্য গতিং গতা ॥ ৩ ॥

উত্তমঃ—উত্তম; **তু**—কিন্তু; **অকৃত**—বিনা; **উদ্বাহঃ**—বিবাহ; **মৃগয়ায়াম্**—মৃগয়ায়; **বলীয়সা**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **হতঃ**—নিহত হয়েছিলেন; **পুণ্য-জনেন**—এক যক্ষের দ্বারা; **অদ্রৌ**—হিমালয় পর্বতে; **তৎ**—তাঁর; **মাতা**—মাতা (সুরুচি); **অস্য**—তাঁর পুত্রের; **গতিম্**—পথ; **গতা**—অনুসরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তম, যিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন, এক সময় মৃগয়ায় গিয়ে, হিমালয় পর্বতে এক অতি বলবান যক্ষের দ্বারা নিহত হন। তাঁর মাতা সুরুচিও তাঁর পুত্রের পথ অনুসরণ করেছিলেন (মৃত্যুবরণ করেছিলেন)।

শ্লোক ৪

ধ্রুবো ভ্রাতৃবধং শ্রুত্বা কোপামর্ষশুচার্পিতঃ ।
জৈত্রং স্যন্দনমাস্থায় গতঃ পুণ্যজনালয়ম্ ॥ ৪ ॥

ধ্রুবঃ—ধ্রুব মহারাজ, **ভ্রাতৃ-বধম্**—তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুর বার্তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কোপ**—ক্রোধ; **অমর্ষ**—প্রতিশোধ; **শুচা**—বিলাপ; **অর্পিতঃ**—পূর্ণ হয়ে; **জৈত্রম্**—বিজয়ী; **স্যন্দনম্**—রথ; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **পুণ্য-জন-আলয়ম্**—যক্ষপুরীতে।

অনুবাদ

হিমালয় পর্বতে যক্ষের হাতে তাঁর ভ্রাতা উত্তমের মৃত্যু হয়েছে, সেই সংবাদ পেয়ে ধ্রুব মহারাজ শোক এবং ক্রোধে অভিভূত হয়ে, তাঁর রথে চড়ে যক্ষপুরী বা অলকাপুরী বিজয় করতে বহির্গত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের ক্রুদ্ধ হওয়া, শোকে অভিভূত হওয়া এবং শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা তাঁর মতো মহাভাগবতের পক্ষে অসংগত ছিল না। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা যে, ভক্তদের ক্রোধ, ঈর্ষা অথবা শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নয়. ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন রাজা, এবং তাই অন্যায়ভাবে যখন তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করা হয়, তখন হিমালয়ের সেই যক্ষদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া তাঁর কর্তব্য ছিল।

শ্লোক ৫

গত্বোদীচীং দিশং রাজা রুদ্রানুচরসেবিতাম্ ।
দদর্শ হিমবদ্দ্রোণ্যাং পুরীং গুহ্যকসংকুলাম্ ॥ ৫ ॥

গত্বা—গিয়ে; **উদীচীম্**—উত্তর; **দিশম্**—দিক; **রাজা**—ধ্রুব মহারাজ; **রুদ্র-অনুচর**—রুদ্র অর্থাৎ শিবের অনুচরদের দ্বারা; **সেবিতাম্**—অধ্যুষিত; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **হিমবৎ**—হিমালয়ের; **দ্রোণ্যাম্**—উপত্যকায়; **পুরীম্**—একটি নগরী; **গুহ্যক**—যক্ষ; **সংকুলাম্**—পূর্ণ।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ উত্তরাভিমুখে হিমালয় পর্বতে গমন করেছিলেন। সেখানে একটি উপত্যকায় রুদ্রের অনুচরগণ অধ্যুষিত একটি নগরী তিনি দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যক্ষরা হচ্ছে শিবের এক ধরনের ভক্ত। এই ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, যক্ষরা হয়তো তিব্বতীয়দের মতো হিমালয় পর্বতের কোন উপজাতি।

শ্লোক ৬

দধ্মৌ শঙ্খং বৃহদ্বাহুঃ খং দিশশ্চানুনাদয়ন্ ।
যেনোদ্বিগ্নদৃশঃ ক্ষত্তরুপদেব্যোঽত্রসন্‌ভৃশম্ ॥ ৬ ॥

দধ্মৌ—ফুৎকার দিয়েছিলেন; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **বৃহৎ-বাহুঃ**—শক্তিশালী বাহুসমন্বিত; **খম্**—আকাশ; **দিশঃ চ**—এবং সমস্ত দিক; **অনুনাদয়ন্**—প্রতিধ্বনিত করেছিলেন; **যেন**—যার দ্বারা; **উদ্বিগ্ন-দৃশঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়েছিল; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **উপদেব্যঃ**—যক্ষপত্নীগণ; **অত্রসন্**—ভয়ভীত হয়েছিল; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! অলকাপুরীতে পৌঁছানো মাত্রই, ধ্রুব মহারাজ তাঁর শঙ্খে ফুৎকার দিয়েছিলেন, এবং সেই শঙ্খধ্বনি সমগ্র আকাশ জুড়ে এবং সমস্ত দিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তা শুনে যক্ষ-রমণীগণ অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিল। তাদের চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তাদের হৃদয় উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৭

ততো নিষ্ক্রম্য বলিন উপদেবমহাভটাঃ ।
অসহন্তস্তন্নিনাদমভিপেতুরুদায়ুধাঃ ॥ ৭ ॥

ততঃ—তার পর; **নিষ্ক্রম্য**—বাহিরে এসে; **বলিনঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **উপদেব**—কুবেরের; **মহা-ভটাঃ**—মহান যোদ্ধারা; **অসহন্তঃ**—সহ্য করতে অক্ষম; **তৎ**—সেই শঙ্খের; **নিনাদম্**—ধ্বনি; **অভিপেতুঃ**—আক্রমণ করেছিল; **উদায়ুধাঃ**—বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে।

অনুবাদ

হে মহাবীর বিদুর! ধ্রুব মহারাজের শঙ্খধ্বনি সহ্য করতে না পেরে, মহাবলী যক্ষবীরেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য নগরী থেকে বেরিয়ে এল।

শ্লোক ৮

স তানাপততো বীর উগ্রধন্বা মহারথঃ ।
একৈকং যুগপৎসর্বানহন্ বাণৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—ধ্রুব মহারাজ; **তান্**—তাদের সকলকে; **আপততঃ**—তাঁর উপর পতিত হতে; **বীরঃ**—বীর; **উগ্র-ধন্বা**—শক্তিশালী ধনুর্ধর; **মহা-রথঃ**—বহু রথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম; **এক-একম্**—একে-একে; **যুগপৎ**—একত্রে; **সর্বান্**—তাদের সকলকে, **অহন্**—হত্যা করেছিলেন; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ**—তিন-তিনটি।

অনুবাদ

মহা ধনুর্ধারী ও মহারথী ধ্রুব মহারাজ সেই যক্ষ-সৈন্যদের অগ্রসর হতে দেখে, একসঙ্গে তিন-তিনটি করে বাণ নিক্ষেপ করে তাদের হত্যা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৯

তে বৈ ললাটলগ্নৈস্তৈরিষুভিঃ সর্ব এব হি ।
মত্বা নিরস্তমাত্মানমাশংসন্ কর্ম তস্য তৎ ॥ ৯ ॥

তে—তারা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ললাট-লগ্নৈঃ**—ললাট সংলগ্ন; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **ইষুভিঃ**—বাণসমূহ; **সর্বে**—তারা সকলে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—নিঃসন্দেহে; **মত্বা**—মনে করে; **নিরস্তম্**—পরাজিত; **আত্মানম্**—তারা নিজেরা; **আশংসন্**—প্রশংসা করেছিল; **কর্ম**—কার্য; **তস্য**—তাঁর; **তৎ**—সেই।

অনুবাদ

যক্ষবীরেরা যখন দেখল যে, ধ্রুব মহারাজের দ্বারা তাদের মস্তক ছিন্ন হতে চলেছে, তখন তারা সহজেই তাদের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিল, এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বীর হিসাবে, তারা ধ্রুব মহারাজের কার্যের প্রশংসা করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে বীরসুলভ মনোভাব প্রদর্শিত হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যক্ষেরা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন তাদের শত্রু, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধ্রুব মহারাজের আশ্চর্যজনক বীরত্ব দর্শন করে, তারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল। শত্রুর বীরত্বের এই প্রকার প্রশংসা ক্ষত্রিয়ের বিশেষ লক্ষণ।

শ্লোক ১০

তেঽপি চামুমমৃষ্যন্তঃ পাদস্পর্শমিবোরগাঃ ।
শরৈরবিধ্যন্ যুগপদ্ দ্বিগুণং প্রচিকীর্ষবঃ ॥ ১০ ॥

তে—যক্ষেরা, **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অমুম্**—ধ্রুবের প্রতি; **অমৃষ্যন্তঃ**—সহ্য করতে অক্ষম হয়ে; **পাদ-স্পর্শম্**—পদদলিত; **ইব**—সদৃশ; **উরগাঃ**—সর্প; **শরৈঃ**—বাণের; **অবিধ্যন্**—আঘাত করেছিল; **যুগপৎ**—একসঙ্গে, **দ্বি-গুণম্**—দ্বিগুণ; **প্রচিকীর্ষবঃ**—প্রতিকারের চেষ্টায়।

অনুবাদ

সর্প যেমন পদস্পর্শ সহনে অসমর্থ, সেই যক্ষরাও তেমন ধ্রুব মহারাজের আশ্চর্যজনক বীরত্ব সহ্য করতে না পেরে, তাদের ধনুক থেকে একসঙ্গে ছয়টি করে বাণ তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগল, এবং এইভাবে তারা তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল।

শ্লোক ১১-১২

ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাসশূলপরশ্বধৈঃ ।
শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুশুণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈঃ শরৈরপি ॥ ১১ ॥
অভ্যবর্ষন্ প্রকুপিতাঃ সরথং সহসারথিম্ ।
ইচ্ছন্তস্তৎপ্রতীকর্তুমযুতানাং ত্রয়োদশ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তার পর; **পরিঘ**—লোহার মুগুর; **নিস্ত্রিংশৈঃ**—তরবারি; **প্রাস-শূল**—ত্রিশূল; **পরশ্বধৈঃ**—বর্শা; **শক্তি**—শক্তি অস্ত্র; **ঋষ্টিভিঃ**—বল্লম; **ভুশুণ্ডীভিঃ**—ভুশুণ্ডী অস্ত্র; **চিত্র-বাজৈঃ**—বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট; **শরৈঃ**—বাণের দ্বারা; **অপি**—ও; **অভ্যবর্ষন্**—তারা ধ্রুবের উপর বর্ষণ করেছিল; **প্রকুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **স-রথম্**—তার রথ সহ;

সহ-সারথিম্—সারথি সহ; **ইচ্ছন্তঃ**—বাসনা করে; **তৎ**—ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ; **প্রতীকর্তুম্**—প্রতিকারের জন্য; **অযুতানাম্**—দশ হাজার; **ত্রয়োদশ**—তের।

অনুবাদ

যক্ষ সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার, এবং তারা সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অদ্ভুতকর্মা ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করতে ইচ্ছা করেছিল। তাদের সমস্ত শক্তি সহকারে তারা রথ এবং সারথি সহ ধ্রুব মহারাজের উপর পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, প্রাশশূল, পরশ্বধ, শক্তি, ঋষ্টি, ভূশুণ্ডী এবং বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল।

শ্লোক ১৩

ঔত্তানপাদিঃ স তদা শস্ত্রবর্ষেণ ভূরিণা ।
ন এবাদৃশ্যতাচ্ছন্ন আসারেণ যথা গিরিঃ ॥ ১৩ ॥

ঔত্তানপাদিঃ—ধ্রুব মহারাজ; **সঃ**—তিনি; **তদা**—তখন; **শস্ত্র-বর্ষেণ**—অস্ত্র বর্ষণের দ্বারা; **ভূরিণা**—নিরন্তর; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অদৃশ্যত**—দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, **আচ্ছন্নঃ**—আচ্ছাদিত হয়ে; **আসারেণ**—নিরন্তর বর্ষণের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **গিরিঃ**—পর্বত।

অনুবাদ

নিরন্তর অস্ত্র বর্ষণের ফলে ধ্রুব মহারাজ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন নিরন্তর বর্ষণের ফলে পর্বত সমাচ্ছন্ন হয়ে দৃষ্টির অগোচর হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন যে, ধ্রুব মহারাজ যদিও শত্রুপক্ষের নিরন্তর বাণ বর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিলেন, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি পরাভূত হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে বারি বর্ষণে আচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গের দৃষ্টান্তটি উপযুক্ত, কারণ পর্বত যখন বারি বর্ষণের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়, তখন সেই পর্বতগাত্র থেকে সমস্ত ময়লা ধুয়ে যায়। তেমনই, শত্রুপক্ষের নিরন্তর অস্ত্র-বর্ষণের ফলে, ধ্রুব মহারাজ তাদের পরাস্ত করার নবীন উদ্যম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, তাঁর মধ্যে যে কিছু অপূর্ণতা ছিল, তা সবই যেন বিধৌত হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ১৪

হাহাকারস্তদৈবাসীৎসিদ্ধানাং দিবি পশ্যতাম্ ।
হতোঽয়ং মানবঃ সূর্যো মগ্নঃ পুণ্যজনার্ণবে ॥ ১৪ ॥

হাহা-কারঃ—হাহাকার; **তদা**—তখন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আসীৎ**—প্রকট হয়েছিল; **সিদ্ধানাম্**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীদের; **দিবি**—আকাশে; **পশ্যতাম্**—যারা সেই যুদ্ধ দেখছিল, **হতঃ**—নিহত; **অয়ম**—এই; **মানবঃ**—মনুর পৌত্র; **সূর্যঃ**—সূর্য, **মগ্নঃ**—অস্ত গেছে; **পুণ্য-জন**—যক্ষদের; **অর্ণবে**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

উচ্চতর লোকের সমস্ত সিদ্ধরা আকাশ থেকে সেই যুদ্ধ দেখছিলেন, এবং যখন তাঁরা দেখলেন যে ধ্রুব মহারাজ শত্রুপক্ষের বাণ-বর্ষণে আচ্ছাদিত হয়ে গেছেন, তখন তাঁরা হাহাকার করে উঠেছিলেন, "হায়! মনুর পৌত্র ধ্রুব সূর্যবৎ এখন যক্ষদের সমুদ্রে অস্তমিত হল।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মানব* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত *মানব* শব্দটির অর্থ হচ্ছে মানুষ. এখানে ধ্রুব মহারাজকেও মানব বলে বর্ণনা করা হয়েছে ধ্রুব মহারাজই কেবল মনুর বংশধর ছিলেন না, সমগ্র মানব-সমাজ হচ্ছে মনুর বংশধর। বৈদিক শাস্ত্রের মতে মনু হচ্ছেন আইন-প্রদাতা। আজও ভারতবর্ষে হিন্দুরা মনু প্রদত্ত আইন অনুসরণ করেন। তাই, মানব-সমাজের সকলেই হচ্ছে মানব বা মনুর বংশধর। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট মানব, কারণ তিনি হচ্ছেন একজন মহান ভক্ত।

সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা, যাঁরা বিমান ব্যতীতই গগনমার্গে বিচরণ করতে পারেন, তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্রুব মহারাজের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, কেবল ভক্তরাই পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত নন, সমস্ত দেবতা, এমন কি সাধারণ মানুষেরা পর্যন্ত তাদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। এখানে যে ধ্রুব মহারাজরূপী সূর্যের যক্ষ-সমুদ্রে অস্তমিত হওয়ার তুলনাটি দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূর্য যখন দিগন্তে অস্ত যায়, তখন মনে হয় যেন সূর্য সমুদ্রে ডুবে গেল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্যের তাতে কোন অসুবিধা হয় না। তেমনই, যদিও মনে হয়েছিল যে, ধ্রুব মহারাজ যক্ষ-সমুদ্রে ডুবে গেছেন, তবুও তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। সূর্য যেমন রাত্রির অবসানে, যথা সময়ে পুনরায় উদিত হয়, তেমনই ধ্রুব মহারাজকে বিপদগ্রস্ত বলে মনে হলেও (কারণ, যুদ্ধে প্রতিকূলতা থাকবেই), তার অর্থ এই নয় যে, তিনি পরাস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

নদৎসু যাতুধানেষু জয়কাশিষ্বথো মৃধে ।
উদতিষ্ঠদ্রথস্তস্য নীহারাদিব ভাস্করঃ ॥ ১৫ ॥

নদৎসু—যখন চিৎকার করছিল; **যাতুধানেষু**—প্রেতরূপ যক্ষ; **জয়কাশিষু**—বিজয় ঘোষণা করে; **অথো**—তখন; **মৃধে**—যুদ্ধে; **উদতিষ্ঠৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **রথঃ**—রথ; **তস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **নীহারাৎ**—কুজ্ঝটিকা থেকে; **ইব**—মতো; **ভাস্করঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

যক্ষেরা সাময়িকভাবে জয় লাভ করে উল্লসিত হয়ে চিৎকার করছিল যে, তারা ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু তখন হঠাৎ ধ্রুব মহারাজের রথ আবির্ভূত হল, ঠিক যেমন কুজ্ঝটিকা ভেদ করে সহসা সূর্যের প্রকাশ হয়।

তাৎপর্য

এখানে ধ্রুব মহারাজকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং যক্ষদের কুজ্ঝটিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যের তুলনায় কুজ্ঝটিকা নিতান্তই নগণ্য সূর্য যদিও কখনও কখনও কুজ্ঝটিকার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্যকে কেউই আচ্ছাদিত করতে পারে না। আমাদের চক্ষু মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে, কিন্তু সূর্য কখনও আচ্ছাদিত হয় না। এই উপমার দ্বারা সর্ব অবস্থায় ধ্রুব মহারাজের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১৬

ধনুর্বিস্ফূর্জয়ন্দিব্যং দ্বিষতাং খেদমুদ্বহন্ ।
অস্ত্রৌঘং ব্যধমদ্বাণৈর্ঘনানীকমিবানিলঃ ॥ ১৬ ॥

ধনুঃ—তাঁর ধনুক; **বিস্ফূর্জয়ন্**—টঙ্কার দিয়ে; **দিব্যম্**—আশ্চর্যজনক; **দ্বিষতাম্**—শত্রুদের; **খেদম্**—বিষাদ; **উদ্বহন্**—সৃষ্টি করে; **অস্ত্র-ওঘম্**—বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র; **ব্যধমৎ**—তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন; **বাণৈঃ**—তাঁর বাণের দ্বারা; **ঘন**—মেঘের; **অনীকম্**—রাশি; **ইব**—মতো; **অনিলঃ**—বায়ু।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের ধনুকের টঙ্কার এবং বাণের ফুৎকার শত্রুদের হৃদয়ে বিষাদ উৎপন্ন করেছিল। তিনি নিরন্তর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং তার ফলে শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ হল, ঠিক যেমন প্রবল বায়ু আকাশের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করে।

শ্লোক ১৭

তস্য তে চাপনির্মুক্তা ভিত্ত্বা বর্মাণি রক্ষসাম্ ।
কায়ানাবিবিশুস্তিগ্মা গিরীনশনয়ো যথা ॥ ১৭ ॥

তস্য—ধ্রুবের; **তে**—সেই সমস্ত বাণ; **চাপ**—ধনুক থেকে; **নির্মুক্তাঃ**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **ভিত্ত্বা**—ভেদ করেছিলেন; **বর্মাণি**—বর্ম; **রক্ষসাম্**—রাক্ষসদের; **কায়ান্**—শরীর; **আবিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিল; **তিগ্মাঃ**—তীক্ষ্ণ; **গিরীন্**—পর্বত; **অশনয়ঃ**—বজ্র; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের ধনুক থেকে বিনির্মুক্ত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণগুলি শত্রুদের বর্ম ভেদ করে তাদের শরীরে প্রবেশ করেছিল, ঠিক যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পর্বতগাত্র বিদারণ করে।

শ্লোক ১৮-১৯

ভল্লৈঃ সংছিদ্যমানানাং শিরোভিশ্চারুকুণ্ডলৈঃ ।
ঊরুভির্হেমতালাভৈর্দোর্ভির্বলয়বল্গুভিঃ ॥ ১৮ ॥
হারকেয়ূরমুকুটৈরুষ্ণীষৈশ্চ মহাধনৈঃ ।
আস্তৃতাস্তা রণভুবো রেজুর্বীরমনোহরাঃ ॥ ১৯ ॥

ভল্লৈঃ—তাঁর বাণের দ্বারা; **সংছিদ্যমানানাম্**—খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে যে-সমস্ত যক্ষদের; **শিরোভিঃ**—মুণ্ড থেকে; **চারু**—সুন্দর; **কুণ্ডলৈঃ**—কর্ণের কুণ্ডলের দ্বারা; **ঊরুভিঃ**—জঙ্ঘাগুলি; **হেম-তালাভৈঃ**—স্বর্ণময় তালবৃক্ষের মতো; **দোর্ভিঃ**—বাহুসমূহ; **বলয়-বল্গুভিঃ**—সুন্দর কঙ্কনের দ্বারা; **হার**—হার; **কেয়ূর**—বাজুবন্ধ;

মুকুটৈঃ—মুকুট; **উষ্ণীষৈঃ**—উষ্ণীষের দ্বারা; **চ**—ও; **মহা-ধনৈঃ**—অত্যন্ত মূল্যবান; **আবৃতাঃ**—আচ্ছাদিত; **তাঃ**—সেইগুলি; **রণ-ভুবঃ**—রণভূমি; **রেজুঃ**—ঝলমল করছিল; **বীর**—বীরদের; **মনঃ-হরাঃ**—মন হরণকারী।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের বাণের দ্বারা যাদের মস্তক ছিন্ন হয়েছিল, সেইগুলি কর্ণকুণ্ডল এবং উষ্ণীষের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল। সেই শরীরের জঙ্ঘাগুলি ছিল সুবর্ণ বর্ণ তালগাছের মতো সুন্দর, তাদের বাহুগুলি সোনার কঙ্কন এবং কেয়ূরের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল, এবং তাদের মস্তকে মহা মূল্যবান স্বর্ণমুকুট শোভা পাচ্ছিল। সেই রণভূমিতে এই সমস্ত অলঙ্কার বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে, তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং তা একজন বীরের পক্ষেও মনোহর হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার দিনে যোদ্ধারা স্বর্ণ অলঙ্কার, মুকুট, উষ্ণীষ ইত্যাদির দ্বারা সজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে যেতেন, এবং তাঁদের মৃত্যু হলে, এই সমস্ত বস্তু শত্রুপক্ষ পুরস্কার-স্বরূপ গ্রহণ করতেন। বহু স্বর্ণ অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধভূমিতে মৃত্যু হলে, তা নিশ্চয়ই রণক্ষেত্রে বীরদের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক ছিল।

শ্লোক ২০

হতাবশিষ্টা ইতরে রণাজিরাদ্
রক্ষোগণাঃ ক্ষত্রিয়বর্যসায়কৈঃ ।
প্রায়ো বিবৃক্ণাবয়বা বিদুদ্রুবু-
র্মৃগেন্দ্রবিক্রীড়িতযূথপা ইব ॥ ২০ ॥

হত-অবশিষ্টাঃ—যে-সমস্ত সৈন্যদের মৃত্যু হয়নি; **ইতরে**—অন্যেরা; **রণ-অজিরাৎ**—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে; **রক্ষঃ-গণাঃ**—যক্ষেরা; **ক্ষত্রিয়-বর্য**—সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় যোদ্ধা; **সায়কৈঃ**—বাণের দ্বারা; **প্রায়ঃ**—প্রায়; **বিবৃক্ণ**—খণ্ড খণ্ড হয়েছিল; **অবয়বাঃ**—তাদের দেহের অঙ্গ; **বিদুদ্রুবুঃ**—পালিয়ে গিয়েছিল; **মৃগেন্দ্র**—সিংহের দ্বারা; **বিক্রীড়িত**—পরাজিত হয়ে; **যূথপাঃ**—হস্তী; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

অন্য যে-সমস্ত যক্ষরা, যারা নিহত হয়নি, তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহান যোদ্ধা ধ্রুব মহারাজের বাণের দ্বারা খণ্ড খণ্ড হয়েছিল। তাই তারা তখন পালিয়ে যেতে লাগল, ঠিক যেমন সিংহের দ্বারা পরাস্ত হয়ে হস্তী পলায়ন করে।

শ্লোক ২১

অপশ্যমানঃ স তদাততায়িনং
মহামৃধে কঞ্চন মানবোত্তমঃ ।
পুরীং দিদৃক্ষন্নপি নাবিশদ্ দ্বিষাং ।
ন মায়িনাং বেদ চিকীর্ষিতং জনঃ ॥ ২১ ॥

অপশ্যমানঃ—যখন দেখছিলেন না, **সঃ**—ধ্রুব; **তদা**—সেই সময়; **আততায়িনম্**—সশস্ত্র শত্রু সৈনিকেরা; **মহা-মৃধে**—সেই মহা যুদ্ধক্ষেত্রে; **কঞ্চন**—কোন; **মানব-উত্তমঃ**—নরশ্রেষ্ঠ; **পুরীম্**—নগরী; **দিদৃক্ষন্**—দর্শন করার ইচ্ছায়, **অপি**—যদিও; **ন আবিশৎ**—প্রবেশ করেননি; **দ্বিষাম্**—শত্রুদের; **ন**—না; **মায়িনাম্**—মায়াবীদের; **বেদ**—জানে; **চিকীর্ষিতম্**—পরিকল্পনা; **জনঃ**—যে-কোন ব্যক্তি।

অনুবাদ

নরশ্রেষ্ঠ ধ্রুব মহারাজ তখন দেখলেন যে, সেই বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে একটিও সশস্ত্র শত্রুসৈন্য দণ্ডায়মান নেই। তখন তিনি অলকাপুরী দর্শন করার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তিনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন, "মায়াবী যক্ষদের পরিকল্পনা কেউই জানে না।"

শ্লোক ২২

ইতি ব্রুবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং
যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশঙ্কিতঃ ।
শুশ্রাব শব্দং জলধেরিবেরিতং
নভস্বতো দিক্ষু রজোহন্বদৃশ্যত ॥ ২২ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্রুবন্**—কথা বলে; **চিত্র-রথঃ**—ধ্রুব মহারাজ, যাঁর রথ অত্যন্ত সুন্দর ছিল; **স্ব-সারথিম্**—তাঁর সারথিকে; **যত্তঃ**—সাবধান; **পরেষাম্**—শত্রুদের থেকে;

প্রতিযোগ—পুনরাক্রমণ; **শঙ্কিতঃ**—আশঙ্কা; **শুশ্রাব**—শুনেছিলেন; **শব্দম্**—শব্দ; **জলধেঃ**—সমুদ্র থেকে; **ইব**—যেন; **ঈরিতম্**—প্রতিধ্বনিত; **নভস্বতঃ**—বায়ুহেতু; **দিক্ষু**—সর্বদিক থেকে; **রজঃ**—ধূলি; **অনু**—তার পর; **অদৃশ্যত**—দেখা গিয়েছিল।

অনুবাদ

ইতিমধ্যে ধ্রুব মহারাজ যখন মায়াবী শত্রুদের পুনঃ আক্রমণের আশঙ্কা করে তাঁর সারথির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁরা এক প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলেন, যেন সমগ্র সমুদ্র সেখানে এসে পড়েছে, এবং তাঁরা দেখলেন যে, প্রচণ্ড বায়ুবেগে চতুর্দিকে ধূলিরাশি সমুত্থিত হচ্ছে।

শ্লোক ২৩

ক্ষণেনাচ্ছাদিতং ব্যোম ঘনানীকেন সর্বতঃ ।
বিস্ফুরত্তড়িতা দিক্ষু ত্রাসয়ৎস্তনয়িত্নুনা ॥ ২৩ ॥

ক্ষণেন—ক্ষণিকের মধ্যে; **আচ্ছাদিতম্**—আচ্ছাদিত হয়েছিল; **ব্যোম**—আকাশ; **ঘন**—ঘন মেঘের; **অনীকেন**—রাশি; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **বিস্ফুরৎ**—চমকাতে লাগল; **তড়িতা**—বিদ্যুৎ; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **ত্রাসয়ৎ**—ভয়ের সঞ্চার করে; **স্তনয়িত্নুনা**—গর্জনের দ্বারা।

অনুবাদ

ক্ষণিকের মধ্যে আকাশ ঘন মেঘমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছন্ন হল, প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হতে লাগল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল এবং সেই সঙ্গে প্রবলভাবে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

শ্লোক ২৪

ববৃষু রুধিরৌঘাসৃক্পূয়বিণ্মূত্রমেদসঃ ।
নিপেতুর্গগনাদস্য কবন্ধান্যগ্রতোঽনঘ ॥ ২৪ ॥

ববৃষুঃ—বর্ষণ হতে লাগল; **রুধির**—রক্ত; **ওঘ**—প্লাবন; **অসৃক্**—শ্লেষ্মা; **পূয়**—পুঁজ; **বিট্**—বিষ্ঠা; **মূত্র**—মূত্র; **মেদসঃ**—মেদ; **নিপেতুঃ**—পড়তে লাগল; **গগনাৎ**—আকাশ থেকে; **অস্য**—ধ্রুবের; **কবন্ধানি**—ধড়; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ বিদুর।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ বিদুর। তখন রক্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, বিষ্ঠা, মূত্র এবং মেদ বর্ষণ হতে লাগল, এবং গগনমণ্ডল থেকে ধ্রুবের সম্মুখে বহু বহু শিররহিত দেহ পতিত হতে লাগল।

শ্লোক ২৫

ততঃ খেঽদৃশ্যত গিরির্নিপেতুঃ সর্বতোদিশম্ ।
গদাপরিঘনিস্ত্রিংশমুসলাঃ সাশ্মবর্ষিণঃ ॥ ২৫ ॥

ততঃ—তার পর; **খে**—আকাশে; **অদৃশ্যত**—দেখা গেল, **গিরিঃ**—একটি পর্বত; **নিপেতুঃ**—পতিত হতে লাগল; **সর্বতঃ-দিশম্**—সর্ব দিক থেকে; **গদা**—গদা; **পরিঘ**—লৌহ মুদ্গর; **নিস্ত্রিংশ**—তরবারি; **মুসলাঃ**—মুষল; **স-অশ্ম**—বিশাল প্রস্তরখণ্ড; **বর্ষিণঃ**—বৃষ্টি।

অনুবাদ

তার পর, আকাশে একটি বিশাল পর্বত দৃষ্ট হল, এবং তা থেকে চতুর্দিকে প্রস্তর বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ ও মুষল ইত্যাদি পতিত হতে লাগল।

শ্লোক ২৬

অহয়োঽশনিনিঃশ্বাসা বমন্তোঽগ্নিং রুষাক্ষিভিঃ ।
অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ ॥ ২৬ ॥

অহয়ঃ—সর্প; **অশনি**—বজ্র; **নিঃশ্বাসাঃ**—নিঃশ্বাস; **বমন্তঃ**—উদ্গিরণ করে; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **রুষা-অক্ষিভিঃ**—ক্রোধপূর্ণ নেত্রে; **অভ্যধাবন্**—এগিয়ে এল; **গজাঃ**—হস্তী; **মত্তাঃ**—উন্মত্ত; **সিংহ**—সিংহ; **ব্যাঘ্রাঃ**—বাঘ, **চ**—ও; **যূথশঃ**—দলে দলে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ দেখলেন যে, ক্রোধপূর্ণ চক্ষুসমন্বিত বিশালাকার সর্পেরা তাদের মুখ থেকে অগ্নি উদ্গিরণ করতে করতে তাঁকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে, এবং সেই সঙ্গে উন্মত্ত হস্তী, সিংহ এবং ব্যাঘ্র দলে দলে তাঁর দিকে ছুটে আসছে।

শ্লোক ২৭

সমুদ্র উর্মিভির্ভীমঃ প্লাবয়ন্ সর্বতো ভুবম্ ।
আসসাদ মহাহ্রাদঃ কল্পান্ত ইব ভীষণঃ ॥ ২৭ ॥

সমুদ্রঃ—সাগর; **উর্মিভিঃ**—তরঙ্গ-সমন্বিত; **ভীমঃ**—ভয়ানক; **প্লাবয়ন্**—প্লাবিত করছে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **ভুবম্**—পৃথিবী; **আসসাদ**—এগিয়ে এল; **মহা-হ্রাদঃ**—প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে; **কল্প-অন্তে**—কল্পান্তে প্রলয়ের সময়; **ইব**—সদৃশ; **ভীষণঃ**—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

তার পর ভীষণমূর্তি সমুদ্র যেন প্রলয়কালীন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, প্রবল তরঙ্গ সহযোগে সারা বিশ্ব প্লাবিত করতে করতে ভীষণ গর্জন করতে লাগল।

শ্লোক ২৮

এবংবিধান্যনেকানি ত্রাসনান্যমনস্বিনাম্ ।
সসৃজুস্তিগ্মগতয় আসুর্যা মায়য়াসুরাঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্-বিধানি—এই প্রকার (ব্যাপার); **অনেকানি**—বহুবিধ; **ত্রাসনানি**—ভয়ঙ্কর; **অমনস্বিনাম্**—অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের; **সসৃজুঃ**—তারা সৃষ্টি করেছিল; **তিগ্ম-গতয়ঃ**—ক্রূর স্বভাবসম্পন্ন; **আসুর্যা**—আসুরিক; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **অসুরাঃ**—অসুরেরা।

অনুবাদ

আসুরিক যক্ষেরা স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রূর, এবং তাদের আসুরিক মায়ার দ্বারা তারা অনেক আশ্চর্যজনক ব্যাপার সৃষ্টি করে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের ভয় দেখাতে পারে।

শ্লোক ২৯

ধ্রুবে প্রযুক্তামসুরৈস্তাং মায়ামতিদুস্তরাম্ ।
নিশম্য তস্য মুনয়ঃ শমাশংসন্ সমাগতাঃ ॥ ২৯ ॥

ধ্রুবে—ধ্রুবের বিরুদ্ধে; **প্রযুক্তাম্**—প্রযুক্ত; **অসুরৈঃ**—অসুরদের দ্বারা; **তাম্**—সেই; **মায়াম্**—মায়াবী শক্তি; **অতি-দুস্তরাম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **তস্য**—তাঁর; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **শম্**—কল্যাণ; **আশংসন্**—অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য; **সমাগতাঃ**—সমুপস্থিত হলেন।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ যখন শুনলেন যে, অসুরেরা ধ্রুবের প্রতি মায়াবী শক্তি প্রয়োগ করেছে, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে কল্যাণকর অনুপ্রেরণা দিতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩০

মুনয়ঃ উচুঃ

ঔত্তানপাদ ভগবাংস্তব শার্ঙ্গধন্বা
দেবঃ ক্ষিণোত্ববনতার্তিহরো বিপক্ষান্ ।
যন্নামধেয়মভিধায় নিশম্য চাদ্ধা
লোকেঽঞ্জসা তরতি দুস্তরমঙ্গ মৃত্যুম্ ॥ ৩০ ॥

মুনয়ঃ উচুঃ—মুনিগণ বললেন; **ঔত্তানপাদ**—হে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তব**—তোমার; **শার্ঙ্গ-ধন্বা**—যিনি শার্ঙ্গ নামক ধনুক ধারণ করেন; **দেবঃ**—ভগবান; **ক্ষিণোতু**—সংহার করুন; **অবনত**—শরণাগতের; **আর্তি**—ক্লেশ; **হরঃ**—যিনি দূর করেন; **বিপক্ষান্**—শত্রুদের; **যৎ**—যাঁর; **নামধেয়ম্**—পবিত্র নাম; **অভিধায়**—উচ্চারণ করে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **চ**—ও; **অদ্ধা**—তৎক্ষণাৎ; **লোকঃ**—ব্যক্তিরা; **অঞ্জসা**—পূর্ণরূপে; **তরতি**—পরিত্রাণ পায়; **দুস্তরম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **অঙ্গ**—হে ধ্রুব; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু।

অনুবাদ

সমস্ত মুনিরা বললেন—হে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব! শার্ঙ্গধন্বা পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন, তিনি তোমার শত্রুদের সংহার করুন। ভগবানের পবিত্র নাম ভগবানেরই মতো শক্তিসম্পন্ন, তাই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং শ্রবণের দ্বারাই কেবল ভয়ঙ্কর মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এইভাবে ভগবদ্ভক্ত পরিত্রাণ পায়।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন যক্ষদের মায়াবী ইন্দ্রজালের দ্বারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, তখন মহর্ষিরা তাঁর কাছে এসেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ঋষিরা ধ্রুব মহারাজকে উৎসাহ

দিতে এসেছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভয়ের কোন কারণ নেই, কেননা তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত। ভগবানের কৃপায় ভক্ত যদি মৃত্যুর সময় তাঁর পবিত্র নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই ভবসাগর পার হয়ে চিৎ-জগতে প্রবেশ করেন। তাঁকে আর জন্ম-মৃত্যুর সংসারচক্রে ফিরে আসতে হয় না। কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, মৃত্যুর সাগর পার হওয়া যায়। তাই ধ্রুব মহারাজ নিশ্চিতরূপে যক্ষদের মায়া অতিক্রম করতে সক্ষম ছিলেন, যা তাঁর মনকে সাময়িকভাবে বিচলিত করেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'যক্ষদের সঙ্গে ধ্রুব মহারাজের যুদ্ধ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একাদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

নিশম্য গদতামেবমৃষীণাং ধনুষি ধ্রুবঃ ।
সন্দধেঽস্ত্রমুপস্পৃশ্য যন্নারায়ণনির্মিতম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **গদতাম্**—বাণী; **এবম্**—এইভাবে; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **ধনুষি**—তাঁর ধনুকে; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **সন্দধে**—যুক্ত করলেন; **অস্ত্রম্**—বাণ; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে; **যৎ**—যা; **নারায়ণ**—নারায়ণের দ্বারা; **নির্মিতম্**—নির্মিত।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজ মহর্ষিদের অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী শ্রবণ করে, জল স্পর্শ করে আচমন করলেন এবং তার পর ভগবান নারায়ণের নির্মিত বাণ তাঁর ধনুকে যুক্ত করলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীনারায়ণ ধ্রুব মহারাজকে তাঁর নিজের তৈরি একটি বিশেষ বাণ দান করেছিলেন, এবং ধ্রুব মহারাজ যক্ষ নির্মিত মায়া নাশ করার জন্য সেই বাণটি তাঁর ধনুকে যোজন করলেন *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলা হয়েছে—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে* । পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ ব্যতীত কেউই মায়াশক্তিকে অতিক্রম করতে পারে না। এই যুগের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের একটি সুন্দর অস্ত্র দিয়েছেন, যে-সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে, *সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র*—এই যুগে *নারায়ণাস্ত্র,* বা মায়াকে দূর করার অস্ত্র হচ্ছে অদ্বৈত

প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর এবং শ্রীবাস আদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা।

শ্লোক ২

সন্ধীয়মান এতস্মিন্মায়া গুহ্যকনির্মিতাঃ ।
ক্ষিপ্রং বিনেশুর্বিদুর ক্লেশা জ্ঞানোদয়ে যথা ॥ ২ ॥

সন্ধীয়মানে—তিনি যখন তাঁর ধনুকে সন্ধান করছিলেন; **এতস্মিন্**—এই নারায়ণাস্ত্র; **মায়াঃ**—মায়া; **গুহ্যক-নির্মিতাঃ**—যক্ষদের দ্বারা সৃষ্ট; **ক্ষিপ্রম্**—অতি শীঘ্র; **বিনেশুঃ**—বিনষ্ট হয়েছিল; **বিদুর**—হে বিদুর; **ক্লেশাঃ**—মায়িক বেদনা এবং আনন্দ; **জ্ঞান-উদয়ে**—জ্ঞানের উদয়ে; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ ধনুকে নারায়ণাস্ত্র যোজন করা মাত্রই যক্ষনির্মিত মায়া দূর হয়ে গেল, ঠিক যেমন পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে, সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ এবং সুখ দূর হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সূর্যের মতো, আর মায়া অন্ধকার সদৃশ। অন্ধকারের অর্থ হচ্ছে আলোকের অনুপস্থিতি; তেমনই মায়া মানে হচ্ছে কৃষ্ণচেতনার অনুপস্থিতি। কৃষ্ণচেতনা এবং মায়া সর্বদাই পাশাপাশি রয়েছে। কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ হওয়া মাত্রই জড় অস্তিত্বের মায়িক দুঃখ এবং সুখ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। *মায়াম্ এতাং তরন্তি তে*—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের নিরন্তর কীর্তন মায়ার মোহময়ী প্রভাব থেকে আমাদের সর্বদা দূরে রাখবে।

শ্লোক ৩

তস্যার্ষাস্ত্রং ধনুষি প্রযুঞ্জতঃ
সুবর্ণপুঙ্খাঃ কলহংসবাসসঃ ।
বিনিঃসৃতা আবিবিশুর্দ্বিষদ্বলং
যথা বনং ভীমরবাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥ ৩ ॥

তস্য—ধ্রুব মহারাজ যখন; **আর্ষ-অস্ত্রম্**—নারায়ণ ঋষি কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্র; **ধনুষি**—তাঁর ধনুকে; **প্রযুঞ্জতঃ**—যুক্ত করলেন; **সুবর্ণ-পুঙ্খাঃ**—সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত (ধনুক); **কলহংস-বাসসঃ**—কলহংসের পক্ষের মতো পালকযুক্ত; **বিনিঃসৃতাঃ**—নিঃসৃত হল; **আবিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিল; **দ্বিষৎ-বলম্**—শত্রুসৈন্য; **যথা**—ঠিক যেমন; **বনম্**—বনে; **ভীম-রবাঃ**—ভীষণ শব্দে; **শিখণ্ডিনঃ**—ময়ূর।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন নারায়ণ ঋষি নির্মিত সেই অস্ত্রটি তাঁর ধনুকে যোজন করলেন, তখন তা থেকে সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত এবং কলহংসের পক্ষের মতো পালক-সমন্বিত শরসমূহ নিঃসৃত হল। ময়ূরেরা যেমন ভীষণ শব্দ করতে করতে বনের মধ্যে প্রবেশ করে, সেই শরসমূহ তেমনই শত্রুসেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হল।

শ্লোক ৪

তৈস্তিগ্মধারৈঃ প্রধনে শিলীমুখৈ-
রিতস্ততঃ পুণ্যজনা উপদ্রুতাঃ ।
তমভ্যধাবন্ কুপিতা উদায়ুধাঃ
সুপর্ণমুন্নদ্ধফণা ইবাহয়ঃ ॥ ৪ ॥

তৈঃ—তাদের দ্বারা; **তিগ্ম-ধারৈঃ**—তীক্ষ্ণধার, **প্রধনে**—রণভূমিতে; **শিলী-মুখৈঃ**—বাণ; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **পুণ্য-জনাঃ**—যক্ষগণ; **উপদ্রুতাঃ**—অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে; **তম্**—ধ্রুব মহারাজের প্রতি; **অভ্যধাবন্**—ধাবিত হল; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **উদায়ুধাঃ**—অস্ত্র উত্তোলন করে; **সুপর্ণম্**—গরুড়ের প্রতি; **উন্নদ্ধ-ফণাঃ**—ফণা উন্নত করে; **ইব**—সদৃশ; **অহয়ঃ**—সর্প।

অনুবাদ

সেই সমস্ত তীক্ষ্ণধার বাণ শত্রু-সৈন্যদের বিচলিত করেছিল, যারা প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য অনেক যক্ষ তাদের অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করে, মহা ক্রোধে ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হল। সর্প যেমন ফণা উন্নত করে গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, সমস্ত যক্ষ সৈনিকেরাও সেইভাবে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫

স তান্ পৃষৎকৈরভিধাবতো মৃধে
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরোদরান্ ।
নিনায় লোকং পরমর্কমণ্ডলং
ব্রজন্তি নির্ভিদ্য যমূর্ধ্বরেতসঃ ॥ ৫ ॥

সঃ—তিনি (ধ্রুব মহারাজ), **তান্**—সমস্ত যক্ষদের; **পৃষৎকৈঃ**—তাঁর বাণের দ্বারা; **অভিধাবতঃ**—অভিমুখে ধাবিত; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে, **নিকৃত্ত**—বিচ্ছিন্ন হয়ে; **বাহু**—হাত; **উরু**—জঙ্ঘা; **শিরঃ-ধর**—গলা; **উদরান্**—উদর; **নিনায়**—প্রদান করেছিলেন; **লোকম্**—লোকে; **পরম্**—পরম, **অর্ক-মণ্ডলম্**—সূর্যমণ্ডল; **ব্রজন্তি**—যায়; **নির্ভিদ্য**—ভেদ করে; **যম্**—যাতে; **ঊর্ধ্ব-রেতসঃ**—ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী, যাঁদের বীর্য কখনও স্খলিত হয় না।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন দেখলেন যে, যক্ষরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর বাণের দ্বারা তাদের খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তাদের শরীর থেকে বাহু, পা, মাথা, পেট আলাদা করে, তিনি সেই যক্ষদের সূর্যমণ্ডলের উপরিস্থিত লোক প্রদান করেছিলেন, যা কেবল সর্বোত্তম ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারীরাই প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

অভক্তদের পক্ষে ভগবান বা তাঁর ভক্তদের দ্বারা নিহত হওয়া মঙ্গলজনক। ধ্রুব মহারাজ নির্বিচারে যক্ষদের সংহার করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁর হস্তে নিহত হওয়ার ফলে সেই লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা কেবল ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারীরাই প্রাপ্ত হন। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী অথবা ভগবানের হস্তে নিহত অসুরেরা ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক প্রাপ্ত হন, এবং ভগবদ্ভক্তের হস্তে নিহত ব্যক্তিরাও সত্যলোক প্রাপ্ত হন। এখানে যে সত্যলোকের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে যেতে হলে সূর্যমণ্ডল অতিক্রম করতে হয়। অতএব বধ করা সব সময় খারাপ নয়। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর ভক্ত যদি বধ করেন অথবা কোন মহান যজ্ঞে যদি কাউকে বলি দেওয়া হয়, তা হলে যিনি নিহত হলেন, তাঁর মঙ্গলই হয়। ভগবান অথবা তাঁর ভক্তের দ্বারা বধের তুলনায় তথাকথিত জড়-জাগতিক অহিংসা নিতান্তই নগণ্য। এমন কি যখন কোন রাজা অথবা রাজ্য-সরকার কোন হত্যাকারীকে বধ করে, তার ফলে

হত্যাকারীর লাভ হয়, কারণ তার ফলে সে তার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

এই শ্লোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *ঊর্ধ্বরেতসঃ*, যার অর্থ হচ্ছে যে, ব্রহ্মচারীর বীর্য কখনও স্খলিত হয় না। ব্রহ্মচর্য পালন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কেউ কোন রকম তপস্যা বা বেদবিহিত আচার অনুষ্ঠান নাও করেন, কেবলমাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মচারী হয়ে বীর্য স্খলন না করেন, তার ফলে তিনি তাঁর মৃত্যুর পর সত্যলোক প্রাপ্ত হন। সাধারণত যৌন জীবন হচ্ছে জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। বৈদিক সভ্যতায় নানাভাবে যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ করা হত। সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে কেবল গৃহস্থদেরই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌনসঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হত অন্য সকলেই যৌন জীবন থেকে বিরত থাকতেন। এই যুগের মানুষেরা বীর্য স্খলন না করার মূল্য জানে না। ফলস্বরূপ তারা নানাভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কেবল এক দুঃখ-দুর্দশাময় অস্তিত্বই ভোগ করে। *ঊর্ধ্বরেতসঃ* শব্দটি বিশেষভাবে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের ইঙ্গিত করে, যারা তপশ্চর্যার কঠোর নিয়ম পালন করে। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ভগবান বলেছেন যে, কেউ যদি ব্রহ্মলোকেও যান, তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয় *(আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন)*। বাস্তবিক মুক্তি কেবল ভক্তির মাধ্যমেই লাভ করা যায়, কারণ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ভক্ত ব্রহ্মলোকেরও ঊর্ধ্বে ভগবদ্ধামে যেতে পারেন, যেখান থেকে আর ফিরে আসতে হয় না। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা মুক্ত হওয়ার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ভক্তিযোগে যুক্ত না হলে, প্রকৃত মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। বলা হয়েছে, *হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি*—শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কেউই মুক্তি লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ৬

তান্ হন্যমানানভিবীক্ষ্য গুহ্যকা-
ননাগসশ্চিত্ররথেন ভূরিশঃ ।
ঔত্তানপাদিং কৃপয়া পিতামহো
মনুর্জগাদোপগতঃ সহর্ষিভিঃ ॥ ৬ ॥

তান্—যে-সমস্ত যক্ষরা; **হন্যমানান্**—নিহত হয়ে; **অভিবীক্ষ্য**—দেখে; **গুহ্যকান্**—যক্ষদের; **অনাগসঃ**—নিরপরাধ; **চিত্র-রথেন**—ধ্রুব মহারাজের দ্বারা, যাঁর একটি সুন্দর রথ ছিল; **ভূরিশঃ**—অত্যন্ত; **ঔত্তানপাদিম্**—উত্তানপাদের পুত্রকে;

কৃপয়া—কৃপাপূর্বক; **পিতামহঃ**—পিতামহ; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **জগাদ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **উপগতঃ**—আগমন করে; **সহ-ঋষিভিঃ**—মহর্ষিগণ সহ।

অনুবাদ

যখন স্বায়ম্ভুব মনু দেখলেন যে, তাঁর পৌত্র ধ্রুব এমন অনেক যক্ষদের বধ করছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, মহর্ষিগণ সহ ধ্রুব মহারাজের কাছে এসে তাঁকে সৎ উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যক্ষদের রাজধানী অলকাপুরী আক্রমণ করেছিলেন, কারণ তাদের একজন তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র নাগরিক তাঁর ভ্রাতা উত্তমকে হত্যা করার অপরাধে অপরাধী ছিল, তারা সকলে নয়। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ সেইজন্য এক কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং প্রবল সংগ্রাম হচ্ছিল। এই রকম ঘটনা আজকালকার দিনেও ঘটে—একজন মানুষের ভুলের জন্য কখনও কখনও সমগ্র রাষ্ট্র আক্রান্ত হয়। এই প্রকার ব্যাপকভাবে আক্রমণ মানব-জাতির পিতা এবং আইন প্রদাতা মনু অনুমোদন করেননি। তাই তিনি তাঁর পৌত্র ধ্রুবকে নিরপরাধ যক্ষ নাগরিকদের হত্যা করা থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

মনুরুবাচ

অলং বৎসাতিরোষেণ তমোদ্বারেণ পাপ্মনা ।
যেন পুণ্যজনানেতানবধীস্ত্বমনাগসঃ ॥ ৭ ॥

মনুঃ উবাচ—মনু বললেন; **অলম্**—যথেষ্ট; **বৎস**—হে প্রিয় বালক; **অতি-রোষেণ**—অত্যন্ত ক্রোধপূর্বক; **তমঃ-দ্বারেণ**—অজ্ঞানের মার্গ; **পাপ্মনা**—পাপপূর্ণ; **যেন**—যার দ্বারা; **পুণ্য-জনান্**—যক্ষগণ; **এতান্**—এই সমস্ত; **অবধীঃ**—তুমি হত্যা করেছ; **ত্বম্**—তুমি; **অনাগসঃ**—নিরপরাধ।

অনুবাদ

শ্রীমনু বললেন—হে বৎস! এই যুদ্ধ বন্ধ কর। অনর্থক ক্রুদ্ধ হওয়া সমীচীন নয়, তা হচ্ছে নারকীয় জীবনের পথ। প্রকৃতপক্ষে যারা অপরাধী নয়, সেই সমস্ত যক্ষদের হত্যা করে এখন তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করছ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অতিরোষেণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অনাবশ্যক ক্রোধের দ্বারা'। ধ্রুব মহারাজ যখন উপযুক্ত ক্রোধের সীমা লঙ্ঘন করছিলেন, তখন তাঁর পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু পাপকর্ম করা থেকে রক্ষা করার জন্য তৎক্ষণাৎ সেখানে এসেছিলেন। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, হত্যা করা খারাপ নয়, কিন্তু যখন অনর্থক হত্যা করা হয়, অথবা কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, সেই হত্যার ফলে নরকের পথ উন্মুক্ত হয়। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন মহান ভক্ত, তাই এই প্রকার পাপকর্ম করা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।

ক্ষত্রিয়দের হত্যা করতে অনুমতি দেওয়া হয় কেবল রাষ্ট্রের আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য; অকারণে হত্যা করা অথবা হিংসা করার অনুমতি তাদের কখনও দেওয়া হয় না। হিংসা নিশ্চিতভাবে নারকীয় জীবনের পথে পরিচালিত করে, কিন্তু রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তার প্রয়োজনও রয়েছে। এখানে ধ্রুব মহারাজকে যক্ষদের হত্যা করতে মনু নিষেধ করেছেন, কারণ তাদের একজনই কেবল তাঁর ভ্রাতা উত্তমকে হত্যা করার অপরাধে দণ্ডনীয় ছিল; তারা সকলে নয়। বর্তমান যুগের যুদ্ধে কিন্তু নিরপরাধ নাগরিকদের উপর আক্রমণ করা হয়। মনুর আইন অনুসারে এই প্রকার যুদ্ধ অত্যন্ত পাপপূর্ণ। অধিকন্তু সভ্য দেশগুলি অনর্থক নিরীহ পশুদের হত্যা করার জন্য বহু কসাইখানা খুলেছে। কোন রাষ্ট্র যখন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন যে নাগরিকরা ব্যাপকভাবে সংহার হয়, তার কারণ তাদের পাপকর্মের ফল বলে বুঝতে হবে। সেটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

শ্লোক ৮

নাস্মৎকুলোচিতং তাত কর্মৈতৎসদ্বিগর্হিতম্ ।
বধো যদুপদেবানামারব্ধস্তেঽকৃতৈনসাম্ ॥ ৮ ॥

ন—না; **অস্মৎ-কুল**—আমাদের পরিবারে; **উচিতম্**—উপযুক্ত; **তাত**—প্রিয় পুত্র; **কর্ম**—কর্ম; **এতৎ**—এই; **সৎ**—সাধুদের দ্বারা; **বিগর্হিতম্**—বর্জিত; **বধঃ**—হত্যা; **যৎ**—যা; **উপদেবানাম্**—যক্ষদের; **আরব্ধঃ**—প্রবৃত্ত হয়েছ; **তে**—তোমার দ্বারা; **অকৃত-এনসাম্**—যারা নিরপরাধ।

অনুবাদ

হে পুত্র! তুমি যে নির্দোষ যক্ষদের বধ করছ তা মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি, এবং তা আমাদের পরিবারের উপযুক্তও নয়, কারণ ধর্ম এবং অধর্মের নিয়ম সম্বন্ধে তাদের অবগত থাকার কথা।

শ্লোক ৯

নন্বেকস্যাপরাধেন প্রসঙ্গাদ্ বহবো হতাঃ ।
ভ্রাতুর্বধাভিতপ্তেন ত্বয়াঙ্গ ভ্রাতৃবৎসল ॥ ৯ ॥

ননু—নিশ্চিতভাবে; **একস্য**—একজনের (যক্ষ); **অপরাধেন**—অপরাধে; **প্রসঙ্গাৎ**—তাদের সঙ্গের ফলে; **বহবঃ**—বহু; **হতাঃ**—হত্যা করা হয়েছে; **ভ্রাতুঃ**—তোমার ভ্রাতার; **বধ**—মৃত্যুর ফলে; **অভিতপ্তেন**—মর্মাহত হয়ে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অঙ্গ**—হে পুত্র; **ভ্রাতৃ-বৎসল**—ভ্রাতার প্রতি স্নেহশীল।

অনুবাদ

হে বৎস! তুমি যে তোমার ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং যক্ষের হাতে তার মৃত্যুতে তুমি যে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছ তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ, একজন মাত্র যক্ষের অপরাধে, তুমি অন্য কতজন নির্দোষ যক্ষকে বধ করেছ।

শ্লোক ১০

নায়ং মার্গো হি সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্তিনাম্ ।
যদাত্মানং পরাগ্‌গৃহ্য পশুবদ্ভূতবৈশসম্ ॥ ১০ ॥

ন—কখনই না; **অয়ম্**—এই; **মার্গঃ**—পথ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সাধূনাম্**—সাধু ব্যক্তিদের; **হৃষীকেশ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অনুবর্তিনাম্**—পন্থা অনুসরণকারী; **যৎ**—যা; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **পরাক্**—শরীর; **গৃহ্য**—মনে করে; **পশু-বৎ**—পশুর মতো; **ভূত**—জীবেদের; **বৈশসম্**—বধ করা।

অনুবাদ

দেহকে কখনও আত্মা বলে মনে করা উচিত নয়, এবং তার ফলে অন্যের দেহকে পশুর মতো হত্যা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির পথ অনুসরণ করেন যে সমস্ত সাধু, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের আচরণ বিশেষভাবে বর্জনীয়।

তাৎপর্য

সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্তিনাম্ শব্দগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধু কে? সাধু হচ্ছেন তিনি, যিনি পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশের সেবার পথ অনুসরণ করেন। *নারদ-*

পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে, *হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে* । ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের অনুকূল সেবার পন্থাকে বলা হয় ভক্তি। তাই, যিনি ইতিমধ্যে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি কেন নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিজনক কার্যে যুক্ত হবেন? এখানে মনু ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তা হলে কেন তিনি অনর্থক পশুর মতো দেহাত্মবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হবেন? একটি পশু মনে করে অন্য আর একটি পশুর দেহ হচ্ছে তার খাদ্য; তাই, দেহাত্মবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হয়ে একটি পশু আর একটি পশুকে আক্রমণ করে। কিন্তু মানুষের, বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তের, এইভাবে আচরণ করা উচিত নয়। অনর্থক পশুহত্যা করা সাধুর উচিত নয়।

শ্লোক ১১

সর্বভূতাত্মভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্ ।
আরাধ্যাপ দুরারাধ্যং বিষ্ণোস্তৎপরমং পদম্ ॥ ১১ ॥

সর্ব-ভূত—সমস্ত জীবে; **আত্ম**—পরমাত্মার; **ভাবেন**—ধ্যানের দ্বারা; **ভূত**—সমস্ত অস্তিত্বের; **আবাসম্**—আলয়; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **ভবান্**—তুমি; **আরাধ্য**—আরাধনার দ্বারা; **আপ**—লাভ করেছ; **দুরারাধ্যম্**—যাঁর আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **তৎ**—তা; **পরমম্**—পরম; **পদম্**—স্থিতি।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরির ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তুমি এতই ভাগ্যবান যে, সমস্ত জীবের পরম ধাম শ্রীভগবানের আরাধনা করার ফলে, তুমি ইতিমধ্যেই সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

আত্মা এবং পরমাত্মার দ্বারা আশ্রিত না হলে, জড় দেহের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আত্মা পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, যিনি প্রতিটি পরমাণুতে বিরাজমান। অতএব, যেহেতু জড় অথবা চেতন সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল, তাই ভগবানকে এখানে *ভূতাবাস* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মনু যখন ধ্রুব মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন, তখন একজন ক্ষত্রিয়রূপে

ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতামহ মনুর সঙ্গে তর্ক করতে পারতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা, এই যুক্তি প্রদর্শন করে তর্ক করতে পারলেও, মনু তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যেহেতু প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবানের নিবাসস্থল, তাই তাদের ভগবানের মন্দির বলে বিবেচনা করা উচিত, এবং অনর্থক তাদের হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

শ্লোক ১২

স ত্বং হরেরনুধ্যাতস্তৎপুংসামপি সম্মতঃ ।
কথং ত্ববদ্যং কৃতবাননুশিক্ষন্ সতাং ব্রতম্ ॥ ১২ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **ত্বম্**—তুমি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **অনুধ্যাতঃ**—সর্বদা ধ্যান কর, **তৎ**—তাঁর; **পুংসাম্**—তাঁর ভক্তদের দ্বারা; **অপি**—ও; **সম্মতঃ**—প্রশংসিত; **কথম্**—কেন; **তু**—তা হলে; **অবদ্যম্**—নিন্দনীয় (কার্য); **কৃতবান্**—করেছ; **অনুশিক্ষন্**—দৃষ্টান্ত স্থাপন করে; **সতাম্**—সাধু ব্যক্তিদের; **ব্রতম্**—ব্রত।

অনুবাদ

যেহেতু তুমি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই ভগবান সর্বদাই তোমার কথা চিন্তা করেন, এবং তুমি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদেরও মান্য। তোমার জীবন হচ্ছে আদর্শ আচরণের নিমিত্ত। তাই তোমাকে এই প্রকার নিন্দনীয় কার্যে লিপ্ত হতে দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত এবং সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। যে শুদ্ধ ভক্ত দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের কথা চিন্তা করেন, ভগবানও সর্বদা তাঁর কথা চিন্তা করেন। শুদ্ধ ভক্ত যেমন ভগবানকে ছাড়া আর কোন কিছুই জানেন না, তেমনই ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে ছাড়া আর কিছু জানেন না। স্বায়ম্ভুব মনু সেই কথা ধ্রুব মহারাজকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—"তুমি কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তই নও, ভগবানের অন্যান্য সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরাও তোমাকে মান্য করেন। তাই তোমার সর্বদা এমনভাবে আচরণ করা উচিত, যাতে তোমার আদর্শ থেকে অন্যেরা শিক্ষা লাভ করতে পারে। অতএব, এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, তুমি এতগুলি নির্দোষ যক্ষকে হত্যা করেছ।"

শ্লোক ১৩

তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু ।
সমত্বেন চ সর্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

তিতিক্ষয়া—সহনশীলতার দ্বারা; **করুণয়া**—দয়ার দ্বারা; **মৈত্র্যা**—মৈত্রীর দ্বারা; **চ**—ও; **অখিল**—সমস্ত; **জন্তুষু**—জীবেদের; **সমত্বেন**—সমতার দ্বারা; **চ**—ও; **সর্ব-আত্মা**—পরমাত্মা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সম্প্রসীদতি**—অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

ভক্ত যখন অন্যদের প্রতি তিতিক্ষা, দয়া, মৈত্রী এবং সমতা প্রদর্শন করেন, তখন ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

মধ্যম অধিকারি ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে এই শ্লোক অনুসারে আচরণ করা ভক্ত-জীবনের তিনটি অবস্থা রয়েছে। কনিষ্ঠ স্তরে ভক্ত কেবল মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, এবং ভক্তি সহকারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভগবানের অর্চনা করেন। মধ্যম স্তরের ভক্ত ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, এবং নির্বোধ সরল ব্যক্তিদের সঙ্গে ও ভগবৎ-বিদ্বেষীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। কখনও কখনও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা ভগবদ্ভক্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, উন্নত স্তরের ভক্তের সহিষ্ণু হওয়া উচিত; যারা অজ্ঞান অথবা নির্বোধ, তাদের প্রতি পূর্ণ কৃপা প্রদর্শন করা উচিত। প্রচারক ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে, নির্বোধ সরল ব্যক্তিদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে, তাদের ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করা। প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস। তাই, ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সকলের কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করা। সেটিই হচ্ছে তাঁর কৃপা। সতীর্থ ভক্তদের প্রতি তিনি মৈত্রীভাব পোষণ করেন। তাঁর কর্তব্য প্রতিটি জীবকেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করা। বিভিন্ন জীব বিভিন্ন সাজ-পোশাকে প্রকট হয়, কিন্তু *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে, জ্ঞানবান ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া। ভগবদ্ভক্তের এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। তাই বলা হয় যে, সাধু ব্যক্তি সর্বদাই সহনশীল এবং দয়ালু; তিনি সকলেরই বন্ধু, কারও প্রতি তিনি বৈরী-ভাবাপন্ন নন, এবং তিনি শান্ত। এইগুলি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের সদ্‌গুণ।

শ্লোক ১৪

সম্প্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
বিমুক্তো জীবনির্মুক্তো ব্রহ্ম নির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

সম্প্রসন্নে—প্রসন্ন হলে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **প্রাকৃতৈঃ**—জড়া প্রকৃতি থেকে; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **জীব-নির্মুক্তঃ**—সূক্ষ্ম শরীর থেকেও মুক্ত; **ব্রহ্ম**—অনন্ত; **নির্বাণম্**—চিন্ময় আনন্দ; **ঋচ্ছতি**—লাভ করে।

অনুবাদ

কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সমস্ত জীবের প্রতি তিতিক্ষা, করুণা, মৈত্রী এবং সমতা প্রদর্শন করা উচিত। এই প্রকার আচরণের ফলে পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হন, এবং তার ফলে ভক্ত তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* ভগবানও প্রতিপন্ন করেছেন—"যদি কেউ নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা সহকারে আমার সেবায় যুক্ত হয়, সে তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়, যেখানে সে অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করে।" এই জড় জগতে সকলেই আনন্দময় জীবন লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। দুর্ভাগ্যবশত মানুষ জানে না কিভাবে সেই আনন্দ লাভ করতে হয়। নাস্তিকেরা ভগবানকে বিশ্বাস করে না, এবং তারা অবশ্যই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের ফলে চিন্ময় স্তর লাভ করা যায়, এবং অন্তহীন আনন্দময় জীবন উপভোগ করা যায়। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া।

এই শ্লোকে *সম্প্রসন্নে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রসন্ন হওয়ার ফলে'। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে আচরণ করা যার ফলে ভগবান প্রসন্ন হন; এমন নয় যে, নিজের প্রসন্নতা বিধান করতে হবে। অবশ্য, ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন ভক্তও আপনা থেকেই প্রসন্ন হন। সেটি হচ্ছে ভক্তিযোগের রহস্য। ভক্তিযোগের বাইরে

সকলেই নিজের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করছে। কেউই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করছে না। কর্মীরা স্থূলভাবে তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করছে, আর সূক্ষ্ম স্তরে জ্ঞানীরা তাদের নিজেদের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করছে। কর্মীরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে সন্তুষ্ট হতে চায়, আর জ্ঞানীরা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা অথবা নিজেদের ভগবান বলে মনে করার সূক্ষ্ম কার্যকলাপের মাধ্যমে সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করছে। যোগীরাও বিভিন্ন প্রকার যোগসিদ্ধি লাভ করতে পারবে বলে মনে করে নিজেদের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করছে। ভক্তরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করে। ভক্তের আত্ম উপলব্ধির পন্থা কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সকলেই নিজের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করছে, কিন্তু ভক্তরা কেবল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করেন। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অন্য সমস্ত পন্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভগবদ্ভক্ত তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত করে ভগবানের প্রীতি সাধনের চেষ্টা করে, তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, এবং তিনি অন্তহীন আনন্দময় জীবন উপভোগ করেন

শ্লোক ১৫

ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধৈর্যোষিৎপুরুষ এব হি ।
তয়োর্ব্যবায়াৎসম্ভূতির্যোষিৎপুরুষয়োরিহ ॥ ১৫ ॥

ভূতৈঃ—প্রকৃতির উপাদানের দ্বারা; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচটি; **আরব্ধৈঃ**—পরিণত হয়; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **এব**—ঠিক তেমন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **তয়োঃ**—তাদের; **ব্যবায়াৎ**—যৌন জীবনের দ্বারা; **সম্ভূতিঃ**—পুনরায় সৃষ্টি হয়; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **পুরুষয়োঃ**—এবং পুরুষের; **ইহ**—এই জড় জগতে।

অনুবাদ

পঞ্চ মহাভূত থেকে জড় জগতের সৃষ্টি শুরু হয়। সেই পঞ্চভূত স্ত্রীদেহ এবং পুরুষদেহে পরিণত হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনে এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রী এবং পুরুষের সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনু যখন দেখলেন যে, ধ্রুব মহারাজ বৈষ্ণব-দর্শন বোঝা সত্ত্বেও তাঁর ভায়ের মৃত্যুর ফলে তখনও বিমর্ষ ছিলেন, তখন তিনি তাঁর কাছে বিশ্লেষণ করেছিলেন

কিভাবে জড়া প্রকৃতির পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা এই জড় দেহের সৃষ্টি হয়। *ভগবদ্গীতায়ও* প্রতিপন্ন হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে সব কিছুর সৃষ্টি হয়, পালন হয় এবং সংহার হয়। নিঃসন্দেহে এই সব কিছুর পশ্চাৎভূমিতে রয়েছে ভগবানের নির্দেশনা। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে *(ময়াধ্যক্ষেণ)*—নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, "আমার অধ্যক্ষতায় জড়া প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয়।" স্বায়ম্ভুব মনু ধ্রুবকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর ভায়ের জড় দেহের মৃত্যুর জন্য প্রকৃতপক্ষে যক্ষের দোষ ছিল না; তা ছিল জড়া প্রকৃতির কার্য। পরমেশ্বর ভগবানের অনেক প্রকার শক্তি রয়েছে, এবং তারা অনেক প্রকার সূক্ষ্ম এবং স্থূলরূপে কার্য করে।

এই প্রবল শক্তির ফলেই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, যদিও স্থূলরূপে মনে হয় যে, তা মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের অতিরিক্ত আর কিছু নয়। তেমনই, তা সে মানুষ হোক অথবা দেবতা হোক, পশু হোক অথবা পক্ষী হোক, সমস্ত জীবদেহই এই পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা সৃষ্ট, এবং মৈথুনের দ্বারা তা থেকে আরও জীবদেহের সৃষ্টি হয়। সেটি হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের নিয়ম। জড়া প্রকৃতির তরঙ্গের এই পন্থায় কারও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ধ্রুব মহারাজকে পরোক্ষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁর ভায়ের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন না হওয়ার জন্য, কারণ দেহের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ভৌতিক। প্রকৃত স্বরূপ চিন্ময় আত্মার কখনও বিনাশ হয় না অথবা কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না।

শ্লোক ১৬

এবং প্রবর্ততে সর্গঃ স্থিতিঃ সংযম এব চ ।
গুণব্যতিকরাদ্রাজন্ মায়য়া পরমাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রবর্ততে**—ঘটে; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **স্থিতিঃ**—পালন; **সংযম**—সংহার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং; **গুণ**—গুণের; **ব্যতিকরাৎ**—মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **পরম-আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

মনু বললেন—হে ধ্রুব মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবানের মায়িক জড় শক্তির দ্বারা এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সংঘটিত হয়।

তাৎপর্য

প্রথমে, সৃষ্টিকার্য সংঘটিত হয় জড়া প্রকৃতির পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা তার পর জড়া প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার ফলে পালন হয় যখন একটি শিশুর জন্ম হয়, তার পিতা মাতা তৎক্ষণাৎ তার পালনের ব্যবস্থা করে। সন্তানের লালন পালনের এই প্রবৃত্তি কেবল মানব-সমাজেই নয়, পশু সমাজেও রয়েছে। এমন কি, বাঘ পর্যন্ত তার শাবকদের লালন পালন করে, যদিও তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে অন্য পশুর মাংস আহার করা জড়া প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার অপরিহার্যরূপে সংঘটিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের জানা উচিত যে, এই সব কিছুই সংঘটিত হয় ভগবানের অধ্যক্ষতায়। সৃষ্টি রজোগুণের কার্য, পালন সত্ত্বগুণের এবং সংহার তমোগুণের আমরা দেখতে পাই যে, যাঁরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাঁরা রজ অথবা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের থেকে অধিক কাল জীবিত থাকেন। অর্থাৎ, কেউ যখন সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি উচ্চতর লোকে উন্নীত হন, যেখানে আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ *ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্ব স্থাঃ* —সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত মহান ঋষি এবং সন্ন্যাসীগণ উচ্চতর লোকে উন্নীত হন। আর যাঁরা জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, তাঁরা শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত, তারা চিৎ জগতে নিত্য জীবন লাভ করেন।

শ্লোক ১৭

নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লোহবৎ ॥ ১৭ ॥

নিমিত্ত-মাত্রম্—নিমিত্ত কারণ; **তত্র**—তখন; **আসীৎ**—ছিল; **নির্গুণঃ**—নিষ্কলুষ; **পুরুষ-ঋষভঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ব্যক্ত**—প্রকাশিত; **অব্যক্তম্**—অপ্রকাশিত; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—জগৎ; **যত্র**—যেখানে; **ভ্রমতি**—বিচরণ করে; **লোহ-বৎ**—লৌহসদৃশ

অনুবাদ

হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি যখন প্রেরণা দেন, তখন অন্য অনেক কারণ এবং কার্য উৎপন্ন হয়, এবং তার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ চালিত হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি কিভাবে এই জড় জগতে কার্যশীল হয়, তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতেই সব কিছু হচ্ছে। পরমেশ্বর ভগবানকে সৃষ্টির আদি কারণ বলে স্বীকার করে না যে-সমস্ত নাস্তিক দার্শনিক, তারা মনে করে যে, বিভিন্ন জড় উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে এই জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। জড় উপাদানের প্রতিক্রিয়ার একটি সরল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ক্ষারের সঙ্গে অম্লের মিশ্রণের ফলে বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবনের উৎপত্তি হয় না। বিভিন্ন ইচ্ছা এবং বিভিন্ন ক্রিয়াসমন্বিত চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনি রয়েছে। ভৌতিক শক্তি যে কিভাবে কার্য করে তা কেবল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা যায় না। এই সম্পর্কে একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুমোর এবং তার চাকি। কুমোরের চাকি ঘোরে, এবং তা থেকে বিভিন্ন রকমের মাটির পাত্র বেরিয়ে আসে। সেই মাটির পাত্রের বিভিন্ন কারণ রয়েছে, কিন্তু তার মূল কারণ হচ্ছে কুমোর, যে সেই চাকিটিতে শক্তি প্রয়োগ করে। তার অধ্যক্ষতায় সেই শক্তি কার্য করে। *ভগবদ্গীতায়* সেই ধারণাটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে—সমস্ত জড় ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার পিছনে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সব কিছু নির্ভর করে তাঁর শক্তির উপর, তবুও তিনি সর্বত্র নেই। বিশেষ অবস্থায় জড় শক্তির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে পাত্র উৎপাদন হয়, কিন্তু কুমোর সেই পাত্রটি নন। তেমনই, জড় জগৎ ভগবান সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি তা থেকে পৃথক। *বেদে* বলা হয়েছে যে, তিনি কেবল দৃষ্টিপাত করেন, এবং তার ফলে জড়া প্রকৃতি ক্ষোভিতা হন।

*ভগবদ্গীতায়*ও বলা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবেদের দ্বারা জড় জগৎরূপী যোনিতে গর্ভসঞ্চার করেন, এবং তার ফলে বিভিন্ন রূপের এবং কার্যকলাপের তৎক্ষণাৎ সূত্রপাত হয়। জীবের বিভিন্ন বাসনা এবং বিভিন্ন কর্মের ফলে, বিভিন্ন যোনিতে ভিন্ন ভিন্ন শরীর উৎপন্ন হয়। ডারউইনের সিদ্ধান্তে চিন্ময় আত্মারূপে জীবকে স্বীকার করা হয়নি, এবং তাই বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ অপূর্ণ। তিনটি গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকার ঘটনা ঘটে, কিন্তু আদি স্রষ্টা অথবা কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এখানে যাঁকে *নিমিত্ত-মাত্রম্* বা নিমিত্ত কারণ বলে বর্ণনা হয়েছে। তিনি কেবল তাঁর শক্তির দ্বারা সেই চক্রকে ঘোরান। মায়াবাদীদের মতে, পরমব্রহ্ম বহুরূপে নিজেকে রূপান্তরিত করেছেন, কিন্তু তা সত্য নয়। যদিও তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, তবুও

তিনি সর্বদাই জড় গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার অতীত। তাই, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১) ব্রহ্মা বলেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্ ॥

বহু কারণ এবং কার্য রয়েছে, কিন্তু আদি কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১৮

স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্যঃ ।
করোত্যকর্তৈব নিহন্ত্যহন্তা
চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্বিভাব্যা ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি; **খলু**—কিন্তু; **ইদম্**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান, **কাল**—কালের, **শক্ত্যা**—শক্তির দ্বারা; **গুণ-প্রবাহেণ**—প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা, **বিভক্ত**—বিভক্ত, **বীর্যঃ**—(যাঁর) শক্তি; **করোতি**—ক্রিয়া করে; **অকর্তা**—যিনি ক্রিয়া করেন না; **এব**—যদিও; **নিহন্তি**—হত্যা করে; **অহন্তা**—হত্যাকারী নন, **চেষ্টা**—শক্তি; **বিভূম্নঃ**—ভগবানের; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **দুর্বিভাব্যা**—অচিন্তনীয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্তনীয় কালরূপ পরম শক্তির দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথস্ক্রিয়ার কারণ হন, এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার শক্তি প্রকট হয়। মনে হয় যেন তিনি কার্য করছেন, কিন্তু তিনি কর্তা নন। তিনি হত্যা করছেন, কিন্তু তিনি হন্তা নন। এইভাবে বোঝা যায় যে, তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই কেবল সব কিছু ঘটছে।

তাৎপর্য

দুর্বিভাব্যা শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পক্ষে অচিন্তনীয়', এবং *বিভক্ত-বীর্যঃ* মানে হচ্ছে 'বিভিন্ন শক্তিতে বিভক্ত'। জড় জগতে সৃজনী শক্তির প্রকাশের এটি হচ্ছে যথার্থ বিশ্লেষণ। একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভগবানের কৃপা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়—রাষ্ট্র-সরকার সর্বদা দয়ালু হওয়ার কথা, কিন্তু কখনও

কখনও, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ-বাহিনীকে নিয়োগ করতে হয়, এবং বিদ্রোহী নাগরিকদের এইভাবে দণ্ড দেওয়া হয়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই কৃপাময় এবং দিব্য গুণাবলী-সমন্বিত, কিন্তু কোন কোন জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে, জড় প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করছে। তাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে, তারা বিভিন্ন প্রকার জড় প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ছে। কেউ যদি তর্ক উত্থাপন করে যে, ভগবান থেকে শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে বলে তিনি কর্তা, তা হলে সেই তর্কটি যথাযথ হবে না। পূর্ববর্তী শ্লোকে *নিমিত্ত মাত্রম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান সর্বদাই এই জড় জগতের কার্য কারণ থেকে সর্বতোভাবে পৃথক থাকেন। তা হলে সব কিছু হচ্ছে কি করে? সেই সূত্রে 'অচিন্ত্য' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। তা বোঝা মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। যে-সমস্ত শক্তি কাজ করছে তা ভগবানেরই দ্বারা প্রযুক্ত, কিন্তু তিনি সর্বদাই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া থেকে পৃথক থাকেন। জড় প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকার শক্তি বিভিন্ন প্রকার জীবদেহ এবং তাদের সুখ এবং দুঃখ উৎপন্ন করে।

ভগবান যে কিভাবে কর্ম করেন তা *বিষ্ণু পুরাণে* সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—অগ্নি এক স্থানে অবস্থিত থাকলেও তার তাপ এবং আলোক বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিজলিঘর এক স্থানে অবস্থিত, কিন্তু তার শক্তি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রকে সক্রিয় করে। উৎপাদন কখনই শক্তির মূল উৎসের সঙ্গে এক নয়, পক্ষান্তরে শক্তির আদি উৎস মূল কারণ হওয়ার ফলে, তা উৎপাদনের সঙ্গে যুগপৎ এক এবং ভিন্ন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব* হচ্ছে পরিপূর্ণ দর্শন। এই জড় জগতে ভগবান তিনরূপে অবতরণ করেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, ও তাঁদের দ্বারা তিনি প্রকৃতির তিনটি গুণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ব্রহ্মারূপে তিনি সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে তিনি পালন করেন, এবং শিবরূপে তিনি সংহারও করেন। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের আদি উৎস গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সর্বদাই জড় প্রকৃতির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া থেকে পৃথক থাকেন।

শ্লোক ১৯

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ ।
জনং জনেন জনয়ন্মারয়ন্মৃত্যুনান্তকম্ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি; **অনন্তঃ**—অনন্ত; **অন্ত-করঃ**—সংহারকর্তা; **কালঃ**—কাল; **অনাদিঃ**—যাঁর আদি নেই; **আদি-কৃৎ**—সব কিছুর আদি; **অব্যয়ঃ**—অবিনাশী; **জনম্**—জীব; **জনেন**—জীবের দ্বারা; **জনয়ন্**—সৃষ্টি করে; **মারয়ন্**—সংহার করে; **মৃত্যুনা**—মৃত্যুর দ্বারা; **অন্তকম্**—সংহারকর্তা।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান নিত্য, কিন্তু কালরূপে তিনি সব কিছুর সংহারকর্তা। তাঁর আদি নেই, যদিও তিনি সব কিছুর আদি; তিনি অব্যয়, যদিও কালক্রমে সব কিছু শেষ হয়ে যায়। পিতার মাধ্যমে জীবের সৃষ্টি হয় এবং মৃত্যুর দ্বারা তার বিনাশ হয়, কিন্তু তিনি সর্বদাই জন্ম-মৃত্যুর থেকে মুক্ত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানের পরম কর্তৃত্ব এবং অচিন্ত্য শক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা যায়। তিনি সর্বদাই অনন্ত। অর্থাৎ, তাঁর আদি নেই এবং অন্ত নেই। কিন্তু তিনি হচ্ছেন (কালরূপে) মৃত্যু, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমি মৃত্যু। জীবনান্তে আমি সব কিছু নিয়ে নিই।" শাশ্বত কালেরও আদি নেই, কিন্তু তা হচ্ছে সমস্ত জীবের স্রষ্টা। এই সূত্রে পরশপাথরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, যা বহু মূল্যবান মণিরত্ন সৃষ্টি করলেও তার কোন বিকার হয় না। তেমনই, বহুবার সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক বস্তুর পালন হয়, এবং কিছু সময় পর সব কিছুরই সংহার হয়, কিন্তু আদি স্রষ্টা ভগবান তাতে কোন রকম বিকার প্রাপ্ত হন না এবং তাঁর শক্তি ক্ষয় প্রাপ্তও হয় না। গৌণ সৃষ্টি হয়ে থাকে ব্রহ্মার দ্বারা, কিন্তু ব্রহ্মা ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট। শিব সমগ্র জগৎ সংহার করেন, কিন্তু চরমে বিষ্ণু তাঁকেও সংহার করেন। শ্রীবিষ্ণুই কেবল থাকেন। বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিতে কেবল বিষ্ণু ছিলেন এবং অন্তেও কেবল তিনিই থাকবেন।

একটি দৃষ্টান্ত আমাদের পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করতে পারে। আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে ভগবান একজন হিটলার সৃষ্টি করেছেন, এবং তার পূর্বে একজন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, এবং তারা যুদ্ধে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে। কিন্তু চরমে বোনাপার্ট এবং হিটলারও নিহত হয়েছে। মানুষ আজও হিটলার এবং বোনাপার্ট সম্বন্ধে এবং কিভাবে তারা বহু মানুষকে যুদ্ধে হত্যা করেছে, সেই সম্বন্ধে লিখতে এবং বই পড়তে খুব আগ্রহী। হিটলার যে কিভাবে হাজার হাজার ইহুদিদের বন্দিশালায় হত্যা করেছে, সেই সম্বন্ধে

জনসাধারণের পাঠের জন্য বছরের পর বছর বহু বই ছাপানো হচ্ছে। কিন্তু হিটলারকে যে কে সংহার করেছে এবং এই রকম একজন ভয়ঙ্কর নরহত্যাকারীকে যে কে সৃষ্টি করেছে, সেই সম্বন্ধে কোন গবেষণা কেউ করছে না। ভগবদ্ভক্তেরা পৃথিবীর ক্ষণিকের ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যাপারে ততটা উৎসাহী নন। তাঁরা কেবল তাঁর সম্বন্ধেই উৎসাহী, যিনি হচ্ছেন আদি স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

শ্লোক ২০

ন বৈ স্বপক্ষোঽস্য বিপক্ষ এব বা
পরস্য মৃত্যোর্বিশতঃ সমং প্রজাঃ ।
তং ধাবমানমনুধাবন্ত্যনীশা
যথা রজাংস্যনিলং ভূতসঙ্ঘাঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **বৈ**—তা সত্ত্বেও; **স্ব-পক্ষঃ**—মিত্রপক্ষ; **অস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বিপক্ষঃ**—শত্রু; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **মৃত্যোঃ**—কালরূপে, **বিশতঃ**—প্রবেশ করে; **সমম্**—সমানরূপে; **প্রজাঃ**—জীব; **তম্**—তাঁকে; **ধাবমানম্**—চলায়মান; **অনুধাবন্তি**—অনুসরণ করে; **অনীশাঃ**—আশ্রিত জীব; **যথা**—যেমন; **রজাংসি**—ধূলিকণা; **অনিলম্**—বায়ু; **ভূত-সঙ্ঘাঃ**—অন্য ভৌতিক তত্ত্ব।

অনুবাদ

কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সর্বত্র বিদ্যমান এবং সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন। তাঁর কাছে কেউই তাঁর মিত্র নয় অথবা শত্রু নয়। কালের অধীনে সকলেই তাদের কর্মফল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে। যেমন, বায়ুর প্রবাহের ফলে ধূলিকণা ওড়ে, তেমনই জীব তার বিশেষ কর্ম অনুসারে, জড়-জাগতিক জীবনে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

যদিও পরমেশ্বর ভগবান সর্ব কারণের পরম কারণ, তবুও তিনি কারও জড় সুখ অথবা দুঃখভোগের জন্য দায়ী নন। ভগবান এই প্রকার পক্ষপাতিত্ব করেন না বুদ্ধিহীন মানুষেরা ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে যে, তাঁরই জন্য কেউ এই জড় জগতে সুখভোগ করছে এবং অন্যেরা দুঃখভোগ করছে। কিন্তু এই

শ্লোকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান কারও পক্ষপাতিত্ব করেন না। কিন্তু জীবেরাও আবার স্বতন্ত্র নয়। জীব যখনই ঘোষণা করে যে, সে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তৎক্ষণাৎ তাকে এই জড় জগতে প্রেরণ করা হয়, যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে তার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করার জন্য। এই প্রকার বিপথগামী জীবেদের জন্য সৃষ্ট এই জড় জগতে, তারা তাদের নিজেদের কর্ম সৃষ্টি করে, এবং কালের সাহায্যে তাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করে। সকলেরই সৃষ্টি হয়েছে, সকলেরই পালন হচ্ছে, এবং চরমে সকলেরই সংহার হবে এই তিনটি বিষয়ে ভগবান সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন। জীব তার নিজের কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখভোগ করে। জীবের উচ্চ-নীচ পদ, তার সুখ এবং দুঃখ, সবই তার কর্ম অনুসারে হয়। এই সম্পর্কে *অনীশাঃ* শব্দটি অত্যন্ত উপযুক্ত, যার অর্থ হচ্ছে 'তাদের নিজেদের কর্মের উপর নির্ভরশীল'। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, সরকার প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা এবং তত্ত্বাবধান প্রদান করেন, কিন্তু মানুষ তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে, বিভিন্ন স্তরের চেতনায় থাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন ধূলিকণা তাতে ভাসে। ক্রমশ বিদ্যুৎ চমকায়, এবং তার পর মুষলধারায় বৃষ্টি নামে, এবং তার ফলে বর্ষা ঋতু অরণ্যে বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ভগবান অত্যন্ত কৃপাময় -তিনি সকলকেই সমান সুযোগ দেন—কিন্তু জীব তার নিজের কর্ম অনুসারে এই জগতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে।

শ্লোক ২১

আয়ুষোঽপচয়ং জন্তোস্তথৈবোপচয়ং বিভুঃ ।
উভাভ্যাং রহিতঃ স্বস্থো দুঃস্থস্য বিদধাত্যসৌ ॥ ২১ ॥

আয়ুষঃ—আয়ুর; **অপচয়ম্**—হ্রাস; **জন্তোঃ**—জীবের; **তথা**—তেমনই; **এব**—ও; **উপচয়ম্**—বৃদ্ধি; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **উভাভ্যাম্**—তাদের উভয়ের থেকে; **রহিতঃ**—মুক্ত; **স্ব-স্থঃ**—সর্বদা তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত; **দুঃস্থস্য**—কর্মের নিয়মের অধীন জীবের; **বিদধাতি**—প্রদান করেন; **অসৌ**—তিনি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বশক্তিমান এবং তিনি জীবকে তার কর্মফল প্রদান করেন। এইভাবে যদিও কোন জীবের আয়ু অত্যন্ত অল্প এবং অন্য কোন জীবের

আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, তবুও তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত, এবং তাঁর নিজের আয়ুর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাৎপর্য

একটি মশা এবং ব্রহ্মা উভয়েই এই জড় জগতের জীব; তাঁরা উভয়েই চিৎ স্ফুলিঙ্গ এবং পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। একটি মশার অতি অল্প আয়ু এবং ব্রহ্মার অতি দীর্ঘ আয়ু—ভগবানই তাদের প্রদান করেছেন তাদের কর্মের ফল অনুসারে কিন্তু *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি*—ভগবান তাঁর ভক্তের কর্মফল ক্ষয় করেন অথবা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন। সেই একই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতায়ও* ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র*—কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত, তা না হলে তা কর্মবন্ধনের কারণ হয় কর্মের নিয়মে জীব কালের বশবর্তী হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে, কখনও সে একটি মশা হয় এবং কখনও ব্রহ্মা হয়। একজন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের কাছে এটি একটি লাভজনক ব্যাপার নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) জীবেদের সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে—*যান্তি দেবব্রতা দেবান্*—যারা দেবতাদের পূজায় আসক্ত, তারা দেবতাদের লোকে যাবে, আর যারা পিতৃদের পূজায় আসক্ত, তারা পিতৃলোকে যাবে। যারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অনুরক্ত, তারা জড় জগতেই থাকবে। কিন্তু যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা ভগবানের ধামে যাবেন, যেখানে জন্ম-মৃত্যু নেই অথবা কর্মফলের অধীন বিভিন্ন প্রকার জীবন নেই। জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন *মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই। জীব কৃষ্ণদাস, এই বিশ্বাস করলে ত' আর দুঃখ নাই।*

শ্লোক ২২

কেচিৎকর্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ।
একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে ॥ ২২ ॥

কেচিৎ—কোন, **কর্ম**—সকাম কর্ম; **বদন্তি**—বলে; **এনম্**—সেই; **স্বভাবম্**—প্রকৃতি; **অপরে**—অন্যরা; **নৃপ**—হে ধ্রুব মহারাজ; **একে**—কেউ; **কালম্**—কাল; **পরে**—অন্যরা; **দৈবম্**—ভাগ্য; **পুংসঃ**—জীবের; **কামম্**—বাসনা; **উত**—ও; **অপরে**—অন্যরা।

অনুবাদ

কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার জীবনের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের সুখ-দুঃখকে কর্মের ফল বলে। অন্য কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে স্বভাব, আবার অনেকে বলে কাল, কেউ কেউ বলে ভাগ্য এবং আবার কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে কাম।

তাৎপর্য

বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক রয়েছে—মীমাংসক, চার্বাক, জ্যোতির্বিদ, কামুকতাবাদী ইত্যাদি। এরা সকলেই মনোধর্মী। প্রকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, আমাদের কর্মই এই জগতে বিভিন্ন প্রকার জীবনে বেঁধে রাখে। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার জীবনের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে তা *বেদে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে—জীবের বাসনাই হচ্ছে তার কারণ। জীব জড় পাথর নয়; তার বিভিন্ন প্রকার বাসনা বা কাম রয়েছে। *বেদে* বলা হয়েছে, *কামোঽকর্ষীৎ*। জীবেরা মূলত ভগবানের বিভিন্ন অংশ, ঠিক যেমন স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে অগ্নির বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তারা প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এই জড় জগতে পতিত হয়েছে। এটি বাস্তব সত্য। প্রতিটি জীবই যথাসাধ্য চেষ্টা করছে প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার।

এই *কাম* অথবা বাসনা বিনষ্ট করা যায় না। কিছু দার্শনিক বলে যে, বাসনা ত্যাগ করতে পারলেই মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু বাসনা ত্যাগ করা মোটেই সম্ভব নয়, কারণ বাসনা হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। বাসনা যদি না থাকে, তা হলে জীব জড় পাথরে পরিণত হবে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এই বাসনাকে অর্পণ করতে হবে। তা হলেই বাসনা পবিত্র হবে। আর বাসনা যখন পবিত্র হয়, তখন জীব সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, বিভিন্ন স্তরের জীবন এবং তাদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের যে-সমস্ত মতবাদ তা সবই অপূর্ণ। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে যে, আমরা ভগবানের নিত্যদাস এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সেই সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে, আমরা এই জড় জগতে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, যেখানে আমরা আমাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ সৃষ্টি করছি এবং তার ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছি। আমাদের বাসনার ফলে, আমরা এই জড় জগতে নিমজ্জিত হয়েছি, কিন্তু সেই বাসনাকে অবশ্যই পবিত্র করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। তা হলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন যোনিতে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করার যে-রোগে আমরা ভুগছি, তার নিরাময় হবে।

শ্লোক ২৩

অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ ।
ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্ ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তস্য—অপ্রকাশিতের; **অপ্রমেয়স্য**—চিন্ময় তত্ত্বের; **নানা**—বিবিধ; **শক্তি**—শক্তি, **উদয়স্য**—যাঁর থেকে উৎপন্ন হয় তাঁর; **চ**—ও; **ন**—কখনই না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **চিকীর্ষিতম্**—পরিকল্পনা; **তাত**—হে বৎস; **কঃ**—কে; **বেদ**—জানতে পারে; **অথ**—অতএব; **স্ব**—নিজের; **সম্ভবম্**—উৎস।

অনুবাদ

পরম সত্য বা চিন্ময় তত্ত্ব কখনই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বোধগম্য নয়, অথবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। তিনি জড়া প্রকৃতি আদি বিভিন্ন শক্তির ঈশ্বর, এবং তাঁর পরিকল্পনা অথবা কার্যকলাপ কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; তাই বুঝতে হবে যে, যদিও তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, কিন্তু মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউ তাঁকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, "যেহেতু বিভিন্ন প্রকার দার্শনিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করছে, তা হলে তাদের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক?" তার উত্তর হচ্ছে যে, পরম সত্য বা চিন্ময় তত্ত্ব কখনই প্রত্যক্ষ অনুভূতি অথবা মানসিক জল্পনা-কল্পনার বিষয় নয়। মনোধর্মীদের কূপমণ্ডুক বলা যেতে পারে। তিন ফুট একটি কুয়ার এক ব্যাঙ তার সেই কুয়ার জ্ঞানের ভিত্তিতে আটলান্টিক মহাসাগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই কূপমণ্ডুকের পক্ষে তা ছিল একটি অসম্ভব কার্য। কেউ মস্ত বড় পণ্ডিত বা প্রফেসর হতে পারেন, কিন্তু তাঁর অনুমানের ভিত্তিতে পরম সত্যকে জানা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব নয়, কারণ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সীমিত। সর্ব কারণের পরম কারণ পরম সত্যকে কেবল পরম সত্যের কৃপাতেই জানা যায়, জ্ঞানের আরোহ পন্থার দ্বারা কখনও তাঁকে জানা যায় না। রাত্রিবেলায় সূর্য যখন আমাদের দৃষ্টির অগোচর থাকে অথবা সূর্য যখন দিনের বেলায় মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তখন সূর্য আকাশে থাকলেও, আমাদের দৈহিক অথবা মানসিক শক্তির দ্বারা অথবা কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা সূর্যকে আবরণ মুক্ত করা সম্ভব নয়। কেউই বলতে পারে না যে, সে একটি অতি শক্তিশালী টর্চ আবিষ্কার করেছে, যার দ্বারা

রাতের আকাশে সূর্যকে দেখা যেতে পারে। এমন কোন টর্চলাইট নেই এবং কোন দিন তা হবেও না।

এই শ্লোকে *অব্যক্ত* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তথাকথিত কোন রকম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা পরম সত্যকে প্রকাশ করা যায় না। অধোক্ষজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। সূর্য যেমন আকাশে উদিত হলে, সকলেই সূর্যকে দেখতে পায়, সূর্যের আলোকে সারা পৃথিবী দেখতে পায় এবং সকলে নিজেকেও দেখতে পায়, ঠিক তেমনই পরম সত্যের আলোকেই পরম সত্যকে জানা যায় এবং তখন সব কিছুই জানা হয়ে যায়। আত্ম উপলব্ধির এই জ্ঞানকে বলা হয় আত্মতত্ত্ব। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমের স্তরে আসা না যাচ্ছে, ততক্ষণ জীব যে-অন্ধকারে তার জন্ম হয়েছিল, সেই অন্ধকারেই থাকে। তখন কেউই পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ভগবান বিবিধ শক্তিসমন্বিত, যে সম্বন্ধে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে* । তিনি শাশ্বত কালশক্তি-সমন্বিত। আমরা যে জড় শক্তি দেখি এবং উপলব্ধি করি, তিনি কেবল সেই শক্তিসমন্বিতই নন, অধিকন্তু তাঁর অন্য বহু শক্তি রয়েছে, যা তিনি প্রয়োজন অনুসারে যথাসময়ে প্রকাশ করতে পারেন। জড় বৈজ্ঞানিকেরা কেবল বিবিধ শক্তির আংশিক উপলব্ধি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে পারে; তারা তাদের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা সেই সমস্ত শক্তির একটি সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের জড় বিজ্ঞানের দ্বারা পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা কখনও সম্ভব নয়। কোন জড় বিজ্ঞানী ভবিষ্যতে কি হবে, সেই সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। ভক্তিযোগের পন্থা কিন্তু তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভক্ত সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, যিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *দদামি বুদ্ধি-যোগং তম্* । ভগবান বলেছেন, "আমি তাকে বুদ্ধি দান করি।" সেই বুদ্ধি কি? *যেন মাম্ উপযান্তি তে* । অজ্ঞানের সমুদ্র পার হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে আসার বুদ্ধি ভগবান দান করেন। অতএব মূল কথাটি হচ্ছে যে, দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা সর্ব কারণের পরম কারণ পরম সত্য বা পরমব্রহ্মকে কখনই জানা যায় না, কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, কারণ তাঁর ভক্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত। অতএব *ভগবদ্গীতাকে* স্বয়ং পরম সত্যের এই গ্রহলোকে অবতরণকালে তাঁর মুখনিঃসৃত শাস্ত্রগ্রন্থ বলে গ্রহণ করা উচিত। কোন বুদ্ধিমান মানুষ যদি ভগবান সম্বন্ধে জানতে চান, তা হলে সদ্গুরুর পরিচালনায় এই দিব্য গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা তাঁর কর্তব্য। তা হলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানা অত্যন্ত সহজ হবে।

শ্লোক ২৪

ন চৈতে পুত্রক ভ্রাতুর্হন্তারো ধনদানুগাঃ ।
বিসর্গাদানয়োস্তাত পুংসো দৈবং হি কারণম্ ॥ ২৪ ॥

ন—কখনই না; **চ**—ও; **এতে**—এই সমস্ত; **পুত্রক**—হে বৎস; **ভ্রাতুঃ**—তোমার ভাইয়েব; **হন্তারঃ**—হত্যাকারী; **ধনদ**—কুবেরের; **অনুগাঃ**—অনুগামীগণ; **বিসর্গ**—জন্মের; **আদানয়োঃ**—মৃত্যুর; **তাত**—হে বৎস; **পুংসঃ**—জীবের; **দৈবম্**—ভগবান; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

হে বৎস! কুবেরের অনুচর এই সমস্ত যক্ষরা তোমার ভ্রাতা উত্তমের বধকর্তা নয়। জীবের জন্ম এবং মৃত্যু সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবানের দ্বারাই হয়।

শ্লোক ২৫

স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ ।
অথাপি হ্যনহঙ্কারান্নাজ্যতে গুণকর্মভিঃ ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে, **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **সঃ**—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবতি**—পালন করেন; **হন্তি**—সংহার করেন; **চ**—ও; **অথ অপি**—অধিকন্তু, **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনহঙ্কারাৎ**—অহঙ্কার-রহিত হওয়ার ফলে; **ন**—না, **অজ্যতে**—আবদ্ধ হয়; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **কর্মভিঃ**—কর্মেব দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং যথা সময়ে ধ্বংস করেন, কিন্তু যেহেতু তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত, তাই তিনি কখনও এই সমস্ত কার্যজনিত অহঙ্কারের দ্বারা অথবা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অনহঙ্কার* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অহঙ্কার-রহিত'। বদ্ধ জীবের অহঙ্কার রয়েছে, এবং তার কর্মেব ফলে সে এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রাপ্ত হয়। কখনও সে দেবদেহ প্রাপ্ত হয়ে সেই দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। তেমনই, যখন সে একটি কুকুরের দেহ প্রাপ্ত হয়, তখনও সে তার দেহটিকেই

তার স্বরূপ বলে মনে করে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সেই রকম কোন দেহ-দেহী ভেদ নেই। তাই *ভগবদ্গীতায়* প্রমাণিত হয়েছে যে, কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভাব না জেনে, তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, সে হচ্ছে একটি মহামূর্খ। ভগবান বলেছেন, *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি*—তিনি কখনও তাঁর কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। আমাদের যে জড় দেহ রয়েছে, তাতেই প্রমাণিত হয় যে, আমরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত। অর্জুনকে ভগবান বলেছেন, "পূর্বে তোমার এবং আমার বহু বহুবার জন্ম হয়েছে। সেই সম্বন্ধে আমার সব মনে আছে, কিন্তু তোমার নেই।" সেটিই হচ্ছে বদ্ধ জীব এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য। পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মার কোন জড় দেহ নেই, এবং যেহেতু তাঁর জড় দেহ নেই, তাই তাঁর কোন কর্মের দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হন না। মায়াবাদীরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহও জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণের প্রভাব থেকে সৃষ্ট, এবং তারা কৃষ্ণের দেহ থেকে কৃষ্ণের আত্মাকে পৃথক বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীবের শরীর যদি সত্ত্ব গুণাত্মকও হয়, তবুও তা জড়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শরীর কখনই জড় নয়; তা চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণের কোন অহঙ্কার নেই, কারণ তিনি কখনও অনিত্য জড় দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেন না। তাঁর দেহ সর্বদাই নিত্য-শাশ্বত; তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে এই জগতে অবতরণ করেন। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *পরং ভাবম্*। *পরং ভাবং* এবং *দিব্যম্* শব্দগুলি শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্লোক ২৬

এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ ।
স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ ॥ ২৬ ॥

এষঃ—এই; **ভূতানি**—সমস্ত সৃষ্ট জীব; **ভূত-আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **ভূত-ঈশঃ**—সকলের নিয়ন্তা; **ভূত-ভাবনঃ**—সকলের পালনকর্তা; **স্ব-শক্ত্যা**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তি; **যুক্তঃ**—তার মাধ্যমে; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অত্তি**—ধ্বংস করেন; **চ**—এবং; **পাতি**—পালন করেন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং পালনকর্তা; তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে তিনি সকলের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির ব্যাপারে দুই প্রকার শক্তি রয়েছে। ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, কিন্তু চিৎ-জগৎ হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তিনি সর্বদাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং এই জড়া প্রকৃতি থেকে তিনি সর্বদাই পৃথক থাকেন। তাই ভগবদ্গীতায় *(৯/৪)* ভগবান বলেছেন, *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ*—"সমস্ত জীব আমাতে অথবা আমার শক্তিতে বিরাজ করছে, কিন্তু আমি সর্বত্র অবস্থিত নই।" তিনি স্বয়ং সর্বদা চিৎ-জগতে অবস্থিত। জড় জগতেও, যেখানে ভগবান স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, তাও চিৎ-জগৎ বলে বুঝতে হবে। যেমন, ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা মন্দিরে পূজিত হন। তাই মন্দিরকেও চিৎ-জগৎ বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ২৭

তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং
সর্বাত্মনোপেহি জগৎপরায়ণম্ ।
যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি
গাবো যথা বৈ নসি দামযন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

তম্—তাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **অমৃতম্**—অমরত্ব; **তাত**—হে বৎস; **দৈবম্**—ভগবান; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **উপেহি**—শরণাগত হও; **জগৎ**—জগতের; **পরায়ণম্**—পরম লক্ষ্য; **যস্মৈ**—যাকে; **বলিম্**—নৈবেদ্য; **বিশ্ব-সৃজঃ**—ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতা; **হরন্তি**—বহন করেন; **গাবঃ**—বৃষ; **যথা**—যেমন; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **নসি**—নাকে; **দাম**—রজ্জুর দ্বারা; **যন্ত্রিতাঃ**—নিয়ন্ত্রিত।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! তুমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও, যিনি জগতের উন্নতির পরম লক্ষ্য। ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ পর্যন্ত সকলেই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে কার্য করছেন, ঠিক যেমন নাসাবদ্ধ বলীবর্দ তার প্রভুর কার্য করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

পরম নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করাই হচ্ছে ভবরোগ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জড়-জাগতিক জীবন শুরু হয় তখন থেকে, যখন আমরা পরম নিয়ন্তাকে

ভুলে গিয়ে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা করি। জড় জগতে সকলেই, ব্যক্তিগতভাবে, রাষ্ট্রগতভাবে, সমাজগতভাবে এবং অন্যান্য বহুভাবে পরম নিয়ন্তা হওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। ধ্রুব মহারাজকে তাঁর পিতামহ যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তাঁর চিন্তা হয়েছিল যে, ধ্রুব মহারাজ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে সমগ্র যক্ষজাতি নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাই এই শ্লোকে স্বায়ম্ভুব মনু পরম নিয়ন্তার মহিমা বিশ্লেষণ করে, ধ্রুব মহারাজের অহঙ্কারজনিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ লেশটুকু পর্যন্ত নির্মূল করার চেষ্টা করেছেন। *মৃত্যুম্ অমৃতম্*, 'মৃত্যু এবং অমরত্ব' শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, "মৃত্যুরূপে আমি অসুরদের থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিই।" অসুরদের কাজ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করে নিরন্তর বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করা। অসুরদের বার বার মৃত্যু হতে থাকে এবং জড় জগতে কর্মের বন্ধন সৃষ্টি করে তাতে জড়িয়ে পড়ে। অসুরদের কাছে ভগবান মৃত্যুস্বরূপ, কিন্তু ভক্তদের কাছে তিনি হচ্ছেন অমৃততুল্য। যাঁরা নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই অমৃতত্ব লাভ করেছেন, কারণ এই জীবনে তাঁরা যা কিছু করছেন, তাঁদের পরবর্তী জীবনেও তাঁরা তাই করতে থাকবেন। তাঁদের চিন্ময় দেহ লাভের জন্য কেবল জড় দেহটির পরিবর্তন হবে। অসুরদের মতো তাঁদের জড় দেহের পরিবর্তন করতে হয় না। তাই ভগবান একাধারে মৃত্যু এবং অমরত্ব। অসুরদের কাছে তিনি মৃত্যু কিন্তু ভক্তদের কাছে তিনি অমরত্ব। তিনি সকলেরই চরম লক্ষ্য, কারণ তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, কোন রকম ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ না করে, সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হওয়ার। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, "তা হলে দেবতাদের পূজা করা হয় কেন?" এখানে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, দেবতাদের পূজা করে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা। তা ছাড়া, দেবতারা যজ্ঞের নৈবেদ্য স্বীকার করেন পরমেশ্বর ভগবানের চরম সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই।

শ্লোক ২৮

যঃ পঞ্চবর্ষো জননীং ত্বং বিহায়
মাতুঃ সপত্ন্যা বচসা ভিন্নমর্মা ।
বনং গতস্তপসা প্রত্যগক্ষ-
মারাধ্য লেভে মূর্ধ্নি পদং ত্রিলোক্যাঃ ॥ ২৮ ॥

যঃ—যে; **পঞ্চ-বর্ষঃ**—পাঁচ বছর বয়সে; **জননীম্**—মায়ের; **ত্বম্**—তুমি; **বিহায়**—ছেড়ে; **মাতুঃ**—মায়ের; **স-পত্ন্যাঃ**—সতীনের; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **ভিন্ন-মর্মা**—হৃদয়ে শোকাকুল হয়ে; **বনম্**—বনে; **গতঃ**—গিয়েছিলে; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **প্রত্যক্-অক্ষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলে; **মূর্ধ্নি**—সর্বোচ্চ; **পদম্**—পদ; **ত্রিলোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তোমার মাতার সতীনের বাণীতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে, তোমার মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি যোগপদ্ধতি অনুশীলন করার জন্য বনে গিয়েছিলে। তার ফলে তুমি ইতিমধ্যেই ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছ।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যে তাঁর বংশধর, সেই জন্য মনু অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কারণ পাঁচ বছর বয়সে ধ্রুব পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন, এবং ছয় মাসের মধ্যে তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন মনুবংশের অথবা মানব পরিবারের গৌরব। মনুষ্য পরিবার শুরু হয় মনু থেকে। *মনুষ্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে মনুর বংশধর ধ্রুব মহারাজ কেবল স্বায়ম্ভুব মনুর পরিবারেরই গৌরব ছিলেন না, তিনি সমগ্র মানব-সমাজের গৌরব। ধ্রুব মহারাজ যেহেতু ইতিমধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন, তাই তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, তিনি যেন এমন কিছু না করেন, যা শরণাগত আত্মার পক্ষে অশোভন।

শ্লোক ২৯

তমেনমঙ্গাত্মনি মুক্তবিগ্রহে
ব্যপাশ্রিতং নির্গুণমেকমক্ষরম্ ।
আত্মানমন্বিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃগ্
যস্মিন্নিদং ভেদমসৎপ্রতীয়তে ॥ ২৯ ॥

তম্—তাঁকে; **এনম্**—তা; **অঙ্গ**—হে ধ্রুব; **আত্মনি**—মনে; **মুক্ত-বিগ্রহে**—ক্রোধমুক্ত; **ব্যপাশ্রিতম্**—অবস্থিত; **নির্গুণম্**—চিন্ময়; **একম্**—এক; **অক্ষরম্**—অক্ষর ব্রহ্ম; **আত্মানম্**—আত্মা; **অন্বিচ্ছ**—অন্বেষণ করার চেষ্টা কর; **বিমুক্তম্**—অমল;

আত্মদৃক্—পরমাত্মার প্রতি উন্মুখ; **যস্মিন্**—যাতে; **ইদম্**—এই; **ভেদম্**—ভেদ; **অসৎ**—অবাস্তব; **প্রতীয়তে**—মনে হয়।

অনুবাদ

হে ধ্রুব। তাই তুমি অক্ষর ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার চেতনা নিবদ্ধ কর। তোমার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি উন্মুখ হও, এবং তার ফলে, আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা তুমি দেখবে যে, জড়-জাগতিক সমস্ত ভেদগুলি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।

তাৎপর্য

আত্ম-উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জীবের দৃষ্টিভঙ্গি তিন প্রকার। দেহাত্মবুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জীব দেহের ভিত্তিতে পার্থক্য দর্শন করে। জীব প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীরে ভ্রমণ করে, কিন্তু দেহের এই সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও সে নিত্য। তাই, জীবকে যখন দেহাত্মবুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করা হয়, তখন একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হয়। মনু চেয়েছিলেন ধ্রুব মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করতে, যিনি যক্ষদের তাঁর থেকে ভিন্নরূপে অথবা শত্রুরূপে দর্শন করছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে কেউই কারও শত্রু নয়, অথবা বন্ধু নয় কর্মের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করছে, কিন্তু কেউ যখন তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি আর কর্মের সেই নিয়মজনিত ভেদ দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে, *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলা হয়েছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

ভগবদ্ভক্ত, যিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন, তিনি কখনও বাহ্য শরীরের ভিত্তিতে ভেদ দর্শন করেন না; তিনি সমস্ত জীবকেই আত্মারূপে, ভগবানের নিত্য দাসরূপে দর্শন করেন। মনু ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই দৃষ্টির মাধ্যমে সব কিছু দর্শন করতে। তিনি তাঁকে বিশেষভাবে সেই উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, এবং তার পক্ষে সাধারণ মানুষের মতো দৃষ্টি নিয়ে অন্য জীবেদের দর্শন করা উচিত ছিল না। পরোক্ষভাবে মনু ধ্রুব মহারাজকে দেখিয়েছিলেন যে, জড় আসক্তির ফলে ধ্রুব মহারাজ তাঁর ভাইকে তাঁর আত্মীয় এবং যক্ষদের তাঁর শত্রু বলে মনে করেছিলেন। মানুষ যখন ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, তখন এই প্রকার ভেদদর্শন দূর হয়ে যায়।

শ্লোক ৩০

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥ ৩০ ॥

ত্বম্—তুমি; **প্রত্যক্-আত্মনি**—পরমাত্মাকে; **তদা**—তখন; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অনন্তে**—যিনি অসীম; **আনন্দ-মাত্রে**—সমস্ত আনন্দের যিনি উৎস; **উপপন্ন**—সমন্বিত; **সমস্ত**—সমগ্র; **শক্তৌ**—শক্তি; **ভক্তিম্**—ভক্তি, **বিধায়**—সম্পাদন করার দ্বারা; **পরমাম্**—পরম; **শনকৈঃ**—অতি শীঘ্র; **অবিদ্যা**—মায়ার; **গ্রন্থিম্**—গ্রন্থি; **বিভেৎস্যসি**—খুলে দেবে; **মম**—আমার; **অহম্**—আমি, **ইতি**—এইভাবে; **প্ররূঢ়ম্**—সুদৃঢ়।

অনুবাদ

এইভাবে তোমার স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে এবং সমস্ত আনন্দের উৎস ও পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার দ্বারা তুমি অচিরেই 'আমি' এবং 'আমার' এই মোহ থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন মুক্ত পুরুষ, কারণ পাঁচ বছর বয়সে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি নিজেকে উত্তমের ভ্রাতা বলে মনে করার ফলে, সাময়িকভাবে মায়াচ্ছন্ন হয়েছিলেন। সমগ্র জড় জগৎ 'আমি' এবং 'আমার' এই মনোভাবের ভিত্তিতে কার্য করছে। সেটিই হচ্ছে জড় জগতের প্রতি আকর্ষণের মূল কারণ। কেউ যদি মায়িক ধারণার ভিত্তি—'আমি' এবং 'আমার' এই ধারণার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তা হলে তাকে বিভিন্ন প্রকার উচ্চ অথবা ঘৃণিত অবস্থায় এই জড় জগতে থাকতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, ধ্রুব মহারাজকে ঋষিগণ এবং মনু মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন 'আমি' এবং 'আমার', এই জড় ধারণা পোষণ না করেন। কেবল ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই অনায়াসে এই মায়া দূর করা যায়।

শ্লোক ৩১

সংযচ্ছ রোষং ভদ্রং তে প্রতীপং শ্রেয়সাং পরম্ ।
শ্রুতেন ভূয়সা রাজন্নগদেন যথাময়ম্ ॥ ৩১ ॥

সংযচ্ছ—নিয়ন্ত্রণ কর; **রোষম্**—ক্রোধ; **ভদ্রম্**—সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ; **তে**—তোমার; **প্রতীপম্**—শত্রু; **শ্রেয়সাম্**—সমস্ত শুভের; **পরম্**—অগ্রণী; **শ্রুতেন**—শ্রবণ করার দ্বারা; **ভূয়সা**—নিরন্তর; **রাজন**—হে রাজন্; **অগদেন**—চিকিৎসার দ্বারা; **যথা**—যেমন; **আময়ম্**—রোগ।

অনুবাদ

হে রাজন! আমি তোমাকে যা বলেছি, সেই সম্বন্ধে একটু বিচার কর। তা রোগের ঔষধের মতো কাজ করবে। তোমার ক্রোধ সংবরণ কর, কারণ পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রোধ হচ্ছে সব চাইতে বড় শত্রু। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। তুমি আমার উপদেশ পালন কর।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন মুক্ত পুরুষ, এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি কারও প্রতি ক্রুদ্ধ হননি কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন একজন রাজা, তাই রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিছুক্ষণের জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। তাঁর ভ্রাতা উত্তম ছিল নির্দোষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক যক্ষ তাঁকে বধ করেছিল। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন রাজা, তাই তাঁর কর্তব্য ছিল অপরাধীকে বধ করা (জীবনের বদলা জীবন)। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধ্রুব মহারাজ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন এবং যক্ষদের যথেষ্টরূপে দণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রোধ এমনই যে, তাকে বাড়তে দিলে তা অন্তহীনভাবে বেড়ে চলে। ধ্রুব মহারাজের রাজোচিত ক্রোধ যাতে সীমা অতিক্রম না করে, সেই জন্য মনু কৃপাপরবশ হয়ে তাঁর পৌত্রের ক্রোধ প্রতিহত করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতামহের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তিনি যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন। এই শ্লোকে *শ্রুতেন ভূয়সা* শব্দগুলি, যার অর্থ হচ্ছে 'নিরন্তর শ্রবণের দ্বারা' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে নিরন্তর শ্রবণের ফলে, ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল ক্রোধকে সংবরণ করা যায়। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ বলেছেন যে, ভগবানের লীলা নিরন্তর শ্রবণ করাই হচ্ছে সকল ভবরোগের মহৌষধ তাই সকলেরই পরমেশ্বর ভগবানের কথা নিরন্তর শ্রবণ করা উচিত। এই শ্রবণের দ্বারা সর্বদা মনের সাম্য বজায় রাখা যায়, এবং তার ফলে পারমার্থিক প্রগতি বাধা প্রাপ্ত হয় না।

দুরাচারীদের প্রতি ধ্রুব মহারাজের ক্রোধ যথাযথ ছিল। এই সূত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়—নারদ মুনির উপদেশে একটি সাপ ভক্তে পরিণত হয়। নারদ মুনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে যেন আর কাউকে দংশন না করে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত লোকেরা সেই সাপের অহিংসক ব্রতের সুযোগ নিতে শুরু করে, বিশেষ করে শিশুরা তার প্রতি পাথর ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাপটি কাউকে কামড়ায় না, কারণ সেটি ছিল তার গুরুদেবের উপদেশ। কিছুকাল পর তার গুরুদেব নারদ মুনির সহিত সাপটির যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন সে অভিযোগ করেছিল, "আমি নির্দোষ জীবেদের দংশন করার বদভ্যাস ত্যাগ করেছি, কিন্তু তারা আমার প্রতি পাথর ছুঁড়ে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে।" সেই কথা শুনে নারদ মুনি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "দংশন করো না, তবে তোমার ফণা বিস্তার করে তাদের ভয় দেখাতে ভুল না। তা হলে তারা পালিয়ে যাবে।" তেমনি, ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই অহিংস; তিনি সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত। কিন্তু এই জগতে, অন্যরা যখন উৎপাত করে, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্তত কিছুকালের জন্য ক্রুদ্ধ হতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৩২

যেনোপসৃষ্টাৎপুরুষাল্লোক উদ্বিজতে ভৃশম্ ।
ন বুধস্তদ্বশং গচ্ছেদিচ্ছন্নভয়মাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

যেন—যার দ্বারা; **উপসৃষ্টাৎ**—অভিভূত হয়ে; **পুরুষাৎ**—পুরুষের দ্বারা; **লোকঃ**—প্রত্যেকে; **উদ্বিজতে**—উদ্বিগ্ন হয়; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ন**—কখনই না; **বুধঃ**—পণ্ডিত ব্যক্তি; **তৎ**—ক্রোধের; **বশম্**—বশীভূত; **গচ্ছেৎ**—যাওয়া উচিত; **ইচ্ছন্**—ইচ্ছুক; **অভয়ম্**—নির্ভীকতা, মুক্তি; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী, তার কখনই ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি অন্য সকলের উদ্বেগের কারণ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তের বা সাধু ব্যক্তির কখনও অন্যের উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত নয়, এবং অন্যদেরও তাঁর উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত নয়। কেউ যদি অন্যাদের

প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন না হয়, তা হলে কেউই তাঁর শত্রু হবে না। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর শত্রুরা তাঁকে ক্রুশ বিদ্ধ করেছিল। আসুরিক ব্যক্তিরা সব সময়ই থাকবে, এবং তারা সাধুদেরও দোষ দর্শন করবে কিন্তু শত উত্তেজনাতেও সাধুর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৩৩

হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্ ।
যজ্জঘ্নিবান্ পুণ্যজনান্ ভ্রাতৃঘ্নানিত্যমর্ষিতঃ ॥ ৩৩ ॥

হেলনম্—দুর্ব্যবহার; **গিরিশ**—শিবের; **ভ্রাতুঃ**—ভ্রাতা, **ধনদস্য**—কুবেরকে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছে; **যৎ**—যেহেতু; **জঘ্নিবান্**—তুমি হত্যা করেছ; **পুণ্য-জনান্**—যক্ষদের; **ভ্রাতৃ**—তোমার ভ্রাতার; **ঘ্নান্**—হত্যাকারীদের; **ইতি**—এইভাবে (চিন্তা করে); **অমর্ষিতঃ**—ক্রুদ্ধ।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! তুমি মনে করছ যে, যক্ষরা তোমার ভ্রাতাকে হত্যা করেছে, এবং তাই তুমি বহুসংখ্যক যক্ষকে হত্যা করেছ। কিন্তু তোমার এই আচরণের দ্বারা তুমি শিবের ভ্রাতা, যিনি দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ সেই কুবেরকে ক্ষুব্ধ করেছ। তুমি ভেবে দেখ যে, তোমার আচরণ কুবের এবং শিবের প্রতি অত্যন্ত অসম্মান-জনক হয়েছে।

তাৎপর্য

মনু উল্লেখ করেছেন যে, যক্ষরা কুবেরের পরিবারভুক্ত বলে ধ্রুব মহারাজ শিব এবং তাঁর ভ্রাতা কুবেরের প্রতি অপরাধ করেছেন। যক্ষরা সাধারণ ব্যক্তি নন। তাঁদের *পুণ্যজনান্* বা পুণ্যবান ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে কারণেই হোক না কেন, কুবের ধ্রুবের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এবং তাই ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে শান্ত করার জন্য।

শ্লোক ৩৪

তং প্রসাদয় বৎসাশু সন্নত্যা প্রশ্রয়োক্তিভিঃ ।
ন যাবন্মহতাং তেজঃ কুলং নোঽভিভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

তম্—তাঁকে; **প্রসাদয়**—শান্ত কর; **বৎস**—হে বৎস; **আশু**—শীঘ্র; **সনত্যা**—প্রণতি নিবেদন করার দ্বারা; **প্রশ্রয়া**—শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের দ্বারা; **উক্তিভিঃ**—নম্র বচনের দ্বারা; **ন যাবৎ**—পূর্বে; **মহতাম্**—মহা পুরুষদের; **তেজঃ**—ক্রোধ; **কুলম্**—বংশ; **নঃ**—আমাদের; **অভিভবিষ্যতি**—অভিভূত হবে।

অনুবাদ

হে বৎস! সেই কারণে, কুবেরের ক্রোধে আমাদের বংশ অভিভূত হওয়ার পূর্বেই বিনম্র বচন, প্রণতি এবং স্তুতির দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন কর।

তাৎপর্য

আমাদের আচরণের দ্বারা সকলের প্রতি বন্ধুত্ব বজায় রাখা উচিত, বিশেষ করে কুবেরের মতো একজন মহান দেবতার প্রতি। আমাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত যে, কেউ যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হন। মানুষ ক্রুদ্ধ হলে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি, পরিবারের প্রতি অথবা সমাজের প্রতি হানি সাধন করতে পারে।

শ্লোক ৩৫

এবং স্বায়ম্ভুবঃ পৌত্রমনুশাস্য মনুর্ধ্রুবম্ ।
তেনাভিবন্দিতঃ সাকমৃষিভিঃ স্বপুরং যযৌ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্বায়ম্ভুবঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **পৌত্রম্**—তাঁর পৌত্রকে; **অনুশাস্য**—উপদেশ প্রদান করে; **মনুঃ**—মনু; **ধ্রুবম্**—ধ্রুব মহারাজকে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **অভিবন্দিতঃ**—সংস্তুত হয়ে; **সাকম্**—সহ; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ; **স্ব-পুরম্**—তাঁর নিজের আলয়ে; **যযৌ**—গমন করেছিলেন

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পৌত্র ধ্রুব মহারাজকে এইভাবে শিক্ষা প্রদান করে তাঁর দ্বারা সংস্তুত হয়ে, মহর্ষিগণ সহ তাঁর আলয়ে গমন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ধ্রুব মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ধ্রুবং নিবৃত্তং প্রতিবুদ্ধ্য বৈশসা-
দপেতমন্যুং ভগবান্ ধনেশ্বরঃ ।
তত্রাগতশ্চারণযক্ষকিন্নরৈঃ
সংস্তূয়মানো ন্যবদৎকৃতাঞ্জলিম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ধ্রুবম্**—ধ্রুব মহারাজকে; **নিবৃত্তম্**—বিরত; **প্রতিবুদ্ধ্য**—জেনে; **বৈশসাৎ**—বধকার্য থেকে; **অপেত**—নিবস্ত হয়েছিল; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **ভগবান্**—কুবের; **ধন-ঈশ্বরঃ**—কোষাধ্যক্ষ; **তত্র**—সেখানে; **আগতঃ**—এসেছিলেন; **চারণ**—চারণদের দ্বারা; **যক্ষ**—যক্ষ; **কিন্নরৈঃ**—এবং কিন্নরদের দ্বারা; **সংস্তূয়মানঃ**—পূজিত হয়ে; **ন্যবদৎ**—বলেছিলেন; **কৃত-অঞ্জলিম্**—করজোড়পূর্বক দণ্ডায়মান ধ্রুবকে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর। ধ্রুব মহারাজের ক্রোধ প্রশমিত হল, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে যক্ষদের হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হলেন। ধনপতি কুবের যখন সেই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি যক্ষ, কিন্নর এবং চারণদের দ্বারা পূজিত হয়ে ধ্রুব মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, এবং অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান ধ্রুব মহারাজকে তখন তিনি বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২

ধনদ উবাচ

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ ।
যৎত্বং পিতামহাদেশাদ্বৈরং দুস্ত্যজমত্যজঃ ॥ ২ ॥

ধন-দঃ উবাচ—ধনপতি (কুবের) বললেন; **ভোঃ ভোঃ**—হে; **ক্ষত্রিয়-দায়াদ**—হে ক্ষত্রিয়পুত্র; **পরিতুষ্টঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত; **অস্মি**—আমি হয়েছি; **তে**—তোমার প্রতি; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **যৎ**—যেহেতু; **তম্**—তুমি; **পিতামহ**—তোমার পিতামহের; **আদেশাৎ**—আদেশে; **বৈরম্**—শত্রুতা; **দুস্ত্যজম্**—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **অত্যজঃ**—ত্যাগ করেছ।

অনুবাদ

ধনপতি কুবের বললেন্—হে নিষ্পাপ ক্ষত্রিয়পুত্র! তোমার পিতামহের উপদেশে তুমি যে দুস্ত্যজ বৈরীভাব ত্যাগ করেছ, সেই জন্য আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

শ্লোক ৩

ন ভবানবধীদ্‌যক্ষান্ন যক্ষা ভ্রাতরং তব ।
কাল এব হি ভূতানাং প্রভুরপ্যয়ভাবয়োঃ ॥ ৩ ॥

ন—না; **ভবান্**—তুমি; **অবধীৎ**—হত্যা করেছ; **যক্ষান্**—যক্ষদের; **ন**—না; **যক্ষাঃ**—যক্ষরা; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতাকে; **তব**—তোমার; **কালঃ**—কাল; **এব**—নিশ্চয়ই; **হি**—কারণ; **ভূতানাম্**—জীবেদের; **প্রভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অপ্যয়-ভাবয়োঃ**—সংহার এবং উৎপত্তির।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে, তুমি যক্ষদের হত্যা করনি, এবং তারাও তোমার ভাইকে হত্যা করেনি, কারণ সৃষ্টি এবং সংহারের পরম কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের কালরূপী প্রকাশ।

তাৎপর্য

ধনপতি কুবের যখন ধ্রুব মহারাজকে নিষ্পাপ বলে সম্বোধন করেছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ এত সমস্ত যক্ষদের হত্যা করার জন্য নিজেকে দায়ী বলে মনে করে, নিজের সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু কুবের তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন যক্ষকে হত্যা করেননি; তাই, তাঁর কোন পাপ হয়নি। তিনি একজন রাজারূপে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, যা ছিল প্রকৃতির অনুশাসন-জনিত নির্দেশ। কুবের বলেছিলেন, "তুমি মনে কোরো না যে,

তোমার ভ্রাতাকে যক্ষরা হত্যা করেছিল। কারণ প্রকৃতির নিয়মে কালের প্রভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল অথবা সে নিহত হয়েছিল। সংহার এবং সৃষ্টির জন্য চরমে দায়ী হচ্ছে ভগবানের কালরূপ প্রকাশ। তুমি সেই জন্য দায়ী নও।"

শ্লোক ৪

অহং ত্বমিত্যপার্থা ধীরজ্ঞানাৎপুরুষস্য হি ।
স্বাপ্নীবাভাত্যতদ্ধ্যানাদ্‌যয়া বন্ধবিপর্যয়ৌ ॥ ৪ ॥

অহম্—আমি; **ত্বম্**—তুমি; **ইতি**—এইভাবে; **অপার্থা**—ভ্রান্ত ধারণা; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **অজ্ঞানাৎ**—অজ্ঞানজনিত; **পুরুষস্য**—পুরুষের; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **স্বাপ্নি**—স্বপ্ন; **ইব**—মতো; **আভাতি**—মনে হয়; **অ-তৎ-ধ্যানাৎ**—দেহাত্মবুদ্ধি থেকে; **যয়া**—যার দ্বারা; **বন্ধ**—বন্ধন; **বিপর্যয়ৌ**—এবং দুঃখ।

অনুবাদ

দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, নিজের এবং অপরের প্রতি 'আমি' এবং 'তুমি' এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার কারণ হচ্ছে অবিদ্যা। এই দেহাত্মবুদ্ধিই হচ্ছে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কারণ, এবং তা আমাদের সংসারচক্রে নিরন্তর আবর্তিত করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই অহং ত্বম্ অর্থাৎ 'আমি' এবং 'তুমি' এই ভাবের উদয় হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু এবং আমরা সকলেই তাঁর বিভিন্ন অংশ, ঠিক যেমন হাত এবং পা হচ্ছে দেহের বিভিন্ন অংশ। আমরা যখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের এই নিত্য সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তখন আর এই ভেদভাব, যা দেহাত্মবুদ্ধির ভিত্তিতে উদ্ভূত হয়, তা থাকতে পারে না। সেই দৃষ্টান্তটি এখানে দেওয়া যেতে পারে—হাত হচ্ছে হাত, এবং পা হচ্ছে পা, কিন্তু যখন তারা উভয়েই সমগ্র দেহের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আর 'হাত' এবং 'পা' এই প্রকার ভেদভাব থাকে না। কারণ তারা সকলেই সমগ্র শরীরের অঙ্গ, এবং সমস্ত অঙ্গের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণ শরীরের সেবা করা। তেমনই, জীব যখন কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়, তখন আর 'আমি' এবং 'তুমি'-র ভেদভাব থাকে না, কারণ সকলেই ভগবানের সেবায় যুক্ত। ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর সেবাও

পরম। হাত যদিও একভাবে কাজ করে এবং পা অন্যভাবে, কিন্তু যেহেতু চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, তাই তা সবই এক। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, মায়াবাদীদের মতো "সব কিছুই এক" বলে মনে করা। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে যে, হাত হচ্ছে হাত, পা হচ্ছে পা, শরীর হচ্ছে শবীর, এবং তা সত্ত্বেও তারা সকলে মিলে এক। যখনই জীব মনে করে যে, সে হচ্ছে স্বাধীন, তখনই তার জড়-জাগতিক বদ্ধজীবন শুরু হয়। স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা তাই ঠিক একটি স্বপ্নের মতো। জীবের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া। তা হলেই সে জড় জগতের বন্ধন্ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

শ্লোক ৫

তদ্‌গচ্ছ ধ্রুব ভদ্রং তে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
সর্বভূতাত্মভাবেন সর্বভূতাত্মবিগ্রহম্ ॥ ৫ ॥

তৎ—অতএব; **গচ্ছ**—এস; **ধ্রুব**—ধ্রুব; **ভদ্রম্**—কল্যাণ হোক; **তে**—তোমার; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অধোক্ষজম্**—যিনি জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীব; **আত্ম-ভাবেন**—তাদের এক বলে মনে করে; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবে; **আত্ম**—পরমাত্মা; **বিগ্রহম্**—রূপসমন্বিত।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! আমার কাছে এসো। ভগবান সর্বদা তোমার মঙ্গল করুন। অধোক্ষজ ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা, এবং এইভাবে বৈষম্য-রহিত হয়ে সমস্ত জীবই এক। তাই, সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের সেই চিন্ময় রূপের সেবা করতে শুরু কর।

তাৎপর্য

এখানে *বিগ্রহম্* অর্থাৎ 'রূপসমন্বিত' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, চরমে পরমতত্ত্ব হচ্ছেন ভগবান। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে। *সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ*—তাঁর রূপ আছে, কিন্তু তাঁর সেই রূপ যে-কোন জড় রূপ থেকে ভিন্ন। জীব সেই পরম রূপের তটস্থা শক্তি। সেই সূত্রে, জীবেরা সেই পরম রূপ থেকে ভিন্ন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তারা তাঁর সমকক্ষও নয়। এখানে ধ্রুব মহারাজকে সেই পরম বিগ্রহের সেবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

তার ফলে, অন্যান্য ব্যষ্টি জীবেরও সেবা সম্পাদিত হবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, একটি গাছের রূপ রয়েছে, এবং সেই গাছের গোড়ায় যখন জল দেওয়া হয়, তখন গাছের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য রূপেরও যথা—পত্র, পল্লব, ফুল, ফল ইত্যাদিতেও আপনা থেকেই জল দেওয়া হয়ে যায়। মায়াবাদীদের ধারণা, পরমতত্ত্ব সব কিছু হওয়ার ফলে নিশ্চয়ই নিরাকার, তা এখানে নিরস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমতত্ত্বের রূপ রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সর্বব্যাপ্ত। কোন কিছুই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়।

শ্লোক ৬

ভজস্ব ভজনীয়াঙ্ঘ্রিমভবায় ভবচ্ছিদম্ ।
যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

ভজস্ব—ভক্তিযুক্ত হও; **ভজনীয়**—ভজনের যোগ্য; **অঙ্ঘ্রিম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **অভবায়**—সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য; **ভব-ছিদম্**—যিনি ভৌতিক বন্ধনের গ্রন্থি ছেদন করেন; **যুক্তম্**—সংযুক্ত; **বিরহিতম্**—পৃথক; **শক্ত্যা**—তাঁর শক্তিকে; **গুণ-ময্যা**—জড়া প্রকৃতির গুণসমন্বিত; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

তাই, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে যুক্ত কর, কারণ তিনিই কেবল আমাদের এই জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে পারেন। ভগবান যদিও জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তবুও তিনি এই জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ থেকে আলাদা থাকেন। এই জড় জগতের সব কিছুই সংঘটিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকের বক্তব্যের রেশ টেনে, এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধ্রুব মহারাজের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে যুক্ত করা। নির্বিশেষ ব্রহ্মের কখনও প্রেমময়ী সেবা করা যায় না। *ভজস্ব* শব্দটি যখন উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে 'ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে যুক্ত কর', তখন বুঝতে হবে যে, সেবক, সেবা এবং সেব্য রয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা হয়, এবং যে-সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা বিধান হয়, তাকে বলা হয় সেবা, এবং

যিনি সেই সেবা করেন, তাঁকে বলা হয় সেবক। এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, অন্য কাউকে নয়, কেবল ভগবানকেই সেবা করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে *(মাম্ একং শরণং ব্রজ)*। পরমেশ্বর ভগবানের হস্ত পদস্বরূপ দেব-দেবীদের সেবা করার কোন প্রয়োজন নেই। যখন ভগবানের সেবা করা হয়, তখন তাঁর হাত-পায়ের সেবা আপনা থেকেই হয়ে যায়। পৃথকভাবে তাঁদের সেবা করার কোন প্রয়োজন হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (১২/৭) উল্লেখ করা হয়েছে, *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ*। অর্থাৎ তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য ভগবান তাঁর ভক্তের অন্তর থেকে তাঁকে এমনভাবে পরিচালনা করেন যে, ভক্ত চরমে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবানই কেবল জীবেদের এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির একটি *(পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে)*। এই জড়া প্রকৃতি ভগবানের একটি শক্তি, ঠিক যেমন তাপ এবং আলোক হচ্ছে অগ্নির শক্তি। জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে জড়া প্রকৃতিতে ভগবানের করণীয় কিছুই নেই। ভগবানের তটস্থা শক্তি জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে, এই জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভগবান এই প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু সেই জীব যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে যুক্ত করে, তখন সে সেই সেবার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান জড়া প্রকৃতিতেও বিরাজমান। সেটি হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। জড়া প্রকৃতি তিনটি গুণের মাধ্যমে ক্রিয়া করে, যা জড় অস্তিত্বে কর্মফলের সৃষ্টি করে। যাঁরা ভক্ত নয় তারা এই সমস্ত কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু ভগবানের সেবাপরায়ণ ভক্ত জড়া প্রকৃতির এই কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত। তাই ভগবানকে এখানে *ভবচ্ছিদম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি সংসার-বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৭

বৃণীহি কামং নৃপ যন্মনোগতং
মত্তস্ত্বমৌত্তানপদেঽবিশঙ্কিতঃ ।
বরং বরার্হোঽম্বুজনাভপাদয়ো-
র্নন্তরং ত্বাং বয়মঙ্গ শুশ্রুম ॥ ৭ ॥

বৃণীহি—প্রার্থনা কর; **কামম্**—বাসনা; **নৃপ**—হে রাজন্; **যৎ**—যা কিছু; **মনঃ-গতম্**—তোমার মনের ভিতর; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **ত্বম্**—তুমি; **ঔত্তানপদে**—হে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র; **অবিশঙ্কিতঃ**—দ্বিধা না করে; **বরম্**—বর; **বর-অর্হঃ**—বর গ্রহণের যোগ্য; **অম্বুজ**—পদ্মফুল; **নাভ**—তাঁর নাভি; **পাদয়োঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **অনন্তরম্**—নিরন্তর; **ত্বাম্**—তোমার সম্বন্ধে; **বয়ম্**—আমরা; **অঙ্গ**—হে ধ্রুব; **শুশ্রুম**—শুনেছি।

অনুবাদ

হে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজ! আমরা শুনেছি যে, তুমি নিরন্তর পদ্মনাভ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। তাই তুমি আমাদের কাছ থেকে সব রকম বর গ্রহণের যোগ্য। অতএব নির্দ্বিধায় তুমি আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করতে পার।

তাৎপর্য

মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজ নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানকারী একজন ভক্তরূপে ইতিমধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। এই প্রকার শুদ্ধ, নিষ্কলুষ ভগবদ্ভক্ত দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত সর্ব প্রকার বর গ্রহণের যোগ্য এই প্রকার বর লাভের জন্য তাঁকে পৃথকভাবে দেবতাদের পূজা করতে হয়নি। কুবের হচ্ছেন দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ, এবং তিনি স্বয়ং ধ্রুব মহারাজকে যে-কোন বর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন যে, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁদের সেবা করার জন্য সব রকম জড় জাগতিক বর দাসীর মতো প্রতীক্ষা করে। ভক্তদের মুক্তি দেওয়ার জন্য মুক্তিদেবী তাঁর দরজায় প্রতীক্ষা করেন। তিনি তাঁদের মুক্তিরও অধিক কোন সম্পদ প্রদান করার জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব থাকেন। তাই ভগবদ্ভক্ত হওয়া এক অতি উচ্চ পদ। কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা করাব ফলে, ভক্ত কোন পৃথক প্রচেষ্টা ব্যতীতই এই জগতের যে-কোন বর লাভ করতে পারেন। ধ্রুব মহারাজকে কুবের বলেছিলেন যে, তিনি শুনেছিলেন ধ্রুব মহারাজ সর্বদাই সমাধিমগ্ন থাকেন, অর্থাৎ তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি জানতেন যে, ধ্রুব মহারাজের পক্ষে এই জড় জগতের কোন কিছুই কাম্য ছিল না। তিনি জানতেন যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দের স্মরণরূপ আশীর্বাদ ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করবেন না।

শ্লোক ৮

মৈত্রেয় উবাচ

স রাজরাজেন বরায় চোদিতো
ধ্রুবো মহাভাগবতো মহামতিঃ ।
হরৌ স বব্রেঽচলিতাং স্মৃতিং যয়া
তরত্যযত্নেন দুরত্যয়ং তমঃ ॥ ৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **সঃ**—তিনি; **রাজ-রাজেন**—রাজাদের রাজার (কুবের) দ্বারা; **বরায়**—বরের জন্য; **চোদিতঃ**—প্রার্থনা করতে; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **মহা-ভাগবতঃ**—সর্বোত্তম শুদ্ধ ভক্ত; **মহা-মতিঃ**—সব চাইতে বুদ্ধিমান অথবা চিন্তাশীল; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **বব্রে**—প্রার্থনা করেছিলেন; **অচলিতাম্**—অবিচলিত; **স্মৃতিম্**—স্মৃতি; **যয়া**—যার দ্বারা; **তরতি**—পার হয়; **অযত্নেন**—অনায়াসে; **দুরত্যয়ম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **তমঃ**—অজ্ঞান।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! যক্ষরাজ কুবের যখন ধ্রুব মহারাজকে বর প্রার্থনা করার জন্য বললেন, তখন মহাভাগবত মহামতি ধ্রুব মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—তিনি যেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিচলিত স্মৃতি লাভ করে দুস্তর অজ্ঞান-সমুদ্র পার হতে পারেন।

তাৎপর্য

বৈদিক অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞ অনুগামীদের মতে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের বর রয়েছে। এই চারটি উদ্দেশ্যকে বলা হয় চতুর্বর্গ। এই চতুর্বর্গের মধ্যে মুক্তিকে এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ বলে বিবেচনা করা হয়। জড় জগতের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়া সর্বোচ্চ পুরুষার্থ নামে পরিচিত। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ যে বর চেয়েছিলেন, তা সর্বোচ্চ পুরুষার্থ মুক্তিরও অতীত। তিনি চেয়েছিলেন, তিনি যেন নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করতে পারেন জীবনের এই স্তরকে বলা হয় পঞ্চম পুরুষার্থ। ভক্ত যখন পঞ্চম পুরুষার্থের স্তরে এসে কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তি তাঁর কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী এই সম্পর্কে বলেছেন যে, ভক্তের কাছে মুক্তি নারকীয় বলে মনে হয়;

তাঁর কাছে স্বর্গসুখ আকাশ-কুসুম-সদৃশ, এবং তার কোন মূল্যই নেই। যোগীরা ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা করে, কিন্তু ভক্তের কাছে ইন্দ্রিয়-সংযম মোটেই কঠিন নয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সেই সর্পগুলির বিষদাঁত ভেঙে গেছে। এইভাবে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী এই পৃথিবীতে লব্ধ সব রকম মুক্তির বিশ্লেষণ করেছেন, এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, শুদ্ধ ভক্তের কাছে সেইগুলির কোন মূল্যই নেই। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন মহা ভাগবত বা সর্বোচ্চ স্তরের শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত মহৎ (*মহা-মতিঃ*)। অত্যন্ত বুদ্ধিমান না হলে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা যায় না। সর্বোচ্চ স্তরের ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই সর্বোচ্চ স্তরের বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষ, এবং তাই তিনি এই জড় জগতের কোন বর লাভের জন্য আগ্রহী হন না। যিনি রাজাদেরও রাজা, তিনি ধ্রুব মহারাজকে বর দিতে চেয়েছিলেন। দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের, যাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে এই জড জগতের জীবেদের কাছে প্রভূত ধন-সম্পদ সরবরাহ করা, তাঁকে এখানে রাজার রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ কুবেরের আশীর্বাদপুষ্ট না হলে রাজা হওয়া যায় না। সেই রাজাদের রাজা স্বয়ং ধ্রুব মহারাজকে যে-কোন পরিমাণ ধন-সম্পদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তাই তাঁকে এখানে *মহা-মতিঃ* বা অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

তস্য প্রীতেন মনসা তাং দত্ত্বৈড়বিড়স্ততঃ ।
পশ্যতোঽন্তর্দধে সোঽপি স্বপুরং প্রত্যপদ্যত ॥ ৯ ॥

তস্য—ধ্রুবের প্রতি; **প্রীতেন**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **মনসা**—মনোভাব সহকারে; **তাম্**—সেই স্মৃতি; **দত্ত্বা**—দান করে; **ঐড়বিড়ঃ**—ইড়বিড়ার পুত্র কুবের; **ততঃ**—তার পর; **পশ্যতঃ**—ধ্রুব যখন দেখছিলেন; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হলেন; **সঃ**—তিনি (ধ্রুব); **অপি**—ও; **স্ব-পুরম্**—তাঁর নগরীতে; **প্রত্যপদ্যত**—ফিরে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

ইড়বিড়ার পুত্র কুবের ধ্রুবের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং আনন্দিত চিত্তে তাঁর বাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন। তার পর তিনি ধ্রুবের সম্মুখে অন্তর্হিত হলেন। ধ্রুব মহারাজও তখন তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

ইড়বিড়ার পুত্র কুবের ধ্রুব মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর কাছ থেকে জড়-জাগতিক ভোগের বস্তু কামনা করেননি। কুবের হচ্ছেন একজন দেবতা, তাই কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, 'ধ্রুব মহারাজ কেন একজন দেবতার থেকে বর গ্রহণ করেছিলেন?' তার উত্তর হচ্ছে যে, বৈষ্ণবের পক্ষে কোন দেবতার কাছ থেকে বর গ্রহণে কোন বাধা নেই, যদি তা কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার অনুকূল হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, ব্রজগোপিকারা কাত্যায়নী দেবীর পূজা করেছিলেন, কিন্তু দেবীর কাছে তাঁদের একমাত্র কামনা ছিল, তাঁরা যেন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করতে পারেন। বৈষ্ণবেরা দেবতাদের কাছ থেকে কোন রকম বর লাভের প্রত্যাশী নন, এমন কি তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের থেকেও কোন রকম আকাঙ্ক্ষা করেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান মুক্তি দান করতে পারেন, কিন্তু ভগবান যদি শুদ্ধ ভক্তকে মুক্তিও দান করেন, তা হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ধ্রুব মহারাজ কুবেরের কাছে চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার প্রার্থনা করেননি, যাকে বলা হয় মুক্তি; তিনি কেবল প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি চিৎ-জগৎ অথবা জড় জগৎ যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি যেন নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে পারেন। বৈষ্ণব সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই কুবের যখন তাঁকে বর দিয়েছিলেন, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেননি। কিন্তু তিনি এমন কিছু চেয়েছিলেন, যা কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার অনুকূল হবে।

শ্লোক ১০

অথাযজত যজ্ঞেশং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং কর্ম কর্মফলপ্রদম্ ॥ ১০ ॥

অথ—তার পর; **অযজত**—তিনি পূজা করেছিলেন; **যজ্ঞ-ঈশম্**—যজ্ঞেশ্বরকে; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **ভূরি**—মহান; **দক্ষিণৈঃ**—দানের দ্বারা; **দ্রব্য-ক্রিয়া-দেবতানাম্**—দ্রব্য, ক্রিয়া, এবং দেবতা-সমন্বিত যজ্ঞের; **কর্ম**—উদ্দেশ্য; **কর্ম-ফল**—কর্মের ফল; **প্রদম্**—প্রদানকারী।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যত দিন গৃহে ছিলেন, তত দিন তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। শাস্ত্রবিহিত

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা, যিনি সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য এবং যিনি যজ্ঞের ফল প্রদান করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৯) বলা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*— পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কেবল কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্মফলের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হয়। চারটি বর্ণ এবং আশ্রমের ব্যবস্থা অনুসারে, বিশেষ করে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার এবং তাঁদের সঞ্চিত অর্থ মুক্তহস্তে দান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। একজন আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজারূপে ধ্রুব মহারাজ বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং উদারভাবে দান করেছিলেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের অর্থ উপার্জন করে প্রভূত ধন সম্পদ সঞ্চয় করার কথা। কখনও কখনও তাঁদের সেই জন্য পাপকর্মে লিপ্ত হতে হয়। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে রাজ্য শাসন করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ধ্রুব মহারাজকে রাজ্যশাসন করার সময় যক্ষদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং তাদের অনেককে হত্যা করতে হয়েছিল। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এইভাবে আচরণ করার প্রয়োজন হয়। ক্ষত্রিয়ের কাপুরুষ হওয়া উচিত নয় এবং অহিংসক হওয়াও উচিত নয়। রাজ্যশাসন করার জন্য তাঁকে হিংসাত্মক কার্য করতে হয়।

তাই ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের সঞ্চিত ধনের অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যেন দান করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করার পরেও যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নয়। তা কখনই ত্যাগ করা উচিত হবে না। তপস্যা সন্ন্যাস-জীবনের জন্য; যাঁরা সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁদের তপস্যা অনুষ্ঠান করা উচিত। বৈষয়িক জীবন যাপন করছে যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, তাদের অবশ্যই দান করা উচিত। জীবনের শুরুতে ব্রহ্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত।

একজন আদর্শ রাজারূপে ধ্রুব মহারাজ তাঁর রাজকোষ উজাড় করে দান করেছিলেন। নাগরিকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তা ব্যয় করা রাজার কর্তব্য নয়। নাগরিকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তা ব্যয় করার ফলে, পৃথিবীর রাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। তা সে রাজতন্ত্রই হোক অথবা গণতন্ত্রই হোক, সেই শোষণ এবং প্রতারণা এখনও চলছে। বর্তমান সময়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন দল রয়েছে, কিন্তু সকলেই তাদের নিজেদের পদ অথবা রাজনৈতিক দলকে গদিতে রাখার চেষ্টাতেই ব্যস্ত।

রাজনৈতিক নেতাদের সেই জনসাধারণের কল্যাণের বিষয়ে চিন্তা করার কোন সময়ই প্রায় নেই, অথচ তাদের থেকে তারা আয়কর, বিক্রয়কর এবং অন্যান্য বহু প্রকার করের বোঝা চাপিয়ে শোষণ করছে। অনেক সময় মানুষের আয়ের শতকরা আশি নব্বই ভাগ আয়কররূপে নিয়ে নেওয়া হয়, এবং সেই অর্থ রাজকর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের মোটা মাহিনা দেওয়ার ব্যাপারে ব্যয় করা হয়। পূর্বে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, নাগরিকদের থেকে সংগৃহীত কর মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হত। কিন্তু এখন, প্রায় কোন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়; তাই, শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মানুষ যেন সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। যে-কোন গৃহস্থ বিনা খরচায় সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন। পরিবারের সমস্ত সদস্যরা একত্রে সমবেত হয়ে, হাততালি দিয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারে। কোন না কোন ভাবেই, সকলেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে এবং জনসাধারণের কাছে প্রসাদ বিতরণ করতে পারে। এই কলিযুগের পক্ষে সেটিই যথেষ্ট। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদূর সম্ভব, মন্দিরে অথবা বাইরে সর্বক্ষণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং যথাসম্ভব প্রসাদ বিতরণ করা। রাষ্ট্রের প্রশাসকদের এবং যাঁরা দেশের সম্পদ উৎপাদন করছেন, তাঁদের সহযোগিতায় এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থাটি আরও কার্যকরীভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব। কেবলমাত্র উদারভাবে প্রসাদ বিতরণ এবং সংকীর্তনের ফলে, সারা পৃথিবী শান্ত হতে পারে এবং সমৃদ্ধিশালী হতে পারে।

সাধারণত বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশিত সমস্ত সকাম যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেবতাদের এই পূজা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত যজ্ঞের ফল পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাম্*—সমস্ত যজ্ঞের প্রকৃত ভোক্তা হচ্ছেন তিনি। তাই তাঁর নাম যজ্ঞপুরুষ।

ধ্রুব মহারাজ যদিও ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত এবং এই প্রকার যজ্ঞ করার কোন প্রয়োজন তাঁর ছিল না, তবুও জনসাধারণের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন। যত দিন পর্যন্ত তিনি গৃহস্থরূপে জীবন যাপন করেছিলেন, তত দিন তিনি এক কপর্দকও তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যয় করেননি। এই শ্লোকে *কর্ম-ফল-প্রদম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান প্রত্যেককেই তার ইচ্ছা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ম প্রদান করেন। পরমাত্মারূপে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তিনি এতই দয়াময় এবং উদার যে, তিনি সকলকেই তাদের ইচ্ছা অনুসারে

কর্ম করার পূর্ণ সুযোগ দেন। তার পর সেই কর্মের ফলও জীবকে ভোগ করতে হয়। কেউ যদি জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়। তা হলে ভগবান তাকে পূর্ণ সুযোগ দেন, কিন্তু সেই কর্মের ফলে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তেমনই, কেউ যদি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে চান, তা হলেও ভগবান তাঁকে পূর্ণ সুযোগ দেন, এবং ভক্ত তাঁর ফল উপভোগ করেন। তাই ভগবান *কর্ম-ফল-প্রদ* নামে পরিচিত।

শ্লোক ১১

সর্বাত্মন্যচ্যুতেঽসর্বে তীব্রৌঘাং ভক্তিমুদ্বহন্ ।
দদর্শাত্মনি ভূতেষু তমেবাবস্থিতং বিভুম্ ॥ ১১ ॥

সর্ব-আত্মনি—পরমাত্মায়; **অচ্যুতে**—অচ্যুত; **অসর্বে**—অন্তহীনভাবে; **তীব্র-ওঘাম্**—তীব্রবেগে; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তি; **উদ্বহন্**—সম্পাদন করে; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **আত্মনি**—পরমাত্মায়, **ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **তম্**—তাঁকে; **এব**—কেবল; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত, **বিভুম্**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সব কিছুর উৎস পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময় তিনি দেখেছিলেন যে, সব কিছু কেবল তাঁর মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান। ভগবানকে বলা হয় অচ্যুত, কারণ তিনি কখনও তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার পরম কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন না।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ কেবল বহু যজ্ঞানুষ্ঠানই করেননি, অধিকন্তু তিনি ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবাও সম্পাদন করেছিলেন। সাধারণ কর্মীরা, যারা তাদের সকাম কর্মের ফল ভোগ করতে চায়, তারা কেবল বৈদিক শাস্ত্রনির্দেশিত কর্ম অনুষ্ঠানেই ব্যস্ত থাকে। ধ্রুব মহারাজ যদিও একজন আদর্শ রাজারূপে বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তবুও তিনি নিরন্তর ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ছিলেন। ভগবান সর্বদা তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। ভক্ত দেখতে পায় যে, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে *(ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি)*। সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারে না ভগবান কি করে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, কিন্তু

ভক্ত প্রকৃতপক্ষে তাঁকে দেখতে পান। ভক্ত কেবল তাঁকে বাহ্যিকভাবেই দেখতে পান না, তিনি তাঁর চিন্ময় দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পান যে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানে আশ্রিত, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে *(মৎ স্থানি সর্ব-ভূতানি)*। সেটি হচ্ছে মহাভাগবতের দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যরা যা দেখে, তিনিও তাই দেখেন, কিন্তু গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নগরী, আকাশ ইত্যাদি দর্শন করার পরিবর্তে, তিনি কেবল তাঁর আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবানকেই সব কিছুতে দর্শন করেন, কারণ সব কিছু তাঁকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে। সেটি হচ্ছে মহাভাগবতের দৃষ্টিভঙ্গি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মহাভাগবত অতি উন্নত শুদ্ধ ভক্ত, যিনি ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করেন, এবং সকলের হৃদয়ের অভ্যন্তরেও দর্শন করেন। অতি উচ্চ মার্গের ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন যে ভক্ত, তাঁর পক্ষেই এই প্রকার দর্শন সম্ভব। যে-সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন*—যাদের চক্ষু ভগবৎ প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে, তাঁরা সর্বত্র প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন; কল্পনার দ্বারা অথবা তথাকথিত ধ্যানের দ্বারা তা কখনও সম্ভব নয়।

শ্লোক ১২

তমেবং শীলসম্পন্নং ব্রহ্মণ্যং দীনবৎসলম্ ।
গোপ্তারং ধর্মসেতূনাং মেনিরে পিতরং প্রজাঃ ॥ ১২ ॥

তম্—তাঁকে; **এবম্**—এইভাবে; **শীল**—দিব্য গুণাবলীর দ্বারা; **সম্পন্নম্**—যুক্ত; **ব্রহ্মণ্যম্**—ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; **দীন**—দরিদ্রদের প্রতি; **বৎসলম্**—দয়ালু, **গোপ্তারম্**—রক্ষক; **ধর্ম-সেতূনাম্**—ধর্মের; **মেনিরে**—মনে করেছিল; **পিতরম্**—পিতা; **প্রজাঃ**—নাগরিকেরা।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ সমস্ত দিব্য গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধালু, দরিদ্র ও নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতি দয়ালু এবং ধর্মের রক্ষক ছিলেন। তাঁর এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁর প্রজারা তাঁকে তাঁদের পিতা বলে মনে করতেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের যে-সমস্ত গুণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তা একজন আদর্শ রাজর্ষির গুণাবলী। কেবল রাজারাই নন, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতাদেরও এই সমস্ত

দিব্য গুণাবলী থাকা উচিত, তা হলেই প্রজারা সুখী হবে। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রজারা ধ্রুব মহারাজকে তাদের পিতা বলে মনে করত। একটি শিশু যেমন তার সক্ষম পিতার উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত থাকে, তেমনই প্রজারা রাষ্ট্র অথবা রাজার দ্বারা সুরক্ষা প্রাপ্ত হয়ে, সর্বতোভাবে সুখী হতে পারে। কিন্তু, আজকাল রাজ্যে জীবনের প্রাথমিক আবশ্যকতাগুলিরও, যথা— নাগরিকদের জীবন এবং সম্পত্তির সুরক্ষার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এই প্রসঙ্গে *ব্রহ্মণ্যম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধ্রুব মহারাজ বেদজ্ঞ ও ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই প্রকার ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই কৃষ্ণভক্তি প্রচারে ব্যস্ত থাকেন। যে-সমস্ত সংস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হওয়া, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্র অথবা সরকারই এই প্রকার সংস্থাকে কোন রকম সাহায্য দেয় না। নেতাদের সদ্‌গুণাবলী বিচার করলে দেখা যায় যে, সদ্‌গুণসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রনেতা খুঁজে পাওয়াও অত্যন্ত দুষ্কর। প্রশাসকেরা কেবল তাদের গদিতে বসে প্রজাদের সমস্ত আবেদন এবং অনুরোধ মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে, যেন জনসাধারণকে না বলার জন্যই তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। আর একটি শব্দ *দীনবৎসলম্*ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্রনেতাদের নিরীহ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, এই যুগে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এবং নেতারা রাষ্ট্র থেকে মোটা মাইনা আদায় করে, এবং তারা অত্যন্ত পুণ্যবান হওয়ার অভিনয় করে, কিন্তু তারা নিরীহ পশুদের হত্যা করার কসাইখানা অনুমোদন করে। আমরা যদি ধ্রুব মহারাজের দিব্য গুণাবলীর সঙ্গে আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতাদের গুণাবলীর তুলনা করি, তা হলে দেখতে পাই যে, প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন সত্যযুগে, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে স্পষ্টীকৃত হবে। তিনি ছিলেন সত্যযুগের আদর্শ রাজা। বর্তমান যুগে (কলিযুগে) সরকারি প্রশাসনগুলি সমস্ত সদ্‌গুণ-রহিত। এই সমস্ত কথা বিচার করলে দেখা যায় যে, ধর্ম, জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য মানুষের কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

শ্লোক ১৩

ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং শশাস ক্ষিতিমণ্ডলম্ ।
ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্বন্নভোগৈরশুভক্ষয়ম্ ॥ ১৩ ॥

ষট্-ত্রিংশৎ—ছত্রিশ; **বর্ষ**—বৎসর; **সাহস্রম্**—হাজার; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **ক্ষিতি-মণ্ডলম্**—ভূমণ্ডল; **ভোগৈঃ**—ভোগের দ্বারা; **পুণ্য**—পুণ্যকর্মের ফল; **ক্ষয়ম্**—ক্ষয়; **কুর্বন্**—করে; **অভোগৈঃ**—তপস্যার দ্বারা; **অশুভ**—অশুভ কর্মের ফল; **ক্ষয়ম্**—হ্রাস।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় এবং তপস্যার দ্বারা অশুভ কর্মের ফল ক্ষয় করে, ছত্রিশ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যে ছত্রিশ হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সত্যযুগে ছিলেন, কারণ সত্যযুগে মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর। পরবর্তী অর্থাৎ ত্রেতা যুগে, মানুষের আয়ু ছিল দশ হাজার বছর, এবং তার পরবর্তী যুগে, দ্বাপরে মানুষের আয়ু ছিল এক হাজার বছর। বর্তমান কলিযুগে, মানুষের আয়ু হচ্ছে বড় জোর এক শত বছর। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আয়ু, মেধা, দয়া আদি সমস্ত সদ্‌গুণ হ্রাস হতে থাকে। কর্ম দুই প্রকার রয়েছে—পুণ্য এবং পাপ। পুণ্যকর্মের ফলে, আমরা উচ্চতর জড় সুখভোগের সুযোগ লাভ করতে পারি, আর পাপকর্মের ফলে, জীব কঠোর দুঃখভোগ করে। ভক্ত কিন্তু সুখভোগের প্রতি আসক্ত নন অথবা দুঃখ-কষ্টের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যখন তাঁর জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি আসে, তখন তিনি মনে করেন, "আমি আমার পুণ্যকর্মের ফল ক্ষয় করছি," এবং যখন তিনি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন, তখন তিনি জানেন, "আমার পাপকর্মের ফল ক্ষয় হচ্ছে।" ভগবদ্ভক্ত সুখ অথবা দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন না; তিনি কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে চান। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি *অপ্রতিহতা* হওয়া উচিত, অর্থাৎ তা সুখ এবং দুঃখ আদি জড় অবস্থার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। ভক্তরা একাদশী এবং অন্যান্য উপবাসের দিন তপশ্চর্যা পালন করেন, এবং অবৈধ যৌনসঙ্গ, আসবপান, দ্যূতক্রীড়া ও আমিষ আহার বর্জনরূপ তপস্যা করেন। এইভাবে তিনি তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল থেকে পবিত্র হন, এবং যেহেতু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তাই অন্য কোন পৃথক প্রচেষ্টা ব্যতীতই তিনি তাঁর জীবন উপভোগ করেন।

শ্লোক ১৪

এবং বহুসবং কালং মহাত্মাবিচলেন্দ্রিয়ঃ ।
ত্রিবর্গৌপয়িকং নীত্বা পুত্রায়াদান্নৃপাসনম্ ॥ ১৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **বহু**—বহু; **সবম্**—বৎসর; **কালম্**—সময়; **মহা-আত্মা**—মহাত্মা; **অবিচল-ইন্দ্রিয়ঃ**—সংযত ইন্দ্রিয়; **ত্রি-বর্গ**—তিন প্রকার জাগতিক কার্যকলাপ; **ঔপয়িকম্**—অনুষ্ঠান করার অনুকূল; **নীত্বা**—অতিবাহিত করে; **পুত্রায়**—তাঁর পুত্রকে; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **নৃপ-আসনম্**—রাজসিংহাসন।

অনুবাদ

সংযত-ইন্দ্রিয় মহাত্মা ধ্রুব মহারাজ এইভাবে ধর্ম, অর্থ এবং কামরূপ ত্রিবর্গ অনুকূলভাবে অনুষ্ঠানের দ্বারা বহুকাল অতিবাহিত করে, অবশেষে তাঁর রাজ-সিংহাসনের ভার তাঁর পুত্রকে দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা জড়-জাগতিক জীবনের পূর্ণতা লাভ করা যায়। তার ফলে আপনা থেকেই অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাফল্য আসে, এবং জড়-জাগতিক বাসনাগুলি চরিতার্থ করতে কোনই অসুবিধা হয় না। ধ্রুব মহারাজ যেহেতু ছিলেন একজন রাজা, তাই তাঁর পদমর্যাদা রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল, তা না হলে প্রজাশাসন করা সম্ভব হত না, এবং তা তিনি পূর্ণরূপে করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর পুত্র উপযুক্ত হয়েছে এবং সে রাজসিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, তৎক্ষণাৎ তিনি তার হাতে সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করে সমস্ত জড়-জাগতিক দায়-দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে *অবিচলেন্দ্রিয়ঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের বেগের দ্বারা কখনও বিচলিত হননি, এবং বয়সে বৃদ্ধ হলেও তাঁর ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। ছত্রিশ হাজার বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন বলে, কেউ মনে করতে পারে যে, তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ছিল যুবকের মতো জীবনীশক্তি-সম্পন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি চিরকাল সংযত-ইন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি জড়-জাগতিক বিচারেও তাঁর কর্তব্য পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছিলেন। সেটি হচ্ছে মহান ভগবদ্ভক্তের আচরণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন একজন অতি ধনী ব্যক্তির পুত্র। যদিও তাঁর

জড় সুখভোগের প্রতি কোন রকম স্পৃহা ছিল না, তবুও তাঁর উপর যখন রাজকার্য দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি তা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন। শ্রীল গৌরসুন্দর তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "মনকে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত রেখে, তুমি অন্তরে নিষ্ঠাপরায়ণ হও, কিন্তু বাহ্যে প্রয়োজন অনুসারে জড়-জাগতিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন কর।" এই প্রকার দিব্য স্থিতি কেবল ভক্তরাই লাভ করতে পারেন, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—যোগী আদি অন্য পরমার্থবাদীরা বলপূর্বক তাদের ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করতে চায়, কিন্তু ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ পূর্ণরূপে শক্তিসমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলিকে প্রয়োগ করেন না, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে উন্নততর চিন্ময় কর্মে নিযুক্ত করেন।

শ্লোক ১৫

মন্যমান ইদং বিশ্বং মায়ারচিতমাত্মনি ।
অবিদ্যারচিতস্বপ্নগন্ধর্বনগরোপমম্ ॥ ১৫ ॥

মন্যমানঃ—উপলব্ধি করে; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **রচিতম্**—নির্মিত; **আত্মনি**—জীবকে; **অবিদ্যা**—অবিদ্যার দ্বারা; **রচিত**—নির্মিত; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **গন্ধর্ব-নগর**—অলীক; **উপমম্**—সদৃশ।

অনুবাদ

শ্রীল ধ্রুব মহারাজ উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই জগৎ স্বপ্ন বা মায়াজালের মতো জীবেদের মোহগ্রস্ত করে, কারণ তা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা রচিত।

তাৎপর্য

কখনও কখনও গভীর অরণ্যে বিরাট বিরাট বহু প্রাসাদ এবং সুন্দর নগরী রয়েছে বলে মনে হয়। তাকে বলা হয় *গন্ধর্ব নগর*। তেমনই স্বপ্নেও আমরা আমাদের কল্পনার দ্বারা বহু অলীক সৃষ্টি করি। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বা ভগবদ্ভক্ত ভালভাবেই জানেন যে, এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী, এবং তা বাস্তব বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মায়িক। এই সবই অলীক। কিন্তু এই প্রতিবিম্বিত সৃষ্টির পিছনে বাস্তব চিন্ময় জগৎ রয়েছে। ভগবদ্ভক্ত চিৎ-জগতের বিষয়েই আগ্রহী, তার প্রতিবিম্বের প্রতি নয়। যেহেতু তিনি পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, তাই ভক্ত সত্যের এই ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বের প্রতি আগ্রহী নন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতে* প্রতিপন্ন হয়েছে (*পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*)।

শ্লোক ১৬

আত্মস্ত্র্যপত্যসুহৃদো বলমৃদ্ধকোশ-
মন্তঃপুরং পরিবিহারভুবশ্চ রম্যাঃ ।
ভূমণ্ডলং জলধিমেখলমাকলয্য
কালোপসৃষ্টমিতি স প্রযযৌ বিশালাম্ ॥ ১৬ ॥

আত্ম—দেহ; **স্ত্রী**—পত্নী; **অপত্য**—সন্তান; **সুহৃদঃ**—বন্ধু; **বলম্**—প্রভাব, সৈন্য; **ঋদ্ধ-কোশম্**—সমৃদ্ধ রাজকোষ; **অন্তঃ-পুরম্**—রমণীদের বাসস্থান; **পরিবিহার-ভুবঃ**—ক্রীড়াস্থল; **চ**—এবং; **রম্যাঃ**—সুন্দর; **ভূ-মণ্ডলম্**—সমগ্র পৃথিবী; **জল-ধি**—সমুদ্রের দ্বারা; **মেখলম্**—পরিবৃত; **আকলয্য**—বিবেচনা করে; **কাল**—কালের দ্বারা; **উপসৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **প্রযযৌ**—গিয়েছিলেন; **বিশালাম্**—বদরিকাশ্রমে।

অনুবাদ

এইভাবে ধ্রুব মহারাজ অবশেষে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত এবং মহাসাগর পরিবৃত ভূমণ্ডল জুড়ে বিস্তৃত তাঁর রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেহ, পত্নী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, সৈন্যসামন্ত, সমৃদ্ধ রাজকোষ, তাঁর অত্যন্ত আরামপ্রদ প্রাসাদ, এবং রমণীয় বিহারস্থল মায়া রচিত বিবেচনা করে, বানপ্রস্থ অবলম্বন করে হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর জীবনের প্রারম্ভে যখন পরমেশ্বর ভগবানের অন্বেষণে বনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সর্ব প্রকার দেহসুখ মায়ার রচনা। জীবনের প্রারম্ভে তিনি তাঁর পিতার রাজ্যের অভিলাষী ছিলেন, এবং তা লাভ করার জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সন্ধানে বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই জড় জগতে সব কিছুই মায়ার সৃষ্টি। ধ্রুব মহারাজের এই আচরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কেউ যদি কোনক্রমে কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে শুরুতে তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল তাতে কিছু যায় আসে না, কালক্রমে তিনি ভগবানের কৃপায় পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন। শুরুতে ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার রাজ্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি একজন মহাভাগবতে পরিণত হন, এবং তখন তাঁর আর কোন রকম জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি আগ্রহ ছিল না। ভক্তরাই কেবল জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে

পারেন। কেউ যদি অতি অল্প ভক্তি সম্পাদন করেও তাঁর ভগবদ্ভক্তির অপরিপক্ক অবস্থা থেকে অধঃপতিত হন, তা হলেও তিনি এই জড় জগতে সকাম কর্মে পূর্ণরূপে যুক্ত ব্যক্তির থেকে শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ১৭

তস্যাং বিশুদ্ধকরণঃ শিববার্বিগাহ্য
বদ্ধ্বাসনং জিতমরুন্মনসাহৃতাক্ষঃ ।
স্থূলে দধার ভগবৎপ্রতিরূপ এতদ্
ধ্যায়ংস্তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎসমাধৌ ॥ ১৭ ॥

তস্যাম্—বদরিকাশ্রমে; **বিশুদ্ধ**—পবিত্র; **করণঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ; **শিব**—শুদ্ধ; **বাঃ**—জল; **বিগাহ্য**—স্নান করে; **বদ্ধ্বা**—স্থির করে; **আসনম্**—আসন; **জিত**—নিয়ন্ত্রিত করে; **মরুৎ**—শ্বাসক্রিয়া; **মনসা**—মনের দ্বারা; **আহৃত**—প্রত্যাহৃত; **অক্ষঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ; **স্থূলে**—ভৌতিক; **দধার**—কেন্দ্রীভূত করেছিলেন; **ভগবৎ-প্রতিরূপে**—ভগবানের প্রকৃত স্বরূপে; **এতৎ**—মন; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **তৎ**—তা; **অব্যবহিতঃ**—অপ্রতিহত; **ব্যসৃজৎ**—তিনি প্রবেশ করেছিলেন; **সমাধৌ**—সমাধিতে।

অনুবাদ

স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পবিত্র জলে নিয়মিতভাবে স্নান করার ফলে, ধ্রুব মহারাজের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছিল। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁর শ্বাসক্রিয়া এবং প্রাণবায়ু সংযত করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করেছিলেন। তার পর তিনি তাঁর মনকে ভগবানের প্রতিরূপ অর্চা বিগ্রহে ধ্যানস্থ করেছিলেন, এইভাবে ভগবানের ধ্যান করতে করতে তিনি পূর্ণ সমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে অষ্টাঙ্গ-যোগপদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ধ্রুব মহারাজ ইতিপূর্বেই অভ্যস্ত ছিলেন। আদবকায়দা-দুরস্ত শহরে অভ্যাস করার জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ নয়। ধ্রুব মহারাজ একলা নির্জন বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন এবং সেখানে যোগ অভ্যাস করেছিলেন। তিনি তাঁর মনকে ভগবানের অর্চা বিগ্রহে একাগ্রীভূত করেছিলেন, যা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অবিকল প্রতিরূপ, এবং এইভাবে নিরন্তর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করে তিনি সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। ভগবানের অর্চা বিগ্রহের

আরাধনা মূর্তি পূজা নয়। ভক্তের উপলব্ধির জন্য অর্চা বিগ্রহ ভগবানের অবতার। তাই ভক্ত মন্দিরে অর্চা বিগ্রহরূপে প্রকাশিত ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। এই রূপ পাথর, ধাতু, কাঠ, মণি, আলেখ্য ইত্যাদি স্থূল পদার্থের দ্বারা রচিত। এই সমস্ত পদার্থ স্থূল অথবা ভৌতিক প্রতীক। ভক্তরা যেহেতু পূজার বিধি-বিধান পালন করেন, তাই ভগবান যদিও ভৌতিকরূপে প্রকাশিত, তবুও তিনি তাঁর আদি চিন্ময় রূপ থেকে অভিন্ন। এইভাবে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করেন। ভগবানের এই নিরন্তর চিন্তা যা *ভগবদ্গীতায়ও* সংস্তুত হয়েছে, তা মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত করে।

শ্লোক ১৮

ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্র-
মানন্দবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমানঃ ।
বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো
নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্তলিঙ্গঃ ॥ ১৮ ॥

ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; **হরৌ**—শ্রীহরিকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রবহন্**—নিরন্তর যুক্ত হয়ে; **অজস্রম্**—সর্বদা; **আনন্দ**—আনন্দময়; **বাষ্প-কলয়া**—অশ্রুধারার দ্বারা; **মুহুঃ**—বারংবার; **অর্দ্যমানঃ**—অভিভূত হয়ে; **বিক্লিদ্যমান**—দ্রবীভূত; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **পুলক**—রোমাঞ্চ; **আচিত**—আচ্ছাদিত; **অঙ্গঃ**—তাঁর শরীর; **ন**—না; **আত্মানম্**—দেহ; **অস্মরৎ**—স্মরণ করেছিলেন, **অসৌ**—তিনি; **ইতি**—এইভাবে; **মুক্ত-লিঙ্গঃ**—সূক্ষ্ম দেহ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

চিন্ময় আনন্দে অভিভূত হওয়ার ফলে, তাঁর নয়ন-যুগল থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল, এবং অঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত হয়ে উঠল। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে সমাধিস্থ হওয়ার ফলে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর জড় দেহের অস্তিত্ব বিস্মৃত হলেন, এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ জড় দেহের বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন ইত্যাদি নবধা ভক্তির দ্বারা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে, ভক্তের শরীরে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকট হয়। এই আট প্রকার শারীরিক

ভাব, যা থেকে বোঝা যায় যে, ভক্ত তাঁর অন্তরে ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন, তাদের বলা হয় অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার। ভক্ত যখন সর্বতোভাবে তাঁর জড় দেহের অস্তিত্ব বিস্মৃত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি মুক্ত হয়ে গেছেন। তিনি আর শরীরের মধ্যে আবদ্ধ নন। সেই সম্পর্কে ঝুনো নারকেলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, যার ভেতরের শাঁসটি বাইরের খোল থেকে আলাদা হয়ে গেছে। নারকেলটি নাড়ালে তখন বোঝা যায় যে, তার ভেতরে শাঁসটি আর বাইরের আবরণের সঙ্গে যুক্ত নেই। তেমনই কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন হন, তখন তিনি সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের জড় আবরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যান। নিরন্তর ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে ধ্রুব মহারাজ বাস্তবিকই এই স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁকে পূর্বেই মহাভাগবত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ মহাভাগবত বা সর্বোচ্চ স্তরের শুদ্ধ ভক্ত না হলে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকট হয় না। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকট ছিল। হরিদাস ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গেও এই সমস্ত লক্ষণ প্রকট ছিল, এবং বহু শুদ্ধ ভক্তের শ্রীঅঙ্গে এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিকার প্রদর্শিত হয়েছিল। এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিকার অনুকরণীয় নয়, কিন্তু কেউ যখন সত্যি সত্যি ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করেন, তখন এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। তখন বুঝতে হবে যে, সেই ভক্ত জড় বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভগবদ্ভক্তির শুরু থেকেই অবশ্য মুক্তির পথের দ্বার খুলে যায়, ঠিক যেমন গাছ থেকে পেড়ে নেওয়ার পরেই নারকেলটি শুকাতে থাকে, তবে খোল থেকে শাঁস আলাদা হতে কিছু সময় লাগে।

এই শ্লোকে *মুক্ত-লিঙ্গঃ* শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ। লিঙ্গ মানে হচ্ছে 'সূক্ষ্ম দেহ'। যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন সে তার স্থূল দেহটি ত্যাগ করে, কিন্তু মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহটি তাকে তার পরবর্তী শরীরে বহন করে নিয়ে যায়। বর্তমান শরীরে অবস্থান করার সময়ও সেই সূক্ষ্ম দেহ তার মানসিক বিকাশের দ্বারা তাকে জীবনের এক স্তর থেকে আর এক স্তরে নিয়ে যায় (যেমন শৈশব থেকে কৈশোরে)। একটি শিশুর মানসিক অবস্থা একটি বালকের থেকে ভিন্ন, একটি বালকের মানসিক অবস্থা একজন যুবক থেকে ভিন্ন এবং একজন যুবকের মানসিক অবস্থা একজন বৃদ্ধের থেকে ভিন্ন। তেমনই, মৃত্যুর সময় দেহান্তর হয় সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা; মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আত্মাকে একটি স্থূল শরীর থেকে অন্য আর একটি স্থূল শরীরে নিয়ে যায়। তাকে বলা হয় আত্মার দেহান্তর। কিন্তু আর একটি স্তর রয়েছে, যখন আত্মা সূক্ষ্ম দেহ থেকেও মুক্ত হয়ে যায়। তখন জীব চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য হন এবং পূর্ণরূপে প্রস্তুত হন।

শ্রীধ্রুব মহারাজের শারীরিক লক্ষণের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য পূর্ণরূপে যোগ্য হয়েছিলেন। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন তার স্থূল শরীরটি বিছানায় শায়িত অবস্থায় থাকলেও সূক্ষ্ম শরীর আত্মাকে অন্য আর একটি পরিবেশে নিয়ে যায়। কিন্তু স্থূল দেহের আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়ার ফলে, সূক্ষ্ম দেহ পুনরায় বর্তমান স্থূল দেহটিতে ফিরে আসে। অতএব জীবকে সূক্ষ্ম দেহ থেকে মুক্ত হতে হয়। এই মুক্তিকে বলা হয় মুক্ত-*লিঙ্গ* ।

শ্লোক ১৯

স দদর্শ বিমানাগ্র্যং নভসোঽবতরদ্ ধ্রুবঃ ।
বিভ্রাজয়দ্দশ দিশো রাকাপতিমিবোদিতম্ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **বিমান**—একটি বিমান; **অগ্র্যম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **নভসঃ**—আকাশ থেকে; **অবতরৎ**—অবতরণ করে; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **বিভ্রাজয়ৎ**—আলোকিত করে; **দশ**—দশ; **দিশঃ**—দিক; **রাকা-পতিম্**—পূর্ণচন্দ্র; **ইব**—সদৃশ; **উদিতম্**—গোচরীভূত।

অনুবাদ

মুক্তির সেই লক্ষণগুলি প্রকট হওয়া মাত্র, তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি সুন্দর বিমান দশদিক আলোকিত করে আকাশ থেকে অবতরণ করছে, যেন পূর্ণচন্দ্র আকাশ থেকে নীচে নেমে আসছে।

তাৎপর্য

জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে—প্রত্যক্ষ জ্ঞান, পরোক্ষ জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান, অধোক্ষজ জ্ঞান, এবং চরমে অপ্রাকৃত জ্ঞান। কেউ যখন অবরোহ পন্থায় জ্ঞান অর্জনের স্তর অতিক্রম করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি দিব্য জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হন। ধ্রুব মহারাজ দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য জ্ঞানের স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি পূর্ণচন্দ্রের মতো উজ্জ্বল এক দিব্য বিমান দর্শন করেছিলেন। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ জ্ঞানের স্তরে এই প্রকার দর্শন সম্ভব নয়। এই প্রকার জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রদর্শন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নতি সাধন করার ফলে, জ্ঞানের এই স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২০

তত্রানু দেবপ্রবরৌ চতুর্ভুজৌ
শ্যামৌ কিশোরাবরুণাম্বুজেক্ষণৌ ।
স্থিতাববষ্টভ্য গদাং সুবাসসৌ
কিরীটহারাঙ্গদচারুকুণ্ডলৌ ॥ ২০ ॥

তত্র—সেখানে; **অনু**—তখন; **দেব-প্রবরৌ**—দুইজন অতি সুন্দর দেবতা; **চতুঃ-ভুজৌ**—চারটি বাহুসমন্বিত; **শ্যামৌ**—শ্যামবর্ণ; **কিশোরৌ**—কিশোর; **অরুণ**—রক্তাভ; **অম্বুজ**—পদ্মফুল; **ঈক্ষণৌ**—নয়ন-সমন্বিত; **স্থিতৌ**—অবস্থিত, **অবষ্টভ্য**—ধারণ করে; **গদাম্**—গদা; **সুবাসসৌ**—সুন্দর বসন পরিহিত; **কিরীট**—মুকুট; **হার**—কণ্ঠহার; **অঙ্গদ**—বালা; **চারু**—সুন্দর; **কুণ্ডলৌ**—কর্ণকুণ্ডল।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ সেই বিমানে দুইজন অতি সুন্দর বিষ্ণুপার্ষদদের দেখতে পেলেন। তাঁরা চতুর্ভুজ এবং তাঁদের অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, তাঁরা কিশোর বয়স্ক, এবং তাঁদের নয়ন কমলের মতো অরুণবর্ণ। তাঁদের হাতে গদা ছিল, এবং তাঁদের পরিধানে ছিল অত্যন্ত সুন্দর বসন এবং মাথায় ছিল মুকুট, আর তাঁরা হার, অঙ্গদ, কুণ্ডল ইত্যাদি অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত ছিলেন।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠবাসীদের রূপ ঠিক ভগবান বিষ্ণুর মতো, এবং তাঁদেরও চার হাতে তাঁরা গদা, শঙ্খ, পদ্ম এবং চক্র ধারণ করেন। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তাঁরা ছিলেন চতুর্ভুজ এবং অত্যন্ত সুন্দর বসন পরিহিত; তাঁদের দেহের সৌন্দর্যের বর্ণনা ঠিক বিষ্ণুর মতো। সেই বিমানে যে দুইজন অসাধারণ ব্যক্তি এসেছিলেন, তাঁরা সরাসরিভাবে বিষ্ণুলোক থেকে এসেছিলেন।

শ্লোক ২১

বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায়কিঙ্করা-
বভ্যুত্থিতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রমঃ ।
ননাম নামানি গৃণন্মধুদ্বিষঃ
পার্ষৎপ্রধানাবিতি সংহতাঞ্জলিঃ ॥ ২১ ॥

বিজ্ঞায়—জানতে পেরে; **তৌ**—তাঁদের; **উত্তম-গায়**—উত্তম যশ শ্রীবিষ্ণুর; **কিঙ্করৌ**—দুইজন সেবক; **অভ্যুত্থিতঃ**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **সাধ্বস**—কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে; **বিস্মৃত**—ভুলে গিয়ে; **ক্রমঃ**—যথাযথ আচরণ; **ননাম**—প্রণাম করেছিলেন, **নামানি**—নামের; **গৃণন্**—উচ্চারণ করে; **মধু-দ্বিষঃ**—ভগবানের (মধুর শত্রু); **পার্ষৎ**—পার্ষদ; **প্রধানৌ**—শ্রেষ্ঠ; **ইতি**—এইভাবে; **সংহৃত**—শ্রদ্ধা সহকারে যুক্ত করেছিলেন; **অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে।

অনুবাদ

সেই অসাধারণ ব্যক্তিদের ভগবানের পার্ষদ বলে চিনতে পেরে, ধ্রুব মহারাজ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ার ফলে, তিনি যে কিভাবে তাঁদের স্বাগত জানাবেন তা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি কেবল করজোড়ে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে, ভগবানের পবিত্র নামের মহিমা উচ্চারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের পবিত্র নামকীর্তন সর্ব অবস্থাতেই সর্বোত্তম। ধ্রুব মহারাজ যখন চতুর্ভুজ এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত বিষ্ণুদূতদের দেখেছিলেন, তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা কে, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য তিনি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কেবল ভগবানের পবিত্র নামসমন্বিত হরেকৃষ্ণ মন্ত্র উচ্চারণ করে, তিনি সহসা তাঁর সম্মুখে আগত সেই অসাধারণ অতিথিদের প্রসন্নতা বিধান করতে পেরেছিলেন। ভগবানের নামকীর্তন সর্বতোভাবে পূর্ণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা তাঁর পার্ষদদের প্রসন্নতা বিধান কিভাবে করতে হয় তা না জানলেও, কেবল ঐকান্তিকভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করলে, সব কিছুই আদর্শরূপে সম্পন্ন হয়। তাই বিপদে অথবা আনন্দে, ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন। তিনি যখন বিপদে পড়েন, তখন ভগবানের এই নাম কীর্তন করার ফলে, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেন, এবং যখন তিনি ভগবানকে অথবা তাঁর পার্ষদদের প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন, তখনও তিনি এই মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে, তাঁদের প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের পরম প্রকৃতি। সঙ্কটে অথবা আনন্দে, উভয় অবস্থাতেই নির্বিঘ্নে তা কীর্তন করা যায়।

শ্লোক ২২

তং কৃষ্ণপাদাভিনিবিষ্টচেতসং
বদ্ধাঞ্জলিং প্রশ্রয়নম্রকন্ধরম্ ।
সুনন্দনন্দাবুপসৃত্য সস্মিতং
প্রত্যূচতুঃ পুষ্করনাভসম্মতৌ ॥ ২২ ॥

তম্—তাঁকে; **কৃষ্ণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পাদ**—শ্রীপাদপদ্ম; **অভিনিবিষ্ট**—মগ্ন হয়ে; **চেতসম্**—যাঁর হৃদয়; **বদ্ধ-অঞ্জলিম্**—হাতজোড় করে; **প্রশ্রয়**—অত্যন্ত বিনীতভাবে; **নম্র**—অবনত; **কন্ধরম্**—যাঁর গলা; **সুনন্দ**—সুনন্দ; **নন্দৌ**—এবং নন্দ; **উপসৃত্য**—কাছে এসে; **স-স্মিতম্**—সহাস্য বদনে; **প্রত্যূচতুঃ**—সম্বোধন করেছিলেন; **পুষ্কর-নাভ**—পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুর; **সম্মতৌ**—অন্তরঙ্গ সেবক।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণময় ছিল। যখন নন্দ এবং সুনন্দ নামক ভগবানের দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদ সহাস্য বদনে তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ হাতজোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে, বিনীতভাবে তাঁর মস্তক অবনত করেছিলেন। তাঁরা তখন তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পুষ্করনাভ-সম্মতৌ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণ বা বিষ্ণু তাঁর কমল-সদৃশ নয়ন, কমল-সদৃশ নাভি, কমল-সদৃশ পদ এবং কমল-সদৃশ হস্তের জন্য বিখ্যাত। এখানে তাঁকে *পুষ্কর-নাভ* বলা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'ভগবানের নাভি কমলের মতো,' এবং *সম্মতৌ* মানে হচ্ছে 'দুইজন অতি বিশ্বস্ত সেবক।' জড়-জাগতিক জীবনের সঙ্গে পারমার্থিক জীবনের পার্থক্য হচ্ছে, একটি জীবন ভগবানের অবাধ্যতার জীবন এবং অন্যটি ভগবানের ইচ্ছার আনুগত্যের জীবন। সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই ভগবানের আদেশ পালন করা, সেটিই হচ্ছে পূর্ণ একাত্মতা।

বৈকুণ্ঠলোকে সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে একাত্ম, কারণ তাঁরা কখনও ভগবানের আদেশ অমান্য করেন না। কিন্তু এই জড় জগতে তারা সম্মত নয়, পক্ষান্তরে তারা সর্বদাই অসম্মত । মনুষ্য-জীবন হচ্ছে ভগবানের আদেশের

সম্মত হওয়ার শিক্ষা লাভ করার একটি সুযোগ। সমাজে সেই শিক্ষা প্রদান করাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির নিয়ম অত্যন্ত কঠোর; প্রকৃতির সেই কঠোর নিয়ম কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হন, এবং তাঁর আদেশ পালনে সম্মত হন, তখন তিনি অনায়াসে সেই কঠোর নিয়ম অতিক্রম করতে পারেন। ধ্রুব মহারাজের এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আদেশের প্রতি সম্মত হওয়ার ফলে, ধ্রুব মহারাজ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল, সকলের পক্ষেই তা সম্ভব। ভগবদ্ভক্তিতে যিনি ঐকান্তিকভাবে যুক্ত, তিনি যথা সময়ে, মনুষ্য-জীবনের এই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ২৩

সুনন্দনন্দাবূচতুঃ

ভো ভো রাজন্ সুভদ্রং তে বাচং নোঽবহিতঃ শৃণু ।
যঃ পঞ্চবর্ষস্তপসা ভবান্‌দেবমতীতৃপৎ ॥ ২৩ ॥

সুনন্দ-নন্দৌ উচতুঃ—সুনন্দ এবং নন্দ বললেন; **ভোঃ ভোঃ রাজন্**—হে রাজন্; **সু-ভদ্রম্**—কল্যাণ হোক; **তে**—আপনার; **বাচম্**—বাণী; **নঃ**—আমাদের; **অবহিতঃ**—মনোযোগ সহকারে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **যঃ**—যিনি; **পঞ্চ-বর্ষ**—পাঁচ বছর বয়সে; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অতীতৃপৎ**—অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবানের দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদ নন্দ এবং সুনন্দ বললেন—হে রাজন! আপনার কল্যাণ হোক। আমরা যা বলব তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। আপনি যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়সের ছিলেন, তখন আপনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তার ফলে ভগবানকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল, তা সকলের পক্ষে সম্ভব। যে-কোন পাঁচ বছর বয়সের শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, এবং কৃষ্ণভাবনার উপলব্ধির

দ্বারা অচিরেই তার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত সারা পৃথিবী জুড়ে সেই শিক্ষার অভাব। শিশুদের পাঁচ বছর বয়স থেকেই সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের নেতাদের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। পাঁচ বছর বয়স থেকে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া শুরু করা যেতে পারে। তার ফলে সেই শিশুরা হিংস্র হবে না বা সমাজের অবাঞ্ছিত হবে না; পক্ষান্তরে, তারা সকলে ভগবানের ভক্ত হবে। তার ফলে আপনা থেকেই পৃথিবীর রূপ বদলে যাবে।

শ্লোক ২৪

তস্যাখিলজগদ্ধাতুরাবাং দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
পার্ষদাবিহ সম্প্রাপ্তৌ নেতুং ত্বাং ভগবৎপদম্ ॥ ২৪ ॥

তস্য—তাঁর; **অখিল**—সমগ্র; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **ধাতুঃ**—স্রষ্টা; **আবাম্**—আমরা; **দেবস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের, **শার্ঙ্গিণঃ**—যিনি শার্ঙ্গ নামক ধনুক ধারণ করেন; **পার্ষদৌ**—পার্ষদ; **ইহ**—এখন; **সম্প্রাপ্তৌ**—নিকটে এসেছি; **নেতুম্**—নিয়ে যাওয়ার জন্য; **ত্বাম্**—আপনি; **ভগবৎ-পদম্**—ভগবানের কাছে।

অনুবাদ

আমরা সমগ্র জগতের স্রষ্টা শার্ঙ্গ নামক ধনুক ধারণকারী ভগবানের প্রতিনিধি। আপনাকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়ে, আমরা এখানে এসেছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, কেবল তাঁর চিন্ময় লীলা (এই জড় জগতেই হোক অথবা চিন্ময় জগতেই হোক) অবগত হওয়ার ফলে, কেউ যখন জানতে পারেন, তিনি কে, তিনি কিভাবে আবির্ভূত হন এবং কিভাবে তিনি তাঁর কার্য করেন, তখন তিনি অচিরেই চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত ভগবানের এই প্রতিশ্রুতি ধ্রুব মহারাজের ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ধ্রুব মহারাজ সারা জীবন তপশ্চর্যার দ্বারা এবং কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা ভগবানকে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। এখন, তার ফলে ভগবানের দুইজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের সমভিব্যাহারে চিৎ-জগতে যাওয়ার উপযুক্ত হয়েছেন।

শ্লোক ২৫

সুদুর্জয়ং বিষ্ণুপদং জিতং ত্বয়া
যৎসূরয়োঽপ্রাপ্য বিচক্ষতে পরম্ ।
আতিষ্ঠ তচ্চন্দ্রদিবাকরাদয়ো
গ্রহর্ক্ষতারাঃ পরিযন্তি দক্ষিণম্ ॥ ২৫ ॥

সুদুর্জয়ম্—যা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন; **বিষ্ণু-পদম্**—বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোক; **জিতম্**—বিজিত হয়েছে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **যৎ**—যা; **সূরয়ঃ**—বড় বড় দেবতারা; **অপ্রাপ্য**—লাভ করতে না পেরে; **বিচক্ষতে**—কেবল দেখে; **পরম্**—পরম; **আতিষ্ঠ**—দয়া করে আসুন; **তৎ**—সেই; **চন্দ্র**—চন্দ্র; **দিব-আকর**—সূর্য; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **গ্রহ**—নবগ্রহ (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো); **ঋক্ষ-তারাঃ**—নক্ষত্র; **পরিযন্তি**—পরিক্রমা করে; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণ দিকে রেখে।

অনুবাদ

এই বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আপনার তপস্যার দ্বারা আপনি তা জয় করেছেন। মহান ঋষিগণ এবং দেবতাগণও সেই পদ প্রাপ্ত হন না। সেই পরম ধাম (বিষ্ণুলোক) কেবল দর্শন করার জন্য সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ঐ স্থানকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করে। আপনি আসুন, সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

তাৎপর্য

এই জড় জগতেও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং মনোধর্মী জ্ঞানীরা চিদাকাশে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা কখনও সেখানে যেতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা ভগবদ্ভক্ত কেবল চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে অবগতই হন না, তিনি বাস্তবিকপক্ষে সেখানে নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় জীবন যাপন করেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এতই শক্তিশালী যে, এই জীবন অবলম্বন করার ফলে এবং ভগবৎ প্রেম বিকশিত করার ফলে, যে-কোন ব্যক্তি অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। এখানে তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ। বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা চন্দ্রলোকে গিয়ে সেখানে বাস করতে না পারার ফলে নিরাশ হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে অন্যান্য গ্রহে ভ্রমণ করে চরমে ভগবদ্ধামে

ফিরে যান। ভগবদ্ভক্তদের অন্য কোন গ্রহ দর্শন করার আগ্রহ থাকে না, কিন্তু ভগবদ্ধামে যাওয়ার সময় তাঁরা সেই সমস্ত লোকগুলি দর্শন করেন, ঠিক যেমন ট্রেনে চড়ে দূর দেশে যাওয়ার সময় ছোট ছোট স্টেশনগুলি চোখে পড়ে।

শ্লোক ২৬

অনাস্থিতং তে পিতৃভিরন্যৈরপ্যঙ্গ কর্হিচিৎ ।
আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ২৬ ॥

অনাস্থিতম্—যা কখনও প্রাপ্ত হয়নি; **তে**—আপনার; **পিতৃভিঃ**—পূর্বপুরুষদের দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অপি**—এমন কি; **অঙ্গ**—হে ধ্রুব; **কর্হিচিৎ**—কোন সময়; **আতিষ্ঠ**—দয়া করে সেখানে এসে বাস করুন; **জগতাম্**—ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের দ্বারা; **বন্দ্যম্**—পূজ্য; **তৎ**—তা; **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর; **পরমম্**—পরম; **পদম্**—স্থান।

অনুবাদ

হে মহারাজ ধ্রুব! আপনার পূর্বপুরুষেরা অথবা অন্য কেউ সেই চিন্ময় লোক কখনও প্রাপ্ত হননি। সেই স্থান বিষ্ণুলোক নামে পরিচিত সর্বোচ্চ পদ, যেখানে শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং বাস করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা তা পূজিত হয়। দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন এবং সেখানে নিত্যকাল বাস করুন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন তপস্যা করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রপিতামহেরও স্বপ্নের অতীত পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন উত্তানপাদ, তাঁর পিতামহ ছিলেন মনু, এবং তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন ব্রহ্মা। সুতরাং ধ্রুব মহারাজ এমন একটি রাজ্য চেয়েছিলেন, যা ব্রহ্মার পদেরও ঊর্ধ্বে, এবং তিনি নারদ মুনিকে অনুরোধ করেছিলেন, সেই পদ প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ তাঁকে দিতে। বিষ্ণুপার্ষদেরা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, সেই বিষ্ণুলোক, যেখানে ভগবান শ্রীবিষ্ণু বাস করেন, তা কেবল তাঁর পূর্বপুরুষেরাই নন, এই ব্রহ্মাণ্ডের কেউই লাভ করতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে এই জড় জগতে সকলেই হয় কর্মী, নয় জ্ঞানী অথবা যোগী, শুদ্ধ ভক্ত প্রায় নেই বললেই চলে। বিষ্ণুলোক নামক চিন্ময় ধাম বিশেষ করে ভক্তদের জন্যই; কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগীদের জন্য নয়। মহান ঋষি এবং দেবতারা ব্রহ্মলোকেও প্রায় যেতে পারে না, এবং *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ

করা হয়েছে যে, ব্রহ্মলোক শাশ্বত স্থান নয়। ব্রহ্মার আয়ু এত দীর্ঘ যে, তাঁর জীবনের একদিনেরও আয়ু হিসাব করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও অন্য সমস্ত লোকের অধিবাসীদের মতো ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) বলা হয়েছে, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*—যাঁরা বিষ্ণুলোকে যান, তাঁরা ছাড়া সকলেরই জীবন জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির অধীন। ভগবান বলেছেন, *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*—"আমার সেই পরম ধামে একবার গেলে, সেখান থেকে আর ফিরে আসতে হয় না।" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/৬) ধ্রুব মহারাজকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, "আপনি আমাদের সঙ্গে সেই লোকে যাচ্ছেন, যেখান থেকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না।" জড় বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকে যাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না, কারণ সেই লোক তাদের কল্পনারও অতীত। জড়-জাগতিক হিসাবে, কেউ যদি আলোকের গতিতেও ভ্রমণ করে, তা হলে সর্বোচ্চ লোকে পৌঁছাতে তার চল্লিশ হাজার আলোকবর্ষ লাগবে। যান্ত্রিক উপায়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা, যা ধ্রুব মহারাজ অনুষ্ঠান করেছিলেন, কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গ্রহলোকগুলিতেই নয়, এই ব্রহ্মাণ্ডেরও অতীত বিষ্ণুলোকে যাওয়া যায়। *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* (Easy Journey to Other Planets) নামক একটি পুস্তিকায় আমরা তার রূপরেখা প্রস্তুত করেছি।

শ্লোক ২৭

এতদ্বিমানপ্রবরমুত্তমশ্লোকমৌলিনা ।
উপস্থাপিতমায়ুষ্মন্নধিরোঢুং ত্বমর্হসি ॥ ২৭ ॥

এতৎ—এই; **বিমান**—বিমান; **প্রবরম্**—অদ্বিতীয়; **উত্তমশ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবান; **মৌলিনা**—সমস্ত জীবের শিরোমণি; **উপস্থাপিতম্**—পাঠিয়েছেন; **আয়ুষ্মন্**—হে অমর; **অধিরোঢুম্**—আরোহণ করার জন্য; **ত্বম্**—আপনি; **অর্হসি**—যোগ্য।

অনুবাদ

হে অমর! এই অদ্বিতীয় বিমানটি ভগবান পাঠিয়েছেন, যাঁর স্তুতি উত্তমশ্লোকের দ্বারা করা হয় এবং যিনি সমস্ত জীবাত্মাদের শিরোমণি। আপনি এই বিমানে আরোহণের সম্পূর্ণ যোগ্য।

তাৎপর্য

জ্যোতির্গণনা অনুসারে, ধ্রুবনক্ষত্রের সঙ্গে শিশুমার নামক আর একটি নক্ষত্র রয়েছে, যেখানে এই জড় জগতের পালনকর্তা শ্রীবিষ্ণু বাস করেন। শিশুমার অথবা ধ্রুবলোকে বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেউ যেতে পারে না, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হবে। বিষ্ণু-পার্ষদেরা সেই বিশেষ বিমানটি ধ্রুব মহারাজের জন্য এনেছিলেন এবং তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, সেই বিমানটি ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিশেষভাবে তাঁর জন্য পাঠিয়েছিলেন।

বৈকুণ্ঠ-বিমান কোন যন্ত্রের দ্বারা চালিত হয় না। অন্তরীক্ষে বিচরণ করার তিনটি উপায় রয়েছে। তার একটি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান রয়েছে। তাকে বলা হয় *ক-পোত-বায়ু*। ক মানে 'অন্তরীক্ষ' এবং *পোত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যান'। দ্বিতীয়টিও হচ্ছে *কপোত-বায়ু*। *কপোত* মানে হচ্ছে 'পারাবত'। কপোতকে শিক্ষা দান করে অন্তরীক্ষে যাওয়া যায়। তৃতীয় পন্থাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাকে বলা হয় *আকাশ-পতন*। আকাশ-পতন পদ্ধতিটিও ভৌতিক। ঠিক যেমন মন কোন রকম যান্ত্রিক আয়োজন ব্যতীতই যে-কোন স্থানে উড়ে যেতে পারে। এই আকাশ-পতন পদ্ধতির ঊর্ধ্বে হচ্ছে বৈকুণ্ঠ পদ্ধতি, যা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। ধ্রুব মহারাজকে শিশুমারলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীবিষ্ণু যে বিমানটি পাঠিয়েছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় বিমান। জড় বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রকার যান দেখতে পায় না এবং তা যে কি করে আকাশে ওড়ে, তা কল্পনাও করতে পারে না। জড় বৈজ্ঞানিকদের চিদাকাশ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই, যদিও *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে (*পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যঃ*)।

শ্লোক ২৮

মৈত্রেয় উবাচ

নিশম্য বৈকুণ্ঠনিযোজ্যমুখ্যয়ো-
র্মধুচ্যুতং বাচমুরুক্রমপ্রিয়ঃ।
কৃতাভিষেকঃ কৃতনিত্যমঙ্গলো
মুনীন্ প্রণম্যাশিষমভ্যবাদয়ৎ ॥ ২৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বৈকুণ্ঠ**—ভগবানের; **নিযোজ্য**—পার্ষদদের; **মুখ্যয়োঃ**—প্রধান; **মধু-চ্যুতম্**—মধুস্রাব; **বাচম্**—বাণী;

উরুক্রম-প্রিয়ঃ—ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ধ্রুব মহারাজ; **কৃত-অভিষেকঃ**—পুণ্যস্নান করে; **কৃত**—অনুষ্ঠান করে; **নিত্য মঙ্গলঃ**—তাঁর দৈনন্দিন মঙ্গলজনক কর্তব্যসমূহ; **মুনীন্**—মুনিদের; **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **আশিষম্**—আশীর্বাদ; **অভ্যবাদয়ৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ধ্রুব মহারাজ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। বৈকুণ্ঠলোকের মুখ্য ভগবৎ পার্ষদদের সুমধুর বাণী শ্রবণ করে তিনি পুণ্য স্নান সমাপন করলেন, এবং উপযুক্ত আভরণে ভূষিত হয়ে, তাঁর নিত্য মাঙ্গলিক কৃত্য সম্পন্ন করেছিলেন। তার পর সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহর্ষিদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ এই জড় জগৎ ত্যাগ করে যাওয়ার সময়েও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে কত নিষ্ঠাবান ছিলেন তা দর্শনীয়। ভক্তিবিষয়ক কর্তব্য সম্পাদনে তিনি সর্বদা সতর্ক ছিলেন। প্রত্যেক ভক্তেরই কর্তব্য খুব সকালে উঠে স্নান করা এবং তিলকের দ্বারা অঙ্গ ভূষিত করা। কলিযুগে মানুষের পক্ষে স্বর্ণ এবং রত্নালঙ্কার সংগ্রহ করা প্রায় সম্ভব নয় বললেই চলে, কিন্তু শরীরের দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করা দেহ পবিত্র করার পর্যাপ্ত শুভ অলঙ্করণ। ধ্রুব মহারাজ সেই সময়ে বদরিকাশ্রমে ছিলেন, সেখানে আরও অন্যান্য অনেক মহর্ষিরাও ছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রেরিত বিমান যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, সেই কারণে তিনি গর্বিত হননি; একজন বিনীত বৈষ্ণবরূপে, ভগবানের মুখ্য বৈকুণ্ঠপার্ষদ কর্তৃক আনীত সেই বিমানে আরোহণ করার পূর্বে, তিনি সমস্ত ঋষিদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

পরীত্যাভ্যর্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৯ ॥

পরীত্য—প্রদক্ষিণ করে; **অভ্যর্চ্য**—পূজা করে; **ধিষ্ণ্য-অগ্র্যম্**—দিব্য বিমান; **পার্ষদৌ**—দুইজন ভগবৎ পার্ষদকে; **অভিবন্দ্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **চ**—ও; **ইয়েষ**—তিনি প্রযত্ন করেছিলেন; **তৎ**—সেই বিমান; **অধিষ্ঠাতুম্**—আরোহণ করতে; **বিভ্রৎ**—দেদীপ্যমান; **রূপম্**—তাঁর স্বরূপ; **হিরণ্ময়ম্**—স্বর্ণময়।

অনুবাদ

বিমানে আরোহণ করবার পূর্বে, ধ্রুব মহারাজ সেই বিমানটিকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন, এবং বিষ্ণু পার্ষদদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তখন তাঁর রূপ তপ্ত কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এইভাবে তিনি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ধামে বিমান, ভগবৎ পার্ষদ এবং ভগবান স্বয়ং সকলেই চিন্ময়। সেখানে কোন জড় কলুষ নেই। গুণগতভাবে সেখানে সব কিছুই এক। ভগবান বিষ্ণু যেমন পূজ্য, তাঁর পার্ষদ, তাঁর সামগ্রী, তাঁর বিমান, তাঁব ধাম, সব কিছুই পূজ্য, কাবণ বিষ্ণুর যা কিছু তা বিষ্ণুরই মতো। একজন শুদ্ধ বৈষ্ণবরূপে ধ্রুব মহারাজ সেই কথা ভালভাবেই জানতেন, এবং তিনি বিমানে আরোহণ করার পূর্বে, সেই বিমানকে এবং ভগবানের পার্ষদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং তাই তা তপ্ত-কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল. এইভাবে তিনিও বিষ্ণুলোকের অন্যান্য সামগ্রীর মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

মায়াবাদীরা কল্পনা করতে পারে না, বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কিভাবে এই একত্ব সম্ভব তাদের একত্বের ধারণায় কোন বৈচিত্র্য নেই। তাই তারা নির্বিশেষবাদী হয়ে গেছে। শিশুমার, বিষ্ণুলোক অথবা ধ্রুবলোক যেমন এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তেমনই এই জগতে বিষ্ণুমন্দিরও এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মন্দিরে যাওয়া মাত্রই আমাদের খুব ভালভাবে জানতে হবে যে, আমরা জড় জগৎ থেকে ভিন্ন স্থানে রয়েছি। মন্দিরে ভগবান বিষ্ণু, তাঁব সিংহাসন, তাঁর কক্ষ এবং মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য সমস্ত বস্তু, সবই চিন্ময়। সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই বলা হয় যে, বনে বাস করা সাত্ত্বিক, শহরে বাস করা রাজসিক, আর বেশ্যালয়, শুঁড়িখানা অথবা কসাইখানায় বাস করা হচ্ছে তামসিক; কিন্তু মন্দিরে বাস করার অর্থ হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোকে বাস কবা মন্দিরের প্রতিটি বস্তু বিষ্ণু বা কৃষ্ণেরই মতো পূজনীয়।

শ্লোক ৩০

তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্ ।
মৃত্যোর্মূর্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্ ॥ ৩০ ॥

তদা—তার পর; **উত্তানপদঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **দদর্শ**—দেখলেন; **অন্তকম্**—মূর্তিমান মৃত্যু; **আগতম্**—তাঁর কাছে এসেছে; **মৃত্যোঃ মূর্ধ্নি**—মৃত্যুর মস্তকে; **পদম্**—পা; **দত্ত্বা**—স্থাপন করে; **আরুরোহ**—আরোহণ করেছিলেন; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **গৃহম্**—একটি বিশাল গৃহসদৃশ বিমানটিতে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন সেই চিন্ময় বিমানটিতে আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, মূর্তিমান মৃত্যু তাঁর কাছে এসেছে। কিন্তু তাকে একেবারে গ্রাহ্য না করে, তিনি তার মস্তকে পা রেখে, সেই বিমানটিতে আরোহণ করেছিলেন, যা ছিল একটি বিশাল গৃহের মতো।

তাৎপর্য

একজন ভক্তের দেহত্যাগ এবং একজন অভক্তের দেহত্যাগকে এক বলে মনে করা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। ধ্রুব মহারাজ যখন সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, মূর্তিমান মৃত্যু তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু তাকে দেখে তিনি মোটেই ভয় পাননি। মৃত্যুও তাঁকে কোন রকম কষ্ট দেয়নি। পক্ষান্তরে ধ্রুব মহারাজ মৃত্যুর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, তার মস্তকে পদার্পণ করেছিলেন। অল্পজ্ঞ মানুষেরা ভক্তের মৃত্যু এবং অভক্তের মৃত্যুর যে কি পার্থক্য তা জানে না। এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যায়—একটি বিড়াল তার শাবকদের মুখে করে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যায়, আবার সেই মুখ দিয়ে সে একটি ইঁদুরকেও ধরে। আপাতদৃষ্টিতে, বিড়ালের ইঁদুর ধরা আর তার শাবকদের ধরা একই রকম বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিড়াল যখন তার মুখে ইঁদুর ধরে, তার অর্থ হচ্ছে ইঁদুরের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে যখন তার শাবকদের ধরে, তার ফলে শাবকদের আনন্দ হয়। ধ্রুব মহারাজ যখন বিমানে আরোহণ করেছিলেন, তখন তিনি মূর্তিমান মৃত্যুর আগমনের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, যে এসেছিল তাঁকে প্রণতি নিবেদন করার জন্য। মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করে তিনি সেই অতুলনীয় বিমানটিতে আরোহণ করেছিলেন, যাকে এখানে একটি বিশাল গৃহের মতো (*গৃহম্*) বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই রকম বহু দৃষ্টান্ত *শ্রীমদ্ভাগবতে* রয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে যে, কর্দম মুনি তাঁর পত্নী দেবহূতিকে নিয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করার জন্য একটি বিমান

সৃষ্টি করেছিলেন, যেটি ছিল একটি বিশাল নগরীর মতো এবং বহু প্রাসাদ, সরোবর ও উদ্যান সমন্বিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বড় বড় বিমান তৈরি করেছে, কিন্তু তাতে ঠাসাঠাসি করে যাত্রীদের নেওয়া হয়, যার ফলে সেই বিমানে চড়ার সময় যাত্রীরা নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করে।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা একটি জড় বিমানও ঠিকমতো তৈরি করতে পারেনি। কর্দম মুনি যে বিমান ব্যবহার করেছিলেন অথবা বিষ্ণুলোক থেকে যে বিমান এসেছিল, তার সঙ্গে তুলনা করতে হলে, তাদের এমন একটি বিমান তৈরি করতে হবে, যা একটি বড় শহরের মতো সরোবর, উদ্যান, ময়দান ইত্যাদি জীবনের সমস্ত সুবিধা-সমন্বিত। তাদের সেই বিমানটিকে অন্তরীক্ষে বিচরণে সক্ষম হতে হবে, এবং অন্য সমস্ত লোকে যেতে সক্ষম হতে হবে। তারা যদি এই রকম একটি বিমান তৈরি করতে পারে, তা হলে তাদের অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করার জন্য ইন্ধন নিতে অন্তরীক্ষ স্টেশনের প্রয়োজন হবে না। সেই বিমানে অন্তহীন ইন্ধন থাকবে অথবা বিষ্ণুলোক থেকে আগত বিমানের মতো ইন্ধন ছাড়াই উড়তে পারবে।

শ্লোক ৩১

তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গপণবাদয়ঃ ।
গন্ধর্বমুখ্যাঃ প্রজগুঃ পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ৩১ ॥

তদা—সেই সময়; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভিঃ; **নেদুঃ**—বাজতে লাগল; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **পণব**—পণব; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **গন্ধর্ব-মুখ্যাঃ**—গন্ধর্ব প্রধানেরা; **প্রজগুঃ**—গেয়েছিল; **পেতুঃ**—বর্ষণ করেছিল; **কুসুম**—ফুল; **বৃষ্টয়ঃ**—বৃষ্টির মতো।

অনুবাদ

তখন আকাশে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ও পণব বাজতে শুরু করেছিল, মুখ্য গন্ধর্বেরা গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং অন্যান্য দেবতারা ধ্রুব মহারাজের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

স চ স্বর্লোকমারোক্ষ্যন্ সুনীতিং জননীং ধ্রুবঃ ।
অন্বস্মরদগং হিত্বা দীনাং যাস্যে ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; **চ**—ও; **স্বঃ-লোকম্**—স্বর্গলোকে; **আরোক্ষ্যন্**—আরোহণ করার সময়; **সুনীতিম্**—সুনীতি; **জননীম্**—মাতাকে; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **অন্বস্মরৎ**—তৎক্ষণাৎ স্মরণ করেছিলেন; **অগম্**—লাভ করা কঠিন; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **দীনাম্**—দরিদ্র; **যাস্যে**—আমি যাব; **ত্রি-বিষ্টপম্**—বৈকুণ্ঠলোকে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ বিমানে আরোহণ করার পর, বিমান যখন ছাড়তে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর দুঃখিতা মাতা সুনীতির কথা স্মরণ করলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, "আমার দুঃখিনী জননীকে ফেলে রেখে, আমি কি করে বৈকুণ্ঠলোকে যাব?"

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর মাতা সুনীতির প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। সুনীতিই তাঁকে এই পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, যার ফলে আজ তিনি বিষ্ণুপার্ষদদের দ্বারা নীত হয়ে, বৈকুণ্ঠলোকে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তাঁর কথা স্মরণ করেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব মহারাজের মাতা সুনীতি ছিলেন তাঁর পথ-প্রদর্শক গুরু। এই প্রকার গুরুকে কখনও কখনও শিক্ষাগুরুও বলা হয়। যদিও নারদ মুনি ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু, কিন্তু তাঁর মাতা সুনীতিই তাঁকে প্রথমে ভগবানের কৃপা কিভাবে লাভ করতে হয়, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরুর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে যথাযথভাবে উপদেশ দেওয়া, এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে যথাযথভাবে গুরুর আদেশ পালন করা। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এবং সাধারণত শিক্ষাগুরুই পরবর্তী কালে দীক্ষাগুরু হন। সুনীতি কিন্তু একজন স্ত্রী হওয়ার ফলে, এবং বিশেষভাবে তাঁর মা হওয়ার ফলে, ধ্রুব মহারাজের দীক্ষাগুরু হতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। নারদ মুনিকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ তাঁর মায়ের কথা স্মরণ করেছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবান যে পরিকল্পনাই করেন, তা তৎক্ষণাৎ ফলপ্রসূ হয়। তেমনই, ভগবানের কৃপায় সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ভক্তও তাঁর বাসনা পূর্ণ করতে পারেন। ভগবান তাঁর নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করেন স্বতন্ত্রভাবে, কিন্তু ভক্ত তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করে। তাই ধ্রুব মহারাজ তাঁর মায়ের কথা স্মরণ করা মাত্রই, বিষ্ণুদূতেরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সুনীতি দেবীও

অন্য আর একটি বিমানে বৈকুণ্ঠলোকে যাচ্ছেন। ধ্রুব মহারাজ মনে করেছিলেন যে, তাঁর মাকে পিছনে ফেলে রেখে তিনি একলাই বৈকুণ্ঠলোকে যাচ্ছেন, যা মঙ্গলজনক হত না, কারণ তার ফলে লোকেরা তাঁর সমালোচনা করত যে, যেই মা তাঁকে এত কিছু দিয়েছিলেন, তাঁকে সঙ্গে করে না নিয়ে তিনি একলা বৈকুণ্ঠলোকে যাচ্ছেন। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ এও বিবেচনা করেছিলেন যে, তিনি তো পরমেশ্বর নন, তাই শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করতেন, তা হলেই তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হত। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তিনি ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন যে, তাঁর মাও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধ্রুব মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন; ভগবানের কৃপায়, তিনি ঠিক ভগবানের মতোই হন, এবং তার ফলে তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাঁর সেই ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়।

শ্লোক ৩৩

ইতি ব্যবসিতং তস্য ব্যবসায় সুরোত্তমৌ ।
দর্শয়ামাসতুর্দেবীং পুরো যানেন গচ্ছতীম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবসিতম্**—চিন্তন; **তস্য**—ধ্রুবের; **ব্যবসায়**—বুঝতে পেরে; **সুর-উত্তমৌ**—সেই দুইজন মুখ্য পার্ষদ; **দর্শয়াম্ আসতুঃ**—তাঁকে দেখিয়েছিলেন; **দেবীম্**—পূজনীয়া সুনীতি; **পুরঃ**—সম্মুখে; **যানেন**—বিমানের দ্বারা; **গচ্ছতীম্**—যাচ্ছেন।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকের দুই মহান ভগবৎ পার্ষদ নন্দ ও সুনন্দ ধ্রুব মহারাজের মনের কথা জানতে পেরে, তাঁকে দেখিয়েছিলেন যে, তাঁর মাতা সুনীতি অন্য আর একটি বিমানে তাঁর পুরোভাগে যাচ্ছেন।

তাৎপর্য

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষাগুরু অথবা দীক্ষাগুরুর কোন শিষ্য যদি ধ্রুব মহারাজের মতো নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তা হলে গুরুদেব অতটা উন্নত না হলেও তাঁর শিষ্য তাঁকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যেতে পারেন। যদিও সুনীতি ছিলেন ধ্রুব মহারাজের শিক্ষাগুরু, তবুও একজন স্ত্রী হওয়ার ফলে, তিনি

বনে যেতে পারেননি, এমন কি তিনি ধ্রুব মহারাজের মতো তপস্যাও করতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ধ্রুব মহারাজ তাঁর মাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তেমনই, প্রহ্লাদ মহাবাজও তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুকে উদ্ধার করেছিলেন। মূল কথা হচ্ছে যে, শিষ্য অথবা সন্তান যদি মহান ভক্ত হন, তা হলে তিনি তাঁর পিতা, মাতা অথবা শিক্ষা অথবা দীক্ষাগুরুকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যেতে পারেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুব বলতেন, "আমি যদি একজন আত্মাকেও ভগবদ্ধামে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে আমি মনে করব যে, আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।" কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আজ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসার লাভ করছে, এবং কখনও কখনও আমার মনে হয় যে, যদিও আমি নানা দিক দিয়ে পঙ্গু, কিন্তু আমার একজন শিষ্যও যদি ধ্রুব মহারাজের মতো শক্তিশালী হয়, তা হলে সে আমাকে বৈকুণ্ঠলোকে বহন করে নিয়ে যেতে পারবে।

শ্লোক ৩৪

তত্র তত্র প্রশংসদ্ভিঃ পথি বৈমানিকৈঃ সুরৈঃ ।
অবকীর্যমাণো দদৃশে কুসুমৈঃ ক্রমশো গ্রহান্ ॥ ৩৪ ॥

তত্র তত্র—ইতস্তত; **প্রশংসদ্ভিঃ**—ধ্রুব মহারাজের প্রশংসাকারী ব্যক্তিদের দ্বারা; **পথি**—পথে; **বৈমানিকৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার বিমান দ্বারা বাহিত; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **অবকীর্যমাণঃ**—আচ্ছাদিত হয়ে; **দদৃশে**—দেখতে পেলেন; **কুসুমৈঃ**—ফুলের দ্বারা; **ক্রমশঃ**—একে একে; **গ্রহান্**—সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ।

অনুবাদ

অন্তরীক্ষ দিয়ে যাওয়ার সময়, ধ্রুব মহারাজ ক্রমশ সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহগুলি দেখতে পেলেন, এবং পথে তাঁর উপর পুষ্প-বর্ষণকারী ও বিভিন্ন বিমানে বিচরণকারী সমস্ত দেবতাদের দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

একটি বৈদিক উক্তি আছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে জানার ফলে, ভক্ত সব কিছু জানতে পারেন। তেমনই, ভগবদ্ধামে যাওয়ার ফলে, বৈকুণ্ঠলোকের পথে অবস্থিত অন্য সমস্ত লোকের সম্বন্ধেও জানা হয়ে যায়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ধ্রুব মহারাজের দেহ আমাদের দেহ থেকে ভিন্ন। বৈকুণ্ঠ বিমানে আরোহণ করার সময়, তাঁর দেহ

সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় সুবর্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কেউই জড় দেহ নিয়ে উচ্চতর লোকগুলি অতিক্রম করতে পারে না, কিন্তু চিন্ময় দেহ লাভ হলে, এই জড় জগতের উচ্চতর লোকেই কেবল যাওয়া যায় না, এই জগতের অতীত বৈকুণ্ঠলোকেও যাওয়া যায়। নারদ মুনি যে জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন, সেই কথা সুবিদিত।

এই কথাও মনে রাখা উচিত যে, সুনীতি যখন বৈকুণ্ঠলোকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর দেহও চিন্ময় স্বরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল। শ্রীসুনীতি দেবীর মতো প্রত্যেক মায়ের কর্তব্য হচ্ছে, তাঁর সন্তানদের ধ্রুব মহারাজের মতো ভক্ত হতে শিক্ষা দেওয়া। সুনীতি দেবী পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর পুত্রকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হতে এবং বনে গিয়ে ভগবানের অন্বেষণ করতে। তিনি কখনও বাসনা করেননি যে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তপশ্চর্যা না করে, তাঁর পুত্র আরামে গৃহে থাকুক। সুনীতি দেবীর মতো প্রত্যেক মায়ের কর্তব্য পুত্রের যথার্থ মঙ্গল বিবেচনা করে, পাঁচ বছর বয়স থেকেই তাকে ব্রহ্মচারী হওয়ার এবং পারমার্থিক উপলব্ধির জন্য তপস্যা করার শিক্ষা দেওয়া তার ফলে লাভ এই হবে যে, পুত্র যদি ধ্রুব মহারাজের মতো একজন ভক্ত হতে পারে, তা হলে কেবল সে ই ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে না, তার সঙ্গে তিনিও চিৎ-জগতে ফিরে যেতে পারবেন, যদিও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে তিনি কোন রকম তপস্যা করতে সক্ষম নাও হন।

শ্লোক ৩৫

ত্রিলোকীং দেবযানেন সোঽতিব্রজ্য মুনীনপি ।
পরস্তাদ্যদ্ ধ্রুবগতির্বিষ্ণোঃ পদমথাভ্যগাৎ ॥ ৩৫ ॥

ত্রি-লোকীম্—ত্রিভুবন; **দেব-যানেন**—দিব্য বিমানে; **সঃ**—ধ্রুব; **অতিব্রজ্য**—অতিক্রম করে; **মুনীন্**—মহর্ষিদের; **অপি**—ও; **পরস্তাৎ**—অতীত; **যৎ**—যা; **ধ্রুব-গতিঃ**—ধ্রুব, যিনি নিত্য জীবন লাভ করেছিলেন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পদম্**—ধাম; **অথ**—তার পর; **অভ্যগাৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ধ্রুব মহারাজ সপ্তর্ষিমণ্ডল অতিক্রম করেছিলেন। সেই স্থানের উর্ধ্ব লোকে তিনি শাশ্বত চিন্ময় পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেখানে শ্রীবিষ্ণু বাস করেন।

তাৎপর্য

সেই বিমানটি চালাচ্ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুইজন মুখ্য পার্ষদ সুনন্দ এবং নন্দ। এই প্রকার চিন্ময় মহাকাশচারীরাই কেবল সপ্তর্ষিমণ্ডলের উর্ধ্বে নিত্য আনন্দময়লোকে তাঁদের বিমান চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে *(পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যঃ)*, অর্থাৎ এই জগতের উর্ধ্বে রয়েছে চিদাকাশ, যেখানে সব কিছুই নিত্য এবং আনন্দময়। সেখানকার গ্রহগুলিকে বলা হয় বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোক। সেখানেই কেবল নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় জীবন লাভ করা যায়। বৈকুণ্ঠলোকের নিম্নে জড় ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মালোকের অন্যান্য অধিবাসীরা ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় না হওয়া পর্যন্ত বাস করেন; কিন্তু তাঁদের জীবনও নিত্য নয়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *(আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ)*। কেউ যদি এই জগতের সর্বোচ্চ লোকেও যায়, তবুও সে নিত্য জীবন লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়ার ফলেই নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৬

যদ্ ভ্রাজমানং স্বরুচৈব সর্বতো
লোকাস্ত্রয়ো হ্যনু বিভ্রাজন্ত এতে ।
যন্নাব্রজঞ্জন্তুষু যেঽননুগ্রহা
ব্রজন্তি ভদ্রাণি চরন্তি যেঽনিশম্ ॥ ৩৬ ॥

যৎ—যেই লোক; **ভ্রাজমানম্**—জ্যোতির্ময়; **স্ব-রুচা**—স্বীয় জ্যোতির দ্বারা; **এব**—মাত্র; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **লোকাঃ**—গ্রহলোকমণ্ডলী; **ত্রয়ঃ**—তিন; **হি**—অবশ্যই; **অনু**—ফলেই; **বিভ্রাজন্তে**—জ্যোতি প্রতিফলিত হয়; **এতে**—এই সমস্ত; **যৎ**—যেই লোক; **ন**—না; **অব্রজন্**—পৌঁছেছেন; **জন্তুষু**—জীবাত্মাদের; **যে**—যারা; **অননুগ্রহাঃ**—কৃপালু নয়; **ব্রজন্তি**—যায়; **ভদ্রাণি**—শুভ কার্য; **চরন্তি**—প্রবৃত্ত হয়; **যে**—যারা; **অনিশম্**—নিরন্তর।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোক স্বীয় জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত। এই জড় জগতের উজ্জ্বল লোকসমূহ সেই জ্যোতির প্রতিফলনের ফলেই উজ্জ্বল হয়। যারা অন্যান্য জীবের প্রতি

কৃপাপরবশ নয়, তারা কখনও সেই লোকে যেতে পারে না। যাঁরা নিরন্তর জীবের কল্যাণজনক কার্যকলাপে যুক্ত, তাঁরাই সেই বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন।

তাৎপর্য

এখানে বৈকুণ্ঠলোকের দুটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, বৈকুণ্ঠ-আকাশে সূর্য এবং চন্দ্রের কোন প্রয়োজন নেই। সেই কথা উপনিষদ এবং *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে *(ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ)*। চিৎ-জগতে বৈকুণ্ঠলোকগুলি স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত; তাই সেখানে সূর্য, চন্দ্র, অথবা বৈদ্যুতিক আলোকের কোন প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে, বৈকুণ্ঠলোকের জ্যোতিই জড় আকাশে প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনের দ্বারাই জড় ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য জ্যোতির্ময় হয়েছে; এবং সূর্যের জ্যোতি থেকে চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি জ্যোতির্ময় হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, জড় আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্কগুলি বৈকুণ্ঠলোকের জ্যোতি ধার করেছে। এই জড় জগৎ থেকে কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়া যায়, যদি তারা অন্য সমস্ত জীবের কল্যাণকর কার্যকলাপে নিরন্তর যুক্ত থাকে। এই প্রকার নিরন্তর কল্যাণকর কার্যকলাপ কেবল কৃষ্ণভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারাই সম্ভব। এই জড় জগতে কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর কোন পরোপকারের কার্য নেই, যাতে মানুষ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই যুক্ত থাকতে পারে।

কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই পরিকল্পনা করেন কিভাবে সমস্ত দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষদের তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে আনা যায়। এমন কি কেউ যদি সমস্ত অধঃপতিত জীবেদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারেন, তবুও যেহেতু তিনি কৃষ্ণভাবনাময়, তাই তাঁর জন্য বৈকুণ্ঠলোকের দ্বার উন্মুক্ত। তিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার যোগ্য হন, এবং কেউ যদি এই প্রকার ভক্তকে অনুসরণ করেন, তা হলে তিনিও বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন। আর অন্য যারা ঈর্ষাপরায়ণ কার্যকলাপে যুক্ত, তাদের বলা হয় কর্মী। কর্মীরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। কেবল তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তারা হাজার হাজার নিরীহ পশুকে হত্যা করতে পারে। জ্ঞানীরা কর্মীদের মতো পাপী নয়, কিন্তু তারা অন্যদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না। তারা কেবল নিজেদের মুক্তির জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে। যোগীরাও যোগসিদ্ধি লাভের চেষ্টা করে নিজেদেরই প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব, যাঁরা ভগবানের সেবক, তাঁরা কৃষ্ণভক্তির প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন পতিত জীবেদের উদ্ধার করার জন্য। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিই কেবল চিৎ-জগতে প্রবেশ করার যোগ্য। সেই কথা এই

শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন যে, *ভগবদ্গীতার* বাণী যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করেন, তাঁরাই হচ্ছেন তাঁর কাছে সব চাইতে প্রিয়

শ্লোক ৩৭

শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্বভূতানুরঞ্জনাঃ ।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবা ॥ ৩৭ ॥

শান্তাঃ—শান্ত; **সম-দৃশঃ**—সমদর্শী; **শুদ্ধাঃ**—পবিত্র; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূত**—জীব, **অনুরঞ্জনাঃ**—প্রসন্নতা প্রদানকারী; **যান্তি**—যায়; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **অচ্যুত**—ভগবানের; **পদম্**—ধামে; **অচ্যুত-প্রিয়**—ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গে; **বান্ধবাঃ**—বন্ধু

অনুবাদ

যাঁরা শান্ত, সমদর্শী, নির্মল ও পবিত্র, এবং যাঁরা অন্য সমস্ত জীবেদের কিভাবে প্রসন্নতা বিধান করতে হয় তা জানেন, তাঁরা ভগবদ্ভক্তদের বন্ধু; তাঁরাই কেবল অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বর্ণনাটি পূর্ণরূপে ইঙ্গিত করে যে, ভগবদ্ভক্তরাই কেবল ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্য। এখানে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তরা শান্ত, কারণ তাঁদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। তাঁরা কেবল ভগবানের সেবায় ঐকান্তিকভাবে যুক্ত। কর্মীরা শান্ত হতে পারে না, কারণ তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। জ্ঞানীরাও শান্ত হতে পারে না, কারণ তারা ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে মুক্তি লাভের চেষ্টায় অত্যন্ত ব্যস্ত। তেমনই যোগীরাও যোগসিদ্ধি লাভের বাসনায় অশান্ত। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত শান্ত কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত এবং তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বলে মনে করেন। একটি শিশু যেমন তার পিতা-মাতার উপর নির্ভর করে পূর্ণ শান্তি অনুভব করে, তেমনই ভগবদ্ভক্তও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করার ফলে সম্পূর্ণরূপে শান্ত।

ভক্ত সমদর্শী। তিনি সকলকেই চিন্ময় স্তরে দর্শন করেন। ভক্ত জানেন যে, যদিও বদ্ধ জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে একটি বিশেষ প্রকার শরীর লাভ করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভক্ত সমস্ত

জীবকে সেই চিন্ময় দৃষ্টিতে দর্শন করেন এবং দেহাত্মবুদ্ধির স্তরে ভেদ দর্শন করেন না। এই সমস্ত গুণাবলীর বিকাশ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল সম্ভব। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত, কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করা যায় না। তাই, আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্থায় যিনি বাস করেন, তাঁরই কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হয়। ভক্তরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, এবং ভগবানও ভক্তদের প্রিয়। সেই স্তরেই কেবল কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করা যায়। যারা কৃষ্ণভাবনাময় অথবা কৃষ্ণভক্ত, তাঁরা সকলেরই প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন, যা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আমরা কোন রকম পক্ষপাতিত্ব না করে, সকলকেই নিমন্ত্রণ জানাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে এবং যত ইচ্ছা প্রসাদ খেতে, এবং তার ফলে সকলেই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়। এটিই হচ্ছে যোগ্যতা। *সর্ব ভূতানুরঞ্জনাঃ*। পবিত্রতার ব্যাপারে কেউই ভক্তের থেকে অধিক পবিত্র হতে পারে না। একবার যিনি বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করেন, তিনি অন্তরে এবং বাইরে পবিত্র হয়ে যান *(যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষম্)*। ভক্ত যেহেতু নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, সেই জন্য কোন জড় কলুষ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে পবিত্র। *মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে*। বলা হয় যে, একটি মুচি অথবা যাঁর মুচিকুলে জন্ম হয়েছে, তিনি যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি ব্রাহ্মণের (শুচি) স্তরে উন্নীত হতে পারেন। যে ব্যক্তি শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় এবং যিনি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করেন, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিশুদ্ধতম।

শ্লোক ৩৮

ইত্যুত্তানপদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ ।
অভূৎত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **উত্তানপদঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **কৃষ্ণ-পরায়ণঃ**—পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **ত্রয়াণাম্**—তিনের; **লোকানাম্**—লোকের; **চূড়া-মণি**—শ্রেষ্ঠ রত্ন; **ইব**—সদৃশ; **অমলঃ**—পবিত্র।

অনুবাদ

এইভাবে মহারাজ উত্তানপাদের অত্যন্ত মহিমান্বিত পুত্র, ধ্রুব মহারাজ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ত্রিলোকের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় শব্দটির সঠিক সংস্কৃত প্রতিশব্দ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—*কৃষ্ণপরায়ণঃ*। *পরায়ণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অগ্রসর হওয়া'। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছেন, তাঁকে বলা হয় কৃষ্ণপরায়ণ বা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়। ধ্রুব মহারাজের দৃষ্টান্তটি সূচিত করে যে, প্রত্যেক কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিলোকের শীর্ষে পৌঁছাতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত এমন একটি উচ্চপদ প্রাপ্ত হতে পারেন, যা যে-কোন উচ্চাভিলাষী জড় ব্যক্তির কল্পনারও অতীত।

শ্লোক ৩৯

গম্ভীরবেগোঽনিমিষং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্ ।
যস্মিন্ ভ্রমতি কৌরব্য মেঢ্যামিব গবাং গণঃ ॥ ৩৯ ॥

গম্ভীর-বেগঃ—প্রবল বেগে; **অনিমিষম্**—নিরন্তর; **জ্যোতিষাম্**—জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর; **চক্রম্**—চক্র; **আহিতম্**—যুক্ত; **যস্মিন্**—যার চতুর্দিকে; **ভ্রমতি**—আবর্তন করে; **কৌরব্য**—হে বিদুর; **মেঢ্যাম্**—মেঢদণ্ড; **ইব**—সদৃশ; **গবাম্**—বলীবর্দের; **গণঃ**—সমূহ।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে কুরুনন্দন বিদুর। বলীবর্দ যেমন মেঢদণ্ডের চারপাশে পরিভ্রমণ করে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্যোতিষ্ক ঠিক সেইভাবে প্রবলবেগে ধ্রুব মহারাজের ধামকে প্রদক্ষিণ করছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্রহ অতি প্রবলবেগে ভ্রমণ করছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একটি বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সূর্য সেকেণ্ডে ষোল হাজার মাইল বেগে ভ্রমণ করছে, এবং *ব্রহ্মসংহিতার যচ্চক্ষুরেষা সবিতা সকলগ্রহাণাম্* শ্লোকটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সূর্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের চক্ষু, এবং তার একটি বিশেষ কক্ষপথ রয়েছে, যার উপর সূর্য পরিভ্রমণ করে। তেমনই, অন্য সমস্ত গ্রহেরও বিশেষ বিশেষ কক্ষপথ রয়েছে। কিন্তু তারা সকলেই এই ত্রিলোকের শিরোমণি স্বরূপ ধ্রুব মহারাজের স্থান ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করছে। ভগবদ্ভক্তের প্রকৃত স্থিতি যে কত উঁচু তা আমরা কেবল কল্পনাই করতে পারি, এবং ভগবানের পদ যে কত উঁচু তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

শ্লোক ৪০

মহিমানং বিলোক্যাস্য নারদো ভগবানৃষিঃ ।
আতোদ্যং বিতুদঞ্ শ্লোকান্ সত্রেঽগায়ৎপ্রচেতসাম্ ॥ ৪০ ॥

মহিমানম্—মহিমা; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **অস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **নারদঃ**—মহর্ষি নারদ, **ভগবান্**—যিনি ভগবানেরই মতো মহিমান্বিত, **ঋষিঃ**—মহাত্মা; **আতোদ্যম্**—বীণা, **বিতুদন্**—বাজিয়ে; **শ্লোকান্**—শ্লোক; **সত্রে**—যজ্ঞস্থলে; **অগায়ৎ**—গেয়েছিলেন; **প্রচেতসাম্**—প্রচেতাদের।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের মহিমা দর্শন করে, নারদ মুনি তাঁর বীণা বাজিয়ে প্রচেতাদের যজ্ঞে মহা আনন্দে পরবর্তী তিনটি শ্লোক গেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদ ছিলেন ধ্রুব মহারাজের গুরুদেব ধ্রুব মহারাজের মহিমা দর্শন করে তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। পিতা যেমন সর্বতোভাবে পুত্রের উন্নতি দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হন, তেমনই গুরুদেব তাঁর শিষ্যের উন্নতি দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

শ্লোক ৪১

নারদ উবাচ

নূনং সুনীতেঃ পতিদেবতায়া-
স্তপঃপ্রভাবস্য সুতস্য তাং গতিম্ ।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ানপি বেদবাদিনো
নৈবাধিগন্তুং প্রভবন্তি কিং নৃপাঃ ॥ ৪১ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **সুনীতেঃ**—সুনীতির; **পতি-দেবতায়াঃ**—অত্যন্ত পতিব্রতা; **তপঃ-প্রভাবস্য**—তপস্যার প্রভাবে; **সুতস্য**—পুত্রের; **তাম্**—সেই; **গতিম্**—স্থিতি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অভ্যুপায়ান্**—উপায়; **অপি**—যদিও; **বেদ-বাদিনঃ**—বেদের কঠোর অনুগামীগণ, বা তথাকথিত বৈদান্তিকগণ; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অধিগন্তুম্**—প্রাপ্ত হতে পারে; **প্রভবন্তি**—যোগ্য; **কিম্**—কি বলার আছে; **নৃপাঃ**—সাধারণ রাজাগণ।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—পতিব্রতা সুনীতির পুত্র ধ্রুব মহারাজ তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রভাবে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী তপস্যার প্রভাবে, এমন এক উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা বেদান্তবিদ ব্রহ্মবাদীরাও লাভ করতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ মানুষের আর কি কথা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বেদ-বাদিনঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত যারা নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ পালন করে, তাদের বলা হয় *বেদবাদী*। তথাকথিত বহু বৈদান্তিক রয়েছে, যারা বেদান্ত-দর্শনের অনুগামী বলে নিজেদের প্রচার করে, কিন্তু বেদান্তের ভ্রান্ত অর্থ করে। যারা বেদের অর্থ না বুঝে বেদের প্রতি আসক্ত, *ভগবদ্‌গীতায়ও* তাদের *বেদ-বাদরতাঃ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই প্রকার ব্যক্তিরা বেদ সম্বন্ধে কথা বলতে পারে অথবা তাদের নিজেদের মনগড়া পন্থায় তপশ্চর্যা অনুষ্ঠান করতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে ধ্রুব মহারাজের মতো এক অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ রাজাদের পক্ষে তা একেবারেই সম্ভব নয়। এখানে রাজাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা পূর্বে রাজারাও রাজর্ষি হতেন। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন রাজা, এবং সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন মহর্ষির মতো বিদ্বান। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত, কোন মহান রাজা, কোন ক্ষত্রিয়, এমন কি বৈদিক অনুশাসনের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুশীলনকারী মহান ব্রাহ্মণও ধ্রুব মহারাজের মতো উচ্চ পদ লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৪২

যঃ পঞ্চবর্ষো গুরুদারবাক্‌শরৈ-
র্ভিন্নেন যাতো হৃদয়েন দূয়তা ।
বনং মদাদেশকরোঽজিতং প্রভুং
জিগায় তদ্ভক্তগুণৈঃ পরাজিতম্ ॥ ৪২ ॥

যঃ—যিনি; **পঞ্চ-বর্ষঃ**—পাঁচ বছর বয়সে; **গুরু-দার**—পিতৃ-পত্নীর; **বাক্‌-শরৈঃ**—বাক্যরূপ বাণের দ্বারা; **ভিন্নেন**—অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে; **যাতঃ**—গিয়েছিলেন; **হৃদয়েন**—কারণ তাঁর হৃদয়; **দূয়তা**—অত্যন্ত দুঃখিত; **বনম্**—বনে; **মৎ-আদেশ**—

আমার নির্দেশ অনুসারে; **করঃ**—কার্য করে; **অজিতম্**—অজেয়; **প্রভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **জিগায়**—পরাস্ত করেছিলেন; **তৎ**—তাঁর; **ভক্ত**—ভক্তদের; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **পরাজিতম্**—পরাজিত

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—দেখ, কিভাবে ধ্রুব মহারাজ তার বিমাতার বাক্যবাণে মর্মাহত হয়ে, কেবল পাঁচ বছর বয়সে বনে গিয়েছিল এবং আমার নির্দেশে তপস্যা করেছিল। ভগবান যদিও অজেয়, তবুও ধ্রুব মহারাজ ভক্তোচিত বিশেষ গুণাবলীর দ্বারা তাঁকে পরাস্ত করেছিল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান অজিত; কেউই তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর ভক্তের গুণাবলীর দ্বারা তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, কারণ মা যশোদা ছিলেন একজন মহান ভক্ত। ভগবান তাঁর ভক্তের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকতে চান। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, সকলেই ভগবানের কাছে এসে স্তবস্তুতি করেন, কিন্তু ভগবান তাতে ততটা প্রসন্ন হন না, যেমন হন শুদ্ধ ভক্তিসহকারে তাঁর ভক্ত যখন তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। ভগবান তাঁর পরম পদের কথা ভুলে গিয়ে, স্বেচ্ছায়, তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। ধ্রুব মহারাজ ভগবানকে জয় করেছিলেন, কারণ তিনি পাঁচ বছর বয়সেই ভক্তির সর্বপ্রকার কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই ভক্তি অবশ্য দেবর্ষি নারদের নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়েছিল। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির প্রথম সোপান—*আদৌ গুর্বাশ্রয়ম্*। প্রথমেই সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, এবং ভক্ত যদি নিষ্ঠাসহকারে গুরুদেবের নির্দেশ পালন করেন, যেমন ধ্রুব মহারাজ নারদ মুনির নির্দেশ পালন করেছিলেন, তা হলে ভগবানের কৃপা লাভ করা কঠিন হয় না।

ভগবদ্ভক্তির সমস্ত গুণাবলীর সমন্বয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম বিকশিত করা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই বিশুদ্ধ প্রেম কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার মাধ্যমে লাভ করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকার করেছেন যে, কেউ যদি যে-কোন অবস্থাতেই বিনীতভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় বাণী অথবা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় চিন্ময় বাণী শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধ প্রেম লাভ করবেন, এবং সেই প্রেমের দ্বারাই কেবল অজিতকে জয় করা যায়। মায়াবাদীরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে

যেতে চায়, কিন্তু ভক্তরা সেই স্তরও অতিক্রম করে। ভক্তরা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে কেবল একই হন না, উপরন্তু তিনি কখনও কখনও পিতা, মাতা অথবা প্রভু হন। অর্জুনও তাঁর ভক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর রথের সারথি করেছিলেন; তিনি ভগবানকে আদেশ দিয়েছিলেন, "এখানে আমার রথ রাখ," এবং ভগবান তাঁর সেই আদেশ পালন করেছিলেন। ভক্ত যে কিভাবে অজিত ভগবানকে জয় করতে পারেন, এইগুলি তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৪৩

যঃ ক্ষত্রবন্ধুর্ভুবি তস্যাধিরূঢ়-
মন্বারুরুক্ষেদপি বর্ষপূগৈঃ ।
ষট্‌পঞ্চবর্ষো যদহোভিরল্পৈঃ
প্রসাদ্য বৈকুণ্ঠমবাপ তৎপদম্ ॥ ৪৩ ॥

যঃ—যিনি; **ক্ষত্র-বন্ধুঃ**—ক্ষত্রিয়পুত্র; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **তস্য**—ধ্রুবের; **অধিরূঢ়ম্**—অতি উন্নত পদ; **অনু**—পশ্চাৎ; **আরুরুক্ষেৎ**—লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে; **অপি**—সত্ত্বেও; **বর্ষ-পূগৈঃ**—বহু বছর; **ষট্-পঞ্চ-বর্ষঃ**—পাঁচ অথবা ছয় বছর বয়স্ক; **যৎ**—যা; **অহোভিঃ অল্পৈঃ**—কয়েক দিন পরে; **প্রসাদ্য**—প্রসন্ন করে; **বৈকুণ্ঠম্**—ভগবান; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **তৎ-পদম্**—তাঁর ধাম।

অনুবাদ

ছয় মাস ধরে কঠোর তপস্যা করার পর, ধ্রুব মহারাজ পাঁচ অথবা ছয় বছর বয়সে অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আহা! কোন মহান ক্ষত্রিয় বহু বহু বছর ধরে তপস্যা করার পরেও এই পদ লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে ধ্রুব মহারাজকে *ক্ষত্র-বন্ধুঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি পূর্ণরূপে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কেননা তাঁর বয়স তখন ছিল কেবলমাত্র পাঁচ বছর; তিনি পরিণত বয়স্ক ক্ষত্রিয় ছিলেন না। ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই তৎক্ষণাৎ কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে যায় না; তাকে শিক্ষা এবং সংস্কার গ্রহণ করতে হয়।

ধ্রুব মহারাজের মতো শিষ্যের গর্বে নারদ মুনি অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। তাঁর অন্য বহু শিষ্য ছিল, কিন্তু তিনি ধ্রুব মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন, কারণ তিনি এক জন্মেই, তাঁর কঠোর তপস্যার দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা সারা ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোন রাজপুত্র বা রাজর্ষি কখনও প্রাপ্ত হননি মহারাজ ভরতের দৃষ্টান্ত রয়েছে, যিনি ছিলেন ভগবানের আর একজন মহান ভক্ত, কিন্তু তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন তিন জন্মে প্রথম জন্মে যদিও তিনি বনে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন, তবুও তিনি একটি হরিণ শিশুর স্নেহে এত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁকে পরবর্তী জীবনে একটি হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। যদিও তিনি হরিণ শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন জাতিস্মর এবং তাঁর আধ্যাত্মিক পদের কথা তাঁর স্মরণ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে সিদ্ধি লাভের জন্য আর একটি জীবনের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি জড় ভরতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জীবনে অবশ্য তিনি সমস্ত জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি সিদ্ধি লাভ করে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজের জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, কেউ যদি চায়, তা হলে বহু জন্মের প্রতীক্ষা না করে, এক জন্মেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার গুরু মহারাজ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলতেন যে, তাঁর প্রতিটি শিষ্যই অন্য জন্মে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রতীক্ষা না করে, এই জন্মেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হতে পারেন মানুষকে কেবল ধ্রুব মহারাজের মতো নিষ্ঠাপরায়ণ এবং ঐকান্তিক হতে হয়, তা হলে এক জন্মেই ভগবদ্ধাম বা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

শ্লোক ৪৪

মৈত্রেয় উবাচ

এতত্তেঽভিহিতং সর্বং যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ।
ধ্রুবস্যোদ্দামযশসশ্চরিতং সম্মতং সতাম্ ॥ ৪৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এতৎ**—এই; **তে**—তোমাকে; **অভিহিতম্**—বর্ণনা করেছি; **সর্বম্**—সব কিছু; **যৎ**—যা; **পৃষ্টঃ অহম্**—আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; **ইহ**—এখানে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **উদ্দাম**—উৎকর্ষ প্রদানকারী; **যশসঃ**—যাঁর খ্যাতি; **চরিতম্**—চরিত্র; **সম্মতম্**—স্বীকৃত; **সতাম্**—মহান ভক্তদের দ্বারা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের মহান যশ এবং চরিত্র সম্বন্ধে তুমি যা কিছু প্রশ্ন আমাকে করেছিলে, আমি সবিস্তারে তা বর্ণনা করেছি। মহাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তেরা ধ্রুব মহারাজের বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহবোধ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ হচ্ছে ভগবান সম্পর্কীয় সব কিছু। ভগবানের লীলা এবং কার্যকলাপ অথবা ভগবানের ভক্তের চরিত্র, যশ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা যা কিছু শুনি, তা সবই এক এবং অভিন্ন। কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তরা ভগবানের লীলা শ্রবণ করতে চায় এবং তারা ভগবানের ভক্তের কার্যকলাপ শ্রবণে ততটা আগ্রহী নয়, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কখনও এই প্রকার ভেদ দর্শন করেন না। কখনও কখনও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যান্য অংশের কথা শ্রবণ না করে, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করতে চায়। পেশাদারি ভাগবত পাঠক রয়েছে, যারা সরাসরিভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* রাসলীলা বর্ণনা করতে শুরু করে, যেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যান্য অধ্যায়গুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন। এই প্রকার ভেদ দর্শন এবং সরাসরিভাবে ভগবানের রাসলীলা শ্রবণ আচার্যগণ অনুমোদন করেননি। নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি অধ্যায় এবং প্রতিটি শব্দ পাঠ করবেন, কারণ প্রথম দিকের শ্লোকগুলি বর্ণনা করেছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের সুপক্ক ফল। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শব্দও ভগবদ্ভক্তের এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাই মহর্ষি মৈত্রেয় এখানে প্রতিপন্ন করেছেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে *সম্মতং সতাম্*, অর্থাৎ মহান ভক্তদের দ্বারা অনুমোদিত।

শ্লোক ৪৫

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ।
স্বর্গ্যং ধ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণম্ ॥ ৪৫ ॥

ধন্যম্—ধন প্রদানকারী; **যশস্যম্**—যশ প্রদানকারী; **আয়ুষ্যম্**—আয়ু বর্ধনকারী; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **স্বস্তি-অয়নম্**—কল্যাণ উৎপন্নকারী; **মহৎ**—মহান; **স্বর্গ্যম্**—স্বর্গলোক প্রদানকারী; **ধ্রৌব্যম্**—অথবা ধ্রুবলোক; **সৌমনস্যম্**—মনের প্রসন্নতা বিধানকারী; **প্রশস্যম্**—প্রশংসার যোগ্য; **অঘ-মর্ষণম্**—সমস্ত পাপ বিনাশকারী।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের আখ্যান শ্রবণকারীর ধন, যশ এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়। তা এতই পবিত্র যে, কেবলমাত্র তা শ্রবণ করার ফলেই স্বর্গলোক বা ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আখ্যান এতই মহিমান্বিত যে, তা শ্রবণের ফলে দেবতারা পর্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তা এতই শক্তিশালী যে, তার ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

এই জগতে বিভিন্ন প্রকার মানুষ রয়েছে। সকলেই শুদ্ধ ভক্ত নয়। যারা কর্মী, তারা প্রচুর ধন সম্পদ কামনা করে। কেউ আবার যশ কামনা করে। কেউ স্বর্গলোক অথবা ধ্রুবলোকে উন্নীত হতে চায়, আবার অন্য অনেকে জড়-জাগতিক লাভের জন্য দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে চায়। এখানে মৈত্রেয় ঋষি বলেছেন যে, সকলেই ধ্রুব মহারাজের আখ্যান শ্রবণ করতে পারেন এবং তার ফলে তাঁদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য লাভ হবে। বলা হয়েছে যে, ভক্ত *(অকাম)*, কর্মী *(সর্বকাম)* এবং জ্ঞানী *(মোক্ষকাম)*, সকলেরই তাদের বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত। তেমনই, কেউ যদি ভগবানের ভক্তের কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তা হলেও তিনি সেই ফলই লাভ করেন। ভগবানের কার্যকলাপ এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৪৬

শ্রুত্বৈতচ্ছ্রদ্ধয়াভীক্ষ্ণমচ্যুতপ্রিয়চেষ্টিতম্ ।
ভবেদ্ভক্তির্ভগবতি যয়া স্যাৎক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **অভীক্ষ্ণম্**—বার বার; **অচ্যুত**—ভগবানের; **প্রিয়**—প্রিয়; **চেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **ভবেৎ**—উৎপন্ন করে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **যয়া**—যার দ্বারা; **স্যাৎ**—অবশ্যই হয়; **ক্লেশ**—দুঃখের; **সংক্ষয়ঃ**—বিনাশ।

অনুবাদ

যিনি ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর শুদ্ধ চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বার বার প্রয়াস করেন, তিনিও শুদ্ধ ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদন করেন। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা জড়-জাগতিক জীবনের ত্রিতাপ-দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

তাৎপর্য

এখানে *অচ্যুত-প্রিয়* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধ্রুব মহারাজের চরিত্র এবং যশ মহান, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের অত্যন্ত প্রিয়। ভগবানের লীলা এবং কার্যকলাপ যেমন শ্রুতিমধুর, তাঁর প্রিয় ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রবণ করাও তেমনই শ্রুতিমধুর এবং শক্তিশালী। কেউ যদি বার বার ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান পাঠ করেন, তা হলে কেবল এই অধ্যায় শ্রবণ এবং পাঠ করার ফলে, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন; আর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, তিনি ভগবানের একজন মহান ভক্ত হওয়ার সুযোগ পান। ভগবানের মহান ভক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জড়-জাগতিক জীবনের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি।

শ্লোক ৪৭

মহত্ত্বমিচ্ছতাং তীর্থং শ্রোতুঃ শীলাদয়ো গুণাঃ ।
যত্র তেজস্তদিচ্ছূনাং মানো যত্র মনস্বিনাম্ ॥ ৪৭ ॥

মহত্ত্বম্—মহিমা; **ইচ্ছতাং**—যাঁরা বাসনা করেন; **তীর্থম্**—পন্থা; **শ্রোতুঃ**—শ্রবণকারীর; **শীল-আদয়ঃ**—সৎ চরিত্র ইত্যাদি; **গুণাঃ**—গুণাবলী; **যত্র**—যাতে; **তেজঃ**—শক্তি; **তৎ**—তা; **ইচ্ছূনাম্**—বাসনাকারীদের; **মানঃ**—সম্মান; **যত্র**—যাতে; **মনস্বিনাম্**—চিন্তাশীল ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

যিনি ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি তাঁরই মতো উত্তম গুণাবলী অর্জন করেন। যাঁরা মহিমা, শক্তি অথবা প্রভাব লাভ করতে চান, এই পন্থার দ্বারা তাঁরা তা লাভ করতে পারেন, আর যাঁরা চিন্তাশীল এবং সম্মানের আকাঙ্ক্ষী, তাঁদের বাঞ্ছা-পূরণেরও এটি হচ্ছে উপযুক্ত উপায়।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই লাভ, পূজা এবং প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষী। সকলেই সব চাইতে উচ্চ পদ লাভ করতে চায়, এবং সকলেই মহান ব্যক্তিদের মহান গুণাবলীর কথা শ্রবণ করতে চায়। ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপের বর্ণনা পাঠ করার দ্বারা এবং হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা, মহান ব্যক্তিদের বাঞ্ছিত সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনায়াসে লাভ করা যায়।

শ্লোক ৪৮

প্রযতঃ কীর্তয়েৎপ্রাতঃ সমবায়ে দ্বিজন্মনাম্ ।
সায়ং চ পুণ্যশ্লোকস্য ধ্রুবস্য চরিতং মহৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রযতঃ—মহা যত্নে; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করা উচিত; **প্রাতঃ**—সকালবেলা; **সমবায়ে**—সঙ্গে; **দ্বি-জন্মনাম্**—দ্বিজদের; **সায়ম্**—সন্ধ্যাবেলায়; **চ**—ও; **পুণ্য-শ্লোকস্য**—পবিত্র খ্যাতির; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুবের; **চরিতম্**—চরিত্র; **মহৎ**—মহান।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় নির্দেশ দিয়েছিলেন—ধ্রুব মহারাজের মহৎ চরিত্র ও কার্যকলাপ ব্রাহ্মণ বা দ্বিজদের সঙ্গে প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় একাগ্রচিত্তে কীর্তন করা উচিত।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, ভক্তসঙ্গেই কেবল পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের চরিত্র ও কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দ্বিজদের সভায় ধ্রুব মহারাজের চরিত্র আলোচনা করতে, এই শ্লোকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিজ বলতে যোগ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের বোঝায়। বিশেষ করে বৈষ্ণব স্তরে উন্নীত ব্রাহ্মণদের সঙ্গ অন্বেষণ করতে হয়। এইভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের চরিত্র ও কার্যকলাপ বর্ণনাকারী *শ্রীমদ্ভাগবতের* আলোচনা অচিরেই ফলপ্রসূ হয়। সেই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ গঠিত হয়েছে। এই সংস্থার প্রতিটি কেন্দ্রে, কেবল সকাল, সন্ধ্যা অথবা মধ্যাহ্নেই নয়, প্রকৃতপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবা নিরন্তর সম্পাদিত হয়। এই সংস্থার সান্নিধ্যে আসার ফলে, যে-কোন ব্যক্তি আপনা থেকেই ভক্তে পরিণত হয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, বহু কর্মী এবং অন্যান্য মানুষ আমাদের এই সংস্থায় এসে, মন্দিরের পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম এবং শান্ত বলে অনুভব করেন। এই শ্লোকে *দ্বি-জন্মনাম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাঁর দুইবার জন্ম হয়েছে'। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যে-কোন ব্যক্তি যোগদান করতে পারেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করে দ্বিজত্ব লাভ করতে পারেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে, দীক্ষা এবং প্রামাণিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে-কোন মানুষ দ্বিজত্ব লাভ করতে পারেন। মানুষের প্রথম জন্ম হয় পিতা-মাতার মাধ্যমে, এবং দ্বিতীয় জন্ম হয় সদ্গুরুরূপী পিতা এবং বৈদিক জ্ঞানরূপী মাতার মাধ্যমে। দ্বিজ না হলে, ভগবান ও তাঁর ভক্তের চিন্ময় বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাই

শূদ্রদের জন্য বেদপাঠ নিষিদ্ধ। স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করে লাভ করা শিক্ষার দ্বারা শূদ্র কখনও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এখন সারা পৃথিবী জুড়ে শিক্ষার ব্যবস্থা কেবল শূদ্র তৈরি করার জন্য। একজন মস্ত বড় প্রয়োগতত্ত্ববিৎ একটি মস্ত বড় শূদ্র ছাড়া আর কিছু নয় *কলৌ শূদ্র-সম্ভবঃ*—এই কলিযুগে সকলেই শূদ্র। যেহেতু সারা পৃথিবীর জনসাধারণ শূদ্রে পরিণত হয়েছে, তাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অবনতি হয়েছে, এবং তার ফলে মানুষেরা আজ অত্যন্ত অসুখী। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের শুরু হয়েছে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ তৈরি করার জন্য, যাতে তাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে পারমার্থিক জ্ঞান প্রচার করতে পারেন। এই পারমার্থিক জ্ঞানের প্রচারের ফলেই কেবল মানুষ সুখী হতে পারে।

শ্লোক ৪৯-৫০

পৌর্ণমাস্যাং সিনীবাল্যাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণেঽথবা ।
দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে সংক্রমেঽর্কদিনেঽপি বা ॥ ৪৯ ॥
শ্রাবয়েচ্ছ্রদ্দধানানাং তীর্থপাদপদাশ্রয়ঃ ।
নেচ্ছংস্তত্রাত্মনাত্মানং সন্তুষ্ট ইতি সিধ্যতি ॥ ৫০ ॥

পৌর্ণমাস্যাম্—পূর্ণিমার দিনে, **সিনীবাল্যাম্**—অমাবস্যার দিনে, **দ্বাদশ্যাম্**—একাদশীর পরের দিন; **শ্রবণে**—শ্রবণ নক্ষত্রের উদয়কালে; **অথবা**—অথবা; **দিন-ক্ষয়ে**—তিথির সমাপ্তিতে; **ব্যতীপাতে**—ব্যতীপাত নামক বিশেষ দিনে, **সংক্রমে**—সংক্রান্তিতে; **অর্কদিনে**—রবিবার; **অপি**—ও; **বা**—অথবা; **শ্রাবয়েৎ**—শ্রবণ করানো উচিত; **শ্রদ্দধানানাম্**—শ্রদ্ধালু শ্রোতাদের; **তীর্থ-পাদ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদ-আশ্রয়ঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত; **ন ইচ্ছন্**—কোন রকম পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা না করে; **তত্র**—সেখানে; **আত্মনা**—আত্মার দ্বারা; **আত্মানম্**—মনের; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **ইতি**—এইভাবে; **সিধ্যতি**—সিদ্ধিলাভ হয়।

অনুবাদ

যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণ-কমলের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কোন রকম পারিশ্রমিক না নিয়ে, ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান কীর্তন করা উচিত। বিশেষ করে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, শ্রবণ নক্ষত্রের উদয়ে, বিশেষ তিথির সমাপ্তিতে, ব্যতীপাতে, সংক্রান্তিতে অথবা রবিবাসরে এই আখ্যান কীর্তন করা

উচিত। এইভাবে, কোন রকম ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বিনা, এই আখ্যান কীর্তন করা হলে, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই সিদ্ধিলাভ করেন।

তাৎপর্য

পেশাদারি ভাগবত পাঠকেরা জঠরের প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপণের জন্য ভাগবত পাঠ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক-স্বরূপ টাকা-পয়সা চাইতে পারে, কিন্তু তার ফলে কারোরই কোন রকম পারমার্থিক উন্নতি সাধন হয় না অথবা কেউই সিদ্ধিলাভ করে না। তাই কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—কেউ যেন জীবিকা নির্বাহের জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করাকে একটি পেশারূপে গ্রহণ না করে। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত ব্যক্তি, যিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভরণ-পোষণ অথবা সারা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করেন, তিনিই কেবল ভগবান এবং ভগবানের ভক্তের লীলা-বিলাসের পূর্ণ বর্ণনা-সমন্বিত *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। সেই পন্থাটির সারমর্ম হচ্ছে—শ্রোতাদের ভগবানের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, এবং কীর্তনকারীকে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। *ভাগবত* পাঠকে ব্যবসা বানানো উচিত নয়। এই পন্থাটির যদি ঠিকভাবে অনুশীলন হয়, তা হলে পাঠকই কেবল পূর্ণ সন্তোষ লাভ করবেন না, পাঠক এবং শ্রোতাদের প্রতি ভগবানও প্রসন্ন হবেন, এবং তার ফলে উভয়েই কেবলমাত্র শ্রবণের দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

শ্লোক ৫১

জ্ঞানমজ্ঞাততত্ত্বায় যো দদ্যাৎসৎপথেঽমৃতম্ ।
কৃপালোর্দীননাথস্য দেবাস্তস্যানুগৃহ্নতে ॥ ৫১ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **অজ্ঞাত-তত্ত্বায়**—সত্য সম্বন্ধে যারা অবহিত নয়; **যঃ**—যিনি; **দদ্যাৎ**—প্রদান করেন; **সৎ-পথে**—সত্যের পথে; **অমৃতম্**—অমরত্ব; **কৃপালোঃ**—দয়ালু; **দীন-নাথস্য**—দীনজনদের রক্ষক; **দেবাঃ**—দেবতারা; **তস্য**—তাকে; **অনুগৃহ্নতে**—আশীর্বাদ প্রদান করেন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের আখ্যান অমৃতত্ব লাভের পরম মহিমান্বিত জ্ঞান। যারা পরম সত্য সম্বন্ধে অবগত নয়, এই জ্ঞানের দ্বারা তাদের সত্যের পথে পরিচালিত করা যায়।

যাঁরা দিব্য সহানুভূতির ফলে, দীনজনদের রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরা আপনা থেকেই দেবতাদের কৃপা এবং আশীর্বাদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

জ্ঞানম্ অজ্ঞাত শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে যেই জ্ঞান প্রায় সমগ্র জগতে অজ্ঞাত। পরম সত্য যে কি তা প্রকৃতপক্ষে কেউই জানে না। জড়বাদীরা তাদের শিক্ষা, দার্শনিক চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরম সত্য সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তাই মহর্ষি মৈত্রেয় নির্দেশ দিয়েছেন যে, পরম সত্য সম্বন্ধে মানুষদের জ্ঞান প্রদান করার জন্য, ভক্তরা যেন সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী প্রচার করেন। শ্রীল ব্যাসদেব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসমন্বিত এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থটি সংকলন করেছেন, যাতে পরম সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে, প্রথম স্কন্ধে, উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহামুনি ব্যাসদেব এই মহান ভাগবত পুরাণ সংকলন করেছিলেন, জনসাধারণের অবিদ্যা দূর করার জন্য। মানুষ যেহেতু পরম সত্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তাই নারদ মুনির নির্দেশে ব্যাসদেব বিশেষভাবে এই *শ্রীমদ্ভাগবত* সংকলন করেছিলেন। সাধারণত মানুষ যদিও সত্যকে জানতে চায়, কিন্তু তারা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তার ফলে তারা বড় জোর নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা প্রাপ্ত হয়। খুব অল্প মানুষই ভগবানকে তত্ত্বত জানে।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে দিব্য জ্ঞান প্রদান করা। যদিও নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করা না যায়, ততক্ষণ প্রকৃত অমৃতত্ত্ব লাভ করা সম্ভব নয়। ভগবদ্ভক্তি, যা ভক্তকে ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়, তাই হচ্ছে প্রকৃত অমৃতত্ত্ব। পতিত জীবদের প্রতি এবং সাধারণ মানুষদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরবশ হয়ে, শুদ্ধ ভক্ত সারা পৃথিবী জুড়ে এই *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করেন। ভক্ত অত্যন্ত দয়ালু, তাই তাঁকে বলা হয় *দীননাথ* এবং তিনি দরিদ্র, অজ্ঞান জনসাধারণের রক্ষক। শ্রীকৃষ্ণও *দীন-নাথ* বা *দীনবন্ধু* নামে পরিচিত, এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তরাও সেই *দীননাথের* পদ গ্রহণ করেন। *দীননাথ* বা কৃষ্ণভক্তরা, যাঁরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা প্রচার করেন, তাঁরা দেবতাদের প্রিয়পাত্র হন। সাধারণত মানুষেরা জাগতিক লাভের জন্য দেব-দেবীদের পূজায়, বিশেষ করে শিবের পূজায় অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে, ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব প্রচারে যুক্ত

শুদ্ধ ভক্ত অলাদাভাবে দেব-দেবীদের পূজা করেন না; দেবদেবীরা আপনা থেকেই তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের যথাসাধ্য আশীর্বাদ করেন। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন আপনা থেকেই ডালপালা এবং পাতায় জল দেওয়া হয়ে যায়, তেমনই ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদনের ফলে, শাখা-পল্লবসদৃশ ভগবানের বিভিন্ন অংশ দেবতারা আপনা থেকেই ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন, এবং তাঁরা তাঁদের সমস্ত আশীর্বাদ প্রদান করেন।

শ্লোক ৫২

ইদং ময়া তেঽভিহিতং কুরূদ্বহ
ধ্রুবস্য বিখ্যাতবিশুদ্ধকর্মণঃ ।
হিত্বার্ভকঃ ক্রীড়নকানি মাতু-
র্গৃহং চ বিষ্ণুং শরণং যো জগাম ॥ ৫২ ॥

ইদম্—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—আপনাকে; **অভিহিতম্**—বর্ণিত; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুবের; **বিখ্যাত**—অতি প্রসিদ্ধ; **বিশুদ্ধ**—অত্যন্ত পবিত্র; **কর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অর্ভকঃ**—বালক; **ক্রীড়নকানি**—খেলনা; **মাতুঃ**—তাঁর মায়ের; **গৃহম্**—গৃহ; **চ**—ও; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণুকে; **শরণম্**—শরণ; **যঃ**—যিনি; **জগাম**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের দিব্য কার্যকলাপ সারা জগতে প্রসিদ্ধ, এবং তা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। ধ্রুব মহারাজ শৈশবেই সমস্ত খেলার সামগ্রী পরিত্যাগ করে তাঁর মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে, ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেছিলেন। হে বিদুর! আমি এই আখ্যান এখন সমাপ্ত করেছি, কারণ তোমার কাছে আমি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, সকলেরই আয়ু অত্যন্ত অল্প, কিন্তু কেউ যদি যথাযথভাবে আচরণ করেন, তা হলে তাঁর কীর্তি দীর্ঘকাল ধরে জগতে বিরাজ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন চিরবিখ্যাত, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের খ্যাতিও চিরস্থায়ী। তাই ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ বর্ণনা করার সময়, দুটি বিশেষ শব্দের

ব্যবহার হয়েছে—*বিখ্যাত* এবং *বিশুদ্ধ*। ধ্রুব মহারাজ যে অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করার জন্য বনে গিয়েছিলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ধ্রুব মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা

শ্লোক ১

সূত উবাচ
নিশম্য কৌষারবিণোপবর্ণিতং
ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণম্ ।
প্ররূঢ়ভাবো ভগবত্যধোক্ষজে
প্রষ্টুং পুনস্তং বিদুরঃ প্রচক্রমে ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **কৌষারবিণা**—ঋষি মৈত্রেয়ের দ্বারা; **উপবর্ণিতম্**—বর্ণিত; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **বৈকুণ্ঠ-পদ**—বৈকুণ্ঠলোকে; **অধিরোহণম্**—আরোহণ; **প্ররূঢ়**—বর্ধিত; **ভাবঃ**—ভক্তিভাব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অধোক্ষজে**—যিনি প্রত্যক্ষ অনুভূতির অতীত; **প্রষ্টুম্**—প্রশ্ন করার জন্য; **পুনঃ**—পুনরায়; **তম্**—মৈত্রেয়কে; **বিদুরঃ**—বিদুর; **প্রচক্রমে**—প্রয়াস করেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী শৌনকাদি সমস্ত ঋষিদের বললেন—মৈত্রেয় ঋষির কাছে ধ্রুব মহারাজের বিষ্ণুধামে আরোহণের বর্ণনা শ্রবণ করে, ভগবানের প্রতি বিদুরের ভক্তি আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং তিনি মৈত্রেয়কে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিদুর এবং মৈত্রেয়ের এই আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে, ভগবান এবং তাঁর ভক্তের কার্যকলাপ এতই মনোমুগ্ধকর যে, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই কোন রকম ক্লান্তি অনুভব করেন না। চিন্ময় বিষয়বস্তু এতই সুন্দর যে, তা শ্রবণ করে অথবা

কীর্তন করে, কেউই কখনও ক্লান্ত হন না। কিন্তু যারা ভক্ত নয় তারা মনে করতে পারে, "কেবলমাত্র ভগবানের কথা আলোচনায় মানুষ এত সময় ব্যয় করে কি করে?" কিন্তু ভক্তরা ভগবানের কথা অথবা তাঁর ভক্তের কথা শ্রবণ ও কীর্তন করে কখনও তৃপ্ত হন না। তাঁরা যতই তা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, ততই তাঁদের শ্রবণ-কীর্তনের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কেবল হরে, কৃষ্ণ এবং রাম—এই তিনটি শব্দের পুনরাবৃত্তি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্তরা কোন রকম ক্লান্তি অনুভব না করে, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা এই মন্ত্র কীর্তন করে যেতে পারেন।

শ্লোক ২

বিদুর উবাচ

কে তে প্রচেতসো নাম কস্যাপত্যানি সুব্রত ।
কস্যান্ববায়ে প্রখ্যাতাঃ কুত্র বা সত্রমাসত ॥ ২ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন; **কে**—কে ছিলেন; **তে**—তাঁরা; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতাগণ; **নাম**—নামক; **কস্য**—কার; **অপত্যানি**—পুত্র; **সুব্রত**—হে শুভ ব্রতধারী মৈত্রেয়; **কস্য**—কার; **অন্ববায়ে**—কুলে; **প্রখ্যাতাঃ**—প্রসিদ্ধ; **কুত্র**—কোথায়; **বা**—ও; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **আসত**—অনুষ্ঠান করা হয়েছিল।

অনুবাদ

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহান ভক্ত! প্রচেতারা কে? কোন্ কুলে তাঁদের জন্ম হয়েছিল? তাঁরা কার পুত্র ছিলেন, এবং কোথায় তাঁরা সেই মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে বর্ণিত হয়েছে, নারদ মুনি প্রচেতাদের যজ্ঞস্থলে তিনটি শ্লোক গান করেছিলেন, তা বিদুরকে এই প্রশ্নগুলি করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

শ্লোক ৩

মন্যে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনম্ ।
যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্যাবিধির্হরেঃ ॥ ৩ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **মহা-ভাগবতম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত; **নারদম্**—দেবর্ষি নারদকে; **দেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **দর্শনম্**—যিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **প্রোক্তঃ**—উক্ত; **ক্রিয়া-যোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **পরিচর্যা**—সেবা করার জন্য; **বিধিঃ**—বিধি; **হরেঃ**—ভগবানকে।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—আমি জানি যে, দেবর্ষি নারদ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তিনি ভগবদ্ভক্তির পাঞ্চরাত্রিক বিধি প্রণয়ন করেছেন এবং স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের কাছে যাওয়ার দুটি পন্থা রয়েছে। একটি হচ্ছে ভাগবত মার্গ বা *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রদর্শিত মার্গ, এবং অন্যটি হচ্ছে পাঞ্চরাত্রিক বিধি। পাঞ্চরাত্রিক বিধি হচ্ছে মন্দিরে ভগবানের আরাধনা করার বিধি, এবং ভাগবত বিধি হচ্ছে শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তি। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন দুটি বিধিকেই যুগপৎ গ্রহণ করেছে, যাতে অনুশীলনকারী ভক্ত ভগবৎ উপলব্ধির পথে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হতে পারে। বিদুর কর্তৃক উক্ত এই পাঞ্চরাত্রিক বিধির প্রথম প্রবর্তন করেন দেবর্ষি নারদ।

শ্লোক ৪

স্বধর্মশীলৈঃ পুরুষৈর্ভগবান্ যজ্ঞপূরুষঃ ।
ইজ্যমানো ভক্তিমতা নারদেনেরিতঃ কিল ॥ ৪ ॥

স্ব-ধর্ম-শীলৈঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানরত; **পুরুষৈঃ**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ-পূরুষঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, **ইজ্যমানঃ**—পূজিত হয়ে; **ভক্তিমতা**—ভক্তদের দ্বারা; **নারদেন**—নারদের দ্বারা; **ঈরিতঃ**—বর্ণিত; **কিল**—নিশ্চিতরূপে।

অনুবাদ

প্রচেতারা যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ ভগবানের আরাধনা করছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজের দিব্য গুণাবলী দেবর্ষি নারদ বর্ণনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনি সর্বদাই ভগবানের লীলার মহিমা কীর্তন করেন। এই শ্লোকে আমরা দেখছি যে, তিনি কেবল ভগবানেরই মহিমা কীর্তন করেন না, তিনি ভগবানের ভক্তেরও গুণগান করেন। নারদ মুনির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করা। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ভগবদ্ভক্তির নির্দেশিকা *নারদ পঞ্চরাত্র* সংকলন করেছেন, যাতে ভক্তরা ভক্তি করার বিধি শিখতে পাবেন এবং দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় তৎপর হতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে প্রতিটি বর্ণের মানুষই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৫) বলা হয়েছে, *স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ*—স্বীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার দ্বারা মানুষ ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১/২/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*—কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের সিদ্ধি হচ্ছে সেই কর্মের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। প্রচেতারা যখন এই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন নারদ মুনি তা দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং সেই যজ্ঞস্থলে তিনি ধ্রুব মহারাজের মহিমা কীর্তন করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

যাস্তা দেবর্ষিণা তত্র বর্ণিতা ভগবৎকথাঃ ।
মহ্যং শুশ্রূষবে ব্রহ্মন্ কার্ৎস্ন্যেনাচষ্টুমর্হসি ॥ ৫ ॥

যাঃ—যা; **তাঃ**—সেই সমস্ত; **দেবর্ষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **তত্র**—সেখানে; **বর্ণিতাঃ**—বর্ণিত; **ভগবৎ-কথাঃ**—ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় উপদেশ; **মহ্যম্**—আমাকে; **শুশ্রূষবে**—শুনতে অত্যন্ত উৎসুক; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কার্ৎস্ন্যেন**—সম্পূর্ণরূপে; **আচষ্টুম্ অর্হসি**—দয়া করে বলুন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! নারদ মুনি কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন, এবং সেই সভায় ভগবানের কোন্ লীলা বর্ণনা করা হয়েছিল? আমি তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। দয়া করে আপনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেই মহিমা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবৎ-কথা বা ভগবানের লীলা-বিলাসের বর্ণনা। মৈত্রেয়ের কাছ থেকে বিদুর যা শুনতে উৎসুক ছিলেন, তা আমরাও আজ পাঁচ হাজার বছর পর শুনতে পারি, যদি আমরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হই।

শ্লোক ৬

মৈত্রেয় উবাচ

ধ্রুবস্য চোৎকলঃ পুত্রঃ পিতরি প্রস্থিতে বনম্ ।
সার্বভৌমশ্রিয়ং নৈচ্ছদধিরাজাসনং পিতুঃ ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **চ**—ও; **উৎকলঃ**—উৎকল; **পুত্রঃ**—পুত্র; **পিতরি**—পিতার পর; **প্রস্থিতে**—প্রস্থান করার পর; **বনম**—বনে; **সার্বভৌম**—সমগ্র ভূখণ্ড; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **ন ঐচ্ছৎ**—বাসনা করেননি; **অধিরাজ**—রাজকীয়; **আসনম্**—সিংহাসন; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিলেন—হে বিদুর! মহারাজ ধ্রুব যখন বনে প্রস্থান করলেন, তখন তাঁর পুত্র উৎকল তাঁর পিতার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সারা পৃথিবীর উপর সার্বভৌমত্ব স্থাপনকারী রাজসিংহাসন গ্রহণ করতে চাননি।

শ্লোক ৭

স জন্মনোপশান্তাত্মা নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ ।
দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি ॥ ৭ ॥

সঃ—ধ্রুব মহারাজের পুত্র উৎকল; **জন্মনা**—তাঁর জন্ম থেকেই; **উপশান্ত**—অত্যন্ত সন্তুষ্ট; **আত্মা**—আত্মা; **নিঃসঙ্গঃ**—আসক্তি-রহিত; **সম-দর্শনঃ**—সমদর্শী; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **লোকে**—এই জগতে; **বিততম্**—বিস্তৃত; **আত্মানাম্**—পরমাত্মাকে; **লোকম্**—সমস্ত জগতের; **আত্মনি**—পরমাত্মায়।

অনুবাদ

উৎকল তাঁর জন্ম থেকেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট এবং সংসারের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সমদর্শী, কারণ তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরমাত্মায় এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মাকে বিরাজমান দেখতেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের পুত্র উৎকলের লক্ষণ এবং গুণ মহাভাগবতের মতো ছিল। *ভগবদ্‌গীতায়* (৬/৩০) যেমন বলা হয়েছে—*যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি*—অতি উন্নত স্তরের ভক্ত সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন, আবার সব কিছু ভগবানে স্থিত দেখতে পান। আবার ভগবদ্‌গীতায়ই (৯/৪) এর সমর্থনে বলা হয়েছে, *ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*—তাঁর অব্যক্ত রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত। সব কিছুই তাঁর উপর আশ্রিত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত বস্তুই ভগবান। মহাভাগবত দেখেন যে, জীবের বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর-ভিত্তিক বৈষম্য নির্বিশেষে একই পরমাত্মা সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন। তিনি সকলকেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করেন। সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি অনুভবকারী মহাভাগবত কখনও ভগবানের দৃষ্টির বহির্ভূত হন না, এবং ভগবানও কখনও তাঁর দৃষ্টির আড়াল হন না। ভগবৎ প্রেমের উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হলেই কেবল তা সম্ভব হয়।

শ্লোক ৮-৯

আত্মানং ব্রহ্ম নির্বাণং প্রত্যস্তমিতবিগ্রহম্ ।
অববোধরসৈকাত্ম্যমানন্দমনুসন্ততম্ ॥ ৮ ॥
অব্যবচ্ছিন্নযোগাগ্নিদগ্ধকর্মমলাশয়ঃ ।
স্বরূপমবরুন্ধানো নাত্মনোহন্যং তদৈক্ষত ॥ ৯ ॥

আত্মানম্—আত্মা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **নির্বাণম্**—জড় অস্তিত্বের নিবৃত্তি; **প্রত্যস্তমিত**—নিবৃত্ত; **বিগ্রহম্**—বিচ্ছেদ; **অববোধ-রস**—জ্ঞানের রসের দ্বারা; **এক-আত্ম্যম্**—একত্ব; **আনন্দম্**—আনন্দ; **অনুসন্ততম্**—বিস্তৃত; **অব্যবচ্ছিন্ন**—নিরন্তর; **যোগ**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **অগ্নি**—অগ্নির দ্বারা; **দগ্ধ**—দগ্ধ; **কর্ম**—সকাম বাসনা; **মল**—মল; **আশয়ঃ**—তাঁর মনে; **স্বরূপম্**—স্বরূপ; **অবরুন্ধানঃ**—উপলব্ধি করে; **ন**—না; **আত্মনঃ**—পরমাত্মা থেকে; **অন্যম্**—অন্য কিছু; **তদা**—তখন; **ঐক্ষত**—দেখেছিলেন।

অনুবাদ

পরম ব্রহ্মের জ্ঞানের প্রসারের দ্বারা, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এই মুক্তিকে বলা হয় নির্বাণ। তিনি দিব্য আনন্দে মগ্ন ছিলেন, এবং সেই আনন্দময় স্থিতিতেই তিনি সর্বদা বিরাজ করতেন, যা ক্রমশ

বর্ধিত হচ্ছিল। নিরন্তর ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। ভক্তিযোগকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ তা জড় বাসনারূপ সমস্ত মল দগ্ধ করে। তিনি সর্বদাই তাঁর আত্ম-উপলব্ধির স্বরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং ভগবানের অতিরিক্ত অন্য কিছুই তিনি দেখতেন না, এবং তিনি সর্বদা তাঁরই সেবাতে যুক্ত থাকতেন।

তাৎপর্য

এই দুটি শ্লোক *ভগবদ্গীতার* (১৮/৫৪) শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তিনি অচিরেই পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে পূর্ণরূপে আনন্দময় হন। তিনি কখনও শোক করেন না অথবা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী। সেই স্তরে তিনি আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর *শিক্ষাষ্টকের* প্রথম শ্লোকে সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং ।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ॥

ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগপদ্ধতি, এবং এই পদ্ধতিতে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই হচ্ছে সর্বোত্তম অনুষ্ঠান। ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, নির্বাণ বা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং তার ফলে চিন্ময় অস্তিত্বের আনন্দ নিরন্তর বর্ধিত হয়, যে-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্* । কেউ যখন এই স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন আর তাঁর জড় ঐশ্বর্যের প্রতি এমন কি সারা পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতিও কোন স্পৃহা থাকে না। এই অবস্থাকে বলা হয় *বিরক্তিরন্যত্র স্যাৎ* । এটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির ফল।

ভগবদ্ভক্তিতে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই জড় ঐশ্বর্য এবং জড় কার্যকলাপ থেকে বিরক্ত হওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে চিন্ময় প্রকৃতি, যা পূর্ণ আনন্দময়। এই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (২/৫৯) বর্ণিত হয়েছে। *পরং দৃষ্টা নিবর্ততে*—চিন্ময় অস্তিত্বে আনন্দময় উন্নততর জীবন আস্বাদন করার ফলে, জড় সুখভোগের বাসনা নিবৃত্ত হয়। জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ দিব্য জ্ঞান সমস্ত জড় বাসনা ভস্মীভূত করে। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলেই যোগসিদ্ধি লাভ হয়। ভক্ত তাঁর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা করেন।

প্রতিটি বদ্ধ জীবই পূর্বজন্মের কর্মফলে পূর্ণ, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তখন তাঁর কর্মফলরূপ সমস্ত মল ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই সম্বন্ধে *নারদ-পঞ্চরাত্রে* বলা হয়েছে—*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্* ।

শ্লোক ১০

জড়ান্ধবধিরোন্মত্তমূকাকৃতিরতন্মতিঃ ।
লক্ষিতঃ পথি বালানাং প্রশান্তার্চিরিবানলঃ ॥ ১০ ॥

জড়—মূর্খ; **অন্ধ**—অন্ধ; **বধির**—বধির; **উন্মত্ত**—পাগল; **মূক**—মূক; **আকৃতিঃ**—আকৃতি; **অ-তৎ**—সেই প্রকার নয়; **মতিঃ**—তাঁর বুদ্ধিমত্তা; **লক্ষিতঃ**—তাঁকে দেখা যেত; **পথি**—পথে; **বালানাম্**—অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের দ্বারা; **প্রশান্ত**—শান্ত; **অর্চিঃ**—অগ্নিশিখা; **ইব**—সদৃশ; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

পথে বিচরণ করার সময় অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা উৎকলকে জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত এবং মূক বলে মনে করত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ছিলেন না। তিনি ভস্মাচ্ছাদিত জ্বলন্ত শিখাবিহীন অগ্নির মতো অবস্থান করতেন।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট বিবোধ আদি বিরক্তিকর প্রতিকূল পরিস্থিতি এড়াবার জন্য জড়ভরত বা উৎকলের মতো মহাত্মারা মৌন থাকেন। অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা এই প্রকার মহাত্মাদের উন্মাদ, বধির বা জড় বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, উন্নত স্তরের ভগবদ্ভক্ত অভক্তদের সঙ্গ করেন না, কিন্তু যাঁরা ভক্ত, তাঁদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতো আচরণ করেন, এবং বালিশদের কাছে ভগবানের কথা বলে কৃপা করেন। সারা জগৎই প্রায় অভক্ততে পূর্ণ, এবং এক প্রকার অতি উন্নত স্তরের ভক্তদের বলা হয় ভজনানন্দী। তবে যাঁরা গোষ্ঠ্যানন্দী, তাঁরা ভগবদ্ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধির করার জন্য প্রচার করেন। কিন্তু এই প্রকার প্রচারকেরাও পারমার্থিক জীবনের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করেন।

শ্লোক ১১

মত্বা তং জড়মুন্মত্তং কুলবৃদ্ধাঃ সমন্ত্রিণঃ ।
বৎসরং ভূপতিং চক্রুর্যবীয়াংসং ভ্রমেঃ সুতম্ ॥ ১১ ॥

মত্বা—মনে করে; **তম্**—উৎকল; **জড়ম্**—বুদ্ধিহীন; **উন্মত্তম্**—উন্মত্ত; **কুল-বৃদ্ধাঃ**—পরিবারের প্রবীণ সদস্যগণ; **স-মন্ত্রিণঃ**—মন্ত্রীগণ সহ; **বৎসরম্**—বৎসর; **ভূ-পতিম্**—পৃথিবীর রাজা; **চক্রুঃ**—বানিয়েছিলেন; **যবীয়াংসম্**—কনিষ্ঠ; **ভ্রমেঃ**—ভ্রমির; **সুতম্**—পুত্র।

অনুবাদ

সেই কারণে মন্ত্রী এবং কুলবৃদ্ধগণ উৎকলকে বুদ্ধিহীন ও উন্মত্ত বলে মনে করেছিলেন, এবং তাই তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রমিনন্দন বৎসরকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে দেখা যায় যে, যদিও তখন রাজতন্ত্র ছিল, কিন্তু তা হলেও তাঁরা স্বৈরাচারী ছিলেন না। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা এবং মন্ত্রীরা পরিবর্তন করতে পারতেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে পারতেন, যদিও রাজপরিবারের সদস্যই কেবল সিংহাসনের অধিকারি হতে পারতেন। আধুনিক যুগেও যেখানে রাজতন্ত্র রয়েছে, কখনও কখনও সেখানে মন্ত্রী এবং রাজপরিবারের প্রবীণ সদস্যরা রাজ পরিবারেরই কোন সদস্যকে অপর সদস্য থেকে উপযুক্ত বলে মনে করে রাজপদে অভিষিক্ত করেন।

শ্লোক ১২

স্বর্বীথির্বৎসরস্যেষ্টা ভার্যাসূত ষড়াত্মজান্ ।
পুষ্পার্ণং তিগ্মকেতুং চ ইষমূর্জং বসুং জয়ম্ ॥ ১২ ॥

স্বর্বীথিঃ—স্বর্বীথি; **বৎসরস্য**—রাজা বৎসরের; **ইষ্টা**—অত্যন্ত প্রিয়; **ভার্যা**—পত্নী; **অসূত**—প্রসব করেছিলেন; **ষট্**—ছয়; **আত্মজান্**—পুত্রদের; **পুষ্পার্ণম্**—পুষ্পার্ণ; **তিগ্মকেতুম্**—তিগ্মকেতু; **চ**—ও; **ইষম্**—ইষ; **ঊর্জম্**—ঊর্জ; **বসুম্**—বসু; **জয়ম্**—জয়।

অনুবাদ

মহারাজ বৎসরের স্বর্বীথি নামক অত্যন্ত প্রিয় পত্নী ছিলেন; তিনি পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, ঊর্জ, বসু এবং জয় নামক ছয় পুত্র প্রসব করেন।

তাৎপর্য

বৎসরের পত্নীকে এখানে *ইষ্টা* বলা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'পূজ্যা'। অর্থাৎ, বৎসরের পত্নীর সমস্ত সদ্‌গুণাবলী ছিল; যেমন তিনি সর্বদাই তাঁর পতির অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং অনুগত ও স্নেহপরায়ণা ছিলেন। গৃহস্থালির সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করার সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁর ছিল। পতি ও পত্নী উভয়েই যদি সদ্‌গুণ সম্পন্ন হন এবং শান্তিপূর্ণভাবে বাস করেন, তা হলে সুসন্তানের জন্ম হয়, এবং সারা পরিবার সুখ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়।

শ্লোক ১৩

পুষ্পার্ণস্য প্রভা ভার্যা দোষা চ দ্বে বভূবতুঃ।
প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়মিতি হ্যাসন্ প্রভাসুতাঃ ॥ ১৩ ॥

পুষ্পার্ণস্য—পুষ্পার্ণের; **প্রভা**—প্রভা; **ভার্যা**—পত্নী; **দোষা**—দোষা; **চ**—ও; **দ্বে**—দুই; **বভূবতুঃ**—ছিলেন; **প্রাতঃ**—প্রাতঃ; **মধ্যন্দিনম্**—মধ্যন্দিনম্; **সায়ম্**—সায়ম্; **ইতি**—এইভাবে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আসন্**—ছিলেন; **প্রভা-সুতাঃ**—প্রভার পুত্রগণ।

অনুবাদ

পুষ্পার্ণের প্রভা এবং দোষা নামক দুই পত্নী ছিল। প্রভার প্রাতঃ, মধ্যন্দিনম্ এবং সায়ম্ নামক তিন পুত্র ছিল।

শ্লোক ১৪

প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ।
ব্যুষ্টঃ সুতং পুষ্করিণ্যাং সর্বতেজসমাদধে ॥ ১৪ ॥

প্রদোষঃ—প্রদোষ; **নিশিথঃ**—নিশিথ; **ব্যুষ্টঃ**—ব্যুষ্ট; **ইতি**—এই প্রকার; **দোষা**—দোষার; **সুতাঃ**—পুত্র; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **ব্যুষ্টঃ**—ব্যুষ্ট; **সুতম্**—পুত্র; **পুষ্করিণ্যাম্**—পুষ্করিণীতে; **সর্ব-তেজসম্**—সর্বতেজা নামক; **আদধে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

দোষার প্রদোষ, নিশিথ এবং ব্যুষ্ট নামক তিন পুত্র ছিল। ব্যুষ্টের পত্নী পুষ্করিণী, এবং তিনি সর্বতেজা নামে এক অতি শক্তিশালী পুত্র প্রসব করেন।

শ্লোক ১৫-১৬

**স চক্ষুঃ সুতমাকূত্যাং পত্ন্যাং মনুমবাপ হ ।
মনোরসূত মহিষী বিরজান্নড্বলা সুতান্ ॥ ১৫ ॥
পুরুং কুৎসং ত্রিতং দ্যুম্নং সত্যবন্তমৃতং ব্রতম্ ।
অগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং প্রদ্যুম্নং শিবিমুল্মুকম্ ॥ ১৬ ॥**

সঃ—তিনি (সর্বতেজা); **চক্ষুঃ**—চক্ষু নামক; **সুতম্**—পুত্র; **আকূত্যাম্**—আকূতিতে; **পত্ন্যাম্**—পত্নী; **মনুম্**—চাক্ষুষ মনু; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **মনোঃ**—মনুর, **অসূত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **মহিষী**—রাণী; **বিরজান্**—রজোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত; **নড্বলা**—নড্বলা; **সুতান্**—পুত্র; **পুরুম্**—পুরু; **কুৎসম্**—কুৎস; **ত্রিতম্**—ত্রিত; **দ্যুম্নম্**—দ্যুম্ন; **সত্যবন্তম্**—সত্যবান্; **ঋতম্**—ঋত; **ব্রতম্**—ব্রত; **অগ্নিষ্টোমম্**—অগ্নিষ্টোম; **অতীরাত্রম্**—অতীরাত্র, **প্রদ্যুম্নম্**—প্রদ্যুম্ন; **শিবিম্**—শিবি; **উল্মুকম্**—উল্মুক।

অনুবাদ

সর্বতেজার পত্নী আকূতি চাক্ষুষ নামক পুত্র প্রসব করেন, যিনি মন্বন্তরে ষষ্ঠ মনু হয়েছিলেন। চাক্ষুষ মনুর পত্নী ছিলেন নড্বলা, তিনি পুরু, কুৎস ত্রিত, দ্যুম্ন, সত্যবান্, ঋত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতীরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি এবং উল্মুক নামক শুদ্ধচিত্ত পুত্রদের প্রসব করেন।

শ্লোক ১৭

**উল্মুকোঽজনয়ৎপুত্রান্পুষ্করিণ্যাং ষড়ুত্তমান্ ।
অঙ্গং সুমনসং খ্যাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্ ॥ ১৭ ॥**

উল্মুকঃ—উল্মুক; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **পুষ্করিণ্যাম্**—তাঁর পত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে; **ষট্**—ছয়; **উত্তমান্**—অতি উত্তম; **অঙ্গম্**—অঙ্গ; **সুমনসম্**—সুমনা; **খ্যাতিম্**—খ্যাতি; **ক্রতুম্**—ক্রতু; **অঙ্গিরসম্**—অঙ্গিরা; **গয়ম্**—গয়।

অনুবাদ

বারোজন পুত্রের মধ্যে, উল্মুক তাঁর পত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সুসন্তান ছিলেন, এবং তাঁদের নাম ছিল অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং গয়।

শ্লোক ১৮

সুনীথাঙ্গস্য যা পত্নী সুষুবে বেণমুল্বণম্ ।
যদ্দৌঃশীল্যাৎস রাজর্ষির্নির্বিণ্ণো নিরগাৎপুরাৎ ॥ ১৮ ॥

সুনীথা—সুনীথা; **অঙ্গস্য**—অঙ্গের; **যা**—যিনি; **পত্নী**—পত্নী; **সুষুবে**—প্রসব করেছিলেন; **বেণম্**—বেণ; **উল্বণম্**—অত্যন্ত কুটিল; **যৎ**—যার; **দৌঃশীল্যাৎ**—দুষ্ট স্বভাববশত; **সঃ**—তিনি; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি অঙ্গ; **নির্বিণ্ণঃ**—অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে; **নিরগাৎ**—চলে গিয়েছিলেন; **পুরাৎ**—গৃহ থেকে।

অনুবাদ

অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেণ নামক একটি পুত্র প্রসব করেন, এই বেণ ছিল অত্যন্ত কুটিল। তার অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাবে মর্মাহত হয়ে, রাজর্ষি অঙ্গ গৃহ ত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯-২০

যমঙ্গ শেপুঃ কুপিতা বাগ্বজ্রা মুনয়ঃ কিল ।
গতাসোস্তস্য ভূয়স্তে মমন্থুর্দক্ষিণং করম্ ॥ ১৯ ॥
অরাজকে তদা লোকে দস্যুভিঃ পীড়িতাঃ প্রজাঃ ।
জাতো নারায়ণাংশেন পৃথুরাদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

যম্—যাকে (বেণকে); **অঙ্গ**—হে বিদুর; **শেপুঃ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **বাক্-বজ্রাঃ**—যাঁদের বাণী বজ্রের মতো কঠোর; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **কিল**—নিঃসন্দেহে; **গত-অসোঃ তস্য**—তার মৃত্যুর পর; **ভূয়ঃ**—অধিকন্তু; **তে**—তাঁরা; **মমন্থুঃ**—মন্থন করেছিলেন; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণ; **করম্**—বাহু; **অরাজকে**—রাজাবিহীন হওয়ায়; **তদা**—তখন; **লোকে**—পৃথিবী; **দস্যুভিঃ**—দস্যু-তস্করদের দ্বারা; **পীড়িতাঃ**—নিপীড়িত; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **জাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অংশেন**—অংশের দ্বারা; **পৃথুঃ**—পৃথু; **আদ্যঃ**—আদি; **ক্ষিতি-ঈশ্বরঃ**—পৃথিবীর রাজা।

অনুবাদ

হে বিদুর! মহর্ষিদের অভিশাপ বজ্রের মতো কঠোর। তাই তাঁরা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বেণ রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন তার মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃত্যুর

পর কোন রাজা না থাকায়, দস্যু-তস্করদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং সমস্ত প্রজারা ভীষণভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিল। তা দেখে, মহর্ষিরা বেণের দক্ষিণ হস্তটিকে মন্থন করেছিলেন, এবং তাঁদের মন্থনের ফলে, ভগবান বিষ্ণুর অংশে আদি রাজা পৃথু আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

প্রজাতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্র শ্রেষ্ঠ, কারণ রাজা যদি প্রবল শক্তিশালী হন, তা হলে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা খুব সুন্দরভাবে বজায় থাকে। এক শত বছর আগেও কাশ্মীরের রাজা এত প্রতাপশালী ছিলেন যে, কেউ যদি তাঁর রাজ্যে চুরি করত, তা হলে তাকে রাজার কাছে নিয়ে আসা মাত্রই, রাজা সেই চোরের হাত কেটে দিতেন। এই প্রকার কঠোর দণ্ডবিধানের ফলে, রাজ্যে একেবারে চুরি হত না। কেউ যদি রাস্তায় কিছু ফেলে যেত, তা হলেও কেউ তা স্পর্শ পর্যন্ত করত না। নিয়ম ছিল যে, দ্রব্যের মালিকই কেবল তা নিয়ে যেতে পারবে এবং অন্য কেউ তা স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। তথাকথিত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন চুরি হয়, তখন পুলিশ এসে মামলা লিখে নিয়ে যায়, কিন্তু সাধারণত চোর কখনও ধরা পড়ে না, এবং ধরা পড়লেও তাকে দণ্ড দেওয়া হয় না। সরকারের এই প্রকার অক্ষমতার ফলে, বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে চোর, বাটপাড় এবং বদমাশদের প্রাধান্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

শ্লোক ২১

বিদুর উবাচ

তস্য শীলনিধেঃ সাধোর্ব্রহ্মণ্যস্য মহাত্মনঃ ।
রাজ্ঞঃ কথমভূদ্দুষ্টা প্রজা যদ্বিমনা যযৌ ॥ ২১ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **তস্য**—তাঁর (অঙ্গ); **শীল-নিধেঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণের আধার; **সাধোঃ**—মহাত্মা; **ব্রহ্মণস্য**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত; **মহাত্মনঃ**—মহাত্মার; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **কথম্**—কিভাবে; **অভূৎ**—হয়েছিল; **দুষ্টা**—খারাপ; **প্রজা**—পুত্র; **যৎ**—যার দ্বারা; **বিমনাঃ**—বিরক্ত হয়ে; **যযৌ**—চলে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রাহ্মণ! মহারাজ অঙ্গ ছিলেন অত্যন্ত সুশীল। তিনি অত্যন্ত চরিত্রবান ও সাধু পুরুষ ছিলেন, এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির

প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তা হলে এই প্রকার মহাত্মার বেণের মতো কুসন্তান কিভাবে উৎপন্ন হয়েছিল, যার জন্য তিনি বিরক্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন?

তাৎপর্য

গৃহস্থ জীবনে মানুষের পিতা, মাতা, পত্নী এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে জীবন যাপন করার কথা, কিন্তু কখনও কখনও কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে পিতা, মাতা, পুত্র অথবা পত্নী শত্রুতে পরিণত হন। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, পিতা যদি অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হন, তা হলে তিনি শত্রু হন, মাতা যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, তা হলে তিনি শত্রু হন, পত্নী যদি অত্যন্ত সুন্দরী হন, তাহলে তিনি শত্রু হন, এবং পুত্র যদি মূর্খ হয়, তা হলে সে শত্রু হয়। এইভাবে পরিবারের সদস্যরা যখন শত্রুতে পরিণত হয়, তখন পরিবারে থাকা অথবা গৃহস্থ জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। জড় জগতে সাধারণত এই প্রকার পরিস্থিতি প্রায়ই দেখা যায়। তাই বৈদিক সংস্কৃতিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পঞ্চাশ বছর বয়সের পর গৃহত্যাগ করতে, যাতে জীবনের বাকি সময় কৃষ্ণভক্তি বিকাশের চেষ্টায় সদ্ব্যবহার করা যায়।

শ্লোক ২২

কিং বাংহো বেণ উদ্দিশ্য ব্রহ্মদণ্ডমযূযুজন্ ।
দণ্ডব্রতধরে রাজ্ঞি মুনয়ো ধর্মকোবিদাঃ ॥ ২২ ॥

কিম্—কেন; **বা**—ও; **অংহঃ**—পাপকর্ম; **বেণে**—বেণকে; **উদ্দিশ্য**—দেখে; **ব্রহ্ম-দণ্ডম্**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ; **অযূযুজন্**—দিতে চেয়েছিল; **দণ্ড-ব্রত-ধরে**—যিনি শাসনদণ্ড ধারণ করেন; **রাজ্ঞি**—রাজাকে; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **ধর্ম-কোবিদাঃ**—যাঁরা ধর্মের অনুশাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—ধর্মজ্ঞ মহর্ষিরা কেন শাসন-দণ্ড ধারণকারী রাজা বেণকে ব্রহ্মশাপ দিয়েছিলেন?

তাৎপর্য

রাজা সকলকে দণ্ডদান করতে পারেন, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মহর্ষিরা রাজাকে দণ্ড দিয়েছেন। রাজা নিশ্চয়ই কোনও গর্হিত অপরাধ করেছিলেন, তা না হলে সব চাইতে সহিষ্ণু এবং ধার্মিক মহর্ষিরা তাঁদের মহৎ ধর্মচেতনা সত্ত্বেও,

কেন তাঁকে শাস্তি দেবেন? এখানে এও বোঝা যায় যে, রাজা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন না। রাজার উপরে ছিল ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণ, এবং প্রয়োজন হলে ব্রাহ্মণেরা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারতেন অথবা বধ করতে পারতেন। তাঁরা কোন অস্ত্র দিয়ে বধ করতেন না, মন্ত্র বা ব্রহ্মশাপের দ্বারা বধ করতেন। ব্রাহ্মণেরা এত শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা যদি কাউকে অভিশাপ দিতেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হত।

শ্লোক ২৩

নাবধ্যেয়ঃ প্রজাপালঃ প্রজাভিরঘবানপি ।
যদসৌ লোকপালানাং বিভর্ত্যোজঃ স্বতেজসা ॥ ২৩ ॥

ন—কখনই না; **অবধ্যেয়ঃ**—অপমান করা উচিত; **প্রজা-পালঃ**—রাজা; **প্রজাভিঃ**—প্রজাদের দ্বারা; **অঘবান্**—পাপপূর্ণ; **অপি**—হওয়া সত্ত্বেও; **যৎ**—যেহেতু; **অসৌ**—তিনি; **লোক-পালানাম্**—বহু রাজাদের; **বিভর্তি**—পালন করেন; **ওজঃ**—বীর্য; **স্ব-তেজসা**—ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা।

অনুবাদ

প্রজাদের কর্তব্য হচ্ছে, রাজা যদি কখনও অত্যন্ত পাপপূর্ণ আচরণ করেও থাকেন, তবুও তাঁকে অপমান না করা। কারণ তিনি তাঁর তেজের দ্বারা অন্য সমস্ত শাসকদের থেকে অধিক প্রভাবশালী।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতিতে রাজা হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। তাঁকে বলা হয় নর-নারায়ণ, যা ইঙ্গিত করে যে, পরম পুরুষ ভগবান নারায়ণ মানব-সমাজে রাজারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই কোনও রাজা পাপাচারী মনে হলেও, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের কখনও অপমান না করাই প্রজাদের শিষ্টাচার। কিন্তু বেণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি নরদেবতাদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, অতএব, বোঝা যায় যে, তিনি অত্যন্ত গর্হিত পাপকর্ম করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ সুনীথাত্মজচেষ্টিতম্ ।
শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; **আখ্যাহি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **মে**—আমার কাছে; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **সুনীথা-আত্মজ**—সুনীথার পুত্র বেণের; **চেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **শ্রদ্দধানায়**—শ্রদ্ধাবান; **ভক্তায়**—আপনার ভক্তকে; **ত্বম্**—আপনি; **পর-অবর**—অতীত এবং ভবিষ্যৎ সহ; **বিৎ-তমঃ**—তত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

বিদুর মৈত্রেয়কে অনুরোধ করলেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনি অতীত এবং ভবিষ্যৎ উভয় কালের সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে খুব ভালভাবে অবগত আছেন। তাই বেণ রাজার সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি আপনার কাছে শুনতে চাই। আমি আপনার শ্রদ্ধাবান ভক্ত, তাই দয়া করে আপনি তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

বিদুর মৈত্রেয়কে তাঁর গুরুদেবরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শিষ্য সর্বদা তাঁর গুরুর কাছে প্রশ্ন করেন, এবং শ্রীগুরুদেব সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন, যদি শিষ্য অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং শ্রদ্ধাবান হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীগুরুদেবের কৃপার ফলে, শিষ্য ভগবানের কৃপা-আশীর্বাদ লাভ করেন। শিষ্য যদি অত্যন্ত বিনীত এবং শ্রদ্ধাশীল না হয়, তা হলে শ্রীগুরুদেব তার কাছে দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করতে আগ্রহী হন না। *ভগবদ্গীতায়* দিব্য জ্ঞান লাভ করার পন্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করতে হয়।

শ্লোক ২৫

মৈত্রেয় উবাচ

অঙ্গোঽশ্বমেধং রাজর্ষিরাজহার মহাক্রতুম্ ।
নাজগ্মুর্দেবতাস্তস্মিন্নাহূতা ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় উত্তর দিলেন; **অঙ্গঃ**—রাজা অঙ্গ; **অশ্ব-মেধম্**—অশ্বমেধ যজ্ঞ; **রাজ-ঋষিঃ**—রাজর্ষি; **আজহার**—সম্পাদন করেছিলেন; **মহা-ক্রতুম্**—মহাযজ্ঞ; **ন**—না; **আজগ্মুঃ**—এসেছিলেন; **দেবতাঃ**—দেবগণ; **তস্মিন্**—সেই যজ্ঞে; **আহূতাঃ**—নিমন্ত্রিত হয়ে; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী ব্রাহ্মণদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় উত্তর দিলেন—হে বিদুর! এক সময় মহান রাজা অঙ্গ অশ্বমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত সমস্ত অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা জানতেন, কিভাবে দেবতাদের আহ্বান করতে হয়, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সত্ত্বেও কোন দেবতা সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে আসেননি।

তাৎপর্য

বৈদিক যজ্ঞ কোন সাধারণ অনুষ্ঠান নয়। এই সমস্ত যজ্ঞে স্বর্গের দেবতারা অংশ গ্রহণ করতেন, এবং উৎসর্গীকৃত পশুরা নতুন জীবন লাভ করত। এই কলিযুগে দেবতাদের আহ্বান করার মতো অথবা পশুদের নতুন জীবন দান করার মতো শক্তিশালী ব্রাহ্মণ নেই। পুরাকালে বৈদিক মন্ত্রে পারঙ্গত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের শক্তি প্রদর্শন করতে পারতেন, কিন্তু এই যুগে, এই প্রকার ব্রাহ্মণের অভাবে, এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়েছে। যে যজ্ঞে অশ্ব উৎসর্গ করা হয়, সেই যজ্ঞকে বলা হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ। কখনও কখনও যজ্ঞে বৃষ উৎসর্গ করা হত *(গবালম্ভ)*, খাবার জন্য নয়, তাদের নতুন জীবন দান করে মন্ত্রের শক্তি প্রদর্শন করার জন্য। তাই এই যুগে একমাত্র ব্যবহারিক যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ, অর্থাৎ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করা।

শ্লোক ২৬

তমূচুর্বিস্মিতাস্তত্র যজমানমথর্ত্বিজঃ ।
হবীংষি হূয়মানানি ন তে গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

তম্—রাজা অঙ্গকে; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্যান্বিত হয়ে; **তত্র**—তখন; **যজমানম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীকে, **অথ**—তার পর; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতরা; **হবীংষি**—ঘৃত আহুতি; **হূয়মানানি**—নিবেদন করে; **ন**—না; **তে**—তাঁরা; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করছেন; **দেবতাঃ**—দেবতারা।

অনুবাদ

সেই যজ্ঞে নিযুক্ত পুরোহিতরা তখন রাজা অঙ্গকে বললেন—হে রাজন্! আমরা যথাযথভাবে যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেবতারা তা গ্রহণ করছেন না।

শ্লোক ২৭

রাজন্ হবীংষ্যদুষ্টানি শ্রদ্ধয়াসাদিতানি তে ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি যোজিতানি ধৃতব্রতৈঃ ॥ ২৭ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **হবীংষি**—যজ্ঞের হবী বা আহুতি দেওয়ার সামগ্রী; **অদুষ্টানি**—দূষিত নয়; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা এবং সাবধানতা সহকারে; **আসাদিতানি**—সংগ্রহ করা হয়েছে, **তে**—আপনার, **ছন্দাংসি**—মন্ত্রসমূহ, **অযাত-যামানি**—ন্যূন নয়, **যোজিতানি**—যথাযথভাবে সম্পাদিত, **ধৃত ব্রতৈঃ**—সুযোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমরা জানি যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সকল সামগ্রী আপনি গভীর শ্রদ্ধা এবং সাবধানতা সহকারে সংগ্রহ করেছেন, এবং তা দূষিত নয়। আমাদের উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রও বীর্যহীন নয়, কারণ উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতরা যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী, এবং এই যজ্ঞ তাঁরা দক্ষতা সহকারে অনুষ্ঠান করছেন।

তাৎপর্য

বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারণ করেন। মন্ত্র এবং সংস্কৃত শব্দ উভয়ই ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হয়, তা না হলে মন্ত্র সফল হয় না। এই যুগে ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নয় এবং তাদের আচার-আচরণও শুদ্ধ নয়। কিন্তু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করার ফলে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ লাভ প্রাপ্ত হওয়া যায় হরেকৃষ্ণ মন্ত্র যদি যথাযথভাবে উচ্চারণ নাও করা হয়, তবুও তার শক্তি এমনই যে, কীর্তনকারী তার ফল লাভ করেন

শ্লোক ২৮

ন বিদামেহ দেবানাং হেলনং বয়মণ্বপি ।
যন্ন গৃহ্ণন্তি ভাগান্ স্বান্ যে দেবাঃ কর্মসাক্ষিণঃ ॥ ২৮ ॥

ন—না, **বিদাম**—খুঁজে পাওয়া; **ইহ**—এই সম্পর্কে; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **হেলনম্**—অপমান, অবহেলা, **বয়ম্**—আমরা, **অণু**—স্বল্প; **অপি**—ও; **যৎ**—যার ফলে; **ন**—না; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করা; **ভাগান্**—ভাগ, **স্বান্**—নিজেদের; **যে**—যে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **কর্ম-সাক্ষিণঃ**—যজ্ঞের সাক্ষী।

অনুবাদ

হে রাজন্! দেবতারা যে কেন অপমানিত অথবা উপেক্ষিত বলে অনুভব করবেন, তার কোন কারণও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও যজ্ঞের সাক্ষী দেবতারা তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন না। কেন যে এই রকম হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি না।

তাৎপর্য

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরোহিতরা যদি কোন প্রকার অবহেলা করেন, তা হলে দেবতারা তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন না. তেমনই ভগবদ্ভক্তিতে সেবাপরাধ নামক অপরাধ রয়েছে। মন্দিরে যাঁরা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের পূজা করেন, তাঁদের এই প্রকার সেবাপরাধ না করার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হয়। সেবাপরাধ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আমরা যদি শ্রীবিগ্রহের সেবা করার অভিনয় করি, কিন্তু সেবাপরাধ সম্বন্ধে সাবধান না হই, তা হলে এই প্রকার অভক্তের কাছ থেকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ কোন নিবেদন গ্রহণ করেন না। তাই মন্দিরে ভগবানের পূজায় যুক্ত ভক্তদের কখনও কোন রকম মনগড়া পন্থা তৈরি না করে, নিষ্ঠাসহকারে পবিত্রতার বিধি নিষেধগুলি পালন করা উচিত, এবং তা হলেই তাঁদের নৈবেদ্য ভগবান গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ২৯

মৈত্রেয় উবাচ

অঙ্গো দ্বিজবচঃ শ্রুত্বা যজমানঃ সুদুর্মনাঃ ।
তৎপ্রষ্টুং ব্যসৃজদ্বাচং সদস্যাংস্তদনুজ্ঞয়া ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিলেন; **অঙ্গঃ**—রাজা অঙ্গ; **দ্বিজ-বচঃ**—ব্রাহ্মণদের বাণী; **শ্রুত্বা**—শুনে; **যজমানঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী; **সুদুর্মনাঃ**—অন্তরে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে; **তৎ**—সেই বিষয়ে; **প্রষ্টুম্**—জিজ্ঞাসা করার জন্য; **ব্যসৃজৎ বাচম্**—তিনি বলেছিলেন; **সদস্যান্**—পুরোহিতদের; **তৎ**—তাঁদের; **অনুজ্ঞয়া**—অনুমতি গ্রহণপূর্বক।

অনুবাদ

সেই প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় বললেন যে, পুরোহিতদের সেই কথা শুনে রাজা অঙ্গ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। তখন তিনি পুরোহিতদের কাছ থেকে কিছু বলার অনুমতি নিয়ে, সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সমস্ত পুরোহিতদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

নাগচ্ছন্ত্যাহুতা দেবা ন গৃহ্ণন্তি গ্রহানিহ ।
সদসস্পতয়ো ব্রূত কিমবদ্যং ময়া কৃতম্ ॥ ৩০ ॥

ন—না, **আগচ্ছন্তি**—আসছে; **আহুতাঃ**—আমন্ত্রিত হয়ে; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ন**—না; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করছেন; **গ্রহান্**—ভাগ; **ইহ**—এই যজ্ঞে, **সদসঃ-পতয়ঃ**—হে পুরোহিতগণ; **ব্রূত**—দয়া করে আমাকে বলুন; **কিম্**—কি; **অবদ্যম্**—অপরাধ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **কৃতম্**—করা হয়েছে।

অনুবাদ

পুরোহিতদের সম্বোধন করে রাজা অঙ্গ বললেন—হে পুরোহিতগণ! দয়া করে আমাকে বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি। দেবতারা আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা এই যজ্ঞে আসছেন না এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন না।

শ্লোক ৩১

সদসস্পতয় ঊচুঃ
নরদেবেহ ভবতো নাঘং তাবন্মনাক্ স্থিতম্ ।
অস্ত্যেকং প্রাক্তনমঘং যদিহেদৃক্ ত্বমপ্রজঃ ॥ ৩১ ॥

সদসঃ-পতয়ঃ ঊচুঃ—প্রধান পুরোহিতগণ বললেন; **নর-দেব**—হে রাজন্; **ইহ**—এই জীবনে; **ভবতঃ**—আপনার; **ন**—না; **অঘম্**—পাপ; **তাবৎ মনাক্**—স্বল্পমাত্রও; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **অস্তি**—আছে; **একম্**—এক; **প্রাক্তনম্**—পূর্ব জীবনে; **অঘম্**—পাপ; **যৎ**—যার দ্বারা; **ইহ**—এই জীবনে; **ঈদৃক**—এই প্রকার; **ত্বম্**—আপনি; **অপ্রজঃ**—পুত্রহীন।

অনুবাদ

প্রধান পুরোহিতগণ বললেন—হে রাজন্! এই জীবনে আপনার কোন পাপ নেই, এমন কি আপনার মনেও কোন পাপ নেই। কিন্তু পূর্ব জীবনে আপনি পাপ করেছিলেন, যার ফলে অত্যন্ত ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও, আপনার কোন পুত্র সন্তান নেই।

তাৎপর্য

বিবাহ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্র সন্তান লাভ করা, কারণ পিতা তথা পূর্বপুরুষদের নারকীয় বদ্ধ জীবন থেকে উদ্ধার করার জন্য পুত্রসন্তানের প্রয়োজন হয়। চাণক্য পণ্ডিত তাই বলেছেন, *পুত্রহীনং গৃহং শূন্যম্*—পুত্রহীন দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত জঘন্য। রাজা অঙ্গ এই জীবনে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে, তিনি অপুত্রক ছিলেন। অতএব বুঝতে হবে যে, কেউ যদি অপুত্রক হয়, তা হলে তার কারণ হচ্ছে তার পূর্বজন্মকৃত পাপ।

শ্লোক ৩২

তথা সাধয় ভদ্রং তে আত্মানং সুপ্রজং নৃপ ।
ইষ্টস্তে পুত্রকামস্য পুত্রং দাস্যতি যজ্ঞভুক্ ॥ ৩২ ॥

তথা—অতএব; **সাধয়**—প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন; **ভদ্রম্**—কল্যাণ হোক; **তে**—আপনার; **আত্মানম্**—আপনার নিজের; **সু-প্রজম্**—সুসন্তান; **নৃপ**—হে রাজন্; **ইষ্টঃ**—পূজিত হয়ে; **তে**—আপনার দ্বারা; **পুত্র-কামস্য**—পুত্র লাভের বাসনায়; **পুত্রম্**—পুত্র; **দাস্যতি**—তিনি দান করবেন; **যজ্ঞ-ভুক্**—যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি অপুত্রক, কিন্তু আপনি যদি ভগবানের কাছে পুত্র লাভের জন্য প্রার্থনা করেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন, তা হলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান আপনার বাসনা পূর্ণ করবেন।

শ্লোক ৩৩

তথা স্বভাগধেয়ানি গ্রহীষ্যন্তি দিবৌকসঃ ।
যদ্যজ্ঞপুরুষঃ সাক্ষাদপত্যায় হরির্বৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

তথা—তখন; **স্ব-ভাগ-ধেয়ানি**—তাঁদের যজ্ঞভাগ; **গ্রহীষ্যন্তি**—গ্রহণ করবেন; **দিব-ওকসঃ**—সমস্ত দেবতারা; **যৎ**—যেহেতু; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **অপত্যায়**—পুত্রের জন্য; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বৃতঃ**—আমন্ত্রিত হয়েছেন।

অনুবাদ

যখন যজ্ঞপুরুষ হরি আপনার পুত্র লাভের বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমন্ত্রিত হবেন, তখন সমস্ত দেবতারা তাঁর সঙ্গে আসবেন এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করবেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা; এবং শ্রীবিষ্ণু যখন যজ্ঞস্থলে আসতে সম্মত হন, তখন সমস্ত দেবতারা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের প্রভুর অনুগমন করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, দেবতাদের উদ্দেশ্যে নয়।

শ্লোক ৩৪

তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাযান্ যান্ কাময়তে জনঃ ।
আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

তান্ তান্—সেই সমস্ত; **কামান্**—ঈপ্সিত বস্তু; **হরিঃ**—ভগবান; **দদ্যাৎ**—দান করবেন; **যান্ যান্**—যা কিছু; **কাময়তে**—কামনা করা হয়; **জনঃ**—ব্যক্তি; **আরাধিতঃ**—পূজিত হয়ে; **যথা**—যেমন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **এষঃ**—ভগবান; **তথা**—তেমনই; **পুংসাম্**—মানুষদের; **ফল-উদয়ঃ**—ফল।

অনুবাদ

যজ্ঞকর্তা (কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত) যে বাসনা নিয়ে ভগবানের পূজা করে, তার সেই বাসনা পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, উপাসক যে-বাসনা নিয়ে তাঁর উপাসনা করে, সেই অনুসারে তিনি তার বাসনা চরিতার্থ করেন। ভগবান এই জগতের সমস্ত বদ্ধ জীবেদের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভক্তদের তিনি বলেন যে, এই প্রকার কর্ম না করে তাঁর শরণাগত হওয়াই শ্রেয়স্কর, কারণ তিনি তাঁর ভক্তের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ভক্ত এবং সকাম কর্মীর মধ্যে এই হচ্ছে পার্থক্য। সকাম কর্মী কেবল তার নিজের কর্মের ফল ভোগ

করে, কিন্তু ভক্ত ভগবানের পরিচালনায় ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করে তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন। এই শ্লোকে *কামান্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের বাসনা'। ভক্ত সমস্ত *কামান্* থেকে মুক্ত। তিনি অন্যাভিলাষিতা-শূন্য। ভগবদ্ভক্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করা। সেটিই কর্মী এবং ভক্তের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৫

ইতি ব্যবসিতা বিপ্রাস্তস্য রাজ্ঞঃ প্রজাতয়ে ।
পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবসিতাঃ**—স্থির করে; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **তস্য**—তাঁর; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **প্রজাতয়ে**—পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে; **পুরোডাশম্**—যজ্ঞের সামগ্রী; **নিরবপন্**—নিবেদন করেছিলেন; **শিপি-বিষ্টায়**—যজ্ঞাগ্নিতে অবস্থিত ভগবানকে; **বিষ্ণবে**—শ্রীবিষ্ণুকে।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা অঙ্গের পুত্র-লাভের উদ্দেশ্যে, তাঁরা সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত শ্রীবিষ্ণুর প্রতি আহুতি প্রদান করতে মনস্থ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞবিধি অনুসারে, কখনও কখনও যজ্ঞস্থলে পশুবলি দেওয়া হয়। এই প্রকার বলি পশুবধের জন্য নয়, পক্ষান্তরে তাদের নতুন জীবন দান করার জন্য। বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারিত হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া হত। কখনও কখনও গবেষণাগারে ছোট ছোট পশুদের উপর ঔষধের প্রভাব পরীক্ষা করা হয় এবং তার ফলে পশুদের মৃত্যু হয়। ওষুধের গবেষণাগারে এই সমস্ত পশুরা পুনরুজ্জীবিত হয় না, কিন্তু যজ্ঞস্থলে যখন পশুবলি দেওয়া হত, তখন বৈদিক মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হত। এই শ্লোকে *শিপি-বিষ্টায়* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *শিপি* শব্দটির অর্থ যজ্ঞাগ্নির শিখা। যজ্ঞাগ্নিতে যখন আহুতি নিবেদন করা হয়, তখন অগ্নিশিখারূপে ভগবান তাতে অবস্থান করেন। ভগবান বিষ্ণু তাই শিপিবিষ্ট নামে পরিচিত।

শ্লোক ৩৬

তস্মাৎপুরুষ উত্তস্থৌ হেমমাল্যমলাম্বরঃ ।
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সিদ্ধমাদায় পায়সম্ ॥ ৩৬ ॥

তস্মাৎ—সেই অগ্নি থেকে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **উত্তস্থৌ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **হেম-মালী**—সোনার মালা; **অমল-অম্বরঃ**—শুভ্র বস্ত্র পরিহিত; **হিরণ্ময়েন**—হিরণ্ময়; **পাত্রেণ**—পাত্রে; **সিদ্ধম্**—পক্ব; **আদায়**—বহন করেছিলেন; **পায়সম্**—পায়েস।

অনুবাদ

যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার মাধ্যমেই, যজ্ঞাগ্নি থেকে সুবর্ণ মাল্যভূষিত এবং শ্বেত বস্ত্র পরিহিত এক পুরুষ আবির্ভূত হলেন। তিনি একটি স্বর্ণপাত্রে পায়েস নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

স বিপ্রানুমতো রাজা গৃহীত্বাঞ্জলিনৌদনম্ ।
অবঘ্রায় মুদা যুক্তঃ প্রাদাৎপত্ন্যা উদারধীঃ ॥ ৩৭ ॥

সঃ—তিনি; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **অনুমতঃ**—অনুমতি গ্রহণ করে; **রাজা**—রাজা; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **অঞ্জলিনা**—অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে; **ওদনম্**—পায়েস; **অবঘ্রায়**—আঘ্রাণ করে; **মুদা**—অত্যন্ত আনন্দ; **যুক্তঃ**—সহকারে; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **পত্ন্যৈ**—তাঁর পত্নীকে; **উদার-ধীঃ**—উদারচিত্ত।

অনুবাদ

রাজা ছিলেন অত্যন্ত উদার, এবং ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে, তিনি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই পায়েস গ্রহণ করেছিলেন, এবং তার ঘ্রাণ গ্রহণ করে তিনি তাঁর পত্নীকে তা প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *উদার-ধীঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। রাজার পত্নী সুনীথা সেই আশীর্বাদ গ্রহণের যোগ্য ছিল না; তবুও রাজা এতই উদার ছিলেন যে, কোন রকম দ্বিধা না করে তিনি যজ্ঞপুরুষ থেকে প্রাপ্ত সেই পায়েস তাঁর পত্নীকে দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে সব কিছুই ঘটে পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে। পরবর্তী

শ্লোকগুলির মাধ্যমে দেখা যাবে যে, সেই ঘটনাটি রাজার পক্ষে অনুকূল হয়নি। রাজা যেহেতু অত্যন্ত উদার ছিলেন, তাই জড় জগতের প্রতি তাঁর বিরক্তি বর্ধন করার জন্য, ভগবান চেয়েছিলেন যে, রানীর গর্ভে এক অত্যন্ত নিষ্ঠুর পুত্রের জন্ম হোক, যার ফলে রাজাকে গৃহত্যাগ করতে হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান বিষ্ণু কর্মীদের বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু তাঁর ভক্তদের বাসনা তিনি ভিন্নভাবে পূর্ণ করেন, যাতে ভক্ত ধীরে ধীরে তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে *(দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে)*। ভগবান তাঁর ভক্তকে ক্রমশ পারমার্থিক উন্নতি সাধন করার সুযোগ দেন, যাতে তাঁর ভক্ত ভগবদ্ধামে তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারেন।

শ্লোক ৩৮

সা তৎপুংসবনং রাজ্ঞী প্রাশ্য বৈ পত্যুরাদধে ।
গর্ভং কাল উপাবৃত্তে কুমারং সুষুবেঽপ্রজা ॥ ৩৮ ॥

সা—তিনি; **তৎ**—সেই পায়েস; **পুম্‌-সবনম্**—যার ফলে পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়; **রাজ্ঞী**—রানী; **প্রাশ্য**—ভক্ষণ করে; **বৈ**—যথার্থই; **পত্যুঃ**—তাঁর পতি থেকে; **আদধে**—ধারণ করেছিলেন; **গর্ভম্**—গর্ভ; **কালে**—যথা সময়ে; **উপাবৃত্তে**—সমুপস্থিত হলে; **কুমারম্**—একটি পুত্র; **সুষুবে**—জন্ম দিয়েছিলেন; **অপ্রজা**—পুত্রহীন।

অনুবাদ

পুত্রহীনা রানী সুনীথা পুত্রোৎপাদক সেই পায়েস ভক্ষণ করে তাঁর পতির সাহচর্যে গর্ভবতী হন, এবং যথা সময়ে এক পুত্র প্রসব করেছিলেন।

তাৎপর্য

দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একটি হচ্ছে *পুংসবনম্*। এই সংস্কারে পত্নীকে ভগবানের প্রসাদ দেওয়া হয়, যাতে পতির সঙ্গে সহবাসের ফলে তিনি গর্ভবতী হতে পারেন।

শ্লোক ৩৯

স বাল এব পুরুষো মাতামহমনুব্রতঃ ।
অধর্মাংশোদ্ভবং মৃত্যুং তেনাভবদধার্মিকঃ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—সেই; **বালঃ**—বালক; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **মাতা-মহম্**—মাতামহ; **অনুব্রতঃ**—অনুগামী; **অধর্ম**—অধর্মের; **অংশে**—অংশ থেকে; **উদ্ভবম্**—উদ্ভূত; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **তেন**—তার দ্বারা; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **অধার্মিকঃ**—অধার্মিক।

অনুবাদ

সেই বালকটির জন্ম হয়েছিল আংশিকভাবে অধর্মের বংশে। তার মাতামহ ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যু, এবং সে তার মাতামহের অনুগত হয়েছিল; তার ফলে সে অত্যন্ত অধার্মিক হয়েছিল।

তাৎপর্য

সেই শিশুটির মাতা সুনীথা ছিল মৃত্যুর কন্যা। সাধারণত কন্যা পিতার গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং পুত্র মাতার গুণ প্রাপ্ত হয়। অতএব, এক বস্তুর সমান অন্য বস্তুগুলিও পরস্পর সমান, এই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ অনুসারে, রাজা অঙ্গের পুত্র তাঁর মাতামহের অনুগামী হয়েছিল। *স্মৃতিশাস্ত্র* অনুসারে, ছেলেরা সাধারণত মাতুলালয়ের নিয়মের অনুগামী হয়। *নরাণাং মাতুল-ক্রম* কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, শিশু সাধারণত মাতার পরিবারের গুণাবলী অনুসরণ করে। যদি মাতৃকুল দুশ্চরিত্র অথবা পাপী হয়, তা হলে সৎ পিতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও, মাতৃকুলের শিকার হয়। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে তাই বিবাহের পূর্বে পাত্র এবং কন্যা উভয়েই বংশের তালিকা বিচার করা হয়। জ্যোতিষ গণনা অনুসারে যদি মিল হয়, তা হলে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু কখনও কখনও যদি সেই গণনায় ভুল হয়, তা হলে গার্হস্থ্য জীবন নৈরাশ্যজনক হয়।

এখানে বোঝা যায় যে, সুনীথা রাজা অঙ্গের সুপত্নী ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন মৃত্যুর কন্যা। কখনও কখনও ভগবান তাঁর ভক্তকে এমন এক পত্নী প্রদান করেন, যার ফলে তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ভগবান তাঁর ভক্তের জন্য এই প্রকার আয়োজন করেন, যাতে ভক্ত ধীরে ধীরে তাঁর পত্নী ও গৃহের প্রতি বিরক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারেন। এখানে দেখা যায় যে, ভগবানের আয়োজন অনুসারে রাজা অঙ্গ এক পুণ্যবান ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সুনীথার মতো কুপত্নী এবং তার পর বেণের মতো এক কু-পুত্র লাভ করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে তিনি সংসার-বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

স শরাসনমুদ্যম্য মৃগয়ুর্বনগোচরঃ ।
হন্ত্যসাধুর্মৃগান্ দীনান্ বেণোঽসাবিত্যরৌজ্জনঃ ॥ ৪০ ॥

সঃ—বেণ নামক সেই বালক; **শরাসনম্**—তার ধনুক; **উদ্যম্য**—নিয়ে; **মৃগয়ুঃ**—শিকারী; **বন-গোচরঃ**—বনে গিয়ে; **হন্তি**—বধ করত; **অসাধুঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে, **মৃগান্**—হরিণ; **দীনান্**—হতভাগ্য; **বেণঃ**—বেণ; **অসৌ**—এখানে এসেছে; **ইতি**—এইভাবে; **অরৌৎ**—চিৎকার করত; **জনঃ**—জনতা।

অনুবাদ

সেই নিষ্ঠুর বালক ধনুর্বাণ নিয়ে বনে গিয়ে, অকারণে নিরীহ হরিণদের বধ করত। তাকে আসতে দেখা মাত্রই পুরজনেরা চিৎকার করত, "নিষ্ঠুর বেণ আসছে! নিষ্ঠুর বেণ আসছে!"

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয়দের জন্য মৃগয়া অনুমোদন করা হয়েছে বধ করার কৌশল শেখার জন্য, আহারের জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে পশুবধ করার জন্য নয়। ক্ষত্রিয় রাজাদের কখনও কখনও অপরাধীর মাথা ছেদন করতে হত। সেই জন্য ক্ষত্রিয়দের বনে শিকার করার অনুমতি ছিল। যেহেতু রাজা অঙ্গের পুত্র বেণের জন্ম হয়েছিল এক কুমাতার গর্ভে, তাই সে ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, এবং সে বনে গিয়ে অনর্থক পশুহত্যা করত। তার উপস্থিতিতে সকলেই অত্যন্ত ভীত হত এবং তারা চিৎকার করে বলত, "বেণ আসছে! বেণ আসছে!" এইভাবে জীবনের শুরু থেকেই সে প্রজাদের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল।

শ্লোক ৪১

আক্রীড়ে ক্রীড়তো বালান্ বয়স্যানতিদারুণঃ ।
প্রসহ্য নিরনুক্রোশঃ পশুমারমমারয়ৎ ॥ ৪১ ॥

আক্রীড়ে—খেলার মাঠে; **ক্রীড়তঃ**—খেলার সময়; **বালান্**—বালকদের; **বয়স্যান্**—তার সমবয়স্ক; **অতি-দারুণঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **নিরনুক্রোশঃ**—নির্দয়ভাবে; **পশু-মারম্**—পশুর মতো; **অমারয়ৎ**—হত্যা করত।

অনুবাদ

সেই বালক এত নিষ্ঠুর ছিল যে, খেলার সময় সে তার সমবয়স্ক বালকদের পশুর মতো হত্যা করত।

শ্লোক ৪২

তং বিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসনৈর্বিবিধৈর্নৃপঃ ।
যদা ন শাসিতুং কল্পো ভৃশমাসীৎসুদুর্মনাঃ ॥ ৪২ ॥

তম্—তাকে; **বিচক্ষ্য**—দেখে; **খলম্**—নিষ্ঠুর; **পুত্রম্**—পুত্র; **শাসনৈঃ**—দণ্ড দ্বারা; **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার; **নৃপঃ**—রাজা; **যদা**—যখন; **ন**—না; **শাসিতুম্**—নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার জন্য; **কল্পঃ**—সমর্থ; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **সু-দুর্মনাঃ**—বিষণ্ণ।

অনুবাদ

রাজা অঙ্গ তাঁর পুত্র বেণের নিষ্ঠুর ও নির্দয় আচরণ দর্শন করে, তাকে সংশোধন করার জন্য নানা প্রকার দণ্ড দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে সৎপথে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন না। তার ফলে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

প্রায়েণাভ্যর্চিতো দেবো যেঽপ্রজা গৃহমেধিনঃ ।
কদপত্যভৃতং দুঃখং যে ন বিন্দন্তি দুর্ভরম্ ॥ ৪৩ ॥

প্রায়েণ—সম্ভবত; **অভ্যর্চিতঃ**—পূজিত হয়েছিলেন; **দেবঃ**—ভগবান; **যে**—যারা; **অপ্রজাঃ**—অপুত্রক; **গৃহ-মেধিনঃ**—গৃহস্থ; **কদ্-অপত্য**—কুসন্তানের দ্বারা; **ভৃতম্**—উৎপন্ন; **দুঃখম্**—দুঃখ; **যে**—যারা; **ন**—না; **বিন্দন্তি**—কষ্টভোগ করে; **দুর্ভরম্**—অসহ্য।

অনুবাদ

রাজা মনে মনে ভাবলেন—যাঁরা অপুত্রক তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। তাঁরা অবশ্যই পূর্বজন্মে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, যার ফলে কুপুত্রের দ্বারা তাঁদের অসহ্য দুঃখভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ৪৪

যতঃ পাপীয়সী কীর্তিরধর্মশ্চ মহান্নৃণাম্ ।
যতো বিরোধঃ সর্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ ॥ ৪৪ ॥

যতঃ—কুপুত্রের কারণে; **পাপীয়সী**—পাপী; **কীর্তিঃ**—যশ; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **চ**—ও; **মহান্**—মহান; **নৃণাম্**—মানুষদের; **যতঃ**—যা থেকে; **বিরোধঃ**—কলহ; **সর্বেষাম্**—সমস্ত মানুষদের; **যতঃ**—যা থেকে; **আধিঃ**—উৎকণ্ঠা; **অনন্তকঃ**—অন্তহীন।

অনুবাদ

পাপী পুত্রের ফলে মানুষের যশ নষ্ট হয়। তার অধর্ম আচরণের ফলে, গৃহে অধর্ম এবং বিরোধের সৃষ্টি হয়, এবং তা কেবল অন্তহীন উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, বিবাহিত দম্পতির পুত্র হওয়া আবশ্যক, তা না হলে তাদের জীবন শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু সদ্‌গুণ-রহিত পুত্র অন্ধচক্ষুর মতো। অন্ধচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু তা থেকে কেবল অসহ্য বেদনাই লাভ হয়। তাই রাজা এই প্রকার কুপুত্র লাভ করে, মনে মনে নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

কস্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ ।
পণ্ডিতো বহু মন্যেত যদর্থাঃ ক্লেশদা গৃহাঃ ॥ ৪৫ ॥

কঃ—কে; **তম্**—তাকে; **প্রজা-অপদেশম্**—নামে মাত্র পুত্র; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **মোহ**—মোহের; **বন্ধনম্**—বন্ধন; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **পণ্ডিতঃ**—বুদ্ধিমান মানুষ; **বহু মন্যেত**—সম্মান করবে; **যৎ-অর্থাঃ**—যার নিমিত্ত; **ক্লেশ-দাঃ**—ক্লেশদায়ক; **গৃহাঃ**—গৃহ।

অনুবাদ

এমন কোন্ বিবেচক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন, যিনি এই প্রকার কুপুত্র কামনা করবেন? এই প্রকার পুত্র জীবের মোহবন্ধনের কারণ ছাড়া আর কিছু নয়, এবং তার নিমিত্ত গৃহ ক্লেশদায়ক হয়ে থাকে।

শ্লোক ৪৬

কদপত্যং বরং মন্যে সদপত্যাচ্ছুচাং পদাৎ ।
নির্বিদ্যেত গৃহান্মর্ত্যো যৎক্লেশনিবহা গৃহাঃ ॥ ৪৬ ॥

কদ্-অপত্যম্—কুপুত্র; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **মন্যে**—আমি মনে করি; **সৎ-অপত্যাৎ**—সুপুত্র থেকে, **শুচাম্**—শোকের; **পদাৎ**—উৎস, **নির্বিদ্যেত**—অনাসক্ত হয়; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল মানুষ; **যৎ**—যার কারণ; **ক্লেশ-নিবহাঃ**—নরক-সদৃশ; **গৃহাঃ**—গৃহ।

অনুবাদ

তার পর রাজা মনে মনে বিচার করেছিলেন—সুপুত্র থেকে কুপুত্র ভাল, কারণ সুপুত্র থেকে গৃহের প্রতি আসক্তির সৃষ্টি হয়, কিন্তু কুপুত্র থেকে তা হয় না। কুপুত্র গৃহকে নরকে পরিণত করে, যার ফলে বুদ্ধিমান মানুষ সহজেই সেই গৃহের প্রতি বিরক্ত হয়।

তাৎপর্য

রাজা গৃহের প্রতি আসক্তি এবং বিরক্তির সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ গৃহকে একটি অন্ধকূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ যদি একটি অন্ধকূপে পতিত হয়, তা হলে সেখান থেকে তার পক্ষে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব সেই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে, ভগবানের শরণাগত হওয়ার জন্য বনে গমন করা উচিত। বৈদিক সভ্যতায় বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু মানুষ তাদের গৃহের প্রতি এতই আসক্ত যে, তারা অন্তিম সময় পর্যন্ত গৃহস্থ জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চায় না। তাই রাজা অঙ্গ বিরক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাঁর কুপুত্রকে গৃহস্থ জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার এক সুন্দর অনুপ্রেরণা বলে মনে করেছিলেন। সেই জন্য তিনি তাঁর কুপুত্রটিকে তাঁর মিত্র বলে মনে করেছিলেন কেননা সে তাঁকে তাঁর গৃহের প্রতি উদাসীন হতে সাহায্য করেছিল। চরমে মানুষকে শিখতে হয় কিভাবে গৃহস্থ জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া যায়। কুপুত্র যদি তাঁর অসৎ আচরণের দ্বারা গৃহস্থকে তাঁর গৃহত্যাগ করতে সাহায্য করে, তা হলে সেটি একটি আশীর্বাদ।

শ্লোক ৪৭

এবং স নির্বিণ্ণমনা নৃপো গৃহা-
ন্নিশীথ উত্থায় মহোদয়োদয়াৎ ।
অলব্ধনিদ্রোঽনুপলক্ষিতো নৃভি-
র্হিত্বা গতো বেণসুবং প্রসুপ্তাম্ ॥ ৪৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **নির্বিণ্ণ-মনাঃ**—উদাসীন হয়ে; **নৃপঃ**—রাজা অঙ্গ; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **নিশীথে**—গভীর রাত্রে; **উত্থায়**—উঠে; **মহা-উদয়-উদয়াৎ**—মহাপুরুষদের আশীর্বাদের ফলে ঐশ্বর্যশালী; **অলব্ধ-নিদ্রঃ**—অনিদ্রিত; **অনুপলক্ষিতঃ**—অজ্ঞাতসারে, **নৃভিঃ**—জনসাধারণের দ্বারা; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **গতঃ**—চলে গিয়েছিল; **বেণ-সুবম্**—বেণের মাতা; **প্রসুপ্তাম্**—গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

অনুবাদ

এইভাবে চিন্তা করে, রাজা অঙ্গ রাত্রে ঘুমাতে পারলেন না। তিনি গৃহস্থ জীবনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়েছিলেন। তাই, একদিন গভীর রাত্রে তিনি শয্যা থেকে উত্থিত হলেন এবং গভীর নিদ্রায় মগ্ন বেণের মাতাকে (তাঁর পত্নীকে) ত্যাগ করে চলে গেলেন। তিনি তাঁর অত্যন্ত ঐশ্বর্যময় রাজ্যের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করেছিলেন, এবং সকলের অজ্ঞাতসারে, তিনি নিঃশব্দে তাঁর গৃহ ও সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মহোদয়োদয়াৎ* শব্দটি সূচিত করে যে, মহাপুরুষদের আশীর্বাদের ফলে জড় ঐশ্বর্য লাভ হয়, কিন্তু কেউ যখন জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তা মহাপুরুষদের আরও বড় আশীর্বাদ। রাজার পক্ষে তাঁর ঐশ্বর্যময় রাজ্য এবং যুবতী পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করা সহজ ছিল না, কিন্তু তিনি যে সেই আসক্তি ত্যাগ করে সকলের অজ্ঞাতসারে বনে যেতে পেরেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে পরমেশ্বর ভগবানের মহান আশীর্বাদ। মহাপুরুষদের এইভাবে গৃহ, পত্নী এবং ধন-সম্পদের সমস্ত আসক্তি বর্জন করে, গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শ্লোক ৪৮

বিজ্ঞায় নির্বিদ্য গতং পতিং প্রজাঃ
পুরোহিতামাত্যসুহৃদ্‌গণাদয়ঃ ।
বিচিক্যুরুর্ব্যামতিশোককাতরা
যথা নিগূঢ়ং পুরুষং কুযোগিনঃ ॥ ৪৮ ॥

বিজ্ঞায়—বুঝতে পেরে; **নির্বিদ্য**—উদাসীন হয়ে; **গতম্**—চলে গেছেন; **পতিম্**—রাজা; **প্রজাঃ**—সমস্ত প্রজারা; **পুরোহিত**—পুরোহিতগণ; **আমাত্য**—মন্ত্রীগণ; **সুহৃৎ**—বন্ধুগণ; **গণ-আদয়ঃ**—এবং জনসাধারণ; **বিচিক্যুঃ**—অন্বেষণ করেছিল; **উর্ব্যাম্**—পৃথিবীর উপর; **অতি-শোক-কাতরাঃ**—অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে; **যথা**—ঠিক যেমন; **নিগূঢ়ম্**—গুপ্ত; **পুরুষম্**—পরমাত্মা; **কু-যোগিনঃ**—অনভিজ্ঞ যোগীগণ।

অনুবাদ

সকলে যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা উদাসীন হয়ে গৃহত্যাগ করেছেন, তখন সমস্ত প্রজারা, পুরোহিতরা, মন্ত্রীরা, সুহৃদেরা এবং জনসাধারণ অত্যন্ত শোকবিহ্বল হয়েছিলেন। তাঁরা পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন অনভিজ্ঞ যোগী তার অন্তরে পরমাত্মার অন্বেষণ করে।

তাৎপর্য

এখানে অনভিজ্ঞ যোগীদের হৃদয়ে পরমাত্মার অন্বেষণের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। বাস্তব বস্তুকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান—এই তিনরূপে উপলব্ধি করা যায়। এই প্রকার কুযোগীরা বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন যোগীরা তাদের মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তারা অন্তর্যামী পরমাত্মাকে খুঁজে পায় না। রাজা যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই কোথা না কোথাও ছিলেন, কিন্তু নাগরিকদের যেহেতু জানা ছিল না কিভাবে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়, তাই তারা কুযোগীদের মতো নিরাশ হয়েছিল।

শ্লোক ৪৯

অলক্ষয়ন্তঃ পদবীং প্রজাপতে-
র্হতোদ্যমাঃ প্রত্যুপসৃত্য তে পুরীম্ ।
ঋষীন্ সমেতানভিবন্দ্য সাশ্রবো
ন্যবেদয়ন্ পৌরব ভর্তৃবিপ্লবম্ ॥ ৪৯ ॥

অলক্ষয়ন্তঃ—খুঁজে না পেয়ে; **পদবীম্**—কোন চিহ্ন; **প্রজাপতেঃ**—রাজা অঙ্গের; **হত-উদ্যমাঃ**—নিরাশ হয়ে; **প্রত্যুপসৃত্য**—ফিরে এসে; **তে**—সেই নাগরিকেরা; **পুরীম্**—নগরে; **ঋষীন্**—মহর্ষিগণ; **সমেতান্**—সমবেত হয়েছিলেন; **অভিবন্দ্য**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে; **স-অশ্রবঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **ন্যবেদয়ন্**—নিবেদন করেছিলেন; **পৌরব**—হে বিদুর; **ভর্তৃ**—রাজার; **বিপ্লবম্**—অনুপস্থিতি।

অনুবাদ

সর্বত্র রাজার অন্বেষণ করা সত্ত্বেও তাঁকে খুঁজে না পেয়ে, নাগরিকেরা অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিলেন, এবং তাঁরা নগরীর সেই স্থানে ফিরে এসেছিলেন, যেখানে রাজ্যের সমস্ত মহর্ষিরা রাজার অনুপস্থিতির ফলে সমবেত হয়েছিলেন। নাগরিকেরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই মহর্ষিদের প্রণতি নিবেদন করে সবিস্তারে তাঁদের জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা কোথায়ও রাজাকে খুঁজে পাননি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ধ্রুব মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

বেণ রাজার কাহিনী

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ভৃগ্বাদয়স্তে মুনয়ো লোকানাং ক্ষেমদর্শিনঃ ।
গোপ্তর্যসতি বৈ নৃণাং পশ্যন্তঃ পশুসাম্যতাম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ভৃগু-আদয়ঃ**—ভৃগু আদি; **তে**—তাঁরা সকলে; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **লোকানাম্**—মানুষদের; **ক্ষেম-দর্শিনঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **গোপ্তরি**—রাজা; **অসতি**—অনুপস্থিতিতে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **নৃণাম্**—সমস্ত নাগরিকদের; **পশ্যন্তঃ**—বুঝতে পেরে; **পশু-সাম্যতাম্**—পশুতুল্য অস্তিত্ব।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে মহাবীর বিদুর! ভৃগু আদি ঋষিরা সর্বদাই জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করতেন। যখন তাঁরা দেখলেন যে, রাজা অঙ্গের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণের হিতসাধন করার মতো কেউ নেই, তখন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শাসক না থাকার ফলে মানুষেরা স্বাধীন এবং অসংযত হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ক্ষেম-দর্শিনঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে যারা সর্বদা জনসাধারণের মঙ্গলকাঙ্ক্ষী। ভৃগু আদি সমস্ত মহর্ষিগণ সর্বদা চিন্তা করেন, কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীদের চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা প্রতিটি গ্রহলোকের রাজাদের উপদেশ দেন, তাঁরা যেন জীবনের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য স্থির রেখে, তাঁদের প্রজাদের শাসন করেন। মহর্ষিগণ রাষ্ট্রপ্রধান বা নৃপতিকে পরামর্শ দিতেন, এবং তাঁদের নির্দেশ অনুসারে তিনি জনগণকে শাসন করতেন। রাজা অঙ্গের নিরুদ্দেশের পর, মহর্ষিদের নির্দেশ পালন করার মতো কেউ ছিল

না। তার ফলে সমস্ত প্রজারা এতই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল যে, পশুদের সাথে তাদের তুলনা করা যেত। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) বর্ণিত হয়েছে, গুণ এবং কর্ম অনুসারে মনুষ্য-সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেক সমাজে বুদ্ধিমান শ্রেণী, শাসক শ্রেণী, উৎপাদক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণী থাকা অবশ্য কর্তব্য। আধুনিক গণতন্ত্রের প্রভাবে এই বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণ-বিভাগ নষ্ট হয়ে গেছে, এবং ভোটের বলে শূদ্রদের প্রশাসকের পদে মনোনীত করা হচ্ছে। জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এই সমস্ত মানুষেরা তাদের খেয়াল-খুশিমতো আইন সৃষ্টি করছে। তার ফলে কেউই সুখী নয়।

শ্লোক ২

বীরমাতরমাহূয় সুনীথাং ব্রহ্মবাদিনঃ ।
প্রকৃত্যসম্মতং বেণমভ্যষিঞ্চন্ পতিং ভুবঃ ॥ ২ ॥

বীর—বেণের; **মাতরম্**—মাতা; **আহূয়**—ডেকে এনে; **সুনীথাম্**—সুনীথা নামক; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—বেদজ্ঞ ঋষিগণ; **প্রকৃতি**—মন্ত্রীদের দ্বারা; **অসম্মতম্**—অমত; **বেণম্**—বেণ; **অভ্যষিঞ্চন্**—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন; **পতিম্**—প্রভু; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ তখন রাজমাতা সুনীথাকে ডেকে এনে, তাঁর অনুমতিক্রমে বেণকে পৃথিবীপতিরূপে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। যদিও তাতে মন্ত্রীদের সম্মতি ছিল না।

শ্লোক ৩

শ্রুত্বা নৃপাসনগতং বেণমত্যুগ্রশাসনম্ ।
নিলিল্যুর্দস্যবঃ সদ্যঃ সর্পত্রস্তা ইবাখবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রুত্বা—শুনে; **নৃপ**—রাজার; **আসন-গতম্**—সিংহাসনে আরোহণ করছেন; **বেণম্**—বেণ; **অতি**—অত্যন্ত; **উগ্র**—কঠোর; **শাসনম্**—দণ্ডদাতা; **নিলিল্যুঃ**—লুকিয়েছিল; **দস্যবঃ**—সমস্ত দস্যুরা; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সর্প**—সাপের থেকে; **ত্রস্তাঃ**—ভীত হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **আখবঃ**—মূষিক।

অনুবাদ

বেণ যে অত্যন্ত কঠোর এবং নিষ্ঠুর ছিল, সেই কথা আগে থেকেই সকলের জানা ছিল; তাই সে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছে শোনা মাত্রই, সমস্ত দস্যু এবং তস্করেরা অত্যন্ত ভীত হয়েছিল, এবং সাপের ভয়ে মূষিক যেমন লুকিয়ে পড়ে, তেমনই তারাও ইতস্তত লুকিয়ে পড়েছিল।

তাৎপর্য

রাষ্ট্র-সরকার যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন দস্যু এবং তস্করেরা প্রবল হয়ে ওঠে। তেমনই, সরকার যদি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, তখন সমস্ত দস্যু-তস্করেরা লুকিয়ে পড়ে। বেণ অবশ্য খুব একটা ভাল রাজা ছিল না, কিন্তু তার নিষ্ঠুরতা এবং কঠোরতা সকলেরই জানা ছিল। তার ফলে রাজ্য অন্তত দস্যু তস্করদের উৎপাত থেকে মুক্ত ছিল।

শ্লোক ৪

স আরূঢ়নৃপস্থান উন্নদ্ধোঽষ্টবিভূতিভিঃ ।
অবমেনে মহাভাগান্ স্তব্ধঃ সম্ভাবিতঃ স্বতঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—রাজা বেণ; **আরূঢ়**—আরোহণ করে; **নৃপ-স্থানঃ**—রাজপদে; **উন্নদ্ধঃ**—অত্যন্ত গর্বিত; **অষ্ট**—আট; **বিভূতিভিঃ**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **অবমেনে**—অপমান করতে শুরু করে; **মহা-ভাগান্**—মহান ব্যক্তিদের; **স্তব্ধঃ**—অবিবেচক; **সম্ভাবিতঃ**—মহান বলে মনে করে; **স্বতঃ**—নিজেকে।

অনুবাদ

রাজসিংহাসনে আরোহণ করে, বেণ অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত হয়ে সর্ব শক্তিমান হয়েছিল। তার ফলে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিল। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। তার ফলে সে মহান ব্যক্তিদের অপমান করতে শুরু করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অষ্ট-বিভূতিভিঃ* শব্দটি, যার অর্থ হচ্ছে 'আট প্রকার ঐশ্বর্যের দ্বারা', অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজার এই অষ্ট ঐশ্বর্য-সমন্বিত হওয়া কর্তব্য। যোগ অভ্যাসের ফলে, রাজারা সাধারণত এই আটটি ঐশ্বর্য লাভ করতেন। অষ্টাঙ্গযোগ

অনুশীলন করে রাজর্ষি অণিমা, গরিমা, প্রাপ্তি ইত্যাদি ঐশ্বর্য লাভ করতেন। রাজর্ষি একটি রাজ্য সৃষ্টি করে, সকলকে বশীভূত করে তাদের শাসন করতে পারতেন। এইগুলি ছিল রাজার কয়েকটি ঐশ্বর্য। রাজা বেণ কিন্তু কখনও যোগ অভ্যাস করেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার রাজপদের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিল। যেহেতু সে খুব একটা বিবেচক ছিল না, তাই সে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে মহান ব্যক্তিদের অপমান করতে শুরু করেছিল.

শ্লোক ৫

এবং মদান্ধ উৎসিক্তো নিরঙ্কুশ ইব দ্বিপঃ ।
পর্যটন্ রথমাস্থায় কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥ ৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **মদ-অন্ধঃ**—ক্ষমতার গর্বে অন্ধ হয়ে; **উৎসিক্তঃ**—দম্ভকারী; **নিরঙ্কুশঃ**—অসংযত; **ইব**—সদৃশ; **দ্বিপঃ**—হস্তী; **পর্যটন্**—বিচরণ করত; **রথম্**—রথে; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **ইব**—বাস্তবিক; **রোদসী**—আকাশ এবং পৃথিবী।

অনুবাদ

তার ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ হয়ে রাজা বেণ রথে আরোহণ করে, অঙ্কুশতাড়ন-রহিত হস্তীর মতো দ্যুলোক এবং ভূলোক কম্পিত করে, তার রাজ্যে বিচরণ করতে লাগল।

শ্লোক ৬

ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ ।
ইতি ন্যবারয়দ্ধর্মং ভেরীঘোষেণ সর্বশঃ ॥ ৬ ॥

ন—না; **যষ্টব্যম্**—কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা; **ন**—না; **দাতব্যম্**—কোন প্রকার দান দেওয়া; **ন**—না; **হোতব্যম্**—হোম করা; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ইতি**—এইভাবে; **ন্যবারয়ৎ**—নিবারণ করেছিল; **ধর্মম্**—ধর্ম অনুষ্ঠান; **ভেরী**—ভেরী; **ঘোষেণ**—শব্দের দ্বারা; **সর্বশঃ**—সর্বত্র।

অনুবাদ

রাজা বেণ ভেরী নিনাদের দ্বারা রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করেছিল যে, ব্রাহ্মণেরা আর কোন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারবেন না, দান করতে পারবেন না বা

হোম আদি ক্রিয়া করতে পারবেন না। অর্থাৎ, সব রকম ধর্ম-অনুষ্ঠান সে বন্ধ করে দিয়েছিল।

তাৎপর্য

বেণ রাজা যা বহু বছর পূর্বে করেছিল, তা এখন সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত নাস্তিক রাষ্ট্র-সরকারগুলি মেনে চলছে। পৃথিবীর অবস্থা এতই সঙ্কটজনক যে, যে-কোন মুহূর্তে সরকারগুলি ঘোষণা করতে পারে যে, সব রকম ধার্মিক অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। তার ফলে পৃথিবীর অবস্থা এতই অধঃপতিত হবে যে, পুণ্যবান ব্যক্তিদের পক্ষে এই পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠবে, তাই সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষদের অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা উচিত, যাতে তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আর জর্জরিত না হয়ে, তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৭

বেণস্যাবেক্ষ্য মুনয়ো দুর্বৃত্তস্য বিচেষ্টিতম্ ।
বিমৃশ্য লোকব্যসনং কৃপয়োচুঃ স্ম সত্রিণঃ ॥ ৭ ॥

বেণস্য—রাজা বেণের; **আবেক্ষ্য**—দেখে; **মুনয়ঃ**—সমস্ত মহর্ষিগণ, **দুর্বৃত্তস্য**—মহা দুরাচারীর; **বিচেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করেছিলেন; **লোক-ব্যসনম্**—জনসাধারণের বিপদ; **কৃপয়া**—কৃপাপরবশ হয়ে; **উচুঃ**—বলেছিলেন; **স্ম**—অতীতে; **সত্রিণঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী।

অনুবাদ

নিষ্ঠুর বেণের অত্যাচার দর্শন করে, সমস্ত মহর্ষিরা একত্রে মিলিত হয়ে বিচার করেছিলেন যে, সারা পৃথিবীর মানুষদের এক মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে। তাই তাঁরা দয়াপরবশ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন, কারণ তাঁরা স্বয়ং যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা বেণের অভিষেকের পূর্বে, মহর্ষিরা সমাজের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন রাজা বেণ অত্যন্ত দায়িত্বহীন, নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী, তখন তাঁরা জনসাধারণের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। ঋষি,

মহাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তরা জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে উদাসীন হন না। সাধারণ কর্মীরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য অর্থ উপার্জন করতে ব্যস্ত থাকে, এবং সাধারণ জ্ঞানীরা তাদের মুক্তির চিন্তায় মগ্ন থেকে সামাজিক ব্যাপার থেকে স্বতন্ত্র থাকে, কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত এবং সাধুরা সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন কিভাবে মানুষ জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই সুখী হতে পারে। তাই মহর্ষিরা আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন, রাজা বেণ কর্তৃক সৃষ্ট সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে জনসাধারণকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়।

শ্লোক ৮

অহো উভয়তঃ প্রাপ্তং লোকস্য ব্যসনং মহৎ ।
দারুণ্যুভয়তো দীপ্তে ইব তস্করপালয়োঃ ॥ ৮ ॥

অহো—হায়; **উভয়তঃ**—উভয় দিক থেকে; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত; **লোকস্য**—জনসাধারণের; **ব্যসনম্**—সঙ্কট; **মহৎ**—অত্যন্ত; **দারুণি**—কাঠ; **উভয়তঃ**—দুই দিক থেকে; **দীপ্তে**—প্রজ্বলিত; **ইব**—সদৃশ; **তস্কর**—দস্যু এবং দুর্বৃত্ত; **পালয়োঃ**—এবং রাজা থেকে।

অনুবাদ

মহর্ষিরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলেন যে, জনসাধারণ উভয় দিক থেকে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। কাঠের উভয় দিক প্রজ্বলিত হলে যেমন তার মধ্যবর্তী পিপীলিকারা ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হয়, ঠিক তেমনই, সেই সময়ে জনসাধারণ একদিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন এক রাজা এবং অন্যদিকে দস্যু-তস্কর আদির মাঝে বিপদাপন্ন হয়েছিল।

শ্লোক ৯

অরাজকভয়াদেষ কৃতো রাজাতদর্হণঃ ।
ততোঽপ্যাসীদ্ভয়ং ত্বদ্য কথং স্যাৎস্বস্তি দেহিনাম্ ॥ ৯ ॥

অরাজক—রাজার অভাবে; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে; **এষঃ**—এই বেণ; **কৃতঃ**—করা হয়েছিল; **রাজা**—রাজা; **অ-তৎ-অর্হণঃ**—যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও; **ততঃ**—তার থেকে; **অপি**—ও; **আসীৎ**—ছিল; **ভয়ম্**—ভয়; **তু**—তখন; **অদ্য**—এখন; **কথম্**—কিভাবে; **স্যাৎ**—হতে পারে; **স্বস্তি**—সুখ; **দেহিনাম্**—জনসাধারণের।

অনুবাদ

অরাজকতা থেকে রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য, ঋষিরা বিবেচনা করতে শুরু করলেন যে, বেণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে, তাকে তাঁরা রাজা করেছিলেন। কিন্তু হায়! এখন জনসাধারণ সেই রাজার দ্বারাই উৎপীড়িত হচ্ছে। এই অবস্থায় মানুষ সুখী হতে পারে কি করে?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, সন্ন্যাস আশ্রমেও মানুষের যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা ব্রহ্মচারীদের অবশ্য কর্তব্য, গৃহস্থদের দান করা কর্তব্য, আর যাঁরা ত্যাগের আশ্রমে রয়েছেন (বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসী), তাঁদের তপস্যা করা কর্তব্য। এই পন্থায় সকলেই পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হতে পারেন। ঋষি এবং মহাত্মারা যখন দেখলেন যে, রাজা বেণ এই সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে, তখন তাঁরা জনসাধারণের উন্নতি সাধনের ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন। মহাত্মারা ভগবৎ চেতনা বা কৃষ্ণভক্তির প্রচার করেন, কারণ তাঁরা পাশবিক জীবনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে চান। প্রজাদের বাস্তবিকভাবে ধর্মের পথে পরিচালনা করার জন্য এবং দস্যু-তস্করদের দমন করার জন্য উত্তম সরকার প্রয়োজন। তা যখন হয়, তখন মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে এবং তার ফলে তাদের জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ১০

অহেরিব পয়ঃপোষঃ পোষকস্যাপ্যনর্থভৃৎ ।
বেণঃ প্রকৃত্যৈব খলঃ সুনীথাগর্ভসম্ভবঃ ॥ ১০ ॥

অহেঃ—সর্পের; **ইব**—সদৃশ; **পয়ঃ**—দুধ দিয়ে; **পোষঃ**—পালন; **পোষকস্য**—পালনকর্তার; **অপি**—ও; **অনর্থ**—অনর্থ; **ভৃৎ**—হয়; **বেণঃ**—রাজা বেণ; **প্রকৃত্যা**—স্বভাবত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **খলঃ**—দুষ্ট; **সুনীথা**—বেণের মাতা সুনীথার; **গর্ভ**—গর্ভ; **সম্ভবঃ**—জাত।

অনুবাদ

ঋষিরা চিন্তা করতে শুরু করলেন—সুনীথার গর্ভ থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে, রাজা বেণ স্বভাবতই অত্যন্ত দুষ্ট। এই দুষ্ট রাজাকে সমর্থন করা ঠিক দুধ দিয়ে সাপ পোষার মতো। এখন সে সব রকম দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়েছে।

তাৎপর্য

সাধুরা সাধারণত সামাজিক কার্যকলাপ এবং জড়-জাগতিক জীবন থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। প্রজাদের দস্যু-তস্করের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সাধুরা বেণকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করার পর, সে ঋষিদের কষ্টের কারণ হয়েছিল। সাধু ব্যক্তিরা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং তপশ্চর্যা অনুশীলনে বিশেষভাবে আগ্রহী হন। কিন্তু সেই সাধুদের কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করার পরিবর্তে, বেণ তাঁদের প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন হয়েছিল এবং তাঁদের সাধারণ কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। দুধ-কলা দিয়ে যে কালসাপ পোষা হয়, সে কেবল তার দাঁতে বিষ জমায় এবং তার পালককে দংশন করার প্রতীক্ষা করে।

শ্লোক ১১

নিরূপিতঃ প্রজাপালঃ স জিঘাংসতি বৈ প্রজাঃ ।
তথাপি সান্ত্বয়েমামুং নাস্মাংস্তৎপাতকং স্পৃশেৎ ॥ ১১ ॥

নিরূপিতঃ—নিযুক্ত; **প্রজা-পালঃ**—রাজা; **সঃ**—সে; **জিঘাংসতি**—অনিষ্ট সাধনের আকাঙ্ক্ষা করে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রজাঃ**—প্রজাদের; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **সান্ত্বয়েম**—আমরা তাকে শান্ত করব; **অমুম্**—তাকে; **ন**—না; **অস্মান্**—আমাদের; **তৎ**—তার; **পাতকম্**—পাপকর্মের ফল; **স্পৃশেৎ**—স্পর্শ করতে পারে।

অনুবাদ

প্রজাদের রক্ষা করার জন্য আমরা এই বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন সে প্রজাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তার এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও, আমরা তাকে এখন বোঝাতে চেষ্টা করব। তার ফলে তার পাপ আমাদের স্পর্শ করবে না।

তাৎপর্য

ঋষিরা বেণকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তার দুষ্ট স্বভাব তাঁদের গোচরীভূত হয়েছিল; তাই তাঁরা তার পাপকর্মের ভাগী হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। অসৎ ব্যক্তিদের সঙ্গ করা পর্যন্ত কর্মের নিয়মে নিষিদ্ধ। বেণকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার ফলে, ঋষিরা নিঃসন্দেহে তার সঙ্গ করেছিলেন।

চরমে রাজা বেণ এতই দুরাচারীতে পরিণত হয়েছিল যে, ঋষিরা তার কার্যকলাপের দ্বারা কলুষিত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। তাই তার বিরুদ্ধে কিছু করার পূর্বে, তাঁরা প্রথমে তার অপকর্ম থেকে তাকে নিরস্ত করা জন্য তাকে শান্ত করা এবং সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ১২

তদ্বিদ্বদ্ভিরসদ্‌বৃত্তো বেণোঽস্মাভিঃ কৃতো নৃপঃ ।
সান্ত্বিতো যদি নো বাচং ন গ্রহীষ্যত্যধর্মকৃৎ ।
লোকধিক্কারসন্দগ্ধং দহিষ্যামঃ স্বতেজসা ॥ ১২ ॥

তৎ—তার দুষ্ট স্বভাব; **বিদ্বদ্ভিঃ**—অবগত; **অসৎ-বৃত্তঃ**—দুরাচারী; **বেণঃ**—বেণ; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **কৃতঃ**—করা হয়েছে; **নৃপঃ**—রাজা; **সান্ত্বিতঃ**—বোঝানো সত্ত্বেও; **যদি**—যদি; **নঃ**—আমাদের; **বাচম্**—বাক্য; **ন**—না; **গ্রহীষ্যতি**—গ্রহণ করে; **অধর্ম-কৃৎ**—অত্যন্ত দুষ্ট; **লোক-ধিক্-কার**—জনসাধারণের দ্বারা নিন্দিত; **সন্দগ্ধম্**—দগ্ধীভূত; **দহিষ্যামঃ**—আমরা দগ্ধ করব; **স্ব-তেজসা**—আমাদের তেজের দ্বারা।

অনুবাদ

ঋষিরা বিবেচনা করলেন—তার দুষ্ট স্বভাব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বেণকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলাম। আমরা যদি তাকে আমাদের উপদেশ গ্রহণে বাধ্য করতে না পারি, তা হলে সে জনসাধারণের দ্বারা নিন্দিত হবে, এবং আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেব। এইভাবে আমাদের তেজের দ্বারা তাকে ভস্মীভূত করব।

তাৎপর্য

সাধুরা রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহী নন, তবুও তাঁরা সর্বদাই জনসাধারণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে থাকেন। তার ফলে কখনও কখনও তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেমে আসতে হয় এবং বিপথগামী সরকার বা রাজপরিবারকে সংশোধন করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু, কলিযুগে সাধুরা পূর্বের মতো শক্তিশালী নন। পুরাকালে সাধুরা তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা পাপীদের ভস্মীভূত করতে পারতেন। কিন্তু কলিযুগের প্রভাবে সাধুদের এখন আর সেই রকম শক্তি নেই। ব্রাহ্মণদের প্রকৃতপক্ষে পশুমেধ যজ্ঞ করার ক্ষমতা নেই, যে যজ্ঞে যজ্ঞাগ্নিতে পশুদের উৎসর্গ করা হত, নতুন জীবন দান করার জন্য। এই

পরিস্থিতিতে, সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার পবিবর্তে, সাধুদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়, এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে, রাজনৈতিক জটিলতায় বিজড়িত না হলেও জনসাধারণ সর্বপ্রকাব লাভ প্রাপ্ত হতে পারে।

শ্লোক ১৩

এবমধ্যবসায়ৈনং মুনয়ো গূঢ়মন্যবঃ ।
উপব্রজ্যাব্রুবন্ বেণং সান্ত্বয়িত্বা চ সামভিঃ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **অধ্যবসায়**—স্থির করে; **এনম্**—তাকে; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **গূঢ়-মন্যবঃ**—তাঁদের ক্রোধ সংগোপন করে; **উপব্রজ্য**—কাছে গিয়ে; **অব্রুবন্**—বলেছিলেন; **বেণম্**—রাজা বেণকে; **সান্ত্বয়িত্বা**—সান্ত্বনা দিয়ে; **চ**—ও; **সামভিঃ**—মধুর বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে সংকল্প করে, ঋষিরা তাঁদের ক্রোধ সংগোপনপূর্বক বেণ রাজার কাছে গিয়েছিলেন, এবং তাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৪

মুনয় ঊচুঃ

নৃপবর্য নিবোধৈতদ্যত্তে বিজ্ঞাপয়াম ভোঃ ।
আয়ুঃশ্রীবলকীর্তীনাং তব তাত বিবর্ধনম্ ॥ ১৪ ॥

মুনয়ঃ ঊচুঃ—ঋষিগণ বলেছিলেন; **নৃপ-বর্য**—হে নৃপশ্রেষ্ঠ; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা কব; **এতৎ**—এই; **যৎ**—যা; **তে**—তোমাকে; **বিজ্ঞাপয়াম**—আমরা উপদেশ দেব; **ভোঃ**—হে রাজন্; **আয়ুঃ**—আয়ু; **শ্রী**—ঐশ্বর্য; **বল**—বীর্য; **কীর্তীনাম্**—সুখ্যাতি; **তব**—তোমার; **তাত**—হে বৎস; **বিবর্ধনম্**—বর্ধনকারী।

অনুবাদ

মহর্ষিরা বললেন—হে রাজন্! তোমাকে সৎ উপদেশ দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি। দয়া করে গভীর মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। তা করার ফলে, তোমার আয়ু, ঐশ্বর্য, বীর্য এবং কীর্তি বৃদ্ধি পাবে।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতা অনুসারে, সাধু এবং ঋষিরা রাজাকে উপদেশ দেন। তাঁদের উপদেশ গ্রহণের ফলে, তাঁরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শাসকে পরিণত হতে পারেন, এবং তাঁদের রাজ্যে সকলেই সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। মহান রাজারা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে মহাত্মাদের উপদেশ গ্রহণ করতেন। রাজারা পরাশর, ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, অসিত প্রমুখ মহর্ষিদের উপদেশ গ্রহণ করতেন অর্থাৎ, তাঁরা প্রথমে মহাত্মাদের প্রাধান্য স্বীকার করতেন এবং তার পর তাঁদের রাজকীয় দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। দুর্ভাগ্যবশত কলিযুগে রাষ্ট্রনেতারা সাধুদের উপদেশ অনুসরণ করে না; তাই জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রনেতা কেউই সুখী নয়। তাদের আয়ু অল্প হয়ে গেছে, এবং প্রায় সকলেই দুর্দশাগ্রস্ত এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিরহিত। এই গণতন্ত্রের যুগে নাগরিকেরা যদি সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে চায়, তা হলে সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন মূর্খদের ভোট দিয়ে নেতৃত্বে বরণ করা তাদের উচিত নয়।

শ্লোক ১৫

ধর্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃকায়বুদ্ধিভিঃ ।
লোকান্ বিশোকান্ বিতরত্যথানন্ত্যমসঙ্গিনাম্ ॥ ১৫ ॥

ধর্মঃ—ধর্মীয় অনুশাসন, **আচরিতঃ**—অনুষ্ঠিত; **পুংসাম্**—মানুষদের; **বাক্**—বাক্যের দ্বারা; **মনঃ**—মন; **কায়**—দেহ; **বুদ্ধিভিঃ**—এবং বুদ্ধির দ্বারা; **লোকান্**—লোকসমূহ; **বিশোকান্**—শোকরহিত; **বিতরতি**—প্রদান করে; **অথ**—নিশ্চিতভাবে; **আনন্ত্যম্**—অন্তহীন সুখ, মুক্তি; **অসঙ্গিনাম্**—জড়-জাগতিক প্রভাব থেকে যাঁরা মুক্ত।

অনুবাদ

যারা কায়, মন, বাক্য এবং বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম আচরণপূর্বক জীবন যাপন করে, তারা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, যা সমস্ত শোক এবং দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত। এইভাবে জড়-জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তারা অন্তহীন সুখ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

ঋষিরা এখানে নির্দেশ দিয়েছেন যে, রাজা অথবা রাষ্ট্রনেতাদের ধার্মিক জীবন যাপন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্ম

মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা। কেবল লোক দেখানো ধার্মিক জীবন যাপন করলে চলবে না; দেহ, মন, বাক্য এবং বুদ্ধির দ্বারা পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করতে হবে। তার ফলে রাজা অথবা রাষ্ট্রনেতারাই যে কেবল জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হবেন তাই নয়, জনসাধারণও ক্রমশ পারমার্থিক উন্নতি সাধন করে, তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে। রাষ্ট্রপ্রধানদের কিভাবে শাসন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা উচিত তার সংক্ষিপ্ত উপদেশ এখানে দেওয়া হয়েছে, এবং এই উপদেশ পালনের ফলে, কেবল এই জীবনই সুখের হবে না, পরবর্তী জীবনও আনন্দময় হয়ে উঠবে।

শ্লোক ১৬

স তে মা বিনশেদ্বীর প্রজানাং ক্ষেমলক্ষণঃ ।
যস্মিন্ বিনষ্টে নৃপতিরৈশ্বর্যাদবরোহতি ॥ ১৬ ॥

সঃ—সেই পারমার্থিক জীবন; **তে**—তোমার দ্বারা; **মা**—করো না; **বিনশেৎ**—বিনষ্ট হতে দেওয়া; **বীর**—হে বীর; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **ক্ষেম-লক্ষণঃ**—সমৃদ্ধির কারণ; **যস্মিন্**—যা; **বিনষ্টে**—বিনষ্ট হলে; **নৃপতিঃ**—রাজা; **ঐশ্বর্যাৎ**—ঐশ্বর্য থেকে; **অবরোহতি**—অধঃপতিত হয়।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—হে বীর! সেই হেতু জনসাধারণের পারমার্থিক জীবন নষ্ট করার নিমিত্ত হওয়া তোমার উচিত নয়। যদি তোমার কার্যকলাপের ফলে তাদের পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট হয়, তা হলে তুমি অবশ্যই তোমার ঐশ্বর্য এবং রাজপদ থেকে পতিত হবে।

তাৎপর্য

পূর্বে, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে রাজারা আদর্শ ধর্মজীবন থেকে ভগবদ্বিহীন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জীবনে অধঃপতিত হওয়ার ফলে, আজ পৃথিবীর সর্বত্রই রাজতন্ত্র লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু, সরকারি-পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যদি ধার্মিক না হয় এবং মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, তা হলে কেবল মাত্র রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হলেও তাতে কোন লাভ হবে না।

শ্লোক ১৭

রাজন্নসাধ্বমাত্যেভ্যশ্চোরাদিভ্যঃ প্রজা নৃপঃ ।
রক্ষন্ যথা বলিং গৃহ্ণন্নিহ প্রেত্য চ মোদতে ॥ ১৭ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **অসাধু**—দুষ্ট; **অমাত্যেভ্যঃ**—মন্ত্রীদের থেকে; **চোর-আদিভ্যঃ**—দস্যু-তস্করদের থেকে; **প্রজাঃ**—নাগরিকদের; **নৃপঃ**—রাজা; **রক্ষন্**—রক্ষা করে; **যথা**—যেমন; **বলিম্**—কর; **গৃহ্ণন্**—গ্রহণ করে; **ইহ**—এই জগতে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর, **চ**—ও; **মোদতে**—আনন্দ উপভোগ করে।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—রাজা যখন দুষ্ট অমাত্যবর্গ ও দস্যু-তস্করদের উৎপাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করেন, তখন তিনি সেই পুণ্যকর্মের ফলে, প্রজাদের থেকে শুল্ক গ্রহণ করেন। এই প্রকার পুণ্যবান রাজা ইহজগতে এবং পরজন্মেও নিশ্চিতভাবে সুখ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পুণ্যবান রাজার কর্তব্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাজার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে দস্যু তস্কর এবং অসাধু অমাত্যদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করা। পূর্বে, ভোট দিয়ে মন্ত্রী নির্বাচন করা হত না, রাজা তাদের মনোনীত করতেন। তার ফলে রাজা যদি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং কঠোর না হতেন, তা হলে মন্ত্রীরা চোর-জোচ্চোরে পরিণত হয়ে, নিরীহ নাগরিকদের শোষণ করত। রাজার কর্তব্য হচ্ছে সরকারি মন্ত্রণালয় অথবা গণবিভাগে যাতে চোর এবং বাটপারদের বৃদ্ধি না হয়, সেদিকে নজর রাখা। রাজা যদি সরকারি বিভাগ এবং গণবিভাগের মাধ্যমে চোর বাটপারদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা না করতে পারেন, তা হলে তাদের কাছ থেকে শুল্ক গ্রহণ করার কোন অধিকার রাজার থাকে না। অর্থাৎ, রাজা বা সরকার প্রজাদের কাছ থেকে তখনই কর আদায় করতে পারেন, যখন রাজা অথবা সরকার দস্যু-তস্করদের উপদ্রব থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে (১২/১/৪০) সরকারি সেবায় নিযুক্ত দস্যু এবং তস্করদের বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, *প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ*—"এই সমস্ত দাম্ভিক ম্লেচ্ছরা (যারা শূদ্রদের থেকেও অধম) রাজপদ অধিকার করে প্রজাদের উপর অত্যাচার করবে, এবং তাদের প্রজারাও আবার অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করবে। এইভাবে বদভ্যাস অনুশীলনের ফলে এবং মূর্খের মতো আচরণ করার ফলে, প্রজারাও তাদের শাসকদেরই মতো হয়ে যাবে।" অর্থাৎ

গণতান্ত্রিক কলিযুগে জনসাধারণ শূদ্রের স্তরে অধঃপতিত হবে। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *কলৌ শূদ্র-সম্ভবাঃ*, কলিযুগে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা শূদ্রে পরিণত হবে। শূদ্র হচ্ছে চতুর্থ স্তরের মানুষ, যারা সমাজের তিনটি স্তরের মানুষদের সেবা করারই কেবল যোগ্য। চতুর্থ স্তরের মানুষ হওয়ার ফলে, শূদ্ররা খুব একটা বুদ্ধিমান নয়। যেহেতু এই গণতন্ত্রের যুগে জনসাধারণ অত্যন্ত অধঃপতিত, তাই তারা কেবল তাদেরই শ্রেণীভুক্ত কোন মানুষকে ভোট দিয়ে নেতৃত্বের পদে বরণ করতে পারে, কিন্তু শূদ্রের দ্বারা পরিচালিত সরকার ঠিকমতো চলতে পারে না। ক্ষত্রিয় নামক দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাঁরা সাধু ব্যক্তিদের (ব্রাহ্মণদের) নির্দেশনায় সরকার বা রাজ্যশাসনের উপযুক্ত। অন্যান্য যুগে—সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ এবং দ্বাপর যুগে—জনসাধারণ এই রকম অধঃপতিত ছিল না, এবং রাষ্ট্রনেতা ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হত না। রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ কার্যাধ্যক্ষ, এবং তিনি যদি কোন মন্ত্রীর চুরি করা ধরতে পারতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে বধ করতেন অথবা পদচ্যুত করতেন। যেহেতু রাজার কর্তব্য হচ্ছে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের বধ করা, তাই তাঁর কর্তব্য ছিল রাজকার্যে নিযুক্ত অসৎ মন্ত্রীদেরও তৎক্ষণাৎ বধ করা। এই প্রকার তীক্ষ্ণ সতর্কতার ফলে, রাজা অত্যন্ত সুচারুরূপে রাজ্য পরিচালনা করতে পারতেন, এবং এই প্রকার রাজার অধীনে প্রজারাও অত্যন্ত সুখী হত। মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, রাজা যদি দস্যু-তস্করদের কবল থেকে প্রজাদের যথাযথভাবে রক্ষা করতে সক্ষম না হন, তা হলে কেবল তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করার কোন অধিকার তাঁর থাকে না। কিন্তু, তিনি যদি প্রজাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন এবং তাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করেন, তা হলে তিনি অত্যন্ত সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারেন, এবং এই জীবনের অন্তে স্বর্গলোক অথবা বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারেন, যেখানে তিনি সর্বতোভাবে সুখী হতে পারেন।

শ্লোক ১৮

যস্য রাষ্ট্রে পুরে চৈব ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ ।
ইজ্যতে স্বেন ধর্মেণ জনৈর্বর্ণাশ্রমান্বিতৈঃ ॥ ১৮ ॥

যস্য—যার; **রাষ্ট্রে**—রাজ্যে; **পুরে**—নগরে; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **ইজ্যতে**—পূজিত হন; **স্বেন**—তাদের নিজেদের; **ধর্মেন**—বৃত্তির দ্বারা; **জনৈঃ**—মানুষদের দ্বারা; **বর্ণ-আশ্রম**—সমাজের চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম ব্যবস্থা; **অন্বিতৈঃ**—যারা অনুসরণ করে।

অনুবাদ

যে রাজার রাজ্যে এবং নগরে জনসাধারণ নিষ্ঠাসহকারে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থা পালন করে, এবং সমস্ত প্রজারা তাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় যুক্ত, সেই রাজাকে পুণ্যবান বলে বিবেচনা করা হয়।

তাৎপর্য

রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং নাগরিকদের কর্তব্য এই শ্লোকটিতে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাষ্ট্রনেতা বা রাজার এবং নাগরিকদেরও কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের কার্যকলাপ এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, যাতে চরমে সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়, এবং তাই তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সব কিছু যাতে সুন্দরভাবে চলে এবং নাগরিকেরা যাতে বিজ্ঞান সম্মত চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম ব্যবস্থায় অবস্থিত হয়ে, ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করে, তা দেখা। *বিষ্ণু পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) সমন্বিত বিজ্ঞান সম্মত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না অধিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সমাজকে প্রকৃত মানব-সমাজ বলে বিবেচনা করা যায় না, অথবা সেই সমাজের মানুষেরা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে কখনই অগ্রসর হতে পারে না। রাষ্ট্র-সরকারের কর্তব্য হচ্ছে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসারে যাতে সব কিছু পরিচালিত হয়, তা দেখা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *ভগবান্‌, যজ্ঞ-পুরুষ*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *যজ্ঞপুরুষ* । *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) যে-সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাম্* । শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের চরম উদ্দেশ্য। তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; তাই তিনি *যজ্ঞ-পুরুষ* নামে পরিচিত। *যজ্ঞ-পুরুষ* শব্দটি শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ, অথবা যে-কোন বিষ্ণুতত্ত্বকে ইঙ্গিত করে। আদর্শ মানব-সমাজে মানুষেরা বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থায় অবস্থিত হয়ে, তাঁদের বিশেষ কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত। প্রত্যেক নাগরিক তাঁর বৃত্তিতে যুক্ত হয়ে, তাঁর কর্মের ফল দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা। যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৬) বলা হয়েছে—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

"যিনি সমস্ত জীবের উৎস এবং যিনি সর্বব্যাপ্ত, স্বীয় কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা, সেই ভগবানের আরাধনা করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে।"

এইভাবে শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত। এইভাবে সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন। রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকেরা যাতে এইভাবে কর্ম করে, তা দেখা। অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করে, তাঁদের কর্তব্য কর্ম থেকে বিচ্যুত না হওয়া রাষ্ট্র এবং সরকারের অবশ্য কর্তব্য। আজ যে-সমস্ত মানুষ সরকারি সেবায় যুক্ত এবং যারা নাগরিকদের শাসন করে, তাদের বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধা নেই. তারা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে, আত্মতৃপ্তি সহকারে অনুভব করে যে, তাদের রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ। এই প্রকার সরকারের শাসনাধীনে কেউই কখনও সুখী হতে পারে না মানুষকে অবশ্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করতে হবে, এবং রাজার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রজারা যে তা সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করছে, সেই সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টি রাখা

শ্লোক ১৯

তস্য রাজ্ঞো মহাভাগ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
পরিতুষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতো নিজশাসনে ॥ ১৯ ॥

তস্য—তাঁর প্রতি; **রাজ্ঞঃ**—রাজা; **মহা-ভাগ**—হে মহারাজ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভূত-ভাবনঃ**—যিনি সমগ্র সৃষ্টির আদি কারণ; **পরিতুষ্যতি**—প্রসন্ন হন; **বিশ্ব-আত্মা**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; **তিষ্ঠতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **নিজ-শাসনে**—তাঁর শাসন ব্যবস্থায়।

অনুবাদ

হে মহাভাগ! রাজা যদি দেখেন যে, ভূতভাবন বিশ্বাত্মা ভগবান যথাযথভাবে পূজিত হচ্ছেন, তা হলে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

সরকারের কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণ এবং সরকারের কার্যকলাপের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান যে সন্তুষ্ট হচ্ছেন তা দেখা। রাষ্ট্র-সরকার অথবা নাগরিকদের যদি সমগ্র সৃষ্টির আদি কারণ *ভূত-ভাবন* অথবা সমস্ত আত্মার আত্মা *বিশ্বাত্মা* পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকে, তা হলে সেই সমাজে সুখী হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। মূল কথা হচ্ছে যে, ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে,

নাগরিকেরা অথবা সরকার কোনভাবেই সুখী হতে পারে না। বর্তমান সময়ে মানুষেরা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় যুক্ত হচ্ছে কি না, তা দেখার কোন রকম আগ্রহ রাজা অথবা শাসকবর্গের নেই। পক্ষান্তরে, তারা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যান্ত্রিক প্রগতির ব্যাপারেই আগ্রহী। পরিণামে তারা প্রকৃতির অত্যন্ত জটিল নিয়মের বন্ধনে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে মানুষের কর্তব্য জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং তার একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানে শরণাগতি। সেই উপদেশ *ভগবদ্গীতায়* দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সরকারের অথবা জনসাধারণের কারোরই সে-সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই; তারা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে এবং এই জীবনে সুখী হওয়ার চেষ্টাতেই মগ্ন। *নিজ-শাসনে* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সরকার এবং নাগরিক উভয়েরই কর্তব্য হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা। জনসাধারণ যখন বর্ণাশ্রম ধর্মে অধিষ্ঠিত হয়, তখন ইহলোকে এবং পরলোকে, অর্থাৎ উভয়লোকেই প্রকৃত জীবন এবং সমৃদ্ধি লাভের সমস্ত সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ২০

তস্মিংস্তুষ্টে কিমপ্রাপ্যং জগতামীশ্বরেশ্বরে ।
লোকাঃ সপালা হ্যেতস্মৈ হরন্তি বলিমাদৃতাঃ ॥ ২০ ॥

তস্মিন্—তিনি যখন; **তুষ্টে**—সন্তুষ্ট হন; **কিম্**—কি; **অপ্রাপ্যম্**—প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব; **জগতাম্**—জগতের; **ঈশ্বর-ঈশ্বরে**—নিয়ন্তাদের নিয়ন্তা; **লোকাঃ**—বিভিন্ন লোকের অধিবাসী; **স-পালাঃ**—পালকগণ সহ; **হি**—সেই কারণে; **এতস্মৈ**—তাঁকে; **হরন্তি**—প্রদান করে; **বলিম্**—পূজার সামগ্রী; **আদৃতাঃ**—মহা আনন্দে।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা মহান দেবতাদের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান পূজিত হন। তিনি যখন প্রসন্ন হন, তখন কোন কিছু লাভ করা আর অসম্ভব হয় না। সেই জন্য বিভিন্ন গ্রহলোকের পালক দেবতারা এবং সেই সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীরা ভগবানকে সমস্ত প্রকার নৈবেদ্য নিবেদন করে মহা আনন্দ অনুভব করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সমগ্র বৈদিক সভ্যতার সারাংশ দেওয়া হয়েছে—এই গ্রহলোকের অথবা অন্য সমস্ত গ্রহলোকের সমস্ত জীবাত্মাদের উচিত তাদের কর্তব্য কর্মের দ্বারা

পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। যখন ভগবান প্রসন্ন হন, তখন জীবনের সমস্ত প্রয়োজন আপনা থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। *বেদেও* উল্লেখ করা হয়েছে—*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* (*কঠ উপনিষদ* ২/২/১৩)। *বেদ* থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান সকলের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন, এবং আমরা বাস্তবিকভাবে দেখতে পাই যে, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ আদি নিম্ন স্তরের জীবেদের যদিও কোন রকম বৃত্তি বা পেশা নেই, তবুও খাদ্যাভাবে তাদের মৃত্যু হয় না। প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় তারা বেঁচে আছে এবং তাদের জীবনের আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন আদি সমস্ত আবশ্যকতাগুলি যথাযথভাবে পূর্ণ হচ্ছে।

মানব-সমাজ কিন্তু কৃত্রিমভাবে এক প্রকার সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, যার ফলে তারা ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়েছে। এমন কি আধুনিক সমাজে মানুষ ভগবানের কৃপা এবং আশীর্বাদের কথাও ভুলে গেছে. তার ফলে আধুনিক সভ্যতায় মানুষ সর্বদাই অসুখী এবং অভাবগ্রস্ত। জীবনের পরম উদ্দেশ্য যে শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা, সেই কথা মানুষ জানে না। তারা জড়বাদী জীবনকেই সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছে এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা মোহিত হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, তাদের নেতারা তাদের এই পথ অনুসরণ করতে সর্বদা অনুপ্রাণিত করছে, এবং ভগবানের নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ জনসাধারণ তাদের সেই সমস্ত অন্ধ নেতাদের অনুসরণ করে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হচ্ছে পৃথিবীর এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সংশোধন করার জন্য প্রতিটি মানুষকে কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় শিক্ষা লাভ করা উচিত এবং বর্ণাশ্রম পদ্ধতি অনুসারে আচরণ করা উচিত। রাষ্ট্রেরও কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত মানুষ যাতে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানে তৎপর হয়, সেই সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা। সেটিই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করতে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার জন্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের শুরু হয়েছে।

শ্লোক ২১

তং সর্বলোকামরযজ্ঞসংগ্রহং
ত্রয়ীময়ং দ্রব্যময়ং তপোময়ম্ ।
যজ্ঞৈর্বিচিত্রৈর্যজতো ভবায় তে
রাজন্ স্বদেশাননুরোদ্ধুমর্হসি ॥ ২১ ॥

তম্—তাঁকে; **সর্ব-লোক**—সমস্ত লোকে; **অমর**—প্রধান দেবতাগণ সহ; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **সংগ্রহম্**—যাঁরা গ্রহণ করেন; **ত্রয়ী-ময়ম্**—তিন বেদের সার; **দ্রব্য-ময়ম্**—সমস্ত দ্রব্যের স্বত্বাধিকারী; **তপঃ-ময়ম্**—সমস্ত তপস্যার উদ্দেশ্য; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **বিচিত্রৈঃ**—বিবিধ; **যজতঃ**—আরাধনা করে; **ভবায়**—উন্নতি সাধনের জন্য; **তে**—তোমার; **রাজন্**—হে রাজন্; **স্ব-দেশান্**—তোমার দেশবাসীরা; **অনুরোদ্ধুম্**—পরিচালিত করার জন্য; **অর্হসি**—তোমার উচিত।

অনুবাদ

হে রাজন্! সমস্ত গ্রহলোকে সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা হচ্ছেন প্রধান দেবতাগণ সহ পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান তিন বেদের সার স্বরূপ, তিনিই সব কিছুর ঈশ্বর, এবং সমস্ত তপস্যার চরম লক্ষ্য। অতএব তোমার উন্নতির জন্য তোমার দেশবাসীদের বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। বাস্তবিকপক্ষে তোমার কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য তাদের পরিচালিত করা।

শ্লোক ২২

যজ্ঞেন যুষ্মদ্বিষয়ে দ্বিজাতিভি-
র্বিতায়মানেন সুরাঃ কলা হরেঃ ।
স্বিষ্টাঃ সুতুষ্টাঃ প্রদিশন্তি বাঞ্ছিতং
তদ্ধেলনং নার্হসি বীর চেষ্টিতুম্ ॥ ২২ ॥

যজ্ঞেন—যজ্ঞের দ্বারা; **যুষ্মৎ**—তোমার; **বিষয়ে**—রাজ্যে; **দ্বি-জাতিভিঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বিতায়মানেন**—অনুষ্ঠিত হয়ে; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **কলাঃ**—অংশ; **হরেঃ**—ভগবানের; **সু-ইষ্টাঃ**—যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; **সু-তুষ্টাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **প্রদিশন্তি**—প্রদান করবে; **বাঞ্ছিতম্**—অভিলষিত ফল; **তৎ-হেলনম্**—তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা; **ন**—না; **অর্হসি**—তোমার উচিত; **বীর**—হে বীর; **চেষ্টিতুম্**—করতে।

অনুবাদ

যখন তোমার রাজ্যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্রতী হবেন, তখন ভগবানের অংশ-সম্ভূত দেবতারা তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন এবং তোমার অভিলষিত ফল তাঁরা প্রদান করবেন। অতএব, হে বীর! যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করো না। তুমি যদি তা বন্ধ কর, তা হলে দেবতাদের অবজ্ঞা করা হবে।

শ্লোক ২৩

বেণ উবাচ

বালিশা বত যূয়ং বা অধর্মে ধর্মমানিনঃ ।
যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে ॥ ২৩ ॥

বেণঃ—রাজা বেণ; **উবাচ**—উত্তর দিলেন; **বালিশাঃ**—অজ্ঞ; **বত**—আহা; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **বা**—বাস্তবিকপক্ষে; **অধর্মে**—ধর্মবিরোধী কার্যে; **ধর্ম-মানিনঃ**—ধর্ম বলে মনে করে; **যে**—তোমরা সকলে; **বৃত্তিদম্**—পালনকারী; **পতিম্**—পতিকে; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **জারম্**—উপপতি; **পতিম্**—পতিকে; **উপাসতে**— ভজনা করে।

অনুবাদ

রাজা বেণ উত্তর দিল—তোমরা সকলেই নিতান্তই অজ্ঞ। তোমরা যে অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করেছ, তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তোমাদের অবস্থা বস্তুত পালন-পোষণকারী পতিকে পরিত্যাগ করে উপপতিকে অন্বেষণকারী স্ত্রীর মতো।

তাৎপর্য

রাজা বেণ এতই মূর্খ ছিল যে, সে মহান ঋষিদেরকে শিশুর মতো অনভিজ্ঞ বলে দোষারোপ করেছিল। অর্থাৎ, সে দোষারোপ করেছিল যে, তাঁদের প্রকৃত জ্ঞান নেই। এইভাবে সে তাঁদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে, তাঁদের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল। অন্নদাতা পতিকে পরিত্যাগ করে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত স্ত্রীর সঙ্গে সে তাঁদের তুলনা করেছিল। এই তুলনাটির উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন প্রকার ধর্ম অনুষ্ঠানে যুক্ত করা, এবং সেই জন্য রাজাকে ব্রাহ্মণদের পালক বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণেরা যদি রাজার পূজা না করে, অন্য দেবতাদের কাছে যায়, তা হলে তারা অসতী স্ত্রীর মতো কলুষিত।

শ্লোক ২৪

অবজানন্ত্যমী মূঢ়া নৃপরূপিণমীশ্বরম্ ।
নানুবিন্দন্তি তে ভদ্রমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৪ ॥

অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে; **অমী**—যারা; **মূঢ়াঃ**—জ্ঞানহীন; **নৃপ-রূপিণম্**—রাজারূপী; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **ন**—না; **অনুবিন্দন্তি**—অনুভব করে; **তে**—তারা; **ভদ্রম্**—সুখ; **ইহ**—এই; **লোকে**—জগতে; **পরত্র**—মৃত্যুর পর; **চ**—ও।

অনুবাদ

যারা ঘোর অজ্ঞানতাবশত রাজারূপী ভগবানের পূজা করে না, তারা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ অনুভব করতে পারে না।

শ্লোক ২৫

কো যজ্ঞপুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী ।
ভর্তৃস্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্ ॥ ২৫ ॥

কঃ—কে; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **নাম**—নামক; **যত্র**—যাকে; **বঃ**—তোমার; **ভক্তিঃ**—ভক্তি, **ঈদৃশী**—এতই মহান; **ভর্তৃ**—পতির জন্য; **স্নেহ**—অনুরাগ; **বিদূরাণাম্**—রহিত; **যথা**—যেমন; **জারে**—উপপতিকে; **কু-যোষিতাম্**—কুলটা স্ত্রীর।

অনুবাদ

তোমরা দেবতাদের প্রতি এত অনুরক্ত, কিন্তু তাঁরা কে? দেবতাদের প্রতি তোমাদের এই প্রীতি বস্তুতই কুলটা স্ত্রীর বিবাহিত জীবন উপেক্ষা করে, উপপতির প্রতি অনুরক্ত হওয়ার মতো।

শ্লোক ২৬-২৭

বিষ্ণুর্বিরিঞ্চো গিরিশ ইন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ ।
পর্জন্যো ধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাম্পতিঃ ॥ ২৬ ॥
এতে চান্যে চ বিবুধাঃ প্রভবো বরশাপয়োঃ ।
দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২৭ ॥

বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; **বিরিঞ্চঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **গিরিশঃ**—শ্রীশিব; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **বায়ুঃ**—পবনদেব; **যমঃ**—যম; **রবিঃ**—সূর্যদেব; **পর্জন্যঃ**—বৃষ্টির দেবতা; **ধন-দঃ**—কুবের; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **ক্ষিতিঃ**—পৃথিবীর দেবতা; **অগ্নিঃ**—অগ্নিদেব; **অপাম্-পতিঃ**—

জলের দেবতা বরুণ; **এতে**—এরা সকলে; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **বিবুধাঃ**—দেবতারা; **প্রভবঃ**—সমর্থ; **বর-শাপয়োঃ**—বর এবং শাপ; **দেহে**—শরীরে; **ভবন্তি**—বিরাজ করে; **নৃপতেঃ**—রাজার; **সর্ব-দেবময়ঃ**—সমস্ত দেবতা-সমন্বিত; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্যদেব, পর্জন্য, কুবের, চন্দ্রদেব, পৃথিবী, অগ্নি, বরুণ, এবং অন্য সকলে, যারা শাপ ও বর প্রদান করতে পারে, এরা সকলেই রাজার দেহে অধিষ্ঠান করে। তাই রাজাকে সর্বদেবময় বলা হয়। অতএব এরা সকলেই রাজার এই শরীরের অংশ।

তাৎপর্য

এই রকম অনেক অসুর রয়েছে, যারা নিজেদের সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহদের পরিচালনাকারী পরম ঈশ্বর বলে মনে করে। এর কারণ হচ্ছে তাদের অহঙ্কার। তেমনই, রাজা বেণ এই আসুরিক মনোভাব গ্রহণ করেছিল এবং নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এই কলিযুগে এই প্রকার অসুরদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না, এবং তারা সকলেই মহান ঋষি ও মহাত্মাদের দ্বারা ধিকৃত হয়েছে।

শ্লোক ২৮

তস্মান্মাং কর্মভির্বিপ্রা যজধ্বং গতমৎসরাঃ ।
বলিং চ মহ্যং হরত মত্তোঽন্যঃ কোঽগ্রভুক্‌পুমান্ ॥ ২৮ ॥

তস্মাৎ—সেই কারণে; **মাম্**—আমাকে; **কর্মভিঃ**—কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **যজধ্বম্**—পূজা কর; **গত**—বিনা; **মৎসরাঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে; **বলিম্**—পূজার সামগ্রী; **চ**—ও; **মহ্যম্**—আমাকে; **হরত**—সমর্পণ কর; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **অন্যঃ**—অন্য; **কঃ**—কে; **অগ্র-ভুক্**—প্রথম নৈবেদ্যের ভোক্তা; **পুমান্**—পুরুষ।

অনুবাদ

রাজা বেণ বলল—অতএব হে বিপ্রগণ! তোমরা আমার প্রতি মৎসরতা পরিত্যাগ করে, তোমাদের অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের দ্বারা আমার পূজা কর এবং আমার উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন কর। তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও, তা হলে বুঝতে

পারবে যে, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, যে সমস্ত যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করতে পারে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ সত্য আর কিছু নেই। রাজা বেণ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ভগবানের অনুকরণ করে, নিজেকেই ভগবান বলে জাহির করার চেষ্টা করছিল। এইগুলি হচ্ছে আসুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তির লক্ষণ।

শ্লোক ২৯

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্থং বিপর্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ ।
অনুনীয়মানস্তদ্যাচ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **বিপর্যয়-মতিঃ**—যার বুদ্ধি ভ্রান্ত হয়েছে; **পাপীয়ান্**—অত্যন্ত পাপী; **উৎপথম্**—সৎ পথ থেকে; **গতঃ**—চলে গিয়ে; **অনুনীয়মানঃ**—সর্বপ্রকারে সম্মানিত হয়ে; **তৎ-যাচ্ঞাম্**—ঋষিদের অনুরোধ; **ন**—না; **চক্রে**—স্বীকার করেছিল; **ভ্রষ্ট**—রহিত; **মঙ্গলঃ**—সর্ব প্রকার শুভ।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—তার পাপকর্মের ফলে এবং সম্মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে, রাজা বেণ মতিচ্ছন্ন হয়েছিল এবং সর্বপ্রকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। মহর্ষিরা গভীর সম্মান সহকারে তাকে যে অনুরোধ করেছিলেন, তা সে গ্রহণ করতে পারেনি এবং তার ফলে সে ধিক্কৃত হয়েছিল।

তাৎপর্য

অসুরেরা মহাজনদের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তারা গুরুজনদের প্রতি সর্বদা অশ্রদ্ধাপরায়ণ। তারা নিজেদের মনগড়া ধর্ম সৃষ্টি করে ব্যাস, নারদ আদি মহাত্মাদের এমন কি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে। গুরুজনদের অমান্য করা মাত্রই মানুষ অত্যন্ত পাপী হয়ে যায় এবং তাদের সমস্ত সৌভাগ্য হারিয়ে ফেলে। রাজা এতই দাম্ভিক এবং অহঙ্কারী ছিল যে, সে মহাত্মাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার সাহস করেছিল, এবং তার ফলে সে তার সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।

শ্লোক ৩০

ইতি তেঽসৎকৃতাস্তেন দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনা ।
ভগ্নায়াং ভব্যযাচ্ঞায়াং তস্মৈ বিদুর চুক্রুধুঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; **তে**—সেই সমস্ত মহর্ষিরা; **অসৎ-কৃতাঃ**—অবমানিত হয়ে; **তেন**—রাজার দ্বারা; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **পণ্ডিত-মানিনা**—নিজেকে মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করে; **ভগ্নায়াম্**—ভগ্ন হয়ে; **ভব্য**—মঙ্গলজনক; **যাচ্ঞায়াম্**—তাদের অনুরোধ; **তস্মৈ**—তাকে; **বিদুর**—হে বিদুর; **চুক্রুধুঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে বিদুর! তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। সেই মূর্খ রাজা নিজেকে মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করে এইভাবে সেই মহর্ষিদের অপমান করেছিল, এবং রাজার বাক্যে মর্মাহত হয়ে তাঁরা তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

হন্যতাং হন্যতামেষ পাপঃ প্রকৃতিদারুণঃ ।
জীবঞ্জগদসাবাশু কুরুতে ভস্মসাদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩১ ॥

হন্যতাম্—হত্যা কর; **হন্যতাম্**—হত্যা কর; **এষঃ**—এই রাজাকে; **পাপঃ**—পাপিষ্ঠ; **প্রকৃতি**—স্বভাবত; **দারুণঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, **জীবন্**—জীবিত থাকা কালে; **জগৎ**—সারা পৃথিবী; **অসৌ**—সে; **আশুঃ**—অতি শীঘ্র; **কুরুতে**—করবে; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

সমস্ত মহান ঋষিগণ তখন গর্জন করে বলেছিলেন—একে সংহার কর! একে সংহার কর! এ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও পাপী। এ যদি বেঁচে থাকে, তা হলে অবশ্যই সে সারা পৃথিবীকে অতি শীঘ্রই ভস্মসাৎ করবে।

তাৎপর্য

সাধুরা সাধারণত সমস্ত জীবেদের প্রতিই অত্যন্ত দয়ালু, কিন্তু যখন কোন সাপ অথবা বিছাকে মারা হয়, তখন তাঁরা দুঃখিত হন না। সাধুদের পক্ষে কাউকে

হত্যা করা ঠিক নয়, কিন্তু অসুররা, যারা সাপ অথবা বিছার মতো, প্রয়োজন হলে তাদের হত্যা করতে তাঁদের উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই সমস্ত ঋষিরা রাজা বেণকে হত্যা করতে স্থির করেছিলেন, সে ছিল সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এখানে আমরা দেখতে পাই, ঋষিরা রাজাকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজা অথবা সরকার যদি আসুরিক হয়ে যায়, তা হলে সাধুদের কর্তব্য সেই সরকারের উচ্ছেদ করে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সেই পদে অভিষিক্ত করা, যাঁরা সাধু-মহাত্মাদের নির্দেশ এবং উপদেশ পালন করেন।

শ্লোক ৩২

নায়মর্হত্যসদ্বৃত্তো নরদেববরাসনম্ ।
যোহধিযজ্ঞপতিং বিষ্ণুং বিনিন্দত্যনপত্রপঃ ॥ ৩২ ॥

ন—কখনই না; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **অর্হতি**—যোগ্য; **অসৎ-বৃত্তঃ**—দুরাচারী; **নর-দেব**—পৃথিবীর রাজা অথবা দেবতার; **বর-আসনম্**—শ্রেষ্ঠ সিংহাসন; **যঃ**—যিনি; **অধিযজ্ঞ-পতিম্**—সমস্ত যজ্ঞের প্রভু; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **বিনিন্দতি**—অপমান করে; **অন্-অপত্রপঃ**—নির্লজ্জ।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—এই দুরাচারী দাম্ভিক ব্যক্তিটির রাজসিংহাসনে বসার কোন যোগ্যতা নেই। সে এমনই নির্লজ্জ যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পর্যন্ত অপমান করার দুঃসাহস করে।

তাৎপর্য

কখনই ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তদের নিন্দা ও অপমান সহ্য করা উচিত নয়। ভক্তরা সাধারণত অত্যন্ত বিনীত এবং শান্ত, তাঁরা কখনও কারও সঙ্গে ঝগড়া করতে চান না। তাঁরা কারও প্রতি ঈর্ষাও করেন না। কিন্তু, শুদ্ধ ভক্ত যখন দেখেন যে, কেউ বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবকে অপমান করছে, তৎক্ষণাৎ তিনি ক্রোধে জ্বলন্ত অগ্নির মতো হয়ে ওঠেন। এটি ভক্তের কর্তব্য। ভক্ত যদিও অত্যন্ত শান্ত এবং বিনীত, তবুও তিনি যদি ভগবান অথবা তাঁর ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করে নীরব থাকেন, তা হলে সেটি তাঁর একটি মস্ত বড় ত্রুটি।

শ্লোক ৩৩

কো বৈনং পরিচক্ষীত বেণমেকমৃতেঽশুভম্ ।
প্রাপ্ত ঈদৃশমৈশ্বর্যং যদনুগ্রহভাজনঃ ॥ ৩৩ ॥

কঃ—কে; **বা**—নিঃসন্দেহে; **এনম্**—ভগবান; **পরিচক্ষীত**—নিন্দা করবে; **বেণম্**—রাজা বেণ; **একম্**—একাকী; **ঋতে**—বিনা; **অশুভম্**—অমঙ্গল; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **ঈদৃশম্**—এই প্রকার; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **যৎ**—যার; **অনুগ্রহ**—কৃপা; **ভাজনঃ**—পাত্র।

অনুবাদ

যে-ভগবানের কৃপাভাজন হয়ে এই ব্যক্তি সমগ্র সৌভাগ্য এবং এই প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করে, মূর্তিমান পাপসদৃশ রাজা বেণ ছাড়া, আর কেই বা সেই ভগবানের নিন্দা করতে পারে?

তাৎপর্য

যখন মানব-সমাজ ব্যষ্টিরূপে বা সমষ্টিরূপে ভগবৎ-বিহীন হয়ে যায় এবং ভগবানের নিন্দা করে, তখন বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ভগবানের কৃপা অস্বীকার করার ফলে, এই প্রকার সভ্যতা সব রকম দুর্ভাগ্য ডেকে আনে।

শ্লোক ৩৪

ইত্থং ব্যবসিতা হন্তুমৃষয়ো রূঢ়মন্যবঃ ।
নিজঘ্নুর্হুঙ্কৃতৈর্বেণং হতমচ্যুতনিন্দয়া ॥ ৩৪ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ব্যবসিতাঃ**—স্থির করে; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **রূঢ়**—প্রকাশ করেছিলেন; **মন্যবঃ**—তাঁদের ক্রোধ; **নিজঘ্নুঃ**—তাঁরা হত্যা করেছিলেন; **হুম্-কৃতৈঃ**—হুঙ্কার ধ্বনি করে; **বেণম্**—রাজা বেণকে; **হতম্**—মৃত; **অচ্যুত**—ভগবানের বিরুদ্ধে; **নিন্দয়া**—নিন্দার দ্বারা।

অনুবাদ

ঋষিরা এইভাবে তাঁদের আচ্ছাদিত ক্রোধ প্রকাশ করে, তৎক্ষণাৎ রাজা বেণকে হত্যা করতে স্থির করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের নিন্দা করার ফলে, রাজা বেণ পূর্বেই হত হয়েছিল। এইভাবে কোন প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ না করে, ঋষিরা কেবল হুঙ্কার ধ্বনির দ্বারা রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ঋষিভিঃ স্বাশ্রমপদং গতে পুত্রকলেবরম্ ।
সুনীথা পালয়ামাস বিদ্যাযোগেন শোচতী ॥ ৩৫ ॥

ঋষিভিঃ—ঋষিদের দ্বারা; **স্ব-আশ্রম-পদম্**—তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে; **গতে**—প্রত্যাবর্তন করে; **পুত্র**—পুত্রের; **কলেবরম্**—দেহ; **সুনীথা**—সুনীথা, রাজা বেণের মাতা; **পালয়াম্-আস**—রক্ষা করেছিলেন; **বিদ্যা-যোগেন**—মন্ত্র এবং উপাদানের দ্বারা; **শোচতী**—শোক করতে করতে।

অনুবাদ

তার পর ঋষিরা নিজ নিজ আশ্রমে প্রস্থান করেছিলেন। বেণ-জননী সুনীথা তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের মৃতদেহ বিশেষ উপাদানের প্রয়োগের দ্বারা এবং মন্ত্রের দ্বারা (মন্ত্র-যোগেন) সংরক্ষণ করতে স্থির করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

একদা মুনয়স্তে তু সরস্বৎসলিলাপ্লুতাঃ ।
হুত্বাগ্নীন্ সৎকথাশ্চক্রুরুপবিষ্টাঃ সরিত্তটে ॥ ৩৬ ॥

একদা—এক সময়; **মুনয়ঃ**—সেই মহর্ষিগণ; **তে**—তারা; **তু**—তখন; **সরস্বৎ**—সরস্বতী নদীর; **সলিল**—জলে; **আপ্লুতাঃ**—স্নান করেছিলেন; **হুত্বা**—আহুতি প্রদান করে; **অগ্নীন্**—অগ্নিতে; **সৎ-কথাঃ**—চিন্ময় বিষয়ের আলোচনা; **চক্রুঃ**—করতে শুরু করেছিলেন; **উপবিষ্টাঃ**—উপবেশন করে; **সরিৎ-তটে**—নদীর তীরে।

অনুবাদ

এক সময় সেই মহাত্মাগণ সরস্বতী নদীতে স্নান করে, এবং যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাঁদের দৈনন্দিন কৃত্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার পর, নদীর তটে উপবেশন করে, তাঁরা চিন্ময় ভগবানের লীলা আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

বীক্ষ্যোত্থিতাংস্তদোৎপাতানাহুর্লোকভয়ঙ্করান্ ।
অপ্যভদ্রমনাথায়া দস্যুভ্যো ন ভবেদ্ভুবঃ ॥ ৩৭ ॥

বীক্ষ্য—দর্শন করে; **উত্থিতান্**—উৎপন্ন হয়েছে; **তদা**—তখন; **উৎপাতান্**—উপদ্রব; **আহুঃ**—তাঁরা বলতে লাগলেন; **লোক**—সমাজে; **ভয়ঙ্করান্**—ভীতি উৎপাদনকারী; **অপি**—কি, **অভদ্রম্**—দুর্ভাগ্য; **অনাথায়াঃ**—শাসক-রহিত; **দস্যুভ্যঃ**—দস্যু-তস্কর থেকে; **ন**—না; **ভবেৎ**—হতে পারে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

সেই সময় রাজ্যে নানা প্রকার উপদ্রব হওয়ার ফলে, সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সেই ঋষিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন—যেহেতু রাজার মৃত্যু হয়েছে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই, তাই হয়তো দস্যু-তস্করদের প্রভাবে প্রজারা সঙ্কটাপন্ন হতে পারে।

তাৎপর্য

রাজ্যে যখন উপদ্রব হয় অথবা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, তখন প্রজাদের সম্পত্তি এবং জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। দস্যু-তস্করদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, বুঝতে হবে যে, শাসক অথবা সরকার মৃত। রাজা বেণের মৃত্যুর ফলে এই সমস্ত সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। তাই ঋষিরা জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্তটি থেকে বোঝা যায় যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে যদিও সাধুরা সাধারণত হস্তক্ষেপ করেন না, তবুও তাঁরা সর্বদা জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ। তাই সমাজ থেকে সর্বদা দূরে থাকলেও, জনসাধারণের প্রতি তাঁদের করুণা এবং অনুকম্পার ফলে, তাঁরা বিবেচনা করেন কিভাবে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কৃত্য কর্ম অনুষ্ঠান করে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করতে পারে। সেটি ছিল এই সমস্ত ঋষিদের চিন্তার বিষয়। এই কলিযুগে সব কিছুই বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তিতে পূর্ণ। তাই সাধুদের কর্তব্য হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, যা শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

পারমার্থিক এবং জাগতিক, উভয় প্রকার উন্নতি সাধনের জন্যই, সকলের কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিভরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা।

শ্লোক ৩৮

এবং মৃশন্ত ঋষয়ো ধাবতাং সর্বতোদিশম্ ।
পাংসুঃ সমুত্থিতো ভূরিশ্চোরাণামভিলুম্পতাম্ ॥ ৩৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **মৃশন্তঃ**—যখন বিবেচনা করছিলেন; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **ধাবতাম্**—ধাবিত হচ্ছিল; **সর্বতঃ-দিশম্**—সর্বদিকে; **পাংসুঃ**—ধূলি; **সমুত্থিতঃ**—উত্থিত হয়েছিল; **ভূরিঃ**—অত্যন্ত; **চোরাণাম্**—চোরদের; **অভিলুম্পতাম্**—লুণ্ঠন কার্যে রত।

অনুবাদ

মহান ঋষিরা যখন এইভাবে আলোচনা করছিলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, সর্বদিকে এক ধূলির ঝড় উত্থিত হয়েছে। নাগরিকদের লুণ্ঠনে রত দস্যু-তস্করদের চতুর্দিকে ধাবিত হওয়ার ফলে এই ঝড় উঠেছিল।

তাৎপর্য

চোর এবং বদমাশেরা জনসাধারণকে লুণ্ঠন করার জন্য রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগের প্রতীক্ষা করে। দস্যু-তস্করদের নিরস্ত করার জন্য বলিষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন।

শ্লোক ৩৯-৪০

তদুপদ্রবমাজ্ঞায় লোকস্য বসু লুম্পতাম্ ।
ভর্তর্যুপরতে তস্মিন্নন্যোন্যং চ জিঘাংসতাম্ ॥ ৩৯ ॥
চৌরপ্রায়ং জনপদং হীনসত্ত্বমরাজকম্ ।
লোকান্নাবারয়ঞ্ছক্তা অপি তদ্দোষদর্শিনঃ ॥ ৪০ ॥

তৎ—সেই সময়; **উপদ্রবম্**—উপদ্রব; **আজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **লোকস্য**—জনসাধারণের, **বসু**—ধন-সম্পত্তি; **লুম্পতাম্**—লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা; **ভর্তরি**—রক্ষক; **উপরতে**—মৃত হওয়ার ফলে; **তস্মিন্**—রাজা বেণ; **অন্যোন্যাম্**—পরস্পর; **চ**—ও; **জিঘাংসতাম্**—সংহার করার বাসনায়; **চোর-প্রায়ম্**—চোরদের দ্বারা পূর্ণ; **জন-পদম্**—রাজ্য; **হীন**—বিহীন; **সত্ত্বম্**—নিয়ম; **অরাজকম্**—রাজাবিহিত; **লোকান্**—দস্যু-তস্কর; **ন**—না; **অবারয়ন্**—তারা দমন করেছিল; **শক্তাঃ**—করতে সক্ষম; **অপি**—যদিও; **তৎ-দোষ**—তার দোষ; **দর্শিনঃ**—বিবেচনা করে।

অনুবাদ

সেই ধূলির ঝড় দর্শন করে ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা বেণের মৃত্যুর ফলে, মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। শাসক না থাকার ফলে, রাজ্য আইন ও শৃঙ্খলা-রহিত হয়েছে, এবং তার ফলে ভয়ঙ্কর দস্যু-তস্করদের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে, যারা প্রজাদের ধন-সম্পদ হরণ করছে। সেই মহান ঋষিরা যদিও তাঁদের নিজেদের শক্তির দ্বারা সেই উপদ্রব উপশম করতে পারতেন—ঠিক যেভাবে তাঁরা রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন—তবুও তাঁরা তা করা অনুচিত বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাই তাঁরা সেই উপদ্রব বন্ধ করার চেষ্টা করেননি।

তাৎপর্য

সেই সমস্ত ঋষি এবং মহাত্মারা সঙ্কটকালে রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন, কিন্তু রাজা বেণের মৃত্যুর পর, দস্যু-তস্করদের প্রাবল্য দমন করার জন্য, তাঁরা রাজকার্যে অংশ গ্রহণ করতে চাননি। হত্যা করা ব্রাহ্মণ এবং সাধুদের কার্য নয়, যদিও তাঁরা বিশেষ জরুরী অবস্থায় কখনও কখনও তা করতে পারেন। তাঁরা তাঁদের মন্ত্র শক্তির প্রভাবে সেই সমস্ত দস্যু-তস্করদের সংহার করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন যে, সেটি হচ্ছে ক্ষত্রিয় রাজাদের কর্তব্য। তাই তাঁরা হত্যাকার্যে অংশ গ্রহণ করতে চাননি।

শ্লোক ৪১

ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎপয়ো যথা ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ; **সম-দৃক্**—সমদর্শী; **শান্তঃ**—শান্তিপ্রিয়; **দীনানাম্**—দরিদ্র; **সমুপেক্ষকঃ**—সর্বতোভাবে উপেক্ষা করে; **স্রবতে**—ক্ষয় হয়; **ব্রহ্ম**—আধ্যাত্মিক শক্তি; **তস্য**—তার; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ভিন্ন-ভাণ্ডাৎ**—ভগ্নপাত্র থেকে; **পয়ঃ**—জল; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

মহান ঋষিরা বিবেচনা করলেন যে, ব্রাহ্মণ যদিও শান্তিপ্রিয় এবং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়ার ফলে নিরপেক্ষ, তবুও দীনজনদের অবহেলা করা তাঁর কর্তব্য নয়। এই প্রকার অবহেলার ফলে, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ ক্ষয় হয়, ঠিক যেমন একটি ভগ্নপাত্র থেকে জল ঝরে পড়ে।

তাৎপর্য

মানব সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর মানুষ ব্রাহ্মণেরা সাধারণত ভগবদ্ভক্ত। তাঁরা সর্বদা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কার্যকলাপে যুক্ত থাকার ফলে, জড়-জাগতিক বিষয়ে সাধারণত উদাসীন থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন মানব-সমাজে সঙ্কট দেখা দেয়, তখন তাঁরা নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। মানব-সমাজের সঙ্কটজনক অবস্থার সংশোধনের জন্য তাঁরা যদি কিছু না করেন, তা হলে বলা হয় যে, সেই প্রকার অবহেলার ফলে তাঁদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষয় হয়। প্রায় সমস্ত ঋষিরাই তাঁদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য হিমালয় পর্বতে যান, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, তিনি তাঁর নিজের মুক্তি চান না। তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত অধঃপতিত জীবেদের উদ্ধার করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত, অপেক্ষা করবেন বলে স্থির কবেছিলেন।

উন্নত স্তরের ব্রাহ্মণদের বলা হয় বৈষ্ণব। দুই প্রকার যোগ্য ব্রাহ্মণ রয়েছে—যথা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ- বৈষ্ণব। যোগ্য ব্রাহ্মণ স্বভাবতই অত্যন্ত বিদ্বান, কিন্তু যখন তাঁর জ্ঞানের উন্নতির ফলে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হন। বৈষ্ণব না হওয়া পর্যন্ত, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির সিদ্ধি অপূর্ণ থাকে।

ঋষিরা অত্যন্ত বিচক্ষণতা সহকারে বিবেচনা করেছিলেন যে, রাজা বেণ যদিও অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ছিল, তবুও সে ছিল ধ্রুব মহারাজের বংশোদ্ভূত। তাই সেই বংশের বীর্য ভগবান কেশবের দ্বারাই সংরক্ষিত হবে। ঋষিরা সেই পরিস্থিতির সংশোধনের জন্য হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন রাজার অভাবে সব কিছুই বিশৃঙ্খল এবং বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৪২

নাঙ্গস্য বংশো রাজর্ষেরেষ সংস্থাতুমর্হতি ।
অমোঘবীর্যা হি নৃপা বংশেঽস্মিন্ কেশবাশ্রয়াঃ ॥ ৪২ ॥

ন—না; **অঙ্গস্য**—রাজা অঙ্গের; **বংশঃ**—বংশ; **রাজ-ঋষেঃ**—রাজর্ষির; **এষঃ**—এই; **সংস্থাতুম্**—নাশ করা; **অর্হতি**—উচিত; **অমোঘ**—নিষ্পাপ, শক্তিশালী; **বীর্যাঃ**—তাঁদের বীর্য; **হি**—যেহেতু; **নৃপাঃ**—রাজারা; **বংশে**—বংশে; **অস্মিন্**—এই; **কেশব**—ভগবানের; **আশ্রয়াঃ**—আশ্রয়ে।

অনুবাদ

ঋষিরা বিবেচনা করেছিলেন যে, রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত নয়, কারণ এই বংশের বীর্য অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এই বংশের সন্তানেরা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হয়।

তাৎপর্য

বংশক্রমের শুদ্ধতাকে বলা হয় *অমোঘ-বীর্য*। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বংশের পবিত্র বীর্য-পরম্পরা শুদ্ধ রাখার জন্য, গর্ভাধান সংস্কার থেকে শুরু করে যতগুলি সংস্কার রয়েছে, সেইগুলি সন্তান ধারণের পূর্বে পালন করা উচিত। এই সংস্কারের বিধি যদি কঠোরভাবে পালন করা না হয়, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা, তা হলে বংশধরেরা অশুদ্ধ হয়ে যায়, এবং ধীরে ধীরে পরিবারে পাপকর্ম হতে দেখা যায়। মহারাজ অঙ্গ অত্যন্ত শুদ্ধ ছিলেন, কারণ ধ্রুব মহারাজের পবিত্র বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পত্নী ছিলেন মৃত্যুর কন্যা সুনীথা, এবং তাঁর সঙ্গ প্রভাবে তাঁর বীর্য দূষিত হয়ে গিয়েছিল। সেই দূষিত বীর্যের ফলে রাজা বেণের জন্ম হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজের বংশে সেটি ছিল একটি মস্ত বড় দুর্ঘটনা। সমস্ত ঋষি ও মুনিরা সেই কথা বিবেচনা করেছিলেন, এবং তাঁরা সেই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্থির করেছিলেন, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪৩

বিনিশ্চিত্যৈবমৃষয়ো বিপন্নস্য মহীপতেঃ।
মমন্থুরূরুং তরসা তত্রাসীদ্বাহুকো নরঃ ॥ ৪৩ ॥

বিনিশ্চিত্য—স্থিরনিশ্চয় করে; **এবম্**—এইভাবে; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **বিপন্নস্য**—মৃত; **মহী-পতেঃ**—রাজার; **মমন্থুঃ**—মন্থন করেছিলেন; **উরুম্**—জঙ্ঘা; **তরসা**—বিশেষ শক্তি সহকারে; **তত্র**—তার পর; **আসীৎ**—জন্ম হয়েছিল; **বাহুকঃ**—বাহুক নামক (বামন); **নরঃ**—এক ব্যক্তি।

অনুবাদ

ঋষিরা এইভাবে স্থিরনিশ্চয় করে, অতিবেগে এবং এক বিশেষ পন্থায়, মৃত রাজা বেণের উরুদেশ মন্থন করেছিলেন। তার ফলে রাজা বেণের শরীর থেকে এক বামন পুরুষের উৎপত্তি হয়েছিল।

তাৎপর্য

রাজা বেণের উরুদেশ মন্থন করার ফলে যে এক ব্যক্তির উৎপত্তি হয়েছিল, তা প্রমাণ করে যে, আত্মা স্বতন্ত্র এবং শরীর থেকে পৃথক। মৃত রাজা বেণের শরীর থেকে ঋষিরা আর একটি ব্যক্তি উৎপন্ন করতে পেরেছিলেন, কিন্তু রাজা বেণকে জীবিত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজা বেণের মৃত্যু হয়েছিল এবং সে নিশ্চিতভাবে অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করেছিল। মুনি ঋষিরা বেণের শরীর সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন, কারণ তা ধ্রুব মহারাজের বংশের বীর্যসম্ভূত ছিল। তার ফলে, অন্য আর একটি শরীর উৎপাদন করার উপাদানগুলি রাজা বেণের শরীরের মধ্যে ছিল। কোন এক বিশেষ পন্থায় যখন মৃতদেহের উরুদেশ মন্থন করা হয়, তখন আর একটি শরীর উৎপন্ন হয়। মৃত হলেও রাজা বেণের শরীর ঔষধ এবং তার মাতার দ্বাবা উচ্চারিত মন্ত্রের প্রভাবে সুরক্ষিত ছিল। এইভাবে আব একটি শরীর উৎপন্ন করার উপাদানগুলি সেখানে ছিল। রাজা বেণের শরীর থেকে যে বাহুক নামক ব্যক্তির শরীর প্রকটিত হয়েছিল, তাতে খুব একটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটি কেবল কিভাবে তা করতে হয়, তা জানার উপর নির্ভর করে। এক দেহের বীর্য থেকে আর একটি দেহের উৎপন্ন হয়, এবং সেই দেহে আত্মার আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে জীবনের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। মহারাজ বেণের মৃতদেহ থেকে যে আর একটি শরীর উৎপন্ন হয়েছিল, তা অসম্ভব বলে মনে করা উচিত নয়। ঋষিরা অত্যন্ত কৌশলে সেই কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ ।
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্ধজঃ ॥ ৪৪ ॥

কাক-কৃষ্ণঃ—কাকের মতো কালো; **অতি-হ্রস্ব**—অত্যন্ত খর্ব; **অঙ্গঃ**—তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **হ্রস্ব**—খর্ব; **বাহুঃ**—বাহু; **মহা**—বিশাল; **হনুঃ**—তার চোয়াল; **হ্রস্ব**—খর্ব; **পাৎ**—তার পা; **নিম্ন**—অনুন্নত; **নাস-অগ্রঃ**—নাসিকার অগ্রভাগ, **রক্ত**—লাল; **অক্ষঃ**—তার চক্ষু; **তাম্র**—তাম্রবর্ণ; **মূর্ধ-জঃ**—তার চুল।

অনুবাদ

রাজা বেণের উরুদেশ থেকে যে ব্যক্তিটি উৎপন্ন হয়েছিল, তার নাম ছিল বাহুক, তার গায়ের রং কাকের মতো কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি

অত্যন্ত খর্ব, তার বাহু এবং পা খর্ব, এবং তার চোয়াল ছিল অত্যন্ত বিশাল। তার নাসিকা অনুন্নত, তার চক্ষু রক্তবর্ণ এবং তার কেশ তাম্রবর্ণ ছিল।

শ্লোক ৪৫

তং তু তেঽবনতং দীনং কিং করোমীতি বাদিনম্ ।
নিষীদেত্যব্রুবংস্তাত স নিষাদস্ততোঽভবৎ ॥ ৪৫ ॥

তম্—তাকে; **তু**—তখন; **তে**—ঋষিরা; **অবনতম্**—অবনত হয়ে; **দীনম্**—বিনীত; **কিম্**—কি; **করোমি**—আমি করব; **ইতি**—এইভাবে; **বাদিনম্**—প্রশ্ন করে, **নিষীদ**—উপবেশন কর; **ইতি**—এইভাবে; **অব্রুবন্**—তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন; **তাত**—হে বিদুর; **সঃ**—সে; **নিষাদঃ**—নিষাদ নামক; **ততঃ**—তার পর; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

সে অত্যন্ত বিনীত ও নম্র ছিল, এবং তার জন্মের পরেই সে অবনত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, "মহাশয়! আমি কি করব?" ঋষিরা তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর।" এইভাবে নৈষাদ জাতির জনক নিষাদের জন্ম হয়েছিল।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সমাজরূপ শরীরের মস্তক হচ্ছে ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উদর বৈশ্য এবং উরু থেকে শুরু করে পা হচ্ছে শূদ্র। শূদ্রদের কখনও কখনও কৃষ্ণ বা কালো বলা হয়। ব্রাহ্মণদের বলা হয় শুক্ল, এবং ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যেরা কালো ও সাদার মিশ্রণ। কিন্তু যাদের রঙ অত্যন্ত সাদা, তাদের চামড়ার সেই সাদা রঙ হচ্ছে শ্বেত কুষ্ঠজনিত। মূল কথা হচ্ছে যে, সাদা অথবা সোনালি গায়ের রঙ উচ্চ বর্ণের এবং শূদ্রদের গায়ের রং কালো।

শ্লোক ৪৬

তস্য বংশ্যাস্তু নৈষাদা গিরিকাননগোচরাঃ ।
যেনাহরজ্জায়মানো বেণকল্মষমুল্বণম্ ॥ ৪৬ ॥

তস্য—তার (নিষাদের); **বংশ্যাঃ**—বংশধরেরা; **তু**—তখন; **নৈষাদাঃ**—নৈষাদ নামক; **গিরি-কানন**—পাহাড় এবং জঙ্গলে; **গোচরাঃ**—নিবাসী; **যেন**—যেহেতু; **অহরৎ**—গ্রহণ করেছিল; **জায়মানঃ**—জন্মের পর; **বেণ**—বেণ রাজার; **কল্মষম্**—সমস্ত প্রকার পাপ; **উল্বণম্**—অত্যন্ত ভয়ানক।

অনুবাদ

তার (নিষাদের) জন্মের পরেই, সে রাজা বেণের সমস্ত পাপকর্মের ফল গ্রহণ করেছিল। তাই এই নিষাদ জাতি সর্বদা চুরি, ডাকাতি এবং শিকার আদি পাপকর্মে সর্বদা যুক্ত থাকে। তার ফলে তাদের কেবলমাত্র পর্বতে এবং অরণ্যেই বাস করতে হয়।

তাৎপর্য

নিষাদদের শহরে এবং নগরে থাকতে দেওয়া হয় না, কারণ তারা স্বভাবতই পাপী। তাই তাদের শরীর অত্যন্ত কুৎসিত, এবং তাদের বৃত্তিও অত্যন্ত পাপময়। কিন্তু আমাদের জেনে রাখতে হবে যে, এই প্রকার পাপী মানুষেরাও (যাদের কখনও কখনও কিরাত বলা হয়) শুদ্ধ ভক্তের কৃপায়, তাদের পাপপঙ্কিল জীবন থেকে উদ্ধার লাভ করে, সর্বোচ্চ বৈষ্ণবপদে উন্নীত হতে পারে। মানুষ যত পাপী হোক না কেন, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। মানুষকে কেবল ভগবদ্ভক্তির পন্থার দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে হয়। এইভাবে সকলেই তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) প্রতিপন্ন করেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, যারা আমার শরণ গ্রহণ করেছে, তারা যদি, পাপযোনি-সম্ভূত—স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রও হয়—তবুও তারা পরম গতি প্রাপ্ত হবে।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'বেণ রাজার কাহিনী' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পৃথু মহারাজের আবির্ভাব ও অভিষেক

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

অথ তস্য পুনর্বিপ্রৈরপুত্রস্য মহীপতেঃ ।
বাহুভ্যাং মথ্যমানাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **অথ**—এইভাবে; **তস্য**—তার; **পুনঃ**—পুনরায়; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **অপুত্রস্য**—অপুত্রক; **মহীপতেঃ**—রাজার; **বাহুভ্যাম্**—বাহু থেকে; **মথ্য-মানাভ্যাম্**—মন্থন করে; **মিথুনম্**—যুগল; **সমপদ্যত**—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! তার পর ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা পুনরায় রাজা বেণের মৃত শরীরের বাহুদ্বয় মন্থন করেছিলেন, এবং তার ফলে তার বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী উৎপন্ন হয়েছিল।

শ্লোক ২

তদ্ দৃষ্ট্বা মিথুনং জাতমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ।
ঊচুঃ পরমসন্তুষ্টা বিদিত্বা ভগবৎকলাম্ ॥ ২ ॥

তৎ—তা; **দৃষ্ট্বা**—দেখে, **মিথুনম্**—যুগল; **জাতম্**—জাত; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত পারঙ্গত; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **পরম**—অত্যন্ত; **সন্তুষ্টাঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **বিদিত্বা**—জেনে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কলাম্**—অংশসম্ভূত।

অনুবাদ

সেই ঋষিগণ বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁরা যখন বেণের বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীকে উৎপন্ন হতে দেখলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত

প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই মিথুন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশসম্ভূত।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত ঋষি ও মুনিরা যে-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা পূর্ণ ছিল। তাঁরা রাজা বেণের সমস্ত পাপকর্মের ফল বাহুকের উৎপত্তির দ্বারা অপসারণ করেছিলেন, যার বর্ণনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে। এইভাবে রাজা বেণের শরীর শুদ্ধ হওয়ার পর, তা থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং সেই মহান ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশসম্ভূত। এই বিস্তার অবশ্য বিষ্ণুতত্ত্ব ছিল না, তিনি ছিলেন বিশেষভাবে বিষ্ণুর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট আবেশাবতার।

শ্লোক ৩

ঋষয় উচুঃ

এষ বিষ্ণোর্ভগবতঃ কলা ভুবনপালিনী ।
ইয়ং চ লক্ষ্ম্যাঃ সম্ভূতিঃ পুরুষস্যানপায়িনী ॥ ৩ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ—ঋষিগণ বললেন; **এষঃ**—এই পুরুষটি; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **কলা**—বিস্তার; **ভুবন-পালিনী**—জগৎ-পালনকারী; **ইয়ম্**—এই স্ত্রী; **চ**—ও; **লক্ষ্ম্যাঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **সম্ভূতিঃ**—বিস্তার; **পুরুষস্য**—ভগবানের; **অনপায়িনী**—অবিচ্ছেদ্য।

অনুবাদ

মহান ঋষিগণ বললেন—এই পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর ভুবন-পালন অংশ, এবং এই স্ত্রীটিও ভগবানের সনাতনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা।

তাৎপর্য

লক্ষ্মীদেবী যে কখনও ভগবান থেকে আলাদা হন না, সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জড় জগতে মানুষেরা লক্ষ্মীদেবীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং তারা ধনসম্পদ লাভের জন্য তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হতে চায়। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, লক্ষ্মীদেবী কখনও ভগবান বিষ্ণু থেকে পৃথক হতে পারেন না। জড়বাদীদের বোঝা উচিত যে, লক্ষ্মীদেবীর পূজা ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে হওয়া উচিত

এবং কখনও তাঁদের পৃথক বলে মনে করা উচিত নয়। যে-সমস্ত জড়বাদীরা লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে চায়, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাদের জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের জন্য, একত্রে ভগবান বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীদেবীর পূজা করা। যদি কোন জড়বাদী মানুষ শ্রীরামচন্দ্র থেকে সীতাদেবীকে পৃথক করার রাবণনীতি অনুসরণ করতে চায়, তা হলে তার সর্বনাশ হবে। যারা লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় অত্যন্ত ধনবান, তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সেই ধন-সম্পদের দ্বারা ভগবানের সেবা করা। এইভাবে তারা নিরুপদ্রবে তাদের ঐশ্বর্যশালী স্থিতি বজায় রাখতে পারবে।

শ্লোক ৪

অয়ং তু প্রথমো রাজ্ঞাং পুমান্ প্রথয়িতা যশঃ ।
পৃথুর্নাম মহারাজো ভবিষ্যতি পৃথুশ্রবাঃ ॥ ৪ ॥

অয়ম্—এই; **তু**—তখন; **প্রথমঃ**—প্রথম; **রাজ্ঞাম্**—রাজার; **পুমান্**—পুরুষ; **প্রথয়িতা**—বিস্তার করবে; **যশঃ**—খ্যাতি; **পৃথুঃ**—মহারাজ পৃথু; **নাম**—নামক; **মহা-রাজঃ**—মহান রাজা; **ভবিষ্যতি**—হবে; **পৃথু-শ্রবাঃ**—বিস্তৃত যশসমন্বিত।

অনুবাদ

এই দুজনের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর যশ বিস্তার করবেন। তাঁর নাম হবে পৃথু। প্রকৃতপক্ষে তিনি হবেন সমগ্র রাজাদের মধ্যে অগ্রণী।

তাৎপর্য

ভগবানের অনেক প্রকার অবতার রয়েছেন। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গরুড় (শ্রীবিষ্ণুর বাহন), শিব এবং অনন্ত, এঁরা সকলে ভগবানের ভক্তরূপের অতি শক্তিশালী অবতার। তেমনই, শচীপতি বা দেবরাজ ইন্দ্র হচ্ছেন ভগবানের কামরূপের অবতার। অনিরুদ্ধ ভগবানের মনের অবতার, তেমনই, পৃথু মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের শাসন-শক্তির অবতার। এইভাবে মহান মুনি-ঋষিরা মহারাজ পৃথুর ভাবী কার্যকলাপের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যাঁকে তাঁরা ইতিমধ্যেই ভগবানের কলা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ইয়ং চ সুদতী দেবী গুণভূষণভূষণা ।
অর্চির্নাম বরারোহা পৃথুমেবাবরুন্ধতী ॥ ৫ ॥

ইয়ম্—এই স্ত্রী; **চ**—এবং; **সু-দতী**—অত্যন্ত সুন্দর দন্তসমন্বিতা; **দেবী**—লক্ষ্মীদেবী; **গুণ**—সদ্‌গুণের দ্বারা; **ভূষণ**—অলঙ্কার; **ভূষণা**—যিনি বিভূষিত করেন; **অর্চিঃ**—অর্চি; **নাম**—নামক; **বর-আরোহা**—অত্যন্ত সুন্দর; **পৃথুম্**—মহারাজ পৃথুকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবরুন্ধতী**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে।

অনুবাদ

অত্যন্ত সুন্দরী এবং সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিতা এই রমণীটি ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপা হবেন। তাঁর নাম হবে অর্চি। ভবিষ্যতে তিনি পৃথু মহারাজকে তাঁর পতিরূপে বরণ করবেন।

শ্লোক ৬

এষ সাক্ষাদ্ধরেরংশো জাতো লোকরিরক্ষয়া ।
ইয়ং চ তৎপরা হি শ্রীরনুজজ্ঞেঽনপায়িনী ॥ ৬ ॥

এষঃ—এই পুরুষ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **হরেঃ**—ভগবানের; **অংশঃ**—অংশ; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **লোক**—সারা জগৎ; **রিরক্ষয়া**—রক্ষা করার বাসনায়; **ইয়ম্**—এই স্ত্রী; **চ**—ও; **তৎ-পরা**—তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী, **অনুজজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **অনপায়িনী**—অবিচ্ছেদ্য।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির এক অংশের দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মানুষদের রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবানের নিত্যসঙ্গিনী হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী, এবং তাঁরই অংশে অর্চিরূপে পৃথু মহারাজের রানী হওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলেছেন যে, যখনই কোন অসাধারণ শক্তি দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে যে, তা হচ্ছে ভগবানের বিশিষ্ট শক্তির প্রকাশ। এই প্রকার অসংখ্য ব্যক্তি রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব নন। বহু জীব ভগবানের শক্তিতত্ত্বরূপে পরিগণিত। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তিপ্রাপ্ত এই প্রকার অবতারদের বলা হয় শক্ত্যাবেশ-অবতার। মহারাজ পৃথু ছিলেন ভগবানের এই প্রকার একজন শক্ত্যাবেশ-অবতার। তেমনই, মহারাজ পৃথুর মহিষী অর্চি ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর শক্ত্যাবেশ-অবতার।

শ্লোক ৭

মৈত্রেয় উবাচ

প্রশংসন্তি স্ম তং বিপ্রা গন্ধর্বপ্রবরা জগুঃ ।
মুমুচুঃ সুমনোধারাঃ সিদ্ধা নৃত্যন্তি স্বঃস্ত্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **প্রশংসন্তি স্ম**—মহিমা কীর্তন করেছিলেন, **তম্**—তাঁকে (পৃথু); **বিপ্রাঃ**—সমস্ত ব্রাহ্মণেরা; **গন্ধর্ব-প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বেরা; **জগুঃ**—কীর্তন করেছিলেন; **মুমুচুঃ**—বর্ষণ করেছিলেন; **সুমনঃ-ধারাঃ**—পুষ্পবৃষ্টি; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ; **নৃত্যন্তি**—নৃত্য করছিলেন; **স্বঃ**—স্বর্গলোকের; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীরা (অপ্সরাগণ)।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! তখন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজের মহিমা কীর্তন করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বেরা তাঁর যশোগান করেছিলেন, সিদ্ধরা পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন, এবং স্বর্গের অপ্সরারা মহা আনন্দে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ৮

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি ।
তত্র সর্ব উপাজগ্মুর্দেবর্ষিপিতৃণাং গণাঃ ॥ ৮ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **তূর্য**—তূর্য; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **নেদুঃ**—বাজতে লাগল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **দিবি**—অন্তরীক্ষে; **তত্র**—সেখানে; **সর্বে**—সমস্ত; **উপাজগ্মুঃ**—এসেছিল; **দেব-ঋষি**—দেবতা এবং ঋষিগণ; **পিতৃণাম্**—পিতৃদের; **গণাঃ**—সমূহ।

অনুবাদ

অন্তরীক্ষে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি বাজতে লাগল। বিভিন্ন লোক থেকে দেবতা, মহর্ষি এবং পিতৃগণ তখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

শ্লোক ৯-১০

ব্রহ্মা জগদ্গুরুর্দেবৈঃ সহাসৃত্য সুরেশ্বরৈঃ ।
বৈণ্যস্য দক্ষিণে হস্তে দৃষ্ট্বা চিহ্নং গদাভৃতঃ ॥ ৯ ॥

পাদয়োররবিন্দং চ তং বৈ মেনে হরেঃ কলাম্ ।
যস্যাপ্রতিহতং চক্রমংশঃ স পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **জগৎ-গুরুঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **সহ**—সঙ্গে; **আসৃত্য**—উপস্থিত হয়ে; **সুর-ঈশ্বরৈঃ**—স্বর্গলোকের শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ সহ; **বৈণ্যস্য**—বেণপুত্র মহারাজ পৃথুর; **দক্ষিণে**—দক্ষিণ; **হস্তে**—হস্তে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **চিহ্নম্**—চিহ্ন; **গদা-ভৃতঃ**—গদাধর শ্রীবিষ্ণুর; **পাদয়োঃ**—দুই পায়ে; **অরবিন্দম্**—পদ্মফুল; **চ**—ও; **তম্**—তাঁকে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **মেনে**—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; **হরেঃ**—ভগবানের; **কলাম্**—অংশের অংশ; **যস্য**—যাঁর; **অপ্রতিহতম্**—পরাভূত হয় না; **চক্রম্**—চক্র; **অংশঃ**—অংশ; **সঃ**—তিনি; **পরমেষ্ঠিনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

দেবতা ও দেবশ্রেষ্ঠগণ সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ব্রহ্মা সেখানে এসেছিলেন। মহারাজ পৃথুর দক্ষিণ করতলে বিষ্ণুর হাতের রেখা এবং দুই পদতলে পদ্মচিহ্ন দর্শন করে ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহারাজ পৃথু হচ্ছেন ভগবানের অংশ। কারণ যাঁর করতলে চক্ররেখা অন্য রেখার দ্বারা প্রতিহত হয় না বা বিলুপ্ত হয় না, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-অবতার বলে বুঝতে হবে।

তাৎপর্য

ভগবানের অবতার চেনার এক বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। আজকাল যে-কোন ভণ্ডকে ভগবানের অবতার বলে মনে করার একটা সস্তা ফ্যাশন দেখা দিয়েছে, কিন্তু এই বর্ণনাটি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রহ্মা স্বয়ং পৃথু মহারাজের করতল এবং পদতলে কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। বিজ্ঞ মহর্ষি এবং ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজকে ভগবানের অংশ বলে স্বীকার করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন, তখনও এক রাজা নিজেকে বাসুদেব বলে ঘোষণা করেছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাকে সংহার করেছিলেন। কাউকে ভগবানের অবতার বলে মনে করার পূর্বে, শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণ অনুসারে তার পরিচয় যাচাই করা উচিত। এই সমস্ত লক্ষণ-বিহীন ভণ্ডরা ভগবানের অবতার বলে নিজেদের জাহির করতে যাওয়ার ফলে, অধিকারিদের দ্বারা নিহত হবে।

শ্লোক ১১

তস্যাভিষেক আরব্ধো ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
আভিষেচনিকান্যস্মৈ আজহ্রুঃ সর্বতো জনাঃ ॥ ১১ ॥

তস্য—তাঁর; **অভিষেকঃ**—অভিষেক; **আরব্ধঃ**—আয়োজিত হয়েছিল; **ব্রাহ্মণৈঃ**—বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত; **আভিষেচনিকানি**—অভিষেকের জন্য বিবিধ সামগ্রী; **অস্মৈ**—তাঁকে; **আজহ্রুঃ**—সংগ্রহ করেছিলেন; **সর্বতঃ**—সর্বদিক থেকে; **জনাঃ**—মানুষ।

অনুবাদ

তখন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা রাজার অভিষেকের আয়োজন করেছিলেন। লোকেরা তখন চতুর্দিক থেকে সেই অনুষ্ঠানের জন্য বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করেছিলেন। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছিল।

শ্লোক ১২

সরিৎসমুদ্রা গিরয়ো নাগা গাবঃ খগা মৃগাঃ ।
দ্যৌঃ ক্ষিতিঃ সর্বভূতানি সমাজহ্রুরুপায়নম্ ॥ ১২ ॥

সরিৎ—নদীসমূহ; **সমুদ্রাঃ**—সমুদ্রসমূহ; **গিরয়ঃ**—পর্বতসমূহ; **নাগাঃ**—নাগগণ; **গাবঃ**—গাভীগণ; **খগাঃ**—পক্ষীগণ; **মৃগাঃ**—পশুগণ; **দ্যৌঃ**—আকাশ; **ক্ষিতিঃ**—পৃথিবী; **সর্ব-ভূতানি**—সমস্ত জীব; **সমাজহ্রুঃ**—সংগ্রহ করেছিল; **উপায়নম্**—বিবিধ প্রকার উপহার।

অনুবাদ

সমস্ত নদী, সমুদ্র, গিরি, পর্বত, নাগ, গাভী, পক্ষী, পশু, স্বর্গলোক এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবেরা তাদের ক্ষমতা অনুসারে রাজাকে দেওয়ার জন্য বিবিধ প্রকার উপহার সংগ্রহ করেছিল।

শ্লোক ১৩

সোঽভিষিক্তো মহারাজঃ সুবাসাঃ সাধ্বলঙ্কৃতঃ ।
পত্ন্যার্চিষালঙ্কৃতয়া বিরেজেঽগ্নিরিবাপরঃ ॥ ১৩ ॥

সঃ—রাজা; **অভিষিক্তঃ**—অভিষিক্ত হয়ে; **মহারাজঃ**—মহারাজ পৃথু; **সু-বাসাঃ**—সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিত; **সাধু-অলঙ্কৃতঃ**—অতি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে; **পত্ন্যা**—তাঁর পত্নী সহ; **অর্চিষা**—অর্চি নামক; **অলঙ্কৃতয়া**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **বিরেজে**—বিরাজ করছিলেন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **অপরঃ**—অন্য।

অনুবাদ

এইভাবে মহারাজ পৃথু অত্যন্ত সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; এবং অত্যন্ত সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা পত্নী অর্চি সহ রাজা অগ্নির মতো বিরাজ করছিলেন।

শ্লোক ১৪

তস্মৈ জহার ধনদো হৈমং বীর বরাসনম্ ।
বরুণঃ সলিলস্রাবমাতপত্রং শশিপ্রভম্ ॥ ১৪ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **জহার**—উপহার দিয়েছিলেন; **ধন-দঃ**—দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের; **হৈমম্**—স্বর্ণনির্মিত; **বীর**—হে বিদুর; **বর-আসনম্**—রাজসিংহাসন; **বরুণঃ**—বরুণদেব; **সলিল স্রাবম্**—বারিবিন্দু বর্ষণকারী; **আতপত্রম্**—ছত্র; **শশি-প্রভম্**—চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল

অনুবাদ

মহর্ষি বললেন—হে বিদুর! মহারাজ পৃথুকে কুবের এক স্বর্ণনির্মিত সিংহাসন উপহার দিয়েছিলেন। বরুণদেব তাঁকে একটি ছত্র উপহার দিয়েছিলেন, যা চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল এবং যা থেকে নিরন্তর সূক্ষ্ম বারিবিন্দু বর্ষিত হয়।

শ্লোক ১৫

বায়ুশ্চ বালব্যজনে ধর্মঃ কীর্তিময়ীং স্রজম্ ।
ইন্দ্রঃ কিরীটমুৎকৃষ্টং দণ্ডং সংযমনং যমঃ ॥ ১৫ ॥

বায়ুঃ—পবনদেব; **চ**—ও; **বাল-ব্যজনে**—দুটি চামর; **ধর্মঃ**—ধর্মরাজ; **কীর্তি-ময়ীম্**—খ্যাতি ও যশ বর্ধনকারী; **স্রজম্**—মালা; **ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা; **কিরীটম্**—মুকুট; **উৎকৃষ্টম্**—অত্যন্ত মূল্যবান; **দণ্ডম্**—রাজদণ্ড; **সংযমনম্**—পৃথিবী শাসন করার জন্য; **যমঃ**—যম।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথুকে বায়ু দুটি চামর প্রদান করেছিলেন; ধর্মরাজ তাঁকে যশ-বর্ধনকারী এক পুষ্পমাল্য প্রদান করেছিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে এক মহামূল্যবান মুকুট প্রদান করেছিলেন; এবং যমরাজ তাঁকে সারা পৃথিবী শাসন করার জন্য একটি রাজদণ্ড প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

ব্রহ্মা ব্রহ্মময়ং বর্ম ভারতী হারমুত্তমম্ ।
হরিঃ সুদর্শনং চক্রং তৎপত্ন্যব্যাহতাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা, **ব্রহ্ম-ময়ম্**—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নির্মিত, **বর্ম**—কবচ; **ভারতী**—সরস্বতী দেবী; **হারম্**—হার; **উত্তমম্**—দিব্য, **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সুদর্শনম্ চক্রম্**—সুদর্শন চক্র; **তৎ-পত্নী**—তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবী; **অব্যাহতাম্**—অক্ষয়; **শ্রিয়ম্**—সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

ব্রহ্মা পৃথু মহারাজকে চিন্ময় জ্ঞাননির্মিত একটি বর্ম প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মার পত্নী ভারতী (সরস্বতী) তাঁকে এক দিব্য হার প্রদান করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁকে সুদর্শন চক্র দান করেছিলেন, এবং বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীদেবী তাঁকে অক্ষয় সম্পদ প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত দেবতারা পৃথু মহারাজকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করেছিলেন। স্বর্গলোকে ভগবানের অবতার উপেন্দ্র বা হরি রাজাকে সুদর্শন চক্র প্রদান করেছিলেন। এখানে বুঝতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু যে সুদর্শন ব্যবহার করেন, এটি ঠিক সেই সুদর্শন চক্র নয়; যেহেতু মহারাজ পৃথু ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তাই তাঁকে যে সুদর্শন চক্র দেওয়া হয়েছিল, তা আদি সুদর্শন চক্রের আংশিক শক্তিসমন্বিত।

শ্লোক ১৭

দশচন্দ্রমসিং রুদ্রঃ শতচন্দ্রং তথাম্বিকা ।
সোমোঽমৃতময়ানশ্বাংস্ত্বষ্টা রূপাশ্রয়ং রথম্ ॥ ১৭ ॥

দশ-চন্দ্রম্—দশটি চন্দ্রভূষিত; **অসিম্**—তরবারি; **রুদ্রঃ**—শিব; **শত-চন্দ্রম্**—শত চন্দ্রভূষিত; **তথা**—সেই প্রকার; **অম্বিকা**—দুর্গাদেবী; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **অমৃত-ময়ান্**—অমৃতময়; **অশ্বান্**—অশ্ব; **ত্বষ্টা**—বিশ্বকর্মা; **রূপ-আশ্রয়ম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **রথম্**—রথ।

অনুবাদ

শিব তাঁকে দশ চন্দ্র অঙ্কিত একটি তরবারি প্রদান করেছিলেন, এবং তাঁর পত্নী দুর্গাদেবী তাঁকে শত চন্দ্র অঙ্কিত একটি ঢাল প্রদান করেছিলেন। চন্দ্রদেব তাঁকে অমৃতময় কতকগুলি অশ্ব প্রদান করেছিলেন, এবং বিশ্বকর্মা তাঁকে একটি অত্যন্ত সুন্দর রথ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

অগ্নিরাজগবং চাপং সূর্যো রশ্মিময়ানিষূন্ ।
ভূঃ পাদুকে যোগময্যৌ দ্যৌঃ পুষ্পাবলিমন্বহম্ ॥ ১৮ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নিদেব; **আজ-গবম্**—ছাগ ও গোশৃঙ্গ নির্মিত; **চাপম্**—ধনুক; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব, **রশ্মি-ময়ান্**—সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল; **ইষূন্**—বাণ; **ভূঃ**—ভূমি, পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; **পাদুকে**—দুটি পাদুকা; **যোগ-ময্যৌ**—যোগশক্তি-সমন্বিত; **দ্যৌঃ**—অন্তরীক্ষের দেবতাগণ; **পুষ্প**—ফুলের; **আবলিম্**—উপহার; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন।

অনুবাদ

অগ্নিদেব তাঁকে ছাগ ও গোশৃঙ্গ-নির্মিত একটি ধনুক প্রদান করেছিলেন। সূর্যদেব তাঁকে সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল বাণ প্রদান করেছিলেন। ভূর্লোকের অধিষ্ঠাত্রী ভূমিদেবী তাঁকে যোগশক্তি-সমন্বিত দুটি পাদুকা প্রদান করেছিলেন, এবং আকাশের দেবতারা পুনঃ পুনঃ পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাজার পাদুকা যোগশক্তি-সমন্বিত ছিল (*পাদুকে যোগময্যৌ*)। অর্থাৎ, সেই পাদুকা চরণে ধারণ করা মাত্র যেখানে ইচ্ছা যেতে পারতেন। যোগীরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারেন। সেই প্রকার শক্তি পৃথু মহারাজের পাদুকায় অর্পিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

নাট্যং সুগীতং বাদিত্রমন্তর্ধানং চ খেচরাঃ ।
ঋষয়শ্চাশিষঃ সত্যাঃ সমুদ্রঃ শঙ্খমাত্মজম্ ॥ ১৯ ॥

নাট্যম্—নাট্যকলা; **সু-গীতম্**—মধুর সংগীত কলা; **বাদিত্রম্**—বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কলা; **অন্তর্ধানম্**—অন্তর্হিত হওয়ার কৌশল; **চ**—ও; **খে চরাঃ**—আকাশমার্গে ভ্রমণকারী দেবতারা; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **চ**—ও; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ, **সত্যাঃ**—অমোঘ; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্রের দেবতা; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **আত্ম-জম্**—নিজের থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

আকাশমার্গে বিচরণকারী গন্ধর্ব, বিদ্যাধর আদি দেবতারা পৃথু মহারাজকে নাট্য, গীত, বাদ্য এবং নিজের ইচ্ছা অনুসারে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার কৌশল প্রদান করেছিলেন। মহর্ষিরা তাঁকে তাঁদের অমোঘ আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। সমুদ্র তাঁকে সলিলসম্ভূত শঙ্খ উপহার দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

সিন্ধবঃ পর্বতা নদ্যো রথবীথীর্মহাত্মনঃ ।
সূতোঽথ মাগধো বন্দী তং স্তোতুমুপতস্থিরে ॥ ২০ ॥

সিন্ধবঃ—সমুদ্র; **পর্বতাঃ**—পর্বত; **নদ্যঃ**—নদী; **রথ-বীথীঃ**—রথ চলার পথ; **মহা-আত্মনঃ**—মহা পুরুষের; **সূতঃ**—স্তবকারী; **অথ**—তখন; **মাগধঃ**—পেশাদার গায়ক কবি; **বন্দী**—পেশাদার বন্দনাকারী; **তম্**—তাঁকে; **স্তোতুম্**—স্তব করার জন্য; **উপতস্থিরে**—উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সমুদ্র, পর্বত, নদী তাঁকে বিনা বাধায় তাঁর রথ চালাবার জন্য পথ প্রদান করেছিল। তার পর সূত, মাগধ এবং বন্দীরা তাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে তার স্তব করার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

স্তাবকাংস্তানভিপ্রেত্য পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
মেঘনির্হ্রাদয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

স্তাবকান্—স্তবকারী; **তান্**—সেই সমস্ত ব্যক্তিদের; **অভিপ্রেত্য**—বুঝতে পেরে; **পৃথুঃ**—মহারাজ পৃথু; **বৈণ্যঃ**—বেণের পুত্র; **প্রতাপ-বান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মেঘ-নির্হ্রাদয়া**—জলদ-গম্ভীর; **বাচা**—স্বরে; **প্রহসন্**—হেসে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

বেণের পুত্র পরম শক্তিশালী মহারাজ পৃথু যখন তাঁর সম্মুখে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দেখলেন, তখন তিনি তাদের অভিনন্দন জানিয়ে, মৃদু হেসে জলদ-গম্ভীরস্বরে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২২

পৃথুরুবাচ

ভোঃ সূত হে মাগধ সৌম্য বন্দিঁ-
লোকেঽধুনাস্পষ্টগুণস্য মে স্যাৎ ।
কিমাশ্রয়ো মে স্তব এষ যোজ্যতাং
মা ময্যভূবন্ বিতথা গিরো বঃ ॥ ২২ ॥

পৃথুঃ উবাচ—মহারাজ পৃথু বললেন; **ভোঃ সূত**—হে সূত; **হে মাগধ**—হে মাগধ; **সৌম্য**—সৌম্য; **বন্দিন্**—হে প্রার্থনারত ভক্ত; **লোকে**—এই জগতে; **অধুনা**—এখন; **অস্পষ্ট**—অপ্রকাশিত, **গুণস্য**—যার গুণাবলী; **মে**—আমার; **স্যাৎ**—হতে পারে; **কিম্**—কেন, **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয়; **মে**—আমার; **স্তবঃ**—প্রশংসা; **এষঃ**—এই; **যোজ্যতাম্**—প্রযুক্ত হতে পারে, **মা**—কখনই নয়; **ময়ি**—আমাকে; **অভুবন্**—ছিল; **বিতথাঃ**—বৃথা; **গিরঃ**—বাণী, **বঃ**—তোমাদের।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথু বললেন—হে সৌম্য সূত, মাগধ এবং বন্দিগণ, তোমরা আমার যে-সমস্ত গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছ তা এখনও অপ্রকাশিত। সুতরাং যে-সমস্ত গুণে আমি গুণান্বিত নই, সেই সমস্ত গুণের প্রশংসা কেন করছ? আমি চাই না যে, তোমাদের এই বাক্যাবলী আমাতে প্রযুক্ত হয়ে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হোক, তাই তোমাদের এই স্তব অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ কর।

তাৎপর্য

সূত, মাগধ এবং বন্দীদের স্তবস্তুতি মহারাজ পৃথুর দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করেছিল, কেননা তিনি ছিলেন, ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। কিন্তু, যেহেতু সেই সমস্ত গুণাবলী তখনও প্রকাশিত হয়নি, তাই পৃথু মহারাজ বিনীতভাবে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তাঁরা এই প্রকার মহান বাক্যের দ্বারা তাঁর প্রশংসা করছেন। তিনি চাননি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে বাস্তবিকভাবে প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁদের স্তবস্তুতি অবশ্যই উপযুক্ত ছিল, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের অবতার, কিন্তু পৃথু মহারাজ সাবধান করে দিয়েছেন যে, দিব্য গুণাবলীযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, কাউকে যেন ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করা না হয়। বর্তমানে তথাকথিত বহু অবতারের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে কতকগুলি মূর্খ এবং বদমাশ। যদিও তাদের মধ্যে কোন দিব্য গুণ নেই, তবুও মানুষ তাদের ভগবানের অবতার বলে মনে করছে। পৃথু মহারাজ চেয়েছিলেন যে, তাঁর প্রকৃত গুণাবলী ভবিষ্যতে প্রকাশিত হয়ে, যেন এই প্রকার প্রশংসাত্মক বাণী সার্থক করে। যদিও তাঁর উদ্দেশ্যে যে স্তবস্তুতি করা হয়েছিল, তাতে কোন ত্রুটি ছিল না, তবুও পৃথু মহারাজ ইঙ্গিত করেছেন যে, ভগবানের অবতার বলে নিজেকে প্রচারকারী ভণ্ডদের উদ্দেশ্যে যেন কখনও এই প্রকার স্তব স্তুতি করা না হয়।

শ্লোক ২৩

তস্মাৎপরোক্ষেঽস্মদুপশ্রুতান্যলং-
করিষ্যথ স্তোত্রমপীচ্যবাচঃ ।
সত্যুত্তমশ্লোকগুণানুবাদে
জুগুপ্সিতং ন স্তবয়ন্তি সভ্যাঃ ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **পরোক্ষে**—ভবিষ্যতে কোন সময়; **অস্মৎ**—আমার; **উপশ্রুতানি**—যে-সমস্ত গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে; **অলম্**—পর্যাপ্ত; **করিষ্যথ**—তোমরা নিবেদন করতে সক্ষম হবে; **স্তোত্রম্**—স্তুতি; **অপীচ্য-বাচঃ**—হে সৌম্য গায়কগণ; **সতি**—উপযুক্ত কার্য হওয়ার ফলে; **উত্তম-শ্লোক**—ভগবানের; **গুণ**—গুণাবলীর; **অনুবাদে**—আলোচনা; **জুগুপ্সিতম্**—জঘন্য ব্যক্তিকে; **ন**—কখনই না; **স্তবয়ন্তি**—স্তুতি করা; **সভ্যাঃ**—সভ্য ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

হে মধুরভাষী স্তাবকগণ! তোমরা যে-সমস্ত গুণের কথা বর্ণনা করেছ, সেগুলি যখন প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে প্রকাশিত হবে, তখন তোমরা এইভাবে আমার প্রশংসা করো। সভ্য ব্যক্তিরা ভগবানের উদ্দেশ্যে যে-স্তবস্তুতি করে, সেই সমস্ত গুণাবলী কখনও মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করো না, যাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সেই গুণগুলি নেই।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের স্নিগ্ধ ভক্তরা খুব ভালভাবেই জানেন কে ভগবান এবং কে ভগবান নয়। কিন্তু নির্বিশেষবাদী অভক্তেরা, যাদের ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই এবং যারা কখনও ভগবানের স্তবস্তুতি করে না, তারা কোনও মানুষকে ভগবান বলে গ্রহণ করে সর্বদা তার স্তবস্তুতি করতে অত্যন্ত আগ্রহী। সেটিই হচ্ছে ভক্ত এবং অসুরের মধ্যে পার্থক্য। অসুরেরা তাদের নিজেদের মনগড়া ভগবান তৈরি করে, অথবা রাবণ এবং হিরণ্যকশিপুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেরাই ভগবান বলে দাবি করে। পৃথু মহারাজ যদিও বাস্তবিকপক্ষে ভগবানের অবতার ছিলেন, তবুও তিনি সেই সমস্ত স্তবস্তুতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, কেননা ভগবানের গুণাবলী তখনও তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়নি। তিনি এই কথা জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত গুণগুলির অধিকারি না হয়, তা হলে তার অনুগামীদের এবং ভক্তদের তার যশ কীর্তনে যুক্ত করা উচিত নয়, যদিও ভবিষ্যতে সেই সমস্ত গুণগুলি তিনি প্রকাশ করতে পারেন। কেউ যদি বাস্তবিকপক্ষে মহাপুরুষের গুণগুলির অধিকারি না হওয়া সত্ত্বেও, ভবিষ্যতে সেই সমস্ত গুণগুলির বিকাশ হবে বলে আশা করে তার অনুগামীদের তার যশকীর্তনে যুক্ত করে, তা হলে সেই ধরনের প্রশংসা প্রকৃতপক্ষে অপমান ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্লোক ২৪

মহদ্‌গুণানাত্মনি কর্তুমীশঃ
কঃ স্তাবকৈঃ স্তাবয়তেঽসতোঽপি ।
তেঽস্যাভবিষ্যন্নিতি বিপ্রলব্ধো
জনাবহাসং কুমতির্ন বেদ ॥ ২৪ ॥

মহৎ—মহান; **গুণান্**—গুণাবলী; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **কর্তুম্**—প্রকাশ করার জন্য; **ঈশঃ**—যোগ্য; **কঃ**—কে; **স্তাবকৈঃ**—অনুগামীদের দ্বারা; **স্তাবয়তে**—স্তুতি করায়; **অসতঃ**—অবর্তমান; **অপি**—সত্ত্বেও; **তে**—তারা; **অস্য**—তার; **অভবিষ্যন্**—হতে পারে; **ইতি**—এই প্রকার; **বিপ্রলব্ধঃ**—প্রতারিত; **জন**—মানুষের; **অবহাসম্**—উপহাস; **কু-মতি**—মূর্খ; **ন**—করে না; **বেদ**—জানা।

অনুবাদ

এই সমস্ত মহান গুণাবলী ধারণে সক্ষম কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে যে, বাস্তবিকপক্ষে সেই গুণগুলির অধিকারি না হয়ে, কিভাবে তার অনুগামীদের তার প্রশংসা করতে দিতে পারে? কোন মানুষকে যদি এই বলে প্রশংসা করা হয় যে, যদি সে শিক্ষিত হত, তা হলে সে একজন মহা পণ্ডিত হত অথবা একজন মহাপুরুষ হত, তা হলে সেটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। যে মূর্খ ব্যক্তি এই প্রকার প্রশংসা গ্রহণে সম্মত হয়, সে জানে না যে, এই প্রকার প্রশংসাবাক্য প্রকৃতপক্ষে তার প্রতি অপমান-সূচক।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবানের অবতার, যে-কথা ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা, যখন তাঁকে নানা প্রকার দিব্য উপহার প্রদান করেছিলেন, তখনই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি তখন সবেমাত্র অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি কখনও তাঁর দিব্য গুণাবলী কার্যে পরিণত করতে পারেননি। তাই তিনি ভক্তদের সেই সমস্ত স্তবস্তুতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। পৃথু মহারাজের এই আচরণ থেকে তথাকথিত ভগবানের অবতারদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। দিব্য গুণাবলী-বিহীন অসুরেরা কখনও যেন তাদের অনুগামীদের কাছ থেকে মিথ্যা প্রশংসা গ্রহণ না করে।

শ্লোক ২৫

প্রভবো হ্যাত্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্রুতাঃ ।
হ্রীমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগর্হিতম্ ॥ ২৫ ॥

প্রভবঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **স্তোত্রম্**—প্রশংসা; **জুগুপ্সন্তি**—পছন্দ করেন না; **অপি**—যদিও; **বিশ্রুতাঃ**—অত্যন্ত

বিখ্যাত; হ্রী-মন্তঃ—বিনীত; **পরম-উদারাঃ**—অত্যন্ত উদার ব্যক্তি; **পৌরুষম্**—শক্তিশালী কার্যকলাপ; **বা**—ও; **বিগর্হিতম্**—নিন্দনীয়।

অনুবাদ

সম্মানিত এবং উদার-হৃদয় ব্যক্তি যেমন তাঁর নিন্দনীয় কার্যকলাপের কথা শুনতে চান না, তেমনই অত্যন্ত বিখ্যাত এবং পরাক্রমশালী ব্যক্তি নিজের প্রশংসা শুনতে চান না।

শ্লোক ২৬

বয়ং ত্ববিদিতা লোকে সূতাদ্যাপি বরীমভিঃ।
কর্মভিঃ কথমাত্মানং গাপয়িষ্যাম বালবৎ ॥ ২৬ ॥

বয়ম্—আমরা; **তু**—তখন; **অবিদিতাঃ**—অপ্রসিদ্ধ; **লোকে**—জগতে; **সূত-আদ্য**—হে সূত আদি ব্যক্তিগণ; **অপি**—এখনই; **বরীমভিঃ**—মহান, প্রশংসনীয়; **কর্মভিঃ**—কার্যকলাপের দ্বারা; **কথম্**—কিভাবে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **গাপয়িষ্যাম**—নিবেদন কার্যে তোমাদের যুক্ত করব; **বাল-বৎ**—শিশুর মতো।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথু বললেন—হে সূত আদি ভক্তগণ! আমার কার্যকলাপের দ্বারা এখনও আমি প্রসিদ্ধ হইনি, কারণ তোমাদের বন্দনীয় কোন কার্য এখনও পর্যন্ত আমি করিনি। অতএব একটি শিশুর মতো আমি কিভাবে তোমাদের আমার গুণগান কার্যে নিযুক্ত করতে পারি?

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজের আবির্ভাব ও অভিষেক' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষোড়শ অধ্যায়

বন্দীদের দ্বারা পৃথু মহারাজের স্তুতি

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং গায়কা মুনিচোদিতাঃ ।
তুষ্টুবুস্তুষ্টমনসস্তদ্বাগমৃতসেবয়া ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলে; **নৃপতিম্**—রাজা; **গায়কাঃ**—বন্দীদের; **মুনিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **চোদিতাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **তুষ্টুবুঃ**—প্রশংসিত, সন্তুষ্ট; **তুষ্ট**—প্রসন্ন হয়ে; **মনসঃ**—মনে; **তৎ**—তাঁর; **বাক্**—বাণী; **অমৃত**—অমৃতময়; **সেবয়া**—শ্রবণের দ্বারা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—পৃথু মহারাজ যখন এইভাবে বললেন, তখন তাঁর বিনয়পূর্ণ অমৃতময় বাণী গায়কদের অত্যন্ত প্রসন্নতা বিধান করেছিল। তখন তাঁরা মুনিদের প্রেরণাক্রমে পুনরায় ভূরি ভূরি প্রশংসার দ্বারা রাজার বন্দনা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে *মুনি-চোদিতাঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, মুনি ও ঋষিদের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে পৃথু মহারাজ যদিও রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং তখনও তিনি তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেননি, তবুও সূত, মাগধ ও বন্দীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের অবতার। মহান ঋষি এবং বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপদেশে তাঁরা সেই কথা বুঝতে পেরেছিলেন। মহাজনদের উপদেশ অনুসারে আমাদের ভগবানের অবতারদের চিনতে হবে। আমাদের মনগড়া জল্পনা-কল্পনার দ্বারা আমরা কখনও ভগবান সৃষ্টি করতে পারি না। যে-সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তম

দাস ঠাকুর বলেছেন, *সাধু-শাস্ত্র-গুরু*—সমস্ত পারমার্থিক বিষয় সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর মাধ্যমে পরীক্ষা করতে হয়। গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর পূর্ববর্তী সাধুদের নির্দেশ অনুসরণ করেন। সদ্‌গুরু কখনও প্রামাণিক শাস্ত্র-বহির্ভূত কোন কিছুর উল্লেখ করেন না। সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রের বাণী এবং যথার্থ সাধু ও গুরুর বাণীর মধ্যে কখনও কোন রকম পার্থক্য থাকে না।

সূত, মাগধ আদি গায়কেরা গুহ্য জ্ঞানের দ্বারা অবগত ছিলেন যে, পৃথু মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের অবতার। তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলী তখনও প্রদর্শন না করার ফলে, পৃথু মহারাজ যদিও সেই সমস্ত স্তবস্তুতি গ্রহণে অস্বীকার করেছিলেন, তবুও বন্দীরা তাঁর বন্দনা থেকে বিরত হননি। অধিকন্তু, তাঁরা পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অবতার হওয়া সত্ত্বেও, ভক্তদের প্রতি আচরণে এত বিনম্র ও আনন্দময় ছিলেন। এই সূত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, পূর্ববর্তী শ্লোকে (৪/১৫/২১) উল্লেখ করা হয়েছে, গায়কদের সঙ্গে কথা বলার সময় পৃথু মহারাজ হাসছিলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। এইভাবে ভগবান এবং তাঁর অবতারের কাছ থেকে আমরা বিনম্র ও স্নিগ্ধ হওয়ার শিক্ষা লাভ করি। পৃথু মহারাজের আচরণ গায়কদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল, এবং তার ফলে তাঁরা তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিলেন এবং মুনি, ঋষি ও সাধুদের বর্ণনা অনুসারে, পৃথু মহারাজের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

শ্লোক ২

নালং বয়ং তে মহিমানুবর্ণনে
যো দেববর্যোঽবততার মায়য়া ।
বেণাঙ্গজাতস্য চ পৌরুষাণি তে
বাচস্পতীনামপি বভ্রমুর্ধিয়ঃ ॥ ২ ॥

ন অলম্—অসমর্থ; **বয়ম্**—আমরা; **তে**—আপনার; **মহিম**—মহিমা; **অনুবর্ণনে**—বর্ণনা করতে; **যঃ**—যিনি; **দেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **বর্যঃ**—শ্রেষ্ঠ; **অবততার**—অবতরণ করেছেন; **মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে অথবা অহৈতুকী কৃপার বশে; **বেণ-অঙ্গ**—রাজা বেণের শরীর থেকে; **জাতস্য**—জাত; **চ**—এবং;

পৌরুষাণি—মহিমান্বিত কার্যকলাপ; **তে**—আপনার; **বাচঃ-পতীনাম্**—মহান বক্তাদের; **অপি**—যদিও; **বভ্রমুঃ**—বিভ্রান্ত হয়েছে; **ধিয়ঃ**—মন।

অনুবাদ

গায়কেরা বললেন—হে রাজন্! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অবতার, এবং তাঁরই অহৈতুকী কৃপায় আপনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। অতএব, আপনার মহিমান্বিত কার্যকলাপের যথাযথভাবে গুণগান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও আপনি রাজা বেণের শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও ব্রহ্মা আদি দেবতাদের মতো মহান বক্তাদের পক্ষেও আপনার মহিমান্বিত কার্যকলাপের সঠিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মায়য়া* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে'। মায়াবাদীরা বলে যে, *মায়া* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মোহ' বা 'মিথ্যা'। কিন্তু *মায়া* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'অহৈতুকী কৃপা'। মায়া দুই প্রকার—যোগমায়া এবং মহামায়া। মহামায়া হচ্ছে যোগমায়ার বিস্তার, এবং এই দুই মায়াই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অভিব্যক্তি। যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে *(আত্ম-মায়য়া)* আবির্ভূত হন। তাই মায়াবাদীদের যে মতবাদ ভগবান অবতরণ করেন বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত শরীরে, সেই ভ্রান্ত মতবাদ পরিত্যাগ করা উচিত। ভগবান এবং তাঁর অবতারেরা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, এবং তাঁরা যে-কোন স্থানেও যে-কোন সময়ে, অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হতে পারেন। পৃথু মহারাজ যদিও বেণ রাজার মৃত শরীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন ভগবানের অবতার, এবং তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে। ভগবান যে-কোন পরিবারে আবির্ভূত হতে পারেন। কখনও কখনও তিনি মৎস্যরূপে অথবা বরাহ রূপে অবতরণ করেন। অতএব তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা যে-কোন স্থানে ও যে-কোন সময়ে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ভগবানের রয়েছে। বলা হয় যে, ভগবানের অবতার অনন্তদেব অনন্ত মুখে অনন্তকাল ধরে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেও, তাঁর অন্ত খুঁজে পান না। অতএব ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের আর কি কথা? বলা হয় যে, ভগবান হচ্ছেন *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্*—তিনি শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও সর্বদা পূজ্য। দেবতারাই যদি ভগবানের মহিমা কীর্তন করার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে না

পান, তা হলে অন্যদের আর কি কথা? তার ফলে সূত, মাগধ আদি গায়কেরা পৃথু মহারাজের মহিমা যথাযথভাবে কীর্তন করতে নিজেদের অক্ষম বলে মনে করেছিলেন।

উত্তম শ্লোকের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে, মানুষ পবিত্র হয়। যদিও আমরা যথাযথভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তনে অক্ষম, তবুও আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের পবিত্র করার জন্য সেই চেষ্টা করা। এমন নয় যে, যেহেতু ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা যথাযথভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তনে অক্ষম, তাই ভগবানের মহিমা কীর্তন বন্ধ করে দিতে হবে। পক্ষান্তরে প্রহ্লাদ মহারাজের বর্ণনা অনুসারে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। আমরা যদি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হই, তা হলে ভগবান আমাদের বুদ্ধি দেবেন, যার দ্বারা আমরা যথাযথভাবে তাঁর মহিমা কীর্তন করতে পারব।

শ্লোক ৩

অথাপ্যুদারশ্রবসঃ পৃথোর্হরেঃ
কলাবতারস্য কথামৃতাদৃতাঃ ।
যথোপদেশং মুনিভিঃ প্রচোদিতাঃ ।
শ্লাঘ্যানি কর্মাণি বয়ং বিতন্মহি ॥ ৩ ॥

অথ-অপি—তা সত্ত্বেও; **উদার**—উদার; **শ্রবসঃ**—যাঁর যশ; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **কলা**—অংশের অংশ; **অবতারস্য**—অবতারের; **কথা**—বাণী; **অমৃত**—অমৃতময়; **আদৃতাঃ**—সাদরে; **যথা**—অনুসারে; **উপদেশম্**—উপদেশ; **মুনিভিঃ**—মহান ঋষিদের দ্বারা; **প্রচোদিতাঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **শ্লাঘ্যানি**—প্রশংসনীয়; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **বয়ম্**—আমরা; **বিতন্মহি**—কীর্তন করার চেষ্টা করব।

অনুবাদ

যদিও যথাযথভাবে আপনার মহিমা কীর্তন করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তবুও আপনার মহিমা কীর্তন করার দিব্য স্বাদ আমরা পেয়েছি। মুনিঋষি মহাজনদের কাছ থেকে যে-উপদেশ আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, সেই অনুসারে আমরা আপনার মহিমা কীর্তন করার চেষ্টা করব। কিন্তু যে বর্ণনাই আমরা করি, তা সর্বদা নিতান্ত অপর্যাপ্ত এবং নগণ্য। হে রাজা। যেহেতু আপনি ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার, তাই আপনার সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত উদার এবং প্রশংসনীয়।

তাৎপর্য

মানুষ যতই দক্ষ হোক না কেন, সে কখনই পর্যাপ্তরূপে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তনে রত, তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সেই চেষ্টা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অনুগামীদের সর্বত্র ভগবানের বাণী প্রচার করার উপদেশ দিয়েছেন। যেহেতু সেই বাণী হচ্ছে মূলত *ভগবদ্গীতা,* তাই প্রচারকদের কর্তব্য হচ্ছে গুরু-পরম্পরা-ধারায় মহান মুনিঋষিরা যেভাবে *ভগবদ্গীতা* বিশ্লেষণ করে গেছেন, সেই অনুসারে তা অধ্যয়ন করা। সাধু, গুরু এবং শাস্ত্রের অনুগত হয়ে, পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, জনসাধারণের কাছে ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান প্রচার করা উচিত। এই অত্যন্ত সরল পন্থায় ভগবানের মহিমা কীর্তন করা যায়। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রকৃত পন্থা, কারণ ভগবদ্ভক্তির দ্বারা অল্প কয়েকটি শব্দের মাধ্যমেই ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায়। ভক্তি ব্যতীত শত-শত গ্রন্থ লিখেও ভগবানকে প্রসন্ন করা যায় না। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকেরা যদি ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে সক্ষম নাও হয়, তবুও তাঁরা সর্বত্র গিয়ে মানুষদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে অনুরোধ করতে পারে।

শ্লোক ৪

এষ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো লোকং ধর্মেঽনুবর্তয়ন্ ।
গোপ্তা চ ধর্মসেতূনাং শাস্তা তৎপরিপন্থিনাম্ ॥ ৪ ॥

এষঃ—এই পৃথু মহারাজ; **ধর্ম-ভৃতাম্**—ধর্ম অনুষ্ঠানকারীদের; **শ্রেষ্ঠঃ**—সর্বোত্তম; **লোকম্**—সারা জগতে; **ধর্মে**—ধর্মীয় কার্যকলাপে; **অনুবর্তয়ন্**—যথাযথভাবে তাদের যুক্ত করে; **গোপ্তা**—রক্ষক; **চ**—ও; **ধর্ম-সেতূনাম্**—ধর্মনীতির; **শাস্তা**—দণ্ডদাতা; **তৎ-পরিপন্থিনাম্**—ধর্ম-বিরোধীদের।

অনুবাদ

এই পৃথু মহারাজ ধর্ম পালনকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলকে ধর্মে প্রবৃত্ত করবেন এবং ধর্মকে রক্ষা করবেন। ধর্ম-বিরোধীদের এবং নাস্তিকদের কাছে তিনি হবেন মহান দণ্ডদাতা।

তাৎপর্য

রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানদের কর্তব্য এই শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে মানুষ নিষ্ঠাসহকারে ধার্মিক জীবন যাপন করছে কি না তা দেখা। নাস্তিকদের দণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে রাজাকে অত্যন্ত কঠোর হওয়া উচিত। অর্থাৎ, নাস্তিক অথবা ভগবৎ বিহীন সরকারকে প্রশ্রয় দেওয়া রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের কখনই উচিত নয়। সরকার ভাল কি না সেটিই হচ্ছে তার পরীক্ষা। ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের নামে, রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান নিরপেক্ষ থেকে মানুষদের সবরকম অধার্মিক আচরণে প্রবৃত্ত হতে দেয়। সেই প্রকার রাষ্ট্রে, সর্ব প্রকার অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও, মানুষ সুখী হয় না। এই কলিযুগে কোন পুণ্যবান রাজা নেই। তার পরিবর্তে চোর-বাটপারেরা ভোটের বলে রাষ্ট্রপ্রধানরূপে নির্বাচিত হয়। তাদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রে, ধর্ম এবং ভগবৎ চেতনা-বিহীন হয়ে, মানুষ কিভাবে সুখী হতে পারে? এই সমস্ত দুরাচারীরা তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে, ভবিষ্যতে মানুষ তাদের দ্বারা এত উৎপীড়িত হবে যে, তারা বাড়িঘর ছেড়ে বনে পালিয়ে যাবে। কিন্তু, কলিযুগে, কৃষ্ণভক্তরা যদি গণতান্ত্রিক সরকার দখল করতে পারে, তা হলে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সুখী হবে।

শ্লোক ৫

এষ বৈ লোকপালানাং বিভর্ত্যেকস্তনৌ তনূঃ ।
কালে কালে যথাভাগং লোকয়োরুভয়োর্হিতম্ ॥ ৫ ॥

এষঃ—এই রাজা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **লোক-পালানাম্**—সমস্ত দেবতাদের; **বিভর্তি**—ধারণ করেন; **একঃ**—একলা; **তনৌ**—তাঁর দেহে; **তনূঃ**—দেহে; **কালে কালে**—যথাসময়; **যথা**—অনুসারে; **ভাগম্**—উপযুক্ত ভাগ; **লোকয়োঃ**—লোকের; **উভয়োঃ**—উভয়; **হিতম্**—কল্যাণ।

অনুবাদ

এই রাজা, যথাসময়ে, সমস্ত জীবেদের পালন করার জন্য এবং সুন্দর অবস্থায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করতে নিজেকে বিভিন্ন দেবতারূপে প্রকাশ করবেন। এইভাবে তিনি প্রজাদের বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে

অনুপ্রাণিত করে স্বর্গলোক পালন করবেন। যথাসময়ে তিনি উপযুক্ত বারি বর্ষণের দ্বারা এই ভূর্লোক পালন করবেন।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীর বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যকলাপের অধ্যক্ষ দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সহায়ক মাত্র। ভগবানের অবতার যখন এই জগতে অবতরণ করেন, তখন সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতারাও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তার ফলে বিভিন্ন দেবতাদেরও কর্তব্য সম্পাদন করতে ভগবানের অবতার তাঁদের সাহায্য করেন। পৃথিবীর পালন নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। *ভগবদ্‌গীতায়* এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বৃষ্টির অধ্যক্ষ দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

"সমস্ত প্রাণীরা অন্ন আহার করে জীবন ধারণ করে। বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে বৃষ্টি হয়, এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞের উদ্ভব হয়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৩/১৪)

তাই, যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহারাজ পৃথু একা সমস্ত নাগরিকদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করবেন, যাতে তাদের কোন প্রকার অভাব অথবা দুঃখ-দুর্দশা না থাকে। কিন্তু এই কলিযুগে, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সরকারের কার্যকরী শাখাব অধ্যক্ষ তথাকথিত রাজা এবং রাষ্ট্রপতিরা হচ্ছে এক-একটি মূর্খ ও দুরাচারী, এবং তারা প্রকৃতির কারণতত্ত্বের জটিলতা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এই সমস্ত মহামূর্খেরা কেবল বিবিধ পরিকল্পনা করে, যা কখনও সফল হয় না, এবং তার ফলে মানুষ নানা দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। সেই অবস্থার প্রতিকারের জন্য শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

রাষ্ট্রের এই দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করার জন্য।

শ্লোক ৬

বসু কাল উপাদত্তে কালে চায়ং বিমুঞ্চতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু প্রতপন্ সূর্যবদ্বিভুঃ ॥ ৬ ॥

বসু—ধনসম্পদ; **কালে**—যথাসময়ে, **উপাদত্তে**—আদায় করতে; **কালে**—যথা সময়; **চ**—ও, **অয়ম্**—এই পৃথু মহারাজ; **বিমুঞ্চতি**—ফিরিয়ে দেবেন; **সমঃ**—সমান; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবেদের; **প্রতপন্**—প্রদীপ্ত; **সূর্য-বৎ**—সূর্যের মতো; **বিভুঃ**—শক্তিমান।

অনুবাদ

এই পৃথু মহারাজ সূর্যের মতো শক্তিশালী হবেন, এবং সূর্যদেব যেমন সকলকে সমানভাবে তাঁর কিরণ বিতরণ করেন, মহারাজ পৃথুও সমানভাবে সকলের প্রতি তাঁর করুণা বিতরণ করবেন। সূর্য যেমন বছরের মধ্যে আট মাস ধরে জল বাষ্পে পরিণত করে, বর্ষাকালে প্রচুরভাবে তা ফিরিয়ে দেয়, ঠিক তেমনই মহারাজ পৃথুও নাগরিকদের কাছ থেকে কর আদায় করে, প্রয়োজনের সময় তাদের তা ফিরিয়ে দেবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কর আদায় করার বিধি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কর আদায়ের উদ্দেশ্য তথাকথিত প্রশাসনিক অধ্যক্ষদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়। প্রয়োজনের সময়, দুর্ভিক্ষ, বন্যা আদি জরুরী অবস্থায়, সেই সংগৃহীত রাজস্ব প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া উচিত। এই আয় কখনও সরকারি কর্মচারীদের মোটা বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বণ্টন করা উচিত নয়। কিন্তু কলিযুগে নাগরিকদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ নানাভাবে কর আদায় করে, সেই সম্পদ প্রশাসকদের ব্যক্তিগত সুবিধায় ব্যয় করা হয়।

এই শ্লোকে সূর্যের দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দর। সূর্য পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে, এবং সূর্য যদিও পৃথিবীকে স্পর্শ করে না, তবুও তা সাগর এবং মহাসাগর আদি জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করে, এবং বর্ষার সময় সেই জল বিতরণ করে জমিকে উর্বর করে। একজন আদর্শ রাজারূপে পৃথু মহারাজ রাষ্ট্রের সর্বত্র, প্রতিটি নগরে ও গ্রামে সূর্যের মতো সেই কার্য সম্পাদন করবেন।

শ্লোক ৭

তিতিক্ষত্যক্রমং বৈণ্য উপর্যাক্রমতামপি ।
ভূতানাং করুণঃ শশ্বদার্তানাং ক্ষিতিবৃত্তিমান্ ॥ ৭ ॥

তিতিক্ষতি—সহ্য করে; **অক্রমম্**—অপরাধ; **বৈণ্যঃ**—রাজা বেণের পুত্র; **উপরি**—তাঁর মাথায়; **আক্রমতাম্**—পদার্পণকারী; **অপি**—ও; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **করুণঃ**—অত্যন্ত দয়ালু; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **আর্তানাম্**—আর্তদের; **ক্ষিতি-বৃত্তি-মান্**—পৃথিবীর স্বভাব-বিশিষ্ট।

অনুবাদ

এই পৃথু মহারাজ সমস্ত নাগরিকদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হবেন। কোন আর্ত ব্যক্তি যদি বিধি-বিধান অবহেলা করে রাজার মস্তকে পদার্পণও করে, তা হলেও তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশে, কিছু মনে না করে তাকে ক্ষমা করবেন। পৃথিবীর পালকরূপে তিনি পৃথিবীরই মতো সহনশীল হবেন।

তাৎপর্য

এখানে মহারাজ পৃথুর সহনশীলতার তুলনা পৃথিবীর সঙ্গে করা হয়েছে। মানুষ এবং পশুর দ্বারা সর্বদা পদদলিত হলেও, পৃথিবী ফলমূল ও শস্য উৎপাদন করে তাদের আহার প্রদান করেন। একজন আদর্শ রাজারূপে পৃথু মহারাজের তুলনা পৃথিবীর সঙ্গে করা হয়েছে, কারণ কোন কোন নাগরিক রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করলেও, তিনি তা সহ্য করবেন এবং তাদের আহার প্রদান করে পালন করবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, রাজার কর্তব্য হচ্ছে, নিজের অসুবিধা হলেও প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। কিন্তু কলিযুগের অবস্থা সেই রকম নয়, কারণ কলিযুগে রাজা এবং রাষ্ট্রপ্রধানেরা প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে, তাদের নিজেদের জীবন উপভোগ করার জন্য। এই প্রকার অন্যায়ভাবে কর সংগ্রহের ফলে, লোকেরা অসৎ হয়ে যায়, এবং তারা নানাভাবে তাদের আয় লুকাবার চেষ্টা করে। অবশেষে রাষ্ট্র আর কর সংগ্রহ করতে পারবে না এবং তার ফলে তাদের বিশাল সামরিক এবং প্রশাসনিক ব্যয়ভার বহন করতে পারবে না। তখন সব কিছু ধ্বসে পড়বে এবং সারা রাষ্ট্র জুড়ে এক প্রবল সঙ্কট ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

শ্লোক ৮

দেবেঽবর্ষত্যসৌ দেবো নরদেববপুর্হরিঃ ।
কৃচ্ছ্রপ্রাণাঃ প্রজা হ্যেষ রক্ষিষ্যত্যঞ্জসেন্দ্রবৎ ॥ ৮ ॥

দেবে—দেবতা (ইন্দ্র) যখন; **অবর্ষতি**—বর্ষণ করেন না; **অসৌ**—সেই; **দেবঃ**—মহারাজ পৃথু; **নর-দেব**—রাজার; **বপুঃ**—দেহধারী; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃচ্ছ্র-প্রাণাঃ**—দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীব; **প্রজাঃ**—নাগরিকগণ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এষঃ**—এই; **রক্ষিষ্যতি**—রক্ষা করবে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **ইন্দ্র-বৎ**—দেবরাজ ইন্দ্রের মতো।

অনুবাদ

যখন বৃষ্টি হবে না এবং জলের অভাবে প্রজাদের ভীষণ কষ্ট হবে, তখন ভগবানের অংশসম্ভূত এই রাজা নিজেই ইন্দ্রের মতো বারি বর্ষণ করবেন। এইভাবে তিনি অনায়াসে অনাবৃষ্টি থেকে প্রজাদের রক্ষা করবেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজকে যে সূর্য এবং ইন্দ্রদেবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। দেবরাজ ইন্দ্রের উপর পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহলোকে জল বিতরণ করার দায়িত্ব রয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইন্দ্র যদি যথাযথভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হন, তা হলে পৃথু মহারাজ স্বয়ং বারি বর্ষণের ব্যবস্থা করবেন। পৃথিবীর মানুষেরা যদি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে, তা হলে কখনও কখনও তিনি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু ভগবানের অবতার পৃথু মহারাজ স্বর্গের রাজার করুণার প্রতি নির্ভর করেননি। এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, যদি বৃষ্টির অভাব হয়, তা হলে পৃথু মহারাজ তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে সেই অভাব দূর করবেন শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে লীলা-বিলাস করছিলেন, তখন তিনিও এই প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। ইন্দ্র যখন সাত দিন ধরে বৃন্দাবনের উপর প্রবলভাবে বারি বর্ষণ করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মাথার উপর একটি ছাতার মতো গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম হচ্ছে গোবর্ধনধারী।

শ্লোক ৯

আপ্যায়য়ত্যসৌ লোকং বদনামৃতমূর্তিনা ।
সানুরাগাবলোকেন বিশদস্মিতচারুণা ॥ ৯ ॥

আপ্যায়য়তি—বর্ধন করে; **অসৌ**—তিনি; **লোকম্**—সারা জগতের; **বদন**—তাঁর মুখমণ্ডলের দ্বারা; **অমৃত-মূর্তিনা**—চন্দ্রের মতো; **স-অনুরাগ**—অনুরাগ সহকারে; **অবলোকেন**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিশদ**—উজ্জ্বল; **স্মিত**—হাস্য; **চারুণা**—সুন্দর।

অনুবাদ

এই পৃথু মহারাজ তাঁর স্নেহসিক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা এবং হাস্যোৎফুল্ল সুন্দর মুখচন্দ্রিমার দ্বারা সকলের আনন্দ বর্ধন করবেন।

শ্লোক ১০

অব্যক্তবর্ত্মৈষ নিগূঢ়কার্যো
গম্ভীরবেধা উপগুপ্তবিত্তঃ ।
অনন্তমাহাত্ম্যগুণৈকধামা
পৃথুঃ প্রচেতা ইব সংবৃতাত্মা ॥ ১০ ॥

অব্যক্ত—অপ্রকাশিত; **বর্ত্মা**—তাঁর নীতি; **এষঃ**—এই রাজা; **নিগূঢ়**—গুপ্ত; **কার্যঃ**—তাঁর কার্যকলাপ; **গম্ভীর**—গম্ভীর, গুপ্ত; **বেধাঃ**—সম্পন্ন করে; **উপগুপ্ত**—গোপন রাখা হয়েছে; **বিত্তঃ**—তাঁর কোষ; **অনন্ত**—অন্তহীন; **মাহাত্ম্য**—মহিমা; **গুণ**—গুণের; **এক-ধামা**—একমাত্র আধার; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **প্রচেতাঃ**—বরুণ, সমুদ্রের রাজা; **ইব**—মতো; **সংবৃত**—আচ্ছাদিত; **আত্মা**—স্বয়ং।

অনুবাদ

গায়কেরা বললেন—পৃথু মহারাজের অনুসৃত মার্গ কেউ বুঝতে পারবে না। তাঁর কার্যকলাপও অত্যন্ত গোপন থাকবে, এবং তিনি যে কিভাবে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সাফল্যমণ্ডিত করবেন, তাও কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না। তাঁর রাজকোষ সকলের অজ্ঞাত থাকবে। তিনি অন্তহীন মাহাত্ম্যসম্পন্ন হবেন এবং সমস্ত গুণের আধার হবেন। তাঁর পদ স্থায়ী এবং প্রচ্ছন্ন থাকবে, ঠিক যেমন সমুদ্রের দেবতা বরুণ সর্বদা জলের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন।

তাৎপর্য

সমস্ত ভৌতিক উপাদানের একজন করে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রয়েছেন। বরুণ বা প্রচেতা হচ্ছেন সাগরের দেবতা। বাইরে থেকে মনে হয় যে, সমুদ্রে কোন রকম

জীবন নেই, কিন্তু যিনি সমুদ্রের তত্ত্ব অবগত, তিনি জানেন যে, জলের ভিতর বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে। জলের দেবতা হচ্ছেন বরুণ। ঠিক যেমন কেউ বুঝতে পারে না সমুদ্রের নীচে কি হচ্ছে, তেমনই পৃথু মহারাজ যে-কিভাবে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করছিলেন, তা কেউই বুঝতে পারত না। পৃথু মহারাজের রাজনীতি যথার্থই ছিল অত্যন্ত গম্ভীর। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, কারণ তিনি ছিলেন অন্তহীন গুণের ধাম।

এই শ্লোকে *উপগুপ্ত-বিত্তঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথু মহারাজ গোপনে কত ধন যে সঞ্চিত রেখেছিলেন তা কেউ জানত না। এই উক্তিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কেবল রাজাই নয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার কষ্টার্জিত ধন গোপনে সঞ্চিত রাখা উচিত, যাতে সৎ উদ্দেশ্যে যথাসময়ে তা ব্যবহার করা যায়। কলিযুগে রাজা অথবা সরকারের সুরক্ষিত কোষাগার নেই, এবং বিনিময়ের একমাত্র পন্থা হচ্ছে কাগজে ছাপানো নোট। তাই সঙ্কটের সময় সরকার নোট ছাপিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চায়, এবং তার ফলে মুদ্রাস্ফীতি হয় এবং জিনিসপত্রের দাম প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়, এবং জনসাধারণকে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। তাই, গোপনে ধনসম্পদ রাখার প্রথাটি অত্যন্ত প্রাচীন। পৃথু মহারাজের সময়ও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজার যেমন তাঁর রাজকোষ গোপন রাখার অধিকার রয়েছে, তেমনই মানুষের ব্যক্তিগত উপার্জনও গোপন রাখা উচিত। তার ফলে কোন দোষ হয় না। মূল কথা হচ্ছে যে, প্রতিটি ব্যক্তিকেই বর্ণাশ্রম ধর্মে শিক্ষিত হওয়া উচিত, যাতে সৎ উদ্দেশ্যেই কেবল অর্থ ব্যয় করা হয়।

শ্লোক ১১

দুরাসদো দুর্বিষহ আসন্নোঽপি বিদূরবৎ ।
নৈবাভিভবিতুং শক্যো বেণারণ্যুত্থিতোঽনলঃ ॥ ১১ ॥

দুরাসদঃ—অনভিগম্য; **দুর্বিষহঃ**—দুঃসহ; **আসন্নঃ**—সমীপবর্তী হয়ে; **অপি**—যদিও; **বিদূর-বৎ**—যেন বহু দূরে; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভিভবিতুম্**—পরাভূত করতে; **শক্যঃ**—সক্ষম; **বেণ**—রাজা বেণ; **অরণি**—অগ্নি উৎপাদনকারী কাষ্ঠ; **উত্থিতঃ**—উৎপন্ন; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

অরণি কাষ্ঠ থেকে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনই বেণ রাজার মৃত শরীর থেকে পৃথু মহারাজের জন্ম হয়েছিল। তাই পৃথু মহারাজ সর্বদাই অগ্নির মতো

অবস্থান করবেন, এবং তাঁর শত্রুরা তাঁর সমীপবর্তী হতে সক্ষম হবে না। তাঁর শত্রুদের কাছে তিনি দুঃসহ হবেন, কারণ তাঁর অতি নিকটে থাকলেও তারা তাঁর কাছে আসতে পারবে না। কেউই পৃথু মহারাজের শক্তিকে পরাভূত করতে পারবে না।

তাৎপর্য

অরণি হচ্ছে এক প্রকার কাষ্ঠ, যার ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় অরণি কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রজ্বলিত হত। যদিও পৃথু মহারাজ তাঁর মৃত পিতা থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তবুও তিনি সর্বদা অগ্নির মতো থাকবেন। ঠিক যেমন আগুনের কাছে যাওয়া যায় না, তেমনই পৃথু মহারাজের শত্রুরা তাঁর অত্যন্ত নিকটে থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছে আসতে পারবে না।

শ্লোক ১২

অন্তর্বহিশ্চ ভূতানাং পশ্যন্ কর্মাণি চারণৈঃ ।
উদাসীন ইবাধ্যক্ষো বায়ুরাত্মেব দেহিনাম্ ॥ ১২ ॥

অন্তঃ—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **চ**—এবং; **ভূতানাম্**—জীবদের; **পশ্যন্**—দেখে; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চারণৈঃ**—গুপ্তচরদের দ্বারা; **উদাসীন**—নিরপেক্ষ; **ইব**—সদৃশ; **অধ্যক্ষঃ**—সাক্ষী; **বায়ুঃ**—প্রাণবায়ু; **আত্মা**—প্রাণশক্তি; **ইব**—সদৃশ; **দেহিনাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবের।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর সমস্ত প্রজাদের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সমস্ত কার্যকলাপ দেখতে সমর্থ হবেন। তবুও তাঁর গুপ্তচর ব্যবস্থা কেউই জানতে পারবে না। দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণবায়ু যেমন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণভাবে কার্যকলাপ করা সত্ত্বেও সর্ব বিষয়ে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকে, পৃথু মহারাজও তেমন প্রশংসা এবং নিন্দায় উদাসীন থাকবেন।

শ্লোক ১৩

নাদণ্ড্যং দণ্ডয়ত্যেষ সুতমাত্মদ্বিষামপি ।
দণ্ডয়ত্যাত্মজমপি দণ্ড্যং ধর্মপথে স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

ন—না; **অদণ্ড্যম্**—অদণ্ডনীয়; **দণ্ডয়তি**—দণ্ডদান করবেন; **এষঃ**—এই রাজা; **সুতম্**—পুত্র; **আত্ম-দ্বিষাম্**—তাঁর শত্রুর; **অপি**—ও; **দণ্ডয়তি**—দণ্ডদান করেন; **আত্ম-জম্**—স্বীয় পুত্র; **অপি**—ও; **দণ্ড্যম্**—দণ্ডনীয়; **ধর্ম-পথে**—ধর্মের পথে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে।

অনুবাদ

যেহেতু রাজা সর্বদা ধর্মপথে থাকবেন, তাই তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং তাঁর শত্রুর পুত্র, উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবেন। শত্রুর পুত্র যদি অদণ্ডনীয় হয়, তা হলে তিনি তাকে দণ্ডদান করবেন না, কিন্তু তাঁর নিজের পুত্র যদি দণ্ডনীয় হয়, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে দণ্ড দেবেন।

তাৎপর্য

এই গুণগুলি হচ্ছে নিরপেক্ষ রাজার বৈশিষ্ট্য। রাজার কর্তব্য হচ্ছে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া এবং নির্দোষকে রক্ষা করা। পৃথু মহারাজ এতই নিরপেক্ষ ছিলেন যে, যদি তাঁর পুত্র দণ্ডনীয় হত, তা হলে তিনি তাকে দণ্ডদান করতে দ্বিধা করতেন না। পক্ষান্তরে যদি তাঁর শত্রুর পুত্র নির্দোষ হত, তা হলে তিনি তাকে দণ্ড দেওয়ার কোন রকম চেষ্টা করতেন না।

শ্লোক ১৪

অস্যাপ্রতিহতং চক্রং পৃথোরামানসাচলাৎ ।
বর্ততে ভগবানর্কো যাবত্তপতি গোগণৈঃ ॥ ১৪ ॥

অস্য—এই রাজার; **অপ্রতিহতম্**—অপ্রতিহত; **চক্রম্**—প্রভাবের পরিধি; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **আ-মানস-অচলাৎ**—মানস পর্বত পর্যন্ত; **বর্ততে**—বিরাজ করে; **ভগবান্**—সব চাইতে শক্তিশালী; **অর্কঃ**—সূর্যদেব; **যাবৎ**—ঠিক যেমন; **তপতি**—দীপ্ত হয়; **গো-গণৈঃ**—আলোক রশ্মির দ্বারা।

অনুবাদ

সূর্যদেব যেমন অপ্রতিহতভাবে তার উজ্জ্বল কিরণ মানসাচল পর্যন্ত বিস্তার করে, মহারাজ পৃথুর প্রভাবও তেমন যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত মানসাচল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।

তাৎপর্য

মানসাচল সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচর হলেও, সূর্যের কিরণ সেখানেও অপ্রতিহতভাবে পৌঁছায়। সূর্যের কিরণ সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তারে কেউ যেমন বাধা দিতে পারে না, তেমনই পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে কেউই তাঁর প্রভাব প্রতিহত করতে পারেনি, এবং যতদিন পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত তা অপ্রতিহত থাকবে। অর্থাৎ সূর্যকিরণকে যেমন সূর্যদেব থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনই পৃথু মহারাজের শাসন-ক্ষমতা পৃথু মহারাজ থেকে পৃথক করা যায় না। অর্থাৎ সকলের উপর পৃথু মহারাজের শাসন অবিচলিতভাবে চলতে থাকবে। এইভাবে রাজার শাসন-ক্ষমতা রাজা থেকে পৃথক করা যায় না।

শ্লোক ১৫

রঞ্জয়িষ্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ ।
অথামুমাহু রাজানং মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ ॥ ১৫ ॥

রঞ্জয়িষ্যতি—প্রসন্ন করবেন; **যৎ**—যেহেতু; **লোকম্**—সমগ্র জগৎ; **অয়ম্**—এই রাজা; **আত্ম**—নিজের; **বিচেষ্টিতৈঃ**—কার্যকলাপের দ্বারা; **অথ**—অতএব; **অমুম্**—তাঁকে; **আহুঃ**—বলা হয়; **রাজানম্**—রাজা; **মনঃ-রঞ্জনকৈঃ**—মনোরঞ্জনকারী; **প্রজাঃ**—প্রজা।

অনুবাদ

এই রাজা তাঁর ব্যবহারিক কার্যকলাপের দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করবেন, এবং তাঁর সমস্ত প্রজারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকবে। সেই কারণে নাগরিকেরা পরম প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে তাদের শাসনকারী রাজারূপে বরণ করেছিল।

শ্লোক ১৬

দৃঢ়ব্রতঃ সত্যসন্ধো ব্রহ্মণ্যো বৃদ্ধসেবকঃ ।
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং মানদো দীনবৎসলঃ ॥ ১৬ ॥

দৃঢ়-ব্রতঃ—দৃঢ়সংকল্প; **সত্য-সন্ধঃ**—সত্যপ্রতিজ্ঞ; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির ভক্ত; **বৃদ্ধ-সেবকঃ**—বৃদ্ধদের সেবক; **শরণ্যঃ**—শরণাগত বৎসল; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **মান-দঃ**—সকলের সম্মানকারী; **দীন-বৎসলঃ**—দীন এবং অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

অনুবাদ

এই রাজা দৃঢ়ব্রত এবং সর্বদা সত্যপ্রতিজ্ঞ হবেন। তিনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুরাগী হবেন, বৃদ্ধদের সেবা করবেন এবং শরণাগতদের আশ্রয়দান করবেন। তিনি সকলকে সম্মান প্রদর্শন করবেন, এবং দীন ও অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি সর্বদা কৃপা প্রদর্শন করবেন।

তাৎপর্য

বৃদ্ধ সেবকঃ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৃদ্ধ দুই প্রকার—বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ। এই সংস্কৃত শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, জ্ঞানের অগ্রগতিতে কেউ বৃদ্ধ হতে পারে। পৃথু মহারাজ সর্বদা ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন, এবং তিনি সর্বদা তাদের রক্ষা করতেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদেরও রক্ষা করতেন। রাজা যে-কার্য সম্পাদন করার সংকল্প করতেন, কেউই তাতে বাধা দিতে পারত না। তাই তাঁকে বলা হত *দৃঢ়সঙ্কল্প* বা *দৃঢ়ব্রত* ।

শ্লোক ১৭

মাতৃভক্তিঃ পরস্ত্রীষু পত্ন্যামর্ধ ইবাত্মনঃ ।
প্রজাসু পিতৃবৎস্নিগ্ধঃ কিঙ্করো ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৭ ॥

মাতৃ-ভক্তিঃ—মাতৃবৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী; **পর-স্ত্রীষু**—অন্য রমণীদের; **পত্ন্যাম্**—তাঁর নিজের পত্নীকে; **অর্ধঃ**—অর্ধ; **ইব**—সদৃশ; **আত্মনঃ**—তাঁর দেহের; **প্রজাসু**—প্রজাদের; **পিতৃ-বৎ**—পিতার মতো; **স্নিগ্ধঃ**—স্নেহপরায়ণ; **কিঙ্করঃ**—সেবক; **ব্রহ্ম-বাদিনাম্**—ভগবানের মহিমা প্রচারকারীদের।

অনুবাদ

রাজা অন্য রমণীদের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করবেন, এবং তাঁর নিজের স্ত্রীকে তাঁর দেহের অর্ধ অঙ্গসদৃশ মনে করবেন। তিনি তাঁর প্রজাদের পুত্রবৎ স্নেহে পালন করবেন, এবং তিনি নিজেকে সর্বদা ভগবানের মহিমা প্রচারকারী ভক্তদের পরম আজ্ঞাকারী দাস বলে মনে করবেন।

তাৎপর্য

পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় পত্নী ব্যতীত অন্য সমস্ত রমণীদের তাঁর মায়ের মতো দেখবেন, অন্যের ধনসম্পদ রাস্তার আবর্জনার মতো বলে মনে করবেন, এবং অন্য সকলকে নিজের মতো বলে মনে করে তাদের প্রতি আচরণ করবেন। চাণক্য পণ্ডিতের

বর্ণনা অনুসারে, এটি হচ্ছে পণ্ডিতের লক্ষণ। এটিই শিক্ষা-ব্যবস্থার মান হওয়া উচিত। শিক্ষার অর্থ কেবল পড়াশুনা করে একটি উপাধি লাভ করা নয়। সে যা শিখেছে তা ব্যক্তিগত জীবনে আচরণ করা উচিত। এই সমস্ত বিজ্ঞ লক্ষণগুলি মহারাজ পৃথুর ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত ছিল। যদিও তিনি ছিলেন একজন রাজা, তবুও তিনি নিজেকে ভগবদ্ভক্তদের একজন বিনীত সেবক বলে মনে করতেন। বৈদিক সদাচার অনুসারে, কোন ভক্ত যদি রাজার প্রাসাদে আসেন, তা হলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর নিজের আসন দান করেন। *ব্রহ্মবাদিনাম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ব্রহ্মবাদী* বলতে ভগবদ্ভক্তকে বোঝায়। *ব্রহ্মন্, পরমাত্মা* এবং *ভগবান* হচ্ছেন পরব্রহ্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা, এবং পরমব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১০/১২) অর্জুন স্বীকার করেছেন *(পরং ব্রহ্ম পরং ধাম)* তাই *ব্রহ্মবাদিনাম্* শব্দটি ভগবদ্ভক্তকে ইঙ্গিত করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবদ্ভক্তদের সেবা করা, এবং আদর্শ রাষ্ট্রের কর্তব্য ভগবদ্ভক্তের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। যেহেতু পৃথু মহারাজ এই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন, তাই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

দেহিনামাত্মবৎপ্রেষ্ঠঃ সুহৃদাং নন্দিবর্ধনঃ ।
মুক্তসঙ্গপ্রসঙ্গোঽয়ং দণ্ডপাণিরসাধুষু ॥ ১৮ ॥

দেহিনাম্—সমস্ত দেহধারী জীবদের; **আত্ম-বৎ**—নিজের মতো; **প্রেষ্ঠঃ**—প্রিয় বলে মনে করে; **সুহৃদাম্**—তাঁর বন্ধুদের; **নন্দি-বর্ধনঃ**—আনন্দ বর্ধন করে; **মুক্ত-সঙ্গ**—সমস্ত জড় কলুষ-রহিত ব্যক্তিদের সঙ্গে; **প্রসঙ্গঃ**—ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; **অয়ম্**—এই রাজা; **দণ্ড-পাণিঃ**—দণ্ডদানকারী হস্ত; **অসাধুষু**—অপরাধীদের।

অনুবাদ

রাজা সমস্ত দেহধারী জীবদের আত্মতুল্য প্রিয় বলে মনে করবেন, এবং তিনি সর্বদা সুহৃৎদের আনন্দ বর্ধন করবেন। তিনি মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করবেন, এবং অসাধু ব্যক্তিদের তিনি কঠোরভাবে দণ্ডদান করবেন।

তাৎপর্য

দেহিনাম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যারা দেহের সঙ্গে যুক্ত। জীব বিভিন্ন যোনিতে দেহ ধারণ করে, যার সংখ্যা হচ্ছে চুরাশি লক্ষ। পৃথু মহারাজ সমস্ত প্রাণীদেরই

আত্মতুল্য মনে করতেন। এই যুগে কিন্তু তথাকথিত সমস্ত রাজা এবং রাষ্ট্রপতিরা অন্যান্য জীবদের আত্মতুল্য মনে করেন না। তাদের অধিকাংশই মাংসাহারী, আর তারা যদি মাংসাশী নাও হয় এবং নিজেদের অত্যন্ত ধার্মিক ও পুণ্যবান বলে প্রচার করার চেষ্টা করে, তবুও তারা তাদের রাজ্যে গো-হত্যা অনুমোদন করে। এই প্রকার পাপিষ্ঠ রাষ্ট্রপ্রধানেরা কখনই জনপ্রিয় হতে পারে না। এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *মুক্ত-সঙ্গ-প্রসঙ্গঃ*, অর্থাৎ, রাজা সর্বদা মুক্ত পুরুষদের সঙ্গ করতেন।

শ্লোক ১৯

অয়ং তু সাক্ষাদ্ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ
কূটস্থ আত্মা কলয়াবতীর্ণঃ ।
যস্মিন্নবিদ্যারচিতং নিরর্থকং
পশ্যন্তি নানাত্বমপি প্রতীতম্ ॥ ১৯ ॥

অয়ম্—এই রাজা; **তু**—তখন; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ত্রি-অধীশঃ**—ত্রিলোকের অধীশ্বর; **কূট-স্থঃ**—নির্বিকার; **আত্মা**—পরমাত্মা; **কলয়া**—অংশের দ্বারা; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেছেন; **যস্মিন্**—যার মধ্যে; **অবিদ্যা-রচিতম্**—অবিদ্যার দ্বারা সৃষ্ট; **নিরর্থকম্**—অর্থহীন; **পশ্যন্তি**—দর্শন করে; **নানাত্বম্**—জড় বৈচিত্র্য; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **প্রতীতম্**—বোঝা যায়।

অনুবাদ

এই রাজা ত্রিভুবনের অধীশ্বর, এবং তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট। তিনি নির্বিকার এবং ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। মুক্ত ও পূর্ণপ্রজ্ঞ হওয়ার ফলে, তিনি সমস্ত জড় বৈচিত্র্যকে অর্থহীন বলে মনে করেন, কারণ সেগুলি মূলত অবিদ্যার দ্বারা রচিত।

তাৎপর্য

এই প্রার্থনার দ্বারা বন্দীরা পৃথু মহারাজের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত গুণের সারাংশ *সাক্ষাদ্ ভগবান্* শব্দ দুটিতে ব্যক্ত হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে, পৃথু মহারাজ হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান এবং তাই তিনি অন্তহীন সদ্‌গুণের অধিকারি। ভগবানের অবতার হওয়াব ফলে, এই সমস্ত সদ্‌গুণে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। পরমেশ্বর ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, এবং পৃথু মহারাজও এমনভাবে ভগবানের

শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি পূর্ণমাত্রায় ভগবানের এই ছয়টি ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারতেন।

কূট-স্থ শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'পরিবর্তন-রহিত'। দুই প্রকার জীব রয়েছে—নিত্যমুক্ত এবং নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীব কখনই ভুলে যান না যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস। যিনি তাঁর সেই পদের কথা কখনও বিস্মৃত হন না এবং যিনি জানেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তিনি নিত্যমুক্ত। এই প্রকার নিত্যমুক্ত জীবেরা পরমাত্মার বিস্তাররূপে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন। *বেদে* বলা হয়েছে *নিত্যো নিত্যানাম্*। তাই নিত্যমুক্ত জীবেরা জানেন যে, তিনি হচ্ছেন পরম নিত্য শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। সেই অবস্থায় তিনি জড় জগৎকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। নিত্যবদ্ধ জীবের দৃষ্টিতে জড় বৈচিত্র্য পরস্পর থেকে ভিন্ন। এই সূত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বদ্ধ জীবের শরীর একটি পোশাকের মতো। মানুষ বিভিন্ন রকম পোশাক পরতে পারে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি পোশাকের খুব একটা গুরুত্ব দেন না। *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ ॥

"বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডাল, এদের সকলের প্রতি যথার্থ জ্ঞানী সমদর্শী হন।"

তাই জ্ঞানী ব্যক্তি জীবের বহিরাবরণ-স্বরূপ দেহটিকে দর্শন করেন না, পক্ষান্তরে বিভিন্ন প্রকার দেহের অভ্যন্তরে যে শুদ্ধ আত্মা রয়েছে, তাকে দর্শন করেন, এবং তিনি খুব ভালভাবে জানেন যে, বিভিন্ন প্রকার দেহগুলি প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা-রচিত। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার হওয়ার ফলে, পৃথু মহারাজ তাঁর চিন্ময় স্থিতির পরিবর্তন করেননি, এবং তার ফলে তাঁর পক্ষে জড় জগৎকে বাস্তব বলে মনে করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ২০

অয়ং ভুবো মণ্ডলমোদয়াদ্রে-
র্গোপ্তৈকবীরো নরদেবনাথঃ।
আস্থায় জৈত্রং রথমাত্তচাপঃ
পর্যস্যতে দক্ষিণতো যথার্কঃ ॥ ২০ ॥

অয়ম্—এই রাজা; **ভুবঃ**—পৃথিবী; **মণ্ডলম্**—গোলক; **আ-উদয়-অদ্রেঃ**—উদয়াচল থেকে, যেখানে প্রথম সূর্যোদয় হয়; **গোপ্তা**—রক্ষা করবেন; **এক**—অদ্বিতীয়ভাবে; **বীরঃ**—শক্তিশালী; **নর-দেব**—সমস্ত রাজাদের, মানব সমাজের দেবতাদের; **নাথঃ**—প্রভু; **আস্থায়**—অবস্থিত হয়ে; **জৈত্রম্**—বিজয়ী; **রথম্**—তাঁর রথ; **আত্ত-চাপঃ**—ধনুক ধারণ করে; **পর্যস্যতে**—প্রদক্ষিণ করবেন; **দক্ষিণতঃ**—দক্ষিণ দিক থেকে; **যথা**—যেমন; **অর্কঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী এই বীর রাজার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তিনি তাঁর হাতে ধনুক ধারণ করে, তাঁর বিজয়ী রথে চড়ে সূর্যের মতো ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ কববেন, এবং তিনি উদয়াচল পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড শাসন করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *যথার্কঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সূর্য এক স্থানে স্থির থাকে না, পক্ষান্তরে তা তার কক্ষপথে ভ্রমণ করছে, যা পরমেশ্বর ভগবান নির্ধারণ করেছেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যান্য অংশেও প্রতিপন্ন হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* পঞ্চম স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে ষোল হাজার মাইল বেগে তার কক্ষপথে ঘুরছে। তেমনই, *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃত-কাল-চক্রঃ*—ভগবানের নির্দেশে সূর্য তাঁর কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। অর্থাৎ সূর্য এক স্থানে স্থির থাকে না। পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর শাসন-ক্ষমতা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হবে । যেখান থেকে প্রথম সূর্যোদয় দেখা যায় সেই হিমালয় পর্বতকে বলা হয় *উদয়াচল* বা *উদয়াদ্রি* । এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথু মহারাজের রাজ্য হিমালয় পর্বত থেকে সমুদ্র এবং মহাসাগরের তট পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অর্থাৎ সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হবে।

এই শ্লোকে আর একটি মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *নরদেব* । পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একজন যোগ্য রাজা, তা তিনি মহারাজ পৃথুই হোন অথবা অন্য যে-কেউ হোন, যিনি আদর্শ রাজারূপে রাজ্যশাসন করেন, তাঁকে নররূপী ভগবান বলে মনে করতে হবে। বৈদিক সংস্কৃতিতে রাজাকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন নারায়ণের প্রতিনিধি, এবং তিনি তাঁর প্রজাদের রক্ষাও করেন। তাই তিনি হচ্ছেন *নাথ* বা অধীশ্বর। সনাতন গোস্বামীও নবাব

হুসেন শাহকে নরদেবরূপে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, যদিও নবাব ছিল মুসলমান। রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের রাজ্যশাসনে এতই দক্ষ হওয়া উচিত যে, প্রজারা যাতে তাঁদের নররূপী ভগবানের মতো পূজা করে। সেটিই হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধ অবস্থা।

শ্লোক ২১

অস্মৈ নৃপালাঃ কিল তত্র তত্র
বলিং হরিষ্যন্তি সলোকপালাঃ ।
মংস্যন্ত এষাং স্ত্রিয় আদিরাজং
চক্রায়ুধং তদ্‌যশ উদ্ধরন্ত্যঃ ॥ ২১ ॥

অস্মৈঃ—তাঁকে; **নৃ-পালাঃ**—সমস্ত রাজারা; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **তত্র তত্র**—যে যে স্থানে; **বলিম্**—উপহার; **হরিষ্যন্তি**—প্রদান করবেন; **স**—সহ; **লোক-পালাঃ**—দেবতা; **মংস্যন্তে**—বিবেচনা করবেন; **এষাম্**—এই সমস্ত রাজাদের; **স্ত্রিয়ঃ**—পত্নীগণ; **আদি-রাজম্**—প্রথম রাজা; **চক্র-আয়ুধম্**—চক্ররূপ অস্ত্র-ধারণকারী; **তৎ**—তাঁর; **যশঃ**—খ্যাতি; **উদ্ধরন্ত্যঃ**—ধারণ করে।

অনুবাদ

যখন এই রাজা সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবেন, তখন অন্য সমস্ত রাজারা এবং দেবতারা তাঁকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করবেন। তাঁদের মহিষীরাও তাঁকে হস্তে চক্র এবং গদাচিহ্নধারী আদি রাজা বলে বিবেচনা করে তাঁর যশ গান করবেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মতো যশস্বী হবেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের যশ সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি ইতিমধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে পরিচিত হয়েছিলেন। *আদি-রাজম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রথম রাজা।' প্রকৃত আদিরাজ হচ্ছেন নারায়ণ বা শ্রীবিষ্ণু। মানুষ জানে না যে, আদি রাজা বা নারায়ণ সমস্ত জীবেদের রক্ষা করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *বেদে* বলা হয়েছে—*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* (*কঠোপনিষদ* ২/২/১৩)। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবেদের পালন করেন। রাজা বা নরদেব হচ্ছেন তাঁর প্রতিনিধি। তাই রাজার কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবের পালনের জন্য ধনসম্পদের

বিতরণ স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করা। তিনি যদি তা করেন, তা হলে তিনি নারায়ণের মতো যশস্বী হবেন। যে-কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে (*তদ্-যশঃ*), পৃথু মহারাজ ভগবানের মতো যশস্বী হয়েছিলেন, কারণ তিনি সেভাবেই সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

অয়ং মহীং গাং দুদুহেঽধিরাজঃ
প্রজাপতির্বৃত্তিকরঃ প্রজানাম্ ।
যো লীলয়াদ্রীন্ স্বশরাসকোট্যা
ভিন্দন্ সমাং গামকরোদ্যথেন্দ্রঃ ॥ ২২ ॥

অয়ম্—এই রাজা; **মহীম্**—পৃথিবী; **গাম্**—গাভীরূপে; **দুদুহে**—দোহন করবেন; **অধিরাজঃ**—অসাধারণ রাজা; **প্রজা-পতিঃ**—মনুষ্যদের জনক; **বৃত্তি-করঃ**—জীবনের সুবিধা প্রদান করে; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **যঃ**—যিনি; **লীলয়া**—অনায়াসে; **অদ্রীন্**—পর্বত; **স্ব-শরাস**—তাঁর ধনুকের; **কোট্যা**—তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের দ্বারা; **ভিন্দন্**—বিদীর্ণ করে; **সমাম্**—সমতল; **গাম্**—পৃথিবী; **অকরোৎ**—করবেন; **যথা**—যেমন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র।

অনুবাদ

প্রজাবৎসল এই অসাধারণ রাজা প্রজাপতিদের মতো প্রজা পালন করবেন। প্রজাদের জীবিকা সম্পাদনের জন্য তিনি গোস্বরূপা এই পৃথিবীকে দোহন করবেন। কেবল তাই নয়, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁর শক্তিশালী বজ্রের দ্বারা পর্বত বিদীর্ণ করেন, তেমনই তিনি তাঁর ধনুকের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের দ্বারা গিরিপর্বত চূর্ণ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠ সমতল করবেন।

শ্লোক ২৩

বিস্ফূর্জয়ন্নাজগবং ধনুঃ স্বয়ং
যদাচরৎক্ষ্মামবিষহ্যমাজৌ ।
তদা নিলিল্যুর্দিশি দিশ্যসন্তো
লাঙ্গূলমুদ্যম্য যথা মৃগেন্দ্রঃ ॥ ২৩ ॥

বিস্ফূর্জয়ন্—স্পন্দিত করে; **আজ-গবম্**—মেষ এবং বৃষের শৃঙ্গনির্মিত; **ধনুঃ**—ধনুক; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **যদা**—যখন; **অচরৎ**—বিচরণ করবেন; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবীর উপর; **অবিষহ্যম্**—অপ্রতিহত; **আজৌ**—যুদ্ধে; **তদা**—তখন; **নিলিল্যুঃ**—লুকাবে; **দিশি দিশি**—সর্বদিকে; **অসন্তঃ**—আসুরিক মানুষেরা; **লাঙ্গূলম্**—পুচ্ছ; **উদ্যম্য**—উন্নত করে; **যথা**—যেমন; **মৃগেন্দ্রঃ**—সিংহ।

অনুবাদ

সিংহ যখন তার পুচ্ছ উন্নত করে বনে বিচরণ করে, তখন অন্য সমস্ত অধম পশুরা লুকিয়ে পড়ে। তেমনই, পৃথু মহারাজ যখন তাঁর মেষ ও বৃষের শৃঙ্গনির্মিত এবং যুদ্ধে অপ্রতিহত ধনুকে টঙ্কার দিয়ে তাঁর রাজ্যে বিচরণ করবেন, তখন সমস্ত আসুরিক-ভাবাপন্ন দুর্বৃত্ত ও দস্যুরা চতুর্দিকে পলায়ন করে লুক্কায়িত হবে।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের মতো শক্তিশালী রাজাকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা অত্যন্ত উপযুক্ত। ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় রাজাদের এখনও বলা হয় সিংহ। রাজ্যে দস্যু, তস্কর এবং আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা যদি কঠোর হস্তে রাজ্যশাসনকারী রাষ্ট্রপ্রধানকে ভয় না করে, তা হলে রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসতে পারে না। তাই সিংহসদৃশ রাজার পরিবর্তে যদি কোন মহিলা রাজ্যের প্রশাসনিক অধ্যক্ষ হন, তা সবচাইতে দুঃখের বিষয় হয়। এই পরিস্থিতি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ২৪

এষোঽশ্বমেধাঞ্ শতমাজহার
সরস্বতী প্রাদুরভাবি যত্র ।
অহার্ষীদ্যস্য হয়ং পুরন্দরঃ
শতক্রতুশ্চরমে বর্তমানে ॥ ২৪ ॥

এষঃ—এই রাজা; **অশ্বমেধান্**—অশ্বমেধ যজ্ঞ; **শতম্**—একশত; **আজহার**—অনুষ্ঠান করবেন; **সরস্বতী**—সরস্বতী নদী; **প্রাদুরভাবি**—প্রকট হয়েছে; **যত্র**—যেখানে; **অহার্ষীৎ**—হরণ করবে; **যস্য**—যার; **হয়ম্**—ঘোড়া; **পুরন্দরঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **শত-ক্রতুঃ**—যিনি এক শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন; **চরমে**—অন্তিম যজ্ঞে; **বর্তমানে**—অনুষ্ঠান কালে।

অনুবাদ

সরস্বতী নদীর উৎসস্থলে এই রাজা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন। শেষ যজ্ঞটি অনুষ্ঠানের সময় দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করবেন।

শ্লোক ২৫

এষ স্বসদ্মোপবনে সমেত্য
সনৎকুমারং ভগবন্তমেকম্ ।
আরাধ্য ভক্ত্যালভতামলং তজ্
জ্ঞানং যতো ব্রহ্ম পরং বিদন্তি ॥ ২৫ ॥

এষঃ—এই রাজা; **স্ব-সদ্ম**—তাঁর প্রাসাদের; **উপবনে**—উদ্যানে; **সমেত্য**—সাক্ষাৎ করে; **সনৎ-কুমারম্**—সনৎকুমার; **ভগবন্তম্**—পূজনীয়; **একম্**—একাকী; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **ভক্ত্যা**—ভক্তিসহকারে; **অলভত**—লাভ করবেন; **অমলম্**—নিষ্কলুষ; **তৎ**—সেই; **জ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ব্রহ্ম**—আত্মা; **পরম্**—পরম, চিন্ময়; **বিদন্তি**—উপভোগ করেন, জানেন

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন উপবনে চতুঃসনদের অন্যতম সনৎকুমারের সঙ্গ লাভ করবেন। রাজা ভক্তিসহকারে তাঁর আরাধনা করবেন এবং যে জ্ঞানের দ্বারা পরম আনন্দ লাভ করা যায়, সেই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

বিদন্তি শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি কিছু জানেন অথবা আনন্দ উপভোগ করেন। কেউ যখন যথাযথভাবে সদ্‌গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং দিব্য আনন্দ সম্বন্ধে অবগত হন, তখন তিনি তাঁর জীবন উপভোগ করেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে, *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি* । কেউ যখন ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা কোন কিছুর জন্য শোক করেন না। তিনি তখন প্রকৃতপক্ষে দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। পৃথু মহারাজ যদিও ছিলেন ভগবানের অবতার, তবুও তিনি তাঁর প্রজাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে সম্প্রদায়ভুক্ত সদ্‌গুরুর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে মানুষ যথার্থ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন এবং এই জড় জগতে

অবস্থান কালেও আনন্দময় জীবন উপভোগ করতে পারেন। এই শ্লোকে *বিদন্তি* শব্দটি 'হৃদয়ঙ্গম করা' অর্থেও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। এইভাবে কেউ যখন ব্রহ্মকে বা সব কিছুর পরম উৎসকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি আনন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

শ্লোক ২৬

তত্র তত্র গিরস্তাস্তা ইতি বিশ্রুতবিক্রমঃ ।
শ্রোষ্যত্যাত্মাশ্রিতা গাথাঃ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ ॥ ২৬ ॥

তত্র তত্র—সর্বত্র; **গিরঃ**—বাণী; **তাঃ তাঃ**—বহু, বিবিধ; **ইতি**—এইভাবে; **বিশ্রুত-বিক্রমঃ**—যাঁর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে; **শ্রোষ্যতি**—শ্রবণ করবে; **আত্ম-আশ্রিতাঃ**—নিজের বিষয়ে, **গাথাঃ**—গান, আখ্যান; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **পৃথু-পরাক্রমঃ**—মহা শক্তিশালী

অনুবাদ

এইভাবে যখন মহারাজ পৃথুর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ জনসাধারণে বিদিত হবে, তখন পৃথু মহারাজ তাঁর অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী কার্যকলাপের বর্ণনা নিজেও সর্বদা শুনতে পাবেন।

তাৎপর্য

কৃত্রিমভাবে নিজের বিষয়ে প্রচার করে তথাকথিত খ্যাতি অর্জন করা এক প্রকার প্রতারণা। পৃথু মহারাজ মানুষের কাছে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের ফলে। তাঁকে কৃত্রিমভাবে নিজের সম্বন্ধে প্রচার করতে হয়নি। মানুষের বাস্তবিক খ্যাতি কখনও গোপন থাকে না।

শ্লোক ২৭

দিশো বিজিত্যাপ্রতিরুদ্ধচক্রঃ
স্বতেজসোৎপাটিতলোকশল্যঃ ।
সুরাসুরেন্দ্রৈরুপগীয়মান-
মহানুভাবো ভবিতা পতির্ভুবঃ ॥ ২৭ ॥

দিশঃ—সর্বদিক; **বিজিত্য**—জয় করে; **অপ্রতিরুদ্ধ**—অপ্রতিহত; **চক্রঃ**—তাঁর প্রভাব বা শক্তি; **স্ব-তেজসা**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **উৎপাটিত**—মূল সহ উচ্ছেদ, **লোক-শল্যঃ**—প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা; **সুর**—দেবতাদের; **অসুর**—অসুরদের; **ইন্দ্রৈঃ**—প্রধানদের দ্বারা; **উপগীয়মান**—প্রশংসিত হয়ে; **মহা-অনুভাবঃ**—মহাত্মা; **ভবিতা**—হবেন; **পতিঃ**—অধীশ্বর; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

কেউই পৃথু মহারাজের আদেশ অমান্য করতে পারবে না। সারা পৃথিবী জয় করে তিনি প্রজাদের ত্রিতাপ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করবেন। তখন তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হবে, এবং সুর ও অসুরেরা সকলেই তাঁর উদার কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করবে।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের সময় একজন সম্রাট সারা পৃথিবী শাসন করতেন, যদিও বহু অধীনস্থ রাজ্য ছিল। ঠিক যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংযুক্ত রাষ্ট্র রয়েছে, পুরাকালেও বহু রাষ্ট্রের মাধ্যমে পৃথিবী শাসিত হত, কিন্তু একজন পরম সম্রাট ছিলেন, যিনি সমস্ত অধীনস্থ রাজ্যগুলির উপর শাসন করতেন। যখনই কোন অধীনস্থ রাজ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে কোন রকম ত্রুটি হত, তৎক্ষণাৎ সম্রাট সেই অধীন রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন।

উৎপাটিত-লোক-শল্যঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পৃথু মহারাজ তাঁর নাগরিকদের সমস্ত দুঃখকষ্ট সমূলে উৎপাটিত করেছিলেন। *শল্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে কাঁটা, অনেক রকম কাঁটা রয়েছে, যা রাজ্যের প্রজাদের বিদ্ধ করে বেদনা দেয়, কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ পর্যন্ত সমস্ত সুদক্ষ শাসকেরা প্রজাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা সমূলে উৎপাটিত করেছিলেন। বলা হয় যে, যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজত্বকালে প্রচণ্ড শীত অথবা প্রখর তাপও ছিল না, এবং প্রজারা কোন রকম মানসিক কষ্টভোগ করত না। এটি হচ্ছে সুশাসন ব্যবস্থার লক্ষণ। পৃথু মহারাজ এই প্রকার শান্তি ও সমৃদ্ধিশালী এবং দুশ্চিন্তামুক্ত রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ফলে সুর এবং অসুর সকলেই তাঁর কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেছিল। যে-সমস্ত ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে চান, তাঁরা যেন এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করেন। কেউ যদি সম্পূর্ণরূপে প্রজাদের ত্রিতাপ

দুঃখ দূর করতে পারেন, তা হলেই কেবল সারা পৃথিবী শাসন কবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত। কোন রকম কূটনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্যশাসন করার আকাঙ্ক্ষা কবা উচিত নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'বন্দীদের দ্বারা পৃথু মহাবাজের স্তুতি' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

পৃথিবীর প্রতি পৃথু মহারাজের ক্রোধ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

এবং স ভগবান্ বৈণ্যঃ খ্যাপিতো গুণকর্মভিঃ ।
ছন্দয়ামাস তান্ কামৈঃ প্রতিপূজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বৈণ্যঃ**—বেণ রাজার পুত্ররূপে; **খ্যাপিতঃ**—স্তুত হয়ে; **গুণ-কর্মভিঃ**—গুণ এবং কর্মের দ্বারা; **ছন্দয়াম্ আস**—প্রসন্নতা-বিধান করা হয়েছিল; **তান্**—সেই বন্দনাকারীদের; **কামৈঃ**—বিবিধ উপহারের দ্বারা; **প্রতিপূজ্য**—সম্মান প্রদর্শন করে, **অভিনন্দ্য**—অভিনন্দন; **চ**—ও।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে বন্দীরা পৃথু মহারাজের গুণাবলী এবং বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের বর্ণনা করেছিলেন। তার পর পৃথু মহারাজ প্রশংসা বাক্যের দ্বারা তাঁদের অভিনন্দন এবং ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করে তাঁদের সন্তোষ-বিধান করেছিলেন।

শ্লোক ২

ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ বর্ণান্ ভৃত্যামাত্যপুরোধসঃ ।
পৌরাঞ্জানপদান্ শ্রেণীঃ প্রকৃতীঃ সমপূজয়ৎ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণ-প্রমুখান্—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের; **বর্ণান্**—অন্যান্য বর্ণদের; **ভৃত্য**—সেবকদের; **অমাত্য**—মন্ত্রীদের; **পুরোধসঃ**—পুরোহিতদের; **পৌরান্**—প্রজাদের; **জানপদান্**—দেশবাসীদের; **শ্রেণীঃ**—বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের; **প্রকৃতীঃ**—প্রশংসকদের; **সমপূজয়ৎ**—তিনি যথাযথ সম্মান প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে সন্তুষ্ট হয়ে পৃথু মহারাজ ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের নেতাদের, তাঁর সেবকদের, তাঁর মন্ত্রীদের, পুরোহিতদের, নাগরিকদের, সাধারণ দেশবাসীদের, অন্যান্য জাতির মানুষদের, প্রশংসকদের এবং অন্যান্য সকলকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

বিদুর উবাচ

কস্মাদ্দধার গোরূপং ধরিত্রী বহুরূপিণী ।
যাং দুদোহ পৃথুস্তত্র কো বৎসো দোহনং চ কিম্ ॥ ৩ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, **কস্মাৎ**—কেন; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **গো-রূপম্**—গাভীরূপ, **ধরিত্রী**—পৃথিবী; **বহু-রূপিণী**—অন্য বহুরূপ ধারিণী; **যাম্**—যাঁকে; **দুদোহ**—দোহন করেছিলেন; **পৃথু**—মহারাজ পৃথু; **তত্র**—সেখানে; **কঃ**—কে; **বৎসঃ**—বাছুর; **দোহনম্**—দোহনপাত্র, **চ**—ও; **কিম্**—কি।

অনুবাদ

বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে ব্রাহ্মণ। বহুরূপ ধারণে সমর্থা পৃথিবী কেন গাভীরূপ ধারণ করেছিলেন? এবং পৃথু মহারাজ যখন তাঁকে দোহন করেছিলেন, তখন বৎস কে হয়েছিল এবং দোহনপাত্র কি হয়েছিল?

শ্লোক ৪

প্রকৃত্যা বিষমা দেবী কৃতা তেন সমা কথম্ ।
তস্য মেধ্যং হয়ং দেবঃ কস্য হেতোরপাহরৎ ॥ ৪ ॥

প্রকৃত্যা—স্বভাবত; **বিষমা**—অসমতল; **দেবী**—পৃথিবী; **কৃতা**—করা হয়েছিল; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **সমা**—সমতল; **কথম্**—কিভাবে; **তস্য**—তাঁর, **মেধ্যম্**—যজ্ঞে উৎসর্গের নিমিত্ত; **হয়ম্**—অশ্ব; **দেবঃ**—ইন্দ্রদেবতা, **কস্য**—কি জন্য; **হেতোঃ**—কারণ; **অপাহরৎ**—করেছিলেন।

অনুবাদ

পৃথিবী স্বভাবতই অসমতল, কিন্তু পৃথু মহারাজ কিভাবে তাকে সমতল করেছিলেন? আর দেবরাজ ইন্দ্রই বা কেন তাঁর যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছিলেন?

শ্লোক ৫

সনৎকুমারাদ্ভগবতো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদুত্তমাৎ ।
লব্ধা জ্ঞানং সবিজ্ঞানং রাজর্ষিঃ কাং গতিং গতঃ ॥ ৫ ॥

সনৎ-কুমারাৎ—সনৎকুমার থেকে; **ভগবতঃ**—পরম শক্তিমান; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ব্রহ্ম-বিৎ-উত্তমাৎ**—বেদবেত্তা; **লব্ধা**—লাভ করার পর; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **স-বিজ্ঞানম্**—ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য; **রাজ-ঋষিঃ**—মহান ঋষিসদৃশ রাজা; **কাম্**—কোন্; **গতিম্**—গতি; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রাজর্ষি পৃথু বেদবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সনৎকুমারের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর, তিনি কিভাবে তাঁর জীবনে ব্যবহারিকভাবে তা প্রয়োগ করেছিলেন, এবং তিনি কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে। সেই সম্প্রদায়গুলির প্রবর্তন হয়েছে ব্রহ্মা, লক্ষ্মীদেবী, সনৎকুমারাদি চতুঃসন এবং শিব থেকে। এই চারটি সম্প্রদায়ের ধারা এখনও চলেছে। পৃথু মহারাজ দেখিয়ে গেছেন যে, যারা বৈদিক জ্ঞান লাভে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের অবশ্যই এই চারটি সম্প্রদায়ের কোন একটি সম্প্রদায় থেকে সদ্গুরু গ্রহণ করতে হবে। বলা হয়েছে যে, এই সম্প্রদায়গুলির কোন একটি থেকে যদি মন্ত্র গ্রহণ করা না হয়, তা হলে সেই তথাকথিত মন্ত্র এই কলিযুগে নিষ্ফল। আজকাল বহু ভুঁইফোড় সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে, যাদের কোন প্রামাণিক পরম্পরা নেই, এবং তারা অননুমোদিত মন্ত্র দান করে জনসাধারণকে বিপথগামী করছে। এই সমস্ত তথাকথিত সম্প্রদায়ের ভণ্ডরা কোন রকম বৈদিক বিধিবিধান পালন করে না। সব রকম পাপকর্মে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা মানুষকে মন্ত্র দিয়ে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা জানেন যে, এই সমস্ত মন্ত্র কখনও সফল হবে না, এবং তাঁরা কখনও এই প্রকার ভুঁইফোড় আধ্যাত্মিক

সম্প্রদায়গুলিকে প্রশ্রয় দেয় না। এই সমস্ত ভণ্ড সম্প্রদায় সম্বন্ধে মানুষদের অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য এই যুগের হতভাগ্য মানুষেরা এই সমস্ত তথাকথিত সম্প্রদায় থেকে মন্ত্র প্রাপ্ত হয় কিন্তু পৃথু মহারাজ তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত থেকে দেখিয়ে গেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় সৎ সম্প্রদায় থেকে তাই পৃথু মহারাজ সনৎকুমারকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬-৭

যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্য ভবান্ ভগবতঃ প্রভোঃ ।
শ্রবঃ সুশ্রবসঃ পুণ্যং পূর্বদেহকথাশ্রয়ম্ ॥ ৬ ॥
ভক্তায় মেঽনুরক্তায় তব চাধোক্ষজস্য চ ।
বক্তুমর্হসি যোঽদুহ্যদ্বৈণ্যরূপেণ গামিমাম্ ॥ ৭ ॥

যৎ—যা; **চ**—এবং; **অন্যৎ**—অন্য; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **ভবান্**—আপনি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রভোঃ**—শক্তিশালী; **শ্রবঃ**—মহিমান্বিত কার্যকলাপ; **সু-শ্রবসঃ**—যা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **পূর্ব-দেহ**—তাঁর পূর্ব অবতারের; **কথা-আশ্রয়ম্**—বর্ণনা সম্পর্কিত; **ভক্তায়**—ভক্তকে; **মে**—আমাকে; **অনুরক্তায়**—অত্যন্ত অনুরক্ত; **তব**—আপনার; **চ**—এবং; **অধোক্ষজস্য**—অধোক্ষজ নামে পরিচিত ভগবানের; **চ**—ও; **বক্তুম্ অর্হসি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **যঃ**—যিনি; **অদুহ্যৎ**—দোহন করেছিলেন; **বৈণ্য-রূপেণ**—রাজা বেণের পুত্ররূপে; **গাম্**—গাভী, পৃথিবী; **ইমাম্**—এই।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার; তাই তাঁর কার্যকলাপের যে-কোন বর্ণনা অবশ্যই অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, এবং তা সর্ব সৌভাগ্যপ্রদ। আমি সর্বদা আপনার এবং অধোক্ষজ ভগবানের ভক্ত। তাই দয়া করে পৃথু মহারাজের কাহিনী বর্ণনা করুন, যিনি রাজা বেণের পুত্ররূপে গাভীরূপী পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে অবতারীও বলা হয়, যার অর্থ হচ্ছে, "যাঁর থেকে সমস্ত অবতারেরা উদ্ভূত হন।" *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য*

প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে—"আমি সমস্ত চিন্ময় এবং ভৌতিক জগতের উৎস। আমার থেকেই সব কিছু উদ্ভূত হয়।" এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের আবির্ভাবের আদি উৎস। এই জড় জগতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই তিন অবতারকে বলা হয় গুণাবতার। জড়া প্রকৃতি পরিচালিত হয় প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা, এবং শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অধ্যক্ষ। মহারাজ পৃথুও শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত গুণের অবতার, যে-গুণের দ্বারা বদ্ধ জীবদের শাসন করা হয়।

এই শ্লোকে *অধোক্ষজ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত।' মানসিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউই পরমেশ্বর ভগবানকে অনুভব করতে পারে না; তাই অল্পজ্ঞ মানুষেরা ভগবানকে জানতে পারে না। যেহেতু জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভগবান সম্বন্ধে কেবল একটি নির্বিশেষ ধারণা সৃষ্টি করা যায়, তাই ভগবানকে বলা হয় অধোক্ষজ।

শ্লোক ৮

সূত উবাচ

চোদিতো বিদুরেণৈবং বাসুদেবকথাং প্রতি ।
প্রশস্য তং প্রীতমনা মৈত্রেয়ঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত; **বিদুরেণ**—বিদুরের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণের; **কথাম্**—বর্ণনা; **প্রতি**—বিষয়ে; **প্রশস্য**—প্রশংসা করে; **তম্**—তাঁকে; **প্রীত-মনাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **মৈত্রেয়ঃ**—মৈত্রেয় ঋষি; **প্রত্যভাষত**—উত্তর দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—বিদুর যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অবতারের কার্যকলাপ শুনতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তখন মৈত্রেয়ও অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বিদুরের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তার পর মৈত্রেয় বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের কথা বা তাঁর অবতারদের কথা এতই চিন্ময় অনুপ্রেরণা প্রদান করে যে, তার বক্তা এবং শ্রোতা কখনই শ্রান্ত হন না। সেটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিক আলোচনার

বৈশিষ্ট্য। আমরা এখানে বাস্তবিকভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, বিদুর ও মৈত্রেয়ের মধ্যে এই আলোচনায় তাঁরা যেন তৃপ্ত হতে পারছেন না। তাঁরা উভয়েই হচ্ছেন ভক্ত, এবং বিদুর যতই প্রশ্ন করছেন, মৈত্রেয় ততই বলতে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। চিন্ময় আলোচনার লক্ষণ হচ্ছে যে, তাতে কেউই ক্লান্তিবোধ করেন না। তাই বিদুরের প্রশ্ন শ্রবণ করে মহর্ষি মৈত্রেয় বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে, আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

মৈত্রেয় উবাচ

যদাভিষিক্তঃ পৃথুরঙ্গ বিপ্রৈ-
রামন্ত্রিতো জনতায়াশ্চ পালঃ ।
প্রজা নিরন্নে ক্ষিতিপৃষ্ঠ এত্য
ক্ষুৎক্ষামদেহাঃ পতিমভ্যবোচন্ ॥ ৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **যদা**—যখন; **অভিষিক্তঃ**—সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **অঙ্গ**—হে বিদুর; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **আমন্ত্রিতঃ**—ঘোষিত; **জনতায়াঃ**—মানুষদের; **চ**—ও; **পালঃ**—রক্ষক; **প্রজাঃ**—প্রজা; **নিরন্নে**—অন্নহীন হয়ে; **ক্ষিতি-পৃষ্ঠে**—পৃথিবীর উপর; **এত্য**—নিকটবর্তী হয়ে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধায়; **ক্ষাম**—ক্ষীণ; **দেহাঃ**—তাদের দেহ; **পতিম্**—রক্ষককে; **অভ্যবোচন্**—তারা বলেছিল।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! যখন ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে প্রজাদের রক্ষক বলে ঘোষণা করেছিলেন, তখন অন্নাভাব হয়েছিল। অনাহারে প্রজাদের দেহ বাস্তবিকই ক্ষীণ হয়েছিল। তাই তারা রাজার কাছে এসে তাদের প্রকৃত অবস্থার কথা জানিয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে ব্রাহ্মণদের দ্বারা রাজাকে মনোনয়নের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণাশ্রম প্রথায় ব্রাহ্মণদের সমাজের মাথা বলে বিবেচনা করা হয় এবং তাই তাঁরা সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে রচিত হয়েছে।

ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম মনুষ্যকৃত নয়, তা ভগবান তৈরি করেছেন। এই বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন। বেণের মতো দুষ্ট রাজা যখন শাসন করত, তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ব্রহ্মণ্য শক্তির দ্বারা তাকে বধ করে গুণের ভিত্তিতে উপযুক্ত রাজা মনোনয়ন করতেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ব্রাহ্মণেরা, বুদ্ধিমান মানুষেরা অথবা মহান ঋষিরা রাজকীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন। এখানে আমরা দেখতে পাই, কিভাবে ব্রাহ্মণেরা প্রজাদের রক্ষকরূপে পৃথু মহারাজকে নির্বাচিত করেছিলেন। প্রজারা অন্নাভাবে ক্ষীণ কলেবর হয়ে, রাজার কাছে এসে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম এতই সুন্দরভাবে গঠিত যে, ব্রাহ্মণেরা রাজাকে পরিচালনা করতেন, এবং রাজা প্রজাদের রক্ষা করতেন। ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং ক্ষত্রিয়দের সংরক্ষণে বৈশ্যেরা গোরক্ষা করতেন, খাদ্যশস্য উৎপাদন করতেন এবং তা বিতরণ করতেন। শূদ্ররা তাদের দৈহিক শ্রমের দ্বারা তিনটি উচ্চ বর্ণকে সাহায্য করত। সেটিই হচ্ছে পরিপূর্ণ আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা।

শ্লোক ১০-১১

বয়ং রাজঞ্জাঠরেণাভিতপ্তা
যথাগ্নিনা কোটরস্থেন বৃক্ষাঃ ।
ত্বামদ্য যাতাঃ শরণং শরণ্যং
যঃ সাধিতো বৃত্তিকরঃ পতির্নঃ ॥ ১০ ॥
তন্নো ভবানীহতু রাতবেহন্নং
ক্ষুধার্দিতানাং নরদেবদেব ।
যাবন্ন নঙ্ক্ষ্যামহ উজ্ঝিতোর্জা
বার্তাপতিস্ত্বং কিল লোকপালঃ ॥ ১১ ॥

বয়ম্—আমরা; **রাজন্**—হে রাজন্; **জাঠরেণ**—ক্ষুধার অগ্নির দ্বারা; **অভিতপ্তাঃ**—অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে; **যথা**—ঠিক যেমন; **অগ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **কোটর-স্থেন**—বৃক্ষের কোটরে; **বৃক্ষাঃ**—বৃক্ষ; **ত্বাম্**—আপনাকে; **অদ্য**—আজ; **যাতাঃ**—আমরা এসেছি; **শরণম্**—আশ্রয়; **শরণ্যম্**—শরণ গ্রহণের যোগ্য; **যঃ**—যিনি; **সাধিতঃ**—নিযুক্ত; **বৃত্তি-করঃ**—জীবিকা প্রদানকারী; **পতিঃ**—প্রভু; **নঃ**—আমাদের; **তৎ**—তাই; **নঃ**—আমাদের; **ভবান্**—আপনি; **ঈহতু**—দয়া করে চেষ্টা করুন; **রাতবে**—প্রদান করতে;

অন্নম্—খাদ্য; **ক্ষুধা**—ক্ষুধায়; **অর্দিতানাম্**—আর্ত; **নর-দেব-দেব**—হে সমস্ত রাজাদের পরম প্রভু; **যাবৎ ন**—যতক্ষণ না; **নঙ্ক্ষ্যামহে**—আমরা বিনষ্ট হব; **উজ্ঝিত**—বিহীন; **ঊর্জাঃ**—অন্ন, **বার্তা**—জীবিকা; **পতিঃ**—প্রদানকারী; **ত্বম্**—আপনি; **কিল**—নিঃসন্দেহে; **লোক-পালঃ**—প্রজাদের রক্ষক।

অনুবাদ

হে রাজন্! বৃক্ষের কোটরস্থ অগ্নি যেমন ধীরে ধীরে বৃক্ষটিকে শুকিয়ে ফেলে, তেমনই আমরা আমাদের জঠরাগ্নির প্রভাবে শুকিয়ে যাচ্ছি। আপনি শরণাগতদের রক্ষক, এবং আমাদের জীবিকা প্রদানের জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। তাই আমরা সকলে আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনি আমাদের রক্ষা করেন। আপনি কেবল একজন রাজাই নন, আপনি ভগবানের অবতারও। বাস্তবিকপক্ষে আপনি সমস্ত রাজাদের রাজা। আপনি আমাদের সর্বপ্রকার জীবিকা প্রদান করতে পারেন, কারণ আপনি আমাদের জীবিকাপতি। তাই, হে রাজাধিরাজ! দয়া করে অন্ন বিতরণ করে আপনি আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি-সাধন করুন। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন, অন্যথায় অনাহারে আমাদের মৃত্যু হবে।

তাৎপর্য

রাজার কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই সমাজ ব্যবস্থার সকলেই যাতে তাদের বৃত্তি অনুসারে কার্যরত হয় তা দেখা। ব্রাহ্মণের কর্তব্য যেমন উপযুক্ত রাজা নির্বাচন করা, তেমনই রাজার কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই সকল বর্ণের মানুষেরা যাতে তাদের নিজের বৃত্তিতে পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয় তা দেখা। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের যদিও কর্তব্য কর্ম সম্পাদনেব অনুমতি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ছিল বেকার। যদিও তারা অলস ছিল না, তবুও তারা তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারছিল না। মানুষ যখন এইভাবে বিভ্রান্ত হয়, তখন তাদের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যাওয়া, এবং রাষ্ট্রপতি অথবা রাজার কর্তব্য হচ্ছে মানুষের এই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তিব জন্য তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

শ্লোক ১২

মৈত্রেয় উবাচ

পৃথুঃ প্রজানাং করুণং নিশম্য পরিদেবিতম্ ।
দীর্ঘং দধ্যৌ কুরুশ্রেষ্ঠ নিমিত্তং সোঽন্বপদ্যত ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **করুণম্**—করুণ অবস্থা; **নিশম্য**—শুনে; **পরিদেবিতম্**—বিলাপ; **দীর্ঘম্**—বহুক্ষণ ধরে; **দধ্যৌ**—চিন্তা করেছিলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে বিদুর; **নিমিত্তম্**—কারণ; **সঃ**—তিনি; **অন্বপদ্যত**—জানতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন, হে বিদুর! পৃথু মহারাজ প্রজাদের এই প্রকার বিলাপ শ্রবণ করলেন এবং তাদের করুণ অবস্থা দর্শন করে, তার অন্তর্নিহিত কারণ জানবার জন্য বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা প্রগৃহীতশরাসনঃ।
সন্দধে বিশিখং ভূমেঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরহা যথা ॥ ১৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **প্রগৃহীত**—গ্রহণ করে; **শরাসনঃ**—ধনুক; **সন্দধে**—যোজন করেছিলেন; **বিশিখম্**—বাণ; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর প্রতি; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **ত্রি-পুর-হা**—শিব; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

সেই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজা ক্রোধে সমগ্র জগৎ সংহারকারী ত্রিপুরারির মতো শরাসন গ্রহণ করলেন এবং পৃথিবীকে লক্ষ্য করে তাতে শর যোজন করলেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ অন্নাভাবের কারণ জ্ঞাত হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনসাধারণের কোন দোষ ছিল না। তারা তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে অলস ছিল না। কিন্তু পৃথিবী যথেষ্ট শস্য উৎপাদন করছিল না। তা ইঙ্গিত করে যে, যথাযথভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করা হলেও, কখনও কখনও বিভিন্ন কারণে পৃথিবী খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে অস্বীকার করতে পারে। আজকাল কিছু কিছু মানুষ বলে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যাভাব হচ্ছে, সেই মতবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অন্য অনেক কারণ রয়েছে, যার ফলে পৃথিবী প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারে অথবা উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারে। পৃথু মহারাজ প্রকৃত কারণটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

প্রবেপমানা ধরণী নিশাম্যোদায়ুধং চ তম্ ।
গৌঃ সত্যপাদ্রবদ্ভীতা মৃগীব মৃগয়ুদ্রুতা ॥ ১৪ ॥

প্রবেপমানা—কম্পমান; **ধরণী**—পৃথিবী; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **উদায়ুধম্**—ধনুর্বাণ গ্রহণ করে; **চ**—ও; **তম্**—রাজা; **গৌঃ**—গাভী; **সতী**—হয়ে; **অপাদ্রবৎ**—পলায়ন করতে শুরু করলেন; **ভীতা**—অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে; **মৃগী ইব**—হরিণীর মতো; **মৃগয়ু**—ব্যাধের দ্বারা; **দ্রুতা**—অনুসরণকারী।

অনুবাদ

পৃথিবী যখন দেখলেন যে, মহারাজ পৃথু তাঁকে সংহার করার জন্য তাঁর ধনুক এবং বাণ গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে কাঁপতে শুরু করেছিলেন। তিনি তখন পৃথু মহারাজের ভয়ে একটি গাভীর রূপ ধারণ করে, ব্যাধ তাড়িত হরিণীর মতো দ্রুতবেগে পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

মাতা যেমন পুত্র ও কন্যারূপী বিবিধ প্রকার সন্তান উৎপাদন করেন, মাতা ধরিত্রীও তেমন তাঁর গর্ভ থেকে বিভিন্ন আকৃতির জীবদেহ সৃষ্টি করেন। তাই মাতা ধরণীর পক্ষে অসংখ্য আকৃতি ধারণ সম্ভব। সেই সময়, পৃথু মহারাজের ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, তিনি একটি গাভীর রূপ ধারণ করেছিলেন। যেহেতু কখনই গোহত্যা করা উচিত নয়, তাই মাতা ধরিত্রী বিচার করেছিলেন যে, পৃথু মহারাজের বাণ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য একটি গাভীর রূপ ধারণ করাই সমীচীন হবে। পৃথু মহারাজ কিন্তু সেই কথা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি গাভীরূপী পৃথিবীর পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত হননি।

শ্লোক ১৫

তামন্বধাবত্তদ্বৈণ্যঃ কুপিতোঽত্যরুণেক্ষণঃ ।
শরং ধনুষি সন্ধায় যত্র যত্র পলায়তে ॥ ১৫ ॥

তাম্—গাভীরূপী পৃথিবী; **অন্বধাবৎ**—পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; **তৎ**—তখন; **বৈণ্যঃ**—রাজা বেণের পুত্র; **কুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **অতি-অরুণ**—অত্যন্ত

রক্তিম; **ঈক্ষণঃ**—চক্ষু; **শরম্**—তীর; **ধনুষি**—ধনুকে; **সন্ধায়**—স্থাপন করে; **যত্র যত্র**—যে যে স্থানে; **পলায়তে**—পলায়ন করছিল।

অনুবাদ

তা দেখে মহারাজ পৃথু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর চক্ষু উদীয়মান সূর্যের মতো আরক্তিম হয়েছিল। তাঁর ধনুকে বাণ যোজন করে, তিনি সেই গাভীরূপী পৃথিবী যেখানেই পলায়ন করছিলেন, তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন।

শ্লোক ১৬

সা দিশো বিদিশো দেবী রোদসী চান্তরং তয়োঃ ।
ধাবন্তী তত্র তত্রৈনং দদর্শানূদ্যতায়ুধম্ ॥ ১৬ ॥

সা—গাভীরূপী পৃথিবী; **দিশঃ**—চতুর্দিকে; **বিদিশঃ**—অন্যান্য দিকে; **দেবী**—দেবী; **রোদসী**—অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর প্রতি; **চ**—ও; **অন্তরম্**—মধ্যে; **তয়োঃ**—তাদের; **ধাবন্তী**—ধাবিত হয়ে; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **এনম্**—রাজা; **দদর্শ**—দেখে; **অনু**—পশ্চাতে; **উদ্যত**—গ্রহণ করে; **আয়ুধম্**—অস্ত্র।

অনুবাদ

গোরূপী পৃথিবী দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে ইতস্তত পলায়ন করছিলেন, এবং যেখানেই তিনি যাচ্ছিলেন, মহারাজ পৃথু ধনুর্বাণ নিয়ে সেখানেই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন।

শ্লোক ১৭

লোকে নাবিন্দত ত্রাণং বৈণ্যান্মৃত্যোরিব প্রজাঃ ।
ত্রস্তা তদা নিববৃতে হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১৭ ॥

লোকে—ত্রিভুবনে; **ন**—না; **অবিন্দত**—লাভ করতে পারে; **ত্রাণম্**—পরিত্রাণ; **বৈণ্যাৎ**—বেণ রাজার পুত্রের হস্ত থেকে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু থেকে; **ইব**—সদৃশ; **প্রজাঃ**—মানুষ; **ত্রস্তা**—অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে; **তদা**—তখন; **নিববৃতে**—নিবৃত্ত হলেন; **হৃদয়েন**—হৃদয়ে; **বিদূয়তা**—অত্যন্ত দুঃখিত।

অনুবাদ

মানুষ যেমন নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পায় না, তেমনই গোরূপী পৃথিবী বেণপুত্র পৃথু মহারাজের হাত থেকে নিস্তারের কোন উপায় নেই দেখে, অবশেষে ভীত ও দুঃখিত চিত্তে তিনি পলায়ন-কার্য থেকে নিবৃত্ত হলেন।

শ্লোক ১৮

উবাচ চ মহাভাগং ধর্মজ্ঞাপন্নবৎসল ।
ত্রাহি মামপি ভূতানাং পালনেঽবস্থিতো ভবান্ ॥ ১৮ ॥

উবাচ—তিনি বললেন; **চ**—এবং; **মহা-ভাগম্**—সেই মহা সৌভাগ্যশালী রাজাকে; **ধর্ম-জ্ঞ**—হে ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা; **আপন্ন-বৎসল**—হে শরণাগতের আশ্রয়; **ত্রাহি**—রক্ষা করুন; **মাম্**—আমাকে; **অপি**—ও; **ভূতানাম্**—জীবদের; **পালনে**—রক্ষণকার্যে; **অবস্থিতঃ**—স্থিত; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

মহা ঐশ্বর্যশালী পৃথু মহারাজকে ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা এবং শরণাগত-বৎসল বলে সম্বোধন করে পৃথিবী বললেন—"আপনি সমস্ত জীবের রক্ষক। এখন আপনি এই লোকের রাজারূপে অবস্থিত হয়েছেন, সুতরাং দয়া করে আপনি আমাকেও রক্ষা করুন।"

তাৎপর্য

গাভীরূপী পৃথিবী পৃথু মহারাজকে *ধর্মজ্ঞ* বলে সম্বোধন করেছিলেন, যার অর্থ হচ্ছে যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত। ধর্মনীতি অনুসারে রাজা এবং অন্য সকলের কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রী, গাভী, শিশু, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। মাতা ধরিত্রী একটি গাভীর রূপ ধারণ করেছিলেন। তিনি একজন স্ত্রীও। তাই তিনি ধর্মজ্ঞ রাজার কাছে পরিত্রাণ লাভের জন্য আবেদন করেছিলেন। ধর্মনীতি অনুসারে, শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করা উচিত নয়। পৃথু মহারাজকে পৃথিবী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি কেবল ভগবানের অবতারই নন, তিনি পৃথিবীর রাজারূপেও অধিষ্ঠিত। তাই তাঁর কর্তব্য ছিল তাঁকে ক্ষমা করা।

শ্লোক ১৯

স ত্বং জিঘাংসসে কস্মাদ্দীনামকৃতকিল্বিষাম্ ।
অহনিষ্যৎকথং যোষাং ধর্মজ্ঞ ইতি যো মতঃ ॥ ১৯ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **ত্বম্**—আপনি; **জিঘাংসসে**—হত্যা করতে চান; **কস্মাৎ**—কেন; **দীনাম্**—দীন; **অকৃত**—যে করেনি; **কিল্বিষাম্**—কোন পাপকর্ম; **অহনিষ্যৎ**—হত্যা করবে; **কথম্**—কিভাবে; **যোষাম্**—একজন স্ত্রীকে; **ধর্ম-জ্ঞঃ**—ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা; **ইতি**—এইভাবে; **যঃ**—যিনি; **মতঃ**—বিবেচনা করা হয়।

অনুবাদ

গাভীরূপী পৃথিবী রাজার কাছে আবেদন করতে লাগলেন—"আমি অত্যন্ত দীন এবং আমি কোন পাপকর্ম করিনি। তা হলে কেন আপনি আমাকে হত্যা করতে চান? ধর্মজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কেন আপনি আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়েছেন, এবং কেন আপনি একজন অবলা রমণীকে এইভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন?

তাৎপর্য

পৃথিবী রাজার কাছে দুইভাবে আবেদন করেছিলেন। ধর্মজ্ঞ রাজার পক্ষে নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করা উচিত নয়। আর তা ছাড়া অবলা রমণী যদি পাপকর্ম করেও থাকে, তবুও তাকে হত্যা করা উচিত নয়। যেহেতু পৃথিবী ছিলেন নির্দোষ এবং একজন স্ত্রী, তাই তাঁকে হত্যা করা রাজার উচিত নয়।

শ্লোক ২০

প্রহরন্তি ন বৈ স্ত্রীষু কৃতাগঃস্বপি জন্তবঃ ।
কিমুত ত্বদ্বিধা রাজন্ করুণা দীনবৎসলাঃ ॥ ২০ ॥

প্রহরন্তি—প্রহার করা; **ন**—কখনই না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **স্ত্রীষু**—স্ত্রীলোকদের; **কৃত-আগঃসু**—পাপকর্ম করলেও; **অপি**—যদিও; **জন্তবঃ**—মানুষ; **কিম্ উত**—আর কি কথা; **ত্বৎ-বিধাঃ**—আপনার মতো; **রাজন্**—হে রাজন্; **করুণাঃ**—দয়ালু; **দীন-বৎসলাঃ**—দীনজনদের প্রতি স্নেহশীল।

অনুবাদ

হে রাজন্! কোন স্ত্রীলোক যদি অপরাধ করে, তা হলেও মানুষ তাকে প্রহার করে না, অতএব আপনার মতো দয়ালু, প্রজারক্ষক ও দীনবৎসল রাজার আর কি কথা।

শ্লোক ২১

মাং বিপাট্যাজরাং নাবং যত্র বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
আত্মানং চ প্রজাশ্চেমাঃ কথমম্ভসি ধাস্যসি ॥ ২১ ॥

মাম্—আমাকে; **বিপাট্য**—খণ্ড খণ্ড করে; **অজরাম্**—অত্যন্ত দৃঢ়; **নাবম্**—তরণী; **যত্র**—যেখানে; **বিশ্বম্**—সারা জগতের সমস্ত সামগ্রী; **প্রতিষ্ঠিতম্**—অবস্থিত; **আত্মানম্**—আপনি; **চ**—এবং; **প্রজাঃ**—আপনার প্রজারা; **চ**—ও; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **কথম্**—কিভাবে; **অম্ভসি**—জলে; **ধাস্যসি**—ধারণ করবেন।

অনুবাদ

গাভীরূপী ধরিত্রী বলতে লাগলেন—হে রাজন্! আমি একটি সুদৃঢ় তরণীর মতো, এবং সমগ্র বিশ্ব আমাতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আপনি যদি আমাকে বিদীর্ণ করেন, তা হলে আপনি কিভাবে নিজেকে এবং আপনার প্রজাদের নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন?

তাৎপর্য

চতুর্দশ ভুবনের তলদেশে রয়েছে গর্ভ উদক। সেই গর্ভ উদকে বিষ্ণু শায়িত, এবং তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্মের নাল উত্থিত হয়েছে, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহ লোক সেই কমলনালের আশ্রয়ে অন্তরীক্ষে ভাসছে। কোন গ্রহলোক যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে তা গর্ভ উদকে পতিত হবে। তাই পৃথু মহারাজকে পৃথিবী সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, তাঁকে ধ্বংস করে তাঁর কোন লাভ হবে না। তা হলে তিনি কিভাবে নিজেকে এবং তাঁর প্রজাদের গর্ভ উদকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন? পক্ষান্তরে বলা যায় যে, অন্তরীক্ষে একটি বায়ুর সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এবং সমুদ্রে যেভাবে নৌকা অথবা দ্বীপ ভাসে, ঠিক সেইভাবে প্রতিটি গ্রহ ভাসছে। কখনও কখনও গ্রহগুলিকে দ্বীপ বলা হয়, এবং কখনও কখনও তরণী বলা হয়। এইভাবে গাভীরূপী পৃথিবী আংশিকভাবে এই জগতের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২২

পৃথুরুবাচ

বসুধে ত্বাং বধিষ্যামি মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্ ।
ভাগং বর্হিষি যা বৃঙ্ক্তে ন তনোতি চ নো বসু ॥ ২২ ॥

পৃথুঃ উবাচ—পৃথু মহারাজ উত্তর দিলেন; **বসু-ধে**—হে বসুন্ধরা; **ত্বাম্**—তোমাকে; **বধিষ্যামি**—বধ করব; **মৎ**—আমার; **শাসন**—শাসন; **পরাক্-মুখীম্**—অবজ্ঞাকারী; **ভাগম্**—তোমার অংশ; **বর্হিষি**—যজ্ঞে; **যা**—যে; **বৃঙ্‌ক্তে**—গ্রহণ করে; **ন**—না; **তনোতি**—প্রদান করে; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের; **বসু**—উৎপাদন।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ ধরিত্রীকে বললেন—হে বসুন্ধরে! তুমি আমার আদেশ ও শাসন অবজ্ঞা করেছ। দেবতারূপে তুমি আমাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছ, কিন্তু তার বিনিময়ে তুমি যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করনি। সেই কারণে আমি তোমাকে অবশ্যই বধ করব।

তাৎপর্য

গাভীরূপী পৃথিবী বলেছিলেন যে, তিনি কেবল একজন স্ত্রীই নন, তিনি নির্দোষ ও নিষ্পাপ, এবং তাই তাঁকে হত্যা করা উচিত নয়। আর তিনি এই ইঙ্গিতও করেছিলেন যে, রাজা যেহেতু যথার্থই ধর্মপরায়ণ তাই তাঁর পক্ষে ধর্মনীতি লঙ্ঘন করে স্ত্রীহত্যা করা উচিত হবে না। তার উত্তরে মহারাজ পৃথু তাঁকে বলেছিলেন যে, প্রথমে তিনি তাঁর আদেশ অবজ্ঞা করেছেন। সেটি ছিল তাঁর প্রথম পাপকর্ম। দ্বিতীয়ত, তিনি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছেন অথচ তার বিনিময়ে যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করেননি।

শ্লোক ২৩

যবসং জগ্ধ্যনুদিনং নৈব দোগ্ধ্যৌধসং পয়ঃ ।
তস্যামেবং হি দুষ্টায়াং দণ্ডো নাত্র ন শস্যতে ॥ ২৩ ॥

যবসম্—সবুজ ঘাস; **জগ্ধি**—তুমি আহার কর; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দোগ্ধি**—উৎপাদন কর; **ঔধসম্**—দুধের থলিতে; **পয়ঃ**—দুধ; **তস্যাম্**—গাভী যখন; **এবম্**—এইভাবে; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **দুষ্টায়াম্**—দুষ্টের; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **ন**—না; **অত্র**—এখানে; **ন**—না; **শস্যতে**—যুক্তিসঙ্গত।

অনুবাদ

যদিও তুমি প্রতিদিন তৃণ ভক্ষণ কর, তবুও তুমি আমাদের উপযোগের জন্য তোমার দুধের থলি পূর্ণ করছ না। যেহেতু তুমি জেনে-শুনে এই অপরাধ করছ,

তাই তুমি বলতে পার না যে, গাভীরূপ ধারণ করেছ বলে, তোমাকে দণ্ডদান করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

গোচারণ ভূমিতে গাভী তৃণ ভক্ষণ করে এবং তার দুধের থলি দুধে পূর্ণ করে, যাতে গোয়ালারা তার দুধ দোহন করতে পারে। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, যাতে প্রচুর মেঘ হয় এবং পৃথিবীর উপর বৃষ্টি হয়। *পয়ঃ* শব্দটি দুধ এবং জল, দুই-ই বোঝায়। এক দেবতারূপে পৃথিবী তাঁর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি সবুজ ঘাস ভক্ষণ করছিলেন কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎ-পাদন করছিলেন না, অর্থাৎ তিনি তাঁর দুধের থলি দুধে পূর্ণ কবছিলেন না। তাই পৃথু মহারাজ যে, তাঁকে দণ্ডদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তা ন্যায়সঙ্গত ছিল।

শ্লোক ২৪

ত্বং খল্বোষধিবীজানি প্রাক্ সৃষ্টানি স্বয়ম্ভুবা ।
ন মুঞ্চস্যাত্মরুদ্ধানি মামবজ্ঞায় মন্দধীঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বম্—তুমি; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **ওষধি**—শস্য এবং ঔষধি; **বীজানি**—বীজ; **প্রাক্**—পূর্বে; **সৃষ্টানি**—সৃষ্ট; **স্বয়ম্ভুবা**—ব্রহ্মার দ্বারা; ন—করে না; **মুঞ্চসি**—প্রদান করা; **আত্ম-রুদ্ধানি**—নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ; **মাম্**—আমাকে; **অবজ্ঞায়**—অবমাননা করে; **মন্দ-ধীঃ**—মন্দবুদ্ধি।

অনুবাদ

তুমি এতই মন্দবুদ্ধি যে, পুরাকালে ব্রহ্মা যে-সমস্ত ওষধি ও শস্যের বীজ সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলি তুমি নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ, এবং আমার আদেশ সত্ত্বেও তুমি সেগুলি প্রদান করছ না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে গ্রহলোকসমূহ সৃষ্টি করছিলেন, তখন তিনি বিভিন্ন প্রকার শস্য, ওষধি, গুল্ম ও বৃক্ষের বীজও সৃষ্টি কবেছিলেন। মেঘ থেকে যখন যথেষ্ট পরিমাণ বারি বর্ষণ হয়, তখন সেই সমস্ত বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে ফল, শস্য, শাকসবজি ইত্যাদি উৎপাদন করে। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা পৃথু মহাবাজ ইঙ্গিত করেছিলেন যে, যখনই খাদ্যশস্য উৎপাদনের অভাব হয়, তখন রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে উৎপাদন কেন বন্ধ হয়েছে এবং কিভাবে সেই পরিস্থিতি সংশোধন করা যায় তার ব্যবস্থা করা।

শ্লোক ২৫

অমূষাং ক্ষুৎপরীতানামার্তানাং পরিদেবিতম্ ।
শময়িষ্যামি মদ্বাণৈর্ভিন্নায়াস্তব মেদসা ॥ ২৫ ॥

অমূষাম্—তাদের সকলের; **ক্ষুৎ-পরীতানাম্**—ক্ষুধাতুর; **আর্তানাম্**—পীড়িতদের; **পরিদেবিতম্**—বিলাপ; **শময়িষ্যামি**—আমি শান্ত করব; **মৎ-বাণৈঃ**—আমার বাণের দ্বারা; **ভিন্নায়াঃ**—খণ্ড খণ্ড করে কেটে; **তব**—তোমার; **মেদসা**—মাংসের দ্বারা

অনুবাদ

আমার বাণের দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে, তোমার মাংসের দ্বারা আমি আমার রাজ্যের এই সমস্ত ক্ষুধাতুর প্রজাদের আর্তনাদ শান্ত করব।

তাৎপর্য

সরকার যে কিভাবে গোমাংস আহারের ব্যবস্থা করতে পারে, তার কিছু ইঙ্গিত আমরা এখানে পাই। এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, কোন বিরল পরিস্থিতিতে, যখন খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড অভাব হয়, তখন মাংস আহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পাবে। কিন্তু যখন যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য থাকে, তখন কেবল অসংযত জিহ্বার তৃপ্তিসাধনের জন্য গোমাংস আহারের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেবল অত্যন্ত বিরল পরিস্থিতিতে, যখন মানুষ শস্যের অভাবে পীড়িত হয়, তখন মাংস আহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়। জিহ্বার তৃপ্তিসাধনের জন্য কসাইখানায় অনর্থক পশুহত্যা সরকারের পক্ষে কখনই অনুমোদন করা উচিত নয়।

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গাভী এবং অন্যান্য পশুদের আহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তৃণ প্রদান করা উচিত। পর্যাপ্ত পরিমাণে তৃণ দেওয়া সত্ত্বেও গাভী যদি দুধ না দেয়, এবং যদি প্রচণ্ডভাবে খাদ্যাভাব হয়, তা হলে দুগ্ধ উৎপাদনে অক্ষম গাভীদের ক্ষুধার্ত জনগণের আহারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আবশ্যকতার নিয়মানুসারে, মানব-সমাজের প্রথমে খাদ্যশস্য এবং শাকসবজি উৎপাদন করার চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু তাতে যদি তারা অক্ষম হয়, তা হলে তারা মাংস আহার করতে পারে। অন্যথায় নয়। বর্তমান মানব-সমাজের যে অবস্থা, তাতে সারা পৃথিবী জুড়ে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন হচ্ছে। তাই পশুহত্যার জন্য কসাইখানা খোলা কখনও সমর্থন করা যেতে পারে না। কোন

কোন রাষ্ট্রে এত অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন হয় যে, তা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, এবং কখনও কখনও সরকার অতিরিক্ত শস্য উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে অর্থাৎ জনসাধারণের আহারের জন্য পৃথিবী পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদন করে, কিন্তু বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা এবং লাভের আশায় সেই শস্য বিতরণ ব্যাহত হয়। তার ফলে কোন কোন স্থানে খাদ্যের অভাব হয় এবং অন্য কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। সারা পৃথিবী জুড়ে যদি একটি সরকার থাকে, তা হলে খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যেতে পারে, এবং তার ফলে অভাবের কোন প্রশ্নই উঠবে না। তখন আর কসাইখানা খোলার কোন প্রয়োজন হবে না, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মিথ্যা প্রচারের কোন প্রয়োজন থাকবে না।

শ্লোক ২৬

পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোঽধমঃ ।
ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ ॥ ২৬ ॥

পুমান্—মানুষ; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **উত**—ও; **ক্লীবঃ**—নপুংসক; **আত্ম-সম্ভাবনঃ**—নিজের ভরণ-পোষণে আগ্রহী; **অধমঃ**—মানব-সমাজের সব চাইতে নিকৃষ্ট; **ভূতেষু**—অন্য জীবদের; **নিরনুক্রোশঃ**—দয়ারহিত; **নৃপাণাম্**—রাজাদের জন্য; **তৎ**—তার; **বধঃ**—বধ কবা; **অবধঃ**—বধ না করার মতো।

অনুবাদ

যে নিষ্ঠুর ব্যক্তি—তা সে পুরুষ হোক, স্ত্রী হোক অথবা ক্লীব হোক—সে যদি কেবল নিজের ভরণ-পোষণের ব্যাপারেই আগ্রহী হয় এবং অন্য জীবদের প্রতি দয়া প্রদর্শন না করে, তা হলে রাজা তাকে বধ করতে পারে। এই প্রকার বধ প্রকৃত বধ বলে মনে করা হয় না।

তাৎপর্য

পৃথিবী তাঁর স্বরূপে স্ত্রীরূপিণী, এবং তাই তাঁর রাজার সংরক্ষণের আবশ্যকতা হয়। কিন্তু পৃথু মহারাজ যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, রাজ্যের কোন নাগরিক, তা তিনি পুরুষ হোন, স্ত্রী হোন অথবা ক্লীব হোন, যদি তার সঙ্গীদের প্রতি দয়াপরবশ না হয়, তা হলে তাকে রাজা হত্যা করতে পারেন, এবং এই প্রকার হত্যাকে প্রকৃতপক্ষে হত্যা বলে মনে করা হয় না। পারমার্থিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে, ভক্ত যদি আত্মতৃপ্ত

হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার না করে, তা হলে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ভক্ত বলে বিবেচনা করা হয় না। যে ভক্ত ভগবানের বাণী প্রচার করার চেষ্টা করেন, যিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও সরল ব্যক্তিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তিনি উন্নত স্তরের ভক্ত। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নন; পক্ষান্তরে, এই জড় জগতের সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার না করা পর্যন্ত, তিনি মুক্তি লাভ করতে চান না। জড়-জাগতিক স্তরেও, কোন মানুষ যদি অন্যের কল্যাণ-সাধনে আগ্রহী না হয়, তা হলে ভগবান অথবা পৃথু মহারাজের মতো ভগবানের অবতার তাকে নিন্দনীয় বলে বিবেচনা করেন।

শ্লোক ২৭

ত্বাং স্তব্ধাং দুর্মদাং নীত্বা মায়াগাং তিলশঃ শরৈঃ।
আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥ ২৭ ॥

ত্বাম্—তুমি; **স্তব্ধাম্**—অত্যন্ত গর্বিত; **দুর্মদাম্**—উন্মত্ত; **নীত্বা**—এই অবস্থায় নিয়ে গিয়ে; **মায়া-গাম্**—ছদ্মগাভী; **তিলশঃ**—তিলের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে; **শরৈঃ**—বাণের দ্বারা; **আত্ম**—আমি নিজেই; **যোগ-বলেন**—যোগ শক্তির দ্বারা; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **ধারয়িষ্যামি**—ধারণ করব; **অহম্**—আমি; **প্রজাঃ**—সমস্ত প্রজাদের, বা সমস্ত জীবদের।

অনুবাদ

তুমি অত্যন্ত গর্বোদ্ধত ও উন্মত্ত হয়েছ। এখন তুমি তোমার যোগশক্তির প্রভাবে গাভীরূপ ধারণ করেছ, কিন্তু তা হলেও আমি আমার বাণের দ্বারা তোমাকে তিল তিল করে খণ্ডবিখণ্ড করব, এবং তার পর আমার যোগশক্তির প্রভাবে আমি নিজেই এই সমস্ত প্রজাদের ধারণ করব।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজকে পৃথিবী বলেছিলেন যে তাঁকে যদি বিনাশ করা হয়, তা হলে তিনি এবং তাঁর প্রজারা সকলেই গর্ভ সমুদ্রে পতিত হবেন। তার উত্তর পৃথু মহারাজ এখন দিচ্ছেন। পৃথিবী যদিও রাজা কর্তৃক নিহত হওয়ার ভয়ে, তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে গাভীরূপ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু রাজা সেই বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং

তাঁকে তিল তিল করে খণ্ডবিখণ্ড করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রজাদের বিনাশের ব্যাপারে, পৃথু মহারাজ তাঁর নিজের যোগশক্তির দ্বারা তাদের সকলকে ধারণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। পৃথিবীর থেকে কোন রকম সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। ভগবান বিষ্ণুর অবতার পৃথু মহারাজ সঙ্কর্ষণের শক্তিসমন্বিত ছিলেন, যাকে বৈজ্ঞানিকেরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে। ভগবান কোন রকম অবলম্বন ছাড়াই মহাশূন্যে কোটি কোটি গ্রহ ধারণ করেছেন; তেমনই, পৃথু মহারাজের পক্ষেও পৃথিবীর সহায়তা ব্যতীতই তাঁর সমস্ত নাগরিকদের এবং নিজেকে অন্তরীক্ষে ধারণ করতে কোন অসুবিধাই হত না। ভগবানের একটি নাম হচ্ছে যোগেশ্বর, অর্থাৎ তিনি সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর। এইভাবে পৃথু মহারাজ পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর সহায়তা ব্যতীত তাঁরা কিভাবে অবস্থান করবেন, সেই সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ২৮

এবং মন্যুময়ীং মূর্তিং কৃতান্তমিব বিভ্রতম্ ।
প্রণতা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ মহী সঞ্জাতবেপথুঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **মন্যু-ময়ীম্**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **মূর্তিম্**—রূপ; **কৃত-অন্তম্**—মূর্তিমান মৃত্যু, যমরাজ; **ইব**—সদৃশ; **বিভ্রতম্**—সমন্বিত; **প্রণতা**—শরণাগত; **প্রাঞ্জলিঃ**—বদ্ধাঞ্জলি; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **মহী**—পৃথিবী; **সঞ্জাত**—উত্থিত, উদ্ভূত হয়েছিল; **বেপথুঃ**—কম্পিত কলেবর।

অনুবাদ

তখন সাক্ষাৎ যমরাজ-সদৃশ পৃথু মহারাজ ক্রোধময়ী মূর্তি ধারণ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যেন তখন মূর্তিমান ক্রোধরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। তাঁর বাক্য শ্রবণ করে পৃথিবী ভয়ে কম্পমানা হয়েছিলেন। বদ্ধাঞ্জলি সহকারে পৃথু মহারাজকে প্রণতি নিবেদন করে, ধরিত্রী বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান দুষ্টদের কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ এবং ভক্তদের কাছে পরম প্রিয়তম। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৩৪) ভগবান বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—'আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু।" শ্রদ্ধাহীন নাস্তিকেরা, যারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাদের কাছে মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয়ে, ভগবান তাদের উদ্ধার করবেন। যেমন হিরণ্যকশিপু ভগবানের আধিপত্য অস্বীকার করেছিল, এবং ভগবান নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে,

তাকে সংহার করেছিলেন। তেমনই পৃথু মহারাজকে ধরিত্রী সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি তাঁকে মূর্তিমান ক্রোধরূপে দর্শন করেছিলেন। তাই তিনি ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিলেন। কোন অবস্থাতে কেউই ভগবানের আধিপত্য অস্বীকার করতে পারে না। তাই তাঁর শরণাগত হয়ে, সর্ব অবস্থাতে তাঁর সংরক্ষণ প্রাপ্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর।

শ্লোক ২৯

ধরোবাচ

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় মায়য়া
বিন্যস্তনানাতনবে গুণাত্মনে ।
নমঃ স্বরূপানুভবেন নির্ধুত-
দ্রব্যক্রিয়াকারকবিভ্রমোর্ময়ে ॥ ২৯ ॥

ধরা—পৃথিবী; **উবাচ**—বলেছিলেন; **নমঃ**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **পরস্মৈ**—পরতত্ত্বকে; **পুরুষায়**—পুরুষকে; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **বিন্যস্ত**—বিস্তার করে; **নানা**—বিবিধ; **তনবে**—রূপ; **গুণ-আত্মনে**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের উৎসকে; **নমঃ**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **স্ব-রূপ**—প্রকৃত রূপেব; **অনুভবেন**—হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা; **নির্ধুত**—প্রভাবিত না হয়ে; **দ্রব্য**—দ্রব্য; **ক্রিয়া**—ক্রিয়া; **কারক**—কর্তা; **বিভ্রম**—ভ্রম; **উর্ময়ে**—ভব-সাগরের তরঙ্গ।

অনুবাদ

ধরিত্রী বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান! হে প্রভু! আপনার স্থিতি দিব্য, এবং আপনি আপনার মায়ার দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বহুরূপে এবং বহু যোনিতে বিস্তার করেছেন। আপনি সর্বদা দিব্য স্থিতিতে অবস্থিত এবং বিবিধ জড়-জাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন জড় সৃষ্টির দ্বারা আপনি প্রভাবিত হন না। তার ফলে আপনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মোহগ্রস্ত হন না।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ যখন তাঁর রাজকীয় আদেশ পৃথিবীকে প্রদান করেছিলেন, তখন পৃথিবী বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। তার ফলে রাজা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছুই জানতেন। তাই পৃথিবীর

পক্ষে তাঁকে প্রতারণা করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। পৃথিবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তিনি সমস্ত ওষধি ও শস্যের বীজ লুকিয়ে রেখেছেন, এবং তাই কিভাবে সেই সমস্ত বীজ পুনরায় প্রকাশ করা যায়, তা তিনি বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছিলেন। পৃথিবী জানতেন যে, রাজা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যদি তিনি তাঁর সেই ক্রোধ শান্ত না করেন, তা হলে তাঁর কাছে কোন রকম সার্থক কার্যক্রম উপস্থাপন করার সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁর প্রস্তাবের শুরুতে, তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজেকে ভগবানের শরীরের বিভিন্ন অংশ বলে স্বীকার করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, জড় জগতের যত রূপ প্রকট হয়েছে, তা সবই ভগবানের বিরাটরূপের অংশ। বলা হয় যে, নিম্নতর লোকসমূহ ভগবানের পায়ের অংশ, আর উচ্চতর লোকগুলি ভগবানের মস্তকের অংশ। ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা, কিন্তু এই বহিরঙ্গা শক্তি একদিক দিয়ে তাঁর থেকে অভিন্ন। তবুও ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিতে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত নন, কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁর চিৎ-শক্তিতে অবস্থিত। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) যে-সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ*—জড়া প্রকৃতি ভগবানের পরিচালনায় কার্য করছে। তাই ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রতি আসক্ত নন, এবং এই শ্লোকে তাঁকে *গুণাত্মা* বা প্রকৃতির তিন গুণের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ*—ভগবান যদিও তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রতি আসক্ত নন, তবুও তিনি তাঁর প্রভু। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব* অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ধরিত্রী বলেছেন যে, ভগবান যদিও জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত তবুও তিনি *নির্ধুত*, অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ থেকে মুক্ত। ভগবান সর্বদা তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত। তাই এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে *স্বরূপ-অনুভবেন*। ভগবান সম্পূর্ণরূপে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা উভয় শক্তি সম্পর্কেই সম্পূর্ণরূপে অবগত, ঠিক যেমন তাঁর ভক্ত তাঁর জড় দেহের প্রতি অনাসক্ত থেকেও সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে, চিন্ময় স্তরে সর্বদা বিরাজ করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, যে-ভক্ত ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত, তিনি তাঁর জড় অবস্থা নির্বিশেষে সর্বতোভাবে মুক্ত। ভক্তের পক্ষে যদি এইভাবে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হওয়া সম্ভব হয়, তা হলে ভগবানের পক্ষে নিশ্চয়ই বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি আসক্ত না হয়ে, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান করা সম্ভব। এই কথা বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। ভক্ত যেমন কখনও তাঁর জড় দেহের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন

হন না, ভগবানও তেমন এই জড় জগতের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হন না। ভক্ত যেমন এই জড় দেহে অবস্থান করা সত্ত্বেও সেই দেহের দ্বারা প্রভাবিত হন না। এই জড় দেহ নানা রকম ভৌতিক অবস্থার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যেমন দেহে পাঁচ প্রকার বায়ু কার্য করছে, এবং হাত, পা, জিহ্বা, উপস্থ, পায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করছে, তবুও আত্মা বা জীব, যিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, তিনি সর্বদা কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করছেন, এবং তাঁর দেহের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার। তেমনই ভগবান যদিও এই জড় জগতের সঙ্গে যুক্ত, তবুও তিনি সর্বদা তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত এবং জড় জগতের কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত। জড় দেহের ছয়টি বৃত্তি রয়েছে, যথা—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু। মুক্ত জীব কখনও এই ছয়টি ভৌতিক মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত শক্তির সর্বশক্তিমান অধীশ্বর হওয়ার ফলে, এই বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তিনি সর্বদাই এই জড় জগতের বহিরঙ্গা শক্তির মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

শ্লোক ৩০

যেনাহমাত্মায়তনং বিনির্মিতা
ধাত্রা যতোঽয়ং গুণসর্গসংগ্রহঃ ।
স এব মাং হন্তুমুদায়ুধঃ স্বরা-
ডুপস্থিতোঽন্যং শরণং কমাশ্রয়ে ॥ ৩০ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা; **অহম্**—আমি; **আত্ম-আয়তনম্**—সমস্ত জীবের আশ্রয়; **বিনির্মিতা**—নির্মিত হয়েছে; **ধাত্রা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **যতঃ**—যাঁর কারণে; **অয়ম্**—এই; **গুণ-সর্গ-সংগ্রহঃ**—বিভিন্ন জড় উপাদানের সমন্বয়; **সঃ**—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মাম্**—আমাকে; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **উদায়ুধঃ**—অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়েছেন; **স্বরাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **উপস্থিতঃ**—আমার সম্মুখে উপস্থিত; **অন্যম্**—অন্য; **শরণম্**—আশ্রয়; **কম্**—কাকে; **আশ্রয়ে**—আমি শরণ গ্রহণ করব।

অনুবাদ

ধরিত্রী বললেন—হে ভগবান! আপনি জড় সৃষ্টির পূর্ণ পরিচালক। আপনি এই জড় জগৎ ও প্রকৃতির তিনটি গুণ উৎপন্ন করেছেন, এবং তাই আপনি সমস্ত

জীবের আশ্রয়স্থল-স্বরূপ পৃথিবীরূপে আমাকেও সৃষ্টি করেছেন। তবুও হে প্রভু, আপনি সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এখন আপনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আপনার অস্ত্র উদ্যত করে আমাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন আমি আর কার শরণ গ্রহণ করব।

তাৎপর্য

এখানে পৃথিবী ভগবানের কাছে পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণের লক্ষণ প্রদর্শন করেছেন বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন কাউকে হত্যা করতে প্রস্তুত হন, তখন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না, এবং কৃষ্ণ যাকে রক্ষা করেন, তাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। ভগবান যেহেতু পৃথিবীকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারত না। আমরা সকলেই ভগবানের সংরক্ষণে রয়েছি, তাই আমাদের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শরণাগত হওয়া। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬৬) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্ব প্রকার ধর্ম ত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে রক্ষা করব। ভয় করো না।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

"মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর ।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর ॥
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে ।
দায় মম গেলা, তুয়া ও-পদ বরণে ॥
মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা ।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ॥"

শ্লোক ৩১

য এতদাদাবসৃজচ্চরাচরং
স্বমায়য়াত্মাশ্রয়য়াবিতর্ক্যয়া ।
তয়ৈব সোহয়ং কিল গোপ্তুমুদ্যতঃ
কথং নু মাং ধর্মপরো জিঘাংসতি ॥ ৩১ ॥

যঃ—যে; **এতৎ**—এই সমস্ত; **আদৌ**—সৃষ্টির শুরুতে; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **চর-অচরম্**—স্থাবর ও জঙ্গম জীবদের; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা; **আত্ম-আশ্রয়য়া**—তাঁর আশ্রয়ে আশ্রিত; **অবিতর্ক্যয়া**—অচিন্ত্য; **তয়া**—সেই মায়ার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সঃ**—তিনি; **অয়ম্**—এই রাজা; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **গোপ্তুম্ উদ্যতঃ**—রক্ষা করতে প্রস্তুত; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—তা হলে; **মাম্**—আমাকে; **ধর্ম-পরঃ**—নিষ্ঠাপূর্বক ধর্মপরায়ণ; **জিঘাংসতি**—সংহার করতে ইচ্ছা করেন।

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনি আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই শক্তির দ্বারা এখন আপনি জীবদের রক্ষা করতে প্রস্তুত। আপনিই ধর্মের পরম রক্ষক। তা হলে কেন আমি গাভীরূপ ধারণ করা সত্ত্বেও আমাকে সংহার করতে আপনি ইচ্ছা করছেন?

তাৎপর্য

পৃথিবী যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি যে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সংহারও করতে পারেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবী প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবান যেহেতু সকলকে রক্ষা করতে উদ্যত, তখন কেন তিনি তাঁকে হত্যা করতে চাইছেন। বস্তুত, পৃথিবী সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল, এবং পৃথিবীই তাদের জন্য খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে।

শ্লোক ৩২

নূনং বতেশস্য সমীহিতং জনৈ-
স্তন্মায়য়া দুর্জয়য়াকৃতাত্মভিঃ ।
ন লক্ষ্যতে যস্ত্বকরোদকারয়দ্-
যোঽনেক একঃ পরতশ্চ ঈশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥

নূনম্—অবশ্যই; **বত**—নিশ্চিতভাবে; **ঈশস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সমীহিতম্**—কার্যকলাপ, পরিকল্পনা; **জনৈঃ**—মানুষদের দ্বারা; **তৎ-মায়য়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **দুর্জয়য়া**—অজেয়; **অকৃত-আত্মভিঃ**—যারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন নয়; **ন**—কখনই না; **লক্ষ্যতে**—দেখা যায়; **যঃ**—যে; **তু**—তখন; **অকরোৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **অকারয়ৎ**—সৃষ্টি করিয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি; **অনেকঃ**—বহু; **একঃ**—এক; **পরতঃ**—তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে ভগবান! যদিও আপনি এক, তবুও আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা আপনি নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেছেন। ব্রহ্মার মাধ্যমে আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাই আপনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। যারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন নয়, তারা আপনার চিন্ময় কার্যকলাপ বুঝতে পারে না, কারণ তারা আপনার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন।

তাৎপর্য

ভগবান এক, কিন্তু তিনি নিজেকে বহু শক্তিতে বিস্তার করেছেন—বহিরঙ্গা শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থা শক্তি ইত্যাদি। ভগবান যে কিভাবে তাঁর বিবিধ শক্তির মাধ্যমে কার্য করেন, ভগবানের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত না হলে, তা বোঝা সম্ভব নয়। জীবও হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি। ব্রহ্মাও একজন জীব, কিন্তু ভগবান তাঁকে বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন। যদিও ব্রহ্মাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বলে মনে করা হয়, কিন্তু পরম স্রষ্টা হচ্ছেন ভগবান। এই শ্লোকে *মায়য়া* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। মায়া মানে হচ্ছে শক্তি। ব্রহ্মা শক্তিমান নন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের তটস্থা শক্তির একটি প্রকাশ। পক্ষান্তরে বলা যায়, ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবানের ক্রীড়নক। যদিও কখনও কখনও ভগবানের পরিকল্পনা আপাত-বিরোধী বলে মনে হয়, কিন্তু তাঁর প্রতিটি কর্মের পিছনে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। যিনি অভিজ্ঞ এবং ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত, তিনিই বুঝতে পারেন কিভাবে ভগবানের পরম পরিকল্পনা অনুসারে সব কিছু সাধিত হচ্ছে।

শ্লোক ৩৩

সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
র্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধনিরুদ্ধশক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥ ৩৩ ॥

সর্গ-আদি—সৃষ্টি, পালন ও সংহার; **যঃ**—যিনি; **অস্য**—এই জড় জগতের; **অনুরুণদ্ধি**—করেন; **শক্তিভিঃ**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **দ্রব্য**—ভৌতিক উপাদানসমূহ; **ক্রিয়া**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **কারক**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ; **চেতনা**—বুদ্ধি; **আত্মভিঃ**—অহঙ্কার সহ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সমুন্নদ্ধ**—প্রকাশিত; **নিরুদ্ধ**—নিহিত; **শক্তয়ে**—যিনি

এই সমস্ত শক্তির অধিকারি; **নমঃ**—প্রণতি; **পরস্মৈ**—পরম; **পুরুষায়**—পুরুষকে; **বেধসে**—সর্ব কারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা আপনি সমস্ত জড় উপাদানের, ইন্দ্রিয়সমূহের, নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের, বুদ্ধির, অহঙ্কারের এবং অন্য সব কিছুর আদি কারণ। আপনার শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। আপনার শক্তির প্রভাবেই কেবল সব কিছু কখনও প্রকাশিত হয় এবং কখনও অপ্রকাশিত হয়। তাই আপনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সমস্ত কার্যকলাপ শুরু হয় সম্পূর্ণ শক্তি বা মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি থেকে। তার পর, প্রকৃতির তিন গুণ ক্ষোভিত হওয়ার ফলে, ভৌতিক উপাদান, চিত্ত, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের সৃষ্টি হয়। এই সব কিছুই একে একে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয়। আধুনিক যুগে একজন যন্ত্রশিল্পী বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে একটি যন্ত্রকে চালিত করতে পারে, যার ফলে সেই যন্ত্রে একের পর এক বিবিধ ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যখন সৃষ্টির বোতাম টেপেন, তখন সৃষ্টিশক্তির বিভিন্ন উপাদান ও তাদের নিয়ন্তাদের উৎপত্তি হয়, এবং ভগবানের অচিন্ত্য পরিকল্পনার ফলে, সেই সব শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ক্রিয়া করে।

শ্লোক ৩৪

স বৈ ভবানাত্মবিনির্মিতং জগদ্
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মকং বিভো ।
সংস্থাপয়িষ্যন্নজ মাং রসাতলা-
দভ্যুজ্জহারাম্ভস আদিসূকরঃ ॥ ৩৪ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভবান্**—আপনি স্বয়ং; **আত্ম**—নিজের দ্বারা; **বিনির্মিতম্**—নির্মাণ করেছেন; **জগৎ**—এই জগৎ; **ভূত**—ভৌতিক উপাদানসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অন্তঃ-করণ**—মন, হৃদয়; **আত্মকম্**—সমন্বিত; **বিভো**—হে ভগবান; **সংস্থাপয়িষ্যন্**—পালন করে; **অজ**—হে জন্মরহিত; **মাম্**—আমাকে;

রসাতলাৎ—রসাতল থেকে; **অভ্যুজ্জহার**—উত্তোলন করেছিলেন; **অন্তসঃ**—জল থেকে; **আদি**—আদি; **সূকরঃ**—বরাহ।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অজ। এক সময় আপনি বরাহরূপে ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগে রসাতল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। আপনার স্বীয় শক্তির প্রভাবে এই জগৎকে পালন করার জন্য, আপনি সমস্ত ভৌতিক উপাদান, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

এটি সেই সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যখন শ্রীকৃষ্ণ বরাহরূপে আবির্ভূত হয়ে, রসাতল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। অসুর হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে তার কক্ষচ্যুত করে গর্ভোদক সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করেছিল, তখন ভগবান আদি বরাহরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

অপামুপস্থে ময়ি নাব্যবস্থিতাঃ
প্রজা ভবানদ্য রিরক্ষিষুঃ কিল ।
স বীরমূর্তিঃ সমভূদ্ধরাধরো
যো মাং পয়স্যুগ্রশরো জিঘাংসসি ॥ ৩৫ ॥

অপাম্—জলের; **উপস্থে**—উপরে অবস্থিত; **ময়ি**—আমাতে, **নাবি**—নৌকায়; **অবস্থিতাঃ**—অবস্থিত; **প্রজাঃ**—জীব; **ভবান্**—আপনি; **অদ্য**—এখন; **রিরক্ষিষুঃ**—রক্ষা করার বাসনায়; **কিল**—বাস্তবিকপক্ষে; **সঃ**—তিনি, **বীর-মূর্তিঃ**—মহান বীররূপে, **সমভূৎ**—হয়েছিলেন, **ধরা-ধরঃ**—পৃথিবী ধারণকারী; **যঃ**—যিনি; **মাম্**—আমাকে; **পয়সি**—দুধের জন্য; **উগ্র-শরঃ**—তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা; **জিঘাংসসি**—আপনি হত্যা করতে চান।

অনুবাদ

হে ভগবান! এইভাবে এক সময় আপনি জল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, এবং তাই আপনি ধরাধর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এখন একজন মহাবীররূপে আপনার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আপনি আমাকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু আমি তো কেবল জলের উপর একটি নৌকার মতো সব কিছু ভাসিয়ে রেখেছি।

তাৎপর্য

ভগবান ধরাধর নামে বিখ্যাত, যার অর্থ হচ্ছে "যিনি বরাহ অবতারে তাঁর দশনশিখরে ধরণীকে ধারণ করেছিলেন।" তাই গাভীরূপী পৃথিবী ভগবানের এই বিরোধী কার্যের কথা বর্ণনা করছেন। যদিও তিনি এক সময় পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি আবার জলের উপর ভাসমান তরণীর মতো সেই পৃথিবীকে নিমজ্জিত করতে চাইছেন। ভগবানের কার্যকলাপ কেউই বুঝতে পারে না। অল্পবুদ্ধির ফলে, মানুষ কখনও কখনও মনে করে যে, ভগবানের কার্যকলাপ পরস্পর-বিরোধী।

শ্লোক ৩৬

নূনং জনৈরীহিতমীশ্বরাণা-
মস্মদ্বিধৈস্তদ্‌গুণসর্গমায়য়া ।
ন জ্ঞায়তে মোহিতচিত্তবর্ত্মভি-
স্তেভ্যো নমো বীরযশস্করেভ্যঃ ॥ ৩৬ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **জনৈঃ**—জনসাধারণের দ্বারা; **ঈহিতম্**—কার্যকলাপ; **ঈশ্বরাণাম্**—নিয়ন্তাদের; **অস্মৎ-বিধৈঃ**—আমার মতো, **তৎ**—ভগবানের; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের, **সর্গ**—যার ফলে সৃষ্টি হয়; **মায়য়া**—আপনার শক্তির দ্বারা; **ন**—কখনই না; **জ্ঞায়তে**—বোঝা যায়; **মোহিত**—মোহাচ্ছন্ন; **চিত্ত**—মন; **বর্ত্মভিঃ**—পন্থা; **তেভ্যঃ**—তাঁদের; **নমঃ**—প্রণতি; **বীর-যশঃ-করেভ্যঃ**—যিনি বীরদেরও খ্যাতি প্রদান করেন।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমিও আপনার জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছি। তার ফলে আমি আপনার কার্যকলাপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছি। আপনার ভক্তদের কার্যকলাপও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, অতএব আপনার লীলা সম্বন্ধে কি আর বলার আছে। এইভাবে সব কিছুই পরস্পর-বিরোধী এবং আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন অবতারে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ সর্বদাই অসাধারণ ও আশ্চর্যজনক। এই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ক্ষুদ্র

মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের কার্যকলাপ অচিন্ত্য বলে স্বীকার করা যায়, ততক্ষণ তার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ভগবান গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্য বিরাজমান। সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি অসংখ্য রূপে বিস্তার করেছেন। সমস্ত অবতারেরা আসছেন সঙ্কর্ষণ থেকে। সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন বলদেবের অংশ, আর বলদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বিস্তার। তাই সমস্ত অবতারদের বলা হয় কলা বা অংশের অংশ।

ঈশ্বরাণাম্ শব্দটি সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বদের ইঙ্গিত করছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) বর্ণনা করা হয়েছে—*রামাদি-মূর্তিষু কলা-নিয়মেন তিষ্ঠন্*। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের আংশিক বিস্তার বা কলা। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ঈশ্বরাণাম্* এই বহুবচনাত্মক শব্দটি থেকে মনে করা উচিত নয় যে, অনেক ভগবান আছেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান হচ্ছেন এক, কিন্তু তিনি নিত্য বিরাজমান ও বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন এবং বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করেন। কখনও কখনও সাধারণ মানুষেরা এই সমস্ত বর্ণনা বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে যে, এই সমস্ত কার্যকলাপ পরস্পর বিরোধী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি পরস্পর বিরোধী নয়। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে এক মহান পরিকল্পনা রয়েছে।

আমাদের বোঝার জন্য কখনও কখনও বলা হয় যে, ভগবান একটি চোরের হৃদয়ে বিরাজমান এবং একটি গৃহস্থের হৃদয়েও বিরাজমান, কিন্তু চোরের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা বলছেন, "যাও, ঐ বাড়িতে গিয়ে চুরি কর," এবং সেই একই সময় তিনি গৃহস্থকে বলছেন, "চোর-বাটপারদের থেকে সাবধানে থাক।" ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়া উপদেশ পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, পরমাত্মার বা পরমেশ্বর ভগবানের কোন পরিকল্পনা রয়েছে, এবং আমাদের সেগুলিকে পরস্পর বিরোধী বলে মনে করা উচিত নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সর্বান্তঃকরণে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া, এবং তাঁর দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে শান্তিতে থাকা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথিবীর প্রতি পৃথু মহারাজের ক্রোধ' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পৃথু মহারাজ কর্তৃক পৃথিবী দোহন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্থং পৃথুমভিষ্টূয় রুষা প্রস্ফুরিতাধরম্ ।
পুনরাহাবনির্ভীতা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **পৃথুম্**—পৃথু মহারাজকে; **অভিষ্টূয়**—স্তুতি করার পর; **রুষা**—ক্রোধে; **প্রস্ফুরিত**—কম্পিত; **অধরম্**—অধর; **পুনঃ**—পুনরায়, **আহ**—তিনি বললেন, **অবনিঃ**—পৃথিবী; **ভীতা**—ভয়ভীতা হয়ে; **সংস্তভ্য**—স্থির হয়ে; **আত্মানম্**—মন; **আত্মনা**—বুদ্ধির দ্বারা

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—হে বিদুর! পৃথিবী এইভাবে স্তব করা সত্ত্বেও পৃথু মহারাজের ক্রোধ উপশম হল না, এবং অত্যন্ত ক্রোধের বশে তাঁর অধর তখন কম্পিত হচ্ছিল। পৃথিবী অত্যন্ত ভীতা হওয়া সত্ত্বেও, রাজাকে আশ্বস্ত করার জন্য এইভাবে বলতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২

সন্নিযচ্ছাভিভো মন্যুং নিবোধ শ্রাবিতং চ মে ।
সর্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ ॥ ২ ॥

সন্নিযচ্ছ—দয়া করে শান্ত করুন; **অভিভো**—হে রাজন্; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা করুন; **শ্রাবিতম্**—যা কিছু বলা হয়েছে; **চ**—ও; **মে**—আমার দ্বারা; **সর্বতঃ**—সব জায়গা থেকে; **সারম্**—সার; **আদত্তে**—গ্রহণ করে; **যথা**—যেমন; **মধু-করঃ**—ভ্রমর; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে ভগবান! দয়া করে আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন এবং আমি আপনাকে যা নিবেদন করছি, তা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করুন। দয়া করে এই বিষয়ে আপনি একটু বিবেচনা করুন। আমি অত্যন্ত দীন হতে পারি, কিন্তু মধুকর যেমন প্রতিটি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, ঠিক তেমনই পণ্ডিত ব্যক্তি সমস্ত বিষয় থেকেই তার সারভাগ গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩

অস্মিঁল্লোকেঽথবামুষ্মিন্মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥

অস্মিন্—এই; **লোকে**—জীবনে; **অথ বা**—অথবা; **অমুষ্মিন্**—পরবর্তী জীবনে; **মুনিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **তত্ত্ব**—সত্য; **দর্শিভিঃ**—দ্রষ্টাদের দ্বারা; **দৃষ্টাঃ**—নির্দিষ্ট হয়েছে; **যোগাঃ**—পদ্ধতি; **প্রযুক্তাঃ**—প্রয়োগ করা হয়েছে; **চ**—ও; **পুংসাম্**—জনসাধারণের; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **প্রসিদ্ধয়ে**—লাভ করার জন্য।

অনুবাদ

সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য, কেবল ইহলোকেই নয়, পরলোকেও মানুষের উন্নতি সাধনের জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিঋষিরা বিবিধ উপায় নির্ণয় করে গেছেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য বৈদিক শাস্ত্রের এবং মুনি-ঋষিদের দ্বারা প্রদত্ত জ্ঞানের উপযোগ করা হয়। বৈদিক নির্দেশকে বলা হয় *শ্রুতি*, এবং মহান ঋষিরা সেই বিষয়ে যে অতিরিক্ত জ্ঞান প্রদান করেছেন, তাকে বলা হয় *স্মৃতি*। মানব-সমাজের কর্তব্য এই শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় জ্ঞানেরই সদ্ব্যবহার করা। কেউ যদি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করতে চান, তা হলে তাকে সেই সমস্ত নির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, কেউ যদি নিজেকে অত্যন্ত উন্নত স্তরের পারমার্থবাদী বলে প্রচার করতে চায়, অথচ শ্রুতি ও স্মৃতির নির্দেশ পালন করে না, সমাজের সে একটি উৎপাত-স্বরূপ। কেবল পরমার্থিক জীবনেই নয়, জড়-জাগতিক জীবনেও শ্রুতি ও স্মৃতির নির্দেশ অনুসরণ করা কর্তব্য। মানব-সমাজের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে *মনুস্মৃতি* অনুসরণ করা, কারণ মানবজাতির জনক মনু বিশেষ করে মানুষদের জন্য সেই সংহিতাটি প্রদান করে গেছেন।

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকদের কখনও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে তারা যেন পিতা, পতি ও প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদের দ্বারা সংরক্ষিত হয়। স্ত্রীলোকদের সর্ব অবস্থাতেই কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। বর্তমানে স্ত্রীলোকদেরও পুরুষদের মতো পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন যে-সমস্ত স্ত্রীলোকেরা তাদের থেকে, এই প্রকার স্বাধীন স্ত্রীলোকেরা অধিক সুখী নয়। শ্রুতি, স্মৃতি ও মহান ঋষিদের দেওয়া উপদেশগুলি যদি মানুষ অনুসরণ করে, তা হলে তারা কেবল ইহলোকেই নয়, পরলোকেও বাস্তবিকই সুখী হবেন। দুর্ভাগ্যবশত, কতকগুলি বদমায়েশ মানুষ সুখী হওয়ার কত নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করছে। মানব-সমাজ তার ফলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক, উভয় প্রকার জীবনের আদর্শই হারিয়েছে, তাই মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এবং পৃথিবীর কোথাও সুখ ও শান্তি নেই। রাষ্ট্রসংঘ যদিও মানব-সমাজের সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা নিজেরাই বিভ্রান্ত এবং সমস্যা-জর্জরিত। যেহেতু তারা বেদের উদার উপদেশগুলি গ্রহণ করছে না, তাই তারা অসুখী।

এই শ্লোকে *অস্মিন্* এবং *অমুষ্মিন্* শব্দ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। *অস্মিন্* মানে 'এই জীবনে' এবং *অমুষ্মিন্* মানে 'পরবর্তী জীবনে'। দুর্ভাগ্যবশত, এই যুগে বড় বড় অধ্যাপক ও পণ্ডিতেরাও মনে করে যে, পরলোক বলে কিছু নেই এবং এই জীবনেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। যেহেতু তারা হচ্ছে এক-একটি মহামূর্খ এবং মহাধূর্ত, তাই তারা কি উপদেশ দেবে? কিন্তু তবুও তাদের মহাপণ্ডিত এবং বড় বড় অধ্যাপক বলে মনে করা হয়। এই শ্লোকে *অমুষ্মিন* শব্দটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রত্যেকের জীবন এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যার ফলে তার পরবর্তী জীবনও লাভপ্রদ হয়। একটি বালক যেমন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে, যাতে পরবর্তী জীবন সুখী হয়, তেমনই এই জীবনে যথাযথভাবে শিক্ষালাভ করতে হবে, যাতে মৃত্যুর পর নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করা যায়। তাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রুতি এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক।

শ্লোক ৪

তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্বদর্শিতান্ ।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা ॥ ৪ ॥

তান্—সেগুলি; **আতিষ্ঠতি**—পালন করে; **যঃ**—যে-কেউ; **সম্যক্**—সম্যক্‌রূপে; **উপায়ান্**—উপায়; **পূর্ব**—পূর্বে; **দর্শিতান্**—নির্দেশিত; **অবরঃ**—অনভিজ্ঞ; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপেতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **উপেয়ান্**—কর্মফল; **বিন্দতে**—উপভোগ করে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে।

অনুবাদ

যিনি পূর্বতন মহর্ষিদের প্রদর্শিত উপায় ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাযথভাবে অনুসরণ করেন, তিনি অনায়াসে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—অর্থাৎ, মুক্ত মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা কর্তব্য। তার ফলে আমরা ইহজন্মে এবং পরজন্মে লাভবান হতে পারি। এই সমস্ত নির্দেশ অনুসরণ করা হলে, আমাদের জড়-জাগতিক জীবনেও লাভ হয়। প্রাচীন মহর্ষি এবং মহাপুরুষেরা যে সমস্ত নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি অনুসরণ করলে, আমরা অনায়াসে জীবনের উদ্দেশ্য অবগত হতে পারি। এই শ্লোকে *অবরঃ* অর্থাৎ 'অনভিজ্ঞ' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি বদ্ধ জীবই অনভিজ্ঞ। প্রতিটি মানুষই *অবোধ-জাত*—জন্মসূত্রে মূর্খ ও অজ্ঞ। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব রকমের মূর্খ ও অজ্ঞরা সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। কিন্তু তারা কি করতে পারে? তাদের তৈরি সংবিধানের কি পরিণতি? আজ তারা একটা আইন তৈরি করছে, আর কালই তাদের খেয়াল-খুশিমতো সেটিকে তারা নাকচ করছে। একটি রাজনৈতিক দল একটি উদ্দেশ্য নিয়ে দেশকে কাজে লাগাচ্ছে, তার পরেই আর একটি রাজনৈতিক দল অন্য এক ধরনের সরকার তৈরি করে, সমস্ত আইন-কানুনগুলি নাকচ করে দিচ্ছে। এই চর্বিত চর্বণ করার পন্থা *(পুনঃ পুনশ্চর্বিত-চর্বণানাম্)* কখনই মানব-সমাজের সুখ ও সমৃদ্ধি আনতে পারে না। সমগ্র মানব-সমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করতে হলে, মুক্ত পুরুষদের দেওয়া আদর্শ পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ৫

তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্ ।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥

তান্—সেই সমস্ত; **অনাদৃত্য**—উপেক্ষা করে; **যঃ**—যিনি; **অবিদ্বান্**—মূর্খ; **অর্থান্**—পরিকল্পনা; **আরভতে**—শুরু করে; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **তস্য**—তার; **ব্যভিচরন্তি**—সফল হয় না; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্য; **আরব্ধাঃ**—প্রচেষ্টা করে; **চ**—এবং; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার।

অনুবাদ

যে সমস্ত মূর্খ মানুষ নির্ভুল নির্দেশ প্রদানকারী মহর্ষিদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করে, তাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনুসারে কল্পিত উপায়সমূহ উদ্ভাবন করে তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবলই বার বার নিষ্ফল হয়।

তাৎপর্য

পূর্বতন আচার্য এবং মুক্ত পুরুষদের দেওয়া নিষ্কলুষ নির্দেশগুলি অমান্য করা আজকাল একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল মানুষেরা এতই অধঃপতিত যে, তারা মুক্ত জীব ও বদ্ধ জীবের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। বদ্ধ জীব চারটি দোষে দুষ্ট—সে ভুল করে, সে প্রমাদগ্রস্ত হতে বাধ্য, তার প্রতারণা করার প্রবণতা রয়েছে এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিপূর্ণ। তাই আমাদের নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সরাসরিভাবে নির্দেশ প্রাপ্ত হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে, যাঁরা নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের নির্দেশ পালন করছেন। অনুগামী যদি মুক্ত পুরুষ নাও হন, কিন্তু তিনি যদি পরম মুক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে অনুসরণ করেন, তা হলে তাঁর কার্যকলাপও জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে স্বভাবিকভাবেই মুক্ত হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।" পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য বাণীতে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাপরায়ণ হলে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করলে, তৎক্ষণাৎ গুরু হওয়া যায়। বিষয়ী মানুষেরা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের মনগড়া সমস্ত মতবাদে অত্যন্ত আগ্রহী, যার ফলে তাদের সমস্ত প্রয়াসেই বার বার তারা ব্যর্থ হয়। যেহেতু সারা পৃথিবী আজ বদ্ধ জীবদের ভ্রান্ত নির্দেশ অনুসরণ করছে, তাই আজ মানব-সমাজ সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

শ্লোক ৬

পুরা সৃষ্টা হ্যোষধয়ো ব্রহ্মণা যা বিশাম্পতে।
ভুজ্যমানা ময়া দৃষ্টা অসদ্ভিরধৃতব্রতৈঃ ॥ ৬ ॥

পুরা—পুরাকালে; **সৃষ্টাঃ**—সৃষ্ট; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ওষধয়ঃ**—ওষধি ও শস্য; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **যাঃ**—যা কিছু; **বিশাম্-পতে**—হে রাজন্; **ভুজ্যমানাঃ**—ভোগ করছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দৃষ্টাঃ**—দেখে, **অসদ্ভিঃ**—অভক্তদের দ্বারা; **অধৃত-ব্রতৈঃ**—সব রকম আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ বর্জিত।

অনুবাদ

হে রাজন্! পুরাকালে ব্রহ্মা যে-সমস্ত বীজ, মূল, ওষধি এবং শস্য সৃষ্টি করেছিলেন, তা এখন সমস্ত অভক্তরা ভোগ করছে, যারা সব রকম আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন জীবদের জন্য, কিন্তু সেই সৃষ্টির পিছনে পরিকল্পনা ছিল যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যে-সমস্ত জীবেরা এখানে আসবে, তারা ব্রহ্মার দেওয়া বৈদিক নির্দেশ প্রাপ্ত হবে, যাতে তারা চরমে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। পৃথিবীতে উৎপন্ন সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি, যথা—ফল, ফুল, গাছপালা, শস্য, পশু আদি সব কিছুরই সৃষ্টি হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের নিমিত্ত যজ্ঞে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু গাভীরূপী পৃথিবী এখানে প্রার্থনা করছেন যে, এই সমস্ত বস্তুগুলি এখন অভক্তরা ব্যবহার করছে, যাদের পারমার্থিক উপলব্ধি সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা নেই। পৃথিবীতে যদিও শস্য, ফল, ফুল ইত্যাদি উৎপাদনের অপরিমেয় ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু পৃথিবী সেই উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ সেগুলি পারমার্থিক উদ্দেশ্য রহিত অভক্তরা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছিল। সব কিছুই ভগবানের, এবং তাঁর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য সব কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে। জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু ব্যবহার করা উচিত নয়। সেটিই হচ্ছে এই জড়া প্রকৃতির পরিকল্পনা।

এই শ্লোকে *অসদ্ভিঃ* এবং *অধৃত-ব্রতৈঃ* শব্দগুলি গুরুত্বপূর্ণ। *অসদ্ভিঃ* শব্দটি অভক্তদের ইঙ্গিত করে। *ভগবদ্গীতায়* অভক্তদের *দুষ্কৃতিনঃ* (দুষ্কৃতকারী), *মূঢ়াঃ* (গাধা অথবা বোকা), *নরাধমাঃ* (মানুষদের মধ্যে সব চাইতে অধঃপতিত) এবং *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* (মায়ার প্রভাবে যারা তাদের জ্ঞান হারিয়েছে), এই চারটি শ্রেণীতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত মানুষেরা অসৎ বা অভক্ত। অভক্তদের *গৃহব্রত*ও বলা হয়, আর ভক্তদের বলা হয় *ধৃতব্রত*। সমগ্র *বেদের* পরিকল্পনা হচ্ছে যে, সমস্ত বদ্ধ জীবেরা, যারা এই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে

এসেছে, তাদের *ধৃতব্রত* হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ তাদের কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি-বিধান করার মাধ্যমে নিজেদের ইন্দ্রিয় বা জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত কার্যকলাপ, সেগুলিকে বলা হয় *কৃষ্ণার্থেঽখিল-চেষ্টাঃ*। তা ইঙ্গিত করে যে, মানুষ সব রকমের কর্ম করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তা যেন শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* তা *যজ্ঞার্থাৎ কর্ম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *যজ্ঞ* শব্দটি ভগবান বিষ্ণুকে ইঙ্গিত করে। সেই বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যেই আমাদের কর্ম করা উচিত। বর্তমান সময়ে (কলিযুগে), কিন্তু, মানুষ বিষ্ণুকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে, এবং তারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সব কিছু করছে। এই সমস্ত মানুষেরা ধীরে ধীরে অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে যাবে, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের উপভোগের জন্য যে-সমস্ত সামগ্রী, তা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। তারা যদি এইভাবে আচরণ করে তা হলে চরমে এমন দারিদ্র্য দেখা দেবে যে, তখন আর কোন শস্য, ফুল ইত্যাদি উৎপন্ন হবে না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কলিযুগের শেষে মানুষ এতই কলুষিত হয়ে যাবে যে, তখন আর কোন শস্য, ফল, দুধ ইত্যাদি থাকবে না।

শ্লোক ৭

অপালিতানাদৃতা চ ভবদ্ভির্লোকপালকৈঃ ।
চোরীভূতেঽথ লোকেঽহং যজ্ঞার্থেঽগ্রসমোষধীঃ ॥ ৭ ॥

অপালিতা—পালন-রহিত; **অনাদৃতা**—উপেক্ষিতা; **চ**—ও; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার মতো; **লোক-পালকৈঃ**—রাজ্যপাল বা রাজাদের দ্বারা; **চোরী-ভূতে**—চোরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে; **অথ**—অতএব; **লোকে**—এই জগতে; **অহম্**—আমি; **যজ্ঞ-অর্থে**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে; **অগ্রসম্**—লুকিয়ে রেখেছি; **ওষধীঃ**—সমস্ত ওষধি ও শস্য।

অনুবাদ

হে রাজন্! কেবল শস্য এবং ওষধিই অভক্তদের দ্বারা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই নয়, যথাযথভাবে আমার পালনও হচ্ছে না। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য ব্যবহার করে যারা চোরে পরিণত হয়েছে, সেই সমস্ত দুর্বৃত্তদের দণ্ডদানে অক্ষম রাজাদের দ্বারাও আমি অনাদৃতা। তাই আমি সমস্ত বীজ লুকিয়ে রেখেছি, কারণ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করার কথা।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ এবং তাঁর পিতা বেণ রাজার সময় যা ঘটেছিল, তা বর্তমান সময়েও হচ্ছে। বিশাল পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য এবং কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিরাট আয়োজন করা হয়েছে, কিন্তু তা সবই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে। তাই এত উৎপাদন ক্ষমতা সত্ত্বেও মানুষের অভাব দূর হয়নি, কারণ পৃথিবী চোর বাটপাড়ে পরিপূর্ণ। *চোরী*-ভূতে শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, জনসাধারণ চোরে পরিণত হয়েছে। বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যখন অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা করা হয়, তখন মানুষ চোরে পরিণত হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা যজ্ঞকে নিবেদন না করে যখন মানুষ খাদ্যশস্য আহার করে, তখন সে চোরে পরিণত হয় এবং তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ অনুসারে, ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি। জনসাধারণের সেই সমস্ত সম্পদ উপযোগ করার অধিকার তখনই হয়, যখন সেগুলি ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। সেটি হচ্ছে প্রসাদ গ্রহণ করার পন্থা। ভগবৎ প্রসাদ যে আহার করে না, সে অবশ্যই একটি চোর। রাজ্যপাল এবং রাজাদের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত চোরদের দণ্ড দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পৃথিবী পালন করা। তা যদি না করা হয়, তা হলে আর খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে না, এবং মানুষকে অনাহারে থাকতে হবে। অবশ্য তাদের যে কেবল অন্নাভাবই হবে, তাই নয়, তখন তারা পরস্পরকে হত্যা করে তাদের মাংস খাবে। তারা ইতিমধ্যেই মাংসের জন্য পশুহত্যা করছে, তাই যখন শস্য, শাকসবজি এবং ফল থাকবে না, তখন তারা তাদের নিজেদের পিতা ও পুত্রদের হত্যা করে তাদের মাংস খাবে।

শ্লোক ৮

নূনং তা বীরুধঃ ক্ষীণা ময়ি কালেন ভূয়সা ।
তত্র যোগেন দৃষ্টেন ভবানাদাতুমর্হতি ॥ ৮ ॥

নূনম্—অতএব; **তাঃ**—তারা; **বীরুধঃ**—ওষধি ও শস্য; **ক্ষীণাঃ**—জীর্ণ; **ময়ি**—আমার মধ্যে; **কালেন**—যথাসময়ে; **ভূয়সা**—অত্যন্ত; **তত্র**—অতএব; **যোগেন**—যথাযথ উপায়ের দ্বারা; **দৃষ্টেন**—প্রসিদ্ধ; **ভবান্**—আপনি; **আদাতুম্**—গ্রহণ করতে; **অর্হতি**—উচিত।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল আমার ভিতর সঞ্চিত থাকার ফলে, এই সমস্ত শস্যবীজ নিশ্চয়ই জীর্ণ হয়েছে। তাই আচার্য বা শাস্ত্র নির্দেশিত উপযুক্ত উপায়ে, সেই সমস্ত বীজগুলি এখনই উদ্ধার করা আপনার কর্তব্য।

তাৎপর্য

যখন খাদ্যশস্যের অভাব হয়, তখন সরকারের কর্তব্য শাস্ত্রবর্ণিত এবং আচার্যদের দ্বারা অনুমোদিত বিধি পালন করা; তা হলে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন হবে, এবং খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা যাবে। *ভগবদ্গীতায়* যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, আকাশে পর্যাপ্ত মেঘ একত্রিত হয়, এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয়। এইভাবে কৃষিকার্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়, তখন মানুষ শস্যজাত খাদ্য আহার করে, এবং গো-মেষ আদি গৃহপালিত জন্তুরাও ঘাস ও শস্য আহার করে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মানুষ যদি যজ্ঞ করে, তা হলে আর খাদ্যাভাব থাকবে না। কলিযুগের একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ।

এই শ্লোকে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে—*যোগেন,* 'অনুমোদিত উপায়ে', এবং *দৃষ্টেন* 'পূর্বতন আচার্যদের দৃষ্টান্ত অনুসারে'। কেউ যদি মনে করে যে, ট্রাক্টর আদি আধুনিক যন্ত্রের প্রয়োগের দ্বারা শস্য উৎপাদন করা যায়, তা হলে সে মস্ত বড় ভুল করছে। কেউ যদি মরুভূমিতে গিয়ে ট্রাক্টর ব্যবহার করে, তা হলেও শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে না। আমরা নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করতে পারি, কিন্তু আমাদের ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, যজ্ঞ না হলে পৃথিবী শস্য উৎপাদন করবে না। পৃথিবী ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করেছেন যে, যেহেতু অভক্তরা খাদ্যশস্য উপভোগ করছে, তাই তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত খাদ্যশস্যের বীজ সংরক্ষণ করে রেখেছেন। নাস্তিকেরা অবশ্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের এই আধ্যাত্মিক পন্থাটিতে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তারা বিশ্বাস করুক অথবা নাই করুক, যান্ত্রিক উপায়ে যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যায় না, সেই কথা অন্তত বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয় না। অনুমোদিত বিধি সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই যুগে বুদ্ধিমান মানুষেরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করবেন, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো এবং যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার জন্য সর্বদা তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে, একমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন

বা সংকীর্তন প্রবর্তনের মাধ্যমেই কেবল এই পৃথিবীকে রক্ষা করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা জানতে পেরেছি যে, যে কৃষ্ণভক্ত নয়, সে চোর। জড়-জাগতিক বিচারে তাকে অত্যন্ত উন্নত বলে মনে হলেও, একটি চোর কখনও সুখী হতে পারে না। সে দণ্ডনীয়। মানুষ যেহেতু কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করছে না, তাই তারা চোরে পরিণত হয়েছে, এবং তার ফলে তারা প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডভোগ করছে। কেউই তা প্রতিহত করতে পারবে না। জনহিতকর কার্যের জন্য যত রকম ত্রাণ তহবিল এবং প্রতিষ্ঠান খোলা হোক না কেন, তাতে কোন কাজ হবে না। পৃথিবীর মানুষ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে, তা হলে অন্নাভাব এবং বহু দুঃখকষ্ট তাদের ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৯-১০

বৎসং কল্পয় মে বীর যেনাহং বৎসলা তব ।
ধোক্ষ্যে ক্ষীরময়ান্ কামাননুরূপং চ দোহনম্ ॥ ৯ ॥
দোগ্ধারং চ মহাবাহো ভূতানাং ভূতভাবন ।
অন্নমীপ্সিতমূর্জস্বদ্ভগবান্ বাঞ্ছতে যদি ॥ ১০ ॥

বৎসম্—বাছুর; **কল্পয়**—ব্যবস্থা কর; **মে**—আমার জন্য; **বীর**—হে বীর; **যেন**—যার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **বৎসলা**—স্নেহপূর্ণ; **তব**—আপনার; **ধোক্ষ্যে**—পূর্ণ করব; **ক্ষীর-ময়ান্**—দুগ্ধরূপে; **কামান্**—বাঞ্ছিত বস্তুসকল; **অনুরূপম্**—বিভিন্ন জীবের প্রয়োজন অনুসারে; **চ**—ও; **দোহনম্**—দোহনপাত্র; **দোগ্ধারম্**—দোহনকারী; **চ**—ও; **মহা-বাহো**—হে মহাবাহো; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ভূত-ভাবন**—হে জীবদের রক্ষাকারী; **অন্নম্**—অন্ন; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত; **ঊর্জঃ-বৎ**—বলপ্রদ; **ভগবান্**—হে পরম পূজ্য; **বাঞ্ছতে**—ইচ্ছা করেন; **যদি**—যদি।

অনুবাদ

হে মহাবীর। হে ভূতভাবন। আপনি যদি প্রচুর খাদ্যশস্য প্রদান করে জীবদের কষ্ট নিবারণ করতে চান, এবং আপনি যদি আমাকে দোহন করে তাদের পোষণ করতে চান, তা হলে আপনি উপযুক্ত বৎস, দোহনপাত্র ও দোগ্ধা নিরূপণ করুন, যাতে আমি আমার বৎসের প্রতি অত্যন্ত বৎসলা হয়ে, আপনার বাসনা অনুসারে দুগ্ধ প্রদান করতে পারি।

তাৎপর্য

গাভী দোহন করার ব্যাপারে এই উপদেশগুলি খুব সুন্দর। প্রথমে গাভীটির যেন একটি বৎস থাকে, যার প্রতি বৎসলা হয়ে গাভী স্বেচ্ছায় পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ প্রদান করবে। সুদক্ষ দোগ্ধা এবং দুধ রাখার জন্য উপযুক্ত দোহন-পাত্রেরও প্রয়োজন। গাভী যেমন বৎস ব্যতীত যথেষ্ট দুধ প্রদান করতে পারে না, তেমনই পৃথিবীও কৃষ্ণভক্তদের প্রতি বৎসলা না হয়ে, প্রচুর পরিমাণে অন্ন উৎপাদন করতে পারে না। পৃথিবীর গাভী রূপটি যদিও রূপক অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে, তবুও তার ভাবার্থটি এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। বাছুর যেমন গাভীকে দুগ্ধ উৎপাদনে অনুপ্রাণিত করে, তেমনই মানুষ যদি অসৎ বা অধৃতব্রত না হয়, তা হলে সমস্ত জীবেরা এমন কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ ও জলচর সকলেই পৃথিবীর কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাদের অন্ন প্রাপ্ত হতে পারে, যে-কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। মানব-সমাজ যখন অসৎ বা ভগবৎ-বিমুখ বা কৃষ্ণভক্তি-বিহীন হয়, তখন সারা পৃথিবী দুঃখকষ্ট ভোগ করে। মানুষ যদি সৎ আচরণ করে, তা হলে পশুদেরও খাদ্যাভাব হয় না এবং তারা সুখে থাকে। ভগবৎ বিমুখ মানুষেরা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে, পশুদের সুরক্ষা ও আহার প্রদান করার পরিবর্তে, তাদের হত্যা করে নিজেদের উদর পূর্তি করে। তার ফলে কেউই সুখী হয় না, এবং আজকের পৃথিবীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার সেটিই হচ্ছে কারণ।

শ্লোক ১১

সমাং চ কুরু মাং রাজন্দেববৃষ্টং যথা পয়ঃ ।
অপর্তাবপি ভদ্রং তে উপাবর্তেত মে বিভো ॥ ১১ ॥

সমাম্—সমতল; **চ**—ও; **কুরু**—করুন; **মাম্**—আমাকে; **রাজন্**—হে রাজন্; **দেব-বৃষ্টম্**—ইন্দ্রের কৃপায় বর্ষারূপে পতিত; **যথা**—যাতে; **পয়ঃ**—জল; **অপ-ঋতৌ**—বর্ষা ঋতু যখন শেষ হয়ে যায়; **অপি**—ও; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তে**—আপনাকে; **উপাবর্তেত**—থাকতে পারে; **মে**—আমার উপর; **বিভো**—হে ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনি আমাকে এমনভাবে সমতল করুন, যেন বর্ষা ঋতু শেষ হয়ে গেলেও, ইন্দ্রদেব-বর্ষিত জল আমার উপরিভাগে সর্বত্রই সমভাবে থাকতে পারে এবং পৃথিবীকে আর্দ্র রাখতে পারে। তার ফলে সর্বপ্রকার উৎপাদনের জন্য তা অত্যন্ত শুভ হবে।

তাৎপর্য

দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র ও বৃষ্টির অধ্যক্ষ। সাধারণত পর্বতকে ভেঙে টুকরা টুকরা করার জন্য পর্বত শিখরে বজ্রপাত করা হয়। এই সমস্ত টুকরাগুলি যখন কালক্রমে ভূপৃষ্ঠে ছড়ায়, তখন ভূপৃষ্ঠ কৃষিযোগ্য হয়। সমতল-ভূমি শস্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী। তাই পৃথু মহারাজের কাছে পৃথিবী অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন উচ্চ ভূমি ও পর্বত ভেঙে পৃথিবীকে সমতল করেন।

শ্লোক ১২

ইতি প্রিয়ং হিতং বাক্যং ভুব আদায় ভূপতিঃ ।
বৎসং কৃত্বা মনুং পাণাবদুহৎসকলৌষধীঃ ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রিয়ম্**—মধুর; **হিতম্**—হিতকর; **বাক্যম্**—বাক্য; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **আদায়**—বিচার করে; **ভূপতিঃ**—রাজা; **বৎসম্**—বৎস; **কৃত্বা**—করে; **মনুম্**—স্বায়ম্ভুব মনুকে; **পাণৌ**—তাঁর হাতে; **অদুহৎ**—দোহন করেছিলেন; **সকল**—সমস্ত; **ওষধীঃ**—ওষধি ও শস্য।

অনুবাদ

পৃথিবীর এই প্রিয় ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করে পৃথু মহারাজ প্রসন্ন হয়েছিলেন। তার পর তিনি স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস রূপে গ্রহণ করে, তাঁর নিজের হাতকে দোহন পাত্ররূপে পরিণত করে, পৃথিবীরূপ গাভী থেকে সমস্ত ওষধি ও শস্য দোহন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

তথাপরে চ সর্বত্র সারমাদদতে বুধাঃ ।
ততোঽন্যে চ যথাকামং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥ ১৩ ॥

তথা—সেইভাবে; **অপরে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সারম্**—নির্যাস; **আদদতে**—গ্রহণ করেছিল; **বুধাঃ**—বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষেরা; **ততঃ**—তার পর; **অন্যে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **যথা-কামম্**—ইচ্ছা অনুসারে; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিলেন; **পৃথু-ভাবিতাম্**—পৃথু মহারাজের নিয়ন্ত্রণাধীন পৃথিবীকে।

অনুবাদ

অন্যেরা, যাঁরা পৃথু মহারাজের মতো বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁরাও পৃথিবী থেকে সার গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে সকলেই সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, এবং পৃথু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁদের বাসনা অনুসারে তাঁরা পৃথিবীর কাছ থেকে সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথিবীকে বলা হয় *বসুন্ধরা* । *বসু* মানে হচ্ছে *'ঐশ্বর্য'*, এবং *ধরা* মানে হচ্ছে 'যিনি ধারণ করেন'। এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীরা মানুষদেব আবশ্যকতা পূর্ণ করে, এবং যথাযথ উপায়ে সমস্ত জীবদের পৃথিবী থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া যায়। ধরিত্রী পৃথু মহারাজকে বলেছিলেন যে, পৃথিবী থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়—খনি থেকে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে অথবা বায়ুমণ্ডল থেকে—তা সবই ভগবানের সম্পত্তি বলে সর্বদা মনে করা উচিত এবং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত। সেইভাবে সব কিছু উপযোগ করার পন্থা পৃথু মহাবাজ প্রবর্তন করেছিলেন। যজ্ঞ বন্ধ হওয়া মাত্রই পৃথিবী তাঁর সমস্ত উৎপাদন—শাকসবজি, ফলমূল, ফুল এবং অন্যান্য কৃষিজাত ও খনিজ পদার্থ সংবরণ করে নেবেন। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সৃষ্টির আদি থেকেই যজ্ঞের পন্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। নিয়মিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, সমভাবে ধনসম্পদ বিতরণের দ্বারা এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ কবা যাবে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কলিযুগে অতি সরল সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান—কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রবর্তিত মহোৎসব—প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে প্রবর্তন করা উচিত। বুদ্ধিমান মানুষদের ব্যক্তিগত আচবণের দ্বারা সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূতক্রীড়া এবং আসবপান বর্জন করে, তাদের তপশ্চর্যার পন্থা অনুসরণ কবা উচিত। সমাজেব বুদ্ধিমান মানুষ অথবা ব্রাহ্মণেবা যদি এই বিধিনিষেধ অনুসরণ করেন, তা হলে পৃথিবীর বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে, এবং মানুষ সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ১৪

ঋষয়ো দুদুহুর্দেবীমিন্দ্রিয়েষ্বথ সত্তম ।
বৎসং বৃহস্পতিং কৃত্বা পয়শ্ছন্দোময়ং শুচি ॥ ১৪ ॥

ঋষয়ঃ—মহর্ষিগণ; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিলেন; **দেবীম্**—পৃথিবীকে; **ইন্দ্রিয়েষু**—ইন্দ্রিয়সমূহকে, **অথ**—তার পর; **সত্তম**—হে বিদুর; **বৎসম্**—বৎস; **বৃহস্পতিম্**—বৃহস্পতিকে; **কৃত্বা**—করে; **পয়ঃ**—দুধ; **ছন্দঃ-ময়ম্**—বৈদিক মন্ত্ররূপে; **শুচি**—পবিত্র।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ বৃহস্পতিকে বৎসে পরিণত করে এবং তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহকে দোহনপাত্রে পরিণত করে, তাঁদের বাণী, মন ও শ্রবণ পবিত্র করার জন্য সর্বপ্রকার বৈদিক জ্ঞান দোহন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃহস্পতি হচ্ছেন স্বর্গলোকের পুরোহিত। কেবল এই গ্রহেই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র মহর্ষিরা মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য বৃহস্পতির মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত পন্থায় বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বৈদিক জ্ঞান সমস্ত মানব-সমাজে আবশ্যকীয় বলে বিবেচনা করা হয়। মানব-সমাজ যদি কেবল দেহ ধারণের জন্য পৃথিবী থেকে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুগুলি আহরণ করে সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে মানব-সমাজ কখনও যথেষ্টভাবে সমৃদ্ধিশালী হবে না। মানুষের মন ও কর্ণের আহারেরও অবশ্য প্রয়োজন। জিহ্বাকে স্পন্দিত করাও মানুষের আর একটি প্রয়োজন। সেই দিব্য শব্দতরঙ্গ হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তির পন্থায় যদি নিয়মিতভাবে এই মহামন্ত্র শ্রবণ ও কীর্তন করা হয়, তা হলে সমগ্র মানব-সমাজ পবিত্র হবে, এবং তার ফলে সমস্ত মানুষ জাগতিক ও পারমার্থিক, উভয় ক্ষেত্রেই সুখী হবেন।

শ্লোক ১৫

কৃত্বা বৎসং সুরগণা ইন্দ্রং সোমমদূদুহন্ ।
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ বীর্যমোজো বলং পয়ঃ ॥ ১৫ ॥

কৃত্বা—বানিয়ে; **বৎসম্**—বৎস; **সুর-গণাঃ**—দেবতারা; **ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **সোমম্**—অমৃত, **অদূদুহন্**—দোহন করেছিলেন; **হিরণ্ময়েন**—স্বর্ণময়; **পাত্রেণ**—পাত্রে; **বীর্যম্**—মানসিক শক্তি; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের শক্তি; **বলম্**—দেহের শক্তি; **পয়ঃ**—দুধ।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বৎসে পরিণত করে, পৃথিবী থেকে সোমরসরূপ অমৃত দোহন করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের মানসিক ক্ষমতা, দেহের ক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সোম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অমৃত'। *সোম* এক প্রকার পানীয়, যা স্বর্গলোকে চন্দ্রমা থেকে বানানো হয় এই সোমরস পান করে দেবতারা মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরে শক্তি লাভ করে। *হিরণ্ময়েন পাত্রেণ* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, সোম কোন সাধারণ মাদক পানীয় নয়। দেবতারা কোন রকম মাদকদ্রব্য স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। সোম এক প্রকার নেশাকারী ঔষধও নয়। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রকার পানীয়, যা কেবল স্বর্গলোকেই পাওয়া যায়। আসুরিক মানুষেরা যে আসব তৈরি করে, সোম তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যে-কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

দৈতেয়া দানবা বৎসং প্রহ্লাদমসুরর্ষভম্ ।
বিধায়াদূদুহন্ ক্ষীরময়ঃপাত্রে সুরাসবম্ ॥ ১৬ ॥

দৈতেয়াঃ—দিতির পুত্ররা; **দানবাঃ**—দানবেরা; **বৎসম্**—বৎস; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **অসুর**—অসুর; **ঋষভম্**—প্রধান; **বিধায়**—বানিয়ে; **অদূদুহন্**—তারা দোহন করেছিল; **ক্ষীরম্**—দুধ; **অয়ঃ**—লৌহ; **পাত্রে**—পাত্রে; **সুরা**—সুরা; **আসবম্**—মদ্য।

অনুবাদ

দৈত্য-দানবেরা অসুরকুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজকে বৎস বানিয়ে, বিভিন্ন প্রকার সুরা এবং আসব দোহন করেছিল, যা তারা লৌহপাত্রে রেখেছিল।

তাৎপর্য

দেবতাদের পানীয় যেমন সোমরস, তেমনই দৈত্য ও দানবদের পানীয় হচ্ছে সুরা ও মদ্য। দিতির থেকে উৎপন্ন অসুরেরা সুরা ও মদ পান করে আনন্দ পায়। এমন কি আজও আসুরিক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরা সুরা ও মদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

এই সম্পর্কে প্রহ্লাদ মহারাজের নামটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্যকুলে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর কৃপায় অসুরেরা সুরা ও মদ্যরূপে তাদের পানীয় প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এখনও পাচ্ছে। অয়ঃ (লৌহ) শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অমৃতময় সোমরস স্বর্ণপাত্রে রাখা হয়েছিল, আর সুরা ও মদ্য ছিল লৌহপাত্রে। যেহেতু সুরা ও মদ্য নিকৃষ্ট, তাই তা লৌহপাত্রে রাখা হয়, এবং যেহেতু সোমরস উৎকৃষ্ট, তাই তা স্বর্ণপাত্রে রাখা হয়েছে।

শ্লোক ১৭

গন্ধর্বাপ্সরসোঽধুক্ষন্ পাত্রে পদ্মময়ে পয়ঃ ।
বৎসং বিশ্বাবসুং কৃত্বা গান্ধর্বং মধু সৌভগম্ ॥ ১৭ ॥

গন্ধর্ব—গন্ধর্বেরা; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ, **অধুক্ষন্**—দোহন করেছিলেন; **পাত্রে**—পাত্রে, **পদ্ম-ময়ে**—পদ্ম থেকে প্রস্তুত; **পয়ঃ**—দুধ; **বৎসম্**—বৎস, **বিশ্বা-বসুম্**—বিশ্বাবসু নামক, **কৃত্বা**—বানিয়ে, **গান্ধর্বম্**—সঙ্গীত, **মধু**—মধুর, **সৌভগম্**—সৌন্দর্য।

অনুবাদ

গন্ধর্ব ও অপ্সরারা বিশ্বাবসুকে বৎস বানিয়ে, পদ্মফুলের পাত্রে দুগ্ধ দোহন করেছিলেন। সেই দুগ্ধ মধুর সঙ্গীতকলা ও সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করেছিল।

শ্লোক ১৮

বৎসেন পিতরোঽর্যম্না কব্যং ক্ষীরমধুক্ষত ।
আমপাত্রে মহাভাগাঃ শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধদেবতাঃ ॥ ১৮ ॥

বৎসেন—বৎসের দ্বারা, **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **অর্যম্না**—পিতৃলোকের দেবতা অর্যমার দ্বারা, **কব্যম্**—পিতৃদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত খাদ্য; **ক্ষীরম্**—দুগ্ধ, **অধুক্ষত**—দোহন করেছিল; **আম-পাত্রে**—অপক্ক মৃন্ময় পাত্রে; **মহা-ভাগাঃ**—মহাভাগ্যবান, **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **শ্রাদ্ধ-দেবতাঃ**—শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ দেবতাগণ।

অনুবাদ

শ্রাদ্ধকর্মের মুখ্য দেবতা সৌভাগ্যবান পিতৃগণ অর্যমাকে বৎস বানিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে অপক্ক মৃন্ময় পাত্রে কব্য দোহন করেছিলেন, যা হচ্ছে পিতৃদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৯/২৫) বলা হয়েছে, *পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ*। যারা পরিবারের কল্যাণ-সাধনে আগ্রহী, তাদের বলা হয় *পিতৃব্রতাঃ*। পিতৃলোক নামক একটি গ্রহলোক রয়েছে, এবং সেই লোকের প্রধান বিগ্রহ হচ্ছেন অর্যমা। তিনি এক প্রকার দেবতা, এবং তাঁর সন্তুষ্টি-বিধান করার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি প্রেতযোনি প্রাপ্ত পরিবারের সদস্যদের স্থূল শরীর লাভে সাহায্য করতে পারে। যারা অত্যন্ত পাপী এবং পরিবার, গৃহ, গ্রাম অথবা দেশের প্রতি আসক্ত, তারা জড় উপাদান রচিত স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয় না, পক্ষান্তরে তারা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীরে থাকে। যারা এই প্রকার সূক্ষ্ম শরীরে থাকে তাদেব বলা হয় প্রেত। এই প্রেত অবস্থা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, কারণ তাদের বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার রয়েছে এবং তারা জড় জাগতিক জীবন উপভোগ করতে চায়, কিন্তু যেহেতু তাদের স্থূল জড় শরীর নেই, তাই তারা তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারে না, এবং তার ফলে তারা নানা রকম উৎপাত করে। পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির পুত্রের কর্তব্য হচ্ছে অর্যমা বা ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা। ভারতবর্ষে অনাদি কাল ধরে মৃত ব্যক্তির পুত্র গয়ায় গিয়ে প্রেতযোনি প্রাপ্ত পিতার উদ্ধারের জন্য, সেখানে বিষ্ণু মন্দিরে পিণ্ডদান করে আসছে। এমন নয় যে, সকলের পিতাই প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই পিণ্ড ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে নিবেদন করা হয়, যাতে বংশের কেউ যদি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তা হলে তিনি স্থূল শরীর প্রাপ্ত হবেন। কিন্তু কেউ যদি বিষ্ণুপ্রসাদ গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হওয়ার অথবা মনুষ্যেতর জন্ম লাভ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। বৈদিক সভ্যতায় মৃত আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করার মাধ্যমে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। কেউ যদি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে অথবা পিতৃলোকে ভগবানের প্রতিনিধি অর্যমাকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে, তা হলে তার পূর্বপুরুষেরা তাঁদের কর্ম অনুসারে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য স্থূল জড় শরীর প্রাপ্ত হতে পারেন। অর্থাৎ, তাঁদের প্রেতযোনি প্রাপ্ত হতে হয় না।

শ্লোক ১৯

প্রকল্প্য বৎসং কপিলং সিদ্ধাঃ সঙ্কল্পনাময়ীম্ ।
সিদ্ধিং নভসি বিদ্যাং চ যে চ বিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

প্রকল্প্য—নিযুক্ত করে; **বৎসম্**—বৎস; **কপিলম্**—কপিল মুনিকে; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধলোকবাসীরা; **সঙ্কল্পনা-ময়ীম্**—ইচ্ছা অনুসারে; **সিদ্ধিম্**—যোগসিদ্ধি; **নভসি**—আকাশে; **বিদ্যাম্**—জ্ঞান; **চ**—ও; **যে**—যাঁরা; **চ**—ও; **বিদ্যাধর-আদয়ঃ**—বিদ্যাধর প্রভৃতি।

অনুবাদ

তার পর সিদ্ধলোক-বাসীরা এবং বিদ্যাধরলোক-বাসীরা কপিল মুনিকে বৎসরূপে পরিণত করে, এবং আকাশকে পাত্র করে, অণিমা আদি যোগসিদ্ধি দোহন করেছিলেন। বস্তুত বিদ্যাধরেরা আকাশে উড়ার বিদ্যা লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধলোক ও বিদ্যাধরলোক-বাসীরা স্বভাবতই যোগশক্তি সমন্বিত, যার ফলে তাঁরা কেবল বিনা বিমানে অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করতেই সক্ষম, তাই নয়, তাঁরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে পর্যন্ত যেতে পারেন। মাছ যেমন জলে সন্তরণ করতে পারে, বিদ্যাধরেরা তেমনই বায়ুর সমুদ্রে সাঁতার দিতে পারেন। সিদ্ধলোক-বাসীরা সমস্ত যোগসিদ্ধি-সমন্বিত। এই লোকের যোগীরা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সমন্বিত অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করেন। নিয়মিতভাবে একটির পর একটি এই যোগের অনুশীলনের ফলে, যোগীরা নানা প্রকার সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁরা অণিমা, লঘিমা আদি যোগসিদ্ধি লাভ করেন। এমন কি তাঁরা একটি গ্রহ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেন, এবং তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু প্রাপ্ত হতে পারেন এবং যে কোন মানুষকে বশীভূত করতে পারেন সিদ্ধলোক-বাসীরা স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত যৌগিক ক্ষমতা সমন্বিত। এই গ্রহে আমরা যদি কোন মানুষকে বিনা যানে উড়তে দেখি, তা হলে তা অবশ্যই একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় হবে, কিন্তু বিদ্যাধরলোকে আকাশে উড়ার ব্যাপারটি পাখির আকাশে উড়ার মতোই সাধারণ ঘটনা। তেমনই, সিদ্ধলোকের সমস্ত অধিবাসীরা হচ্ছেন যোগসিদ্ধি-সমন্বিত মহাযোগী।

এই শ্লোকে কপিল মুনির নামটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্তক, এবং তাঁর পিতা কর্দম মুনি ছিলেন এক মহান সিদ্ধযোগী। কর্দম মুনি এমনই একটি বিমান তৈরি করেছিলেন, যা ছিল একটি ছোটখাটো শহরের মতো এবং তাতে নানা প্রকার উদ্যান, প্রাসাদ এবং বহু দাসদাসী ছিল। এই সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে কপিলদেবের মাতা দেবহূতি এবং পিতা কর্দম মুনি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

অন্যে চ মায়িনো মায়ামন্তর্ধানাদ্ভুতাত্মনাম্ ।
ময়ং প্রকল্প্য বৎসং তে দুদুহুর্ধারণাময়ীম্ ॥ ২০ ॥

অন্যে—অন্যরা, **চ**—ও; **মায়িনঃ**—মায়াবী যাদুকর; **মায়াম্**—মায়াবী শক্তি, **অন্তর্ধান**—অদৃশ্য হওয়ার; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **আত্মনাম্**—দেহের; **ময়ম্**—ময়দানব; **প্রকল্প্য**—পরিণত করে, **বৎসম্**—বৎস, তে—তাঁরা; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিলেন; **ধারণা-ময়ীম্**—ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

কিম্পুরুষের লোকবাসীরা ময়দানবকে বৎস বানিয়ে, সংকল্পমাত্র অদৃশ্য হওয়ার এবং অন্যরূপে আবির্ভূত হওয়ার বিদ্যা দোহন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কিম্পুরুষের লোকবাসীরা নানা রকম অদ্ভুত যোগশক্তি প্রদর্শন করতে পারেন। অর্থাৎ যত রকম আশ্চর্যজনক বস্তু কল্পনা করা যায়, তাঁরা তা সব প্রদর্শন করতে পারেন। কিম্পুরুষ-বাসীরা তাঁদের ইচ্ছামতো বা কল্পনা মাত্র যে কোন কার্য সাধন করতে পারেন। এইগুলিও যোগশক্তি। এই প্রকার যোগশক্তিকে *ঈশিতা* বলা হয়। অসুরেরা সাধারণত যোগ অভ্যাসের দ্বারা এই প্রকার শক্তি আয়ত্ত করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে, অসুরদের নানা রকম আশ্চর্যজনক রূপ পরিগ্রহ করে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আবির্ভূত হওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর গোপসখাদের সম্মুখে বকাসুর এক বিশাল বকপক্ষীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই গ্রহে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁকে বহু অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যারা কিম্পুরুষদের মতো অদ্ভুত যোগশক্তি প্রদর্শন করেছিল। কিম্পুরুষেরা যদিও স্বাভাবিকভাবে এই প্রকার শক্তিসমন্বিত, তবে যোগ অনুশীলনের ফলে, এই সমস্ত যোগশক্তি এই গ্রহলোকের যে কেউ লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২১

যক্ষরক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ ।
ভূতেশবৎসা দুদুহুঃ কপালে ক্ষতজাসবম্ ॥ ২১ ॥

যক্ষ—যক্ষগণ (কুবেরের বংশধরগণ), **রক্ষাংসি**—রাক্ষসেরা (মাংসভোজীরা), **ভূতানি**—ভূতেরা, **পিশাচাঃ**—পিশাচেরা; **পিশিত-অশনাঃ**—যারা মাংস আহারে অভ্যস্ত, **ভূতেশ**—শিবের অবতার রুদ্র, **বৎসাঃ**—বৎস, **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিলেন, **কপালে**—মাথার খুলির পাত্রে, **ক্ষতজ**—রক্ত, **আসবম্**—মদ্য।

অনুবাদ

তার পর যক্ষ, রাক্ষস, ভূত এবং পিশাচেরা, যারা মাংস আহারে অভ্যস্ত, তারা শিবের অবতার রুদ্রকে বৎসে পরিণত করে, নর-কপালরূপ পাত্রে রক্ত থেকে প্রস্তুত মদ্য দোহন করেছিল।

তাৎপর্য

মনুষ্যরূপী কিছু জীব রয়েছে, যাদের জীবন ধারণের উপায় এবং আহার অত্যন্ত জঘন্য। সাধারণত তাদের খাদ্য হচ্ছে মাংস এবং পানীয় হচ্ছে রক্ত থেকে প্রস্তুত মদ, যা এই শ্লোকে *ক্ষতজাসবম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তমোগুণাশ্রিত যক্ষ, রাক্ষস, ভূত এবং পিশাচেরা হচ্ছে এই প্রকার অধম মানুষদের নেতা। এরা সকলে রুদ্রের অধীন। রুদ্র হচ্ছেন তমোগুণের ঈশ্বর শিবের অবতার। শিবের অন্য আর একটি নাম হচ্ছে ভূতনাথ, অর্থাৎ 'ভূতদের প্রভু।' ব্রহ্মা যখন চার কুমারদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে রুদ্রের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ২২

তথাহয়ো দন্দশূকাঃ সর্পা নাগাশ্চ তক্ষকম্ ।
বিধায় বৎসং দুদুহুর্বিলপাত্রে বিষং পয়ঃ ॥ ২২ ॥

তথা—তেমনই, **অহয়ঃ**—ফণাহীন সর্প, **দন্দশূকাঃ**—বৃশ্চিক, **সর্পাঃ**—ফণাযুক্ত সর্প, **নাগাঃ**—বিশাল সর্প, **চ**—এবং; **তক্ষকম্**—সর্পদের নেতা তক্ষক, **বিধায়**—বানিয়ে, **বৎসম্**—বৎস, **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিল, **বিল-পাত্রে**—সাপের গর্তকে পাত্র বানিয়ে, **বিষম্**—বিষ; **পয়ঃ**—দুধের মতো।

অনুবাদ

তার পর ফণাহীন সর্প, ফণাযুক্ত সর্প, বিশাল নাগ, বৃশ্চিক এবং অন্যান্য সমস্ত বিষধর প্রাণীরা তক্ষককে বৎস বানিয়ে, সাপের গর্তরূপ পাত্রে পৃথিবী থেকে বিষ দোহন করেছিল।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে নানা প্রকার প্রাণী রয়েছে, এবং এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিভাবে সরীসৃপ এবং বৃশ্চিকদের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা ভগবান করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, সকলেই তাদের আহার্য পৃথিবী থেকে গ্রহণ করছে। জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে বিশেষ প্রকার চরিত্র গঠিত হয়। *পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাম্*—কেউ যদি সাপকে দুধ খাওয়ায়, তা হলে সাপের বিষই কেবল বর্ধিত হয়। কিন্তু, কেউ যদি কোন প্রতিভাশালী ঋষি অথবা মহাত্মাকে দুধ প্রদান করেন, তা হলে তাঁদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষগুলি বিকশিত হবে, যার ফলে তাঁরা উচ্চতর আধ্যাত্মিক চিন্তা করতে পারেন। এইভাবে ভগবান সকলকেই আহার প্রদান করছেন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে জীবের বিশেষ চরিত্র গঠিত হয়

শ্লোক ২৩-২৪

পশবো যবসং ক্ষীরং বৎসং কৃত্বা চ গোবৃষম্ ।
অরণ্যপাত্রে চাধুক্ষন্মৃগেন্দ্রেণ চ দংষ্ট্রিণঃ ॥ ২৩ ॥
ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনঃ ক্রব্যং দুদুহুঃ স্বে কলেবরে ।
সুপর্ণবৎসা বিহগাশ্চরং চাচরমেব চ ॥ ২৪ ॥

পশবঃ—পশু; **যবসম্**—সবুজ ঘাস; **ক্ষীরম্**—দুধ; **বৎসম্**—বৎস; **কৃত্বা**—পরিণত করে; **চ**—ও; **গো-বৃষম্**—শিবের বাহন বৃষ; **অরণ্য-পাত্রে**—অরণ্যরূপ পাত্রে, **চ**—ও, **অধুক্ষন্**—দোহন করেছিল; **মৃগ-ইন্দ্রেণ**—সিংহের দ্বারা; **চ**—এবং, **দংষ্ট্রিণঃ**—তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট পশু; **ক্রব্য-অদাঃ**—যে-সমস্ত পশু কাঁচা মাংস খায়; **প্রাণিনঃ**—জীব; **ক্রব্যম্**—মাংস; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিল; **স্বে**—নিজের; **কলেবরে**—তাদের দেহরূপ পাত্রে; **সুপর্ণ**—গরুড়; **বৎসাঃ**—বৎস; **বিহগাঃ**—পক্ষীরা; **চরম্**—জঙ্গম জীবেরা; **চ**—ও; **অচরম্**—স্থাবর জীবেরা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—ও।

অনুবাদ

গবাদি চতুষ্পদ প্রাণীরা শিবের বাহন বৃষকে বৎস করে এবং অরণ্যকে পাত্র করে তাদের আহারের জন্য তাজা সবুজ ঘাস দোহন করেছিল। ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুরা সিংহকে বৎস বানিয়ে তাদের আহার্যরূপে মাংস দোহন করেছিল। পক্ষীরা গরুড়কে বৎস বানিয়ে, পৃথিবী থেকে তাদের আহার্যরূপে জঙ্গম কীটপতঙ্গ এবং স্থাবর তৃণগুল্ম দোহন করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুড় থেকে বহু মাংসাশী পক্ষীর উদ্ভব হয়েছে। এক প্রকার পক্ষী আছে যারা বানর খেতে খুব ভালবাসে। ঈগল পাখিরা মেষশাবক আহার করতে ভালবাসে, আবার অন্য অনেক পাখি রয়েছে, যারা কেবল ফল খায়। তাই এই শ্লোকে *চরম্* শব্দে হচ্ছে জঙ্গম প্রাণী, এবং *অচরম্* শব্দে তৃণ, ফল আদি বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ২৫

বটবৎসা বনস্পতয়ঃ পৃথগ্রসময়ং পয়ঃ ।
গিরয়ো হিমবদ্বৎসা নানাধাতূন্ স্বসানুষু ॥ ২৫ ॥

বট-বৎসাঃ—বটবৃক্ষকে বৎস বানিয়ে, **বনঃ-পতয়ঃ**—বৃক্ষরাজি; **পৃথক্**—বিভিন্ন, **রস-ময়ম্**—রসরূপে; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **গিরয়ঃ**—পর্বত; **হিমবৎ-বৎসাঃ**—হিমালয়কে বৎস বানিয়ে; **নানা**—বিবিধ; **ধাতূন্**—ধাতু; **স্ব**—নিজেদের; **সানুষু**—তাদের চূড়ায়।

অনুবাদ

বৃক্ষরা বটবৃক্ষকে বৎস বানিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু রস দোহন করেছিল। পর্বতেরা হিমালয়কে বৎস বানিয়ে, শৃঙ্গরূপ পাত্রে বিভিন্ন প্রকার ধাতু দোহন করেছিল।

শ্লোক ২৬

সর্বে স্বমুখ্যবৎসেন স্বে স্বে পাত্রে পৃথক্ পয়ঃ ।
সর্বকামদুঘাং পৃথ্বীং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥ ২৬ ॥

সর্বে—সমস্ত; **স্ব-মুখ্য**—তাদের প্রধানদেব দ্বারা; **বৎসেন**—বৎসরূপে; **স্বে স্বে**—তাদের নিজেদের; **পাত্রে**—পাত্রে, **পৃথক্**—ভিন্ন ভিন্ন; **পয়ঃ**—দুধ; **সর্ব-কাম**—সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু; **দুঘাম্**—দুধরূপে; **পৃথ্বীম্**—পৃথিবীকে; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিল; **পৃথু-ভাবিতাম্**—মহারাজ পৃথুর নিয়ন্ত্রণাধীনে।

অনুবাদ

পৃথিবী সকলকে তাদের উপযুক্ত আহার প্রদান করেছিলেন। পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন। তার ফলে পৃথিবীর

সমস্ত প্রাণীরা তাদের স্ব স্ব জাতির প্রধান ব্যক্তিকে বৎসে পরিণত করে, বিভিন্ন প্রকার পাত্রে তাদের খাদ্যরূপ পৃথক পৃথক বস্তু লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যে সকলের আহার প্রদান করেন তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে। বেদেও বলা হয়েছে—*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* । ভগবান যদিও এক, তবুও তিনি সকলেব প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু পৃথিবীর মাধ্যমে প্রদান করেন। বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী রয়েছে, এবং তারা তাদের নিজেব নিজেব গ্রহলোক থেকে তাদের খাদ্যদ্রব্য বিভিন্নরূপে প্রাপ্ত হয়। এই বর্ণনার পর, মানুষ কিভাবে বলতে পারে যে, চন্দ্রলোকে কোন জীব নেই? পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত হওযার ফলে, প্রতিটি চন্দ্রলোক পার্থিব। প্রতিটি গ্রহলোক তাদের নিবাসীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উৎপাদন করে। চন্দ্রে কোন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না অথবা সেখানে কোন প্রাণী নেই বলে যে মতবাদ প্রচার হচ্ছে, বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে তা সত্য নয়।

শ্লোক ২৭

এবং পৃথ্বাদয়ঃ পৃথ্বীমন্নাদাঃ স্বন্নমাত্মনঃ ।
দোহবৎসাদিভেদেন ক্ষীরভেদং কুরূদ্বহ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **পৃথু-আদয়ঃ**—পৃথু মহারাজ এবং অন্যেরা; **পৃথ্বীম্**—পৃথিবীকে; **অন্ন-অদাঃ**—আহার করতে অভিলাষী সমস্ত জীবেরা; **সু-অন্নম্**—তাদের বাঞ্ছিত খাদ্য; **আত্মনঃ**—জীবন ধারণের জন্য; **দোহ**—দোহন করার জন্য; **বৎস-আদি**—বৎস, পাত্র এবং দোগ্ধা; **ভেদেন**—বিভিন্ন; **ক্ষীর**—দুধ; **ভেদম্**—বিভিন্ন; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর। এইভাবে পৃথু প্রমুখ অন্নভোজী জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন বৎস সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন দোহনপাত্রে তাদের অভীষ্ট খাদ্যরূপ দুগ্ধ দোহন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

ততো মহীপতিঃ প্রীতঃ সর্বকামদুঘাং পৃথুঃ ।
দুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্ণা দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তার পর; **মহী-পতিঃ**—রাজা; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **সর্ব-কাম**—সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু; **দুঘাম্**—দুগ্ধরূপে উৎপাদনকারী; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **দুহিতৃত্বে**—দুহিতারূপী; **চকার**—করেছিলেন; **ইমাম্**—এই পৃথিবীকে, **প্রেম্না**—স্নেহবশত; **দুহিতৃ-বৎসলঃ**—কন্যাবৎসল।

অনুবাদ

তার পর, পৃথিবী সমস্ত জীবদের বিভিন্ন প্রকার আহার্য প্রদান করেছিলেন বলে, পৃথু মহারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এবং তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়ে পৃথিবীকে দুহিতৃত্বে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

চূর্ণয়ন্ স্বধনুষ্কোট্যা গিরিকূটানি রাজরাট্ ।
ভূমণ্ডলমিদং বৈণ্যঃ প্রায়শ্চক্রে সমং বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

চূর্ণয়ন্—চূর্ণবিচূর্ণ করে, **স্ব**—নিজের; **ধনুঃ-কোট্যা**—ধনুকের বলের দ্বারা; **গিরি**—পর্বতের; **কূটানি**—শিখর; **রাজ-রাট্**—সম্রাট; **ভূ-মণ্ডলম্**—সমগ্র পৃথিবীর; **ইদম্**—এই; **বৈণ্যঃ**—বেণের পুত্র; **প্রায়ঃ**—প্রায়; **চক্রে**—করেছিলেন; **সমম্**—সমতল; **বিভুঃ**—শক্তিমান।

অনুবাদ

তার পর, রাজাধিরাজ মহারাজ পৃথু তাঁর ধনুকের শক্তির দ্বারা গিরিপর্বত চূর্ণবিচূর্ণ করে, পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করেছিলেন। তাঁরই কৃপায় পৃথিবী প্রায় সমতল হয়েছে।

তাৎপর্য

সাধারণত পৃথিবীর পার্বত্য অংশগুলি বজ্রাঘাতে সমতল করা হয়। সাধারণত সেটি স্বর্গলোকের দেবরাজ ইন্দ্রের কার্য, কিন্তু ভগবানের অবতার পৃথু মহারাজ সেই জন্য ইন্দ্রের প্রতীক্ষা করেননি। তিনি নিজেই তাঁর সুদৃঢ় ধনুকের দ্বারা সেই কার্য সম্পন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

অথাস্মিন্ ভগবান্ বৈণ্যঃ প্রজানাং বৃত্তিদঃ পিতা ।
নিবাসান্ কল্পয়াঞ্চক্রে তত্র তত্র যথার্হতঃ ॥ ৩০ ॥

অথ—এইভাবে; **অস্মিন্**—এই পৃথিবীর উপর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বৈণ্যঃ**—বেণপুত্র; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **বৃত্তিদঃ**—বৃত্তি প্রদানকারী; **পিতা**—পিতা; **নিবাসান্**—বাসস্থান; **কল্পয়াম্**—উপযুক্ত, **চক্রে**—বানিয়ে; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **যথা**—যেমন; **অর্হতঃ**—বাঞ্ছিত, উপযুক্ত।

অনুবাদ

রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের কাছে পৃথু মহারাজ ছিলেন ঠিক পিতার মতো। তাই তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি প্রদানে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করার পর, সকলের বৃত্তি এবং বাসনা অনুসারে, তিনি তাদের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

গ্রামান্ পুরঃ পত্তনানি দুর্গাণি বিবিধানি চ ।
ঘোষান্ ব্রজান্ সশিবিরানাকরান্ খেটখর্বটান্ ॥ ৩১ ॥

গ্রামান্—গ্রাম; **পুরঃ**—নগর; **পত্তনানি**—পত্তন; **দুর্গাণি**—দুর্গ; **বিবিধানি**—নানা প্রকার; **চ**—ও; **ঘোষান্**—গোপপল্লী; **ব্রজান্**—গোশালা; **স-শিবিরান্**—সেনানিবাস, **আকরান্**—খনি; **খেট**—কৃষকদের গ্রাম, **খর্বটান্**—পর্বতস্থ গ্রাম।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথু মহারাজ বহু গ্রাম, নগর, পত্তন, দুর্গ, ঘোষপল্লী, গোশালা, সেনানিবাস, খনি, কৃষকদের গ্রাম এবং পাহাড়ী গ্রাম প্রভৃতি বাসস্থান নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

প্রাক্‌পৃথোরিহ নৈবৈষা পুরগ্রামাদিকল্পনা ।
যথাসুখং বসন্তি স্ম তত্র তত্রাকুতোভয়াঃ ॥ ৩২ ॥

প্রাক্—পূর্বে; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **ইহ**—এই লোকে; **ন**—কখনই না, **এব**—নিশ্চিতভাবে; **এষা**—এই; **পুর**—নগরীর; **গ্রাম-আদি**—গ্রাম ইত্যাদি; **কল্পনা**—পরিকল্পিত ব্যবস্থা; **যথা**—যেমন, **সুখম্**—সুবিধাজনক, **বসন্তি স্ম**—বাস করেছিল; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **অকুতঃ-ভয়াঃ**—নির্ভয়ে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের রাজত্বকালের পূর্বে এই ভূমণ্ডলে নগর, গ্রাম, গোচারণভূমি ইত্যাদির পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না। সকলেই তাদের নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো এবং সুবিধামতো তাদের বাসস্থান তৈরি করত, এবং তার ফলে সব কিছুই অবিন্যস্ত ছিল। কিন্তু পৃথু মহারাজের সময় থেকে পরিকল্পনা অনুসারে, নগর ও গ্রাম পত্তনের ব্যবস্থা শুরু হয়।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, শহর এবং নগরের পরিকল্পনা নতুন নয়, তা চলে আসছে পৃথু মহারাজের সময় থেকে। ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রাচীন নগরেও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই প্রকার প্রাচীন নগরীর বহু বর্ণনা রয়েছে। এমন কি পাঁচ হাজার বছর আগেও, শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত মথুরা, হস্তিনাপুর (বর্তমান নতুন দিল্লী) ইত্যাদি নগরীও ছিল অত্যন্ত সুন্দর পরিকল্পনা অনুসারে। অতএব পরিকল্পনা অনুসারে নগর এবং শহর নির্মাণ আধুনিক যুগেই উদ্ভাবিত হয়নি, প্রাচীন যুগেও তা বিদ্যমান ছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজ কর্তৃক পৃথিবী দোহন' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

উনবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

অথাদীক্ষত রাজা তু হয়মেধশতেন সঃ ।
ব্রহ্মাবর্তে মনোঃ ক্ষেত্রে যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **অথ**—তার পর; **অদীক্ষত**—দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; **রাজা**—রাজা, **তু**—তখন; **হয়**—অশ্ব; **মেধ**—যজ্ঞ; **শতেন**—একশত অনুষ্ঠান করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **ব্রহ্মাবর্তে**—ব্রহ্মাবর্ত নামক; **মনোঃ**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **ক্ষেত্রে**—স্থানে; **যত্র**—যেখানে; **প্রাচী**—পূর্বমুখী, **সরস্বতী**—সরস্বতী নদী।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে প্রিয় বিদুর! স্বায়ম্ভুব মনুর ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্তে, যেখানে সরস্বতী নদী পূর্ববাহিনী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে পৃথু মহারাজ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

তদভিপ্রেত্য ভগবান্ কর্মাতিশয়মাত্মনঃ ।
শতক্রতুর্ন মমৃষে পৃথোর্যজ্ঞমহোৎসবম্ ॥ ২ ॥

তৎ অভিপ্রেত্য—এই বিষয়ে বিবেচনা করে; **ভগবান্**—পরম শক্তিশালী; **কর্ম-অতিশয়ম্**—সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পারদর্শী, **আত্মনঃ**—নিজের; **শত-ক্রতুঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র, যিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন; **ন**—না; **মমৃষে**—সহ্য করেছিলেন; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **মহা-উৎসবম্**—মহোৎসব।

অনুবাদ

মহা শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র যখন তা দেখলেন, তখন তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে পৃথু মহারাজ তাঁকে অতিক্রম করবেন। তাই পৃথু মহারাজের সেই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান তাঁর কাছে অসহ্য হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে আসে অথবা জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে আসে, তারা সকলেই পরস্পরের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হয়। এই মাৎসর্য দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যেও দেখা যায়। শাস্ত্রে দেখা গেছে যে, ইন্দ্র বেশ কয়েকবার অনেকের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হয়েছেন। তিনি বিশেষ করে মহান সকাম কর্ম অনুষ্ঠান এবং যোগ অভ্যাস বা সিদ্ধির প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ হন। তিনি তা সহ্য করতে পারেন না বলে, সেগুলির অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। ইন্দ্রের ভয় যে, কেউ হয়তো মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে অথবা যোগসিদ্ধি লাভ করে, তাঁর আসন দখল করে নেবে, তাই তিনি তাদের প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ হন। যেহেতু জড় জগতে কেউই অন্যের উন্নতি সহ্য করতে পারে না, তাই এই জড় জগতে সকলেই মৎসর। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে তাই বলা হয়েছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* তাদের জন্য যারা নির্মৎসর। অর্থাৎ, যারা মাৎসর্যরূপ কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তারা কৃষ্ণভক্তির মার্গে অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু, কৃষ্ণভক্তির পথে একজন যদি অপরকে অতিক্রম করে যান, তা হলে ভক্তরা মনে করেন, "আহা, এই ভক্তটি কত ভাগ্যবান যে, তিনি কি সুন্দরভাবে ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করছেন।" এই প্রকার নির্মৎসরতা বৈকুণ্ঠের বৈশিষ্ট্য। আর প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি মাৎসর্য জড় জগতের বৈশিষ্ট্য। দেবতারা জড় জাগতিক স্তরে রয়েছেন, তাই তাঁরা মাৎসর্য থেকে মুক্ত নন।

শ্লোক ৩

যত্র যজ্ঞপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
অন্বভূয়ত সর্বাত্মা সর্বলোকগুরুঃ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥

যত্র—যেখানে; **যজ্ঞ-পতিঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান, **হরিঃ**—শ্রীবিষ্ণু, **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **অন্বভূয়ত**—আবির্ভূত হয়েছিলেন, **সর্ব-আত্মা**—সকলের পরমাত্মা; **সর্ব-লোক-গুরুঃ**—সমস্ত গ্রহলোকের অধীশ্বর, অথবা সকলের গুরু; **প্রভুঃ**—অধীশ্বর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, এবং তিনি সমস্ত গ্রহলোকের অধীশ্বর ও সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। তিনি স্বয়ং পৃথু মহারাজের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সাক্ষাৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার। প্রকৃতপক্ষে পৃথু মহারাজ হচ্ছেন একজন জীব, কিন্তু তিনি ভগবান বিষ্ণু থেকে বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান, এবং তাই তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। পৃথু মহারাজ হচ্ছেন জীবতত্ত্ব। বিষ্ণুতত্ত্ব বলতে ভগবানকে বোঝায়, আর জীবতত্ত্ব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব যখন বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকে বলা হয় শক্ত্যাবেশ অবতার। এখানে শ্রীবিষ্ণুকে *হরিরীশ্বর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর ভক্তের সমস্ত কষ্ট দূর করে দেন। তাই তাঁকে বলা হয় হরি। তাঁকে ঈশ্বরও বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। পরম ঈশ্বর পুরুষোত্তম হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ঈশ্বররূপে বা পরম নিয়ন্তারূপে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন, যেমন *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) তিনি তাঁর ভক্তদের আশ্বাস দিয়েছেন— "সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে, কেবল আমার শরণাগত হও। তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় পেয়ো না।" ভক্ত যদি কেবল তাঁর শরণাগত হন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত করতে পারেন। এখানে তাঁকে *সর্বাত্মা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, এবং তাই তিনি সকলের পরম গুরু। আমরা যদি *ভগবদ্গীতায়* প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি, তা হলে আমাদের জীবন তৎক্ষণাৎ সার্থক হয়। মানব-সমাজকে শ্রীকৃষ্ণের থেকে ভাল উপদেশ আর কেউ দিতে পারে না।

শ্লোক ৪

অন্বিতো ব্রহ্মশর্বাভ্যাং লোকপালৈঃ সহানুগৈঃ ।
উপগীয়মানো গন্ধর্বৈর্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ ॥ ৪ ॥

অন্বিতঃ—সহ; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মার দ্বারা; **শর্বাভ্যাম্**—এবং শিবের দ্বারা; **লোক-পালৈঃ**—লোকপালদের দ্বারা; **সহ অনুগৈঃ**—তাদের অনুগামীগণ সহ; **উপগীয়-মানঃ**—প্রশংসিত হয়ে; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **মুনিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **চ**—ও; **অপ্সরঃ-গণৈঃ**—অপ্সরাদের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণু যখন যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা, শিব, লোকপালগণ এবং তাঁদের অনুচরেরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যখন তিনি সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন গন্ধর্ব, ঋষি এবং অপ্সরারা তাঁর যশকীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ৫

সিদ্ধা বিদ্যাধরা দৈত্যা দানবা গুহ্যকাদয়ঃ ।
সুনন্দনন্দপ্রমুখাঃ পার্ষদপ্রবরা হরেঃ ॥ ৫ ॥

সিদ্ধাঃ—সিদ্ধগণ; **বিদ্যাধরাঃ**—বিদ্যাধরগণ; **দৈত্যাঃ**—দিতির বংশধরগণ; **দানবাঃ**—দানবগণ; **গুহ্যক-আদয়ঃ**—যক্ষ প্রভৃতি; **সুনন্দ-নন্দ-প্রমুখাঃ**—বৈকুণ্ঠলোকে বিষ্ণুর প্রধান পার্ষদ সুনন্দ, নন্দ আদি; **পার্ষদ**—পার্ষদগণ; **প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব এবং যক্ষরাও ভগবানের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুনন্দ, নন্দ আদি মুখ্য পার্ষদেরাও ছিলেন।

শ্লোক ৬

কপিলো নারদো দত্তো যোগেশাঃ সনকাদয়ঃ ।
তমন্বীয়ুর্ভাগবতা যে চ তৎসেবনোৎসুকাঃ ॥ ৬ ॥

কপিলঃ—কপিল মুনি; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয়; **যোগ-ঈশাঃ**—যোগেশ্বরগণ; **সনক-আদয়ঃ**—সনক আদি; **তম্**—ভগবান বিষ্ণু; **অন্বীয়ুঃ**—অনুগমন করেছিলেন; **ভাগবতাঃ**—মহান ভক্তগণ; **যে**—যাঁরা সকলে; **চ**—ও; **তৎ-সেবন-উৎসুকাঃ**—সর্বদা তাঁর সেবা করতে উৎসুক।

অনুবাদ

সর্বদা ভগবানের সেবা করতে উৎসুক মহান ভক্তগণ এবং কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় প্রমুখ মহর্ষিগণ, ও সনকাদি যোগেশ্বরগণ, সকলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সেই মহান যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন।

শ্লোক ৭

যত্র ধর্মদুঘা ভূমিঃ সর্বকামদুঘা সতী ।
দোগ্ধি স্মাভীপ্সিতানর্থান্ যজমানস্য ভারত ॥ ৭ ॥

যত্র—যেখানে; **ধর্ম-দুঘা**—ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ উৎপাদনকারী; **ভূমিঃ**—পৃথিবী; **সর্ব কাম**—সমস্ত বাসনা; **দুঘা**—দুগ্ধরূপে উৎপাদনকারী; **সতী**—গাভী; **দোগ্ধি স্ম**—পূর্ণ হয়েছিল; **অভীপ্সিতান্**—বাঞ্ছিত; **অর্থান্**—বস্তুসমূহ; **যজমানস্য**—যজ্ঞকর্তার; **ভারত**—হে বিদুর।

অনুবাদ

হে বিদুর! সেই মহাযজ্ঞে সমগ্র ভূমি কামধেনুর মতো হয়েছিল, এবং সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, সকলের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ধর্ম-দুঘা* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'কামধেনু'। কামধেনুকে সুরভিও বলা হয়। সুরভি গাভী চিৎ-জগতে বিরাজ করে, যে-সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এই সুরভি গাভীদের পালন করেন—*সুরভীরভি-পালয়ন্তম্* । সুরভি গাভীকে যতবার ইচ্ছা দোহন করা যায়, এবং যত পরিমাণে ইচ্ছা দুধ পাওয়া যায়। নানা রকম আবশ্যকীয় পদার্থ উৎপাদনের জন্য দুধের প্রয়োজন, বিশেষ করে ঘি, যা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন হয়। আমরা যদি শাস্ত্র নির্দেশিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করি, তা হলে আমাদের জীবনের আবশ্যকতাগুলির সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রহ্মা যজ্ঞসহ মানুষদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। যজ্ঞ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কর্ম করা। এই যুগে বেদবিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য যোগ্য ব্রাহ্মণ পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পুরাকালে মহাযজ্ঞ

অনুষ্ঠানের ফলে যে-ফল লাভ হত, *(যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈঃ)* সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে, সেই ফল লাভ করা যায়। পৃথু মহারাজ এবং অন্যেরা মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে, পৃথিবী থেকে জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ এই সংকীর্তন যজ্ঞ শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃতের এই কার্যকলাপে যোগদান করে, মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সুফল লাভ করা মানুষের কর্তব্য; তা হলে তার কোন অভাব থাকবে না। যদি সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তা হলে আর কোন অসুবিধা থাকবে না, এমন কি যান্ত্রিক শিল্প উদ্যোগেও নয়। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, শিল্প উদ্যোগ ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষেত্রে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা উচিত। তা হলে সব কিছুই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং স্বচ্ছন্দভাবে সম্পাদিত হবে।

শ্লোক ৮

উহুঃ সর্বরসান্নদ্যঃ ক্ষীরদধ্যন্নগোরসান্ ।
তরবো ভূরিবর্ষ্মাণঃ প্রাসূয়ন্ত মধুচ্যুতঃ ॥ ৮ ॥

উহুঃ—বহন করেছিল; **সর্ব-রসান্**—সর্বপ্রকার রস; **নদ্যঃ**—নদীসমূহ; **ক্ষীর**—দুগ্ধ; **দধি**—দই; **অন্ন**—বিভিন্ন প্রকার খাদ্য; **গো-রসান্**—অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য; **তরবঃ**—বৃক্ষ; **ভূরি**—মহান; **বর্ষ্মাণঃ**—দেহধারী; **প্রাসূয়ন্ত**—ফল উৎপাদন করেছিল; **মধু-চ্যুতঃ**—মধুস্রাবী।

অনুবাদ

বহমান নদীসমূহ মধুর, কষায়, অম্ল ইত্যাদি সমস্ত রস বহন করেছিল, এবং বিশাল বৃক্ষসমূহ প্রচুর পরিমাণে ফল ও মধু উৎপাদন করেছিল। পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস খেয়ে, গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুধ, দই, ঘি এবং অন্যান্য সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ প্রদান করেছিল।

তাৎপর্য

নদীগুলি যদি দূষিত না হয় এবং তাদের নিজের গতিতে চলতে দেওয়া হয়, অথবা কখনও কখনও ভূমি প্লাবিত করতে দেওয়া হয়, তা হলে ভূমি অত্যন্ত উর্বর হবে এবং সব রকম শাক সবজি, বৃক্ষ ও লতা উৎপাদন হবে। *রস* শব্দটির অর্থ হচ্ছে

'স্বাদ'। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে সব কটি রস রয়েছে, এবং জমিতে বীজ বপন করা মাত্রই, আমাদের বিভিন্ন রস আস্বাদন করার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বৃক্ষরাজি অঙ্কুরিত হয় যেমন, ইক্ষু মধুর রস প্রদান করে, এবং লেবু অম্ল রস প্রদান করে, তার ফলে আমাদেব মধুর ও অম্ল রস আস্বাদনের বাসনা তৃপ্ত হয়। তেমনই আনারস আদি ফল রয়েছে। সেই সঙ্গে আবার আমাদের কটুস্বাদ আস্বাদনের তৃপ্তিসাধনের জন্য লঙ্কা রয়েছে। যদিও পৃথিবীর ভূমি এক, তবুও বিভিন্ন প্রকার বীজ থেকে বিভিন্ন প্রকার স্বাদের উদ্‌গম হয়। শ্রীকৃষ্ণ সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১০) বলেছেন, *বীজং মাং সর্বভূতানাম্* —"আমি সমস্ত অস্তিত্বের আদি বীজ।" তাই এখানে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। যে সম্বন্ধে *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে—*পূর্ণম্ ইদম্*। জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করার পরিপূর্ণ আয়োজন পরমেশ্বর ভগবান করে রেখেছেন। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কিভাবে যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করতে হয়, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করা, কারণ জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তাই জীব যাতে তার স্বরূপগত বৃত্তি অনুসারে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে, তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা না হলে, সমস্ত জীবেরা দুঃখকষ্ট ভোগ করবে। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

তরবো ভুবি-বর্ষ্মাণঃ শব্দগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ধিত বিশাল দেহযুক্ত বৃক্ষদের বোঝায়। এই সমস্ত বৃক্ষের উদ্দেশ্য হচ্ছে মধু ও বিভিন্ন প্রকার ফল উৎপাদন করা। অর্থাৎ অরণ্যেরও মধু, ফল ও ফুল সরবরাহ করার উদ্দেশ্য রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, যজ্ঞের অভাবে, এই কলিযুগে অরণ্যের বিশাল বৃক্ষগুলি যথেষ্ট পরিমাণে মধু ও ফল সরবরাহ করে না। এইভাবে সব কিছুই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। এই যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে সংকীর্তন আন্দোলন বিস্তার করা।

শ্লোক ৯

সিন্ধবো রত্ননিকরান্ গিরয়োঽন্নং চতুর্বিধম্ ।
উপায়নমুপাজহ্রুঃ সর্বে লোকাঃ সপালকাঃ ॥ ৯ ॥

সিন্ধবঃ—সমুদ্র; **রত্ন-নিকরান্**—রত্নসমূহ; **গিরয়ঃ**—পর্বত; **অন্নম্**—খাদ্যদ্রব্য; **চতুঃ-বিধম্**—চার প্রকার; **উপায়নম্**—উপহার; **উপাজহ্রুঃ**—নিয়ে এসেছিল; **সর্বে**—সমস্ত; **লোকাঃ**—গ্রহলোক-সমূহের জনসাধারণ; **স-পালকাঃ**—লোকপালগণ সহ।

অনুবাদ

সমুদ্র নানা প্রকার মূল্যবান রত্নসমূহে পূর্ণ ছিল, পর্বত ধাতুতে পূর্ণ ছিল এবং তার জমি ছিল অত্যন্ত উর্বর, এবং তাতে চতুর্বিধ খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন গ্রহলোকের লোকপালগণ ও জনসাধারণ পৃথু মহারাজের জন্য নানা প্রকার উপহার নিয়ে সেখানে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে যে, এই জগতে, কেবল মানুষদের জন্যই নয়, পশুপক্ষী, সরীসৃপ, জলচর এবং বৃক্ষ সকলেরই আবশ্যকীয় বস্তু উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে. সমুদ্র ও মহাসাগর মুক্তা, প্রবাল ও মণিমাণিক্য উৎপাদন করে, যাতে ভগবানের বাধ্য সৌভাগ্যবান মানুষেরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারে। তেমনই, পর্বতগুলি নানা রকম রাসায়নিক পদার্থে পূর্ণ, এবং প্রবহমান নদীগুলি সেগুলি শস্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়ে জমির উর্বরতা-সাধন করতে পারে, যাতে চতুর্বিধ খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। সেই চতুর্বিধ খাদ্য হচ্ছে—চর্ব্য (যে-সমস্ত খাদ্য চর্বণ করা হয়), লেহ্য (যেগুলি লেহন করা হয়), চূষ্য (যেগুলি চোষা যায়) এবং পেয় (যেগুলি পান করা যায়)।

অন্যলোকের অধিবাসীরা এবং লোকপালেরা পৃথু মহারাজকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁরা পৃথু মহারাজকে নানা প্রকার উপহার দিয়েছিলেন এবং একজন উপযুক্ত রাজারূপে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যাঁর পরিকল্পনায় ও কার্যকলাপে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারবে। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমুদ্র ও মহাসাগর মণিমাণিক্য উৎপাদনের জন্য, কিন্তু কলিযুগে সমুদ্রের প্রধান উপযোগিতা হচ্ছে মাছধরা। শূদ্র ও দরিদ্র মানুষদের মাছ ধরতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হত, কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আদি উচ্চ বর্ণের মানুষেরা সমুদ্র থেকে মুক্তা, প্রবাল, মণিমাণিক্য সংগ্রহ করতেন। দরিদ্র মানুষেরা যদিও সমুদ্র থেকে শত-শত মণ মাছ ধরতে পারে, কিন্তু তার মূল্য একটি মুক্তা অথবা প্রবালের সমান নয়। এই যুগে রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য কত কারখানা খোলা হয়েছে, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন পাহাড়-পর্বতগুলি আপনা থেকেই রাসায়নিক সার উৎপন্ন করে, যা শস্যক্ষেত্রে খাদ্যশস্য উৎপাদনে সাহায্য করে। এইভাবে সব কিছুই নির্ভর করে বৈদিক বিধি অনুসারে মানুষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবে কি না তার উপর।

শ্লোক ১০

ইতি চাধোক্ষজেশস্য পৃথোস্তু পরমোদয়ম্ ।
অসূয়ন্ ভগবানিন্দ্রঃ প্রতিঘাতমচীকরৎ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **চ**—ও; **অধোক্ষজ-ঈশস্য**—যিনি অধোক্ষজকে তাঁর পূজনীয় ভগবানরূপে স্বীকার করেছেন; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **তু**—তখন; **পরম**—সর্বোচ্চ, **উদয়ম্**—ঐশ্বর্য, **অসূয়ন্**—মাৎসর্য পরায়ণ হয়ে, **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র, **প্রতিঘাতম্**—বিঘ্ন, **অচীকরৎ**—করেছিলেন

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ অধোক্ষজ ভগবানের আশ্রিত ছিলেন। বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে, পৃথু মহারাজ ভগবানের কৃপায় অলৌকিক উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। কিন্তু পৃথু মহারাজের এই ঐশ্বর্য সহ্য করতে না পেরে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে, তাঁর যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করার চেষ্টা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অধোক্ষজ*, *ভগবান্ ইন্দ্রঃ* এবং *পৃথোঃ* এই তিনটি শব্দে তিনটি পৃথক উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। বিষ্ণুর অবতার হওয়া সত্ত্বেও, পৃথু মহারাজ ছিলেন বিষ্ণুর পরম ভক্ত শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার হলেও তিনি ছিলেন একটি জীব তাই ভগবানের ভক্ত হওয়াই তাঁর কর্তব্য ছিল। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার হলেও, ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় কলিযুগে ঢেঁড়া পেটানো বহু অবতার রয়েছে, যারা প্রকৃতপক্ষে এক একটি পাষণ্ডী। *ভগবান্ ইন্দ্রঃ* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, জীব দেবরাজ ইন্দ্রের মতো শক্তিশালী ও পূজনীয় হতে পারে, কারণ ইন্দ্র হচ্ছেন সাধারণ জীব এবং তাঁর মধ্যে বদ্ধ জীবের চারটি দোষ রয়েছে। ইন্দ্রকে এখানে *ভগবান্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যে-শব্দটি সাধারণত পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এখানে ইন্দ্রকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তাঁর হাতে অনেক ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ভগবান হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভগবানের অবতার পৃথু মহারাজের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ। জড়-জাগতিক জীবনের দোষ এতই প্রবল যে, সেই কলুষের ফলে ইন্দ্রও ভগবানের অবতারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

তাই আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, বদ্ধ জীবের অধঃপতন কিভাবে হয়। পৃথু মহারাজের ঐশ্বর্য জড় জাগতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল না। এই

শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন *অধোক্ষজের* পরম ভক্ত। *অধোক্ষজ* বলতে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝায়, যিনি মন ও বাক্যের অতীত। কিন্তু, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপে তাঁর ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন। ভক্ত প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, যদিও ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয় ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির অতীত।

শ্লোক ১১

চরমেণাশ্বমেধেন যজমানে যজুষ্পতিম্ ।
বৈণ্যে যজ্ঞপশুং স্পর্ধন্নপোবাহ তিরোহিতঃ ॥ ১১ ॥

চরমেণ—অন্তিম; **অশ্ব-মেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **যজমানে**—যখন তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন; **যজুঃ-পতিম্**—যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **বৈণ্যে**—রাজা বেণের পুত্র; **যজ্ঞ-পশুম্**—যজ্ঞে উৎসর্গ করার পশু; **স্পর্ধন্**—মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে, **অপোবাহ**—চুরি করেছিলেন; **তিরোহিতঃ**—অদৃশ্য হয়ে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ যখন শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞটি অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন ইন্দ্র সকলের অলক্ষ্যে যজ্ঞাশ্বটি অপহরণ করেন। পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে, তিনি তা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ইন্দ্র শতক্রতু নামে পরিচিত, কারণ তিনি এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে, যজ্ঞে যে পশুবলি দেওয়া হয়, তাকে হত্যা করা হয় না। যজ্ঞের সময় যথাযথভাবে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রের প্রভাবে উৎসর্গীকৃত পশু নবজীবন লাভ করে ফিরে আসে। সেটি হচ্ছে যজ্ঞ সার্থক হয়েছে কি না তার পরীক্ষা। পৃথু মহারাজ যখন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁর প্রতি অত্যন্ত মাৎসর্য-পরায়ণ হয়েছিলেন, কারণ তিনি চাননি যে, কেউ তাঁকে অতিক্রম করুক। ইন্দ্র একজন সাধারণ জীব হওয়ার ফলে, পৃথু মহারাজের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন, এবং নিজেকে অদৃশ্য রেখে, তিনি যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ১২

তমত্রির্ভগবানৈক্ষত্ত্বরমাণং বিহায়সা ।
আমুক্তমিব পাখণ্ডং যোঽধর্মে ধর্মবিভ্রমঃ ॥ ১২ ॥

তম্—দেবরাজ ইন্দ্র; **অত্রিঃ**—ঋষি অত্রি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **ঐক্ষৎ**—দেখতে পেয়েছিলেন; **ত্বরমাণম্**—অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গমন করছেন; **বিহায়সা**—আকাশ মার্গে; **আমুক্তম্ ইব**—মুক্ত পুরুষের মতো; **পাখণ্ডম্**—পাষণ্ড; **যঃ**—যে; **অধর্মে**—অধর্মতে; **ধর্ম**—ধর্ম; **বিভ্রমঃ**—ভুল করে।

অনুবাদ

ইন্দ্র যখন ঘোড়াটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি মুক্ত পুরুষের বেশ ধারণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই বেশ ছিল এক প্রকার প্রতারণা, কারণ তখন তাঁর আচরণ ভ্রমবশত ধর্মাচরণ বলে মনে হয়েছিল। ইন্দ্র যখন আকাশমার্গে এইভাবে পলায়ন করছিলেন, তখন মহর্ষি অত্রি তাঁকে দেখতে পান এবং সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ব্যবহৃত *পাখণ্ড* শব্দটি কখনও *পাষণ্ড* বলেও উচ্চারণ করা হয়। এই শব্দ দুটি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ইঙ্গিত করে, যারা অত্যন্ত ধার্মিক হওয়ার অভিনয় করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা অত্যন্ত পাপী। ইন্দ্র অন্যদের প্রতারণা করার জন্য গৈরিক বসন ধারণ করেছিলেন। নিজেদের মুক্ত পুরুষ বলে প্রচারকারী অথবা ভগবানের অবতার বলে প্রচারকারী বহু ভণ্ডরা এই গৈরিক বসন অপব্যবহার করেছে। তার ফলে মানুষ প্রতারিত হয়েছে। আমরা বহুবার উল্লেখ করেছি যে, বদ্ধ জীবের প্রতারণা করার প্রবণতা থাকে; তাই সেই প্রবণতাটি দেবরাজ ইন্দ্রের মতো ব্যক্তির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। সেই সূত্রে বোঝা যায় যে, দেবরাজ ইন্দ্রও জড় কলুষ থেকে মুক্ত নন। তাই *আমুক্তম্ ইব* অর্থাৎ, 'যেন একজন মুক্ত পুরুষ' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন সারা জগতের কাছে ঘোষণা করে যে, তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় ত্যাগ করেছেন এবং তিনি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত। সেই প্রকার ভগবদ্ভক্তই প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী বা মুক্ত পুরুষ। *ভগবদ্গীতায়* (৬/১) বলা হয়েছে—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥

"যিনি কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কর্তব্যবোধে কার্য করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, এবং তিনিই প্রকৃত যোগী, যারা আগুন জ্বালায় না অথবা কর্ম করে না তারা নয়।"

অর্থাৎ যিনি তাঁর কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং যোগী। প্রতারক সন্ন্যাসী ও যোগী পৃথু মহারাজের যজ্ঞের সময় থেকেই রয়েছে। এই প্রতারণা দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত মূর্খের মতো প্রবর্তন করেছেন। কোন কোন যুগে এই প্রতারণা অত্যন্ত প্রবল হয়, এবং অন্য কোন যুগে ততটা প্রবল হয় না। সন্ন্যাসীর কর্তব্য অত্যন্ত সতর্ক থাকা, কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১২/৫১)। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিক না হলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য এই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ না করাই ভাল, কারণ এই যুগে মায়ার প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল। পারমার্থিক উপলব্ধিতে অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তিরই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। জীবিকা উপার্জনের জন্য অথবা কোন জড় জাগতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৩

অত্রিণা চোদিতো হন্তুং পৃথুপুত্রো মহারথঃ।
অন্বধাবত সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥

অত্রিণা—মহর্ষি অত্রির দ্বারা; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **পৃথু-পুত্রঃ**—পৃথু মহারাজের পুত্র; **মহা-রথঃ**—একজন মহাবীর; **অন্বধাবত**—অনুসরণ করেছিলেন; **সংক্রুদ্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **তিষ্ঠ তিষ্ঠ**—দাঁড়াও দাঁড়াও; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—ও; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি অত্রি যখন পৃথু মহারাজের পুত্রকে ইন্দ্রের ছলনার কথা জানান, তখন সেই পরম বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে "দাঁড়াও! দাঁড়াও!" বলতে বলতে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় যখন শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করে, তখন *তিষ্ঠ তিষ্ঠ* শব্দগুলি তারা প্রয়োগ করে। যুদ্ধ করার সময়, ক্ষত্রিয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে পারে না। কিন্তু

কোন ক্ষত্রিয় যদি কাপুরুষের মতো তার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, তখন তাকে *তিষ্ঠ তিষ্ঠ* শব্দের দ্বারা যুদ্ধ করতে আহ্বান করা হয়। যথার্থ ক্ষত্রিয় কখনও তার শত্রুকে পিছন থেকে হত্যা করে না, এবং যথার্থ ক্ষত্রিয় কখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনও করে না। ক্ষত্রিয়নীতি ও তেজ অনুসারে, হয় যুদ্ধে জয়লাভ, নয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করতে হয়। স্বর্গের রাজা হওয়ার ফলে, ইন্দ্রের পদ যদিও অত্যন্ত উন্নত, তবুও যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করার ফলে তিনি অধঃপতিত হয়েছিলেন। তাই তিনি ক্ষত্রিয়নীতি অনুসরণ না করেই, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন, এবং পৃথু মহারাজের পুত্র *তিষ্ঠ তিষ্ঠ* বলে তাঁকে যুদ্ধ করতে আহ্বান করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তং তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য মেনে ধর্মং শরীরিণম্ ।
জটিলং ভস্মনাচ্ছন্নং তস্মৈ বাণং ন মুঞ্চতি ॥ ১৪ ॥

তম্—তাঁকে; **তাদৃশ-আকৃতিম্**—সেই বেশে; **বীক্ষ্য**—দেখে; **মেনে**—মনে করে; **ধর্মম্**—ধর্মপরায়ণ; **শরীরিণম্**—দেহধারী; **জটিলম্**—জটা-সমন্বিত; **ভস্মনা**—ভস্মের দ্বারা; **আচ্ছন্নম্**—আচ্ছাদিত, **তস্মৈ**—তাঁকে, **বাণম্**—শর; **ন**—না; **মুঞ্চতি**—নিক্ষেপ করেন।

অনুবাদ

ইন্দ্রকে জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত দেখে, পৃথুর পুত্র তাঁকে একজন ধর্মাত্মা ও পবিত্র সন্ন্যাসী বলে মনে করেছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেননি।

শ্লোক ১৫

বধান্নিবৃত্তং তং ভূয়ো হন্তবেঽত্রিরচোদয়ৎ ।
জহি যজ্ঞহনং তাত মহেন্দ্রং বিবুধাধমম্ ॥ ১৫ ॥

বধাৎ—বধ করা থেকে, **নিবৃত্তম্**—নিবৃত্ত হয়ে; **তম্**—পৃথুর পুত্র; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **হন্তবে**—হত্যা করার উদ্দেশ্যে; **অত্রিঃ**—মহর্ষি অত্রি; **অচোদয়ৎ**—অনুপ্রাণিত করেছিলেন; **জহি**—হত্যা কর; **যজ্ঞ-হনম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্নকারী; **তাত**—হে পুত্র; **মহা ইন্দ্রম্**—মহান দেবরাজ ইন্দ্রকে; **বিবুধ-অধমম্**—দেবাধমকে।

অনুবাদ

অত্রি যখন দেখলেন যে, ইন্দ্রকে বিনাশ না করে, মহারাজ পৃথুর পুত্র তাঁর দ্বারা প্রতারিত হয়ে ফিরে এসেছেন, তখন অত্রি মুনি তাঁকে পুনরায় হত্যা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, পৃথু মহারাজের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য, ইন্দ্র সমস্ত দেবতাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হয়ে গেছে।

শ্লোক ১৬

এবং বৈণ্যসুতঃ প্রোক্তস্ত্বরমাণং বিহায়সা ।
অন্বদ্রবদভিক্রুদ্ধো রাবণং গৃধ্ররাড়িব ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **বৈণ্য সুতঃ**—মহারাজ পৃথুর পুত্র; **প্রোক্তঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **ত্বরমাণম্**—দ্রুত গতিতে গমনকারী ইন্দ্র; **বিহায়সা**—আকাশে, **অন্বদ্রবৎ**—পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; **অভিক্রুদ্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, **রাবণম্**—রাবণ, **গৃধ্র রাট্**—শকুনিদের রাজা; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সেই কথা শুনে, বেণ রাজার পৌত্র তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আকাশমার্গে পলায়নরত ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং শকুনিদের রাজা জটায়ু যেভাবে রাবণের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে তিনি ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

সোহশ্বং রূপং চ তদ্ধিত্বা তস্মা অন্তর্হিতঃ স্বরাট্ ।
বীরঃ স্বপশুমাদায় পিতুর্যজ্ঞমুপেয়িবান্ ॥ ১৭ ॥

সঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; **অশ্বম্**—ঘোড়া; **রূপম্**—সাধুর ছদ্মবেশ; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **তস্মৈ**—তাঁর জন্য; **অন্তর্হিতঃ**—অদৃশ্য হয়েছিলেন; **স্ব-রাট্**—ইন্দ্র, **বীরঃ**—মহাবীর; **স্ব পশুম্**—তাঁর পশু; **আদায়**—গ্রহণ করে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার, **যজ্ঞম্**—যজ্ঞে; **উপেয়িবান্**—তিনি ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

ইন্দ্র যখন দেখলেন যে, পৃথুর পুত্র তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে, ঘোড়াটি রেখে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। মহাবীর পৃথুপুত্র সেই অশ্বটি নিয়ে তাঁর পিতার যজ্ঞস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

তত্তস্য চাদ্ভুতং কর্ম বিচক্ষ্য পরমর্ষয়ঃ ।
নামধেয়ং দদুস্তস্মৈ বিজিতাশ্ব ইতি প্রভো ॥ ১৮ ॥

তৎ—সেই; **তস্য**—তাঁর; **চ**—ও, **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **বিচক্ষ্য**—দর্শন করে; **পরম-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ, **নামধেয়ম্**—নাম; **দদুঃ**—প্রদান করেছিলেন, **তস্মৈ**—তাঁকে; **বিজিত-অশ্বঃ**—বিজিতাশ্ব (যিনি অশ্ব জয় করেছেন), **ইতি**—এইভাবে; **প্রভো**—হে বিদুর।

অনুবাদ

হে বিদুর! মহর্ষিরা মহারাজ পৃথুর পুত্রের এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করে, তাঁকে বিজিতাশ্ব নাম প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

উপসৃজ্য তমস্তীব্রং জহারাশ্বং পুনর্হরিঃ ।
চষালযূপতশ্ছন্নো হিরণ্যরশনং বিভুঃ ॥ ১৯ ॥

উপসৃজ্য—সৃষ্টি করে; **তমঃ**—অন্ধকার; **তীব্রম্**—ঘন; **জহার**—নিয়ে গিয়েছিলেন, **অশ্বম্**—ঘোড়া; **পুনঃ**—পুনরায়, **হরিঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **চষাল-যূপতঃ**—পশু বলি দেওয়ার যূপকাষ্ঠ থেকে; **ছন্নঃ**—আচ্ছাদিত করে; **হিরণ্য-রশনম্**—স্বর্ণশৃঙ্খলের দ্বারা বদ্ধ; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান।

অনুবাদ

হে বিদুর! অত্যন্ত শক্তিশালী স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তখন ঘন অন্ধকারের দ্বারা যজ্ঞস্থল আচ্ছন্ন করে, স্বর্ণশৃঙ্খলের দ্বারা যূপকাষ্ঠে বেঁধে রাখা সেই অশ্বটিকে পুনরায় অপহরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

অত্রিঃ সন্দর্শয়ামাস ত্বরমাণং বিহায়সা ।
কপালখট্বাঙ্গধরং বীরো নৈনমবাধত ॥ ২০ ॥

অত্রিঃ—মহর্ষি অত্রি, **সন্দর্শয়াম্ আস**—দেখিয়েছিলেন, **ত্বরমাণম্**—অত্যন্ত দ্রুতবেগে গমনকারী, **বিহায়সা**—আকাশে; **কপাল খট্বাঙ্গ**—নরকপাল সমন্বিত যষ্টি, **ধরম্**—ধারণকারী, **বীরঃ**—বীর (মহারাজ পৃথুর পুত্র); **ন**—না, **এনম্** দেবরাজ ইন্দ্র, **অবাধত**—হত্যা করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি অত্রি পুনরায় পৃথু মহারাজের পুত্রকে দেখিয়েছিলেন যে, আকাশমার্গে ইন্দ্র পলায়ন করছে। মহাবীর পৃথুপুত্র তখন পুনরায় তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, ইন্দ্র কপাল ও খট্বাঙ্গ ধারণ করেছেন, তখন তিনি তাঁকে হত্যা না করতে স্থির করেছিলেন।

শ্লোক ২১

অত্রিণা চোদিতস্তস্মৈ সন্দধে বিশিখং রুষা ।
সোঽশ্বং রূপং চ তদ্ধিত্বা তস্থাবন্তর্হিতঃ স্বরাট্ ॥ ২১ ॥

অত্রিণা—মহর্ষি অত্রির দ্বারা, **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **তস্মৈ**—দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি, **সন্দধে**—যোজন করেছিলেন, **বিশিখম্**—তাঁর বাণ; **রুষা**—মহাক্রোধে, **সঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র, **অশ্বম্**—ঘোড়া, **রূপম্**—সন্ন্যাসীর বেশধারী, **চ**—ও, **তৎ**—তা, **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **তস্থৌ**—স্থিত, **অন্তর্হিতঃ**—অদৃশ্য, **স্ব-রাট্**—স্বাধীন ইন্দ্র

অনুবাদ

মহর্ষি অত্রি যখন পুনরায় তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তখন পৃথু মহারাজের পুত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনুকে বাণ যোজন করলেন। তা দেখে ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ এবং অশ্ব পরিত্যাগ করে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

বীরশ্চাশ্বমুপাদায় পিতৃযজ্ঞমথাব্রজৎ ।
তদবদ্যং হরে রূপং জগৃহুর্জ্ঞানদুর্বলাঃ ॥ ২২ ॥

বীরঃ—পৃথু মহারাজের পুত্র; **চ**—ও; **অশ্বম্**—ঘোড়া; **উপাদায়**—গ্রহণ করে; **পিতৃ-যজ্ঞম্**—তাঁর পিতার যজ্ঞস্থলে; **অথ**—তার পর; **অব্রজৎ**—গিয়েছিলেন; **তৎ**—সেই; **অবদ্যম্**—নিন্দনীয়; **হরেঃ**—ইন্দ্রের; **রূপম্**—বেশ; **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছিল; **জ্ঞান-দুর্বলাঃ**—যাদের জ্ঞান অল্প।

অনুবাদ

তার পর মহারাজ পৃথুর পুত্র বিজিতাশ্ব পুনরায় সেই অশ্বটি নিয়ে তাঁর পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। সেই সময় থেকে যারা মন্দবুদ্ধি, তারা কপট সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করেছিল। ইন্দ্রই তার প্রবর্তন করেছেন।

তাৎপর্য

অনাদিকাল ধরে সন্ন্যাস আশ্রমীরা ত্রিদণ্ড ধারণ করে আসছেন। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য একদণ্ডী সন্ন্যাস প্রবর্তন করেন। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী হচ্ছেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, এবং একদণ্ডী সন্ন্যাসী হচ্ছে মায়াবাদী সন্ন্যাসী। অন্যান্য আরও অনেক প্রকার সন্ন্যাসী রয়েছে, যাদের বৈদিক বিধিতে অনুমোদন করা হয়নি। পৃথু মহারাজের মহান পুত্র বিজিতাশ্বের আক্রমণ থেকে লুকাবার জন্য ইন্দ্র যে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন, তার ফলে এক প্রকার কপট সন্ন্যাসীর প্রবর্তন হয়েছে। সেই থেকে এখন নানা প্রকার কপট সন্ন্যাসী দেখা দিয়েছে। তাদের কেউ উলঙ্গ হয়ে থাকে, এবং কেউ নরকপাল ও ত্রিশূল ধারণ করে। সাধারণত তাদের বলা হয় কাপালিক। এক অর্থহীন পরিস্থিতি থেকে সেগুলির প্রবর্তন হয়েছে। যারা মূর্খ তারাই এদের সন্ন্যাসী বলে মনে করে, এবং এদের ভণ্ডামিকে ধর্ম আচরণ বলে মনে করে। এরা কখনই পারমার্থিক পথপ্রদর্শক নয়। এখন কতকগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও, যাদের বৈদিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক নেই, তারা এক প্রকার সন্ন্যাসী তৈরি করেছে, যারা পাপপূর্ণ কার্যকলাপে যুক্ত থাকে। যে-সমস্ত পাপকর্ম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া। এই সমস্ত তথাকথিত সন্ন্যাসীরা এই সব কটি পাপকর্মে লিপ্ত হয়। তারা মাংস, মাছ, ডিম এবং প্রায় সব কিছুই খায়। কখনও কখনও তারা সুরাও পান করে, এবং তাদের অজুহাত হচ্ছে যে, মাছ-মাংস এবং মদ না খেলে, মেরু-প্রদেশের নিকটবর্তী ঠাণ্ডা দেশগুলিতে থাকা অসম্ভব। এই সমস্ত সন্ন্যাসীরা দরিদ্রদের সেবা করার নামে এই সকল পাপকর্মের প্রচলন করে, যার ফলে নিরীহ পশুদের বধ করা হয়, যাতে সেগুলির দ্বারা সেই সমস্ত সন্ন্যাসীদের উদরপূর্তি হতে পারে।

পরবর্তী শ্লোকে এই সমস্ত সন্ন্যাসীদের *পাখণ্ডী* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা নারায়ণকে শিব অথবা ব্রহ্মার সমকক্ষ বলে মনে করে, তারা হচ্ছে পাখণ্ডী। যে-সম্বন্ধে পুরাণে বলা হয়েছে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

কলিযুগে পাখণ্ডীরা অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করবে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলন প্রবর্তন করার মাধ্যমে এই সমস্ত পাখণ্ডীদের সংহার করার ব্যবস্থা করেছেন। যাঁরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ কর্তৃক প্রবর্তিত সংকীর্তন আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করবেন, তাঁরা এই সমস্ত পাখণ্ডীদের প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন।

শ্লোক ২৩

যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া ।
তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গং খণ্ডমিহোচ্যতে ॥ ২৩ ॥

যানি—যে সব; **রূপাণি**—রূপ; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছেন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র, **হয়**—অশ্ব, **জিহীর্ষয়া**—চুরি করার ইচ্ছায়, **তানি**—সেই সমস্ত; **পাপস্য**—পাপকর্মের; **খণ্ডানি**—চিহ্ন; **লিঙ্গম্**—প্রতীক; **খণ্ডম্**—'খণ্ড' শব্দ, **ইহ**—এখানে; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যজ্ঞাশ্ব অপহরণের চেষ্টায় ইন্দ্র যে-সমস্ত সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেছিলেন, সেগুলি নাস্তিক্য দর্শনের প্রতীক।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় সন্ন্যাস আশ্রম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার একটি মুখ্য অঙ্গ। আচার্য-পরম্পরা অনুসারে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ তথাকথিত সন্ন্যাসীদেরই ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। এই প্রকার সন্ন্যাসের প্রবর্তন হয়েছে পৃথু মহারাজের প্রতি ইন্দ্রের ঈর্ষা থেকে, এবং ইন্দ্র যা প্রবর্তন করে গেছেন, তা আবার এই কলিযুগে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই যুগের

কোন সন্ন্যাসীই প্রামাণিক নয়। বৈদিক ব্যবস্থায় কারোরই কোন নতুন পন্থা প্রবর্তন করার অধিকার নেই। কেউ যদি ঈর্ষাবশত তা করে, তা হলে তাকে বলা হয় *পাষণ্ডী* বা নাস্তিক। *বৈষ্ণব তন্ত্রে* বলা হয়েছে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

যদিও ব্রহ্মা এবং শিবও নারায়ণের সমকক্ষ নন, তবুও আজকাল বহু পাষণ্ডী দরিদ্র-নারায়ণ, স্বামী-নারায়ণ ইত্যাদি আখ্যা প্রবর্তন করেছে। এগুলি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

শ্লোক ২৪–২৫

এবমিন্দ্রে হরত্যশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া ।
তদ্‌গৃহীতবিসৃষ্টেষু পাখণ্ডেষু মতির্নৃণাম্ ॥ ২৪ ॥
ধর্ম ইত্যুপধর্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু ।
প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু ॥ ২৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **ইন্দ্রে**—দেবরাজ ইন্দ্র যখন; **হরতি**—হরণ করেছিলেন; **অশ্বম্**—ঘোড়া; **বৈণ্য**—রাজা বেণের পুত্রের; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **জিঘাংসয়া**—বন্ধ করার বাসনায়; **তৎ**—তাঁর দ্বারা; **গৃহীত**—গৃহীত; **বিসৃষ্টেষু**—ত্যক্ত; **পাখণ্ডেষু**—পাপপূর্ণ বেশের প্রতি; **মতিঃ**—আকর্ষণ; **নৃণাম্**—জনসাধারণের; **ধর্মঃ**—ধর্মপদ্ধতি; **ইতি**—এইভাবে; **উপধর্মেষু**—ছলধর্মের প্রতি; **নগ্ন**—উলঙ্গ; **রক্ত-পট**—রক্তবর্ণ বেশ; **আদিষু**—ইত্যাদি; **প্রায়েণ**—সাধারণত; **সজ্জতে**—আকৃষ্ট হয়; **ভ্রান্ত্যা**—মূর্খতাবশত; **পেশলেষু**—পটু; **চ**—এবং; **বাগ্মিষু**—বাক্‌পটু।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথু মহারাজের যজ্ঞের অশ্ব হরণ করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কয়েকটি সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে কপট সন্ন্যাস প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। কিছু সন্ন্যাসী নগ্ন থাকে, এবং কখনও কখনও তারা রক্তবর্ণের বেশ ধারণ করে; তাদের বলা হয় কাপালিক। এগুলি কেবল পাপকর্মের প্রতীক মাত্র। পাপাসক্ত মানুষেরা এই তথাকথিত সন্ন্যাসীদের খুব সমাদর করে, কারণ তারা সকলেই হচ্ছে ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিক। তারা তাদের নিজেদের মতবাদ স্থাপন করার ব্যাপারে অত্যন্ত বাকপটু। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে, তাদের ধর্ম-আচরণকারী বলে

মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা তা নয়। দুর্ভাগ্যবশত মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা তাদের ধার্মিক বলে মনে করে, এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের সর্বনাশ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলিযুগের মানুষেরা অল্প আয়ুসম্পন্ন, পারমার্থিক জ্ঞানহীন এবং তাদের দুর্ভাগ্যের ফলে, কপটতাকে ধর্ম বলে মনে করবে। তার ফলে তারা সর্বদাই মানসিক কষ্ট ভোগ করবে। এই কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ করা বৈদিক শাস্ত্রে এক রকম নিষিদ্ধ হয়েছে, কারণ অল্পবুদ্ধি মানুষেরা প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ধর্ম হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়ার ধর্ম। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করা অবশ্য কর্তব্য। সন্ন্যাস আশ্রম এবং ধর্ম অনুষ্ঠানের অন্যান্য যে-সমস্ত পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রামাণিক নয়। এইযুগে সেগুলি ধর্মের নামে চলছে সেটিই সব চাইতে অনুশোচনার বিষয়।

শ্লোক ২৬

তদভিজ্ঞায় ভগবান্ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ ।
ইন্দ্রায় কুপিতো বাণমাদত্তোদ্যতকার্মুকঃ ॥ ২৬ ॥

তৎ—সেই; **অভিজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **ভগবান্**—ভগবানের অবতার; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **পৃথু-পরাক্রমঃ**—অত্যন্ত পরাক্রমশালী; **ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রের উপর; **কুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, **বাণম্**—বাণ; **আদত্ত**—গ্রহণ করেছিলেন; **উদ্যত**—প্রস্তুত হয়েছিলেন, **কার্মুকঃ**—ধনুক।

অনুবাদ

অত্যন্ত পরাক্রমশালী মহারাজ পৃথু তৎক্ষণাৎ তাঁর ধনুর্বাণ গ্রহণ করে ইন্দ্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কারণ ইন্দ্র এই প্রকার অধার্মিক সন্ন্যাসপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজার কর্তব্য হচ্ছে কোন রকম অধার্মিক পদ্ধতি প্রচলিত হতে না দেওয়া। পৃথু মহারাজ যেহেতু ছিলেন ভগবানের অবতার, তাই অবশ্যই তাঁর কর্তব্য ছিল সব রকম অধার্মিক প্রথা উচ্ছেদ করা। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, রাষ্ট্রপ্রধানদের

ভগবানের প্রামাণিক প্রতিনিধি হয়ে, সব রকম অধার্মিক পদ্ধতি উচ্ছেদ করা কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত, যে-সমস্ত রাষ্ট্রনেতারা রাজ্যকে ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করে, তারা এক-একটি কাপুরুষ। সেই মনোবৃত্তি হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে অধর্মের বোঝাপড়া করার পন্থা, এবং সেই কারণে মানুষ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ছে। তার ফলে পরিস্থিতির এত অবনতি হয় যে, মানব সমাজ নরকে পরিণত হয়।

শ্লোক ২৭

তমৃত্বিজঃ শক্রবধাভিসন্ধিতং
বিচক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমসহ্যরংহসম্ ।
নিবারয়ামাসুরহো মহামতে
ন যুজ্যতেঽত্রান্যবধঃ প্রচোদিতাৎ ॥ ২৭ ॥

তম্—পৃথু মহারাজ; **ঋত্বিজঃ**—ঋত্বিকগণ, **শক্র-বধ**—দেবরাজ ইন্দ্রের হত্যা; **অভিসন্ধিতম্**—এইভাবে নিজেকে তৈরি করে; **বিচক্ষ্য**—দেখে; **দুষ্প্রেক্ষ্যম্**—দেখতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **অসহ্য**—অসহনীয়; **রংহসম্**—যাঁর বেগ; **নিবারয়াম্ আসুঃ**—নিবৃত্ত করেছিলেন, **অহো**—আহা; **মহা-মতে**—হে মহাত্মা, **ন**—না, **যুজ্যতে**—আপনার যোগ্য; **অত্র**—এই যজ্ঞস্থলে; **অন্য**—অন্য কিছু; **বধঃ**—বধ; **প্রচোদিতাৎ**—শাস্ত্রবিহিত।

অনুবাদ

যখন পুরোহিতরা এবং অন্য সকলে দেখলেন, পৃথু মহারাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করে বলেছিলেন—হে মহাত্মন্! দয়া করে তাঁকে বধ করবেন না, কারণ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞের নিমিত্ত পশু ব্যতীত অন্য কিছু বধ করা উচিত নয়। এটি শাস্ত্রের বিধান।

তাৎপর্য

পশুবলি দেওয়ার বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। তা পরীক্ষা করে বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারিত হয়েছে কি না, এবং তার ফলে যজ্ঞাগ্নিতে উৎসর্গীকৃত পশু নতুন জীবন লাভ করে ফিরে আসে। ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করার জন্য যে-যজ্ঞ, তাতে কাউকে বধ করা উচিত নয়। অতএব সেই যজ্ঞে তা হলে ইন্দ্রকে

কিভাবে বধ করা যেতে পারে, যাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশরূপে যজ্ঞে পূজা করা হয়? তাই পুরোহিতরা পৃথু মহারাজকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে বধ না করতে।

শ্লোক ২৮

বয়ং মরুত্বন্তমিহার্থনাশনং
হ্বয়ামহে ত্বচ্ছ্রবসা হতত্বিষম্ ।
অযাতযামোপহবৈরনন্তরং
প্রসহ্য রাজন্ জুহবাম তেঽহিতম্ ॥ ২৮ ॥

বয়ম্—আমরা; **মরুৎ-বন্তম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ইহ**—এখানে; **অর্থ**—আপনার স্বার্থে; **নাশনম্**—ধ্বংসকারী; **হ্বয়ামহে**—আমরা ডাকব; **ত্বৎ-শ্রবসা**—আপনার মহিমার দ্বারা; **হত-ত্বিষম্**—তাঁর শক্তি ইতিমধ্যে বিনষ্ট হয়েছে; **অযাতযাম**—পূর্বে কখনও ব্যবহার হয়নি; **উপহবৈঃ**—আবাহন মন্ত্রের দ্বারা; **অনন্তরম্**—অচিরেই; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **রাজন্**—হে রাজন্; **জুহবাম**—আমরা অগ্নিতে উৎসর্গ করব; **তে**—আপনার; **অহিতম্**—শত্রুকে।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার ফলে, ইন্দ্র ইতিমধ্যেই হতবীর্য হয়েছে। আমরা অভূতপূর্ব বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করে, এই যজ্ঞশালায় তাকে নিয়ে আসব এবং আমাদের মন্ত্রের বলে তাকে যজ্ঞাগ্নিতে হোম করব, কারণ সে হচ্ছে আপনার শত্রু।

তাৎপর্য

যথাযথভাবে যজ্ঞে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ সম্পাদন করা যায়। কিন্তু কলিযুগে কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ নেই, যারা যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে। তাই এই যুগে কোন বড় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এই যুগে একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন আন্দোলন।

শ্লোক ২৯

ইত্যামন্ত্র্য ক্রতুপতিং বিদুরাস্যর্ত্বিজো রুষা ।
স্রুগ্‌ঘস্তাঞ্জুহ্বতোঽভ্যেত্য স্বয়ম্ভুঃ প্রত্যষেধত ॥ ২৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **আমন্ত্র্য**—নিবেদন করে; **ক্রতু-পতিম্**—যজ্ঞপতি মহারাজ পৃথু; **বিদুর**—হে বিদুর; **অস্য**—পৃথুর; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **রুষা**—মহাক্রোধে; **স্রুক-হস্তান্**—হোমপাত্র হস্তে ধারণ করে; **জুহ্বতঃ**—যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে; **অভ্যেত্য**—শুরু করে; **স্বয়ম্ভূঃ**—ব্রহ্মা; **প্রত্যষেধত**—তাঁদের নিবৃত্ত হতে বললেন।

অনুবাদ

হে বিদুর! রাজাকে এই উপদেশ দেওয়ার পর, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত পুরোহিতেরা মহাক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। তাঁরা যখন যজ্ঞে আহুতি দিতে যাচ্ছিলেন, তখন ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করলেন।

শ্লোক ৩০

ন বধ্যো ভবতামিন্দ্রো যদ্‌যজ্ঞো ভগবত্তনুঃ ।
যং জিঘাংসথ যজ্ঞেন যস্যেষ্টাস্তনবঃ সুরাঃ ॥ ৩০ ॥

ন—না; **বধ্যঃ**—বধের যোগ্য; **ভবতাম্**—আপনাদের দ্বারা; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **যৎ**—যেহেতু; **যজ্ঞঃ**—ইন্দ্রের নাম; **ভগবৎ-তনুঃ**—ভগবানের শরীরের অংশ; **যম্**—যাঁকে; **জিঘাংসথ**—আপনারা বধ করতে ইচ্ছা করেন; **যজ্ঞেন**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **যস্য**—ইন্দ্রের; **ইষ্টাঃ**—পূজিত হয়ে; **তনবঃ**—শরীরের অঙ্গ; **সুরাঃ**—দেবতাগণ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তাঁদের সম্বোধন করে বললেন—হে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীগণ, আপনারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করতে পারেন না। সেটি আপনাদের কর্তব্য নয়। আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে, ইন্দ্র পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ভগবানের একজন শক্ত্যাবেশ অবতার। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনারা সমস্ত দেবতাদের প্রসন্নতা বিধান করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আপনাদের জানা উচিত যে, সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ইন্দ্রের অংশ। তা হলে এই মহান যজ্ঞে আপনারা কিভাবে তাঁকে বধ করতে পারেন?

শ্লোক ৩১

তদিদং পশ্যত মহদ্ধর্মব্যতিকরং দ্বিজাঃ ।
ইন্দ্রেণানুষ্ঠিতং রাজ্ঞঃ কর্মৈতদ্বিজিঘাংসতা ॥ ৩১ ॥

তৎ—তখন; **ইদম্**—এই; **পশ্যত**—দেখুন; **মহৎ**—মহান; **ধর্ম**—ধর্মজীবনের; **ব্যতিকরম্**—ব্যতিক্রম; **দ্বিজাঃ**—হে মহান ব্রাহ্মণগণ; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের দ্বারা; **অনুষ্ঠিতম্**—অনুষ্ঠিত, **রাজ্ঞঃ**—রাজার, **কর্ম**—কার্যকলাপ; **এতৎ**—এই যজ্ঞ; **বিজিঘাংসতা**—বিঘ্ন উৎপাদনকারী।

অনুবাদ

পৃথুর মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র এমন কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করেছেন, যার ফলে ভবিষ্যতে ধর্মের সুনির্দিষ্ট পথ বিনষ্ট হবে। ভেবে দেখুন, আপনারা যদি তাঁর আরও বিরোধিতা করেন, তা হলে তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্য অনেক অধর্মের পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন।

শ্লোক ৩২

পৃথুকীর্তেঃ পৃথোর্ভূয়াত্তর্হ্যেকোনশতক্রতুঃ ।
অলং তে ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈর্যদ্ভবান্মোক্ষধর্মবিৎ ॥ ৩২ ॥

পৃথু-কীর্তেঃ—পৃথুকীর্তি, **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **ভূয়াৎ**—হোক; **তর্হি**—অতএব; **এক ঊন-শত-ক্রতুঃ**—নিরানব্বইটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী; **অলম্**—কোন লাভ নেই, **তে**—আপনার, **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **সু-ইষ্টৈঃ**—সুসম্পন্ন, **যৎ**—যেহেতু, **ভবান্**—আপনি, **মোক্ষ-ধর্ম-বিৎ**—মোক্ষের মার্গ সম্বন্ধে অবগত

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন, "অতএব বিপুলকীর্তি পৃথুর নিরানব্বইটি যজ্ঞই হোক।" তার পর ব্রহ্মা পৃথু মহারাজের প্রতি বললেন, "যেহেতু আপনি মোক্ষের মার্গ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, অতএব আপনার আর অধিক যজ্ঞ করার কি প্রয়োজন?"

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজকে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ব্রহ্মা নেমে এসেছিলেন। পৃথু মহারাজ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, এবং ইন্দ্র সেই জন্য অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন, কারণ তিনি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা বা শতক্রতু নামে পরিচিত। জড় জগতে যেমন সকলেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ, ইন্দ্র স্বর্গের দেবরাজ হওয়া সত্ত্বেও পৃথুর প্রতি সেভাবে মাৎসর্য-পরায়ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর শততম যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করার

চেষ্টা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল একটি মস্ত বড় প্রতিযোগিতা, এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য পৃথুর যজ্ঞ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নানা রকম অধর্মের পন্থা সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। সেই অধর্মের প্রবর্তন বন্ধ করার জন্য ব্রহ্মা স্বয়ং সেই যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহারাজ পৃথু ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত, তাই তাঁর বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই প্রকার অনুষ্ঠানকে বলা হয় কর্ম, এবং চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ভক্তদের সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একজন আদর্শ রাজারূপে পৃথু মহারাজের কর্তব্য ছিল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। তাই একটি আপস মীমাংসা করার প্রয়োজন ছিল। ব্রহ্মার আশীর্বাদে পৃথু মহারাজ ইন্দ্রের থেকেও অধিক যশস্বী হয়েছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মার আশীর্বাদে পৃথু মহারাজের এক শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সংকল্প পরোক্ষভাবে পূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

নৈবাত্মনে মহেন্দ্রায় রোষমাহর্তুমর্হসি ।
উভাবপি হি ভদ্রং তে উত্তমশ্লোকবিগ্রহৌ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনে**—আপনার থেকে অভিন্ন; **মহা-ইন্দ্রায়**—দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি; **রোষম্**—ক্রোধ; **আহর্তুম্**—করতে; **অর্হসি**—উচিত; **উভৌ**—আপনারা দুজনেই; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—ও; **ভদ্রম্**—কল্যাণ; **তে**—আপনার, **উত্তম-শ্লোক-বিগ্রহৌ**—ভগবানের অবতার।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—আপনাদের উভয়েরই কল্যাণ হোক, কারণ আপনি এবং দেবরাজ ইন্দ্র উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। সুতরাং আপনি ইন্দ্র থেকে ভিন্ন নন। অতএব ইন্দ্রের প্রতি আপনার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৩৪

মাস্মিন্মহারাজ কৃথাঃ স্ম চিন্তাং
নিশাময়াস্মদ্বচ আদৃতাত্মা ।
যদ্ধ্যায়তো দৈবহতং নু কর্তুং
মনোঽতিরুষ্টং বিশতে তমোঽন্ধম্ ॥ ৩৪ ॥

মা—করবেন না, **অস্মিন্**—এতে; **মহা-রাজ**—হে রাজন্; **কৃথাঃ**—করুন; **স্ম**—পূর্ববৎ, **চিন্তাম্**—মনের বিক্ষোভ; **নিশাময়**—দয়া করে বিচার করুন, **অস্মৎ**—আমার, **বচঃ**—বাণী, **আদৃত-আত্মা**—অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে; **যৎ**—যেহেতু, **ধ্যায়তঃ**—যিনি ধ্যান করছেন তাঁর, **দৈব-হতম্**—দৈব দ্বারা বিঘ্নিত; **নু**—নিশ্চিতভাবে; **কর্তুম্**—করার জন্য, **মনঃ**—মন; **অতি-রুষ্টম্**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, **বিশতে**—প্রবেশ করে; **তমঃ**—অন্ধকার; **অন্ধম্**—গভীর।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে, ক্ষুব্ধ ও চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। এই বিঘ্ন দৈবের প্রভাবেই হয়েছে। দয়া করে শ্রদ্ধাসহকারে আমার উপদেশ শ্রবণ করুন। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, দৈবের প্রভাবে যদি কোন কিছু ঘটে, তা হলে সেই জন্য আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। দৈবের দ্বারা কোন কার্য বিনষ্ট হলে, যতই আমরা সেই কার্য সম্পন্ন করার চেষ্টা করি, ততই আমরা জড়বাদী বিচারের ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করি।

তাৎপর্য

কখনও কখনও সাধু বা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তিদেরও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সেই সমস্ত ঘটনাগুলি দৈব নির্ধারিত বলে মনে করা উচিত। অসুখী হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকলেও, সেই বিপত্তির প্রতিকার করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ যতই আমরা তা করতে চেষ্টা করি, ততই আমরা জড় জাগতিক উৎকণ্ঠার গভীরতম অন্ধকারে প্রবেশ করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই সম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ হওয়ার পরিবর্তে, আমাদের সব কিছু সহ্য করা উচিত

শ্লোক ৩৫

ক্রতুর্বিরমতামেষ দেবেষু দুরবগ্রহঃ ।
ধর্মব্যতিকরো যত্র পাখণ্ডৈরিন্দ্রনির্মিতৈঃ ॥ ৩৫ ॥

ক্রতুঃ—যজ্ঞ, **বিরমতাম্**—বন্ধ হোক; **এষঃ**—এই; **দেবেষু**—দেবতাদের মধ্যে, **দুরবগ্রহঃ**—অবাঞ্ছিত বস্তুতে আসক্তি, **ধর্ম-ব্যতিকরঃ**—ধর্মের বিপর্যয়, **যত্র**—যেখানে; **পাখণ্ডৈঃ**—পাপকর্মের দ্বারা, **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা, **নির্মিতৈঃ**—তৈরি হয়েছে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করুন, কারণ এই যজ্ঞের ফলে ইন্দ্র অনেক অধর্ম আচরণ প্রবর্তন করেছে। আপনি জেনে রাখুন যে, দেবতাদের মধ্যেও অনেকের বহু অবাঞ্ছিত বাসনা রয়েছে।

তাৎপর্য

সাধারণত ব্যবসাতেও অনেক প্রতিযোগী থাকে, এবং বৈদিক কর্মকাণ্ড কখনও কখনও কর্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও মৎসরতা সৃষ্টি করবে। কর্মীরা মাৎসর্য পরায়ণ হতে বাধ্য, কারণ তারা পূর্ণমাত্রায় জড় সুখ ভোগ করতে চায়। সেটিই হচ্ছে ভবরোগ। তার ফলে কর্মীদের মধ্যে, সাধারণ ব্যবসার ক্ষেত্রে অথবা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সব সময় প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ব্রহ্মা চেয়েছিলেন ইন্দ্র এবং পৃথু মহারাজের মধ্যে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হোক যেহেতু পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত ও ভগবানের অবতার, তাই ব্রহ্মা তাঁকে যজ্ঞ বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে ইন্দ্র আর অধর্মের পন্থা প্রবর্তন না করে, যা দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা সর্বদা অনুসরণ করে।

শ্লোক ৩৬

এভিরিন্দ্রোপসংসৃষ্টৈঃ পাখণ্ডৈর্হারিভির্জনম্ ।
হ্রিয়মাণং বিচক্ষ্বৈনং যস্তে যজ্ঞধ্রুগশ্বমুট্ ॥ ৩৬ ॥

এভিঃ—এই সবের দ্বারা; **ইন্দ্র-উপসংসৃষ্টৈঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা সৃষ্ট; **পাখণ্ডৈঃ**—পাপকার্য; **হারিভিঃ**—অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক; **জনম্**—জনসাধারণ; **হ্রিয়মাণম্**—অভিভূত হয়ে; **বিচক্ষ্ব**—দেখ; **এনম্**—এই সমস্ত; **যঃ**—যিনি; **তে**—আপনার; **যজ্ঞ-ধ্রুক্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে; **অশ্ব-মুট্**—যিনি অশ্ব চুরি করেছেন।

অনুবাদ

দেখ, যজ্ঞাশ্ব চুরি করার ফলে, দেবরাজ ইন্দ্র কিভাবে যজ্ঞের মাঝে এক বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত এই সমস্ত চিত্তাকর্ষক পাপকর্ম জনসাধারণকে অভিভূত করবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৩/২১) উল্লেখ করা হয়েছে—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

"মহান ব্যক্তি যে ভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এবং তিনি তাঁর দৃষ্টান্তের দ্বারা যে আদর্শ সৃষ্টি করেন, সারা জগৎ তা অনুসরণ করে।"

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁকে পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন। তার ফলে তিনি যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেন এবং বহু অধার্মিক ব্যক্তির মধ্যে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেন। এই প্রকার কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয়; তাই সেগুলি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ব্রহ্মা মনে করেছিলেন যে, ইন্দ্রকে এই প্রকার অধার্মিক পন্থা আরও প্রবর্তন করতে না দিয়ে, বরং যজ্ঞ বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয়স্কর মানুষ যখন বৈদিক বিধি অনুসারে অনর্থক অসংখ্য পশু বধ করতে শুরু করেছিল, তখন বুদ্ধদেবও অনেকটা এই ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। বৈদিক যজ্ঞবিধির বিরোধিতা করে বুদ্ধদেব অহিংসার ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু নতুন জীবন লাভ করে, কিন্তু সেই প্রকার ক্ষমতা-বিহীন মানুষেরা যজ্ঞবিধির নামে অসহায় পশুদের অনর্থক হত্যা করছিল তাই ভগবান বুদ্ধদেব সাময়িকভাবে বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেছিলেন। যে-যজ্ঞ বিরুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি করে, সেই প্রকার যজ্ঞ আচরণ করা মানুষের পক্ষে উচিত নয়। সেই যজ্ঞ বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয়স্কর।

আমরা বার বার উল্লেখ করেছি যে, কলিযুগে যোগ্য ব্রাহ্মণের অভাবে, বৈদিক কর্মকাণ্ডের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাই শাস্ত্রে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপী পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হবেন এবং পূজিত হবেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা। শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তাই যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা করা। এই যুগে ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের এটিই হচ্ছে সব চাইতে সরল পন্থা। এই যুগের যজ্ঞ সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রে যে-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই পাপপূর্ণ কলিযুগে অনর্থক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে সেই নির্দেশ পালন করাই মানুষের কর্তব্য। কলিযুগে সারা পৃথিবীর মানুষেরাই

মাংস আহারের জন্য, কসাইখানা খুলে পশু হত্যা করতে অত্যন্ত দক্ষ। যদি প্রাচীন ধর্ম অনুষ্ঠানগুলি পালন করা হয়, তা হলে মানুষ আরও বেশি করে পশুহত্যা করতে অনুপ্রাণিত হবে। কলকাতায় অনেক মাংসের দোকান আছে, যেখানে মা কালীর মুর্তি রাখা হয়, আর মাংসাশী মানুষেরা মনে করে যে, সেই সমস্ত দোকান থেকে মাংস কেনাই সমীচীন, কারণ তা হচ্ছে কালীর প্রসাদ। তারা জানে না যে, মা কালী কখনও আমিষ আহার গ্রহণ করেন না, কারণ তিনি হচ্ছে শিবের সাধ্বী স্ত্রী। শিব হচ্ছেন একজন মহান বৈষ্ণব এবং তিনি কখনও আমিষ আহার করেন না, এবং মা কালী সর্বদা শিবের উচ্ছিষ্টই গ্রহণ করেন। তাই তাঁর পক্ষে আমিষ আহার করা কখনই সম্ভব নয়। এই প্রকার নৈবেদ্য ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস আদি কালীর অনুচরেরাই কেবল গ্রহণ করে, এবং যারা মাছ-মাংসরূপে কালীর প্রসাদ গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে তা কালীর প্রসাদ নয়, তারা ভূত ও পিশাচদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে।

শ্লোক ৩৭

ভবান্ পরিত্রাতুমিহাবতীর্ণো
ধর্মং জনানাং সময়ানুরূপম্ ।
বেণাপচারাদবলুপ্তমদ্য
তদ্দেহতো বিষ্ণুকলাসি বৈণ্য ॥ ৩৭ ॥

ভবান্—আপনি; **পরিত্রাতুম্**—পরিত্রাণ করার জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেছেন; **ধর্মম্**—ধর্মের পন্থা; **জনানাম্**—জনসাধারণের; **সময়-অনুরূপম্**—সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে; **বেণ-অপচারাৎ**—রাজা বেণের অন্যায় আচরণের দ্বারা; **অবলুপ্তম্**—প্রায় বিলুপ্ত; **অদ্য**—সম্প্রতি; **তৎ**—তার; **দেহতঃ**—দেহ থেকে; **বিষ্ণু**—ভগবান বিষ্ণুর; **কলা**—অংশের অংশ; **অসি**—আপনি; **বৈণ্য**—হে বেণ রাজার পুত্র।

অনুবাদ

হে বেণপুত্র মহারাজ পৃথু! আপনি ভগবান বিষ্ণুর কলা অবতার। রাজা বেণের দুষ্ট কার্যকলাপের ফলে, ধর্ম প্রায় অবলুপ্ত হয়েছিল। সেই উচিত সময়ে আপনি ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে অবতরণ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে ধর্মরক্ষা করার জন্য আপনি রাজা বেণের শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবান বিষ্ণু যে কিভাবে অসুরদের সংহার করেন এবং সাধুদের পরিত্রাণ করেন, তা *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৮) বর্ণিত হয়েছে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের উদ্ধার করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের সংহার করার জন্য, এবং পুনরায় ধর্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।"

অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান বিষ্ণু সর্বদা তাঁর দুই হাতে গদা ও চক্র ধারণ করেন, এবং তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য তাঁর অপর দুই হাতে তিনি শঙ্খ ও পদ্ম ধারণ করেন। যখন ভগবানের অবতার এই লোকে অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত থাকেন, তখন তিনি অসুরদের সংহার করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। ভগবান বিষ্ণু কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ বা রামরূপে আবির্ভূত হন। ভগবানের এই সমস্ত অবতারদের আবির্ভাবের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে। কখনও কখনও তিনি শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে আবির্ভূত হন, যেমন ভগবান বুদ্ধদেব। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সমস্ত শক্ত্যাবেশ অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট জীব। জীবেরাও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশ, কিন্তু তারা তেমন শক্তিশালী নয়; তাই কোন জীব যখন শ্রীবিষ্ণুর অবতাররূপে অবতরণ করেন, তখন তিনি বিশেষভাবে ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হন।

মহারাজ পৃথুকে যখন ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণনা করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ এবং বিশেষভাবে তিনি তাঁর শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। কোন জীব যখন শ্রীবিষ্ণুর অবতারের মতো বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রচার করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ভগবানের অবতার। এই প্রকার ব্যক্তি ঠিক বিষ্ণুর মতো যুক্তিসহকারে অসুরদের পরাভূত করে, শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেন। *ভগবদ্‌গীতায়* ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন দেখা যায় যে, কেউ অসাধারণভাবে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করছেন, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, তিনি শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিশেষভাবে শক্তিসম্পন্ন হয়েছেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (অন্ত্য ৭/১১)—প্রতিপন্ন হয়েছে, *কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন*—ভগবানের শক্তিতে বিশেষভাবে আবিষ্ট না হলে, ভগবানের দিব্য নামের মহিমা প্রচার করা যায় না। কেউ যখন এই প্রকার শক্ত্যাবিষ্ট ব্যক্তির সমালোচনা করে অথবা তাঁর দোষ দর্শন করে, তখন বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুবিদ্বেষী এবং তাকে

দণ্ডভোগ করতে হবে। এই প্রকার অপরাধীরা যদি তিলক ও মালা ধারণ করে বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করে, তা হলেও শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করার জন্য, ভগবান তাদের ক্ষমা করবেন না। শাস্ত্রে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শ্লোক ৩৮

স ত্বং বিমৃশ্যাস্য ভবং প্রজাপতে
সঙ্কল্পনং বিশ্বসৃজাং পিপীপৃহি।
ঐন্দ্রীং চ মায়ামুপধর্মমাতরং
প্রচণ্ডপাখণ্ডপথং প্রভো জহি ॥ ৩৮ ॥

সঃ—উপরোক্ত; **ত্বম্**—আপনি; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **অস্য**—এই জগতের; **ভবম্**—অস্তিত্ব, **প্রজা-পতে**—হে জনগণের রক্ষাকর্তা; **সঙ্কল্পনম্**—সংকল্প; **বিশ্ব-সৃজাম্**—বিশ্ব স্রষ্টাদের, **পিপীপৃহি**—পূর্ণ করুন; **ঐন্দ্রীম্**—দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট; **চ**—ও; **মায়াম্**—মায়া; **উপধর্ম**—তথাকথিত সন্ন্যাস প্রথার, অধর্মের; **মাতরম্**—জননী; **প্রচণ্ড**—ভীষণ; **পাখণ্ড-পথম্**—পাপকর্মের পন্থা; **প্রভো**—হে প্রভু; **জহি**—দয়া করে জয় করুন।

অনুবাদ

হে প্রজারক্ষক! দয়া করে আপনি আপনার অবতরণের উদ্দেশ্য বিবেচনা করুন। ইন্দ্র যে পাষণ্ড মতবাদ সৃষ্টি করেছেন, তা নানা অধর্মের জননী। সুতরাং আপনি দয়া করে সেই সমস্ত ছলনা অচিরে নিরস্ত করুন।

তাৎপর্য

প্রজাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির মহান দায়িত্ব সম্বন্ধে পৃথু মহারাজকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য, ব্রহ্মা তাঁকে *প্রজাপতে* বলে সম্বোধন করেছিলেন। কেবল এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পৃথু মহারাজ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছিলেন। আদর্শ রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজারা যাতে যথাযথভাবে ধর্ম অনুশীলন করে তা দেখা। ইন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট কপট ধর্ম আচরণগুলি নিরস্ত করতে, ব্রহ্মা পৃথু মহারাজকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার কর্তব্য হচ্ছে অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত কপট ধর্মগুলি বন্ধ করা। মূলত ধর্ম এক—ভগবানের দেওয়া ধর্ম এবং তা গুরুশিষ্য পরম্পরা ধারায় দুইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। ইন্দ্রের

সঙ্গে অর্থহীন প্রতিযোগিতা থেকে বিরত হতে পৃথু মহারাজকে ব্রহ্মা অনুরোধ করেছিলেন। পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করতে না দেওয়ার জন্য ইন্দ্র বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন। বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার পরিবর্তে, তাঁর অবতরণের মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করাই পৃথু মহারাজের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল। তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল সৎ সরকার স্থাপন করে, আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

শ্লোক ৩৯

মৈত্রেয় উবাচ
ইত্থং স লোকগুরুণা সমাদিষ্টো বিশাম্পতিঃ ।
তথা চ কৃত্বা বাৎসল্যং মঘোনাপি চ সন্দধে ॥ ৩৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **সঃ**—পৃথু মহারাজ; **লোক-গুরুণা**—গ্রহলোক-সমূহের আদিগুরু ব্রহ্মা কর্তৃক; **সমাদিষ্টঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **বিশাম্-পতিঃ**—জনগণের প্রভু, রাজা; **তথা**—এইভাবে; **চ**—ও; **কৃত্বা**—করে; **বাৎসল্যম্**—স্নেহ; **মঘোনা**—ইন্দ্রের সঙ্গে; **অপি**—ও; **চ**—ও, **সন্দধে**—সন্ধি করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—এইভাবে পরম গুরু ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, পৃথু মহারাজ তাঁর যজ্ঞ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন, এবং গভীর স্নেহ প্রদর্শন করে ইন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতা করলেন।

শ্লোক ৪০

কৃতাবভৃথস্নানায় পৃথবে ভূরিকর্মণে ।
বরান্‌দদুস্তে বরদা যে তদ্বর্হিষি তর্পিতাঃ ॥ ৪০ ॥

কৃত—অনুষ্ঠান করে; **অবভৃথ-স্নানায়**—যজ্ঞান্তে স্নান করে; **পৃথবে**—মহারাজ পৃথুকে; **ভূরি-কর্মণে**—বহু পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে যিনি বিখ্যাত; **বরান্**—বর; **দদুঃ**—দিয়েছিলেন; **তে**—তাঁরা সকলে; **বর-দাঃ**—বর প্রদানকারী দেবতারা; **যে**—যাঁরা; **তৎ-বর্হিষি**—সেই প্রকার যজ্ঞ করার ফলে; **তর্পিতাঃ**—প্রসন্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তার পর পৃথু মহারাজ স্নান করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর, বিধি অনুসারে স্নান করতে হয়। তার পর তাঁর মহিমান্বিত কার্যকলাপে প্রসন্ন হয়েছিলেন যে সমস্ত দেবতারা, তাঁদের কাছ থেকে তিনি বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ মানে হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু, কারণ সমস্ত যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান হয় ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য। যেহেতু যজ্ঞ করার ফলে দেবতারা আপনা থেকেই অত্যন্ত প্রসন্ন হন, তাই তাঁরা যজ্ঞকারীকে বরদান করেন। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন গাছটির শাখা প্রশাখা, কাণ্ড, ফুল, পাতা, সব কিছুই তৃপ্ত হয়, এবং উদরকে খাদ্য দিলে যেমন দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সবল হয়, তেমনই কেউ যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা কেবল ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করেন, তা হলে সমস্ত দেবতারাও আপনা থেকে সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন দেবতারা সেই ভক্তকে নানা প্রকার বর প্রদান করেন। শুদ্ধ ভক্ত তাই দেবতাদের কাছ থেকে কোন রকম বর প্রার্থনা করেন না। তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই সেবা করেন। তাই দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত কোন বস্তুর অভাব তাঁর হয় না।

শ্লোক ৪১

বিপ্রাঃ সত্যাশিষস্তুষ্টাঃ শ্রদ্ধয়া লব্ধদক্ষিণাঃ ।
আশিষো যুযুজুঃ ক্ষত্তরাদিরাজায় সৎকৃতাঃ ॥ ৪১ ॥

বিপ্রাঃ—সমস্ত ব্রাহ্মণেরা; **সত্য**—সত্য; **আশিষঃ**—যাঁদের আশীর্বাদ; **তুষ্টাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **লব্ধ-দক্ষিণাঃ**—যিনি দক্ষিণা লাভ করেছেন; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **যুযুজুঃ**—প্রদান করেছিলেন; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **আদি-রাজায়**—আদি রাজাকে; **সৎ-কৃতাঃ**—সম্মানিত হয়ে।

অনুবাদ

গভীর শ্রদ্ধা সহকারে, আদি রাজা পৃথু সেই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, রাজাকে তাঁদের আন্তরিক আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

ত্বয়াহূতা মহাবাহো সর্ব এব সমাগতাঃ ।
পূজিতা দানমানাভ্যাং পিতৃদেবর্ষিমানবাঃ ॥ ৪২ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; **আহূতাঃ**—নিমন্ত্রিত হয়ে; **মহা-বাহো**—হে পরম শক্তিশালী; **সর্বে**—সমস্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সমাগতাঃ**—সমবেত; **পূজিতাঃ**—সম্মানিত হয়ে; **দান**—দানের দ্বারা; **মানাভ্যাম্**—এবং সম্মানের দ্বারা; **পিতৃ**—পিতৃগণ; **দেব**—দেবতাগণ; **ঋষি**—মহর্ষিগণ; **মানবাঃ**—এবং মানুষেরা।

অনুবাদ

সমস্ত মহর্ষি ও ব্রাহ্মণেরা বললেন—হে শক্তিশালী রাজা! আপনার নিমন্ত্রণে সর্বশ্রেণীর জীবেরা এই সভায় যোগদান করেছেন। তাঁরা পিতৃলোক ও স্বর্গলোক থেকে এসেছেন, এবং মহর্ষিগণ ও সাধারণ মানুষেরাও এই সভায় যোগদান করেছেন। এখন তাঁরা সকলেই আপনার ব্যবহারে এবং আপনার দানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

বিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ সাকং মঘবতা বিভুঃ।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞপতিস্তুষ্টো যজ্ঞভুক্ তমভাষত ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু; **অপি**—ও; **বৈকুণ্ঠঃ**—বৈকুণ্ঠপতি; **সাকম্**—সহ; **মঘবতা**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বিভুঃ**—ভগবান; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **যজ্ঞপতিঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়েছিলেন; **যজ্ঞ-ভুক্**—যজ্ঞের ভোক্তা; **তম্**—পৃথু মহারাজকে; **অভাষত**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—হে বিদুর! নিরানব্বইটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্রসহ সেই যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার পর তিনি বলেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

এষ তেঽকার্ষীদ্ভঙ্গং হয়মেধশতস্য হ।
ক্ষমাপয়ত আত্মানমমুষ্য ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বললেন, **এষঃ**—এই ইন্দ্রদেব; **তে**—তোমার; **অকার্ষীৎ**—করেছিল; **ভঙ্গম্**—বিঘ্ন; **হয়**—অশ্ব; **মেধ**—যজ্ঞ; **শতস্য**—এক শতের; **হ**—বাস্তবিকপক্ষে; **ক্ষমাপয়ত**—ক্ষমাপ্রার্থী; **আত্মানম্**—তোমাকে; **অমুষ্য** তাকে; **ক্ষন্তুম্**—ক্ষমা করা; **অর্হসি**—উচিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বললেন—হে মহারাজ পৃথু! ইন্দ্র তোমার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এখন সে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তোমার কাছে এসেছে। তাই তাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *আত্মানম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যোগী এবং জ্ঞানীদের মধ্যে পরস্পরকে (এমন কি সাধারণ মানুষকেও) আত্মা বলে সম্বোধন করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে, কারণ পরমার্থবাদী কখনও জীবকে তার দেহ বলে মনে করেন না। আত্মা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, আত্মা ও পরমাত্মা গুণগতভাবে অভিন্ন। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে যে, দেহ কেবল বাহ্যিক আবরণ মাত্র, এবং তার ফলে উন্নত স্তরের পরমার্থবাদী কখনও নিজের ও অন্যের মধ্যে ভেদ দর্শন করেন না।

শ্লোক ৩

সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ ।
নাভিদ্রুহ্যন্তি ভূতেভ্যো যর্হি নাত্মা কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

সু-ধিয়ঃ—পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **সাধবঃ**—যাঁরা কল্যাণমূলক কার্যকলাপে উদ্যোগী, **লোকে**—এই জগতে; **নর-দেব**—হে রাজন্; **নর-উত্তমাঃ**—নরশ্রেষ্ঠ; **ন অভিদ্রুহ্যন্তি**—কখনও বিদ্বেষ-পরায়ণ হন না; **ভূতেভ্যঃ**—অন্য জীবদের প্রতি, **যর্হি**—কারণ; **ন**—কখনই না; **আত্মা**—আত্মা; **কলেবরম্**—এই শরীর।

অনুবাদ

হে রাজন্! যাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং অন্যের হিতসাধনে রত, মনুষ্য-সমাজে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁরা কখনও অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হন না। তাঁরা ভালভাবে জানেন যে, আত্মা থেকে এই জড় দেহ ভিন্ন।

তাৎপর্য

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, কোন পাগল যদি কাউকে হত্যা করে, তা হলে উচ্চ বিচারালয়েও তার অপরাধ ক্ষমা করা হয়। তার কারণ হচ্ছে যে, জীব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, তার স্বরূপে সে সর্বদাই শুদ্ধ। কিন্তু যখন সে মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়, তখন সে প্রকৃতির তিন গুণের শিকার হয়। বাস্তবিকপক্ষে, সে যা কিছুই করে, তা প্রকৃতির প্রভাবেই অনুষ্ঠিত হয় সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৪) বলা হয়েছে—

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

"দেহরূপী নগরীর অধীশ্বর দেহী কর্ম সৃষ্টি করে না, কাউকে সে কর্মে প্রবৃত্ত করে না, অথবা সে কর্মফলও সৃষ্টি করে না। তা সবই অনুষ্ঠিত হয় জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে।"

প্রকৃতপক্ষে জীব অথবা আত্মা কোন কিছুই করে না; সব কিছুই সম্পাদিত হয় প্রকৃতির গুণের প্রভাবে কোন মানুষ যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন রোগের লক্ষণগুলি সমস্ত বেদনার কারণ হয় যারা পারমার্থিক চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নত, তারা আত্মার প্রতি অথবা জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আত্মার কার্যকলাপের প্রতি কখনও মাৎসর্য পরায়ণ হন না উন্নত স্তরের পরমার্থবাদীকে বলা হয় *সুধিয়ঃ* । *সুধী* মানে 'বুদ্ধি', *সুধী* মানে 'অত্যন্ত উন্নত' এবং *সুধী* মানে 'ভক্ত'। যারা ভগবদ্ভক্ত এবং অত্যন্ত উন্নত স্তরের বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন, তাঁরা কখনও আত্মা অথবা দেহের বিরুদ্ধে কিছু করেন না। যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, তা হলে তিনি তা ক্ষমা করেন তাই বলা হয় যে, ক্ষমা হচ্ছে পারমার্থিক স্তরে উন্নত ব্যক্তির একটি গুণ।

শ্লোক ৪

পুরুষা যদি মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা দেবমায়য়া ।
শ্রম এব পরং জাতো দীর্ঘয়া বৃদ্ধসেবয়া ॥ ৪ ॥

পুরুষাঃ—মানুষ; **যদি**—যদি; **মুহ্যন্তি**—মোহাচ্ছন্ন হয়; **ত্বাদৃশাঃ**—তোমার মতো; **দেব**—ভগবানের; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **শ্রমঃ**—পরিশ্রম; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পরম্**—কেবল; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **দীর্ঘয়া**—দীর্ঘকাল ধরে; **বৃদ্ধ-সেবয়া**—গুরুজনদের সেবার দ্বারা।

অনুবাদ

পূর্বতন আচার্যদের উপদেশ পালন করার ফলে, পারমার্থিক জীবনে উন্নত তোমার মতো ব্যক্তিরাও যদি আমার মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়, তা হলে তোমার পারমার্থিক উন্নতি কেবল সময়ের অনর্থক অপচয় বলেই মনে করা হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বৃদ্ধ-সেবয়া* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে 'গুরুজনদের সেবার দ্বারা'। আচার্য অথবা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে দিব্য জ্ঞান লাভ করতে হয়। পরম্পরা ধারায় শিক্ষা লাভ না করে, কেউ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। পৃথু মহারাজ সেই ধারায় পূর্ণরূপে শিক্ষিত ছিলেন; তাই তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত ছিল না। দেহাত্মবুদ্ধি সর্বস্ব সাধারণ মানুষ সর্বদা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।

শ্লোক ৫

অতঃ কায়মিমং বিদ্বানবিদ্যাকামকর্মভিঃ ।
আরব্ধ ইতি নৈবাস্মিন্ প্রতিবুদ্ধোঽনুষজ্জতে ॥ ৫ ॥

অতঃ—অতএব; **কায়ম্**—দেহ; **ইমম্**—এই; **বিদ্বান্**—জ্ঞানবান; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানের দ্বারা; **কাম**—বাসনাসমূহ; **কর্মভিঃ**—কার্যকলাপের দ্বারা; **আরব্ধ**—সৃষ্টি করেছে; **ইতি**—এইভাবে; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অস্মিন্**—এই শরীরকে; **প্রতিবুদ্ধঃ**—জ্ঞানী; **অনুষজ্জতে**—আসক্ত হয়।

অনুবাদ

যাঁরা দেহাত্মবুদ্ধির কারণ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, যাঁরা জানেন যে, এই দেহ মায়াজনিত অবিদ্যা, কাম ও কর্মের দ্বারা সৃষ্ট, তাঁরা কখনও দেহের প্রতি আসক্ত হন না।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা সুন্দর বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন *(সুধিয়ঃ)*, তাঁরা কখনও তাঁদের দেহকে তাঁদের স্বরূপ বলে মনে করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হওয়ার ফলে, শরীরের দুই প্রকার কার্য রয়েছে। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, যখন

আমরা মনে করি যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের ফলে আমরা আনন্দ উপভোগ করতে পারব, তখন আমরা মোহাচ্ছন্ন থাকি। আর এক প্রকার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা হচ্ছে, মায়িক শরীর থেকে উৎপন্ন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টার দ্বারা সুখী হওয়া যাবে বলে মনে করা অথবা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার দ্বারা অথবা নানা প্রকার বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সুখী হওয়া যাবে বলে মনে করা। এগুলি হচ্ছে মায়া। তেমনই, রাজনৈতিক উত্থান এবং সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের অনুষ্ঠানের দ্বারা সারা পৃথিবীর মানুষকে সুখী করা যাবে বলে মনে করাও মায়া, কারণ সেই সবই দেহাত্মবুদ্ধি-জাত। দেহাত্মবুদ্ধির বশবর্তী হয়ে আমরা যা কিছু কামনা করি অথবা অনুষ্ঠান করি তা সবই মায়িক। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু পৃথু মহারাজকে বলেছিলেন যে, যদিও যজ্ঞ অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের কাছে একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তবুও তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"বেদ প্রধানত প্রকৃতির তিন গুণের বিষয়ে আলোচনা করে। কিন্তু অর্জুন, তুমি গুণাতীত হও। সমস্ত দ্বন্দ্বভাব এবং লাভ ক্ষতি ও আত্মরক্ষার সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে, প্রকৃত লাভের জন্য আত্মতত্ত্বে অধিষ্ঠিত হও।"

বেদে যে-সমস্ত কর্মের বিধান রয়েছে, তা মুখ্যত প্রকৃতির তিন গুণের উপর নির্ভর করে তাই অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত বৈদিক কার্যকলাপের অতীত হতে। অর্জুনকে ভগবান যে সমস্ত কার্যকলাপের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে চিন্ময় ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপ

শ্লোক ৬

অসংসক্তঃ শরীরেঽস্মিন্নমুনোৎপাদিতে গৃহে ।
অপত্যে দ্রবিণে বাপি কঃ কুর্যান্মমতাং বুধঃ ॥ ৬ ॥

অসংসক্তঃ—অনাসক্ত হয়ে; **শরীরে**—শরীরের প্রতি; **অস্মিন্**—এই; **অমুনা**—এই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি থেকে; **উৎপাদিতে**—উৎপন্ন; **গৃহে**—গৃহে; **অপত্যে**—সন্তান; **দ্রবিণে**—সম্পত্তি; **বা**—অথবা; **অপি**—ও; **কঃ**—কে; **কুর্যাৎ**—করবে; **মমতাম্**—আসক্তি; **বুধঃ**—বিজ্ঞ ব্যক্তি।

অনুবাদ

সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত যে অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার গৃহ, অপত্য, বিত্ত আদি শারীরিক বিষয়ের প্রতি মমতা থাকবে কি করে?

তাৎপর্য

বৈদিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান করা। কিন্তু, এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা বাস্তবিকপক্ষে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা যায় না। বরং, এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা, ভগবানের অনুমতিক্রমে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে বিশেষভাবে আগ্রহী জড়বাদীদের এই সমস্ত বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অনুমতি দেওয়া হয়। তাকে বলা হয় *ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদাঃ*। জড়া প্রকৃতির গুণের ভিত্তিতে এই সমস্ত বৈদিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান হয়। যাঁরা জড়াতীত স্তরে রয়েছেন, তাঁরা এই সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানে মোটেই আগ্রহী নন। বরং, তারা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার উচ্চতর কার্যকলাপে আগ্রহী। এই প্রকার ভক্তিকে বলা হয় *নিস্ত্রৈগুণ্য*। দেহসুখ উপভোগের জড়-জাগতিক ধারণার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ৭

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নির্গুণোহসৌ গুণাশ্রয়ঃ ।
সর্বগোহনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥ ৭ ॥

একঃ—এক; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতির্ময়; **নির্গুণঃ**—ভৌতিক গুণরহিত; **অসৌ**—তা; **গুণ-আশ্রয়ঃ**—সদ্গুণের আধার; **সর্ব-গঃ**—সর্বত্র গমনাগমনে সক্ষম; **অনাবৃতঃ**—জড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়ে; **সাক্ষী**—সাক্ষী; **নিরাত্মা**—অন্য কিছুতে আত্মবুদ্ধি না করে; **আত্ম-আত্মনঃ**—দেহ এবং মনে; **পরঃ**—অতীত।

অনুবাদ

আত্মা এক, শুদ্ধ, চিন্ময় এবং স্বতঃপ্রকাশ। তিনি সমস্ত সদ্গুণের আধার, এবং সর্বব্যাপ্ত। তিনি জড় আবরণ-রহিত, এবং তিনি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। তিনি অন্য সমস্ত জীব থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, এবং তিনি সমস্ত দেহধারী আত্মার অতীত।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে *অসংসক্তঃ* অর্থাৎ 'আসক্তি-রহিত', এবং *বুধঃ* অর্থাৎ 'সব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবগত', এই দুটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পূর্ণরূপে অবগত মানে হচ্ছে, নিজের স্বরূপ এবং পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি সম্বন্ধে অবগত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এই শ্লোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণু নিজেকে বা পরমাত্মাকে বর্ণনা করছেন। পরমাত্মা সর্বদাই দেহধারী জীবাত্মা ও জড় জগৎ থেকে ভিন্ন। তাই, এখানে তাঁকে *পর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই *পর* বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন 'এক'। ভগবান এক, কিন্তু এই জড় জগতে জড় দেহধারী বদ্ধ জীবাত্মা নানারূপে বিরাজ করে। যেমন—দেবতা, মানুষ, পশু, বৃক্ষ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। এইভাবে জীব এক নয়, বহু। *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীব বহু, এবং তারা শুদ্ধ নয়। কিন্তু, পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ ও অনাসক্ত। জড় দেহের আবরণে আবৃত হওয়ার ফলে, জীব স্বতঃপ্রকাশ নয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশ। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে, জীবকে বলা হয় *সগুণ*, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা হচ্ছেন নির্গুণ, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন নন। জড় গুণের দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে জীব *গুণাশ্রিত*, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান *গুণাশ্রয়*। বদ্ধ জীবের দৃষ্টি জড় কলুষের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই সে তার কার্যকলাপের কারণ দর্শন করতে পারে না, এবং তার বিগত জীবন দর্শন করতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান জড় দেহের দ্বারা আবৃত না হওয়ার ফলে, জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই *আত্মা*। গুণগতভাবে তাঁরা এক, তবুও তাঁরা ভিন্ন, বিশেষ করে ষড়ৈশ্বর্যের ব্যাপারে। পূর্ণজ্ঞান মানে হচ্ছে জীবাত্মার পক্ষে তার নিজের স্থিতি ও পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া। সেটিই হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞান।

শ্লোক ৮

য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পূরুষঃ।
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ ॥ ৮ ॥

যঃ—যে-কেউ; **এবম্**—এইভাবে; **সন্তম্**—বিরাজমান হয়ে; **আত্মানম্**—জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে; **আত্ম-স্থম্**—তাঁর দেহে অবস্থিত হয়ে; **বেদ**—জানেন; **পূরুষঃ**—ব্যক্তি;

ন—কখনই না, **অজ্যতে**—প্রভাবিত হন, **প্রকৃতি** জড়া প্রকৃতিতে, **স্থঃ** অবস্থিত, **অপি**—যদিও; **তৎ-গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা, **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ময়ি**—আমাতে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত

অনুবাদ

এইভাবে যিনি পরমাত্মা ও আত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তিনি জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কখনই প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি সর্বদাই আমার দিব্য প্রেমময়ী সেবায় অবস্থিত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যখন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তেমনই, যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তিনি এই জড় শরীরে বা জড় জগতে থাকলেও, জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ, তিনিই জড়া প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।" এই সম্পর্কে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, কেউ যদি তাঁর দেহ, বাণী ও মনের দ্বারা সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে জড় জগতে অবস্থান করলেও, তাঁকে মুক্ত বলে বিবেচনা করতে হবে।

শ্লোক ৯

যঃ স্বধর্মেণ মাং নিত্যং নিরাশীঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ভজতে শনকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি ॥ ৯ ॥

যঃ—যিনি **স্ব-ধর্মেণ**—তাঁর বৃত্তির দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **নিরাশীঃ**—কোন প্রকার উদ্দেশ্য রহিত; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তিসহকারে, **অন্বিতঃ**—যুক্ত; **ভজতে**—আরাধনা করেন; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **তস্য**—তাঁর, **মনঃ**—মন; **রাজন্**—হে পৃথু মহারাজ; **প্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বললেন—হে পৃথু মহারাজ! কেউ যখন তাঁর স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে, কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশা না করে, আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে অনাবিল তৃপ্তি আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির বক্তব্য *বিষ্ণু পুরাণেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। জীবের স্বধর্ম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং তা সমাজের চারটি বিভাগ ও জীবনের চারটি স্তরে—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাসে প্রয়োগ হয়। কেউ যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে আচরণ করেন এবং কোন রকম কর্মফলের প্রত্যাশা না করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে তৃপ্তি লাভ করেন স্বধর্ম আচরণের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। *ভগবদ্গীতায়* এই পন্থাটিকে কর্মযোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবা ও সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কর্ম করা কর্তব্য তা না হলে আমরা কর্মফলের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ব।

সকলেরই স্বধর্ম রয়েছে, কিন্তু সেই জড় জাগতিক বৃত্তিটি কখনই জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে সাধন করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তার বৃত্তিগত কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করা ব্রাহ্মণের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর বৃত্তি সম্পাদন করার পরিবর্তে, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে তা অনুষ্ঠান করা। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদেরও সেই উদ্দেশ্যে কর্ম করা কর্তব্য। এই জড় জগতে সকলেই নানা প্রকার বৃত্তিগত কার্যকলাপে যুক্ত কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। ভগবদ্ভক্তি অত্যন্ত সরল, এবং যে-কেউই তা সম্পাদন করতে পারে। যে যেখানে রয়েছে, সে সেখানেই থাকতে পারে, কেবল তাকে তার গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে শ্রীবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ হতে পারেন অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারেন (ভগবানের অন্য বহু রূপ রয়েছে)। এইভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তাঁর সৎ কর্মের ফলের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করতে পারেন। মানুষ তার বৃত্তি নির্বিশেষে, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, আত্মনিবেদন আদি ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে। এইভাবে অনায়াসে ভগবানের সেবা করা যায়। ভগবান যখন কারও সেবায় সন্তুষ্ট হন, তখন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

শ্লোক ১০

**পরিত্যক্তগুণঃ সম্যগ্‌দর্শনো বিশদাশয়ঃ ।
শান্তিং মে সমবস্থানং ব্রহ্ম কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ১০ ॥**

পরিত্যক্ত-গুণঃ—যিনি জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়েছেন, **সম্যক্**—সম, **দর্শনঃ**—যাঁর দৃষ্টি; **বিশদ**—নিষ্কলুষ; **আশয়ঃ**—যাঁর মন অথবা হৃদয়, **শান্তিম্**—শান্তি; **মে**—আমার, **সমবস্থানম্**—সমপদ, **ব্রহ্ম**—চিন্ময়; **কৈবল্যম্**—জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্তি; **অশ্নুতে**—লাভ করে

অনুবাদ

হৃদয় যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন ভক্তের মন উদার ও স্বচ্ছ হয়, এবং তিনি তখন সব কিছুই সমভাবে দর্শন করেন। জীবনের সেই অবস্থায় শান্তি লাভ হয়, এবং তিনি তখন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপী আমার সমপদ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

কৈবল্য সম্বন্ধে মায়াবাদীদের ধারণা বৈষ্ণবদের থেকে ভিন্ন মায়াবাদীরা মনে করে যে, জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই, জীব ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় কিন্তু কৈবল্য সম্বন্ধে বৈষ্ণব দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন বৈষ্ণবেরা তাঁদের নিজেদের স্থিতি এবং পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নির্মল স্তরে জীব বুঝতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস, এবং সেই অবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত স্থিতি বা জীবের পারমার্থিক পূর্ণতা। ভগবানের সঙ্গে প্রেমের এই আদান-প্রদান অতি সহজে সাধন করা সম্ভব *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ যখন ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্ময় *কৈবল্য* স্তর বা *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হন

শ্লোক ১১

**উদাসীনমিবাধ্যক্ষং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাম্ ।
কূটস্থমিমমাত্মানং যো বেদাপ্নোতি শোভনম্ ॥ ১১ ॥**

উদাসীনম্—উদাসীন; **ইব**—কেবল; **অধ্যক্ষম্**—অধ্যক্ষ **দ্রব্য**—জড় উপাদানের, **জ্ঞান**—জ্ঞানেন্দ্রিয়; **ক্রিয়া**—কর্মেন্দ্রিয়, **আত্মনাম্**—মনের, **কূটস্থম্**—স্থির; **ইমম্**—

এই; **আত্মানম্**—আত্মা; **যঃ**—যিনি, **বেদ**—জানেন; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হন; **শোভনম্**—সৌভাগ্য।

অনুবাদ

যিনি জানেন যে, এই জড় দেহ পঞ্চমহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গঠিত, এবং আত্মা স্থির ও উদাসীন হয়ে এই সবের অধ্যক্ষতা করে, তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষ কিভাবে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। সর্বপ্রথমে জানতে হবে যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। আত্মাকে বলা হয় *দেহী*, এবং জড় শরীরকে বলা হয় *দেহ*। প্রতিনিয়ত দেহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয়; তাই আত্মাকে বলা হয় *কূটস্থম্*। প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতিক্রিয়ার ফলে, দেহের পরিবর্তন সাধিত হয়। যিনি আত্মার স্থির স্থিতি সম্বন্ধে অবগত, তিনি সুখ ও দুঃখরূপে প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা বিচলিত হন না। *ভগবদ্গীতায়ও* শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, জড় দেহের উপর জড়া প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে যেহেতু সুখ ও দুঃখের গমনাগমন হয়, তাই তার দ্বারা বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কখনও কখনও বিচলিত হয়ে পড়লেও, তা সহ্য করতে শেখা উচিত। জীবের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত বাহ্য দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি সর্বদা উদাসীন থাকা।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ থেকে আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই আটটি উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে কারও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই এই অনাসক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়ার উপায়। যিনি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনিই কেবল জড় দেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন। কেউ যখন কোন বিশেষ চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হন, তখন তিনি বাইরের কোন কিছু শুনতে পান না অথবা দেখতে পান না, যদিও সেগুলি তাঁর উপস্থিতিতে ঘটছে। তেমনই, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকেন, তাঁরা বাহ্যিক জড় দেহে কি হচ্ছে সেই সম্বন্ধে গ্রাহ্য করেন না। সেই অবস্থাকে বলা হয় সমাধি। যিনি এই সমাধি লাভ করেছেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম যোগী।

শ্লোক ১২

ভিন্নস্য লিঙ্গস্য গুণপ্রবাহো
দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মনঃ ।
দৃষ্টাসু সম্পৎসু বিপৎসু সূরয়ো
ন বিক্রিয়ন্তে ময়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ১২ ॥

ভিন্নস্য—ভিন্ন; **লিঙ্গস্য**—দেহের; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের; **প্রবাহঃ**—নিরন্তর পরিবর্তন; **দ্রব্য**—ভৌতিক উপাদান সমূহ; **ক্রিয়া**—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ; **কারক**—দেবতাগণ, **চেতনা** মন, **আত্মনঃ**—গঠিত; **দৃষ্টাসু**—যখন অনুভব করা হয়; **সম্পৎসু**—সুখ; **বিপৎসু**—দুঃখ; **সূরয়ঃ**—যাঁরা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন; **ন**—কখনই না, **বিক্রিয়ন্তে**—বিচলিত হন; **ময়ি**—আমাতে; **বদ্ধ-সৌহৃদাঃ**—বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণু পৃথু মহারাজকে বললেন—হে রাজন্! প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাবে এই জড় জগতে নিরন্তর পরিবর্তন হয়। পঞ্চ-মহাভূত, ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা দেবতাগণ, এবং মন, যা আত্মার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়—এই সবের সমন্বয়ে দেহ গঠিত হয়। যেহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় উপাদানের এই সমন্বয় থেকে আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই আমার সঙ্গে সুদৃঢ় সৌহার্দ্য ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ আমার ভক্ত পূর্ণজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে, জড় জগতের এই সুখ ও দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না।

তাৎপর্য

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জীবকে যদি দেহের কার্যকলাপের অধ্যক্ষতা করতে হয়, তা হলে সে দেহের কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে কিভাবে? তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে—এই সমস্ত কার্যকলাপ জীবাত্মার কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত এইভাবে দেওয়া যায়—একজন ব্যবসায়ী তার গাড়িতে বসে যখন কোথাও যান, তখন তিনি নিরীক্ষণ করেন গাড়িটি কিভাবে চলছে এবং সেই অনুসারে গাড়ির চালককে তিনি নির্দেশ দেন। তিনি জানেন কতটা তেল খরচ হচ্ছে, এবং এইভাবে তিনি গাড়িটির সমস্ত বিষয়ে অবগত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গাড়িটি থেকে ভিন্ন এবং তাঁর ব্যবসার ব্যাপারে তিনি অনেক

বেশি সচেতন। গাড়িতে করে যাওয়ার সময়েও, তিনি তাঁর ব্যবসা এবং অফিস সম্বন্ধেই চিন্তা করেন। গাড়িটিতে বসে থাকলেও গাড়িটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই একজন ব্যবসায়ী যেমন সর্বদা তাঁর ব্যবসার চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তেমনই জীবও ভগবানের প্রেমময়ী সেবার চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারেন তখন তাঁর পক্ষে তাঁর জড় দেহের কার্যকলাপ থেকে স্বতন্ত্র থাকা সম্ভব। এই প্রকার উদাসীন অবস্থা কেবল ভক্তের পক্ষেই সম্ভব।

বদ্ধ-সৌহৃদাঃ—'বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ' শব্দটি বিশেষভাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীরা ভগবদ্ভক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে না। কর্মীরা দেহের কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন। তাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে কেবল দেহটির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে জ্ঞানীরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা মুক্তি লাভ করতে পারে না। যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেনি, তাই তারা ব্রহ্ম অনুভূতির অতি উচ্চ পদ থেকে অধঃপতিত হয় যোগীরাও দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন—তারা মনে করে যে, ধারণা, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি দৈহিক ব্যায়ামের মাধ্যমে তারা পারমার্থিক বস্তু লাভ করতে পারবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে, ভক্ত সর্বদাই চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত। তাই, দেহের কর্ম এবং ফল থেকে স্বতন্ত্র থেকে প্রকৃত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা, অর্থাৎ ভগবানের সেবা করা, কেবল ভক্তের পক্ষেই সম্ভব।

শ্লোক ১৩

সমঃ সমানোত্তমমধ্যমাধমঃ
সুখে চ দুঃখে চ জিতেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।
ময়োপক্লৃপ্তাখিললোকসংযুতো
বিধৎস্ব বীরাখিললোকরক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥

সমঃ—সমভাব; **সমান**—সমান; **উত্তম**—শ্রেষ্ঠ, **মধ্যম**—অন্তর্বর্তী স্থিতিসম্পন্ন; **অধমঃ**—নিকৃষ্ট; **সুখে**—সুখে; **চ**—এবং; **দুঃখে**—দুঃখে, **চ**—ও; **জিত-ইন্দ্রিয়**—যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি জয় করেছেন; **আশয়ঃ**—মন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপক্লৃপ্ত**—আয়োজিত; **অখিল**—সমস্ত; **লোক**—মানুষদের দ্বারা; **সংযুতঃ**—মিলিত হয়ে; **বিধৎস্ব**—প্রদান কর; **বীর**—হে বীর; **অখিল**—সমস্ত, **লোক**—প্রজাদের; **রক্ষণম্**—রক্ষা।

অনুবাদ

হে বীর রাজা! সর্বদা সমভাবাপন্ন হয়ে উত্তম, মধ্যম ও অধম সমস্ত মানুষদের প্রতি সমানভাবে আচরণ কর। অনিত্য সুখদুঃখে বিচলিত হয়ো না। সর্বতোভাবে তোমার মন ও ইন্দ্রিয় সংযত কর আমার ব্যবস্থাপনায়, তুমি জীবনের যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সর্বদা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে, রাজারূপে তোমার কর্তব্য সম্পাদন করার চেষ্টা কর। তোমার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তোমার রাজ্যের প্রজাদের রক্ষা করা।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার একটি খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে হোক অথবা তাঁর প্রতিনিধি সদ্গুরুর কাছ থেকেই হোক, ভগবানের আদেশ পালন করাই মানুষের কর্তব্য। অর্জুন প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিলেন। তেমনই, এখানে পৃথু মহারাজও তাঁর কর্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন। *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ নিষ্ঠাসহকারে আমাদের পালন করা উচিত। *ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ*—প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির নির্দেশ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বলে মনে করে পালন করা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, মুক্তি লাভ হবে কি না সেই সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তা না করে, শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করে যাওয়া উচিত। তা করলে, তিনি সর্বদাই মুক্ত থাকবেন। *বর্ণ* (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং আশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) ধর্ম অনুসারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা সাধারণ মানুষের কর্তব্য কেউ যদি কেবল নিষ্ঠাসহকারে এবং নিয়মিতভাবে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, তা হলে তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা-বিধান করতে পারবেন।

পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন রাজা, তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে সর্বদা দৈহিক কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন থেকে, ভগবানের সেবায় সংলগ্ন হয়ে মুক্ত স্তরে স্থিত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী শ্লোকের *বদ্ধ-সৌহৃদাঃ* শব্দটি এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেহের কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন হয়ে, ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায় অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তি আচরণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করে ভগবান আমাদের সাহায্য

করেন। বাইরে তিনি গুরুরূপে আমাদের নির্দেশ দেন। তাই, শ্রীগুরুদেবকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবান বলেছেন, *আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ*—গুরুদেবকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৭/২৭)। শ্রীগুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবান বলেই মনে করা উচিত এবং কখনও তাঁর প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হওয়া উচিত নয় অথবা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। আমরা যদি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করি এবং ভগবদ্ভক্তি আচরণ করি, তা হলে আমরা সর্বদাই জড় দেহের ও জড় কার্যকলাপের কলুষ থেকে মুক্ত থাকব, এবং আমাদের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ১৪

শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব রাজ্ঞো
যৎসাম্পরায়ে সুকৃতাৎ ষষ্ঠমংশম্ ।
হর্তান্যথা হৃতপুণ্যঃ প্রজানা-
মরক্ষিতা করহারোহঘমত্তি ॥ ১৪ ॥

শ্রেয়ঃ—শুভ, **প্রজা-পালনম্**—জনসাধারণকে শাসন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার পক্ষে, **যৎ**—যেহেতু, **সাম্পরায়ে**—পরবর্তী জীবনে; **সুকৃতাৎ**—পুণ্যকর্ম থেকে; **ষষ্ঠম্ অংশম্**—ছয় ভাগের এক ভাগ; **হর্তা**—সংগ্রহকারী, **অন্যথা**—নতুবা; **হৃত-পুণ্যঃ**—পুণ্যকর্মের ফল থেকে বঞ্চিত হয়ে; **প্রজানাম্**—প্রজাদের, **অরক্ষিতা**—যিনি রক্ষা করেন না; **কর-হারঃ**—কর সংগ্রাহক; **অঘম্**—পাপ, **অত্তি**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

রাজার ধর্ম হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের রক্ষা করা। এইভাবে আচরণ করার ফলে, রাজা তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রজাদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ ভোগ করেন। কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে কিন্তু তাদের যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে না, সেই রাজার পুণ্যফল প্রজারা হরণ করে, এবং তার প্রজাদের পাপকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সকলেই যদি জড় জগতের প্রতি উদাসীন হয়ে মুক্তি লাভের জন্য পারমার্থিক কার্যকলাপে যুক্ত হন, তা হলে সব কিছু চলবে কি করে? আর যদি সব কিছু যথাযথভাবে চালাতে হয়, তা হলে রাজার পক্ষে সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব হয় কি করে? সেই প্রশ্নের উত্তরে, এখানে *শ্রেয়ঃ* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান অন্ধের মতো অথবা ঘটনাক্রমে সমাজের বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেননি, যে-কথা মূর্খ মানুষেরা বলে থাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমন কি শূদ্রেরও কর্তব্য হচ্ছে, যথাযথভাবে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা। এবং তার ফলে তারা সকলেই জীবনের চরম সিদ্ধি—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৫) প্রতিপন্ন হয়েছে *স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ*—"নিজের নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের ফলে, পরমসিদ্ধি লাভ করা যায়।" ভগবান শ্রীবিষ্ণু পৃথু মহারাজকে তাঁর প্রজা পালনের দায়িত্বভার ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে মুক্তিলাভের জন্য হিমালয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেননি। তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর রাজকার্য সম্পাদন করেই তিনি মুক্তিলাভ করতে পারেন। রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে প্রজা বা জনসাধারণ যাতে তাদের পারমার্থিক মুক্তিলাভের জন্য তাদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে তা দেখা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে প্রজাদের কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানকে সেই উদ্দেশ্যে কোন কিছু করার প্রয়োজন হয় না। আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় প্রজাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য করার জন্য বহু আইন-কানুন রয়েছে, কিন্তু প্রজাদের পারমার্থিক জ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে কি না, সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্র-সরকার সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকে। তার ফলে, ভগবৎ চেতনা বা পারমার্থিক জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ হয়ে, প্রজারা তাদের নিজেদের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করে এবং তার ফলে তারা পাপকর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

একজন রাষ্ট্র-প্রধানের জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি উদাসীন থেকে কেবল তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা উচিত নয়। রাজার প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে, প্রজারা যাতে ধীরে ধীরে পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে তা দেখা। কৃষ্ণভক্তি লাভ করা মানে সব রকম পাপকর্ম থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া। রাজ্য থেকে পাপকর্ম যখন সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা হয়, তখন আর যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে পৃথিবীর অবস্থা

সেই রকম ছিল। রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রজাদের কৃষ্ণভক্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন, তা হলেই কেবল তিনি প্রজা-শাসনের যোগ্য; তা না হলে তার কর সংগ্রহ করার কোন অধিকার নেই। রাজা যদি প্রজাদের পারমার্থিক কল্যাণ সাধনে সচেতন থাকেন, তা হলেই তিনি অনায়াসে কর সংগ্রহ করতে পারেন। তার ফলে রাজা ও প্রজা ইহলোকে সুখী হন, এবং পরলোকে রাজা তাঁর প্রজাদের পুণ্য কর্মের এক ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হতে পারেন। তা না হলে, পাপী প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করার ফলে, তাকে তাদের পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

পিতামাতা এবং গুরুদেবের ক্ষেত্রেও সেই নিয়মটি প্রযোজ্য। পিতামাতা যদি কেবল কুকুর-বিড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করে, কিন্তু তাদের আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে না পারে, তা হলে তারা তাদের পশুতুল্য সন্তানদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী হয়। সম্প্রতি, এই সমস্ত সন্তানেরা হিপী হয়ে যাচ্ছে। তেমনই, গুরু যদি শিষ্যকে পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার নির্দেশ না দিতে পারে, তা হলে তাকে তাদের পাপকর্মের জন্য দায়ী হতে হবে। প্রকৃতির এই সমস্ত সূক্ষ্ম নিয়মগুলি মানব-সমাজের বর্তমান নেতাদের জানা নেই। যেহেতু সমাজের নেতারা মূর্খ এবং জনসাধারণ হচ্ছে চোর ও দুর্বৃত্ত, তাই মানব-সমাজের কল্যাণ হতে পারে না। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় না হওয়ার ফলে, এই প্রকার সমাজ-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সর্বত্র বিক্ষোভ, যুদ্ধ ও উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে।

শ্লোক ১৫

এবং দ্বিজাগ্র্যানুমতানুবৃত্ত
ধর্মপ্রধানোঽন্যতমোঽবিতাস্যাঃ ।
হ্রস্বেন কালেন গৃহোপযাতান্
দ্রষ্টাসি সিদ্ধাননুরক্তলোকঃ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **অগ্র্য**—অগ্রণীদের দ্বারা; **অনুমত**—অনুমোদিত; **অনুবৃত্ত**—গুরুশিষ্য পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত; **ধর্ম**—ধর্মনীতি; **প্রধানঃ**—যাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে; **অন্যতমঃ**—অনাসক্ত; **অবিতা**—রক্ষক; **অস্যাঃ**—পৃথিবীর; **হ্রস্বেন**—অল্প; **কালেন**—সময়ে; **গৃহ**—তোমার গৃহে; **উপযাতান্**—স্বয়ং এসে; **দ্রষ্টাসি**—তুমি দেখবে; **সিদ্ধান্**—সিদ্ধপুরুষ; **অনুরক্তঃ-লোকঃ**—প্রজাদের প্রিয়।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণু বললেন—হে মহারাজ পৃথু! তুমি যদি গুরু-পরম্পরা ধারায় দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে প্রজা পালন কর, এবং সব রকম মনোধর্ম-প্রসূত মতবাদের প্রতি অনাসক্ত হয়ে, তাঁদের দেওয়া ধর্মীয় অনুশাসন পালন কর, তা হলে তোমার সমস্ত প্রজারা সুখী হবে এবং তারা তোমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হবে, এবং তুমি অচিরেই সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চারজন মুক্ত-পুরুষের দর্শন লাভ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু পৃথু মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করা; তা হলে, মানুষ এই জড় জগতে যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, তার মৃত্যুর পর সে মুক্তি লাভ করবে। এই যুগে যেহেতু বর্ণাশ্রম ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছে, তাই বর্ণাশ্রম ধর্মের সমস্ত নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এই যুগে জীবনের পূর্ণতা লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা। বর্ণাশ্রম ধর্ম যেমন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানুষদের দ্বারা আচরণ করা সম্ভব, তেমনই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি মানুষের পক্ষে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা সম্ভব।

এখানে পরাশর, মনু আদি *দ্বিজাগ্র্য* বা ব্রাহ্মণ প্রধানদের অনুসরণ করা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মনীতি অনুসারে জীবন যাপন করতে হয়, সেই সম্বন্ধে এই সমস্ত মহর্ষিরা ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপ গোস্বামী আমাদের বিধি-বিধান দিয়েছেন। তাই গুরুশিষ্য পরম্পরার ধারায় যাঁরা দিব্য জ্ঞান লাভ করেছেন, সেই সমস্ত আচার্যদের নির্দেশ অনুসরণ করা কর্তব্য। এইভাবে, জীবনের বদ্ধ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও, আমাদের বর্তমান স্থিতি পরিত্যাগ না করে, জড় কলুষের বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন কারও অবস্থার পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই, কেবল পরম্পরা সূত্র থেকে শ্রবণ করে এবং ব্যবহারিক জীবনে সেই সমস্ত নীতিগুলি অনুসরণ করে, জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি—মুক্তিলাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দেহের পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন চেতনার পরিবর্তন। দুর্ভাগ্যবশত, এই অধঃপতিত যুগে, মানুষেরা কেবল দেহের চিন্তাতেই মগ্ন, আত্মার চিন্তায় নয়। তারা কেবল দেহের পরিপ্রেক্ষিতে নানা মতবাদ

সৃষ্টি করেছে, আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে নয়।

আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের বহু প্রতিনিধিরা আইন-প্রণয়ন করার জন্য ভোট দিচ্ছে। প্রতিদিন তারা নতুন নতুন আইন সৃষ্টি করছে কিন্তু যেহেতু সেই সমস্ত আইনগুলি হচ্ছে কতকগুলি অনভিজ্ঞ বদ্ধ জীবের মনোধর্মী ধারণাপ্রসূত, তাই সেগুলি মানব-সমাজকে স্বস্তি প্রদান করতে পারে না পূর্বে, রাজারা যদিও ছিলেন স্বৈরাচারী, তবুও তাঁরা মহর্ষি এবং মহাজনদের প্রদত্ত নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন তার ফলে রাজ্যশাসনে তাঁদের কোন রকম ভুল হত না, এবং সব কিছুই নিখুঁতভাবে পরিচালিত হত প্রজারা তখন ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পুণ্যবান, রাজা ন্যায়সঙ্গতভাবে কর ধার্য করতেন, এবং তাই সেই পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত সুখকর। বর্তমানে যে-সমস্ত তথাকথিত রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হচ্ছে, তারা সকলেই জড় বিষয়াসক্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, তারা কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে; তাদের কোন রকম শাস্ত্রজ্ঞান নেই পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এই সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানেরা এক-একটি মূর্খ এবং দুরাচারী, আর জনসাধারণ হচ্ছে শূদ্র। এই মূর্খ দুরাচারী আর শূদ্রদের সমন্বয় কখনও পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে পারে না। তাই আমরা দেখতে পাই যে, মানব-সমাজে যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও কলহ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, নেতারা কেবল মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করতেই অক্ষম নয়, তারা তাদের মানসিক শান্তি পর্যন্ত দিতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যারা মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে জীবন যাপন করে, তারা কখনও সফল হতে পারে না এবং মৃত্যুর পর সুখ অথবা মুক্তি লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ১৬

বরং চ মৎ কঞ্চন মানবেন্দ্র
বৃণীষ্ব তেঽহং গুণশীলযন্ত্রিতঃ ।
নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভি-
র্যোগেন বা যৎসমচিত্তবর্তী ॥ ১৬ ॥

বরম্—বর; **চ**—ও, **মৎ**—আমার থেকে; **কঞ্চন**—তুমি যা চাও, **মানব-ইন্দ্র**—হে নরশ্রেষ্ঠ; **বৃণীষ্ব**—অনুরোধ কর; **তে**—তোমার, **অহম্**—আমি; **গুণ-শীল**—উত্তম গুণ এবং শ্রেষ্ঠ আচরণ দ্বারা, **যন্ত্রিতঃ**—মুগ্ধ হয়ে; **ন**—না, **অহম্**—আমি, **মখৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **সু-লভঃ**—অনায়াসলব্ধ; **তপোভিঃ**—

তপস্যার দ্বারা, **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **বা**—অথবা; **যৎ**—যার ফলে; **সম-চিত্ত**—যার চিত্ত বৈষম্যরহিত; **বর্তী**—অবস্থিত হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্! তোমার উত্তম গুণাবলী এবং অপূর্ব সুন্দর আচরণে আমি মুগ্ধ হয়েছি, এবং তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। সেই জন্য তুমি আমার কাছে যে-কোন বর প্রার্থনা করতে পার। যারা উচ্চগুণাবলী-সমন্বিত নয় এবং যাদের আচরণ উত্তম নয়, তারা কেবলমাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, কঠোর তপস্যার দ্বারা অথবা যোগ অভ্যাসের দ্বারা কখনও আমার কৃপা লাভ করতে পারে না। কিন্তু যাঁদের চিত্ত সমস্ত পরিস্থিতিতে বৈষম্য-রহিত, তাঁদের হৃদয়ে আমি সর্বদা বিরাজ করি।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের সুন্দর চরিত্র ও আচরণে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে বরদান করেছিলেন। ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা অথবা যোগ অভ্যাসের দ্বারা কখনও তাঁর প্রসন্নতা-বিধান করা যায় না। তিনি কেবল সৎ চরিত্র ও আচরণের দ্বারাই প্রসন্ন হন। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত গুণগুলি বিকশিত করা যায় না। যারা ভগবানের প্রতি অবিচলিতভাবে শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ, তাঁরাই আত্মার সমস্ত সদ্‌গুণগুলি বিকশিত করতে পারে। আত্মা যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তা' ভগবানের সদ্‌গুণ-সমন্বিত। আত্মা যখন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত থাকে, তখনই কেবল জড় গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ভাল অথবা মন্দের বিচার হয়ে থাকে। কিন্তু জীব যখন সমস্ত জড় গুণের অতীত চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হয়, তখন সমস্ত সদ্‌গুণগুলি তার মধ্যে বিকশিত হয়। ভগবদ্ভক্তের মধ্যে যে ছাব্বিশটি গুণ দেখা যায়, সেগুলি হচ্ছে— (১) কৃপালু, (২) কারও সঙ্গে ঝগড়া না করা, (৩) পরম সত্যে অবিচল, (৪) সকলের প্রতি সমদর্শী, (৫) নির্দোষ, (৬) দানশীল, (৭) মৃদু, (৮) শুচি, (৯) সরল, (১০) পরোপকারী, (১১) শান্ত, (১২) কৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত, (১৩) জড় বাসনা-রহিত, (১৪) বিনীত, (১৫) স্থির, (১৬) সংযত, (১৭) মিতাহারী, (১৮) অপ্রমত্ত, (১৯) মানদ, (২০) অমানী, (২১) গম্ভীর, (২২) করুণাপূর্ণ, (২৩) বন্ধু-ভাবাপন্ন, (২৪) কবি, (২৫) দক্ষ এবং (২৬) মৌনী। জীবের মধ্যে যখন এই সমস্ত দিব্য গুণ বিকশিত হয়, তখন ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, কৃত্রিমভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা যোগ

অভ্যাসের দ্বারা কখনও ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায় না। অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন না করলে, কেউ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আশা করতে পারে না।

শ্লোক ১৭

মৈত্রেয় উবাচ

স ইত্থং লোকগুরুণা বিষ্বক্সেনেন বিশ্বজিৎ ।
অনুশাসিত আদেশং শিরসা জগৃহে হরেঃ ॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন, **সঃ**—তিনি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **লোক গুরুণা**—সমস্ত মানুষের পরম প্রভুর দ্বারা, **বিষ্বক্সেনেন**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা, **বিশ্ব-জিৎ**—বিশ্ববিজেতা (মহারাজ পৃথু); **অনুশাসিত**—আদিষ্ট হয়ে; **আদেশম্**—নির্দেশ; **শিরসা**—মস্তকে; **জগৃহে**—গ্রহণ করে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! এইভাবে বিশ্বজিৎ মহারাজ পৃথু পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক অবনত করে প্রত্যেকের ভগবানের আদেশ গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান যা বলেছেন তা ঠিক সেভাবেই, অত্যন্ত সাবধানতা ও শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের বাণীর সংশোধন করা অথবা সংযোজন করা আমাদের কার্য নয়, আজকাল তথাকথিত বহু পণ্ডিত ও স্বামী এইভাবে *ভগবদ্গীতার* মনগড়া ভাষ্য রচনা করছে। ভগবানের আদেশ কিভাবে গ্রহণ করতে হয় তার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত পৃথু মহারাজ এখানে দিয়েছেন। পরম্পরার মাধ্যমে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার এটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ১৮

স্পৃশন্তং পাদয়োঃ প্রেম্না ব্রীড়িতং স্বেন কর্মণা ।
শতক্রতুং পরিষ্বজ্য বিদ্বেষং বিসসর্জ্জ হ ॥ ১৮ ॥

স্পৃশন্তম্—স্পর্শ করে; **পাদয়োঃ**—পা; **প্রেম্ণা**—প্রেমবশত; **ব্রীড়িতম্**—লজ্জিত; **স্বেন**—তাঁর নিজের; **কর্মণা**—কার্যকলাপের দ্বারা; **শত-ক্রতুম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **বিদ্বেষম্**—বিদ্বেষ; **বিসসর্জ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **হ**—নিঃসন্দেহে।

অনুবাদ

ইন্দ্র তখন তাঁর কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে, পৃথু মহারাজের পদযুগলে পতিত হলেন। কিন্তু পৃথু মহারাজ তৎক্ষণাৎ প্রেমাপ্লুত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তাঁর যজ্ঞাশ্ব অপহরণ-জনিত বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধ করে তারপর অনুতপ্ত হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখানেও আমরা দেখতে পাই যে, দেবরাজ ইন্দ্র এত শক্তিশালী ছিলেন যে, তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে এসেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, পৃথু মহারাজের যজ্ঞের অশ্ব চুরি করার জন্য, তিনি নিজেকে একজন মহা অপরাধী বলে মনে করেছিলেন। ভগবান কখনও বৈষ্ণব-অপরাধীকে ক্ষমা করেন না। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। একজন মহান ঋষি ও যোগী দুর্বাসা মুনি অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করেছিলেন, এবং তাঁকেও অম্বরীষ মহারাজের পাদপদ্মে পতিত হতে হয়েছিল।

পৃথু মহারাজের পদতলে ইন্দ্র পতিত হয়েছিলেন, কিন্তু পৃথু মহারাজ ছিলেন এমনই এক উদারচিত্ত বৈষ্ণব যে, তিনি চাননি ইন্দ্র তাঁর পদতলে পতিত হোন পক্ষান্তরে, তিনি তাঁকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তাঁরা দুজনেই পূর্বের ঘটনা বিস্মৃত হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও মহারাজ পৃথু উভয়েই পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা উভয়েই ছিলেন বৈষ্ণব বা শ্রীবিষ্ণুর সেবক, তাই তাঁরা তাঁদের বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করেছিলেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে সহযোগিতামূলক আচরণের এটি একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বর্তমান সময়ে, মানুষেরা যেহেতু বৈষ্ণব নয়, তাই তারা পরস্পরের সঙ্গে সর্বক্ষণ যুদ্ধ করছে এবং তার ফলে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পূর্বেই বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এই পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করা অত্যন্ত প্রয়োজন, যাতে মানুষ পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষাপরায়ণ হলেও, কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে এই প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ও মাৎসর্য পরিত্যাগ করতে পারে

শ্লোক ১৯

ভগবানথ বিশ্বাত্মা পৃথুনোপহৃতার্হণঃ ।
সমুজ্জিহানয়া ভক্ত্যা গৃহীতচরণাম্বুজঃ ॥ ১৯ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অথ**—তার পর, **বিশ্ব-আত্মা** পরমাত্মা, **পৃথুনা**—পৃথু মহারাজের দ্বারা; **উপহৃত**—নিবেদিত; **অর্হণঃ**—পূজার সমস্ত সামগ্রী; **সমুজ্জিহানয়া**—ক্রমশ বর্ধিত; **ভক্ত্যা**—যার ভক্তি; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **চরণ-অম্বুজঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম অত্যন্ত সুন্দরভাবে পূজা করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের পূজা করার সময়, পৃথু মহারাজের ভগবৎ-প্রেম ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভক্তের শরীরে যখন বিভিন্ন প্রকার ভাবের উদয় হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁর ভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। ক্রন্দন, হাস্য, স্বেদ, মূর্চ্ছা, উন্মাদনা ইত্যাদি বহু প্রকার দিব্য ভাব রয়েছে। এই সমস্ত লক্ষণগুলি কখনও কখনও ভক্তের শরীরে দেখা যায় তাদের বলা হয় অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার, অর্থাৎ 'আট প্রকার দিব্য রূপান্তর'। সেগুলির কখনও অনুকরণ করা উচিত নয়, কিন্তু ভক্ত যখন সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই সমস্ত লক্ষণগুলি আপনা থেকেই তাঁর শরীরে প্রকাশিত হয়। ভগবান হচ্ছেন ভক্ত-বৎসল, অর্থাৎ তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। তাই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে-দিব্য আনন্দময় আদান প্রদান হয়, তা এই জড় জগতের কার্যকলাপের মতো নয়।

শ্লোক ২০

প্রস্থানাভিমুখোঽপ্যেনমনুগ্রহবিলম্বিতঃ ।
পশ্যন্ পদ্মপলাশাক্ষো ন প্রতস্থে সুহৃৎসতাম্ ॥ ২০ ॥

প্রস্থান—প্রস্থান করতে; **অভিমুখঃ**—উদ্যত; **অপি**—যদিও; **এনম্**—তাঁকে (পৃথুকে); **অনুগ্রহ**—দয়া স্বারা **বিলম্বিতঃ**—বিলম্ব; **পশ্যন্**—দেখে; **পদ্ম-পলাশ-অক্ষঃ**—

ভগবান, যাঁর নয়ন কমলদলের মতো; ন—না, প্রতস্থে—প্রস্থান করেছিলেন; সুহৃৎ — শুভাকাঙ্ক্ষী; সতাম্—ভক্তদের।

অনুবাদ

ভগবান তখন প্রস্থান করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ-পরায়ণ ছিলেন, তাই তিনি প্রস্থান করতে পারলেন না। ভগবান তখন তাঁর কমল-নয়নের দ্বারা পৃথু মহারাজের আচরণ দর্শন করেছিলেন, ভক্ত-বাৎসল্যহেতু তাঁর এই বিলম্ব হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে *সুহৃৎ সতাম্* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি সর্বদাই অনুরক্ত হন এবং তিনি সর্বদাই তাঁদের শুভ কামনা করেন। এটি পক্ষপাতিত্ব নয়। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন *(সমোহহং সর্বভূতেষু)*, কিন্তু যিনি তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁর প্রতি তিনি অনুগ্রহশীল। আর এক জায়গায় ভগবান বলেছেন যে, তাঁর ভক্ত সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং তিনিও সর্বদা তাঁর ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করেন।

তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রতি ভগবানের এই অনুরাগ অস্বাভাবিক নয়, অথবা পক্ষপাতিত্ব নয়। যেমন, পিতা তাঁর বহু পুত্রের মধ্যে যেই পুত্রটি তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়, তার প্রতি তিনিও বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেন। *ভগবদ্গীতার* (১০/১০) তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

> *তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।*
> *দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥*

যাঁরা নিরন্তর প্রীতি ও অনুরাগ সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থিত ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভগবান তাঁর ভক্তদের থেকে দূরে থাকেন না। তিনি সর্বদাই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান কিন্তু তাঁর ভক্তই কেবল তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের থেকে উপদেশ গ্রহণ করেন। তাই, ভগবদ্ভক্তের কখনও ভুল করার সম্ভাবনা থাকে না, এবং ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে পক্ষপাতিত্ব করেন না।

শ্লোক ২১

স আদিরাজো রচিতাঞ্জলির্হরিং
বিলোকিতুং নাশকদশ্রুলোচনঃ ।
ন কিঞ্চনোবাচ স বাষ্পবিক্লবো
হৃদোপগুহ্যামুমধাদবস্থিতঃ ॥ ২১ ॥

সঃ—তিনি, **আদি-রাজঃ**—আদি রাজা; **রচিত-অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে, **বিলোকিতুম্**—দেখার জন্য; **ন**—না; **অশকৎ**—সক্ষম হয়েছিলেন, **অশ্রু-লোচনঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে, **ন**—না, **কিঞ্চন**—কোন কিছু, **উবাচ**—বলেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **বাষ্প-বিক্লবঃ**—তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল, **হৃদা**—হৃদয়ে; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **অমুম্**—ভগবান, **অধাৎ**—অবস্থান করেছিলেন; **অবস্থিতঃ**—দাঁড়িয়ে ছিলেন

অনুবাদ

আদি রাজা পৃথুর চক্ষু তখন অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায়, ভগবানকে দর্শন করতে পারলেন না এবং তাঁকে সম্ভাষণ করতে পারলেন না। তিনি কেবল তাঁর হৃদয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে, কৃতাঞ্জলিপুটে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় যেমন শ্রীকৃষ্ণকে আদি পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই, ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার হওয়ার ফলে, পৃথু মহারাজকে এই শ্লোকে *আদিরাজ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত এবং একজন মহান বীর। তিনি তাঁর রাজ্যে সমস্ত দুষ্টদের দমন করেছিলেন। তিনি এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি সক্ষম ছিলেন তিনি তাঁর প্রজাদের পুণ্যকর্মে ও ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত রেখে, তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। প্রজাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা না করে, তিনি একটি কড়ি পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে কর হিসাবে গ্রহণ করেননি। জীবনের সব চাইতে বড় বিপত্তি হচ্ছে ভগবদ্বিহীন হওয়া এবং তাই তা পাপময়। যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজা প্রজাদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, আমিষাহার ও দ্যূতক্রীড়ায় লিপ্ত হয়ে পাপ কর্ম করতে দেন, তা হলে রাজা সেই জন্য দায়ী হন, এবং প্রজাদের সেই সমস্ত পাপকর্মের ফল রাজাকে ভোগ করতে হয়, কারণ তিনি অনর্থক তাদের কাছ থেকে কর

সংগ্রহ করেন। শাসকদের জন্য নিয়মাবলী রয়েছে, এবং যেহেতু শাসক-প্রধানরূপে পৃথু মহারাজ সেই সমস্ত নিয়মগুলি পালন করেছিলেন, তাই তাঁকে এখানে *আদিরাজঃ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

মহারাজ পৃথুর মতো একজন দায়িত্বশীল রাজাও প্রথম শ্রেণীর শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন। পৃথু মহারাজের আচরণ থেকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, কিভাবে তিনি অন্তরে ও বাইরে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

আজকে বোম্বাইয়ের খবর কাগজে আমরা দেখলাম যে, সরকার মদ্যপান নিষেধের আইন তুলে নিচ্ছে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে বোম্বাইয়ে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নাগরিকেরা এতই ধূর্ত যে, তারা অবৈধভাবে মদ তৈরি করে, এবং খোলাখুলিভাবে দোকানে বিক্রি হতে না দিলেও, শৌচাগার তথা অন্যান্য অস্বাভাবিক স্থানে মদ বিক্রি করছে। এই প্রকার অবৈধ চোরাচালান বন্ধ করতে না পেরে, সরকার সস্তা দামে মদ তৈরি করতে স্থির করেছে, যাতে শৌচালয়ে মদ না কিনে, সরাসরিভাবে সরকারের কাছ থেকে তা কিনতে পারে। রাষ্ট্রসরকার পাপপূর্ণ জীবন থেকে নাগরিকদের হৃদয় পরিবর্তন সাধনে অকৃতকার্য হয়েছে, তাই তারা রাজকোষ পূর্ণ করার জন্য এবং কর সংগ্রহে ক্ষতি হতে না দেওয়ার জন্য মদ তৈরি করে তা নাগরিকদের কাছে সরবরাহ করতে স্থির করেছে।

এই প্রকার সরকার কখনও পাপকর্মের ফল অর্থাৎ যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিপদ প্রতিহত করতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে যে, ভগবানের আইন যখন অমান্য করা হয় (*ভগবদ্গীতায়* যাকে *ধর্মস্য গ্লানিঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে), তখন হঠাৎ যুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তাদের কঠোর দণ্ডভোগ করতে হয়। সম্প্রতি আমরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি যুদ্ধ হতে দেখেছি। চৌদ্দ দিনের মধ্যে প্রচুর ধন ও জন নষ্ট হয়েছে, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে উৎপাত হয়েছে। এগুলি হচ্ছে পাপপূর্ণ জীবনের ফল। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষদের শুদ্ধ ও পবিত্র করা। আমরা যদি কৃষ্ণভাবনার বিকাশের ফলে আংশিকভাবেও শুদ্ধ হই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে *নষ্ট-প্রায়েষু অভদ্রেষু*, তা হলে মানুষের কাম, ক্রোধ আদি ভবরোগ নিরাময় হবে। তা সম্ভব হতে পারে কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী বা কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করার মাধ্যমে। বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগ সামরিক তহবিলে কোটি কোটি টাকা দান করেছে, এবং সেই টাকাগুলিকে বারুদরূপে পোড়ানো হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তাদের যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য মুক্তহস্তে দান

করতে বলা হয়, তখন তারা নারাজ হয়। এই অবস্থায়, সারা পৃথিবী নানা প্রকার বিপর্যয় ও যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দুর্দশা ভোগ করবে। এটি হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করার পরিণতি।

শ্লোক ২২

অথাবমৃজ্যাশ্রুকলা বিলোকয়ন্-
নতৃপ্তদৃগ্‌গোচরমাহ পূরুষম্ ।
পদা স্পৃশন্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে
বিন্যস্তহস্তাগ্রমুরঙ্গবিদ্বিষঃ ॥ ২২ ॥

অথ—তার পর, **অবমৃজ্য**—মার্জন করে, **অশ্রু-কলাঃ**—অশ্রুবিন্দু **বিলোকয়ন্** দর্শন করে, **অতৃপ্ত**—অপরিতৃপ্ত, **দৃক্-গোচরম্**—দৃষ্টির গোচরীভূত, **আহ**—তিনি বলেছিলেন, **পূরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে, **পদা**—তাঁর চরণকমল দ্বারা, **স্পৃশন্তম্**—স্পর্শ করে, **ক্ষিতিম্**—পৃথিবী; **অংসে**—স্কন্ধে, **উন্নতে**—উন্নত, **বিন্যস্ত** স্থাপন করে, **হস্ত** তাঁর হাতের **অগ্রম্**—অগ্রভাগ, **উরঙ্গ-বিদ্বিষঃ**—সর্পশত্রু গরুড়ের

অনুবাদ

তার পর তিনি অশ্রুধারা মার্জন করে দেখতে পেলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় স্পর্শ করে, গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে তাঁর হস্তের অগ্রভাগ বিন্যস্ত করে, তাঁর অপরিতৃপ্ত নয়ন-পথের পথিকরূপে অবস্থান করছেন। তখন পৃথু মহারাজ তাঁকে সম্বোধন করে এই প্রার্থনাটি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে যে, ভগবান পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে স্বর্গলোক পর্যন্ত সমস্ত উচ্চলোকের অধিবাসীরা পারমার্থিক জীবনে এত উন্নত যে, তাঁরা যখন এই পৃথিবী অথবা অনুরূপ অন্যান্য লোকে আসেন, তখন তাঁরা তাঁদের ভারশূন্যতা এমনভাবে বজায় রাখেন যে, ভূমি স্পর্শ না করেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু যেহেতু তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের একটি লোকে বাস করেন, তাই তিনি কখনও কখনও এমনভাবে অভিনয় করেন, যেন তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের একজন দেবতা। তিনি যখন প্রথম পৃথু মহারাজের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন,

তখন তিনি এই পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করেননি, কিন্তু তিনি যখন পৃথু মহারাজের আচরণ এবং চরিত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়েছিলেন, তখন তিনি বৈকুণ্ঠলোকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণরূপে আচরণ করেছিলেন। পৃথু মহারাজের প্রতি তাঁর স্নেহের বশে, তিনি পৃথিবী স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর বাহন গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে তাঁর হস্তের অগ্রভাগ স্থাপন করেছিলেন, যেন পৃথিবীপৃষ্ঠে দাঁড়াতে অভ্যস্ত না হওয়ার ফলে পড়ে যেতে পারেন বলে, সেই অবলম্বন গ্রহণ করেছিলেন। এগুলি পৃথু মহারাজের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহের লক্ষণ। তাঁর এই পরম সৌভাগ্য দর্শন করে, পৃথু মহারাজের নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল, এবং তাই তিনি স্পষ্টভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও গদ্‌গদ স্বরে তিনি তাঁর বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

পৃথুরুবাচ

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ
কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্ ।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥ ২৩ ॥

পৃথুঃ উবাচ—পৃথু মহারাজ বললেন; **বরান্**—বর; **বিভো**—হে ভগবান; **ত্বৎ**—আপনার থেকে; **বরদ-ঈশ্বরাৎ**—সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **কথম্**—কিভাবে; **বৃণীতে**—প্রার্থনা করতে পারে; **গুণ-বিক্রিয়া**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; **আত্মনাম্**—জীবের; **যে**—যে; **নারকাণাম্**—নরকবাসী জীবদের; **অপি**—ও; **সন্তি**—রয়েছে; **দেহিনাম্**—দেহধারীদের; **তান্**—সেই সমস্ত; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **কৈবল্য-পতে**—হে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রদাতা; **বৃণে**—আমি প্রার্থনা করি; **ন**—না; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে ভগবান! যাঁদের বরদান করার ক্ষমতা রয়েছে, আপনি সেই দেবতাদেরও ঈশ্বর। অতএব কোন বিবেকী ব্যক্তি কেন আপনার কাছে জড় জগতের গুণের বন্ধনে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভোগ্য বর প্রার্থনা করবে? সেই সমস্ত বর নরকবাসী

জীবেরা পর্যন্ত আপনা থেকে লাভ করে। হে ভগবান! আপনি ব্রহ্ম-সাযুজ্যও অবশ্যই দান করতে পারেন, কিন্তু সেই সমস্ত বর আমি লাভ করতে ইচ্ছা করি না।

তাৎপর্য

মানুষের বাসনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার বর রয়েছে। কর্মীদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ বর হচ্ছে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া। সেখানকার আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সুখের মাত্রা অত্যন্ত উন্নত। জ্ঞানী ও যোগীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়। তাকে বলা হয় *কৈবল্য*। তাই ভগবানকে এখানে *কৈবল্যপতি* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু ভগবানের কাছ থেকে ভগবদ্ভক্তরা এক ভিন্ন প্রকার বর প্রাপ্ত হন। ভক্তরা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চান না অথবা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চান না। ভক্তদের কাছে *কৈবল্য* ও নরকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যারা এই জড় জগতে রয়েছে, তাদের বলা হয় নারকী কারণ এই জড় জগৎ নারকীয়। পৃথু মহারাজ বলেছেন যে, তিনি কর্মীদের অভীপ্সিত বর কামনা করেন না, এমন কি জ্ঞানী ও যোগীদের অভীপ্সিত বরও কামনা করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বর্ণনা করেছেন যে, *কৈবল্য* নরক-সদৃশ, এবং স্বর্গসুখ আকাশ-কুসুমের মতো। ভক্ত সেগুলি কামনা করেন না। ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মা অথবা শিবের পদও কামনা করেন না, এমন কি ভক্ত ভগবানের সমানও হতে চান না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে পৃথু মহারাজ তাঁর স্থিতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ২৪

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্-
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ২৪ ॥

ন—না; **কাময়ে**—কামনা করি; **নাথ**—হে প্রভু; **তৎ**—তা; **অপি**—এমন কি; **অহম্**—আমি; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **যুষ্মৎ**—আপনার; **চরণ-অম্বুজ**—শ্রীপাদপদ্মের; **আসবঃ**—অমৃত; **মহৎ-তম**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের; **অন্তঃ-হৃদয়াৎ**—হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে; **মুখ**—মুখ থেকে; **চ্যুতঃ**—নির্গত,

বিধৎস্ব—প্রদান করুন; **কর্ণ**—কান; **অযুতম্**—দশ সহস্র, **এষঃ**—এই; **মে**—আমার; **বরঃ**—বর

অনুবাদ

হে ভগবান। আমি তাই আপনার অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার বর প্রার্থনা করি না, কারণ সেই অস্তিত্বে আপনার শ্রীপাদপদ্মের অমৃত পান করা যায় না। আমি কেবল অযুত কর্ণ লাভের বর প্রার্থনা করি, কারণ তার ফলে আমি আপনার শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীমুখ থেকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ করতে সক্ষম হব।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে পৃথু মহারাজ ভগবানকে *কৈবল্যপতি* বলে সম্বোধন করেছেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি কৈবল্য মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন তা এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—"হে প্রভু। আমি সেই প্রকার বর কামনা করি না।" পৃথু মহারাজ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ করার জন্য অযুত কর্ণ লাভের বর প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ভগবানের সেই মহিমা যেন তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীমুখনিঃসৃত হয়, যাঁরা তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভগবানের সেই মহিমা কীর্তন করেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে (১/১/৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *শুক-মুখাদ্ অমৃত-দ্রব সংযুতম্*—শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়ার ফলে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* অমৃত আরও অধিক আস্বাদনীয় হয়েছে। কেউ মনে করতে পারে যে, ভক্ত ও অভক্ত নির্বিশেষে যে-কোন মানুষের কাছ থেকে অথবা যে কোন স্থানে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা যেতে পারে, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের মহিমা যেন অবশ্যই শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়। অভক্তদের মুখ থেকে শ্রবণ করতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী কঠোরভাবে নিষেধ করে গেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু পেশাদারী বক্তা রয়েছে, যারা অত্যন্ত আলঙ্কারিক ঢঙে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রবচন দেয়, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত তাদের কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শুনতে চান না, কারণ ভগবানের এই প্রকার মহিমা-কীর্তন কেবল জড় শব্দ-তরঙ্গের স্পন্দন মাত্র। কিন্তু যখন এই *শ্রীমদ্ভাগবত* শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করা হয়, তখন ভগবানের মহিমা তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়

শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী (৩/২৫/২৫) *সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্যসংবিদ* কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে যখন ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়, তখন

তা অত্যন্ত বীর্যবতী হয়। সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবানের অসংখ্য ভক্ত রয়েছে, এবং তাঁরা অনাদিকাল ধরে অন্তহীনভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে শেষ করতে পারছেন না। পৃথু মহারাজ তাই অযুত কর্ণ লাভের বর প্রার্থনা করেছেন, ঠিক যেমন রূপ গোস্বামীও কোটি কোটি কর্ণ ও কোটি কোটি জিহ্বা লাভের বাসনা করেছেন, যাতে তিনি ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারেন এবং শ্রবণ করতে পারেন। অর্থাৎ, আমাদের কর্ণ যদি সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণে যুক্ত থাকে, তা হলে পারমার্থিক উন্নতির সর্বনাশ সাধনকারী মায়াবাদ দর্শন শ্রবণ করার কোন অবকাশ থাকবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, কেউ যদি মায়াবাদীর কাছ থেকে ভগবানের কার্যকলাপেব বিষয় শ্রবণ করে, তা হলে সেই বর্ণনা বৈদিক শাস্ত্র থেকে হলেও তার সর্বনাশ হবে। মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ করে কেউই পারমার্থিক জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না।

শ্লোক ২৫

স উত্তমশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥ ২৫ ॥

সঃ—সেই; **উত্তম শ্লোক**—উত্তমশ্লোকের দ্বারা যাঁর বন্দনা হয়, সেই ভগবান; **মহৎ**—মহান ভক্তদের; **মুখ-চ্যুতঃ**—মুখনিঃসৃত; **ভবৎ**—আপনাব; **পদ-অম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্ম থেকে; **সুধা**—অমৃতের; **কণ**—বিন্দু; **অনিলঃ**—সুখকর বায়ু; **স্মৃতিম্**—স্মরণশক্তি; **পুনঃ**—পুনরায়; **বিস্মৃত**—বিস্মৃত; **তত্ত্ব**—সত্য; **বর্ত্মনাম্**—যাদের পথ; **কু-যোগিনাম্**—যারা ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ করেনি তাদের; **নঃ**—আমাদের; **বিতরতি**—পুনরায় প্রদান করে; **অলম্**—বৃথা; **বরৈঃ**—অন্য বর।

অনুবাদ

হে ভগবান। মহাপুরুষদের মুখনিঃসৃত উত্তমশ্লোকের দ্বারা আপনার মহিমা কীর্তিত হয়। আপনার শ্রীপাদপদ্মের এই মহিমা ঠিক কেশরের কণার মতো। যখন মহান ভক্তদের মুখনিঃসৃত বাণী আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিস্পৃশ কেশরের সৌরভ

বহন করে, তখন বিস্মৃত জীবেরা পুনরায় আপনার সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা স্মরণ করে। এইভাবে ভক্তেরা যথাযথভাবে জীবনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। হে ভগবান, আমি আপনার শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার সৌভাগ্য ব্যতীত আর অন্য কোন বর চাই না।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা উচিত। সেই কথা পুনরায় এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে শুদ্ধ ভক্তের মুখনিঃসৃত চিন্ময় শব্দতরঙ্গ এতই বীর্যবতী যে, তা ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের স্মৃতি পুনর্জাগরিত করতে পারে। এই জগতে মায়ার বশীভূত হওয়ার ফলে, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমরা বিস্মৃত হয়েছি, ঠিক যেমন গভীর নিদ্রায় মগ্ন মানুষ তার কর্তব্য ভুলে যায়। *বেদে* বলা হয়েছে যে, আমরা সকলে মায়ার প্রভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি। এই নিদ্রিত অবস্থা থেকে জেগে উঠে, আমাদের প্রকৃত সেবায় যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, এবং এইভাবে আমরা এই মনুষ্য জীবনের অপূর্ব সুযোগ যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করতে পারি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি গানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, জীব জাগ, জীব জাগ। ভগবান প্রতিটি জীবকে জেগে উঠে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন, যাতে এই মনুষ্য-জীবনে তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। জেগে ওঠার এই বাণী শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়।

শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, তাই তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কেশর সদৃশ কৃপাকণার সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত। শুদ্ধ ভক্তের বাণী যদিও জড় আকাশের শব্দেরই মতো, তবুও তাঁর সেই বাণী এমনই বীর্যবতী যে, তা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কেশরকণা স্পর্শ করে। কোন নিদ্রিত ব্যক্তি যখন শুদ্ধ ভক্তের মুখনিঃসৃত বীর্যবতী বাণী শ্রবণ করে, তৎক্ষণাৎ ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা মনে পড়ে যায়, যদিও সেই ক্ষণ পর্যন্ত সে সব কিছু ভুলে ছিল।

তাই সকাম কর্ম, মনোধর্মী জ্ঞান অথবা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে বদ্ধ জীবদের শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই হচ্ছি *কুযোগী*, কারণ ভগবানের নিত্য সেবকরূপে তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে, আমরা এই জড় জগতের সেবায় যুক্ত হয়েছি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই

কুযোগীর স্তর থেকে সুযোগীর স্তরে উন্নীত হওয়া। শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করার পন্থা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবে অনুমোদন করেছেন। মানুষ তার নিজের অবস্থাতেই থাকতে পারেন—তা যে অবস্থাতেই হোক না কেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করার ফলে, তিনি ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং তার ফলে তাঁরা প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। এইভাবে জীবন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হতে পারে। তাই, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করার এই পন্থা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৬

যশঃ শিবং সুশ্রব আর্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং
শ্রীর্যৎপ্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥

যশঃ—মহিমা; **শিবম্**—কল্যাণকর; **সু-শ্রবঃ**—হে মহা-মহিমান্বিত ভগবান; **আর্য-সঙ্গমে**—উত্তম ভক্তদের সাহচর্যে; **যদৃচ্ছয়া**—কোন না কোনভাবে; **চ**—ও; **উপশৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **তে**—আপনার; **সকৃৎ**—একবারও; **কথম্**—কিভাবে; **গুণ-জ্ঞঃ**—গুণগ্রাহী; **বিরমেৎ**—বিরত হতে পারে; **বিনা**—যদি না; **পশুম্**—পশু; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **যৎ**—যা; **প্রবব্রে**—স্বীকৃত; **গুণ**—আপনার গুণের; **সংগ্রহ**—লাভ করার; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছায়।

অনুবাদ

হে মহা-মহিমান্বিত ভগবান! কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের সাহচর্যে আপনার কার্যকলাপের মহিমা একবারও শ্রবণ করেন, এবং তিনি যদি একটি পশু না হন, তা হলে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না, কারণ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা কখনও করবে না। আপনার মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের পূর্ণপন্থা লক্ষ্মীদেবীও গ্রহণ করেছেন। তিনি কেবল আপনার অনন্ত কার্যকলাপ ও অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করার জন্য সর্বদা উৎসুক।

তাৎপর্য

এই সংসারে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ *(আর্য-সঙ্গম)* সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। *আর্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক মার্গে যাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন। মানব-জাতির ইতিহাসে, আর্যদের পৃথিবীর সব চাইতে উন্নত জাতি বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কারণ তাঁরা বৈদিক সভ্যতা গ্রহণ করেছেন। আর্যরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন এবং তাঁরা ভারতীয়-আর্য নামে পরিচিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমস্ত আর্যরা সমস্ত বৈদিক নিয়ম পালন করতেন, এবং তার ফলে তাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন। রাজর্ষি নামে পরিচিত রাজারা ক্ষত্রিয়রূপে অথবা প্রজাদের রক্ষা-কর্তারূপে এত সুন্দর শিক্ষালাভ করতেন, এবং আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁরা এত উন্নত ছিলেন যে, প্রজাদের লেশমাত্রও কষ্ট ছিল না।

আর্যরা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। অন্যদের ক্ষেত্রে যদিও কোন বাধা ছিল না, তবুও আর্যরা অতি শীঘ্রই পারমার্থিক জীবনের সার গ্রহণ করতে পারতেন। ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের কাছে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের বাণী এত সহজে প্রচার করতে পারছি কি করে? ইতিহাস বলে যে, আমেরিকান ও ইউরোপীয়রা যখন উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিল, তখন তারা তাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু বর্তমানে জড় বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাবে কলুষিত হয়ে, তাদের পুত্র ও পৌত্রেরা দুরাচারী হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে তারা তাদের আদি আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, বৈদিক সভ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে আর্য পরিবারের এই সমস্ত বংশধরেরা অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করছে। অন্যেরা যারা তাদের সঙ্গ করছে, এবং শুদ্ধ ভক্তদের মুখ থেকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ ও কীর্তন করছে, তারাও এই দিব্য শব্দ-তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। আর্যদের সঙ্গে যখন এই দিব্য শব্দ-তরঙ্গ উচ্চারণ করা হয়, তখন তার প্রভাব অত্যন্ত বীর্যবতী হয়; তবে আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত না হলেও, কেউ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ করেন, তা হলে তিনিও বৈষ্ণবে পরিণত হবেন, কারণ এই দিব্য শব্দ-তরঙ্গের মহতী প্রভাব সকলকেই প্রভাবিত করে।

পৃথু মহারাজ ইঙ্গিত করেছেন যে, নারায়ণের নিত্যসঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীও ভগবানের মহিমা শ্রবণ করতে চান, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ব্রজগোপিকাদের সঙ্গ লাভের জন্য লক্ষ্মীদেবী কঠোর তপস্যা করেছিলেন। নির্বিশেষবাদীরা প্রশ্ন করতে পারে, কৈবল্য বা মুক্তি অথবা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে, বহু বছর ধরে নিরন্তর কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে কি লাভ হবে। তার

উত্তরে পৃথু মহারাজ বলেছেন যে, এই কীর্তনের আকর্ষণ এমনই মহৎ যে, কেউ যদি নিছক একটি পশু না হয়, তা হলে তার পক্ষে এই পন্থা পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। এমন কি কেউ যদি ঘটনাক্রমেও এই দিব্য শব্দ তরঙ্গের সান্নিধ্য লাভ করে, তা হলে তার ক্ষেত্রেও তাই হয়। এই বিষয়ে পৃথু মহারাজ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, একটি পশুই কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের অনুশীলন ত্যাগ করতে পারে। যাঁরা পশু নয়, পক্ষান্তরে প্রকৃতই বুদ্ধিমান, উন্নত, সভ্য মানুষ, তাঁরা কখনও হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ত্যাগ করতে পারেন না।

শ্লোক ২৭

অথাভজে ত্বাখিলপূরুষোত্তমং
গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলি-
র্ন স্যাৎকৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ ॥ ২৭ ॥

অথ—অতএব; **আভজে**—আমি ভজনা করব, **ত্বা**—আপনাকে, **অখিল**—সমস্ত; **পূরুষ-উত্তমম্**—শ্রীভগবান, **গুণ-আলয়ম্**—সমস্ত সদ্‌গুণের আধার, **পদ্ম-করা**—পদ্মহস্ত লক্ষ্মীদেবী; **ইব**—সদৃশ; **লালসঃ**—ইচ্ছুক, **অপি**—বাস্তবিকপক্ষে; **আবয়োঃ**—লক্ষ্মীদেবী ও আমার, **এক-পতি**—এক পতি; **স্পৃধোঃ**—প্রতিযোগিতা, **কলিঃ**—কলহ; **ন**—না; **স্যাৎ**—হতে পারে, **কৃত**—করে, **ত্বৎ-চরণ**—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; **এক-তানয়োঃ**—একাগ্রতা।

অনুবাদ

এখন আমি ঠিক কমলার মতো ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হতে চাই, কারণ ভগবান হচ্ছেন সমস্ত দিব্য গুণের আধার। সেই জন্য হয়তো লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আমার বিবাদ হতে পারে, কারণ আমরা উভয়েই একাগ্রচিত্তে একই সেবায় যুক্ত হব।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে *অখিল-পূরুষোত্তম* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ ভগবান হচ্ছেন সমগ্র জগতের ঈশ্বর। *পূরুষ* মানে হচ্ছে 'ভোক্তা' এবং *উত্তম* মানে হচ্ছে

'শ্রেষ্ঠ'। এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন প্রকার *পুরুষ* বা ভোক্তা রয়েছে। সাধারণত তাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। *বেদে* ভগবানকে সমস্ত নিত্যের মধ্যে পরম নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে (*নিত্যো নিত্যানাম্*)। পরমেশ্বর ভগবান ও জীব উভয়েই নিত্য। পরম নিত্য হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব, বা বিষ্ণু ও তাঁর অবতারেরা। অতএব নিত্য বলতে কৃষ্ণ থেকে শুরু করে মহাবিষ্ণু, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অবতারদের ইঙ্গিত করে। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে (*রামাদি-মূর্তিষু*), রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি ভগবান বিষ্ণুর অনন্ত কোটি অবতার রয়েছেন, এবং তাঁদের সকলকেই বলা হয় নিত্য।

যাঁরা কখনও এই জড় জগতে আসেননি, *মুক্ত* শব্দটি সেই সমস্ত জীবেদের ইঙ্গিত করে। বদ্ধ জীব হচ্ছে তারা, যারা প্রায় নিত্যকাল ধরে এই জড় জগতে রয়েছে। বদ্ধরা জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে, আনন্দ লাভ করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে, কিন্তু মুক্তরা ইতিমধ্যেই বন্ধনমুক্ত। তাঁরা কখনও এই জড় জগতে আসেন না। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন এই জড় জগতের অধীশ্বর, এবং জড়া প্রকৃতির দ্বারা তাঁর নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই শ্রীবিষ্ণুকে এখানে *পুরুষোত্তম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে জীবতত্ত্বের তুলনা করা অথবা তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা একটি মহা অপরাধ। মায়াবাদীরা জীব ও ভগবানকে সমান ও এক বলে মনে করে। সেটি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ।

এই জড় জগতে আমরা দেখতে পাই যে, উন্নত স্তরের ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্তরের দ্বারা পূজিত হন। তেমনই, পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই অন্যদের দ্বারা পূজিত হন। পৃথু মহারাজ তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হতে মনস্থ করেছেন। পৃথু মহারাজকে শ্রীবিষ্ণুর একজন অবতার বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তিনি হচ্ছেন শক্ত্যাবেশ অবতার। এই শ্লোকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *গুণালয়ম্*, যা ইঙ্গিত করে যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত গুণের উৎস। মায়াবাদীরা তাদের নির্বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নির্গুণ (সমস্ত গুণরহিত), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান হচ্ছেন সমস্ত গুণের উৎস। ভগবানের সব চাইতে মাহাত্ম্যপূর্ণ একটি গুণ হচ্ছে তাঁর ভক্তদের প্রতি তাঁর অনুরাগ, তাই তাঁকে বলা হয় ভক্তবৎসল। ভক্তরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় আগ্রহী, এবং ভগবানও তাঁর ভক্তদের প্রেমময়ী সেবা গ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহী। এই সেবার বিনিময়ে নানা প্রকার দিব্য আদান-প্রদান হয়, যাদের বলা হয় দিব্য গুণাত্মক

কার্যকলাপ। ভগবানের দিব্য গুণাবলীর কয়েকটি হচ্ছে যে, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপ্ত, সর্ব-শক্তিমান, সর্ব-কারণের পরম কারণ, পরম সত্য, সমস্ত আনন্দের উৎস, সমস্ত জ্ঞানের উৎস, সর্ব-মঙ্গলময়, ইত্যাদি।

লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পৃথু মহারাজ ভগবানের সেবা করার বাসনা করেছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি মাধুর্যরসে অবস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীদেবী মাধুর্য রসে ভগবানের সেবায় যুক্ত। যদিও লক্ষ্মীদেবীর স্থান ভগবানের বক্ষে, কিন্তু একজন ভক্তরূপে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করে আনন্দ উপভোগ করেন। পৃথু মহারাজ কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথাই চিন্তা করছিলেন, কারণ তিনি ভগবানের দাস্যরসের সেবক পরবর্তী শ্লোকে আমরা জানতে পারব যে, পৃথু মহারাজ লক্ষ্মীদেবীকে জগজ্জননীরূপে দর্শন করছিলেন তার ফলে মাধুর্যরসে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শঙ্কিত ছিলেন যে, ভগবানের সেবা করার ফলে, লক্ষ্মীদেবী হয়তো তাঁর প্রতি রুষ্ট হতে পারেন এ থেকে বোঝা যায় যে, চিন্ময় জগতেও ভগবানের সেবকদের মধ্যে সেবার প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু এই প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণরূপে দ্বেষভাব রহিত বৈকুণ্ঠলোকে যদি কোন ভক্ত ভগবানের সেবায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, তা হলে অন্যেরা তাঁর শ্রেষ্ঠ সেবার জন্য ঈর্ষান্বিত হন না, বরং সেই সেবার পর্যায়ে উপনীত হওয়ার প্রয়াসী হন।

শ্লোক ২৮

জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎকর্মণি নঃ সমীহিতম্ ।
করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ
স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া ॥ ২৮ ॥

জগৎ-জনন্যাম্—জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী; **জগৎ-ঈশ**—হে জগদীশ্বর; **বৈশসম্**—ক্রোধ; **স্যাৎ**—হতে পারে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যৎ-কর্মণি**—যাঁর কার্যকলাপে; **নঃ**—আমার; **সমীহিতম্**—আকাঙ্ক্ষা; **করোষি**—আপনি বিবেচনা করুন; **ফল্গু**—তুচ্ছ সেবা; **অপি**—যদিও; **উরু**—অত্যধিক; **দীন-বৎসলঃ**—দীনের প্রতি স্নেহপরায়ণ; **স্বে**—নিজের, **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধিষ্ণ্যে**—আপনার ঐশ্বর্যে; **অভিরতস্য**—সম্পূর্ণরূপে যিনি সন্তুষ্ট; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **তয়া**—তাঁর সঙ্গে।

অনুবাদ

হে জগদীশ্বর! লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন সারা জগতের মাতা, এবং তবু আমার মনে হয় যে, তাঁর সেবায় হস্তক্ষেপ করার ফলে এবং যে পদের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত সেই সেবা করার ফলে, তিনি হয়তো আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তা হলেও আমি আশা করি যে, আমাদের এই ভুল বোঝাবুঝিতে আপনি আমার পক্ষ অবলম্বন করবেন, কারণ আপনি দীনবৎসল এবং আপনি সর্বদা তুচ্ছ সেবাকেও অনেক বড় করে দেখেন। তাই লক্ষ্মীদেবী আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেও, আমার মনে হয় যে, তাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, কারণ আপনি সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল, সুতরাং লক্ষ্মীতেও আপনার তত প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

মা লক্ষ্মী সর্বদা নারায়ণের পদসেবা করেন বলে বিখ্যাত। তিনি একজন আদর্শ পত্নী, কারণ তিনি সর্বতোভাবে নারায়ণের সেবা করেন। তিনি কেবল তাঁর পদসেবাই করেন না, অধিকন্তু তিনি তাঁর গৃহস্থালির সমস্ত কার্যও করেন। তিনি তাঁর জন্য অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করেন, তাঁর আহারের সময় তাঁকে ব্যজন করেন, তাঁর মুখমণ্ডলে চন্দন লেপন করেন এবং তাঁর শয্যা ও আসন প্রস্তুত করেন। এইভাবে তিনি সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং তাঁর দৈনন্দিন কার্যকলাপে অন্য কোন ভক্তের হস্তক্ষেপ করার কোন রকম সুযোগ থাকে না। পৃথু মহারাজের তাই মনে হয়েছিল যে, লক্ষ্মীদেবী ভগবানের যে সেবা করেন, তিনি যদি সেই সেবা করতে যান, তা হলে লক্ষ্মীদেবী হয়তো তাঁর প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হবেন। কিন্তু সমগ্র জগতের জননী মা লক্ষ্মী কেন পৃথু মহারাজের মতো একজন নগণ্য সেবকের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন? সেটিও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও পৃথু মহারাজ নিজেকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের কাছে আবেদন করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন। পৃথু মহারাজ সাধারণ বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বা সকাম কর্মে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু ভগবান এতই দয়ালু ও উদার যে, তিনি পৃথু মহারাজকে জীবনের পরম পদ, অর্থাৎ ভক্তি প্রদান করতে প্রস্তুত ছিলেন।

কেউ যখন বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য থাকে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার। এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা কেউই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু ভগবান এতই কৃপাময় যে, তাঁর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অতি তুচ্ছ সেবাও তিনি গ্রহণ করেন, এবং তাই *বিষ্ণু পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন যজ্ঞকর্তা ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন। তাই পৃথু

মহারাজ আশা করেছিলেন যে, তাঁর তুচ্ছ সেবা ভগবান স্বীকার করবেন এবং তিনি তা লক্ষ্মীদেবীর সেবা থেকেও শ্রেয় বলে মনে করবেন. লক্ষ্মীদেবীকে বলা হয় চঞ্চলা, কারণ তিনি এক জায়গায় স্থির থাকতে পারেন না। তাই পৃথু মহারাজ ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি যদি ক্রোধবশত চলেও যান, তা হলেও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কোন ক্ষতি হবে না, কারণ তিনি আত্ম-নির্ভরশীল এবং লক্ষ্মীদেবীর সহায়তা ব্যতীতই তিনি যে কোন কার্য করতে পারেন। যেমন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মাকে তাঁর নাভি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্মীদেবীর সাহায্য গ্রহণ করেননি। লক্ষ্মীদেবী তখন তাঁর পাশে বসে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করছিলেন সাধারণত পতি যখন পত্নীর গর্ভে বীর্যাধান করেন, তখন যথাসময়ে পুত্রের জন্ম হয় কিন্তু ব্রহ্মার জন্মের ক্ষেত্রে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীতে গর্ভসঞ্চার করেননি। আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার ফলে, ভগবান তাঁর নাভি থেকে ব্রহ্মাকে উৎপাদন করেছিলেন। তাই, পৃথু মহারাজের বিশ্বাস ছিল যে, লক্ষ্মীদেবী যদি তাঁর প্রতি রুষ্ট হন, তা হলে ভগবান ও তাঁর উভয়েরই কোন ক্ষতি হবে না।

শ্লোক ২৯

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্ ।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ন বিদ্মহে ॥ ২৯ ॥

ভজন্তি—আরাধনা করে; **অথ**—অতএব; **ত্বাম্**—আপনি; **অত এব**—সুতরাং; **সাধবঃ**—সাধু ব্যক্তিগণ; **ব্যুদস্ত**—যিনি দূর করেন, **মায়া-গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **বিভ্রম**—ভ্রান্ত ধারণা, **উদয়ম্** উৎপন্ন হয়, **ভবৎ**—আপনার, **পদ**—চরণ-কমল; **অনুস্মরণাৎ**—নিরন্তর স্মরণ করার ফলে; **ঋতে**—বিনা, **সতাম্** মহাত্মাদের, **নিমিত্তম্**—কারণ; **অন্যৎ**—অন্য; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ন**—না; **বিদ্মহে**—বুঝতে পারি

অনুবাদ

মহান মুক্ত পুরুষেরা সর্বদা আপনাকে ভক্তি করে, কারণ ভক্তির প্রভাবেই কেবল মোহময়ী জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। হে ভগবান! মুক্ত পুরুষেরা যে আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাঁরা নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করেন।

তাৎপর্য

কর্মীরা সাধারণত দৈহিক সুখের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। জ্ঞানীরা কিন্তু জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, চিন্ময় আত্মা হওয়ার ফলে, এই জড় জগতে তাঁদের করণীয় কিছু নেই। আত্ম-উপলব্ধির পর, জ্ঞানের পরিপক্ব অবস্থায় জ্ঞানীরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *(বহূনাং জন্মনামন্তে)*। ভগবদ্ভক্তির স্তরে না আসা পর্যন্ত আত্মজ্ঞান পূর্ণ হয় না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত, তারা জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, বিশেষ করে রজ ও তমোগুণের দ্বারা, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অত্যন্ত লোভী ও কামাতুর থাকে, এবং সারা দিন ও সারা রাত তারা কঠোর পরিশ্রম করে। এই প্রকার অহঙ্কারী জীব নিরন্তর এক যোনি থেকে আর এক যোনিতে দেহান্তরিত হয়, এবং কোন জীবনেই সে শান্তিলাভ করতে পারে না। জ্ঞানীরা সেই সত্য সম্বন্ধে অবগত এবং তাই তাঁরা কর্মত্যাগ করে কর্মসন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

কিন্তু তা হলেও সেটি বাস্তবিক সন্তোষের স্তর নয়। আত্ম-উপলব্ধির পরে, জ্ঞানীর জড় জ্ঞান তাঁকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে যায়। তখন তিনি নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে তৃপ্ত হন। পৃথু মহারাজ তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যে সমস্ত মুক্ত পুরুষেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরা জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। মুক্তি যদি চরম লক্ষ্য হত, তা হলে মুক্ত পুরুষদের ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার কোন প্রশ্নই উঠত না। অর্থাৎ, আত্ম-উপলব্ধিজনিত যে আনন্দকে আত্মানন্দ বলা হয়, তা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার প্রভাবে লব্ধ আনন্দের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। পৃথু মহারাজ তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তিনি কেবল নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করবেন এবং তার ফলে তাঁর মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ হবে। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ৩০

মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং
বরং বৃণীষ্বেতি ভজন্তমাত্থ যৎ ।
বাচা নু তন্ত্যা যদি তে জনোঽসিতঃ
কথং পুনঃ কর্ম করোতি মোহিতঃ ॥ ৩০ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **গিরম্**—বাণী; **তে**—আপনার; **জগতাম্**—জড় জগতের প্রতি; **বিমোহিনীম্**—মোহকারিণী; **বরম্**—বর; **বৃণীম্ব**—প্রার্থনা কর; **ইতি**—এইভাবে; **ভজন্তম্**—আপনার ভক্তকে; **আত্থ**—আপনি বলেছেন; **যৎ**—যেহেতু; **বাচা**—বেদের বর্ণনা অনুসারে; **নু**—নিশ্চিতভাবে; **তন্ত্যা**—রজ্জুর দ্বারা; **যদি**—যদি; **তে**—আপনার; **জনঃ**—জনসাধারণ; **অসিতঃ**—বদ্ধ নয়; **কথম্**—কিভাবে; **পুনঃ**—পুনঃ পুনঃ; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **করোতি**—অনুষ্ঠান কর; **মোহিতঃ**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার অনন্য ভক্তের কাছে আপনি যা বলেছেন তা অত্যন্ত মোহকারিণী। বেদে আপনি যে প্রলোভন প্রদান করেছেন তা অবশ্যই আপনার শুদ্ধ ভক্তদের উপযুক্ত নয়। সাধারণ মানুষেরাই বেদের মধুর বাণীতে মোহিত হয়ে, তাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ সকাম কর্মে রত হয়।

তাৎপর্য

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একজন মহান আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে, যারা বৈদিক সকাম কর্মের প্রতি অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের অবশ্যই সর্বনাশ হয়েছে। বেদের তিনটি কাণ্ড রয়েছে, যথা—কর্মকাণ্ড (সকাম কর্ম), জ্ঞানকাণ্ড (দার্শনিক গবেষণা) ও উপাসনা কাণ্ড (জড় জাগতিক লাভের জন্য দেব দেবীদের পূজা)। যারা কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠানে রত, তাদের এই অর্থে সর্বনাশ হয়েছে যে, যারা জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের সকলেরই সর্বনাশ হয়েছে, তা সেই দেহ কোন দেবতার হোক, কোন রাজার হোক অথবা কোন পশুর হোক কিংবা যে দেহই হোক না কেন। সকলের পক্ষেই জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখ সমভাবে ক্লেশকর। নিজের চিন্ময় স্থিতি উপলব্ধি করার জন্য যে জ্ঞানের চর্চা, তাও সময়েরই অপচয় মাত্র। জীব যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। পৃথু মহারাজ সেই জন্য বলেছেন যে, জড়-জাগতিক বরের প্রলোভন হচ্ছে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ রাখার অন্য একটি ফাঁদ। তাই তিনি স্পষ্টভাবে ভগবানকে বলেছেন যে, জড় সুবিধা ভোগের জন্য ভগবান যে তাঁকে বর দিতে চাইছেন, তা অবশ্যই মোহকারিণী। শুদ্ধ ভক্ত কখনই ভুক্তি অথবা মুক্তির প্রতি আগ্রহী নন।

যে-সমস্ত কনিষ্ঠ ভক্তরা জানে না যে, জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা তাদের প্রকৃত সুখ প্রদান করবে না, ভগবান কখনও কখনও তাদের বর দান করেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ভগবান তাই বলেছেন, কোন ঐকান্তিক ভক্ত যদি খুব একটা বুদ্ধিমান না হওয়ার ফলে, ভগবানের কাছে জড় জাগতিক সুযোগ সুবিধা প্রার্থনা করেন, তা হলে ভগবান সর্বজ্ঞ হওয়ার ফলে, তাঁকে সেই সমস্ত জাগতিক সুখ সুবিধা প্রদান করবেন না, পক্ষান্তরে তাঁর সমস্ত জড় জাগতিক সুযোগ সুবিধাগুলি তিনি তাঁর থেকে নিয়ে নেন, যাতে চরমে সেই ভক্ত সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হতে পারেন অর্থাৎ, ভক্তের পক্ষে জড় জাগতিক সুযোগ সুবিধা বা লাভ কখনই মঙ্গলজনক নয় মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিনিময়ে, বেদের যে সমস্ত নির্দেশগুলি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে, তা অত্যন্ত মোহকারিণী তাই *ভগবদ্‌গীতায়* (২/৪২) ভগবান বলেছেন *যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ*। অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা *(অবিপশ্চিতঃ)* বেদের সুন্দর সুন্দর কথায় আকৃষ্ট হয়ে জড় জাগতিক লাভের জন্য সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তার ফলে তারা বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-জন্মান্তরে কঠোর দুঃখকষ্ট ভোগ করে

শ্লোক ৩১

ত্বন্মায়য়াদ্ধা জন ঈশ খণ্ডিতো
যদন্যদাশাস্ত ঋতাত্মনোঽবুধঃ।
যথা চরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং
তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্ ॥ ৩১ ॥

ত্বৎ—আপনার, **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **অদ্ধা**—নিশ্চিতভাবে; **জনঃ**—জনসাধারণ; **ঈশ**—হে ভগবান, **খণ্ডিতঃ**—বিভক্ত; **যৎ**—যেহেতু; **অন্যৎ**—অন্য; **আশাস্তে**—কামনা করে; **ঋত**—প্রকৃত; **আত্মনঃ**—আত্মা থেকে; **অবুধঃ**—অজ্ঞ; **যথা**—যেমন; **চরেৎ** প্রবৃত্ত হয়, **বাল-হিতম্**—নিজের সন্তানের কল্যাণ, **পিতা** পিতা, **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে, **তথা**—তেমনই, **ত্বম্**—আপনি, **এব**—নিশ্চিতভাবে, **অর্হসি নঃ সমীহিতুম্**—দয়া করে আমার কল্যাণ সাধন করুন

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার মায়ার প্রভাবে এই জড়-জগতের সমস্ত জীবেরা তাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছে, এবং অজ্ঞানতা-বশত তারা সর্বদাই সমাজ, বন্ধুত্ব ও প্রেমরূপে জড় সুখ কামনা করছে। তাই, দয়া করে আপনি আমাকে কোন রকম

জড়-জাগতিক লাভের জন্য বর প্রার্থনা করতে বলবেন না। পক্ষান্তরে, পিতা যেমন তাঁর পুত্রের প্রার্থনার প্রত্যাশা না করে তার কল্যাণের জন্য সব কিছু করেন, তেমনই আপনিও যা কিছু আমার কল্যাণকর বলে মনে করেন তাই করুন।

তাৎপর্য

পুত্রের কর্তব্য হচ্ছে পিতার কাছে কোন কিছু না চেয়ে তার পিতার উপর নির্ভর করা। সৎ পুত্রের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তার পক্ষে যা কল্যাণকর, তার পিতাই তা সব চাইতে ভালভাবে জানেন। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের কাছে কোন জড় জাগতিক লাভের জন্য প্রার্থনা করেন না। এমন কি তিনি কোন রকম পারমার্থিক লাভেরও প্রার্থনা করেন না। শুদ্ধ ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত এবং ভগবান সর্বতোভাবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬৬) বলা হয়েছে *অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি*। পিতা তাঁর পুত্রের আবশ্যকতাগুলি জানেন এবং তিনি তার জন্য সেগুলি সরবরাহ করেন। ভগবানও জীবের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে সেগুলি সরবরাহ করেন। তাই *ঈশোপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই জড় জগতের সব কিছুই পূর্ণ *(পূর্ণম্ ইদম্)*। তবে অসুবিধাটি হচ্ছে এই যে, জীব তার স্বরূপ-বিস্মৃত হওয়ার ফলে, অনাবশ্যক সমস্ত বস্তুর চাহিদা সৃষ্টি করছে এবং তার ফলে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে ফলস্বরূপ, জন্ম-জন্মান্তরেও তার জড় জাগতিক কার্যকলাপ শেষ হয় না।

আমাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী রয়েছে, এবং তারা সকলেই জন্মান্তর ও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তাঁকে আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেওয়া, কারণ আমাদের পক্ষে যে কি কল্যাণকর তা তিনি জানেন।

পৃথু মহারাজ তাই ভগবানকে বলেছেন যে, তাঁর পক্ষে যে কি মঙ্গলজনক, তা পরম পিতারূপে তিনিই যেন বিচার করেন সেটিই হচ্ছে জীবের আদর্শ স্থিতি তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে উপদেশ দিয়েছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে সর্ব-শক্তিমান ভগবান। আমি ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে চাই না, আমি সুন্দরী রমণীর সঙ্গসুখও লাভ করতে চাই না, এবং আমি বহু অনুগামীও আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি কেবল চাই জন্ম-জন্মান্তরে যেন আপনার সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।"

সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবদ্ভক্তির বিনিময়ে শুদ্ধ ভক্তের কোন রকম জড় জাগতিক লাভের প্রত্যাশা করা উচিত নয়, এবং সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জ্ঞানের দ্বারাও মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। তাঁর কর্তব্য নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ৩২

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যাদিরাজেন নুতঃ স বিশ্বদৃক্

তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে।

দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া

মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্ত্যজাম্ ॥ ৩২ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়, উবাচ—বললেন; ইতি—এইভাবে, আদি-রাজেন—আদিরাজা (পৃথু) দ্বারা, নুতঃ—পূজিত হয়ে, সঃ—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); বিশ্ব-দৃক্—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের দ্রষ্টা; তম্—তাঁকে; আহ—বলেছিলেন, রাজন্—হে রাজন্; ময়ি—আমাকে; ভক্তিঃ—ভক্তি; অস্তু—হোক; তে—তোমার; দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যের দ্বারা, ঈদৃশী—এই প্রকার; ধীঃ—বুদ্ধিমত্তা, ময়ি—আমাকে, তে—তোমার দ্বারা; কৃতা—অনুষ্ঠিত হয়ে, যয়া—যার দ্বারা, মায়াম্—মায়া, মদীয়াম্—আমার, তরতি—উত্তীর্ণ হয়; স্ম—নিশ্চিতভাবে; দুস্ত্যজাম্—ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, পৃথু মহারাজের প্রার্থনা শুনে, ব্রহ্মাণ্ডের দ্রষ্টা ভগবান রাজাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—হে রাজন্! আমার ভক্তিবৃত্তিতে তুমি সর্বদাই যুক্ত থেকো। তুমি যা বুদ্ধিমত্তাপূর্বক ব্যক্ত করেছ, কেবল এই প্রকার সৎ উদ্দেশ্যের ফলেই দুর্লঙ্ঘ্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতাতেও ভগবান বলেছেন যে, মায়া দুর্লঙ্ঘ্য। সকাম কর্মের দ্বারা, মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা অথবা যোগের দ্বারা কেউই এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে না। মায়াকে অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। সেই কথা ভগবান নিজেই বলেছেন— *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৪)। কেউ যদি ভবসমুদ্র পার হতে চায়, তা হলে ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নেই। তাই ভগবদ্ভক্তের স্বর্গে অথবা নরকে কোথাও কোন রকম জড় জাগতিক স্থিতির অপেক্ষা করা উচিত নয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকবেন, কারণ সেটি হচ্ছে তাঁর প্রকৃত বৃত্তি। সেই অবস্থায় স্থির হয়ে জীব জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম অতিক্রম করতে পারে।

শ্লোক ৩৩

তত্ত্বং কুরু ময়াদিষ্টমপ্রমত্তঃ প্রজাপতে ।
মদাদেশকরো লোকঃ সর্বত্রাপ্নোতি শোভনম্ ॥ ৩৩ ॥

তৎ—অতএব, **ত্বম্**—তুমি; **কুরু**—কর, **ময়া**—আমার দ্বারা, **আদিষ্টম্**—আদেশ, **অপ্রমত্তঃ**—বিভ্রষ্ট না হয়ে; **প্রজা পতে**—হে প্রজাদের প্রভু; **মৎ**—আমার; **আদেশ করঃ**—আজ্ঞা-পালনকারী; **লোকঃ**—কোন ব্যক্তি, **সর্বত্র**—সর্বত্র; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **শোভনম্**—সমস্ত সৌভাগ্য।

অনুবাদ

হে রাজন্! হে প্রজাপালক! এখন থেকে অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে তুমি আমার আদেশ পালন কর এবং কখনও কোন কিছুর দ্বারা বিভ্রষ্ট হয়ো না। যে শ্রদ্ধাপূর্বক এইভাবে আমার আজ্ঞা পালন করে, তার সর্বত্র মঙ্গল হয়।

তাৎপর্য

ধর্মজীবনের মূল তত্ত্ব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করা, এবং যিনি তা করেন তিনি পূর্ণরূপে ধার্মিক। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৫) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ*—"সর্বদা কেবল আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও।" তার পর (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) তিনি বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও।" সেটিই হচ্ছে ধর্মের মূল তত্ত্ব। যিনি ভগবানের এই

আদেশ পালন করেন, তিনিই বাস্তবিক ধার্মিক অন্য সকলকে ভণ্ড বলা হয়েছে, কারণ ধর্মের নামে সারা পৃথিবী জুড়ে নানা রকম কার্যকলাপ চলছে, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নয় কিন্তু যিনি ভগবানের নির্দেশ পালন করেন, তাঁর সর্বত্র মঙ্গল হয়

শ্লোক ৩৪

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি বৈণ্যস্য রাজর্ষেঃ প্রতিনন্দ্যার্থবদ্বচঃ।
পূজিতোঽনুগৃহীত্বৈনং গন্তুং চক্রেঽচ্যুতো মতিম্ ॥ ৩৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, **ইতি**—এইভাবে, **বৈণ্যস্য**—রাজা বেণের পুত্র (পৃথু মহারাজ) **রাজর্ষেঃ** রাজর্ষির, **প্রতিনন্দ্য**—সমাদর করে, **অর্থ-বৎ বচঃ**—সারগর্ভ প্রার্থনা, **পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে, **অনুগৃহীত্বা**—প্রভূতভাবে অনুগ্রহ করে, **এনম্**—মহারাজ পৃথুর **গন্তুম্**—সেখান থেকে প্রস্থান করতে, **চক্রে**—স্থির করেছিলেন, **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত ভগবান, **মতিম্**—তাঁর মন

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত পৃথু মহারাজের সারগর্ভ প্রার্থনার প্রচুর সমাদর করলেন। এইভাবে তাঁর দ্বারা সুন্দরভাবে পূজিত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, এবং সেখান থেকে তিনি প্রস্থান করতে ইচ্ছা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রতিনন্দ্যার্থবদ্ বচঃ* শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এর অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান রাজার অর্থপূর্ণ প্রার্থনার সমাদর করেছিলেন। ভক্ত জড় জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন না, তিনি কেবল তাঁর কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা করেন; তিনি প্রার্থনা করেন, জন্ম জন্মান্তরে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় তিনি যেন যুক্ত হতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, *মম জন্মনি জন্মনি*, অর্থাৎ 'জন্ম-জন্মান্তরে', কারণ ভক্ত জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়ারও অভিলাষী নন। ভগবান ও তাঁর ভক্ত এই জড় জগতে বারবার জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু এই প্রকার জন্ম অপ্রাকৃত *ভগবদ্গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে তিনি ও অর্জুন উভয়েই পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করেছেন, অর্জুন তা ভুলে

গেছেন কিন্তু তাঁর সব কিছু মনে আছে। ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভগবান ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত বহুবার জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু যেহেতু এই প্রকার জন্ম অপ্রাকৃত, তাই ভৌতিক জন্মের কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে তাঁরা মুক্ত, এবং তাই তাদের বলা হয় দিব্য।

ভগবান ও তাঁর ভক্তের জন্ম যে দিব্য তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য। ভগবানের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রকৃত ধর্ম ভগবদ্ভক্তির প্রতিষ্ঠা করা, এবং ভক্তের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই ধর্মের পন্থা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রচার করা। পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবদ্ভক্তি প্রচার করার জন্য ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, এবং তাঁর সেই স্থিতিতে স্থির থাকতে ভগবান তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ যখন কোন রকম জড় জাগতিক লাভের বর গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, তখন ভগবান তাঁর সেই প্রত্যাখ্যানের প্রশংসা করেছিলেন। এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *অচ্যুত*। ভগবান যদিও এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তবুও তিনি বদ্ধ জীবদের মতো পতনশীল নন। ভগবান যখন প্রকট হন, তখন তিনি প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁর দিব্য স্থিতিতে বিরাজ করেন, এবং তাই *ভগবদ্গীতায়* তাঁর আবির্ভাবের তত্ত্ব বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন *আত্ম-মায়য়া* 'তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত'। *অচ্যুত* হওয়ার ফলে, ভগবান এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য নন। তিনি আসেন ধর্ম সংস্থাপন করতে এবং মানব-সমাজকে আসুরিক প্রভাব থেকে মুক্ত করতে।

শ্লোক ৩৫-৩৬

দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বসিদ্ধচারণপন্নগাঃ ।
কিন্নরাপ্সরসো মর্ত্যাঃ খগা ভূতান্যনেকশঃ ॥ ৩৫ ॥
যজ্ঞেশ্বরধিয়া রাজ্ঞা বাগ্বিত্তাঞ্জলিভক্তিতঃ ।
সভাজিতা যযুঃ সর্বে বৈকুণ্ঠানুগতাস্ততঃ ॥ ৩৬ ॥

দেব—দেবতাগণ, **ঋষি**—মহর্ষিগণ, **পিতৃ**—পিতৃগণ, **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **সিদ্ধ**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ; **চারণ**—চারণলোকের অধিবাসীগণ; **পন্নগাঃ**—নাগলোকের অধিবাসীগণ; **কিন্নর**—কিন্নরলোকের অধিবাসীগণ, **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **মর্ত্যাঃ**—মর্তলোক-বাসীগণ; **খগাঃ**—পক্ষী, **ভূতানি**—অন্য সমস্ত জীব; **অনেকশঃ**—বহু; **যজ্ঞ-ঈশ্বর-ধিয়া**—নিজেকে ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে মনে করার যথার্থ বুদ্ধিসহকারে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **বাক্**—মধুর বাক্যে, **বিত্ত**—সম্পদ; **অঞ্জলি**—বদ্ধাঞ্জলি হয়ে,

ভক্তিতঃ—ভক্তিসহকারে; **সভাজিতাঃ**—যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; **যযুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **সর্বে**—সকলে; **বৈকুণ্ঠ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **অনুগতাঃ**—অনুগামীগণ; **ততঃ**—সেই স্থান থেকে।

অনুবাদ

দেবতা, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা, মর্ত্যলোকবাসী, পক্ষী এবং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত জীবদের, এবং পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্ষদদের অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে পৃথু মহারাজ সুমধুর বাণীর দ্বারা এবং যথাসম্ভব সম্পদ প্রদান করে পূজা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের পর, তাঁরা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজে মনে করা হয় যে, পৃথিবীতেই কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসমন্বিত বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব রয়েছে, অন্যান্য লোকে জীবন নেই। বৈদিক শাস্ত্রে কিন্তু এই মূর্খ মতবাদ স্বীকার করা হয় না। বেদের অনুগামীরা পূর্ণরূপে জানেন যে, অন্যান্য লোকে দেবতা, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব, পন্নগ, কিন্নর, চারণ, সিদ্ধ, অপ্সরা আদি বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। বেদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, কেবল এই জড় জগতের গ্রহগুলিতেই নয়, চিৎ-জগতেও বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। যদিও এই সমস্ত জীবেরা গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মতো চিন্ময়, তবুও মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটি জড় উপাদান দ্বারা রচিত বিভিন্ন প্রকার দেহে তারা বিরাজ করছে। চিৎ-জগতে কিন্তু এই প্রকার দেহ ও দেহীর পার্থক্য নেই। জড় জগতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীরে আকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা পূর্ণরূপে জানতে পারি যে, জড় ও চিন্ময় উভয় জগতেই প্রতিটি লোকে বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন জীব রয়েছে। পৃথিবী হচ্ছে ভূর্লোকের একটি গ্রহ। ভূর্লোকের ঊর্ধ্বে ছয়টি লোক রয়েছে এবং নিম্নে সাতটি লোক রয়েছে। তাই ব্রহ্মাণ্ডকে বলা হয় চতুর্দশ ভুবন, অর্থাৎ তাতে চৌদ্দটি লোক রয়েছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-সমন্বিত জড় আকাশের ঊর্ধ্বে আর একটি আকাশ রয়েছে, যাকে বলা হয় *পরব্যোম* বা চিদাকাশ, যেখানে চিন্ময় লোকসমূহ রয়েছে। সেই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানের বিবিধ প্রকার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। তাদের সেই সেবা বিভিন্ন প্রকার রস বা সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই রসগুলি হচ্ছে দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্য-রস, মাধুর্যরস ও সর্বোপরি পরকীয় রস। শ্রীকৃষ্ণ

যেখানে বিরাজ করেন, সেই কৃষ্ণলোকেই কেবল এই পরকীয়-রস বিদ্যমান। সেই গ্রহ লোকটিকে গোলোক বৃন্দাবন বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সেখানে নিত্য বিরাজমান, তবুও তিনি অনন্তকোটিরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। তাঁর একটি রূপে তিনি এই জড় জগতে বৃন্দাবন-ধাম নামক একটি বিশেষ স্থানে আবির্ভূত হন, এবং সেখানে তিনি বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আকর্ষণ করতে তাঁর গোলোক বৃন্দাবন ধামের লীলা প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ৩৭

ভগবানপি রাজর্ষেঃ সোপাধ্যায়স্য চাচ্যুতঃ ।
হরন্নিব মনোঽমুষ্য স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **রাজ-ঋষেঃ**—রাজর্ষির; **স-উপাধ্যায়স্য**—পুরোহিতগণ সহ; **চ**—ও; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত ভগবান; **হরন্**—মুগ্ধ করে; **ইব**—যেন; **মনঃ**—মন; **অমুষ্য**—তাঁর; **স্ব-ধাম**—নিজের ধামে; **প্রত্যপদ্যত**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

পুরোহিতসহ রাজার মন হরণ করে, অচ্যুত ভগবান চিদাকাশে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যেহেতু চিন্ময়, তাই তিনি তাঁর দেহের পরিবর্তন না করে, এই জড় জগতে অবতরণ করতে পারেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় *অচ্যুত*। জীব যখন এই জড় জগতে পতিত হয়, তখন তাকে একটি জড় শরীর ধারণ করতে হয়, এবং তাই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীবকে *অচ্যুত* বলা যায় না। ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত হয়ে অধঃপতিত হওয়ার ফলে, জড় জগতে দুঃখকষ্ট ভোগ করার জন্য অথবা জড় জগতের দুঃখময় পরিবেশে সুখ ভোগের চেষ্টা করার জন্য জীব একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। তাই অধঃপতিত জীবদের বলা হয় *চ্যুত*, কিন্তু ভগবানকে বলা হয় *অচ্যুত*। ভগবান সকলের কাছেই আকর্ষণীয়। তিনি কেবল রাজা ও বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে আসক্ত পুরোহিতদের কাছেই নয়, সকলের কাছে আকর্ষণীয়। ভগবান যেহেতু সর্বাকর্ষক, তাই তাঁকে বলা হয় কৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের কলা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ভগবান পৃথু মহারাজের যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু জড় সৃষ্টির মূল কারণ কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। কারণোদকশায়ী বিষ্ণু প্রথমে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির গুণের নিয়ন্ত্রণকারী গুণাবতারদের অন্যতম।

শ্লোক ৩৮

অদৃষ্টায় নমস্কৃত্য নৃপঃ সন্দর্শিতাত্মনে ।
অব্যক্তায় চ দেবানাং দেবায় স্বপুরং যযৌ ॥ ৩৮ ॥

অদৃষ্টায়—জড় দৃষ্টির অতীত যিনি তাঁকে; **নমঃ-কৃত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **নৃপঃ**—রাজা; **সন্দর্শিত**—প্রকাশিত; **আত্মনে**—পরমাত্মাকে; **অব্যক্তায়**—যিনি জড় জগতের প্রকাশের অতীত; **চ**—ও; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **দেবায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **স্ব-পুরম্**—তাঁর গৃহে; **যযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তখন সমস্ত দেবতাদের পরম দেবতা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবান যদিও জড় দৃষ্টির অগোচর, তবুও তিনি পৃথু মহারাজের দৃষ্টিপথে নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন। ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করার পর, পৃথু মহারাজ তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জড় দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু জড় ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় উন্মুখ হওয়ার ফলে শুদ্ধ হয়, তখন ভগবান তাঁর ভক্তের দৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশিত করেন। অব্যক্ত শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অপ্রকাশিত'। এই জড় জগৎ যদিও ভগবানের সৃষ্ট, তবুও জড় দৃষ্টিতে তিনি অপ্রকাশিত। মহারাজ পৃথু তাঁর শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে চিন্ময় দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। এখানে তাই ভগবানকে *সন্দর্শিতাত্মা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি সাধারণ দৃষ্টিতে অপ্রকাশিত হলেও, তাঁর ভক্তের দৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশ করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের উপদেশ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

মৌক্তিকৈঃ কুসুমস্রগ্‌ভির্দুকূলৈঃ স্বর্ণতোরণৈঃ ।
মহাসুরভিভির্ধূপৈর্মণ্ডিতং তত্র তত্র বৈ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **মৌক্তিকৈঃ**—মুক্তার দ্বারা; **কুসুম**—ফুলের; **স্রগ্‌ভিঃ**—মালার দ্বারা; **দুকূলৈঃ**—বস্ত্র; **স্বর্ণ**—স্বর্ণ; **তোরণৈঃ**—তোরণের দ্বারা; **মহা-সুরভিভিঃ**—অত্যন্ত সুগন্ধিত; **ধূপৈঃ**—ধূপের দ্বারা; **মণ্ডিতম্**—অলংকৃত; **তত্র তত্র**—স্থানে স্থানে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—পৃথু মহারাজ যখন তাঁর নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য মুক্তা, ফুলের মালা, সুন্দর বস্ত্র ও স্বর্ণ-তোরণের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শহরটিকে সাজানো হয়েছিল, এবং সারা নগরী সুগন্ধিত ধূপের দ্বারা সুবাসিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

সোনা, রূপা, মুক্তা, রত্ন, ফুল, বৃক্ষ, রেশমীবস্ত্র ইত্যাদি প্রকৃতিজাত উপহারের মাধ্যমে প্রকৃত ঐশ্বর্য সরবরাহ করা হয়। তাই বৈদিক সভ্যতায় ভগবানের দেওয়া এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপহারের দ্বারা ঐশ্বর্য প্রকাশ ও অলংকৃত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকার ঐশ্বর্য অচিরেই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে এবং সমগ্র পরিবেশ চিন্ময় হয়ে ওঠে। পৃথু মহারাজের রাজধানী এই প্রকার অমূল্য ঐশ্বর্যময় অলংকারের দ্বারা সজ্জিত হয়েছিল।

শ্লোক ২

চন্দনাগুরুতোয়ার্দ্ররথ্যাচত্বরমার্গবৎ ।
পুষ্পাক্ষতফলৈস্তোক্মৈর্লাজৈরর্চির্ভিরর্চিতম্ ॥ ২ ॥

চন্দন—চন্দন; **অগুরু**—অগুরু নামক এক প্রকার সুগন্ধি গুল্ম; **তোয়**—জলের; **আর্দ্র**—সিক্ত; **রথ্যা**—রথ চলার পথ; **চত্বর**—প্রাঙ্গণ; **মার্গবৎ**—সংকীর্ণ পথ; **পুষ্প**—ফুল; **অক্ষত**—অখণ্ডিত; **ফলৈঃ**—ফলের দ্বারা; **তোক্মৈঃ**—খনিজ দ্রব্যের দ্বারা; **লাজৈঃ**—খই; **অর্চির্ভিঃ**—প্রদীপের দ্বারা; **অর্চিতম্**—সাজানো হয়েছিল।

অনুবাদ

নগরীর পথ ও প্রাঙ্গণসমূহ চন্দন ও অগুরু মিশ্রিত জলে সিক্ত হয়েছিল, এবং ফুল, ফল, খই, বিভিন্ন প্রকার ধাতু, প্রদীপ ইত্যাদি মাঙ্গলিক সামগ্রীর দ্বারা সর্বত্র সাজান হয়েছিল।

শ্লোক ৩

সবৃন্দৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈঃ পরিষ্কৃতম্ ।
তরুপল্লবমালাভিঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥

স বৃন্দৈঃ—ফল ও ফুলসহ; **কদলী স্তম্ভৈঃ**—কলাগাছের স্তম্ভের দ্বারা; **পূগ-পোতৈঃ**—সুপারি বৃক্ষের কচি ডালের দ্বারা; **পরিষ্কৃতম্**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কৃত; **তরু**—নবীন বৃক্ষ; **পল্লব**—আম্রপল্লব; **মালাভিঃ**—মালার দ্বারা; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **সমলঙ্কৃতম্**—সুন্দরভাবে সজ্জিত।

অনুবাদ

পথের সন্ধিস্থলগুলি ফল, ফুল, কদলীস্তম্ভ, সুপারি গাছের ডাল, বৃক্ষ ও তরুপল্লবের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল।

শ্লোক ৪

প্রজাস্তং দীপবলিভিঃ সম্ভৃতাশেষমঙ্গলৈঃ ।
অভীয়ুর্মৃষ্টকন্যাশ্চ মৃষ্টকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥ ৪ ॥

প্রজাঃ—প্রজারা, **তম্**—তাঁকে, **দীপ-বলিভিঃ**—প্রদীপের দ্বারা, **সম্ভৃত**—সজ্জিত; **অশেষ**—অসংখ্য, **মঙ্গলৈঃ**—মাঙ্গলিক সামগ্রী, **অভীয়ুঃ**—তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য এসেছিল, **মৃষ্ট**—সুন্দর অঙ্গকান্তি-সমন্বিতা, **কন্যাঃ চ**—এবং অবিবাহিত বালিকারা, **মৃষ্ট**—পরস্পর অঙ্গ সংলগ্ন **কুণ্ডল**—কানের দুল **মণ্ডিতাঃ**—অলংকৃত

অনুবাদ

যখন রাজা নগরে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত নাগরিকেরা দীপ, পুষ্প, দধি ইত্যাদি মাঙ্গলিক সামগ্রী নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। নানা প্রকার রত্নালংকারে বিভূষিতা বহু সুন্দরী কুমারীও রাজাকে স্বাগত জানিয়েছিল। তাদের পরস্পরের অঙ্গ সংলগ্ন হওয়ার ফলে, তাদের কানের দুল যেন পরস্পরকে স্পর্শ করছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় বর, রাজা, গুরু আদি বিশিষ্ট অতিথিকে স্বাগত জানাবার জন্য সুপারি, কলা, আঙ্গুর, ধান, দই, সিঁদুর ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহ সর্বত্র ছড়ানো হয়। তেমনই অবিবাহিত কন্যারা, যারা বাইরে ও অন্তরে শুদ্ধ, তারা যখন সুন্দর বস্ত্র ও অলংকারে সজ্জিত হয়ে স্বাগত জানায়, তখন তাও শুভ বলে মনে করা হয়। কুমারী অর্থাৎ পুরুষের স্পর্শ প্রাপ্ত হয়নি যে সমস্ত অবিবাহিত কন্যা, তারা সমাজের পবিত্র সদস্য। এখনও গোঁড়া হিন্দু সমাজের অবিবাহিত কন্যাদের অবাধে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না অথবা ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হয় না। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাদের পিতামাতা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাদের রক্ষা করেন, বিবাহের পর তাদের পতিরা তাদের রক্ষা করেন, এবং বৃদ্ধ অবস্থায় তাদের পুত্ররা তাদের রক্ষা করে। স্ত্রীলোকদের যখন এইভাবে রক্ষা করা হয়, তখন তারা সর্বদা পুরুষদের শক্তির মঙ্গলময় উৎস হয়।

শ্লোক ৫

শঙ্খদুন্দুভিঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ চর্ত্বিজাম্ ।
বিবেশ ভবনং বীরঃ স্তূয়মানো গতস্ময়ঃ ॥ ৫ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ, **দুন্দুভি**—দুন্দুভি; **ঘোষেণ**—শব্দের দ্বারা, **ব্রহ্ম**—বৈদিক; **ঘোষেণ**—মন্ত্র উচ্চারণ; **চ**—ও **ঋত্বিজাম্**—পুরোহিতগণ, **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন, **ভবনম্**—প্রাসাদ; **বীরঃ**—রাজা; **স্তূয়মানঃ**—পূজিত হয়ে; **গত-স্ময়ঃ**—নিরহঙ্কার

অনুবাদ

রাজা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনিত হল, পুরোহিতেরা বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন এবং স্তবকারীরা স্তব করলেন। কিন্তু তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য এই সমস্ত অনুষ্ঠান সত্ত্বেও, রাজা ছিলেন সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার।

তাৎপর্য

রাজাকে যে স্বাগত জানানো হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত ঐশ্বর্য-সমন্বিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গর্বিত হননি। তাই বলা হয় যে, শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যবান মহাপুরুষ কখনও গর্বিত হন না, এবং সেই সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, ফলবান বৃক্ষ ঋজু না হয়ে, ফলের ভারে ঝুঁকে পড়ে, তেমনই গুণবান ব্যক্তি সর্বদাই বিনয়াবনত থাকেন। সেটিই হচ্ছে মহাপুরুষদের লক্ষণ।

শ্লোক ৬

পূজিতঃ পূজয়ামাস তত্র তত্র মহাযশাঃ ।
পৌরাঞ্জানপদাংস্তাংস্তান্ প্রীতঃ প্রিয়বরপ্রদঃ ॥ ৬ ॥

পূজিতঃ—পূজিত হয়ে; **পূজয়াম্ আস**—পূজা নিবেদন করেছিল, **তত্র তত্র**—স্থানে স্থানে; **মহা-যশাঃ**—মহাযশস্বী; **পৌরান্**—নগরের সম্মানিত মানুষেরা; **জান-পদান্**—সাধারণ প্রজারা; **তান্ তান্**—সেভাবে; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রিয়-বর-প্রদঃ**—তাঁদের বর প্রদানে প্রস্তুত।

অনুবাদ

নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও সাধারণ প্রজারা সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে রাজাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এবং রাজাও তাঁদের অভীষ্ট বর প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

দায়িত্বশীল রাজার কাছে প্রজারা সব সময়ই সমীপবর্তী হতে পারে। সাধারণত মহান ও সাধারণ সমস্ত নাগরিকদেরই রাজাকে দর্শন করার ও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার অভিলাষ থাকে। রাজা সেই কথা জানতেন, এবং তাই যখনই নাগরিকদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের বাসনা পূর্ণ করতেন অথবা তাদের

অভিযোগের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এই প্রকার ব্যবহারে দায়িত্বশীল রাজতন্ত্র তথাকথিত প্রজাতান্ত্রিক সরকার থেকে অনেক ভাল, কারণ প্রজাতন্ত্রে প্রজারা রাষ্ট্র-প্রধানদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতে পারে না এবং তাদের অভিযোগ দূর করার জন্য কেউই দায়ী থাকে না। দায়িত্বশীল রাজতন্ত্রে সরকারের বিরুদ্ধে প্রজাদের কোন অভিযোগ থাকত না, এবং থাকলেও তারা সরাসরিভাবে রাজার কাছে গিয়ে অভিযোগ করতে পারত, এবং রাজাও তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

শ্লোক ৭

স এবমাদীন্যনবদ্যচেষ্টিতঃ
কর্মাণি ভূয়াংসি মহান্মহত্তমঃ ।
কুর্বন্ শশাসাবনিমণ্ডলং যশঃ
স্ফীতং নিধায়ারুরুহে পরং পদম্ ॥ ৭ ॥

সঃ—পৃথু মহারাজ; **এবম্**—এইভাবে; **আদীনি**—শুরু থেকেই; **অনবদ্য**—উদার; **চেষ্টিতঃ**—বিভিন্ন প্রকার কার্য করে; **কর্মাণি**—কর্ম; **ভূয়াংসি**—বারবার; **মহান্**—মহান; **মহৎ-তমঃ**—সব চাইতে মহান; **কুর্বন্**—অনুষ্ঠান করে; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **অবনি-মণ্ডলম্**—পৃথিবী; **যশঃ**—খ্যাতি, **স্ফীতম্**—বিস্তৃত; **নিধায়**—প্রাপ্ত হয়ে; **আরুরুহে**—উন্নীত হয়েছিলেন, **পরম্ পদম্**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ ছিলেন মহত্তম মহাপুরুষ এবং তাই তিনি ছিলেন সকলেরই পূজ্য। তিনি পৃথিবী শাসন করার সময় বহু মহিমান্বিত কীর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সর্বদাই উদার। এই প্রকার মহান সাফল্য অর্জন করার ফলে, তাঁর খ্যাতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল, এবং চরমে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দায়িত্বশীল রাজা বা কার্যাধ্যক্ষের প্রজাশাসনে বহু দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য থাকে। রাজা বা সরকারের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। রাজার পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে, প্রজারা তাদের বিশেষ বিশেষ [illegible] অনুসারে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করছে কিনা তা দেখা।

সমাজের বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনুসারে, যাতে সকলে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, তা দেখাও রাজার কর্তব্য। আর তা ছাড়া, পৃথু মহারাজের দৃষ্টান্ত অনুসারে, রাজার কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর বিকাশ সাধন করা।

বিভিন্ন স্তরের মহান ব্যক্তি রয়েছেন—মহান, মহত্তর ও মহত্তম—কিন্তু পৃথু মহারাজ তাঁদের সকলকে অতিক্রম করেছিলেন তাই তাঁকে এখানে *মহত্তমঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথু মহারাজ ছিলেন ক্ষত্রিয়, এবং তিনি নিখুঁতভাবে তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। তেমনই ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রেরাও তাদের কর্তব্য কর্ম সুচারুরূপে নির্বাহ করতে পারেন এবং তার ফলে জীবনের অন্তিম সময়ে চিৎ-জগতে উন্নীত হবেন, যাকে বলা হয় *পরং পদম্*। *পরং পদম্* বা বৈকুণ্ঠলোক কেবল ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম পদকেও *পরং পদম্* বলা হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত না হলে, সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, সেই *পরং পদম্* থেকে এই জড় জগতে আবার অধঃপতিত হতে হয়। তাই বলা হয়েছে, *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ*—নির্বিশেষবাদীরা *পরং পদ* লাভ করার জন্য কঠোর প্রয়াস করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্করহিত হওয়ার ফলে, তাদের পুনরায় এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয়। কেউ যদি অন্তরীক্ষে উড়তে পারে, তা হলে সে অনেক উঁচুতে উড়ে যেতে পারে, কিন্তু সে যদি কোন গ্রহে পৌঁছাতে না পারে, তা হলে তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। তেমনই সেই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিরূপ *পরং পদম্* প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যেহেতু তারা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারে না, তাই তাদের এই জড় জগতে কোন জড় গ্রহের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তারা যদি ব্রহ্মলোক বা সত্যলোকও প্রাপ্ত হয়, তবুও তা এই জড় জগতেই অবস্থিত।

শ্লোক ৮

সূত উবাচ

তদাদিরাজস্য যশো বিজৃম্ভিতং
গুণৈরশেষৈর্গুণবৎসভাজিতম্ ।
ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ সদস্পতে
কৌষারবিং প্রাহ গৃণন্তমর্চয়ন্ ॥ ৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **তৎ**—তা, **আদি-রাজস্য**—আদি রাজার; **যশঃ**—খ্যাতি; **বিজৃম্ভিতম্**—অত্যন্ত যোগ্য; **গুণৈঃ**—গুণাবলীর দ্বারা; **অশেষৈঃ**—অন্তহীন; **গুণ-বৎ**—উপযুক্ত; **সভাজিতম্**—প্রশংসিত হয়ে; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **মহা-ভাগবতঃ**—পরম ভক্ত, **সদঃ-পতে**—মহর্ষিদের নায়ক; **কৌষারবিম্**—মৈত্রেয়কে, **প্রাহ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন, **গৃণন্তম্**—কথা বলার সময়; **অর্চয়ন্**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে ঋষিদের নায়ক শৌনক! অত্যন্ত যোগ্য মহিমান্বিত ও বিশ্ববিশ্রুত আদিরাজা পৃথুর সম্বন্ধে মৈত্রেয় ঋষির কাছ থেকে শ্রবণ করার পর, মহাভাগবত বিদুর অত্যন্ত বিনীতভাবে মৈত্রেয় ঋষির অর্চনা করে তাঁকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করেছিলেন।

শ্লোক ৯

বিদুর উবাচ

সোঽভিষিক্তঃ পৃথুর্বিপ্রৈর্লব্ধাশেষসুরার্হণঃ ।
বিভ্রৎ স বৈষ্ণবং তেজো বাহ্বোর্যাভ্যাং দুদোহ গাম্ ॥ ৯ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **সঃ**—তিনি (মহারাজ পৃথু); **অভিষিক্তঃ**—যখন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **বিপ্রৈঃ**—মহর্ষি ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা, **লব্ধ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অশেষ**—অসংখ্য, **সুর-অর্হণঃ**—দেবতাদের উপহার; **বিভ্রৎ**—বিস্তার করে; **সঃ**—তিনি; **বৈষ্ণবম্**—ভগবান বিষ্ণু থেকে প্রাপ্ত; **তেজঃ**—শক্তি; **বাহ্বোঃ**—বাহুদ্বয়; **যাভ্যাম্**—যার দ্বারা; **দুদোহ**—দোহন করেছিলেন; **গাম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়! মহর্ষি ব্রাহ্মণেরা যে পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষেক করেছিলেন, সমস্ত দেবতারা যে তাঁকে অসংখ্য উপহার প্রদান করেছিলেন এবং তিনি যে বিষ্ণুতেজ প্রাপ্ত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে, আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ যেহেতু ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন একজন মহান বৈষ্ণব ভগবদ্ভক্ত। সেই জন্য সমস্ত দেবতারা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা বিস্তারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য নানা প্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন, এবং তাঁর রাজ্যাভিষেকে মহান ঋষি ও সাধুরাও যোগদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁদের দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে, পৃথু মহারাজ সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং জনসাধারণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পৃথিবীর সম্পদ দোহন করেছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখব যে, রাজ্যশাসনের ব্যাপারে প্রতিটি রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য পৃথু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। রাষ্ট্রপ্রধান রাজা হোন অথবা রাষ্ট্রপতি হোন, এবং তাঁদের রাজ্য রাজতান্ত্রিক অথবা গণতান্ত্রিক হোক, এই পন্থা এতই নিখুঁত যে, তা যদি অনুসরণ করা হয়, তা হলে সকলেই সুখী হবে এবং তার ফলে সকলের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করা অত্যন্ত সহজ হবে।

শ্লোক ১০

কো ন্বস্য কীর্তিং ন শৃণোত্যভিজ্ঞো
যদ্বিক্রমোচ্ছিষ্টমশেষভূপাঃ ।
লোকাঃ সপালা উপজীবন্তি কাম-
মদ্যাপি তন্মে বদ কর্ম শুদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

কঃ—কে; **নু**—কিন্তু; **অস্য**—মহারাজ পৃথু; **কীর্তিম্**—মহিমান্বিত কার্যকলাপ; **ন শৃণোতি**—শ্রবণ করে না; **অভিজ্ঞঃ**—বুদ্ধিমান, **যৎ**—তাঁর; **বিক্রম**—বীরত্ব; **উচ্ছিষ্টম্**—উচ্ছিষ্ট, **অশেষ**—অসংখ্য; **ভূপাঃ**—রাজাগণ; **লোকাঃ**—গ্রহলোক; **স-পালাঃ**—তাদের দেবতাগণ সহ; **উপজীবন্তি**—জীবন যাপন; **কামম্**—বাঞ্ছিত বস্তু; **অদ্য অপি**—আজও; **তৎ**—তা; **মে**—আমাকে; **বদ**—দয়া করে বলুন; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **শুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ এতই মহান ছিল এবং তাঁর শাসন-প্রণালী এতই উদার ছিল যে, আজও সমস্ত রাজা ও বিভিন্ন গ্রহলোকের দেবতারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ

করেন। এমন কে আছে যে তাঁর মহিমান্বিত কার্যকলাপ শ্রবণ করতে চাইবে না? আমি পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে আরও শুনতে চাই কারণ তাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র ও বিশুদ্ধ।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে মহাত্মা বিদুরের বারবার শ্রবণ করার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ রাজা ও রাষ্ট্র-প্রধানদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যাতে তাঁরা জনসাধারণের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে তাঁদের রাজ্যশাসন করার উদ্দেশ্যে বারবার পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ শ্রবণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সময়ে কেউই পৃথু মহারাজের বিষয়ে শ্রবণ করতে অথবা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আগ্রহী নয়; তাই পৃথিবীর কোন দেশই সুখী নয় অথবা পারমার্থিক জ্ঞানের বিষয়ে উন্নতশীল নয়, যদিও সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শ্লোক ১১

মৈত্রেয় উবাচ

গঙ্গাযমুনয়োর্নদ্যোরন্তরাক্ষেত্রমাবসন্ ।
আরব্ধানেব বুভুজে ভোগান্ পুণ্যজিহাসয়া ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **গঙ্গা**—গঙ্গানদী; **যমুনয়োঃ**—যমুনা নদীর; **নদ্যোঃ**—দুটি নদীর; **অন্তরা**—মধ্যে; **ক্ষেত্রম্**—স্থান; **আবসন্**—বাস করে; **আরব্ধান্**—প্রারব্ধ; **এব**—সদৃশ; **বুভুজে**—ভোগ করেছিলেন; **ভোগান্**—সৌভাগ্য; **পুণ্য**—পুণ্যকর্ম; **জিহাসয়া**—হ্রাস করার উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—হে বিদুর! পৃথু মহারাজ গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী ভূখণ্ডে বাস করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী, তাই মনে হয়েছিল, তিনি যেন তাঁর পূর্বকৃত পুণ্য ক্ষয় করার জন্য প্রারব্ধ সৌভাগ্য ভোগ করছেন।

তাৎপর্য

'পুণ্য' ও 'পাপ' কেবল সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু মহারাজ পৃথু ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার; তাই তিনি পুণ্য অথবা পাপ

কর্মের অধীন ছিলেন না। আমরা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি যে, কোন জীব যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তখন তাঁকে বলা হয় শক্ত্যাবেশ অবতার। পৃথু মহারাজ কেবল একজন শক্ত্যাবেশ অবতারই ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্তেরা কর্মফলের অধীন নন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তের পূর্বকৃত পাপ ও পুণ্যকর্মের ফল বিনষ্ট করে দেন। *আরব্ধান্ এব* শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে 'যেন পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথু মহারাজের ক্ষেত্রে পূর্বকৃত কর্মফলের কোন প্রশ্নই ওঠে না, তাই এখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনা অর্থে 'এব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*। অর্থাৎ, কখনও কখনও মানুষ ভগবানের অবতারকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অবতার অথবা তাঁর ভক্তরা এমনভাবে আচরণ করতে পারেন যে, মনে হয় যেন তাঁরা সাধারণ মানুষ, কিন্তু তা বলে কখনও তাঁদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। প্রামাণিক শাস্ত্রের উক্তি এবং আচার্যদের স্বীকৃতি ব্যতীত, সাধারণ মানুষদেরও কখনও ভগবানের অবতার বা ভক্ত বলে স্বীকার করা উচিত নয়। সনাতন গোস্বামী শাস্ত্র-প্রমাণের ভিত্তিতে চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবানের অবতার বলে চিনতে পেরেছিলেন, যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও নিজে তা প্রকাশ করেননি। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আচার্য অথবা গুরুদেবকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ১২

সর্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্ ।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥ ১২ ॥

সর্বত্র—সব জায়গায়; **অস্খলিত**—অপ্রতিহত; **আদেশঃ**—আজ্ঞা; **সপ্ত-দ্বীপ**—সপ্তদ্বীপ; **এক**—এক; **দণ্ড-ধৃক্**—দণ্ডধারী শাসনকর্তা; **অন্যত্র**—ব্যতীত; **ব্রাহ্মণ-কুলাৎ**—ব্রাহ্মণ ও মহাত্মা; **অন্যত্র**—ব্যতীত; **অচ্যুত-গোত্রতঃ**—ভগবানের বংশধর (বৈষ্ণব)।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথু ছিলেন সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর অপ্রতিহত আদেশ সাধু, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেউ লঙ্ঘন করতে পারত না।

তাৎপর্য

সপ্তদ্বীপ হচ্ছে (১) এশিয়া, (২) ইউরোপ, (৩) আফ্রিকা, (৪) উত্তর আমেরিকা, (৫) দক্ষিণ আমেরিকা, (৬) অস্ট্রেলিয়া ও (৭) ওশিয়েনিয়া, এই সাতটি মহাদেশ। আধুনিক যুগে অনেকে মনে করে যে, বৈদিক যুগে বা প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু সেই ধারণাটি সঠিক নয়। তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক যুগেরও হাজার হাজার বছর পূর্বে পৃথু মহারাজ পৃথিবীর উপর আধিপত্য করেছিলেন, এবং এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখনকার দিনে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে কেবল অবগতই ছিলেন না, সেই সমস্ত স্থান পৃথু মহারাজের মতো একজন রাজার দ্বারা শাসিত হত। যে দেশে পৃথু মহারাজ বাস করতেন, তা ছিল অবশ্যই ভারতবর্ষ, কারণ এই অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই স্থানটি ছিল গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ। ব্রহ্মাবর্ত নামক সেই স্থানটি হচ্ছে বর্তমান পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষের রাজারা এক সময় সমগ্র পৃথিবী শাসন করতেন এবং তাঁরা ছিলেন বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী।

অস্খলিত শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পৃথু মহারাজের আদেশ পৃথিবীর কেউ লঙ্ঘন করতে পারত না। কিন্তু সেই আদেশ সাধু অথবা ভগবান বিষ্ণুর বংশধর বৈষ্ণবদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ছিল না। ভগবান *অচ্যুত* নামে পরিচিত, এবং *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন সেই নামে তাঁকে সম্বোধন করেছেন (*সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত*)। *অচ্যুত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কখনও প্রভাবিত না হওয়ার ফলে, যাঁর কখনও পতন হয় না। জীব যখন তার স্বরূপগত স্থিতি থেকে এই জড় জগতে পতিত হয়, তখন সে *চ্যুত* হয়, অর্থাৎ অচ্যুতের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সে বিস্মৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ বা সন্তান। জীব যখন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়ে, বিভিন্ন যোনির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে, কিন্তু সে যখন পুনরায় তার স্বরূপগত চেতনায় ফিরে আসে, তখন আর সে জড় দেহের উপাধির পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করে না। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) বলা হয়েছে *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*।

জড়-জাগতিক উপাধি জাতি, বর্ণ, ধর্ম, রাষ্ট্র ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। বিভিন্ন গোত্র জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে, কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভক্ত হন, তিনি তখন অচ্যুত-গোত্রধারী হন বা পরমেশ্বর ভগবানের বংশধর হন, এবং তার ফলে তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি সমস্ত বিবেচনার অতীত হন।

পৃথু মহারাজ ব্রাহ্মণ কুলের উপর, অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞানসমন্বিত জ্ঞানী পণ্ডিতদের উপর অথবা বৈষ্ণবদের উপর, যাঁরা হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের অতীত, তাঁদের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেননি তাই বলা হয়েছে—

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী-র্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥

"যে মনে করে যে, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কাঠ অথবা পাথরের তৈরি, যে সদ্‌গুরুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, যে অচ্যুত গোত্রভুক্ত বৈষ্ণবদের কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত অথবা যে ভগবানের চরণামৃত বা গঙ্গাজলকে সাধারণ জল বলে মনে করে, সে হচ্ছে একজন নারকী, অর্থাৎ সে নরকে বাস করছে।" *(পদ্মপুরাণ)*

এই শ্লোকে বর্ণিত তত্ত্ব থেকে বোঝা যায় যে, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের স্তরে না আসা পর্যন্ত মানুষকে রাজার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা কারও নিয়ন্ত্রণাধীন নন। ব্রাহ্মণ বলতে তাঁকে বোঝায়, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, বা পরম সত্যের নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে অবগত, আর বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন।

শ্লোক ১৩

একদাসীন্মহাসত্রদীক্ষা তত্র দিবৌকসাম্ ।
সমাজো ব্রহ্মর্ষীণাং চ রাজর্ষীণাং চ সত্তম ॥ ১৩ ॥

একদা—এক সময়; **আসীৎ**—সংকল্প করেছিলেন; **মহা-সত্র**—মহাযজ্ঞ; **দীক্ষা**—দীক্ষা; **তত্র**—সেই উৎসবে; **দিব-ওকসাম্**—দেবতাদের; **সমাজঃ**—সভা; **ব্রহ্ম-ঋষীণাম্**—ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিদের; **চ**—ও; **রাজ-ঋষীণাম্**—মহান ঋষিতুল্য রাজাদের; **চ**—ও; **সৎ-তম**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের।

অনুবাদ

এক সময় পৃথু মহারাজ এক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা সকলে সমবেত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, পৃথু মহারাজের বাসস্থল যদিও ছিল গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে, তবুও তাঁর মহান যজ্ঞে দেবতারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তা ইঙ্গিত করে যে, পূর্বে দেবতারা এই গ্রহলোকে আসতেন। তেমনই, অর্জুন, যুধিষ্ঠির আদি মহাপুরুষেরা উচ্চতর লোকে যেতেন। এইভাবে উপযুক্ত বিমান ও অন্তরীক্ষ-যানের মাধ্যমে বিভিন্ন লোকে যাতায়াতের প্রচলন ছিল।

শ্লোক ১৪

তস্মিন্নর্হৎসু সর্বেষু স্বর্চিতেষু যথার্হতঃ ।
উত্থিতঃ সদসো মধ্যে তারাণামুডুরাড়িব ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্—সেই মহাসভায়; **অর্হৎসু**—পূজনীয়দের; **সর্বেষু**—তাঁরা সকলে; **সু-অর্চিতেষু**—যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; **যথা-অর্হতঃ**—যোগ্যতা অনুসারে; **উত্থিতঃ**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **সদসঃ**—সদস্যদের মধ্যে; **মধ্যে**—মধ্যে; **তারাণাম্**—তারাদের; **উডু-রাট্**—চন্দ্র; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সেই মহান সভায় মহারাজ পৃথু সর্ব প্রথমে সমস্ত পূজনীয় অতিথিদের যথাযথভাবে পূজা করেছিলেন, এবং তার পর তিনি সেই সভায় তারকা পরিবৃত চন্দ্রের মতো উত্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে, পৃথু মহারাজের দ্বারা সেই মহাযজ্ঞে মহান ও সম্মানিত ব্যক্তিদের যে স্বাগত জানানো হয়েছিল, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতিথিকে স্বাগত জানানোর প্রথম বিধি হচ্ছে তাঁদের পদ ধৌত করা, এবং বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অতিথিদের পাদপ্রক্ষালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তেমনই, পৃথু মহারাজও দেবতাদের, ঋষিদের, ব্রাহ্মণদের ও মহান রাজাদের যথাযথভাবে সংবর্ধনা করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

প্রাংশুঃ পীনায়তভুজো গৌরঃ কঞ্জারুণেক্ষণঃ ।
সুনাসঃ সুমুখঃ সৌম্যঃ পীনাংসঃ সুদ্বিজস্মিতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রাংশুঃ—অতি দীর্ঘ; **পীন-আয়ত**—পূর্ণ ও বিস্তৃত; **ভুজঃ**—বাহু; **গৌরঃ**—গৌরবর্ণ; **কঞ্জ**—পদ্মের মতো; **অরুণ-ঈক্ষণঃ**—প্রভাতকালীন সূর্যের মতো উজ্জ্বল চক্ষু; **সু-নাসঃ**—সুন্দর নাসিকা; **সু-মুখঃ**—সুন্দর মুখমণ্ডল; **সৌম্যঃ**—সৌম্য; **পীন-অংসঃ**—উন্নত স্কন্ধ; **সু**—সুন্দর; **দ্বিজ**—দন্ত; **স্মিতঃ**—স্মিত হাস্য।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথুর দেহ উন্নত ও বলিষ্ঠ, তাঁর অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ, তাঁর বাহুযুগল দীর্ঘ ও স্থূল, তাঁর নেত্রযুগল প্রভাতকালীন সূর্যের মতো উজ্জ্বল, তাঁর নাসিকা উন্নত, মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং ব্যক্তিত্ব সৌম্য। তাঁর স্মিত হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলে সুন্দর দন্তরাজি শোভা পাচ্ছিল।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় পুরুষ ও রমণীরা সাধারণত অত্যন্ত সুন্দর হয়। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আমরা দেখতে পাব যে, পৃথু মহারাজের শারীরিক গঠন কেবল সুন্দরই ছিল না, তাঁর দেহ সমস্ত শুভ লক্ষণ-সমন্বিত ছিল।

বলা হয় যে, 'মুখ হচ্ছে মনের সূচক।' মানুষের মানসিক অবস্থা তার মুখের গঠনের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। মানুষের দেহের গঠনে তার পূর্বকৃত কর্মের প্রভাব প্রকাশ পায়। কারণ পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে, মানুষ, পশু, দেবতা আদি সকলেরই পরবর্তী দেহ নির্ধারিত হয়। এটি আত্মার বিভিন্ন প্রকার দেহে দেহান্তরের প্রমাণ।

শ্লোক ১৬

ব্যূঢ়বক্ষা বৃহচ্ছ্রোণির্বলিবল্গুদলোদরঃ ।
আবর্তনাভিরোজস্বী কাঞ্চনোরুরুদগ্রপাৎ ॥ ১৬ ॥

ব্যূঢ়—প্রশস্ত; **বক্ষাঃ**—বক্ষ; **বৃহৎ-শ্রোণিঃ**—স্থূল কটিদেশ; **বলি**—রেখা; **বল্গু**—অত্যন্ত সুন্দর; **দল**—অশ্বত্থ পত্রের মতো; **উদরঃ**—উদর; **আবর্ত**—ঘূর্ণিস্রোত;

নাভিঃ—নাভি; ওজস্বী—উজ্জ্বল; কাঞ্চন—স্বর্ণ; উরুঃ—উরুদ্বয়; উদগ্র-পাৎ—পায়ের পাতার উপরিভাগ উন্নত।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের বক্ষস্থল বিস্তৃত, কটিদেশ স্থূল, উদর ত্রিবলী রেখায় সুশোভিত এবং অশ্বত্থ পত্রের মতো ঊর্ধ্বভাগে বিস্তৃত ও অধোভাগে সংকুচিত। তাঁর নাভিদেশ আবর্তের মতো গভীর, উরুদ্বয় সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল, এবং পায়ের পাতার মধ্যভাগ উন্নত।

শ্লোক ১৭

সূক্ষ্মবক্রাসিতস্নিগ্ধমূর্ধজঃ কম্বুকন্ধরঃ ।
মহাধনে দুকূলাগ্র্যে পরিধায়োপবীয় চ ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম; বক্র—কুঞ্চিত; অসিত—কৃষ্ণবর্ণ; স্নিগ্ধ—চিক্কণ; মূর্ধজঃ—মাথার চুল; কম্বু—শঙ্খের মতো; কন্ধরঃ—গলদেশ; মহা-ধনে—অত্যন্ত মূল্যবান; দুকূল-অগ্র্যে—ধুতি পরিহিত; পরিধায়—দেহের উপরিভাগে; উপবীয়—উপবীতের মতো; চ—ও।

অনুবাদ

তাঁর কেশকলাপ—সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ; গলদেশ শঙ্খের মতো রেখাযুক্ত। তিনি একটি অতি মূল্যবান ধুতি পরেছিলেন, এবং তাঁর দেহের উপরিভাগে ছিল এক অতি সুন্দর উত্তরীয়।

শ্লোক ১৮

ব্যঞ্জিতাশেষগাত্রশ্রীর্নিয়মে ন্যস্তভূষণঃ ।
কৃষ্ণাজিনধরঃ শ্রীমান্ কুশপাণিঃকৃতোচিতঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যঞ্জিত—ইঙ্গিত করে; অশেষ—অসংখ্য; গাত্র—দেহ; শ্রীঃ—সৌন্দর্য; নিয়মে—নিয়ন্ত্রিত; ন্যস্ত—পরিত্যক্ত; ভূষণঃ—বস্ত্র; কৃষ্ণ—কৃষ্ণবর্ণ; অজিন—চর্ম; ধরঃ—ধারণ করে; শ্রীমান্—সুন্দর; কুশ-পাণিঃ—কুশহস্তে; কৃত—অনুষ্ঠান করেছিলেন; উচিতঃ—প্রয়োজন অনুসারে।

অনুবাদ

যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার সময় পৃথু মহারাজ তাঁর মূল্যবান বস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তিনি যখন কৃষ্ণাজিন পরিধান করেছিলেন এবং অঙ্গুলে কুশাঙ্গরীয় ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল, কারণ তার ফলে তাঁর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পূর্বে পৃথু মহারাজ সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

শিশিরস্নিগ্ধতারাক্ষঃ সমৈক্ষত সমন্ততঃ ।
ঊচিবানিদমুর্বীশঃ সদঃ সংহর্ষয়ন্নিব ॥ ১৯ ॥

শিশির—শিশির; **স্নিগ্ধ**—আর্দ্র; **তারা**—তারকা; **অক্ষঃ**—চক্ষু; **সমৈক্ষত**—দেখেছিলেন; **সমন্ততঃ**—চতুর্দিকে; **ঊচিবান্**—বলতে শুরু করেছিলেন; **ইদম্**—এই; **উর্বীশঃ**—অত্যন্ত সম্মানীয়; **সদঃ**—সভাসদদের মধ্যে; **সংহর্ষয়ন্**—তাঁদের আনন্দ বর্ধন করে; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

সভাস্থ সকলকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং তাঁদের আনন্দ বর্ধন করার জন্য পৃথু মহারাজ শিশির-স্নিগ্ধ তারকার মতো চক্ষুর দ্বারা তাঁদের উপর দৃষ্টিপাত করেছিলেন, এবং তার পর তিনি গম্ভীর স্বরে তাঁদের বলেছিলেন।

শ্লোক ২০

চারু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং মৃষ্টং গূঢ়মবিক্লবম্ ।
সর্বেষামুপকারার্থং তদা অনুবদন্নিব ॥ ২০ ॥

চারু—সুন্দর; **চিত্র-পদম্**—বিচিত্র পদবিশিষ্ট; **শ্লক্ষ্ণম্**—অত্যন্ত স্পষ্ট; **মৃষ্টম্**—মহান; **গূঢ়ম্**—গভীর অর্থযুক্ত; **অবিক্লবম্**—নিঃশঙ্ক; **সর্বেষাম্**—সকলের জন্য; **উপকার-অর্থম্**—উপকারের জন্য; **তদা**—তখন; **অনুবদন্**—বলতে লাগলেন; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের সেই বাণী ছিল অত্যন্ত মনোহর, বিচিত্র পদবিশিষ্ট, স্পষ্টভাবে বোধগম্য, শ্রবণ-মধুর, গম্ভীর ও শুদ্ধ। তিনি যেন উপস্থিত সকলের মঙ্গলের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তা বলেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পৃথুর দেহসৌষ্ঠব অত্যন্ত সুন্দর ছিল, এবং তাঁর বাণীও সর্বতোভাবে ওজস্বী ছিল তাঁর বাণী আলঙ্কারিক পদবিশিষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ছিল, এবং তা কেবল সুন্দরই ছিল না, তা অত্যন্ত সহজবোধ্য ও স্পষ্ট ছিল।

শ্লোক ২১

রাজোবাচ

সভ্যাঃ শৃণুত ভদ্রং বঃ সাধবো য ইহাগতাঃ ।
সৎসু জিজ্ঞাসুভির্ধর্মমাবেদ্যং স্বমনীষিতম্ ॥ ২১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ বলতে শুরু করলেন; **সভ্যাঃ**—হে সভ্যগণ; **শৃণুত**—দয়া করে শ্রবণ করুন; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **বঃ**—আপনাদের; **সাধবঃ**—সমস্ত মহাত্মাগণ; **যে**—যিনি; **ইহ**—এখানে; **আগতাঃ**—উপস্থিত হয়েছেন; **সৎসু**—মহোদয়গণের প্রতি; **জিজ্ঞাসুভিঃ**—জানতে ইচ্ছুক; **ধর্মম্**—ধর্মীয় অনুশাসন; **আবেদ্যম্**—বক্তব্য; **স্ব-মনীষিতম্**—বিচারিত।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বললেন—হে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ! আপনাদের মঙ্গল হোক! আপনারা, সমস্ত মহাত্মারা, যাঁরা এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন, দয়া করে আমার প্রার্থনা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। যে-ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জিজ্ঞাসু, ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের কাছে তাঁর মনের অভিলাষ ব্যক্ত করা উচিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সাধবঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যখন অত্যন্ত মহান ও বিখ্যাত হন, তখন অনেক অসৎ ব্যক্তি তাঁর শত্রু হয়, কারণ ঈর্ষা করাই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের স্বভাব। সভায় বিভিন্ন প্রকার মানুষের সমাবেশ হয়, এবং তাই, পৃথু মহারাজ

যেহেতু ছিলেন অত্যন্ত মহৎ, সেই সভায় হয়তো তাঁর কিছু শত্রু উপস্থিত ছিল, যারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারেনি। পৃথু মহারাজ কিন্তু সজ্জন ব্যক্তিদের কথাই বিবেচনা করেছিলেন, এবং তাই তিনি প্রথমে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের অপেক্ষা না করে, সাধু প্রকৃতির ব্যক্তিদের সম্বোধন করেছিলেন। রাজারূপে তিনি সকলকে আদেশ করেননি, পক্ষান্তরে সেই সাধু ও মহর্ষিদের সভায় তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন সমগ্র পৃথিবীর একজন মহান রাজারূপে, তিনি তাঁদের আদেশ প্রদান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনীত, নম্র ও সৎ, তাই তিনি তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত তাঁদের স্বীকৃতির জন্য তাঁদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। এই জড় জগতে সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত। তাই তাদের চারটি ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু পৃথু মহারাজ যদিও সেই সমস্ত ত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন, তবুও তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর বক্তব্য মহাত্মা, সাধু ও মুনি-ঋষিদের সমক্ষে উপস্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

অহং দণ্ডধরো রাজা প্রজানামিহ যোজিতঃ ।
রক্ষিতা বৃত্তিদঃ স্বেষু সেতুষু স্থাপিতা পৃথক্ ॥ ২২ ॥

অহম্—আমি; **দণ্ড-ধরঃ**—রাজদণ্ড-ধারণকারী; **রাজা**—রাজা; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **ইহ**—এই জগতে; **যোজিতঃ**—নিযুক্ত; **রক্ষিতা**—রক্ষক; **বৃত্তি-দঃ**—উপজীবিকা প্রদানকারী; **স্বেষু**—তাদের নিজেদের; **সেতুষু**—সামাজিক বর্ণবিভাগ; **স্থাপিতা**—স্থাপিত; **পৃথক্**—ভিন্ন-ভিন্নভাবে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বললেন—পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় আমি এই লোকের রাজারূপে নিযুক্ত হয়েছি, এবং প্রজাদের শাসনের জন্য, বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য এবং বৈদিক নির্দেশে স্থাপিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসারে তাদের জীবিকা প্রদানের জন্য আমি এই রাজদণ্ড ধারণ করেছি।

তাৎপর্য

কোন বিশেষ গ্রহলোকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভগবানের দ্বারা রাজা নিযুক্ত হয়ে থাকেন বলে মনে করা হয়। এখন যেমন আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক দেশে একজন করে রাষ্ট্রপতি রয়েছেন, ঠিক তেমনই প্রতিটি গ্রহলোকে একজন প্রধান ব্যক্তি রয়েছেন। কেউ যখন রাষ্ট্রপতি বা রাজা হন, তখন বুঝতে হবে যে, ভগবান

তাঁকে সেই সুযোগটি দিয়েছেন। বৈদিক প্রথায় রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়, এবং নাগরিকেরা তাঁকে নররূপী ভগবান বলে শ্রদ্ধা করেন। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে, ভগবান সমস্ত জীবদের পালন করেন, বিশেষ করে মানুষদের, যাতে তারা সর্বোত্তম সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারে। নিম্নতর যোনিতে বহু বহু জন্মের পর, জীব যখন মনুষ্য-শরীব প্রাপ্ত হয়, বিশেষ করে সভ্য মানুষের জীবন, তখন সেই মনুষ্য-সমাজকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা অবশ্য কর্তব্য, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্* ইত্যাদি)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণ মনুষ্য সমাজের স্বাভাবিক বিভাগ, এবং পৃথু মহারাজ ঘোষণা করেছেন যে, সেই সামাজিক বিভাগ অনুসারে প্রতিটি মানুষেব যথাযথ উপজীবিকা প্রাপ্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। রাজা বা সরকারের কর্তব্য হচ্ছে মানুষ যাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে এবং তাদের নিজ-নিজ বৃত্তিতে যথাযথভাবে নিযুক্ত থাকে তা দেখা। বর্তমান সময়ে সবকার বা রাজা যেহেতু প্রজাদের এইভাবে সংরক্ষণ করছে না, তাই সমাজ-ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য অথবা কে শূদ্র তা কেউই জানে না, আব মানুষ কেবল তার জন্মসূত্রে কোন বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করছে। সরকারের কর্তব্য হচ্ছে গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজের বর্ণ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, কারণ তার ফলে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রকৃতপক্ষে সুসংস্কৃত হতে পারবে। মানব-সমাজ যদি এই চারটি বর্ণবিভাগ অবলম্বন না করে, তা হলে মানব-সমাজ পশু-সমাজের থেকে কোন মতেই উন্নত হতে পারে না, যাতে শান্তি ও সমৃদ্ধি থাকে না, কেবল থাকে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা। একজন আদর্শ রাজারূপে পৃথু মহারাজ বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রবর্তন করেছিলেন।

প্রজায়তে ইতি প্রজা। *প্রজা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই পৃথু মহারাজ তাঁর রাজ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, সেই সমস্ত প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। *প্রজা* শব্দে কেবল মানুষদেরই বোঝায় না, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি অন্য সমস্ত জীবদেরও বোঝায়। রাজার কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবদের সুরক্ষা ও আহার প্রদান করা। আধুনিক সমাজের মূর্খ ও দুর্বৃত্তদের সবকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। পশুরা যে-স্থানে জন্মগ্রহণ করেছে, তারাও সেই রাজ্যের প্রজা, এবং তারাও ভগবানের কাছ থেকে বেঁচে থাকার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। ব্যাপকভাবে পশুহত্যার ফলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে, সেই জন্য কসাই, তার দেশ ও তার সরকারকে ভবিষ্যতে তার ফলভোগ করতে হবে।

শ্লোক ২৩

তস্য মে তদনুষ্ঠানাদ্যানাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ।
লোকাঃ স্যুঃ কামসন্দোহা যস্য তুষ্যতি দিষ্টদৃক্ ॥ ২৩ ॥

তস্য—তার; **মে**—আমার; **তৎ**—তা; **অনুষ্ঠানাৎ**—সম্পাদন করার দ্বারা, **যান্**—যা; **আহুঃ**—বলা হয়েছে; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—বেদজ্ঞদের দ্বারা; **লোকাঃ**—গ্রহলোক-সমূহ; **স্যুঃ**—হয়; **কাম-সন্দোহাঃ**—ঈপ্সিত বস্তু প্রদানকারী; **যস্য**—যার; **তুষ্যতি**—প্রসন্ন হয়; **দিষ্ট-দৃক্**—নিয়তির দ্রষ্টা।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথু বললেন—আমি মনে করি যে, রাজারূপে আমি যদি আমার কর্তব্য সম্পাদন করি, তা হলে আমি বেদজ্ঞদের দ্বারা বর্ণিত ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারব। সমস্ত নিয়তির দ্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের ফলে, সেই গন্তব্যস্থল নিশ্চিতভাবে লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ *ব্রহ্মবাদিনঃ* শব্দটির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। *ব্রহ্ম* শব্দে *বেদকে* বোঝায়, যাকে শব্দব্রহ্মও বলা হয়। এই শব্দব্রহ্ম কোন সাধারণ ভাষা নয়, যদিও তা সাধারণ ভাষায় লেখা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। বৈদিক শাস্ত্র-প্রমাণকে চরম প্রমাণ বলে স্বীকার করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে বহু তত্ত্ব রয়েছে, এবং তাতে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধেও বহু নির্দেশ রয়েছে। যে রাজা তাঁর রাজ্যের সমস্ত প্রাণীদের সুরক্ষা প্রদান করার দ্বারা তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন, তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হন। তাও নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতার উপর। এমন নয় যে, কেউ যদি যথাযথভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন, তা হলেই তিনি আপনা থেকেই স্বর্গলোকে উন্নীত হবেন। এই উন্নতি নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতার উপর। অতএব চরমে আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের ফলে, জীব তার বাঞ্ছিত কার্যকলাপের ফল লাভ করতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

জীবের নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পূর্ণতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। *কাম-সন্দোহাঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তি'। সকলেই জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের বাসনা করে, কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় সমস্ত বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, মানব-জীবনের কোন পরিকল্পনা নেই। এই মহামূর্খতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তার ফলে মানব-সভ্যতা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম জানে না, যা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ। যেহেতু তারা এক-একটি মহা-নাস্তিক, তাই তারা ভগবানের অস্তিত্ব ও তাঁর আদেশ বিশ্বাস করে না, এবং তাই তারা জানে না প্রকৃতি কিভাবে কার্য করে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সহ জনসাধারণের মহামূর্খতা জীবনকে এতই বিপজ্জনক করে তোলে যে, মানুষ বুঝতে পারে না, তাদের জীবনের উন্নতি হচ্ছে, না অবনতি হচ্ছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* (৭/৫/৩০) অনুসারে তারা জড় অস্তিত্বের অন্ধতম প্রদেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। *অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রম্*। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও জনসাধারণকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান প্রদান করতে শুরু করেছে। সকলেরই কর্তব্য এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা।

শ্লোক ২৪

য উদ্ধরেৎকরং রাজা প্রজা ধর্মেষ্বশিক্ষয়ন্ ।
প্রজানাং শমলং ভুঙ্‌ক্তে ভগং চ স্বং জহাতি সঃ ॥ ২৪ ॥

যঃ—যে রাজা বা রাজ্যপাল; **উদ্ধরেৎ**—আদায় করে; **করম্**—কর; **রাজা**—রাজা; **প্রজাঃ**—প্রজা; **ধর্মেষু**—তাদের কর্তব্য সম্পাদনে; **অশিক্ষয়ন্**—কিভাবে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, সেই শিক্ষা না দিয়ে; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **শমলম্**—পাপ; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **ভগম্**—ঐশ্বর্য; **চ**—ও; **স্বম্**—নিজের; **জহাতি**—ত্যাগ করে; **সঃ**—সেই রাজা।

অনুবাদ

যে রাজা তাঁর প্রজাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার শিক্ষা না দিয়ে, কেবল তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করেন, তাঁকে প্রজাদের পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হয়, এবং তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

কর্তব্য সম্পাদন না করে রাজা, রাজ্যপাল অথবা রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করা উচিত নয়। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে কিভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম আচরণ করতে হয়, সেই সম্বন্ধে প্রজাদের শিক্ষা দেওয়া। রাজা যদি তাঁর সেই কর্তব্যে অবহেলা করেন এবং প্রজাদের কাছ থেকে কেবল করই গ্রহণ করেন, তা হলে যারা সেই সংগ্রহের শরিক, অর্থাৎ সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা ও রাষ্ট্রপ্রধানেরা—তাঁদের সকলকে জনসাধারণের পাপকর্মের ফলভোগ করতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যদি কোন পাপময় স্থানে ভোজন করে, তা হলে তাকে সেখানে অনুষ্ঠিত পাপকর্মের ফলভোগ করতে হবে। (তাই বৈদিক সমাজে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ভোজন করাবার জন্য গৃহে নিমন্ত্রণ করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে, কারণ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তার পাপকর্মের ফল থেকে তাকে মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সর্বত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। তবে যে অনুষ্ঠানে ভগবানের প্রসাদ বিতরণ হয়, সেখানে অংশ গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।) বহু সূক্ষ্ম নিয়ম রয়েছে যেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবীর মানুষদের মঙ্গলের জন্য এই বৈদিক জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিতরণ করছে।

শ্লোক ২৫

তৎ প্রজা ভর্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানসূয়বঃ ।
কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২৫ ॥

তৎ—অতএব; **প্রজাঃ**—হে প্রজাগণ; **ভর্তৃ**—প্রভুর; **পিণ্ড-অর্থম্**—পারলৌকিক কল্যাণ; **স্ব-অর্থম্**—নিজের হিত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনসূয়বঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে; **কুরুত**—সম্পাদন কর; **অধোক্ষজ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ধিয়ঃ**—তাঁর চিন্তা করে; **তর্হি**—অতএব; **মে**—আমাকে; **অনুগ্রহ**—কৃপা; **কৃতঃ**—করা হয়েছে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বলতে লাগলেন—অতএব হে প্রজাবৃন্দ! তোমাদের রাজার পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের জন্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে তোমাদের কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন কর এবং সর্বদা তোমাদের হৃদয়ে ভগবানের কথা চিন্তা কর। তা করলে তোমাদের নিজেদের হিতসাধন হবে এবং তোমাদের রাজারও পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করে তোমরা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অধোক্ষজ-ধিয়ঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এর অর্থ হচ্ছে 'কৃষ্ণভাবনামৃত'। রাজা ও প্রজা উভয়েরই কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া উচিত, তা না হলে তারা উভয়েই মৃত্যুর পর নিম্নতর যোনি প্রাপ্ত হবে। দায়িত্বশীল সরকারের কর্তব্য সকলের মঙ্গল সাধনের জন্য কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা দান করা। কৃষ্ণভক্তি বিনা রাষ্ট্র অথবা নাগরিক কেউই দায়িত্বশীল হতে পারে না। পৃথু মহারাজ তাই তাঁর নাগরিকদের কৃষ্ণভক্তি আচরণ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, এবং কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হতে হয়, সেই সম্বন্ধে তাদের শিক্ষা দিতে তিনি নিজেও অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃতের সার কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) প্রদান করা হয়েছে—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু দান কর এবং যে তপস্যা অনুষ্ঠান কর, তা সবই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর।" সরকারি কর্মচারী সহ রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষদের যদি পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হলে যদিও প্রতিটি ব্যক্তি প্রকৃতির কঠোর নিয়মের দ্বারা দণ্ডনীয়, তবুও তাদের আর সেই দণ্ডভোগ করতে হবে না।

শ্লোক ২৬

যূয়ং তদনুমোদধ্বং পিতৃদেবর্ষয়োঽমলাঃ ।
কর্তুঃ শাস্তুরনুজ্ঞাতুস্তুল্যং যৎপ্রেত্য তৎফলম্ ॥ ২৬ ॥

যূয়ম্—এখানে উপস্থিত সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিগণ; **তৎ**—তা; **অনুমোদধ্বম্**—আমার প্রস্তাব দয়া করে অনুমোদন করুন; **পিতৃ**—পিতৃলোক থেকে যাঁরা এসেছেন; **দেব**—স্বর্গলোক থেকে যাঁরা এসেছেন; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অমলাঃ**—যাঁরা সমস্ত পাপকর্ম থেকে মুক্ত, **কর্তুঃ**—অনুষ্ঠানকারী; **শাস্তুঃ**—আদেশ প্রদানকারী; **অনুজ্ঞাতুঃ**—সমর্থকদের; **তুল্যম্**—সমান; **যৎ**—যা; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **তৎ**—তা ; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

আমি সমস্ত নির্মল-হৃদয় দেবতা, পিতৃ ও ঋষিদের অনুরোধ করছি যে, আপনারা আমার প্রস্তাব সমর্থন করুন, কারণ মৃত্যুর পর কর্মের ফল কর্মকর্তা, আদেশকর্তা, ও সমর্থককে সমানভাবে ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের সরকার ছিল আদর্শ, কারণ তা ঠিক বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হচ্ছিল। পৃথু মহারাজ পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছেন যে, সকলেই যে তাঁদের নিজ-নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হচ্ছেন, তা দেখা সরকারের প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্র এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যে, মানুষ আপনা থেকেই কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হবে। পৃথু মহারাজ তাই চেয়েছিলেন যে, তাঁর প্রজারা যেন সম্পূর্ণরূপে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন, কারণ তাঁরা যদি তা করেন, তা হলে তাঁরা তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর সমান লাভের ভাগীদার হবেন। একজন আদর্শ রাজারূপে পৃথু মহারাজ যদি স্বর্গলোকে উন্নীত হন, তা হলে তাঁর পন্থা অনুমোদন করার দ্বারা তাঁর যে-সমস্ত প্রজারা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরাও স্বর্গলোকে উন্নীত হবেন। যেহেতু বর্তমানে যে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারিত হচ্ছে তা অকৃত্রিম, পূর্ণ ও প্রামাণিক, এবং তা পৃথু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, তাই যাঁরা এই আন্দোলনে সহযোগিতা করছেন অথবা এই আন্দোলনের নীতি স্বীকার করেছেন, তাঁদেরও কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকারী সেবকদের সমান ফল লাভ হবে।

শ্লোক ২৭

অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ ।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ ॥ ২৭ ॥

অস্তি—অবশ্যই রয়েছেন; **যজ্ঞ-পতিঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **নাম**—নামক; **কেষাঞ্চিৎ**—কারও মতে; **অর্হ-সৎ-তমাঃ**—হে পূজ্যতম; **ইহ**—এই জড় জগতে; **অমুত্র**—মৃত্যুর পর; **চ**—ও; **লক্ষ্যন্তে**—দেখা যায়; **জ্যোৎস্না-বত্যঃ**—শক্তিমান, সুন্দর; **ক্বচিৎ**—কোথাও; **ভুবঃ**—শরীর।

অনুবাদ

হে পূজ্যতমগণ! প্রামাণিক শাস্ত্রের মতে, একজন পরম পুরুষ নিশ্চয়ই রয়েছেন, যিনি আমাদের কর্মের ফল প্রদান করছেন। তা না হলে কেন এমন কোন কোন ব্যক্তিদের দেখা যায়, যাঁরা ইহলোকে ও পরলোকে অসাধারণ সৌন্দর্য ও শক্তিসম্পন্ন হন?

তাৎপর্য

রাজ্য শাসন করার সময় পৃথু মহারাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রজাদের ভগবৎ-চেতনার স্তরে উন্নীত করা। সেই যজ্ঞস্থলে যেহেতু বহু লোকের সমাগম হয়েছিল, তাই সেখানে নিশ্চয়ই বিভিন্ন প্রকার মানুষ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পৃথু মহারাজ কেবল তাঁদেরই সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, যাঁরা নাস্তিক ছিলেন না। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পৃথু মহারাজ নাগরিকদের *অধোক্ষজ ধিয়ঃ* অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ বা কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং এই শ্লোকে তিনি বিশেষভাবে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন করছেন। যদিও তাঁর পিতা ছিলেন একজন মহা নাস্তিক, যিনি শাস্ত্রনির্দেশ পালন করেননি এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রতি এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তাঁরা কেবল তাঁকে সিংহাসনচ্যুতই করেননি, অভিশাপ দিয়ে হত্যাও করেছিলেন। নাস্তিকেরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, এবং তার ফলে তারা মনে করে যে, দৈনন্দিন জীবনে সব কিছুই ঘটছে জড়-জাগতিক আয়োজনের ফলে অথবা ঘটনাক্রমে। নাস্তিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন বিশ্বাস করে, যাতে মনে করা হয় যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সমন্বয়ের ফলে সব কিছু ঘটছে। তারা কেবল জড় পদার্থকে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে, কোন বিশেষ অবস্থায় জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে প্রাণের উদ্ভব হয়, এবং তা হচ্ছে পুরুষ বা ভোক্তা; তার পর, জড় পদার্থ ও জীবনী শক্তির সমন্বয়ের ফলে বিবিধ প্রকার সৃষ্টির উদ্ভব হয়। নাস্তিকেরা *বেদের* বাণীও বিশ্বাস করে না। তাদের মতে বৈদিক নির্দেশগুলি কেবল কতকগুলি মতবাদ মাত্র এবং জীবনে সেগুলির কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব নয়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে, পৃথু মহারাজ প্রস্তাব করেছিলেন যে, উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বিনা নানা প্রকার সৃষ্টি সম্ভব নয়, ভগবৎ-বিশ্বাসী মানুষেরা যেন সেই কথা বিচার করে নাস্তিকদের মতবাদ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করেন। নাস্তিকেরা কোন রকম প্রমাণ ছাড়াই দাবি করে যে, ঘটনাক্রমে কেবল বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু আস্তিকেরা বেদের নির্দেশ বিশ্বাস করার ফলে, বৈদিক প্রমাণের ভিত্তিতেই কেবল তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এঁদের সকলেরই কর্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিধিনিষেধ রয়েছে, সেই সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। বর্তমান সময়ে তথাকথিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা যদিও তাদের প্রকৃত সংস্কৃতি

হারিয়ে ফেলেছে, তবুও তারা জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হওয়ার দাবি করে। এই সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার জন্য সেই কথা তারা স্বীকার করতে চায় না। শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত ভয়ংকর মায়াবাদ দর্শন, যেই মতবাদে ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ, তা বেদবিহিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন যে, মায়াবাদীরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের চরণে সব চাইতে গর্হিত অপরাধী। বৈদিক প্রথায় যারা *বেদের* নির্দেশ মানে না, তাদের বলা হয় নাস্তিক। বুদ্ধদেব যখন অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন, তখন তাঁকে সেই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য *বেদকে* অস্বীকার করতে হয়েছিল, এবং সেই জন্য *বেদের* অনুগামীদের মতে তিনি হচ্ছেন নাস্তিক। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বৌদ্ধ-দর্শনের অনুগামীরা যেহেতু *বেদের* প্রামাণিকতা অস্বীকার করে, তাই তারা হচ্ছে নাস্তিক, কিন্তু শঙ্করাচার্য ছলনাপূর্বক *বেদকে* প্রতিষ্ঠা করার জন্য বৌদ্ধদের মায়াবাদ-দর্শন অনুসরণ করেছিলেন, তাই মহাপ্রভু শঙ্করাচার্যের অনুগামীদের বৌদ্ধদের থেকেও অধিক ভয়ংকর বলে বিবেচনা করেছেন। শঙ্করবাদী দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নিরাকার, তাঁর যে রূপ তা কেবল কল্পনাপ্রসূত। এই মতবাদ ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বৌদ্ধদের থেকেও অধিক ভয়ংকর। নাস্তিক ও মায়াবাদীদের এই সমস্ত দার্শনিক মতবাদ সত্ত্বেও, কৃষ্ণভক্তরা নিষ্ঠাসহকারে *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ পালন করেন, যা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার। *ভগবদগীতায়* (১৮/৪৬) বলা হয়েছে—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

"যিনি সমস্ত জীবের উৎস ও সর্বব্যাপ্ত, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীয় কর্তব্যকর্মের দ্বারা আরাধনা করার ফলে, সিদ্ধিলাভ করা যায়।" তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, যে-কথা *বেদান্ত-সূত্রে* বর্ণনা করা হয়েছে *(জন্মাদ্যস্য যতঃ)* . ভগবান নিজেও *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ* —"আমিই সব কিছুর উৎস।" পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস, এবং সেই সঙ্গে পরমাত্মারূপে তিনি সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে পরিব্যাপ্ত। তাই পরম সত্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং প্রতিটি জীবের কর্তব্য হচ্ছে তার কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের দ্বারা *(স্ব-কর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য)* সেই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। পৃথু মহারাজ সেই সূত্রটি তাঁর প্রজাদের মধ্যে প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

মানব-সভ্যতার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, বিভিন্ন বৃত্তির মাধ্যমে কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত থেকে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করার চেষ্টা করা।

সেটিই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*— স্বধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের ফলে সিদ্ধিলাভ করা যায়। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন অর্জুন। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাঁর স্বধর্ম ছিল যুদ্ধ করা, এবং তাঁর সেই ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সকলেরই কর্তব্য এই নীতি অনুসরণ করা। যে-সমস্ত নাস্তিকেরা তা করে না, তাদের ভর্ৎসনা করে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) বলা হয়েছে—*তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্*। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তারা অত্যন্ত ক্রূর ও নরাধম। পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই প্রকার দুষ্কৃতকারীরা জড় অস্তিত্বের অন্ধতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং তারা অসুর বা নাস্তিকরূপে জন্মগ্রহণ করে। জন্ম-জন্মান্তরে এই প্রকার অসুরেরা ক্রমশ অধঃপতিত হয়ে, অবশেষে বাঘ, সিংহ আদি হিংস্র পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে, কোটি-কোটি বছর ধরে তারা কৃষ্ণ-জ্ঞানবিহীন হয়ে অন্ধকারে অবস্থান করে।

পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় পুরুষোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি অন্য সমস্ত জীবের মতোই একজন পুরুষ, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সমস্ত পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা নায়ক। *বেদেও* সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। সমস্ত নিত্যের মধ্যে তিনি হচ্ছেন পরম নিত্য, সমস্ত চেতনের মধ্যে তিনি হচ্ছেন পরম চেতন, এবং তিনি পূর্ণ। অন্য জীবের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন তাঁর হয় না, কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পালক তাই তাদেরকে সঠিক স্তরে নিয়ে আসার অধিকার তাঁর রয়েছে, যাতে তারা সুখী হতে পারে। পিতা যেমন চান যে, তাঁর পরিচালনায় থেকে তাঁর সমস্ত সন্তানেরা সুখী হোক, তেমনই পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও চান যে, সমস্ত জীবেরাই সুখী হোক। এই জড় জগতে সুখী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। পিতা ও পুত্র উভয়েই নিত্য, কিন্তু জীব যদি তার নিত্য আনন্দময় ও জ্ঞানময় জীবনের স্তরে না আসে, তা হলে তার সুখী হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পুরুষোত্তম ভগবানের যদিও সাধারণ জীবদের থেকে লাভ করার মতো কিছুই নেই, তবুও তাঁদের ভালমন্দ বিচার করার অধিকার তাঁর রয়েছে। সঠিক উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কার্যকলাপের পন্থা, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি (*স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*)। জীব তার স্বধর্মে নিযুক্ত হতে পারে, কিন্তু সে যদি তার সেই স্বধর্মে সিদ্ধিলাভ করতে চায়,

তা হলে তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে। যাঁরা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেন, তাঁরা জীবনের উন্নততর সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন, কিন্তু যারা তাকে অসন্তুষ্ট করে, তারা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েন।

তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, দুই প্রকার কর্ম রয়েছে—বৈষয়িক কর্ম ও যজ্ঞের জন্য কর্ম *(যজ্ঞার্থাৎ কর্ম)*। যে কর্ম যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না তা বন্ধনের কারণ। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত, তা না হলে সেই কর্ম আমাদের জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে।" *(ভগবদ্গীতা* ৩/৯) এই কর্মবন্ধন প্রকৃতির কঠোর নিয়ম অনুসারে প্রদত্ত হয়। জড় অস্তিত্ব হচ্ছে জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত বাধা বিপত্তিগুলি জয় করার জন্য এক প্রকার সংগ্রাম। অসুরেরা সমস্ত বাধাবিপত্তি জয় করার জন্য সর্বদাই সংগ্রাম করছে, এবং জড়া প্রকৃতির মোহময়ী শক্তির প্রভাবে মূর্খ জীবেরা এই জড় জগতে কঠোর পরিশ্রম করে এবং সেটিকে সুখ বলে মনে করে। তাকে বলা হয় মায়া। সেই কঠোর জীবন সংগ্রামে তারা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

জীবের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভগবান আমাদের নিয়মাবলী প্রদান করেছেন, ঠিক যেমন রাজা তাঁর রাজ্যে আইন প্রদান করেন, এবং কেউ যখন সেই আইন ভঙ্গ করে, তখন তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। তেমনই, ভগবান আমাদের *বেদের* অচ্যুত জ্ঞান প্রদান করেছেন, যা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—মানুষের এই চারটি ত্রুটির দ্বারা কলুষিত নয়। আমরা যদি *বেদের* নির্দেশ না মেনে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কর্ম করি, তা হলে ভগবানের আইনে আমাদের অবশ্যই দণ্ডভোগ করতে হবে, এবং তিনি জীবকে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রদান করেন। জড় অস্তিত্ব বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের পন্থা প্রকৃতি প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার শরীর অনুসারে হয়ে থাকে। পুণ্য ও পাপের স্তরবিভাগ অবশ্যই রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যিনি সম্পূর্ণরূপে পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়েছেন (সম্পূর্ণরূপে পুণ্যকর্মে যুক্ত হওয়ার ফলে কেবল তা সম্ভব), তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এইভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।" ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার এই জীবনকে বলা হয় *অধোক্ষজ-*

ধিয়ঃ, অথবা কৃষ্ণভক্তির জীবন। পৃথু মহারাজ চেয়েছিলেন যে, তাঁর প্রজারা যেন সেই পন্থা অনুসরণ করে।

বিভিন্ন প্রকারের জীবন ও জড় সৃষ্টি ঘটনাক্রমে বা আবশ্যকতার ফলে উদ্ভব হয় না; সেগুলি হচ্ছে জীবনের পুণ্যকর্ম ও পাপকর্ম অনুসারে ভগবানের বিবিধ আয়োজন। পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের ফলে, কেউ ভাল দেশে ভাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে, এবং সে সুন্দর দেহ, উচ্চশিক্ষা অথবা প্রভূত ধনসম্পদ লাভ করতে পারে। তাই, আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার জীবনের মান রয়েছে, এবং দৈহিক গঠন ও শিক্ষার স্তর, ইত্যাদি পরমেশ্বর ভগবান পুণ্য অথবা পাপকর্মের ফল অনুসারে প্রদান করেন। তাই বিভিন্ন প্রকার জীবন ঘটনাক্রমে বিকশিত হয় না। পক্ষান্তরে তা নির্ধারিত হয় পূর্বকৃত ব্যবস্থা অনুসারে। ভগবানের এই পরিকল্পনা *বেদে* বর্ণিত হয়েছে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সেই জ্ঞানের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে তার জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে চরমে, বিশেষ করে মনুষ্য-শরীর লাভ করে, কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের দ্বারা সে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

ঘটনাক্রমে কোন কিছু ঘটার মতবাদটি বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, *অজ্ঞাত-সুকৃতি* কথাটির মাধ্যমে সব চাইতে ভালভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। *অজ্ঞাত-সুকৃতি* কথাটির অর্থ হচ্ছে অজ্ঞাতসারে কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করা। কিন্তু তাও পরিকল্পিত। যেমন, কৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষেব মতো আসেন, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে একজন ভক্ত হিসাবে আসেন, অথবা তিনি তাঁর প্রতিনিধি গুরুদেবকে প্রেরণ করেন, অথবা শুদ্ধ ভক্তকে প্রেরণ করেন। সেটিও পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারেই সংঘটিত হয়। তাঁরা আসেন প্রচার করার জন্য এবং শিক্ষা প্রদান করার জন্য। তার ফলে ভগবানের দৈবী মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন জীব তাঁদের সঙ্গ করার, তাঁদের সঙ্গে কথা বলার এবং তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়, এবং কোন না কোনভাবে যদি বদ্ধ জীব এই প্রকার ব্যক্তিদের শরণাগত হয়ে, তাঁদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ কবে, তা হলে সে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার সুযোগ পায় এবং জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণ গ্রহণ কর। তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত করব। ভয় করো না।"

(*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) *সর্ব-পাপেভ্যঃ* কথাটির অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে'। যে ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্ত, গুরুদেব অথবা ভগবানের অন্যান্য প্রামাণিক অবতারদের সঙ্গলাভ করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করেন। তখন তাঁর জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ২৮-২৯

মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ ।
প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ ॥ ২৮ ॥
ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ ।
প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা ॥ ২৯ ॥

মনোঃ—মনু (স্বায়ম্ভুব মনু); **উত্তানপাদস্য**—ধ্রুব মহারাজের পিতা উত্তানপাদের; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **মহী-পতেঃ**—মহান রাজার; **প্রিয়ব্রতস্য**—ধ্রুব মহারাজের পরিবারভুক্ত প্রিয়ব্রতের; **রাজর্ষেঃ**—মহান রাজর্ষির; **অঙ্গস্য**—অঙ্গ নামক; **অস্মৎ**—আমার; **পিতুঃ**—আমার পিতা; **পিতুঃ**—পিতার; **ঈদৃশানাম্**—এই প্রকার মহাপুরুষদের; **অথ**—ও; **অন্যেষাম্**—অন্যদের; **অজস্য**—পরম অমরের; **চ**—ও; **ভবস্য**—জীবদের; **চ**—ও; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদ মহারাজের; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **চ**—ও; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **কৃত্যম্**—তাদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে; **অস্তি**—আছে; **গদা-ভৃতা**—গদাধারী পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

তা কেবল বৈদিক প্রমাণের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়নি, মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত, আমার পিতামহ অঙ্গ প্রভৃতি বহু মহাপুরুষের দ্বারা এবং প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি প্রমুখ মহাজনদের দ্বারা তা প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন গদাধারী পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী আস্তিক।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে, সাধুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং সদ্গুরুর পরিচালনায় শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে প্রকৃত মার্গ নির্ধারণ করতে হয় (*সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য*)। সাধু হচ্ছেন তিনি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া বৈদিক নির্দেশ পালন করেন। যিনি বৈদিক নির্দেশের প্রামাণিক ভিত্তি অনুসারে এবং

মহাপুরুষদের জীবনের দৃষ্টান্ত অনুসারে যথাযথ পন্থা প্রদর্শন করেন, তাঁকে বলা হয় গুরু। জীবন-গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে, স্বায়ম্ভুব মনু প্রমুখ যে-সমস্ত মহাজনদের উল্লেখ পৃথু মহারাজ এখানে করেছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। এই প্রকার মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সব চাইতে নিরাপদ পন্থা, বিশেষ করে যাঁদের কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে। মহাজন হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব, নারদ মুনি, মনু, কুমার, প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি মহারাজ, যমরাজ, ভীষ্ম, জনক, শুকদেব গোস্বামী ও কপিল মুনি।

শ্লোক ৩০

দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্মবিমোহিতান্ ।
বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা ॥ ৩০ ॥

দৌহিত্র-আদীন্—আমার পিতা বেণ আদি পৌত্রগণ; **ঋতে**—বিনা; **মৃত্যোঃ**—মূর্তিমান মৃত্যুর; **শোচ্যান্**—নিন্দনীয়; **ধর্ম-বিমোহিতান্**—ধর্মের পথে মোহগ্রস্ত হয়ে; **বর্গ**—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; **স্বর্গ**—স্বর্গলোকে উন্নতি; **অপবর্গাণাম্**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **এক**—এক; **আত্ম্য**—পরমেশ্বর ভগবান; **হেতুনা**—কারণ।

অনুবাদ

আমার পিতা এবং মূর্তিমান মৃত্যুর পৌত্র বেণ প্রমুখ নিন্দনীয় ব্যক্তিরা ধর্মের পথে মোহগ্রস্ত হলেও, পূর্বোল্লিখিত মহাপুরুষেরা স্বীকার করেছেন যে, এই জগতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অথবা স্বর্গলোকে উন্নতির আশীর্বাদ একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানই প্রদান করতে পারেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের পিতা রাজা বেণ ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন এবং বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি-বিধানের পন্থা পরিত্যাগ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন একজন নাস্তিক, যিনি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেননি, এবং যিনি তাঁর রাজ্যে সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পৃথু মহারাজ রাজা বেণের চরিত্র নিন্দনীয় বলে মনে করেছিলেন, কারণ বেণ ধর্ম অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মূর্খ ছিলেন। নাস্তিকেরা মনে করে যে, ধর্ম আচরণ, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও

মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করবার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের মতে, ধর্ম হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থায় শান্তি স্থাপনের জন্য মানুষকে নীতিপরায়ণ ও সৎ হতে অনুপ্রাণিত করার জন্য এক মনগড়া ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করা। অধিকন্তু, তারা বলে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই উদ্দেশ্যে ভগবানকে স্বীকার করারও কোন প্রয়োজন নেই, কারণ কেউ যদি নীতিপরায়ণ ও সততার আদর্শ অনুসরণ করে, তা হলেই যথেষ্ট। তেমনই, কেউ যদি অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের জন্য খুব ভালভাবে পরিকল্পনা করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে, তা হলে আপনা থেকেই অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন হবে। তেমনই, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে না, কারণ কেউ যদি যে-কোন উপায়েই হোক যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে, তা হলে সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পাবে। আর মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ মৃত্যুর পরে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। পৃথু মহারাজ কিন্তু তাঁর পিতা, যে ছিল মূর্তিমান মৃত্যুর দৌহিত্র, তার এই প্রকার নাস্তিক মতবাদ স্বীকার করেননি। সাধারণত কন্যা পিতার গুণ অর্জন করে এবং পুত্র মাতার গুণাবলী অর্জন করে। তাই মৃত্যুর কন্যা সুনীথা তার পিতার গুণগুলি প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং বেণ তার মাতার গুণগুলি প্রাপ্ত হয়েছিল। যারা সংসার চক্রে জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন, তারা জড়-জাগতিক ধারণার অতিরিক্ত অন্য কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না। যেহেতু রাজা বেণ ছিলেন সেই প্রকার ব্যক্তি, তাই তিনি ভগবানের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে পারেননি। আধুনিক সভ্যতা রাজা বেণের মতবাদ স্বীকার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করি, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য হই। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন।

কেউ যদি ধর্ম ও নৈতিকতার ব্যাপারে ভগবানের অধ্যক্ষতা স্বীকার না করে, তা হলে তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, একই নৈতিক স্তরের দুই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ফল কেন প্রাপ্ত হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, দুই ব্যক্তি সমান নৈতিকতা, সততা ও আচার-পরায়ণ হলেও তাদের পদ তবু সমান নয়। তেমনই, অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে দেখা যায় যে, দুজন মানুষ দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করলেও সমান ফল প্রাপ্ত হয় না। কেউ হয়তো বিনা পরিশ্রমেই প্রভূত ঐশ্বর্য উপভোগ করে, আর অন্য কেউ কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও দিনে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তেমনই, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাপারেও, কারও যথেষ্ট খাবার থাকলেও তবুও তার পারিবারিক জীবনে সে সুখী নয় অথবা কখনও কখনও সে বিবাহিত পর্যন্ত নয়,

কিন্তু এক ব্যক্তি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তেমন স্বচ্ছল না হলেও, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচুর সুযোগ তার রয়েছে, এমন কি শূকর, কুকুর প্রভৃতি পশুদেরও মানুষদের থেকে অধিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের সুযোগ রয়েছে। মুক্তি ব্যতীত, ধর্ম, অর্থ, ও কাম—জীবনের এই প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির কথা যদি আমরা বিবেচনা করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে, সেগুলি সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। তাই আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, কেউ একজন রয়েছেন, যিনি এই বিভিন্ন স্তরগুলি নির্ধারণ করছেন। চরমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেবল মুক্তির জন্যই ভগবানের উপর নির্ভর করতে হবে তা নয়, জীবনের সাধারণ প্রয়োজনগুলির জন্যও ভগবানের উপর নির্ভর করতে হয়। পৃথু মহারাজ তাই ইঙ্গিত করেছেন যে, ধনী পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ সুখী হয় না। তেমনই, মূল্যবান ওষুধ ও সুদক্ষ চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও রোগীর মৃত্যু হয়; অথবা নিরাপদে বড় নৌকায় থাকা সত্ত্বেও মানুষ জলে ডুবে মারা যায়। এইভাবে আমরা প্রকৃতি প্রদত্ত বাধা-বিপত্তিগুলি প্রতিহত করার জন্য সংগ্রাম করতে পারি, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত আমাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হবে না।

শ্লোক ৩১

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ৩১ ॥

যৎ-পাদ—যাঁর চরণকমল; **সেবা**—সেবা; **অভিরুচিঃ**—রুচি; **তপস্বিনাম্**—তপস্বীদের, **অশেষ**—অসংখ্য; **জন্ম**—জন্ম; **উপচিতম্**—গ্রহণ করে; **মলম্**—মল; **ধিয়ঃ**—মন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **ক্ষিণোতি**—ধ্বংস করে; **অন্বহম্**—প্রতিদিন; **এধতী**—বৃদ্ধি করে; **সতী**—হয়ে; **যথা**—যেমন; **পদ-অঙ্গুষ্ঠ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলি; **বিনিঃসৃতা**—বিনির্গত; **সরিৎ**—জল।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার অভিরুচির ফলে, দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষ অন্তহীন জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কলুষ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ থেকে উদ্ভূত গঙ্গার জলের মতো এই পন্থা তৎক্ষণাৎ মনকে নির্মল করে, এবং তার ফলে তার পারমার্থিক চেতনা বা কৃষ্ণভক্তি ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে দেখা যায় যে, যাঁরা নিয়মিত গঙ্গা স্নান করেন, তাঁরা প্রায় সব রকম রোগ থেকে মুক্ত থাকেন। কলকাতার একজন অত্যন্ত সম্মানীয় ব্রাহ্মণ কখনও ডাক্তারের ওষুধ খেতেন না। কখনও যদি তাঁর অসুখ হত, তা হলে তিনি ওষুধ না খেয়ে কেবল গঙ্গাজল পান করতেন, এবং তার ফলে অতি শীঘ্র তাঁর রোগ নিরাময় হত। গঙ্গার মহিমা সমস্ত ভারতবাসীরা অবগত। গঙ্গানদী কলকাতার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কখনও কখনও গঙ্গার জলে মল ও নিকটবর্তী কলকারখানা থেকে পরিত্যক্ত অন্যান্য সমস্ত ময়লা দেখা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করেন, এবং তাঁরা শারীরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত সুস্থ এবং পারমার্থিক দিক দিয়েও অত্যন্ত উন্নত। সেটিই হচ্ছে গঙ্গার জলের প্রভাব। গঙ্গার এই মাহাত্ম্যের কারণ হচ্ছে যে, তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। তেমনই, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা গ্রহণ করেন অথবা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অন্তহীন জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যান। আমরা দেখেছি যে, পূর্বে যাঁদের জীবন অত্যন্ত কলুষিত ছিল, কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করার ফলে, তাঁরা তাঁদের সমস্ত কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন এবং অতি দ্রুত পারমার্থিক উন্নতি লাভ করছেন। পৃথু মহারাজ তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত তথাকথিত নৈতিকতা, অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা যায় না। তাই ভগবানের সেবা করা বা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা উচিত, এবং তার ফলে অচিরেই একজন আদর্শ মানুষে পরিণত হওয়া যায়, এবং সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি* । একজন দায়িত্বশীল রাজা হওয়ার ফলে, পৃথু মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, সকলেই যেন পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, কেবল তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন শরণাগত আত্মার সমস্ত পাপের ফল তৎক্ষণাৎ দুর করে দেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, ভগবানের কৃপার মূর্ত-প্রকাশ শ্রীগুরুদেবও শিষ্যের দীক্ষার সময়, শিষ্যের পাপপূর্ণ জীবনের সমস্ত কর্মফল গ্রহণ করেন। এইভাবে শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবের দেওয়া নির্দেশ অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি পবিত্র থাকেন এবং জড়া প্রকৃতির কলুষের দ্বারা কলুষিত হন না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের সমস্ত পাপকর্মের ফল গ্রহণ করেন। কখনও কখনও গুরুদেব তাঁর শিষ্যের পাপের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে স্বয়ং এক প্রকার কষ্টভোগ করেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অধিক শিষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

শ্লোক ৩২

বিনির্ধুতাশেষমনোমলঃ পুমা-
নসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্যবান্ ।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুনর্
ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥ ৩২ ॥

বিনির্ধুত—বিশেষরূপে ধৌত হয়ে; **অশেষ**—অন্তহীন; **মনঃ-মলঃ**—মনোধর্মের কলুষ; **পুমান্**—পুরুষ; **অসঙ্গ**—বিরক্ত হয়ে; **বিজ্ঞান**—বিজ্ঞানসম্মতভাবে; **বিশেষ**—বিশেষরূপে; **বীর্যবান্**—ভক্তিযোগের বলে বলীয়ান হয়ে; **যৎ**—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি**—শ্রীপাদপদ্ম; **মূলে**—মূলে; **কৃত-কেতনঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **ন**—কখনই না; **সংসৃতিম্**—সংসার; **ক্লেশ-বহাম্**—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ; **প্রপদ্যতে**—গ্রহণ করে।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা অথবা মনোধর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হন, এবং তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ভক্তিযোগের অনুশীলনের প্রভাবে বীর্যবান হওয়ার ফলেই কেবল তা সম্ভব হয়। একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মমূলের আশ্রয় গ্রহণ করলে, সেই ভক্তকে আর কখনও ত্রিতাপ দুঃখ-সমন্বিত এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শিক্ষাষ্টকে* বলেছেন যে, ভগবানের পবিত্র নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন, অথবা ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা চিত্ত ধীরে ধীরে সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। অনাদিকাল ধরে জড় জগতের সঙ্গ প্রভাবে, আমাদের চিত্তে

স্তূপীকৃত আবর্জনা সঞ্চিত হয়েছে। তার পূর্ণ প্রভাব তখনই দেখা যায়, যখন জীব তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার ফলে জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, আর এই দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সে জন্মমৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়। কেউ যখন ভক্তিযোগের বলে বলীয়ান হয়, তখন তার মন এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়, এবং তখন আর তার এই সংসারের প্রতি অথবা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না।

ভক্তির লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞান ও বৈরাগ্য। জীব যে তার স্বরূপে তার শরীর নয়, সেটিই হচ্ছে জ্ঞান, এবং বৈরাগ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি অনীহা। ভক্তিযোগের বলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এই দুটি মৌলিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এইভাবে ভক্ত যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় স্থির হন, তখন তাঁর দেহত্যাগের পর, এই জড় জগতে তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন—*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*।

এই শ্লোকে *বিজ্ঞান* শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জীব যখন তার দেহকে আর তার স্বরূপ বলে মনে করে না, তখন চিন্ময় স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয়। *ভগবদ্গীতায়* সেই জ্ঞানের বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, *ব্রহ্মভূত* বা চিন্ময় উপলব্ধির বিকাশ। জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় জীব চিন্ময় উপলব্ধি লাভ করতে পারে না, কারণ সে তখন জড়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের পরিচয় অনুভব করে। জড় জগৎ ও চিৎ জগতের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করাকে বলা হয় জ্ঞান। জ্ঞানের স্তর বা *ব্রহ্মভূত* স্তরে আসার পর, জীব ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়। সেই স্তরে সে পূর্ণরূপে তার নিজের স্থিতি ও পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সেই উপলব্ধিকে এখানে *বিজ্ঞান-বিশেষ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভগবান বলেছেন যে, তাঁর জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন ভগবৎ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হন, তখন তাঁর মুক্তি সুনিশ্চিত। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞানকে *প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যম্*, অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা ধর্মতত্ত্বের উপলব্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভক্তিযোগ অনুশীলনের দ্বারা মানুষ তার পারমার্থিক জীবনের উন্নতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি অন্যান্য পন্থার অনুশীলনের দ্বারা নিজের উন্নতির বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না, কিন্তু ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষভাবে নিজের পারমার্থিক উপলব্ধি দর্শন করা যায়, ঠিক যেমন আহার করলে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও তৃপ্তি অনুভব করা যায়। রজ ও তমোগুণের প্রভাবে জীব ভ্রান্তভাবে

এই জড় জগৎকে উপভোগ করতে চায় এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়, কিন্তু ভক্তিযোগের প্রভাবে এই দুটি প্রবণতার ক্ষয় হয় এবং জীব সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণ অতিক্রম করে জীব শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়, যা জড় গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। এইভাবে অবস্থিত হওয়ার ফলে জীবের আর কোন সন্দেহ থাকে না। সে বুঝতে পারে যে, তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে না।

শ্লোক ৩৩

তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভি-
র্মনোবচঃকায়গুণৈঃ স্বকর্মভিঃ
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যূয়ম্**—তোমরা, সমস্ত প্রজারা; **ভজত**—আরাধনা করে; **আত্ম**—নিজের; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তির দ্বারা, **মনঃ**—মন; **বচঃ**—বাণী; **কায়**—দেহ; **গুণৈঃ**—বিশেষ গুণাবলীর দ্বারা, **স্ব-কর্মভিঃ**—বৃত্তিগত কর্মের দ্বারা; **অমায়িনঃ**—নিষ্কপটে; **কাম-দুঘ**—সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করে; **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **যথা**—যতদূর সম্ভব, **অধিকার**—যোগ্যতা, **অবসিত-অর্থ**—সম্পূর্ণরূপে নিজের হিত সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে; **সিদ্ধয়ঃ**—তৃপ্তি।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর প্রজাদের উপদেশ দিলেন—তোমাদের কায়মনোবাক্য এবং তোমাদের বৃত্তিগত কর্মের ফল অর্পণ করার দ্বারা সর্বদা উদার চিত্তে ভগবানের সেবা কর। তোমাদের যোগ্যতা ও বৃত্তি অনুসারে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে, নিষ্কপটে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত হও। তা হলে তোমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্যসাধনে তোমরা সফল হবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, *স্ব কর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য*—নিজের বৃত্তিগত কর্মের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে হবে। সেই জন্য চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের পদ্ধতি স্বীকার করা আবশ্যক। পৃথু মহারাজ তাই বলেছেন,

গুণৈঃ স্ব-কর্মভিঃ। এই পদাংশটির ব্যাখ্যা *ভগবদ্গীতায়* করা হয়েছে। *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"জড়া প্রকৃতির গুণ এবং সেই সমস্ত গুণে সম্পাদিত বিশিষ্ট কর্তব্যকর্ম অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান এই চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) সৃষ্টি করেছেন।" সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত যে-ব্যক্তি, তিনি নিশ্চিতভাবে অন্যদের থেকে অধিকতর বুদ্ধিমান। তাই তিনি সত্য ভাষণ, ইন্দ্রিয় সংযম, মনোসংযম, শুচিতা, সহিষ্ণুতা, আত্মজ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব—এই সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপ অনুশীলন করতে পারেন। এইভাবে কেউ যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধন করতে পারেন। তেমনই ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা, দান করা, নিষ্ঠা সহকারে রাজকার্যে বৈদিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করতে নির্ভীক থাকা। ক্ষত্রিয় এইভাবে তাঁর বৃত্তিগত কর্ম সম্পাদনের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারেন। তেমনই, বৈশ্য তাঁর বৃত্তি সম্পাদনের দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, গো রক্ষা করে এবং যখন অতিরিক্ত কৃষি উৎপাদন হয়, তখন প্রয়োজন হলে বিনিময় করে ব্যবসা করার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারেন। তেমনই, শূদ্রেরা যেহেতু যথেষ্ট বুদ্ধিমান নয়, তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের উচ্চবর্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া। সকলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মনকে নিয়োজিত করে, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা, তার বাণীকে সর্বদা ভগবানের প্রার্থনা নিবেদনে অথবা ভগবানের মহিমা প্রচারে যুক্ত করা, এবং তার দেহকে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য ভগবানের সেবা সম্পাদনে যুক্ত করা। আমাদের শরীরে যেমন মস্তক, বাহু, উদর ও পা—এই চারটি অঙ্গ রয়েছে, তেমনই, মানব-সমাজরূপী শরীরকেও গুণ ও কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান মানুষদের মস্তকের কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, ক্ষত্রিয়দের বাহুর কার্য সম্পাদন করতে হয়, বৈশ্যদের উদরের কার্য সম্পাদন করতে হয় এবং শূদ্রদের পায়ের কার্য সম্পাদন করতে হয়। জীবনের এই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে কেউই উচ্চ নয় অথবা নীচ নয়; বর্ণবিভাগে উচ্চ ও নীচ বিচার রয়েছে, কিন্তু যেহেতু সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে এক—পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা—তাই তাদের মধ্যে কোন ভেদ নেই।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভগবান যেহেতু ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদেরও পূজ্য, তা হলে এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষ কিভাবে তাঁর সেবা করবে? সেই কথা পৃথু মহারাজ *যথাধিকার,* 'নিজের যোগ্যতা অনুসারে' শব্দটির দ্বারা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন,

তা হলেই যথেষ্ট হবে। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা রামানুজাচার্যের মতো হওয়ার প্রয়োজন নেই, যাঁদের ক্ষমতা নিশ্চিতভাবেই আমাদের থেকে অনেক উর্ধ্বে। কোনও শূদ্র পর্যন্ত, যে প্রকৃতির গুণ অনুসারে জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্টতম স্তরে অধিষ্ঠিত, সেই একই সাফল্য লাভ করতে পারে। নিষ্কপটে ভগবানের সেবা করে, যে-কোন ব্যক্তি সার্থক হতে পারেন। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সরল ও উদার হওয়া অবশ্য কর্তব্য *(অমায়িনঃ)*। ভগবদ্ভক্তিতে সাফল্য লাভের জন্য জীবনের নিম্নস্তরে স্থিত হওয়া কোন অযোগ্যতা নয়। তিনি ব্রাহ্মণ হোন, ক্ষত্রিয় হোন, বৈশ্য হোন অথবা শূদ্রই হোন না কেন, তাঁর একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে সরলতা, উদারতা ও নিষ্কপটতা। তখন, উপযুক্ত সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করার দ্বারা তিনি জীবনের চরম সাফল্য লাভ করতে পারেন। ভগবান নিজেই যে কথা প্রতিপন্ন করেছেন, *স্ত্রীয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্* (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/৩২)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা পতিতা স্ত্রী, তিনি যাই হোন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না কেউ যদি তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধির দ্বারা কার্য করার মাধ্যমে নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তা হলে তিনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করে, তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে এখানে *কামদুঘাঙ্‌ঘ্রি-পঙ্কজম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ সকলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করার সমস্ত শক্তি তাঁর রয়েছে। ভগবদ্ভক্ত এই জীবনেও সুখী, কারণ তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক অভাবগুলি পূর্ণ হয়, এবং চরমে তিনি যখন তাঁর দেহ ত্যাগ করেন, তখন তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৩৪

অসাবিহানেকগুণোঽগুণোঽধ্বরঃ
পৃথগ্বিধদ্রব্যগুণক্রিয়োক্তিভিঃ ।
সম্পদ্যতেঽর্থাশয়লিঙ্গনামভি-
র্বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ ॥ ৩৪ ॥

অসৌ—পরমেশ্বর ভগবান; **ইহ**—এই জড় জগতে; **অনেক**—বিবিধ; **গুণঃ**—গুণাবলী; **অগুণঃ**—দিব্য; **অধ্বরঃ**—যজ্ঞ; **পৃথক্‌ বিধ**—বিবিধ প্রকার; **দ্রব্য**—ভৌতিক তত্ত্ব; **গুণ**—উপাদান; **ক্রিয়া**—অনুষ্ঠান; **উক্তিভিঃ**—বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা;

সম্পদ্যতে—পূজিত হন; **অর্থ**—স্বার্থ; **আশয়**—উদ্দেশ্য; **লিঙ্গ**—রূপ; **নামভিঃ**—নাম; **বিশুদ্ধ**—নিষ্কলুষ; **বিজ্ঞান**—বিজ্ঞান; **ঘনঃ**—ঘনীভূত; **স্ব-রূপতঃ**—তাঁর স্বরূপে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় এবং তিনি জড় জগতের দ্বারা কলুষিত নন। যদিও তিনি হচ্ছেন জড় বৈচিত্র্যবিহীন ঘনীভূত আত্মা, তবুও তিনি বিবিধ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, সংকল্প, দ্রব্যশক্তি ও নাম দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ বদ্ধ জীবদের মঙ্গলের জন্য স্বীকার করেন।

তাৎপর্য

জাগতিক উন্নতি লাভের জন্য *বেদে* বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের নির্দেশ রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৩/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রহ্মা মানুষ, দেবতা আদি সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের জাগতিক বাসনা অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দিয়েছেন *(সহ-যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা)*। এই সমস্ত অনুষ্ঠানকে যজ্ঞ বলা হয়, কারণ তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান করা। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগতিক লাভ প্রাপ্ত হওয়া, কিন্তু সেই সঙ্গে যেহেতু তার লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা, তাই *বেদে* এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে কর্মকাণ্ড বা জাগতিক কার্যকলাপ, এবং সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপই জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা কলুষিত। সাধারণত কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদিত হয় রজোগুণে, তবুও বদ্ধ জীবেরা, মানুষ ও দেবতা উভয়েরই এই সমস্ত যজ্ঞ করা কর্তব্য, কারণ তা না হলে তারা মোটেই সুখী হতে পারবে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলি কলুষিত হলেও তাতে কিছু না কিছু ভগবদ্ভক্তি থাকে, কারণ যখনই কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, তখন তার কেন্দ্রে থাকেন বিষ্ণু। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্বল্প প্রচেষ্টাও ভক্তি এবং তা অত্যন্ত মূল্যবান। ভক্তির লেশমাত্রও অনুষ্ঠাতার জড় প্রবৃত্তি শুদ্ধ করে এবং ধীরে ধীরে তা চিন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকার যজ্ঞ জড়-জাগতিক কার্য হলেও তার ফল চিন্ময়। সূর্যযজ্ঞ, ইন্দ্রযজ্ঞ, চন্দ্রযজ্ঞ ইত্যাদি বিভিন্ন দেবতাদের নামে অনুষ্ঠিত হলেও, সেই সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের দেহের অংশ। এই সমস্ত দেবতারা যজ্ঞের নৈবেদ্য নিজেরা গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁরা তা গ্রহণ করেন পরমেশ্বর ভগবানের জন্য, ঠিক যেমন কর সংগ্রাহক তাঁর নিজের জন্য কর

সংগ্রহ করতে পারেন না, তিনি তা সংগ্রহ করেন সরকারের জন্য। যে-কোন যজ্ঞ যখন এইভাবে পূর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধি-সহ অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাকে *ভগবদ্‌গীতায় ব্রহ্মার্পণম্‌* অথবা ভগবানে অর্পিত যজ্ঞ বলা হয়েছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ যজ্ঞফল ভোগ করতে পারেন না, তাই ভগবান বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের প্রকৃত ভোক্তা (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌*)। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/২৪) বলা হয়েছে—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্‌ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥

"যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হবেন, কারণ তিনি ব্রহ্মরূপ ক্রিয়াপরায়ণ, যাতে ব্রহ্মই হচ্ছেন অগ্নিরূপী গতি এবং অর্পিত হবিও ব্রহ্মসম।" যজ্ঞকর্তাকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, *বেদে* যে-সমস্ত যজ্ঞের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। *বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থাঃ* (*বিষ্ণুপুরাণ* ৩/৮/৯)। পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যা কিছু করা হয়, তা জড় হোক অথবা চিন্ময় হোক, বাস্তবিকপক্ষে তাকে যজ্ঞ বলে মনে করতে হবে, এবং এইভাবে যজ্ঞ করার ফলে, ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়। ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যক্ষ পন্থা হচ্ছে নবধা ভক্তি—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩)

এই নবধা ভক্তিকে এই শ্লোকে *বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-ঘনঃ*, অর্থাৎ, ভগবান বিষ্ণুর রূপে দিব্যজ্ঞান কেন্দ্রীভূত করে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু যিনি সরাসরিভাবে এই পন্থা গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁর উচিত পরোক্ষভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। তাই বিষ্ণুকে বলা হয় যজ্ঞপতি। *শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্‌* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৯/১৫)।

পরমেশ্বর ভগবানের গভীর বিজ্ঞান অত্যন্ত ঘনীভূত। যেমন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ভাসাভাসা-ভাবে কিছু জানে, কিন্তু চিকিৎসকেরা সঠিকভাবে জানে না শরীরের সব কিছু হচ্ছে কিভাবে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সব কিছুই বিস্তারিতভাবে জানেন। তাই তাঁর জ্ঞান হচ্ছে *বিজ্ঞান ঘন*, কারণ তাতে জড় বিজ্ঞানের মতো কোন ত্রুটি নেই।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-ঘন;* তাই, যদিও তিনি জড় কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ গ্রহণ করেন, তবুও তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। তাই পরমেশ্বর ভগবানের *অনেক-গুণ* বলতে তাঁর বহু দিব্য গুণাবলীকে বোঝানো হয়, কারণ তিনি জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। বিভিন্ন প্রকার জড় সামগ্রী বা ভৌতিক উপাদান ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পর্যবসিত হয়, কারণ চরমে জড় ও চেতন গুণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ সব কিছুই পরম চেতন পবমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। উপলব্ধি ও শুদ্ধতার ক্রমোন্নতির ফলে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ, যিনি জড়-জাগতিক লাভের জন্য বনে গিয়ে তপস্যা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু চরমে তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করেছিলেন এবং তখন আর জড়-জাগতিক লাভের জন্য বর গ্রহণ করতে চাননি। তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। *আশয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সংকল্প'। সাধারণত যে-কোন বদ্ধ জীবের জড়-জাগতিক লাভের সংকল্প থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত জড়-জাগতিক লাভের বাসনাগুলি যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে তৃপ্ত হয়ে যায়, তখন তিনি ধীরে ধীরে চিন্ময় স্তব লাভ করেন। তখন তাঁর জীবন সার্থক হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

মানুষ অকাম (ভক্ত), সর্বকাম (কর্মী) অথবা মোক্ষকাম (জ্ঞানী বা যোগী) যাই হোক না কেন, সকলকেই ভক্তিযোগের প্রত্যক্ষ পন্থার দ্বারা পরমেশ্বব ভগবানের আরাধনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এইভাবে জড় ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার লাভই একসঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৫

প্রধানকালাশয়ধর্মসংগ্রহে
শরীর এষ প্রতিপদ্য চেতনাম্ ।
ক্রিয়াফলত্বেন বিভুর্বিভাব্যতে
যথানলো দারুষু তদ্গুণাত্মকঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রধান—জড়া প্রকৃতি; **কাল**—কাল; **আশয়**—বাসনা; **ধর্ম**—বৃত্তিগত ধর্ম; **সংগ্রহে**—সমষ্টি; **শরীরে**—দেহ; **এষঃ**—এই; **প্রতিপদ্য**—স্বীকার করে; **চেতনাম্**—চেতনা;

ক্রিয়া—কার্যকলাপ; **ফলত্বেন**—ফলের দ্বারা; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিভাব্যতে**—প্রকাশিত; **যথা**—যেমন; **অনলঃ**—অগ্নি; **দারুষু**—কাষ্ঠে; **তৎ-গুণ-আত্মকঃ**—আকৃতি ও গুণ অনুসারে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপ্ত, কিন্তু জড়া প্রকৃতি, কাল, বাসনা ও বৃত্তিগত ধর্মের সমন্বয়ে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার শরীরেও তিনি প্রকাশিত। একই অগ্নি যেমন বিভিন্ন আকার ও আয়তনের কাষ্ঠখণ্ডে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনই বিভিন্ন প্রকার চেতনার বিকাশ হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক জীবের সঙ্গে পরমাত্মারূপে নিরন্তর বিরাজ করেন। প্রতিটি জীব প্রকৃতি প্রদত্ত জড় শরীর অনুসারে সচেতন। জড় উপাদানগুলি কালের প্রভাবে সক্রিয় হয়, এবং তার ফলে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির তিন গুণের সঙ্গ প্রভাবে জীব এক বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। পশুজীবনে তমোগুণের প্রভাব এতই প্রবল যে, তাদের পক্ষে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে, যদিও তিনি পশুদের হৃদয়েও বিরাজমান; কিন্তু মনুষ্য-শরীরে চেতনা উন্নত হওয়ার ফলে, মানুষ তার কার্যকলাপের প্রভাবে *(ক্রিয়া-ফলত্বেন)* তম ও রজোগুণ অতিক্রম করে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে পারে। মানুষকে তাই উন্নত স্তরের সাধুর সঙ্গ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *বেদে* (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/২/১২) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*— জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অথবা প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। গুরুম্ *এবাভিগচ্ছেৎ*— এটি একটি অবশ্য কর্তব্য; তাতে ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন অবকাশ নেই। গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ তাঁর সঙ্গ প্রভাবে জীবের ভগবৎ-চেতনা বিকশিত হতে থাকে। এই প্রকার চেতনার বিকাশের সর্বোচ্চ পূর্ণতার স্তরকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। প্রকৃতি যে-রকম শরীর প্রদান করে, সেই অনুসারে চেতনা প্রকাশ পায়, এবং যেভাবে চেতনা বিকশিত হতে থাকে, সেই অনুসারে জীব কার্য করে, এবং সেই কার্যের শুদ্ধতা অনুসারে প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। এখানে যে-দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। অগ্নি সর্বদাই এক, কিন্তু ইন্ধনের আয়তন অনুসারে অগ্নি সোজা, বাঁকা, ছোট, বড়, ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হয়।

চেতনার বিকাশ অনুসারে ভগবানকে উপলব্ধি কবা যায়। তাই, যারা মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার তপস্যা (কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যোগ পদ্ধতি একটি সিঁড়ির মতো, সর্বোচ্চ স্তরে ওঠার জন্য বিভিন্ন ধাপ রয়েছে, এবং সেই ধাপ অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ অথবা ভক্তিযোগের স্তরে অবস্থিত। ভক্তিযোগ অবশ্য ভগবৎ উপলব্ধির সিঁড়ির সর্বোচ্চ স্তর। অর্থাৎ, চেতনার বিকাশ অনুসারে জীব তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন, এবং তাঁর সেই স্বরূপ উপলব্ধি যখন পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তখন তিনি অন্তহীন ব্রহ্মানন্দে অধিষ্ঠিত হন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত সংকীর্তন আন্দোলনই হচ্ছে পবমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার সব চাইতে সহজ ও সরল পন্থা। এই পন্থাকে বলা হয় কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণভাবনার অমৃত। পরমেশ্বর ভগবানের পরম উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান কবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন করেছেন—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* (*ভগবদ্‌গীতা* ৪/১১)। শরণাগতির মাত্রা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। পূর্ণ সমর্পণ তখনই হয়, যখন মানুষ পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হন। *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে* (*ভগবদ্‌গীতা* ৭/১৯)।

শ্লোক ৩৬

অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং
হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরম্ ।
স্বধর্মযোগেন যজন্তি মামকা
নিরন্তরং ক্ষোণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অহো—তোমরা সকলে; **মম**—আমাকে, **অমী**—তারা সকলে; **বিতরন্তি**—বিতরণ করে; **অনুগ্রহম্**—কৃপা; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গুরুম্**—পরম গুরু; **যজ্ঞ-ভুজাম্**—যজ্ঞভাগ গ্রহণের যোগ্য সমস্ত দেবতাগণ; **অধীশ্বরম্**—পরম ঈশ্বর; **স্ব-ধর্ম**—বৃত্তিগত ধর্ম; **যোগেন**—দ্বাবা; **যজন্তি**—পূজা করে; **মামকাঃ**—আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; **নিরন্তরম্**—নিরন্তর; **ক্ষোণি-তলে**—ভূপৃষ্ঠে; **দৃঢ়-ব্রতাঃ**—দৃঢ় সংকল্প সমন্বিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞফলের ঈশ্বর এবং ভোক্তা। তিনি পরম গুরুও। এই ভূমণ্ডলে সমস্ত প্রজারা যাঁরা আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যাঁরা স্বধর্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করছেন, তাঁরা আমার প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রদান করছেন। অতএব, হে প্রজাগণ! আপনাদের ধন্যবাদ।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করার জন্য প্রজাদের প্রতি পৃথু মহারাজের উপদেশ এখানে দুইরূপে সমাপ্ত হয়েছে। যারা নবীন ভক্ত তাদের তিনি বার বার বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু এখানে তিনি সেই ভক্তদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন, যাঁরা ইতিমধ্যেই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে পরম গুরু ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত। এখানে বিশেষভাবে *গুরুম্* শব্দটির উল্লেখ চৈত্য গুরুরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে ইঙ্গিত করে। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তিনি সর্বদাই জীবকে তাঁর শরণাগত হয়ে প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন; তাই তিনি হচ্ছেন আদি গুরু। তিনি অন্তরে ও বাইরে গুরুরূপে নিজেকে প্রকাশ করে উভয়ভাবে বদ্ধ জীবদের সাহায্য করেন। তাই এখানে তাঁকে *গুরুম্* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বোঝা যায় যে, পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে ভূমণ্ডলের সমস্ত মানুষ ছিলেন তাঁর প্রজা। তাঁদের অধিকাংশই, প্রায় সকলেই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ছিলেন। তাই তাঁদের ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকার ফলে, এবং এইভাবে তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য, তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পক্ষান্তরে, যে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা ও রাষ্ট্রপ্রধান পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করেন এবং তার ফলে উভয়েই লাভবান হন।

শ্লোক ৩৭

মা জাতু তেজঃ প্রভবেম্মহর্দ্ধিভি-
স্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ ।
দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং
কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্ দ্বিজানাম্ ॥ ৩৭ ॥

মা—কখনও কর না; **জাতু**—কোন সময়; **তেজঃ**—পরম শক্তি; **প্রভবেৎ**—প্রদর্শন করে; **মহা**—মহান; **ঋদ্ধিভিঃ**—ঐশ্বর্যের দ্বারা, **তিতিক্ষয়া**—সহিষ্ণুতার দ্বারা, **তপসা**—তপশ্চর্যা; **বিদ্যয়া**—বিদ্যার দ্বারা, **চ**—ও; **দেদীপ্যমানে**—যাঁরা ইতিমধ্যেই মহিমান্বিত; **অজিত-দেবতানাম্**—বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত; **কুলে**—সমাজে; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **রাজ-কুলাৎ**—রাজ-পরিবার থেকেও শ্রেষ্ঠ, **দ্বিজানাম্**—ব্রাহ্মণদের।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তাঁদের সহিষ্ণুতা, তপস্যা, জ্ঞান ও বিদ্যার বলে মহিমান্বিত হন। এই সমস্ত দিব্য সম্পদের প্রভাবে বৈষ্ণবেরা রাজকুল থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, রাজকুল যেন কখনও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের উপর তাদের বিক্রম প্রদর্শন না করে এবং কখনও তাঁদের চরণে অপরাধ না করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে রাজা ও প্রজা উভয়েরই জন্য পৃথু মহারাজ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করেছেন। এখন তিনি বিশ্লেষণ করছেন কিভাবে নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তিকে একটি লতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। লতার কাণ্ড কোমল এবং তাই বর্ধিত হওয়ার জন্য তার একটি বৃক্ষের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, এবং বর্ধিত হওয়ার সময় যথেষ্ট সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। এই সুরক্ষার কথা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন। কেউ যদি বৈষ্ণব অপরাধ করে, তা হলে ভগবদ্ভক্তিতে তার প্রগতি প্রতিহত হয়। ভক্তিমার্গে অত্যন্ত উন্নত হলেও, বৈষ্ণব অপরাধের ফলে তার সমস্ত উন্নতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। শাস্ত্রে দেখা যায় যে, একজন অতি মহান যোগী দুর্বাসা মুনি বৈষ্ণব অপরাধ করেছিলেন, এবং সেই অপরাধ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য তাঁকে পুরো এক বছর ধরে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল, এমন কি তাঁকে বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি যখন বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের কাছে যান, তখন ভগবানও তাঁকে রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। অতএব বৈষ্ণব চরণে অপরাধ সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। সব চাইতে গর্হিত বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে *গুর্বপরাধ,* বা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ। দশবিধ নাম অপরাধের মধ্যে এই *গুর্বপরাধ* সব চাইতে গর্হিত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। *গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনম্* (*পদ্মপুরাণ*)। দশবিধ নাম অপরাধের মধ্যে

সবচাইতে গর্হিত অপরাধ হচ্ছে শ্রীগুরুদেবকে অবজ্ঞা করা এবং বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা করা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সরল ভাষায় বৈষ্ণবের সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন—যাঁর দর্শন মাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হয়, তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। এই শ্লোকে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ উভয়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। বৈষ্ণব হচ্ছেন তত্ত্ববেত্তা ব্রাহ্মণ এবং তাই তাঁকে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অথবা বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ বলা হয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণ শুদ্ধ বৈষ্ণব নাও হতে পারেন। কেউ যখন তাঁর শুদ্ধ পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, *ব্রহ্ম জানাতি,* তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ স্তরে পরমতত্ত্বের উপলব্ধি প্রধানত নির্বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে হয়। কিন্তু, ব্রাহ্মণ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি বৈষ্ণব হন। বৈষ্ণব স্তর ব্রাহ্মণ স্তরেরও ঊর্ধ্বে। জড়-জাগতিক ধারণা অনুসারে, মানব-সমাজে ব্রাহ্মণের স্তর সর্বোচ্চ, কিন্তু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও ঊর্ধ্বে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব উভয়েই পারমার্থিক দিক দিয়ে উন্নত। ব্রাহ্মণের গুণাবলী সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে—সত্য, শৌচ, মনের সাম্য, ইন্দ্রিয় সংযম, সহিষ্ণুতা, সরলতা, তত্ত্বজ্ঞান, শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস, এবং নিজের জীবনে ব্যবহারিকভাবে এই সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর প্রয়োগ। এই সমস্ত গুণের অতিরিক্ত, কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি বৈষ্ণব হন। পৃথু মহারাজ তাঁর ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ প্রজাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না করেন। তাঁদের চরণে অপরাধ এতই ভয়ঙ্কর যে, সেই অপরাধের ফলে শ্রীকৃষ্ণের বংশোদ্ভূত যাদবেরা পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ কখনও সহ্য করতে পারেন না। কখনও কখনও রাজপুরুষেরা অথবা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা তাদের ক্ষমতার গর্বে উদ্ধত হয়ে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের উপেক্ষা করে, তারা জানে না যে, তাদের সেই অপরাধের ফলে তাদের সর্বনাশ হবে।

শ্লোক ৩৮

ব্রহ্মণ্যদেবঃ পুরুষঃ পুরাতনো
নিত্যং হরির্যচ্চরণাভিবন্দনাৎ ।
অবাপ লক্ষ্মীমনপায়িনীং যশো
জগৎপবিত্রং চ মহত্তমাগ্রণীঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মণ্য-দেবঃ—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভু; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরাতনঃ**—সর্বপ্রাচীন, **নিত্যম্**—নিত্য; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যৎ**—যাঁর; **চরণ**—চরণ কমল; **অভিবন্দনাৎ**—পূজার দ্বারা; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **লক্ষ্মীম্**—ঐশ্বর্য, **অনপায়িনীম্**—নিরন্তর; **যশঃ**—খ্যাতি, **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **চ**—ও; **মহৎ**—মহান; **তম**—পরম; **অগ্রণীঃ**—অগ্রগণ্য.

অনুবাদ

পুরাতন, শাশ্বত ও সমস্ত মহা-পুরুষদের অগ্রণী পরমেশ্বর ভগবান ভুবন-পাবন যশরূপী ঐশ্বর্য লাভ করেছেন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মের উপাসনার দ্বারা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *ব্রহ্মণ্যদেব* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ব্রহ্মণ্য* বলতে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বোঝায়, এবং *দেব* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূজনীয় ভগবান'। সুতরাং, বৈষ্ণব অথবা সত্ত্বগুণের (ব্রাহ্মণরূপে) সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। তম ও রজোগুণের নিম্ন অবস্থায় ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা বা অনুভব করা অত্যন্ত কঠিন। তাই ভগবানকে এখানে ব্রহ্মণ্য ও বৈষ্ণব সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আরাধ্য দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

(*বিষ্ণুপুরাণ* ১/১৯/৬৫)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ও গাভীদের প্রধান রক্ষক। তা না জেনে এবং তার সম্মান না করে, ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, এবং সেই জ্ঞান ব্যতীত কোনও কল্যাণকর কার্য বা মানবতাবাদী প্রচার সফল হতে পারে না। ভগবান হচ্ছেন পুরুষ বা পরম ভোক্তা। এমন নয় যে, তিনি যখন অবতার রূপে প্রকট হন তখনই তিনি কেবল ভোক্তা, পক্ষান্তরে তিনি অনাদি কাল ধরে ভোক্তা, অর্থাৎ শুরু থেকে *(পুরাতনঃ)* এবং নিত্যকাল ধরে *(নিত্যম্)* তিনি ভোক্তা। *যচ্চরণাভিবন্দনাৎ*—পৃথু মহারাজ বলেছেন, পরমেশ্বর ভগবান কেবল ব্রাহ্মণদের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার ফলে, নিত্য যশরূপ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবানকে জাগতিক লাভের জন্য কিছুই করতে হয় না। যেহেতু তিনি পরম পূর্ণ, তাই তাঁর কোন কিছুর আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করে তিনি ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছেন। এগুলি তাঁর দৃষ্টান্তসূচক কার্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ছিলেন, তখন তিনি নারদ মুনির শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। সুদামা বিপ্র যখন তাঁর গৃহে এসেছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর পা ধুয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের শয্যায় তাঁকে বসতে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে ও কুন্তীদেবীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। ভগবানের এই আদর্শ আচরণ আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাঁর এই ব্যক্তিগত আচরণ থেকে আমাদের শিক্ষালাভ করতে হবে, কিভাবে গাভীদের রক্ষা করতে হয়, কিভাবে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে হয় এবং কিভাবে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধা করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২১) ভগবান বলেছেন, *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*—"নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেভাবে আচরণ করেন, অন্যেরা আপনা থেকে তা অনুসরণ করে।" পরমেশ্বর ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কে হতে পারেন, এবং কার আচরণ অধিক আদর্শময় হতে পারে? এমন নয় যে, জড় জাগতিক লাভের জন্য তাঁকে এগুলি করতে হয়েছিল। তিনি এইভাবে আচরণ করেছিলেন, কারণ জড় জগতে কিভাবে আচরণ করা উচিত, কেবল আমাদের সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *মহত্তম-অগ্রণীঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় জগতে *মহত্তম* বা মহান ব্যক্তিরা হচ্ছেন ব্রহ্মা ও শিব, কিন্তু ভগবান তাঁদেরও ঊর্ধ্বে। *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতের সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর বীর্য, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর জ্ঞান, তাঁর বৈরাগ্য ও তাঁর যশ সবই *জগৎ-পবিত্রম্* অর্থাৎ জগৎ-পবিত্রকারী। তাঁর ঐশ্বর্য আমরা যতই আলোচনা করি, এই জগৎ ততই পবিত্র হয়। জড় জগতে বিষয়াসক্ত মানুষদের যে ঐশ্বর্য তা কখনই স্থির নয়—এই জগতে লক্ষ্মী চঞ্চলা। আজকে যে অত্যন্ত ধনী, কাল সে দরিদ্র হয়ে যেতে পারে; আজ যে অত্যন্ত বিখ্যাত, কাল সে কুখ্যাত হতে পারে। জড় জগতের যে ঐশ্বর্য তা কখনই স্থির নয়, কিন্তু এই ছয়টি ঐশ্বর্য পরমেশ্বর ভগবানে পূর্ণরূপে রয়েছে, কেবল চিৎ-জগতেই নয়, এই জড় জগতেও। তাঁর খ্যাতি এখনও অক্ষুণ্ণ, তাঁর দেওয়া জ্ঞান *ভগবদ্গীতা* আজও সকলের দ্বারা সম্মানিত। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় সব কিছুই শাশ্বত।

শ্লোক ৩৯

যৎসেবয়াশেষগুহাশয়ঃ স্বরাড়্
বিপ্রপ্রিয়স্তুষ্যতি কামমীশ্বরঃ ।
তদেব তদ্ধর্মপরৈর্বিনীতৈঃ
সর্বাত্মনা ব্রহ্মকুলং নিষেব্যতাম্ ॥ ৩৯ ॥

যৎ—যাঁর, **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **অশেষ**—অন্তহীন; **গুহা-আশয়ঃ**—সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে; **স্ব-রাট্**—কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **বিপ্র-প্রিয়ঃ**—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়; **তুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হন; **কামম্**—বাসনার; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **তৎ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তৎ-ধর্ম-পরৈঃ**—ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণের দ্বারা; **বিনীতৈঃ**—বিনম্রতার দ্বারা, **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **ব্রহ্ম-কুলম্**—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বংশধর; **নিষেব্যতাম্**—সর্বদা তাঁদের সেবায় যুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

সকলের হৃদয়ে বিরাজ করা সত্ত্বেও, সর্বতোভাবে স্বাধীন পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং নিষ্কপটে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বংশধরদের সেবা করেন, কারণ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, ভগবান যখন দেখেন যে, কেউ তাঁর ভক্তের সেবা করছেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তিনি পূর্ণ, তাই তাঁর কারও সেবা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আমাদের নিজেদের স্বার্থে সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করা উচিত। এই সেবা ভগবানকে সরাসরিভাবে করা যায় না, তা করতে হয় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মাধ্যমে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা,* অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবা না করলে, এই জড় বন্ধনের কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদঃ*—শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়। এই প্রকার আচরণ কেবল শাস্ত্রেই উল্লেখ করা হয়নি, আচার্যেরাও তা অনুসরণ করেন। ভগবানের আদর্শ আচরণ অনুসরণ করে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবায় যুক্ত হতে পৃথু মহারাজ তাঁর প্রজাদের উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৪০

পুমাঁল্লভেতানতিবেলমাত্মনঃ
প্রসীদতোঽত্যন্তশমং স্বতঃ স্বয়ম্ ।
যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেবয়া ততঃ
পরং কিমত্রাস্তি মুখং হবির্ভুজাম্ ॥ ৪০ ॥

পুমান্—পুরুষ; **লভেত**—লাভ করতে পারে; **অনতি-বেলম্**—অবিলম্বে; **আত্মনঃ**—তার আত্মার, **প্রসীদতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **অত্যন্ত**—অত্যধিক; **শমম্**—শান্তি; **স্বতঃ**—আপনা থেকে, **স্বয়ম্**—স্বয়ং, **যৎ**—যাঁর, **নিত্য**—নিয়মিত; **সম্বন্ধ**—সম্বন্ধ; **নিষেবয়া**—সেবার দ্বারা; **ততঃ**—তারপর; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **কিম্**—কি; **অত্র**—এখানে; **অস্তি**—আছে; **মুখম্**—সুখ; **হবিঃ**—ঘৃত; **ভুজাম্**—যাঁরা পান করেন।

অনুবাদ

নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করার দ্বারা হৃদয়ের কলুষ বিধৌত করে পরম শান্তি লাভ করা যায় এবং জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট হওয়া যায়। এই জগতে ব্রাহ্মণদের সেবা করার থেকে শ্রেষ্ঠ সকাম কর্ম নেই, কারণ যে-সমস্ত দেবতাদের জন্য নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই দেবতারা তার ফলে প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (২/৬৫) বলা হয়েছে—*প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে* আত্মতৃপ্ত না হলে, জড় জগতের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। তাই পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন—

তাঁদের চরণ সেবি' ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥

"জন্মজন্মান্তর আমি ভক্তসমাজে বাস করে, আচার্যদের চরণসেবা করতে চাই।" কেবলমাত্র ভক্তসমাজে বাস এবং আচার্যদের আদেশ পালন করার দ্বারাই আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কলিযুগে, বর্তমান সময়ে, ব্রাহ্মণকুলের সেবা করা অত্যন্ত দুষ্কর। *বরাহ-পুরাণে* বলা হয়েছে, কলিযুগের সুযোগ নিয়ে রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। *রাক্ষসাঃ*

কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু (বরাহ-পুরাণ)। অর্থাৎ, কলিযুগে তথাকথিত বহু জাতি ব্রাহ্মণ ও জাতি-গোস্বামী রয়েছে, যারা শাস্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে এবং জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দাবি করে যে, ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব হচ্ছে জন্মগত অধিকার। এই প্রকার কপট ব্রাহ্মণকুলের সেবা করে কোন লাভ হবে না। তাই সদ্গুরু ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গ করা এবং তাঁদের সেবা করা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ তা নবীন ভক্তকে পূর্ণ আত্মতৃপ্তি লাভ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে, *ভগবদ্গীতার* (২/৪১) *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন* শ্লোকটি ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে, ভক্তিযোগের বিধি বিধানগুলি বাস্তবিকই পালন করে অচিরেই মুক্তির চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে কথা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে *(অত্যন্তশমম্)।*

অনতিবেলম্ ('অবিলম্বে') শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কেবল ব্রাহ্মণদের ও বৈষ্ণবদের সেবা করার দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়। কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের কোন প্রয়োজন নেই। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন নারদ মুনি স্বয়ং। তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে তিনি ছিলেন একজন দাসীর পুত্র, কিন্তু তিনি মহান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি কেবল মুক্তিই লাভ করেননি, সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম গুরুরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাই বৈদিক পন্থায় যে-কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর, ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবার প্রথা রয়েছে।

শ্লোক ৪১

অশ্নাত্যনন্তঃ খলু তত্ত্বকোবিদৈঃ
শ্রদ্ধাহুতং যন্মুখ ইজ্যনামভিঃ ।
ন বৈ তথা চেতনয়া বহিষ্কৃতে
হুতাশনে পারমহংস্যপর্যগুঃ ॥ ৪১ ॥

অশ্নাতি—আহার করে; **অনন্তঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **খলু**—তা সত্ত্বেও; **তত্ত্ব-কোবিদৈঃ**—পরম সত্য সম্বন্ধে যাঁরা অবগত; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **হুতম্**—অগ্নিতে আহুতি; **যৎ-মুখে**—যার মুখে; **ইজ্য-নামভিঃ**—বিভিন্ন দেবতাদের নামে; **ন**—কখনই না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **তথা**—তেমনই; **চেতনয়া**—জীবনী-শক্তির দ্বারা; **বহিঃ-**

কৃতে—বঞ্চিত হয়ে; **হুত-অশনে**—যজ্ঞাগ্নিতে; **পারমহংস্য**—ভক্তদের সম্বন্ধে; **পর্যগুঃ**—কখনও চলে যান না।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত যদিও বিভিন্ন দেবতাদের নামে নিবেদিত যজ্ঞের আহুতির মাধ্যমে আহার করেন, তবুও যজ্ঞাগ্নির মাধ্যমে আহার করার থেকে তত্ত্বজ্ঞ ঋষি ও ভক্তদের মুখের দ্বারা আহার করে তিনি অধিক তৃপ্তি অনুভব করেন, কারণ তিনি তখন ভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করেন না।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, বিভিন্ন দেবতাদের নামে ভগবানকে আহার প্রদান করার জন্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করা হয়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় মন্ত্রে *স্বাহা* শব্দের উচ্চারণ করা হয়, যেমন—ইন্দ্রায় স্বাহা, আদিত্যায় স্বাহা। এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় ইন্দ্র, আদিত্য ইত্যাদি দেবতাদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য, কারণ ভগবান বলেছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েষু বা ।
তত্র তিষ্ঠামি নারদ যত্র গায়ন্তি মদ্ভক্তাঃ ॥

"আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না; যেখানে আমার ভক্তরা আমার মহিমা কীর্তন করে, আমি সেইখানে থাকি।" তা থেকে বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান কখনও তাঁর ভক্তদের সঙ্গত্যাগ করেন না।

অগ্নি অবশ্যই অচেতন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ও ব্রাহ্মণেরা পরমেশ্বর ভগবানের চেতন প্রতিনিধি। তাই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ভোজন করানো হলে, সরাসরিভাবে ভগবানকে ভোজন করানো হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করার পরিবর্তে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের আহার করানো উচিত, কারণ সেই পন্থাটি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ থেকে অধিক কার্যকরী। অদ্বৈত প্রভু তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে, তিনি প্রথমে হরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান করে তাঁকে প্রসাদ নিবেদন করেছিলেন। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পর একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আহার নিবেদন করা হয়। কিন্তু অদ্বৈত প্রভু তা নিবেদন করেছিলেন হরিদাস ঠাকুরকে, যিনি মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি এমন কার্য কেন করছেন, যার ফলে ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁর মর্যাদা বিপর্যস্ত হতে পারে। অদ্বৈত আচার্য উত্তর দিয়েছিলেন যে, হরিদাস ঠাকুরকে আহার নিবেদন করার মাধ্যমে, তিনি কোটি কোটি

সর্বোত্তম ব্রাহ্মণকে ভোজন করাচ্ছেন। তিনি সেই বিষয়ে যে-কোন বিদ্বান ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন যে, হরিদাস ঠাকুরের মতো একজন শুদ্ধ ভক্তকে ভোজন করিয়ে, তিনি হাজার হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করানোর ফল প্রাপ্ত হয়েছেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করা হয়, কিন্তু সেই প্রকার আহুতি যখন বৈষ্ণবদের নিবেদন করা হয়, তা নিশ্চয়ই অধিক ফলপ্রসূ হয়।

শ্লোক ৪২

যদ্ব্রহ্ম নিত্যং বিরজং সনাতনং
শ্রদ্ধাতপোমঙ্গলমৌনসংযমৈঃ ।
সমাধিনা বিভ্রতি হার্থদৃষ্টয়ে
যত্রেদমাদর্শ ইবাবভাসতে ॥ ৪২ ॥

যৎ—যা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি; **নিত্যম্**—শাশ্বতরূপে; **বিরজম্**—নির্মল; **সনাতনম্**—অনাদি; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **মঙ্গল**—শুভ; **মৌন**—মৌন; **সংযমৈঃ**—মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে; **সমাধিনা**—পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে; **বিভ্রতি**—প্রকাশিত হয়; **হ**—যেভাবে তিনি তা করেছিলেন; **অর্থ**—বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য; **দৃষ্টয়ে**—খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে; **যত্র**—যে বিষয়ে; **ইদম্**—এই সমস্ত; **আদর্শে**—দর্পণে; **ইব**—সদৃশ; **অবভাসতে**—প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণদের দিব্য স্থিতি শাশ্বতরূপে সুরক্ষিত হয়, কারণ সেই সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা, তপস্যা, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম, এবং ধ্যানের দ্বারা বৈদিক নির্দেশ পালন করা হয়। এইভাবে জীবনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, ঠিক যেমন স্বচ্ছ দর্পণে মুখ পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একজন সজীব ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো অগ্নিহোত্র যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করার থেকেও অধিক ফলদায়ক। এখন এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে ব্রাহ্মণত্ব কি এবং ব্রাহ্মণ কে। ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর ফল যজ্ঞ অনুষ্ঠানের থেকেও অধিক ফলদায়ক, এই শাস্ত্রোক্তির সুযোগ নিয়ে, কলিযুগে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত কিছু ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর অধিকারি না হওয়া সত্ত্বেও, কেবল জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণত্ব দাবি করে এই ব্রাহ্মণ-ভোজনের সুযোগ

গ্রহণ করে। কে প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং কে তা নয়, তা নির্ণয় করার জন্য পৃথু মহারাজ এখানে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির সঠিক বর্ণনা প্রদান করেছেন। আলোক যদি না থাকে, তা হলে আগুন হওয়ার দাবি করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণকে বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। বৈদিক সিদ্ধান্তের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)। বৈদিক সিদ্ধান্ত—বেদের চরম উপলব্ধি বা বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যেভাবে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*), কেবলমাত্র সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানার মাধ্যমে, কোন ব্যক্তি পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ হন। যেই ব্রাহ্মণ পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, তিনি সর্বদা চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ, কোন অবস্থাতেই তাঁর অধঃপতন হয় না, এবং তিনি অবিলম্বে ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।"

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তই হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে আদর্শ ব্রাহ্মণ। তাঁর স্থিতি দিব্য, কারণ তিনি বদ্ধ জীবনের চারটি ত্রুটি—ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা থেকে মুক্ত। আদর্শ বৈষ্ণব বা কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, কারণ তিনি যা কিছু বলেন তা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিনিধির শিক্ষা অনুসারেই বলেন। যেহেতু বৈষ্ণব ঠিক শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলেন, তাই তাঁরা যা বলেন তা এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত। যেমন, *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সকলেরই উচিত সর্বদা তাঁর কথা চিন্তা করা, সকলেরই তাঁর ভক্ত হওয়া উচিত, তাঁকে পূজা করা উচিত এবং চরমে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শরণাগত হওয়া। এই সমস্ত ভক্তিমূলক কার্যকলাপ দিব্য এবং তা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা থেকে মুক্ত। তাই, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত এবং যাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার ভিত্তিতেই তাঁর বাণী প্রচার করেন, তাঁরা *বিরজম্*, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত। তাই, প্রকৃত ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব সর্বদা *বেদের* সিদ্ধান্ত বা পরমেশ্বর ভগবানের নিজের দেওয়া বৈদিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন। বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল আমরা পরম সত্যের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই পরম সত্যকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা ও চরমে পরমেশ্বর ভগবানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অনাদি কাল থেকেই এই জ্ঞান পূর্ণ,

এবং ব্রহ্মণ্য বা বৈষ্ণব সংস্কৃতি এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তাই, শ্রদ্ধাসহকারে *বেদ* অধ্যয়ন করা উচিত। কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের জন্য তা পাঠ করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে এই জ্ঞান ও তার কার্যকলাপ বিস্তারের জন্য পরমেশ্বর ভগবান ও *বেদের* বাণীতে প্রকৃত শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে তা করা উচিত।

এই শ্লোকে *মঙ্গল* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, যা কিছু ভাল তা করা এবং যা ভাল নয় তা পরিত্যাগ করার নাম *মঙ্গল*। ভাল কার্য করার অর্থ হচ্ছে ভক্তির অনুকূল কার্য স্বীকার করা এবং ভক্তির প্রতিকূল কার্য বর্জন করা। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা চারটি পাপকার্য বর্জন করি —যথা, অবৈধ যৌনসঙ্গ, নেশা, দ্যূতক্রীড়া ও আমিষ আহার —এবং আমরা প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ষোলমালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি, এবং ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করি। এইভাবে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক শক্তি অটুট রাখা যায়। নিষ্ঠাসহকারে এই সমস্ত বিধি নিষেধগুলি পালন করে, যদি কেউ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,* এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে পারমার্থিক জীবনে উন্নতিলাভ করবেন এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করবেন। যেহেতু বৈদিক জ্ঞান অধ্যয়ন অথবা হৃদয়ঙ্গম করার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা, তাই উপরোক্ত বিধি অনুসারে যিনি বৈদিক নিয়ম পালন করেন, তিনি প্রথম থেকেই স্বচ্ছ দর্পণে যেভাবে নিজের মুখ দেখা যায়, ঠিক সেইভাবে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন। তাই, সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীবাত্মা হওয়ার ফলে অথবা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, তাঁর মধ্যে শাস্ত্রবর্ণিত সমস্ত গুণগুলি থাকা কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মণ্যধর্ম আচরণ করা কর্তব্য এইভাবে তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারেন এবং বুঝতে পারেন শ্রীকৃষ্ণকে। ভগবদ্ভক্ত যে কিভাবে নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বর্ণিত হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম বিকশিত করার ফলে, ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে তাঁকে শ্যামসুন্দররূপে দর্শন করেন। সেটিই হচ্ছে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিপূর্ণ অবস্থা।

শ্লোক ৪৩

তেষামহং পাদসরোজরেণু-
মার্যা বহেয়াধিকিরীটমায়ুঃ ।
যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং
নশ্যত্যমুং সর্বগুণা ভজন্তি ॥ ৪৩ ॥

তেষাম্—তাঁদের সকলের; **অহম্**—আমি; **পাদ**—পদ; **সরোজ**—কমল; **রেণুম্**—ধূলিকণা; **আর্যাঃ**—হে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ, **বহেয়**—বহন করি; **অধি**—পর্যন্ত; **কিরীটম্**—মুকুট; **আয়ুঃ**—জীবনের শেষ পর্যন্ত, **যম্**—যা; **নিত্যদা**—সর্বদা, **বিভ্রতঃ**—বহন করে, **আশু**—অতি শীঘ্র; **পাপম্**—পাপপূর্ণ কার্যকলাপ; **নশ্যতি**—নষ্ট হয়; **অমুম্**—এই সমস্ত; **সর্ব-গুণাঃ**—পূর্ণরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন; **ভজন্তি**—পূজা।

অনুবাদ

এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ! আমি আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করি, যাতে আমার জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা সর্বদা আমার মুকুটে ধারণ করতে পারি। যিনি এই প্রকার ধূলিকণা তাঁর মস্তকে ধারণ করতে পারেন, তিনি অতি শীঘ্র সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত বাঞ্ছিত সদ্‌গুণাবলী অর্জন করেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, পরমেশ্বর ভগবানে যাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা রয়েছে, অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা বৈষ্ণবদের প্রতি যাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা রয়েছে, তাঁর মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি বিকশিত হয়। *যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)। প্রহ্লাদ মহারাজও বলেছেন, *নৈষাং মতিস্তাবদ্ উরুক্রমাঙ্ঘ্রিম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩২)। যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারা যায় না যে, পরমেশ্বর ভগবান কে, এবং পরমেশ্বর ভগবানকে না জানা পর্যন্ত জীবন অপূর্ণ থাকে। বহু জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে, পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে জেনে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত মহাত্মা অত্যন্ত বিরল। যে রাজমুকুট ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের পদধূলি বহন করে না, তা রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে এক বিশাল বোঝা মাত্র. পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথু মহারাজের মতো

বদান্য রাজা যদি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের উপদেশ অনুসরণ না করেন অথবা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি অনুসরণ না করেন, তা হলে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে একটি বোঝাস্বরূপ, কারণ তিনি তাঁর প্রজাদের কোন রকম মঙ্গলসাধন করতে পারেন না। পৃথু মহারাজ হচ্ছেন একজন আদর্শ রাজার দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৪৪

গুণায়নং শীলধনং কৃতজ্ঞং
বৃদ্ধাশ্রয়ং সংবৃণতেহনু সম্পদঃ ।
প্রসীদতাং ব্রহ্মকুলং গবাং চ
জনার্দনঃ সানুচরশ্চ মহ্যম্ ॥ ৪৪ ॥

গুণ-অয়নম্—যিনি সমস্ত সদ্গুণ অর্জন করেছেন; **শীল-ধনম্**—সৎ আচরণ যাঁর সম্পদ; **কৃত-জ্ঞম্**—কৃতজ্ঞ; **বৃদ্ধ-আশ্রয়ম্**—যিনি জ্ঞানীদের আশ্রয় গ্রহণ করেন; **সংবৃণতে**—প্রাপ্ত হন; **অনু**—নিশ্চিতভাবে; **সম্পদঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্য; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হন; **ব্রহ্ম-কুলম্**—ব্রাহ্মণশ্রেণী; **গবাম্**—গাভী; **চ**—এবং; **জনার্দনঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স**—সহ; **অনুচরঃ**—তাঁর ভক্তগণ সহ, **চ**—এবং; **মহ্যম্**—আমাকে।

অনুবাদ

যিনি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেছেন—যাঁর একমাত্র সম্পদ হচ্ছে তাঁর সৎ আচরণ, যিনি কৃতজ্ঞ এবং যিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাগত—তিনি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ প্রাপ্ত হন। আমি তাই বাসনা করি যে, পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্ষদেরা যেন গাভীসহ আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ—এই প্রার্থনার দ্বারা ভগবান পূজিত হন। তার ফলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ও গাভীদের শ্রদ্ধা করেন এবং রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যেখানে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি রয়েছে, সেখানেই গোপালন ও গোরক্ষা হয়। যেই সমাজে অথবা সভ্যতায় ব্রাহ্মণ নেই অথবা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি নেই, সেখানে মানব-সভ্যতার সর্বনাশ সাধন করে, গাভীদের সাধারণ পশু বলে মনে করে হত্যা করা হয়। পৃথু মহারাজ যে এখানে *গবাম্* শব্দটি উল্লেখ করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ভগবান

সর্বদাই গাভী ও ভক্তদের সঙ্গে থাকেন। ছবিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সব সময় গাভী, গোপবালক ও গোপ-বালিকাদেব সঙ্গে দেখা যায়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই একলা থাকতে পারেন না। তাই পৃথু মহাবাজ *সানুচরশ্চ* শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর অনুগামী ও ভক্তদের সঙ্গে থাকেন।

দেবতাদের সমস্ত গুণাবলী ভগবদ্ভক্ত অর্জন করেন; তিনি *গুণায়নম্*, সমস্ত সদ্‌গুণের আধার। তাঁর একমাত্র সম্পদ হচ্ছে সদ্‌গুণাবলী, এবং তিনি কৃতজ্ঞ। ভগবানের কৃপার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের একটি গুণ। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সকলেরই কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত, কারণ তিনি সমস্ত জীবদের পালন করছেন এবং তাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করছেন। *বেদে* (*কঠোপনিষদ* ২/২/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—এক পরমেশ্বর ভগবান জীবের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করছেন। তাই যে-সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ, তারা নিশ্চিতভাবে সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা গুণান্বিত।

এই শ্লোকে *বৃদ্ধাশ্রয়ম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৃদ্ধ শব্দটি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে বোঝায়। বৃদ্ধ দুই প্রকার, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ। যিনি জ্ঞানবান, তিনিই প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধ (জ্ঞানবৃদ্ধ); কেবল বয়সে প্রবীণ হলেই বৃদ্ধ হয় না। *বৃদ্ধাশ্রয়ম্*, যিনি জ্ঞানবান গুরুজনের আশ্রয় করেন, তিনি ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত সদ্‌গুণ অর্জন করেন এবং তিনি সৎ আচরণ শিক্ষালাভ করতে পারেন। কেউ যখন প্রকৃত সদ্‌গুণাবলী অর্জন করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের করুণা উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হন এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি তখন সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। সেই প্রকার ব্যক্তিই হচ্ছেন ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব। পৃথু মহারাজ তাই পার্ষদ, ভক্ত, বৈষ্ণব ও গাভীসহ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

শ্লোক ৪৫

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ ।
তুষ্টুবুর্হৃষ্টমনসঃ সাধুবাদেন সাধবঃ ॥ ৪৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলার সময়; **নৃ-পতিম্**—রাজা; **পিতৃ**—পিতৃলোকের অধিবাসীগণ; **দেব**—দেবতাগণ;

দ্বি-জাতয়ঃ—(ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব) দ্বিজগণ; **তুষ্টুবুঃ**—সন্তুষ্ট; **হৃষ্ট-মনসঃ**—অন্তরে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **সাধু-বাদেন**—প্রশংসা বাক্যের দ্বারা; **সাধবঃ**—উপস্থিত সমস্ত সাধু ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—পৃথু মহারাজের সেই সুন্দর বাণী শ্রবণ করে, সেই সভায় উপস্থিত সমস্ত দেবতা, পিতৃ, ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মারা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন সভায় কেউ যখন খুব সুন্দরভাবে ভাষণ দেন, তখন শ্রোতারা সাধু-সাধু শব্দে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁকে অভিনন্দন জানান। তাকে বলা হয় সাধুবাদ। সেই সভায় উপস্থিত সমস্ত মহর্ষি, পিতৃ ও দেবতারা পৃথু মহারাজের ভাষণ শ্রবণ করে সাধু সাধু বলে তাঁদের শুভেচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁরা সকলে পৃথু মহারাজের সৎ উদ্দেশ্য সমর্থন করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৬

পুত্রেণ জয়তে লোকানিতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
ব্রহ্মদণ্ডহতঃ পাপো যদ্বেণোঽত্যতরত্তমঃ ॥ ৪৬ ॥

পুত্রেণ—পুত্রের দ্বারা; **জয়তে**—জয়ী হন; **লোকান্**—সমস্ত স্বর্গলোক; **ইতি**—এইভাবে; **সত্যবতী**—সত্য হয়; **শ্রুতিঃ**—বেদ; **ব্রহ্ম-দণ্ড**—ব্রাহ্মণের অভিশাপের দ্বারা; **হতঃ**—নিহত; **পাপঃ**—সব চাইতে পাপী; **যৎ**—যেমন; **বেণঃ**—পৃথু মহারাজের পিতা; **অতি**—অত্যন্ত; **অতরৎ**—উদ্ধার লাভ করেছিলেন; **তমঃ**—নরকের অন্ধকার থেকে।

অনুবাদ

তাঁরা সকলে ঘোষণা করেছিলেন যে, পুত্রের কর্মের দ্বারা পিতা স্বর্গলোক-সমূহ জয় করতে পারেন,—এই হিতবাক্য সার্থক হয়েছে; যেহেতু ব্রহ্মশাপের ফলে নিহত পাপী বেণও তার পুত্র মহারাজ পৃথুর দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন নরক থেকে নিস্তার পেল।

তাৎপর্য

বেদের বর্ণনা অনুসারে পুৎ নামক একটি নরক রয়েছে, এবং সেই নরক থেকে যে উদ্ধার করে তাকে বলা হয় পুত্র। তাই বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্রলাভ করা, যে পিতাকে পুৎ নামক নরকে পতিত হলেও উদ্ধার করতে পারবে। পৃথু মহারাজের পিতা বেণ ছিল অত্যন্ত পাপী এবং তাই ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তার মৃত্যু হয়েছিল। এখন, সেই সভায় উপস্থিত সমস্ত মহাত্মা, ঋষি ও ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজের জীবনের মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রবণ করে নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছিলেন যে, *বেদের* বাণী পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছে *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহে পত্নীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপযুক্ত পুত্রসন্তান লাভ করা, যে তার পিতাকে নরকের অন্ধতম প্রদেশ থেকে উদ্ধার করতে পারবে। বিবাহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নয়, পিতার উদ্ধারকারী সুযোগ্য পুত্রসন্তান লাভ করা। কিন্তু পুত্র যদি অযোগ্য অসুর হয়ে যায়, তা হলে সে পিতাকে কিভাবে নরক থেকে উদ্ধার করবে? তাই পিতার কর্তব্য নিজে বৈষ্ণব হয়ে, পুত্রদেরও বৈষ্ণব হওয়ার শিক্ষা দেওয়া; তা হলে পিতা যদি ঘটনাক্রমে পরবর্তী জীবনে নরকে পতিতও হয়, তার সুযোগ্য পুত্র তাকে উদ্ধার করতে পারবে, ঠিক যেমন পৃথু মহারাজ তাঁর পিতাকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তমঃ ।
বিবিক্ষুরত্যগাৎসূনোঃ প্রহ্লাদস্যানুভাবতঃ ॥ ৪৭ ॥

হিরণ্যকশিপুঃ—প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা, **চ**—ও; **অপি**—পুনরায়; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের, **নিন্দয়া**—নিন্দা করার ফলে; **তমঃ**—নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে; **বিবিক্ষুঃ**—প্রবেশ করেছিল; **অত্যগাৎ**—উদ্ধার লাভ করেছিল; **সূনোঃ**—তার পুত্রের; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদ মহারাজের; **অনুভাবতঃ**—প্রভাবে।

অনুবাদ

তেমনই, হিরণ্যকশিপু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার পাপে নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়েছিল; কিন্তু তার মহান পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের প্রভাবে, সেও উদ্ধার লাভ করে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে বর দিতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁর গভীর ভক্তি ও সহনশীলতার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছ থেকে কোন বর গ্রহণ করতে চাননি। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই প্রকার বরগ্রহণ ঐকান্তিক ভক্তের শোভা পায় না। কোন পুরস্কার লাভের আশায় ভগবানের সেবা করাকে প্রহ্লাদ মহারাজ এক ধরনের ব্যবসা বলে নিন্দা করেছেন। যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন বৈষ্ণব, তাই তিনি নিজের স্বার্থে কোন বর প্রার্থনা করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর পিতার প্রতি গভীর অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন। যদিও তাঁর পিতা তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল, এবং ভগবান তাকে হত্যা না করলে, প্রহ্লাদকে সে হত্যা করত, তবুও প্রহ্লাদ মহারাজ তার মঙ্গল কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করেছিলেন, এবং হিরণ্যকশিপু নরকের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে উদ্ধার লাভ করে তার পুত্রের কৃপায় ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আদর্শ দৃষ্টান্ত, এই জড় জগতে নিরন্তর নারকীয় যন্ত্রণাভোগ করছে যে-সমস্ত পাপী, তাদের প্রতি যিনি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাই *পর-দুঃখ-দুঃখী কৃপাম্বুধিঃ* বলা হয়। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভগবানের সমস্ত ভক্তরা পাপী জীবদের উদ্ধার করার জন্য এই জড় জগতে আসেন। তাঁরা সহিষ্ণুতা সহকারে সব রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করেন, কারণ সেটি জড় জগতের নারকীয় পরিবেশ থেকে পাপীদের উদ্ধারকারী বৈষ্ণবের আর একটি গুণ। তাই বৈষ্ণবদের বন্দনা করে বলা হয়—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

বৈষ্ণবদের প্রধান ভাবনা হচ্ছে কিভাবে বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করা যায়।

শ্লোক ৪৮

বীরবর্য পিতঃ পৃথ্ব্যাঃ সমাঃসঞ্জীব শাশ্বতীঃ ।
যস্যেদৃশ্যচ্যুতে ভক্তিঃ সর্বলোকৈকভর্তরি ॥ ৪৮ ॥

বীর-বর্য—সর্বশ্রেষ্ঠ বীর; **পিতঃ**—পিতা; **পৃথ্ব্যাঃ**—পৃথিবীর; **সমাঃ**—সমান আয়ু; **সঞ্জীব**—জীবিত থাকুন; **শাশ্বতীঃ**—চিরকাল; **যস্য**—যাঁর, **ঈদৃশী**—এই প্রকার; **অচ্যুতে**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **সর্ব**—সমস্ত; **লোক**—লোক; **এক**—এক; **ভর্তরি**—পালক।

অনুবাদ

সমস্ত সাধু ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন—হে বীরশ্রেষ্ঠ, হে পৃথিবীর পিতা! আপনি দীর্ঘায়ু হোন, কারণ আপনি সমগ্র জগতের পতি অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ।

তাৎপর্য

সভায় উপস্থিত সাধুরা পৃথু মহাবাজকে দীর্ঘজীবন লাভ কবাব আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। যদিও মানুষের আয়ু সীমিত, তবুও কেউ যদি সৌভাগ্যবশত ভগবানের ভক্ত হন, তা হলে তিনি জীবনেব জন্য নির্দিষ্ট স্থিতিকাল অতিক্রম কবেন; কখনও কখনও যোগীরা অবশ্য দেহত্যাগ করেন তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে, জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে নয়। ভক্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ভগবানের প্রতি অবিচলিত ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে, তিনি চিরকাল জীবত থাকেন। বলা হয় যে, *কীর্তির্যস্য স জীবতি*—'যিনি সৎ কীর্তি রেখে যান, তিনি চিরকাল জীবিত থাকেন।' বিশেষ করে যিনি ভগবদ্ভক্ত হওয়ার খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে চিরকাল জীবিত থাকেন। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আলোচনা হয়েছিল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, "কীর্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি?" রামানন্দ রায় উত্তর দিয়েছিলেন, "কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি " কারণ ভক্ত কেবল নিত্যকাল বৈকুণ্ঠলোকেই বাস করেন না, এই জড় জগতেও তিনি তাঁর খ্যাতির দ্বারা চিরকাল জীবিত থাকেন।

শ্লোক ৪৯

অহো বয়ং হ্যদ্য পবিত্রকীর্তে
ত্বয়ৈব নাথেন মুকুন্দনাথাঃ ।
য উত্তমশ্লোকতমস্য বিষ্ণো-
র্ব্রহ্মণ্যদেবস্য কথাং ব্যনক্তি ॥ ৪৯ ॥

অহো—আহা, **বয়ম্**—আমরা; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অদ্য**—আজ; **পবিত্র-কীর্তে**—হে পরম পবিত্র; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **নাথেন**—ভগবানের দ্বারা; **মুকুন্দ**—পরমেশ্বব ভগবান; **নাথাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রজা হয়ে, **যে**—যিনি; **উত্তম-শ্লোক-তমস্য**—উত্তমশ্লোকের দ্বারা যাঁর প্রশংসা হয়, সেই ভগবানের;

বিষ্ণোঃ—বিষ্ণুর; **ব্রহ্মণ্য-দেবস্য**—ব্রাহ্মণদের আরাধ্য ভগবান; **কথাম্**—বাণী; **ব্যনক্তি**—ব্যক্ত হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রোতারা বললেন, হে মহারাজ পৃথু! আপনার কীর্তি পরম পবিত্র, কারণ ব্রাহ্মণদের প্রভু, পবিত্র কীর্তি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আপনি প্রচার করছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে, আমরা আপনাকে আমাদের প্রভুরূপে প্রাপ্ত হয়েছি, এবং তাই আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা যেন প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে বাস করছি।

তাৎপর্য

প্রজারা ঘোষণা করেছিলেন যে, মহারাজ পৃথুর সংরক্ষণে থেকে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা যেন পালিত হচ্ছিলেন। এই উপলব্ধিটি হচ্ছে জড় জগতে অবিচলিত সমাজ-ব্যবস্থার যথার্থ স্থিতি। যেহেতু *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পালক ও নায়ক, তাই রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হওয়া। তা হলে তিনি ভগবানেরই মতো সম্মান প্রাপ্ত হওয়ার দাবি করতে পারেন। রাজা অথবা সমাজের নেতারা কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হতে পারেন, তাও এই শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। যেহেতু পৃথু মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের পরমেশ্বরত্ব ও মহিমা প্রচার করছিলেন, তাই তিনি ছিলেন ভগবানের উপযুক্ত প্রতিনিধি। এই প্রকার রাজা অথবা নেতার অধীনে থাকাই হচ্ছে মানব-সমাজের আদর্শ স্থিতি এই প্রকার রাজা বা নেতার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্যে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ও গাভীদের সুরক্ষা প্রদান করা।

শ্লোক ৫০

নাত্যদ্ভুতমিদং নাথ তবাজীব্যানুশাসনম্ ।
প্রজানুরাগো মহতাং প্রকৃতিঃ করুণাত্মনাম্ ॥ ৫০ ॥

ন—না; **অতি**—অত্যন্ত; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ইদম্**—এই; **নাথ**—হে প্রভু; **তব**—আপনার; **আজীব্য**—উপার্জনের উৎস; **অনুশাসনম্**—শাসন-ব্যবস্থা; **প্রজা**—প্রজাদের; **অনুরাগঃ**—স্নেহ; **মহতাম্**—মহতের; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **করুণ**—দয়ালু; **আত্মনাম্**—জীবদের।

অনুবাদ

হে প্রভু! প্রজাশাসন করাই আপনার ধর্ম। আপনার মতো মহাপুরুষের পক্ষে তা কোন আশ্চর্যজনক কার্য নয়, কারণ আপনি অত্যন্ত দয়ালু এবং সর্বদা প্রজাদের হিতসাধনে যত্নবান। সেটিই আপনার চরিত্রের মাহাত্ম্য।

তাৎপর্য

রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের পালন করা এবং তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা। বৈদিক সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়ও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে জ্ঞান বিতরণ করা এবং তাই তাঁদের শিষ্যদের থেকে তাঁরা দান গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু রাজার কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে প্রজাদের উন্নতি-সাধনের জন্য তাদের সুরক্ষা প্রদান করা, এবং তাই তিনি তাদের উপর কর ধার্য করতে পারেন; বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র সমাজের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং তা থেকে স্বল্প লাভ করা; কিন্তু শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যদের মতো স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না বলে, তারা সমাজের উচ্চতর বর্ণের সেবা করে এবং তাঁরা তাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন।

উপযুক্ত রাজা অথবা রাজনৈতিক নেতার লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—তাঁদের কর্তব্য জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হওয়া এবং তাদের মুখ্য হিতসাধনে যত্নবান হওয়া এবং সেটি হচ্ছে ভগবানের উত্তম ভক্তে পরিণত হওয়া। মহাত্মারা স্বভাবতই অন্যের হিতসাধনে আগ্রহী, এবং বৈষ্ণবেরা হচ্ছেন বিশেষভাবে দয়ালু। তাই আমরা বৈষ্ণব নায়কদের প্রণতি নিবেদন করে বলি -

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

বৈষ্ণব নেতাই কেবল মানুষের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন *(বাঞ্ছাকল্পতরু)*, এবং তিনি অত্যন্ত কৃপালু কারণ তিনি মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতসাধন করেন। তিনি পতিতপাবন, কারণ রাজা অথবা রাষ্ট্রনেতারা যদি ভগবদ্বাণীর প্রচার-কার্যের নেতা বৈষ্ণবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে বৈশ্যেরাও বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন, এবং শূদ্রেরা তাঁদের সেবা করবেন। তার ফলে জীবনের পরম লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে সমগ্র সমাজ প্রগতিশীল এক আদর্শ মানব-সমাজে পরিণত হবে।

শ্লোক ৫১

অদ্য নস্তমসঃ পারস্ত্বয়োপাসাদিতঃ প্রভো ।
ভ্রাম্যতাং নষ্টদৃষ্টীনাং কর্মভির্দৈবসংজ্ঞিতৈঃ ॥ ৫১ ॥

অদ্য—আজ, **নঃ**—আমাদের; **তমসঃ**—জড়-জাগতিক অস্তিত্বের অন্ধকারে; **পারঃ**—অপর পারে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উপাসাদিতঃ**—বর্ধিত; **প্রভো**—হে প্রভু; **ভ্রাম্যতাম্**—ভ্রাম্যমাণ; **নষ্ট-দৃষ্টীনাম্**—যারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়েছে; **কর্মভিঃ**—পূর্বকৃত কর্মের ফলে; **দৈব-সংজ্ঞিতৈঃ**—দৈবের দ্বারা আয়োজিত।

অনুবাদ

নাগরিকেরা বললেন—আজ আপনি আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন কিভাবে ভবসাগর অতিক্রম করা যায়। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম ও দৈবের ব্যবস্থাপনায় আমরা সকাম কর্মের জালে আটকে পড়েছি এবং জীবনের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি; তার ফলে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করছি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কর্মভির্দৈব-সংজ্ঞিতৈঃ* পদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের কর্মের গুণ অনুসারে, আমরা জড়া প্রকৃতির গুণের সম্পর্কে আসি, এবং দৈবের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন শরীরের মাধ্যমে সেই সমস্ত কর্মের ফলভোগ করার সুযোগ পাই। এইভাবে জীবনের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, সমস্ত জীবেরা বিভিন্ন যোনিতে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছে। কখনও তারা নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আবার কখনও তারা উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়; এইভাবে আমরা সকলে অনাদিকাল ধরে ভ্রমণ করছি। শ্রীগুরুদেব ও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল আমরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে জানতে পারি, এবং তার ফলে আমাদের জীবনের প্রগতি শুরু হয়। এখানে পৃথু মহারাজের প্রজারা স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা পূর্ণরূপে অনুভব করতে পেরেছেন যে, পৃথু মহারাজের উপদেশের ফলে তাঁরা লাভবান হয়েছেন।

শ্লোক ৫২

নমো বিবৃদ্ধসত্ত্বায় পুরুষায় মহীয়সে ।
যো ব্রহ্ম ক্ষত্রমাবিশ্য বিভর্তীদং স্বতেজসা ॥ ৫২ ॥

নমঃ—প্রণাম; **বিবৃদ্ধ**—অত্যন্ত উন্নত; **সত্ত্বায়**—অস্তিত্বে; **পুরুষায়**—পুরুষকে; **মহীয়সে**—যিনি এইভাবে মহিমামণ্ডিত; **যঃ**—যিনি; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি; **ক্ষত্রম্**—প্রশাসনিক কর্তব্য; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **বিভর্তি**—পালন করে; **ইদম্**—এই; **স্ব-তেজসা**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত; তাই আপনি পরমেশ্বর ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি। আপনি আপনার স্বীয় প্রভাবের দ্বারা মহিমান্বিত, এবং এইভাবে আপনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবর্তন করার দ্বারা সমগ্র জগৎ পালন করছেন, এবং ক্ষত্রিয়রূপে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করে আপনি সকলকে রক্ষা করছেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার ব্যতীত এবং রাষ্ট্রের উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যতীত, কোন সমাজ-ব্যবস্থারই মান যথাযথভাবে বজায় রাখা সম্ভব নয়। পৃথু মহারাজের প্রজারা এই শ্লোকে তা স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর রাজ্যে এক অপূর্ব সুন্দর অবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন *বিবৃদ্ধ-সত্ত্বায়* শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। জড় জগতে তিনটি গুণ রয়েছে—যথা সত্ত্ব, রজ ও তম। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তমোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে হয়। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত জীবনের নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার আর কোন পন্থা নেই; যে-কথা এই *শ্রীমদ্ভাগবতের* পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এবং তাঁদের শ্রীমুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী নিয়মিতভাবে শ্রবণ করার ফলে, নিকৃষ্টতম জীবন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট জীবনের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

মানুষ যখন শ্রবণ ও কীর্তনের প্রারম্ভিক অনুশীলনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের হৃদয়ের কলুষ বিধৌত করতে সহায়তা করেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৭) এইভাবে ধীরে ধীরে পবিত্র হয়ে মানুষ রজ ও তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন। রজ ও তমোগুণের প্রভাবের ফলে, কাম ও লোভের উদয় হয়। কিন্তু মানুষ যখন সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি কাম ও লোভ থেকে মুক্ত হয়ে, জীবনের

যে-কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। এই প্রকার মানসিকতা ইঙ্গিত করে যে, তিনি সত্ত্বগুণের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সেই সত্ত্বগুণের স্তরও অতিক্রম করে, *বিবৃদ্ধ-সত্ত্ব* বা বিশুদ্ধ সত্ত্বে উন্নীত হতে হয়। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বে কৃষ্ণভক্ত হওয়া যায়। তাই পৃথু মহারাজকে এখানে *বিবৃদ্ধ সত্ত্ব* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। চিন্ময় স্তরে অবস্থিত শুদ্ধ ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, পৃথু মহারাজ মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্তরে অবতরণ করেছেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর স্বীয় প্রভাবের দ্বারা সমগ্র জগৎ রক্ষা করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন রাজা, একজন ক্ষত্রিয়, কিন্তু একজন বৈষ্ণব হওয়ার ফলে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণও। ব্রাহ্মণরূপে তিনি প্রজাদের যথাযথভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং একজন ক্ষত্রিয়রূপে তিনি তাঁদের সকলকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন। পৃথু মহারাজের প্রজারা একজন আদর্শ রাজার দ্বারা সর্বতোভাবে সুরক্ষিত ছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজের উপদেশ' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

চতুঃসনের সঙ্গে পৃথু মহারাজের মিলন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

জনেষু প্রগৃণৎস্বেবং পৃথুং পৃথুলবিক্রমম্ ।
তত্রোপজগ্মুর্মুনয়শ্চত্বারঃ সূর্যবর্চসঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, **জনেষু**—প্রজারা, **প্রগৃণৎসু**—যখন প্রার্থনা করছিল, **এবম্**—এইভাবে; **পৃথুম্**—পৃথু মহারাজকে; **পৃথুল**—অত্যন্ত; **বিক্রমম্**—শক্তিশালী; **তত্র**—সেখানে; **উপজগ্মুঃ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **মুনয়ঃ**—কুমারগণ, **চত্বারঃ**—চার; **সূর্য**—সূর্যের মতো, **বর্চসঃ**—উজ্জ্বল।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—প্রজারা যখন এইভাবে মহা-পরাক্রমশালী রাজা পৃথুর মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন সেখানে সূর্যের মতো তেজস্বী চারজন কুমার এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ২

তাংস্তু সিদ্ধেশ্বরান্ রাজা ব্যোম্নোঽবতরতোঽর্চিষা ।
লোকানপাপান্ কুর্বাণান্ সানুগোঽচষ্ট লক্ষিতান্ ॥ ২ ॥

তান্—তাঁদের, **তু**—কিন্তু, **সিদ্ধ-ঈশ্বরান্**—সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর; **রাজা**—রাজা; **ব্যোম্নঃ**—আকাশ থেকে, **অবতরতঃ**—অবতরণ করবার সময়, **অর্চিষা**—তাঁদের উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা; **লোকান্**—গ্রহলোক-সমূহ; **অপাপান্**—নিষ্পাপ, **কুর্বাণান্**—করে; **স-অনুগঃ**—তাঁর অনুচরগণ সহ; **অচষ্ট**—চেনা যাচ্ছিল; **লক্ষিতান্**—তাঁদের দেখে।

অনুবাদ

সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর সেই চারজন কুমার গ্রহলোক-সমূহকে পবিত্র করে যখন আকাশ থেকে অবতরণ করছিলেন, তখন তাঁদের উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করে, রাজা ও তাঁর অনুচরেরা তাঁদের চিনতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

চার কুমারকে এখানে *সিদ্ধেশ্বরান্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর'। যোগসিদ্ধি লাভের ফলে অণিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ইত্যাদি আট প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। এই চার কুমারেরা সিদ্ধেশ্বররূপে সমস্ত যোগসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, এবং তাই তাঁরা কোন রকম যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতীতই অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করতে পারতেন। তাঁরা যখন অন্য লোক থেকে পৃথু মহারাজের কাছে আসছিলেন, তখন তাঁরা বিমানে চড়ে আসেননি, পক্ষান্তরে স্বয়ং এসেছিলেন। অর্থাৎ, এই চতুঃসন যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতীত অন্তরীক্ষ-ভ্রমণে সক্ষম আকাশচারী ছিলেন। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা অন্তরীক্ষ যান ব্যতীত এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করতে পারেন। কুমারদের বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা যেখানেই গিয়েছিলেন, সেই স্থানকেই তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত করে পবিত্র করেছিলেন। পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে, এই ভূপৃষ্ঠের সমস্ত বস্তু নিষ্পাপ হয়েছিল, এবং তাই কুমারেরা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করেছিলেন। যেই স্থান পাপপূর্ণ, সেই স্থানে তাঁরা সাধারণত যান না।

শ্লোক ৩

তদ্দর্শনোদ্গতান্ প্রাণান্ প্রত্যাদিৎসুরিবোত্থিতঃ ।
সসদস্যানুগো বৈণ্য ইন্দ্রিয়েশো গুণানিব ॥ ৩ ॥

তৎ—তাঁকে; **দর্শন**—দর্শন করে; **উদ্গতান্**—উদ্গ্রীব হয়েছিলেন; **প্রাণান্**—প্রাণ, **প্রত্যাদিৎসুঃ**—শান্তিপূর্ণভাবে গিয়ে; **ইব**—সদৃশ, **উত্থিতঃ**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, **স**—সহ, **সদস্য**—পার্ষদ ও অনুচর, **অনুগঃ**—কর্মচারীগণ, **বৈণ্যঃ**—মহারাজ পৃথু, **ইন্দ্রিয়-ঈশঃ**—জীব; **গুণান্ ইব**—যেমন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অনুবাদ

চার কুমারদের দর্শন করে, পৃথু মহারাজ তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর অমাত্যগণ সহ উত্থিত

হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

প্রতিটি বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির গুণের বিশেষ মিশ্রণের দ্বারা প্রভাবিত। তার ফলে, বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়ে, বিশেষভাবে কার্য করতে বাধ্য হয়। এখানে পৃথু মহারাজকে এই প্রকার বদ্ধ জীবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তার কারণ এই নয় যে, তিনি ছিলেন বদ্ধ জীবাত্মা। চতুঃসনদের স্বাগত জানাবার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠাকে বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তার চক্ষু সুন্দর রূপ দর্শন করতে চায়, তার কর্ণ সুন্দর সঙ্গীত শ্রবণ করতে চায়, তার নাসিকা সুন্দর ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করতে চায়, তার ত্বক স্পর্শসুখ অনুভব করতে চায় এবং তার জিহ্বা সুন্দর স্বাদ আস্বাদন করতে চায়। তেমনই হস্ত, পদ, উদর, উপস্থ, মন ইত্যাদি তার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি এতই আকৃষ্ট যে, সে কিছুতেই তাদের দমন করতে পারে না। তেমনই, পৃথু মহারাজও দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত চতুঃসনদের আকর্ষণে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন, এবং কেবল তিনিই নন, তাঁর অমাত্য ও অনুচরেরাও তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। বলা হয়, "সমরুচি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একসঙ্গে থাকেন।" এই পৃথিবীতে সকলেই তাদের নিজেদের মতো রুচিসম্পন্ন মানুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মদ্যপের প্রতি মদ্যপই আকৃষ্ট হয়। তেমনই, সাধুদের দ্বারা সাধু আকৃষ্ট হয়। পৃথু মহারাজ পারমার্থিক উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তার ফলে তিনি কুমারদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁরই মতো সমরুচি-বিশিষ্ট। তাই বলা হয়, মানুষকে চেনা যায় তার সঙ্গ থেকে।

শ্লোক ৪

গৌরবাদ্‌যন্ত্রিতঃ সভ্যঃ প্রশ্রয়ানতকন্ধরঃ ।
বিধিবৎপূজয়াঞ্চক্রে গৃহীতাধ্যর্হণাসনান্‌ ॥ ৪ ॥

গৌরবাৎ—মহিমা; **যন্ত্রিতঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **সভ্যঃ**—অত্যন্ত সুশীল; **প্রশ্রয়**—বিনয়ের দ্বারা; **আনত-কন্ধরঃ**—স্কন্ধ অবনত করে; **বিধি বৎ**—শাস্ত্রের বিধি অনুসারে; **পূজয়াম্**—আরাধনা করে; **চক্রে**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **অধি**—সহ; **অর্হণ**—স্বাগত জানাবার উপচার; **আসনান্**—আসন সমূহ।

অনুবাদ

যখন সেই মহর্ষিগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁদের যে স্বাগত জানানো হয়েছিল তা স্বীকার করে, রাজার দেওয়া আসন গ্রহণ করলেন, তখন মহারাজ পৃথু তাঁদের গৌরবের বশীভূত হয়ে, বিনয়াবনত মস্তকে তাঁদের পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই চারজন কুমারেরা হচ্ছেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম্পরা আচার্য। ব্রহ্মা, শ্রী, কুমার ও রুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে কুমার সম্প্রদায় আসছে এই চার কুমার থেকে। তাই পৃথু মহারাজ সম্প্রদায়-আচার্যদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈঃ*—শ্রীগুরুদেব অথবা সম্প্রদায়ের আচার্যকে ঠিক ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করা উচিত এই শ্লোকে *বিধিবৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ পৃথু মহারাজ নিষ্ঠা সহকাবে সৎ সম্প্রদায়েব আচার্য বা গুরুদেবকে স্বাগত জানাবার জন্য শাস্ত্রবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করেছিলেন। আচার্যকে দর্শন করা মাত্রই তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা উচিত। পৃথু মহারাজ তা যথাযথভাবে করেছিলেন; তাই এখানে *প্রশ্রয়ানত-কন্ধরঃ* শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে বিনয়বশত তিনি কুমারদের সম্মুখে প্রণত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

তৎপাদশৌচসলিলৈর্মার্জিতালকবন্ধনঃ ।
তত্র শীলবতাং বৃত্তমাচরন্মানয়ন্নিব ॥ ৫ ॥

তৎ-পাদ—তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম; **শৌচ**—ধৌত, **সলিলৈঃ**—জল; **মার্জিত**—ছিটিয়েছিলেন; **অলক**—চুল; **বন্ধনঃ**—গুচ্ছ; **তত্র**—সেখানে; **শীলবতাম্**—সম্মানিত ব্যক্তিদের; **বৃত্তম্**—আচরণ; **আচরন্**—আচরণ করেছিলেন; **মানয়ন্**—অনুশীলন করে; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

তারপর রাজা কুমারদের পাদোদক তাঁর নিজের মস্তকে সিঞ্চন করেছিলেন। এই প্রকার শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের দ্বারা কিভাবে একজন মহাত্মাকে সম্মান করতে হয়, তা রাজা একজন আদর্শ ব্যক্তিরূপে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়* । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন আচার্যরূপে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা তিনি নিজে আচরণও করেছেন, সেই কথা সুবিদিত। তিনি যখন ভক্তরূপে ভগবানের মহিমা প্রচার করছিলেন, তখন যদিও কয়েকজন মহান ব্যক্তি তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ বলে চিনতে পেরেছিলেন, তবুও কখনও তাঁকে অবতার বলে সম্বোধন করলে, তিনি তা স্বীকার করেননি। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের অবতার হন অথবা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে বিশেষভাবে আবিষ্ট হন, তবুও নিজেকে অবতার বলে ঘোষণা করা তাঁর উচিত নয়। যথাসময়ে মানুষ আপনা থেকেই প্রকৃত সত্য জানতে পারবে। পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব রাজা, তাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে কুমারদের মতো মহাপুরুষদের সম্মান করতে হয়। কোন সাধু যখন গৃহে আসেন, বৈদিক প্রথায় প্রথমে তাঁর পা ধোয়ানো হয় এবং সেই পাদোদক নিজের মাথায় ও পরিবারের অন্যদের মাথায় ছিটানো হয়। পৃথু মহারাজ তা করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন জনসাধারণের একজন আদর্শ শিক্ষক।

শ্লোক ৬

হাটকাসন আসীনান্ স্বধিষ্ণ্যেষ্বিব পাবকান্ ।
শ্রদ্ধাসংযমসংযুক্তঃ প্রীতঃ প্রাহ ভবাগ্রজান্ ॥ ৬ ॥

হাটক-আসনে—স্বর্ণনির্মিত সিংহাসনে; **আসীনান্**—যখন তাঁরা উপবিষ্ট হয়েছিলেন; **স্ব-ধিষ্ণ্যেষু**—পূজার বেদির উপর; **ইব**—সদৃশ; **পাবকান্**—অগ্নি; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **সংযম**—সংযম; **সংযুক্তঃ**—অলংকৃত হয়ে; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **প্রাহ**—বলেছিলেন, **ভব**—শিব; **অগ্রজান্**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের।

অনুবাদ

সেই চারজন মহর্ষি ছিলেন শিবের অগ্রজ, এবং তাঁরা যখন স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন, তখন তাঁরা যজ্ঞবেদিতে ঠিক জ্বলন্ত অগ্নির মতো প্রতিভাত

হচ্ছিলেন। পৃথু মহারাজ গভীর নম্রতা ও শ্রদ্ধা সহকারে অত্যন্ত সংযতভাবে বলতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে কুমারদের শিবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা থেকে যখন কুমারদের উৎপত্তি হয়েছিল, তখন ব্রহ্মা জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের বিবাহ করতে বলেছিলেন। সৃষ্টির শুরুতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অত্যন্ত আবশ্যকতা ছিল, তাই ব্রহ্মা একের পর এক পুত্র উৎপাদন করছিলেন এবং তাঁদের প্রজাসৃষ্টির আদেশ দিচ্ছিলেন। কিন্তু, তিনি যখন কুমারদের তা করতে বলেন, তখন তাঁরা সেই আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা সারা জীবন ব্রহ্মচারী থেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কুমারদের বলা হয় *নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী,* অর্থাৎ তাঁরা কখনও বিবাহ করবেন না। বিবাহ করতে অস্বীকার করার ফলে, ব্রহ্মা তাঁদের প্রতি এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর চক্ষু আরক্তিম হয়েছিল। তখন তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে শিব বা রুদ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন। ক্রোধকে তাই বলা হয় রুদ্র। শিবেরও একটি সম্প্রদায় রয়েছে, এবং সেটি রুদ্র-সম্প্রদায় নামে পরিচিত, এবং তাঁরাও বৈষ্ণব।

শ্লোক ৭

পৃথুরুবাচ

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ ।
যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্দুর্দর্শানাং চ যোগিভিঃ ॥ ৭ ॥

পৃথুঃ উবাচ—মহারাজ পৃথু বললেন; **অহো**—হে প্রভু; **আচরিতম্**—অনুশীলন; **কিম্**—কি, **মে**—আমার দ্বারা; **মঙ্গলম্**—সৌভাগ্য; **মঙ্গল-আয়নাঃ**—হে সৌভাগ্যের মূর্তবিগ্রহ; **যস্য**—যার দ্বারা; **বঃ**—আপনার; **দর্শনম্**—দর্শন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আসীৎ**—সম্ভব হয়েছে; **দুর্দর্শানাম্**—দুর্লভ দর্শন; **চ**—ও; **যোগিভিঃ**—মহান যোগীদের দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথু বললেন—হে প্রিয় মহর্ষিগণ! আপনারা সৌভাগ্যের মূর্তবিগ্রহ। আপনাদের দর্শন যোগীদেরও দুর্লভ। মানুষ কদাচিৎ আপনাদের দর্শন করতে

পারে। আমি জানি না এমন কি শুভ কার্য আমি করেছিলাম, যার ফলে আমি আপনাদের দর্শন পেলাম।

তাৎপর্য

যখন কারও পারমার্থিক জীবনে কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটে, তখন বুঝতে হবে যে, তা তাঁর অজ্ঞাত সুকৃতি বা অজ্ঞাত পুণ্যকর্মের ফল। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের দর্শন কোন সাধারণ ঘটনা নয়। যখন তা ঘটে, তখন বুঝতে হবে যে, তা পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের পরিণাম। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্*। কেউ যখন সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পুণ্যকর্মে মগ্ন হন, তখনই কেবল তিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারেন। পৃথু মহারাজের জীবন যদিও পুণ্যকর্মে পূর্ণ ছিল, তবুও তিনি কুমারদের দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। তিনি ভেবে পাননি, কি পুণ্যকর্ম তিনি করেছিলেন। এটি পৃথু মহারাজের বিনয়ের লক্ষণ। তাঁর জীবন এমনই পুণ্য কার্যকলাপে পূর্ণ ছিল যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কুমারেরাও আসবেন।

শ্লোক ৮

কিং তস্য দুর্লভতরমিহ লোকে পরত্র চ ।
যস্য বিপ্রাঃ প্রসীদন্তি শিবো বিষ্ণুশ্চ সানুগঃ ॥ ৮ ॥

কিম্—কি; **তস্য**—তাঁর; **দুর্লভ-তরম্**—অত্যন্ত দুর্লভ, **ইহ**—এই, **লোকে**—জগতে; **পরত্র**—মৃত্যুর পর; **চ**—অথবা; **যস্য**—যাঁর; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব; **প্রসীদন্তি**—প্রসন্ন হন; **শিবঃ**—সর্ব-মঙ্গলময়; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **চ**—ও; **স-অনুগঃ**—সহগামী।

অনুবাদ

যাঁর উপর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা প্রসন্ন হন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অত্যন্ত দুর্লভ যে-কোন বস্তু প্রাপ্ত হতে পারেন। কেবল তাই নয়, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সঙ্গে থাকেন যে সর্ব-মঙ্গলময় শিব ও বিষ্ণু, তাঁরাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা সর্ব-মঙ্গলময় ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বহন করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের প্রতি তাঁদের গভীর প্রেমবশত সর্বদা তাঁকে তাঁদের হৃদয়ে বহন করেন। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণেরা প্রকৃতপক্ষে ভাবাবিষ্ট হয়ে তাঁকে সর্বদাই অনুভব করেন এবং দর্শন করেন। তাই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুকে বহন করেন। যেখানেই তাঁরা যান, শ্রীবিষ্ণু, শিব ও ভগবদ্ভক্তদের তাঁরা বহন করেন। চার কুমার হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, এবং তাঁরা মহারাজ পৃথুর প্রাসাদে এসেছিলেন, অতএব স্বভাবতই শ্রীবিষ্ণু ও তাঁর ভক্তরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা যখন কারও প্রতি প্রসন্ন হন, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও সেই কথা প্রতিপন্ন করে *গুর্বষ্টকমে* গেয়েছেন—*যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদঃ* । ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর প্রসন্নতা-বিধানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা-বিধান করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান যদি প্রসন্ন হন, তা হলে আর ইহলোকে অথবা পরলোকে তাঁর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না।

শ্লোক ৯

নৈব লক্ষয়তে লোকো লোকান্ পর্যটতোঽপি যান্ ।
যথা সর্বদৃশং সর্ব আত্মানং যেঽস্য হেতবঃ ॥ ৯ ॥

ন—না; **এব**—এইভাবে; **লক্ষয়তে**—দেখতে পারে; **লোকঃ**—লোকজন; **লোকান্**—সমস্ত গ্রহলোকে; **পর্যটতঃ**—ভ্রমণ করে; **অপি**—যদিও; **যান্**—যাঁদের; **যথা**—যেমন; **সর্ব-দৃশম্**—পরমাত্মা; **সর্বে**—সকলের মধ্যে; **আত্মানম্**—সকলের অন্তরে; **যে**—যারা; **অস্য**—এই জগতের; **হেতবঃ**—কারণ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বললেন—যদিও আপনারা সমস্ত লোকে বিচরণ করেন, তবুও কেউই আপনাদের দেখতে পায় না, ঠিক যেমন সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজ

করলেও পরমাত্মাকে কেউই জানতে পারে না। এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবও পরমাত্মাকে জানতে পারেন না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বলা হয়েছে—*মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ*। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও চন্দ্র আদি দেবতারাও পরমেশ্বর ভগবানকে জানার চেষ্টা করতে গিয়ে মোহিত হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রও তাঁকে চিনতে পারেননি। অতএব যে-সমস্ত যোগী অথবা জ্ঞানীরা, যারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে নির্বিশেষ বলে মনে করে, তাদের আর কি কথা? তেমনই, কুমারদের মতো মহাপুরুষ এবং বৈষ্ণবেরাও সাধারণের দৃষ্টির অগোচর, যদিও তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে সর্বত্র বিচরণ করেন। সনাতন গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, তখন চন্দ্রশেখর আচার্য তাঁকে চিনতে পারেননি। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করলেও যেমন জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন ব্যক্তিরা এই জগতের উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, তেমনই, তাঁর শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবেরাও পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করলেও, বদ্ধ জীবেরা তাঁদের চিনতে পারে না। তাই বলা হয়েছে যে, জড় চক্ষুর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান অথবা বৈষ্ণবকে দর্শন করা যায় না। ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করতে হয়, তখন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা যায় পরমেশ্বর ভগবান কে এবং বৈষ্ণব কে।

শ্লোক ১০

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ ।
যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্যাম্বুতৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥ ১০ ॥

অধনাঃ—নির্ধন; **অপি**—যদি; **তে**—তারা; **ধন্যাঃ**—মহিমান্বিত; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **গৃহ-মেধিনঃ**—গৃহাসক্ত ব্যক্তি; **যৎ-গৃহাঃ**—যার গৃহ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অর্হবর্য**—অত্যন্ত পূজনীয়; **অম্বু**—জল; **তৃণ**—ঘাস; **ভূমি**—ভূমি; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **অবরাঃ**—ভৃত্য।

অনুবাদ

গৃহাসক্ত ব্যক্তি যদি নির্ধনও হন, তবুও তাঁর গৃহে সাধু সমাগম হলে তিনি ধন্য হন। সেই গৃহস্বামী ও তাঁর সেবক সেই মহান অতিথিকে জল, আসন ও স্বাগত জানাবার সামগ্রী প্রদান করে ধন্য হন, এবং সেই গৃহও ধন্য হয়।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক বিচারে নির্ধন ব্যক্তি ব্যর্থ, এবং পারমার্থিক বিচারে যে ব্যক্তি সংসার জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, সে-ও ব্যর্থ। কিন্তু সাধু নির্ধন অথবা গৃহের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের গৃহে যাওয়ার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। যখন তা হয়, তখন গৃহস্বামী ও তাঁর ভৃত্যরা ধন্য হন, কারণ তাঁরা তাঁর পা ধোয়ার জল প্রদান করেন, তাঁর বসার জন্য আসন দান করেন এবং তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী প্রদান করেন। অতএব সাধু যখন কোন সাধারণ মানুষের গৃহেও যান, তখন সেই ব্যক্তি তাঁর আশীর্বাদের প্রভাবে ধন্য হন। তাই বৈদিক প্রথায় সাধুদের আশীর্বাদ লাভের জন্য গৃহস্থরা তাঁদের গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। এই প্রথা ভারতবর্ষে এখনও প্রচলিত রয়েছে, এবং তাই সাধুরা যেখানেই যান, গৃহস্থরা তাঁদের সৎকার করেন, এবং প্রতিদানে তাঁরা তাঁদের দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। তাই সন্ন্যাসীদের কর্তব্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের মূল্য সম্বন্ধে অজ্ঞ গৃহস্থদের অনুগ্রহ করার জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করা।

কেউ তর্ক করতে পারে যে, সমস্ত গৃহস্থরাই ধনী নন এবং তাই তাঁদের পক্ষে বড় বড় সাধুদের সৎকার করা সম্ভব নয়, কারণ তাঁদের সঙ্গে তাঁদের শিষ্যরাও থাকেন। গৃহস্থ যদি সাধুর সৎকার করতে চান, তা হলে তাঁর অনুগামীদেরও সৎকার করতে হবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, দুর্বাসা মুনি সর্বদা তাঁর ষাট হাজার শিষ্যসহ ভ্রমণ করতেন এবং যদি আতিথ্যে একটুও ত্রুটি হত, তা হলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হতেন এবং কখনও কখনও গৃহস্বামীকে অভিশাপ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে যে-কোন গৃহস্থ, তা তিনি যতই দরিদ্র হোন না কেন, ভক্তিপূর্বক সাধুকে সম্মান করতে পারেন, এবং অন্তত একটু জল দিতে পারেন, কারণ পানীয় জল সর্বত্রই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে গৃহে যদি হঠাৎ কোন অতিথি আসেন এবং তাঁকে যদি আহার্য সামগ্রী না দেওয়া যায়, তা হলে অন্তত পক্ষে তাঁকে এক গ্লাস জল দিতে হয়। জলও যদি না থাকে, তা হলে অন্তত বসার আসন দেওয়া যায়। আর যদি আসনও না থাকে, তা হলে অন্তত ভূমি পরিষ্কার করে, সেখানে অতিথিকে বসতে অনুরোধ করা যায়। কোন গৃহস্থ যদি তাও না করতে পারেন, তা হলে অন্তত হাত জোড় করে 'স্বাগতম্' বলে অতিথিকে অভিনন্দন জানাতে পারেন। তাও যদি না করা যায়, তা হলে নিজের দরিদ্র অবস্থার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে, অশ্রু-বিসর্জন করা যায় এবং স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা যায়। এইভাবে যে-কোন অতিথিকে, তা তিনি সাধু মহাত্মাই হোন অথবা রাজা হোন, সৎকার করে তাঁর প্রসন্নতা-বিধান করা যায়।

শ্লোক ১১

ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেষ্বরিক্তাখিলসম্পদঃ ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়পাদতীর্থবিবর্জিতাঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাল—বিষধর সর্প; **আলয়**—গৃহ; **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **তেষু**—সেই গৃহে; **অরিক্ত**—পর্যাপ্তভাবে; **অখিল**—সমস্ত; **সম্পদঃ**—ঐশ্বর্য; **যৎ**—যা; **গৃহাঃ**—গৃহ; **তীর্থ-পাদীয়**—মহাপুরুষদের চরণ সম্বন্ধীয়; **পাদ-তীর্থ**—পাদোদক; **বিবর্জিতাঃ**—বিহীন।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে, যে গৃহস্থের গৃহে ভগবানের ভক্তের চরণ পড়ে না, এবং যেখানে সেই চরণ ধোয়ার জল থাকে না, সেই গৃহ যদি সমস্ত ঐশ্বর্য এবং জাগতিক উন্নতিতে পরিপূর্ণও হয়, তবুও তা বিষধর সর্পসঙ্কুল বৃক্ষের মতো।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তীর্থপাদীয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব। পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্রাহ্মণদের কিভাবে অভ্যর্থনা করতে হয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন, এই শ্লোকে, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। সাধারণত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদের জ্ঞানের আলোক প্রদান করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কষ্ট স্বীকার করেন। সন্ন্যাসী দুই প্রকার—একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী। একদণ্ডী সন্ন্যাসীরা সাধারণত শঙ্করাচার্যের অনুগামী এবং তাদের বলা হয় মায়াবাদী সন্ন্যাসী, কিন্তু ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরা রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য আদি বৈষ্ণব আচার্যদের অনুগামী, এবং তাঁরা গৃহস্থদের জ্ঞান প্রদানের কার্যে ব্যস্ত। একদণ্ডী সন্ন্যাসীরা শুদ্ধ ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, কারণ তাঁরা জানেন যে, চিন্ময় আত্মা জড় দেহ থেকে ভিন্ন, কিন্তু তাঁরা সাধারণত নির্বিশেষবাদী। বৈষ্ণবেরা জানেন যে, পরম সত্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং ব্রহ্মজ্যোতি তাঁরই দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (১৪/২৭)—*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্* । অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, *তীর্থপাদীয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে বৈষ্ণব। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৩/১০) উল্লেখ করা হয়েছে—*তীর্থী-কুর্বন্তি তীর্থানি* । বৈষ্ণব যেখানেই যান, সেই স্থানকে তিনি তীর্থস্থানে পরিণত করেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা তাঁদের পাদপদ্মের স্পর্শের দ্বারা প্রতিটি স্থানকে তীর্থস্থানে পরিণত করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে ভ্রমণ করেন। পূর্ববর্তী শ্লোকের বর্ণনা

অনুসারে, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেই গৃহ বৈষ্ণবদের অভ্যর্থনা জানায় না, সেই গৃহ বিষধর সর্পের বাসস্থান-স্বরূপ। বলা হয় যে, অত্যন্ত মূল্যবান চন্দন গাছের চারপাশে বিষধর সর্পেরা থাকে। চন্দন কাঠ অত্যন্ত শীতল, এবং বিষধর সর্পরা তাদের বিষের প্রভাবে সর্বদাই অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির এবং তাই শীতল হওয়ার জন্য তারা চন্দন-বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে তেমনই বহু ধনী ব্যক্তি আছে যাদের ঘর বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর থাকে অথবা প্রহরী থাকে, এবং তাদের ফটকে অনেক সময় ফলকে লেখা থাকে 'প্রবেশ নিষেধ', 'অনধিকার প্রবেশ নিষেধ', 'কুকুর থেকে সাবধান' ইত্যাদি। কখনও কখনও পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অনধিকার প্রবেশকারীকে গুলি করা হয়, এবং তার ফলে কোন অপরাধ হয় না। আসুরিক গৃহস্থদের এমনই অবস্থা, এবং সেই প্রকার গৃহকে বিষধর সর্পের বাসস্থান বলে বিবেচনা করা হয়। এই প্রকার পরিবারের সদস্যরা সর্পতুল্য কারণ সাপেরা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, এবং তারা যখন সাধুদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, তখন তাদের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, ক্রূর দুই প্রকার—সর্প ও খল ব্যক্তি। খল ব্যক্তি সর্পের থেকেও ভয়ঙ্কর, কারণ সর্পকে মন্ত্রের দ্বারা অথবা ওষুধের দ্বারা বশীভূত করা যায়, কিন্তু খল ব্যক্তিকে কোনভাবেই বশীভূত করা যায় না।

শ্লোক ১২

স্বাগতং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদ্‌ব্রতানি মুমুক্ষবঃ ।
চরন্তি শ্রদ্ধয়া ধীরা বালা এব বৃহন্তি চ ॥ ১২ ॥

সু-আগতম্—স্বাগত; **বঃ**—আপনাদেরকে; **দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ**—ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যাঁর; **ব্রতানি**—ব্রত; **মুমুক্ষবঃ**—মুক্তিকামী ব্যক্তির; **চরন্তি**—আচরণ করেন; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাপূর্বক; **ধীরাঃ**—সংযত, **বালাঃ**—বালক; **এব**—সদৃশ; **বৃহন্তি**—দর্শন করে; **চ**—ও।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ চতুঃসনদের দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আপনারা আপনাদের জন্ম থেকেই নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন, এবং যদিও আপনারা মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তবুও আপনারা ছোট বালকের মতো রয়েছেন।

তাৎপর্য

কুমারদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাঁদের জন্ম থেকেই তাঁরা ব্রহ্মচারী। তাঁরা নিজেদের চার পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুর মতো রেখেছেন, কারণ যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হলে, কখনও কখনও ইন্দ্রিয় বিচলিত হয় এবং তার ফলে ব্রহ্মচর্য পালন করা দুষ্কর হতে পারে। তাই কুমারেরা জেনেশুনে শিশুর মতো রয়েছেন, কারণ শিশুদের ইন্দ্রিয় কখনও যৌন বাসনার দ্বারা বিচলিত হয় না। সেটিই হচ্ছে কুমারদের মাহাত্ম্য, এবং তাই পৃথু মহারাজ তাঁদের দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করেছেন। কুমারেরা কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা থেকে জন্মগ্রহণই করেননি, তাঁদের এখানে *দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তাঁরা ছিলেন বৈষ্ণব। আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, তাঁদের প্রবর্তিত একটি সম্প্রদায় রয়েছে, এবং আজও সেই সম্প্রদায় নিম্বার্ক-সম্প্রদায় নামে প্রচলিত রয়েছে। বৈষ্ণব আচার্যদের চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় একটি। পৃথু মহারাজ বিশেষভাবে কুমারদের স্থিতির প্রশংসা করেছেন, কারণ তাঁদের জীবনের শুরু থেকেই তাঁরা ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন। পৃথু মহারাজ কুমারদের বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করার মাধ্যমে বৈষ্ণবত্বের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, সকলের কর্তব্য হচ্ছে বৈষ্ণবের জাতি, কুল ইত্যাদি বিচার না করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। *বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিঃ* করা উচিত নয়। বৈষ্ণব সর্বদাই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, এবং তাই বৈষ্ণবকে কেবল ব্রাহ্মণরূপে নয়, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠরূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত

শ্লোক ১৩

কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থার্থবেদিনাম্ ।
ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্মভিঃ ॥ ১৩ ॥

কচ্চিৎ—কি, **নঃ**—আমাদের; **কুশলম্**—সৌভাগ্য; **নাথাঃ**—হে প্রভু; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করাকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে; **অর্থ-বেদিনাম্**—যারা কেবল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন সম্বন্ধেই অবগত; **ব্যসন**—অসুখ; **আবাপে**—প্রাপ্ত হয়েছে, **এতস্মিন্**—এই জড় জগতে; **পতিতানাম্**—পতিতদের; **স্ব-কর্মভিঃ**—তাদের নিজেদের যোগ্যতার দ্বারা।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ ঋষিদের কাছে সেই প্রকার ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যারা তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে, এই ভয়ঙ্কর জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তারা কি কোন রকম সৌভাগ্য লাভ করতে পারে?

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ কুমারদের কুশল প্রশ্ন করেননি, কারণ ব্রহ্মচর্যের জীবন যাপন করার ফলে, তাঁরা সর্বদাই মঙ্গলময়। যেহেতু তাঁরা মুক্তির ব্রত আচরণ করেন, তাই তাঁদের কোন প্রকার দুর্ভাগ্যের প্রশ্নই উঠতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নিষ্ঠা সহকারে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পন্থা অনুসরণ করছেন যে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ, তাঁরা সর্বদাই সৌভাগ্যবান। যে প্রশ্নটি মহারাজ করেছিলেন, তা ছিল তাঁর নিজের জন্য, কারণ তিনি রাজকার্যের দায়িত্বে ছিলেন এবং গার্হস্থ্য আশ্রমে ছিলেন। রাজারা কেবল গৃহস্থই নন, উপরন্তু তাঁরা সাধারণত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে মগ্ন থাকেন, এবং কখনও কখনও তাঁদের মৃগয়ায় গিয়ে পশুহত্যা করতে হয়, কারণ হত্যা করার কলা তাঁদের অভ্যাস করতে হয়, তা না হলে তাঁদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসুবিধা হবে। স্ত্রীসঙ্গ, মাংসাহার, আসবপান ও দ্যূতক্রীড়া—এই চারটি পাপকর্ম ক্ষত্রিয়দের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন পাণ্ডবেরা। দুর্যোধন যখন পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেছিল, তখন তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি, এবং সেই দ্যূতক্রীড়ায় তাঁদের রাজ্য তাঁরা হারিয়েছিলেন, এবং তাঁদের পত্নীকে অপমান করা হয়েছিল। তেমনই, শত্রুপক্ষ যখন ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে আহ্বান করে, তখন ক্ষত্রিয় তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সেই সমস্ত কথা বিচার করে পৃথু মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁদের জন্য কোন মঙ্গলময় পথ রয়েছে কি না। গৃহস্থ-জীবন অমঙ্গলজনক, কারণ গৃহস্থ মানেই হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেতনা, এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে লিপ্ত হওয়া মাত্রই জীবন বিপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে। এই জড় জগৎ সম্বন্ধে বলা হয়েছে *পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্*, প্রতি পদে বিপদ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৫৮)। এই জড় জগতে সকলেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। সেই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করে উল্লেখ করে, চতুঃসনদের নিকট মহারাজ পৃথু সেই সমস্ত পতিত জীবদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যারা পূর্বকৃত পাপকর্ম অথবা অমঙ্গলজনক কর্মের ফলে এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। তাদের কি মঙ্গলময় পারমার্থিক জীবন লাভের কোন সম্ভাবনা রয়েছে? এই শ্লোকে *ইন্দ্রিয়ার্থার্থ-বেদিনাম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, এই শব্দটির দ্বারা তাদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের *পতিতানাম্* বা অধঃপতিত বলেও বর্ণনা

করা হয়েছে। যাঁরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের সমস্ত কার্যকলাপ ত্যাগ করেছেন, তাঁদেরই উন্নত বলে বিবেচনা করা হয়। আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *স্ব কর্মভিঃ* মানুষ তার পূর্বকৃত অসৎ কর্মের ফলে অধঃপতিত হয়। মানুষ তার অধঃপতিত অবস্থার জন্য নিজেই দায়ী, কারণ তার অসৎ কর্মই হচ্ছে তার অধঃপতনের কারণ। সেই সমস্ত কর্মের পরিবর্তে যখন ভগবানের সেবা শুরু হয়, তখন মঙ্গলময় জীবন শুরু হয়।

শ্লোক ১৪

ভবৎসু কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে ।
কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ভবৎসু—আপনাদেরকে, **কুশল**—সৌভাগ্য, **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন, **আত্ম-আরামেষু**—যিনি সর্বদা চিন্ময় আনন্দে মগ্ন থাকেন, **ন ঈষ্যতে**—কোন প্রয়োজন নেই, **কুশল**—সৌভাগ্য; **অকুশলাঃ**—অমঙ্গল; **যত্র**—যেখানে, **ন**—কখনই না; **সন্তি**—থাকে; **মতি-বৃত্তয়ঃ**—মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বললেন—আপনারা সর্বদা চিন্ময় আনন্দে মগ্ন, তাই আপনাদের কুশল অথবা অকুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করা উচিত নয়। মনোধর্ম-প্রসূত শুভ ও অশুভ আপনাদের মধ্যে নেই।

তাৎপর্য

চৈতন্য চরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা ৪/১৭৬) বলা হয়েছে—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব —'মনোধর্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ,'—এই সব 'ভ্রম' ॥

এই জড় জগতে ভাল ও মন্দ উভয়ই মনোধর্ম-প্রসূত, কারণ জড় জগতের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল তার প্রকাশ হয়। তাকে বলা হয় মায়া বা *আত্ম-মায়া* । স্বপ্নে অনেক কিছুর অস্তিত্ব প্রতীত হয়, তেমনই আমরা মনে করি যে, জড়া প্রকৃতি থেকে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে। চিন্ময় আত্মা কিন্তু সর্বদাই জড়াতীত। আত্মার জড়া প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই আবরণ স্বপ্ন

অথবা সম্মোহনের মতো। *ভগবদ্গীতাতেও* (২/৬২) বলা হয়েছে, *সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ*। সঙ্গ প্রভাবে আমরা কৃত্রিম জড়-জাগতিক আবশ্যকতাগুলি সৃষ্টি করি। *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে*। আমরা যখন আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হই এবং জড় জগৎকে ভোগ করতে চাই, তখন আমাদের জড় বাসনাগুলি প্রকট হয়, এবং আমরা বিভিন্ন প্রকার জড় সুখের সঙ্গলাভ করি জড় ভোগবাসনা উদয় হওয়া মাত্রই, বিভিন্ন প্রকার কামভোগের বাসনা সৃষ্টি হয়, এবং সেই ভ্রান্ত ভোগবাসনা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সুখী করতে পারে না, তখন ক্রোধ নামক আর এক প্রকার মোহের সৃষ্টি হয়, এবং ক্রোধের ফলে মোহ দৃঢ়তর হয়। এইভাবে যখন আমরা মোহাচ্ছন্ন হই, তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা আমরা ভুলে যাই, এবং কৃষ্ণভাবনামৃত হারাবার ফলে, আমাদের প্রকৃত বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়। এইভাবে আমরা এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি।

ভগবদ্গীতায় (২/৬৩) বলা হয়েছে—

ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

জড় জগতের সঙ্গ প্রভাবে আমরা আমাদের চিন্ময় চেতনা হারিয়ে ফেলি; এবং তার ফলে শুভ ও অশুভ ধারণার উদয় হয়। কিন্তু যাঁরা আত্মারাম, তাঁদের এই প্রশ্ন ওঠে না। *আত্মারাম* ধীরে ধীরে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা। প্রথমে কুমারেরা আত্ম তত্ত্ববেত্তা ব্রহ্মবাদী ছিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের লীলার প্রতি আকৃষ্ট হন। মূলকথা হচ্ছে যে, যাঁরা সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁদের কাছে শুভ ও অশুভের দ্বৈত ভাবনার উদয় হয় না। অতএব পৃথু মহারাজ কুমারদের কুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করেননি, তাঁর নিজের সম্বন্ধে তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তদহং কৃতবিশ্রম্ভঃ সুহৃদো বস্তপস্বিনাম্ ।
সংপৃচ্ছে ভব এতস্মিন্ ক্ষেমঃ কেনাঞ্জসা ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

তৎ—অতএব; **অহম্**—আমি; **কৃত-বিশ্রম্ভঃ**—সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়ে; **সু-হৃদঃ**—বন্ধু; **বঃ**—আমাদের; **তপস্বিনাম্**—জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট; **সম্পৃচ্ছে**—প্রশ্ন

করতে ইচ্ছা করি, **ভবে**—এই জড় জগতে; **এতস্মিন্**—এই; **ক্ষেমঃ**—পরম বাস্তবতা; **কেন**—কোন্ উপায়ে; **অঞ্জসা**—অবিলম্বে; **ভবেৎ**—লাভ করা যায়।

অনুবাদ

আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আপনাদের মতো মহর্ষিরা সংসাররূপী দাবানলে সন্তপ্ত ব্যক্তিদের একমাত্র সুহৃৎ। তাই আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, কিভাবে আমরা অচিরে এই জড় জগতে আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য-সাধন করতে পারি।

তাৎপর্য

সাধুরা যখন জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাঁরা তা করছেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বিষয়ীদের কাছে যান, বাস্তবিক মঙ্গল সম্বন্ধে তাদের জানাবার জন্য। পৃথু মহারাজ তা পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন; তাই কুমারদের কুশল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে সময় নষ্ট না করার পরিবর্তে, তিনি অচিরে এই জড় জগতের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারবেন কি না, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পৃথু মহারাজও আবার নিজের জন্য সেই প্রশ্নটি করেননি, তিনি এই প্রশ্নটি করেছিলেন, কেননা সাধারণ মানুষেরা যাতে সাধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই, তাঁদের শরণাগত হয়ে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার বেদনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁদের নিকট প্রশ্ন করে, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে, জুড়াইতে না কৈনু উপায়।* "আমরা নিরন্তর জড় জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা জর্জরিত, আমাদের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে, কিন্তু সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভের কোন চেষ্টা আমরা করিনি।" বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদেরও *তপস্বী* বলা যায়, কারণ সেই শব্দটির অর্থ হচ্ছে যারা সর্বদা জড়-জাগতিক কষ্ট ভোগ করছে। কেউ যখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই সমস্ত জড়-জাগতিক কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর সেই কথারও বিশ্লেষণ করেছেন—*"গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্তন, রতি না জন্মিল কেন তায়।"* নরোত্তম দাস ঠাকুর অনুশোচনা করে বলেছেন যে, গোলোকের সব চাইতে দুর্লভ সম্পদ যে হরিনাম সংকীর্তন, তার প্রতি তাঁর অনুরাগের উদয় হল না। অর্থাৎ এই জড় জগতে সকলেই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, এবং কেউ যদি তা থেকে উদ্ধার লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সাধু

মহাত্মাদের সঙ্গ করতে হবে, এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করতে হবে সেটিই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের মঙ্গল সাধনের একমাত্র পন্থা

শ্লোক ১৬

ব্যক্তমাত্মবতামাত্মা ভগবানাত্মভাবনঃ ।
স্বানামনুগ্রহায়েমাং সিদ্ধরূপী চরত্যজঃ ॥ ১৬ ॥

ব্যক্তম্—স্পষ্ট, **আত্ম-বতাম্**—অধ্যাত্মবাদীদের, **আত্মা**—জীবনের লক্ষ্য, **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান, **আত্ম-ভাবনঃ**—জীবদের উন্নতিসাধনে সর্বদা উৎসুক; **স্বানাম্**—তাঁর নিজের ভক্তদের, **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ইমাম্**—এইভাবে, **সিদ্ধ-রূপী**—সম্পূর্ণরূপে স্বরূপসিদ্ধ, **চরতি**—ভ্রমণ করেন; **অজঃ**—নারায়ণ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবদের উন্নতিসাধনে অত্যন্ত আগ্রহী, এবং তাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য, তিনি আপনাদের মতো স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিরূপে পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রকার পরমার্থবাদী রয়েছেন, যেমন জ্ঞানী বা ব্রহ্মবাদী, যোগী ও ভগবদ্ভক্ত, কুমারেরা প্রথমে যোগী ও জ্ঞানী ছিলেন এবং অবশেষে তাঁরা ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন। আদিতে তাঁরা ছিলেন ব্রহ্মবাদী, কিন্তু পরে তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হন; তাই তাঁরা হচ্ছেন পরমার্থবাদীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, এবং বদ্ধ জীবদের শুদ্ধ চেতনায় উন্নীত করার জন্য এবং তাদের কৃষ্ণভক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। শ্রেষ্ঠ ভক্তদের বলা হয় *আত্মবৎ*, অথবা যাঁরা পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে তাদের কৃষ্ণচেতনার স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছেন। তাই তাঁকে বলা হয় *আত্ম-ভাবন*। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জীবদের বুদ্ধি প্রদান করার চেষ্টা করছেন, যাতে তারা তাঁকে জানতে পারে। তিনি সকলের সখারূপে তাদের সঙ্গে রয়েছেন, এবং প্রতিটি জীবকে তার বাসনা অনুসারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন।

এই শ্লোকে *আত্মবতাম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন, যথা *কনিষ্ঠ অধিকারী*, *মধ্যম-অধিকারী* ও *উত্তম-অধিকারী*—নব্য ভক্ত, প্রচারক ভক্ত ও *মহা-ভাগবত*। *উত্তম অধিকারী* ভক্তের বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান রয়েছে, তাই তিনি ভগবদ্ভক্ত হয়েছেন। তিনি নিজেই কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ নন, অন্যদেরও বৈদিক শাস্ত্র-প্রমাণের মাধ্যমে তিনি প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারেন। উত্তম ভক্ত সমস্ত জীবদের পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করতে পারেন, এবং তাই তাঁর দৃষ্টিতে কোন ভেদভাব থাকে না। *মধ্যম-অধিকারী* (প্রচারক) ভক্তও শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ এবং অন্যদের প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারেন, কিন্তু তিনি অনুকূল-ভাবাপন্ন ও প্রতিকূল-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করেন। অর্থাৎ, *মধ্যম-অধিকারী* ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরদের উপেক্ষা করেন, এবং *কনিষ্ঠ-অধিকারী* ভক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে খুব একটা না জানলেও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ। কুমারেরা কিন্তু ছিলেন *মহাভাগবত*, কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরমতত্ত্ব অধ্যয়ন করার পর, তাঁরা ভগবদ্ভক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, তাঁরা বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভক্ত অনেক রয়েছে, কিন্তু যে ভক্ত বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, তিনি তাঁর সব চাইতে প্রিয়। সকলেই তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী উচ্চতম পদে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছে। দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণ কর্মীরা পূর্ণমাত্রায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে। জ্ঞানীদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু ভক্তের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রচার করা। তাই ভক্তরা হচ্ছেন বাস্তবিকই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, এবং তাই তাঁরা প্রত্যক্ষ নারায়ণরূপে পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন, কারণ তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে নারায়ণকে বহন করেন এবং তাঁর মহিমা প্রচার করেন। নারায়ণের প্রতিনিধি নারায়ণেরই মতো, কিন্তু তা বলে মায়াবাদীদের মতো কখনও নিজেকে নারায়ণ বলে মনে করা উচিত নয়। মায়াবাদীরা সাধারণত সন্ন্যাসীদের নারায়ণ বলে সম্বোধন করে। তাদের ধারণা যে, কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করার ফলে, মানুষ নারায়ণের সমতুল্য হয়ে যায় অথবা স্বয়ং নারায়ণ হয়ে যায়। বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন, এবং সেই সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে, ভগবদ্ভক্ত নিজে নারায়ণ হয়ে গিয়ে নারায়ণের সমতুল্য হন না, পক্ষান্তরে নারায়ণের পরম বিশ্বস্ত সেবকরূপে নারায়ণের সমতুল্য হন। এই প্রকার মহাত্মা জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য গুরুর কার্য করেন, এবং যেই গুরুদেব নারায়ণের মহিমা প্রচার করেন, তাঁকে নারায়ণ সদৃশ বলে মনে করে সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।

শ্লোক ১৭

মৈত্রেয় উবাচ

পৃথোস্তৎসূক্তমাকর্ণ্য সারং সুষ্ঠু মিতং মধু ।
স্ময়মান ইব প্রীত্যা কুমারঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **তৎ**—তা; **সূক্তম্**—বৈদিক সিদ্ধান্ত; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **সারম্**—অত্যন্ত সারগর্ভ; **সুষ্ঠু**—উপযুক্ত, **মিতম্**—পরিমিত, **মধু**—শ্রুতিমধুর; **স্ময়মানঃ**—ঈষৎ হেসে; **ইব**—সদৃশ; **প্রীত্যা**—পরম প্রসন্নতাপূর্বক; **কুমারঃ**—ব্রহ্মচারী, **প্রত্যুবাচ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **হ**—এইভাবে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার পৃথু মহারাজের অত্যন্ত সারগর্ভ, উপযুক্ত, স্বল্পাক্ষর ও শ্রুতিমধুর বাক্য শ্রবণ করে পরম প্রসন্নতা সহকারে ঈষৎ হেসে বলতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

কুমারদের কাছে পৃথু মহারাজ যে-কথা বলেছিলেন, তা অনেক গুণযুক্ত হওয়ার ফলে, অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। ভাষণ মনোনীত শব্দের দ্বারা রচিত হওয়া উচিত, এবং তা শ্রুতিমধুর পরিস্থিতির অনুকূল হওয়া উচিত। সেই প্রকার বাণীকে বলা হয় অর্থযুক্ত। পৃথু মহারাজের বাণীতে সেই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি উপস্থিত ছিল, কারণ তিনি হচ্ছেন একজন আদর্শ ভক্ত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ*—"যিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাপরায়ণ এবং তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁর মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণ প্রকাশিত হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২) তাই কুমারেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং সনৎকুমার এইভাবে বলতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

সনৎকুমার উবাচ

সাধু পৃষ্টং মহারাজ সর্বভূতহিতাত্মনা ।
ভবতা বিদুষা চাপি সাধূনাং মতিরীদৃশী ॥ ১৮ ॥

সনৎ-কুমারঃ উবাচ—সনৎকুমার বললেন; **সাধু**—সাধু প্রকৃতির; **পৃষ্টম্**—প্রশ্ন; **মহারাজ**—হে রাজন্; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবদের; **হিত-আত্মনা**—যিনি সকলের মঙ্গল কামনা করেন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **বিদুষা**—অত্যন্ত বিদ্বান; **চ**—এবং; **অপি**—যদিও; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **ঈদৃশী**—এই প্রকার।

অনুবাদ

সনৎকুমার বললেন—হে পৃথু মহারাজ! আপনি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এই প্রকার প্রশ্ন সমস্ত জীবের পক্ষে লাভপ্রদ; বিশেষ করে সর্বদা অন্যদের হিতাকাঙ্ক্ষী আপনার মতো ব্যক্তি তা উত্থাপন করেছেন। যদিও আপনি সব কিছু জানেন, তবুও আপনি এই প্রশ্ন করেছেন, কারণ এটিই হচ্ছে সাধুদের আচরণ। এই প্রকার বুদ্ধি আপনার মতো ব্যক্তিরই উপযুক্ত।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ দিব্যজ্ঞানে পারঙ্গত ছিলেন, তবুও কুমারদের কাছে তিনি নিজেকে একজন মূর্খের মতো উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মানুষ যতই মহান ও বিজ্ঞ হোন না কেন, গুরুজনদের সম্মুখে তাঁর প্রশ্ন করা উচিত। যেমন, অর্জুন যদিও দিব্যজ্ঞান সমন্বিত ছিলেন, তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, যেন তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। তেমনই, পৃথু মহারাজও সব কিছু জানতেন, তবুও তিনি কুমারদের কাছে এমনভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, যেন তিনি কিছুই জানতেন না। মহান ব্যক্তিরা যখন পরমেশ্বর ভগবান অথবা ভগবদ্ভক্তের কাছে প্রশ্ন করেন, তখন সেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের মঙ্গলসাধন করা। তাই কখনও কখনও মহাপুরুষেরা জেনে শুনে উচ্চতর মহাজনদের কাছে প্রশ্ন করেন, কারণ তাঁরা সর্বদা অন্যের কল্যাণ চিন্তা করেন।

শ্লোক ১৯

সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাং চ সম্মতঃ ।
যৎসম্ভাষণসম্প্রশ্নঃ সর্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥ ১৯ ॥

সঙ্গমঃ—সঙ্গ, **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **সাধূনাম্**—ভক্তদের, **উভয়েষাম্**—উভয়ের জন্য; **চ**—ও, **সম্মতঃ**—চূড়ান্ত, **যৎ**—যা; **সম্ভাষণ**—আলোচনা, **সম্প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন ও উত্তর, **সর্বেষাম্**—সকলের; **বিতনোতি**—বিস্তার করে, **শম্**—প্রকৃত সুখ

অনুবাদ

যখন ভগবদ্ভক্তদের সমাবেশ হয়, তখন তাঁদের আলোচনা, প্রশ্ন ও উত্তর শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই অভিলষিত হয়। তাই এই প্রকার সমাগম সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক এবং প্রকৃত সুখদায়ক।

তাৎপর্য

ভক্তদের মধ্যে যে আলোচনা হয়, তা শ্রবণ করাই পরমেশ্বর ভগবানের বীর্যবতী বার্তা শ্রবণ করার একমাত্র উপায়। যেমন, *ভগবদ্গীতা* দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে, কিন্তু যেহেতু ভক্তদের দ্বারা তার বিষয়বস্তু আলোচনা হয়নি, তাই তার প্রভাব বিস্তার হয়নি। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে, পাশ্চাত্য জগতে একজনও কৃষ্ণভক্ত হয়নি। কিন্তু গুরুপরম্পরা ধারায় যখন সেই *ভগবদ্গীতার* বাণীই প্রদান করা হল, তখন তার পারমার্থিক উপলব্ধির প্রভাব তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেল।

কুমারদের অন্যতম সনৎকুমার পৃথু মহারাজকে বলেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ কেবল পৃথু মহারাজের পক্ষেই লাভপ্রদ হয়নি, তা কুমারদের পক্ষেও লাভপ্রদ হয়েছিল। নারদ মুনি যখন ব্রহ্মার কাছে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তাই কোন সাধু যখন অন্য কোন সাধুর কাছে পরমেশ্বর ভগবান অথবা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন তা সব কিছুকে চিন্ময় করে তোলে। যে ব্যক্তি এই প্রকার আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করেন তিনি ইহজন্মে এবং পরজন্মেও লাভবান হন।

উভয়েষাম্ শব্দটি নানাভাবে বর্ণনা করা যায়। সাধারণত দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী। ভগবদ্ভক্তদের আলোচনা শ্রবণ করে জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী উভয়েই লাভবান হন। ভক্তসঙ্গে জড়বাদীর এই লাভ হয় যে, তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার ফলে তার পক্ষে ভক্ত হওয়া অথবা জীবের বাস্তবিক স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সম্ভাবনা বর্ধিত হয়। মানুষ যখন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, তখন পরবর্তী জন্মে তার মনুষ্য জীবন লাভ করা সুনিশ্চিত হয়, অথবা তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। অর্থাৎ, মূলকথা হচ্ছে যে, ভগবদ্ভক্তের আলোচনায় যদি

কেউ যোগদান করেন, তা হলে তিনি জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় দিক দিয়েই লাভবান হন। শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই লাভ হয়, এবং কর্মী ও জ্ঞানী উভয়েরই লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে পারমার্থিক বিষয়ে আলোচনা সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক। তাই কুমারেরা স্বীকার করেছিলেন যে, এই সাক্ষাতের ফলে কেবল রাজাই লাভবান হননি, কুমারেরাও লাভবান হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

অস্ত্যেব রাজন্ ভবতো মধুদ্বিষঃ
পাদারবিন্দস্য গুণানুবাদনে ।
রতির্দুরাপা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকী
কামং কষায়ং মলমন্তরাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

অস্তি—আছে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভবতঃ**—আপনার; **মধু-দ্বিষঃ**—ভগবানের; **পাদ-অরবিন্দস্য**—শ্রীপাদপদ্মের; **গুণ-অনুবাদনে**—মহিমা কীর্তনে; **রতিঃ**—আসক্তি; **দুরাপা**—অত্যন্ত কঠিন; **বিধুনোতি**—ধৌত করে; **নৈষ্ঠিকী**—নিষ্ঠাপরায়ণ; **কামম্**—কামাত্মক; **কষায়ম্**—অতিবর্জিত কামবাসনা; **মলম্**—নোংরা; **অন্তঃ-আত্মনঃ**—অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে।

অনুবাদ

সনৎকুমার বললেন—হে রাজন্! পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের মহিমা কীর্তনে আপনি ইতিমধ্যেই অনুরক্ত। এই প্রকার অনুরাগ অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রতি এই প্রকার অবিচলিত শ্রদ্ধা লাভ করে, তখন আপনা থেকেই তার অন্তরের সমস্ত কামবাসনা বিধৌত হয়।

তাৎপর্য

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২৫)

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হলে, ভগবানের কৃপায় জড়বাদী মানুষদের হৃদয়ের সমস্ত কলুষ ধীরে ধীরে বিধৌত হয়। পালিশ করা হলে রূপা যেমন উজ্জ্বল হয়, তেমনই

ভগবদ্ভক্তের সৎসঙ্গের প্রভাবে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের হৃদয় কামবাসনা থেকে মুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে জড় সুখ বা কামবাসনার সঙ্গে জীবের কোন সম্পর্ক নেই। তা ঠিক নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার মতো, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সে জেগে ওঠে, এবং তৎক্ষণাৎ চিন্ময় আত্মা নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাসরূপে চিনতে পেরে তার স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়। পৃথু মহারাজ ছিলেন স্বরূপসিদ্ধ নিত্যমুক্ত আত্মা, তাই পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করার স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর ছিল, এবং কুমারেরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভগবানের দৈবী মায়ার বশীভূত হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর ছিল না। অর্থাৎ, ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার পন্থাই হচ্ছে হৃদয়কে জড় কলুষ থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায়। কর্ম, জ্ঞান ও যোগের পন্থায় কখনও হৃদয়ের কলুষ দূর করা যায় না, কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন, তখন আপনা থেকেই তাঁর হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূর হয়ে যায়।

শ্লোক ২১

শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং
ক্ষেমস্য সধ্র্যগ্বিমৃশেষু হেতুঃ ।
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি
দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যা ॥ ২১ ॥

শাস্ত্রেষু—শাস্ত্রে; **ইয়ান্ এব**—কেবল এই; **সু-নিশ্চিতঃ**—স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে; **নৃণাম্**—মানব-সমাজে; **ক্ষেমস্য**—চরম কল্যাণের; **সধ্র্যক্**—পূর্ণরূপে; **বিমৃশেষু**—সম্যক্ বিবেচনার দ্বারা; **হেতুঃ**—কারণ, **অসঙ্গঃ**—বৈরাগ্য; **আত্ম-ব্যতিরিক্তে**—দেহাত্মবুদ্ধি; **আত্মনি**—পরমাত্মার প্রতি; **দৃঢ়া**—বলবতী; **রতিঃ**—আসক্তি; **ব্রহ্মণি**—চিন্ময়, **নির্গুণে**—জড়া প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানে; **চ**—এবং; **যা**—যা।

অনুবাদ

শাস্ত্রে পূর্ণরূপে বিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, মানব-সমাজের কল্যাণের চরম লক্ষ্য হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধিতে আসক্তি-রহিত হওয়া এবং নির্গুণ ও চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি গভীর অনুরাগ লাভ করা।

তাৎপর্য

মানব-সমাজে সকলেই জীবনের পরম কল্যাণ লাভের চেষ্টায় যুক্ত, কিন্তু যারা দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণ, তারা জীবনের চরম উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে না, এমন কি

তা যে কি, তা পর্যন্ত তারা বুঝতে পারে না। জীবনের পরম উদ্দেশ্য *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) বর্ণিত হয়েছে। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* । মানুষ যখন জীবনের পরম লক্ষ্য খুঁজে পায়, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই জড় দেহের প্রতি অনাসক্ত হয়। এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, চিন্ময় জগতের প্রতি (*ব্রহ্মণি*) আসক্তি দৃঢ়ভাবে বর্ধিত করা উচিত। *বেদান্ত-সূত্রে* (১/১/১) প্রতিপন্ন হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* —পরমেশ্বর ভগবান অথবা ব্রহ্মের অনুসন্ধান ব্যতীত, জড় জগতের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা যায় না। ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনিতে বিবর্তনের পন্থায় জীবনের চরম উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, কারণ সেই সমস্ত দেহে দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। *অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার* অর্থ হচ্ছে যে, দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে হলে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হয় অথবা তার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করতে হয়। তখন চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* । ব্রহ্মে আসক্তি বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত, তারা দীর্ঘকাল সেই আসক্তি বজায় রাখতে পারে না। নির্বিশেষবাদীরা এই জগৎকে মিথ্যা বলে তা বর্জন করার পর, পুনরায় এই মিথ্যা জগতে ফিরে আসে, যদিও তারা ব্রহ্মে আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে। তেমনই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মতো বহু যোগী পরমাত্মারূপী ব্রহ্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে গিয়ে, নারীর শিকার হয়ে অধঃপতিত হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করার উপদেশ সমস্ত শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এটিই একমাত্র পন্থা, এবং সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) বলা হয়েছে *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* । কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত স্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বৈষয়িক কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভগবৎ প্রেমকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে উপদেশ দিয়েছেন (*প্রেমা পুমার্থো মহান্*)। ভগবৎ প্রেম বৃদ্ধি না করে, পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

শ্লোক ২২

সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্মচর্যয়া
　　জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া ।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং
　　পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ ॥ ২২ ॥

সা—সেই ভগবদ্ভক্তি; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে; **ভগবৎ-ধর্ম**—ভগবদ্ভক্তি; **চর্যয়া**—আলোচনার দ্বারা; **জিজ্ঞাসয়া**—জিজ্ঞাসার দ্বারা; **অধ্যাত্মিক**—পারমার্থিক; **যোগ-নিষ্ঠয়া**—পারমার্থিক উপলব্ধির দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে; **যোগ-ঈশ্বর**—পরমেশ্বর ভগবান; **উপাসনয়া**—তাঁর আরাধনার দ্বারা; **চ**—এবং; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **পুণ্য-শ্রবঃ**—যা শ্রবণ করার ফলে; **কথয়া**—আলোচনার দ্বারা; **পুণ্যয়া**—পুণ্যের ফলে; **চ**—ও।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে, তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও জীবনে ভক্তিযোগের পন্থা প্রয়োগ করার দ্বারা যোগেশ্বর ভগবানের আরাধনা এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার ফলে, ভগবানের প্রতি আসক্তি বর্ধিত হয়। এই সমস্ত কার্য পরম পবিত্র।

তাৎপর্য

যোগেশ্বর শব্দটি পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ভক্ত উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। *ভগবদ্গীতাতে* দুই জায়গায় এই শব্দটির উল্লেখ হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮/৭৮) শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান শ্রীহরি বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি হচ্ছেন সমস্ত যোগের ঈশ্বর (*যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ*)। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও (৬/৪৭) যোগেশ্বরেব বর্ণনা কবা হয়েছে—*স মে যুক্ততমো মতঃ* । এই *যুক্ততম* শব্দটি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী—ভক্তকে ইঙ্গিত করে, যাঁকে *যোগেশ্বরও* বলা যায়। এই শ্লোকে *যোগেশ্বর-উপাসনা* কথাটির অর্থ শুদ্ধ ভক্তের সেবা। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, "*ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পাএগছে কেবা।* " শুদ্ধ ভক্তের সেবা ব্যতীত পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করা যায় না। প্রহ্লাদ মহারাজও বলেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/৩২)

জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তিরহিত এবং ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত শুদ্ধ ভক্তেব আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। তাঁর সেবার ফলেই কেবল গুণময়ী জড় জগৎ অতিক্রম করা যায়। এই শ্লোকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা ভক্তের সেবা করার

উপদেশ দেওয়া হয়েছে (*যোগেশ্বর-উপাসনয়া*)। সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের সেবা করার অর্থ হচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা। শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার ফলে, পবিত্র জীবন লাভ হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* (৭/২৮) বলা হয়েছে যে, পুণ্যবান না হলে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায় না।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

ভগবানের সেবায় স্থিত হতে হলে, জড়া প্রকৃতির সমস্ত কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হতে হয়। ভগবদ্ভক্তির শুরুতেই সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, *আদৌ গুর্বাশ্রয়ম্*, এবং সদ্গুরুর কাছে পারমার্থিক ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হয় (*সদ্ধর্ম-পৃচ্ছা*), এবং মহান ভগবদ্ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয় (*সাধুমার্গ-অনুগমনম্*)। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী এই উপদেশগুলি দিয়েছেন।

মূল কথা হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সদ্গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং তাঁর কাছ থেকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে হয়, এবং তাঁর কাছ থেকে ভগবানের বাণী ও মহিমা শ্রবণ করতে হয়। এইভাবে যখন ভগবদ্ভক্তিতে বিশ্বাস জন্মায়, তখন অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি বর্ধিত হয়

শ্লোক ২৩

অর্থেন্দ্রিয়ারামসগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরেগুর্ণপীযুষপানাৎ ॥ ২৩ ॥

অর্থ—ধনসম্পদ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আরাম**—তৃপ্তি; **স-গোষ্ঠী**—তাদের সঙ্গীগণ-সহ; **অতৃষ্ণয়া**—বিতৃষ্ণার দ্বারা; **তৎ**—তা, **সম্মতানাম্**—তাদের দ্বারা অনুমোদিত; **অপরিগ্রহেণ**—অস্বীকার করার ফলে; **চ**—ও; **বিবিক্ত-রুচ্যা**—অরুচি; **পরিতোষে**—সুখ; **আত্মনি**—স্বীয়; **বিনা**—ব্যতীত; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গুণ**—গুণাবলী, **পীযূষ**—অমৃত; **পানাৎ**—পান করার ফলে।

অনুবাদ

পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করতে হলে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পরায়ণ ও অর্থলোলুপ ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হয়। কেবল সেই প্রকার ব্যক্তিকেই নয়, এমন কি যারা তাদের সঙ্গে সঙ্গ করে, তাদের সঙ্গও পরিত্যাগ করতে হয়। মানুষের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে ভগবান শ্রীহরির মহিমারূপ অমৃত পান না করে সে শান্তিতে থাকতে পারে না। এইভাবে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে, পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা যায়।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই ধনসম্পদ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যথাসম্ভব ধন উপার্জন করা এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে তা ব্যয় করা। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ বর্ণনা করে বলেছেন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ২/১/৩)

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের এটিই হচ্ছে আদর্শ উদাহরণ। রাত্রিবেলা ছয় ঘণ্টার বেশি ঘুমিয়ে অথবা মৈথুন ক্রিয়ায় তারা তাদের সময়ের অপচয় করে। এটি হচ্ছে তাদের রাতের কর্ম, আর দিনের বেলায় তারা অফিসে অথবা ব্যবসার স্থানে গিয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। কিছু টাকা পাওয়া মাত্রই তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য নানান জিনিস খরিদ করে। এই প্রকার ব্যক্তিরা কখনও জীবনের মাহাত্ম্য বুঝতে চেষ্টা করে না। ভগবান কে, জীবাত্মা কি, ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কি, ইত্যাদি সম্বন্ধে তারা কখনও ভেবে দেখে না বর্তমানে অবস্থার এতই অবনতি হয়েছে যে, যাদের ধার্মিক বলে মনে করা হয়, তারাও কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত। এই কলিযুগে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা অন্যান্য যুগের থেকে অনেক বেশি; তাই যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষদের সেবা করা, এবং সেই সঙ্গে ধন উপার্জন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনই যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা। তাই বলা হয়েছে—*ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৪২)। ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতিসাধন করতে হলে, জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি বিরক্ত হতে হবে। যে বিষয় ভক্তের তৃপ্তিসাধন করে, তা অভক্তদের কাছে সম্পূর্ণ অরুচিকর।

কেবল নিষ্ক্রিয় হলে অথবা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করলেই হবে না, যথাযথ বৃত্তিতে যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কখনও কখনও দেখা যায় যে, পারমার্থিক উন্নতিসাধনে আগ্রহী ব্যক্তিরা বৈষয়িক ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করে নির্জন স্থানে যান, যা যোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু তাও পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের সহায়ক হবে না, কারণ অনেক সময় দেখা গেছে যে, এই প্রকার যোগীদেরও অধঃপতন হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করার ফলে, জ্ঞানীরাও অধঃপতিত হয়। নির্বিশেষবাদী অথবা শূন্যবাদীরা জড়-জাগতিক সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু তারা ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়ার ফলে, চিন্ময় স্তরে স্থির থাকতে পারে না। ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে। সেই কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে—*বিনা হরের্গুণ-পীযূষপানাৎ*। ভগবানের মহিমা-অমৃত পান করতে হবে, অর্থাৎ, সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করতে হবে। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের প্রধান পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই উপদেশ দিয়েছেন, যা আমরা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে দেখতে পাই। কেউ যদি পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করতে চান, তা হলে তাঁর মহা সৌভাগ্যের ফলে তিনি সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন এবং তাঁর কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারেন। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই কৃপার ফলে, তিনি ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্ত হন, এবং তিনি যদি সেই বীজ তাঁর হৃদয়ে রোপণ করেন এবং তাতে শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চন করেন, তা হলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেই ভক্তিলতা বর্ধিত হতে থাকে, সেই ভক্তিলতা এতই প্রবল যে, তা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে চিৎ জগতে গিয়ে পৌঁছায় এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত, তা বর্ধিত হতে থাকে, ঠিক যেমন সাধারণ লতা ছাদের আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত বর্ধিত হতে থাকে। তার পর তাতে বাঞ্ছিত ফল ফলে। এই ফল উৎপন্ন হওয়ার প্রকৃত কারণ হচ্ছে শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল ভক্তিলতায় সিঞ্চন করা। এর তাৎপর্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে আগ্রহী মানুষ ভক্তসঙ্গ ব্যতীত থাকতে পারেন না; তাঁকে অবশ্যই ভক্তসঙ্গে বাস করতে হয়, যেখানে তিনি নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছে, যাতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের শত শত কেন্দ্র মানুষকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করার এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকার সুযোগ দিতে পারে, এবং তার ফলে মানুষ তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে।

শ্লোক ২৪

অহিংসয়া পারমহংস্যচর্যয়া
স্মৃত্যা মুকুন্দাচরিতাগ্র্যসীধুনা ।
যমৈরকামৈর্নিয়মৈশ্চাপ্যনিন্দয়া
নিরীহয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ ॥ ২৪ ॥

অহিংসয়া—অহিংসার দ্বারা; **পারমহংস্য-চর্যয়া**—মহান আচার্যদেব পদাঙ্ক অনুসরণের দ্বারা; **স্মৃত্যা**—স্মরণের দ্বারা, **মুকুন্দ**—পরমেশ্বর ভগবান, **আচরিত-অগ্র্য**—কেবল তাঁর কার্যকলাপ প্রচার করার ফলে, **সীধুনা**—অমৃতের দ্বারা; **যমৈঃ**—বিধিনিষেধ পালনের দ্বারা, **অকামৈঃ**—বিষয় বাসনা-রহিত; **নিয়মৈঃ**—নিষ্ঠা সহকারে নিয়মসমূহ পালনের দ্বারা, **চ**—ও, **অপি**—নিশ্চিতভাবে, **অনিন্দয়া**—নিন্দা না করে, **নিরীহয়া**—সরলভাবে জীবন যাপন করে, **দ্বন্দ্ব**—দ্বৈতভাব, **তিতিক্ষয়া**—সহিষ্ণুতার দ্বারা, **চ**—এবং।

অনুবাদ

পারমার্থিক উন্নতিসাধনে যিনি আগ্রহী, তাঁর পক্ষে অবশ্যই অহিংসা, আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ, সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলা স্মরণ, বিষয় বাসনা-রহিত হয়ে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ পালন, এগুলি অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার সময়, কখনও অপরের নিন্দা করা উচিত নয়। ভক্তের কর্তব্য সরল জীবন যাপন করা এবং বিরোধী তত্ত্বের দ্বৈতভাবের দ্বারা বিচলিত না হওয়া। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সেগুলি সর্বদা সহ্য করতে চেষ্টা করা।

তাৎপর্য

ভক্তেরা প্রকৃতপক্ষে সাধু। সাধু বা ভক্তের প্রথম গুণ হচ্ছে অহিংসা। যারা ভগবদ্ভক্তির মার্গে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক, অথবা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী, তাদের প্রথমেই অহিংসার আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। সাধুর বর্ণনা করে বলা হয়েছে *তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২১)। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং অন্যের প্রতি কৃপালু হওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তিনি নিজে আহত হলে তা সহ্য করেন, কিন্তু অন্য কেউ যদি আঘাত পায়, ভগবদ্ভক্ত তখন তা সহ্য করেন না। সারা পৃথিবী হিংসায় পূর্ণ এবং ভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সেই হিংসা বন্ধ করা, বিশেষ করে অনর্থক যে পশুহত্যা হচ্ছে

তা বন্ধ করা। ভগবদ্ভক্ত কেবল মানব-সমাজেরই সুহৃৎ নন, তিনি সমস্ত জীবের পরম বন্ধু, কারণ তিনি সমস্ত জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তানরূপে দর্শন করেন। তিনি কেবল নিজেকে ভগবানের সন্তান বলে দাবি করে অন্যদের আত্মা নেই বলে তাদের হত্যা করতে অনুমোদন করেন না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও এই প্রকার বিচারধারা পোষণ করেন না। তিনি *সুহৃদঃ সর্ব-দেহিনাম্*—ভগবানের প্রকৃত ভক্ত সমস্ত জীবদের পরম বন্ধু। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবদের পিতা; তাই কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। তাকে বলা হয় *অহিংসা*। এই প্রকার অহিংসার আচরণ তখনই সম্ভব, যখন আমরা মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। তাই, বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে, আমাদের চারটি সম্প্রদায়ের মহান আচার্যদের বা গুরু-পরম্পরার অনুসরণ করতে হয়।

গুরু পরম্পরা ব্যতীত পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা হাস্যকর। তাই বলা হয়েছে *আচার্যবান্ পুরুষো বেদ*—যিনি আচার্য পরম্পরাকে অনুসরণ করেন, তিনি বস্তুকে প্রকৃতরূপে জানতে পারেন (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/১৪/২)। *তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*—দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/২/১২)। পারমার্থিক জীবনে *স্মৃত্যা* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *স্মৃত্যা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা। জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হয়, যাতে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ না করে থাকা না যায়। এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যাতে খাওয়ার সময়, শোয়ার সময়, চলার সময়, কাজ করার সময় সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকা যায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে উপদেশ দেওয়া হয় যে, আমাদের জীবন যেন আমরা এমনভাবে গড়ে তুলি, যাতে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করা যায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে ভক্তরা যখন 'স্পিরিচুয়াল স্কাই' নামক আগরবাতি তৈরি করে, তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণভক্তের মহিমা শ্রবণ করে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ*—সর্বদাই শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত। *বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ*—কখনও বিষ্ণুকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক জীবন—*স্মৃত্যা*। আমরা যদি নিরন্তর ভগবানের কথা শ্রবণ করি, তা হলে এই প্রকার স্মরণ সম্ভব। তাই এই শ্লোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*মুকুন্দাচরিতাগ্র্য-সীধুনা*। *সীধু* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অমৃত'। *শ্রীমদ্ভাগবত*, *ভগবদ্গীতা* অথবা এই প্রকার প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করা মানে হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় বাস করা। যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বিধিনিষেধ পালন করেন, তাঁদের পক্ষেই এইভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া সম্ভব। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত

আন্দোলনে আমরা ভক্তদের প্রতিদিন জপমালায় ষোল মালা জপ করা এবং বিধি-নিষেধগুলি পালন করার নির্দেশ দিই। ভক্তদের পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধনে তা সাহায্য করে।

এই শ্লোকে এই কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা (*যমৈঃ*) পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা সম্ভব। ইন্দ্রিয়-সংযমের ফলে, মানুষ *স্বামী* অথবা *গোস্বামী* হতে পারেন। তাই যাঁরা *স্বামী* অথবা *গোস্বামী*, এই চূড়ান্ত উপাধি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ইন্দ্রিয় সংযম করা অবশ্য কর্তব্য। নিঃসন্দেহে তাঁকে ইন্দ্রিয়ের স্বামী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রিয়গুলি যদি কখনও স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে চায়, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সেগুলিকে সংযত করা। আমরা যদি কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রবণতা বর্জন করি, তা হলে আপনা থেকেই ইন্দ্রিয়-সংযম হবে।

এই শ্লোকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *অনিন্দয়া*—আমাদের কখনও অন্যদের ধর্মের সমালোচনা করা উচিত নয়। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ধর্ম রয়েছে। তামসিক ও রাজসিক ধর্ম কখনও সাত্ত্বিক ধর্মের মতো পূর্ণ নয়। *ভগবদ্‌গীতায়* সব কিছুই তিনটি গুণ অনুসারে বিভক্ত হয়েছে; তাই ধর্মের পন্থাও সেই অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে। মানুষ যখন প্রধানত রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তখন তাদের ধর্মের পন্থাও সেই গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই সমস্ত পন্থার সমালোচনা করার পরিবর্তে, ভগবদ্ভক্ত সেই সমস্ত ধর্মের অনুগামীদের তাদের স্বীয় ধর্ম অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করেন, যাতে তারা ধীরে ধীরে সাত্ত্বিক ধর্মের স্তরে উন্নীত হতে পারে। তা না করে ভক্ত যদি কেবল তাদের সমালোচনাই করেন, তা হলে ভক্তের মন ক্ষুব্ধ হবে। অতএব ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং চিত্তের বিক্ষোভ রোধ করতে চেষ্টা করা।

ভক্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে *নিরীহয়া,* অর্থাৎ সরল জীবন যাপন করা। *নিরীহ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভদ্র', 'বিনীত' অথবা 'সরল'। বিষয়ীদের মতো অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করা ভক্তের উচিত নয়। ভক্তকে উন্নত ভাবধারা সমন্বিত সরল জীবন যাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্ভক্তির আচরণের উদ্দেশ্যে দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই তাঁর গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা অথবা নিদ্রা যাওয়া তাঁর উচিত নয়। কেবলমাত্র দেহ ধারণের জন্য আহার করা উচিত, কিন্তু আহার করার জন্য তাঁর দেহ ধারণ

করা উচিত নয়, এবং কেবলমাত্র ছয় থেকে সাত ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। ভক্তদের এই আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য। যতক্ষণ দেহ রয়েছে, ততক্ষণ তা ঋতু পরিবর্তন, ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ও ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হবেই। সেগুলি এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নবীন ভক্তরা কখনও কখনও চিঠিতে প্রশ্ন করে, কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা সত্ত্বেও, কেন তাদের রোগ হচ্ছে। এই শ্লোক থেকে তাদের জানা উচিত যে, তাদের এই দ্বন্দ্বভাব সহ্য করতে হবে (*দ্বন্দ্ব তিতিক্ষয়া*)। এই জগৎ দ্বৈতভাব সমন্বিত। কখনও কারও মনে করা উচিত নয় যে, অসুখ হলে ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে তাঁর অধঃপতন হয়েছে। জড় জাগতিক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন চলতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) উপদেশ দিয়েছেন, *তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত* — "হে অর্জুন! ভক্তিতে স্থির হয়ে, এই সমস্ত বিড়ম্বনা সহ্য করতে চেষ্টা কর।"

শ্লোক ২৫

হরের্মুহুস্তৎপরকর্ণপূর-
গুণাভিধানেন বিজৃম্ভমাণয়া ।
ভক্ত্যা হ্যসঙ্গঃ সদসত্যনাত্মনি
স্যান্নির্গুণে ব্রহ্মণি চাঞ্জসা রতিঃ ॥ ২৫ ॥

হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **তৎ-পর**—ভগবান সম্পর্কে; **কর্ণ-পূর**—কর্ণভূষণ; **গুণ-অভিধানেন**—দিব্য গুণাবলীর আলোচনা; **বিজৃম্ভমাণয়া**—কৃষ্ণভক্তি বর্ধনের দ্বারা; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অসঙ্গঃ**—নিঃস্পৃহ; **সৎ-অসতি**—জড় জগৎ; **অনাত্মনি**—চিন্ময় উপলব্ধির বিরোধী; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **নির্গুণে**—চিৎ স্তরে; **ব্রহ্মণি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **চ**—এবং; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **রতিঃ**—আকর্ষণ।

অনুবাদ

ভক্তের কর্তব্য নিরন্তর ভগবানের দিব্য গুণাবলী শ্রবণ দ্বারা ক্রমশ ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করা। ভগবানের লীলাসমূহ ভক্তের কর্ণভূষণ সদৃশ। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের দ্বারা এবং জড় প্রকৃতির গুণের অতীত হওয়ার দ্বারা, অনায়াসে চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হওয়া যায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে শ্রবণের দ্বারা ভক্তির পুষ্টিসাধনের উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ অথবা লীলাবিলাস ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে শ্রবণ করতে চান না। আত্ম তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির কাছে *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির প্রবণতা বৃদ্ধি করা যায়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যতই শ্রবণ করা যায়, ততই ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতিসাধন করা যায়। ভগবদ্ভক্তিতে আমরা যতই উন্নতিসাধন করি, ততই আমরা জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত হই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে, জড় জগতের প্রতি আমরা যতই অনাসক্ত হই, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি ততই বর্ধিত হয়। তাই, যে ভক্ত ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতিসাধন করে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁর পক্ষে অর্থ ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত বিষয়ীর সঙ্গ ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

(*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১১/৮)

এই শ্লোকে *ব্রহ্মণি* শব্দটির টীকায় আসুরী বর্ণাশ্রম প্রথার সমর্থক নির্বিশেষবাদী অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতের* পেশাদারি পাঠকেরা বলে যে, *ব্রহ্মণি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিন্তু এই শ্লোকের *ভক্ত্যা* ও *গুণাভিধানেন* শব্দগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই অর্থ সমীচীন নয়। নির্বিশেষবাদীদের মতে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোন দিব্যগুণ নেই; তাই *ব্রহ্মণি* শব্দটির অর্থ 'পরমেশ্বর ভগবানে' বলে বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন স্বীকার করেছেন; তাই যখনই *ব্রহ্ম* শব্দটির ব্যবহার হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করছে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকে নয়। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১১) ব্রহ্ম বলতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানকে বোঝাতে পারে, কিন্তু যখন সেই শব্দটি ভক্তি অথবা দিব্য গুণাবলীর স্মরণ সম্বন্ধে উল্লেখ হয়, তখন তা পরমেশ্বর ভগবানকে ইঙ্গিত করবে, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে নয়।

শ্লোক ২৬

যদা রতির্ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমা-
নাচার্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা ।
দহত্যবীর্যং হৃদয়ং জীবকোশং
পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ ॥ ২৬ ॥

যদা—যখন; **রতিঃ**—আসক্তি; **ব্রহ্মণি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **নৈষ্ঠিকী**—স্থির; **পুমান্**—ব্যক্তি; **আচার্যবান্**—শ্রীগুরুদেবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে শরণাগত; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বিরাগ**—অনাসক্তি; **রংহসা**—বলের দ্বারা; **দহতি**—দহন করে; **অবীর্যম্**—দুর্বল; **হৃদয়ম্**—হৃদয়ে; **জীব-কোশম্**—আত্মার আবরণ; **পঞ্চ-আত্মকম্**—পঞ্চভূত; **যোনিম্**—জন্মের উৎস; **ইব**—সদৃশ; **উত্থিতঃ**—উদ্ভূত; **অগ্নিঃ**—আগুন।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নৈষ্ঠিকী রতিলাভ করার ফলে এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হওয়ার ফলে, জীব শরীরের অন্তঃস্থলে স্থিত হয়ে এবং পঞ্চভূতের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে, তার ভৌতিক পরিবেশকে দগ্ধীভূত করে, ঠিক যেমন কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন অগ্নি সেই কাষ্ঠকেই ভস্মীভূত করে দেয়।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই একসঙ্গে হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাস করেন। বৈদিক শ্লোকে বলা হয়েছে, *হৃদি হ্যয়ম্ আত্মা*—আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই হৃদয়ে বাস করেন। আত্মা যখন ভৌতিক হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে অথবা হৃদয় যখন চিন্ময়তত্ত্ব লাভের জন্য নির্মল হয়, তখন আত্মার মুক্তি হয়। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত—*যোনিম্ ইবোত্থিতোঽগ্নিঃ*। কাঠ থেকে অগ্নির উৎপত্তি হয়, এবং সেই আগুনের দ্বারাই সেই কাঠ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি জীবের ঐকান্তিক আসক্তি ঠিক অগ্নির মতো। তাপ ও আলোকের মাধ্যমে যেমন জ্বলন্ত অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনই হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান জীবাত্মা যখন পূর্ণ পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে জগতের প্রতি অনাসক্ত হন, তখন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূত দ্বারা রচিত তাঁর জড় আবরণ দগ্ধীভূত হয়, এবং তখন তিনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশ থেকেও মুক্ত হন। তাই এই শ্লোকে *পঞ্চাত্মকম্* শব্দটি পঞ্চ মহাভূতকে ইঙ্গিত করে অথবা জড় কলুষের

পাঁচটি আবরণকে ইঙ্গিত করে। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অগ্নিতে যখন এই সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে যায়, তখন মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিপরায়ণ হয়। সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর উপদেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত, হৃদয়ের পঞ্চ আবরণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। জীবাত্মা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কেন্দ্রীভূত, এবং তাকে মুক্ত করার অর্থ হচ্ছে তার হৃদয় থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়া। এটিই পদ্ধতি। অবশ্যই তাকে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হবে এবং তাঁর নির্দেশে ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, এবং তার ফলে সে জড় জগৎ থেকে অনাসক্ত হয়, এবং এইভাবে সে মুক্ত হয়। তাই, উত্তম ভক্ত তাঁর জড় দেহে বাস করেন না, তিনি তাঁর চিন্ময় শরীরে বিরাজ করেন, ঠিক যেমন শুকনো নারকেল খোলের মধ্যে থাকলেও তা খোল থেকে আলাদা। তাই শুদ্ধ ভক্তের শরীরকে বলা হয় চিন্ময় শরীর বা দিব্য শরীর। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তের শরীর জড় কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত নয়, এবং তাই ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই মুক্ত (*ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে*)। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীও তা প্রতিপন্ন করেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যিনি তাঁর শরীর, মন ও বাণীর দ্বারা পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি মুক্ত, এমন কি এই জড় শরীরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত।"

শ্লোক ২৭

দগ্ধাশয়ো মুক্তসমস্ততদ্‌গুণো
নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচষ্টে।
পরাত্মনোর্যদ্‌ব্যবধানং পুরস্তাৎ
স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে ॥ ২৭ ॥

দগ্ধ-আশয়ঃ—সমস্ত জড়-বাসনা দগ্ধ হয়ে; **মুক্ত**—মুক্ত; **সমস্ত**—সমস্ত; **তৎ-গুণঃ**—জড় গুণাবলী; **ন**—না, **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনঃ**—আত্মা অথবা পরমাত্মা; **বহিঃ**—বাহ্য; **অন্তঃ**—আভ্যন্তরীণ; **বিচষ্টে**—কার্যশীল; **পর-আত্মনোঃ**—পরমাত্মার; **যৎ**—যা; **ব্যবধানম্**—পার্থক্য; **পুরস্তাৎ**—শুরুতে যেমন ছিল; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **যথা**—যেমন; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **তৎ**—তা; **বিনাশে**—সমাপ্ত হলে।

অনুবাদ

কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনারহিত হন এবং সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে সম্পাদিত কার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। আত্ম-উপলব্ধির পূর্বে, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তা আর তখন থাকে না। ঠিক যেমন স্বপ্ন ভেঙে গেলে, স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, সমস্ত জড়-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য (*অন্যাভিলাষিতা-শূন্যম্*)। কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনারহিত হন, তখন আর মনোধর্মী জ্ঞান অথবা সকাম কর্মের আবশ্যকতা থাকে না। তখন বুঝতে হবে যে, তিনি জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত। তার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে—ঠিক যেমন শুকনো নারকেল তার বাইরের খোসা থেকে আলাদা। সেটিই হচ্ছে মুক্তির স্তর। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১০/৬) যেমন বলা হয়েছে, মুক্তির অর্থ হচ্ছে *স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*—স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। মানুষ যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধিতে থাকে, ততক্ষণ সমস্ত জড় বাসনাগুলি থাকে, কিন্তু কেউ যখন উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তখন আর তাঁর বাসনাগুলি জড় থাকে না। ভগবদ্ভক্ত এই চেতনায় কার্য করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যখন দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত জড় বাসনাগুলি সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন মুক্ত হওয়া যায়।

কেউ যখন জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হন, তখন আর তিনি নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু করেন না। তখন তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মই চিন্ময়। বদ্ধ অবস্থায় দুই প্রকার কার্যকলাপ হয়। মানুষ শরীরের জন্য কার্য করে, এবং সেই সঙ্গে সে মুক্ত হতে চায়। ভক্ত যখন সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় বাসনা অথবা জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি দেহের জন্য কর্ম এবং আত্মার জন্য কর্মের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত হন। তখন দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জীবনের যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন তিনি মুক্ত। তাঁকে বলা হয় *জীবন্মুক্তঃ*, অর্থাৎ এই শরীরে থাকা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত। সেই প্রকার মুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের

কর্ম এবং মুক্ত হওয়ার কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেউ যখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন আর তাঁকে শোক অথবা মোহের প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হয় না। কর্মী ও জ্ঞানীদের কার্যকলাপ শোক ও মোহের বশবর্তী, কিন্তু কেবল পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কার্য করেন যে আত্ম তত্ত্ববেত্তা মুক্ত পুরুষ, তাঁকে কখনও শোক অথবা মোহের দ্বারা প্রভাবিত হতে হয় না এটিই হচ্ছে একত্বের স্তর, বা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে মগ্ন হওয়া। অর্থাৎ জীবের পৃথক সত্তা থাকলেও তার স্বার্থ পৃথক নয়। তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং তাঁর ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তাঁকে কিছুই করতে হয় না; তাই তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, নিজেকে নয়। তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ তখন সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। স্বপ্ন ভেঙে গেলে, স্বপ্নের সমাপ্তি হয়। স্বপ্নে মানুষ কখনও নিজেকে একজন রাজারূপে দর্শন করে, এবং সে রাজকীয় সামগ্রী, সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি দর্শন করে, কিন্তু স্বপ্ন যখন ভেঙে যায়, তখন আর সে নিজেকে ছাড়া অন্য আর কিছু দেখতে পায় না। তেমনই, মুক্ত পুরুষ হৃদয়ঙ্গম করেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর ও পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যদিও তাঁরা উভয়েই তাঁদের পৃথক সত্তা বজায় রাখেন। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* । পরমাত্মা ও আত্মার একত্বের এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত

শ্লোক ২৮

আত্মানমিন্দ্রিয়ার্থং চ পরং যদুভয়োরপি ।
সত্যাশয় উপাধৌ বৈ পুমান্ পশ্যতি নান্যদা ॥ ২৮ ॥

আত্মানম্—আত্মা, **ইন্দ্রিয়-অর্থম্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য; **চ**—এবং, **পরম্**—দিব্য; **যৎ**—যা; **উভয়োঃ**—উভয়, **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সতি**—অবস্থিত হয়ে; **আশয়ে**—জড় বাসনা, **উপাধৌ**—উপাধি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **পুমান্**—ব্যক্তি, **পশ্যতি**—দর্শন করে; **ন অন্যদা**—অন্যথা নয়।

অনুবাদ

আত্মা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়, তখন সে বিভিন্ন বাসনা সৃষ্টি করে, এবং সেই কারণে সে উপাধিযুক্ত হয়। কিন্তু আত্মা যখন চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত হয়, তখন তার ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন কার্যে রুচি থাকে না।

তাৎপর্য

জড় বাসনার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, আত্মা বিশেষ প্রকার দেহের উপাধিতে আচ্ছাদিত বলে মনে হয়। তার ফলে সে নিজেকে একটি পশু, মানুষ, দেবতা, পক্ষী ইত্যাদি বলে মনে করে। অহঙ্কার-জনিত ভ্রান্ত পরিচিতির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে, এবং মায়িক জড় বাসনার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে, সে জড় ও চেতনের মধ্যে ভেদ দর্শন করে। মানুষ যখন এই প্রকার ভেদভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন আর সে জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করবে না। তখন কেবল চেতনেরই প্রাধান্য বিরাজ করে। মানুষ যখন জড় বাসনার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তখন সে নিজেকে প্রভু অথবা ভোক্তা বলে মনে করে। তার ফলে সে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কার্য করে এবং জড় সুখ ও দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু সে যখন জীবনের এই ধারণা থেকে মুক্ত হয়, তখন আর সে উপাধির দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এবং তখন আর সে সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে দর্শন করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর বিশ্লেষণ করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (পূর্ব ২/২৫৫) বলেছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

মুক্ত পুরুষদের জড় বস্তুর প্রতি অথবা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি কোন রকম আসক্তি থাকে না। তিনি বুঝতে পারেন যে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাই সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। তাই তিনি কোন কিছুই পরিত্যাগ করেন না। কোন কিছুই পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না, কারণ কিভাবে সব কিছু ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয় তা *পরমহংস* জানেন। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই চিন্ময়, কোন কিছুই জড় নয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও* (*মধ্য* ৮/২৭৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মহাভাগবত বা অত্যন্ত উন্নত স্তরের ভক্তের জড় দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না—

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥

যদিও তিনি বৃক্ষ, পর্বত ও অন্যান্য জঙ্গম জীবদের দর্শন করেন, তবুও তিনি সব কিছুই ভগবানের সৃষ্টিরূপে দর্শন করেন এবং সেই সূত্রে তিনি কেবল স্রষ্টাকেই দর্শন করেন, সৃষ্টিকে নয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। তিনি সব কিছুতেই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। তিনি সব কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সব কিছুকে দর্শন করেন। এটিই হচ্ছে অদ্বয়জ্ঞান।

শ্লোক ২৯

নিমিত্তে সতি সর্বত্র জলদাবপি পূরুষঃ ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি ভিদাং পশ্যতি নান্যদা ॥ ২৯ ॥

নিমিত্তে—কারণের ফলস্বরূপ; **সতি**—হয়ে; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **জল-আদৌ অপি**—জল ও অন্য প্রতিবিম্বের মাধ্যম; **পূরুষঃ**—পুরুষ, **আত্মনঃ**—নিজে; **চ**—এবং, **পরস্য অপি**—অন্যকে; **ভিদাম্**—পার্থক্য; **পশ্যতি**—দর্শন করে; **ন অন্যদা**—অন্য কোন কারণ নেই।

অনুবাদ

বিভিন্ন কারণের ফলে মানুষ নিজের ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করে, ঠিক যেমন জল, তেল অথবা দর্পণে একই শরীরের প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য

আত্মা এক, এবং তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি *স্বাংশ* ও *বিভিন্নাংশ* রূপে প্রকাশিত হন। জীব হচ্ছে *বিভিন্নাংশ* ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরা হচ্ছেন *স্বাংশ* । এইভাবে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি রয়েছে, এবং বিভিন্নভাবে তাদের বিস্তার হয়। এইভাবে, বিভিন্ন কারণে সেই একই তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন বিস্তার হয়। সেই উপলব্ধি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, কিন্তু জীব যখন উপাধির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তখন সে পার্থক্য দর্শন করে, ঠিক যেমন জল, তেল অথবা দর্পণে দৃষ্ট নিজের প্রতিবিম্বকে ভিন্ন বলে মনে হয়। জলে যখন কোন কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তখন তা সচল বলে মনে হয়। বরফে যখন সেই প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তখন তা স্থির বলে মনে হয়। যখন তা তেলে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তা অস্পষ্ট বলে মনে হয়। একই বস্তুকে এইভাবে বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়। যখন সেই মাধ্যম সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন সমস্ত বস্তুটিকে এক বলে প্রতীত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে পরমহংস বা জীবনের সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই কেবল সর্বত্র দর্শন করেন। তাঁর কাছে তখন আর অন্য বস্তু থাকে না।

এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বিভিন্ন কারণের ফলে জীবাত্মা পশু, মানুষ, দেবতা, বৃক্ষ ইত্যাদি রূপে দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি। তাই, *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ভিক্ষা করে। তারা আরও বেশি জড় ঐশ্বর্য লাভের আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করে। যদি এই জড় ঐশ্বর্য প্রতিহত হয়, তা হলে এই সমস্ত মানুষেরা আর ভক্তদের প্রণাম করবে না। এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষেরা কেবল তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনেই সর্বদা আগ্রহী। তারা সাধুদের অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের প্রচার কার্যের জন্য কিছু দান করে, যাতে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে।

কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তখন ভগবান সেই ভক্তকে তাঁর জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে বাধ্য করেন। ভগবান যেহেতু তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের আশীর্বাদ প্রদান করেন না, তাই মানুষ সাধারণত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করতে ভয় পায়। কারণ তারা মনে করে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণবেরা জড় ঐশ্বর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্র। এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষেরা শিবের পূজা করে অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের প্রভূত সুযোগ লাভ করে, কারণ শিব হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষা দুর্গাদেবীর পতি। শিবের কৃপায় শিবভক্তরা দুর্গাদেবীর আশীর্বাদ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। যেমন রাবণ ছিল মস্ত বড় শিব উপাসক ও শিবের ভক্ত, এবং তার ফলে সে দুর্গাদেবীর এমন কৃপালাভ করেছিল যে, তার সমগ্র রাজধানী সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি ব্রাজিলে প্রচুর পরিমাণ সোনা পাওয়া গেছে, এবং পুরাণে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, সেটি ছিল রাবণের রাজধানী। কিন্তু সেই রাজধানী রামচন্দ্র ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এই প্রকার ঘটনা অধ্যয়নের ফলে, আমরা *ঈশ-বিধ্বংসিতাশিষাম্* শব্দটির পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ভগবান তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক আশীর্বাদ প্রদান করেন না, কারণ তার ফলে তাঁরা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্রে পুনরায় এই সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়তে পারেন। জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের ফলে, রাবণের মতো ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য গর্বিত হয়ে ওঠে। রাবণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সীতাদেবীকে হরণ করার দুঃসাহস করেছিল। সে মনে করেছিল যে, ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিকে সে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকার কর্মের দ্বারা রাবণ *বিধ্বংসিত*, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়েছিল। বর্তমান মানব-সভ্যতা অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছে, এবং তাই ধ্বংসোন্মুখ হয়ে উঠেছে।

চক্র থেকে মুক্ত হতে পারি। এই উপায়ের দ্বারা আমরা পরোক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অবিচলিত শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পারি। মনকে যদি নিরন্তর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়ে চিন্তা করতে দেওয়া হয়, তা হলে তা আমাদের জড় বন্ধনের কারণ হয়। আমাদের মন যদি কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিব ভাবনায় পূর্ণ হয়, তা হলে কৃষ্ণভক্ত হতে চাইলেও, নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয় বিস্মৃত হওয়া যায় না। কেউ যদি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা সত্ত্বেও মনকে সংযত করতে না পারে, তা হলে সে কেবল পবিবার, সমাজ, মূল্যবান গৃহ ইত্যাদি ভোগের বিষয়েই চিন্তা করবে। সে যদি হিমালয় পর্বত অথবা বনেও যায়, তা হলেও তার মন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগেব বিষয়েই নিবন্তর চিন্তা কবতে থাকবে। এইভাবে ক্রমশ তার বুদ্ধি প্রভাবিত হবে। বুদ্ধি যখন প্রভাবিত হয়, তখন কৃষ্ণভাবনার মূল স্বাদ হারিয়ে যায়।

এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। যদি কোন বিশাল জলাশয়ের চারপাশে সর্বত্র বড় বড় কুশঘাস থাকে, তা হলে সেই জলাশয়েব জল শুকিয়ে যায়। তেমনই, যখন জড় সুখভোগের বাসনা স্তম্ভের মতো বর্ধিত হয়, তখন চিত্তরূপী সরোবরেব শুদ্ধ চেতনারূপ জল শুকিয়ে যায়। তাই প্রথম থেকেই এই সমস্ত কুশঘাস-সদৃশ জড় বাসনা কেটে ফেলে দিতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, প্রথম থেকেই যদি শস্যক্ষেত্রের আগাছাগুলি উপড়ে ফেলে না দেওয়া হয়, তা হলে সেগুলি সার ও জল শোষণ করে নেবে এবং ধানের চারাগুলি শুকিয়ে যাবে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাই হচ্ছে আমাদের এই জড় জগতে অধঃপতনের কারণ, এবং তার ফলে আমরা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ক্লেশ এবং ত্রিতাপ দুঃখভোগ করছি। কিন্তু আমবা যদি আমাদের বাসনাগুলি ভগবানেব দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করি, তা হলে আমাদের বাসনাগুলি পবিত্র হবে। বাসনাগুলিকে হত্যা করা যায় না। সেগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে পবিত্র করতে হয়। আমরা যদি নিরন্তর কোন বিশেষ রাষ্ট্র, সমাজ বা পরিবারের সদস্য বলে মনে করে নিরন্তর সেগুলি চিন্তা করি, তা হলে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদেব বাসনা যদি ভগবানের সেবায় প্রয়োগ করা হয়, তা হলে তা শুদ্ধ হয়, এবং তার ফলে আমরা তৎক্ষণাৎ জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হই।

শ্লোক ৩১

ভ্রশ্যত্যনুস্মৃতিশ্চিত্তং জ্ঞানভ্রংশঃ স্মৃতিক্ষয়ে ।
তদ্রোধং কবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহ্নবমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

ভ্রশ্যতি—বিনষ্ট হয়; **অনুস্মৃতিঃ**—নিরন্তর চিন্তা করে; **চিত্তম্**—চেতনা; **জ্ঞান-ভ্রংশঃ**—প্রকৃত জ্ঞানরহিত; **স্মৃতি-ক্ষয়ে**—স্মৃতি বিনষ্ট হওয়ার ফলে; **তৎ-রোধম্**—সেই পন্থা অবরুদ্ধ করে; **কবয়ঃ**—মহান পণ্ডিতগণ; **প্রাহুঃ**—মত প্রকাশ করেছেন; **আত্ম**—আত্মার; **অপহ্নবম্**—বিনাশ; **আত্মনঃ**—আত্মার

অনুবাদ

জীব যখন তার মূল চেতনা থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন সে তার পূর্বস্থিতি স্মরণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অথবা তার বর্তমান স্থিতি বুঝতে পারে না। স্মৃতি যখন হারিয়ে যায়, তখন অর্জিত জ্ঞান এক ভ্রান্ত আধারের ভিত্তিতে আহরণ হয়। যখন তা হয়, তখন পণ্ডিতেরা তাকে আত্মার বিনাশ বলে মনে করেন।

তাৎপর্য

জীব অথবা আত্মা নিত্য ও শাশ্বত। তার কখনও বিনাশ হয় না, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান যখন কাজ করে না, তখন পণ্ডিতেরা বলেন যে, তার বিনাশ হয়েছে। সেটিই হচ্ছে পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য। অল্পজ্ঞ দার্শনিকদের মতে, পশুদের আত্মা নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পশুদের আত্মা রয়েছে। পশুদের অজ্ঞানের আবরণ এতই প্রবল যে, মনে হয় যেন তাদের আত্মা হারিয়ে গেছে। আত্মা ব্যতীত শরীর সক্রিয় হতে পারে না। সেটিই হচ্ছে জীবিত দেহ ও মৃত দেহের মধ্যে পার্থক্য। আত্মা যখন দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, তখন দেহটিকে বলা হয় মৃত। যখন প্রকৃত জ্ঞান প্রদর্শিত হয় না, তখন বলা হয় যে, আত্মার বিনাশ হয়েছে। আমাদের মূল চেতনা হচ্ছে কৃষ্ণচেতনা, কারণ আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। এই চেতনা যখন ভ্রান্তভাবে পরিচালিত হয়, তখন জীব জড় পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং তখন তার মূল চেতনা কলুষিত হয়। তখন সে মনে করে যে, সে জড় উপাদান থেকে উদ্ভূত। এইভাবে জীব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে তার প্রকৃত স্মৃতি হারিয়ে ফেলে, ঠিক যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে যায়। যখন এইভাবে প্রকৃত চেতনার ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, তখন এক ভ্রান্ত পরিচিতির ভিত্তিতে বিনষ্ট আত্মা তার কার্যকলাপ সম্পাদন করে। বর্তমানে মানব সমাজ দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত স্তরে কার্য করছে, তার ফলে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে মানুষদের আত্মা বিনষ্ট হয়েছে, এবং সেই সূত্রে তাদের অবস্থা পশুদের থেকে কোন অংশে উন্নত নয়।

শ্লোক ৩২

নাতঃ পরতরো লোকে পুংসঃ স্বার্থব্যতিক্রমঃ ।
যদধ্যন্যস্য প্রেয়স্ত্বমাত্মনঃ স্বব্যতিক্রমাৎ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **অতঃ**—এর পর; **পরতরঃ**—শ্রেয়; **লোকে**—এই জগতে; **পুংসঃ**—জীবদের; **স্ব-অর্থ**—ব্যক্তিগত লাভ; **ব্যতিক্রমঃ**—প্রতিবন্ধক; **যৎ-অধি**—তার অতীত; **অন্যস্য**—অন্যদের; **প্রেয়স্ত্বম্**—অধিকতর রুচিকর; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য; **স্ব**—নিজের; **ব্যতিক্রমাৎ**—প্রতিবন্ধকের দ্বারা।

অনুবাদ

আত্ম উপলব্ধির থেকে অধিক প্রিয়তর অন্য কোন বস্তু আছে বলে মনে করাই, নিজের হিতসাধনে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক।

তাৎপর্য

মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। 'আত্মা' বলতে পরমাত্মা ও ব্যষ্টি আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান ও জীবকে বোঝায়। কিন্তু কেউ যখন দেহ ও দেহসুখের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, তখন সে তার আত্ম-উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। মায়ার প্রভাবে জীব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, যা এই জগতে আত্ম-উপলব্ধি সাধনে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য বর্জিত। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, পরমাত্মার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের কার্যকলাপে সেই প্রবণতাকে পরিচালিত করা উচিত। এই উদ্দেশ্য ব্যতীত যা কিছুই করা হোক না কেন, তা জীবের স্বার্থের পরিপন্থী।

শ্লোক ৩৩

অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানং সর্বার্থাপহ্নবো নৃণাম্ ।
ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্‌যেনাবিশতি মুখ্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥

অর্থ—ধন; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য; **অভিধ্যানম্**—নিরন্তর চিন্তা করে; **সর্ব-অর্থ**—চতুর্বর্গ; **অপহ্নবঃ**—ধ্বংসাত্মক; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **ভ্রংশিতঃ**—রহিত হয়ে; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বিজ্ঞানাৎ**—ভক্তি; **যেন**—এই সবের দ্বারা; **আবিশতি**—প্রবেশ করে; **মুখ্যতাম্**—স্থাবর-জীবন।

অনুবাদ

কিভাবে ধন উপার্জন করা যায় এবং তা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ব্যবহার করা যায়, সেই চিন্তায় নিরন্তর মগ্ন থাকলে মানব-সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থ বিনষ্ট হয়। জ্ঞান ও ভক্তিরহিত হওয়ার ফলে, বৃক্ষ অথবা পাথর যোনিতে প্রবিষ্ট হতে হয়।

তাৎপর্য

জ্ঞান শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া, এবং *বিজ্ঞান* বলতে জীবনে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বোঝায়। মনুষ্য জীবন লাভের পর এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্তর প্রাপ্ত হওয়া উচিত, কিন্তু এই মহান সুযোগ লাভের পরেও কেউ যদি এই জ্ঞান বিকশিত না করে এবং শ্রীগুরুদেবের ও শাস্ত্রের সাহায্যের মাধ্যমে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ না করে—অর্থাৎ, এই সুযোগের অপব্যবহার করে—তা হলে পরবর্তী জীবনে সে অবশ্যই স্থাবর যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে। পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি হচ্ছে স্থাবর জীব। জীবনের এই স্তরকে বলা হয় *পূণ্যতাম্* বা *মুখ্যতাম্*, অর্থাৎ, সমস্ত কার্যকলাপ শূন্যে পরিণত করা। যে-সমস্ত দার্শনিকেরা নিষ্ক্রিয় হওয়ার মতবাদ সমর্থন করে, তাদের বলা হয় *শূন্যবাদী*। প্রকৃতির পরিচালনায়, আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এমন অনেক দার্শনিক রয়েছে, যারা তাদের কার্যকলাপ পবিত্র করার পরিবর্তে, সব কিছুকেই শূন্যে পরিণত করতে চায় অথবা সমস্ত কার্যকলাপ-রহিত করতে চায়। এই নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক হচ্ছে বৃক্ষ ও পর্বত। প্রকৃতির নিয়মে তারা এক প্রকার দণ্ডভোগ করছে। আমরা যদি আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্ম-উপলব্ধি যথাযথভাবে সম্পাদন না করি, তা হলে প্রকৃতি আমাদের বৃক্ষ অথবা পর্বতযোনি প্রদানের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করে দণ্ডদান করবে। তাই এখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করার নিন্দা করা হয়েছে। সর্বদা অর্থ উপার্জন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চিন্তায় যে মগ্ন থাকে, সে আত্মহত্যার পন্থা অনুসরণ করছে। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র মানব সমাজ এই পথ অনুসরণ করছে। মানুষ যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহে বদ্ধপরিকর। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ভিক্ষা করে হোক, ঋণ করে হোক অথবা চুরি করে হোক, তারা অর্থ সংগ্রহ করতে চায়। আত্ম-উপলব্ধির পথে এই প্রকার সভ্যতা সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক।

শ্লোক ৩৪

ন কুর্যাৎকর্হিচিৎসঙ্গং তমস্তীব্রং তিতীরিষুঃ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকম্ ॥ ৩৪ ॥

ন—করে না; **কুর্যাৎ**—কার্য; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **তমঃ**—অজ্ঞান; **তীব্রম্**—তীব্র গতিতে; **তিতীরিষুঃ**—অজ্ঞান অতিক্রম করতে অভিলাষী ব্যক্তিরা, **ধর্ম**—ধর্ম; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কাম**—ইন্দ্রিয়সুখ; **মোক্ষাণাম্**—মুক্তির; **যৎ**—যা; **অত্যন্ত**—অত্যধিক; **বিঘাতকম্**—প্রতিবন্ধক বা বাধা।

অনুবাদ

যারা অজ্ঞান-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ঐকান্তিকভাবে অভিলাষী, তাদের কখনও তমোগুণের সঙ্গ করা উচিত নয়, কারণ ভোগবাদী কার্যকলাপ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক।

তাৎপর্য

জীবনের চারটি বর্গ মানুষকে ধর্মীয় নীতি, সামাজিক স্থিতি অনুসারে অর্থ উপার্জন, বিধিনিষেধ অনুসারে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং জড় আসক্তি থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ রয়েছে, ততক্ষণ এই সমস্ত জড়-জাগতিক আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন বর্জন করে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জনের জন্য কার্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আধুনিক মানব-সভ্যতা ধর্মীয় অনুশাসনের ধার ধারে না। তা কেবল ধর্মীয় অনুশাসন বর্জিত অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনেই আগ্রহী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কসাইখানায় কসাইয়েরা অনায়াসে অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু এই প্রকার ব্যবসা ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। তেমনই, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বহু নাইট ক্লাব এবং মৈথুনের জন্য বেশ্যালয় রয়েছে। বিবাহিত জীবনে অবশ্য মৈথুনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ, কারণ আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের চরম লক্ষ্য হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি। তেমনই, সরকার যদিও মদিরালয় খোলার অনুমতি দিতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অবাধে মদিরালয় খোলা হবে এবং অবৈধ মদের চোরাচালান হবে। অনুমতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা। চিনি, গম অথবা দুধের জন্য অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করার আবশ্যকতা হয় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয় এমন কার্য না করতে, যার ফলে পারমার্থিক জীবন ও মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পন্থায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। তাই বৈদিক প্রথায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পন্থা এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা সত্ত্বেও, চরমে মুক্তিলাভ করা যেতে পারে। বৈদিক সভ্যতা আমাদেরকে শাস্ত্রের পূর্ণজ্ঞান প্রদান করে, এবং আমরা যদি শাস্ত্র ও শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিতভাবে জীবন যাপন করি, তা হলে আমাদের সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা চরিতার্থ হবে, এবং সেই সঙ্গে আমরা মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারব।

শ্লোক ৩৫

তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে ।
ত্রৈবর্গ্যোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ ॥ ৩৫ ॥

তত্র—সেখানে; **অপি**—ও; **মোক্ষঃ**—মুক্তি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থে**—উদ্দেশ্যে, **আত্যন্তিকতযা**—সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ; **ইষ্যতে**—সেভাবে গ্রহণ করে; **ত্রৈবর্গ্যঃ**—অন্য তিনটি বর্গ, যথা—ধর্ম, অর্থ ও কাম; **অর্থঃ**—পুরুষার্থ, **যতঃ**—যা থেকে, **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে, **কৃত-অন্ত**—মৃত্যু; **ভয়**—ভয়; **সংযুতঃ**—যুক্ত।

অনুবাদ

চতুর্বর্গের মধ্যে—অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে, মোক্ষকেই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করা উচিত। অন্য তিনটি বর্গ প্রকৃতির কঠোর নিয়মে, মৃত্যুর দ্বারা বিনাশশীল।

তাৎপর্য

মোক্ষকে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে গ্রহণ করা উচিত, এমন কি অন্য তিনটি বর্গ বর্জন করেও তা গ্রহণ করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই সূত গোস্বামী সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নতির সাফল্যের ভিত্তিতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়। যেহেতু আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে মন্দিরে অথবা গির্জায় গিয়ে ভগবানের কাছে ধর্না দিই। অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ নয়। সব কিছুই এমনভাবে সামঞ্জস্য সাধন করতে হয়, যাতে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি। তাই এই শ্লোকে মুক্তি বা *মোক্ষের* উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। অন্য তিনটি বর্গ জড় জাগতিক এবং তাই বিনাশশীল। আমরা যদি এই জীবনে ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমাই এবং বহু জড় বিষয় সংগ্রহ করি, তা সবই মৃত্যুতে শেষ হয়ে যাবে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মৃত্যুরূপে পরমেশ্বর ভগবান শেষ পর্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সব কিছু হরণ করে নেন। মূর্খতাবশত আমরা সেই কথা বিচার করে দেখি না। মূর্খতাবশত আমরা মৃত্যুর ভয়ে ভীত নই, এমন কি আমরা বিচার করেও দেখি না যে, ধর্ম, অর্থ ও কামের দ্বারা অর্জিত সব কিছু মৃত্যু হরণ করে নেবে। ধর্মের দ্বারা, অথবা পুণ্যকর্মের দ্বারা আমরা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব। মূল কথা হচ্ছে যে, আমরা ধর্ম,

অর্থ ও কাম—এই *ত্রৈবর্গ্য* বিসর্জন দিতে পারি, কিন্তু মুক্তির উদ্দেশ্য বর্জন করতে পারি না। মুক্তি সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৯) উল্লেখ করা হয়েছে—*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্মনৈতি*। মুক্তির অর্থ হচ্ছে এই দেহ ত্যাগ করার পর অন্য আর একটি জড় দেহ গ্রহণ করতে হয় না। নির্বিশেষবাদীদের কাছে মুক্তি মানে হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা *মোক্ষ* নয়, কারণ সেই নির্বিশেষ অবস্থা থেকে তাকে পুনরায় এই জড় জগতে পতিত হতে হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণের চেষ্টা করা উচিত এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। অতএব মূল কথাটি হচ্ছে যে, পুণ্যকর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে, আমাদের ভগবদ্ধামে পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত, যার মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তাই যাঁরা প্রকৃতপক্ষে মুক্তি লাভের অভিলাষী, তাদের জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার।

শ্লোক ৩৬

পরেঽবরে চ যে ভাবা গুণব্যতিকরাদনু ।
ন তেষাং বিদ্যতে ক্ষেমমীশবিধ্বংসিতাশিষাম্ ॥ ৩৬ ॥

পরে—জীবনের উচ্চতর স্থিতিতে; **অবরে**—জীবনের নিম্নতর অবস্থায়; **চ**—এবং; **যে**—যারা সকলে; **ভাবাঃ**—ধারণা; **গুণ**—ভৌতিক গুণ; **ব্যতিকরাৎ**—মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা; **অনু**—অনুসরণ করে; **ন**—কখনই না; **তেষাম্**—তাদের; **বিদ্যতে**—বিদ্যমান হয়; **ক্ষেমম্**—সংশোধন; **ঈশ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিধ্বংসিত**—বিনষ্ট; **আশিষাম্**—আশীর্বাদ।

অনুবাদ

আমরা নিম্নতর স্তরের জীবন থেকে উচ্চতর স্তরের জীবনের পার্থক্য নিরূপণ করে তাকে আশীর্বাদ বলে মনে করি, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই প্রকার ভেদভাব জড়া প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্কে বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবনের এই সমস্ত অবস্থার কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নেই, কারণ পরম নিয়ন্তার দ্বারা তা সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

এই সংসারে আমরা উচ্চতর স্তরের জীবনকে আশীর্বাদ বলে মনে করি এবং নিম্নতর স্তরের জীবনকে অভিশাপ বলে মনে করি। 'উচ্চ' ও 'নীচ' এর পার্থক্য ততক্ষণই

থাকে, যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মিথস্ক্রিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমাদের সৎ কর্মের দ্বারা আমরা উচ্চতর লোকে অথবা উচ্চতর স্তরের জীবন প্রাপ্ত হই (যথা বিদ্যা, দৈহিক সৌন্দর্য ইত্যাদি)। এগুলি পুণ্য কর্মের ফল তেমনই, পাপকর্মের ফলে আমরা অশিক্ষিত হই, কুৎসিত শরীর লাভ করি, এবং দারিদ্র্য জীবন যাপন করি কিন্তু জীবনের এই সমস্ত বিভিন্ন অবস্থা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন। কিন্তু, সমগ্র জগৎ যখন লয় হয়ে যাবে, তখন এই সমস্ত গুণের ক্রিয়া আর থাকবে না. *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ভগবান তাই বলেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রগতির দ্বারা অথবা ধার্মিক জীবন যাপনের দ্বারা—মহাযজ্ঞ অথবা সকাম কর্মের দ্বারা আমরা যদি সর্বোচ্চ লোকেও উন্নীত হই, তা হলেও প্রলয়ের সময় এই সমস্ত উচ্চতর লোক এবং সেখানকার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে এই শ্লোকে *ঈশ বিধ্বংসিতাশিষাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পরম নিয়ন্তার দ্বারা এই সমস্ত আশীর্বাদ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তখন আমাদের কেউই রক্ষা করতে পারবে না। আমাদের দেহ, এই লোকেই হোক অথবা অন্য লোকেই হোক, ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং পুনরায় আমাদের কোটি কোটি বছর ধরে মহাবিষ্ণুর শরীরে অচেতন অবস্থায় থাকতে হবে। তার পর আবার যখন সৃষ্টির প্রকাশ হবে, তখন আমরা বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, পুনরায় আমরা আমাদের কার্যকলাপ শুরু করব। তাই কেবল উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়েই, আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে, চিৎ-জগতে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় লাভের জন্য। সেটিই আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি উচ্চ অথবা নীচ, জড় জগতের কোন কিছুর প্রতি আমাদের আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে সব কিছুই সমস্তরের বলে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। তার ফলে আমরা পূর্ণ জ্ঞানময়, আনন্দময় ও চিন্ময় কার্যকলাপের নিত্য আশীর্বাদ লাভ করতে পারব।

সুনিয়ন্ত্রিত মানব সমাজ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উন্নতিবিধান করে। মানব সমাজের পক্ষে ধর্ম অত্যন্ত আবশ্যক। ধর্মবিহীন মানব-সমাজ কেবল পশুর সমাজ। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

যখন ধর্ম, অর্থ ও কামের সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সমন্বয় সাধন হয়, তখন এই জগতের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিব থেকে মুক্তি সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু এই কলিযুগে ধর্ম ও মোক্ষেব কোন প্রশ্নই ওঠে না মানুষ কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপাবে আগ্রহী। তাই, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও, মানব সমাজেব আচবণ প্রায় পশুর মতো হয়ে গেছে। সব কিছু যখন উৎকটভাবে পাশবিক হয়ে যায়, তখন প্রলয় হয়। এই প্রলয়কে *ঈশ-বিধ্বংসিতাশিষাম্* রূপে গ্রহণ কবা উচিত। ভগবৎ প্রদত্ত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিব আশীর্বাদ চবমে ধ্বংসের মাধ্যমে লয় হয়ে যাবে। কলিযুগের শেষে ভগবান কল্কি অবতাবরূপে আবির্ভূত হবেন, এবং তাঁব একমাত্র কাজ হবে পৃথিবীব সমস্ত মানুষদেব সংহার কবা। সেই সংহার সাধনের পব, পুনবায় স্বর্ণযুগ শুরু হবে তাই আমাদের জানা উচিত যে, আমাদের জড় জাগতিক সমস্ত কার্য ঠিক শিশুদের খেলার মতো। শিশুবা সমুদ্রের তীরে খেলা করে, এবং তাদেব পিতা সেখানে বসে দেখেন, শিশুবা কিভাবে বালি দিয়ে ঘববাড়ি, দেওয়াল ইত্যাদি বানিয়ে খেলা কবছে, কিন্তু অবশেষে পিতা তাঁর শিশুদের ঘরে ফিরে আসতে বলবেন। তখন সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। যে-সমস্ত মানুষ শিশুসুলভ অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপারে অত্যন্ত আসক্ত, ভগবান কখনও কখনও তাদের উপর অনুগ্রহ করে, তাদের নির্মিত বস্তু ধ্বংস করে দেন।

ভগবান বলেছেন *যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ* ভগবান যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেছেন যে, যখন তিনি তাঁর ভক্তেব সমস্ত জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য হরণ করে নেন, তা তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষ কৃপার প্রদর্শন। তাই সাধাবণত দেখা যায় যে, জড়-জাগতিক বিচাবে বৈষ্ণবেবা খুব একটা ঐশ্বর্যশালী হন না। বৈষ্ণব বা ভগবানেব শুদ্ধ ভক্ত যখন জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের চেষ্টা করেন এবং সেই সঙ্গে পবমেশ্বব ভগবানেব সেবাব অভিলাষ কবেন, তখন তাঁর ভক্তি প্রতিহত হয়। তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে, ভগবান তাঁর তথাকথিত সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জাগতিক ঐশ্বর্য নষ্ট কবে দেন। ভক্ত তখন অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টায় বাব বাব নিরাশ হয়ে, অবশেষে পরমেশ্বর ভগবানেব শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ কবেন। এই প্রকার কার্যও *ঈশ বিধ্বংসিতাশিষাম্* বলে মনে কবা উচিত, যার ফলে ভগবান জড় ঐশ্বর্য নষ্ট করে দেন, কিন্তু পাবমার্থিক উপলব্ধির দ্বাবা তাঁকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেন। আমাদের প্রচাবকার্যে কখনও কখনও আমবা দেখতে পাই যে বিষয়াসক্ত মানুষেবা আমাদের কাছে এসে প্রণতি নিবেদন কবে আশীর্বাদ

ভিক্ষা করে। তারা আরও বেশি জড় ঐশ্বর্য লাভের আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করে। যদি এই জড় ঐশ্বর্য প্রতিহত হয়, তা হলে এই সমস্ত মানুষেরা আর ভক্তদের প্রণাম করবে না। এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষেরা কেবল তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনেই সর্বদা আগ্রহী। তারা সাধুদের অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের প্রচার-কার্যের জন্য কিছু দান করে, যাতে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে।

কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তখন ভগবান সেই ভক্তকে তাঁর জড়-জাগতিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে বাধ্য করেন। ভগবান যেহেতু তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের আশীর্বাদ প্রদান করেন না, তাই মানুষ সাধারণত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করতে ভয় পায়। কারণ তারা মনে করে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণবেরা জড় ঐশ্বর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্র। এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষেরা শিবের পূজা করে অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের প্রভূত সুযোগ লাভ করে, কারণ শিব হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষা দুর্গাদেবীর পতি। শিবের কৃপায় শিবভক্তরা দুর্গাদেবীর আশীর্বাদ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। যেমন রাবণ ছিল মস্ত বড় শিব উপাসক ও শিবের ভক্ত, এবং তার ফলে সে দুর্গাদেবীর এমন কৃপালাভ করেছিল যে, তার সমগ্র রাজধানী সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি ব্রাজিলে প্রচুর পরিমাণ সোনা পাওয়া গেছে, এবং পুরাণে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, সেটি ছিল রাবণের রাজধানী কিন্তু সেই রাজধানী রামচন্দ্র ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এই প্রকার ঘটনা অধ্যয়নের ফলে, আমরা *ঈশ-বিধ্বংসিতাশিষাম্* শব্দটির পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ভগবান তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক আশীর্বাদ প্রদান করেন না, কারণ তার ফলে তাঁরা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্রে পুনরায় এই সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়তে পারেন। জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের ফলে, রাবণের মতো ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য গর্বিত হয়ে ওঠে। রাবণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সীতাদেবীকে হরণ করার দুঃসাহস করেছিল। সে মনে করেছিল যে, ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিকে সে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকার কর্মের দ্বারা রাবণ *বিধ্বংসিত*, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়েছিল। বর্তমান মানব-সভ্যতা অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছে, এবং তাই ধ্বংসোন্মুখ হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৩৭

তত্ত্বং নরেন্দ্র জগতামথ তস্থুষাং চ
দেহেন্দ্রিয়াসুধিষণাত্মভিরাবৃতানাম্ ।
যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিশ্বগাবিঃ
প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবাংস্তমবেহি সোঽস্মি ॥ ৩৭ ॥

তৎ—অতএব; **ত্বম্**—আপনি; **নর ইন্দ্র**—হে শ্রেষ্ঠ রাজন্, **জগতাম্**—জঙ্গমের; **অথ**—অতএব; **তস্থুষাম্**—স্থাবর; **চ**—ও; **দেহ**—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **অসু**—প্রাণবায়ু; **ধিষণা**—বিবেচনার দ্বারা; **আত্মভিঃ**—আত্ম-উপলব্ধি; **আবৃতানাম্**—যারা এইভাবে আবৃত; **যঃ**—যিনি; **ক্ষেত্র-বিৎ**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **তপতয়া**—বশীভূত করার দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিশ্বক্**—সর্বত্র; **আবিঃ**—প্রকাশিত; **প্রত্যক্**—প্রতিটি রোমে; **চকাস্তি**—উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তম্**—তাঁকে; **অবেহি**—উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর; **সঃ অস্মি**—আমি সেই।

অনুবাদ

সনৎকুমার রাজাকে উপদেশ দিলেন—অতএব, হে পৃথু মহারাজ, যিনি স্থাবর ও জঙ্গম প্রতিটি জীবের শরীরে জীবাত্মার সঙ্গে বিরাজ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে চেষ্টা করুন। জীবাত্মা স্থূল জড় শরীর এবং প্রাণ ও বুদ্ধির দ্বারা নির্মিত সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টায় সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সকলের হৃদয়ে ব্যষ্টি আত্মার সঙ্গে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার চেষ্টা করার মাধ্যমে, আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করা। ব্যষ্টি জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদানের দ্বারা আবৃত দেহের অভ্যন্তরে বিরাজ করেন। সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুশীলন। পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার দুটি পন্থা রয়েছে—নির্বিশেষবাদ ও ভগবদ্ভক্তি। নির্বিশেষবাদীরা চরমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জীব ও পরমব্রহ্ম এক, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বা সবিশেষবাদীরা উপলব্ধি করেন যে, যেহেতু পরম সত্য হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা এবং জীব হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত, তাই জীবের

কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সেবা করা। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে *তত্ত্বমসি* —'তুমি তা' এবং *সোঽহম্* 'আমি তা'। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, এই মন্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান বা পরম সত্য ও জীব এক, কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের বিচারে এই মন্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান ও জীব উভয়েই গুণগতভাবে এক। *তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম*। পরমেশ্বর ও জীব উভয়েই ব্রহ্ম তা হৃদয়ঙ্গম করাই হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে ও নিজেকে জানা। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টায় এই অমূল্য জীবনের অপচয় করা উচিত নয়।

এই শ্লোকে *ক্ষেত্রবিৎ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির বিশ্লেষণ *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২) করা হয়েছে—ইদং *শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে*। এই দেহকে বলা হয় *ক্ষেত্র*, এবং এই দেহের মালিকদের (দেহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট জীবাত্মা ও পরমাত্মা) উভয়কেই বলা হয় *ক্ষেত্রবিৎ*। কিন্তু এই দুই প্রকার *ক্ষেত্রবিৎ*-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এক *ক্ষেত্রবিৎ* পরমাত্মা জীবাত্মাকে পরিচালনা করছেন আমরা যখন যথাযথভাবে পরমাত্মার নির্দেশ গ্রহণ করি, তখন আমাদের জীবন সার্থক হয়। তিনি অন্তর থেকে এবং বাইরে থেকে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। অন্তর থেকে তিনি *চৈত্যগুরু* রূপে নির্দেশ দিচ্ছেন। পরোক্ষভাবে বাইরে শ্রীগুরুরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেও তিনি জীবদের সাহায্য করছেন। উভয়ভাবেই ভগবান জীবদের পরিচালিত করছেন, যাতে তারা তাদের জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সমাপ্ত করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। যে-কোন ব্যক্তি দেহের অভ্যন্তরে আত্মা ও পরমাত্মাকে দেখতে পাবেন, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত এঁরা দুজনে শরীরের ভিতরে বিরাজ করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর উজ্জ্বল ও সজীব থাকে। কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা স্থূল শরীর ত্যাগ করা মাত্রই, তা তৎক্ষণাৎ পচতে শুরু করে। যিনি আধ্যাত্মিক বিচারে উন্নত, তিনি মৃত দেহ ও জীবন্ত দেহের প্রকৃত পার্থক্য এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এবং তাঁদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়ার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করা উচিত। এইভাবে জ্ঞানের উন্নতি-সাধনের ফলে, মুক্তি ও জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা হয়েছে যে, কেউ যদি তথাকথিত জাগতিক কর্তব্যসমূহ পরিত্যাগ করে মুক্তির পথ অবলম্বন করেন, তা হলে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে-ব্যক্তি মুক্তির পথ অবলম্বন

না করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে, তার সর্বনাশ হয়। সেই সম্পর্কে ব্যাসদেবের সঙ্গে নারদ মুনির উপদেশ অত্যন্ত উপযুক্ত—

> *ত্যক্তা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-*
> *র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।*
> *যত্র ক্ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং*
> *কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥*
>
> (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৭)

কেউ যদি আবেগের বশে অথবা অন্য কোন কারণে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন, অথচ জীবনের চরম লক্ষ্যসাধনে অকৃতকার্য হয়ে, অভিজ্ঞতার অভাবে অধঃপতিত হয় তবুও তাতে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর জাগতিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন করেন, তার ফলে তাঁর কোন লাভ হয় না।

শ্লোক ৩৮

যস্মিন্নিদং সদসদাত্মতয়া বিভাতি
মায়া বিবেকবিধুতি স্রজি বাহিবুদ্ধিঃ ।
তং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধতত্ত্বং
প্রত্যূঢ়কর্মকলিলপ্রকৃতিং প্রপদ্যে ॥ ৩৮ ॥

যস্মিন্—যাতে, **ইদম্**—এই; **সৎ-অসৎ**—পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর বিভিন্ন শক্তি, **আত্মতয়া**—সমস্ত কার্য ও কারণের মূল হওয়ার ফলে, **বিভাতি**—প্রকাশ করেন; **মায়া**—মায়া, **বিবেক-বিধুতি**—বিচার ও বিবেচনার দ্বারা মুক্ত, **স্রজি**—রজ্জুতে; **বা**—অথবা, **অহি**—সর্প; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **তম্**—তাঁকে, **নিত্য**—চিরকাল, **মুক্ত**—মুক্ত; **পরিশুদ্ধ**—নিষ্কলুষ; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব, **প্রত্যূঢ়**—চিন্ময়; **কর্ম**—সকাম কর্ম, **কলিল**—কলুষ, **প্রকৃতিম্**—চিন্ময় শক্তিতে অবস্থিত; **প্রপদ্যে**—শরণাগত হই।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এই শরীরের ভিতর কার্য ও কারণের সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে, নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু যিনি বিবেকের দ্বারা মায়াকে অতিক্রম করেছেন,

এবং যার ফলে রজ্জুকে সর্প বলে মনে করার ভ্রম দূর হয়, তিনি বুঝতে পারেন যে, পরমাত্মা চিরকাল জড় সৃষ্টির অতীত এবং তিনি বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত। এইভাবে ভগবান সমস্ত জড় কলুষের অতীত, এবং কেবল তাঁরই শরণাগত হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে মায়াবাদীদের যে সিদ্ধান্ত, তা এই শ্লোকটিতে বিশেষভাবে নিরস্ত হয়েছে। মায়াবাদীদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব ও পরমাত্মা এক, এবং তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মায়াবাদীদের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম ব্যতীত কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই, এবং পার্থক্য আছে বলে যে অনুভূতি তা হচ্ছে মায়া। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, এটি ঠিক তেমনই। রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্তটি সাধারণত মায়াবাদীরা দিয়ে থাকে। তাই বিবর্তবাদের সূচক এই শব্দগুলি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি নিত্যমুক্ত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীবাত্মার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান এই শরীরে রয়েছেন। সেই কথা *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে। একই বৃক্ষে অবস্থিত দুটি বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা হয়েছে। তবুও পরমাত্মা মায়ার অতীত। মায়াশক্তিকে বলা হয় বহিরঙ্গা শক্তি, এবং জীবকে বলা হয় তটস্থা শক্তি। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি সমন্বিত জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি জীব, উভয়েই ভগবানের শক্তি। যদিও শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, তবুও জীবাত্মা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করে যে, সে ও ভগবান এক।

এই শ্লোকে *প্রপদ্যে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা *ভগবদ্গীতার* সিদ্ধান্ত (১৮/৬৬)—*সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,* এই শ্লোকটির সম অর্থবাহী। অন্যত্র ভগবান বলেছেন—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৯)। এই *প্রপদ্যে* অথবা *শরণং ব্রজ* পরমাত্মার কাছে জীবের শরণাগতির সূচক। ব্যষ্টি জীবাত্মা যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে। ভগবান যদিও ব্যষ্টি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত, তবুও তিনি জীবাত্মার থেকে শ্রেষ্ঠ। যদিও মনে হয় যে, ভগবান ও জড়া প্রকৃতি এক, তবুও ভগবান সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অতীত। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে, তিনি যুগপৎ এক ও অভিন্ন। জড়া প্রকৃতি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, এবং যেহেতু শক্তি শক্তিমান থেকে অভিন্ন, তাই মনে হয় যেন ভগবান ও জীবাত্মা এক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা জড়া

প্রকৃতির অধীন, এবং ভগবান সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অতীত। ভগবান যদি ব্যষ্টি জীবাত্মার থেকে শ্রেষ্ঠ না হন, তা হলে তাঁর শরণাগত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। *প্রপদ্যে* শব্দটি ভগবদ্ভক্তির পন্থাসূচক। রজ্জু ও সর্প সম্বন্ধে ভক্তিবিহীন জল্পনা কল্পনার দ্বারা কখনই পরম সত্যকে জানা যায় না। তাই মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা কল্পনার দ্বারা পরম সত্যকে জানার প্রচেষ্টা থেকে ভগবদ্ভক্তির গুরুত্ব অনেক বেশি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥ ৩৯ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ**—চরণ; **পঙ্কজ**—পদ্ম; **পলাশ**—পাপড়ি অথবা অঙ্গুলি; **বিলাস**—ভোগ; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **আশয়ম্**—বাসনা; **গ্রথিতম্**—গ্রন্থি; **উদ্গ্রথয়ন্তি**—সমূলে উৎপাটিত করে; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **তৎ**—তা; **বৎ**—সদৃশ, **ন**—কখনই না; **রিক্ত-মতয়ঃ**—ভগবদ্ভক্তি-বিহীন ব্যক্তিগণ; **যতয়ঃ**—অধিক থেকে অধিকতর প্রচেষ্টার দ্বারা; **অপি**—যদিও; **রুদ্ধ**—বন্ধ করেছে, **স্রোতঃ-গণাঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের তরঙ্গ; **তম্**—তাঁকে; **অরণম্**—শরণ গ্রহণের যোগ্য; **ভজ**—প্রেমপূর্বক সেবা করুন, **বাসুদেবম্**—বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে।

অনুবাদ

যে-সমস্ত ভক্তরা নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠির সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা অনায়াসে সকাম কর্মের বাসনাস্বরূপ গ্রন্থির বন্ধন থেকে মুক্ত হন। যেহেতু তা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই জ্ঞানী ও যোগী আদি অভক্তরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বৃত্তি রোধ করার কঠোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও সফল হতে পারে না। তাই আপনাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, বসুদেবের তনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হোন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে যত্নবান তিন প্রকার অধ্যাত্মবাদী রয়েছেন—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। তাঁরা সকলেই নদীর অন্তহীন তরঙ্গের মতো ইন্দ্রিয়ের

প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। নদীর তরঙ্গ অবিরল ধারায় প্রবাহিত হয় এবং তা রোধ করা খুব কঠিন। তেমনই, জড়সুখ ভোগের বাসনার তরঙ্গ এতই প্রবল যে, তা ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই রোধ করা যায় না। ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে চিন্ময় প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের দ্বারা দিব্য আনন্দে এতই অভিভূত হন যে, তাঁর জড়সুখ ভোগের বাসনা আপনা থেকেই লুপ্ত হয়ে যায়। জ্ঞানী ও যোগীরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আসক্ত না হওয়ার ফলে, বাসনার তরঙ্গের বিরুদ্ধে কেবল সংগ্রামই করে যায়। এই শ্লোকে তাদের *রিক্ত-মতয়ঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'ভক্তিবিহীন'। অর্থাৎ, জ্ঞানী ও যোগীরা যদিও জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ভ্রান্ত দার্শনিক জল্পনা কল্পনা অথবা ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ রোধ করার কঠোর প্রচেষ্টায় আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। সেই সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭)

এখানেও সেই বিষয়েই জোর দেওয়া হয়েছে। ভক্ত *বাসুদেবম্* বলতে বোঝায় যে, যিনি বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি অনায়াসে কামনার বৃত্তি রোধ করতে পারেন মানুষ যদি কৃত্রিমভাবে বাসনার বৃত্তি রোধ করার চেষ্টা করে, তা হলে সে নিশ্চিতভাবে পরাভূত হবে। সেই কথাই এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সকাম কর্ম-বাসনারূপ বৃক্ষের মূল অত্যন্ত দৃঢ, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির দ্বারা সেই বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত করা যায়, কারণ ভগবদ্ভক্তির বাসনা উন্নততর। উন্নত বাসনায় নিয়োজিত হলে, নিকৃষ্ট বাসনা বর্জন করা যায়। বাসনা ত্যাগ করা অসম্ভব কিন্তু নিকৃষ্ট বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবার বাসনা করা। জ্ঞানীরা পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করে, কিন্তু এই প্রকার বাসনাকেও কাম বলে বিবেচনা করা হয়। তেমনই, যোগীরা যোগসিদ্ধি লাভের বাসনা করে, এবং সেটিও কাম। আর ভক্তদের জড়সুখ ভোগের কোন প্রকার বাসনা থাকে না বলে তারা পবিত্র হয়। বাসনা ত্যাগ করার কোন রকম কৃত্রিম প্রচেষ্টা করা হয় না। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলির আশ্রয়ের বাসনা তখন চিন্ময় আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে এখানে কুমারগণ বলেছেন যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হচ্ছে সমস্ত আনন্দের চরম উৎস। তাই জড়সুখ ভোগের বাসনা রোধ করার ব্যর্থ প্রয়াস না করে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়

গ্রহণ কবা কর্তব্য। যতক্ষণ পর্যন্ত জড় জাগতিক সুখভোগেব বাসনা ত্যাগ না কবা যায়, ততক্ষণ সংসাব বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না সেই সম্পর্কে বলা যেতে পাবে যে, নদীব তবঙ্গ অবিবত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে এবং তা বোধ কবা যায় না, কিন্তু সেই নদী প্রবাহিত হচ্ছে সমুদ্রেব দিকে নদীতে যখন জোয়াব আসে, তখন সেই নদীব গতি বিপরীতমুখী হয এবং নদীর দুকূল ছাপিয়ে যায়, তখন সমুদ্রেব তবঙ্গ নদীব তবঙ্গ থেকে অধিক প্রভাবশালী হযে ওঠে। তেমনই, ভক্ত যখন তাঁব বুদ্ধি দিযে ভগবানেব সেবাব জন্য নানা বকম পবিকল্পনা কবেন, তখন জড় বাসনারূপ মরা নদীতে ভগবানেব সেবারূপ বাসনাব জোয়ার আসে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে যামুনাচার্য বলেছেন যে, যখন থেকে তিনি ভগবানেব শ্রীপাদপদ্মেব সেবায় যুক্ত হযেছেন, তখন ভগবানেব সেবা কবাব নব নব বাসনাব স্রোত এমনভাবে প্রবাহিত হচ্ছে যে, মৈথুন সুখেব অবরুদ্ধ বাসনা তখন নিতান্তই নগণ্য হযে গেছে। এমন কি যামুনাচার্য বলেছেন যে, তিনি তখন সেই প্রকার বাসনাব উদ্দেশ্যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন *ভগবদ্গীতাতেও* (২/৫৯) প্রতিপন্ন হযেছে—*পবং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সেবা কবাব প্রেমময়ী বাসনাব বিকাশেব দ্বাবা আমবা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগেব সমস্ত জড় বাসনা সমূলে উৎপাটিত করতে পাবি

শ্লোক ৪০

কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি।
তত্ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥ ৪০ ॥

কৃচ্ছ্রঃ—ক্লেশদাযক; **মহান্**—অত্যন্ত; **ইহ**—এখানে (এই জীবনে), **ভব-অর্ণবম্**—সংসাব সমুদ্র, **অপ্লব ঈশাম্**—পবমেশ্বব ভগবানেব শ্রীপাদপদ্মেব আশ্রয গ্রহণ করেনি যে অভক্তেবা, **ষট্‌ বর্গ**—ছয ইন্দ্রিয, **নক্রম্**—হাঙর, **অসুখেন**—অত্যন্ত অসুবিধা সহকারে, **তিতীর্ষন্তি**—উত্তীর্ণ হয, **তৎ**—অতএব; **ত্বম্**—আপনি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানেব, **ভগবতঃ**—ভগবানেব, **ভজনীয়ম্**—আবাধ্য; **অঙ্ঘ্রিম্**—শ্রীপাদপদ্ম, **কৃত্বা**—কবে, **উড়ুপম্**—নৌকা; **ব্যসনম্**—সব বকম বিপদ, **উত্তর**—উত্তীর্ণ হোন, **দুস্তর**—অত্যন্ত কঠিন; **অর্ণম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

অজ্ঞানের সমুদ্র পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা ভয়ঙ্কর নক্র-মকরসংকুল। অভক্তরা যদিও সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা করে, তবুও আমি আপনাকে বলছি যে, সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মরূপী নৌকার আশ্রয় অবলম্বন করুন। এই সমুদ্র যদিও অত্যন্ত দুস্তর, তবুও তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে আপনি অনায়াসে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতে পারবেন।

তাৎপর্য

এখানে জড় সংসারকে অজ্ঞানের বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সমুদ্রের আর একটি নাম বৈতরণী। বৈতরণী সমুদ্রে, যা হচ্ছে কারণ সমুদ্র, সেখানে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড খেলার বলের মতো ভাসছে। এই সমুদ্রের অপর পারে রয়েছে বৈকুণ্ঠলোক, যার বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যঃ*। এইভাবে এই জড়া প্রকৃতির অতীত এক নিত্য বিরাজমান চিন্ময় প্রকৃতি রয়েছে। যদিও কারণ সমুদ্রের সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি বার বার লয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোক নিত্য বিরাজমান এবং সেগুলির কখনও ধ্বংস হয় না। মনুষ্য-জীবন জীবকে অজ্ঞানের সমুদ্ররূপী জড় ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করে চিদাকাশে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়। এই সমুদ্র অতিক্রম করার যদিও নানা প্রকার উপায় অথবা নৌকা রয়েছে, কিন্তু কুমারেরা পৃথু মহারাজকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বনে অনিচ্ছুক অভক্তরা অন্যান্য উপায়ে (কর্ম, জ্ঞান ও যোগ) এই সমুদ্র অতিক্রম করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার ফলে তাদের মহাক্লেশই কেবল লাভ হয়। বাস্তবিকপক্ষে তারা সেই ক্লেশ উপভোগে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে কখনই পারে না। অভক্তরা যে সেই সমুদ্র পার হতে পারবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই, আর যদি তারা পার হয়ও, সেইজন্য তাদের কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। পক্ষান্তরে, যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধাপরায়ণ এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তিনি এক অত্যন্ত নিরাপদ নৌকায় চড়ে সেই সমুদ্র অতিক্রম করছেন, এবং তিনি যে অত্যন্ত অনায়াসে এবং স্বচ্ছন্দে সেই সমুদ্র অতিক্রম করবেন তা সুনিশ্চিত।

পৃথু মহারাজকে তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, অনায়াসে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করার নিমিত্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপী নৌকা গ্রহণ করার জন্য। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত

বিপজ্জনক বস্তুগুলির তুলনা করা হয়েছে সমুদ্রের হাঙ্গরের সঙ্গে কেউ যদি অত্যন্ত সুদক্ষ সাঁতারুও হয়, তবুও হাঙ্গর যদি তাঁকে আক্রমণ করে, তা হলে তার বাঁচার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, তথাকথিত বহু স্বামী ও যোগী ঘোষণা করে যে, তারা এই অজ্ঞানের সমুদ্র অতিক্রম করতে সক্ষম এবং অন্যদেরও তা অতিক্রম করতে তারা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, তারা কেবল তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের শিকার হয়। তাদের অনুগামীদের এই অজ্ঞানের সমুদ্র অতিক্রম করতে সাহায্য করার পরিবর্তে, এই সমস্ত স্বামী ও যোগীরা কামিনী-কাঞ্চনরূপী মায়ার শিকার হয়, এবং সেই সমুদ্রের হাঙ্গরেরা তাদের গ্রাস করে।

শ্লোক ৪১

মৈত্রেয় উবাচ

স এবং ব্রহ্মপুত্রেণ কুমারেণাত্মমেধসা ।
দর্শিতাত্মগতিঃ সম্যক্প্রশস্যোবাচ তং নৃপঃ ॥ ৪১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **সঃ**—রাজা; **এবম্**—এইভাবে, **ব্রহ্ম-পুত্রেণ**—ব্রহ্মার পুত্রের দ্বারা, **কুমারেণ**—কুমারদের একজনের দ্বারা; **আত্ম-মেধসা**—চিন্ময় জ্ঞানে পারঙ্গত; **দর্শিত**—দেখান হয়, **আত্ম-গতিঃ** -আধ্যাত্মিক উন্নতি, **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **প্রশস্য**—আরাধনা করে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **তম্**—তাঁকে, **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ব্রহ্মার পুত্র আত্ম-তত্ত্ববেত্তা সনৎকুমারের দ্বারা এইভাবে পূর্ণরূপে পারমার্থিক জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে, পৃথু মহারাজ নিম্নলিখিত শব্দে তাঁদের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *আত্ম-মেধসা* শব্দটির টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, *আত্মনি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে *পরমাত্মনি* অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১). তাই যাঁর মন পূর্ণ কৃষ্ণচেতনায় কার্য করছে, তাঁকে বলা হয় *আত্ম-মেধাঃ* । এই শব্দটির বিপরীত

শব্দ হচ্ছে *গৃহমেধী* , অর্থাৎ যার বুদ্ধি সর্বদা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন। *আত্ম-মেধাঃ* সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের কথা চিন্তা করেন। যেহেতু ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন, তাই তিনি পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের পন্থা প্রদর্শনে সক্ষম ছিলেন। *আত্মগতিঃ* শব্দটি কর্মের সেই পন্থার সূচক, যার দ্বারা মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে।

শ্লোক ৪২

রাজোবাচ

কৃতো মেঽনুগ্রহঃ পূর্বং হরিণার্তানুকম্পিনা ।
তমাপাদয়িতুং ব্রহ্মন্ ভগবন্ যূয়মাগতাঃ ॥ ৪২ ॥

রাজা উবাচ—রাজা বললেন, **কৃতঃ**—করেছেন, **মে**—আমাকে; **অনুগ্রহঃ**—অহৈতুকী কৃপা; **পূর্বম্**—পূর্বে, **হরিণা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **আর্ত-অনুকম্পিনা**—দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ; **তম্**—তা; **আপাদয়িতুম্**—তা প্রতিপন্ন করতে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ভগবন্**—হে শক্তিমান; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে; **আগতাঃ**—এখানে এসেছেন।

অনুবাদ

রাজা বললেন—হে ব্রাহ্মণ! হে শক্তিমান! পূর্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণু আমার প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, আপনারা আমার গৃহে আসবেন। তাঁর সেই আশীর্বাদ পূর্ণ করার জন্য আপনারা সকলে এখানে এসেছেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ মহান অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন ভগবান বিষ্ণু সেই মহা-যজ্ঞস্থলে প্রকট হয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, অচিরেই কুমারেরা এসে রাজাকে উপদেশ দান করবেন। তাই পৃথু মহারাজ ভগবানের সেই অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করেছিলেন, এবং ভগবানের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করে কুমারেরা যখন সেখানে এসেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবান যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন তিনি তাঁর কোন ভক্তদের মাধ্যমে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন। তেমনই, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর মহিমান্বিত নাম এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

উভয়ই পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে প্রচারিত হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার বাসনা করেছিলেন, এবং আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।

তাঁর ভক্তদের সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি* —"হে কৌন্তেয়, দৃপ্ত কণ্ঠে তুমি ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩১) ভগবান নিজেই সেই কথা ঘোষণা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি অর্জুনের মাধ্যমে সেই ঘোষণাটি করতে চেয়েছিলেন, এবং এইভাবে তিনি দ্বিগুণভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হবে না। ভগবান নিজে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। দুর্দশাগ্রস্ত মানব সমাজের জন্য ভগবান বহু প্রতিজ্ঞা করেন। ভগবান যদিও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তবুও মানুষেরা সাধারণত তাঁর সেবা করতে চায় না। তাই সম্পর্কটি অনেকটা পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো; পুত্র পিতাকে ভুলে গেলেও অথবা অবহেলা করলেও, পিতা সর্বদাই পুত্রের কল্যাণসাধনে উৎসুক থাকেন। *অনুকম্পিনা* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ; ভগবান জীবের প্রতি এতই কৃপাপরায়ণ যে, অধঃপতিত জীবদের কল্যাণের জন্য তিনি স্বয়ং এই জড় জগতে আসেন

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতরণ করি।" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৭)

এইভাবে অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে ভগবান বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন। অধঃপতিত জীবেদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই লোকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অসুরেরা যখন অসহায় পশুদের হত্যা করছিল, তখন সেই পশুদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে বুদ্ধদেব এসেছিলেন; প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন অর্থাৎ, ভগবান এই জড় জগতের অধঃপতিত জীবদের প্রতি এতই কৃপাপরায়ণ যে, তাদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি স্বয়ং আসেন, অথবা তাঁর ভক্ত ও সেবকদের প্রেরণ করেন। তাই সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে *ভগবদ্গীতা* উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই জন্য বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সম্বন্ধে গভীরভাবে বিচার করা, এবং শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তদের দেওয়া *ভগবদ্গীতার* নির্ভেজাল উপদেশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

শ্লোক ৪৩

নিষ্পাদিতশ্চ কার্ৎস্ন্যেন ভগবদ্ভির্ঘৃণালুভিঃ ।
সাধূচ্ছিষ্টং হি মে সর্বমাত্মনা সহ কিং দদে ॥ ৪৩ ॥

নিষ্পাদিতঃ চ—আদেশ যথাযথভাবে পালন করে, **কার্ৎস্ন্যেন**—পূর্ণরূপে, **ভগবদ্ভিঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিদের দ্বারা, **ঘৃণালুভিঃ**—অত্যন্ত দয়ালুর দ্বারা; **সাধু-উচ্ছিষ্টম্**—সাধুদের উচ্ছিষ্ট, **হি**—নিশ্চিতভাবে, **মে**—আমার, **সর্বম্**—সব কিছু, **আত্মনা**—হৃদয় ও আত্মা, **সহ**—সঙ্গে, **কিম্**—কি, **দদে**—দেব।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! আপনারা ভগবানেরই মতো কৃপালু, তাই আপনারা তাঁর আদেশ পূর্ণরূপে পালন করেছেন। আপনাদের কিছু দান করা আমার কর্তব্য, কিন্তু আমার কাছে যা রয়েছে, তা সাধুদের উচ্ছিষ্ট স্বরূপ। অতএব আপনাদের আমি কি দান করব?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সাধূচ্ছিষ্টম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ পৃথু মহারাজ ভৃগু আদি মহর্ষিদের কাছ থেকে তাঁদের উচ্ছিষ্ট স্বরূপ তাঁর রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন রাজা বেণের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে কোন জনপ্রিয় রাজা ছিল না। তার ফলে নানা প্রকার দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল, এবং তখন ভৃগুর নেতৃত্বে মহান ঋষিরা মৃত রাজা বেণের শরীর থেকে পৃথু মহারাজের দেহ সৃষ্টি করেছিলেন পৃথু মহারাজ যেহেতু মহর্ষিদের কৃপায় তাঁর রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি কুমারদের কাছে সেই রাজ্য বণ্টন করতে চাননি। পিতা যদি কৃপাপূর্বক তাঁর পুত্রকে তাঁর উচ্ছিষ্ট দান করেন, সেই উচ্ছিষ্ট পুনরায় পিতাকে প্রদান করা পুত্রের কর্তব্য নয় পৃথু মহারাজের অবস্থা অনেকটা সেই রকম ছিল। তাঁর কাছে যা কিছু ছিল, তা সবই পিতৃসদৃশ সাধুদের উচ্ছিষ্ট এবং তাই তিনি পুনরায় কুমারদের তা নিবেদন করতে চাননি। কিন্তু, পরোক্ষভাবে তিনি তাঁর সব কিছুই কুমারদের দান করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারতেন। পরবর্তী শ্লোকে সেই বিষয়টি স্পষ্টিকৃত হয়েছে।

শ্লোক ৪৪

প্রাণা দারাঃ সুতা ব্রহ্মন্ গৃহাশ্চ সপরিচ্ছদাঃ ।
রাজ্যং বলং মহী কোশ ইতি সর্বং নিবেদিতম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রাণাঃ—প্রাণ; **দারাঃ**—পত্নী; **সুতাঃ**—পুত্র; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **গৃহাঃ**—গৃহ; **চ**—ও; **স**—সহ; **পরিচ্ছদাঃ**—সমস্ত উপকরণ; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **বলম্**—শক্তি; **মহী**—ভূমি, **কোশঃ**—কোশ; **ইতি**—এইভাবে, **সর্বম্**—সব কিছু ; **নিবেদিতম্**—অর্পণ করলাম।

অনুবাদ

রাজা বললেন—অতএব হে ব্রাহ্মণগণ। আমার জীবন, পত্নী, পুত্র, গৃহ, গৃহস্থালির সমস্ত সামগ্রী, আমার রাজ্য, বল, ভূমি এবং বিশেষরূপে আমার রাজকোষ সবই আমি আপনাদের নিবেদন করলাম।

তাৎপর্য

কোন কোন পাঠে *দারাঃ* শব্দটির ব্যবহার হয়নি, তার পরিবর্তে *রায়ঃ* শব্দটিব ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'ধনসম্পদ'। ভারতবর্ষে এখনও অনেক ধনী ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা রাজ্যের দ্বারা *রায়* উপাধিতে পরিচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন মহান ভক্ত রামানন্দ রায়রূপে পবিচিত ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন মাদ্রাজের রাজ্যপাল এবং অত্যন্ত ধনী। এখনও রায় বাহাদুর, রায় চৌধুবী ইত্যাদি বায় উপাধিধারী বহু ব্যক্তি রয়েছেন। *দারাঃ* বা পত্নীকে ব্রাহ্মণদের নিবেদন কবা অনুমোদিত নয়। দান গ্রহণের যোগ্য পাত্রে সব কিছু দান কবা যায়, কিন্তু কোথায়ও পত্নীকে দান কবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না; তাই এখানে *দারাঃ* শব্দটির স্থানে *রায়ঃ* পাঠটি অধিক উপযুক্ত। যেহেতু পৃথু মহারাজ কুমারদেব সর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন, তাই *কোশঃ* শব্দটির পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। রাজা ও মহারাজেরা নিজেদের ব্যক্তিগত কোষ রাখতেন যাকে বত্নভাণ্ড বলা হত রত্নভাণ্ড এক বিশেষ প্রকার কোষাগার যাতে বালা, কণ্ঠহার ইত্যাদি বিশেষ রত্নালঙ্কার, যা নাগরিকেরা রাজাকে প্রদান করতেন, তা রাখা হত। যে কোষে কর ও খাজনা বাখা হয়, তা থেকে পৃথকভাবে এই সমস্ত রত্নালঙ্কার রাখা হত। এইভাবে পৃথু মহাবাজ তাঁর ব্যক্তিগত মণিরত্নও কুমারদের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন কবেছিলেন। ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে, রাজার সমস্ত সম্পত্তি ছিল ব্রাহ্মণদেব, এবং পৃথু মহারাজ রাজ্যের কল্যাণেব জন্য কেবল তা ব্যবহার করছিলেন, যদি তা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি হয়, তা হলে সেগুলি আবার তাদের নিবেদন করা কি করে সম্ভব? সেই সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীধব স্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, সেটি ঠিক ভৃত্যের প্রভুকে খাদ্য নিবেদন করার মতো। খাদ্য প্রভুর, কারণ তিনি তা খরিদ কবেছেন, কিন্তু ভৃত্য আহার তৈরি করে, তা প্রভুর গ্রহণযোগ্য করে তাঁকে তা নিবেদন করে। এইভাবে পৃথু মহাবাজের যা কিছু তা সবই তিনি কুমারদের নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ ।
সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ ৪৫ ॥

সৈনা-পত্যম্—সেনাপতির পদ; **চ**—এবং; **রাজ্যম্**—রাজপদ; **চ**—এবং; **দণ্ড**—শাসন; **নেতৃত্বম্**—নেতৃত্ব, **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং; **সর্ব**—সমস্ত; **লোক-অধিপত্যম্**—গ্রহলোকের আধিপত্য; **চ**—এবং; **বেদ-শাস্ত্র-বিৎ**—যিনি বৈদিক শাস্ত্রের মর্ম অবগত; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

যেহেতু বৈদিক জ্ঞানসমন্বিত ব্যক্তিই কেবল সেনাপতি, রাজ্যশাসক, দণ্ডদাতা ও সমগ্র গ্রহলোকের অধিপতি হওয়ার যোগ্য, তাই পৃথু মহারাজ সব কিছু কুমারদের নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুমারদের মতো সাধু ও ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য, রাষ্ট্র অথবা সাম্রাজ্য পরিচালনা করা অবশ্য কর্তব্য। যখন রাজতন্ত্র সমগ্র পৃথিবী শাসন করছিল, তখন সাধু ও ব্রাহ্মণদের পরিষদের দ্বারা রাজা পরিচালিত হতেন। রাজ্যের শাসক রাজা ব্রাহ্মণদের দাসরূপে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতেন। এমন নয় যে, রাজা অথবা ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। এমন কি তাঁরা তাঁদের রাজ্য নিজের সম্পত্তি বলেও মনে করতেন না। রাজারা বৈদিক শাস্ত্রে অত্যন্ত পারঙ্গত ছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা *ঈশোপনিষদের* নির্দেশ, *ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বম্*, অর্থাৎ সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, সেই কথা খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন। *ভগবদ্গীতাতেও* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন *সর্বলোক-মহেশ্বরম্*। তাই কেউই রাজ্যের মালিক হওয়ার দাবি করতে পারে না। রাজা, রাষ্ট্রপতি অথবা রাষ্ট্র-প্রধানদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, তাঁরা মালিক নন, তাঁরা হচ্ছেন দাস।

বর্তমান যুগে, রাজা অথবা রাষ্ট্রপতিরা ভুলে গেছেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের দাস। পক্ষান্তরে তাঁরা নিজেদের জনসাধারণের দাস বলে মনে করেন। বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঘোষণা করে যে, তারা হচ্ছে জনগণের সরকার, কিন্তু এই প্রকার সরকার *বেদে* অনুমোদিত হয়নি। *বেদে* বলা হয়েছে যে, ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে রাজ্যশাসন করা উচিত, এবং তাই ভগবানের প্রতিনিধিদের

দ্বারা তা শাসিত হওয়া উচিত। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (*বেদ-শাস্ত্র-বিদ্‌-অর্হতি*), অর্থাৎ উচ্চ রাজপদগুলি তাঁদেরই দেওয়া উচিত, যাঁরা বৈদিক শাস্ত্রে পারঙ্গত। *বেদে* বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রাজা, সেনাপতি, সৈনিক ও নাগরিকদের কিভাবে আচরণ করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান যুগে বহু তথাকথিত দার্শনিক রয়েছে, যারা প্রামাণিক উদাহরণ না দিয়েই উপদেশ দেয়, এবং বহু নেতারা তাদের অবৈধ নির্দেশ অনুসরণ করে তার ফলে মানুষ সুখী নয়।

কার্ল মার্ক্স-এর বর্তমান সাম্যবাদ যা সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলি অনুসরণ করছে, তা পূর্ণ নয় বৈদিক সাম্যবাদ অনুসারে, রাজ্যে কেউ কখনও অভুক্ত থাকে না বর্তমানে অনেক আজেবাজে প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা ক্ষুধার্তদের খাদ্য প্রদান করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, কিন্তু এই অর্থ নিঃসন্দেহে অপব্যবহার করা হয়। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, সরকারের এমনভাবে সব কিছুর আয়োজন করা উচিত, যাতে কারও অনাহারে থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, গৃহস্থদের দেখা উচিত যে, যাতে একটি টিকটিকি এবং সাপও অনাহারে না থাকে। তাদেরও আহার প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে অনাহারের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সব কিছু হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি এবং তিনি এমন ব্যবস্থা করেন যে, সকলেরই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য মেলে। *বেদে* (*কঠোপনিষদ* ২/২/১৩) বলা হয়েছে *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্‌* । পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করেন, এবং অনাহারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ যদি অনাহারে থাকে, তবে তার কারণ হচ্ছে তথাকথিত শাসক, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির কুশাসন ব্যবস্থা।

অতএব, স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা *বেদশাস্ত্রবিৎ* নন, তাঁদের রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ইত্যাদি হওয়ার জন্য ভোটে দাঁড়ানো উচিত নয়। পুরাকালে রাজারা ছিলেন *রাজর্ষি* , অর্থাৎ, যদিও তাঁরা রাজারূপে রাজ্যশাসন করতেন, তবুও কখনও বৈদিক শাস্ত্রনির্দেশ লঙ্ঘন করতেন না এবং মহান সাধু ও ব্রাহ্মণদের নির্দেশনায় রাজ্যশাসন করতেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে, বর্তমান রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও মুখ্য সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের পদের অযোগ্য, কারণ তাঁরা বৈদিক প্রশাসনিক জ্ঞানে পারঙ্গত নন এবং মহান সাধু ও ব্রাহ্মণদের নির্দেশ তাঁরা গ্রহণ করেন না। *বেদ* ও ব্রাহ্মণদের আদেশ অবজ্ঞা করার ফলে, পৃথু মহারাজের পিতা ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। তাই পৃথু মহারাজ ভালভাবে জানতেন যে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সাধু ও ব্রাহ্মণদের সেবকরূপে এই পৃথিবী শাসন করা।

শ্লোক ৪৬

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ ।
তস্যৈবানুগ্রহেণান্নং ভুঞ্জতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

স্বম্—নিজের; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে, **স্বম্**—নিজের; **বস্তে**—বস্ত্র; **স্বম্**—নিজের; **দদাতি**—দান করেন, **চ**—এবং; **তস্য**—তাঁর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুগ্রহেণ**—কৃপার দ্বারা; **অন্নম্**—অন্ন, **ভুঞ্জতে**—আহার করে, **ক্ষত্রিয়-আদয়ঃ**—সমাজের ক্ষত্রিয় আদি অন্য বর্ণ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের কৃপায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররা তাদের আহার প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণেরাই কেবল তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি ভোগ করেন, তাঁদের নিজেদের বস্ত্র পরিধান করেন এবং তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি অপরকে দান করেন।

তাৎপর্য

নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় মন্ত্রে ভগবানের পূজা করা হয়, যা ইঙ্গিত করে যে, ভগবান ব্রাহ্মণদের পূজনীয় বলে মনে করেন। সকলেই ভগবানের পূজা করে, কিন্তু অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান ব্রাহ্মণদের পূজা করেন। সকলেরই কর্তব্য ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করা, কারণ ব্রাহ্মণদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, সারা পৃথিবী জুড়ে শব্দ-ব্রহ্ম বা বৈদিক জ্ঞান প্রচার করা। যখনই বৈদিক জ্ঞানের প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণদের অভাব হয়, তখন মানব-সমাজে সংকট দেখা দেয়। যেহেতু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা হচ্ছেন ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবক, তাই তাঁরা অন্য কারোর উপর নির্ভর করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই জগতের সব কিছুই ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি, এবং দৈন্যবশত ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়, অথবা রাজা এবং বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন। সব কিছুই ব্রাহ্মণদের, কিন্তু ক্ষত্রিয় সরকার ও ব্যবসায়ীরা তত্ত্বাবধায়কের মতো তার তত্ত্বাবধান করেন, এবং যখন ব্রাহ্মণদের অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের তা সরবরাহ করা উচিত। সেটা অনেকটা ব্যাঙ্কে টাকা রাখার মতো এবং যিনি টাকা গচ্ছিত রাখেন, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে টাকা তুলে নিতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা ভগবানের সেবায় রত থাকেন বলে বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয় সামলাবার জন্য তাঁদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকে না, তাই ক্ষত্রিয়রা অথবা রাজারা ধনসম্পদ আগলে রাখতেন, এবং ব্রাহ্মণদের প্রয়োজনে সেই সম্পদ তাঁদের এনে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবেরা অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন যাপন

করবেন না, তাঁরা তাঁদের নিজেদের ধনই খরচ করবেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাঁরা অন্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দান করবার কোন অধিকার নেই, কারণ তাদের যা কিছু তা সবই ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি। তাই ব্রাহ্মণদের নির্দেশনায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দান করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত অভাব, এবং যেহেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করছে না, তাই পৃথিবীর অবস্থা এত সংকটজনক হয়ে উঠেছে।

এই শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি ইঙ্গিত করে যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা কেবল ব্রাহ্মণের কৃপাতেই আহার করে; অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের দ্বারা বর্জিত কোন বস্তু তাদের আহার করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা জানেন কি আহার করা উচিত, এবং তাঁরা এমন কোন বস্তু আহার করেন না, যা প্রথমে ভগবানকে নিবেদন করা হয়নি। তাঁরা কেবল প্রসাদ বা ভগবানকে নিবেদিত খাদ্য আহার করেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদেরও কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ আহার করা উচিত, যা ব্রাহ্মণদের কৃপায় তারা পেয়ে থাকে কসাইখানা খুলে মাংস, মাছ অথবা ডিম আহার করা অথবা মদ্যপান করা, কিংবা এই সমস্ত উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করা তাদের উচিত নয় বর্তমান যুগে, যেহেতু ব্রাহ্মণদের নির্দেশনায় সমাজ পরিচালিত হচ্ছে না, তাই সমস্ত জনসাধারণ কেবল পাপকর্মে মগ্ন হয়েছে। তার ফলে, সকলেই প্রকৃতির নিয়মে যথাযোগ্য দণ্ডভোগ করছে। এটিই হচ্ছে কলিযুগের অবস্থা।

শ্লোক ৪৭

যৈরীদৃশী ভগবতো গতিরাত্মবাদ
একান্ততো নিগমিভিঃ প্রতিপাদিতা নঃ ।
তুষ্যন্ত্বদভ্রকরুণাঃ স্বকৃতেন নিত্যং
কো নাম তৎপ্রতিকরোতি বিনোদপাত্রম্ ॥ ৪৭ ॥

যৈঃ—যাঁদের দ্বারা; **ঈদৃশী**—এই প্রকার; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গতিঃ**—প্রগতি, **আত্ম-বাদে**—আধ্যাত্মিক বিচার; **একান্ততঃ**—পূর্ণ উপলব্ধিতে; **নিগমিভিঃ**—বৈদিক প্রমাণের দ্বারা; **প্রতিপাদিতা**—নিশ্চিতরূপে নিরূপিত; **নঃ**—আমাদের; **তুষ্যন্তু**—সন্তুষ্ট হন; **অদভ্র**—অন্তহীন; **করুণাঃ**—কৃপা; **স্ব-কৃতেন**—আপনার নিজের কার্যকলাপের দ্বারা; **নিত্যম্**—শাশ্বত; **কঃ**—কে; **নাম**—কেউ নয়; **তৎ**—তা; **প্রতিকরোতি**—প্রতিকার করে; **বিনা**—ব্যতীত; **উদ-পাত্রম্**—অঞ্জলিভরে জল নিবেদন করা।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বললেন—যাঁরা ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করার দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির পন্থা বিশ্লেষণ করে অন্তহীন সেবা করেছেন, এবং বৈদিক প্রমাণের উপর পূর্ণ বিশ্বাস-সমন্বিত যাঁদের ব্যাখ্যা আমাদের জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, তাঁদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য অঞ্জলি ভরে কেবল জল দেওয়া ছাড়া আর আমাদের কি দেওয়ার আছে? এই প্রকার মহাপুরুষেরা তাঁদের নিজেদের কার্যকলাপেব দ্বারাই কেবল সন্তুষ্ট হতে পারেন, যা তাঁদের অন্তহীন করুণার ফলে, মানব-সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে।

তাৎপর্য

জড় জগতে মহাপুরুষেবা মানব সমাজের কল্যাণ-সাধনেব জন্য সেবা করতে অত্যন্ত উৎসুক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতবণ থেকে বড় সেবা আব নেই। সমস্ত জীব মায়াশক্তির বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের প্রকৃত পবিচয় ভুলে গিয়ে, তারা শান্তিপূর্ণ জীবনের অন্বেষণে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে জড় জগতে বিচবণ কবে। যেহেতু তাদের আত্ম-উপলব্ধির স্বল্প জ্ঞানও নেই, তাই তাবা মনের ও দেহের সুখের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হওয়া সত্ত্বেও শান্তি পায় না। কুমার, নাবদ, প্রহ্লাদ, জনক, শুকদেব গোস্বামী ও কপিলদেব আদি মহাজনদের অনুগামী বৈষ্ণব আচার্যবা এবং তাঁদের সেবকেরা পবমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান কবে মানব-সমাজের এক অপূর্ব সেবা সম্পাদন করতে পারেন। এই জ্ঞান মানব সমাজের জন্য এক অপূর্ব আশীর্বাদ।

কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান এমনই এক মহান উপহার, যার প্রতিদান দেওয়া অসম্ভব। তাই পৃথু মহারাজ কুমারদের অনুবোধ করেছেন যে, জীবদেব মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করাব পরোপকারের কার্যই তাঁদের সন্তোষের কারণস্বরূপ। বাজা দেখেছিলেন যে, তাঁদের সেই অতি মহৎ কার্যকলাপের জন্য তাঁদের প্রসন্নতা বিধানের আর অন্য কোন উপায় ছিল না। *বিনোদপাত্রম্* শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ হয় *বিনা* ও *উদপাত্রম্* , অথবা একটি শব্দরূপে তার অর্থ হচ্ছে '*বিদূষক* '। বিদূষকের কার্য হচ্ছে কেবল লোক হাসানো, এবং যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব অথবা শ্রীকৃষ্ণের দিব্যজ্ঞান প্রদানকারী শিক্ষককে প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করে, তার অবস্থা ঠিক একজন বিদূষকের মতো হাস্যকর, কারণ সেই ঋণ কখনও শোধ করা সম্ভব নয়। সমস্ত মানুষদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও উপকাবক হচ্ছেন তিনি, যিনি মানুষদের মূল কৃষ্ণচেতনায় জাগরিত কবেন।

শ্লোক ৪৮

মৈত্রেয় উবাচ
ত আত্মযোগপতয় আদিরাজেন পূজিতাঃ ।
শীলং তদীয়ং শংসন্তঃ খেহভবন্মিষতাং নৃণাম্ ॥ ৪৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন, **তে**—তাঁরা; **আত্ম যোগ-পতয়ঃ**—ভক্তির দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির উপদেষ্টাগণ; **আদি রাজেন**—আদি রাজা (পৃথু) দ্বারা; **পূজিতাঃ**—পূজিত হয়ে; **শীলম্**—স্বভাব; **তদীয়ম্**—রাজার, **শংসন্তঃ**—প্রশংসা করে, **খে**—আকাশে, **অভবন্**—আবির্ভূত হয়েছিলেন, **মিষতাম্**—যখন দেখছিলেন; **নৃণাম্**—মানুষদের।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—এইভাবে পৃথু মহারাজের দ্বারা পূজিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির উপদেষ্টা চার কুমারগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা রাজার গুণের প্রশংসা করতে করতে সর্বসমক্ষে আকাশমার্গে উত্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, দেবতারা কখনও পৃথিবীর পৃষ্ঠ স্পর্শ করেন না। তাঁরা কেবল অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন নারদ মুনি, কুমার আদি মহর্ষিদের অন্তরীক্ষে বিচরণের জন্য কোন রকম যানের আবশ্যকতা হয় না সিদ্ধলোকের অধিবাসীরাও বিনা যানে অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে পারেন, কারণ তাঁরা সব রকম যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন। পূর্ণরূপে যোগসিদ্ধ এই প্রকার মহাপুরুষদের আর আজকাল পৃথিবীতে দেখা যায় না, কারণ এখনকার মানব-সমাজ তাঁদের উপস্থিতির যোগ্য নয় কুমারগণ কিন্তু পৃথু মহারাজের চরিত্রের, তাঁর মহান ভক্তির এবং বিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন। পৃথু মহারাজ যেভাবে তাঁদের পূজা করেছিলেন, তার ফলে কুমারগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। পৃথু মহারাজের কৃপার প্রভাবেই তাঁর প্রজারা কুমারদের অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে দেখতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

বৈণ্যস্তু ধুর্যো মহতাং সংস্থিত্যাধ্যাত্মশিক্ষয়া ।
আপ্তকামমিবাত্মানং মেন আত্মন্যবস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥

বৈণ্যঃ—মহারাজ বেণের পুত্র (পৃথু); **তু**—নিঃসন্দেহে; **ধুর্যঃ**—প্রধান; **মহতাম্**—মহাপুরুষদের; **সংস্থিত্যা**—পূর্ণরূপে স্থির হয়ে; **আধ্যাত্ম-শিক্ষয়া**—আত্ম-উপলব্ধির বিষয়ে; **আপ্ত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কামম্**—বাসনা, **ইব**—সদৃশ; **আত্মানম্**—আত্মতৃপ্তিতে; **মেনে**—বিবেচনা করেছিলেন; **আত্মনি**—আত্মায়; **অবস্থিতঃ**—স্থিত হয়ে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে স্থির হওয়ার ফলে, মহাপুরুষদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। পারমার্থিক উপলব্ধিতে পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করার ফলে, তিনি আত্মতৃপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হওয়ার ফলে, মানুষ পরম আত্মসন্তোষ লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে আত্মসন্তোষ কেবল শুদ্ধ ভক্তরাই লাভ করতে পারেন, যাঁদের ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা থাকে না। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের কাম্য কিছুই নেই, তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত। তেমনই যে ভগবদ্ভক্তের ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই, তিনিও ভগবানেরই মতো আত্মতৃপ্ত। সকলেই মনের শান্তি এবং আত্মার তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু তা লাভ করা সম্ভব কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে।

পূর্ববর্তী শ্লোকে পৃথু মহারাজের অসীম জ্ঞান এবং পূর্ণ ভক্তির বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা এখানে সমর্থিত হয়েছে, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত মহাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৩) শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মাদের সম্বন্ধে বলেছেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পৃথানন্দন! মোহমুক্ত মহাত্মারা দৈবী প্রকৃতির আশ্রয়ে সংরক্ষিত। তাঁরা পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকেন, কারণ তাঁরা আমাকে আদি ও অব্যয় পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানেন।"

মহাত্মারা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ নন, পক্ষান্তরে তাঁরা ভগবানের দৈবী শক্তির সংরক্ষণে অবস্থিত। তার ফলে প্রকৃত মহাত্মারা সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন। পৃথু মহারাজ মহাত্মার এই সমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেছিলেন, তাই এই শ্লোকে তাঁকে *ধুর্যো মহতাম্* বা শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫০

কর্মাণি চ যথাকালং যথাদেশং যথাবলম্ ।
যথোচিতং যথাবিত্তমকরোদ্‌ব্রহ্মসাৎকৃতম্ ॥ ৫০ ॥

কর্মাণি—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **যথা-কালম্**—সময় ও পরিস্থিতির উপযুক্ত; **যথা-দেশম্**—স্থান ও স্থিতির উপযুক্ত; **যথা-বলম্**—নিজের শক্তি অনুসারে; **যথা-উচিতম্**—যতখানি সম্ভব; **যথা-বিত্তম্**—এই সম্বন্ধে যতখানি অর্থ ব্যয় করা সম্ভব; **অকরোৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ব্রহ্ম-সাৎ**—পরম সত্যে; **কৃতম্**—করেছিলেন।

অনুবাদ

আত্মতুষ্ট হওয়ার ফলে পৃথু মহারাজ সময়, স্থান, শক্তি ও আর্থিক স্থিতি অনুসারে, যথাসম্ভব পূর্ণতা সহকারে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। এই সমস্ত কার্যে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। এইভাবে তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন দায়িত্বশীল সম্রাট, এবং তাই একই সময়ে তাঁকে একজন ক্ষত্রিয়, একজন রাজা এবং একজন ভক্তরূপে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়েছিল। সিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে স্থান, কাল, আর্থিক সঙ্গতি এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা অনুযায়ী, তিনি পূর্ণ দক্ষতা সহকারে তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পেরেছিলেন। এই সম্পর্কে এই শ্লোকে *কর্মাণি* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ ছিল অসাধারণ, কারণ তা ছিল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবদ্ভক্তির অনুকূল যা কিছু তা কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়, এবং ভগবদ্ভক্তির অনুকূল কার্যকলাপকে কখনও সাধারণ কার্য বা সকাম কর্ম বলে মনে করা উচিত নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, একজন সাধারণ কর্মী তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা করে। ভগবদ্ভক্ত সেই কার্য ঠিক একইভাবে সম্পাদন করতে পারেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। তাই তাঁর কার্যকলাপ সাধারণ নয়।

পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ সাধারণ ছিল না, পক্ষান্তরে তা ছিল আধ্যাত্মিক ও দিব্য, কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। ঠিক অর্জুনের মতো, যিনি ছিলেন যোদ্ধা, তাই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য

যুদ্ধ করতে হয়েছিল। একজন রাজারূপে পৃথু মহারাজও ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য তাঁর রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, সমগ্র পৃথিবীর সম্রাটরূপে তিনি যা কিছু করেছিলেন, তা সর্বতোভাবে একজন শুদ্ধ ভক্তের উপযুক্ত ছিল। তাই জনৈক বৈষ্ণব কবি বলেছেন, '*বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়*'—শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপ কেউই বুঝতে পারে না। শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপ সাধারণ ক্রিয়াকলাপ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার পিছনে একটি গভীর বৈশিষ্ট্য থাকে—পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বুঝতে হলে, অত্যন্ত দক্ষ হতে হয়। যদিও একজন বৈষ্ণবরূপে পৃথু মহারাজ ছিলেন পরমহংস, অর্থাৎ সমস্ত জড় কার্যকলাপের অতীত, তবুও তিনি কখনও চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রমের বাইরে কোন কার্য করেননি। একজন ক্ষত্রিয়রূপে তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের মাধ্যমে এই সমস্ত কার্যের অতীত ছিলেন। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তরূপে তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে, বাহ্যিকভাবে তিনি নিজেকে একজন অতি শক্তিশালী ও কর্তব্য-পরায়ণ রাজারূপে প্রকাশ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তাঁর কোন কার্যই তিনি নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য করেননি। তিনি যা কিছু করেছিলেন, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৫১

ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য নির্বিষঙ্গঃ সমাহিতঃ ।
কর্মাধ্যক্ষং চ মন্বান আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৫১ ॥

ফলম্—ফল; **ব্রহ্মণি**—পরম ব্রহ্মে; **সংন্যস্য**—পরিত্যাগ করে; **নির্বিষঙ্গঃ**—কলুষিত না হয়ে; **সমাহিতঃ**—পূর্ণরূপে সমর্পিত; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **অধ্যক্ষম্**—অধ্যক্ষ; **চ**—এবং; **মন্বানঃ**—সর্বদা চিন্তা করে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **প্রকৃতেঃ**—জড় প্রকৃতির; **পরম্**—অতীত।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ নিজেকে জড় প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাসরূপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সমস্ত কর্মের ফল ভগবানে অর্পিত হয়েছিল, এবং তিনি সর্বদা নিজেকে সর্বেশ্বর ভগবানের দাসরূপে মনে করতেন।

তাৎপর্য

ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় সমর্পিত পৃথু মহারাজের জীবন কর্মযোগের একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। *ভগবদ্গীতায়* কর্মযোগ শব্দটির প্রায়ই ব্যবহার হয়েছে, এবং এখানে বাস্তবিকপক্ষে কর্মযোগ যে কি, তার ব্যবহারিক উদাহরণ দিয়েছেন পৃথু মহারাজ। কর্মযোগের যথাযথ সম্পাদনে প্রাথমিক আবশ্যকতা এখানে দেওয়া হয়েছে। *ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য* (অথবা *বিন্যস্য*)—কর্মের সমস্ত ফল পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। তা করার ফলে, বাস্তবিকভাবে সন্ন্যাস আশ্রমে স্থিত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/২) বলা হয়েছে যে, কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানে অর্পণ করাকে বলা হয় সন্ন্যাস।

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

"প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলেন।" পৃথু মহারাজ যদিও একজন গৃহস্থরূপে জীবন যাপন করছিলেন, তবুও তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

নির্বিষঙ্গঃ (নিষ্কলুষ) শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পৃথু মহারাজ তাঁর কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত ছিলেন না। এই জড় জগতে কোন ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে এবং কার্য করে, সে সর্বদা নিজেদের তার মালিক বলে মনে করে। যখন কর্মের ফল ভগবানের সেবায় নিবেদিত হয়, তখনই কেবল প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগের অনুশীলন হয়। কর্মযোগ যে-কেউ অনুশীলন করতে পারেন, তবে তা বিশেষভাবে গৃহস্থদের পক্ষে সহজ, যাঁরা তাঁদের গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তিযোগের পন্থা অনুসারে তাঁর আরাধনা করতে পারেন। এই পন্থার নয়টি অঙ্গ রয়েছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩)

কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের এই পন্থা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। সেই সংঘের সদস্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার দ্বারা যে-কোন ব্যক্তি সেই পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারেন।

গৃহে অথবা মন্দিরে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে সব কিছুর মালিক বলে মনে করা

উচিত, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস বলে মনে করা উচিত। ভগবান এই জড় সৃষ্টির অংশ নন, তাই তিনি জড়াতীত। এই শ্লোকে *প্রকৃতেঃ পরম্* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ এই জড় জগতে সব কিছুই ভগবানের বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু ভগবান স্বয়ং এই জড় জগতের সৃষ্টি নন। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় সৃষ্টির পরম অধ্যক্ষ, এবং সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বলা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কুন্তীপুত্র! এই প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় কার্য করছে, এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব উৎপন্ন করছে। সেই নিয়মের বশবর্তী হয়েই বার বার তার সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিনাশ হচ্ছে।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় জড় পদার্থের আশ্চর্যজনক মিথস্ক্রিয়ার ফলে, জড় জগতের সমস্ত পরিবর্তন এবং প্রগতি সংঘটিত হচ্ছে। এই জড় জগতে কোন কিছুই ঘটনাচক্রে ঘটছে না। কেউ যদি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবক হয়ে সব কিছু তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ এই জড় জগতে জীবদ্দশাতেও তিনি মুক্ত। সাধারণত মুক্তিলাভ হয় দেহত্যাগের পর, কিন্তু যিনি পৃথু মহারাজের দৃষ্টান্ত অনুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি এই জীবন-কালেই মুক্ত হয়ে যান। কৃষ্ণভক্তিতে কর্মের ফল নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। বাস্তবিকপক্ষে, কর্মের ফল নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করে না, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। সেটি *ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য* উক্তিটির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। ভগবানের সেবায় ঐকান্তিকভাবে যুক্ত আত্মার কখনও নিজেকে মালিক অথবা অধ্যক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। ঐকান্তিক ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিধিবিধান অনুসারে তার কর্মের অনুষ্ঠান করা। তার কর্মের ফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর।

শ্লোক ৫২

গৃহেষু বর্তমানোঽপি স সাম্রাজ্যশ্রিয়ান্বিতঃ ।
নাসজ্জতেন্দ্রিয়ার্থেষু নিরহংমতিরর্কবৎ ॥ ৫২ ॥

গৃহেষু—গৃহে; **বর্তমানঃ**—উপস্থিত; **অপি**—যদিও; **সঃ**—পৃথু মহারাজ; **সাম্রাজ্য**—সমগ্র রাজ্য; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য; **অন্বিতঃ**—সমন্বিত; **ন**—কখনই না; **অসজ্জতঃ**—আকৃষ্ট;

ইন্দ্রিয়-অর্থেষু—ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য; **নিঃ**—না; **অহম্**—আমি; **মতিঃ**—বিবেচনা; **অর্ক**—সূর্য; **বৎ**—সদৃশ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ, যিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির ফলে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, তিনি একজন গৃহস্থরূপে গৃহে অবস্থান করছিলেন। যেহেতু তিনি কখনও তাঁর ঐশ্বর্য নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে চাননি, তাই তিনি সর্বদা অনাসক্ত ছিলেন, ঠিক যেমন সূর্য সমস্ত অবস্থাতেই অপ্রভাবিত থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গৃহেষু* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারটি আশ্রমের মধ্যে কেবল গৃহস্থকেই স্ত্রীসঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাই গৃহস্থ-আশ্রম হচ্ছে ভক্তদের জন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির এক প্রকার অনুমতি। পৃথু মহারাজের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, যদিও তিনি গৃহস্থ হয়ে থাকার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারি ছিলেন, তবুও তিনি কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হননি। সেই বিশেষ লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রতি আকৃষ্ট হন না, এবং তার ফলে তিনি মুক্ত। জড়-জাগতিক জীবনে মানুষ তাদের নিজেদের সন্তোষের জন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ভক্তিপূর্ণ অথবা মুক্ত জীবনে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হয় ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টিবিধান করা।

এই শ্লোকে পৃথু মহারাজকে সূর্যের সঙ্গে *(অর্কবৎ)* তুলনা করা হয়েছে। সূর্য কখনও কখনও মল, মূত্র ও অন্যান্য দূষিত বস্তুর উপর কিরণ বিতরণ করে, কিন্তু সূর্য যেহেতু সর্ব-শক্তিমান, তাই সেই সমস্ত দূষিত বস্তুর দ্বারা সূর্য কখনও প্রভাবিত হয় না। পক্ষান্তরে, সূর্যকিরণ সমস্ত দূষিত ও নোংরা স্থান বিশুদ্ধ করে দেয়। তেমনই, ভক্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কোন বাসনা থাকে না, তাই তিনি কখনও সেই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ ভগবানের সেবায় রূপান্তরিত করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু জানেন কিভাবে সব কিছু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা যায়, তাই তিনি কখনও জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। পক্ষান্তরে, তাঁর দিব্য

পরিকল্পনার দ্বারা তিনি সেই সমস্ত কার্যকলাপকে চিন্ময় করে তোলেন। সেই কথা *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* বর্ণনা করা হয়েছে—*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*—তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে জড় জাগতিক উপাধির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া।

শ্লোক ৫৩

এবমধ্যাত্মযোগেন কর্মাণ্যনুসমাচরন্ ।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চার্চিষ্যাত্মসম্মতান্ ॥ ৫৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **অধ্যাত্ম-যোগেন**—ভক্তিযোগের দ্বারা; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **অনু**—সর্বদা; **সমাচরন্**—সম্পাদন করে; **পুত্রান্**—পুত্র; **উৎপাদযাম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **পঞ্চ**—পাঁচ; **অর্চিষি**—তাঁর পত্নী অর্চিতে; **আত্ম**—নিজের; **সম্মতান্**—তাঁর বাসনা অনুসারে।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তির মুক্ত অবস্থায় স্থিত হয়ে, পৃথু মহারাজ কেবল ভগবৎ সেবারূপ কর্মই সম্পাদন করেননি, তাঁর পত্নী অর্চির গর্ভে তিনি পাঁচটি পুত্রসন্তানও উৎপাদন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে, তাঁর সেই পুত্রদের লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

একজন গৃহস্থরূপে পৃথু মহারাজ তাঁর পত্নী অর্চির মাধ্যমে পাঁচটি পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে তাঁদের প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাদের জন্ম ঘটনাক্রমে অথবা খামখেয়ালীর বশে হয়নি। বর্তমান যুগে (কলিযুগে) কিভাবে নিজের ইচ্ছা অনুসারে সন্তান উৎপাদন করা যায়, তা এক প্রকার অজ্ঞাত। সেই রহস্যাবৃত পন্থাটি নির্ভর করে, পিতামাতার পবিত্রীকরণের জন্য নানা প্রকার সংস্কারের উপর। এই সমস্ত সংস্কারের মধ্যে প্রথম সংস্কারটি হচ্ছে গর্ভাধান সংস্কার বা সন্তান উৎপাদন করার সংস্কার। এই সংস্কারটি বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উচ্চবর্ণদের জন্য অবশ্য পালনীয়। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ধর্মনীতির অবিরুদ্ধ কাম হচ্ছে তিনি স্বয়ং, এবং ধর্মের নিয়মানুসারে কেউ যখন সন্তান উৎপাদন করতে চান, তখন মৈথুনের পূর্বে গর্ভাধান সংস্কার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। যৌন মিলনের পূর্বে পিতা মাতার মানসিক অবস্থা নিশ্চিতভাবে

সন্তানের মনোবৃত্তিকে প্রভাবিত করে। কামের বশবর্তী হয়ে যখন সন্তান উৎপাদন হয়, তখন সেই সন্তান পিতামাতার বাসনা অনুসারে হয় না। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *যথা যোনির্যথা বীজম্*। *যথা যোনিঃ* বলতে মাকে বোঝায় এবং *যথা বীজম্* পিতাকে বোঝায়। যৌন মিলনের পূর্বে পিতামাতা যদি তাঁদের মনোভাব যথাযথভাবে গড়ে তোলেন, তা হলে তাঁদের যে সন্তান উৎপাদন হবে, সে অবশ্যই তাঁদের সেই মানসিক অবস্থা প্রতিবিম্বিত করবে। তাই *আত্ম-সম্মতান্* শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, পৃথু মহারাজ ও অর্চি উভয়েই সন্তান উৎপাদনের পূর্বে গর্ভাধান সংস্কার করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁদের সমস্ত সন্তানেরা তাঁদের ইচ্ছা এবং বিশুদ্ধ মানসিক অবস্থা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৃথু মহারাজ কামের বশবর্তী হয়ে সন্তান উৎপাদন করেননি, এবং তিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর পত্নীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। গৃহস্থরূপে তিনি তাঁর সন্তানদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শাসকরূপে উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৪

বিজিতাশ্বং ধূম্রকেশং হর্যক্ষং দ্রবিণং বৃকম্ ।
সর্বেষাং লোকপালানাং দধারৈকঃ পৃথুর্গুণান্ ॥ ৫৪ ॥

বিজিতাশ্বম্—বিজিতাশ্ব নামক; **ধূম্রকেশম্**—ধূম্রকেশ নামক; **হর্যক্ষম্**—হর্যক্ষ নামক; **দ্রবিণম্**—দ্রবিণ নামক; **বৃকম্**—বৃক নামক; **সর্বেষাম্**—সকলের; **লোক-পালানাম্**—সমস্ত লোকের শাসক; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **একঃ**—এক; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **গুণান্**—সমস্ত গুণাবলী।

অনুবাদ

বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামক পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করার পরেও, পৃথু মহারাজ এই পৃথিবীর উপর রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। অন্য সমস্ত লোকের শাসনকারী দেবতাদের সমস্ত গুণ তিনি ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রতিটি লোকে একজন শাসনকারী প্রধান দেবতা থাকেন। *ভগবদ্গীতা* থেকে জানা যায় যে, সূর্যলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন বিবস্বান। তেমনই, চন্দ্র আদি অন্যান্য প্রতিটি লোকে এক-একজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অন্য

সমস্ত লোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা হচ্ছেন সূর্য ও চন্দ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের বংশধর। এই পৃথিবীতেও দুটি ক্ষত্রিয়-বংশ রয়েছে, তাদের একটি আসছে সূর্যদেব থেকে এবং অন্যটি চন্দ্রদেব থেকে। সেই সূত্রে সেই বংশ দুটি যথাক্রমে সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে পরিচিত। এই গ্রহে যখন রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তখন প্রধান শাসক ছিলেন সূর্যবংশের, এবং অধীনস্থ রাজারা ছিলেন চন্দ্রবংশের। কিন্তু পৃথু মহারাজ এত শক্তিশালী ছিলেন যে, অন্য সমস্ত লোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমান যুগে, মানুষ চন্দ্রে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তো দূরের কথা, তারা সেখানে কাউকেই দেখতে পায়নি। কিন্তু, বৈদিক শাস্ত্রে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, চন্দ্রলোক অতি উন্নত অধিবাসীদের দ্বারা পূর্ণ, যাঁদের দেবতা বলে গণনা করা হয়। তাই এই পৃথিবীর আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা যে কি প্রকারে চন্দ্রলোক অভিযান করেছে, সেই সম্বন্ধে আমাদের সব সময় সন্দেহ রয়েছে।

শ্লোক ৫৫

গোপীথায় জগৎসৃষ্টেঃ কালে স্বে স্বেঽচ্যুতাত্মকঃ ।
মনোবাগ্‌বৃত্তিভিঃ সৌম্যৈর্গুণৈঃ সংরঞ্জয়ন্ প্রজাঃ ॥ ৫৫ ॥

গোপীথায়—সংরক্ষণের জন্য; **জগৎ-সৃষ্টেঃ**—পরম স্রষ্টার; **কালে**—যথাসময়ে; **স্বে স্বে**—নিজেদের; **অচ্যুত-আত্মকঃ**—কৃষ্ণভক্ত হওয়ায়; **মনঃ**—মন; **বাক্**—বাণী; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তির দ্বারা; **সৌম্যৈঃ**—অত্যন্ত স্নিগ্ধ; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **সংরঞ্জয়ন্**—প্রসন্ন করেছিলেন; **প্রজাঃ**—প্রজাদের।

অনুবাদ

যেহেতু পৃথু মহারাজ পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি সমস্ত নাগরিকদের স্ব-স্ব বাসনা অনুসারে তাদের প্রসন্নতা-বিধান করার মাধ্যমে, ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য পৃথু মহারাজ তাঁর বাণী, মন, কর্ম ও স্নিগ্ধ আচরণের দ্বারা সর্বতোভাবে তাদের প্রসন্ন রাখতেন।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে যে, পৃথু মহারাজ অন্যদের মনোভাব বোঝার অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা সব রকম নাগরিকদের প্রসন্ন রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর

আচরণ এত সুন্দর ছিল যে, সমস্ত নাগরিকেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতেন। এই শ্লোকে *অচ্যুতাত্মকঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পৃথু মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে এই পৃথিবী শাসন করতেন তিনি জানতেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি এবং ভগবানের সৃষ্টিকে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা সহকারে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। সৃষ্টির পিছনে যে কি উদ্দেশ্য রয়েছে, তা নাস্তিকেরা বুঝতে পারে না। চিৎ-জগতের তুলনায় এই জড় জগৎ যদিও অত্যন্ত হেয়, তবুও এই জড় সৃষ্টির পিছনে কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা সেই উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না, এমন কি তারা একজন স্রষ্টার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে না। তারা তাদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সব কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে, এবং তারা পরম স্রষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছু দর্শন করতে চায় না। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত। তিনি জানেন যে, জীবকে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই লোকের শাসকদের জানা উচিত যে, এখানকার সমস্ত অধিবাসীরা, বিশেষ করে মানুষেরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য এই জড় জগতে এসেছে। তাই শাসকের কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের ইন্দ্রিয় সুখভোগের সুযোগ প্রদান করা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করা, যাতে তাঁরা চরমে তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

সেই উদ্দেশ্য মনে রেখে, রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানদের পৃথিবী শাসন করা উচিত। তার ফলে সকলেই সন্তুষ্ট হবে। তা সম্পাদন করা যায় কিভাবে? পৃথু মহারাজের মতো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্যশাসনের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এমন কি এই অধঃপতিত যুগেও যদি শাসক, রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতিরা পৃথু মহারাজের দৃষ্টান্তের সুযোগ গ্রহণ করেন, তা হলে নিশ্চিতভাবে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির সাম্রাজ্য অবশ্যই স্থাপিত হবে।

শ্লোক ৫৬

রাজেত্যধান্নামধেয়ং সোমরাজ ইবাপরঃ ।
সূর্যবদ্বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ প্রতপংশ্চ ভুবো বসু ॥ ৫৬ ॥

রাজা—রাজা; **ইতি**—এইভাবে; **অধাৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **নামধেয়ম্**—নামক; **সোম-রাজঃ**—চন্দ্রলোকের রাজা; **ইব**—সদৃশ; **অপরঃ**—পক্ষান্তরে; **সূর্য-বৎ**—

সূর্যদেবের মতো; **বিসৃজন্**—বিতরণ করে; **গৃহ্নন্**—আদায় করে; **প্রতপন্**—কঠোর শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা; **চ**—ও; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **বসু**—কর।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ চন্দ্রলোকের রাজা সোমরাজের মতো প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সূর্য যেমন তাপ ও আলোক বিতরণ করে এবং সেই সঙ্গে জল শোষণ করে, ঠিক তেমনই পৃথু মহারাজ কঠোর শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা প্রজাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করে, যথাসময়ে তাদের তা দান করতেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পৃথু মহারাজকে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহের রাজাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবান যেভাবে ব্রহ্মাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা দেখতে চান, তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন চন্দ্রগ্রহের রাজা এবং সূর্যগ্রহের রাজা। সূর্য তাপ ও কিরণ বিতরণ করে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত গ্রহ থেকে জল শোষণ করে। রাত্রি বেলায় চন্দ্র অত্যন্ত মনোরম, এবং দিনের বেলায় সূর্যের আলোকে কঠোর পরিশ্রম করার পর মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন রাত্রে সে চন্দ্রের কিরণ উপভোগ করে। সূর্যদেবের মতো পৃথু মহারাজ তাঁর তাপ ও কিরণ বিতরণ করে তাঁর রাজ্য রক্ষা করেছিলেন, কারণ তাপ ও আলোক ব্যতীত কেউই থাকতে পারে না। তেমনই, পৃথু মহারাজ কর সংগ্রহ করেছিলেন এবং নাগরিক ও সরকারকে এমন কঠোর আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁকে অবজ্ঞা করার শক্তি কারও ছিল না। অপর পক্ষে তিনি ঠিক চন্দ্রকিরণের মতো সকলের আনন্দ-বিধান করেছিলেন। সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই তাদের বিশেষ প্রভাবের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড পালন করে, এবং ব্রহ্মাণ্ডের পালন-কার্যে পরমেশ্বর ভগবানের আদর্শ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের অবগত হওয়া উচিত।

শ্লোক ৫৭

দুর্ধর্ষস্তেজসেবাগ্নির্মহেন্দ্র ইব দুর্জয়ঃ ।
তিতিক্ষয়া ধরিত্রীব দ্যৌরিবাভীষ্টদো নৃণাম্ ॥ ৫৭ ॥

দুর্ধর্ষঃ—অজেয়; **তেজসা**—শক্তির দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **মহা-ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ইব**—সদৃশ; **দুর্জয়ঃ**—অজেয়; **তিতিক্ষয়া**—সহিষ্ণুতার দ্বারা; **ধরিত্রী**—পৃথিবী; **ইব**—সদৃশ; **দ্যৌঃ**—স্বর্গলোক; **ইব**—সদৃশ; **অভীষ্ট-দঃ**—বাসনাপূর্ণকারী; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ এতই প্রবল এবং শক্তিমান ছিলেন যে, তাঁর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারোর ছিল না। তিনি ছিলেন অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ তেজস্বী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মতো দুর্জয় বলশালী। অপর পক্ষে, পৃথু মহারাজ আবার পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল, এবং স্বর্গের মতো সকলের অভীষ্টপ্রদ ছিলেন।

তাৎপর্য

রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা এবং তাদের বাসনা পূর্ণ করা। সেই সঙ্গে আবার প্রজাদের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা। পৃথু মহারাজ সৎ সরকারের সমস্ত মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন, এবং তিনি এমনই দুর্ধর্ষ ছিলেন যে, অগ্নির তাপ ও আলোক যেমন রোধ করা যায় না, তেমনই তাঁর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারও ছিল না। তিনি এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়েছিল। এই যুগের বৈজ্ঞানিকেরা আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অনেক গবেষণা করছে, এবং পুরাকালে মানুষেরা ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করতেন, কিন্তু এই সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র ও আণবিক অস্ত্র দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ছিল। ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে বড় বড় পর্বতও বিদীর্ণ হয়। এত তেজস্বী ও বলবান হওয়া সত্ত্বেও পৃথু মহারাজ পৃথিবীর মতো সহিষ্ণু, এবং আকাশ থেকে বর্ষার ধারার মতো তিনি প্রজাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতেন। বৃষ্টি ব্যতীত এই পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন বাসনা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৪) বলা হয়েছে, *পর্জন্যাদ্ অন্ন সম্ভবঃ*—আকাশ থেকে বৃষ্টি হয় বলেই কেবল অন্ন উৎপন্ন হয়, এবং অন্ন না হলে এই পৃথিবীতে কেউই তৃপ্ত হতে পারে না। তেমনই অন্তহীন করুণা বিতরণের তুলনা করা হয় মেঘ থেকে বর্ষিত জলের সঙ্গে। পৃথু মহারাজ বর্ষার ধারার মতো নিরন্তর তাঁর কৃপা বিতরণ করতেন পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথু মহারাজ ছিলেন গোলাপের থেকেও কোমল এবং বজ্রের থেকেও কঠোর। এইভাবে তিনি তাঁর রাজ্যশাসন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৮

বর্ষতি স্ম যথাকামং পর্জন্য ইব তর্পয়ন্ ।
সমুদ্র ইব দুর্বোধঃ সত্ত্বেনাচলরাড়িব ॥ ৫৮ ॥

বর্ষতি—বর্ষণ করে; **স্ম**—করে; **যথা-কামম্**—যত ইচ্ছা; **পর্জন্যঃ**—জল; **ইব**—সদৃশ; **তর্পয়ন্**—তৃপ্তিসাধন করে; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **ইব**—সদৃশ; **দুর্বোধঃ**—দুর্বোধ্য; **সত্ত্বেন**—স্থিতির দ্বারা; **অচল**—পর্বত; **রাট্ ইব**—রাজার মতো।

অনুবাদ

মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে সকলের তৃপ্তিসাধন করে, তেমনই পৃথু মহারাজ প্রজাদের অভাব মোচন করে তাদের সন্তোষ-বিধান করতেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের মতো গম্ভীর এবং তাই তাঁর অভিপ্রায় কেউ জানতে পারত না, এবং তাঁর সংকল্প ছিল পর্বতরাজ সুমেরুর মতো অটল।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ দুর্দশাগ্রস্ত মানব-সমাজের উপর তাঁর করুণা বিতরণ করতেন, এবং তা ছিল ঠিক প্রচণ্ড তাপের পর বারি বর্ষণের মতো। বিশাল সমুদ্র এতই গভীর যে, তা কেউ মাপতে পারে না, তেমনই পৃথু মহারাজ এতই গম্ভীর ছিলেন যে, তাঁর অভিপ্রায় কেউ জানতে পারত না। মেরুপর্বত ব্রহ্মাণ্ডের অক্ষের মতো স্থিত, এবং তার সেই স্থিতি থেকে একটুও নড়ানো যায় না; তেমনই পৃথু মহারাজের সংকল্প থেকে কেউ তাঁকে বিচলিত করতে পারত না।

শ্লোক ৫৯

ধর্মরাড়িব শিক্ষায়ামাশ্চর্যে হিমবানিব ।
কুবের ইব কোশাঢ্যো গুপ্তার্থো বরুণো যথা ॥ ৫৯ ॥

ধর্ম-রাট্ ইব—যমরাজের মতো; **শিক্ষায়াম্**—শিক্ষায়; **আশ্চর্যে**—ঐশ্বর্যে; **হিমবান্ ইব**—হিমালয় পর্বতের মতো; **কুবেরঃ**—স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবের; **ইব**—সদৃশ; **কোশ-আঢ্যঃ**—ধনবান; **গুপ্ত-অর্থঃ**—গুপ্ত রহস্য; **বরুণঃ**—বরুণদেব; **যথা**—সদৃশ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যা ছিল ঠিক যমরাজের মতো। তাঁর ঐশ্বর্য ছিল হিমালয় পর্বতের মতো, যেখানে সব রকম মূল্যবান মণিরত্ন ও ধাতু সঞ্চিত রয়েছে। তাঁর ধন-সম্পদ ছিল স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের মতো, এবং গোপন রহস্য সংরক্ষণে তিনি ছিলেন ঠিক বরুণদেবের মতো।

তাৎপর্য

মৃত্যুর অধ্যক্ষ যমরাজ বা ধর্মরাজকে সারা জীবন পাপকর্মে লিপ্ত অপরাধী জীবদের বিচার করে দণ্ডদান করতে হয়। তার ফলে বিচারের ব্যাপারে যমরাজকে সব চাইতে দক্ষ বলে মনে করা হয়। পৃথু মহারাজও ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান এবং নাগরিকদের বিচারের ব্যাপারে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ হিমালয় পর্বতের খনিজ ও রত্নসম্ভারের মতো পৃথু মহারাজের ঐশ্বর্য ছিল অতুলনীয়; তাই স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়েছে। তাঁর জীবনের রহস্য কেউই অবগত হতে পারত না, ঠিক যেমন জল, রাত্রি এবং পশ্চিম আকাশের অধিপতি বরুণদেবের রহস্য কেউই অবগত হতে পারে না। বরুণ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, এবং যেহেতু তিনি পাপের জন্য দণ্ডদান করেন, তাই ক্ষমা লাভের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। তিনি রোগ প্রেরণকারীও, এবং কখনও কখনও তাঁকে মিত্র ও ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়।

শ্লোক ৬০

মাতরিশ্বেব সর্বাত্মা বলেন মহসৌজসা ।
অবিষহ্যতয়া দেবো ভগবান্ ভূতরাড়িব ॥ ৬০ ॥

মাতরিশ্বা—বায়ু; **ইব**—সদৃশ; **সর্ব-আত্মা**—সর্বব্যাপ্ত; **বলেন**—দৈহিক শক্তির দ্বারা; **মহসা ওজসা**—সাহস ও শক্তির দ্বারা; **অবিষহ্যতয়া**—অসহিষ্ণুতার দ্বারা; **দেবঃ**—দেবতা; **ভগবান্**—সব চাইতে শক্তিশালী; **ভূত-রাট্ ইব**—রুদ্র বা সদাশিবের মতো।

অনুবাদ

দেহের শক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে মহারাজ পৃথু ছিলেন সর্বত্র গমনক্ষম বায়ুর মতো শক্তিশালী। তাঁর অসহ্য বিক্রম ছিল শিব বা সদাশিবের অংশ সর্ব-শক্তিমান রুদ্রের মতো।

শ্লোক ৬১

কন্দর্প ইব সৌন্দর্যে মনস্বী মৃগরাড়িব ।
বাৎসল্যে মনুবন্নৃণাং প্রভুত্বে ভগবানজঃ ॥ ৬১ ॥

কন্দর্পঃ—কামদেব; **ইব**—সদৃশ, **সৌন্দর্যে**—সৌন্দর্যে, **মনস্বী**—চিন্তাশীলতায়; **মৃগ-রাট্ ইব**—পশুরাজ সিংহের মতো; **বাৎসল্যে**—স্নেহে; **মনু-বৎ**—স্বায়ম্ভুব মনুর মতো, **নৃণাম্**—মানব সমাজের; **প্রভুত্বে**—নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে; **ভগবান্**—প্রভু; **অজঃ**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন কন্দর্পের মতো, এবং তিনি ছিলেন সিংহের মতো নির্ভীক। বাৎসল্যে তিনি ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর মতো, এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল ব্রহ্মার মতো।

শ্লোক ৬২

বৃহস্পতির্ব্রহ্মবাদে আত্মবত্ত্বে স্বয়ং হরিঃ ।
ভক্ত্যা গোগুরুবিপ্রেষু বিষ্বক্সেনানুবর্তিষু ।
হ্রিয়া প্রশ্রয়শীলাভ্যামাত্মতুল্যঃ পরোদ্যমে ॥ ৬২ ॥

বৃহস্পতিঃ—স্বর্গের পুরোহিত বৃহস্পতি, **ব্রহ্ম-বাদে**—আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে, **আত্ম-বত্ত্বে**—আত্ম সংযমের ব্যাপারে; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, **ভক্ত্যা**—ভক্তিতে; **গো**—গাভী; **গুরু**—গুরুদেব, **বিপ্রেষু**—ব্রাহ্মণদের; **বিষ্বক্সেন**—ভগবান, **অনুবর্তিষু**—অনুগামী, **হ্রিয়া**—লজ্জার দ্বারা, **প্রশ্রয় শীলাভ্যাম্**—অত্যন্ত ভদ্র আচরণের দ্বারা, **আত্ম-তুল্যঃ**—ঠিক নিজের মতো, **পর-উদ্যমে**—পরোপকারের কার্যে।

অনুবাদ

তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে পৃথু মহারাজ সমস্ত সৎ গুণাবলী প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল ঠিক বৃহস্পতির মতো। আত্ম-সংযমে তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের মতো। ভক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন গাভী, গুরু ও ব্রাহ্মণদের প্রতি আসক্ত ভক্তদের মহান অনুগামী। তিনি ছিলেন লজ্জাশীল এবং তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত বিনম্র। আর পরোপকারের জন্য তিনি এমনভাবে কার্য করতেন যে, মনে হত তিনি যেন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে কার্য করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁকে বৃহস্পতির অবতার বলে সম্বোধন করেছিলেন। বৃহস্পতি হচ্ছেন

স্বর্গলোকের প্রধান পুরোহিত, এবং তিনি ব্রহ্মবাদ বা মায়াবাদ দর্শনের অনুগামী। বৃহস্পতি একজন মহান নৈয়ায়িক এই উক্তি থেকে প্রতীত হয় যে, পৃথু মহারাজ যদিও ছিলেন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত একজন মহান ভক্ত, তবুও তিনি বৈদিক শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের প্রভাবে সমস্ত নির্বিশেষবাদী ও মায়াবাদীদের পরাস্ত করতে পারতেন পৃথু মহারাজের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবাতেই যুক্ত থাকেন না, প্রয়োজন হলে ন্যায় ও দর্শনের ভিত্তিতে নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদীদের সঙ্গে তর্ক করে তাদের নির্বিশেষবাদকে পরাস্ত করতে প্রস্তুত থাকেন

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন আদর্শ আত্মসংযমী বা ব্রহ্মচারী। শ্রীকৃষ্ণকে যখন যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে সভাপতিরূপে মনোনীত করা হয়েছিল, তখন পিতামহ ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী বলে প্রশংসা করেছিলেন। যেহেতু পিতামহ ভীষ্ম ছিলেন ব্রহ্মচারী, তাই ব্রহ্মচারী ও ব্যভিচারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে তিনি সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিলেন পৃথু মহারাজ যদিও ছিলেন গৃহস্থ এবং পাঁচটি সন্তানের পিতা, তবুও তাঁকে পরম আত্মসংযমী বলে বিবেচনা করা হয়েছিল কেউ যখন মানব সমাজের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচারী। যারা কুকুর বিড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করে, তারা উপযুক্ত পিতা নয়। ব্রহ্মচারী শব্দটি ব্রহ্মস্তরে আচরণকারী বা ভগবদ্ভক্তির আচরণকারী ব্যক্তিদেরও বোঝায় নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণায় কোন রকম ক্রিয়া নেই, কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে কার্য করেন, তখন তাঁকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। এইভাবে পৃথু মহারাজ একাধারে একজন আদর্শ ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ছিলেন। *বিষ্বক্সেনানুবর্তিষু* শব্দটি সেই ভক্তদের ইঙ্গিত করে, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের সেবায় রত অন্য ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস* যাঁরা ষড় গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনি তাঁদের শিষ্য হতে প্রস্তুত।

সমস্ত বৈষ্ণবদের মতো পৃথু মহারাজও গোরক্ষা, গুরুদেব ও যোগ্য ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পৃথু মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত বিনীত, সুশীল ও ভদ্র, এবং যখনই তিনি জনসাধারণের জন্য কোনরকম পরোপকারের কার্য অথবা কল্যাণকর কার্য করতেন, তখন তিনি এমনভাবে পরিশ্রম করতেন যে, মনে হত তিনি যেন তাঁর নিজের প্রয়োজনের তাগিদে সেই কাজ করছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি কেবল লোক-দেখানোর জন্য পরোপকারের কার্য করতেন না, তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং নিষ্ঠা সহকারে তা করতেন। সমস্ত পরোপকারের কার্য এইভাবে করা উচিত।

শ্লোক ৬৩

কীর্ত্যোর্ধ্বগীতয়া পুম্ভিস্ত্রৈলোক্যে তত্র তত্র হ ।
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেষু স্ত্রীণাং রামঃ সতামিব ॥ ৬৩ ॥

কীর্ত্যা—কীর্তির দ্বারা; **উর্ধ্ব-গীতয়া**—উচ্চস্বরে কীর্তনের দ্বারা; **পুম্ভিঃ**—জনসাধারণের দ্বারা; **ত্রৈ-লোক্যে**—সারা ব্রহ্মাণ্ডে; **তত্র তত্র**—সর্বত্র; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **কর্ণ-রন্ধ্রেষু**—কর্ণকুহরে; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **সতাম্**—ভক্তদের; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যবর্তী লোকের সর্বত্র পৃথু মহারাজের যশ উচ্চস্বরে কীর্তিত হয়েছিল, এবং সমস্ত স্ত্রী ও সাধুরা তাঁর মহিমা শ্রবণ করেছিলেন, যা ছিল শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তির মতোই মধুর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *স্ত্রীণাম্* ও *রামঃ* শব্দ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্ত্রীলোকেরা বীরদের প্রশংসা শুনে আনন্দ উপভোগ করেন। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, পৃথু মহারাজের খ্যাতি এতই মহান ছিল যে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র স্ত্রীলোকেরা গভীর আনন্দের সঙ্গে তা শ্রবণ করতেন। সেই সঙ্গে তাঁর মহিমা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভগবদ্ভক্তেরাও শ্রবণ করেছিলেন, এবং তাঁদের কাছে তা ঠিক শ্রীরামচন্দ্রের মহিমার মতোই আনন্দদায়ক ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য এখনও বর্তমান, এবং সম্প্রতি ভারতবর্ষে রামরাজ্য পার্টি নামক একটি রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছে, যা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতারা রামকে বাদ দিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যদিও তারা ভগবৎ চেতনা বর্জন করেছে, তবুও তারা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভগবদ্ভক্তরা এই প্রকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পৃথু মহারাজের মহিমা সাধুরা শ্রবণ করেছিলেন, কারণ তিনি আদর্শ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'চতুঃসনের সঙ্গে পৃথু মহারাজের মিলন' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

শ্লোক ১-৩

মৈত্রেয় উবাচ

দৃষ্ট্বাত্মানং প্রবয়সমেকদা বৈণ্য আত্মবান্ ।
আত্মনা বর্ধিতাশেষস্বানুসর্গঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১ ॥
জগতস্তস্থুষশ্চাপি বৃত্তিদো ধর্মভৃৎসতাম্ ।
নিষ্পাদিতেশ্বরাদেশো যদর্থমিহ জজ্ঞিবান্ ॥ ২ ॥
আত্মজেষ্বাত্মজাং ন্যস্য বিরহাদ্রুদতীমিব ।
প্রজাসু বিমনঃস্বেকঃ সদারোঽগাত্তপোবনম্ ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **আত্মানম্**—দেহে; **প্রবয়সম্**—বার্ধক্য; **একদা**—একসময়; **বৈণ্যঃ**—মহারাজ পৃথু, **আত্ম-বান্**—পারমার্থিক শিক্ষায় পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ, **আত্মনা**—নিজের দ্বারা, **বর্ধিত**—বর্ধিত; **অশেষ**—অন্তহীনভাবে; **স্ব-অনুসর্গঃ**—জড় ঐশ্বর্যের সৃষ্টি; **প্রজা-পতিঃ**—প্রজাদের রক্ষক, **জগতঃ**—জঙ্গম; **তস্থুষঃ**—স্থাবর, **চ**—ও, **অপি**—নিশ্চিতভাবে, **বৃত্তি-দঃ**—ভাতা প্রদানকারী; **ধর্ম-ভৃৎ**—ধর্মের অনুশাসন পালনকারী; **সতাম্**—ভক্তদের; **নিষ্পাদিত**—সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করে, **ঈশ্বর**—পরমেশ্বর ভগবানের, **আদেশঃ**—আজ্ঞা; **যৎ-অর্থম্**—তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে, **ইহ**—এই জগতে, **জজ্ঞিবান্**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **আত্ম-জেষু**—তাঁর পুত্রদের, **আত্ম-জাম্**—পৃথিবী; **ন্যস্য**—সূচিত করে; **বিরহাৎ**—বিরহের ফলে; **রুদতীম্ ইব**—যেন ক্রন্দন করতে লাগলেন; **প্রজাসু**—প্রজাদের; **বিমনঃসু**—দুঃখিতদের; **একঃ**—একলা; **স-দারঃ**—তাঁর পত্নীসহ; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **তপঃ-বনম্**—যে বনে তপস্যা করা যায়।

অনুবাদ

তাঁর জীবনের অন্তিম অবস্থায়, পৃথু মহারাজ যখন দেখলেন যে, তিনি বৃদ্ধ হতে চলেছেন, তখন সেই মহাপুরুষ, যিনি সারা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তিনি স্থাবর

ও জঙ্গম তাঁর সমস্ত সম্পদ সমস্ত জীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। তিনি ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সকলের বৃত্তি নির্ধারণ করেছিলেন, এবং পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করে তাঁর পূর্ণ অনুমতিক্রমে, তিনি তাঁর পুত্রদের হস্তে তাঁর কন্যাসদৃশা পৃথিবীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছিলেন। তার পর পৃথু মহারাজ তাঁর বিরহে কাতর ও ক্রন্দনরত প্রজাদের ত্যাগ করে তপস্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর পত্নীসহ একাকী বনে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবানের একজন শক্ত্যাবেশ অবতার, এবং তাই তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবানের আদেশ পূর্ণ করার জন্য। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *সর্বলোক মহেশ্বর*, এবং তিনি দেখতে চান যে, প্রতিটি গ্রহলোকেই জীবেরা তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে সুখে জীবন যাপন করছে। যখনই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তখন ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, যা *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*।

বেণ রাজার রাজত্বকালে নানা প্রকার ধর্মগ্লানি দেখা দিয়েছিল বলে, ভগবান তাঁর সব চাইতে বিশ্বস্ত ভক্ত পৃথু মহারাজকে পাঠিয়েছিলেন সেই পরিস্থিতির সংশোধন করার জন্য। তাই, ভগবানের আদেশ অনুসারে পৃথিবীর পরিস্থিতি সংশোধন করার পর, পৃথু মহারাজ অবসর গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যশাসনে তিনি ছিলেন আদর্শ, এবং এখন অবসর গ্রহণের ব্যাপারেও তিনি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিলেন। তিনি পুত্রদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি বণ্টন করে তাঁদের পৃথিবী শাসন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং তার পর তিনি তাঁর পত্নীসহ বনে গমন করেছিলেন। এই সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথু মহারাজ একলা বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন, আবার সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর পত্নীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বৈদিক নিয়ম অনুসারে কেউ যখন গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন তিনি তাঁর পত্নীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, কারণ পতি ও পত্নীকে একই অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয়। এইভাবে তাঁরা উভয়ে যৌথভাবে মুক্তিলাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে আদর্শ মহাজন পৃথু মহারাজের অনুসৃত পন্থা, এবং এটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতার পন্থা। মৃত্যু পর্যন্ত গৃহে না থেকে, উপযুক্ত সময়ে গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার

জন্য প্রত্যেকের প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে, বৈকুণ্ঠলোক থেকে ভগবানের প্রতিনিধিরূপে আগত পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বতোভাবে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য, তিনি তপোবনে কঠোর তপস্যাও করেছিলেন। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, তখনকার দিনে বহু তপোবন বা অবসর গ্রহণ করে তপস্যা করার জন্য বিশেষ বন ছিল প্রকৃতপক্ষে, সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করার জন্য, সকলের পক্ষেই তপোবনে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, কারণ পারিবারিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা এবং সেই সঙ্গে গৃহে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৪

তত্রাপ্যদাভ্যনিয়মো বৈখানসসুসম্মতে ।
আরব্ধ উগ্রতপসি যথা স্ববিজয়ে পুরা ॥ ৪ ॥

তত্র—সেখানে, **অপি**—ও; **অদাভ্য**—কঠোর; **নিয়মঃ**—তপস্যা; **বৈখানস**—বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়ম; **সু-সম্মতে**—সুবিদিত, **আরব্ধঃ**—শুরু করে, **উগ্র**—কঠোর, **তপসি**—তপস্যা, **যথা**—যেমন, **স্ব-বিজয়ে**—পৃথিবী জয় করে, **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে পৃথু মহারাজ বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পালন করেছিলেন এবং বনে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পূর্বে তিনি রাজ্যশাসন কার্যে এবং পৃথিবী জয় করার ব্যাপারে যে ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, এই ব্যাপারেও তিনি সেই ঐকান্তিকতা সহকারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

গৃহস্থ আশ্রমে মানুষের যেমন অত্যন্ত সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন, তেমনই গৃহস্থ জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পরেও মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করা প্রয়োজন। মানুষ যখন পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখনই তা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে মানুষকে সাহায্য করা। গৃহস্থ-আশ্রম হচ্ছে এক প্রকার নিয়মিত জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের

অনুমোদন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের মধ্যবর্তী অবস্থায় চিরতরে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা পরিত্যাগ করার জন্য, সম্পূর্ণরূপে তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হওয়া। তাই বানপ্রস্থ জীবন বা তপস্যার জীবনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃথু মহারাজ বানপ্রস্থ জীবনের সমস্ত নিয়মগুলি যথাযথভাবে পালন করেছিলেন, যাকে সাধারণত *বৈখানস আশ্রম* বলা হয়। *বৈখানস-সুসম্মতে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বানপ্রস্থ আশ্রমে সমস্ত বিধিগুলি কঠোরতার সঙ্গে পালন করতে হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথু মহারাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিলেন। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা কর্তব্য। এইভাবে পৃথু মহারাজের আদর্শ চরিত্র অনুসরণ করার ফলে, গৃহস্থ-আশ্রমে অথবা বিরক্ত আশ্রমে সর্বতোভাবে পূর্ণতা লাভ করা যায়। তার ফলে দেহত্যাগ করার পর, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়

শ্লোক ৫

কন্দমূলফলাহারঃ শুষ্কপর্ণাশনঃ ক্বচিৎ ।
অব্ভক্ষঃ কতিচিৎপক্ষান্ বায়ুভক্ষস্ততঃ পরম্ ॥ ৫ ॥

কন্দ—বৃক্ষের স্কন্দ, **মূল**—শিকড়, **ফল**—ফল, **আহারঃ**—আহার করে, **শুষ্ক**—শুকনো, **পর্ণ**—পাতা, **অশনঃ**—আহার করে, **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও, **অপ্-ভক্ষঃ**—জল পান করে; **কতিচিৎ**—কয়েক, **পক্ষান্**—পক্ষ, **বায়ু**—বায়ু; **ভক্ষঃ**—শ্বাস নিয়ে; **ততঃ পরম্**—তার পর।

অনুবাদ

তপোবনে, পৃথু মহারাজ কখনও কন্দমূল, ফল, কখনও শুষ্ক পত্র আহার, কখনও বা কেবল জল পান করে কয়েক পক্ষকাল অতিবাহিত করতেন। অবশেষে কেবল বায়ু ভক্ষণ করে তিনি জীবন ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় যোগীদের বনে নির্জন স্থানে গিয়ে, পবিত্র স্থানে একাকী বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পৃথু মহারাজের আচরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন শহর থেকে কোন ভক্ত বা শিষ্য প্রেরিত পক্ক

অন্ন তিনি আহার করেননি। বনবাসের ব্রত গ্রহণ করা মাত্রই, মূল, স্কন্দ, ফল, শুষ্কপত্র অথবা প্রকৃতির দানস্বরূপ যা পাওয়া যায়, তাই কেবল আহার করতে হয়। পৃথু মহারাজ বনে বাস করার জন্য, এই সমস্ত নিয়মগুলি কঠোরতাপূর্বক অঙ্গীকার করেছিলেন, এবং কখনও কখনও তিনি কেবল শুষ্কপত্র আহার করেছিলেন এবং অল্প একটু জল পান করেছিলেন কখনও তিনি কেবল গাছের ফল আহার করে জীবন ধারণ করেছিলেন, এবং অবশেষে তিনি কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি বনে বাস করেছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করেছিলেন, বিশেষ করে আহারের ব্যাপারে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যাঁরা পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে চান, তাঁদের পক্ষে অত্যধিক আহার করা কখনও উচিত নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী সাবধান করে দিয়েছেন যে, অত্যধিক আহার এবং অত্যধিক প্রয়াস পারমার্থিক জীবনে উন্নতি-সাধনের পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, বনে বাস করা সাত্ত্বিক, শহরে বাস করা রাজসিক, এবং বেশ্যালয় অথবা মদিরালয়ে বাস করা তামসিক। কিন্তু মন্দিরে বাস করা বৈকুণ্ঠে বাস করারই সামিল, যা জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে ভগবানের মন্দিরে বাস করার সুযোগ দিচ্ছে, যা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ থেকে অভিন্ন। তাই কৃষ্ণভক্তকে বনে যেতে হয় না এবং কৃত্রিমভাবে পৃথু মহারাজ অথবা বনবাসী মুনি-ঋষিদের অনুকরণ করতে হয় না।

শ্রীল রূপ গোস্বামী মন্ত্রীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর, বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং পৃথু মহারাজের মতো একটি গাছের নীচে বাস করেছিলেন। তখন থেকে অনেকে রূপ গোস্বামীর অনুকরণ করে বৃন্দাবনে বাস করতে গিয়েছে। কিন্তু পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে, তাদের অনেকেই অধঃপতিত হয়েছে, এবং বৃন্দাবন ধামে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যুতক্রীড়া ও আসব-পানের শিকার হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষদের পক্ষে পৃথু মহারাজ ও রূপ গোস্বামীর মতো বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষেরা অথবা যে কোন মানুষ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মন্দিরে বাস করতে পারেন, যা বনবাসের থেকেও শ্রেষ্ঠ, এবং অন্য কোন কিছু গ্রহণ না করে, কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের ব্রত অবলম্বন করতে পারেন, এবং চারটি বিধিনিষেধ পালন করে প্রতিদিন ষোল মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারেন। এইভাবে আচরণ করলে, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন কখনও বিচলিত হবে না।

শ্লোক ৬

গ্রীষ্মে পঞ্চতপা বীরো বর্ষাস্বাসারষাণ্মুনিঃ ।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে উদকে স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥ ৬ ॥

গ্রীষ্মে—গ্রীষ্মকালে, **পঞ্চ-তপাঃ**—পাঁচ প্রকার তাপ, **বীরঃ**—নায়ক, **বর্ষাসু**—বর্ষা ঋতুতে, **আসারষাট্**—প্রবল বারিবর্ষণে অবস্থিত থেকে; **মুনিঃ**—মুনিদের মতো; **আকণ্ঠ**—গলা পর্যন্ত, **মগ্নঃ**—নিমজ্জিত হয়ে; **শিশিরে**—শীতকালে; **উদকে**—জলের মধ্যে; **স্থণ্ডিলে-শয়ঃ**—ভূমিতে শয়ন করে।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়ম এবং মহান ঋষি ও মুনিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, পৃথু মহারাজ গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির তাপ সহ্য করেছিলেন, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে থেকে বর্ষার ধারাসম্পাত সহ্য করেছিলেন, এবং শীতকালে আকণ্ঠ জলমগ্ন থেকেছিলেন। তিনি ভূমিতেও শয়ন করতেন।

তাৎপর্য

যারা ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে পারে না, সেই প্রকার জ্ঞানী ও যোগীরা এইভাবে তপস্যা করেন। জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাদের এইভাবে কষ্টের তপস্যা করতে হয়। *পঞ্চতপাঃ* হচ্ছে পাঁচ প্রকার তাপ। চারদিকে চারটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড এবং ঊর্ধ্বদিকে সূর্য, এবং তার মাঝখানে বসে এই পঞ্চবিধ তাপ সহ্য করা হয়। এটি একপ্রকার অনুমোদিত তপশ্চর্যা। তেমনই, বর্ষাকালে বর্ষার ধারায় নিজেকে উন্মুক্ত রাখা এবং শীতকালে আকণ্ঠ জলমগ্ন হয়ে থাকা এক প্রকার তপস্যা। ভূমিতে শয়ন করাও তপস্বীদের কর্তব্য। এই প্রকার কঠোর তপস্যা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৭

তিতিক্ষুর্যতবাগ্‌দান্ত ঊর্ধ্বরেতা জিতানিলঃ ।
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণমচরত্তপ উত্তমম্ ॥ ৭ ॥

তিতিক্ষুঃ—সহ্য করে; **যত**—সংযত করে; **বাক্**—বাণী; **দান্তঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম করে, **ঊর্ধ্ব-রেতাঃ**—বীর্য ধারণ করে ; **জিত-অনিলঃ**—প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে; **আরিরাধয়িষুঃ**—কেবল ইচ্ছা করে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অচরৎ**—অনুশীলন করে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **উত্তমম্**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর বাণী সংযত করে জিতেন্দ্রিয়, ঊর্ধ্বরেতা ও জিতশ্বাস হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যই কেবল এই সমস্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

তাৎপর্য

কলিযুগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(*বৃহন্নারদীয় পুরাণ*)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের জন্য দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কেবল নিরন্তর তাঁর দিব্য নাম কীর্তন করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত যারা এই সূত্রটি অবলম্বন করতে পারে না, তারা তপশ্চর্যার অন্যান্য পন্থা স্বীকার না করে, এক ধরনের ছদ্ম ধ্যানের পন্থা অনুশীলন করে। কিন্তু, আসল কথা হচ্ছে যে, হয় পবিত্র হওয়ার জন্য উপরোক্ত কঠোর তপস্যার পন্থা অবলম্বন করতে হবে, নতুবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যাঁরা কৃষ্ণভক্ত তাঁরা হচ্ছেন সব চাইতে বুদ্ধিমান, কারণ কলিযুগে এই প্রকার কঠোর তপস্যা করা মোটেই সম্ভব নয়। আমাদের কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো মহাপুরুষদের অনুসরণ করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* লিখেছেন, *পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনম্*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম-কীর্তনের পরম বিজয় হোক, যা শুরুতেই হৃদয়কে পবিত্র করে তৎক্ষণাৎ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। *ভব মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্*। সমস্ত যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান হয়ে থাকে, তা হলে এই যুগের জন্য যে ভক্তিযোগের সরল পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, তাই যথেষ্ট। তবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। পৃথু মহারাজ যদিও এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বহু পূর্বে তাঁর তপস্যা সম্পাদন করেছিলেন, তবুও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধান করা।

বহু মূর্খ আছে যারা বলে যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর থেকেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার পন্থা প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্য নয়। পৃথু মহারাজ কোটি-কোটি বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন, কারণ পৃথু মহারাজ ছিলেন ধ্রুব মহারাজের বংশধর, যিনি সত্যযুগে ছত্রিশ হাজার বছর

ধরে রাজত্ব করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের আয়ু এক লক্ষ বছর না হলে, কিভাবে তিনি ছত্রিশ হাজার বছর ধরে রাজত্ব করতে পারেন? মূল কথাটি হচ্ছে যে, সৃষ্টির আদিতেই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার পন্থা প্রচলিত ছিল এবং তা সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও এই কলিযুগে প্রচলিত রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল ব্রহ্মার এই কল্পেই নয়, প্রতিটি কল্পেই প্রকট হন। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রত্যেক কল্পেই হয়। এমন নয় যে, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে। এটি একটি মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত, যা বৈদিক শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়নি।

এই শ্লোকে *আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণম্ অচরৎ তপ উত্তমম্* বাক্যাংশটি তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথু মহারাজ কঠোর তপস্যা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার জন্যই। শ্রীকৃষ্ণ এতই দয়াময়, বিশেষ করে এই যুগে, যে তিনি তাঁর দিব্য নামের শব্দতরঙ্গে আবির্ভূত হন। *নারদ পঞ্চরাত্রে* সেই কথা বলা হয়েছে, *আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্*— যদি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা হয়, তা হলে আর কঠোর তপস্যার কি প্রয়োজন? কারণ লক্ষ্য তো ইতিমধ্যেই লাভ হয়ে গেছে। সব রকম তপস্যা করার পর, যদি শ্রীকৃষ্ণের কাছে না পৌঁছানো যায়, তা হলে সেই তপস্যার কোন মূল্য নেই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সমস্ত তপস্যাই কেবল অর্থহীন পরিশ্রম মাত্র। *শ্রম এব হি কেবলম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৮)। তাই বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে না পারার জন্য, আমাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের আয়ু অত্যন্ত অল্প, তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, বৈষ্ণব আচার্যদের প্রদত্ত বিধির অনুশীলন করে শান্তিতে কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করা। হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন।* দিব্য আনন্দময় জীবন লাভের জন্য কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন কর, শ্রীবৃন্দাবন ধামের পূজা কর, এবং সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবদের সেবা কর। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই অত্যন্ত নিরাপদ এবং সহজ। আমাদের কেবল ভগবানের আদেশ পালন করতে হবে, সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে হবে। আমাদের কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করতে হবে, এবং বৈষ্ণবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করতে হবে। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব উভয়েরই প্রতিনিধি; তাই শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা হলে, সর্বসিদ্ধি লাভ হবে।

শ্লোক ৮

তেন ক্রমানুসিদ্ধেন ধ্বস্তকর্মমলাশয়ঃ ।
প্রাণায়ামৈঃ সন্নিরুদ্ধষড়্‌বর্গশ্ছিন্নবন্ধনঃ ॥ ৮ ॥

তেন—এইভাবে তপস্যা করার ফলে; **ক্রম**—ক্রমশ; **অনু**—নিরন্তর; **সিদ্ধেন**—সিদ্ধির দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **মল**—কলুষ; **আশয়ঃ**—বাসনা; **প্রাণ-আয়ামৈঃ**—প্রাণায়াম অভ্যাসেব দ্বারা; **সন্**—হয়ে; **নিরুদ্ধ**—নিগৃহীত; **ষট্‌-বর্গঃ**—মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ; **ছিন্ন-বন্ধনঃ**—সমস্ত বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে।

অনুবাদ

এইভাবে কঠোর তপস্যা করাব ফলে, পৃথু মহারাজ ক্রমশ আধ্যাত্মিক জীবনে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং সকাম কর্মের সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করার জন্য তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি সমস্ত সকাম কর্মের বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রাণায়ামৈঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাবণ হঠ যোগীবা ও অষ্টাঙ্গ যোগীরা প্রাণাযাম অভ্যাস করেন, কিন্তু সাধাবণত তাঁবা তার উদ্দেশ্য কি তা জানেন না। প্রাণায়াম বা অষ্টাঙ্গ-যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মন ও ইন্দ্রিয়কে সকাম কর্ম থেকে নিবৃত্ত করা তথাকথিত যে-সমস্ত যোগীরা পাশ্চাত্যেব দেশগুলিতে যোগ অনুশীলন করে, তাদেব এই সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। প্রাণাযামের উদ্দেশ্য কঠোর পরিশ্রম করার জন্য দেহকে সুস্থ ও সবল করা নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণেব আবাধনা কবা। পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথু মহারাজ যে-সমস্ত তপস্যা, প্রাণায়াম ও যোগ অভ্যাস করেছিলেন, সেই সবেবই উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণেব আরাধনা। এইভাবে পৃথু মহারাজ যোগীদের জন্যও এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন কবেছিলেন। তিনি যা কিছুই করেছিলেন, তা সবই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা-বিধানের জন্য।

যারা সকাম কর্মেব প্রতি আসক্ত, তাদের মন সর্বদা কলুষিত বাসনার দ্বাবা পূর্ণ। সকাম কর্ম হচ্ছে জড় জগৎকে ভোগ করার কলুষিত বাসনাব প্রকাশ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কলুষিত বাসনার দ্বারা প্রভাবিত থাকে, ততক্ষণ তাকে একের পব এক জড় শরীর ধারণ করতে হয়। তথাকথিত যোগীবা, যাদের যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা কেবল দেহটিকে সুস্থ রাখার জন্য যোগ

অনুশীলন করে। এইভাবে তারা সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং তার ফলে অন্য আর একটি শরীর ধারণ করার বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা জানে না যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। এই প্রকার যোগীদের বিভিন্ন যোনিতে বিচরণ করার থেকে রক্ষা করার জন্য শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই যুগে এই প্রকার যোগের অভ্যাস কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। এই যুগে আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা।

পৃথু মহারাজ এই আচরণ করেছিলেন সত্যযুগে। কিন্তু এই যুগে যারা কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, সেই সমস্ত অধঃপতিত জীবাত্মারা এই যোগ অনুশীলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।* অর্থাৎ, কর্মী, জ্ঞানী, ও যোগীরা যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার স্তরে আসে, ততক্ষণ তাদের তথাকথিত তপস্যা ও যোগের কোনই মূল্য নেই। *নারাধিতঃ* —যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা না করা হয়, তা হলে ধ্যানযোগ অভ্যাস, কর্মযোগের অনুষ্ঠান অথবা জ্ঞানযোগের অনুশীলনের কোন মূল্যই নেই। প্রাণায়ামের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, ভগবানের দিব্য নামকীর্তন এবং আনন্দে বিভোর হয়ে নৃত্য করাও প্রাণায়াম। পূর্ববর্তী শ্লোকে সনৎকুমার পৃথু মহারাজকে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা ।
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ॥

কেবলমাত্র বাসুদেবের আরাধনার দ্বারা সকাম কর্মের বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বাসুদেবের আরাধনা না করে, যোগী ও জ্ঞানীরা কখনই এই প্রকার বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/২২/৩৯)

এখানে *প্রাণায়াম* শব্দটি অন্য আর কোন উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করেনি। প্রাণায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মন ও ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় যুক্ত করার জন্য সুদৃঢ় করা। বর্তমান যুগে, কেবলমাত্র ভগবানের দিব্য নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করার ফলেই অতি অনায়াসে এই দৃঢ় সংকল্প লাভ করা যায়।

শ্লোক ৯

সনৎকুমারো ভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্ ।
যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎপুরুষর্ষভঃ ॥ ৯ ॥

সনৎ-কুমারঃ—সনৎকুমার, **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী, **যৎ**—যা; **আহ**—বলেছিলেন; **আধ্যাত্মিকম্**—জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি; **পরম্**—চরম; **যোগম্**—যোগ; **তেন**—তার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ, **অভজৎ**—আরাধনা করেছিলেন, **পুরুষ-ঋষভঃ**—নরশ্রেষ্ঠ.

অনুবাদ

এইভাবে সনৎকুমারের উপদেশ অনুসারে, নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৃথু পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সনৎকুমারের উপদেশ অনুসারে, পৃথু মহারাজ প্রাণায়াম যোগ অভ্যাসের দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন এই শ্লোকে *পুরুষম্ অভজৎ পুরুষর্ষভঃ* বাক্যাংশটি তাৎপর্যপূর্ণ। *পুরুষর্ষভ* শব্দে নরশ্রেষ্ঠ পৃথু মহারাজকে বোঝানো হয়েছে, এবং *পুরুষম্* শব্দে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। অতএব এই উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন একজন পুরুষ হচ্ছেন পূজ্য এবং অন্যজন হচ্ছেন পূজক। পূজক পুরুষ জীব যখন পরম পুরুষের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, তখন সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/১২) বলেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত জীবেরা এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁদের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে পূর্বে বিরাজমান ছিলেন, এবং ভবিষ্যতেও বিরাজমান থাকবেন। তাই দুই পুরুষ, জীব ও পরমেশ্বর ভগবান কখনই তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন না।

প্রকৃতপক্ষে, যিনি তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন তিনি এই জীবনে ও পরবর্তী জীবনে নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে, ভক্তের কাছে এই জীবন ও পরবর্তী জীবনের কোন পার্থক্য নেই। এই জীবনে নবীন ভক্ত কিভাবে ভগবানের সেবা করবেন, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন, এবং পরবর্তী জীবনে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে পরমেশ্বর ভগবানের সেই একই প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন।

নব্য ভক্তের ক্ষেত্রেও ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*। ভগবদ্ভক্তি কখনই জাগতিক কার্যকলাপ নয়। যেহেতু তিনি *ব্রহ্মভূত* স্তরে ক্রিয়া করছেন, তাই ভগবদ্ভক্ত ইতিমধ্যেই মুক্ত। তাই তাঁকে আর *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অন্য কোন রকম যোগ অভ্যাস করতে হয় না। ভক্ত যদি নিষ্ঠা সহকারে গুরুদেবের আদেশ পালন করেন, বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করেন এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন কবেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি সর্ব অবস্থায় অবিচলিত থেকে, পূর্ণ ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত।"

শ্লোক ১০

ভগবদ্ধর্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততঃ সদা।
ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ ॥ ১০ ॥

ভগবৎ-ধর্মিণঃ—যিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন; **সাধোঃ**—ভক্তের; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাস সহকারে; **যততঃ**—প্রচেষ্টা করে; **সদা**—সর্বদা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ব্রহ্মণি**—নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস; **অনন্য-বিষয়া**—অবিচলিতভাবে স্থিত; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথু মহারাজ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বিধিবিধান পালন করে পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেমের উদয়ে, তিনি অবিচলিত ভক্তি লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্-ধর্মিণঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মহারাজ পৃথু যে ধার্মিক বিধি পালন করছিলেন, তা সমস্ত কৃত্রিমতার অতীত ছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/১/২) শুরুতে বলা হয়েছে, *ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র*—যে-সমস্ত ধর্মের নিয়ম কৃত্রিমতায় পূর্ণ, তা প্রকৃতপক্ষে কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। *ভগবদ্-ধর্মিণঃ* শব্দটির ব্যাখ্যা

করে বীর রাঘব আচার্য বলেছেন *নিবৃত্ত-ধর্মেণঃ,* অর্থাৎ তা জড়-জাগতিক আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কলুষিত হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

কেউ যখন জড় জাগতিক বাসনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং সকাম কর্ম ও মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা কলুষিত না হয়ে, সম্পূর্ণরূপে অনুকূল ভগবৎ সেবায় যুক্ত হন, তাঁর সেই সেবাকে বলা হয় *ভগবদ্-ধর্ম* বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি। এই শ্লোকে *ব্রহ্মণি* শব্দটি নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বোঝায় না। নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের অধীন তত্ত্ব, এবং যেহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়, তাই তাদের *ভগবদ্ ধর্মের* অনুগামী বলা যায় না। জড় সুখভোগের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করতে পারে, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সেই প্রকার কোন বাসনা নেই। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তই প্রকৃত *ভগবদ্ ধর্মী।*

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পৃথু মহারাজ কখনও নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন না। তিনি সর্বদাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। *ভগবতি ব্রহ্মণি* কথাটি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তকে বোঝায়। ভক্তের কাছে নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়, এবং তিনি কখনও নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চান না। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পৃথু মহারাজ কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগের পন্থা অবলম্বন না করে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

তস্যানয়া ভগবতঃ পরিকর্মশুদ্ধ-
সত্ত্বাত্মনস্তদনুসংস্মরণানুপূর্ত্যা ।
জ্ঞানং বিরক্তিমদভূন্নিশিতেন যেন
চিচ্ছেদ সংশয়পদং নিজজীবকোশম্ ॥ ১১ ॥

তস্য—তাঁর; **অনয়া**—এর দ্বারা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **পরিকর্ম**—ভক্তির কার্য; **শুদ্ধ**—শুদ্ধ, চিন্ময়; **সত্ত্ব**—অস্তিত্ব; **আত্মনঃ**—মনের; **তৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অনুসংস্মরণ**—নিরন্তর স্মরণ; **অনুপূর্ত্যা**—পূর্ণরূপে সম্পাদন করে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান;

বিরক্তি—অনাসক্তি; **মৎ**—সম্পন্ন; **অভূৎ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **নিশিতেন**—তীব্র কার্যকলাপের দ্বারা, **যেন**—যার দ্বারা; **চিচ্ছেদ**—বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, **সংশয়-পদম্**—সন্দেহের স্থিতি; **নিজ**—নিজের; **জীব-কোশম্**—জীবাত্মার আবরণ।

অনুবাদ

নিরন্তর ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, পৃথু মহারাজের মন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাই তিনি নিরন্তর ভগবানের চরণারবিন্দের চিন্তায় মগ্ন হতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। এইভাবে তিনি অহঙ্কার ও জড়-জাগতিক জীবনের ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

নারদ-পঞ্চরাত্রে ভগবদ্ভক্তিকে একটি রানীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রানী যখন দর্শন দেন, তখন বহু পরিচারিকা তাঁর সঙ্গে থাকেন। ভগবদ্ভক্তিরূপ রানীর পরিচারিকারা হচ্ছেন জড় ঐশ্বর্য, মুক্তি ও যোগসিদ্ধি। কর্মীরা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, জ্ঞানীরা মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষী, এবং যোগীরা অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য লালায়িত। *নারদ-পঞ্চরাত্র* থেকে আমরা জানতে পারি যে, যিনি শুদ্ধ ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি সকাম কর্ম, মনোধর্মী জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা লব্ধ সমস্ত ঐশ্বর্যও আপনা থেকেই লাভ করেছেন। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাই *কৃষ্ণকর্ণামৃতে* প্রার্থনা করেছেন—"হে ভগবান! আমি যদি আপনার প্রতি অনন্য ভক্তিলাভ করতে পারি, তা হলে আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে প্রকাশিত হন, এবং তখন সকাম কর্মের ফল, এবং দার্শনিক জ্ঞানের ফল—যথা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আমার সম্মুখে ভৃত্যের মতো দণ্ডায়মান হয়ে, আমার আদেশের প্রতীক্ষা করে।" অর্থাৎ, জ্ঞানীরা *ব্রহ্মবিদ্যা* বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কঠোর প্রয়াস করে, কিন্তু ভক্ত কেবল ভগবদ্ভক্তি লাভ করে আপনা থেকেই তাঁর জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। ভক্তের চিন্ময় দেহ যখন প্রকাশিত হতে শুরু হয়, তখন তিনি চিন্ময় জীবনের কার্যকলাপে প্রবিষ্ট হন।

বর্তমানে আমাদের শরীর, মন ও বুদ্ধি সবই জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু যখন আমরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হই, তখন আমাদের চিন্ময় দেহ, চিন্ময় মন ও চিন্ময় বুদ্ধি প্রকাশিত হয়। সেই চিন্ময় অবস্থায় ভগবদ্ভক্ত কর্ম, জ্ঞান ও যোগের সমস্ত সুফল লাভ করেন। ভক্ত যদিও কখনও অলৌকিক শক্তিলাভের

জন্য সকাম কর্মে অথবা মনোধর্মী জ্ঞানে প্রবৃত্ত হন না, তবুও তাঁর সেবায় অলৌকিক শক্তি আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। ভগবদ্ভক্ত কখনও কোন প্রকার জড় ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিন্তু সেই সমস্ত ঐশ্বর্য আপনা থেকেই তাঁর কাছে আসে। সেই জন্য তাঁকে কোন প্রয়াস করতে হয় না। তাঁর ভক্তির প্রভাবে, তিনি আপনা থেকেই *ব্রহ্মভূত* হন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণ ভক্তিযোগে, সর্ব অবস্থায় অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।"

নিয়মিতভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, ভক্ত জীবনের চিন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁর মন চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তাই তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ছাড়া আর অন্য কিছুর কথা চিন্তা করতে পারেন না। এই হচ্ছে *সংস্মরণ-অনুপূর্ত্যা* শব্দটির অর্থ। নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করার ফলে, ভগবদ্ভক্ত তৎক্ষণাৎ শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হন। শুদ্ধসত্ত্ব হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের, এমন কি সত্ত্বগুণেরও অতীত চিন্ময় স্তর। এই জড় জগতে সত্ত্বগুণ হচ্ছে পরম সিদ্ধির সূচক, কিন্তু এই গুণকেও অতিক্রম করে শুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে আসতে হয়, যেখানে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ ক্রিয়া করতে পারে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন—যার পচনশক্তি প্রবল, আহার করার পর আপনা থেকেই তার উদরে জঠরাগ্নি জ্বলে ওঠে, যা সব কিছু হজম করিয়ে দেয়, এবং তাকে আর হজম করার জন্য কোন রকম ঔষধ গ্রহণ করতে হয় না। তেমনই, ভগবদ্ভক্তির আগুন এতই প্রবল যে, তাকে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করার জন্য অথবা জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য, পৃথকভাবে আর কিছু করতে হয় না। জ্ঞানীকে জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে জ্ঞানের চর্চা করতে হতে পারে, কিন্তু অবশেষে ব্রহ্মভূত স্তরে আসতে পারে, কিন্তু ভক্তকে এই ধরনের কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তিনি নিঃসন্দেহে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন। যোগী ও জ্ঞানীরা সর্বদা তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দিহান; তাই তারা ভ্রান্তভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক নিঃসন্দেহে প্রকাশিত হয়, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগাবনের নিত্যদাস। ভক্তিবিহীন জ্ঞানী ও যোগীরা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করতে পারে, কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে তাদের বুদ্ধি ভক্তের মতো শুদ্ধ নয়। অর্থাৎ, জ্ঞানী ও যোগীরা ভক্তির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত, প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হতে পারে না।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)

জ্ঞানী ও যোগীরা ব্রহ্ম উপলব্ধির পরম পদ প্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তির অভাবের ফলে, তাদের পুনরায় জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়। তাই জ্ঞান ও যোগকে মুক্তির প্রকৃত পন্থা বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে পৃথু মহারাজ আপনা থেকেই এই সমস্ত পদ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যেহেতু পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তাই মুক্তিলাভের জন্য তাঁর করণীয় কিছু ছিল না। তিনি ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য বৈকুণ্ঠলোক বা চিজ্জগৎ থেকে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই জ্ঞান, যোগ অথবা কর্মের পন্থা অনুশীলন না করেই, তাঁর ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই স্থির ছিল। যদিও পৃথু মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণ যাতে জীবনের প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদন করে চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে, সেই পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করেছিলেন।

শ্লোক ১২

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহ-
স্তত্তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন ।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো
যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ ॥ ১২ ॥

ছিন্ন—বিচ্ছিন্ন হয়ে; **অন্য-ধীঃ**—জীবনের অন্য সমস্ত ধারণা (দেহাত্মবুদ্ধি); **অধিগত**—গভীরভাবে অবগত হয়ে; **আত্ম-গতিঃ**—পারমার্থিক জীবনের চরম লক্ষ্য; **নিরীহঃ**—বাসনারহিত; **তৎ**—তা, **তত্যজে**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **অচ্ছিনৎ**—তিনি ছিন্ন করেছিলেন; **ইদম্**—এই; **বয়ুনেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **ন**—কখনই না; **যোগ-গতিভিঃ**—যৌগিক পন্থার অনুশীলন; **যতিঃ**—অনুশীলনকারী; **অপ্রমত্তঃ**—মোহমুক্ত; **যাবৎ**—যতক্ষণ, **গদাগ্রজ**—শ্রীকৃষ্ণের; **কথাসু**—বাণী; **রতিম্**—আকর্ষণ; **ন**—কখনই না; **কুর্যাৎ**—করে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ যখন সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। এইভাবে পরমাত্মার কাছ থেকে সমস্ত আদেশ লাভ করতে সমর্থ হয়ে, তিনি যোগ ও জ্ঞানের অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কি জ্ঞান ও যোগের সিদ্ধিতেও তাঁর কোন রুচি ছিল না, কারণ তিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য, এবং যোগী ও জ্ঞানীরা যদি কৃষ্ণকথার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তা হলে সংসার সম্বন্ধে তাদের ভ্রম কখনও দূর হবে না।

তাৎপর্য

মানুষ যতক্ষণ দেহাত্ম-চেতনায় অত্যন্ত মগ্ন থাকে, ততক্ষণ সে অষ্টাঙ্গযোগ অথবা জ্ঞানযোগ ইত্যাদি আত্ম উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থার প্রতি আগ্রহী হয়। কিন্তু সে যখন বুঝতে পারে যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া, তখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন এবং তাই যারা কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী, তাদের সে তখন সাহায্য করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে জীবনের পূর্ণতা নির্ভর করে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার প্রবণতার উপর। তাই এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে—*যাবদ্‌গদাগ্রজকথাসু রতিং না কুর্যাৎ।* মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এবং তাঁর লীলা ও কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত না হয়, ততক্ষণ যোগ অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ভগবদ্ভক্তির স্তর লাভ করে পৃথু মহারাজ জ্ঞান ও যোগ অভ্যাসের প্রতি উদাসীন হয়েছিলেন এবং সেগুলি পরিত্যাগ করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে রূপ গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে শুদ্ধ ভক্তির স্তর—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

প্রকৃত জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে, জীব যে ভগবানের নিত্যদাস তা হৃদয়ঙ্গম করা। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, এই জ্ঞান লাভ হয়। যে-কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।* জীবনের পরমহংস স্তরে মানুষ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছু—*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।* কেউ যখন পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছু এবং কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি,

তখন তিনি পরমহংস বা মহাত্মা হন। এই প্রকার মহাত্মা বা পরমহংস অত্যন্ত দুর্লভ। পরমহংস বা শুদ্ধ ভক্ত কখনও হঠযোগ বা মনোধর্মী জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন না। তিনি কেবল ভগবানের অনন্য ভক্তিতেই আগ্রহশীল। পূর্বে যারা এই সমস্ত পন্থার প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার সঙ্গে সঙ্গে কখনও কখনও জ্ঞান ও যোগেরও অভ্যাস করে থাকে, কিন্তু অনন্য ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই, তারা আত্ম উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন চরম লক্ষ্য, তখন তিনি আর হঠযোগ অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন না।

শ্লোক ১৩

এবং স বীরপ্রবরঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ।
ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **বীর-প্রবরঃ**—বীরশ্রেষ্ঠ; **সংযোজ্য**—প্রয়োগ করে; **আত্মানম্**—মন; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **ব্রহ্ম-ভূতঃ**—মুক্ত হয়ে; **দৃঢ়ম্**—দৃঢ়ভাবে; **কালে**—যথাসময়ে; **তত্যাজ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **স্বম্**—নিজের; **কলেবরম্**—দেহ।

অনুবাদ

তারপর যখন পৃথু মহারাজের দেহত্যাগ করার সময় উপস্থিত হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে স্থির করেছিলেন, এবং সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মভূত স্তরে স্থিত হয়ে, তিনি তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

একটি প্রবাদ আছে যে, পারমার্থিক উন্নতির চরম পরীক্ষা হয় মৃত্যুর সময়। *ভগবদ্গীতাতেও* (৮/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

যাঁরা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করছেন, তাঁরা জানেন যে, তাঁদের পরীক্ষা হবে মৃত্যুর সময়। মৃত্যুর সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ গোলোক

বৃন্দাবন বা কৃষ্ণলোকে পৌঁছানো যায়, এবং তার ফলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পৃথু মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, জীবনের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে, এবং তাই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যোগের পন্থায় *ব্রহ্মভূত* স্তরে স্থিত হয়ে, দেহত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে স্বেচ্ছায় এই দেহত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। মৃত্যুর সময় পৃথু মহারাজ যে যৌগিক পন্থা অনুশীলন করেছিলেন, তা দৈহিক ও মানসিক সুস্থ অবস্থায়ও দেহত্যাগ করার জন্য মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। প্রত্যেক ভক্তই কামনা করেন যে, দৈহিক ও মানসিক সুস্থ অবস্থায় যেন দেহত্যাগ করা যায়। মহারাজ কুলশেখরও তাঁর *মুকুন্দমালা স্তোত্রে* এই বাসনা ব্যক্ত করেছেন—

কৃষ্ণ ত্বদীয়পদপঙ্কজপঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥

মহারাজ কুলশেখর সুস্থ অবস্থায় দেহত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন শরীর ও মন সুস্থ থাকাকালে দেহত্যাগ করতে পারেন। মৃত্যুর সময় কফ, বায়ু ও পিত্তের দ্বারা মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, এবং তখন যেহেতু কোন কিছু উচ্চারণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়, তাই কৃষ্ণের কৃপাতেই কেবল মৃত্যুর সময় হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু মুক্তাসনে স্থিত হয়ে যোগী তাঁর দেহত্যাগ করে তাঁর ঈপ্সিত লোকে গমন করতে পারেন। সিদ্ধযোগী যোগ অভ্যাসের দ্বারা, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও সময়ে দেহত্যাগ করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

সম্পীড্য পায়ুং পার্ষ্ণিভ্যাং বায়ুমুৎসারয়ঞ্ছনৈঃ ।
নাভ্যাং কোষ্ঠেষ্ববস্থাপ্য হৃদুরঃকণ্ঠশীর্ষণি ॥ ১৪ ॥

সম্পীড্য—রোধ করে; **পায়ুম্**—গুহ্যদ্বার; **পার্ষ্ণিভ্যাম্**—গুলফের দ্বারা; **বায়ুম্**—ঊর্ধ্বগামী বায়ু; **উৎসারয়ন্**—ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **নাভ্যাম্**—নাভির দ্বারা; **কোষ্ঠেষু**—হৃদয় ও কণ্ঠে; **অবস্থাপ্য**—স্থাপন করে; **হৃৎ**—হৃদয়ে; **উরঃ**—ঊর্ধ্ব; **কণ্ঠ**—কণ্ঠ; **শীর্ষণি**—ভ্রূযুগলের মধ্যে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ এক বিশেষ যৌগিক আসনে বসে তাঁর পায়ের গোড়ালির দ্বারা গুহ্যদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন, এবং প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে প্রথমে নাভিদেশের চক্রে, তারপর হৃদ্দেশের চক্রে, তারপর কণ্ঠের চক্রে এবং অবশেষে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী চক্রে উত্তোলন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে আসনের বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে বলা হয় মুক্তাসন। যোগপদ্ধতিতে আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের ক্রিয়া কঠোরভাবে বিধিনিষেধ অনুশীলন করার মাধ্যমে সংযত করার পর, যোগ অনুশীলনকারীকে বিভিন্ন প্রকার আসন অভ্যাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। যোগের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইচ্ছা অনুসারে দেহত্যাগ করতে সমর্থ হওয়া। যিনি যোগের চরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দেহে বাস করতে পারেন, অথবা দেহত্যাগ করে এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে অথবা বাইরে যে-কোন স্থানে যেতে পারেন। কোন কোন যোগী উচ্চতর লোকে গিয়ে জড়সুখ ভোগ করার জন্য দেহত্যাগ করেন। কিন্তু, বুদ্ধিমান যোগীরা এই জড় জগতের মধ্যে সময়ের অপচয় করতে চান না; তাঁরা উচ্চতর লোকে জড়সুখ ভোগের সুযোগ-সুবিধাগুলির প্রতি একটুও আকৃষ্ট নন, পক্ষান্তরে তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী।

এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, পৃথু মহারাজের উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার কোন বাসনা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। পৃথু মহারাজ যদিও কৃষ্ণভক্তি লাভের পর, অষ্টাঙ্গ-যোগের অভ্যাস বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তবুও শীঘ্রই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অভ্যাসের সদ্ব্যবহার করে নিজেকে *ব্রহ্মভূত* স্তরে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। মুক্তাসন নামক এই বিশেষ আসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুণ্ডলিনী-চক্রকে ক্রমে ক্রমে মূলাধার চক্র থেকে স্বাধিষ্ঠান-চক্রে, তারপর মণিপুর-চক্রে, তারপর অনাহত-চক্রে ও বিশুদ্ধ-চক্রে এবং অবশেষে আজ্ঞা-চক্রে উত্তোলন করা। যোগী যখন ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী আজ্ঞা-চক্রে প্রাণবায়ুকে উত্তোলন করতে সক্ষম হন, তখন তিনি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে চিৎ-জগতের বৈকুণ্ঠলোক বা কৃষ্ণলোক পর্যন্ত যে-কোন লোকে যেতে পারেন। অর্থাৎ, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হলে, ব্রহ্মভূত স্তরে পৌঁছাতে হয়। কিন্তু, যাঁরা কৃষ্ণভক্ত বা যাঁরা ভক্তিযোগ *(শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্)* অনুশীলন করছেন, তাঁরা মুক্তাসনের পন্থা অভ্যাস না করেও ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে

পারেন। মুক্তাসন অভ্যাস করার উদ্দেশ্য হচ্ছে *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হওয়া, কারণ *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়া যায় না। কিন্তু *ভগবদ্‌গীতায়* (১৪/২৬) উল্লেখ করা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে, ভক্ত সর্বদাই *ব্রহ্মভূত* স্তরে অধিষ্ঠিত (*ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। ভক্ত যদি *ব্রহ্মভূত* স্তরে অবস্থিত থাকতে পারেন, তা হলে তিনি তাঁর মৃত্যুর পর, আপনা থেকেই চিৎ জগতে প্রবেশ করতে পারেন এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন তাই কুণ্ডলিনী চক্র জাগরিত করার ব্যাপারে অথবা একে একে *ষট্-চক্র* ভেদ করার ব্যাপারে পারঙ্গত না হওয়ার ফলে, ভক্তের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। পৃথু মহারাজ ইতিমধ্যেই এই পন্থা অনুশীলন করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাননি, তাই তিনি *ষট্-চক্র* ভেদ করার এই পন্থার সুযোগ নিয়ে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং ভগবদ্ধামে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

উৎসর্পয়ংস্তু তং মূর্ধ্নি ক্রমেণাবেশ্য নিঃস্পৃহঃ ।
বায়ুং বায়ৌ ক্ষিতৌ কায়ং তেজস্তেজস্যয়ূযুজৎ ॥ ১৫ ॥

উৎসর্পয়ন্—এইভাবে স্থাপন করে, **তু**—কিন্তু; **তম্**—বায়ু, **মূর্ধ্নি**—মস্তকে, **ক্রমেণ**—ধীরে ধীরে; **আবেশ্য**—স্থাপন করে, **নিঃস্পৃহঃ**—সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে; **বায়ুম্**—দেহের বায়ুভাগ; **বায়ৌ**—ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদনকারী সমগ্র বায়ুতে, **ক্ষিতৌ**—পৃথিবীর সমস্ত আবরণে, **কায়ম্**—তাঁর জড় দেহ; **তেজঃ**—দেহের অগ্নি; **তেজসি**—জড়া প্রকৃতির অগ্নির আবরণে; **অয়ূযুজৎ**—মিশ্রিত হয়েছিল।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথু মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন করেছিলেন। তখন তাঁর সমস্ত জড় বাসনা সমাপ্ত হয়েছিল। তারপর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বায়ুতে, তাঁর দেহের কঠিন ভাগকে সমগ্র পৃথিবীতে, এবং তাঁর দেহের অগ্নিকে সমগ্র অগ্নিতে লীন করেছিলেন।

তাৎপর্য

চিৎ স্ফুলিঙ্গ, যার আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের একভাগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা যখন জড় অস্তিত্বে আসতে বাধ্য হয়, তখন সেই চিৎ-স্ফুলিঙ্গটি স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় উপাদানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। জড় দেহটি মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচটি স্থূল উপাদানে, এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটি সূক্ষ্ম উপাদানের দ্বারা গঠিত। কেউ যখন মুক্তিলাভ করেন, তখন তিনি এই জড় আবরণগুলি থেকে মুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে যোগের সাফল্য নির্ভর করে, এই সমস্ত জড় আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় অস্তিত্বে প্রবেশ করার উপর। বুদ্ধদেবের নির্বাণের শিক্ষা এই তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধদেব তাঁর অনুগামীদের ধ্যান ও যোগের মাধ্যমে এই জড় আবরণগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বুদ্ধদেব আত্মা সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব প্রদান করেননি, কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করে, তা হলে সে চরমে জড় আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করবে।

জীব যখন জড় আবরণ ত্যাগ করে, তখন সে তার চিন্ময় অবস্থায় স্থিত হয় আত্মাকে অবশ্যই চিদাকাশে প্রবেশ করে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হতে হয় দুর্ভাগ্যবশত, জীব যতক্ষণ পর্যন্ত চিৎ-জগৎ ও বৈকুণ্ঠলোকের তত্ত্ব প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তার ৯৯.৯ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার তবে, ব্রহ্মজ্যোতি থেকে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, এই ব্রহ্মজ্যোতি বৈচিত্র্যহীন, এবং বৌদ্ধরা মনে করে যে, তা শূন্য। চিদাকাশকে বৈচিত্র্যহীন বলে মনে করা হোক অথবা শূন্য বলে মনে করা হোক, উভয় ক্ষেত্রেই চিন্ময় আনন্দ নেই, যা বৈকুণ্ঠলোক বা কৃষ্ণলোকে আস্বাদন করা যায়। বিচিত্র আনন্দের অনুপস্থিতিতে, আত্মা ক্রমশ আনন্দময় জীবন উপভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং কৃষ্ণলোক অথবা বৈকুণ্ঠলোক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকার ফলে, সে স্বাভাবিকভাবে জড় জাগতিক আনন্দ উপভোগ করার জন্য জড় জগতে অধঃপতিত হয়

শ্লোক ১৬

খান্যাকাশে দ্রবং তোয়ে যথাস্থানং বিভাগশঃ।
ক্ষিতিমম্ভসি তত্তেজস্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্ ॥ ১৬ ॥

খানি—শরীরে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বার; **আকাশে**—আকাশে; **দ্রবম্**—তরল পদার্থ; **তোয়ে**—জলে; **যথা-স্থানম্**—উপযুক্ত স্থানে; **বিভাগশঃ**—যেভাবে বিভাজিত হয়েছে; **ক্ষিতিম্**—পৃথিবী; **অম্ভসি**—জলে; **তৎ**—সেই; **তেজসি**—আগুনে; **অদঃ**—অগ্নি; **বায়ৌ**—বায়ুতে; **নভসি**—আকাশে; **অমুম্**—সেই।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথু মহারাজ ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রগুলিকে আকাশে, রক্ত আদি দেহের তরল অংশকে সমগ্র জলে লীন করেছিলেন। তারপর তিনি পৃথিবীকে জলে, জলকে অগ্নিতে, অগ্নিকে বায়ুতে এবং বায়ুকে আকাশে লয় করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *যথাস্থানম্* ও *বিভাগশঃ* শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রহ্মা নারদের কাছে বিশ্লেষণ করেছেন, কিভাবে সৃষ্টিকার্য সংঘটিত হয়। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে একের পর এক ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ দেবতাদের, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের, এবং জড় উপাদানের বিভাগ হয়। তিনি এও বিশ্লেষণ করেছেন, কিভাবে একের পর এক তাদের সৃষ্টি হয়—আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে মাটি, ইত্যাদি। সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেমনই, ভগবান সেই একই পন্থায় এই জড় দেহও সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হওয়ার পর, ভগবান একে একে এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তেমনই, জীব মাতৃজঠরে প্রবেশ করার পর, সমগ্র আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী থেকে উপাদানগুলি সংগ্রহ করে সে তার স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি করে। *যথাস্থানং বিভাগশঃ* শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত হওয়া উচিত এবং সৃষ্টির প্রক্রিয়ার ক্রম বিপরীতভাবে বিচার করে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

শ্লোক ১৭

ইন্দ্রিয়েষু মনস্তানি তন্মাত্রেষু যথোদ্ভবম্ ।
ভূতাদিনামূন্যুৎকৃষ্য মহত্যাত্মনি সন্দধে ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রিয়েষু—ইন্দ্রিয়ে; **মনঃ**—মন; **তানি**—ইন্দ্রিয়; **তৎ-মাত্রেষু**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে; **যথা-উদ্ভবম্**—যেখান থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছে; **ভূত-আদিনা**—পঞ্চ উপাদানের দ্বারা;

অমূনি—সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়, **উৎকৃষ্য**—বার করে নিয়ে; **মহতি**—মহত্তত্ত্বে; **আত্মনি**—অহঙ্কারকে; **সন্দধে**—যোজন করেছিলেন।

অনুবাদ

তিনি স্থিতি অনুসারে, মনকে ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের উৎপত্তিস্থল তন্মাত্রে যোজন করেছিলেন। তারপর তিনি তন্মাত্রকে অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে যোজিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

অহঙ্কারের সম্পর্কে মহত্তত্ত্ব দুইভাগে বিভক্ত হয়—একভাগ তমোগুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় এবং অপর ভাগটি রজ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়। তমোগুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়। রজোগুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, মনের সৃষ্টি হয়, এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়. মন সংরক্ষিত হয় বিশেষ প্রকার দেবতার দ্বারা। মনেরও নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা রয়েছেন। এইভাবে সমগ্র মন, অর্থাৎ জড় দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জড় মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোজিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে যোজিত হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হচ্ছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ইত্যাদি শব্দ হচ্ছে ইন্দ্রিয় বিষয়ের চরম উৎস। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মন আকৃষ্ট হয় এবং তন্মাত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হয়, এবং চরমে তারা সকলে আকাশে সংযোজিত হয় সৃষ্টির আয়োজন এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে কারণ ও কার্য পরস্পরকে অনুসরণ করে। লীন হওয়ার পন্থা মূল কারণের সঙ্গে কার্যের সংযোজনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়. যেহেতু জড় জগতের চরম কারণ হচ্ছে মহত্তত্ত্ব, তাই ধীরে ধীরে সব কিছু মহত্তত্ত্বে সংযোজিত হয়ে লীন হয়। একে শূন্যবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কিন্তু এটি হচ্ছে প্রকৃত আধ্যাত্মিক মন অথবা চেতনাকে শুদ্ধ করার পন্থা।

মন যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়, তখন শুদ্ধ চেতনা ক্রিয়া করে। চিদাকাশের শব্দতরঙ্গ আপনা থেকে সমস্ত জড় কলুষ নির্মল করতে পারে, এবং সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*চেতোদর্পণ-মার্জনম্* । মনকে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত করার জন্য, আমাদের কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এই কঠিন শ্লোকটির এটি হচ্ছে সারমর্ম। কীর্তনের প্রভাবে যখন সমস্ত জড় কলুষ বিধৌত হয়, তখন সমস্ত কামনা-বাসনা ও জড় জাগতিক কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হয়ে

যায়, এবং প্রকৃত জীবনের শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব শুরু হয়। এই শ্লোকে যে যোগপদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে, তা আয়ত্ত করা এই কলিযুগে অত্যন্ত কঠিন। এই প্রকার যোগে অত্যন্ত সুদক্ষ না হতে পারলে, সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত *শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্* অবলম্বন করা। তার ফলে, কেবলমাত্র *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*, এই মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে অনায়াসে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জড় জাগতিক জীবনের শুরু যেমন জড় শব্দ থেকে হয়, তেমনই, চিন্ময় জীবনের শুরুও চিন্ময় শব্দতরঙ্গ থেকে হয়।

শ্লোক ১৮

তং সর্বগুণবিন্যাসং জীবে মায়াময়ে ন্যধাৎ ।
তং চানুশয়মাত্মস্থমসাবনুশয়ী পুমান্ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্যেণ স্বরূপস্থোঽজহাৎপ্রভুঃ ॥ ১৮ ॥

তম্—তাঁকে; **সর্ব-গুণ-বিন্যাসম্**—সমস্ত গুণের আধার, **জীবে**—উপাধি সমূহকে; **মায়া-ময়ে**—সমস্ত শক্তির আধার; **ন্যধাৎ**—স্থাপন করে, **তম্**—তা, **চ**—ও; **অনুশয়ম্**—উপাধি, **আত্মস্থম্**—আত্ম-উপলব্ধিতে স্থিত; **অসৌ**—তিনি; **অনুশয়ী**—জীব; **পুমান্**—ভোক্তা; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য; **বীর্যেণ**—শক্তির দ্বারা; **স্বরূপ-স্থঃ**—স্বরূপে স্থিত হয়ে; **অজহাৎ**—স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **প্রভুঃ**—নিয়ন্তা।

অনুবাদ

তারপর পৃথু মহারাজ জীবাত্মার সম্পূর্ণ উপাধি মায়ার পরম নিয়ন্তাকে অর্পণ করেছিলেন। যে উপাধির দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, সেই সমস্ত উপাধি থেকে তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর কৃষ্ণভাবনাময় স্বরূপে অবস্থিত হয়ে, তিনি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বা প্রভুরূপ তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড় শক্তির উৎস। তাই তাঁকে কখনও কখনও *মায়াময়* বা পরম পুরুষ বলা হয়, যিনি মায়া নামক তাঁর

শক্তির মাধ্যমে তাঁর লীলাবিলাস করতে পারেন। ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৩) আমরা জানতে পারি—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

ঈশ্বর বা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত বদ্ধ জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, এবং তাঁর পরম ইচ্ছার প্রভাবে জীব মায়া প্রদত্ত যন্ত্রস্বরূপ বিভিন্ন দেহের মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার সুযোগ পায়। যদিও জীব ও ভগবান উভয়েই জড়া প্রকৃতিতে রয়েছেন, তবুও ভগবান জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে জীবকে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রদান করার মাধ্যমে, তার গতিবিধি পরিচালনা করছেন, এবং এইভাবে জীব বিভিন্ন শরীরের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে তার কর্মের প্রভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ছে।

পৃথু মহারাজ যখন তাঁর দিব্য জ্ঞানের বিকাশ এবং জড় বাসনা থেকে বিরক্তির প্রভাবে আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের প্রভু হয়েছিলেন (সেই অবস্থাকে কখনও কখনও বলা হয় গোস্বামী বা স্বামী)। অর্থাৎ তিনি তখন আর জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হননি। কেউ যখন এত শক্তিশালী হন যে, তিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাব পরিত্যাগ করতে পারেন, তখন তাঁকে বলা হয় প্রভু। এই শ্লোকে *স্বরূপস্থঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীবের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে নিজেকে জানা। সেই জ্ঞানকে বলা হয় *স্বরূপোপলব্ধি*। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, ভক্ত ক্রমশ ভগবানের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। নিজের বিশুদ্ধ স্থিতি সম্বন্ধে এই উপলব্ধিকে বলা হয় *স্বরূপোপলব্ধি*, এবং কেউ যখন সেই স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন কিভাবে দাস, সখা, পিতামাতা অথবা প্রেমিকারূপে তিনি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উপলব্ধির এই স্তরকে বলা হয় *স্বরূপস্থ*। পৃথু মহারাজ পূর্ণরূপে তাঁর এই স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, এবং পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাবে যে, বৈকুণ্ঠ থেকে প্রেরিত রথে চড়ে তিনি এই জগৎ বা এই দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

এই শ্লোকে *প্রভু* শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন পূর্ণরূপে স্বরূপ উপলব্ধি করেন এবং সেই স্থিতি অনুসারে আচরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় *প্রভু*। শ্রীগুরুদেবকে 'প্রভুপাদ' বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন পূর্ণরূপে স্বরূপসিদ্ধ আত্মা। *পাদ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পদ', এবং *প্রভুপাদ* বলতে বোঝায় যে, তাঁকে প্রভু বা পরমেশ্বর ভগবানের পদ প্রদান করা হয়েছে, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে আচরণ করেন।

প্রভু বা ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা না হলে, গুরুর কার্য করা যায় না এবং গুরুদেব হচ্ছেন পরম প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেবের বন্দনা করে লিখেছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ॥

"শ্রীগুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবানের মতো সম্মান প্রদর্শন করা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের সব চাইতে অন্তরঙ্গ সেবক।" তাই পৃথুমহারাজকেও প্রভুপাদ বা এখানকার বর্ণনা অনুসারে প্রভু বলে সম্বোধন করা যায় এই সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে। পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তা হলে কেন তাঁকে প্রভু হওয়ার জন্য বিধিবিধান অনুশীলন করতে হয়েছিল? যেহেতু তিনি এই পৃথিবীতে একজন আদর্শ রাজারূপে এসেছিলেন এবং যেহেতু রাজার কর্তব্য হচ্ছে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে প্রজাদের শিক্ষা দেওয়া, তাই তিনি অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবদ্ভক্তির সমস্ত নিয়মগুলি পালন করেছিলেন। তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি একজন ভক্তরূপে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হয়. তাই বলা হয়েছে, *আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে*। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিজের আচরণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অন্যদের ভগবদ্ভক্তির পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। তেমনই, পৃথু মহারাজ যদিও ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তবুও তিনি প্রভুর পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, ঠিক একজন ভক্তের মতো আচরণ করেছিলেন। অধিকন্তু *স্বরূপস্থঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূর্ণ মুক্তি' এই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১০/৬) বলা হয়েছে, *হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*—জীব যখন মায়িক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের স্তর প্রাপ্ত হন, তাঁর সেই অবস্থাকে বলা হয় স্বরূপস্থঃ অথবা পূর্ণ মুক্তি।

শ্লোক ১৯

অর্চির্নাম মহারাজ্ঞী তৎপত্ন্যনুগতা বনম্ ।
সুকুমার্যতদর্হা চ যৎপদ্ভ্যাং স্পর্শনং ভুবঃ ॥ ১৯ ॥

অর্চিঃ নাম—অর্চি নামক, **মহা-রাজ্ঞী**—মহারাণী; **তৎ-পত্নী**—পৃথু মহারাজের পত্নী; **অনুগতা**—তাঁর পতির অনুগামিনী; **বনম্**—বনে, **সু-কুমারী**—অত্যন্ত কোমলাঙ্গী, **অ-তৎ-অর্হা**—অযোগ্য; **চ**—ও; **যৎ-পদ্ভ্যাম্**—যাঁর পায়ের দ্বারা; **স্পর্শনম্**—স্পর্শ করে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর উপর।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের পত্নী মহারাণী অর্চি ছিলেন অত্যন্ত কোমলাঙ্গী, তিনি তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে বনে গমন করেছিলেন। যদিও তাঁর বনে বাস করার প্রয়োজন ছিল না, তবুও তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর চরণ-কমলের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু পৃথু মহারাজের পত্নী ছিলেন একজন মহারাণী এবং একজন রাজার দুহিতা, তাই তিনি কখনও ভূমিতে পদক্ষেপ করেননি, কারণ রাণীরা কখনও প্রাসাদের বাইরে আসতেন না। তাঁরা অবশ্যই বনে যাননি এবং সেখানে বাস করার নানা রকম অসুবিধা সহ্য করেননি। বৈদিক সভ্যতায় পতিব্রতা মহারাণীদের এই প্রকার ত্যাগের শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে। রামচন্দ্র যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী সীতাদেবীও তাঁর পতির অনুগমন করেছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর পিতা মহারাজ দশরথের আদেশ পালনের জন্য বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু সীতাদেবীর প্রতি এই প্রকার কোন আদেশ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর পতির অনুগামিনী হয়েছিলেন। তেমনই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীও তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে বনে গমন করেছিলেন। পৃথু, শ্রীরামচন্দ্র ও ধৃতরাষ্ট্রের মতো মহা-পুরুষদের পত্নী হওয়ার ফলে, তাঁরাও ছিলেন আদর্শ সতীসাধ্বী রমণী। এই প্রকার মহারাণীরাও তাঁদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে পতিব্রতা হয়ে জীবনের প্রত্যেক পরিস্থিতিতে পতির অনুগমন করতে হয়। পতি যখন রাজা, তখন তিনি তাঁর পাশে মহারাণীরূপে বসেন, এবং পতি যখন বনে গমন করেন, তখনও তিনি তাঁর অনুগমন করেন, তা বনে যত দুঃখ-কষ্টই সহ্য করতে হোক না কেন। তাই এখানে বলা হয়েছে *অতদ্-অর্হা*, অর্থাৎ যদিও তাঁর পদদ্বয় কখনও ভূমি স্পর্শ করেনি, তবুও তিনি যখন তাঁর পতির সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে সব রকম কষ্ট স্বীকার করেছিলেন।

শ্লোক ২০

অতীব ভর্তুর্ব্রতধর্মনিষ্ঠয়া
শুশ্রূষয়া চার্ষদেহযাত্রয়া ।
নাবিন্দতার্তিং পরিকর্শিতাপি সা
প্রেয়স্করস্পর্শনমাননির্বৃতিঃ ॥ ২০ ॥

অতীব—অত্যন্ত; **ভর্তুঃ**—পতির; **ব্রত-ধর্ম**—তাঁর সেবা করার ব্রত; **নিষ্ঠয়া**—নিষ্ঠা সহকারে; **শুশ্রূষয়া**—সেবার দ্বারা; **চ**—ও; **আর্ষ**—মহান ঋষিদের মতো; **দেহ**—দেহ; **যাত্রয়া**—বসবাসের অবস্থা; **ন**—করেননি; **অবিন্দত**—উপলব্ধি; **আর্তিম্**—কোন প্রকার কষ্ট; **পরিকর্শিতা অপি**—দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও; **সা**—তিনি; **প্রেয়ঃ-কর**—অত্যন্ত সুখদায়ক; **স্পর্শন**—স্পর্শ; **মান**—যুক্ত; **নির্বৃতিঃ**—আনন্দ।

অনুবাদ

মহারাণী অর্চি যদিও এই প্রকার কষ্টে অভ্যস্ত ছিলেন না, তবুও তিনি মহর্ষির মতো বনবাসী তাঁর পতির অনুগমন করেছিলেন। তিনি ভূমিতে শয়ন করতেন এবং কেবল ফল, ফুল ও পাতা ভক্ষণ করতেন, এবং যেহেতু তিনি তাতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাই তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর পতির সেবা করে তিনি যে আনন্দ লাভ করতেন, তার ফলে তাঁর কোন প্রকার ক্লেশের অনুভূতি হত না।

তাৎপর্য

ভর্তৃব্রত-ধর্ম-নিষ্ঠয়া বাক্যাংশটি ইঙ্গিত করে যে, স্ত্রীর কর্তব্য বা ধর্ম হচ্ছে সমস্ত পরিস্থিতিতেই পতির সেবা করা। বৈদিক সভ্যতায় পুরুষদের জীবনের প্রথম থেকেই শিক্ষা দেওয়া হত ব্রহ্মচারী হওয়ার, তারপর একজন আদর্শ গৃহস্থ হওয়ার, তারপর বানপ্রস্থ এবং অবশেষে সন্ন্যাসী হওয়ার। আর স্ত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হত, জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পতির অনুগামিনী হওয়ার। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের পর, মানুষ গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ করবে, এবং স্ত্রীদের পিতামাতারা শিক্ষা দিতেন পতিব্রতা পত্নী হওয়ার। এইভাবে যখন স্ত্রী ও পুরুষের মিলন হত, তখন তাঁরা উভয়েই উচ্চতর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য জীবন যাপন করার শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন। ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হত, জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য-সাধনে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার, এবং মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হত, পতির অনুগামিনী হওয়ার। সতী স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থ-জীবনে সর্বতোভাবে পতির প্রসন্নতা বিধান করা, এবং পতি যখন গৃহস্থ জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে বনবাসী হতেন, তখন তিনি পতির অনুগামিনী হয়ে, বানপ্রস্থ বা বনবাসীর জীবন গ্রহণ করতেন। সেই অবস্থাতেও গৃহস্থ আশ্রমে যেভাবে তিনি পতির সেবা করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই তাঁর সেবা করে যেতেন। কিন্তু পতি যখন সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতেন, তখন পত্নীকে গৃহে ফিরে যেতে হত এবং একজন সাধ্বী রমণীরূপে পুত্র ও পুত্রবধূদের সামনে এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শিক্ষা দিতেন, কিভাবে তপশ্চর্যার জীবন যাপন করতে হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পতির গৃহত্যাগের ফলে, তিনিও তপস্বিনীর জীবন যাপন করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জপমালায় জপ করতেন, এবং একমালা জপ পূর্ণ করার পর, একদানা চাল একত্র করতেন। এইভাবে যত মালা জপ করতেন, তত দানা চাল সংগ্রহ করে তা রন্ধন করতেন, এবং তা ভগবানকে নিবেদন করে তিনি প্রসাদ গ্রহণ করতেন। একে বলা হয় তপস্যা। আজও ভারতবর্ষে বিধবারা অথবা যাঁদের পতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যদিও তাঁদের সন্তান-সন্ততির সঙ্গে বাস করেন, তবুও তাঁরা তপস্বিনীর মতো জীবন যাপন করেন। পৃথু মহারাজের পত্নী অর্চি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, এবং তাঁর পতি যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও তাঁর অনুগামিনী হয়ে, কেবল বনে ফলমূল খেয়ে এবং ভূমিতে শয়ন করে দিনাতিপাত করেছিলেন। যেহেতু স্ত্রীর শরীর পুরুষদের থেকে অধিক কোমল, তাই মহারাণী অর্চি অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন, *পরিকর্শিতা*। কেউ যখন তপস্যা করেন, তখন তাঁর শরীর সাধারণত দুর্বল হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক জীবনে স্থূল হওয়া ভাল নয়, কারণ আধ্যাত্মিক জীবন অবলম্বন করলে, মানুষের আহার, নিদ্রা ইত্যাদি দেহের সুখ সুবিধাগুলি হ্রাস করা অবশ্য কর্তব্য। যদিও মহারাণী অর্চি বনবাসের ফলে অত্যন্ত কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন, তবুও তিনি অসুখী ছিলেন না, কারণ তিনি তাঁর মহান পতির সেবা করার সৌভাগ্য উপভোগ করছিলেন

শ্লোক ২১

দেহং বিপন্নাখিলচেতনাদিকং
পত্যুঃ পৃথিব্যা দয়িতস্য চাত্মনঃ ।
আলক্ষ্য কিঞ্চিচ্চ বিলপ্য সা সতী
চিতামথারোপয়দদ্রিসানুনি ॥ ২১ ॥

দেহম্—দেহ; **বিপন্ন**—পূর্ণরূপে রহিত; **অখিল**—সমস্ত; **চেতনা**—অনুভূতি; **আদিকম্**—লক্ষণ; **পত্যুঃ**—তাঁর পতির; **পৃথিব্যাঃ**—পৃথিবীর; **দয়িতস্য**—দয়ালুর; **চ আত্মনঃ**—এবং তাঁর নিজের; **আলক্ষ্য**—দর্শন করে; **কিঞ্চিৎ**—অতি অল্প; **চ**—এবং; **বিলপ্য**—বিলাপ করে; **সা**—তিনি; **সতী**—পতিব্রতা; **চিতাম্**—চিতায়; **অথ**—এখন, **আরোপয়ৎ**—স্থাপন করেছিলেন; **অদ্রি**—পর্বত, **সানুনি**—শিখরে।

অনুবাদ

মহারাণী অর্চি যখন দেখলেন যে, তাঁর পতি, যিনি তাঁর প্রতি এবং সারা পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তিনি জীবনের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করছেন না, তখন স্বল্পকাল তিনি বিলাপ করেছিলেন, এবং তারপর এক পর্বত-শিখরে চিতা রচনা করে তাঁর পতির দেহ স্থাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাণী যখন দেখলেন যে, তাঁর পতির দেহে জীবনের সমস্ত লক্ষণ স্তব্ধ হয়েছে, তখন তিনি কিছুকাল বিলাপ করেছিলেন। *কিঞ্চিৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'স্বল্পকাল'। রাণী পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে, তাঁর পতির দেহে জীবনের সমস্ত লক্ষণ— কর্ম, বুদ্ধি ও চেতনা বন্ধ হয়ে গেলেও, তবুও তাঁর মৃত্যু হয়নি। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (২/১৩) বলা হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"যেইভাবে এই শরীরে দেহধারী আত্মা নিরন্তর কৌমার থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনই, মৃত্যুর পর আত্মা অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয়। স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তি কখনও এই প্রকার পরিবর্তনের ফলে মোহগ্রস্ত হন না।"

জীব যখন এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, যাকে সাধারণত মৃত্যু বলা হয়, বুদ্ধিমান মানুষ সেই জন্য অনুশোচনা করেন না। কারণ তিনি জানেন যে, জীবের মৃত্যু হয়নি, কেবল এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তর হয়েছে। বনে একাকী পতির মৃতদেহ সহ একলা হওয়ার ফলে, মহারাণীর ভয়ভীত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মহাপুরুষের মহান পত্নী, তাই তিনি ক্ষণকাল বিলাপ করার পর, বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর করণীয় বহু কর্তব্য রয়েছে। তাই বিলাপ করে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে তিনি একটি পর্বত-শিখরে তাঁর চিতা তৈরি করেছিলেন এবং দাহ করার জন্য তাঁর পতির দেহ তাতে স্থাপন করেছিলেন।

পৃথু মহারাজকে এখানে *দয়িত* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি কেবল পৃথিবীর রাজাই ছিলেন না, পৃথিবীকে তাঁর রক্ষিত সন্তানের মতো তিনি পালন করেছিলেন। তেমনই, তিনি তাঁর পত্নীকেও রক্ষা করেছিলেন। রাজার কর্তব্য হচ্ছে সকলকে রক্ষা করা, বিশেষ করে পৃথিবী বা ভূখণ্ড, যেখানে তিনি শাসন

করেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রজা ও পরিবারের সদস্যদেরও। যেহেতু পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন আদর্শ রাজা, তাই তিনি সকলকেই সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, তাই এখানে তাঁকে *দয়িত* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

বিধায় কৃত্যং হ্রদিনীজলাপ্লুতা
দত্ত্বোদকং ভর্তুরুদারকর্মণঃ ।
নত্বা দিবিস্থাংস্ত্রিদশাংস্ত্রিঃ পরীত্য
বিবেশ বহ্নিং ধ্যায়তী ভর্তৃপাদৌ ॥ ২২ ॥

বিধায়—সম্পাদন করে; **কৃত্যম্**—কর্তব্যকর্ম; **হ্রদিনী**—নদীর জলে; **জল-আপ্লুতা**—পূর্ণরূপে স্নান করে; **দত্ত্বা উদকম্**—জলাঞ্জলি দান করেছিলেন; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতিকে; **উদার-কর্মণঃ**—যিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **দিবিস্থান্**—আকাশে অবস্থিত; **ত্রি-দশান্**—তিন কোটি দেবতাদের; **ত্রিঃ**—তিনবার; **পরীত্য**—পরিক্রমা করে; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **বহ্নিম্**—অগ্নিতে; **ধ্যায়তী**—ধ্যান করতে করতে; **ভর্তৃ**—তাঁর পতির; **পাদৌ**—দুটি চরণ-কমল।

অনুবাদ

তারপর মহারাণী অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। নদীর জলে স্নান করে, তিনি তাঁর পতির উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন। তারপর আকাশস্থ দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করে, এবং তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে, তাঁর পতির পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে তিনি চিতাগ্নিতে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মৃত পতির চিতাগ্নিতে সতী স্ত্রীর প্রবেশকে বলা হয় সহগমন, অর্থাৎ 'পতির সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা'। অনাদিকাল ধরে বৈদিক সভ্যতায় এই সহগমনের প্রথা চলে আসছে। ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্বকালেও এই প্রথা কঠোরভাবে পালন করা হত। কিন্তু কালক্রমে এই প্রথাটি বিকৃত হয়ে, এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে, মৃত পতির চিতাগ্নিতে পত্নী প্রবেশ করতে না চাইলেও, তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে জোর করে চিতাগ্নিতে প্রবেশ করাত। তাই এই প্রথা বন্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু আজও স্বেচ্ছায় পতির চিতাগ্নিতে প্রবেশ করার বিরল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ১৯৪০ সালের পরেও একজন সতী স্ত্রীকে এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে আমরা দেখেছি।

শ্লোক ২৩

**বিলোক্যানুগতাং সাধ্বীং পৃথুং বীরবরং পতিম্ ।
তুষ্টুবুর্বরদা দেবৈর্দেবপত্ন্যঃ সহস্রশঃ ॥ ২৩ ॥**

বিলোক্য—দেখে; **অনুগতাম্**—মৃত পতির অনুগামিনী হতে; **সাধ্বীম্**—পতিব্রতা স্ত্রী; **পৃথুম্**—পৃথু মহারাজের; **বীর-বরম্**—মহান বীর; **পতিম্**—পতি; **তুষ্টুবুঃ**—স্তুতি করেছিলেন; **বর-দাঃ**—বরদানে সমর্থ; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **দেব-পত্ন্যঃ**—দেবতাদের পত্নীগণ; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

মহান রাজা পৃথুর পতিব্রতা পত্নী অর্চির এই বীরত্বপূর্ণ কার্য দর্শন করে হাজার হাজার দেবপত্নীরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের পতিগণ-সহ রাণীর স্তুতি করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

**কুর্বত্যঃ কুসুমাসারং তস্মিন্মন্দরসানুনি ।
নদৎস্বমরতূর্যেষু গৃণন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥ ২৪ ॥**

কুর্বত্যঃ—বর্ষণ করে; **কুসুম-আসারম্**—পুষ্পবৃষ্টি; **তস্মিন্**—তাতে; **মন্দর**—মন্দর পর্বতের; **সানুনি**—শিখরে; **নদৎসু**—বাজিয়ে, **অমর-তূর্যেষু**—দেবতাদের তূর্য; **গৃণন্তি স্ম**—বলাবলি করেছিলেন, **পরস্পরম্**—নিজেদের মধ্যে।

অনুবাদ

সেই সময় দেবতারা মন্দর পর্বতের শিখরে দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন, এবং তাঁদের পত্নীরা সেই চিতার উপর পুষ্পবৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে এইভাবে বলাবলি করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

দেব্য উচুঃ

**অহো ইয়ং বধূর্ধন্যা যা চৈবং ভূভুজাং পতিম্ ।
সর্বাত্মনা পতিং ভেজে যজ্ঞেশং শ্রীর্বধূরিব ॥ ২৫ ॥**

দেব্যঃ ঊচুঃ—দেবপত্নীরা বলেছিলেন; **অহো**—আহা, **ইয়ম্**—এই, **বধূঃ**—বধূ, **ধন্যা**—ধন্য, **যা**—যিনি; **চ**—ও; **এবম্**—যেই প্রকার; **ভূ**—পৃথিবীর; **ভুজাম্**—সমস্ত রাজাদের, **পতিম্**—রাজা, **সর্ব-আত্মনা**—পূর্ণ উপলব্ধি সহকারে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **ভেজে**—আরাধনা করেছেন; **যজ্ঞ-ঈশম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে, **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **বধূঃ**—পত্নী; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

দেবপত্নীরা বললেন—মহারাণী অর্চি ধন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের সম্রাট মহারাজ পৃথুর এই পত্নী তাঁর কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁর পতির সেবা করেছেন, ঠিক যেভাবে লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সেবা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *যজ্ঞেশং শ্রীর্বধূরিব* বাক্যাংশটি ইঙ্গিত করে যে, লক্ষ্মীদেবী যেভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সেবা করেন, ঠিক সেইভাবে মহারাণী অর্চি তাঁর পতির সেবা করেছিলেন। এই পৃথিবীর ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাই যে, যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজ্য শাসন করছিলেন, তখন মহারাণী রুক্মিণী, যিনি ছিলেন কৃষ্ণের মহিষীদের মধ্যে প্রধান, তিনি শত-শত দাসী থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতেন। তেমনই বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবীও স্বয়ং নারায়ণের সেবা করেন, যদিও ভগবানের সেবা করার জন্য সেখানে হাজার হাজার ভক্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। এই প্রথা দেবপত্নীরাও অনুসরণ করেন, এবং পুরাকালে মানুষের পত্নীরাও এই আদর্শই অনুসরণ করতেন। বৈদিক সভ্যতায় বিবাহ বিচ্ছেদের মতো মানুষের তৈরি আইনের দ্বারা কখনও পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ হত না। মানব সমাজে পরিবার জীবন অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, এবং বিবাহ বিচ্ছেদ নামক কৃত্রিম আইন উচ্ছেদ করতে হবে। পতি ও পত্নীকে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করতে হবে, এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা রুক্মিণী-কৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। এইভাবে পৃথিবীতে শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করা সম্ভব।

শ্লোক ২৬

সৈষা নূনং ব্রজত্যূর্ধ্বমনু বৈণ্যং পতিং সতী ।
পশ্যতাস্মানতীত্যার্চির্দুর্বিভাব্যেন কর্মণা ॥ ২৬ ॥

সা—তিনি; **এষা**—এই; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রজতি**—গমন করে; **ঊর্ধ্বম্**—ঊর্ধ্বে; **অনু**—অনুগমন করে; **বৈণ্যম্**—বেণের পুত্র; **পতিম্**—পতি; **সতী**—সতী; **পশ্যত**—দেখ; **অস্মান্**—আমাদের; **অতীত্য**—অতিক্রম করে; **অর্চিঃ**—অর্চি নামক; **দুর্বিভাব্যেন**—অচিন্ত্য; **কর্মণা**—কার্য।

অনুবাদ

দেবপত্নীরা বললেন—দেখ কিভাবে সতী অর্চি তাঁর অচিন্ত্য পুণ্যকর্মের প্রভাবে, এখনও তাঁর পতির অনুগমন করে, যতদূর পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঊর্ধ্বগামিনী হচ্ছেন।

তাৎপর্য

যে বিমান পৃথু মহারাজকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং যে বিমান মহারাণী অর্চিকে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই দুটি বিমানই স্বর্গলোকের দেবীদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করেছিল। পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নী যে এত উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা দেখে তাঁরা বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। যদিও তাঁরা ছিলেন স্বর্গলোকবাসী দেবতাদের পত্নী এবং পৃথু মহারাজ ছিলেন নিকৃষ্টতর পৃথিবীর অধিবাসী, তবুও পৃথু মহারাজ তাঁর পত্নীসহ দেবলোক অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেছিলেন। এখানে *ঊর্ধ্বম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দেবপত্নীরা, যাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তাঁরা ছিলেন চন্দ্র, সূর্য, শুক্র আদি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত উচ্চতর লোকের অধিবাসী। ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে হচ্ছে চিদাকাশ, এবং সেই চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। তাই *ঊর্ধ্বম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, বৈকুণ্ঠলোক হচ্ছে জড় জগতের সমস্ত লোকের ঊর্ধ্বে, এবং পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নী সেই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করছিলেন। তা এও ইঙ্গিত করে যে, পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নী অর্চি যখন জড় আগুনের দ্বারা তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁরা তাঁদের চিন্ময় শরীর লাভ করে চিন্ময় বিমানে আরোহণ করেছিলেন, যা জড় উপাদানগুলি অতিক্রম করে চিদাকাশে পৌঁছাতে পারে। যেহেতু তাঁরা দুটি আলাদা বিমানে বাহিত হয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, চিতাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার পরও তাঁরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে পৃথক ছিলেন। অর্থাৎ, তাঁরা তাঁদের পরিচিতি হারাননি অথবা শূন্য হয়ে যাননি, যা নির্বিশেষবাদীরা কল্পনা করে।

স্বর্গলোকের দেবীরা নিম্ন ও ঊর্ধ্ব দুই দিকই দর্শন করতে পারেন। তাঁরা যখন নীচের দিকে দেখেছিলেন, তখন তাঁরা দেখেছিলেন যে, পৃথু মহারাজের দেহ দগ্ধ হচ্ছে এবং তাঁর পত্নী অর্চি সেই আগুনে প্রবেশ করছেন, এবং যখন তাঁরা উপরের

দিকে দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা দেখেছিলেন যে, কিভাবে দুটি বিমানে তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে যাচ্ছেন। তা সম্ভব হয়েছিল কেবল তাঁদের *দুর্বিভাব্যেন কর্মণা* বা অচিন্ত্য কর্মের প্রভাবে। পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাঁর পত্নী মহারাণী অর্চি কেবল তাঁর পতির অনুগমন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা দুজনেই ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত, এবং তার ফলে তাঁরা অচিন্ত্য কর্মসাধনে সক্ষম ছিলেন। এই প্রকার কার্য সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণ মানুষ ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ পর্যন্ত করতে পারে না, এবং সাধারণ স্ত্রী সতীত্বের এই প্রকার ব্রত অবলম্বন করে সর্বতোভাবে তাঁদের পতির অনুগমন করতে পারে না মহিলাদের উচ্চ শিক্ষালাভের কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাঁদের পতিরা যদি ভগবদ্ভক্ত হন এবং তাঁরা যদি তাঁদের পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে পতি ও পত্নী উভয়েই মুক্তিলাভ করবেন এবং বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হবেন। পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নীর অচিন্ত্য কর্মের প্রভাবে তা প্রত্যক্ষ হয়েছে

শ্লোক ২৭

তেষাং দুরাপং কিং ত্বন্যন্মর্ত্যানাং ভগবৎপদম্ ।
ভুবি লোলায়ুষো যে বৈ নৈষ্কর্ম্যং সাধয়ন্ত্যত ॥ ২৭ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **দুরাপম্**—দুর্লভ, **কিম্**—কি, **তু**—কিন্তু, **অন্যৎ**—অন্য কিছু, **মর্ত্যানাম্**—মানুষদের, **ভগবৎ-পদম্**—ভগবানের রাজ্য, **ভুবি**—পৃথিবীতে; **লোল**—চঞ্চল; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **যে**—যারা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **নৈষ্কর্ম্যম্**—মুক্তির পথ, **সাধয়ন্তি**—পালন করে; **উত**—সঠিকভাবে।

অনুবাদ

এই জড় জগতে প্রতিটি মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প, কিন্তু যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। কারণ তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মুক্তির পথে অবস্থিত। এই প্রকার ব্যক্তিদের কাছে কোন কিছুই দুর্লভ নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৩৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্* । অর্থাৎ, এই জড় জগৎ দুঃখময় (*অসুখম্*) এবং সেই সঙ্গে তা অনিত্য। তাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। সেটি হচ্ছে

মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি। যে-সমস্ত ভক্ত নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত, তাঁরা কেবল জড়-জাগতিক সুখই ভোগ করেন না, তাঁরা সব রকম আধ্যাত্মিক লাভও প্রাপ্ত হন, কারণ তাঁদের জীবনের শেষে তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। এই শ্লোকে তাঁদের গন্তব্য স্থলকে *ভগবৎ-পদম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *পদম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ধাম', এবং *ভগবৎ* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবানের'। অতএব ভগবদ্ভক্তের গন্তব্যস্থল হচ্ছে ভগবানের ধাম।

এই শ্লোকে *নৈষ্কর্ম্যম্* শব্দটি, যার অর্থ হচ্ছে 'দিব্যজ্ঞান', অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দিব্যজ্ঞান লাভ করে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে না। সাধারণত জ্ঞান, যোগ ও কর্মের পন্থা জন্ম জন্মান্তর ধরে সম্পাদন করার পর, ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি করার সুযোগ পাওয়া যায়। সেই সুযোগ লাভ হয় শুদ্ধ ভক্তের কৃপায়, এবং সেভাবেই কেবল প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভ করা যায়। এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, দেবপত্নীরা অনুতাপ করেছিলেন, কারণ যদিও তাঁদের উচ্চতর লোকে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল, এবং লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে সব রকম জড়সুখ ভোগ করার সুযোগ এসেছিল, তবুও তাঁরা পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নীর মতো সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নী ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন, কারণ তাঁরা যে পদ লাভ করেছিলেন, তার তুলনায় তা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*—"এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত, সর্বত্রই বার বার জন্ম-মৃত্যুর দুঃখভোগ করতে হয়।" পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যদি সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও যায়, তা হলেও তাকে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর কষ্টে ফিরে আসতে হবে *ভগবদ্গীতার* নবম অধ্যায়ে (৯/২১) শ্রীকৃষ্ণ সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।

"এইভাবে স্বর্গলোকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার পর, তাদের আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়।" এইভাবে পুণ্যকর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে, পুনরায় নিম্নতর লোকে ফিরে এসে, পুণ্যকর্মের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে হয়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১২) বলা হয়েছে, *নৈষ্কর্ম্যম্ অপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জিতম্*—"ভগবদ্ভক্তি লাভ না করা পর্যন্ত, মুক্তির পথ মোটেই নিরাপদ নয়।" কেউ যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতেও

উন্নীত হয়, তবুও তার সেখান থেকে এই জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকের অতীত ব্রহ্মজ্যোতি থেকেও যদি অধঃপতন হওয়া সম্ভব হয়, তা হলে যে-সমস্ত সাধারণ যোগী ও কর্মী স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, তাদের আর কি কথা? এইভাবে স্বর্গলোকেব দেবতাদের পত্নীরা কর্ম, জ্ঞান ও যোগের ফলকে খুব একটা প্রশংসনীয় বলে মনে করেননি।

শ্লোক ২৮

স বঞ্চিতো বতাত্মধ্রুক্ কৃচ্ছ্রেণ মহতা ভুবি ।
লব্ধাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েষু বিষজ্জতে ॥ ২৮ ॥

সঃ—সে; **বঞ্চিতঃ**—প্রতারিত হয়েছে; **বত**—নিশ্চিতভাবে; **আত্ম-ধ্রুক্**—আত্মদ্রোহী; **কৃচ্ছ্রেণ**—অত্যন্ত ক্লেশের দ্বারা; **মহতা**—মহান কার্যের দ্বারা; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **লব্ধা**—লাভ করে; **আপবর্গ্যম্**—মুক্তির পথ; **মানুষ্যম্**—মনুষ্য-জীবনে; **বিষয়েষু**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয়ে; **বিষজ্জতে**—যুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে-ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে বহু কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে, এই পৃথিবীতে অপবর্গের দ্বারস্বরূপ মনুষ্য-জন্ম লাভ করেও অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে, তাকে অবশ্যই আত্মদ্রোহী এবং বঞ্চিত বলে বিবেচনা করতে হবে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে মানুষ ইন্দ্রিয় সুখভোগের স্বল্প সাফল্য লাভের জন্য বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত হয়। কর্মীরা অত্যন্ত কঠিন কর্মে ব্যস্ত থাকে, এবং তার ফলে তারা বড় বড় কলকারখানা খোলে, বিশাল নগরী নির্মাণ করে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল যজ্ঞ করছে। তেমনই, যোগীরা সেই একই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কঠোর যোগসাধনা করছে। জ্ঞানীরা জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন। এইভাবে সকলেই কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অত্যন্ত কঠিন সমস্ত কার্যে যুক্ত। তাদের সকলকেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কার্যকলাপে যুক্ত বলে মনে করা হয়, কারণ তারা সকলেই জড় জগতে কিছু সুবিধা (অর্থাৎ বিষয়) লাভ করতে চাইছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত কার্যকলাপের ফল অনিত্য। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৩) শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, *অন্তবৎ তু ফলং*

তেষাম্ —"এই ফল (যারা দেবতাদের পূজা করে) সীমিত এবং অনিত্য।" যোগী, কর্মী ও জ্ঞানীদের কার্যকলাপের ফল ক্ষণস্থায়ী। অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্* —"তা কেবল অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের জন্য।" বিষয় বলতে ইন্দ্রিয় সুখভোগ বোঝায়। কর্মীরা সোজাসুজিভাবে বলে যে, তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। যোগীরাও ইন্দ্রিয়সুখ চায়, তবে তারা তা চায় উচ্চ স্তরে। তারা যোগ অভ্যাস করে নানা রকম অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করতে চায়। তাই তারা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অথবা মহৎ থেকে মহত্তর হওয়া, অথবা পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ সৃষ্টি করা, কিংবা বৈজ্ঞানিকদের মতো নানা রকম আশ্চর্যজনক যন্ত্র আবিষ্কার করার জন্য অত্যন্ত কঠোর সাধনা করে। তেমনই, জ্ঞানীরাও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত, কারণ তারা চায় ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে। এইভাবে এই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ অথবা নিম্ন স্তরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন। ভক্তেরা কিন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহী নন; তাঁরা কেবল ভগবানের সেবা করার সুযোগ লাভ করেই সন্তুষ্ট। যেহেতু তাঁরা সর্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, তাই তাঁদের অপ্রাপ্য কিছুই নেই, কারণ তাঁরা ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত।

দেবপত্নীরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রয়াসীদের *বঞ্চিত* বলে নিন্দা করেছেন। যারা সেই প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের হত্যা করছে (*আত্মহা*)। যে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/১৭) বলা হয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

কেউ যখন বিশাল সাগর উত্তীর্ণ হতে চায়, তখন তার একটি সুদৃঢ় নৌকার প্রয়োজন হয়। কথিত হয় যে, অজ্ঞানের সমুদ্র অতিক্রম করার জন্য, এই মনুষ্য শরীর হচ্ছে একটি অতি সুন্দর নৌকা। মনুষ্য-শরীরে গুরুরূপ অতি সুদক্ষ কর্ণধারের সাহায্য লাভ করা যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপারূপ অনুকূল বায়ুও পাওয়া যায়। সেই অনুকূল বায়ু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। মনুষ্য-শরীর হচ্ছে নৌকা, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হচ্ছে অনুকূল বায়ু, এবং শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন কর্ণধার। শ্রীগুরুদেব জানেন কিভাবে পাল খাটাতে হবে, যার ফলে অনুকূল বায়ুর সুযোগ নেওয়া যায় এবং তিনি সেই নৌকার হাল ধরে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যান। কিন্তু কেউ যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে সে এই মনুষ্য-জীবন বৃথা নষ্ট করছে। এইভাবে সময় ও জীবনের অপচয় করা আত্মহত্যা করারই সামিল।

এই শ্লোকে *লব্ধাপবর্গ্যম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *অপবর্গ্যম্* বা মুক্তির পথ নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হওয়া নয়, পক্ষান্তরে সালোক্যাদি-সিদ্ধি লাভ করা, যার অর্থ হচ্ছে সেই লোক প্রাপ্ত হওয়া যেখানে ভগবান বাস করেন। পাঁচ প্রকার মুক্তি রয়েছে, এবং তার মধ্যে একটি হচ্ছে সাযুজ্য-মুক্তি, বা পরমেশ্বরে বা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু, যেহেতু ব্রহ্মজ্যোতি থেকে জড় জগতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই শ্রীল জীব গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। *স বঞ্চিতঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মনুষ্য-জীবন লাভ করার পরেও কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি না করে, তা হলে সে প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত হয়েছে। যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী নয়, সেই সমস্ত অভক্তদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা ছাড়া মনুষ্য জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

শ্লোক ২৯

মৈত্রেয় উবাচ

স্তুবতীষ্বমরস্ত্রীষু পতিলোকং গতা বধূঃ ।
যং বা আত্মবিদাং ধুর্যো বৈণ্যঃ প্রাপাচ্যুতাশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **স্তুবতীষু**—স্তব করে; **অমর-স্ত্রীষু**—স্বর্গের দেবতাদের পত্নীরা; **পতি-লোকম্**—যে গ্রহলোকে তাঁর পতি গমন করেছেন; **গতা**—পৌঁছে; **বধূঃ**—পত্নী; **যম্**—যেখানে; **বা**—অথবা; **আত্ম-বিদাম্**—স্বরূপসিদ্ধ জীবদের; **ধুর্যঃ**—শ্রেষ্ঠ; **বৈণ্যঃ**—রাজা বেণের পুত্র (পৃথু মহারাজ), **প্রাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অচ্যুত-আশ্রয়ঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! স্বর্গের দেবতাদের পত্নীরা যখন নিজেদের মধ্যে এইভাবে বলাবলি করছিলেন, তখন মহারাণী অর্চি সেই লোকে পৌঁছেছিলেন, যে-লোকটি স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর পতি পৃথু মহারাজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, কোন স্ত্রী যখন তাঁর পতির সহমৃতা হন বা পতির চিতাগ্নিতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পতি যে-লোকে গমন করেন, তিনিও সেই লোক প্রাপ্ত

হন। এই জড় জগতে পতিলোক বলে একটি লোক রয়েছে, ঠিক যেমন পিতৃলোক নামক একটি লোক রয়েছে। কিন্তু এই শ্লোকে *পতিলোক* শব্দটি এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানকে বোঝানো হয়নি, কারণ পৃথু মহারাজ স্বরূপসিদ্ধ জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার ফলে, নিশ্চয়ই ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, এবং বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাণী অর্চিও পতিলোকে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু এই লোকটি জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোন গ্রহলোক নয়, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই লোকে প্রবেশ করেছিলেন, যা তাঁর পতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জড় জগতেও পত্নী যখন পতির সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন, তার পরবর্তী জন্মে তিনি তাঁর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন। তেমনই, মহারাজ পৃথু ও মহারাণী অর্চি বৈকুণ্ঠলোকে মিলিত হয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠলোকে পতি-পত্নী রয়েছেন, তবে সেখানে যৌনজীবন বা সন্তান উৎপাদনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। বৈকুণ্ঠলোকে পতি ও পত্নী উভয়েই অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত, এবং তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু সেখানে তাঁরা যৌনসুখ উপভোগ করেন না। বাস্তবিকপক্ষে, তাঁদের কাছে যৌনসঙ্গম মোটেই সুখকর নয়, কারণ তাঁরা উভয়েই ভগবানের মহিমা কীর্তন করে ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন থাকেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলেছেন যে, এই জড় জগতে থাকা কালেও, পতি ও পত্নী তাঁদের গৃহকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করতে পারেন। কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হলে, এই জগতেও পতি ও পত্নী গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে শ্রীবিগ্রহের সেবা করে বৈকুণ্ঠে বাস করতে পারেন। তার ফলে তাঁরা কখনও যৌন আবেগ অনুভব করবেন না। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে অগ্রসর হওয়ার পরীক্ষা। যিনি ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি লাভ করেছেন, তিনি কখনও যৌন জীবনের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ বোধ করেন না, এবং তিনি যে পরিমাণে যৌন জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়েছেন, সেই অনুপাতে তিনি ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হন। তিনি প্রকৃতপক্ষে বৈকুণ্ঠলোকে বাস করছেন বলে অনুভব করেন। চরম বিচারে জড় জগৎ বলে কিছু নেই, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের সেবা বিস্মৃত হয়ে তার ইন্দ্রিয়ের সেবায় যুক্ত হয়, তখনই কেবল তার মনে হয় যে, সে জড় জগতে বাস করছে।

শ্লোক ৩০

ইত্থম্ভূতানুভাবোঽসৌ পৃথুঃ স ভগবত্তমঃ ।
কীর্তিতং তস্য চরিতমুদ্দামচরিতস্য তে ॥ ৩০ ॥

ইত্থম্-ভূত—এইভাবে; **অনুভাবঃ**—অত্যন্ত মহান, শক্তিমান; **অসৌ**—তা; **পৃথুঃ**—মহারাজ পৃথু; **সঃ**—তিনি; **ভগবৎ-তমঃ**—প্রভুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **কীর্তিতম্**—বর্ণিত;

তস্য—তাঁর; **চরিতম্**—চরিত্র; **উদ্দাম**—অত্যন্ত মহান, **চরিতস্য**—যিনি এই সমস্ত গুণসমন্বিত; **তে**—তোমার কাছে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—ভক্তশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৃথু ছিলেন অত্যন্ত শক্তিমান, এবং তাঁর চরিত্র ছিল উদার, চমৎকার ও মহৎ। তাই আমি তাঁর কথা তোমার কাছে যথাসাধ্য বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভগবত্তমঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ *ভগবৎ* শব্দটি বিশেষভাবে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। *ভগবান্* শব্দটি আসছে ভগবৎ শব্দটি থেকে। কিন্তু কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, *ভগবান্* শব্দটি ব্রহ্মা, শিব, নারদ মুনি প্রভৃতি মহান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। পৃথু মহারাজের ক্ষেত্রেও সেইভাবে শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। এখানে তাঁকে *ভগবত্তমঃ* বা ভগবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যখন অসাধারণ ও অলৌকিক গুণাবলী প্রদর্শন করেন, অথবা তিরোভাবের পর উচ্চতম লক্ষ্য প্রাপ্ত হন অথবা জ্ঞান ও অজ্ঞানের পার্থক্য জানেন, তখনই কেবল তাঁকে *ভগবান্* বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কখনও *ভগবান্* শব্দটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩১

য ইদং সুমহৎপুণ্যং শ্রদ্ধয়াবহিতঃ পঠেৎ ।
শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স পৃথোঃ পদবীমিয়াৎ ॥ ৩১ ॥

যঃ—যিনি; **ইদম্**—এই; **সু-মহৎ**—অত্যন্ত মহান; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **অবহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **পঠেৎ**—পাঠ করেন; **শ্রাবয়েৎ**—ব্যাখ্যা করেন; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **বা**—অথবা; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **পদবীম্**—পদ; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পৃথু মহারাজের মহান চরিত্র শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, অথবা শ্রবণ করেন অথবা অন্যদের তা শোনান, তিনি নিশ্চিতভাবে

পৃথু মহারাজের লোক প্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ, তিনিও ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*—এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। আমরা যখন বিষ্ণুর কথা বলি, তখন আমরা বিষ্ণুর সঙ্গে যা সম্পর্কিত, তাকেও উল্লেখ করি। *শিব পুরাণে* শিব বলেছেন যে, বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তার থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে, বৈষ্ণব অথবা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত যা তাঁর আরাধনা। সেই তত্ত্ব এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বৈষ্ণবের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ-কীর্তনেরই সমান, কারণ মৈত্রেয় ঋষি এখানে বলেছেন যে, যাঁরা মনোযোগ সহকারে পৃথু মহারাজের মহিমা শ্রবণ করেন, তাঁরাও সেই গ্রহলোক প্রাপ্ত হবেন, যেই গ্রহলোকে পৃথু মহারাজ গিয়েছেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মধ্যে কোন দ্বৈতভাব নেই। তাকে বলা হয় অদ্বয়জ্ঞান। বৈষ্ণব বিষ্ণুরই মতো মহত্ত্বপূর্ণ, এবং তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর *গুর্বষ্টকে* লিখেছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

"শ্রীগুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো সম্মান করা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের সব চাইতে বিশ্বস্ত সেবক। সেই কথা সমস্ত শাস্ত্রে বলা হয়েছে এবং সমস্ত মহাজনেরা তা অনুসরণ করেছেন। তাই, শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি হচ্ছেন শ্রীহরির আদর্শ প্রতিনিধি।"

পরম বৈষ্ণব হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব, এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। বলা হয় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও কখনও গোপীদের নাম কীর্তন করতেন। তাঁর কয়েকজন ছাত্র তখন তাঁকে উপদেশ দিয়েছিল, গোপীদের নাম কীর্তন করার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁর ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই বিরোধ এমনই একটি স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। কারণ তিনি গৃহস্থ-আশ্রমে ছিলেন বলে, তাঁকে তারা খুব গুরুত্ব দিচ্ছিল না। আসল কথাটি হচ্ছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু গোপীদের নাম কীর্তন করেছিলেন, অতএব

গোপীদের বা ভগবানের ভক্তদের পূজা ভগবানের পূজারই সমান। ভগবান নিজেও বলেছেন যে, সরাসরিভাবে তাঁর ভক্তি করার থেকে তাঁর ভক্তের প্রতি ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কখনও কখনও সহজিয়ারা ভগবানের ভক্তদের কার্যকলাপের কথা বাদ দিয়ে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে আগ্রহ প্রদর্শন করে। এরা উচ্চস্তরের ভক্ত নয়, যাঁরা ভক্ত ও ভগবানকে সমান স্তরে দর্শন করেন, তাঁরা উন্নততর স্তরের ভক্ত।

শ্লোক ৩২

ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চস্বী রাজন্যো জগতীপতিঃ ।
বৈশ্যঃ পঠন্ বিট্‌পতিঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সত্তমতামিয়াৎ ॥ ৩২ ॥

ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ; **ব্রহ্ম-বর্চস্বী**—যিনি আধ্যাত্মিক সাফল্যের শক্তিলাভ করেছেন; **রাজন্যঃ**—ক্ষত্রিয়বর্গ; **জগতী-পতিঃ**—পৃথিবীর রাজা; **বৈশ্যঃ**—বৈশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ; **পঠন্**—পাঠ করে; **বিট্-পতিঃ**—পশুদের প্রভু; **স্যাৎ**—হন; **শূদ্রঃ**—শূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ; **সত্তম-তাম্**—মহান ভক্তের পদ; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় সারা পৃথিবীর রাজা হন; বৈশ্য অন্য বৈশ্য ও পশুদের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন, এবং শূদ্র শ্রেষ্ঠ ভক্ত হন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, জাগতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলেরই ভগবানের ভক্ত হওয়া উচিত। তিনি সমস্ত কামনা রহিত (*অকাম*) হন, সকাম হন, কিংবা মুক্তি লাভের অভিলাষী (*মোক্ষকাম*) হন, সকলকেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের আরাধনা করতে এবং প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে। তা করার ফলে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন। ভগবদ্ভক্তির পন্থা, বিশেষ করে শ্রবণ ও কীর্তন এতই শক্তিশালী যে, তা মানুষকে পরম পূর্ণতা প্রদান করতে পারে। এই শ্লোকে *ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের* উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এখানে বুঝতে হবে যে, *ব্রাহ্মণ* বলতে যাদের ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম হয়েছে, *ক্ষত্রিয়* বলতে যাদের ক্ষত্রিয়-পরিবারে জন্ম হয়েছে, *বৈশ্য* বলতে যাদের বৈশ্য-পরিবারে জন্ম হয়েছে এবং *শূদ্র* বলতে যাদের শূদ্র-পরিবারে জন্ম হয়েছে, তাঁদের বোঝানো হয়েছে। কিন্তু *ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য* অথবা *শূদ্র* নির্বিশেষে সকলেই কেবলমাত্র শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করাই চরম লক্ষ্য নয়; ব্রাহ্মণের শক্তি, যাকে বলা হয় ব্রহ্মতেজ, তা থাকা অবশ্য কর্তব্য। তেমনই, ক্ষত্রিয়-পরিবারে জন্মগ্রহণ করাই সর্বোচ্চ লক্ষ্য নয়, পৃথিবীর উপর শাসন করার ক্ষমতা থাকা অবশ্য কর্তব্য। তেমনই, বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়; তার কাছে হাজার হাজার পশু (বিশেষ করে গাভী) থাকা উচিত এবং অন্য বৈশ্যদের উপর আধিপত্য থাকা উচিত, ঠিক যেমন বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের ছিল। নন্দ মহারাজ ছিলেন বৈশ্য এবং তাঁর নয় লক্ষ গাভী ছিল, এবং তিনি বহু গোপ ও গোপবালকদের উপর কর্তৃত্ব করতেন। শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করার মাধ্যমে এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তদের লীলা-বিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার মাধ্যমে, ব্রাহ্মণের থেকেও মহৎ হতে পারেন।

শ্লোক ৩৩

ত্রিঃ কৃত্ব ইদমাকর্ণ্য নরো নার্যথবাদৃতা ।
অপ্রজঃ সুপ্রজতমো নির্ধনো ধনবত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিঃ—তিনবার; **কৃত্বঃ**—উচ্চারণ করে; **ইদম্**—এই; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **নরঃ**—মানুষ, **নারী**—স্ত্রী; **অথবা**—অথবা; **আদৃতা**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **অপ্রজঃ**—সন্তানহীন; **সু-প্রজ-তমঃ**—বহু সন্তান লাভ করতে পারেন; **নির্ধনঃ**—ধনহীন, **ধন-বৎ**—ধনী; **তমঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পৃথু মহারাজের এই কাহিনী শ্রবণ করলে পুত্রহীন বহু পুত্রলাভ করবেন, এবং নির্ধন ব্যক্তি ধনীশ্রেষ্ঠ হবেন।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত মানুষেরা ধনসম্পদ ও বৃহৎ পরিবার লাভের আশায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে, বিশেষ করে দুর্গাদেবী, শিব ও ব্রহ্মার। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের বলা হয় *শ্রিয়ৈশ্বর্য-প্রজেপ্সবঃ*। *শ্রী* মানে 'সৌন্দর্য', *ঐশ্বর্য* মানে 'ধনসম্পদ', *প্রজা* মানে 'সন্তান-সন্ততি', এবং *ঈপ্সবঃ* মানে 'আকাঙ্ক্ষী'। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকার বরলাভের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতে হয়। কিন্তু এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেবল পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র শ্রবণ করার ফলে, প্রচুর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ করা

যায় কেবলমাত্র পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ, জীবনী ও ইতিহাস পাঠ করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, অন্তত তিনবার তা পাঠ করা উচিত। যারা জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, তারা পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ভক্তদের কথা শ্রবণ করে এতই লাভবান হবেন যে, তাদের আর অন্য কোন দেবতাদের কাছে যেতে হবে না। এই শ্লোকে সুপ্রজস্তমঃ ('বহু সন্তান-সন্ততি পরিবৃত হয়ে') শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কারও বহু সন্তান-সন্ততি থাকতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে একটিও উপযুক্ত সন্তান নাও হতে পারে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সুপ্রজস্তমঃ, অর্থাৎ এইভাবে লব্ধ সমস্ত সন্তানেরা বিদ্যা, ঐশ্বর্য, শ্রী ও শক্তি ইত্যাদি সমস্ত গুণে গুণান্বিত হবে।

শ্লোক ৩৪

অস্পষ্টকীর্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ।
ইদং স্বস্ত্যয়নং পুংসামমঙ্গল্যনিবারণম্ ॥ ৩৪ ॥

অস্পষ্ট কীর্তিঃ—অপ্রকাশিত যশ; **সু যশাঃ**—অত্যন্ত যশস্বী; **মূর্খঃ**—নিরক্ষর; **ভবতি**—হয়; **পণ্ডিতঃ**—বিদ্বান; **ইদম্**—এই; **স্বস্তি অয়নম্**—মঙ্গলজনক; **পুংসাম্**—মানুষদের; **অমঙ্গল্য**—অমঙ্গল; **নিবারণম্**—নাশ করে।

অনুবাদ

এই বৃত্তান্ত তিনবার শ্রবণ করলে, যশহীন ব্যক্তি অত্যন্ত যশস্বী হবেন, এবং মূর্খ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত হবেন। অর্থাৎ, পৃথু মহারাজের বৃত্তান্ত এতই মঙ্গলজনক যে, তা সমস্ত অমঙ্গল দূর করে।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই কিছু লাভ, কিছু পূজা এবং কিছু প্রতিষ্ঠা চায়। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে, অনায়াসে সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায়। এমন কি কেউ যদি সমাজে অপরিচিত অথবা অখ্যাত হন, তিনিও যদি ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করেন এবং ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, তা হলে তিনি অত্যন্ত যশস্বী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। কেউ যদি মূর্খ হন, তবুও কেবল *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *ভগবদ্গীতায়* ভগবান ও তাঁর ভক্তদের লীলা-বিলাসের কাহিনী শ্রবণ করেন, তা হলে তিনিও সমাজে মহাপণ্ডিত বলে পরিচিত হতে পারেন। এই জড় জগতে প্রতিটি পদক্ষেপ বিপদে পূর্ণ, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণরূপে

নির্ভীক, কারণ ভগবদ্ভক্তি এতই মঙ্গলজনক যে, তা আপনা থেকেই সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করে। যেহেতু পৃথু মহারাজের বৃত্তান্ত শ্রবণ করা ভগবদ্ভক্তির একটি অঙ্গ, তাই তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে, স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত সৌভাগ্যের উদয় হয়।

শ্লোক ৩৫

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং কলিমলাপহম্ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সম্যক্‌সিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ ।
শ্রদ্ধয়ৈতদনুশ্রাব্যং চতুর্ণাং কারণং পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ধন্যম্—ধনপ্রাপক; **যশস্যম্**—যশের উৎস; **আয়ুষ্যম্**—দীর্ঘ আয়ুর উৎস; **স্বর্গ্যম্**—স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার উপায় স্বরূপ; **কলি**—কলিযুগের; **মল-অপহম্**—কল্মষ নাশকারী; **ধর্ম**—ধর্ম; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কাম**—ইন্দ্রিয় সুখভোগ; **মোক্ষাণাম্**—মুক্তির; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **অভীপ্সুভিঃ**—অভিলাষী; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **এতৎ**—এই বর্ণনা; **অনুশ্রাব্যম্**—শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য; **চতুর্ণাম্**—চারটির; **কারণম্**—কারণ; **পরম্**—চরম।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের কাহিনী শ্রবণ করে মানুষ মহান হতে পারে, আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে, স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে এবং কলিযুগের কলুষ নাশ করতে পারে। অধিকন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পথেও উন্নতিসাধন করতে পারে। অতএব, এই সমস্ত বিষয়ে আগ্রহশীল জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র পাঠ করেন এবং শ্রবণ করেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র পাঠ ও শ্রবণ করার ফলে, স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায়, এবং ভগবদ্ভক্ত হওয়া মাত্রই তাঁর সমস্ত জড় বাসনা আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, অথবা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত (অকাম) হতে চান, অথবা জড়-জাগতিক উন্নতিসাধন করতে চান (*সকাম* বা

সর্বকাম), অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চান (*মোক্ষকাম*), তিনি যেন ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা তাঁর ভক্তের মহিমা শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন। সেটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেববেদ্যঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)। বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তদের জানা। আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি, তখন তাঁর ভক্তদের কথাও বলি, কারণ তিনি কখনও একলা থাকেন না। তিনি কখনও নির্বিশেষ অথবা শূন্য নন। শ্রীকৃষ্ণ বৈচিত্র্যপূর্ণ, এবং শ্রীকৃষ্ণ যেখানে উপস্থিত থাকেন, সেই স্থান শূন্য হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ৩৬

বিজয়াভিমুখো রাজা শ্রুত্বৈতদভিযাতি যান্ ।
বলিং তস্মৈ হরন্ত্যগ্রে রাজানঃ পৃথবে যথা ॥ ৩৬ ॥

বিজয়-অভিমুখঃ—জয়লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে উদ্যত; **রাজা**—রাজা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই; **অভিযাতি**—যাত্রা করেন; **যান্**—রথে; **বলিম্**—কর; **তস্মৈ**—তাঁকে; **হরন্তি**—উপহার দেন; **অগ্রে**—সম্মুখে; **রাজানঃ**—অন্য রাজারা; **পৃথবে**—পৃথু মহারাজকে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

শাসন-ক্ষমতা ও জয়লাভে ইচ্ছুক কোনও রাজা যদি পৃথু মহারাজের কাহিনী তিনবার উচ্চারণ করে তাঁর রথে চড়ে যাত্রা করেন, তা হলে তাঁর আদেশে অন্য সমস্ত রাজারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে কর প্রদান করবেন, ঠিক যেভাবে তাঁরা পৃথু মহারাজকে তাঁর আদেশ মাত্রই কর প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় রাজা যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতে চান, তাই তিনি অন্য সমস্ত রাজাদের তাঁর অধীনস্থ করতে চান। বহুকাল পূর্বে পৃথু মহারাজ যখন পৃথিবীর উপর আধিপত্য করছিলেন, তখনও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন তিনি ছিলেন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। এমন কি পাঁচ হাজার বছর আগেও যুধিষ্ঠির মহারাজ ও পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। কখনও কখনও অধীন রাজারা বিদ্রোহ করে, এবং তখন সম্রাটকে তাঁদের দণ্ডদান

করতে হয়। কেউ যদি অন্য সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে সমগ্র পৃথিবী শাসন করার অভিলাষী হন, তা হলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র কীর্তন করেন।

শ্লোক ৩৭

মুক্তান্যসঙ্গো ভগবত্যমলাং ভক্তিমুদ্বহন্ ।
বৈণ্যস্য চরিতং পুণ্যং শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েৎপঠেৎ ॥ ৩৭ ॥

মুক্ত-অন্য-সঙ্গঃ—সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অমলাম্**—নির্মল; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তি; **উদ্বহন্**—সম্পাদন করে; **বৈণ্যস্য**—মহারাজ বেণের পুত্র, **চরিতম্**—চরিত্র; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করা; **শ্রাবয়েৎ**—অন্যদের শোনানো অবশ্য কর্তব্য; **পঠেৎ**—এবং পাঠ করেন।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ভক্তির বিবিধ পন্থা পালন করে চিন্ময় পদে স্থিত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হতে পারেন, তবুও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময়, পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে নিজে শ্রবণ করা, পাঠ করা এবং অন্যদের শ্রবণ করানো তাঁর অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

এক প্রকার কনিষ্ঠ ভক্ত আছে, যারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করতে, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* রাসলীলার বর্ণনাকারী অধ্যায়গুলি শ্রবণ করতে অত্যন্ত উৎসুক। এই প্রকার ভক্তদের এই উপদেশের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস অভিন্ন। একজন আদর্শ রাজারূপে, পৃথু মহারাজ প্রজা-শাসনের সমস্ত যোগ্যতা ও গুণাবলী প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন কিভাবে তাদের শিক্ষাদান করতে হয়, কিভাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করতে হয়, কিভাবে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়, এবং কিভাবে মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয়, ইত্যাদি। তাই সহজিয়া বা কনিষ্ঠ ভক্তদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং অন্যদের শ্রবণ করান, যদিও তিনি মনে করতে পারেন যে, ভগবদ্ভক্তির অতি উচ্চ স্তরে চিন্ময় পদে তিনি অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৩৮

বৈচিত্রবীর্যাভিহিতং মহন্মাহাত্ম্যসূচকম্ ।
অস্মিন্ কৃতমতিমর্ত্যম্ পার্থবীং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

বৈচিত্রবীর্য—হে বিচিত্রবীর্যের পুত্র (বিদুর); **অভিহিতম্**—কীর্তিত; **মহৎ**—মহান; **মাহাত্ম্য**—মহিমা; **সূচকম্**—প্রকাশকারী; **অস্মিন্**—এতে; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **অতি-মর্ত্যম্**—অসাধারণ; **পার্থবীম্**—পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে; **গতিম্**—উন্নতি, লক্ষ্য; **আপ্নুয়াৎ**—প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! আমি যথাসাধ্য পৃথু মহারাজের চরিত্র কীর্তন করলাম, যা ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করে। যিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন, তিনিও পৃথু মহারাজের মতো ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে *শ্রাবয়েৎ* শব্দটির উল্লেখ হয়েছে, তা ইঙ্গিত করে যে, পৃথু মহারাজের চরিত্র কেবল নিজেই পাঠ করা উচিত, তাই নয়, অন্যদেরও তা শোনানো উচিত। তাকে বলা হয় প্রচার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন—*"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ"* (*শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮)। পৃথু মহারাজের ভগবদ্ভক্তির ইতিহাস পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনার মতোই শক্তিশালী। ভগবানের লীলা এবং পৃথু মহারাজের কার্যকলাপের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য দর্শন করা উচিত নয়, এবং ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে যখনই সম্ভব অন্যদের পৃথু মহারাজের কাহিনী শ্রবণে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করা। কেবল নিজের হিত সাধনের জন্য তাঁর লীলা পাঠ করা উচিত, তাই নয়, অন্যদেরও তা পাঠ করতে এবং শ্রবণ করতে অনুপ্রাণিত করা উচিত। এইভাবে সকলেই লাভবান হবে।

শ্লোক ৩৯

অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্
পৃথুচরিতং প্রথয়ন্ বিমুক্তসঙ্গঃ ।
ভগবতি ভবসিন্ধুপোতপাদে
স চ নিপুণাং লভতে রতিং মনুষ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

অনু-দিনম্—প্রতিদিন; **ইদম্**—এই; **আদরেণ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **পৃথু-চরিতম্**—পৃথু মহারাজের বর্ণনা; **প্রথয়ন্**—কীর্তন করে; **বিমুক্ত**—মুক্ত; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভব-সিন্ধু**—অজ্ঞানের সমুদ্র; **পোত**—নৌকা; **পাদে**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **সঃ**—তিনি; **চ**—ও; **নিপুণাম্**—পূর্ণ; **লভতে**—লাভ করেন; **রতিম্**—আসক্তি; **মনুষ্যঃ**—মানুষ।

অনুবাদ

যিনি পৃথু মহারাজের কার্যকলাপের বৃত্তান্ত নিয়মিতভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করেন, কীর্তন করেন এবং বর্ণনা করেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ নিশ্চিতভাবে বর্ধিত হবে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সংসার-সমুদ্র পার হওয়ার তরণিসদৃশ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভবসিন্ধু পোত পাদে* বাক্যাংশটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে বলা হয় *মহৎ-পদম্*; অর্থাৎ, সমগ্র জড় জগতের উৎস হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ* —সব কিছু ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই জড় জগৎ, যার তুলনা অজ্ঞানের সমুদ্রের সঙ্গে করা হয়, তাও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত। কিন্তু অজ্ঞানের এই মহাসমুদ্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রভাবে সংকীর্ণ হয়ে যায়। যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁকে আর এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে হয় না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থিত হওয়ার ফলে, তা উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। ভগবান ও ভগবানের ভক্তের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের ফলে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় দৃঢ়রূপে স্থির হওয়া যায়। পৃথু মহারাজের জীবনচরিত নিয়মিতভাবে প্রতিদিন বর্ণনা করার ফলে, অনায়াসে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সম্পর্কে *বিমুক্ত-সঙ্গঃ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু আমরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ করি, তাই এই জড় জগতে আমাদের স্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কিন্তু যখন আমরা শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হই, তৎক্ষণাৎ আমরা *বিমুক্ত-সঙ্গ* হই অথবা মুক্ত হয়ে যাই।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

রুদ্রগীত কীর্তন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

বিজিতাশ্বোঽধিরাজাসীৎপৃথুপুত্রঃ পৃথুশ্রবাঃ ।
যবীয়োভ্যোঽদদাৎকাষ্ঠা ভ্রাতৃভ্যো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **বিজিতাশ্বঃ**—বিজিতাশ্ব নামক; **অধিরাজা**—সম্রাট; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **পৃথু পুত্রঃ** —পৃথু মহারাজের পুত্র; **পৃথু-শ্রবাঃ**—মহান কার্যের; **যবীয়োভ্যঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের; **অদদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **কাষ্ঠাঃ**—বিভিন্ন দিক; **ভ্রাতৃভ্যঃ**—ভ্রাতাদের; **ভ্রাতৃ-বৎসলঃ**—ভ্রাতাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—মহারাজ পৃথুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব, যিনি তাঁর পিতারই মতো যশস্বী ছিলেন, তিনি রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দিক আধিপত্য করতে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর ভাইদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র বর্ণনা করার পর, মহর্ষি মৈত্রেয় পৃথু মহারাজের বংশ পরম্পরায় তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। পৃথু মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন। মহারাজ বিজিতাশ্ব তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন, এবং তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন পৃথিবীর বিভিন্ন দিক শাসন করেন। অনাদিকাল ধরে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজা হওয়ার প্রথা চলে আসছে। পাণ্ডবেরা যখন পৃথিবী শাসন করছিলেন, তখন মহারাজ পাণ্ডুর

জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির সম্রাট হয়েছিলেন, এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। তেমনই, বিজিতাশ্ব রাজপদে অভিষিক্ত হলে, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পৃথিবীর বিভিন্ন দিকের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ২

হর্যক্ষায়াদিশৎপ্রাচীং ধূম্রকেশায় দক্ষিণাম্ ।
প্রতীচীং বৃকসংজ্ঞায় তুর্যাং দ্রবিণসে বিভুঃ ॥ ২ ॥

হর্যক্ষায়—হর্যক্ষকে; **অদিশৎ**—প্রদান করেছিলেন; **প্রাচীম্**—পূর্ব দিক; **ধূম্রকেশায়**—ধূম্রকেশকে; **দক্ষিণাম্**—দক্ষিণ দিক; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম দিক, **বৃক-সংজ্ঞায়**—বৃক নামক ভ্রাতাকে; **তুর্যাম্**—উত্তর দিক; **দ্রবিণসে**—দ্রবিণ নামক অন্য ভ্রাতাকে, **বিভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

মহারাজ বিজিতাশ্ব তাঁর ভ্রাতা হর্যক্ষকে পৃথিবীর পূর্ব দিক, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ দিক, বৃককে পশ্চিম দিক এবং দ্রবিণকে উত্তর দিক প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩

অন্তর্ধানগতিং শক্রাল্লব্ধ্বান্তর্ধানসংজ্ঞিতঃ ।
অপত্যত্রয়মাধত্ত শিখণ্ডিন্যাং সুসম্মতম্ ॥ ৩ ॥

অন্তর্ধান—অন্তর্হিত হওয়ার; **গতিম্**—বিদ্যা; **শক্রাৎ**—দেবরাজ ইন্দ্রের থেকে; **লব্ধ্বা**—প্রাপ্ত হয়ে; **অন্তর্ধান**—অন্তর্ধান নাম; **সংজ্ঞিতঃ**—নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অপত্য**—সন্তান; **ত্রয়ম্**—তিনজন; **আধত্ত**—উৎপাদন করেছিলেন; **শিখণ্ডিন্যাম্**—তাঁর পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে; **সু-সম্মতম্**—সকলের দ্বারা সমাদৃত।

অনুবাদ

পূর্বে, মহারাজ বিজিতাশ্ব দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা বিধানের ফলে, তাঁর কাছ থেকে অন্তর্ধান বিদ্যা প্রাপ্ত হয়ে অন্তর্ধান উপাধি লাভ করেন। শিখণ্ডিনী নামক পত্নীর গর্ভে তিনি তিনটি অতি উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ বিজিতাশ্বের অন্তর্হিত হওয়ার ক্ষমতা ছিল বলে তিনি অন্তর্ধান নামে পরিচিত হন। ইন্দ্র যখন পৃথু মহারাজের যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছিলেন, তখন তিনি

ইন্দ্রের কাছ থেকে এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইন্দ্র যখন অশ্ব অপহরণ করছিলেন, তখন তিনি অন্য সকলের কাছে অদৃশ্য ছিলেন, কিন্তু পৃথু মহারাজের পুত্র বিজিতাশ্ব তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁর পিতার ঘোড়া চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন জেনেও, বিজিতাশ্ব তাঁকে আক্রমণ করেননি। তা ইঙ্গিত করে যে, মহারাজ বিজিতাশ্ব যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান করতেন ইন্দ্র যদিও তাঁর পিতার অশ্ব চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তবুও বিজিতাশ্ব ভালভাবেই জানতেন যে, ইন্দ্র কোন সাধারণ চোর ছিলেন না। ইন্দ্র যেহেতু ছিলেন একজন মহান ও শক্তিশালী দেবতা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবক, তাই অন্যায়ভাবে আচরণ করলেও, বিজিতাশ্ব জেনে শুনে তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্র সেই সময়ে বিজিতাশ্বের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। দেবতাদের ইচ্ছা অনুসারে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হওয়ার মহান শক্তি রয়েছে, এবং বিজিতাশ্বের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্র তাঁকে সেই যোগশক্তি দান করেছিলেন। তার ফলে বিজিতাশ্ব অন্তর্ধান নামে পরিচিত হয়েছিলেন

শ্লোক ৪

পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা ।
বসিষ্ঠশাপাদুৎপন্নাঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ ॥ ৪ ॥

পাবকঃ—পাবক নামক; **পবমানঃ**—পবমান নামক; **চ**—ও; **শুচিঃ**—শুচি নামক; **ইতি**—এইভাবে; **অগ্নয়ঃ**—অগ্নিদেবতা; **পুরা**—পূর্বে; **বসিষ্ঠ**—মহর্ষি বসিষ্ঠ; **শাপাৎ**—অভিশাপের ফলে; **উৎপন্নাঃ**—সম্প্রতি জন্মগ্রহণ করেছেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **যোগ-গতিম্**—যোগ অভ্যাসের লক্ষ্য; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ অন্তর্ধানের তিনটি পুত্রের নাম ছিল—পাবক, পবমান ও শুচি। পূর্বে এই তিনজন ছিলেন অগ্নির দেবতা, কিন্তু মহর্ষি বসিষ্ঠের অভিশাপের ফলে তাঁরা মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা ছিলেন অগ্নিদেবের মতো শক্তিমান এবং তাঁরা যোগবলে পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৬/৪১-৪৩) উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন যোগভ্রষ্ট হন, তখন তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হন, এবং সেখানে জড় সুখভোগ করার পর, পুনরায় পৃথিবীতে অত্যন্ত ধনী পরিবারে অথবা পুণ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

অতএব দেবতাদের যখন অধঃপতন হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁরা পৃথিবীতে অত্যন্ত ধনী ও পুণ্যবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে, জীব কৃষ্ণভক্তি সম্পাদনের সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং তার ফলে তাঁর বাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্রেরা ছিলেন অগ্নির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, এবং তাঁরা যোগবলে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়ে, তাঁদের পূর্বের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

অন্তর্ধানো নভস্বত্যাং হবির্ধানমবিন্দত ।
য ইন্দ্রমশ্বহর্তারং বিদ্বানপি ন জঘ্নিবান্ ॥ ৫ ॥

অন্তর্ধানঃ—অন্তর্ধান নামক রাজা; **নভস্বত্যাম্**—তাঁর পত্নী নভস্বতীর গর্ভে; **হবির্ধানম্**—হবির্ধান নামক; **অবিন্দত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি, **ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **অশ্ব-হর্তারম্**—যিনি তাঁর পিতার অশ্ব অপহরণ করছিলেন; **বিদ্বান্ অপি**—তা জানা সত্ত্বেও; **ন জঘ্নিবান্**—তাঁকে হত্যা করেননি।

অনুবাদ

মহারাজ অন্তর্ধানের নভস্বতী নামক আর এক পত্নী ছিলেন, এবং তাঁর গর্ভে তিনি হবির্ধান নামক আর একটি পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অন্তর্ধান যেহেতু ছিলেন অত্যন্ত উদার, তাই ইন্দ্র তাঁর পিতার যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করছেন জেনেও তিনি তাঁকে হত্যা করেননি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুরাণ থেকে জানা যায় যে, স্বর্গের রাজা ইন্দ্র অপহরণ কার্যে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি অদৃশ্য হয়ে যে-কোন বস্তু অপহরণ করতে পারেন, এবং তিনি সকলের অগোচরে অন্যের পত্নী অপহরণ করতে পারেন। একবার তিনি তাঁর অন্তর্ধান বিদ্যা ব্যবহার করে গৌতম মুনির পত্নীকে ধর্ষণ করেছিলেন, এবং তেমনভাবেই অদৃশ্য হয়ে তিনি পৃথু মহারাজের অশ্ব অপহরণ করেছিলেন। যদিও মানব-সমাজে এই প্রকার কার্য অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ইন্দ্রদেবের পক্ষে সেই কার্য গর্হিত বলে মনে করা হয় না। অন্তর্ধান যদিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর পিতার অশ্ব অপহরণ করছেন, তবুও তিনি ইন্দ্রকে হত্যা করেননি, কারণ তিনি জানতেন যে, অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি যদি কখনও কোন রকম নিন্দনীয় কার্য করেন, তা হলে তার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

ভগবদ্‌গীতায় (৯/৩০) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

ভগবান বলেছেন যে, এমন কি কোন ভক্ত যদি কোন নিন্দনীয় কার্য করেন, তবুও, তাঁকে সাধু বা পুণ্যবান ব্যক্তি বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ। ভগবানের ভক্ত কখনও জেনে শুনে পাপকর্ম করেন না, তবে পূর্বের অভ্যাসের বশে যদি কখনও কোন নিন্দনীয় কার্য করে ফেলেন, তবে তার খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, কারণ ভগবদ্ভক্তরা স্বর্গলোকেই হোক অথবা এই লোকেই হোক অত্যন্ত শক্তিশালী। ঘটনাক্রমে তারা কেউ যদি কোন নিন্দনীয় কার্য করে ফেলেন, তবে তার বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে, তা উপেক্ষা করা উচিত।

শ্লোক ৬

রাজ্ঞাং বৃত্তিং করাদানদণ্ডশুল্কাদিদারুণাম্ ।
মন্যমানো দীর্ঘসত্রব্যাজেন বিসসর্জ হ ॥ ৬ ॥

রাজ্ঞাম্—রাজার; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **কর**—কর; **আদান**—আদায় করা; **দণ্ড**—দণ্ড; **শুল্ক**—অর্থদণ্ড; **আদি**—ইত্যাদি; **দারুণাম্**—অত্যন্ত কঠোর; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকালব্যাপী; **সত্র**—যজ্ঞ; **ব্যাজেন**—অজুহাতে; **বিসসর্জ**—ত্যাগ করেছিলেন; **হ**—পূর্বে।

অনুবাদ

রাজার বৃত্তি অনুসারে, অন্তর্ধানকে যখন প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে হত, দণ্ডদান করতে হত অথবা শুল্ক গ্রহণ করতে হত, তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে তিনি তা করতে চাইতেন না। তার ফলে এই প্রকার কর্তব্য কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, রাজা হওয়ার ফলে রাজাকে কখনও কখনও এমন কার্য করতে হয়, যা বাঞ্ছনীয় নয়। তেমনই অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, কারণ যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়কে কর্তব্যের খাতিরে এই প্রকার অবাঞ্ছিত কার্য করতে হয়। প্রজাদের কাছ

থেকে কর সংগ্রহ করতে অথবা অপরাধীদের দণ্ড দিতে মহারাজ অন্তর্ধানের মোটেই ভাল লাগত না; তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার অজুহাতে তিনি অল্প বয়সে রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

তত্রাপি হংসং পুরুষং পরমাত্মানমাত্মদৃক্ ।
যজংস্তল্লোকতামাপ কুশলেন সমাধিনা ॥ ৭ ॥

তত্র অপি—তাঁর ব্যস্ততা সত্ত্বেও; **হংসম্**—যিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দুঃখ দূর করেন; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **পরম-আত্মানম্**—পরম প্রিয় পরমাত্মা, **আত্ম-দৃক্**—যিনি আত্মাকে দর্শন করেছেন বা উপলব্ধি করেছেন; **যজন্**—আরাধনার দ্বারা; **তৎ-লোকতাম্**—সেই গ্রহলোক; **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কুশলেন**—অনায়াসে; **সমাধিনা**—সর্বদা সমাধিস্থ হয়ে।

অনুবাদ

মহারাজ অন্তর্ধান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেও, আত্ম-তত্ত্ববেত্তা হওয়ার ফলে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে মহারাজ অন্তর্ধান সমাধিমগ্ন হয়ে অনায়াসে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু সাধারণত সকাম কর্মীরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাই এখানে *(তত্রাপি)* বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহারাজ অন্তর্ধান বাহ্যিকভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত হলেও তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। অর্থাৎ, তিনি সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা প্রচলিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন সেই সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩)

ভগবদ্ভক্তিকে বলা হয় *কীর্তন-যজ্ঞ*, এবং *সংকীর্তন যজ্ঞ* অনুশীলনের দ্বারা অনায়াসে সেই লোকে উন্নীত হওয়া যায়, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন। পঞ্চপ্রকার মুক্তির মধ্যে একটি হচ্ছে ভগবানের লোকে ভগবানের সঙ্গে বাস করা, যাকে বলা হয় *সালোক্য* মুক্তি।

শ্লোক ৮

হবির্ধানাদ্ধবির্ধানী বিদুরাসূত ষট্ সুতান্ ।
বর্হিষদং গয়ং শুক্লং কৃষ্ণং সত্যং জিতব্রতম্ ॥ ৮ ॥

হবির্ধানাৎ—হবির্ধান থেকে; **হবির্ধানী**—হবির্ধানের পত্নী; **বিদুর**—হে বিদুর; **অসূত**—জন্ম দিয়েছিল; **ষট্**—ছয়; **সুতান্**—পুত্র; **বর্হিষদম্**—বর্হিষৎ নামক; **গয়ম্**—গয় নামক; **শুক্লম্**—শুক্ল নামক; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ নামক; **সত্যম্**—সত্য নামক; **জিত-ব্রতম্**—জিতব্রত নামক।

অনুবাদ

মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্র হবির্ধানের পত্নীর নাম ছিল হবির্ধানী, যিনি বর্হিষৎ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামক ছয়টি পুত্রের জন্মদান করেছিলেন।

শ্লোক ৯

বর্হিষৎ সুমহাভাগো হাবির্ধানিঃ প্রজাপতিঃ ।
ক্রিয়াকাণ্ডেষু নিষ্ণাতো যোগেষু চ কুরূদ্বহ ॥ ৯ ॥

বর্হিষৎ—বর্হিষৎ নামক, **সু-মহা-ভাগঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **হাবির্ধানিঃ**—হাবির্ধানি নামক; **প্রজা-পতিঃ**—প্রজাপতির পদ; **ক্রিয়া-কাণ্ডেষু**—সকাম কর্মের ব্যাপারে; **নিষ্ণাতঃ**—মগ্ন হয়ে; **যোগেষু**—হঠযোগের অভ্যাসে; **চ**—ও; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ (বিদুর)।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর। হবির্ধানের অত্যন্ত শক্তিমান পুত্র বর্হিষৎ বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন, এবং তিনি হঠযোগের অভ্যাসেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রভাবে, তিনি প্রজাপতিরূপেও পরিচিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের সংখ্যা অধিক ছিল না, তাই সন্তান উৎপাদন করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য, অত্যন্ত শক্তিশালী জীব অথবা দেবতাদের প্রজাপতিরূপে

নিযুক্ত করা হয়েছিল। বহু প্রজাপতি রয়েছেন—ব্রহ্মা, দক্ষ এবং মনুও প্রজাপতিরূপে পরিচিত। হবির্ধানের পুত্র বর্হিষৎও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

শ্লোক ১০

যস্যেদং দেবযজনমনুযজ্ঞং বিতন্বতঃ।
প্রাচীনাগ্রৈঃ কুশৈরাসীদাস্তৃতং বসুধাতলম্ ॥ ১০ ॥

যস্য—যাঁর; **ইদম্**—এই; **দেব-যজনম্**—যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট করে; **অনুযজ্ঞম্**—নিরন্তর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন; **বিতন্বতঃ**—সম্পাদন করে; **প্রাচীন-অগ্রৈঃ**— পূর্বমুখী রেখে; **কুশৈঃ**—কুশঘাস; **আসীৎ**—ছিলেন; **আস্তৃতম্**—বিক্ষিপ্ত; **বসুধা-তলম্**—পৃথিবীপৃষ্ঠে সর্বত্র।

অনুবাদ

মহারাজ বর্হিষৎ পৃথিবীর সর্বত্র বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার প্রভাবে পূর্বাগ্র-কুশ দ্বারা ধরণীতল আচ্ছাদিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে (*ক্রিয়া-কাণ্ডেষু নিষ্ণাতঃ*), মহারাজ বর্হিষৎ কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত মগ্ন ছিলেন। অর্থাৎ, একস্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পরই তিনি তার অতি নিকটেই আর একটি যজ্ঞ করতে শুরু করতেন। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার এই রকম আবশ্যকতা হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বিভিন্ন স্থানে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেছে এবং দেখা গেছে যে, যেখানেই সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, সেখানেই হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়ে তাতে অংশ গ্রহণ করেন। এই সূত্রে যে অচিন্ত্যনীয় কল্যাণ লাভ হয়, তা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত করা উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের কর্তব্য একের পর এক সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যাতে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা পরিহাসের ছলেই হোক অথবা নিষ্ঠা সহকারেই হোক, যেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন। তার ফলে তাঁদের হৃদয় নির্মল হবে। ভগবানের দিব্য নাম (*হরেনাম*) এতই শক্তিশালী যে, তা পরিহাসচ্ছলে অথবা নিষ্ঠা সহকারে, যেভাবেই কীর্তন করা হোক না কেন, এই দিব্য শব্দ-তরঙ্গের প্রভাব সমভাবে বিতরিত হবে। বর্তমান যুগে মহারাজ

বর্হিষতের মতো একের পর এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়, কিন্তু সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব, কেননা তাতে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না। যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন স্থানে বসে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করতে পারেন। যদি সারা পৃথিবী হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা প্লাবিত হয়, তা হলে সকলেই পরম সুখী হবে।

শ্লোক ১১

সামুদ্রীং দেবদেবোক্তামুপয়েমে শতদ্রুতিম্ ।
যাং বীক্ষ্য চারুসর্বাঙ্গীং কিশোরীং সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাম্ ।
পরিক্রমন্তীমুদ্বাহে চকমেঽগ্নিঃ শুকীমিব ॥ ১১ ॥

সামুদ্রীম্—সমুদ্রের কন্যাকে; **দেব-দেব-উক্তাম্**—পরম দেবতা ব্রহ্মার উপদেশে; **উপয়েমে**—বিবাহ করেছিলেন; **শতদ্রুতিম্**—শতদ্রুতি নামক; **যাম্**—যাঁকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **চারু**—অত্যন্ত সুন্দর; **সর্ব-অঙ্গীম্**—দেহের প্রতিটি অঙ্গ; **কিশোরীম্**—যুবতী; **সুষ্ঠু**—পর্যাপ্ত পরিমাণে; **অলঙ্কৃতাম্**—অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিতা; **পরিক্রমন্তীম্**—পরিক্রমণ করার সময়; **উদ্বাহে**—বিবাহ অনুষ্ঠানে; **চকমে**—আকৃষ্ট হয়ে; **অগ্নিঃ**—অগ্নিদেব; **শুকীম্**—শুকীকে; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

মহারাজ বর্হিষৎ, যিনি প্রাচীনবর্হি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি দেবদেব ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেন। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং তিনি ছিলেন নবযৌবন-সম্পন্না। সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে, বিবাহের সময় তিনি যখন অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন অগ্নিদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে কামনা করেছিলেন, ঠিক যেমন তিনি পূর্বে শুকীকে অভিলাষ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। বৈদিক প্রথা অনুসারে, বিবাহের সময় কন্যাকে মূল্যবান শাড়ি ও অলঙ্কারে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভূষিত করা হয়, এবং বিবাহের সময় বধূ বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। তারপর বর-বধূর শুভদৃষ্টি হয় এবং তারা পরস্পরের প্রতি আজীবন আকৃষ্ট হয়। বরের কাছে বধূকে যখন অত্যন্ত সুন্দরী বলে মনে হয়, তখন সেই আকর্ষণ অত্যন্ত দৃঢ় হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা

হয়েছে যে, পুরুষ ও স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং যখন তারা বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন সেই আকর্ষণ অত্যন্ত দৃঢ় হয়। এইভাবে সুদৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হয়ে ঘর সুন্দর গৃহস্থালি স্থাপন করে এবং অন্ন উৎপাদনের জন্য সুন্দর ক্ষেত্র তৈরি করে। তার পর সন্তান উৎপাদন হয়, তার পর বন্ধুবান্ধব আসে এবং ধনসম্পদ আসে। এইভাবে পুরুষেরা বৈষয়িক জীবনে জড়িয়ে পড়ে মনে করতে শুরু করে, "এটি আমার" এবং "আমি এই সব করছি" এইভাবে সংসারের মোহ বাড়তে থাকে।

এই শ্লোকে *শুকীম্ ইব* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ শতদ্রুতি যখন বর প্রাচীনবর্হিকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন অগ্নিদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন, ঠিক যেভাবে তিনি পূর্বে সপ্তর্ষিপত্নী শুকীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অগ্নিদেব যখন সপ্তর্ষিদের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি ঠিক এইভাবে প্রদক্ষিণরতা শুকীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অগ্নিপত্নী স্বাহা তখন শুকীর রূপ ধারণ করে অগ্নিকে সম্ভোগ সুখ প্রদান করেন। কেবল অগ্নিদেবই নন, দেবরাজ ইন্দ্র, এমন কি ব্রহ্মা, শিব আদি অতি উন্নত স্তরের দেবতারা পর্যন্ত যৌন আবেদনের দ্বারা যে কোন সময়ে অভিভূত হন. জীবের মৈথুন আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল যে, কেবল যৌন আকর্ষণের দ্বারাই সমস্ত জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। এই যৌন আকর্ষণের ফলেই জীবকে জড় জগতে বদ্ধ হয়ে বিভিন্ন প্রকার শরীর গ্রহণ করতে হয় পরবর্তী শ্লোকে এই যৌন আকর্ষণ আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

বিবুধাসুরগন্ধর্বমুনিসিদ্ধনরোরগাঃ ।
বিজিতাঃ সূর্যয়া দিক্ষু ক্বণয়ন্ত্যৈব নূপুরৈঃ ॥ ১২ ॥

বিবুধ—জ্ঞানবান; **অসুর**—অসুর; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব; **মুনি**—মহান ঋষিগণ; **সিদ্ধ**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ; **নর**—ভূলোকবাসীগণ; **উরগাঃ**—নাগলোকবাসীগণ; **বিজিতাঃ**—মোহিত; **সূর্যয়া**—নব বধূর দ্বারা; **দিক্ষু**—সমস্ত দিকে; **ক্বণয়ন্ত্যা**—কিঙ্কিণী শব্দ; **এব**—কেবল; **নূপুরৈঃ**—তাঁর নূপুরের দ্বারা।

অনুবাদ

শতদ্রুতির বিবাহের সময় অসুর, গন্ধর্ব, মুনি, সিদ্ধ, নর ও নাগেরা অত্যন্ত মহান হলেও, সকলেই তাঁর নূপুরের কিঙ্কিণী ধ্বনির দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সাধারণত মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হলে, সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর, তারা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। সন্তানের জন্ম দেওয়া মেয়েদের স্বাভাবিক কার্য, এবং তাই একের পর এক সন্তান উৎপাদন করে তারা অধিক থেকে অধিকতর সুন্দরী হয়ে ওঠে। কিন্তু শতদ্রুতি এতই সুন্দরী ছিলেন যে, তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আকৃষ্ট করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে কেবল তাঁর নূপুরের ধ্বনির দ্বারা তিনি সমস্ত বিদ্বান ও মহান দেবতাদের আকৃষ্ট করেছিলেন। তা ইঙ্গিত করে যে, সমস্ত দেবতারা পূর্ণরূপে তাঁর সৌন্দর্য দর্শন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বস্ত্র ও আভরণের দ্বারা বিভূষিতা ছিলেন বলে, তাঁরা তা দেখতে পাননি। যেহেতু তাঁরা কেবল শতদ্রুতির পদযুগল দর্শন করতে পেরেছিলেন, তাই তাঁরা নূপুরেব প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর পদচালনার সময় যার থেকে কিঙ্কিণী ধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দেবতারা কেবল তাঁর নূপুরের কিঙ্কিণীর ধ্বনিতেই মোহিত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ণ সৌন্দর্য তাঁদের দেখতে হয়নি। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মানুষ রমণীর হাতের চুড়ির অথবা পায়ের নূপুরের শব্দ শুনে, অথবা কেবল তার শাড়ি দেখে কামোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তা থেকে বোঝা যায় যে, নারী হচ্ছে মায়ার পূর্ণ প্রতিনিধি। বিশ্বামিত্র মুনি যদিও চক্ষু মুদ্রিত করে যোগসাধনা করছিলেন, তবুও মেনকার কঙ্কণের ধ্বনিতে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়। এইভাবে বিশ্বামিত্র মুনি মেনকার সৌন্দর্যের শিকার হয়েছিলেন এবং তার ফলে বিশ্ববিশ্রুতা শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ, নারীর আকর্ষণ থেকে স্বর্গের দেবতা এবং উচ্চতর লোকের অধিবাসীরাও নিজেদের রক্ষা করতে পারেন না। ভগবানের ভক্তই কেবল, যিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হয়েছেন, তিনি রমণীর আকর্ষণ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণেব দ্বারা আকৃষ্ট হন, তখন এই জগতের মায়াশক্তি আর তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

শ্লোক ১৩

প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রাঃ শতদ্রুত্যাং দশাভবন্ ।
তুল্যনামব্রতাঃ সর্বে ধর্মস্নাতাঃ প্রচেতসঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাচীনবর্হিষঃ—মহারাজ প্রাচীন বর্হির; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **শতদ্রুত্যাম্**—শতদ্রুতির গর্ভে; **দশ**—দশ; **অভবন্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **তুল্য**—সমানভাবে; **নাম**—নাম; **ব্রতাঃ**—ব্রত; **সর্বে**—সকলে; **ধর্ম**—ধর্ম; **স্নাতাঃ**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; **প্রচেতসঃ**—তাঁদের সকলেরই নাম ছিল প্রচেতা।

অনুবাদ

মহারাজ প্রাচীনবর্হি শতদ্রুতির গর্ভে দশটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই সমানভাবে ধর্মপরায়ণ ছিলেন, এবং তাঁদের সকলেরই নাম ছিল প্রচেতা।

তাৎপর্য

ধর্মস্নাতাঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দশটি পুত্রই ধর্ম অনুষ্ঠানে মগ্ন ছিলেন। অধিকন্তু তাঁরা সকলে সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন মানুষকে তখনই সার্থক বলে মনে করা হয়, যখন তাঁরা পূর্ণরূপে ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানবান, ও সৎ চরিত্রবান হন সমস্ত প্রচেতারা সমানরূপে সিদ্ধ ছিলেন।

শ্লোক ১৪

পিত্রাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে তপসেহর্ণবমাবিশন্ ।
দশবর্ষসহস্রাণি তপসার্চংস্তপস্পতিম্ ॥ ১৪ ॥

পিত্রা—পিতার দ্বারা; **আদিষ্টাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **প্রজা-সর্গে**—সন্তান উৎপাদনের বিষয়ে; **তপসে**—তপস্যা করার জন্য; **অর্ণবম্**—সমুদ্রে; **আবিশন্**—প্রবেশ করেছিলেন; **দশ-বর্ষ**—দশ বছর; **সহস্রাণি**—হাজার; **তপসা**—তাঁদের তপস্যার দ্বারা; **আর্চন্**—আরাধনা করেছিলেন; **তপঃ**—তপস্যার; **পতিম্**—প্রভুকে।

অনুবাদ

বিবাহ করে সন্তান উৎপাদনের জন্য পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, প্রচেতারা সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সমস্ত তপস্যাব পতি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও মহান ঋষি ও তপস্বীরা এই পৃথিবীর সোরগোল থেকে দূরে নির্জন স্থানে বাস কবার উদ্দেশ্যে হিমালয় পর্বতে যান। কিন্তু, এখানে মনে হচ্ছে যে, নির্জন স্থানে তপস্যা করাব জন্যই প্রাচীনবর্হিব পুত্র প্রচেতারা সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করেছিলেন। যেহেতু তাঁরা দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন, তাই এই ঘটনা ঘটেছিল সত্যযুগে, যখন মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর। তাঁরা যে তপপতি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য তপস্যা করেছিলেন, সেই বিষয়টিও লক্ষণীয়। কেউ যদি জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য তপশ্চর্যা

করেন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হতে হবে। পক্ষান্তরে, কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধ স্তর প্রাপ্ত হতে না পারে, তা হলে সমস্ত তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন অর্থহীন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত সর্বোচ্চ ফল লাভ করা যায় না। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাং সর্ব-লোক-মহেশ্বরম্*। তাই তপস্যার বাঞ্ছিত ফল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৩৩/৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

কেউ যদি মানব-সমাজের সব চাইতে নিকৃষ্ট চণ্ডালকুলেও জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি যদি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি ধন্য, কারণ বুঝতে হবে যে, যাঁর জিহ্বাগ্রে ভগবানের নাম বিরাজ করে, তিনি তাঁর পূর্বজন্মে সব রকম তপস্যা অনুষ্ঠান করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় যিনি মহামন্ত্র (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) কীর্তন করেন, তিনি সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ করবেন, যা পূর্বে মানুষেরা সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করার ফলে প্রাপ্ত হতেন। এই কলিযুগে, যদি কেউ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সুযোগ গ্রহণ না করেন, যা এই যুগে অধঃপতিত মানুষদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন।

শ্লোক ১৫

যদুক্তং পথি দৃষ্টেন গিরিশেন প্রসীদতা ।
তদ্ধ্যায়ন্তো জপন্তশ্চ পূজয়ন্তশ্চ সংযতাঃ ॥ ১৫ ॥

যৎ—যা; **উক্তম্**—বলা হয়েছে; **পথি**—পথে; **দৃষ্টেন**—সাক্ষাৎ করার সময়, **গিরিশেন**—শিবের দ্বারা; **প্রসীদতা**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **তৎ**—তা; **ধ্যায়ন্তঃ**—ধ্যান করে; **জপন্তঃ চ**—জপ করেও; **পূজয়ন্তঃ চ**—পূজা করেও; **সংযতাঃ**—অত্যন্ত সংযমপূর্বক।

অনুবাদ

যখন প্রাচীনবর্হির সমস্ত পুত্র তপস্যা করার জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে মহাদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক তাঁদের পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছিলেন। প্রাচীনবর্হির পুত্ররা অত্যন্ত সাবধানতা ও মনোযোগ সহকারে তা কীর্তন ও উপাসনা করে সেই উপদেশের ধ্যান করেছিলেন।

তাৎপর্য

তপস্যা করার জন্য অথবা কৃচ্ছ্রসাধন করার জন্য, কিংবা যে-কোন প্রকার ভক্তি অনুষ্ঠান করার জন্য যে গুরুদেবের পথ প্রদর্শনের আবশ্যকতার প্রয়োজন হয়, তা এখানে স্পষ্ট হয়েছে। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহারাজ প্রাচীনবর্হির দশজন পুত্র শিবের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং শিব অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে তাঁদের তপস্যা করার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শিব সেই দশজন প্রচেতার গুরু হয়েছিলেন, এবং তাঁর শিষ্যরূপে তাঁরা এত নিষ্ঠা সহকারে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন যে, কেবল সেই উপদেশের উপর ধ্যান করার ফলে (*ধ্যায়ন্তঃ*) তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এটিই হচ্ছে সাফল্য লাভের রহস্য। দীক্ষালাভের পর গুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে, শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে অনন্যচিত্ত হয়ে গুরুদেবের সেই আদেশ অথবা উপদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করা, এবং কোন কিছুর দ্বারা বিচলিত না হওয়া। এটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরেরও অভিমত, যিনি *ভগবদ্গীতার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪১) শ্লোকটির অর্থ বিশ্লেষণ করার সময় বলেছেন যে, শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিষ্যের কাছে প্রাণতুল্য। শিষ্যের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে কি না সেই সম্বন্ধে চিন্তা না করে, কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা। এইভাবে শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা শ্রীগুরুদেবের আদেশের ধ্যান করা, এবং সেটিই হচ্ছে ধ্যানের পূর্ণতা। তাঁর আদেশের ওপর কেবল ধ্যান করাই নয়, কিভাবে তা পূর্ণরূপে আরাধনা করা যায় এবং সম্পাদন করা যায়, তার উপায় অনুসন্ধান করাও তার কর্তব্য।

শ্লোক ১৬

বিদুর উবাচ

প্রচেতসাং গিরিত্রেণ যথাসীৎপথি সঙ্গমঃ ।
যদুতাহ হরঃ প্রীতস্তন্নো ব্রহ্মন্ বদার্থবৎ ॥ ১৬ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন; **প্রচেতসাম্**—প্রচেতাদের; **গিরিত্রেণ**—মহাদেবের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **আসীৎ**—ছিল; **পথি**—পথে; **সঙ্গমঃ**—সাক্ষাৎ; **যৎ**—যা; **উত আহ**—বলেছিলেন; **হরঃ**—মহাদেব; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **তৎ**—তা; **নঃ**—আমাদের; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **বদ**—বলুন; **অর্থ-বৎ**—অর্থ প্রকাশ করে।

অনুবাদ

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ! প্রচেতাদের সঙ্গে শিবের সাক্ষাৎ হয়েছিল কেন? দয়া করে বলুন কিভাবে সেই সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিভাবে শিব তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং কিভাবে তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দয়া করে আমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে, সেই কথা আমাকে বলুন।

তাৎপর্য

যখনই ভক্তের সঙ্গে ভগবানেব অথবা ভগবানের মহান ভক্তদের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়, তখন তা শ্রবণ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া উচিত। নৈমিষারণ্যের সভায়, যেখানে সূত গোস্বামী সমস্ত মহান ঋষিদের *শ্রীমদ্ভাগবত* শুনিয়েছিলেন, সেখানেও সূত গোস্বামীকে মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শুকদেব গোস্বামীর মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কারণ মহর্ষিরা জানতেন যে, শুকদেব গোস্বামী ও পরীক্ষিৎ মহারাজের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, তা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই যেমন পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার জন্য *ভগবদ্গীতার* বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তেমনই বিদুরও মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে শিব ও প্রচেতাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ছিলেন।

শ্লোক ১৭

সঙ্গমঃ খলু বিপ্রর্ষে শিবেনেহ শরীরিণাম্ ।
দুর্লভো মুনয়ো দধ্যুরসঙ্গাদ্যমভীপ্সিতম্ ॥ ১৭ ॥

সঙ্গমঃ—সঙ্গ; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **বিপ্র-ঋষে**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **শিবেন**—শিবসহ; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **শরীরিণাম্**—যারা জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ; **দুর্লভঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **দধ্যুঃ**—ধ্যানপরায়ণ হয়েছিলেন; **অসঙ্গাৎ**—অন্য সব কিছু থেকে বিরক্ত হয়ে; **যম্**—যাঁকে; **অভীপ্সিতম্**—বাসনা করে।

অনুবাদ

মহর্ষি বিদুর বললেন—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের পক্ষে শিবের সাক্ষাৎ লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। এমন কি সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত এবং শিবের সঙ্গলাভের জন্য সর্বদা তাঁর ধ্যানে মগ্ন মহান ঋষিরাও তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারেন না।

তাৎপর্য

যেহেতু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে, দেবাদিব মহাদেব এই জগতে অবতরণ করেন না, তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁকে আদেশ দেন, তখন সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে শিব অবতরণ করেন। এই সম্পর্কে *পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে যে, কলিযুগে শিব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপ মায়াবাদ দর্শন প্রচার করার জন্য, ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। *পদ্ম পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্তিনা ॥

শিব পার্বতীদেবীকে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন যে, বৌদ্ধদর্শন নিরসন করার জন্য, তিনি ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীর বেশে মায়াবাদ-দর্শন প্রচার করবেন। এই সন্ন্যাসী হচ্ছেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য। বৌদ্ধ-দর্শনের প্রভাব পরাস্ত করে বেদান্ত-দর্শন প্রচার করার জন্য, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যকে বৌদ্ধ-দর্শনের সঙ্গে কিছু আপস মীমাংসা করতে হয়েছিল, এবং তার ফলে তিনি কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। কারণ সেই সময় এর প্রয়োজন ছিল। তা না হলে মায়াবাদ দর্শন প্রচার করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এখন মায়াবাদ-দর্শন অথবা বৌদ্ধ-দর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই দুটিকেই বর্জন করেছেন শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন প্রচার করছে, এবং উভয় প্রকার মায়াবাদীদের দর্শনই বর্জন করেছে। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধদর্শন ও শঙ্করাচার্যের দর্শন, উভয়ই হচ্ছে জড়-জাগতিক স্তরে মায়াবাদের বিভিন্ন রূপ। এই দুটি দর্শনেরই কোন রকম আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য নেই। *ভগবদ্গীতার* দর্শন, যার চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া, তা গ্রহণ করার পরেই কেবল আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের সূচনা হয়। মানুষ সাধারণত শিবের পূজা করে জড়-জাগতিক লাভের জন্য, এবং যদিও তারা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করতে পারে না, তবুও তাঁর পূজা করার ফলে তাদের অনেক জড়-জাগতিক লাভ হয়।

শ্লোক ১৮

আত্মারামোঽপি যস্ত্বস্য লোককল্পস্য রাধসে ।
শক্ত্যা যুক্তো বিচরতি ঘোরয়া ভগবান্ ভবঃ ॥ ১৮ ॥

আত্ম-আরামঃ—আত্মতৃপ্ত; **অপি**—যদিও; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **অস্য**—এই; **লোক**—জড় জগৎ; **কল্পস্য**—যখন প্রকাশিত হয়; **রাধসে**—এর অস্তিত্বের সহায়তা করার জন্য; **শক্ত্যা**—শক্তি; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **বিচরতি**—কার্য করে; **ঘোরয়া**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **ভগবান্**—ভগবান; **ভবঃ**—শিব।

অনুবাদ

ভগবান শিব হচ্ছেন সব চাইতে শক্তিশালী দেবতা, যাঁর স্থান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরেই। তিনি আত্মারাম। যদিও এই জড় জগতে কোন বস্তুর প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই, তবুও বদ্ধ জীবদের কল্যাণের জন্য, তিনি সর্বদা কালী ও দুর্গা আদি ভয়ঙ্কর শক্তিসহ সর্বত্র বিচরণ করেন।

তাৎপর্য

শিবকে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলা হয়। তিনি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠরূপে পরিচিত (*বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*)। তার ফলে শিবের একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে, যা রুদ্র-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ব্রহ্ম-সম্প্রদায় যেমন ব্রহ্মা থেকে আসছে, তেমনই রুদ্র-সম্প্রদায় শিব থেকে আসছে। শিব হচ্ছেন দ্বাদশ মহাজনদের অন্যতম। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৩/২০) উল্লেখ করা হয়েছে—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

এই বারোজন হচ্ছেন ভগবানের বাণীর প্রচারক মহাজন। শম্ভু হচ্ছে শিবের একটি নাম। তাঁর সম্প্রদায় বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় নামেও পরিচিত, এবং বর্তমান বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় বল্লভ-সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। বর্তমান ব্রহ্ম-সম্প্রদায় মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় নামে পরিচিত। শিব যদিও মায়াবাদ-দর্শন প্রচার করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্যরূপে তাঁর লীলার শেষে, তিনি বৈষ্ণব-দর্শন প্রচার করেছেন—*ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে* । তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দের আরাধনার উপর জোর দিয়েছেন। এই শ্লোকে তিনবার

সেই কথা বলে, বিশেষভাবে তাঁর অনুগামীদের তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে, কেবলমাত্র বাক্যবিন্যাস ও ব্যাকরণের ধাঁধাঁর দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। কেউ যদি প্রকৃতই মুক্তিলাভে আকাঙ্ক্ষী হন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে। সেটিই হচ্ছে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অন্তিম উপদেশ।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিব সর্বদাই তাঁর জড় শক্তি (*শক্ত্যা ঘোরয়া*) সহ থাকেন। মহামায়া—দুর্গা অথবা কালী—সর্বদাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। দুর্গা ও কালী সমস্ত অসুরদের সংহার করে তাঁর সেবা করেন। কখনও কখনও কালী এত ক্রোধান্বিতা হন যে, তিনি নির্বিচারে সমস্ত অসুরদের সংহার করতে থাকেন। বহুল প্রচলিত কালীর একটি ছবিতে দেখা যায় যে, তিনি অসুরদের মস্তকের মালা পরিহিতা এবং তাঁর বাঁ হাতে একটি নরমুণ্ড এবং ডান হাতে অসুর সংহার করার জন্য খড়্গ। মহাযুদ্ধ হচ্ছে কালীর অসুর সংহারকারী রূপের প্রতীক।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন-শক্তিরেকা (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪৪)

অসুরেরা জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা দুর্গা অথবা কালীর পূজা করার দ্বারা তাঁদের প্রসন্ন রাখতে চেষ্টা করে. কিন্তু অসুরেরা যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন কালী কোন রকম বিচার না করে ব্যাপকভাবে তাদের সংহার করতে শুরু করেন। অসুরেরা শিবের শক্তির রহস্য জানে না, এবং তাই জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে তারা কালী, দুর্গা অথবা শিবের পূজা করে। তাদের আসুরিক স্বভাবের জন্য তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে চায় না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) বলা হয়েছে—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

শিবের কার্য অত্যন্ত কঠিন, কারণ তাঁকে দুর্গা অথবা কালীর শক্তিকে কাজে লাগাতে হয়। আর একটি বহুল প্রচলিত কালীর ছবিতে দেখা যায় যে, তিনি শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। তা ইঙ্গিত করে যে, অসুর সংহার-কার্য থেকে কালীকে নিরস্ত করার জন্য কখনও কখনও শিবকে মাটিতে শুয়ে থাকতে হয়। শিব যেহেতু মহামায়া (দুর্গাদেবীকে) নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই শিবের উপাসকেরা এই জড় জগতে অত্যন্ত ঐশ্বর্যমণ্ডিত পদ প্রাপ্ত হন। শিবের পরিচালনায়, শিবের উপাসকেরা সব রকম জড়-জাগতিক সুবিধা লাভ করেন। তার বিপরীত, বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব ক্রমশ নির্ধন হয়ে যান, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়তে দেন না। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ভক্তদের অন্তর থেকে

বুদ্ধিদান করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) বলা হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর আমার ভক্তিতে রত থেকে প্রেমপূর্বক আমার পূজা করে, তাদের আমি বুদ্ধি প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে আসতে পারে।"

এইভাবে ভগবান বিষ্ণু তাঁর ভক্তদের বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে ভক্তরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারেন। ভক্তের যেহেতু কোন প্রকার জড় বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তাই তিনি কালী অথবা দুর্গার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসেন না।

শিব এই জড় জগতের তমোগুণেরও অধ্যক্ষ। শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর শক্তি দুর্গাদেবী সমস্ত জীবদের অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখেন (*যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা*)। ব্রহ্মা ও শিব উভয়েই বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্টিকার্যের অধ্যক্ষ আর শিব হচ্ছেন সংহার কার্যের অধ্যক্ষ। শিব তাঁর সেই কার্য সম্পাদন করেন তাঁর শক্তি কালী অথবা দুর্গার সহায়তায়। তাই এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিব তাঁর ভয়ঙ্কর শক্তি (*শক্ত্যা ঘোরয়া*) সহ থাকেন, এবং সেটিই হচ্ছে শিবের প্রকৃত স্থিতি।

শ্লোক ১৯

মৈত্রেয় উবাচ

প্রচেতসঃ পিতুর্বাক্যং শিরসাদায় সাধবঃ ।
দিশং প্রতীচীং প্রযযুস্তপস্যাদৃতচেতসঃ ॥ ১৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **প্রচেতসঃ**—মহারাজ প্রাচীনবর্হির সমস্ত পুত্রেরা; **পিতুঃ**—পিতার; **বাক্যম্**—বাক্য; **শিরসা**—মস্তকে; **আদায়**—ধারণ করে; **সাধবঃ**—সমস্ত পবিত্র; **দিশম্**—দিক; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম; **প্রযযুঃ**—গিয়েছিলেন; **তপসি**—তপস্যায়; **আদৃত**—নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করে; **চেতসঃ**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর। সাধু চরিত্র প্রচেতারা তাঁদের পিতা প্রাচীনবর্হির বাক্য শিরোধার্য করে পিতার আদেশ পালন করার জন্য পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সাধবঃ* শব্দটি (যার অর্থ হচ্ছে 'পবিত্র' অথবা 'সদাচারী') অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে। এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে *সাধু* শব্দ থেকে। প্রকৃত *সাধু* হচ্ছেন তিনি, যিনি সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন। প্রাচীনবর্হির পুত্রদের *সাধবঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তাঁদের পিতার বাধ্য ছিলেন। পিতা, রাজা ও গুরুকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়, এবং তাই তাঁদের ভগবানেরই মতো সম্মান করতে হয়। পিতা, গুরু ও রাজার কর্তব্য হচ্ছে, তাঁদের অধীনস্থদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত যে, চরমে তাঁরা যেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন। সেটিই হচ্ছে গুরুজনের কর্তব্য এবং অধীনস্থের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁদের সেই আদেশ পালন করা। *শিরসা* ('শিরোধার্য করে') শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ প্রচেতারা তাঁদের পিতার নির্দেশ শিরোধার্য করেছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা বিনয়াবনত চিত্তে তা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

সসমুদ্রমুপ বিস্তীর্ণমপশ্যন্ সুমহৎসরঃ ।
মহন্মন ইব স্বচ্ছং প্রসন্নসলিলাশয়ম্ ॥ ২০ ॥

স-সমুদ্রম্—সমুদ্রের নিকটে; **উপ**—প্রায়; **বিস্তীর্ণম্**—অত্যন্ত প্রশস্ত ও দীর্ঘ; **অপশ্যন্**—তাঁরা দেখেছিলেন; **সু-মহৎ**—অতি বিশাল; **সরঃ**—সরোবর; **মহৎ**—মহাত্মা; **মনঃ**—মন; **ইব**—সদৃশ; **সু-অচ্ছম্**—নির্মল; **প্রসন্ন**—আনন্দময়; **সলিল**—জল; **আশয়ম্**—আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

এইভাবে ভ্রমণ করার সময়, প্রচেতারা এক বিশাল সরোবর দর্শন করলেন, যা প্রায় সমুদ্রের মতো বিস্তৃত ছিল। সেই সরোবরের জল ছিল মহাত্মাদের নির্মল অন্তঃকরণের মতো স্বচ্ছ, এবং জলচরেরা এত বড় জলাশয়ের শরণ গ্রহণ করার ফলে, তাদের অত্যন্ত শান্ত ও প্রসন্ন বলে প্রতীত হয়েছিল।

তাৎপর্য

স-সমুদ্র শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সমুদ্রের সন্নিকটে'। সেই জলাশয়টি ছিল একটি উপসাগরের মতো, কারণ তা সমুদ্র থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। উপ শব্দটির

অর্থ হচ্ছে 'প্রায়', এবং এই শব্দটি বহুভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন *উপপতি*, যা ইঙ্গিত করে 'প্রায় পতির মতো', অর্থাৎ যেই প্রেমিক পতির মতো আচরণ করে। *উপ* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'বড়', 'ছোট' অথবা 'নিকটে'। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে, সেই জলাশয়টি ছিল একটি বিশাল উপসাগর বা সরোবর। কিন্তু সেটি সমুদ্রের মতো তরঙ্গসংকুল ছিল না, পক্ষান্তরে তা ছিল অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ। সেই সরোবরের জল ছিল মহাত্মাদের মনের মতো স্বচ্ছ। অনেক মহাত্মা হতে পারে—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তদেরও বলা হয় মহাত্মা—তবে তাঁরা অত্যন্ত দুর্লভ। যোগী ও জ্ঞানীদের মধ্যে বহু মহাত্মা দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত মহাত্মা হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, যিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত, তিনি অত্যন্ত দুর্লভ (*স মহাত্মা সুদুর্লভঃ, ভগবদ্গীতা* ৭/১৯)। ভক্তের মন সর্বদাই শান্ত, স্নিগ্ধ ও বাসনাশূন্য, কারণ তিনি সর্বদাই *অন্যাভিলাষিতা-শূন্যম্*। ভৃত্যরূপে, সখারূপে, পিতারূপে, মাতারূপে অথবা প্রেয়সীরূপে ভগবানের সেবা করা ছাড়া তাঁর আর কোন বাসনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের ফলে, ভক্ত সর্বদাই অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ। সেই সরোবরের জলচর প্রাণীরাও যে অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ ছিল, তাও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ভগবদ্ভক্তের শিষ্য যেহেতু একজন মহাত্মার শরণ গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি সর্বদাই অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ, এবং তিনি কখনও ভব-সাগরের তরঙ্গের দ্বারা বিচলিত হন না।

এই জড় জগতকে প্রায়ই অজ্ঞানের সমুদ্র বলা হয়। এই সাগরে [illegible] বিক্ষুব্ধ। মহান ভগবদ্ভক্তের মনও একটি সমুদ্র বা বিশাল সরোবরের মতো ছিল, তাতে কোন রকম বিক্ষোভ নেই। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪১) বলা হয়েছে—*ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন*। যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা কখনও কোন কিছুর দ্বারা বিচলিত হন না। *ভগবদ্গীতায়* (৬/২২) আরও বলা হয়েছে *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে*। যদি জীবনে দুঃখদুর্দশা আসেও, তবুও ভক্ত কখনও বিচলিত হন না। তাই কেউ যখন মহাত্মা অথবা মহান ভগবদ্ভক্তের শরণাগত হন, তখন তিনি শান্ত হয়ে যান। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* (*মধ্য* ১৯/১৪৯) বলা হয়েছে—*কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'*। কিন্তু যোগী, কর্মী ও জ্ঞানীরা সর্বদাই বহু বাসনায় পূর্ণ, তাই তারা অশান্ত। কেউ তর্ক করতে পারে যে, ভক্তদেরও তো বাসনা রয়েছে, কারণ তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু এই প্রকার বাসনা মনকে বিচলিত করে না। ভক্ত যদিও ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তবুও ভগবদ্ভক্ত জীবনের যে-কোন পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাই, এই শ্লোকে *মহন্মনঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, সেই সরোবরের জল মহান ভগবদ্ভক্তের মনের মতো শান্ত ও স্নিগ্ধ ছিল।

শ্লোক ২১

নীলরক্তোৎপলাম্ভোজকহ্লারেন্দীবরাকরম্ ।
হংসসারসচক্রাহ্বকারণ্ডবনিকূজিতম্ ॥ ২১ ॥

নীল—নীল; **রক্ত**—লাল; **উৎপল**—পদ্ম; **অম্ভঃ-জ**—জলজাত; **কহ্লার**—এক প্রকার পদ্ম; **ইন্দীবর**—আর এক প্রকাব পদ্ম; **আকরম্**—খনি; **হংস**—হংস; **সারস**—সারস; **চক্রাহ্ব**—চক্রবাক; **কারণ্ডব**—কারণ্ডব পক্ষী; **নিকূজিতম্**—কূজনের দ্বারা মুখরিত।

অনুবাদ

সেই বিশাল সরোবরে নানা প্রকার পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাদের কোনটির রঙ নীল, কোনটির রঙ লাল, কোনটি রাত্রে প্রস্ফুটিত হয়, কোনটি দিনের বেলা প্রস্ফুটিত হয়, আবার কোনটি সন্ধ্যাবেলা প্রস্ফুটিত হয়। সেই সমস্ত ইন্দীবর, কহ্লার আদি পদ্মফুলে সেই সরোবরটি এমনভাবে পূর্ণ ছিল যে, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেটি একটি ফুলের আকর। আর সেই সরোবরের তীর হংস, সারস, চক্রবাক ও অন্যান্য পাখির কূজনে মুখরিত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *আকরম্* ('খনি') শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সেই সরোবরটিকে মনে হচ্ছিল যেন একটি পদ্মফুলের খনি, যেখান থেকে বিভিন্ন প্রকার পদ্মফুল উৎপন্ন হয়। তাদের কোনটি দিনের বেলা প্রস্ফুটিত হয়, কোনটি রাত্রে ও কোনটি সন্ধ্যায়, এবং সেই অনুসারে ও তাদের রঙ অনুসারে, তাদের বিভিন্ন নাম রয়েছে। সেই সমস্ত ফুলে সরোবরটি পূর্ণ ছিল, এবং যেহেতু সেই সরোববটি ছিল অত্যন্ত শান্ত ও নিস্তব্ধ এবং পদ্মফুলে পূর্ণ, এবং হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডব আদি পক্ষীরা তীরে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সুবে গান করছিল, তার ফলে সেই পরিবেশটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে যেমন বিভিন্ন প্রকার মানুষ রয়েছে, তেমনই বিভিন্ন প্রকার পক্ষী, পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি রয়েছে। সব কিছুই প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে বিভক্ত। হংস, সারস আদি পক্ষী, যারা স্বচ্ছ জলে বিচরণ করে এবং পদ্মফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করে, তারা নোংরা স্থানে আবর্জনাভোজী কাক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। তেমনই কিছু মানুষ রজ ও তমোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আবার কিছু মানুষ সত্ত্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সৃষ্টি এমনই বিচিত্র যে, প্রতিটি সমাজে সর্বদাই বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাই পদ্মফুলে পূর্ণ সেই বিশাল সরোবরের তটে সেই সুন্দর পরিবেশ উপভোগ করার জন্য উন্নত স্তরের পক্ষীরা বাস করত।

শ্লোক ২২

মত্তভ্রমরসৌস্বর্যহৃষ্টরোমলতাঙ্ঘ্রিপম্ ।
পদ্মকোশরজো দিক্ষু বিক্ষিপৎপবনোৎসবম্ ॥ ২২ ॥

মত্ত—উন্মত্ত; **ভ্রমর**—ভ্রমর; **সৌ-স্বর্য**—সুন্দর স্বরে গুঞ্জনবত; **হৃষ্ট**—আনন্দভরে; **রোম**—শরীরের লোম; **লতা**—বল্লরি; **অঙ্ঘ্রিপম্**—বৃক্ষ; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **কোশ**—কোশ; **রজঃ**—পরাগ; **দিক্ষু**—চতুর্দিকে; **বিক্ষিপৎ**—বিক্ষেপ করে, **পবন**—বায়ু; **উৎসবম্**—উৎসব।

অনুবাদ

সেই সরোবরের চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ ও লতা ছিল, এবং তাদের চারপাশে মত্ত ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছিল। ভ্রমরদের সেই মধুর গুঞ্জন শ্রবণ করে, সেখানকার গাছপালাগুলি যেন অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠেছিল, এবং তখন পদ্মফুলের পরাগ চতুর্দিকে বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তার ফলে সেখানে এক আনন্দময় মহোৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

তাৎপর্য

বৃক্ষ ও লতারাও এক প্রকার জীব। যখন ভ্রমরেরা মধু সংগ্রহ করার জন্য বৃক্ষ লতায় আসে, তখন তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত আনন্দিত হয়। বায়ুও সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে, পদ্মফুলের পরাগ চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। তার সঙ্গে তখন হংসের মধুর কলধ্বনি এবং সরোবরের শান্ত পরিবেশও মিলিত হয়। প্রচেতাদের কাছে তখন মনে হয়েছিল, সেই স্থানটিতে যেন এক নিরন্তর মহোৎসব হচ্ছে। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, প্রচেতারা শিবলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন, যা হিমালয় পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত।

শ্লোক ২৩

তত্র গান্ধর্বমাকর্ণ্য দিব্যমার্গমনোহরম্ ।
বিসিস্ম্যু রাজপুত্রাস্তে মৃদঙ্গপণবাদ্যনু ॥ ২৩ ॥

তত্র—সেখানে; **গান্ধর্বম্**—মধুর সঙ্গীতের ধ্বনি; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **দিব্য**—স্বর্গীয়; **মার্গ**—সুষম; **মনঃ-হরম্**—সুন্দর; **বিসিস্ম্যুঃ**—তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন; **রাজ-**

পুত্রাঃ—রাজা বর্হিষতের পুত্রগণ; **তে**—তাঁরা সকলে; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **পণব**—নাকাড়া; **আদি**—সব মিলে; **অনু**—সর্বদা।

অনুবাদ

রাজপুত্রেরা যখন মৃদঙ্গ ও পণবসহ অত্যন্ত সুমধুর রাগরাগিণীর ধ্বনি শুনতে পেলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সরোবরের সন্নিকটে বিভিন্ন ফুল ও প্রাণী ছাড়াও সেখানে অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীতের ধ্বনিও শোনা গিয়েছিল। এই দৃশ্যের তুলনায় নির্বিশেষবাদীদের বৈচিত্র্যহীন শূন্য নিতান্তই অপ্রীতিকর। সৎ-চিৎ-আনন্দময়ত্ব লাভই হচ্ছে জীবের প্রকৃত সিদ্ধি। নির্বিশেষবাদীরা যেহেতু সৃষ্টির বৈচিত্র্য অস্বীকার করে, তাই তারা প্রকৃতপক্ষে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। প্রচেতারা যে স্থানটিতে এসেছিলেন, তা ছিল শিবের ধাম। নির্বিশেষবাদীরা সাধারণত শিবের পূজা করে, কিন্তু শিব তাঁর ধামে কখনই বৈচিত্র্যবিহীন নন। এইভাবে মানুষ যেখানেই যায়, তা শিবলোক হোক, বিষ্ণুলোক হোক অথবা ব্রহ্মলোক হোক, পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দের বৈচিত্র্য সেখানে থাকবে।

শ্লোক ২৪-২৫

তর্হ্যেব সরসস্তস্মান্নিষ্ক্রামন্তং সহানুগম্ ।
উপগীয়মানমমরপ্রবরং বিবুধানুগৈঃ ॥ ২৪ ॥
তপ্তহেমনিকায়াভং শিতিকণ্ঠং ত্রিলোচনম্ ।
প্রসাদসুমুখং বীক্ষ্য প্রণেমুর্জাতকৌতুকাঃ ॥ ২৫ ॥

তর্হি—তখনই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সরসঃ**—জল থেকে; **তস্মাৎ**—সেখান থেকে; **নিষ্ক্রামন্তম্**—বেরিয়ে আসছেন; **সহ-অনুগম্**—মহাত্মাগণ-সহ; **উপগীয়মানম্**—অনুগামীদের দ্বারা বন্দিত; **অমর-প্রবরম্**—দেবতাদের মধ্যে প্রধান; **বিবুধ-অনুগৈঃ**—তাঁর অনুচরগণ-সহ; **তপ্ত-হেম**—গলিত সোনা; **নিকায়-আভম্**—তাঁর গায়ের রঙ; **শিতি-কণ্ঠম্**—নীলকণ্ঠ; **ত্রি-লোচনম্**—তিন চক্ষুবিশিষ্ট; **প্রসাদ**—কৃপাময়; **সু-মুখম্**—সুন্দর মুখমণ্ডল; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **প্রণেমুঃ**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **জাত**—উৎপন্ন হয়েছিল; **কৌতুকাঃ**—কৌতূহল হয়েছিল।

অনুবাদ

প্রচেতারা তাঁদের সৌভাগ্যক্রমে দেবশ্রেষ্ঠ শিবকে তাঁর পার্ষদগণ-সহ জল থেকে উত্থিত হতে দেখলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল ঠিক তপ্ত কাঞ্চনের মতো, তাঁর কণ্ঠ ছিল নীলাভ, এবং তাঁর তিনটি চক্ষু ছিল, এবং তিনি অত্যন্ত কৃপাপূর্ণ নয়নে তাঁর ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন। তাঁর অনুগামী গন্ধর্বাদি সংগীতজ্ঞেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন। শিবকে দর্শন করে প্রচেতারা অত্যন্ত কৌতূহল-বিশিষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁকে তৎক্ষণাৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিবুধানুগৈঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, শিবের সঙ্গে গন্ধর্ব, কিন্নর আদি উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা সর্বদা থাকেন। তাঁরা সকলে সঙ্গীত-বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী, এবং শিব সর্বদা তাঁদের দ্বারা পূজিত হন। ছবিতে সাধারণত শিবকে শ্বেতবর্ণ রূপে দেখানো হয়, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর গায়ের রং ঠিক সাদা নয়, তা ছিল তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ বা উজ্জ্বল পীতবর্ণের মতো। যেহেতু শিব সর্বদাই অত্যন্ত কৃপালু, তাই তাঁর আর এক নাম আশুতোষ। সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শিবকে নিম্নবর্ণের লোকেরাও প্রসন্ন করতে পারে। কেবল বিল্বপত্র ও প্রণতি নিবেদন করার মাধ্যমে তাঁর প্রসন্নতা-বিধান করা যায়। তিনি অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হন বলে, তাঁর নাম আশুতোষ।

যারা সাধারণত জড়-জাগতিক উন্নতি কামনা করে, তারা তাদের ঈপ্সিত বরলাভের জন্য শিবের কাছে যায়। মহাদেব অত্যন্ত কৃপালু বলে, তিনি অতি শীঘ্র তাঁর ভক্তদের মনোবাসনা অনুসারে বরদান করেন। অসুরেরা শিবের এই উদারতার সুযোগ নেয় এবং কখনও কখনও তারা শিবের কাছ থেকে এমন বর প্রাপ্ত হয়, যা অন্যদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যেমন, বৃকাসুর শিবের থেকে বর নিয়েছিল যে, সে কারও মস্তক স্পর্শ করা মাত্রই তার মৃত্যু হবে। শিব যদিও কখনও কখনও অত্যন্ত উদারতাপূর্বক তাঁর ভক্তদের বরদান করেন, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে যে, অত্যন্ত ধূর্ত অসুরেরা অন্যায়ভাবে এই বর পরীক্ষা করে দেখতে চায়। যেমন, বৃকাসুর তার অভিলষিত বর প্রাপ্ত হওয়ার পর, শিবের মস্তক স্পর্শ করতে চেয়েছিল। কিন্তু, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্তরা কখনও এই প্রকার বর আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং ভগবান বিষ্ণুও তাঁর ভক্তদের কখনও এমন বরদান করেন না, যা সারা পৃথিবী জুড়ে অশান্তি সৃষ্টি করে।

শ্লোক ২৬

স তান্ প্রপন্নার্তিহরো ভগবান্ধর্মবৎসলঃ ।
ধর্মজ্ঞান্ শীলসম্পন্নান্ প্রীতঃ প্রীতানুবাচ হ ॥ ২৬ ॥

সঃ—শ্রীশিব; **তান্**—তাঁদের; **প্রপন্ন-আর্তি-হরঃ**—যিনি শরণাগতদের সন্তাপ দূর করেন; **ভগবান্**—প্রভু; **ধর্ম-বৎসলঃ**—ধর্মপরায়ণ; **ধর্ম-জ্ঞান্**—ধর্মনীতি সম্বন্ধে যাঁরা অবগত; **শীল-সম্পন্নান্**—অত্যন্ত সদাচারী; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রীতান্**—অত্যন্ত ভদ্র আচরণ; **উবাচ**—তাঁদের বলেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

ভগবান শিব প্রচেতাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি সাধারণত পুণ্যবান ও সদাচারী ব্যক্তিদের রক্ষক। রাজকুমারদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা কৃষ্ণ ভক্তবৎসল নামে পরিচিত, এবং এখানে শিবকে *ধর্মবৎসল* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ধর্মবৎসল* বলতে তাঁদের বোঝায়, যাঁরা ধর্মের নিয়ম অনুসারে জীবন যাপন করেন। তা সত্ত্বেও, এই দুটি শব্দের অতিরিক্ত মাহাত্ম্য রয়েছে। কখনও কখনও শিবকে রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়। এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদা খুব একটা ধর্মপরায়ণ হয় না এবং তাদের কার্যকলাপও পবিত্র নয়, কিন্তু যেহেতু তারা জড়-জাগতিক লাভের আশায় শিবের পূজা করে, তাই তারা কখনও কখনও ধর্মের অনুশাসন পালন করে। শিব যখনই দেখেন যে তাঁর ভক্তেরা ধর্মের নিয়ম পালন করছে, তখন তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন। প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতারা স্বভাবতই অত্যন্ত পুণ্যবান ও স্নিগ্ধ ছিলেন, এবং তার ফলে শিব তৎক্ষণাৎ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। শিব বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রাজকুমারেরা ছিলেন বৈষ্ণবের সন্তান, এবং তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীরুদ্র উবাচ

যূয়ং বেদিষদঃ পুত্রা বিদিতং বশ্চিকীর্ষিতম্ ।
অনুগ্রহায় ভদ্রং ব এবং মে দর্শনং কৃতম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-রুদ্রঃ উবাচ—শিব বললেন; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **বেদিষদঃ**—মহারাজ প্রাচীনবর্হির; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **বিদিতম্**—জেনে; **বঃ**—তোমাদের; **চিকীর্ষিতম্**—বাসনা, **অনুগ্রহায়**—তোমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভদ্রম্**—তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক, **বঃ**—তোমরা সকলে; **এবম্**—এইভাবে, **মে**—আমার; **দর্শনম্**—দর্শন; **কৃতম্**—তোমরা করেছ।

অনুবাদ

শিব বললেন—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্রগণ! তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। আমি জানি তোমরা কি করতে চাও, এবং তাই তোমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আমি তোমাদের গোচরীভূত হয়েছি।

তাৎপর্য

এই উক্তির দ্বারা শিব ইঙ্গিত করেছেন যে, রাজপুত্রেরা যে কি করতে যাচ্ছিলেন, সেই সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে যাচ্ছিলেন। সেই কথা অবগত হয়ে, তৎক্ষণাৎ শিব তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, যা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হবে। তা ইঙ্গিত করে যে, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হননি, কিন্তু ভগবানের সেবা করার অভিলাষী, তিনি দেবাদিদেব মহাদেব প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ করবেন। তাই ভক্তকে পৃথকভাবে দেবতাদের প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে হয় না। কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার দ্বারা ভগবদ্ভক্ত তাঁদের সকলকে প্রসন্ন করতে পারেন। ভক্তকে দেবতাদের কাছ থেকে কোন রকম জড় জাগতিক বর প্রার্থনা করতে হয় না, কারণ ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হয়ে দেবতারা তাঁর যা কিছু প্রয়োজন তা সবই প্রদান করেন। দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের সেবক, এবং তাঁরা সর্বদাই সমস্ত পরিস্থিতিতে ভক্তদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন। তাই শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যখন ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ হন, তখন দেবতাদের কাছ থেকে জড় ঐশ্বর্য প্রাপ্তির কি আর কথা, মুক্তিদেবী স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হয়ে, তাঁদের সেবা করার সুযোগের প্রতীক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দেবতারাই ভগবদ্ভক্তের সেবা করার সুযোগের প্রতীক্ষা করছেন। তার ফলে কৃষ্ণভক্তকে কখনও জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য অথবা মুক্তির জন্য কোন রকম প্রয়াস করতে হয় না। ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হয়ে তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সমস্ত লাভ প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২৮

যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ২৮ ॥

যঃ—যে-কেউ; **পরম্**—চিন্ময়; **রংহসঃ**—নিয়ন্তার; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ত্রি-গুণাৎ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে, **জীব-সংজ্ঞিতাৎ**—জীব নামক; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **প্রপন্নঃ**—শরণাগত; **সঃ**—তিনি; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **হি**—নিঃসন্দেহে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীশিব বললেন—যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতি ও জীব আদি সব কিছুর নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

শ্রীশিব যে কেন রাজকুমারদের সমক্ষে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই কথা এখন তিনি বিশ্লেষণ করছেন। তার কারণ হচ্ছে সেই রাজকুমারেরা সকলেই ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, যিনি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ জেনে, পূর্ণজ্ঞানে আমার শরণাগত হন, সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

সাধারণ মানুষের পক্ষে শিবের দর্শন লাভ করা দুর্লভ, এবং তেমনই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শরণাগত ভক্তের দর্শনও অত্যন্ত দুর্লভ (*স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। প্রচেতারা যেহেতু সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের শরণাগত ছিলেন, তাই শিব বিশেষভাবে তাঁদের দেখতে এসেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথমেই *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়,* এই মন্ত্রেও বাসুদেবকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু বাসুদেব হচ্ছেন পরম সত্য, তাই শিব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যারা বাসুদেবের ভক্ত, যারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ কেবল সাধারণ জীবেরই আরাধ্য নন, তিনি শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও আরাধ্য। *যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১)। ব্রহ্মা, শিব, বরুণ, ইন্দ্র, চন্দ্র ও অন্যান্য সমস্ত দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন।

সেটিই হচ্ছে ভক্তির বৈশিষ্ট্য। যিনি কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি যারা ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছে এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানবার প্রয়াস করছে, তাদেরও অত্যন্ত প্রিয় হয়ে যান। তেমনই, সমস্ত দেবতারাও দেখেন কারা প্রকৃতপক্ষে ভগবান বাসুদেবের শরণাগত হয়েছেন। যেহেতু প্রচেতারা বাসুদেবের শরণাগত হয়েছিলেন, তাই শিব স্বেচ্ছায় তাদের দর্শন করতে এসেছিলেন।

ভগবান বাসুদেব অথবা শ্রীকৃষ্ণকে *ভগবদ্গীতায়* পুরুষোত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন ভোক্তা (*পুরুষ*) এবং পরম (*উত্তম*)। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ সব কিছুর ভোক্তা। জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে পুরুষ (ভোক্তা) নয়, সে হচ্ছে প্রকৃতি। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) বর্ণনা করা হয়েছে—*অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্*। এইভাবে জীব হচ্ছে প্রকৃতি বা ভগবানের তটস্থা-শক্তি। জড়া প্রকৃতির সংসর্গে আসার ফলে, সে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতের সমস্ত জীব আমার শাশ্বত অংশ। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অত্যন্ত কঠোরভাবে সংগ্রাম করছে।"

জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে জীব কেবল বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করে। প্রকৃতপক্ষে, সুখ উপভোগ করার জন্য সে এত কঠিন পরিশ্রম করে যে, এমন কি সে জড় জগতের বিষয়গুলিও ভোগ করতে পারে না। তার ফলে তাকে কখনও কখনও প্রকৃতি বা জীব বলা হয়, কারণ সে তটস্থা-শক্তিতে অবস্থিত। জীব যখন প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তখন তাকে বলা হয় *জীব-সংজ্ঞিত*। জীব দুই প্রকার—*ক্ষর* ও *অক্ষর*। যারা অধঃপতিত হয়ে বদ্ধ হয়েছে, তাদের বলা হয় *ক্ষর*, এবং যারা বদ্ধ নয়, তাদের বলা হয় *অক্ষর*। অধিকাংশ জীবই চিজ্জগতে রয়েছে এবং তাদের বলা হয় *অক্ষর*। তারা ব্রহ্ম পদে অর্থাৎ পূর্ণ চিন্ময় অস্তিত্বে স্থিত রয়েছে। তারা জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা বদ্ধ জীবদের থেকে ভিন্ন।

ক্ষর ও অক্ষর, উভয়েরই অতীত হওয়ার ফলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবকে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৮) পুরুষোত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা

বলতে পারে যে, বাসুদেব হচ্ছেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অধীন তত্ত্ব, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্* । শ্রীকৃষ্ণ যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস, সেই কথা *ব্রহ্ম-সংহিতাতেও* (৫/৪০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটি* । নির্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সেই রশ্মিতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ভাসছে। এইভাবে বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান, এবং যাঁরা পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত, শ্রীশিব তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন। শ্রীকৃষ্ণ চান যে, জীবেরা যেন সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হয়, যে-কথা তিনি *ভগবদ্গীতার* শেষ অধ্যায়ে (১৮/৬৬) বলেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।*

এই শ্লোকে *সাক্ষাৎ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তথাকথিত বহু ভক্ত রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল কর্মী ও জ্ঞানী। কারণ তারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নয়। কর্মীরা কখনও কখনও তাদের কর্মের ফল ভগবান বাসুদেবকে নিবেদন করে, এবং এই নিবেদনকে বলা হয় *কর্মার্পণম্* । তা হচ্ছে সকাম কর্ম, কারণ কর্মীরা শ্রীবিষ্ণুকে শিব ও ব্রহ্মার মতো একজন দেবতা বলে মনে করে। যেহেতু তারা শ্রীবিষ্ণুকে দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে, তাই তাদের মতে, দেবতাদের শরণাগত হওয়া বাসুদেবের শরণাগত হওয়ারই সমান। সেই মতটি এখানে অস্বীকার করা হয়েছে, কারণ তা হলে শিব বলতেন যে, তাঁর শরণাগত হওয়া, ভগবান বাসুদেব বা বিষ্ণুর শরণাগত হওয়া অথবা ব্রহ্মার শরণাগত হওয়া একই কিন্তু, শিব সেই কথা বলেননি কারণ তিনি নিজেও বাসুদেবের শরণাগত, এবং অন্য কেউ যখন বাসুদেবের শরণাগত হন, তখন তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় হন। সেই কথা তিনি এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। মূল কথা হচ্ছে যে, শিবের ভক্তরা শিবের প্রিয় নন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা শিবের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ২৯

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্ ।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ ২৯ ॥

স্ব-ধর্ম-নিষ্ঠঃ—যিনি তাঁর নিজের ধর্ম বা বৃত্তিতে স্থিত; **শত-জন্মভিঃ**—একশ জন্ম ধরে; **পুমান্**—জীব; **বিরিঞ্চতাম্**—ব্রহ্মার পদ; **এতি**—প্রাপ্ত হন; **ততঃ**—তার পর; **পরম্**—অধিকতর; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মাম্**—আমাকে প্রাপ্ত হয়; **অব্যাকৃতম্**—অবিচলিতভাবে; **ভাগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অথ**—অতএব; **বৈষ্ণবম্**—ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত; **পদম্**—পদ, **যথা**—যেমন; **অহম্**—আমি; **বিবুধাঃ**—দেবতা; **কলা-অত্যয়ে**—জড় জগতের বিনাশের পর।

অনুবাদ

মানুষ শত জন্ম ধরে যথাযথভাবে স্বধর্ম আচরণ করার ফলে, ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হন, এবং তিনি যদি তার থেকেও অধিক যোগ্যতা অর্জন করেন, তা হলে তিনি আমাকে লাভ করতে পারেন। কিন্তু যেই ব্যক্তি অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হন, তিনি অচিরেই চিৎ-জগতে উন্নীত হন। আমি ও অন্যান্য দেবতারা এই জড় জগতের বিনাশের পর সেই লোক প্রাপ্ত হই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিবর্তনের পন্থার চরম পরিণতি সম্বন্ধে একটি ধারণা প্রদান করে। বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী যে বর্ণনা করেছেন—*প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদম্*, সেই বর্ণনা অনুসারে প্রলয় থেকে আমরা এই বিবর্তনের পন্থার বিচার করতে পারি। প্রলয়ের সময় যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হয়, তখন বহু মাছ ও জলচর প্রাণী থাকে, এবং সেই জলচর প্রাণীদের থেকে বৃক্ষলতা ইত্যাদির বিকাশ হয়। তা থেকে কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপদের বিকাশ হয়, এবং তা থেকে পক্ষী, পশু এবং অবশেষে মানুষ এবং চরমে সভ্য মানুষের বিকাশ হয়। সভ্য মানুষেরা একটি সন্ধিস্থলে রয়েছেন, যেখান থেকে তাঁরা আরও উন্নতি লাভ করে আধ্যাত্মিক জীবন বিকশিত করতে পারেন। এখানে বলা হয়েছে *স্ব-ধর্ম-নিষ্ঠঃ*, অর্থাৎ জীব যখন সভ্য জীবন প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম বা স্বধর্ম আচরণ করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) তার ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।

"জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং তাদের কর্ম অনুসারে, আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি।"

সভ্য মানব-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণ থাকা অবশ্য কর্তব্য, এবং প্রত্যেকের কর্তব্য সেই বর্ণবিভাগ অনুসারে যথাযথভাবে তার স্বধর্ম আচরণ করা। এখানে বলা হয়েছে *স্ব ধর্ম-নিষ্ঠঃ*, অর্থাৎ সে ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক, অথবা শূদ্র হোক, তাতে কিছু যায় আসে না; কেউ যদি তার স্বীয় বর্ণে অবিচলিত থেকে যথাযথভাবে তার বিশেষ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে, তা হলে তাকে সভ্য মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে। তা না হলে সে একটি পশুর তুল্য। এখানে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন একশ জন্ম ধরে তাঁর স্বধর্ম আচরণ করেন (যেমন, কোন ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করেন), তা হলে তিনি ব্রহ্মলোকে, যেখানে ব্রহ্মা বাস করেন, সেই লোকে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হন শিবলোক বা সদাশিবলোক নামেও একটি লোক রয়েছে, যা চিৎ-জগৎ ও জড় জগতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়ার পর কেউ যদি আরও অধিক যোগ্য হন, তা হলে তিনি শিবলোকে উন্নীত হন। তেমনই, কেউ যদি আরও অধিক যোগ্যতা অর্জন করেন, তা হলে তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। বৈকুণ্ঠলোকই হচ্ছে সকলের লক্ষ্য, এমন কি দেবতারাও সেখানে উন্নীত হতে চান। সব রকম জড় জাগতিক অভিলাষ রহিত ভগবদ্ভক্তই কেবল সেই স্থান প্রাপ্ত হতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও জড় জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না (*আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*)। তেমনই, শিবলোকে উন্নীত হলেও জীব সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হতে পারে না, কারণ শিবলোক তটস্থ স্থানে অবস্থিত। কিন্তু কেউ যদি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি জীবনের চরম লক্ষ্য, এবং ক্রমবিকাশের চরম গতি প্রাপ্ত হন (*মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*)। পক্ষান্তরে, এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মানব-সমাজে যাঁদের চেতনা বিকশিত হয়েছে, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করা, যাতে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠলোক অথবা কৃষ্ণলোকে তাঁরা উন্নীত হতে পারেন। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন* (*ভগবদ্গীতা* ৪/৯)। যে ভক্ত পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, যিনি অন্য কোন লোক বা গ্রহের প্রতি আর আকৃষ্ট নন, এমন কি যিনি ব্রহ্মলোক বা শিবলোকের প্রতিও আকৃষ্ট নন, তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণলোকে স্থানান্তরিত হন (*মামেতি*)। সেটিই হচ্ছে জীবনের চরম পূর্ণতা এবং বিবর্তনের পন্থার চরম পরিণতি।

শ্লোক ৩০

অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা ।
ন মদ্ভাগবতানাং চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ৩০ ॥

অথ—অতএব; **ভাগবতাঃ**—ভগবদ্ভক্তগণ; **যূযম্**—তোমরা সকলে; **প্রিয়াঃ**—আমার অত্যন্ত প্রিয়; **স্থ**—তোমরা হও; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যথা**—যেমন; **ন**—না; **মৎ**—আমার থেকে; **ভাগবতানাম্**—ভক্তদের; **চ**—ও; **প্রেয়ান্**—অত্যন্ত প্রিয়; **অন্যঃ**—অন্য; **অস্তি**—হয়; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

তোমরা সকলেই ভগবানের ভক্ত, এবং তাই আমার কাছে তোমরা স্বয়ং ভগবানের মতো শ্রদ্ধেয়। সেই সূত্রে আমি জানি যে, ভক্তরাও আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং আমি তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। তাই ভক্তদের কাছে আমার মতো প্রিয় আর কেউ নয়।

তাৎপর্য

বলা হয়, *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—শিব সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভক্তরা শিবেরও ভক্ত। বৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিবের মন্দির রয়েছে। গোপীরা কেবল শিবেরই পূজা করতেন না, তাঁরা কাত্যায়নীদেবী বা দুর্গাদেবীরও পূজা করতেন। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হওয়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা শিবকে অশ্রদ্ধা করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্তরূপে তাঁর পূজা করেন। তার ফলে যখনই ভগবদ্ভক্ত শিবের পূজা করেন, তখন তিনি শিবের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করতে পারেন, এবং তিনি কখনও তাঁর কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে যে, মানুষ সাধারণত জড়-জাগতিক লাভের আশায় দেব-দেবীদের পূজা করে। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ* । কামের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা দেব-দেবীদের পূজা করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনই তা করেন না, কারণ তিনি কখনই কামের দ্বারা পরিচালিত হন না। সেটিই হচ্ছে শিবের প্রতি ভগবদ্ভক্তের শ্রদ্ধা এবং অসুরদের শ্রদ্ধার মধ্যে পার্থক্য। অসুরেরা কোন রকম বর লাভের আশায় শিবের পূজা করে, এবং সেই বরের অপব্যবহার করে তারা চরমে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিহত হয়, এবং এইভাবে তারা মুক্তিলাভ করে।

শিব যেহেতু ভগবানের পরম ভক্ত, তাই ভগবানের সমস্ত ভক্তরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। শিব প্রচেতাদের বলেছিলেন যে, যেহেতু তাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাই তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। শিব কেবল প্রচেতাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ ছিলেন না; ভগবানের সমস্ত ভক্তরাই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ভগবদ্ভক্তেরা শিবের কেবল প্রিয়ই নন, শিব তাঁদের ভগবানেরই মতো শ্রদ্ধা করেন। তেমনই, ভগবদ্ভক্তেরাও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে শিবেরও পূজা করেন। তাঁরা তাঁকে পৃথক ভগবানরূপে পূজা করেন না। নাম অপরাধের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হর বা শিবের নাম কীর্তন করা এবং হরির নাম কীর্তন করাকে সমান বলে মনে করা একটি অপরাধ। ভক্তদের সব সময় অবগত থাকা উচিত যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং শিব হচ্ছেন তাঁর ভক্ত। ভক্তকে ভগবানেরই মতো সম্মান করা উচিত, এবং কখনও কখনও ভক্তকে ভগবানের থেকেও অধিক সম্মান করা হয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং কোনও সময়ে শিবের পূজা করেছিলেন। ভগবান যদি ভক্তের পূজা করেন, তা হলে ভগবদ্ভক্ত কেন ভক্তকে ভগবানেরই সমান স্তরে পূজা করবেন না? এটিই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, শিব কেবল লৌকিকতার খাতিরে অসুরদের বরদান করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের যাঁরা ভক্ত, তাঁদের প্রতিই কেবল প্রীতিপরায়ণ।

শ্লোক ৩১

ইদং বিবিক্তং জপ্তব্যং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্ ।
নিঃশ্রেয়সকরং চাপি শ্রূয়তাং তদ্বদামি বঃ ॥ ৩১ ॥

ইদম্—এই; **বিবিক্তম্**—বিশেষ; **জপ্তব্যম্**—সর্বদা জপ করা কর্তব্য; **পবিত্রম্**—অত্যন্ত পবিত্র; **মঙ্গলম্**—কল্যাণকর; **পরম্**—দিব্য; **নিঃশ্রেয়স-করম্**—অত্যন্ত লাভজনক; **চ**—ও; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ কর; **তৎ**—তা; **বদামি**—আমি বলছি; **বঃ**—তোমাদের।

অনুবাদ

এখন আমি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করব, যা কেবল দিব্য, পবিত্র ও মঙ্গলময়ই নয়, অধিকন্তু জীবনের চরম লক্ষ্যলাভের অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। আমি যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করব, তখন তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

বিবিক্তম্ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, শিব যে মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন, সেটি সাম্প্রদায়িক ছিল; পক্ষান্তরে সেটি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়, এতই গোপনীয় যে, জীবনের চরম মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য সাধনের অভিলাষী ব্যক্তিদের পক্ষে শিবের এই নির্দেশ অনুসারে ভগবানের কাছে প্রার্থনা এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য, যা শিব নিজেও করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যনুক্রোশহৃদয়ো ভগবানাহ তাঞ্ছিবঃ ।
বদ্ধাঞ্জলীন্ রাজপুত্রান্নারায়ণপরো বচঃ ॥ ৩২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অনুক্রোশ-হৃদয়ঃ**—অত্যন্ত দয়ালু; **ভগবান্**—প্রভু; **আহ**—বলেছিলেন; **তান্**—প্রচেতাদের; **শিবঃ**—শিব; **বদ্ধ-অঞ্জলীন্**—কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; **রাজ-পুত্রান্**—রাজপুত্রদের; **নারায়ণ-পরঃ**—নারায়ণের মহান্ ভক্ত শিব; **বচঃ**—বাণী।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ভগবানের পরম ভক্ত, মহাপুরুষ শিব দয়াপরবশ হয়ে রাজপুত্রদের উপদেশ দিতে লাগলেন, এবং তাঁরাও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর সেই উপদেশ শ্রবণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শিব স্বেচ্ছায় রাজপুত্রদের আশীর্বাদ করার জন্য এবং তাঁদের হিতসাধনের জন্য সেখানে এসেছিলেন। তিনি স্বয়ং সেই মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, যাতে তা অধিক শক্তিসম্পন্ন হয়, এবং তিনি রাজপুত্রদের সেই মন্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। কোন মন্ত্র যখন ভগবানের মহান ভক্তের দ্বারা উচ্চারিত হয়, তখন মন্ত্র অধিক শক্তিসম্পন্ন হয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র যদিও অত্যন্ত শক্তিশালী, তবুও দীক্ষার সময় শিষ্য শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হন, কারণ শ্রীগুরুদেবের দ্বারা উচ্চারিত হওয়ার ফলে, সেই মন্ত্র অধিক শক্তিসম্পন্ন হয়। শিব রাজপুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তা শুনতে, কারণ অনবধানে শ্রবণের ফলে নাম অপরাধ হয়।

শ্লোক ৩৩

শ্রীরুদ্র উবাচ

জিতং ত আত্মবিদ্‌বর্যস্বস্তয়ে স্বস্তিরস্তু মে ।
ভবতারাধসা রাদ্ধং সর্বস্মা আত্মনে নমঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রী-রুদ্রঃ উবাচ—শিব বললেন; **জিতম্**—জয় হোক; **তে**—আপনার; **আত্ম-বিৎ**—আত্ম তত্ত্ববেত্তা; **বর্য**—শ্রেষ্ঠ; **স্বস্তয়ে**—মঙ্গলময়কে; **স্বস্তিঃ**—কল্যাণ; **অস্তু**—হোক; **মে**—আমার; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **আরাধসা**—সর্বতোভাবে পূর্ণের দ্বারা, **রাদ্ধম্**—আরাধ্য; **সর্বস্মৈ**—পরম আত্মা, **আত্মনে**—পরমাত্মাকে; **নমঃ**—প্রণতি।

অনুবাদ

ভগবানের প্রার্থনা করে শিব বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার মহিমা সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক! সমস্ত আত্মবিৎ পুরুষদের মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং আপনি সর্বদা তাঁদের কল্যাণসাধন করেন, তাই আপনি আমারও কল্যাণসাধন করুন। আপনার উপদেশ সর্বতোভাবে পূর্ণ, তাই আপনি আরাধ্য। আপনি হচ্ছেন পরমাত্মা; তাই আমি পুরুষোত্তমরূপে আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করে শুরুতেই ভক্ত বলেন, "হে ভগবান! আপনার মহিমা সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক " ভগবানের মহিমা কীর্তন করা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত *আত্মবিৎ* পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই সম্বন্ধে বেদে (*কঠোপনিষদ* ২/২/১৩) বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* — পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন প্রকার চেতন জীব রয়েছে—তাদের কেউ এই জড় জগতে রয়েছে, এবং অন্যেরা চিৎ-জগতে রয়েছেন। যাঁরা চিৎ-জগতে রয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে *আত্মবিৎ*, কারণ চিন্ময় স্তরে জীব কখনও ভগবানের প্রতি তাঁর সেবার কথা বিস্মৃত হন না। তাই চিৎ-জগতে যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি এবং স্বতন্ত্র জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত। তাই সমস্ত *আত্মবিৎ* পুরুষদের মধ্যে ভগবানই হচ্ছেন পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* । স্বতন্ত্র জীবাত্মা যখন পরম আত্মারূপে ভগবানকে

জেনে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানে স্থির হন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বমঙ্গলময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত হন। শিব এখানে প্রার্থনা করেছেন যে, তাঁর প্রতি ভগবানের কৃপার প্রভাবে, তিনি যেন চিরকাল তাঁর মঙ্গলময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন।

ভগবান পরম পূর্ণ, এবং তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, যাঁরা তাঁর আরাধনা করেন, তাঁরাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের উপদেশ দেন, যার ফলে তাঁরা পারমার্থিক মার্গে উন্নতিসাধন করতে পারেন। তাঁরা যখন পরম পূর্ণের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে*। ভগবান সর্বদাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে উপদেশ দিতে প্রস্তুত থাকেন, যার ফলে ভগবদ্ভক্ত ভক্তিমার্গে ক্রমশ উন্নতিসাধন করতে পারেন। ভগবান যেহেতু পরমাত্মা বা সর্বাত্মারূপে উপদেশ দেন, তাই শিব তাঁকে *সর্বাত্মা আত্মনে নমঃ* বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। স্বতন্ত্র জীবকে বলা হয় *আত্মা*, এবং ভগবানকেও *আত্মা* বা পরমাত্মা বলা হয়। সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন বলে, ভগবান পরম *আত্মা* নামে পরিচিত। তাই তাঁকে সর্বতোভাবে প্রণতি নিবেদন করা হয়। এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৮/২০) কুন্তীদেবীর প্রার্থনা বিচার করা যেতে পারে—

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ॥

ভগবান সর্বদা জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত পরমহংস বা সর্বোচ্চ স্তরের ভগবদ্ভক্তদের উপদেশ দিতে সব সময় প্রস্তুত। ভগবান সর্বদা এই প্রকার উন্নত স্তরের ভক্তদের বলে দেন, কিভাবে তাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে স্থির থাকতে পারেন। তেমনই, আত্মারাম শ্লোকে (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/১০) উল্লেখ করা হয়েছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

আত্মারাম বলতে তাঁদের ইঙ্গিত করে, যাঁরা জড় জগতের প্রতি আসক্ত না হয়ে, কেবল আত্ম-উপলব্ধির বিষয়ে যুক্ত থাকেন। এই প্রকার আত্ম-তত্ত্ববিৎদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—নির্বিশেষ ও সবিশেষ। কিন্তু, ভগবানের সবিশেষ দিব্য গুণাবলীর প্রতি যখন নির্বিশেষবাদীরা আকৃষ্ট হন, তখন তাঁরাও ভক্তে পরিণত

হন। মূল কথা হচ্ছে যে, শিব পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের ভক্তিতে স্থিব থাকতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে যে, শিব কখনও নির্বিশেষবাদীদের মতো ভগবানের সত্তায় লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করেন না পক্ষান্তরে, তিনি মনে কবেন যে, তিনি যদি ভগবদ্ভক্তিতে স্থির থাকতে পারেন, তা হলে সেটি হবে তাঁর পরম সৌভাগ্য। এই জ্ঞানের প্রভাবে জীব উপলব্ধি করতে পারেন যে, সমস্ত জীব, এমন কি শিব, ব্রহ্মা এবং অন্য সমস্ত দেবতারাও হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের দাস।

শ্লোক ৩৪

নমঃ পঙ্কজনাভায় ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে ।
বাসুদেবায় শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে ॥ ৩৪ ॥

নমঃ—আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি, **পঙ্কজ-নাভায়**—যাঁর নাভি থেকে সর্বলোকাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভূত-সূক্ষ্ম**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আত্মনে**—উৎস; **বাসুদেবায়**—ভগবান বাসুদেবকে; **শান্তায়**—যিনি সর্বদা শান্ত; **কূট-স্থায়**—অপরিবর্তনীয়; **স্ব-রোচিষে**—স্বপ্রকাশ স্বরূপ।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার নাভিদেশ থেকে সর্বলোকাত্মক পদ্ম উত্থিত হয়েছে, তাই আপনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস। আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের পবম নিয়ন্তা, এবং আপনি হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত বাসুদেব। আপনি পরম শান্ত, এবং আপনার স্বপ্রকাশের ফলে, আপনি ছয় প্রকার বিকারের দ্বারা কখনও বিচলিত হন না।

তাৎপর্য

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভসমুদ্রে শয়ন করেন, এবং তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম উদ্ভূত হয়। সেই পদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, এবং ব্রহ্মা থেকে জড়-জাগতিক সৃষ্টি শুরু হয়। এইভাবে পবমেশ্বর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জড় ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের উৎস। যেহেতু শিব নিজেকে এই জড় সৃষ্টির একজন বলে মনে করছেন, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিও পরম নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রণাধীন। হৃষীকেশ বা ইন্দ্রিয়েব ঈশ্বর নামেও পরমেশ্বর ভগবান পরিচিত, যা ইঙ্গিত করে যে, আমাদের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি ভগবানেবই

সৃষ্টি। অতএব তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং তাঁর কৃপার প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরের সেবায় সেগুলি নিযুক্ত করতে পারেন। বদ্ধ অবস্থায় জীব জড় সুখভোগের চেষ্টায় তার ইন্দ্রিয়গুলিকে যুক্ত করে এই জড় জগতে সংগ্রাম করে। কিন্তু জীব যদি ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে পারে। শিব বাসনা করেছেন যে, তিনি যেন জড় জগতের কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় বিপথগামী না হন; পক্ষান্তরে তিনি যেন সর্বদা তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে পারেন। সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবের কৃপা এবং সহযোগিতার প্রভাবে জীব তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে পারেন, ঠিক যেমন ভগবান অবিচলিতভাবে তাঁর কার্য করেন।

শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে বাক্যাংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান যদিও এই জড় জগতে রয়েছেন, তবুও তিনি কখনও সংসার সমুদ্রের তরঙ্গের দ্বারা বিচলিত হন না। কিন্তু, বদ্ধ জীবেরা ছয় প্রকার বিকারের দ্বারা বিচলিত হয়। সেই ছয়টি বিকার হচ্ছে—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু। বদ্ধ জীবেরা যদিও অতি সহজে জড় জগতের এই সমস্ত অবস্থাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু পরমাত্মা বা বাসুদেবরূপে পরমেশ্বর ভগবান কখনও এই সমস্ত বিকারের দ্বারা বিচলিত হন না। তাই এখানে তাঁকে *কূটস্থায়* বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর শক্তির প্রভাবে তিনি সর্বদাই শান্ত ও অবিচলিত। *স্বরোচিষে* শব্দটির দ্বারা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর দিব্য স্থিতির প্রভাবে স্বয়ং প্রকাশ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীব পরমেশ্বর ভগবানের জ্যোতির অন্তর্গত হলেও, তার ক্ষুদ্রত্বহেতু কখনও কখনও সেই জ্যোতির্ময় স্থিতি থেকে অধঃপতিত হয়। যখন তার অধঃপতন হয়, তখন সে এই জড় জগতে বদ্ধ জীবনে প্রবেশ করে। ভগবান কিন্তু কখনও এইভাবে বদ্ধ হন না; তাই এখানে তাঁকে বলা হয়েছে স্বয়ং প্রকাশ বা *স্বরোচিষে*। তাই এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের বদ্ধ জীব যখন বাসুদেবের আশ্রয়ে থাকে অথবা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩৫

সঙ্কর্ষণায় সূক্ষ্মায় দুরন্তায়ান্তকায় চ ।
নমো বিশ্বপ্রবোধায় প্রদ্যুম্নায়ান্তরাত্মনে ॥ ৩৫ ॥

সঙ্কর্ষণায়—জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানের অধিষ্ঠাতাকে; **সূক্ষ্মায়**—জড় উপাদানের সূক্ষ্ম অব্যক্ত রূপকে; **দুরন্তায়**—যাঁকে অতিক্রম করা যায় না তাঁকে; **অন্তকায়**—সংহারের অধিষ্ঠাতাকে; **চ**—ও; **নমঃ**—প্রণতি; **বিশ্ব-প্রবোধায়**—ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ সাধনের অধিষ্ঠাতাকে; **প্রদ্যুম্নায়**—প্রদ্যুম্নকে; **অন্তঃ-আত্মনে**—সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান। আপনি সূক্ষ্ম তত্ত্বের উৎস, সমস্ত জড় উপাদানের অধিষ্ঠাতা এবং সংহারকর্তা। আপনি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ, এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কর্ষণের পূর্ণ শক্তির দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে। জড় বৈজ্ঞানিকেরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম আবিষ্কার করে থাকতে পারে, যা এই জড় জগতের সমস্ত বস্তুর গঠন ও পালন করছে, কিন্তু তবুও সেই সমস্ত উপাদানের অধিষ্ঠাতা ও স্রষ্টা তাঁর মুখাগ্নির দ্বারা সব কিছু ধ্বংস করে ফেলতে পারেন। ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনাকারী *ভগবদ্গীতার* একাদশ অধ্যায়ে তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সমস্ত উপাদানের অধিষ্ঠাতা তাঁর সংহারকারী শক্তির দ্বারা এই জগতের সংহারকও। সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন সৃষ্টি ও ধ্বংসের অধিষ্ঠাতা, আর ভগবান বাসুদেবের আর একটি রূপ প্রদ্যুম্ন হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের বৃদ্ধি এবং পালনের অধিষ্ঠাতা। এই শ্লোকে *সূক্ষ্মায়* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই স্থূল জড় শরীরের মধ্যে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম জড় শরীর রয়েছে। ভগবান তাঁর বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণরূপে এই জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত উপাদানের পালন করেন। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, স্থূল জড় উপাদানগুলি হচ্ছে—মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ, এবং সূক্ষ্ম জড় উপাদানগুলি হচ্ছে—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই সবই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৩৬

নমো নমোঽনিরুদ্ধায় হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে ।
নমঃ পরমহংসায় পূর্ণায় নিভৃতাত্মনে ॥ ৩৬ ॥

নমঃ—আপনাকে আমি সর্বতোভাবে প্রণতি নিবেদন করি, **নমঃ**—পুনরায় প্রণতি নিবেদন করি; **অনিরুদ্ধায়**—অনিরুদ্ধকে; **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়ের-ঈশ্বর; **ইন্দ্রিয়-আত্মনে**—ইন্দ্রিয়ের পরিচালক; **নমঃ**—সর্বতোভাবে আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি; **পরম-হংসায়**—সূর্যরূপকে; **পূর্ণায়**—পরম পূর্ণকে, **নিভৃত-আত্মনে**—ক্ষয়-বৃদ্ধিশূন্য।

অনুবাদ

হে ভগবান। আপনি ইন্দ্রিয় ও মনের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ। আপনি সূর্যরূপে তেজের দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করছেন, আপনার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নেই। তাই আমি বার বার আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে । মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, এবং অনিরুদ্ধ হচ্ছেন মনের অধিষ্ঠাতা। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ করতে হয়, তাই শিব মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধের প্রার্থনা করেছেন, যাতে তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন এবং তার ফলে তিনি তাঁর মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) বলা হয়েছে—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু* । ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে যুক্ত করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) এও বলা হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনং চ*—ভগবান থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে। তাই অনিরুদ্ধ যদি প্রসন্ন হন, তা হলে তিনি মনকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে সাহায্য করেন। এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অনিরুদ্ধের বিস্তার হচ্ছেন সূর্যদেব। যেহেতু সূর্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন অনিরুদ্ধের বিস্তার, তাই এই শ্লোকে শিব সূর্যদেবের প্রার্থনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) হচ্ছেন মানসিক ক্রিয়ার, অর্থাৎ চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা ও ক্রিয়ার দেবতা। শিব অনিরুদ্ধকে সূর্যদেবরূপে প্রার্থনা করেছেন। অনিরুদ্ধ বাহ্য ভৌতিক তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, যে ভৌতিক তত্ত্বের দ্বারা এই শরীর গঠিত হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, *পরমহংস* শব্দটি হচ্ছে সূর্যদেবের আর একটি নাম। সূর্যদেবকে এখানে *নিভৃতাত্মনে* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি সর্বদা বৃষ্টির দ্বারা বিভিন্ন গ্রহলোক পালন করেন। সূর্যদেব সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত করে মেঘে পরিণত করেন এবং সর্বত্র জল বিতরণ করেন। যখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয়,

তখন অন্ন উৎপন্ন হয়, এবং সেই অন্ন প্রতিটি গ্রহের জীবদের পালন করে। সূর্যদেবকে এখানে *পূর্ণ* বলেও সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ সূর্যরশ্মি অন্তহীন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সময় থেকে, কোটি কোটি বছর ধরে সূর্যদেব তাপ ও আলোক বিতরণ করছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে না। *পরমহংস* শব্দটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে নির্মল। যখন প্রচুর পরিমাণে সূর্যের কিরণ নিঃসৃত হয়, তখন মন নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে, অর্থাৎ সূর্যদেব জীবের মনকে *পরমহংস* স্তরে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন। শিব অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হন, যার ফলে তাঁর মন সর্বদা সম্পূর্ণরূপে নির্মল থাকে এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকে। অগ্নি যেমন সমস্ত মলিন বস্তুকে শুদ্ধ করে, তেমনই সূর্যদেবও সব কিছুকে শুদ্ধ করেন, বিশেষ করে মনের কলুষকে, এবং এইভাবে মানুষকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করেন।

শ্লোক ৩৭

স্বর্গাপবর্গদ্বারায় নিত্যং শুচিষদে নমঃ ।
নমো হিরণ্যবীর্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তবে ॥ ৩৭ ॥

স্বর্গ—স্বর্গলোক; **অপবর্গ**—মুক্তির পথ; **দ্বারায়**—দ্বারের; **নিত্যম্**—নিত্য; **শুচি-ষদে**—পরম পবিত্রকে; **নমঃ**—আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **হিরণ্য**—স্বর্ণ; **বীর্যায়**—বীর্য; **চাতুঃ-হোত্রায়**—চাতুর্হোত্র নামক বৈদিক যজ্ঞ; **তন্তবে**—বিস্তারকারীকে।

অনুবাদ

হে ভগবান অনিরুদ্ধ! আপনার অধ্যক্ষতায় স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আপনি সর্বদা জীবের শুদ্ধ হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি স্বর্ণসদৃশ বীর্যসমন্বিত, এবং তার ফলে অগ্নিরূপে আপনি চাতুর্হোত্র আদি বৈদিক যজ্ঞের সহায়তা করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

স্বর্গ হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর লোকসমূহ, এবং অপবর্গ মানে হচ্ছে 'মুক্তি'। যারা বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতি আকৃষ্ট, তারা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির তিনটি

গুণের বন্ধনে আবদ্ধ। *ভগবদ্গীতায়* তাই বলা হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সকাম কর্মের স্তর অতিক্রম করা। বিভিন্ন প্রকারের মুক্তি রয়েছে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। অনিরুদ্ধ সকাম কর্মীদের কেবল উচ্চতর লোকে উন্নীত হতেই সহায়তা করেন না, তিনি তাঁর অক্ষয় শক্তির দ্বারা ভক্তকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় প্রবৃত্ত হতেও সহাযতা করেন। তাপ যেমন জড় শক্তির উৎস, তেমনই অনিরুদ্ধের অনুপ্রেরণা হচ্ছে সেই শক্তি, যার প্রভাবে মানুষ ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃত্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩৮

নম ঊর্জ ইষে ত্রয্যাঃ পতয়ে যজ্ঞরেতসে ।
তৃপ্তিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্বরসাত্মনে ॥ ৩৮ ॥

নমঃ—আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি; **ঊর্জে**—পিতৃলোকের পোষককে; **ইষে**—সমস্ত দেবতাদের পোষককে; **ত্রয্যাঃ**—তিন বেদের; **পতয়ে**—প্রভুকে; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **রেতসে**—চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে; **তৃপ্তি-দায়**—যিনি সকলকে তৃপ্ত করেন, তাঁকে; **চ**—ও; **জীবানাম্**—জীবদের; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **সর্ব-রস-আত্মনে**—সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি পিতৃলোক ও দেবতাদেরও পোষক। আপনি চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং তিন বেদের প্রভু। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সমস্ত জীবের তৃপ্তির আদি উৎস।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে যখন জীবের জন্ম হয়, বিশেষ করে মনুষ্যরূপে, তখন দেবতাদের প্রতি, ঋষিদের প্রতি এবং সাধারণ জীবদের প্রতি তার কতকগুলি ঋণ থাকে। সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*দেবর্ষি ভূতাপ্ত নৃণাং-পিতৃণাম্* । এইভাবে পিতৃদের প্রতি, পূর্ব-পুরুষদের প্রতি মানুষের ঋণ থাকে। শিব অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যাতে তাঁকে শক্তি দান কবেন, যার ফলে তিনি পিতৃ, দেবতা, ঋষি ও জনসাধারণের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় প্রবৃত্ত হতে পারেন। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৪১)

কেউ যদি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি দেবতা, ঋষি, পিতা, পূর্বপুরুষ ইত্যাদি সকলের কাছে তাঁর যে ঋণ রয়েছে, তা থেকে মুক্ত হয়ে যান। শিব তাই অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যাতে তাঁকে শক্তি দেন, যার ফলে তিনি সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন।

চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সোম হচ্ছেন জীবের জিহ্বার দ্বারা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদানকারী দেবতা। শিব অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁকে শক্তি প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ভগবৎ-প্রসাদ ছাড়া অন্য কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ না করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি শ্লোকে গেয়েছেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিভ হচ্ছে সব চাইতে ভয়ঙ্কর শত্রু। কেউ যদি তাঁর জিহ্বাকে সংযত করতে পারেন, তা হলে তিনি অনায়াসে তাঁর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে পারেন। জিহ্বাকে সংযত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা। শিব অনিরুদ্ধের কাছে যে প্রার্থনা করেছেন, তা এই উদ্দেশ্যেই (*তৃপ্তিদায়*); তিনি অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে তিনি তাঁকে কেবল ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হতে সাহায্য করেন।

শ্লোক ৩৯

সর্বসত্ত্বাত্মদেহায় বিশেষায় স্থবীয়সে ।
নমস্ত্রৈলোক্যপালায় সহ ওজোবলায় চ ॥ ৩৯ ॥

সর্ব—সমস্ত, **সত্ত্ব**—অস্তিত্ব; **আত্ম**—আত্মা; **দেহায়**—দেহকে; **বিশেষায়**—বিভিন্নতা; **স্থবীয়সে**—জড় জগৎকে; **নমঃ**—প্রণতি নিবেদন করি; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রিভুবন; **পালায়**—পালক, **সহ**—সঙ্গে; **ওজঃ**—শক্তি; **বলায়**—বলকে; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি বিরাট স্বরূপ, যাতে সমস্ত জীবদের শরীর নিহিত রয়েছে। আপনি ত্রিলোকের পালক, এবং তার ফলে আপনি সেগুলির মধ্যে মন, ইন্দ্রিয়,

দেহ ও প্রাণবায়ু পালন করেন। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জীবের শরীর যেমন অসংখ্য কোষ, কীটাণু ও জীবাণু দ্বারা গঠিত, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট শরীর সমস্ত জীবদের স্বতন্ত্র শরীরের দ্বারা গঠিত। শিব সমস্ত জীব শরীর-সমন্বিত বিরাট শরীরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছেন, যাতে প্রত্যেকের শরীর সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হতে পারে। জীবের শরীর যেহেতু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গঠিত, তাই সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। যেমন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে, হাত ভগবানের মন্দির মার্জনে নিযুক্ত হতে পারে, ইত্যাদি। সমস্ত জীবের প্রাণবায়ু হওয়ার ফলে, ভগবান প্রকৃতপক্ষে ত্রিলোকের পালক। তাই তিনি প্রতিটি জীবকে পূর্ণরূপে দৈহিক ও মানসিক শক্তির দ্বারা তাঁর জীবনের প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এইভাবে প্রতিটি জীবেরই কর্তব্য তার প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাণীর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২২/৩৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়-আচরণং সদা ॥

কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার বাসনাও করেন, তবুও অনুমোদন ব্যতীত তা সম্ভব নয়। জীব কিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে, তা প্রদর্শন করার জন্য শিব বিভিন্নভাবে তাঁর প্রার্থনায় নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ৪০

অর্থলিঙ্গায় নভসে নমোঽন্তর্বহিরাত্মনে ।
নমঃ পুণ্যায় লোকায় অমুষ্মৈ ভূরিবর্চসে ॥ ৪০ ॥

অর্থ—অর্থ; **লিঙ্গায়**—প্রকাশ করে; **নভসে**—আকাশকে; **নমঃ**—নমস্কার; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—এবং বাইরে; **আত্মনে**—আত্মাকে; **নমঃ**—প্রণতি নিবেদন করি; **পুণ্যায়**—পুণ্যকর্ম; **লোকায়**—সৃষ্টির জন্য; **অমুষ্মৈ**—মৃত্যুর পর; **ভূরি-বর্চসে**—পরম জ্যোতি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি দিব্য বাণীর প্রসারের দ্বারা সব কিছুর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন। আপনি অন্তর ও বাইরের সর্বব্যাপ্ত আকাশ, এবং আপনি জড়-জাগতিক ও জড়াতীত সমস্ত পুণ্যকর্মের চরম লক্ষ্য। আমি তাই বারবার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রমাণকে বলা হয় *শব্দব্রহ্ম*। এমন অনেক বস্তু রয়েছে, যা আমাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের শব্দপ্রমাণ অভ্রান্ত। *বেদকে বলা হয় শব্দব্রহ্ম*, কারণ বৈদিক প্রমাণ হচ্ছে চরম জ্ঞান। তার কারণ *শব্দব্রহ্ম* বা *বেদ* ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে। *শব্দব্রহ্মের* প্রকৃত সারমর্ম কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। এই দিব্য ধ্বনি উচ্চারণের ফলে, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বস্তুর অর্থ প্রকাশিত হয়। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। প্রত্যেক বস্তুর অর্থ প্রকাশ হয়, বায়ুর মাধ্যমে প্রাপ্ত শব্দের ধ্বনির দ্বারা. সেই ধ্বনি জড় হতে পারে অথবা আধ্যাত্মিক হতে পারে, কিন্তু শব্দ ব্যতীত কোন কিছুর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *বেদে* বলা হয়েছে, *অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ*—"নারায়ণ সর্বব্যাপ্ত এবং তিনি অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত।" *ভগবদ্গীতাতেও* (১৩/৩৪) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥

"হে ভারত! এক সূর্য যেমন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করে, তেমনই জীবাত্মা ও পরমাত্মা চেতনার দ্বারা সমগ্র দেহকে প্রকাশিত করে।"

পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই চেতনা সর্বব্যাপ্ত. জীবের সীমিত চেতনা কেবল তার জড় শরীরটি জুড়ে ব্যাপ্ত, আর ভগবানের পরম চেতনা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত। জীবাত্মা দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে বলেই সারা শরীর জুড়ে চেতনা ব্যাপ্ত রয়েছে; তেমনই, পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের চেতনা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত রয়েছে বলে সব কিছু যথাযথভাবে ক্রিয়া করছে। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"হে কৌন্তেয়! আমারই অধ্যক্ষতায় এই জড়া প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে, এবং সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের উৎপন্ন করছে।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১০)

শিব তাই পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, যাতে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, আমরা ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতেরই সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। এই সূত্রে অমুষ্মৈ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হওয়ার পর সর্বোৎকৃষ্ট যে লক্ষ্য তাকে ইঙ্গিত করে। যারা সকাম কর্মে যুক্ত (কর্মী), তারা তাদের পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে উচ্চতরলোক প্রাপ্ত হয়। আর যারা জ্ঞানী, অর্থাৎ যারা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় কৈবল্য বা সাযুজ্য লাভ করতে চায়, তারাও চরমে তাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চরম স্তরে রয়েছেন ভগবদ্ভক্ত, যিনি ভগবানের সঙ্গলাভ করতে চান, তিনি বৈকুণ্ঠলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১২) ভগবানকে *পবিত্রং পরমম্* বা পরম পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কথা এই শ্লোকেও প্রতিপন্ন হয়েছে। শুকদেব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, যে-সমস্ত গোপবালকেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করেছিলেন, তাঁরা কোন সাধারণ জীব ছিলেন না। জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যের ফলে, মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। যেহেতু পবিত্র আত্মাই কেবল তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারেন, তাই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পবিত্র।

শ্লোক ৪১

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় পিতৃদেবায় কর্মণে ।
নমোঽধর্মবিপাকায় মৃত্যবে দুঃখদায় চ ॥ ৪১ ॥

প্রবৃত্তায়—প্রবৃত্তি; **নিবৃত্তায়**—নিবৃত্তি; **পিতৃ-দেবায়**—পিতৃলোকের অধীশ্বরকে; **কর্মণে**—সকাম কর্মের ফলকে; **নমঃ**—নমস্কার; **অধর্ম**—অধর্ম; **বিপাকায়**—ফলকে, **মৃত্যবে**—মৃত্যুকে; **দুঃখ-দায়**—সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে ভগবান্! আপনি পুণ্যকর্মের ফল দর্শনকারী। আপনি প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও তাদের পরিণাম। আপনি অধর্মজনিত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কারণ, অতএব আপনি মৃত্যু। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তাঁর থেকে জীবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উদয় হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতির উদয় হয়।"

ভগবান অসুরদের তাঁর কথা ভুলিয়ে দেন এবং তাঁর ভক্তদের তাঁব কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মানুষের নিবৃত্তির কারণও হচ্ছেন ভগবান। *ভগবদ্গীতার* (১৬/৭) বর্ণনা অনুসারে, *প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ*—অসুরেরা জানে না কিভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং কোন্ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। অসুরেরা যে ভগবদ্ভক্তির বিরোধিতা করে, সেই সম্বন্ধে বুঝতে হবে যে, তাদের সেই প্রবৃত্তির কারণও ভগবান। অসুরেরা যেহেতু ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃত্ত হতে চায় না, তাই তাদের অন্তর থেকে ভগবান তাদের তাঁকে বিস্মৃত হওয়ার বুদ্ধি প্রদান করেন। কর্মীরা সাধারণত পিতৃলোকে উন্নীত হতে চায়, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। *যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ* — "যারা দেবতাদের পূজা কবে, তারা দেবতাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে, আর যারা পিতৃদের পূজা করে, তারা পিতৃলোকে গমন করবে।"

এই শ্লোকে *দুঃখদায়* শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যারা অভক্ত, তাদের নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নিক্ষেপ করা হয়। সেই অবস্থাটি অত্যন্ত দুঃখদায়ক। জীব যেহেতু তার কর্ম অনুসারে তার জীবনের স্থিতি লাভ করে, তাই অসুব বা অভক্তরা অত্যন্ত দুঃখদায়ক পরিস্থিতিতে প্রক্ষিপ্ত হয়।

শ্লোক ৪২

নমস্ত আশিষামীশ মনবে কারণাত্মনে ।
নমো ধর্মায় বৃহতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ ॥ ৪২ ॥

নমঃ—প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **আশিষাম্ ঈশ**—হে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ প্রদানকারী; **মনবে**—পরম মন অথবা পরম মনুকে; **কারণ-আত্মনে**—সর্ব কারণের পরম কারণকে; **নমঃ**—প্রণতি নিবেদন করি; **ধর্মায়**—যিনি শ্রেষ্ঠ ধর্মবিৎ তাঁকে; **বৃহতে**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অকুণ্ঠ-মেধসে**—যাঁর মেধা কখনও প্রতিহত হয় না; **পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **পুরাণায়**—প্রবীণতমকে; **সাংখ্য-যোগ-ঈশ্বরায়**—সাংখ্য-যোগতত্ত্বের ঈশ্বরকে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে ভগবান্! আপনি সমস্ত আশীর্বাদ প্রদানকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রবীণতম এবং সমস্ত ভোক্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভোক্তা। আপনি সমগ্র জগতের সাংখ্যযোগ-দর্শনের ঈশ্বর, কারণ আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আপনি সমস্ত ধর্মতত্ত্বের পরম ঈশ্বর, পরম মন এবং আপনার মেধা কখনও কোন পরিস্থিতিতে প্রতিহত হয় না। তাই বারবার আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কৃষ্ণায় অকুণ্ঠ মেধসে* শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনিশ্চয়তার তত্ত্ব (Theory of uncertainty) আবিষ্কার করে তাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবের মস্তিষ্কের এমন কোন ক্রিয়া থাকতে পারে না, যা স্থান ও কালের সীমার দ্বারা প্রতিহত হয় না। জীবকে বলা হয় অণু, পরম আত্মার একটি অতি ক্ষুদ্র পারমাণবিক অংশ, এবং তাই তার মস্তিষ্কও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ধারণ করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তিষ্কও সীমিত। শ্রীকৃষ্ণ যা বলেন এবং করেন, তা কখনও কাল ও স্থানের দ্বারা সীমিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৬) ভগবান বলেছেন—

> *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।*
> *ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥*

"হে অর্জুন! অতীতে যা কিছু হয়েছে, বর্তমানে যা কিছু হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হবে, পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি তা সবই জানি। আমি সমস্ত জীবদেরও জানি; কিন্তু আমাকে কেউই জানে না।"

শ্রীকৃষ্ণ সব কিছু জানেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকে কেউই জানতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিনিধির পক্ষে অনিশ্চয়তা তত্ত্বের (Theory of uncertainty) কোন প্রশ্নই ওঠে না। শ্রীকৃষ্ণ যা বলেন তা পূর্ণ ও নিশ্চিত, এবং তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সর্ব অবস্থাতেই প্রযোজ্য। আর শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু বলেন, সেই সম্বন্ধে যিনি যথাযথভাবে অবগত, তাঁর কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন *ভগবদ্গীতা যথাযথের* ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী, এবং যারা এই আন্দোলনে যুক্ত, তাদের পক্ষে অনিশ্চয়তার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণকে *আশিষাম্ ঈশ* বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। মহাপুরুষেরা, ঋষিরা ও দেবতারা সাধারণ জীবদের বরদান করতে সক্ষম, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই আবার পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে বরলাভ করেন শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদপুষ্ট না হলে, কেউই অন্য কাউকে বরদান করতে পারে না। *মনবে* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ. এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম মনুকে'। বৈদিক শাস্ত্রে পরম মনু বা প্রথম মনু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার স্বায়ম্ভুব মনু। সমস্ত মনু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন অবতার *(মন্বন্তর-অবতার)*। ব্রহ্মার এক দিনে চৌদ্দজন মনু, একমাসে চারশ কুড়িজন মনু, এবং এক বছরে ৫,০৪০ জন মনু, এবং তাঁর সারা জীবনে ৫,০৪,০০০ মনু রয়েছেন। যেহেতু সমস্ত মনুরা হচ্ছেন মানব-সমাজের পরিচালক, তাই চরমে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মানব-সমাজের পরম পরিচালক। *মনবে* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে সব রকম মন্ত্রের সিদ্ধি। মন্ত্র বদ্ধ-জীবদের ভববন্ধন থেকে উদ্ধার করে; তাই কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মন্ত্র উচ্চারণ করার ফলে, জীব যে-কোন অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে।

কারণাত্মনে—সব কিছুরই একটি কারণ রয়েছে. ঘটনাক্রমে জগতের উৎপত্তির মতবাদটি এই শ্লোকে খণ্ডন করা হয়েছে। যেহেতু সব কিছুরই একটি কারণ রয়েছে, তাই ঘটনাক্রমে কোন কিছু ঘটার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু তথাকথিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাই তারা মূর্খের মতো বলে যে, সব কিছু ঘটছে ঘটনাক্রমে। *ব্রহ্মসংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের পরম কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তাই এখানে তাঁকে *কারণাত্মনে* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি স্বয়ং সব কিছুর আদি কারণ, মূল ও বীজ। *বেদান্ত-সূত্রে* (১/১/২) যাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—পরম সত্য হচ্ছেন সমস্ত প্রকাশের পরম কারণ।

এখানে *সাংখ্য-যোগেশ্বরায়* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বা সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অচিন্ত্য যোগশক্তি ব্যতীত কাউকে ভগবান বলে স্বীকার করা যায় না। এই কলিযুগে যাদের অল্প একটু যোগশক্তি রয়েছে, তারা নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করছে, কিন্তু এই সমস্ত নকল ভগবানেরা কেবল মূর্খদের কাছ থেকেই স্বীকৃতি লাভ করে, কারণ একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সমস্ত যোগশক্তি ও যোগসিদ্ধি-সমন্বিত। বর্তমান কালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে সাংখ্য যোগপদ্ধতি, তার প্রবর্তন করেছে নিরীশ্বরবাদী কপিল, কিন্তু প্রকৃত সাংখ্য-যোগপদ্ধতির প্রবর্তক হচ্ছেন

শ্রীকৃষ্ণের এক অবতার কপিলদেব, যিনি ছিলেন দেবহূতির পুত্র। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের আর এক অবতার দত্তাত্রেয়ও সাংখ্য-যোগপদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সাংখ্য-যোগপদ্ধতি ও যোগশক্তির আদি উৎস।

পুরুষায় পুরাণায় শব্দ দুটিও বিশেষভাবে বিচার্য। *ব্রহ্মসংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণকে *আদি-পুরুষ* বলে স্বীকার করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতাতেও* শ্রীকৃষ্ণকে *পুরাণ-পুরুষ* বলে স্বীকার করা হয়েছে। যদিও তিনি সকলের মধ্যে সব চাইতে প্রবীণ, তবুও তিনি হচ্ছেন নবযৌবন-সম্পন্ন। এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *ধর্মায়*। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত ধর্মনীতির মূল প্রবর্তক, তাই বলা হয়েছে—*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবদ্-প্রণীতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/৩/১৯)। কেউই কোন নতুন ধরনের ধর্ম প্রবর্তন করতে পারে না, কারণ ধর্ম ইতিমধ্যেই রয়েছে, এবং তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ মূল ধর্ম সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে, সমস্ত ধর্ম পবিত্যাগ করতে আমাদের বলেছেন। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া। *মহাভারতেও* বলা হয়েছে—

যে চ বেদবিদো বিপ্রা যে চাধ্যাত্মবিদো জনাঃ।
তে বদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্মং সনাতনম্ ॥

এর অর্থ হচ্ছে যে যিনি সঠিকভাবে *বেদ* অধ্যয়ন কবেছেন, যিনি প্রকৃত বিপ্র অথবা বেদজ্ঞ, এবং যিনি আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি পরমেশ্বব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনুসরণ করাকেই জীবের সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা করেন। অতএব শিবও এখানে আমাদের সনাতন ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করছেন।

শ্লোক ৪৩

শক্তিত্রয়সমেতায় মীঢুষেঽহঙ্কৃতাত্মনে ।
চেতআকৃতিরূপায় নমো বাচোবিভূতয়ে ॥ ৪৩ ॥

শক্তি-ত্রয়—তিন প্রকার শক্তি; **সমেতায়**—উৎসকে; **মীঢুষে**—রুদ্রকে; **অহঙ্কৃত-আত্মনে**—অহঙ্কারের উৎস; **চেতঃ**—জ্ঞান, **আকৃতি**—কর্ম করার ঔৎসুক্য; **রূপায়**—রূপকে; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **বাচঃ**—বাণীকে; **বিভূতয়ে**—বিভিন্ন প্রকার ঐশ্বর্যকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি কর্তা, করণ ও কর্মের পরম নিয়ন্তা। তাই আপনি দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। আপনি অহঙ্কারের পরম নিয়ন্তা রুদ্র। আপনিই হচ্ছেন জ্ঞান ও বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্মের উৎস।

তাৎপর্য

সকলেই অহঙ্কারেব দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম করে। তাই শিব পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার মাধ্যমে অহঙ্কারকে পবিত্র করার চেষ্টা করছেন। যেহেতু শিব বা রুদ্র হচ্ছেন অহঙ্কারের নিয়ন্তা, তাই তিনি ভগবানের কৃপার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শুদ্ধ হতে চাইছেন, যাতে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জাগ্রত হতে পারে। রুদ্র অবশ্য সর্বদাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জাগ্রত, কিন্তু তিনি আমাদের লাভেব জন্য এইভাবে প্রার্থনা করছেন। নির্বিশেষবাদীদের কাছে শুদ্ধ স্বরূপ হচ্ছে *অহং ব্রহ্মাস্মি*—"আমি এই শরীর নই; আমি আত্মা।" কিন্তু তার প্রকৃত স্থিতিতে আত্মাকে ভগবদ্ভক্তির কার্য অনুষ্ঠান করতে হয়। তাই শিব প্রার্থনা করেছেন, যাতে তাঁর মন ও কর্ম উভয়ই বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে। এটিই হচ্ছে অহঙ্কারকে শুদ্ধ করার পন্থা। *চেতঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান'। পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত যথাযথভাবে কর্ম করা যায় না। জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হচ্ছে *বাচঃ* বা বেদের বাণী। এখানে *বাচঃ* শব্দটি বেদের বাণীকে বোঝাচ্ছে। সৃষ্টির উৎস হচ্ছে শব্দ, এবং শব্দ যদি শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তা হলে পূর্ণ জ্ঞান ও যথাযথ কর্ম প্রকাশিত হবে। তা সম্ভব হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করাব মাধ্যমে। এইভাবে শিব বারংবার প্রার্থনা করেছেন, *বেদের* পবিত্র নির্দেশ অনুসারে, তাঁব জ্ঞান ও কার্যকলাপের পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে, যাতে তাঁর দেহ, মন ও কার্যকলাপ শুদ্ধ হতে পারে। শিব পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে তাঁর মন, ইন্দ্রিয় ও বাণী কেবল ভক্তির প্রতি উন্মুখ হয়।

শ্লোক ৪৪

দর্শনং নো দিদৃক্ষূণাং দেহি ভাগবতার্চিতম্ ।
রূপং প্রিয়তমং স্বানাং সর্বেন্দ্রিয়গুণাঞ্জনম্ ॥ ৪৪ ॥

দর্শনম্—দর্শন; **নঃ**—আমাদের; **দিদৃক্ষূণাম্**—দর্শনাভিলাষী; **দেহী**—দয়া করে প্রদর্শন করুন; **ভাগবত**—ভক্তদের; **অর্চিতম্**—তাঁদের দ্বারা যেভাবে পূজিত; **রূপম্**—রূপ; **প্রিয়-তমম্**—সর্বাপেক্ষা প্রিয়; **স্বানাম্**—আপনার ভক্তদের; **সর্ব-ইন্দ্রিয়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **গুণ**—গুণ ; **অঞ্জনম্**—অত্যন্ত মনোহর

অনুবাদ

হে ভগবান! আমি আপনার সেই রূপ দর্শন করতে চাই, যা আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তরা আরাধনা করেন। আপনার অন্য বহু রূপ রয়েছে, কিন্তু আমি

বিশেষভাবে সেই রূপ দর্শন করতে চাই, যা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। দয়া করে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, সেই রূপ প্রদর্শন করুন, কারণ ভক্তদের আরাধ্য সেই রূপই কেবল ইন্দ্রিয়ের সমস্ত আবেদনগুলি পূর্ণরূপে তৃপ্ত করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রুতি বা বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরম সত্য হচ্ছে *সর্ব-কামঃ সর্ব-গন্ধঃ সর্ব-রসঃ,* অথবা, পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি *রসো বৈ সঃ,* অর্থাৎ, তিনি সমস্ত আস্বাদনীয় সম্পর্কের (রসের) উৎস। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় রয়েছে—দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, ইত্যাদি, এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমস্ত প্রবণতাগুলি তৃপ্ত হয়ে যায়। *হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—"ভক্তির অর্থ হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশের সেবায় যুক্ত করা।" *(নারদ-পঞ্চরাত্র)* আমাদেব জড় ইন্দ্রিয়গুলি কিন্তু কখনও ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে না; তাই সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হতে হয়। *সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্ তৎপরত্বেন নির্মলম্* ; সমস্ত উপাধি বা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে, শুদ্ধ হতে হয়। আমরা যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় যুক্ত করি, তখন ইন্দ্রিয়ের বাসনা বা প্রবণতাগুলি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়। শিব তাই ভগবানের সেই রূপ দর্শন করতে চেয়েছেন, যা বৌদ্ধ দার্শনিকদের চিন্তার অতীত।

নির্বিশেষবাদী ও শূন্যবাদীদেরও পরম সত্যের রূপ দর্শন করতে হয়। বৌদ্ধ মন্দিরে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের মূর্তি থাকে, কিন্তু বৈষ্ণব মন্দিরে ভগবান যেভাবে পূজিত হন (যেমন রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণ), সেইভাবে তাঁদের পূজা করা হয় না। বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রাধাকৃষ্ণ অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা হয়। শিব ভগবানের পূর্ণরূপ সেইভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে ভক্তরা তা দেখতে চান। *রূপং প্রিয়তমং স্বানাম্* শব্দগুলি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করছে যে, শিব ভগবানের সেই রূপ দর্শন করতে চান, যা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। *স্বানাম্* শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ভক্তরাই কেবল ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। জ্ঞানী, যোগী ও কর্মীরা ভগবানের ততটা প্রিয় নয়, কারণ কর্মীরা তাদের আবশ্যকতাগুলির সরবরাহকারীরূপে ভগবানকে দেখতে চায়, জ্ঞানীরা তাঁকে দর্শন করতে চায়, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার জন্য, এবং যোগীরা তাঁকে হৃদয়ে আংশিকভাবে প্রকাশমান পরমাত্মারূপে দর্শন করতে চায়, কিন্তু ভক্তেরা তাঁকে তাঁর পূর্ণ স্বরূপে দর্শন করতে চান। সেই স .ন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩০) বলা হয়েছে—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি বংশীবদনে অত্যন্ত নিপুণ, যাঁর নয়ন প্রস্ফুটিত কমল-দলের মতো, যাঁর মস্তক শিখিপুচ্ছের দ্বারা অলংকৃত, যাঁর সুন্দর রূপ বর্ষার জলভরা মেঘের মতো নীলবর্ণ, এবং যাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য কোটি কোটি কামদেবকে মোহিত করে।" এই বর্ণনা অনুসারে, এইভাবে শিব ভগবানকে দর্শন করতে চেয়েছেন—অর্থাৎ ভক্তদের কাছে তিনি যেভাবে প্রকাশিত হন, সেইভাবে তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাৎপর্য এই যে, শিব ভগবানকে তাঁর পূর্ণ স্বরূপে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, নির্বিশেষবাদী বা শূন্যবাদীদের মতো তাঁকে দর্শন করতে চাননি। ভগবান যদিও তাঁর বিবিধরূপে এক (*অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্ অনাদিম্*), তবুও গোপীজন-বল্লভরূপে ও গোপ-বালকদের সখারূপে তাঁর কৈশোর মূর্তি তাঁর পরম পূর্ণস্বরূপ। তাই বৈষ্ণবগণ ভগবানের বৃন্দাবন-লীলার রূপটিকে তাঁর সর্বপ্রধান স্বরূপ বলে মনে করেন।

শ্লোক ৪৫-৪৬

স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্ঘনশ্যামং সর্বসৌন্দর্যসংগ্রহম্ ।
চার্বায়তচতুর্বাহু সুজাতরুচিরাননম্ ॥ ৪৫ ॥
পদ্মকোশপলাশাক্ষং সুন্দরভ্রু সুনাসিকম্ ।
সুদ্বিজং সুকপোলাস্যং সমকর্ণবিভূষণম্ ॥ ৪৬ ॥

স্নিগ্ধ—স্নিগ্ধ; **প্রাবৃট্**—বর্ষা ঋতু; **ঘন-শ্যামম্**—নিবিড় মেঘের মতো; **সর্ব**—সমস্ত; **সৌন্দর্য**—সৌন্দর্য; **সংগ্রহম্**—সংগ্রহ; **চারু**—সুন্দর; **আয়ত**—আয়ত; **চতুঃ-বাহু**—চতুর্ভুজ; **সু-জাত**—অত্যন্ত সুন্দর; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **আননম্**—মুখ; **পদ্ম-কোশ**—পদ্মফুলের কোরক; **পলাশ**—পাপড়ি; **অক্ষম্**—চক্ষু; **সুন্দর**—সুন্দর; **ভ্রু**—ভ্রূ; **সু-নাসিকম্**—উন্নত নাসিকা; **সু-দ্বিজম্**—সুন্দর দাঁত; **সু-কপোল**—সুন্দর কপোল; **আসয়ম্**—মুখ; **সম-কর্ণ**—সমানভাবে সুন্দর কর্ণযুগল; **বিভূষণম্**—সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত।

অনুবাদ

ভগবানের রূপ বর্ষার সুস্নিগ্ধ মেঘের মতো শ্যামবর্ণ। বর্ষার ধারা যেমন স্নিগ্ধ, তাঁর দেহের সৌন্দর্যও তেমন স্নিগ্ধ। নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি। ভগবানের চতুর্ভুজ ও পদ্ম-পলাশের মতো নেত্রসমন্বিত তাঁর মুখমণ্ডল অপূর্ব সুন্দর। তাঁর নাসিকা উন্নত, তাঁর হাসি অত্যন্ত মনোহর, তাঁর কপোল অত্যন্ত সুন্দর এবং সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত তাঁর কর্ণযুগল সমানভাবে সুন্দর।

তাৎপর্য

গ্রীষ্মের প্রখর তাপের পর, আকাশে যখন ঘন কালো মেঘ দেখা যায়, তখন তা মনকে মুগ্ধ করে। *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*বর্হাবতংসম্ অসিতাম্বুদ-সুন্দরাঙ্গম্* । ভগবান তাঁর কেশে ময়ূরের পুচ্ছ ধারণ করেন, আর তাঁর অঙ্গকান্তি ঠিক বর্ষার জলভরা মেঘের মতো শ্যামবর্ণ। তাঁর রূপ অত্যন্ত সুন্দর এবং স্নিগ্ধ *কন্দর্প-কোটি-কমনীয়* । কৃষ্ণের সৌন্দর্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, কোটি-কোটি কন্দর্পের সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা চলে না। বিষ্ণুরূপে ভগবানের রূপ সমস্ত ঐশ্বর্যে বিভূষিত; শিব তাই নারায়ণ বা বিষ্ণুর সব চাইতে ঐশ্বর্যশালী রূপ দর্শন লাভের বাসনা করছেন। সাধারণত ভগবানের আরাধনা শুরু হয় নারায়ণ বা বিষ্ণুর আরাধনার মাধ্যমে, আর কৃষ্ণ ও রাধার আরাধনা সব চাইতে গোপনীয়। ভগবান নারায়ণের আরাধনা হয় পাঞ্চরাত্রিক বিধির দ্বারা, আর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা হয় ভাগবত-বিধির দ্বারা। পাঞ্চরাত্রিক-বিধির দ্বারা ভগবানের পূজা না করে, কেউ ভাগবত বিধির দ্বারা ভগবানের পূজা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে নবীন ভক্তরা পাঞ্চরাত্রিক বিধির দ্বারা বা *নারদ-পঞ্চরাত্রে* যে-সমস্ত বিধিবিধান দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা ভগবানের পূজা করেন। নবীন ভক্তরা রাধাকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারে না; তাই মন্দিরে বিধি-বিধানের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করা হয়। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ থাকলেও, নবীন ভক্তরা প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে থাকেন। পাঞ্চরাত্রিক-বিধি অনুসারে আরাধনাকে বলা হয় বিধিমার্গ, আর ভাগবত-বিধি অনুসারে আরাধনাকে বলা হয় রাগমার্গ। রাগমার্গ সেই সমস্ত ভক্তদের জন্য, যাঁরা বৃন্দাবনের স্তরে উন্নীত হয়েছেন।

ব্রজবাসীরা—গোপিকারা, মা যশোদা, নন্দ মহারাজ, গোপবালক, গাভী ও অন্য সকলে—প্রকৃতপক্ষে রাগমার্গ বা ভাগবত-মার্গের স্তরে রয়েছেন। তাঁরা মূলত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য ও শান্ত—এই পাঁচটি রসে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু যদিও ভাগবত-মার্গে এই পাঁচটি রস রয়েছে, তবুও বিশেষভাবে বাৎসল্য ও মাধুর্যেরই

প্রাধান্য বেশি। তবুও গোপবালকেরা বিপ্রলম্ভ সখ্যে বা উন্নততর সখ্য-রসে ভগবানের আরাধনা করেন। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকদের মধ্যে সখ্য রয়েছে, তবুও এই সখ্য কৃষ্ণ ও অর্জুনের ঐশ্বর্যপর সখ্য থেকে ভিন্ন। অর্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একজন সাধারণ সখার মতো আচরণ করার ফলে ভীত হয়েছিলেন; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপ বালকেরা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়েন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁরা সমকক্ষের মতো আচরণ করেন, ঠিক যেভাবে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করে থাকেন, এবং তাঁরা কখনই তাঁর ভয়ে ভীত নন, অথবা তাঁরা কখনও তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন না। এইভাবে রাগমার্গ বা ভাগবত-মার্গে কৃষ্ণের সঙ্গে উন্নততর স্তরের সখ্য রয়েছে, যথা বিপ্রলম্ভ সখ্য। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে ভগবানের সেবা বৃন্দাবনে রাগমার্গে দেখা যায়।

পাঞ্চরাত্রিক-বিধির নির্দেশ অনুসারে, বিধিমার্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে, কিছু অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তি এক লাফে রাগমার্গে উঠতে চায়। এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় সহজিয়া। কিছু আসুরিক ব্যক্তিও রয়েছে যারা গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করে তাদের জঘন্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়। এই সমস্ত অসুরেরা, যারা রাগমার্গ সম্বন্ধে গান লিখে বই ছাপায়, তারা নিশ্চিতভাবে নরকের মার্গে এগিয়ে চলেছে. দুর্ভাগ্যবশত তারা তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও সেই পথে টেনে নিয়ে যায়। কৃষ্ণভক্তদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই সমস্ত অসুরদের সঙ্গ বর্জন করা উচিত। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বিধিমার্গ অনুসরণ করে লক্ষ্মী-নারায়ণের আরাধনা করা উচিত, যদিও মন্দিরে ভগবান রাধাকৃষ্ণরূপে বিরাজমান থাকতে পারেন। রাধাকৃষ্ণের মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণও রয়েছেন; তাই কেউ যখন বিধিমার্গে ভগবানের আরাধনা করেন, তখন ভগবান লক্ষ্মী-নারায়ণরূপে তাঁর সেবা গ্রহণ করেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের বিধিমার্গে সেবা করার সমস্ত নির্দেশ পূর্ণরূপে দেওয়া হয়েছে। বিধিমার্গে সেবার ক্ষেত্রে যদিও চৌষট্টি প্রকার অপরাধ রয়েছে, কিন্তু রাগমার্গে এই সমস্ত অপরাধের বিচার নেই, কারণ সেই স্তরের ভক্ত এত উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হন যে, অপরাধের তখন আর কোন প্রশ্নই থাকে না। কিন্তু আমরা যদি বিধিমার্গ অনুসরণ না করে, অপরাধের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন না হই, তা হলে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না।

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনা করে শিব *চার্বায়ত-চতুর্বাহু সুজাত-রুচিরাননম্* পদটি

ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ তিনি নারায়ণ বা বিষ্ণুর সুন্দর চতুর্ভুজের বর্ণনা করেছেন। যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁরা তাঁকে *সুজাত-রুচিবাননম্* বলে বর্ণনা করেন। বিষ্ণুতত্ত্বে ভগবানের লক্ষ-লক্ষ রূপ রয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত রূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ হচ্ছে সব চাইতে সুন্দর। তাই যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁদের জন্য *সুজাত-রুচিরাননম্* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে।

শ্রীবিষ্ণুর চারটি হাতের বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। তাঁর যে দুটি হাতে তিনি পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন, সেগুলি ভক্তদের জন্য, এবং অপর দুটি হাত, যাতে তিনি চক্র ও গদা ধারণ করেন, সেগুলি অসুরদের জন্য। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সব কটি হাতই মঙ্গলময়, তা তিনি শঙ্খ ও ফুল অথবা গদা ও চক্র যা-ই ধারণ করুন না কেন। বিষ্ণুর চক্র ও গদার দ্বারা নিহত অসুরেরা চিৎ-জগতে উন্নীত হয়, ঠিক যেভাবে ভগবানের ভক্তরা পদ্ম ও শঙ্খ ধারণকারী হস্তের দ্বারা রক্ষিত হন। কিন্তু অসুরেরা চিৎ-জগতে উন্নীত হয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থান করে, কিন্তু ভক্তরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন। আর যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁরা অচিরেই গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন।

ভগবানের সৌন্দর্য বর্ষার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয়, তখন তা মানুষের কাছে অধিক থেকে অধিকতর মনোহর বলে মনে হয়। গ্রীষ্মকালে প্রখর তাপের পর, বর্ষা ঋতু মানুষের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। বস্তুতপক্ষে, গ্রামের লোকেরা তখন তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, সেই বর্ষার ধারা উপভোগ করে। তাই ভগবানের দেহের সৌন্দর্যকে বর্ষার জলভরা মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভক্তরা ভগবানের সৌন্দর্য উপভোগ করেন, কারণ তা হচ্ছে সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি। তাই এখানে *সর্ব-সৌন্দর্য-সংগ্রহম্* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ বলতে পারে না যে, ভগবানের শরীরের কোন অঙ্গ কম সুন্দর। তা সর্বতোভাবে *পূর্ণম্*। সব কিছুই পূর্ণ—ভগবানের সৃষ্টি, ভগবানের সৌন্দর্য এবং ভগবানের অঙ্গসৌষ্ঠব। এই সবই এত পূর্ণ যে, কেউ যখন ভগবানের সৌন্দর্য দর্শন করে, তখন তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে যায়। *সর্ব-সৌন্দর্য* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, জড় জগৎ ও চিৎ-জগতে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য রয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত সৌন্দর্য ভগবানের মধ্যে রয়েছে। জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী উভয়েই ভগবানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। যেহেতু ভগবান সুর ও অসুর, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী, সকলকেই আকর্ষণ করেন, তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ। তেমনই তাঁর ভক্তরাও সকলকে আকর্ষণ করেন। *ষড়্-গোস্বামী-স্তোত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে—*ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ*—গোস্বামীরা ধীর (ভক্ত) ও অধীর (অসুর) উভয়ের

কাছেই সমান প্রিয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন তিনি অসুরদের কাছে খুব একটা প্রিয় ছিলেন না, কিন্তু ষড়্‌গোস্বামীরা যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন তাঁরা অসুরদেরও প্রিয় ছিলেন। তাঁর ভক্তের সঙ্গে আচরণে এটিই হচ্ছে ভগবানের বৈশিষ্ট্য। ভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের নিজের থেকেও বেশি কৃতিত্ব প্রদান করেন যেমন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করেননি, তিনি কেবল নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং এইভাবে যুদ্ধ জয়ের সমস্ত কৃতিত্ব তিনি অর্জুনকে দান করেছেন। *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্* —"হে সব্যসাচী (অর্জুন)! এই যুদ্ধে তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও।" (*ভগবদ্গীতা* ১১/৩৩) ভগবান সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব অর্জুনকে দেওয়া হয়েছিল। তেমনই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সব কিছুই ঘটছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার সমস্ত কৃতিত্ব দিচ্ছেন তাঁর ঐকান্তিক সেবকদের। এইভাবে ভগবানকে এখানে *সর্ব-সৌন্দর্য-সংগ্রহম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৭-৪৮

প্রীতিপ্রহসিতাপাঙ্গমলকৈ রূপশোভিতম্ ।
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কদুকূলং মৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥ ৪৭ ॥
স্ফুরৎকিরীটবলয়হারনূপুরমেখলম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মমালামণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রীতি—অনুগ্রহপূর্ণ; **প্রহসিত**—হাস্যোজ্জ্বল; **অপাঙ্গম্**—তির্যক দৃষ্টিপাত; **অলকৈঃ**—কুঞ্চিত কেশের দ্বারা; **রূপ**—সৌন্দর্য; **শোভিতম্**—সুশোভিত; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **পঙ্কজ**—পদ্মফুলের; **কিঞ্জল্ক**—কেশর; **দুকূলম্**—বস্ত্র, **মৃষ্ট**—উজ্জ্বল; **কুণ্ডলম্**—কর্ণকুণ্ডল, **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **কিরীট**—মুকুট, **বলয়**—কঙ্কণ; **হার**—কণ্ঠহার; **নূপুর**—নূপুর, **মেখলম্**—মেখলা; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—গদা; **পদ্ম**—পদ্ম; **মালা**—মালা; **মণি**—মণি; **উত্তম**—সর্বোত্তম; **ঋদ্ধিমৎ**—সেই কারণে আরও অধিক সুন্দর

অনুবাদ

তাঁর উদার ও প্রীতিপূর্ণ হাস্য এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি নেত্রান্ত থেকে তির্যকভাবে দৃষ্টিপাতের ফলে, ভগবান অপূর্ব সুন্দর। তাঁর কৃষ্ণ কেশদাম কুঞ্চিত, এবং

পদ্মফুলের কেশরের মতো তাঁর পীতবর্ণ বসন বায়ুর মধ্যে উড়ছে। তাঁর উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল, মুকুট, বলয়, হার, নূপুর, মেখলা এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম সহ অন্যান্য অলংকারসমূহ তাঁর বক্ষের কৌস্তুভ-মণির স্বাভাবিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে।

তাৎপর্য

প্রহসিতাপাঙ্গ শব্দটি শ্রীকৃষ্ণের হাস্য এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি, বিশেষ করে ব্রজগোপিকাদের প্রতি তির্যক দৃষ্টিপাতকে ইঙ্গিত করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজগোপিকাদের হৃদয়ে মাধুর্য-রসের অনুভূতি বৃদ্ধি করেন, তখন তিনি সর্বদা হাস্য মুদ্রায় থাকেন। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম তাঁর হাতে অথবা হাতের তালুতে দেখা যায়। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে, হাতের তালুতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্ন মহাপুরুষের লক্ষণ, বিশেষ করে তা পরমেশ্বর ভগবানকে সূচিত করে।

শ্লোক ৪৯

সিংহস্কন্ধত্বিষো বিভ্রৎসৌভগগ্রীবকৌস্তুভম্ ।
শ্রিয়ানপায়িন্যা ক্ষিপ্তনিকষাশ্মোরসোল্লসৎ ॥ ৪৯ ॥

সিংহ—সিংহ; **স্কন্ধ**—স্কন্ধ, **ত্বিষঃ**—কুঞ্চিত কেশ, **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **সৌভগ**—ভাগ্যশালী; **গ্রীব**—গলা, **কৌস্তুভম্**—কৌস্তুভ মণি; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্য; **অনপায়িন্যা**—অচঞ্চলা; **ক্ষিপ্ত**—পরাভূত করে; **নিকষ**—কষ্টিপাথর; **অশ্ম**—পাথর; **উরসা**—বক্ষের দ্বারা; **উল্লসৎ**—উজ্জ্বল।

অনুবাদ

ভগবানের স্কন্ধদেশ ঠিক সিংহের মতো। সেই স্কন্ধদেশে ফুলের মালা, কণ্ঠহার ও মণিমালা সর্বদা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছে। এগুলি ছাড়াও রয়েছে কৌস্তুভ-মণির সৌন্দর্য আর ভগবানের শ্যাম বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন, যা হচ্ছে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। এই উজ্জ্বল শ্রীবৎস-চিহ্ন স্বর্ণ-রেখাঙ্কিত কষ্টিপাথরের সৌন্দর্যকেও তিরস্কার করছে ।

তাৎপর্য

সিংহের স্কন্ধদেশে কেশরাদি দেখতে সর্বদাই খুব সুন্দর লাগে। তেমনই, ভগবানের স্কন্ধদেশ হচ্ছে সিংহেরই মতো, এবং কৌস্তুভ-মণিসহ কণ্ঠহার ও ফুলের মালা

সিংহের সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। ভগবানের বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-রেখা রয়েছে, তা হচ্ছে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। তার ফলে ভগবানের বক্ষস্থলের সৌন্দর্য স্বর্ণ-রেখাঙ্কিত কষ্টিপাথরের সৌন্দর্যের থেকেও অধিক সুন্দর। সোনার শুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য যখন কালো কষ্টিপাথরে দাগ দেওয়া হয়, তখন সেই স্বর্ণরেখার দ্বারা অঙ্কিত হওয়ার ফলে, সেই কষ্টিপাথরকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর লাগে, কিন্তু ভগবানের বক্ষস্থলের সৌন্দর্য কষ্টিপাথরের সেই সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে।

শ্লোক ৫০

পূররেচকসংবিগ্নবলিবল্গুদলোদরম্ ।
প্রতিসংক্রাময়দ্বিশ্বং নাভ্যাবর্তগভীরয়া ॥ ৫০ ॥

পূর—শ্বাস গ্রহণ করে; **রেচক**—শ্বাস ত্যাগ করে, **সংবিগ্ন**—বিচলিত; **বলি**—উদরের ত্রিবলি-রেখা; **বল্গু**—সুন্দর; **দল**—অশ্বত্থের পত্রের মতো; **উদরম্**—উদর; **প্রতিসংক্রাময়ৎ**—যেখান থেকে নির্গত হয়ে, পুনরায় সেখানেই প্রবেশ করেছে; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **নাভ্যা**—নাভি; **আবর্ত**—আবর্তিত হয়ে; **গভীরয়া**—গভীরতার দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবানের উদর ত্রিবলি-রেখায় শোভিত। তা অশ্বত্থ পত্রের মতো গোল, এবং তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে, সেই উদর অত্যন্ত সুন্দরভাবে কম্পিত হয়। ভগবানের নাভিদেশ এত গভীর যে, মনে হয় যেন সেখান থেকে সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়ে পুনরায় সেখানেই প্রবেশ করতে চায়।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের নাভি থেকে উদ্ভূত কমল-নালে। সেই কমল-নালের উপর উপবিষ্ট হয়ে, ব্রহ্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের নাভি এত গভীর এবং কুণ্ডলাকার যে, মনে হয় যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে, পুনরায় আবার সেই নাভিতেই ফিরে যেতে চায়। ভগবানের নাভি ও তাঁর উদরের ত্রিবলি-রেখা তাঁর সৌন্দর্যকে সর্বদা বর্ধিত করে। ভগবানের দেহের সৌন্দর্যের এই বিস্তৃত বিবরণ বিশেষভাবে সূচিত করে যে, ভগবান হচ্ছেন সবিশেষ পুরুষ। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের দেহের সৌন্দর্য কখনও বুঝতে পারে না, যার বর্ণনা শিব এখানে তাঁর বন্দনার মাধ্যমে করেছেন। নির্বিশেষবাদীরা যদিও সাধারণত শিবের পূজা করে থাকে, তবুও ভগবানের দেহের সৌন্দর্য বর্ণনা করে

শিব যে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন, তা বুঝতে তাঁরা অক্ষম। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩৩) ভগবান বিষ্ণুকে *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি সর্বদা ব্রহ্মা ও শিবের দ্বারা পূজিত।

শ্লোক ৫১

শ্যামশ্রোণ্যধিরোচিষ্ণুদুকূলস্বর্ণমেখলম্ ।
সমচার্বঙ্ঘ্রিজঙ্ঘোরুনিম্নজানুসুদর্শনম্ ॥ ৫১ ॥

শ্যাম—শ্যামবর্ণ; **শ্রোণি**—কোমরের নিম্নভাগ; **অধি**—অতিরিক্ত; **রোচিষ্ণু**—মনোহর; **দুকূল**—বস্ত্র; **স্বর্ণ**—স্বর্ণনির্মিত; **মেখলম্**—কোমরবন্ধ; **সম**—সমান; **চারু**—সুন্দর; **অঙ্ঘ্রি**—শ্রীপাদপদ্ম; **জঙ্ঘ**—জঙ্ঘা; **উরু**—উরুদ্বয়; **নিম্ন**—অনুন্নত; **জানু**—জানুদ্বয়; **সু-দর্শনম্**—অত্যন্ত সুন্দর।

অনুবাদ

ভগবানের কোমরের নিম্নভাগ শ্যামবর্ণ এবং তা পীতবর্ণ বস্ত্র ও স্বর্ণনির্মিত মেখলার দ্বারা সুশোভিত। তাঁর পাদপদ্ম, জঙ্ঘা, উরুদ্বয় ও জানুযুগল পরস্পর সমান এবং অপূর্ব সুন্দর। তাঁর সমগ্র শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/৩/২০) যে বারোজন মহাজনের উল্লেখ করা হয়েছে, শিব তাঁদের অন্যতম। সেই মহাজনেরা হচ্ছেন স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি বা শুকদেব গোস্বামী ও যমরাজ। যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা সাধারণত শিবের পূজা করে, তাদের কর্তব্য ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সম্বন্ধে অবগত হওয়া। এখানে শিব অত্যন্ত কৃপাপূর্বক ভগবানের দেহের সৌন্দর্য সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এইভাবে বোঝা যায়, নির্বিশেষবাদীরা যে বলে ভগবানের কোন রূপ নেই, তা কোন অবস্থাতেই স্বীকার করা যায় না।

শ্লোক ৫২

পদা শরৎপদ্মপলাশরোচিষা
নখদ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা ।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধ্বসং
পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্ ॥ ৫২ ॥

পদা—শ্রীপাদপদ্মের দ্বারা; **শরৎ**—শরৎ ঋতু; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **পলাশ**—দল, **রোচিষা**—অত্যন্ত মনোহর; **নখ**—নখ; **দ্যুভিঃ**—জ্যোতির দ্বারা; **নঃ**—আমাদের, **অন্তঃ-অঘম্**—মল, **বিধুন্বতা**—যা পরিষ্কার করতে পারে; **প্রদর্শয়**—প্রদর্শন করুন; **স্বীয়ম্**—নিজের, **অপাস্ত**—হ্রাস করে, **সাধ্বসম্**—জড় জগতের বিপত্তি, **পদম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **গুরো**—হে পরম গুরুদেব; **মার্গ**-পথ, **গুরুঃ**—শ্রীগুরুদেব; **তমঃ-জুষাম্**—যারা অজ্ঞানতাবশত দুঃখকষ্ট ভোগ করছে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্ম-যুগল শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মতো, এবং আপনার সেই পাদপদ্মের নখরাজির দীপ্তি বদ্ধ জীবদের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে। হে ভগবান! আপনি আমাকে কৃপাপূর্বক আপনার সেই রূপ প্রদর্শন করুন, যা ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর করে। হে ভগবান! আপনি সকলের পরম গুরু; অতএব অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমস্ত বদ্ধ জীব আপনার কাছ থেকে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

শিব এইভাবে প্রামাণিকরূপে ভগবানের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা করেছেন এখন তিনি ভগবানের চরণ কমল দর্শন করতে চাইছেন। যখন কোন ভক্ত ভগবানের দিব্যরূপ দর্শন করতে চান, তখন তিনি ভগবানের দেহের ধ্যান শুরু করেন তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে। *শ্রীমদ্ভাগবতকে* দিব্য বাণীরূপে ভগবানের প্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয়, এবং তার বারোটি স্কন্ধ ভগবানের চিন্ময় রূপের বারোটি অঙ্গ, *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বলে বর্ণনা করা হয়। তাই শিব নির্দেশ দিয়েছেন যে, সর্বপ্রথমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ, কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করতে চান, তা হলে তাঁকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ থেকে পাঠ শুরু করতে হবে।

ভগবানের চরণ কমলের সৌন্দর্যের উপমা শরৎকালের পদ্মপলাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে শরৎকালে নদী ও সরোবরের ঘোলাটে অথবা কর্দমাক্ত জল স্বচ্ছ হয়ে যায় সেই সময় যে পদ্ম ফোটে তা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়। পদ্মফুলের তুলনা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গে করা হয়, এবং সেই পদ্মদলের তুলনা করা হয়, ভগবানের পায়ের নখের সঙ্গে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নখ অত্যন্ত উজ্জ্বল, যা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *আনন্দ-চিন্ময়-সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য*—ভগবানের দিব্য রূপের প্রতিটি অঙ্গ

আনন্দ-চিন্ময়-সদুজ্জ্বল । এইভাবে তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ নিরন্তর অতি উজ্জ্বল। সূর্যকিরণ যেমন এই জড় জগতের অন্ধকার দূর করে, ভগবানের অঙ্গজ্যোতি তেমনই বদ্ধ জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করেন। অর্থাৎ, যাঁরা ঐকান্তিকভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে চান এবং ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করতে চান, তাঁদের সর্বপ্রথমে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার চেষ্টা করতে হবে। কেউ যখন ভগবানের সেই পাদপদ্ম দর্শন করেন, তখন তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সন্দেহ ও ভয় দূর হয়ে যায়।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে হলে, নির্ভয় হতে হয়। *অভয়ং সত্ত্ব-সংশুদ্ধিঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৬/১)। জড় বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার ফলেই ভয়ের উদয় হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৩৭) বলা হয়েছে, *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ* —দেহাত্ম-বুদ্ধির ফলে ভয়ের উদয় হয়। মানুষ যতক্ষণ দেহাত্ম-বুদ্ধিতে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তার ভয় থাকে, কিন্তু সেই জড় ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই, তিনি *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হয়ে অথবা আত্ম উপলব্ধি লাভ করে, তৎক্ষণাৎ নির্ভয় হন। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৪)। নির্ভয় না হয়ে কখনও আনন্দময় হওয়া যায় না। ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদা নির্ভয় ও আনন্দময়, কারণ তাঁরা নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত। আরও বলা হয়েছে—

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/২০)

ভগবদ্ভক্তি-যোগের অনুশীলনের ফলে, নির্ভয় ও আনন্দময় হওয়া যায়। নির্ভয় ও আনন্দময় না হলে, ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *ভগবৎ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানং মুক্ত-সঙ্গস্য জায়তে* । এই শ্লোকটি তাঁদেরকে ইঙ্গিত করে, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে এই জড় জগতের ভয় থেকে মুক্ত হয়েছেন। কেউ যখন এইভাবে মুক্ত হন, তখন তিনি ভগবানের দিব্যরূপ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই ভগবদ্ভক্তি-যোগ অনুশীলন করার জন্য শিব সকলকে উপদেশ দিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে, তা করার ফলে যথাযথভাবে মুক্ত হয়ে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করা যায়।

আরও উল্লেখ করা হয়েছে—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ভগবান হচ্ছেন পরম গুরুদেব, এবং ভগবানের প্রামাণিক প্রতিনিধিও হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব। ভগবান তাঁর চরণ-কমলের নখের জ্যোতির দ্বারা তাঁর ভক্তের অন্তর থেকে জ্ঞানের আলোক প্রকাশ করেন, এবং ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব ভক্তকে বাইরে থেকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন। কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করার ফলে এবং নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করার ফলে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় এবং বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

এইভাবে *বেদে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি যাঁর অবিচলিত ভক্তি রয়েছে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞান তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৫৩

এতদ্রূপমনুধ্যেয়মাত্মশুদ্ধিমভীপ্সতাম্ ।
যদ্ভক্তিযোগোঽভয়দঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্ ॥ ৫৩ ॥

এতৎ—এই; **রূপম্**—রূপ; **অনুধ্যেয়ম্**—ধ্যান করা অবশ্য কর্তব্য; **আত্ম**—আত্মা, **শুদ্ধিম্**—পবিত্রীকরণ; **অভীপ্সতাম্**—যাঁরা তা আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁদের; **যৎ**—যা; **ভক্তি-যোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **অভয়-দঃ**—প্রকৃত অভয় প্রদানকারী; **স্ব-ধর্মম্**—স্বীয় বৃত্তিকারক কর্তব্য; **অনুতিষ্ঠতাম্**—সম্পাদন করে।

অনুবাদ

হে ভগবান! যাঁরা তাঁদের জীবন পবিত্র করতে চান, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুসারে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা। যাঁরা তাঁদের স্বধর্ম অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং যাঁরা ভয় থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁদের এই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

কথিত হয় যে, ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, লীলা ও পরিকরদের স্থূল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; তাই ইন্দ্রিয়গুলির পবিত্রীকরণের জন্য ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া কর্তব্য, এবং তার ফলেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়। এখানে কিন্তু ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের ধ্যান করেন, তাঁরা

নিশ্চিতভাবে জড় ইন্দ্রিয়ের কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং তার ফলে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। এই যুগে জনসাধারণের কাছে 'ধ্যান' শব্দটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু তারা ধ্যান শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি তা জানে না। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, যোগীরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন। *ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১)। সেটিই হচ্ছে যোগীদের প্রকৃত কর্তব্য—নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করা। শিব তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁদের এই ধ্যানের পন্থায় বা অষ্টাঙ্গ-যোগের পন্থায় যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, এবং তা কেবল তাঁদের নিরন্তর ভগবৎ-দর্শনেই সাহায্য করবে তাই নয়, অধিকন্তু বৈকুণ্ঠলোকে বা গোলোক বৃন্দাবনে তাঁর পার্ষদত্ব লাভ করে প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দর্শন করতে পারবেন।

স্ব-ধর্মম্ শব্দটি (*স্বধর্মম্ অনুতিষ্ঠতাম্* বর্ণনা অনুসারে) ইঙ্গিত করে যে, কেউ যদি তাঁর জীবনের কোন প্রকার সুরক্ষা কামনা করেন, তা হলে ভক্তিযোগের দ্বারা সমর্থিত বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশীলন সম্পাদন করা কর্তব্য। সাধারণত মানুষ মনে করে যে, কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্পাদন করার ফলেই কেবল নির্ভয় হওয়া যায় অথবা নিশ্চিতরূপে মুক্তিলাভ করা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত কর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত ভক্তিযোগ সহকারে সম্পাদিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্ভয় হওয়া যায় না। *ভগবদ্গীতায়* কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ভক্তিযোগের স্তরে না আসা পর্যন্ত, অন্য সমস্ত যোগগুলি জীবনের চরম সিদ্ধিলাভে সাহায্য করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্তিযোগই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র উপায়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও* সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়েছে। সেই আলোচনায় রামানন্দ রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্পর্কে বলেছেন যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানও বাহ্য ক্রিয়া (*এহো বাহ্য)।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বুঝিয়েছেন যে, কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে মুক্তিলাভের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অবশেষে রামানন্দ রায় ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করেছেন—*স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৩)। জীবনের অবস্থা নির্বিশেষে কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করেন, যার শুরু হয় ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখ থেকে

ভগবানের চিন্ময় বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমে (*শ্রুতি-গতাম্*), তখন তিনি ধীরে ধীরে অজেয় পরমেশ্বর ভগবানকে জয় করতে পারেন।

ভগবানকে বলা হয় অজিত, কিন্তু যিনি শরণাগত হয়ে স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের বাণী শ্রবণ করেন, তিনি অজিত ভগবানকে জয় করতে পারেন। অর্থাৎ কেউ যদি মুক্তিলাভের ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে তাঁকে কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠান করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে তাঁকে ভক্তিযোগেও যুক্ত হতে হবে, যার শুরু হয় আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। এই পন্থা তাঁকে অজিত ভগবানকে জয় করতে সাহায্য করবে, এবং তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর, তিনি ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করবেন।

শ্লোক ৫৪

ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্লভঃ সর্বদেহিনাম্ ।
স্বারাজ্যস্যাপ্যভিমত একান্তেনাত্মবিদ্‌গতিঃ ॥ ৫৪ ॥

ভবান্—আপনি; **ভক্তি-মতা**—ভক্তের দ্বারা; **লভ্যঃ**—লভ্য; **দুর্লভঃ**—দুর্লভ; **সর্ব দেহিনাম্**—অন্য সমস্ত জীবদের; **স্বারাজ্যস্য**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **অপি**—ও; **অভিমতঃ**—চরম লক্ষ্য; **একান্তেন**—কৈবল্যের দ্বারা; **আত্ম-বিৎ**—আত্ম-তত্ত্ববিদের; **গতিঃ**—চরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান! স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রও জীবনের চরম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি লাভে অভিলাষী। তেমনই, আপনি ব্রহ্মবাদীদেরও চরম লক্ষ্য। কিন্তু, তাদের পক্ষে আপনাকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, অথচ যাঁরা আপনার ভক্ত, তাঁরা আপনাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—*বেদেষু দুর্লভম্ অদুর্লভম্ আত্ম ভক্তৌ*। তা ইঙ্গিত করে যে, কেবল বেদান্ত-দর্শন বা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে, জীবনের চরম লক্ষ্য বা জীবের পরম গন্তব্যস্থল বৈকুণ্ঠলোক বা গোলোক বৃন্দাবন প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, ভগবদ্ভক্তের পক্ষে সেই পরম সিদ্ধি লাভ করা অতি সহজ। *বেদেষু দুর্লভম্ অদুর্লভম্ আত্ম-ভক্তৌ*—এর অর্থ হচ্ছে তাই। এই শ্লোকে শিব সেই কথাই প্রতিপন্ন করেছেন। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগের দ্বারা ভগবানকে

প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যাঁরা ভক্তিযোগী, তাঁদের পক্ষে ভগবানকে লাভ করা মোটেই কঠিন নয়। *স্বারাজ্যস্য* শব্দটি স্বর্গলোকের রাজা ইন্দ্রকে বোঝায়। সাধারণত কর্মীরা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু স্বর্গের রাজা ইন্দ্রও ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করতে চায়। যারা মনে করে *অহং ব্রহ্মাস্মি* ('আমি হচ্ছি পরম ব্রহ্ম, আমি পরম সত্যের সঙ্গে এক'), তারাও চরমে বৈকুণ্ঠলোকে বা গোলোক বৃন্দাবনে পূর্ণ মুক্তিলাভের বাসনা করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানা যায়। কেউ যখন এই ভক্তির দ্বারা পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন।"

অতএব, কেউ যদি চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভক্তিযোগের অনুশীলনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে চেষ্টা করতে হবে। এই প্রকার উপলব্ধি ব্যতীত, কখনও চিৎ-জগতে প্রবেশ করা যায় না। কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারেন অথবা নিজেকে ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করতে পারেন *(অহং ব্রহ্মাস্মি)*, কিন্তু তা চরম তত্ত্বজ্ঞান নয়। ভক্তিযোগের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য, তখনই কেবল জীবনের প্রকৃত পূর্ণতা লাভ হয়।

শ্লোক ৫৫

তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া ।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎপাদমূলং বিনা বহিঃ ॥ ৫৫ ॥

তম্—আপনাকে; **দুরারাধ্যম্**—আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **সতাম্ অপি**—সব চাইতে উন্নত ব্যক্তিও; **দুরাপয়া**—দুর্লভ; **একান্ত**—শুদ্ধ; **ভক্ত্যা**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **কঃ**—সেই ব্যক্তিটি কে; **বাঞ্ছেৎ**—বাসনা করা উচিত; **পাদ-মূলম্**—চরণপদ্ম; **বিনা**—ব্যতীত; **বহিঃ**—বহির্মুখী ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

হে ভগবান! ভগবদ্ভক্তি মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও দুর্লভ, কিন্তু এই ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার প্রসন্নতা-বিধান করা যায়। কেউ যদি জীবনের সিদ্ধিলাভের বিষয়ে প্রকৃতই নিষ্ঠাপরায়ণ হন, তা হলে আত্ম-উপলব্ধির অন্য পন্থা তিনি কেন গ্রহণ করবেন?

তাৎপর্য

সতাম্ শব্দটি পরমার্থবাদীকে ইঙ্গিত করে। তিন প্রকার পরমার্থবাদী রয়েছেন—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। তাঁদের মধ্যে ভক্তই হচ্ছেন ভগবানকে লাভ করার সব চাইতে উপযুক্ত। এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, ভক্তি-বহির্মুখ ব্যক্তিরাই কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অন্বেষণ করে না। মূর্খ মানুষেরাই কেবল মনে করে যে, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ইত্যাদি যে-কোন উপায়েই ভগবানকে লাভ করা যায়। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবানের কৃপা লাভ করা অসম্ভব। *দুরারাধ্য* শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৫৬

যত্র নির্বিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে ।
বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্ বীর্যশৌর্যবিস্ফূর্জিতভ্রুবা ॥ ৫৬ ॥

যত্র—যেখানে; **নির্বিষ্টম্ অরণম্**—সম্পূর্ণরূপে শরণাগত আত্মা; **কৃত-অন্তঃ**—দুর্দম্য কাল; **ন অভিমন্যতে**—আক্রমণ করে না; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **বিধ্বংসয়ন্**—সংহার দ্বারা; **বীর্য**—পরাক্রম; **শৌর্য**—প্রভাব; **বিস্ফূর্জিত**—কেবলমাত্র বিস্তারের দ্বারা; **ভ্রুবা**—ভ্রূর।

অনুবাদ

অজেয় কাল কেবলমাত্র তাঁর ভ্রূকুটি বিলাসের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস করে। কিন্তু যাঁরা সম্পূর্ণরূপে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত ভক্ত, তাঁদের কাছে ভয়ঙ্কর কাল আসতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৩৪) বলা হয়েছে যে, মৃত্যুরূপে ভগবান সকলের সমস্ত সম্পদ হরণ করে নেন। *মৃত্যুঃ সর্ব-হরশ্চাহম্*—"আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু।" বদ্ধ জীবেরা যা কিছু সৃষ্টি করে, মৃত্যুরূপে ভগবান তা সব ছিনিয়ে নেন। এই জড় জগতে কালের প্রভাবে সব কিছুই বিনাশশীল। কিন্তু কাল তার সমস্ত শক্তি দিয়েও ভক্তের কার্যকলাপে বাধা দিতে পারে না, কারণ ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত। সেই কারণেই কেবল ভক্ত দুর্জয় কালের প্রভাব থেকে

মুক্ত। কর্মী ও জ্ঞানীদের সমস্ত কার্যকলাপ, যার সঙ্গে ভক্তির কোন সম্পর্ক নেই, তা কালক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। কর্মীদের জড়-জাগতিক সাফল্য একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে; তেমনই, জ্ঞানীদের নির্বিশেষ উপলব্ধিও কালের প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)

কর্মীদের কি কথা, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য জ্ঞানীরা কঠোর তপস্যা করে, কিন্তু তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করতে পাবে না। তাই তারা পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। সম্পূর্ণরূপে অনন্য ভক্তিতে স্থিত না হওয়া পর্যন্ত, স্বর্গলোকে অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও, মুক্তির কোন নিশ্চয়তা থাকে না। কিন্তু ভক্তির প্রভাবে ভক্ত যা লাভ করেন, তা কখনও কালের প্রভাবে নষ্ট হয় না। এমন কি ভক্ত যদি তাঁর ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণরূপে নাও করতে পারেন, তবুও যেখানে শেষ করেছিলেন, তাঁর পরবর্তী জন্মে তিনি সেখান থেকে আবার ভগবদ্ভক্তি শুরু করবেন। এই প্রকার সুযোগ কর্মী ও জ্ঞানীদের দেওয়া হয় না, কারণ তাদের সাধনা বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভক্তের প্রাপ্তি কখনও বিনষ্ট হয় না, কারণ তা পূর্ণ হোক অথবা অপূর্ণ হোক, তা নিরন্তর চলতে থাকে। সেটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।* কেউ যদি তাঁর ভক্তিযোগের সাধনা পূর্ণ করতে নাও পারেন, তবুও তিনি পরবর্তী জীবনে শুদ্ধ ভক্ত পরিবারে অথবা ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় তাঁর অসম্পূর্ণ সাধনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। এই প্রকার পরিবারে মানুষেরা ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতিসাধন করার অত্যন্ত সুন্দর সুযোগ প্রাপ্ত হন।

যমরাজ যখন যমদূতদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন ভক্তদের কাছে না যেতে। তিনি বলেছিলেন, "ভক্তদের দূর থেকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো, এবং তাঁদের কাছে যেও না।" এইভাবে ভগবদ্ভক্ত যমরাজের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নন। যমরাজ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, এবং তিনি সমস্ত জীবের মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করেন। তবুও ভক্তদের ক্ষেত্রে তাঁর করণীয় কিছুই নেই। মূর্তিমান মহাকাল তাঁর চোখের পলকে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু ভক্তদের তিনি কিছু করতে পারেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্ত এই জীবনে যে-ভক্তি সম্পাদন করেছেন, তা কালের প্রভাবে নষ্ট হয় না। এই প্রকার আধ্যাত্মিক সম্পদ কালের প্রভাবের অতীত হওয়ার ফলে, অপরিবর্তিতই থাকে।

শ্লোক ৫৭

ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৫৭ ॥

ক্ষণ-অর্ধেন—ক্ষণার্ধের দ্বারা; **অপি**—ও; **তুলয়ে**—তুলনা; **ন**—কখনই না; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোক; **ন**—না; **অপুনঃ-ভবম্**—পরমেশ্বরে লীন হয়ে যাওয়া; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঙ্গি**—সঙ্গী; **সঙ্গস্য**—সঙ্গলাভের সুযোগ গ্রহণ করে; **মর্ত্যানাম্**—বদ্ধ জীবদের; **কিম্ উত**—কি রয়েছে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ।

অনুবাদ

কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে ক্ষণার্ধের জন্যও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভের সুযোগ পান, তা হলে আর তাঁর কর্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। তা হলে যে সমস্ত দেবতারা জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাঁদের কাছ থেকে বর লাভ করার প্রতি তাঁর কি আর আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

তাৎপর্য

এখানে কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্তদের মধ্যে ভক্তদের সর্বোত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গেয়েছেন—*কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-পুষ্পায়তে* (*চৈতন্য-চরিতামৃত*)। *কৈবল্য* মানে হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যাওয়া, আর *ত্রিদশ-পুর্* হচ্ছে স্বর্গলোক, যেখানে দেবতারা থাকেন। এইভাবে ভক্তদের কাছে *কৈবল্য-সুখ* বা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়া নরকতুল্য, কারণ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে তাঁর অস্তিত্ব হারানোকে ভক্ত আত্মহত্যার সমতুল্য বলে মনে করেন। ভগবানের সেবা করার জন্য ভক্ত সর্বদাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চান। আর স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়াকে তিনি আকাশ-কুসুম বলে মনে করেন। ভক্তের কাছে ক্ষণস্থায়ী জড়-জাগতিক সুখের কোন মূল্য নেই। ভক্ত এত উন্নত স্তরে রয়েছেন যে, কর্ম অথবা জ্ঞানের প্রতি তাঁর কোন রুচি নেই। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ভক্তের কাছে কর্ম ও জ্ঞানের ফল এতই তুচ্ছ যে, তাদের প্রতি তাঁর স্বল্পমাত্রও আসক্তি থাকে না। ভক্তকে সমস্ত সুখ প্রদানের জন্য ভক্তিযোগই যথেষ্ট। সেই সমন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) বলা হয়েছে—*যয়াত্মা সুপ্রসীদতি*। কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হওয়া যায়, এবং সেটিই হচ্ছে ভক্তসঙ্গের ফল। শুদ্ধ ভক্তের আশীর্বাদ ব্যতীত কেউই পূর্ণরূপে প্রসন্ন হতে পারেন না, এবং পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন না।

শ্লোক ৫৮

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্‌মনাম্ ।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎসঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥ ৫৮ ॥

অথ—অতএব; **অনঘ-অঙ্ঘ্রেঃ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট করে; **তব**—আপনার; **কীর্তি**—মহিমা; **তীর্থয়োঃ**—পবিত্র গঙ্গাজল; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—এবং বাইরে; **স্নান**—স্নান; **বিধূত**—ধৌত; **পাপ্‌মনাম্**—মনের কলুষিত অবস্থা; **ভূতেষু**—সাধারণ জীবদের; **অনুক্রোশ**—বর অথবা কৃপা; **সু-সত্ত্ব**—সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণে; **শীলিনাম্**—এই প্রকার গুণসম্পন্ন যাঁরা তাঁদের; **স্যাৎ**—হোক; **সঙ্গমঃ**—সঙ্গ; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **এষঃ**—এই; **নঃ**—আমাদের; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত মঙ্গলের উৎস এবং সমস্ত পাপের কলুষ বিনাশকারী। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন আমাকে আপনার ভক্তদের সঙ্গলাভের আশীর্বাদ করেন, যাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার ফলে, সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছেন এবং যাঁরা বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। আমি মনে করি যে, আপনার এই প্রকার ভক্তদের সঙ্গ করার সৌভাগ্যই হবে আমার প্রতি আপনার প্রকৃত আশীর্বাদ।

তাৎপর্য

গঙ্গাজল সমস্ত পাপ দূর করে। অর্থাৎ, কেউ যখন গঙ্গায় স্নান করেন, তিনি তখন তাঁর জীবনের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন। গঙ্গাজলের এই মহিমার কারণ হচ্ছে, গঙ্গা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তেমনই যাঁরা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গে যুক্ত এবং যাঁরা তাঁর মহিমা কীর্তনে মগ্ন, তাঁরা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা সাধারণ বদ্ধ জীবদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে সক্ষম। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গেয়েছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা এতই শক্তিশালী যে, তাঁদের প্রত্যেকে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করতে সক্ষম। অর্থাৎ, ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের মহিমা প্রচার করে, সমস্ত বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করে শুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে উন্নীত করা। এখানে

সু-সত্ত্ব শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'শুদ্ধ সত্ত্ব', যা জড়-জাগতিক সত্ত্বগুণের অতীত এক চিন্ময় স্তর। শিব তাঁর আদর্শ প্রার্থনার দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণু ও তাঁর বৈষ্ণব ভক্তদের শরণাগত হওয়া।

শ্লোক ৫৯

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং
তমোগুহায়াং চ বিশুদ্ধমাবিশৎ ।
যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা
মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্ ॥ ৫৯ ॥

ন—কখনই না; **যস্য**—যাঁর; **চিত্তম্**—হৃদয়; **বহিঃ**—বাহ্যিক; **অর্থ**—রুচি; **বিভ্রমম্**—মোহিত; **তমঃ**—অন্ধকার; **গুহায়াম্**—গুহায়; **চ**—ও; **বিশুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছেন; **যৎ**—যা; **ভক্তি-যোগ**—ভগবদ্ভক্তি; **অনুগৃহীতম্**—কৃপা প্রাপ্ত; **অঞ্জসা**—প্রসন্নতাপূর্বক; **মুনিঃ**—চিন্তাশীল; **বিচষ্টে**—দর্শন করেন; **ননু**—কিন্তু; **তত্র**—সেখানে; **তে**—আপনার; **গতিম্**—কার্যকলাপ।

অনুবাদ

যে ভক্তের হৃদয় ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে এবং যিনি ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ করেছেন, তিনি কখনও অন্ধকূপ-সদৃশ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হন না। এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে পবিত্র হয়ে, ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত আনন্দ সহকারে আপনার নাম, যশ, রূপ, কার্যকলাপ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২৫) বলা হয়েছে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

কেবল শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ভগবানের দিব্য নাম, যশ, গুণ ও কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বার বার বলেছেন—

'সাধুসঙ্গ', সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয় ।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

(*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য* ২২/৫৪)

কেবলমাত্র শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ কৃষ্ণভক্তির পথে আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি সাধন করতে পারে। সাধুসঙ্গ বা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ মানে হচ্ছে, সর্বক্ষণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারা যুক্ত থাকা। বিশেষ করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন মানুষকে পবিত্র করে, এবং তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কীর্তন করার উপদেশ দিয়েছেন। *চেতো-দর্পণ মার্জনম্*—শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করার ফলে চিত্তরূপ দর্পণ পরিষ্কার হয়ে যায়, এবং তখন ভক্তের আর বহির্মুখী কার্যকলাপের প্রতি কোন রুচি থাকে না। কেউ যখন ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তখন তার হৃদয় কলুষিত থাকে। হৃদয় নির্মল না হলে বোঝা যায় না, কিভাবে সব কিছু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। *ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/২০)। যাঁর হৃদয় পবিত্র হয়েছে তিনি দেখতে পান যে, সমগ্র জগৎ হচ্ছে ভগবানেরই প্রকাশ, কিন্তু যাঁর হৃদয় কলুষিত, তিনি অন্যভাবে দর্শন করেন। তাই সৎসঙ্গ বা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়।

যাঁর হৃদয় পবিত্র, তিনি কখনও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হন না, সেই শক্তি সর্বদা বদ্ধ জীবদের জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে অনুপ্রাণিত করে। পবিত্র-হৃদয় ভগবদ্ভক্ত যখন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তখন তিনি কখনও বিচলিত হন না। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের মোট নয়টি পন্থা রয়েছে, এবং সেই পন্থায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনকারী শুদ্ধ ভক্ত কখনও বিচলিত হন না। দশটি নামাপরাধ ও চৌষট্টিটি সেবা অপরাধ বর্জন করে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করা উচিত। ভক্ত যখন নিষ্ঠা সহকারে এই সমস্ত বিধিগুলি অনুশীলন করেন, তখন ভক্তিদেবী তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তখন আর তিনি বাহ্যিক কোন কিছুর দ্বারা বিচলিত হন না। ভগবদ্ভক্তকে *মুনিও* বলা হয়। *মুনি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'চিন্তাশীল'। এক অভক্ত যেমন জল্পনা-কল্পনা-পরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত ঠিক তেমনই চিন্তাশীল। অভক্তদের জল্পনা-কল্পনা অশুদ্ধ, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের চিন্তা পবিত্র। কপিলদেব ও শুকদেব গোস্বামীকেও *মুনি* বলা হয়, এবং ব্যাসদেবকে মহামুনি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভক্তকে *মুনি* বা চিন্তাশীল বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। অতএব সিদ্ধান্তটি হচ্ছে যে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে এবং নামাপরাধ

ও সেবাপরাধ বর্জন করার ফলে হৃদয় যখন নির্মল হয়, তখন ভগবানের দিব্য নাম, রূপ ও কার্যকলাপ ভগবানই তাঁর হৃদয়ে প্রকাশ করেন।

শ্লোক ৬০

যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ ।
তৎ ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্ ॥ ৬০ ॥

যত্র—যেখানে; **ইদম্**—এই; **ব্যজ্যতে**—প্রকাশিত; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **বিশ্বস্মিন্**—জগতে; **অবভাতি**—প্রকাশিত হয়, **যৎ**—যা; **তৎ**—তা, **ত্বম্**—আপনি, **ব্রহ্ম**—নির্বিশেষ ব্রহ্ম; **পরম্**—দিব্য; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **আকাশম্**—আকাশ; **ইব**—সদৃশ; **বিস্তৃতম্**—বিস্তৃত।

অনুবাদ

হে ভগবান! নির্বিশেষ ব্রহ্ম সূর্য কিরণের মতো অথবা আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত। এবং সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত এবং যাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, তা আপনিই।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সব কিছুই ব্রহ্ম এবং তার অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। সমগ্র জগৎ ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থিত। নির্বিশেষবাদীরা কিন্তু বুঝতে পারে না, কিভাবে এই বিশাল বিশ্ব একজন ব্যক্তিতে অবস্থিত। এইভাবে নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; তাই তারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে, পরম সত্য যে একজন পুরুষ তা অস্বীকার করে। এই ভ্রান্ত ধারণা শিব স্বয়ং দূর করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত, তা হচ্ছে ভগবান স্বয়ং। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান ব্রহ্ম রূপে সূর্যকিরণের মতো সর্বব্যাপ্ত। এই দৃষ্টান্তটি হৃদয়ঙ্গম করা খুবই সহজ। সমস্ত ভুবন সূর্যকিরণে অবস্থিত, তবুও সূর্যকিরণ ও সূর্যকিরণের উৎস সেই সমস্ত ভুবনগুলি থেকে পৃথক তেমনই আকাশ অথবা বায়ু সর্বব্যাপ্ত; বায়ু ঘটের ভিতরেও রয়েছে, আবার তা পবিত্র ও অপবিত্র উভয় স্থানেই রয়েছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আকাশ কখনও অপবিত্র হয় না সূর্যকিরণও অপবিত্র ও পবিত্র উভয় স্থানকেই স্পর্শ করে, এবং উভয়েই যদিও সূর্যের দ্বারাই উৎপন্ন, তবুও সূর্য সমস্ত নোংরা বস্তু থেকে পৃথক থাকে। তেমনই, ভগবান সর্বব্যাপ্ত। পবিত্র ও অপবিত্র

বস্তু রয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পবিত্র বস্তুগুলি হচ্ছে ভগবানের সম্মুখভাগ, এবং অপবিত্র বস্তুগুলি ভগবানের পশ্চাৎ-ভাগ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"আমার অব্যক্ত রূপের দ্বারা আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত। সব কিছুই আমাতে স্থিত, তবুও আমি সেগুলিতে অবস্থিত নই।"

ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করে যে, ভগবান তাঁর ব্রহ্মস্বরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত। সব কিছুই তাঁর মধ্যে অবস্থিত, তবুও তিনি সেগুলিতে অবস্থিত নন। তার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভক্তিযোগ ব্যতীত, ভগবানের সেবা ব্যতীত, নির্বিশেষবাদীরাও ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে—*অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* । অর্থাৎ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা পরব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* পরমতত্ত্বকে অদ্বয়জ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে উপলব্ধি হয় তিনটি স্বরূপে --নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান হচ্ছেন অন্তিম সত্য, এবং এই শ্লোকেও শিব প্রতিপন্ন করেছেন যে, চরমে পরম সত্য হচ্ছেন একজন সবিশেষ পুরুষ। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন—*তৎ ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্।* এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—একজন সফল ব্যবসায়ীর বহু কলকারখানা ও অফিস থাকতে পারে, এবং সেগুলি সবই তাঁর আদেশের উপর নির্ভর করে থাকে। কেউ যদি বলে যে, সমস্ত ব্যবসাটি সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে রয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর সমস্ত অফিস ও ফ্যাক্টরীগুলি তাঁর মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্ছেন পক্ষান্তরে বুঝতে হয় যে, তাঁরই মস্তিষ্কের দ্বারা অথবা তাঁর শক্তির বিস্তারের দ্বারা সেই ব্যবসাটি নির্বিঘ্নে চলছে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের মস্তিষ্ক ও শক্তির দ্বারা সমগ্র জড় জগৎ এবং চিন্ময় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যে অদ্বৈত দর্শন বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা স্বীকার করে যে, সমস্ত শক্তির পরম উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাটি এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ রূপ যে কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাও বর্ণনা করা হয়েছে—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥

"হে কৌন্তেয় (অর্জুন), আমি জলের স্বাদ, সূর্য ও চন্দ্রের আলোক, বৈদিক মন্ত্রের ওঁকার; আমি আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৭/৮)

এইভাবে সব কিছুর যোগশক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ৬১

যো মায়য়েদং পুরুরূপয়াসৃজদ্
বিভর্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ ।
যদ্ভেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্থয়া
ত্বমাত্মতন্ত্রং ভগবন্ প্রতীমহি ॥ ৬১ ॥

যঃ—যিনি; **মায়য়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **ইদম্**—এই; **পুরু**—বহু; **রূপয়া**—রূপের দ্বারা; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছেন; **বিভর্তি**—পালন করেন, **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **ক্ষপয়তি**—সংহার করেন; **অবিক্রিয়ঃ**—পরিবর্তিত না হয়ে; **যৎ**—যা; **ভেদ-বুদ্ধিঃ**—ভেদভাব; **সৎ**—নিত্য; **ইব**—সদৃশ; **আত্ম-দুঃস্থয়া**—নিজেকে কষ্ট দিয়ে; **ত্বম্**—আপনাকে; **আত্ম-তন্ত্রম্**—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **প্রতীমহি**—আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার বহু প্রকার শক্তি রয়েছে, এবং সেই সমস্ত শক্তিগুলি নানারূপে প্রকাশিত। সেই শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এবং এমনভাবে তা আপনি পালন করছেন যে, মনে হয় তা যেন চিরস্থায়ী, কিন্তু তবুও চরমে আপনি তা ধ্বংস করেন। যদিও আপনি এই প্রকার পরিবর্তনের দ্বারা কখনও একটুও বিচলিত হন না, তবুও জীবেরা তার ফলে বিচলিত হয়, এবং তাই তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎ আপনার থেকে ভিন্ন। হে ভগবান! আপনি সর্বদা স্বতন্ত্র, এবং তা আমি স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারি।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ শক্তি রয়েছে, যা তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—বহিরঙ্গা শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তি। বিভিন্ন প্রকার জগৎও রয়েছে, যথা—চিৎ-জগৎ ও জড় জগৎ, আর বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। তাদের মধ্যে কোন জীব বদ্ধ এবং অন্যেরা নিত্যমুক্ত। যাঁরা

জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে কখনও আসে না, তাঁদের বলা হয় নিত্যমুক্ত। কিন্তু, কোন কোন জীব এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, এবং তার ফলে তারা নিজেদের পরমেশ্বর ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে। এই জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকার ফলে, তাদের অস্তিত্ব সর্বদাই দুঃখদায়ক। সর্বদা দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীবেরা জড়া প্রকৃতিকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলে মনে করে। সেই কথা বিশ্লেষণ করে এক বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

জীব যখন পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে, তাঁকে অনুকরণ করে স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করতে চায়, তখন সে নিজেকে ভোক্তা বলে অভিমান করে এবং পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই পরাশক্তি জীবাত্মার পক্ষে এই জড় জগৎ অত্যন্ত দুঃখময়, কিন্তু এই জড়া প্রকৃতি ভগবানের কাছে দুঃখদায়ক নয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কাছে জড়া প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি উভয়েই সমান। এই শ্লোকে শিব বিশ্লেষণ করেছেন যে, জড়া প্রকৃতি ভগবানের কাছে মোটেই দুঃখদায়ক নয়। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই স্বতন্ত্র, কিন্তু যেহেতু জীব স্বতন্ত্র নয়, তাই স্বতন্ত্রভাবে সুখী হওয়ার ভ্রান্ত ধারণাবশত তার কাছে এই জড় জগৎ দুঃখময়। তার ফলে জড়া প্রকৃতি ভেদভাব সৃষ্টি করে।

যেহেতু মায়াবাদী দার্শনিকেরা তা বুঝতে পারে না, তাই তারা শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়। কিন্তু, বৈষ্ণবেরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তাই তাঁরা এই জড় জগতেও কোন রকম ক্লেশ অনুভব করেন না। তার কারণ হচ্ছে যে, তাঁরা জানেন কিভাবে এই জড়া শক্তিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হয়। একটি রাষ্ট্রে সাধারণ নাগরিকদের চোখে ফৌজদারি বিভাগ ও দেওয়ানি বিভাগ পৃথক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই দুটি বিভাগই এক এবং অভিন্ন। ফৌজদারি বিভাগ অপরাধীদের জন্য কষ্টদায়ক, কিন্তু একজন সৎ নাগরিকের কাছে তা মোটেই কষ্টদায়ক নয়। তেমনই, বদ্ধ জীবদের কাছে জড়া প্রকৃতি কষ্টদায়ক, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত মুক্ত জীবদের কাছে তা নয়। পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর মাধ্যমে ভগবান সমগ্র জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। কেবল নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ভগবান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্গত করে বিষ্ণুরূপে এই জড় জগতের সৃষ্টি ও পালনকার্য সম্পাদন করেন। তারপর সঙ্কর্ষণরূপে তিনি সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করেন। এইভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করা সত্ত্বেও ভগবান তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের বিবিধ

কার্যকলাপ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হতে পারে, কিন্তু ভগবান যেহেতু পরম মহান, তাই তিনি কখনও তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। শিব ও ভগবানের অন্যান্য শুদ্ধ ভক্তরা ভেদবুদ্ধির দ্বারা অন্ধ না হয়ে, তা স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারেন। ভক্তের কাছে ভগবান হচ্ছেন পরম আত্মা। যেহেতু তিনি পরম শক্তিমান, তাই তাঁর বিভিন্ন শক্তিও চিন্ময়। ভক্তের কাছে কোন কিছুই জড় নয়, কারণ জড় অস্তিত্ব মানে হচ্ছে ভগবৎ বিস্মৃতি।

শ্লোক ৬২

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে ।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং
বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ ॥ ৬২ ॥

ক্রিয়া—কার্যকলাপ; **কলাপৈঃ**—পন্থার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যোগিনঃ**—যোগীগণ; **শ্রদ্ধা-অন্বিতাঃ**—শ্রদ্ধা ও দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে; **সাধু**—যথাযথভাবে; **যজন্তি**—আরাধনা করেন; **সিদ্ধয়ে**—সিদ্ধির জন্য; **ভূত**—জড়া শক্তি; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অন্তঃ-করণ**—হৃদয়; **উপলক্ষিতম্**—লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত; **বেদে**—বেদে; **চ**—ও; **তন্ত্রে**—বৈদিক অনুসিদ্ধান্তে; **চ**—ও; **তে**—আপনার; **এব**—নিশ্চিতভাবে, **কোবিদাঃ**—সুপণ্ডিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার বিশ্বরূপ পঞ্চ তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আপনার অংশ সর্বান্তর্যামী পরমাত্মার দ্বারা রচিত। ভক্ত ব্যতীত অন্য যোগীরা, যথা কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীরা তাদের স্বীয় স্থিতিতে অবস্থিত থেকে, তাদের কার্যকলাপের দ্বারা আপনার আরাধনা করে। বেদে, তন্ত্রে ও অন্যান্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল আপনিই আরাধ্য। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এটিই হচ্ছে পরম সিদ্ধান্ত।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিব ভগবানের সেই রূপ দর্শন করতে চান, যেই রূপে ভক্তরা তাঁকে দর্শন করতে সর্বদা আগ্রহী। এই জড় জগতে

ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারূপে ভগবানের অন্য অনেক রূপও রয়েছে, এবং বিষয়াসক্ত মানুষেরাই কেবল সেই সমস্ত রূপের পূজা করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষী, তাদের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত হচ্ছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০)

ভগবদ্ভক্ত, মোক্ষকামী, জ্ঞানী ও সর্বকামী কর্মী সকলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করতে চান। এমন কি কেউ যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, যা এখানে *ক্রিয়া-কলাপৈঃ* রূপে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, দেব-দেবীরা হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে আরাধ্য ভগবান হচ্ছেন বিষ্ণু বা যজ্ঞেশ্বর। বৈদিক ও তান্ত্রিক যজ্ঞে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হলেও, যজ্ঞের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণু। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়! মানুষ যজ্ঞে যখন অন্য দেবতাদের কোন কিছু নিবেদন করে, প্রকৃতপক্ষে তা কেবল আমার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করা হয়। তারা যথাযথভাবে না জেনে, অবিধিপূর্বক দেবতাদের পূজা করে।"

অতএব বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকেরাও পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু তাঁরা তা করেন অবিধিপূর্বক। বিধির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা সেই কথা প্রতিপন্ন করে *বিষ্ণুপুরাণে* (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগীরা—প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকেই—যদি বেদ ও তন্ত্রের জ্ঞানে বাস্তবিকই পণ্ডিত হন, তা হলে তিনি শ্রীবিষ্ণুরই আরাধনা করেন। এখানে *কোবিদাঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ভগবদ্ভক্তদের ইঙ্গিত করে। ভগবানের ভক্তরাই কেবল পূর্ণরূপে জানেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত। জড় জগতে তিনি পাঁচটি জড় উপাদান, এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা প্রকাশিত। আরও একটি শক্তির দ্বারা তিনি

জড় জগতে প্রকাশিত হন, তা হচ্ছে জীবাত্মা। চিৎ-জগৎ ও জড় জগতে সমস্ত প্রকাশই ভগবানের বিভিন্ন শক্তির অভিব্যক্তি। চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, ভগবান এক এবং তিনি সব কিছুতেই নিজেকে বিস্তার করেছেন। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,* এই বৈদিক বাণীর মাধ্যমে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি তা জানেন, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় একাগ্রীভূত করেন।

শ্লোক ৬৩

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তি-
স্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে ।
মহানহং খং মরুদগ্নিবার্ধরাঃ
সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ ॥ ৬৩ ॥

ত্বম্—আপনি; **একঃ**—এক; **আদ্যঃ**—আদি; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **সুপ্ত**—সুপ্ত; **শক্তি**—শক্তি; **তয়া**—যার দ্বারা; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **বিভিদ্যতে**—পৃথক হয়ে যায়; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **অহম্**—অহঙ্কার; **খম্**—আকাশ; **মরুৎ**—বায়ু; **অগ্নি**—অগ্নি; **বাঃ**—জল; **ধরাঃ**—পৃথিবী; **সুর-ঋষয়ঃ**—দেবতা ও ঋষিগণ; **ভূত-গণাঃ**—জীব; **ইদম্**—এই সমস্ত; **যতঃ**—যার থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ একমাত্র পরম পুরুষ। এই জড় জগৎ সৃষ্টির পূর্বে, আপনার মায়াশক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যখন আপনার মায়াশক্তি ক্ষোভিত হয়, তখন সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটি গুণ সক্রিয় হয়, এবং তার ফলে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, আগুন, জল, মাটি, বিভিন্ন দেবতা ও ঋষিগণ প্রকট হন। এইভাবে জড় জগতের সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

যদি সমগ্র সৃষ্টি এক হয়, অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান বা বিষ্ণু ব্যতীত আর কিছু না হয়, তা হলে কেন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা এইভাবে জড় সৃষ্টির উপাদানগুলিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন, যা এই শ্লোকে কবা হয়েছে? পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা কেন জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তরে শিব বলেছেন যে, আত্মা ও জড় পদার্থ বিভিন্ন দার্শনিকেরা সৃষ্টি করেননি, তা সৃষ্টি

করেছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। সেই সম্বন্ধে এই শ্লোকে বলা হয়েছে—*ত্বম্ এক আদ্যঃ পুরুষঃ।* চেতন ও জড়ের পার্থক্য যদিও ভগবান সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে-সমস্ত জীব নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁদের কাছে সেই রকম কোন ভেদ নেই। যারা ভগবানের অনুকরণ করে ভোক্তা হতে চায়, তাদের কাছে কেবল জড় জগৎই রয়েছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগৎ হচ্ছে সব কিছুর স্রষ্টা আদি পুরুষ ভগবানকে ভুলে যাওয়ার পরিণাম। যে-সমস্ত জীবেরা ভগবানকে অনুকরণ করে তাঁর মতো ভোগ করতে চায়, তাদের সেই বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভগবান তাঁর সুপ্ত শক্তির দ্বারা জড় ও চেতনের এই পার্থক্য সৃষ্টি করেন। যেমন কখনও কখনও শিশুরা তাদের মায়ের অনুকরণ করে রান্নাঘরে রান্না করতে চায়, এবং মা তখন তাদের কিছু খেলনা দেন, যা দিয়ে শিশুরা তাঁর রান্নার অনুকরণ করতে পারে। তেমনই, কোন জীব যখন ভগবানের কার্যকলাপের অনুকরণ করতে চায়, তখন ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। তাই এই জড় জগৎ ভগবানের মায়াশক্তির সৃষ্টি। ভগবানের ঈক্ষণের দ্বারা মায়াশক্তি সক্রিয় হয়। তখন জড়া প্রকৃতির গুণগুলি সক্রিয় হয়, এবং মহত্তত্ত্বরূপে সর্বপ্রথমে জড়া শক্তির প্রকাশ হয়। তারপর ক্রমশ অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটির প্রকাশ হয়। সৃষ্টির পর, জীবদের প্রকৃতির গর্ভে আধান করা হয়, এবং তাঁরা ক্রমশ ব্রহ্মা ও সপ্তর্ষিরূপে, তারপর বিভিন্ন দেবতারূপে উদ্ভূত হন। ক্রমে ক্রমে দেবতাদের থেকে মানুষ, পশু, বৃক্ষ, পক্ষী ও অন্য সব কিছুর প্রকাশ হয়। সব কিছুর আদি কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যে-কথা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে—*ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ।* সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

> *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।*
> *অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥*

যারা ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত, তারা বুঝতে পারে না যে, সব কিছুর আদি কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেই সত্য প্রকাশ করে বেদান্ত-সূত্রে বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ* (*বেদান্ত-সূত্র* ১/১/২)। শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) প্রতিপন্ন করেছেন—

> অহং *সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।*
> *ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥*

"আমি সমস্ত চেতন ও জড় জগতের উৎস। সব কিছুই আমার থেকে উদ্ভূত হয়। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে আমার ভজনা করে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন যে, তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উৎস (*অহং সর্বস্য প্রভবঃ*), তার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি ব্রহ্মা, শিব, পুরুষাবতার, জড় জগৎ এবং এই জড় জগতের সমস্ত জীবদের উৎস প্রকৃতপক্ষে প্রভব ('সৃষ্টি') শব্দটি কেবল এই জড় জগৎকে ইঙ্গিত করে, কারণ চিৎ-জগৎ নিত্য হওয়ার ফলে, তার সৃষ্টির কোন প্রশ্ন ওঠে না। *শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে* ভগবান বলেছেন, *অহম্ এবাসম্ এবাগ্রে*— "আমি সৃষ্টির পূর্বে ছিলাম।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৯/৩৩) *বেদেও* বলা হয়েছে, *একো নারায়ণ আসীৎ*—"সৃষ্টির পূর্বে কেবল নারায়ণ ছিলেন।" সেই কথা শঙ্করাচার্যও প্রতিপন্ন করেছেন। *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—"নারায়ণ সৃষ্টির অতীত"। (*গীতাভাষ্য*) যেহেতু নারায়ণের সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়, তাই নারায়ণ যখন বলেন, "সৃষ্টি হোক," তখন সেই সৃষ্টি সর্বতোভাবে চিন্ময় জড়ের অস্তিত্ব কেবল তাদেরই জন্য, যারা ভুলে গেছে যে, নারায়ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের আদি কারণ।

শ্লোক ৬৪

সৃষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্ট-
শ্চতুর্বিধং পুরমাত্মাংশকেন ।
অথো বিদুস্তং পুরুষং সন্তমন্ত-
র্ভুঙ্‌ক্তে হৃষীকৈর্মধু সারঘং যঃ ॥ ৬৪ ॥

সৃষ্টম্—সৃষ্টিতে; **স্ব-শক্ত্যা**—আপনার নিজের শক্তির দ্বারা, **ইদম্**—এই জড় জগৎ, **অনুপ্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **চতুঃ-বিধম্**—চার প্রকার, **পুরম্**—দেহ, **আত্ম-অংশকেন**—আপনার নিজের বিভিন্ন অংশের দ্বারা; **অথো**—অতএব; **বিদুঃ**—জানেন; **তম্**—তাকে; **পুরুষম্**—ভোক্তা; **সন্তম্**—অবস্থিত হয়ে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **হৃষীকৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, **মধু**—মাধুর্য; **সার-ঘম্**—মধু; **যঃ**—যিনি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করার পর, আপনি চারটি রূপে এই সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন। সমস্ত জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত হয়ে আপনি তাদের জানেন, এবং কিভাবে তারা তাদের ইন্দ্রিয় উপভোগ করছে তাও জানেন। এই জড় জগতে তথাকথিত সুখভোগ ঠিক মৌমাছির মৌচাকে সঞ্চিত মধু আস্বাদন করার মতো।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। যেহেতু জড় পদার্থ স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করতে পারে না, তাই ভগবান স্বয়ং এই জড় সৃষ্টিতে তাঁর অংশ প্রকাশরূপে (পরমাত্মা) প্রবেশ করেন, এবং তিনি তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবরূপেও প্রবেশ করেন। অর্থাৎ, এই জড় সৃষ্টিকে সক্রিয় করার জন্য জীব ও ভগবান উভয়েই এই জড় জগতে প্রবেশ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) বলা হয়েছে—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"হে মহাবাহো অর্জুন! এই অপরা প্রকৃতির অতীত আমার একটি পরা প্রকৃতি রয়েছে। সমস্ত জীব সেই পরা প্রকৃতিসম্ভূত এবং তারাই এই জগৎকে ধারণ করে রয়েছে।"

এই জড় জগৎ যেহেতু স্বতন্ত্রভাবে সক্রিয় হতে পারে না, তাই জীবেরা চার প্রকার শরীরে এই জড় জগতে প্রবেশ করে। এই শ্লোকে *চতুর্বিধম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই জড় জগতে চার প্রকার জীব রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। জীবেরা যেভাবেই এই জড় জগতে আসুক না কেন, তারা সকলেই ইন্দ্রিয় উপভোগের চেষ্টায় ব্যস্ত।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা যে মনে করে, মানুষ ছাড়া অন্য জীবদের আত্মা নেই, তা এখানে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির সমস্ত জীব, তা জরায়ুজ হোক, অণ্ডজ হোক, স্বেদজ হোক বা উদ্ভিজ্জই হোক, সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তারা সকলেই স্বতন্ত্র চিৎস্ফুলিঙ্গ এবং আত্মা। ভগবানও মানুষ, পশু, বৃক্ষ, কীট ও পতঙ্গ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং যেহেতু সমস্ত জীবেরা এই জড় জগতে আসে তাদের ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য, তাই ভগবান জীবদের বাসনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে পরিচালিত করেন। এইভাবে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান সকলের বাসনা সম্বন্ধে অবগত। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।"

সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে ভগবান তাদের স্মৃতি দান করেন, যার ফলে জীবেরা বিশেষ কোন বস্তু উপভোগ করতে পারে। এইভাবে জীবেরা তাদের উপভোগের মধুচক্র সৃষ্টি করে এবং তারপর তা উপভোগ করে। এখানে মৌমাছিদের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত, কারণ মৌমাছিরা যখন মৌচাকের মধু উপভোগ করার চেষ্টা করে, তখন তাদের অন্যান্য মৌমাছিদের দংশন সহ্য করতে হয়। মৌমাছিরা যেহেতু মধু উপভোগ করার সময় পরস্পরকে দংশন করে, তাই তারা মধুর মিষ্টতা পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে পারে না, কারণ সেই সঙ্গে তাদের দংশনের কষ্টও অনুভব করতে হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীবকে এই জড় জগতে সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়, কিন্তু তাদের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত পরমেশ্বর ভগবান তাদের থেকে পৃথক থাকেন। *উপনিষদে* একটি বৃক্ষে দুটি পক্ষীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। একটি পক্ষী (জীব) সেই গাছের ফল উপভোগ করছে, এবং অন্য পক্ষী (পরমাত্মা) কেবল সাক্ষীরূপে রয়েছেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৩/২৩) পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানকে *উপদ্রষ্টা* ও *অনুমন্তা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এইভাবে ভগবান কেবল সাক্ষী থেকে জীবের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের অনুমতি প্রদান করেন। পরমাত্মাই জীবকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা মৌমাছি মৌচাক তৈরি করতে পারে, বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারে, এবং সেগুলি সঞ্চয় করে উপভোগ করতে পারে। যদিও পরমাত্মা জীব থেকে পৃথক থাকেন, তবুও তিনি তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত, এবং তিনি তাদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন, যার দ্বারা তারা তাদের কর্মের ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে পারে। মানব-সমাজ ঠিক একটি মৌচাকের মতো, কারণ সকলেই বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহের কার্যে ব্যস্ত, অথবা বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করার ব্যাপারে ব্যস্ত। এইভাবে তারা যৌথভাবে উপভোগ করার জন্য এক বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, এই সাম্রাজ্য সৃষ্টি করার পর, অন্য রাষ্ট্রের দংশনও তাদের ভোগ করতে হয়। কখনও কখনও এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং তখন মানুষের তৈরি মৌচাক দুঃখ-কষ্টের উৎসরূপে পরিণত হয়। মানুষেরা যদিও তাদের ইন্দ্রিয়ের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য তাদের মৌচাক রচনা করছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের অন্যান্য মানুষদের অথবা রাষ্ট্রের দংশনের বেদনাভোগ করতে হচ্ছে। পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত কার্যকলাপের কেবল সাক্ষীরূপে রয়েছেন। মূল কথা হচ্ছে যে, ভগবান ও জীব উভয়েই জড় জগতে প্রবেশ করেন। কিন্তু পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন আরাধ্য, কারণ তিনি এই

জড় জগতে জীবের সুখভোগের সমস্ত আয়োজন করেছেন। কিন্তু যেহেতু এটি জড় জগৎ, তাই কেউই দুঃখকষ্ট ব্যতীত এইখানে সুখভোগ করতে পারে না। জড় সুখ মানেই হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা, কিন্তু চিন্ময় আনন্দে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। সেখানে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের সংরক্ষণে বিশুদ্ধ আনন্দ।

শ্লোক ৬৫

স এষ লোকানতিচণ্ডবেগো
বিকর্ষসি ত্বং খলু কালয়ানঃ ।
ভূতানি ভূতৈরনুমেয়তত্ত্বো
ঘনাবলীর্বায়ুরিবাবিষহ্যঃ ॥ ৬৫ ॥

সঃ—সেই; **এষঃ**—এই; **লোকান্**—সমস্ত ভুবন; **অতি**—অত্যন্ত; **চণ্ড-বেগঃ**—প্রচণ্ড বেগে; **বিকর্ষসি**—ধ্বংস করে; **ত্বম্**—আপনি; **খলু**—তা সত্ত্বেও; **কালয়ানঃ**—যথাসময়ে; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **ভূতৈঃ**—অন্য জীবদের দ্বারা; **অনুমেয়-তত্ত্বঃ**—পরমতত্ত্ব, যা অনুমান করা যায়; **ঘন-আবলীঃ**—মেঘসমূহ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **ইব**—সদৃশ; **অবিষহ্যঃ**—অসহ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার পরম ঈশ্বরত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় না, কিন্তু এই জগতে যে সবকিছু কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তা দেখে তা অনুমান করা যায়। কালের বেগ অত্যন্ত প্রচণ্ড, এবং সবকিছুই অন্য কিছুর দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—ঠিক যেমন একটি পশু আর একটি পশুকে আহার করে। বায়ু যেমন আকাশের মেঘকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, ঠিক সেইভাবে কাল সবকিছু ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতির নিয়মে ধ্বংসকার্য সংঘটিত হয়। এই জগতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, যদিও বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কর্মী ও অন্য সকলে সর্বদা সবকিছু চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করছে। এক মূর্খ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে, বিজ্ঞানের মাধ্যমে জীবনকে চিরস্থায়ী করা যাবে। তথাকথিত কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে জীব সৃষ্টিরও চেষ্টা করছে। এইভাবে সকলেই কোন না কোনভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাঁর পরম ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভগবান

এতই শক্তিশালী যে, তিনি মৃত্যুরূপে সব কিছু ধ্বংস করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৩৪) সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—"আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু।" নাস্তিকদের কাছে ভগবান হচ্ছেন মৃত্যু, এবং জড় জগতে তারা যা কিছু সঞ্চয় করে, তা সব তিনি তাদের থেকে হরণ করে নেন। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু সর্বদা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করত, এবং ভগবানের প্রতি প্রহ্লাদের অবিচলিত ভক্তির জন্য সে পাঁচ বছরের শিশু প্রহ্লাদকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু, যথাসময়ে ভগবান নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে, হিরণ্যকশিপুকে তার পুত্রের উপস্থিতিতে সংহার করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৩/৪৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই মৃত্যুর পন্থা স্বাভাবিক। *জীব জীবস্য জীবনম্*—"একটি জীব অন্য আর একটি জীবের খাদ্য।" সাপ ব্যাঙ খায়, বেজি সাপ খায়, আর অন্য আর একটি পশু বেজিকে খায়। এইভাবে ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে ধ্বংসের ক্রিয়া চলছে। যদিও আমরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের হাত দেখতে পাই না, কিন্তু এই ধ্বংসকার্যের মাধ্যমে আমরা ভগবানের হাতের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। আমরা বায়ুর দ্বারা মেঘকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখি, কিন্তু যদিও তা কিভাবে হচ্ছে তা আমরা দেখতে পাই না, কারণ বায়ুকে দেখা যায় না। তেমনই, যদিও আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারি না, তবুও ধ্বংস-ক্রিয়ার মাধ্যমে দেখা যায়, কিভাবে তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে ভয়ঙ্করভাবে এই ধ্বংসকার্য চলছে, কিন্তু নাস্তিকেরা তা দেখতে পায় না।

শ্লোক ৬৬

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্ ।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥ ৬৬ ॥

প্রমত্তম্—যারা উন্মাদ; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **ইতি**—এইভাবে; **কৃত্য**—করণীয়; **চিন্তয়া**—এই প্রকার বাসনার দ্বারা; **প্রবৃদ্ধ**—অত্যন্ত উন্নত; **লোভম্**—লোভ; **বিষয়েষু**—জড় সুখভোগে; **লালসম্**—বাসনা করে; **ত্বম্**—আপনি; **অপ্রমত্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে; **সহসা**—সহসা; **অভিপদ্যসে**—ধারণ করে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধার্ত; **লেলিহানঃ**—লোভার্ত জিহ্বার দ্বারা; **অহিঃ**—সর্প; **ইব**—সদৃশ; **আখুম্**—মূষিক; **অন্তকঃ**—ধ্বংসকারী।

অনুবাদ

হে ভগবান! এই জড় জগতে সমস্ত জীবই বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রমত্ত, এবং তারা সর্বদাই কিছু না কিছু করার বাসনায় ব্যস্ত। তার কারণ হচ্ছে দুর্দমনীয় লোভ। জড়-জাগতিক সুখভোগের জন্য এই লোভ জীবের মধ্যে সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান আপনি কালরূপে তাদের আক্রমণ করেন, ঠিক যেভাবে একটি সর্প অনায়াসে একটি মূষিককে গ্রাস করে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই লোভী, এবং সকলেই জড় সুখভোগের জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করে। জড় সুখভোগের লালসার ফলে, জীবকে প্রমত্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে, জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই সংঘটিত হয় প্রকৃতির দ্বারা।"

সব কিছুই সম্পন্ন হয় প্রকৃতির নিয়মে, এবং সেই নিয়মগুলি ভগবানের নিয়ন্ত্রণের অধীন। নাস্তিকেরা বা নির্বোধেরা সেই কথা জানে না। তারা তাদের নিজেদের পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকে, আর বড় বড় রাষ্ট্রগুলি তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে ব্যস্ত থাকে। যদিও আমরা জানি যে, কালের প্রভাবে বহু বড় বড় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে। মানুষের চরম উন্মত্ততায় বহু বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কালের প্রভাবে সেই সমস্ত পরিবার ও সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ নাস্তিকেরা ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করতে চায় না। এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা ভগবানের পরম অধ্যক্ষতা স্বীকার না করে অনর্থক নিজেদের মনগড়া সমস্ত কর্তব্য সৃষ্টি করে। তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা তাদের রাষ্ট্রের জড়-জাগতিক উন্নতি-সাধনের জন্য নানা রকম পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা কেবল তাদের নিজেদের উচ্চ পদই আকাঙ্ক্ষা করে। জড়-জাগতিক উচ্চ পদের লোভে, তারা নিজেদের জনসাধারণের নেতা রূপে উপস্থাপিত করে তাদের ভোট সংগ্রহ করে, যদিও তারা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন। এইগুলি হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার কয়েকটি ভ্রান্তি। ভগবানের অধ্যক্ষতা স্বীকার না করে এবং

ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে, জীবেরা বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের সমস্ত পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের অবৈধ পরিকল্পনার ফলে, সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিদিন দ্রব্যমূল্য এতই বৃদ্ধি হচ্ছে যে, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের পক্ষে জীবন-ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে, এবং তার ফলে তারা প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। কৃষ্ণভক্তির অভাবে মানুষেরা তথাকথিত নেতা ও পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। তার ফলে মানুষের দুঃখকষ্ট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে, প্রকৃতির নিয়মে, এই জড় জগতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়; তাই সকলেরই কর্তব্য নিজেদের রক্ষা করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা এই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"ঋষিগণ আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার চরম উদ্দেশ্য, সমস্ত গ্রহলোক ও সমস্ত দেবতাদের মহেশ্বর, এবং সমস্ত জীবের সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে জেনে, জড় জগতের দুঃখদুর্দশা থেকে শান্তিলাভ করেন।"

সমাজে কেউ যদি মনের শান্তিলাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর অধীশ্বর হচ্ছেন তিনি, এবং তিনি আবার সমস্ত জীবের পরম বন্ধু। সেই কথা জানার ফলে, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সুখী হতে পারে এবং শান্তিলাভ করতে পারে।

শ্লোক ৬৭

কস্তুৎপদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো
যস্তেঽবমানব্যয়মানকেতনঃ ।
বিশঙ্কয়াস্মদ্গুরুরর্চতি স্ম যদ্
বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দশ ॥ ৬৭ ॥

কঃ—কে; **ত্বৎ**—আপনার; **পদ-অব্জম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **বিজহাতি**—উপেক্ষা করে; **পণ্ডিতঃ**—পণ্ডিত; **যঃ**—যিনি; **তে**—আপনাকে; **অবমান**—অবমাননা করে; **ব্যয়মান**—হ্রাস করে; **কেতনঃ**—এই শরীর; **বিশঙ্কয়া**—নিঃসন্দেহে; **অস্মৎ**—আমাদের; **গুরুঃ**—গুরুদেব, পিতা; **অর্চতি**—আরাধনা করে; **স্ম**—অতীতে; **যৎ**—যা; **বিনা**—ব্যতীত; **উপপত্তিম্**—বিক্ষোভ; **মনবঃ**—মনুগণ; **চতুঃ-দশ**—চৌদ্দ।

অনুবাদ

হে ভগবান! যে-কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই জানেন যে, আপনার আরাধনা না করলে সমগ্র জীবন ব্যর্থ হয়। সেই কথা জানা সত্ত্বেও, কিভাবে তিনি আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা ত্যাগ করতে পারেন? এমন কি আমাদের পিতা এবং গুরুদেব ব্রহ্মাও নির্দ্বিধায় আপনার আরাধনা করেছেন, এবং চতুর্দশ মনুগণও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

তাৎপর্য

পণ্ডিত শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তি। প্রকৃত জ্ঞানী কে? জ্ঞানীর বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

এইভাবে বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, মানুষ যখন আত্ম উপলব্ধির জন্য খামখেয়ালীপূর্ণ সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখনই তিনি প্রকৃত জ্ঞানী হন। এই প্রকার *মহাত্মা* বা জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবই হচ্ছেন সব কিছু (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*)। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা না করা হলে অথবা তাঁর ভক্ত না হলে, জীবন ব্যর্থ হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামীও বলেছেন যে, কেউ যখন উন্নত ভক্ত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁকে সংযত ও ধৈর্যশীল (*ক্ষান্তিঃ*) হওয়া উচিত এবং কখনও সময়ের অপচয় না করে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত (*অব্যর্থ-কালত্বম্*)। তাঁকে সমস্ত জড় আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত (*বিরক্তি*), এবং তাঁর কার্যকলাপের বিনিময়ে কোন প্রকার সম্মান কামনা করা উচিত নয় (*মান-শূন্যতা*)। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করবেন (*আশাবন্ধঃ*), এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা করার জন্য সর্বদা অত্যন্ত উৎসুক থাকা উচিত (*সমুৎকণ্ঠা*), জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা কীর্তন ও শ্রবণের মাধ্যমে ভগবানের মহিমা আস্বাদন করতে উৎসুক (*নামগানে সদা রুচিঃ*), এবং তিনি সর্বদা ভগবানের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করতে উৎসুক (*আসক্তিস্তদ্-গুণাখ্যানে*)। যে-সমস্ত স্থানে ভগবান তাঁর লীলাবিলাস করেছেন, সেই সমস্ত স্থানের প্রতিও তাঁর অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়া উচিত (*প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে*)। এইগুলি উন্নত স্তরের ভক্তের লক্ষণ।

উত্তম ভক্ত বা পূর্ণ চেতনা সমন্বিত মানুষ, যিনি প্রকৃতই জ্ঞানবান, তিনি কখনও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করতে পারেন না। ব্রহ্মার আয়ু যদিও অত্যন্ত দীর্ঘ (চারশ বত্রিশ কোটি বছর হচ্ছে ব্রহ্মার দিনের বার ঘণ্টা), তবু ব্রহ্মাও মৃত্যুর ভয়ে ভীত এবং তার ফলে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। তেমনই, ব্রহ্মার একদিনে যে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তাঁরাও ভগবানের সেবায় যুক্ত প্রথম মনু হচ্ছেন স্বায়ম্ভুব মনু। প্রত্যেক মনুর আয়ু হচ্ছে একাত্তর চতুর্যুগ এবং এক একটি চতুর্যুগের স্থিতি হচ্ছে ৪৩,২০,০০০ বছর। যদিও মনুদের আয়ুষ্কাল এতই দীর্ঘ, তবুও তাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থেকে, পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেন। এইযুগে মানুষের আয়ু হচ্ছে বড় জোর সত্তর-আশি বছর, এবং এই স্বল্প আয়ুও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তাই মানুষদের পক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা অধিকতর কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

(*শিক্ষাষ্টক* ৩)

কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর চারপাশে ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, এবং কখনও কখনও তাঁর শত্রুরা তাঁকে পরাস্ত করতে চেষ্টা করে অথবা তাঁর ভগবদ্ভক্তি বন্ধ করতে চেষ্টা করে। কেবল বর্তমান যুগেই নয়, পুরাকালেও প্রহ্লাদ মহারাজ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর আসুরিক পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁকে নানাভাবে নির্যাতিত করে। নাস্তিকেরা সর্বদাই ভক্তদের নির্যাতন করতে প্রস্তুত থাকে; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সমস্ত মানুষদের প্রতি অত্যন্ত সহিষ্ণু হতে। এই সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও প্রচার করে যেতে হবে, কারণ এই প্রচার ও কীর্তনই হচ্ছে জীবনের সিদ্ধি। জীবনকে সর্বতোভাবে পূর্ণ করা যে কত জরুরী, সেই সম্বন্ধে প্রচার করা উচিত। ব্রহ্মা আদি পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় এইভাবে যুক্ত হওয়া কর্তব্য।

শ্লোক ৬৮

অথ ত্বমসি নো ব্রহ্মন্ পরমাত্মন্ বিপশ্চিতাম্ ।
বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তমকুতশ্চিদ্ভয়া গতিঃ ॥ ৬৮ ॥

অথ—অতএব; **ত্বম্**—আপনি, হে ভগবান; **অসি**—হন; **নঃ**—আমাদের; **ব্রহ্মন্**—হে পরম ব্রহ্ম; **পরম-আত্মন্**—হে পরমাত্মা; **বিপশ্চিতাম্**—বিদ্বান ও জ্ঞানবান মানুষদের জন্য; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **রুদ্র-ভয়**—রুদ্রের ভয়ে; **ধ্বস্তম্**—ধ্বংস হয়; **অকুতশ্চিৎ-ভয়া**—নিশ্চিতরূপে নির্ভয়; **গতিঃ**—গতি।

অনুবাদ

হে ভগবান! যে-সমস্ত মানুষ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান, তাঁরা আপনাকে পরম ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে জানেন। যদিও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চরমে সব কিছুর সংহারকারী রুদ্রের ভয়ে ভীত, কিন্তু আপনার জ্ঞানবান ভক্তের কাছে আপনিই হচ্ছেন নির্ভয় আশ্রয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহারের জন্য তিনজন দেবতা হচ্ছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (মহেশ্বর)। প্রলয়ের সময় জড় দেহের বিনাশ হয়ে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর ও জীবের স্থূল শরীর, উভয়েই চরমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দেহের বিনাশের ভয়ে ভক্ত কখনও ভীত হন না, কারণ তিনি স্থির নিশ্চিতভাবে জানেন যে, দেহের বিনাশের পর, তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)।

কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করেন, তা হলে তাঁর আর মৃত্যুভয় থাকে না, কারণ তাঁর ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। অভক্তরা মৃত্যুর ভয়ে ভীত, কারণ তারা যে পরবর্তী জীবনে কোথায় যাবে এবং কি ধরনের শরীর প্রাপ্ত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। এই শ্লোকে *রুদ্র-ভয়* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ রুদ্র স্বয়ং শিব, যিনি নিজেই 'রুদ্রের ভয়ের' কথা বলছেন। তা ইঙ্গিত করে যে, বহু রুদ্র রয়েছেন—একাদশ রুদ্র, এবং যে রুদ্র এখানে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করছেন, তিনি অন্য রুদ্রদের থেকে ভিন্ন, যদিও তিনি তাঁদেরই মতো সমান শক্তিসম্পন্ন। মূল কথা হচ্ছে যে, একজন রুদ্র অন্য রুদ্রদের ভয়ে ভীত, কারণ তাঁরা সকলেই এই জড় জগতের ধ্বংসকার্যে লিপ্ত। কিন্তু ভক্ত কখনও রুদ্রের ভয়ে ভীত নন, কারণ তিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে থাকার ফলে সুরক্ষিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে অর্জুন! তুমি সকলের কাছে ঘোষণা কর যে, আমার শুদ্ধ ভক্ত কোন পরিস্থিতিতেই বিনষ্ট হবে না।"

শ্লোক ৬৯

ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ ।
স্বধর্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ ॥ ৬৯ ॥

ইদম্—এই; **জপত**—জপ করার সময়; **ভদ্রম্**—সর্বতোভাবে কল্যাণ; **বঃ**—তোমরা সকলে; **বিশুদ্ধাঃ**—বিশুদ্ধ; **নৃপ-নন্দনাঃ**—রাজপুত্রগণ; **স্ব-ধর্মম্**—স্বীয় বৃত্তিকারক ধর্ম; **অনুতিষ্ঠন্তঃ**—সম্পাদন করে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অর্পিত**—অর্পণ করে; **আশয়াঃ**—সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা সমন্বিত।

অনুবাদ

হে রাজপুত্রগণ! তোমরা সকলে বিশুদ্ধ হৃদয়ে তোমাদের রাজোচিত কর্তব্য সম্পাদন কর। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মন স্থির করে তোমরা এই মন্ত্র জপ কর। তার ফলে ভগবান তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন, এবং তাতে তোমাদের সর্বতোভাবে মঙ্গল হবে।

তাৎপর্য

ভগবানের উদ্দেশ্যে শিবের এই প্রার্থনা অত্যন্ত প্রামাণিক ও মহত্বপূর্ণ। স্বীয় কর্তব্যকর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করার মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া। মানুষ কোন্ সামাজিক স্থিতিতে রয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না। তা তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আমেরিকান, ইংরেজ, ভারতীয় ইত্যাদি যাই হোন না কেন, তিনি যে-কোন স্থানে এবং যে-কোন অবস্থায় ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রও হচ্ছে একটি প্রার্থনা, কারণ প্রার্থনা করা হয় ভগবানের নামের দ্বারা ভগবানকে সম্বোধন করে, তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়ে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রতে বলা হয়, "হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! হে রাম! হে ভগবানের শক্তি হরে! দয়া করে আমাকে আপনার সেবায় যুক্ত করুন।" কেউ যদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থিতিতেও থাকেন, তিনিও যে-কোন পরিস্থিতিতেই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারেন, যে-সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অহৈতুকী অপ্রতিহতা*—"ভগবদ্ভক্তি কোন জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৬) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই পন্থা উপদেশ দিয়ে গেছেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/৩)

মানুষ তার স্বীয় স্থানে থেকে অথবা তার বৃত্তিকারক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং আমরা পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের কেন্দ্র স্থাপন করছি, যাতে সকলেই ভগবানের বাণী শ্রবণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়।

শ্লোক ৭০

তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ।
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্ ॥ ৭০ ॥

তম্—তাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **আত্ম-স্থম্**—তোমাদের হৃদয়-অভ্যন্তরে; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতেষু**—প্রতিটি জীবে; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত; **পূজয়ধ্বম্**—পূজা কর; **গৃণন্তঃ চ**—সর্বদা কীর্তন করে; **ধ্যায়ন্তঃ চ**—সর্বক্ষণ ধ্যান করে; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

অতএব, হে রাজকুমারগণ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি তোমাদের হৃদয়েও অবস্থিত। অতএব সর্বক্ষণ তাঁর মহিমা কীর্তন কর এবং নিরন্তর তাঁর ধ্যান কর।

তাৎপর্য

অসকৃৎ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার অর্থ হচ্ছে যে, ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং ধ্যান কেবল কিছুক্ষণের জন্যই করণীয় নয়, তা 'নিরন্তর' করা কর্তব্য। সেই উপদেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* দিয়েছেন—*কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ* — "ভগবানের দিব্য নাম দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই করা উচিত।" তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, আমরা ভক্তদের প্রতিদিন কমপক্ষে ষোলমালা জপ করার উপদেশ দিই। প্রকৃতপক্ষে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের নাম কীর্তন করা

উচিত, ঠিক যেভাবে হরিদাস ঠাকুর করতেন। তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরেকৃষ্ণ নাম জপ করতেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর আর অন্য কোন কৃত্য ছিল না। রঘুনাথ দাস গোস্বামী আদি গোস্বামীগণও অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নাম জপ করতেন এবং প্রণতি নিবেদন করতেন। শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর *ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকে* বলেছেন—*সংখ্যাপূর্বক-নামগান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ*। *সংখ্যাপূর্বক* মানে হচ্ছে 'নির্দিষ্ট সংখ্যা স্থির রেখে'। রঘুনাথ দাস গোস্বামী কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনই করতেন না, তিনি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রণতিও নিবেদন করতেন।

যেহেতু রাজকুমারেরা ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কঠোর তপস্যা করতে যাচ্ছিলেন, তাই শিব তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন নিরন্তর ভগবানের নাম জপ করতে এবং ভগবানের ধ্যান করতে। শিব যে স্বয়ং তাঁর পিতা ব্রহ্মার শিক্ষা অনুসারে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি পরম্পরা ধারায় রাজকুমারদের কাছেও সেই উপদেশই দিয়েছিলেন। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপদেশ অনুসারে চলাই যথেষ্ট নয়, সেই জ্ঞান শিষ্যদের কাছে বিতরণ করাও কর্তব্য।

আত্মানম্ আত্মস্থং সর্বভূতেষ্বস্থিতম্ শব্দগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের উৎস। জীবেরা যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই ভগবান তাদের সকলেরই পিতা। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত বলে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ। এই শ্লোকে ভগবানকে আরাধনা করার বিধি অত্যন্ত সরল এবং পূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কারণ যে-কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে উপবিষ্ট হয়ে, জীবনের যে কোন অবস্থায় ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করতে পারেন। শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা অনায়াসে ভগবানের ধ্যান করা যায়।

শ্লোক ৭১

যোগাদেশমুপাসাদ্য ধারয়ন্তো মুনিব্রতাঃ ।
সমাহিতধিয়ঃ সর্ব এতদভ্যসতাদৃতাঃ ॥ ৭১ ॥

যোগ-আদেশম্—ভক্তিযোগের এই নির্দেশ; **উপাসাদ্য**—নিরন্তর পাঠ করে; **ধারয়ন্তঃ**—হৃদয়ে ধারণ করে; **মুনি-ব্রতাঃ**—মহান মুনিদের ব্রত গ্রহণ করে, মৌনব্রত অবলম্বন করে; **সমাহিত**—সর্বদা চিত্ত স্থির রেখে; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধির দ্বারা; **সর্বে**—তোমরা সকলে; **এতৎ**—এই; **অভ্যসত**—অভ্যাস কর; **আদৃতাঃ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে।

অনুবাদ

হে রাজপুত্রগণ। আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা রূপে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার যোগপদ্ধতি বর্ণনা করেছি। তোমরা সকলে এই মহত্ত্বপূর্ণ স্তোত্র মনে ধারণ করে তাতে সমাহিত থাকার ব্রত গ্রহণ করার মাধ্যমে মহান ঋষি হও। মুনিদের মতো মৌনব্রত অবলম্বন করে, তোমরা গভীর মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে এই পন্থা অনুশীলন কর।

তাৎপর্য

হঠযোগের পদ্ধতিতে আসন, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি দৈহিক ব্যায়ামের অভ্যাস করতে হয়। কোন বিশেষ আসনে একস্থানে বসে, নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করে মনকে একাগ্রীভূতও করতে হয়। হঠযোগের পদ্ধতিতে এত বিধিবিধান রয়েছে যে, তা এই যুগে অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। তার বিকল্প পদ্ধতি ভক্তিযোগ অত্যন্ত সরল। এই পন্থাটি কেবল এই যুগের জন্যই নয়, তা অন্যান্য যুগের জন্যও, কারণ এই যোগপদ্ধতি বহুকাল পূর্বে শিব মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন। ভক্তিযোগের পদ্ধতি কোন নবীন পন্থা নয়, কারণ পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগকে সর্বোত্তম যোগপদ্ধতি বলে বর্ণনা করেছেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক দিব্য প্রেম সহকারে আমার ভজনা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী এবং তিনি সব চাইতে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত।"

সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী হচ্ছেন তিনি, যিনি নিরন্তর তাঁর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন। অর্থাৎ, এই ভক্তিযোগের পদ্ধতি অনাদিকাল ধরে চলে আসছে এবং এখন তা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচলিত হচ্ছে।

এই সম্পর্কে *মুনিব্রতাঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চান, তাঁদের পক্ষে মৌন থাকা কর্তব্য। মৌন থাকার অর্থ হচ্ছে কেবল কৃষ্ণকথা বলা। মহারাজ অম্বরীষ এই প্রকার মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ॥

"মহারাজ অম্বরীষ তাঁর মনকে সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির রেখেছিলেন এবং তিনি কেবল তাঁর মহিমা কীর্তন করতেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৯/৪/১৯) আমাদেরও কর্তব্য হচ্ছে এই জীবনের সুযোগ গ্রহণ করে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গে অনর্থক বাক্যালাপ না করে একজন মহামুনির মতো হওয়া। আমাদের উচিত কেবল শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করা অথবা অবিচলিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা তাকে বলা হয় *মুনিব্রত*। বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত (*সমাহিত-ধিয়ঃ*) এবং সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করা উচিত। *এতদ্ অভ্যসতাদৃতাঃ* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, কেউ যদি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে (আদৃত) গুরুদেবের এই উপদেশ পালন করেন এবং যথাযথভাবে তা আচরণ করেন, তা হলে তাঁর কাছে এই ভক্তিযোগের পন্থা অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে।

শ্লোক ৭২

ইদমাহ পুরাস্মাকং ভগবান্ বিশ্বসৃক্পতিঃ ।
ভৃগ্বাদীনামাত্মজানাং সিসৃক্ষুঃ সংসিসৃক্ষতাম্ ॥ ৭২ ॥

ইদম্—এই; **আহ**—বলা হয়েছে; **পুরা**—পূর্বে; **অস্মাকম্**—আমাদের, **ভগবান্**—ভগবান; **বিশ্ব-সৃক্**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; **পতিঃ**—প্রভু, **ভৃগু-আদীনাম্**—ভৃগু আদি মহর্ষিদের; **আত্মজানাম্**—তাঁর পুত্রদের; **সিসৃক্ষুঃ**—সৃষ্টি করার ইচ্ছায়; **সংসিসৃক্ষতাম্**—সৃষ্টিকার্যের অধ্যক্ষ।

অনুবাদ

সমস্ত প্রজাপতিদের প্রভু ব্রহ্মা প্রথমে আমাদের এই স্তোত্রটি বলেছিলেন। সৃষ্টিকার্যে ইচ্ছুক ভৃগু আদি প্রজাপতিদেরও এই স্তোত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন; ব্রহ্মা তার পর শিব ও ভৃগু মুনি আদি অন্যান্য মহর্ষিদের সৃষ্টি করেছেন। এই মহর্ষিরা হচ্ছেন—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, বসিষ্ঠ আদি। এই সমস্ত মহর্ষিগণ প্রজাসৃষ্টির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত। শুরুতে যেহেতু খুব বেশি জীব ছিল না, তাই বিষ্ণু সন্তান উৎপাদনের দায়িত্ব ব্রহ্মার উপর অর্পণ করেছিলেন, এবং

ব্রহ্মা সেই দায়িত্ব শত-সহস্র দেবতা ও মহর্ষিদের উপর অর্পণ করেছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা তাঁর পুত্র ও শিষ্যদের এই স্তোত্র উপদেশ দিয়েছিলেন, যেটি শিব এখানে গেয়েছেন। জড় সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ, কিন্তু শিব এখানে যে স্তোত্রটি গেয়েছেন, সেই বর্ণনা অনুসারে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা নিরন্তর স্মরণ করার ফলে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রভাব প্রতিহত করা যায়। এইভাবে আমরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে থাকতে পারি তার ফলে সৃষ্টিকার্যে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থায় অবিচলিত থাকতে পারি। সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। জড় জগতে সকলেই বর্ণাশ্রম-ধর্মে নির্দিষ্ট কোন বিশেষ বৃত্তিতে যুক্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সকলেই তাদের বৃত্তিতে যুক্ত, কিন্তু কেউ যদি তার প্রথম কর্তব্য—নিরন্তর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার কথা স্মরণে রাখেন, তা হলে সব কিছুই সার্থক হবে। কেউ যদি কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিধিবিধান অনুসারে তাঁর কর্তব্যকর্মে যুক্ত থাকেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা স্মরণ না করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত বৃত্তি, কার্যকলাপ ও ধর্ম-অনুষ্ঠান কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/৮), প্রথম স্কন্ধে প্রতিপন্ন হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

মূল কথা হচ্ছে যে, কেউ যদি তাঁর বৃত্তিগত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন, তা হলেও অপ্রতিহতভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে যাওয়া উচিত। কেবলমাত্র শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের মাধ্যমে তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারেন। বৃত্তিগত ধর্ম পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৪৬) বলা হয়েছে—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

"সমস্ত জীবের উৎস এবং সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার দ্বারা মানুষ তার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করে সিদ্ধিলাভ করতে পারে।"

এইভাবে কেউ তার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারেন, কিন্তু এখানে দেওয়া শিবের নির্দেশ অনুসারে তিনি যদি ভগবানের আরাধনা করেন, তা হলে তিনি জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৩)। আমাদের কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া উচিত, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা যদি আমাদের সেই কর্তব্যকর্মের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা করি, তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৭৩

তে বয়ং নোদিতাঃ সর্বে প্রজাসর্গে প্রজেশ্বরাঃ ।
অনেন ধ্বস্ততমসঃ সিসৃক্ষ্মো বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৭৩ ॥

তে—তাঁর দ্বারা; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **নোদিতাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **সর্বে**—সমস্ত; **প্রজা-সর্গে**—প্রজা সৃষ্টির সময়; **প্রজা-ঈশ্বরাঃ**—প্রজাপতিরা; **অনেন**—এর দ্বারা; **ধ্বস্ত-তমসঃ**—সর্বপ্রকার অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে; **সিসৃক্ষ্মঃ**—আমরা সৃষ্টি করেছিলাম; **বিবিধাঃ**—নানা প্রকার; **প্রজাঃ**—জীব।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন সমস্ত প্রজাপতিদের প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন আমরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে এই স্তোত্র গেয়েছিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। এইভাবে আমরা বিবিধ প্রকার জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সৃষ্টির শুরুতেই একসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার জীবদের সৃষ্টি হয়েছিল। ডারউইনের অর্থহীন বিবর্তনবাদ এখানে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এমন নয় যে, কোটি-কোটি বছর আগে বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষেরা ছিল না। পক্ষান্তরে, এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন জীব ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছিল সর্বপ্রথমে। ব্রহ্মা তার পর মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বসিষ্ঠ আদি মহর্ষিদের এবং শিবকে সৃষ্টি করেছিলেন। তার পর তাঁরা জীবের কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহ সৃষ্টি করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে বলেছেন যে, জীব তার কর্ম অনুসারে বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তা নির্ধারিত হয় উচ্চতর অধিকারিদের দ্বারা। এই সমস্ত উচ্চতর অধিকারিরা ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত হন, এবং তাঁরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, অন্যান্য প্রজাপতি ও মনুগণ। এইভাবে দেখা যায় যে, সৃষ্টির শুরুতে প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন সব চাইতে বুদ্ধিমান। এমন নয় যে, তথাকথিত আধুনিক বুদ্ধিমত্তা ধীরে ধীরে বিবর্তনের

মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* ক্রমিক বিবর্তনের বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সেই বিবর্তন দেহের বিবর্তন নয়। সর্বপ্রকার দেহ শুরু থেকেই রয়েছে। দেহের মধ্যে রয়েছে যে চিন্ময় আত্মা বা চিৎস্ফুলিঙ্গ তা প্রকৃতির নিয়মে এবং উচ্চতর অধিকারিদের অধ্যক্ষতায় ক্রমশ উন্নততর শরীর প্রাপ্ত হচ্ছে। এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সৃষ্টির প্রথম থেকেই বিবিধ প্রকার জীব রয়েছে। এমন নয় যে, তাদের কেউ কেউ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সব কিছুই রয়েছে, কেবল আমাদের জ্ঞানের অভাবে আমরা বস্তুর বাস্তবিক রূপ দর্শন করতে পারছি না।

এই শ্লোকে *ধ্বস্ততমসঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তমোগুণ থেকে মুক্ত না হলে, আমরা বিভিন্ন প্রকার জীবের সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩১/১) বলা হয়েছে, *দৈবনেত্রেণ*—উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন দেবতাদের অধ্যক্ষতায় জীব তার দেহ প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত দেবতারা যদি সব রকম ত্রুটি থেকে মুক্ত না হন, তা হলে কিভাবে তাঁরা জীবের বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন? বৈদিক নির্দেশের অনুগামীরা কখনও ডারউইনের বিবর্তনবাদ স্বীকার করতে পারেন না, কারণ তার সেই মতবাদটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

শ্লোক ৭৪

অথেদং নিত্যদা যুক্তো জপন্নবহিতঃ পুমান্ ।
অচিরাচ্ছ্রেয় আপ্নোতি বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ৭৪ ॥

অথ—এইভাবে; **ইদম্**—এই; **নিত্যদা**—নিয়মিতভাবে; **যুক্তঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **জপন্**—জপ করার দ্বারা; **অবহিতঃ**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; **পুমান্**—মানুষ; **অচিরাৎ**—অবিলম্বে; **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণ; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **বাসুদেব-পরায়ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁর মন সর্বদা তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকে, যিনি একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে এই স্তোত্র জপ করেন, তিনি অচিরেই জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধি মানে হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া। *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/২৮) প্রথম স্কন্ধে বলা হয়েছে—*বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ ।* জীবনের চরম

লক্ষ্য হচ্ছেন বাসুদেব বা কৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে-কোন ভক্ত কেবল তাঁর বন্দনা করার মাধ্যমে সর্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, জাগতিক বিষয় প্রাপ্ত হতে পারেন, এবং মুক্তিলাভ করতে পারেন। ব্রহ্মা, শিব আদি মহান পুরুষেরা এবং মহর্ষিরা নানাভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩৩)। সমস্ত দেবতাদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছেন শিব ও বিরিঞ্চি বা ব্রহ্মা, এবং তাঁরা উভয়েই ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করেন। আমরা যদি এই প্রকার মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হই, তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। দুর্ভাগ্যবশত মানুষেরা এই রহস্য সম্বন্ধে অবগত নয়। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—"তারা জানে না যে, জীবনের প্রকৃত প্রয়োজন এবং পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর (কৃষ্ণের) পূজা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১) ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে কখনও সুখী হওয়া যায় না। কৃষ্ণভক্ত না হলে, আমাদের প্রতি পদক্ষেপে ব্যর্থ হতে হবে এবং বিভ্রান্ত হতে হবে। এই সংকট থেকে জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকেই সব কিছু জেনে, আমার শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

কেবলমাত্র বাসুদেবের ভক্ত হয়ে আমরা যে-কোন বর লাভ কবতে পারি।

শ্লোক ৭৫

শ্রেয়সামিহ সর্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্ ।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞাননৌর্ব্যসনার্ণবম্ ॥ ৭৫ ॥

শ্রেয়সাম্—সর্বপ্রকার কল্যাণের মধ্যে; **ইহ**—এই জগতে; **সর্বেষাম্**—সমস্ত মানুষের; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **নিঃশ্রেয়সম্**—চরম মঙ্গল; **পরম্**—দিব্য; **সুখম্**—সুখ; **তরতি**—উত্তীর্ণ হয়; **দুষ্পারম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **নৌঃ**—নৌকা; **ব্যসন**—বিপদ; **অর্ণবম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

এই জড় জগতে যত প্রকার কল্যাণ রয়েছে, তার মধ্যে জ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়, কারণ জ্ঞানরূপ নৌকায় আরোহণ করে, দুর্লঙ্ঘ্য সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তা ছাড়া এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আর কোন উপায় নেই।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে সকলেই অজ্ঞানের ফলে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। প্রতিদিন আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞানহীন মানুষ নানা প্রকার অপরাধজনক কার্য করছে এবং তার ফলে কারারুদ্ধ হয়ে দণ্ডভোগ করছে, যদিও সে তার পাপকর্ম সম্বন্ধে হয়তো সচেতন নয়। এই প্রকার অজ্ঞানতা সারা জগৎ জুড়ে বিরাজ করছে। মানুষ বিবেচনা করে দেখে না, অবৈধ যৌনসঙ্গের চেষ্টার দ্বারা, জিহ্বার তৃপ্তিসাধনের জন্য পশুহত্যা করে, আসব পান করে এবং জুয়া খেলে তারা কিভাবে তাদের জীবন বিপন্ন করছে। এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই পৃথিবীর নেতারা এই সমস্ত পাপকর্মের পরিণাম যে কি তা জানে না। পক্ষান্তরে তারা এই সমস্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করছে এবং তার ফলে অজ্ঞানের সমুদ্রের পরিধি বর্ধিত করছে।

এই অজ্ঞানের বিপরীত হচ্ছে পূর্ণজ্ঞান, এবং তা এই জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমরা ব্যবহারিকভাবে দেখতে পাই যে, যাঁরা জ্ঞানবান, তাঁরা জীবনের অনেক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পান। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে, *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*—"কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন।" *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*—"এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন তথাকথিত সমস্ত নেতাদের চোখ খুলে দিয়ে, তাদের জীবনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। সবচাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ হচ্ছে মনুষ্যেতর জীবন প্রাপ্ত হওয়া। বহু কষ্টে এই মনুষ্য শরীর লাভ হয়েছে, যাতে এই শরীরের সদ্ব্যবহার করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। শিব উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি এই স্তোত্রের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হতে পারবেন এবং তার ফলে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর জীবন সার্থক করতে পারবেন।

শ্লোক ৭৬

য ইমং শ্রদ্ধয়া যুক্তো মদ্‌গীতং ভগবৎস্তবম্ ।
অধীয়ানো দুরারাধ্যং হরিমারাধয়ত্যসৌ ॥ ৭৬ ॥

যঃ—যে-কেউ; **ইমম্**—এই; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **যুক্তঃ**—গভীর আসক্তিসহ; **মৎ-গীতম্**—আমি যে গানটি গেয়েছি; **ভগবৎ-স্তবম্**—পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা; **অধীয়ানঃ**—নিয়মিত পাঠ করার দ্বারা; **দুরারাধ্যম্**—যাঁর আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আরাধয়তি**—আরাধনা করতে পারেন; **অসৌ**—এই প্রকার ব্যক্তি।

অনুবাদ

যদিও পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তি করা এবং তাঁর আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও কেউ যদি আমার দ্বারা রচিত ও গীত এই স্তোত্র কেবল পাঠ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

শিব যে ভগবান বাসুদেবের শুদ্ধ ভক্ত, তা এখানে বিশেষভাবে বোঝা যাচ্ছে। *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—"সমস্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।" সেই সূত্রে শিবের একটি সম্প্রদায় রয়েছে, একটি বৈষ্ণব পরম্পরা রয়েছে, যার নাম হচ্ছে রুদ্র-সম্প্রদায়। এখন বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা এই রুদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবের ভক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। সেই সম্পর্কে এখানে *দুরারাধ্যম্* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দেবতাদের পূজা করা খুব একটা কঠিন নয়, কিন্তু বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া তত সহজ নয়। কিন্তু, কেউ যদি শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করেন এবং মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, যে উপদেশ শিব দিয়েছেন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হতে পারেন। সেই কথা প্রহ্লাদ মহারাজও প্রতিপন্ন করেছেন। মনোধর্মের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা যায় না। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে একটি বিশেষ প্রাপ্তি, যা কেবল শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হওয়ার ফলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ*—"সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তের চরণ-রেণুর দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩২)

শ্লোক ৭৭

বিন্দতে পুরুষোঽমুষ্মাদ্যদ্যদিচ্ছত্যসত্বরম্ ।
মদ্গীতগীতাৎসুপ্রীতাচ্ছ্রেয়সামেকবল্লভাৎ ॥ ৭৭ ॥

বিন্দতে—লাভ করে; **পুরুষঃ**—ভক্ত; **অমুষ্মাৎ**—ভগবান থেকে; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **ইচ্ছতি**—কামনা করেন; **অসত্বরম্**—স্থির হয়ে; **মৎ-গীত**—আমার দ্বারা গীত; **গীতাৎ**—সঙ্গীতের দ্বারা; **সু-প্রীতাৎ**—ভগবান থেকে, যিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন; **শ্রেয়সাম্**—সমস্ত মঙ্গলের; **এক**—এক; **বল্লভাৎ**—প্রিয়তম থেকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত মঙ্গলময় আশীর্বাদের মধ্যে প্রিয়তম বস্তু। যে ব্যক্তি আমার দ্বারা গীত এই সঙ্গীত গান করেন, তিনি ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারেন। এই প্রকার ভক্ত ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হয়ে ভগবানের কাছে যা প্রার্থনা করেন, তাই প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৬/২২) বলা হয়েছে, *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ* —কেউ যদি ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হন, তা হলে তাঁর আর আকাঙ্ক্ষা করার মতো কিছু থাকে না, এবং তিনি আর অন্য কোন কিছু লাভের আশাও করেন না। ধ্রুব মহারাজ যখন তপস্যার প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে তাঁর ঈপ্সিত যে-কোন বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন যে, ভগবানকে দর্শন করে তিনি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছেন, তাই তাঁর আর চাওয়ার মতো কিছুই নেই। ভগবানের সেবা ব্যতীত আমরা যা কিছু চাই, তা হচ্ছে মায়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস' (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২০/১০৮)। প্রতিটি জীবই ভগবানের নিত্যদাস; তাই কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। বিশ্বস্ত সেবক যেমন তার প্রভুর কৃপায়, তার যে-কোন বাসনা চরিতার্থ করতে পারে, ঠিক তেমনই যাঁরা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের আর স্বতন্ত্রভাবে কোন বাসনা থাকে না। নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলেই, তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ হয়ে যায়। শিব আমাদের দেখিয়েছেন যে, তিনি যে স্তুতিগান করেছেন, কেবল তা কীর্তন করার ফলে যে-কোন ভক্ত অনায়াসে সফল হতে পারেন।

শ্লোক ৭৮

ইদং যঃ কল্য উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্যো মুচ্যতে কর্মবন্ধনৈঃ ॥ ৭৮ ॥

ইদম্—এই প্রার্থনা, **যঃ**—যে ভক্ত; **কল্যে**—প্রাতঃকালে; **উত্থায়**—শয্যাত্যাগ করার পর; **প্রাঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে; **অন্বিতঃ**—মগ্ন হয়ে; **শৃণুয়াৎ**—কীর্তন করেন এবং শ্রবণ করেন; **শ্রাবয়েৎ**—এবং অন্যদের শোনান; **মর্ত্যঃ**—এই প্রকার মানুষ; **মুচ্যতে**—মুক্ত হন; **কর্ম-বন্ধনৈঃ**—সকাম কর্মের সমস্ত বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

যে ভক্ত খুব সকালে উঠে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে এই রুদ্রগীত গান করেন এবং অন্যদের তা শোনান, তিনি নিশ্চিতভাবে সকাম কর্মের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

মুক্তির অর্থ হচ্ছে সমস্ত সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১০/৬) বলা হয়েছে—*মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপম্*। মুক্তি মানে হচ্ছে অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে, নিজের স্বরূপে অবস্থিত হওয়া (*স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*)। বদ্ধ অবস্থায় আমরা একের পর এক সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাকে বলা হয় *কর্মবন্ধন*। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মন সকাম কর্মে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ আমরা সুখভোগের জন্য নানা প্রকার পরিকল্পনা করি। কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা ভিন্ন, কারণ ভক্তিযোগের অর্থ হচ্ছে পরম ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে কার্য করা। আমরা যখন পরম ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে কার্য করি, তখন আমরা সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হই না। যেমন, অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন কারণ পরমেশ্বর ভগবান তা চেয়েছিলেন; তাই সেই যুদ্ধের ফলাফলের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না। ভগবদ্ভক্তিতে শ্রবণ এবং কীর্তনও দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করারই মতো। প্রকৃতপক্ষে শ্রবণ এবং কীর্তনও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। ইন্দ্রিয়গুলি যখন জড় সুখ-ভোগের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন কর্মের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

শ্লোক ৭৯

গীতং ময়েদং নরদেবনন্দনাঃ
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ স্তবম্ ।
জপন্ত একাগ্রধিয়স্তপো মহৎ
চরধ্বমন্তে তত আপ্স্যথেপ্সিতম্ ॥ ৭৯ ॥

গীতম্—গীত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **নরদেব-নন্দনাঃ**—হে রাজপুত্রগণ; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **পুংসঃ**—ভগবান; **পরম-আত্মনঃ**—সকলের পরমাত্মা; **স্তবম্**—প্রার্থনা; **জপন্তঃ**—জপ করে; **এক-অগ্র**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধি; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **মহৎ**—মহান; **চরধ্বম্**—তোমরা অভ্যাস কর, **অন্তে**—অন্তে; **ততঃ**—তার পর; **আপ্স্যথ**—প্রাপ্ত হবে; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত ফল।

অনুবাদ

হে রাজপুত্রগণ! আমি যে স্তোত্রটি গাইলাম, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি এই স্তোত্র তোমরা জপ কর, কারণ তা মহান তপস্যারই মতো কার্যকরী। এইভাবে যখন তোমরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে, তখন তোমাদের জীবন সার্থক হবে, এবং তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

আমরা যদি নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে থাকি, তা হলে যথাসময়ে আমাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'রুদ্রগীত কীর্তন' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি সন্দিশ্য ভগবান্ বার্হিষদৈরভিপূজিতঃ ।
পশ্যতাং রাজপুত্রাণাং তত্রৈবান্তর্দধে হরঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সন্দিশ্য**—উপদেশ দিয়ে; **ভগবান**—সর্বশক্তিমান, **বার্হিষদৈঃ**—রাজা বর্হিষতের পুত্রদের দ্বারা, **অভিপূজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **পশ্যতাম্**—সমক্ষে; **রাজ-পুত্রাণাম্**—রাজপুত্রদের ; **তত্র**—সেখানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে, **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরঃ**—শিব।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—হে বিদুর! এইভাবে ভগবান শিব রাজা বর্হিষতের পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজপুত্রেরাও তখন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শিবের পূজা করেছিলেন। তার পর ভগবান শিব রাজপুত্রদের সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়টিতে প্রাচীন কালের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি খুব সুন্দর তত্ত্ব পাওয়া যায়। রাজা বর্হিষৎ যখন তাঁর রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণের কথা বিবেচনা করছিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রদের তপস্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা প্রজাদের মঙ্গল-সাধনের জন্য আদর্শ রাজা হতে পারেন। সেই সময় রাজা বর্হিষৎ নিজেও দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে জড় জগৎ এবং তা ভোগ করতে ইচ্ছুক জীবদের সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করছিলেন। তা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, রাজ্যভার গ্রহণ করার পূর্বে রাজা ও রাজপুত্রদের রাজকার্য পরিচালনার জন্য

কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। জনকল্যাণ-কার্যের লক্ষ্য ছিল ভগবানকে জানা মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং তাঁর সেবা করা। যেহেতু রাজারা প্রজাদের পারমার্থিক শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন, তাই রাজা ও প্রজা উভয়েই কৃষ্ণভাবনায় সুখী থাকতেন এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের রাজবংশ আসছে নারদ মুনির প্রখ্যাত শিষ্য এবং ভগবানের মহান ভক্ত ধ্রুব মহারাজ থেকে। মহারাজ প্রাচীনবর্হিবৎ তখন বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সকাম কর্মে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ উচ্চতর লোকে বা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মুক্তি তাতে লাভ করা যায় না দেবর্ষি নারদ যখন দেখেছিলেন যে, ধ্রুব মহারাজের বংশধর এইভাবে সকাম কর্মের দ্বারা পথভ্রষ্ট হচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং নিজে এসে জীবনের পরম লক্ষ্য ভক্তিযোগ সম্বন্ধে তাঁকে উপদেশ দেন। নারদ মুনি কিভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে পরোক্ষভাবে ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা এখানে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

রুদ্রগীতং ভগবতঃ স্তোত্রং সর্বে প্রচেতসঃ ।
জপন্তস্তে তপস্তেপুর্বর্ষাণামযুতং জলে ॥ ২ ॥

রুদ্র-গীতম্—শিব যে গান গেয়েছিলেন; **ভগবতঃ**—ভগবানের, **স্তোত্রম্**—স্তোত্র; **সর্বে**—সমস্ত; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতা নামক রাজপুত্রগণ; **জপন্তঃ**—জপ করে; **তে**—তাঁরা সকলে, **তপঃ**—তপশ্চর্যা, **তেপুঃ**—সম্পাদন করে; **বর্ষাণাম্**—বছর, **অযুতম্**—দশ হাজার; **জলে**—জলের ভিতর

অনুবাদ

সমস্ত প্রচেতারা দশ হাজার বছর জলের ভিতর দাঁড়িয়ে, সেই রুদ্রগীত জপ করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজপুত্রেরা কিভাবে দশ হাজার বছর জলের ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই কথা শুনে আধুনিক যুগের মানুষেরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত আশ্চর্য হবে। কিন্তু, বায়ুর ভিতর থাকা অথবা জলের ভিতর থাকা একই রকম; তবে কিভাবে তা করতে হবে, তা

কেবল জানতে হয় জলচর প্রাণীরা সারা জীবন জলের মধ্যে থাকে। জলের ভিতর থাকার জন্য তাদের কতকগুলি অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হয়। তখনকার দিনে মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর। তার মধ্যে কেউ যদি দশ হাজার বছর তপস্যা করতেন, তা হলে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন নিঃসন্দেহে সফল হত। সেটি খুব একটি আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যদিও এই যুগে সেই প্রকার কার্য অসম্ভব, তবুও সত্যযুগে তা সম্ভব ছিল।

শ্লোক ৩

প্রাচীনবর্হিষং ক্ষত্তঃ কর্মস্বাসক্তমানসম্ ।
নারদোঽধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃপালুঃ প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৩ ॥

প্রাচীনবর্হিষম্—মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **আসক্ত**—রত; **মানসম্**—চিত্ত; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ, **অধ্যাত্ম**—আধ্যাত্মিক; **তত্ত্ব-জ্ঞঃ**—তত্ত্ববেত্তা; **কৃপালুঃ**—কৃপাপরবশ হয়ে; **প্রত্যবোধয়ৎ**—উপদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

রাজপুত্রেরা যখন জলের ভিতর কঠোর তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁদের পিতা বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। তাই তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তত্ত্ববেত্তা দেবর্ষি নারদ রাজার প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে, তাঁকে পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে মনস্থ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, *কৈবল্য* বা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া, নরকে যাওয়ারই সমতুল্য, এবং স্বর্গ সুখভোগ আকাশ-কুসুমের মতো। অর্থাৎ, ভক্ত কখনও কর্মী এবং জ্ঞানীদের যে চরম লক্ষ্য, তাতে কোন গুরুত্ব দেন না। কর্মীদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া, এবং জ্ঞানীদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া। জ্ঞানীরা অবশ্য কর্মীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, কোটি কর্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৪৭)। তাই ভক্ত কখনও কর্মমার্গে প্রবেশ করেন না। নারদ মুনি যখন দেখলেন যে, মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ সকাম কর্ম অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তখন তিনি তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন।

ভৌতিক কার্যকলাপে লিপ্ত কর্মীদের থেকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার দ্বারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছেন যাঁরা, তাঁরা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিতে কর্ম ও জ্ঞান দুটিকেই মায়ার মোহময়ী প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়।

শ্লোক ৪

শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ কর্মণাত্মন ঈহসে ।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্রেয়ঃ—চরম মঙ্গল; **ত্বম্**—আপনি; **কতমৎ**—তা কি; **রাজন্**—হে রাজন্; **কর্মণা**—সকাম কর্মের দ্বারা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **ঈহসে**—বাসনা করেন; **দুঃখ-হানিঃ**—সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি; **সুখ-অবাপ্তিঃ**—সমস্ত সুখের প্রাপ্তি; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **তৎ**—তা; **ন**—কখনই না; **ইহ**—এই প্রসঙ্গে; **চ**—এবং; **ইষ্যতে**—লাভ হয়।

অনুবাদ

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে রাজন্! এই সমস্ত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনি কি লাভ করতে চান? জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া এবং সুখভোগ করা, কিন্তু সকাম কর্মের দ্বারা তো তা লভ্য নয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে মহামায়া প্রকৃত বুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করে। মানুষ রজোগুণে কিছু লাভ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু সে জানে না যে, কাল তাকে চিরকালের জন্য কোন কিছু উপভোগ করতে দেবে না। মানুষ যে পরিমাণ পরিশ্রম করে, তার তুলনায় তার যা লাভ হয় তা নিতান্তই নগণ্য। আর লাভ যদি হয়ও, তবুও তা ক্লেশবিহীন নয়। মানুষ যদি জন্মসূত্রে ধনী না হয় এবং সে যদি বাড়ি, গাড়ি ও অন্যান্য জড়-জাগতিক বস্তু ক্রয় করতে চায়, তা হলে সেই জন্য তাকে বহু বছর ধরে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। অতএব তার সুখ কখনই অনায়াসে লব্ধ নয়।

প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতে নিরঙ্কুশ সুখ কখনই লাভ করা যায় না। আমরা যদি কোন কিছু উপভোগ করতে চাই, তা হলে সেই সুখ লাভের জন্য আমাদের দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, এই জড় জগৎ দুঃখময়, আর

যে সুখ ভোগের চেষ্টা আমরা করি তা প্রকৃতপক্ষে মায়িক। আমাদের সকলকেই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখভোগ করতে হয়। আমরা অনেক ভাল ভাল ওষুধ আবিষ্কার করে থাকতে পারি, কিন্তু ব্যাধি ও মৃত্যুর দুঃখ রোধ করা কখনই সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে রোগ ও মৃত্যুকে ঔষধ প্রতিহত করতে পারে না। মোট কথা এই জড় জগতে সুখ নেই, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা তথাকথিত সুখের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। বাস্তবিকপক্ষে, এই কঠোর পরিশ্রম করার পন্থাকেই সুখ বলে মনে করা হয়। সেটিই হচ্ছে মায়া।

তাই নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি এত ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, কি লাভ করতে চান। যদি কেউ স্বর্গলোকও প্রাপ্ত হয়, তবুও সে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। কেউ এখানে তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, ভক্তদেরও তো ভক্তিসাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয় এবং সেই জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। হ্যাঁ, নবীন ভক্তদের জন্য ভগবদ্ভক্তির সাধনা কষ্টদায়ক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের অন্তত এই আশা রয়েছে যে, চরমে তারা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে, পরম আনন্দ লাভ করতে পারবে। সাধারণ কর্মীদের জন্য এই প্রকার কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ তারা যদি স্বর্গলোকেও উন্নীত হয়, তবুও তারা যে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে পারবে, সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন কি ব্রহ্মাও, যিনি সর্বোচ্চ লোকে (ব্রহ্মলোকে) অবস্থিত, তাঁরও মৃত্যু হয়। ব্রহ্মার জন্ম ও মৃত্যু সাধারণ মানুষের থেকে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এই জড় জগতে তিনিও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত নন। কেউ যদি এই সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন করেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন ! যিনি তত্ত্বত জানেন যে, আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর, এই জড় জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

এইভাবে পূর্ণ কৃষ্ণচেতনা লাভ করার পর, ভগবদ্ভক্তকে তাঁর মৃত্যুর পর আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। সেটিই হচ্ছে সুখের চরম অবস্থা, যাতে দুঃখের লেশ মাত্রও থাকে না।

শ্লোক ৫

রাজোবাচ

ন জানামি মহাভাগ পরং কর্মাপবিদ্ধধীঃ ।
ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্মভিঃ ॥ ৫ ॥

রাজা উবাচ—রাজা উত্তর দিলেন; **ন**—না, **জানামি**—আমি জানি; **মহা-ভাগ**—হে মহাত্মা, **পরম্**—দিব্য; **কর্ম**—সকাম কর্মের দ্বারা; **অপবিদ্ধ**—বিদ্ধ হয়ে; **ধীঃ**—আমার বুদ্ধি; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **মে**—আমাকে; **বিমলম্**—বিশুদ্ধ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যেন**—যার দ্বারা, **মুচ্যেয়**—মুক্ত হতে পারি, **কর্মভিঃ**—সকাম কর্ম থেকে।

অনুবাদ

রাজা উত্তর দিলেন—হে মহাত্মা নারদ! আমার বুদ্ধি সকাম কর্মে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাই আমি জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত নই। দয়া করে আপনি আমাকে শুদ্ধ জ্ঞান দান করুন। যার ফলে আমি সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন

সৎ-সঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস ।
তে-কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ-ফাঁস ॥

মানুষ যতক্ষণ সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাকে একের পর এক শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়। তাকে বলা হয় *কর্মবন্ধ ফাঁস।* মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হোক অথবা পুণ্যকর্মে লিপ্ত হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ উভয়ই জড় দেহের বন্ধনের কারণ পুণ্যকর্মের ফলে কেউ ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং সুন্দর দেহ ও উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তার ফলে তার দুঃখকষ্ট চিরতরে নিবৃত্ত হয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা অস্বাভাবিক নয়, এবং উচ্চশিক্ষা ও অত্যন্ত সুন্দর দেহ লাভ করাও অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে দুঃখকষ্ট নেই। বর্তমানে পাশ্চাত্যের যুবক যুবতীদের যথেষ্ট শিক্ষা, সৌন্দর্য ও ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও, এবং যথেষ্ট খাবার, বেশভূষা ও ইন্দ্রিয়

সুখভোগের প্রচুর সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত দুঃখী। প্রকৃতপক্ষে তারা এত দুঃখী যে, তারা হিপি হয়ে যাচ্ছে এবং প্রকৃতির নিয়মে তাদের এক অত্যন্ত দুঃখময় জীবন গ্রহণ করতে হচ্ছে। তাদের থাকবার কোন জায়গা নেই, অন্ন বস্ত্রের সংস্থান নেই, এবং তারা অত্যন্ত নোংরাভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং রাস্তায় ঘুমাতে বাধ্য হতে হচ্ছে। তা থেকে বোঝা যায় যে, কেবল পুণ্যকর্ম করার ফলেই সুখী হওয়া যায় না। এমন নয় যে রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মালেই, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেবল পাপকর্ম অথবা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সুখী হওয়া যায় না। এই প্রকার কার্যগুলি কেবল জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনের কারণ হয়। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাকে বলেছেন *কর্মবন্ধ ফাঁস।*

মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ সেই কথা স্বীকার করে সরলভাবে নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিভাবে এই *কর্মবন্ধ-ফাঁস* থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের এই স্তরকে বেদান্ত-সূত্রের প্রথম শ্লোকে *অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে কেউ যখন *কর্মবন্ধ-ফাঁসের* চেষ্টায় হতাশ হন, তখন তিনি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, যাকে বলা হয় *ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।* জীবনের চরম লক্ষ্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে *বেদে* (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১১/২/১২) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*— "দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করবার উদ্দেশ্যে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।"

মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু নারদ মুনিকে পেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর কাছে সেই জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যার দ্বারা *কর্মবন্ধ-ফাঁস* থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। *জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ।* *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/১০) প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছে *কর্মবন্ধ-ফাঁস* থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা।

শ্লোক ৬

গৃহেষু কূটধর্মেষু পুত্রদারধনার্থধীঃ ।
ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু ॥ ৬ ॥

গৃহেষু—গৃহস্থ জীবনে; **কূট-ধর্মেষু**—কপট-ধর্মে, **পুত্র**—সন্তান-সন্ততি; **দার**—পত্নী; **ধন**—সম্পদ, **অর্থ**—জীবনের লক্ষ্য; **ধীঃ**—যিনি মনে করেন; **ন**—না; **পরম্**—

চিন্ময়; বিন্দতে—লাভ করেন, মূঢ়ঃ—মূর্খ ব্যক্তি; ভ্রাম্যন্—ভ্রমণ করে; সংসার—জড় অস্তিত্বের; বর্ত্মসু—পথে।

অনুবাদ

যারা কেবল তথাকথিত সুন্দর জীবনের প্রতি আগ্রহশীল—অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির বন্ধনে গৃহস্থরূপে ধন-সম্পদের অন্বেষণ করাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তারা কেবল বিভিন্ন শরীরে সংসার-চক্রে আবর্তিত হয়। তারা কখনই জীবনের পরম লক্ষ্য খুঁজে পায় না।

তাৎপর্য

যারা স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ ও গৃহ আদির বন্ধন-সমন্বিত গৃহস্থ জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা কূটধর্ম পরায়ণ এই কূটধর্ম বা ছলধর্মকে প্রহ্লাদ মহারাজ অন্ধকূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি অন্ধকূপের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন কারণ অন্ধকূপে পতিত হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী সে সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করতে পারে, কিন্তু কেউই তার সেই আর্তনাদ শুনতে পাবে না অথবা তাকে উদ্ধার করতে আসবে না।

ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ১৯/১৫১) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—*ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।* সমস্ত জীবেরা বিভিন্ন লোকে নানা প্রকার শরীরে ভ্রমণ করছে। তাদের সেই উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণের সময়, তারা যদি পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় কোন ভক্তের সঙ্গলাভ করে, তা হলে তাদের জীবন সার্থক হয়। মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ যদিও সকাম কর্মে লিপ্ত ছিলেন, তবুও দেবর্ষি নারদ তাঁর কাছে এসেছিলেন। মহারাজ ছিলেন পরম ভাগ্যবান, তাই তিনি নারদ মুনির সঙ্গলাভ করেছিলেন, যিনি তাঁকে দিব্য জ্ঞানের আলোক দান করেছিলেন সাধুদের কর্তব্য হচ্ছে নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করে, মোহাচ্ছন্ন মানুষদের জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, তাদের কর্মবন্ধন থেকে উদ্ধার করা।

শ্লোক ৭

নারদ উবাচ

ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতাঞ্জীবসঙ্ঘান্নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ ॥ ৭ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ উত্তর দিলেন; **ভোঃ ভোঃ**—ওহে; **প্রজা-পতে**—হে প্রজাপালক; **রাজন্**—হে রাজন্; **পশূন্**—পশু; **পশ্য**—দেখুন; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অধ্বরে**—যজ্ঞে; **সংজ্ঞাপিতান্**—নিহত, **জীব-সঙ্ঘান্**—পশুসমূহ; **নির্ঘৃণেন**—নির্দয়ভাবে; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে প্রজাপালক রাজন্! আপনি যজ্ঞস্থলে যে-সমস্ত পশুদের নির্দয়ভাবে বলি দিয়েছেন, গগনমার্গে সেই সমস্ত পশুদের দেখুন।

তাৎপর্য

যেহেতু বেদে পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই প্রায় সমস্ত ধর্ম-অনুষ্ঠানে পশুবলি দেওয়া হয়। কিন্তু, কেবল শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পশুহত্যা করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের স্তর অতিক্রম করে, প্রকৃত সত্য—জীবনের পরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। নারদ মুনি রাজাকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যের ভাবনা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। জ্ঞান ও বৈরাগ্য হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। জ্ঞান বিনা জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হওয়া যায় না, এবং জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত না হলে, পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা যায় না। কর্মীরা সাধারণত জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে ব্যস্ত, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা যে-কোন পাপকর্ম করতে প্রস্তুত থাকে। পশুবলি এই রকম একটি পাপকর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। তাই নারদ মুনি তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত মৃত পশুদের দেখিয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

এতে ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব ।
সম্পরেতম্ অয়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ ॥ ৮ ॥

এতে—তারা সকলে; **ত্বাম্**—আপনি; **সম্প্রতীক্ষন্তে**—প্রতীক্ষা করছে; **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করছে; **বৈশসম্**—আঘাত; **তব**—আপনার; **সম্পরেতম্**—মৃত্যুর পর; **অয়ঃ**—লৌহনির্মিত; **কূটৈঃ**—শৃঙ্গ দ্বারা; **ছিন্দন্তি**—বিদীর্ণ করবে; **উত্থিত**—উদ্দীপ্ত; **মন্যবঃ**—ক্রোধ।

অনুবাদ

আপনি যে তাদের পীড়ন করেছেন তা স্মরণ করে, এই সমস্ত পশুরা আপনার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আপনার মৃত্যুর পর তারা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে, লৌহময় শৃঙ্গের দ্বারা আপনার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবে।

তাৎপর্য

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে যজ্ঞে পশুহত্যার পরিণাম সম্বন্ধে বোঝাতে চেয়েছিলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশুদের তৎক্ষণাৎ মনুষ্য শরীর লাভ হয়। তেমনই যুদ্ধ ক্ষেত্রে ন্যায্য কারণে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হলে, তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হন। *মনু-সংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজার উচিত হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা, যার ফলে তাকে যেন আর পরবর্তী জীবনে তার অপরাধমূলক কার্যের জন্য দুঃখভোগ করতে না হয়। সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে নারদ মুনি রাজাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যজ্ঞে রাজা যে-সমস্ত পশুদের হত্যা করেছিলেন, তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। নারদ মুনি এখানে কোন পরস্পর-বিরোধী কথা বলেননি। তিনি রাজাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যজ্ঞে অত্যধিক পশুবধ অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে যদি কোন রকম নগণ্য ত্রুটিও হয়, তা হলে নিহত পশু মনুষ্য জীবনে উন্নীত হতে পারে না। তার ফলে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীকে সেই পশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকতে হয়, ঠিক যেমন একজন হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির হত্যার জন্য দায়ী থাকে। কসাইখানায় যখন পশুবধ হয়, তখন ছয়জন মানুষ সেই জন্য দায়ী থাকে। যে ব্যক্তি সেই পশুবধের অনুমতি দেয়, যে ব্যক্তি হত্যা করে, যে ব্যক্তি সাহায্য করে, যে ব্যক্তি সেই পশুর মাংস ক্রয় করে, যে ব্যক্তি সেই পশুমাংস রন্ধন করে এবং যে ব্যক্তি তা আহার করে, সকলেই এই হত্যাকার্যে জড়িত থাকে। নারদ মুনি এই তত্ত্বের প্রতি রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে যজ্ঞেও পশু বধ করার নিন্দা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

অত্র তে কথয়িষ্যেঽহমমুমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
পুরঞ্জনস্য চরিতং নিবোধ গদতো মম ॥ ৯ ॥

অত্র—এখানে; **তে**—আপনাকে; **কথয়িষ্যে**—আমি বলব; **অমুম্**—এই বিষয়ে; **ইতিহাসম্**—ইতিহাস; **পুরাতনম্**—অতি প্রাচীন; **পুরঞ্জনস্য**—পুরঞ্জনের বিষয়ে; **চরিত্রম্**—তার চরিত্র; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা করুন; **গদতঃ মম**—আমি যা বলছি

অনুবাদ

এই সম্পর্কে আমি আপনাকে পুরঞ্জন নামক এক রাজার সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাব। আপনি দয়া করে সমাহিত চিত্তে তা শ্রবণ করার চেষ্টা করুন।

তাৎপর্য

মহর্ষি নারদ অন্য আর একটি বিষয় সম্বন্ধে—রাজা পুরঞ্জনের ইতিহাস বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। সেটি ছিল ভিন্নভাবে বর্ণিত রাজা প্রাচীনবর্হিষতেরই ইতিহাস পক্ষান্তরে বলা যায় যে, সেটি ছিল একটি রূপক পুরঞ্জন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যে-ব্যক্তি তার দেহকে ভোগ করে।' পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই কথা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের কাহিনী শুনতে চায়, তাই নারদ মুনি রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী বলতে শুরু করেছিলেন। এই রাজা পুরঞ্জন হচ্ছেন মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ স্বয়ং। নারদ মুনি সরাসরিভাবে যজ্ঞে যে পশু বলি দেওয়া হয়, তার নিন্দা করতে চাননি বুদ্ধদেব কিন্তু সরাসরিভাবে সমস্ত পশুবলির পন্থা বর্জন করেছিলেন। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী বলেছেন—*নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।* *শ্রুতিজাতম্* বলতে বোঝায় যে, *বেদে* পশুবলি অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু ভগবান বুদ্ধদেব পশুবলি বন্ধ করার জন্য সরাসরিভাবে *বেদকে* অস্বীকার করেছেন। তার ফলে বেদের অনুগামীরা বুদ্ধদেবকে স্বীকার করেন না। যেহেতু তিনি *বেদের* প্রামাণিকতা স্বীকার করেননি, তাই ভগবান বুদ্ধদেবকে নাস্তিকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। দেবর্ষি নারদ কিন্তু *বেদের* প্রামাণিকতা অস্বীকার করতে পারেন না, তাই তিনি মহারাজ প্রাচীন-বর্হিষৎকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কর্মকাণ্ডের পন্থা অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক।

মূর্খ মানুষেরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অত্যন্ত কঠিন এই কর্মকাণ্ডের পথ অবলম্বন করে। যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের বলা হয় মূঢ়। মূঢ় ব্যক্তিদের পক্ষে জীবনের চরম লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারের সময় আমরা দেখি যে, মানুষেরা এই আন্দোলনের প্রতি খুব একটা আকৃষ্ট হয় না, কারণ তারা হচ্ছে সকাম কর্মে লিপ্ত মূঢ়দের দল ... া হয়েছে যে—*উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।* মূর্খ

ব্যক্তিকে যদি সৎ উপদেশ দেওয়া হয়, তা হলে সে সেই উপদেশের সদ্ব্যবহার করার পরিবর্তে, উপদেষ্টার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরোধী হয়। যেহেতু নারদ মুনি তা খুব ভালভাবে জানতেন, তাই তিনি রাজাকে তাঁর সারা জীবনের ইতিহাসের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। সোনা অথবা হীরের নথ বা দুল পরতে হলে, নাক অথবা কান ফুটো করতে হয়। কর্মকাণ্ডের মার্গে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য এইভাবে দুঃখ সহ্য করা হয়। কেউ যদি ভবিষ্যতে সুখভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে বর্তমানে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কেউ যদি ভবিষ্যতে কোটিপতি হয়ে তা উপভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে সেই অর্থ সংগ্রহ করার জন্য বর্তমানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সেটিই হচ্ছে কর্মকাণ্ডীয়। যারা সেই মার্গের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে নারদ মুনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সকাম কর্মে যুক্ত হতে হলে, কিভাবে কঠোর দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হয়। যারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের বলা হয় *বিষয়ী*। *বিষয়ীর* অর্থ হচ্ছে বিষয়ের ভোক্তা, অর্থাৎ তারা কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের কার্যে লিপ্ত। নারদ মুনি পরোক্ষভাবে মহারাজ পুরঞ্জনের কাহিনীর মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের পন্থা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং বিপজ্জনক

ইতিহাসম্ ও *পুরাতনম্* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, জীব যদিও জড় দেহে বাস করে, এই জড় দেহে জীবের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*অনাদি করম-ফলে পড়ি' ভবার্ণব-জলে, তরিবারে না দেখি উপায়।* প্রতিটি জীবই এই জড় জগতে তার পূর্বকৃত কর্মফলে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, তাই সকলেরই একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। মূর্খ জড় বৈজ্ঞানিকেরা তাদের মনগড়া বিবর্তনবাদ সৃষ্টি করেছে, যা কেবল জড় শরীর সম্পর্কেই। কিন্তু তা প্রকৃত ক্রম-বিবর্তন নয়। প্রকৃত বিবর্তন হচ্ছে জীবের ইতিহাস, যাকে এখানে *পুরঞ্জন* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ 'দেহরূপ পুরে যে বাস করে'। শ্রীনারদ মুনি এই বিবর্তনবাদ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপলব্ধির জন্য ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করবেন

শ্লোক ১০

আসীৎপুরঞ্জনো নাম রাজা রাজন্ বৃহচ্ছ্রবাঃ ।
তস্যাবিজ্ঞাতনামাসীৎসখাবিজ্ঞাতচেষ্টিতঃ ॥ ১০ ॥

আসীৎ—ছিল; **পুরঞ্জনঃ**—পুরঞ্জন; **নাম**—নামক; **রাজা**—রাজা; **রাজন্**—হে রাজন্, **বৃহৎ-শ্রবাঃ**—যাঁর কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত মহৎ; **তস্য**—তার; **অবিজ্ঞাত**—অবিজ্ঞাত; **নামা**—নামক; **আসীৎ**—ছিল; **সখা**—বন্ধু; **অবিজ্ঞাত**—অজ্ঞাত; **চেষ্টিতঃ**—যার কার্যকলাপ।

অনুবাদ

হে রাজন্! পুরাকালে পুরঞ্জন নামক এক রাজা ছিলেন, যিনি তাঁর মহান কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর অবিজ্ঞাত ('অজ্ঞাত') নামক এক বন্ধু ছিল। তাঁর কার্যকলাপ কেউ বুঝতে পারত না।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীব হচ্ছে *পুরঞ্জন* । *পুরম্* মানে 'এই শরীরে' এবং *জন* মানে হচ্ছে 'জীব'। অতএব প্রতিটি জীবই হচ্ছে পুরঞ্জন। প্রতিটি জীবই তার দেহের রাজা, কারণ জীবকে তার ইচ্ছা অনুসারে, তার দেহটিকে ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সে সাধারণত ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য তার শরীরটি ব্যবহার করে, কারণ যারা দেহাত্ম-বুদ্ধিতে মগ্ন, তারা মনে করে যে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলির সেবা করা। সেটিই হচ্ছে কর্মকাণ্ডের পন্থা। যার আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই সে জানে না যে, প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী আত্মা। যারা কেবল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় মোহিত হয়ে রয়েছে, তাদের বলা হয় বিষয়ী সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত মানুষেরা, যারা কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগের ব্যাপারেই আগ্রহী, তাদের পুরঞ্জন নামে সম্বোধন করা যেতে পারে। যেহেতু এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষেরা তাদের খেয়াল-খুশিমতো তাদের ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করে, তাই তাদের রাজাও বলা যেতে পারে। দায়িত্বহীন রাজারা তাদের রাজপদকে এবং রাজ্যকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে, তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য রাজকোষের অর্থ অপব্যয় করে।

বৃহচ্ছ্রবাঃ শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রবঃ* মানে হচ্ছে 'খ্যাতি'। জীব প্রাচীন কাল থেকেই বিখ্যাত, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) বলা হয়েছে, *ন জায়তে ম্রিয়তে বা*—"জীবের কখনও জন্ম হয় না এবং মৃত্যুও হয় না।" যেহেতু সে নিত্য, তাই তার কার্যকলাপও নিত্য, যদিও সেগুলির অনুষ্ঠান হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার শরীরে। *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*—"শরীরকে হত্যা করা হলেও, তার মৃত্যু হয় না।" এইভাবে জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে, নানা

প্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করে। প্রতিটি দেহেই জীব বহু রকম কর্ম করে। কখনও সে একজন মহান নায়ক হয়—ঠিক যেমন হিরণ্যকশিপু ও কংস অথবা আধুনিক যুগের নেপোলিয়ন কিংবা হিটলার। এই সমস্ত মানুষদের কার্যকলাপ অবশ্যই অত্যন্ত বিরাট, কিন্তু তাদের দেহটি বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু শেষ হয়ে যায়। তখন কেবল তাদের নামের মধ্যেই তারা থাকে। তাই জীবকে *বৃহচ্ছ্রবাঃ* বলা যেতে পারে। তার বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপের জন্য তার বিপুল খ্যাতি থাকতে পারে। অবশ্য তার এক বন্ধু রয়েছে, যাঁকে সে জানে না। বিষয়াসক্ত মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। পরমাত্মা যদিও জীবাত্মার সখারূপে তার ঠিক পাশেই বসে রয়েছেন, তবু জীবাত্মা তা জানতে পারে না। তাই তাঁকে *অবিজ্ঞাত-সখা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *অবিজ্ঞাত চেষ্টিতঃ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ জীব পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে কঠোর পরিশ্রম করে এবং প্রকৃতির নিয়মে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজেকে ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে এবং জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম থেকে মুক্ত বলে মনে করে। *ভগবদ্গীতায়* (২/২৪) বলা হয়েছে—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চঃ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥

"জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য ও অশোষ্য। সে নিত্য, সর্বব্যাপ্ত, অপরিবর্তনশীল, অচল এবং সনাতন।"

জীব *সনাতন* অর্থাৎ নিত্য। যেহেতু কোন অস্ত্রের দ্বারা তাকে হত্যা করা যায় না, আগুনের দ্বারা ভস্মীভূত করা যায় না, জলের দ্বারা সিক্ত বা দ্রবীভূত করা যায় না, বায়ুর দ্বারা শুকানো যায় না, সে জড় প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত। যদিও সে দেহগুলি পরিবর্তন করছে, তবুও সে জাগতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাকে জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে স্থাপন করা হয়েছে, এবং সে তার সখা পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে কার্য করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" এইভাবে ভগবান পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং জীবের বাসনা অনুসারে জীবকে কর্ম করার নির্দেশ দেন। ভগবান যে তার সমস্ত বাসনা চরিতার্থ

করার সুযোগ দিচ্ছেন, সেই কথা জীব এই জীবনে এবং তার পূর্ববর্তী জীবনেও বুঝতে পারেনি। ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কারোরই কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে না। ভগবান যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রদান করছেন, তা বদ্ধ জীবের অজ্ঞাত।

শ্লোক ১১

সোহন্বেষমাণঃ শরণং বভ্রাম পৃথিবীং প্রভুঃ ।
নানুরূপং যদাবিন্দদভূৎস বিমনা ইব ॥ ১১ ॥

সঃ—সেই রাজা পুরঞ্জন; **অন্বেষমাণঃ**—অন্বেষণ করতে করতে; **শরণম্**—আশ্রয়; **বভ্রাম**—ভ্রমণ করেছিলেন; **পৃথিবীম্**—সারা পৃথিবী; **প্রভুঃ**—স্বতন্ত্র ঈশ্বর হওয়ার জন্য; **ন**—কখনই না; **অনুরূপম্**—তার ইচ্ছানুরূপ; **যদা**—যখন; **অবিন্দৎ**—খুঁজে পেয়েছিলেন; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি; **বিমনাঃ**—বিষণ্ণ; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তাঁর বসবাসের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করতে করতে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তবুও তিনি তাঁর ইচ্ছানুরূপ কোন স্থান খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি নিরাশ ও বিষণ্ণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পুরঞ্জনের এই ভ্রমণ ঠিক আধুনিক যুগের হিপিদের মতো। সাধারণত হিপিরা হচ্ছে খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধনী পিতাদের সন্তান। এমন নয় যে, তারা সব সময় গরিব ছিল। কিন্তু তারা তাদের পিতাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করে সারা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীব *প্রভু* বা ঈশ্বর হতে চায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব কখনই *প্রভু* নয়; সে হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস। জীব যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে প্রভু হতে চায়, তখন সে সারা জগৎ ভ্রমণ করতে থাকে। এই জগতে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনি এবং কোটি কোটি গ্রহলোক রয়েছে। জীব এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার শরীরে ও বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করতে থাকে, এবং তাই তার অবস্থা ঠিক রাজা পুরঞ্জনের মতো, যে তার বসবাসের উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করতে করতে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিল।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড/অমৃত বলিয়া যেবা খায়, নানা যোনি সদা ফিরে*—"যে মানুষ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ বিষকে অমৃত মনে করে পান করে, সে নিরন্তর বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে।" *কদর্য ভক্ষণ করে*—"এবং, তার দেহ অনুসারে, সে নানা প্রকার কদর্য বস্তু আহার করে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যখন একটি শূকরের শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে বিষ্ঠা আহার করে। জীব যখন একটি কাকের শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে সব রকমের আবর্জনা খায়, এমন কি পুঁজ ও কফ খায়, এবং সেগুলিকে সে অত্যন্ত উপাদেয় বলে মনে করে। এইভাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর দেখিয়েছেন যে, জীব বিভিন্ন শরীরে ভ্রমণ করে সব রকম কদর্য বস্তু ভক্ষণ করে। তা সত্ত্বেও সে যখন সুখী হতে পারে না, তখন সে বিষণ্ণ হয়ে হিপির জীবন অবলম্বন করে।

তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *ন অনুরূপম্*, অর্থাৎ রাজা তাঁর উপযুক্ত কোন স্থান খুঁজে পাননি। তার কারণ হচ্ছে এই জড় জগতে কোন গ্রহলোকে এবং কোন প্রকার দেহেই জীব সুখী হতে পারে না, কারণ এই জড় জগতে সব কিছুই আত্মার অনুপযুক্ত। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, জীব স্বতন্ত্রভাবে প্রভু হতে চায়, কিন্তু যখন সে সেই ধারণা পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব বরণ করে, তৎক্ষণাৎ তার আনন্দময় জীবনের শুরু হয়। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে',
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই ।

সেই সম্পর্কে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন! ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং সমস্ত জীবদের তিনি মায়ানির্মিত যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে ভ্রমণ করাচ্ছেন।"

বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার যোনিসম্ভূত দেহরূপ যন্ত্রে বাহিত হয়ে জীবেরা ভ্রমণ করছে। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবদের জিজ্ঞাসা করছেন, কেন তারা এই সমস্ত দেহরূপ যন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, এই মায়ার তরঙ্গ অতিক্রম করার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন।

জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই, তিনি আমাদের উপদেশ দেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। তা হলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই জন্য কোন দুশ্চিন্তা করো না।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬)

এইভাবে আমরা এক দেহ থেকে আর এক দেহে, এবং এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে ভ্রমণরূপ সংসার বন্ধন থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হতে পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)। ভ্রমণ করার সময় কোন জীব যদি যথেষ্ট ভাগ্যবান হন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করে কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারেন, এবং তখন তাঁর প্রকৃত জীবন শুরু হয়। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত ভ্রাম্যমাণ জীবদের শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে সুখী হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

এই শ্লোকে *বিমনা ইব* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই জড় জগতে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সর্বদা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। ব্রহ্মাও যদি উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হন, তা হলে যে-সমস্ত সাধারণ জীব এই গ্রহলোকে কার্য করছে, তাদের আর কি কথা? *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।

"এই জগতে সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত সব কটি স্থানই দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ, যেখানে নিরন্তর জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়।" জড় জগতে জীব কখনই তৃপ্ত নয়। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের পদ প্রাপ্ত হলেও জীব উৎকণ্ঠাতেই পূর্ণ থাকে, কারণ সে ভ্রান্তিবশত এই জড় জগৎকে সুখভোগের একটি স্থান বলে মনে করছে।

শ্লোক ১২

ন সাধু মেনে তাঃ সর্বা ভূতলে যাবতীঃ পুরঃ ।
কামান্ কাময়মানোঽসৌ তস্য তস্যোপপত্তয়ে ॥ ১২ ॥

ন—কখনই না; **সাধু**—ভাল; **মেনে**—মনে করে; **তাঃ**—তাদের, **সর্বাঃ**—সমস্ত; **ভূ-তলে**—এই পৃথিবীতে; **যাবতীঃ**—সর্বপ্রকার; **পুরঃ**—বাসগৃহ; **কামান্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয়; **কাময়মানঃ**—বাসনা করে; **অসৌ**—সেই রাজা; **তস্য**—তাঁর, **তস্য**—তাঁর; **উপপত্তয়ে**—লাভ করার জন্য।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জনের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের অন্তহীন বাসনা ছিল; তার ফলে তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে এমন একটি স্থানের অন্বেষণ করছিলেন, যেখানে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তিনি তেমন কোন স্থান খুঁজে পেলেন না।

তাৎপর্য

মহান বৈষ্ণব কবি শ্রীল বিদ্যাপতি গেয়েছেন—

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,
সুত-মিত-রমণী সমাজে।

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ইন্দ্রিয় সুখভোগকে এখানে মরুভূমিতে একবিন্দু জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মরুভূমির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সমুদ্রের প্রয়োজন, কিন্তু সেখানে যদি এক বিন্দু জল ঢালা হয়, তাতে কি লাভ হয়? তেমনই, জীবেরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, *বেদান্ত-সূত্রে* যাদের *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ* বা পূর্ণ আনন্দময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, জীবও পূর্ণ আনন্দের অন্বেষণ করছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কখনই সেই আনন্দ লাভ করা যায় না। বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে জীব কোন কোন শরীরে একটু-আধটু সুখ উপভোগ করতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ সুখভোগ কোন জড় শরীরেই সম্ভব নয়। তাই পুরঞ্জন বা জীব বিভিন্ন প্রকার শরীরে ভ্রমণ করে কেবল সুখভোগের প্রচেষ্টায় সর্বত্র নিরাশ হয়েছিল। অর্থাৎ, জড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত চিৎ-স্ফুলিঙ্গ কখনই জড়-জাগতিক জীবনের কোন পরিবেশেই পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে পারে না। ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মগ্ন হয়ে, হরিণ কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ উপভোগ করতে পারে, কিন্তু তার পরিণাম হচ্ছে মৃত্যু। তেমনই, মাছ তাদের জিহ্বার তৃপ্তিসাধনে অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু সে যখন ধীবরের টোপ গেলে, তখন তার জীবনের অবসান হয়। এমন কি হাতিও, যে অত্যন্ত বলবান, হস্তিনীর সঙ্গে মৈথুন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার লালসায় তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে, সে বন্দি হয়। প্রত্যেক যোনিতে জীব তার

ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করার জন্য শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তার ইন্দ্রিয়গুলি একসঙ্গে উপভোগ করতে পারে না। মনুষ্য-জীবনে সে তার সব কটি ইন্দ্রিয়কে বিকৃতভাবে উপভোগ করার সুযোগ পায়, কিন্তু তার ফলে তাকে এত বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় যে, চরমে সে বিষণ্ণ হয়। সে যতই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে, ততই সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ১৩

স একদা হিমবতো দক্ষিণেষ্বথ সানুষু ।
দদর্শ নবভির্দ্বার্ভিঃ পুরং লক্ষিতলক্ষণাম্ ॥ ১৩ ॥

সঃ—সেই রাজা পুরঞ্জন; **একদা**—এক সময়; **হিমবতঃ**—হিমালয় পর্বতের; **দক্ষিণেষু**—দক্ষিণে; **অথ**—তার পর; **সানুষু**—শিখরে; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **নবভিঃ**—নয়টি; **দ্বার্ভিঃ**—দ্বারযুক্ত; **পুরম্**—একটি নগর; **লক্ষিত**—গোচরীভূত; **লক্ষণাম্**—সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত।

অনুবাদ

এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে তিনি এক সময় হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ভাগে ভারতবর্ষ নামক স্থানে নয়টি দ্বার এবং সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত একটি নগরী দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে ভারতবর্ষ নামক স্থান। জীব যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে তখন বুঝতে হবে যে, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(*চৈঃ চঃ আদি* ৯/৪১)

অতএব যারা এই ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভ করেন, তাঁরা জীবনের সমস্ত সুবিধা লাভ করেন। তাঁরা জড় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার উন্নতির জন্যই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জীবন সার্থক করতে পারেন। জীবনের উদ্দেশ্যসাধন

করে তাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করে পরোপকার করতে পারেন। অর্থাৎ, যাঁরা তাঁদের পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন, তাঁরা তাঁদের জন্ম সার্থক করার পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছেন। ভারতবর্ষের পরিবেশ এমনই যে, জাগতিক অবস্থার দ্বারা বিচলিত না হয়ে, মানুষ এখানে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, মহারাজ যুধিষ্ঠির অথবা রামচন্দ্রের রাজত্বকালে মানুষেরা সব রকম দুশ্চিন্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল। তখন অত্যধিক ঠাণ্ডা অথবা অত্যধিক গরম কোনটিই ছিল না। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন প্রকার ক্লেশ সেই সময় ছিল না কিন্তু এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ কৃত্রিমভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। কিন্তু এই সমস্ত জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও এই দেশের সংস্কৃতি এমনই যে, মানুষ অনায়াসে জীবনের চরম লক্ষ্য—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন। তাই বুঝতে হবে যে, পূর্বজন্মের বহু পুণ্যের ফলেই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়।

এই শ্লোকে *লক্ষিত-লক্ষণাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত মঙ্গলজনক। বৈদিক সংস্কৃতি জ্ঞানে পূর্ণ, এবং ভারতবর্ষে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা বৈদিক জ্ঞান এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামক সংস্কৃতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। বর্তমান সময়েও, সারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করার সময় আমরা দেখি যে, অনেক দেশে মানুষদের জড়-জাগতিক সব রকম সুবিধা রয়েছে, কিন্তু পারমার্থিক উন্নতির কোন সুযোগ নেই। সর্বত্রই একটি বিশেষ ত্রুটি আমরা দেখতে পাই যে, এক দিকের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কিন্তু পূর্ণ সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট অভাব। অন্ধ চলতে পারে কিন্তু দেখতে পায় না, আর পঙ্গু দেখতে পারে কিন্তু চলতে পারে না অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায় অনুসারে, যখন অন্ধ মানুষ পঙ্গুকে তার কাঁধে তুলে নেয়, তখন সেই পঙ্গুর পরিচালনায় অন্ধ ব্যক্তি চলতে সক্ষম হয়। তেমনই, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা এবং জাগতিক প্রয়োজনীয়তাগুলির যথাযথ ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে জাগতিক সুখভোগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, কিন্তু পারমার্থিক উন্নতি সম্বন্ধে কারও কোন ধারণা নেই। অনেকে পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের আকাঙ্ক্ষী, কিন্তু প্রতারকেরা এসে তাদের প্রতারণা করে তাদের টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার হচ্ছে, যাতে জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার উন্নতি-সাধনের জন্যই সব রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ হতে পারে। এইভাবে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মানুষ এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

ভারতবর্ষের গ্রামের যে কোন মানুষ শহরের কলকারখানার প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে, জীবনের যে কোন অবস্থায় থেকে পারমার্থিক উন্নতিসাধন করতে পারে। দেহকে বলা হয় নবদ্বার সমন্বিত নগরী, এবং সেই নয়টি দ্বার হচ্ছে—দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসারন্ধ্র, একটি মুখ, একটি উপস্থ ও একটি পায়ু। এই নয়টি দ্বার যখন পরিষ্কার থাকে এবং যথাযথভাবে ক্রিয়া করে, তখন দেহ সুস্থ থাকে। ভারতবর্ষের গ্রামের মানুষেরা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে, কুয়া বা নদীর জলে স্নান করে, মন্দিরে মঙ্গল-আরতিতে যোগদান করে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এবং ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করে এই নয়টি দ্বারই পবিত্র রাখেন। এইভাবে মনুষ্য-জীবনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করা যায়। আমরা ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই পদ্ধতি প্রচলিত করছি। যাঁরা সেই সুযোগ গ্রহণ করছেন, তাঁরা পারমার্থিক জীবনে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছেন। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষকে পঙ্গুর সঙ্গে এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলিকে অন্ধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গত দুই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ বিদেশী শাসকদের অধীনে ছিল, এবং তাই তার প্রগতিরূপ পা দুটি ভেঙ্গে গেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে জাগতিক ঐশ্বর্যের চাকচিক্যের ফলে, মানুষের চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে পাশ্চাত্যের দেশগুলির অন্ধ মানুষেরা এবং ভারতবর্ষের পঙ্গু মানুষেরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যৌথভাবে কার্য করতে পারেন। তা হলে ভারতের পঙ্গু মানুষেরা পাশ্চাত্যের সহযোগিতায় প্রকৃত প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবেন, আর পাশ্চাত্যের অন্ধ মানুষেরা ভারতের পঙ্গু মানুষদের সহায়তায় পরমতত্ত্ব দর্শন করতে পারবেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মানব-সমাজের উন্নতি-সাধনের জন্য পাশ্চাত্যের জড়-জাগতিক প্রগতি এবং ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের সমন্বয়-সাধন করা উচিত।

শ্লোক ১৪

প্রাকারোপবনাট্টালপরিখৈরক্ষতোরণৈঃ ।
স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সঙ্কুলাং সর্বতো গৃহৈঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাকার—প্রাচীর; **উপবন**—উদ্যান; **অট্টাল**—অট্টালিকা; **পরিখৈঃ**—পরিখা; **অক্ষ**—গবাক্ষ তোরণৈঃ —বহির্দ্বার দ্বারা; **স্বর্ণ**—স্বর্ণ, **রৌপ্য**—রৌপ্য; **অয়সৈঃ**—লৌহনির্মিত, **শৃঙ্গৈঃ**—শিখরযুক্ত; **সঙ্কুলাম্**—পরিব্যাপ্ত; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **গৃহৈঃ**—গৃহসমূহ।

অনুবাদ

সেই নগরীটি প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ ও বহির্দ্বার দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানকার গৃহসমূহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্মিত শিখরের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

তাৎপর্য

দেহ ত্বকরূপ প্রাচীরের দ্বারা সংরক্ষিত। দেহের রোমগুলি উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং নাক, মস্তক আদি দেহের উচ্চতর অঙ্গগুলিকে অট্টালিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের নিম্নভাগ এবং বলি রেখাগুলিকে পরিখার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, চোখ দুটিকে গবাক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং চোখের পাতা বহির্দ্বারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিন প্রকার ধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহা প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্যোতক। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহা যথাক্রমে—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণকে বোঝায়। দেহটিকে কখনও কখনও কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি ধাতুসমন্বিত একটি বস্তা বলে মনে করা হয়। *যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে। শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/৮৪/১৩) বর্ণনা অনুসারে, যারা কফ, পিত্ত ও বায়ুর এই বস্তাটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, তারা একটি গরু অথবা গাধার থেকে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ১৫

নীলস্ফটিকবৈদূর্যমুক্তামরকতারুণৈঃ ।
কৢপ্তহর্ম্যস্থলীং দীপ্তাং শ্রিয়া ভোগবতীমিব ॥ ১৫ ॥

নীল—নীলা; **স্ফটিক**—স্ফটিক, **বৈদূর্য**—হীরা; **মুক্তা** মুক্তা; **মরকত**—পান্না, **অরুণৈঃ**—প্রবালের দ্বারা; **কৢপ্ত**—সুসজ্জিত; **হর্ম্য-স্থলীম্**—সেই প্রাসাদের মেঝে; **দীপ্তাম্**—উজ্জ্বল; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্যমণ্ডিত; **ভোগবতীম্**—ভোগবতী নামক দিব্য নগরী; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সেই নগরীর প্রাসাদের গৃহতল নীলা, স্ফটিক, হীরা, মুক্তা, পান্না ও প্রবালের দ্বারা নির্মিত ছিল। সেই নগরীর গৃহসমূহ এমনই দীপ্তিযুক্ত ছিল যে, তার সৌন্দর্যের তুলনা দিব্য নগরী ভোগবতীর সঙ্গে করা যেত।

তাৎপর্য

দেহরূপ নগরীর রাজধানী হচ্ছে হৃদয়। রাজ্যের রাজধানী যেমন উচ্চ অট্টালিকা ও দীপ্তিময় প্রাসাদে পূর্ণ থাকে, ঠিক তেমনই হৃদয় জড় সুখভোগের বিভিন্ন বাসনা এবং পরিকল্পনায় পূর্ণ। এই প্রকার পরিকল্পনাগুলিকে নীলা, প্রবাল, মুক্তা, পান্না আদি মূল্যবান রত্নের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। হৃদয় হচ্ছে সব রকম জড় সুখভোগের পরিকল্পনার কেন্দ্র।

শ্লোক ১৬

সভাচত্বররথ্যাভিরাক্রীড়ায়তনাপণৈঃ ।
চৈত্যধ্বজপতাকাভির্যুক্তাং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

সভা—সভাগৃহ; **চত্বর**—চতুষ্পথ; **রথ্যাভিঃ**—রাজপথের দ্বারা; **আক্রীড়-আয়তন**—দ্যূতক্রীড়ার স্থান; **আপণৈঃ**—বিপণির দ্বারা; **চৈত্য**—বিশ্রামস্থল; **ধ্বজ-পতাকাভিঃ**—ধ্বজ ও পতাকার দ্বারা; **যুক্তাম্**—সুসজ্জিত; **বিদ্রুম**—বৃক্ষরহিত; **বেদিভিঃ**—বেদিসমূহের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই নগরী বহু সভাগৃহ, চতুষ্পথ, রাজপথ, ভোজনালয়, দ্যূতক্রীড়ার স্থান, বাজার, বিশ্রামস্থান, ধ্বজ, পতাকা এবং সুন্দর উদ্যান-সমন্বিত ছিল।

তাৎপর্য

এইভাবে রাজধানীর বর্ণনা করা হয়েছে। রাজধানীতে বহু সভাগৃহ, রাজপথ, চত্বর, বীথি ও রাস্তা, দ্যূতক্রীড়ার স্থান, বাজার ও বিশ্রামস্থান থাকে, এবং সেগুলি ধ্বজ ও পতাকার দ্বারা সুসজ্জিত থাকে। চত্বরের চারপাশে রেলিং থাকে এবং সেখানে গাছপালা থাকে না। দেহের হৃদয়কে সভাগৃহের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ জীব পরমাত্মা-সহ হৃদয়ে অবস্থান করে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।* হৃদয় হচ্ছে সমস্ত স্মৃতি, বিস্মৃতি ও জ্ঞানের কেন্দ্র। দেহের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখকে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের আকর্ষণীয় চত্বরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এবং ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না —এই তিনটি নাড়িকে রাজপথের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে যৌগিক পন্থায় সংযত করা হয় সুষুম্না নামক নাড়ির মাধ্যমে, তাই সেটিকে বলা

হয় মুক্তির পথ। দেহটি হচ্ছে বিশ্রামস্থল কারণ জীব যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে দেহের অভ্যন্তরে বিশ্রাম করে। হাতের তালু ও পায়ের পাতাকে ধ্বজ ও পতাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭

পুর্যাস্তু বাহ্যোপবনে দিব্যদ্রুমলতাকুলে ।
নদদ্বিহঙ্গালিকুলকোলাহলজলাশয়ে ॥ ১৭ ॥

পুর্যাঃ—সেই নগরীর; **তু**—তখন; **বাহ্য-উপবনে**—বাইরের উদ্যানে; **দিব্য**—অত্যন্ত সুন্দর; **দ্রুম**—বৃক্ষরাজি, **লতা**—লতা; **আকুলে**—পূর্ণ; **নদৎ**—ধ্বনিত করে, **বিহঙ্গ**—পক্ষীকুল; **অলি**—ভ্রমর; **কুল**—সমূহ; **কোলাহল**—গুঞ্জন; **জল-আশয়ে**—সরোবরে।

অনুবাদ

সেই নগরীর বাইরে এক সুন্দর সরোবরের চারপাশে বেষ্টন করে বহু সুন্দর বৃক্ষ ও লতা ছিল। সেই সরোবরের চারপাশে পক্ষীকুল মধুর স্বরে সর্বক্ষণ কূজন করত এবং ভ্রমরেরা গুঞ্জন করত।

তাৎপর্য

যেহেতু দেহটি একটি মহানগরীর মতো, তাই সেখানে অবশ্যই ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য সরোবর ও উদ্যানের বিবিধ আয়োজন ছিল। দেহের যে সমস্ত অঙ্গগুলি যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এখানে পরোক্ষভাবে সেগুলির কথা বলা হয়েছে। শরীরে উপস্থ আছে বলে, জীব যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই যৌন বেগের দ্বারা উত্তেজিত হয়। শৈশবে সুন্দরী রমণীর দর্শনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না ইন্দ্রিয়গুলি থাকলেও, উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যৌন উত্তেজনা থাকে না। যৌন উত্তেজনার অনুকূল অবস্থাগুলিকে এখানে নির্জন উদ্যান বা সুন্দর বাগানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেউ যখন বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিকে দর্শন করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। বলা হয় যে, পুরুষ যদি নির্জন স্থানে কোন রমণীকে দেখে উত্তেজিত না হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি ব্রহ্মচারী। কিন্তু এই প্রকার আচরণ এখন প্রায় অসম্ভব। যৌন উত্তেজনা এতই প্রবল যে, কেবল দর্শন, স্পর্শন অথবা সম্ভাষণের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ

করার ফলে, এমন কি কেবল তাদের কথা চিন্তা করার ফলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাই ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসীদের স্ত্রীসঙ্গ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে নির্জন স্থানে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নির্জন স্থানে স্ত্রীসম্ভাষণ করা উচিত নয়, এমন কি তিনি যদি কন্যা, ভগ্নী অথবা মাতাও হন। যৌন আবেদন এতই প্রবল যে, কেউ যদি অত্যন্ত বিদ্বানও হন, তবুও তিনি এই প্রকার পরিস্থিতিতে উত্তেজিত হবেন। তা যদি হয়, তা হলে একজন যুবক কি করে নির্জন উদ্যানে সুন্দরী যুবতীকে দর্শন করে শান্ত ও সংযত থাকতে পারে?

শ্লোক ১৮

হিমনির্ঝরবিপ্রুষ্মৎকুসুমাকরবায়ুনা ।
চলৎপ্রবালবিটপনলিনীতটসম্পদি ॥ ১৮ ॥

হিম-নির্ঝর—তুষার আচ্ছাদিত পর্বতের জলপ্রপাত থেকে; **বিপ্রুট্-মৎ**—জলকণা বহন করে; **কুসুম-আকর**—বসন্ত; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **চলৎ**—আন্দোলিত হয়ে; **প্রবাল**—শাখা; **বিটপ**—বৃক্ষ; **নলিনী-তট**—পদ্মপূর্ণ সরোবরের তটে; **সম্পদি**—সমৃদ্ধ সমন্বিত।

অনুবাদ

সরোবরের তটস্থিত বৃক্ষের শাখাগুলি বসন্ত বায়ুর দ্বারা বাহিত তুষারাচ্ছাদিত পর্বতের ঝর্নার জল প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *হিম-নির্ঝর* শব্দটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ঝর্না রসের (সম্পর্কের) দ্যোতক। শরীরে বিভিন্ন প্রকার রস রয়েছে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রস হচ্ছে শৃঙ্গার রস বা *আদি-রস।* যখন এই *আদি-রস* বা যৌন বাসনা কামদেব দ্বারা প্রেরিত বসন্ত বায়ুর সংস্পর্শে আসে, তখন তা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, এই সবই হচ্ছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের দ্যোতক। বায়ু হচ্ছে স্পর্শ। ঝর্না হচ্ছে রস বসন্ত বায়ু *(কুসুমাকর)* হচ্ছে গন্ধ। এই সমস্ত বিবিধ ভোগ জীবনকে অত্যন্ত আনন্দদায়ক করে তোলে, এবং তার ফলে আমরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি।

শ্লোক ১৯

**নানারণ্যমৃগব্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ ।
আহূতং মন্যতে পান্থো যত্র কোকিলকূজিতৈঃ ॥ ১৯ ॥**

নানা—বিভিন্ন; **অরণ্য**—বন; **মৃগ**—পশু; **ব্রাতৈঃ**—সমূহের দ্বারা; **অনাবাধে**—অহিংসার ব্যাপারে; **মুনি-ব্রতৈঃ**—ঋষিদের মতো; **আহূতম্**—যেন নিমন্ত্রিত হয়ে, **মন্যতে**—মনে করে; **পান্থঃ**—পথিক; **যত্র**—যেখানে; **কোকিল**—কোকিলের; **কূজিতৈঃ**—কুহুরবের দ্বারা।

অনুবাদ

এই প্রকার পরিবেশে বনের পশুরাও মুনিদের মতো হিংসাবিহীন এবং ঈর্ষাবিহীন হয়েছিল। তার ফলে পশুরা অন্য কাউকে আক্রমণ করত না। তদুপরি সমস্ত স্থান কোকিলের কুহুরবে মুখরিত ছিল। তার ফলে পথিকেরা মনে করতেন সেই পরিবেশ যেন তাঁদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে, এবং তাই তাঁরা সেই সুন্দর উদ্যানে বিশ্রাম করতেন।

তাৎপর্য

স্ত্রীপুত্র-সমন্বিত শান্তিপূর্ণ পরিবারকে সেই অরণ্যের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সন্তানেরা হিংসাবিহীন পশুর মতো। কিন্তু কখনও কখনও স্ত্রী এবং পুত্রদের *স্বজনাখ্য-দস্যু* বা আত্মীয়স্বজন নামক দস্যু বলা হয়। কঠোর পরিশ্রম করে মানুষ ধন সংগ্রহ করে, কিন্তু স্ত্রী-পুত্রেরা সেই ধনসম্পদ বনের দস্যু-তস্করদের মতো লুণ্ঠন করে নেয়। তা সত্ত্বেও পরিবারে স্ত্রী-পুত্রজনিত এই প্রচণ্ড অশান্তিকে উদ্যানে কোকিলের কুহুরবের মতো মনে হয়। এই প্রকার পরিবেশের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে, মানুষ আনন্দময় পারিবারিক জীবন উপভোগ করার জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে।

শ্লোক ২০

**যদৃচ্ছয়াগতাং তত্র দদর্শ প্রমদোত্তমাম্ ।
ভৃত্যৈর্দশভিরায়ান্তীমেকৈকশতনায়কৈঃ ॥ ২০ ॥**

যদৃচ্ছয়া—সহসা, বিনা প্রয়োজনে; **আগতাম্**—উপস্থিত হয়েছিল; **তত্র**—সেখানে; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **প্রমদা**—একজন রমণী; **উত্তমাম্**—অত্যন্ত সুন্দরী;

ভৃত্যৈঃ—সেবকদের দ্বারা পরিবৃত; দশভিঃ—দশজন; আয়ান্তীম্—এগিয়ে এসে; এক-এক—তাদের প্রত্যেকে; শত—এক শত, নায়কৈঃ নেতা।

অনুবাদ

সেই অতি সুন্দর উদ্যানে বিচরণ করতে করতে রাজা পুরঞ্জন সহসা এক অত্যন্ত সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেলেন, যিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দশটি ভৃত্য ছিল, এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শত-শত পত্নী ছিল।

তাৎপর্য

দেহকে ইতিমধ্যেই একটি সুন্দর উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যৌবনে কামভাব জাগরিত হয়, এবং বুদ্ধি মানুষের কল্পনা অনুসারে, বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গ করার জন্য উন্মুখ হয় যৌবনে পুরুষ অথবা স্ত্রী উভয়েই তাদের বুদ্ধি অথবা কল্পনা অনুসারে বিপরীত লিঙ্গের অন্বেষণ করে। বুদ্ধি মনকে প্রভাবিত করে, এবং মন দশটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে পাঁচটি ইন্দ্রিয় জ্ঞান আহরণ করে, এবং অন্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় সরাসরিভাবে কর্ম করে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের বহু বাসনা থাকে। সেটিই হচ্ছে দেহ এবং দেহে অবস্থান করে যে দেহী বা পুরঞ্জন তার স্থিতি।

শ্লোক ২১

পঞ্চশীর্ষাহিনা গুপ্তাং প্রতীহারেণ সর্বতঃ।
অন্বেষমাণামৃষভমপ্রৌঢ়াং কামরূপিণীম্ ॥ ২১ ॥

পঞ্চ—পাঁচ, শীর্ষ—মস্তক; অহিনা—সর্পের দ্বারা; গুপ্তাম্—রক্ষিত; প্রতীহারেণ—দেহরক্ষীর দ্বারা, সর্বতঃ সর্বত্র; অন্বেষমাণাম্—অন্বেষণকারী; ঋষভম্—পতি; অপ্রৌঢ়াম্—অল্পবয়স্কা; কাম-রূপিণীম্—কামবাসনা চরিতার্থ করতে অত্যন্ত আকর্ষণীয়া।

অনুবাদ

সেই রমণী পাঁচটি মস্তক বিশিষ্ট একটি সর্পের দ্বারা চারদিক থেকে সুরক্ষিত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী ও যুবতী, এবং তাঁকে উপযুক্ত পতির অন্বেষণে অত্যন্ত উৎসুক বলে প্রতীত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

জীবের শরীরে প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান নামক পাঁচটি বায়ু ক্রিয়া করে। এই পঞ্চ প্রাণবায়ুকে একটি সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ সর্প কেবল বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করতে পারে। সর্পের দ্বারা বাহিত প্রাণশক্তিকে *প্রতিহার* বা দেহরক্ষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাণশক্তি ব্যতীত কেউ এক পলকের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণশক্তির অধীনে কার্য করে।

সেই রমণী, যিনি হচ্ছেন বুদ্ধির প্রতীক, তিনি একজন উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছিলেন। তা ইঙ্গিত করে যে, চেতনা ব্যতীত বুদ্ধি ক্রিয়া করতে পারে না। সুন্দরী রমণী তখনই সার্থক হন, যখন তিনি উপযুক্ত পতির দ্বারা সুরক্ষিত হন। বুদ্ধি সর্বদা নবীন থাকা উচিত, তাই এখানে *অপ্রৌঢ়াম্* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। জড় সুখভোগ মানে হচ্ছে বুদ্ধির দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ উপভোগ করা।

শ্লোক ২২

সুনাসাং সুদতীং বালাং সুকপোলাং বরাননাম্ ।
সমবিন্যস্তকর্ণাভ্যাং বিভ্রতীং কুণ্ডলশ্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥

সু-নাসাম্—অত্যন্ত সুন্দর নাক; **সু-দতীম্**—অত্যন্ত সুন্দর দাঁত; **বালাম্**—যুবতী রমণী; **সু-কপোলাম্**—সুন্দর কপোল; **বর-আননাম্**—সুন্দর মুখ; **সম**—সমান; **বিন্যস্ত**—রচিত; **কর্ণাভ্যাম্**—কর্ণযুগল; **বিভ্রতীম্**—উজ্জ্বল; **কুণ্ডল-শ্রিয়ম্**—সুন্দর কর্ণকুণ্ডল।

অনুবাদ

সেই রমণীর নাক, দাঁত ও কপোল অত্যন্ত সুন্দর। তার কর্ণযুগল তেমনই সুন্দরভাবে বিন্যস্ত এবং উজ্জ্বল কুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত।

তাৎপর্য

বুদ্ধির শরীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়সমূহকে উপভোগ করে, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাকে আচ্ছাদিত করে, যেমন গন্ধ, রূপ, শব্দ ইত্যাদি। *সুনাসাম্* শব্দটি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ইঙ্গিত করে। তেমনই, মুখ হচ্ছে রস গ্রহণের ইন্দ্রিয়, কারণ চর্বণ করে ও জিহ্বার দ্বারা স্পর্শ করে বস্তুর স্বাদ উপলব্ধি করা যায়। *সুকপোলাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে

স্বচ্ছ মস্তিষ্ককে যা বস্তুকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বুদ্ধির দ্বারা বস্তুসমূহকে যথাযথভাবে ঠিক করা যায়। দুই কানের কুণ্ডল বুদ্ধিরই দ্বারা পরানো হয়েছে। এইভাবে এখানে জ্ঞানলাভ করার উপায়গুলিকে আলঙ্কারিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৩

পিশঙ্গনীবীং সুশ্রোণীং শ্যামাং কনকমেখলাম্ ।
পদ্ভ্যাং ক্বণদ্ভ্যাং চলন্তীং নূপুরৈর্দেবতামিব ॥ ২৩ ॥

পিশঙ্গ—পীতবর্ণ, **নীবীম্**—বস্ত্র; **সু-শ্রোণীম্**—সুন্দর নিতম্ব, **শ্যামাম্**—শ্যামবর্ণ, **কনক**—স্বর্ণনির্মিত, **মেখলাম্**—কোমরবন্ধ, **পদ্ভ্যাম্**—পায়ের দ্বারা; **ক্বণদ্ভ্যাম্**—কিঙ্কিণী ধ্বনি; **চলন্তীম্**—বিচরণ করছিলেন; **নূপুরৈঃ**—নূপুরের দ্বারা, **দেবতাম্**—স্বর্গের দেবতা; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সেই রমণীর কটি ও শ্রোণীদেশ অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর পরণে পীতবর্ণ শাড়ি এবং তাঁর কটিদেশ স্বর্ণমেখলা বেষ্টিত ছিল তিনি যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর নূপুর থেকে কিঙ্কিণীধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। তাঁকে দেখে সাক্ষাৎ দেবাঙ্গনার মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উন্নত নিতম্ব ও কুচযুগল সমন্বিতা সুন্দর বসনা এবং অলঙ্কারে বিভূষিতা রমণীকে দর্শন করে, মনে যে আনন্দের অনুভূতি হয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪

স্তনৌ ব্যঞ্জিতকৈশোরৌ সমবৃত্তৌ নিরন্তরৌ ।
বস্ত্রান্তেন নিগূহন্তীং ব্রীড়য়া গজগামিনীম্ ॥ ২৪ ॥

স্তনৌ—স্তনযুগল; **ব্যঞ্জিত**—ইঙ্গিত করে; **কৈশোরৌ**—নবযৌবন; **সমবৃত্তৌ**—সমবর্তুল, **নিরন্তরৌ**—ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত, পাশাপাশি; **বস্ত্র-অন্তেন**—শাড়ির আঁচলের দ্বারা, **নিগূহন্তীম্** আচ্ছাদন করার চেষ্টা করে, **ব্রীড়য়া** লজ্জাবশত, **গজ-গামিনীম্**—হস্তিনীর মতো সুন্দর গতিতে যিনি গমন করেন।

অনুবাদ

তিনি তাঁর বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা তাঁর সমবর্তুল এবং ব্যবধান-রহিত স্তনযুগলকে আচ্ছাদন করার চেষ্টা করছিলেন। সেই গজগামিনী লজ্জাবশত বার বার তাঁর স্তনযুগলকে আচ্ছাদন করার চেষ্টা করছিলেন।

তাৎপর্য

স্তনযুগল রাগ ও দ্বেষের প্রতীক। রাগ ও দ্বেষের লক্ষণ *ভগবদ্গীতায়* (৩/৩৪) বর্ণিত হয়েছে—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥

"জীব ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ অনুভব করে, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্বারা বশীভূত হওয়া মানুষের উচিত নয়, কারণ সেগুলি আত্ম-উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ।"

রাগ ও দ্বেষের এই প্রতিনিধিদ্বয় পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে অত্যন্ত প্রতিকূল। মানুষের পক্ষে যুবতী রমণীর স্তনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বর্ণনা করেছেন যে, রমণীর স্তন, বিশেষ করে যুবতী রমণীর স্তন রক্ত ও মাংসের সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়, অতএব উন্নত স্তনের মোহময়ী আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। সেগুলি হচ্ছে পুরুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য মায়ার দূত। স্তন যেহেতু সমানভাবে আকর্ষণ করে, তাই তাদের *সমবৃত্তৌ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি মৃত্যুর ক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধ মানুষের হৃদয়েও যৌন বাসনা থাকে। এই উত্তেজনা থেকে মুক্ত হতে হলে, যামুনাচার্যের মতো আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, যিনি বলেছেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনং চ ॥

"যখন থেকে আমি নিত্য নতুন আনন্দের উপলব্ধি-সমন্বিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছি, তখন থেকে যখনই আমার মনে নারীসঙ্গ সুখের কথা স্মরণ হয়, তখন ঘৃণায় আমার মুখ বিকৃত হয়, এবং সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে

আমি থুথু ফেলি।" কেউ যখন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন, তখন আর তিনি রক্ত-মাংসের দুটি পিণ্ডস্বরূপ যুবতী রমণীর স্তনের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ অনুভব করেন না। *নিরন্তরৌ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যদিও স্তন দুটি ভিন্ন স্থানে অবস্থিত কিন্তু তাদের ক্রিয়া একই। আমাদের রাগ ও দ্বেষের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করা উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/৩৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা উভয়েই রজোগুণ থেকে উদ্ভূত (*কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ*)।

নিগূহন্তীম্ ('ঢাকবার চেষ্টা করে') শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, কেউ যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা হলে সেগুলি কৃষ্ণভক্তির দ্বারা রূপান্তরিত করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কামের উপযোগ করা যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য। কামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ কর্মী দিনরাত পরিশ্রম করে; তেমনই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য দিনরাত কাজ করতে পারেন। ঠিক যেমন কর্মীরা তাদের কাম ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, ভক্তেরও সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কর্ম করা উচিত। তেমনই, ভক্তদ্বেষী অসুরদের উপর প্রয়োগ করে, ক্রোধের উপযোগ করা যায়। হনুমানজী তাঁর ক্রোধ এইভাবে উপযোগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একজন মহান ভক্ত, এবং অভক্ত রাক্ষস রাবণের রাজধানীতে আগুন লাগিয়ে, তিনি তাঁর ক্রোধের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে কাম শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য ব্যবহার করা যায়, এবং ক্রোধ অসুরদের দণ্ডদান করার মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়। এই দুটি যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার করা হয়, তখন তারা তাদের জড়-জাগতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আধ্যাত্মিক গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২৫

তামাহ ললিতং বীরঃ সব্রীড়স্মিতশোভনাম্ ।
স্নিগ্ধেনাপাঙ্গপুঙ্খেন স্পৃষ্টঃ প্রেমোদ্ভ্রমদ্ভ্রুবা ॥ ২৫ ॥

তাম্—তাকে; **আহ**—সম্বোধন করে বলেছিলেন; **ললিতম্**—অত্যন্ত স্নিগ্ধ স্বরে; **বীরঃ**—বীর; **সব্রীড়**—লজ্জাযুক্ত; **স্মিত**—স্মিত হেসে; **শোভনাম্**—অত্যন্ত সুন্দরী; **স্নিগ্ধেন**—কাম-বাসনার দ্বারা; **অপাঙ্গ-পুঙ্খেন**—কটাক্ষরূপ বাণের দ্বারা; **স্পৃষ্টঃ**—বিদ্ধ হয়ে; **প্রেম-উদ্ভ্রমৎ**—প্রেম উৎপাদনকারী; **ভ্রুবা**—ভ্রূযুগলের দ্বারা

অনুবাদ

বীর পুরঞ্জন সেই অত্যন্ত সুন্দর রমণীর ভ্রূযুগল ও হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং তিনি তখনই তাঁর কাম-বাসনারূপী বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিলেন। যখন সেই রমণী লজ্জাভরে হেসেছিলেন, তখন পুরঞ্জনের কাছে তাঁকে সুন্দর মনে হয়েছিল, যিনি বীর হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে সম্বোধন না করে পারলেন না।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই দুইভাবে বীর। সে যখন মায়ার শিকার হয়, তখন সে মহান নেতা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ইত্যাদিরূপে এই জড় জগতের একজন মহান বীর রূপে কার্য করে। এবং তার বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ জড় সভ্যতার উন্নতি-সাধনে সহায়তা করে। ইন্দ্রিয়ের প্রভু হয়ে গোস্বামীরূপেও একজন বীর হওয়া যায়। জড় জাগতিক কার্যকলাপ হচ্ছে ভ্রান্ত বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ, কিন্তু জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় সুখভোগ থেকে বিরত করাই হচ্ছে প্রকৃত বীরত্ব। কেউ এই জড় জগতে যত বড় বীরই হোন না কেন, তিনি রমণীর স্তন নামক রক্ত-মাংসের পিণ্ডের দ্বারা অচিরেই পরাস্ত হয়ে যান। জড় জগতের ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন রোমদেশীয় বীর অ্যান্টোনি ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। তেমনই বাজি রাও নামক মহারাষ্ট্রের একজন মহাবীর এক সুন্দরী রমণীর শিকার হয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পূর্বে রাজনীতিবিদেরা বিষকন্যা নামক সুন্দরী রমণীদের তাদের কার্যসাধনের জন্য ব্যবহার করতেন। এই সমস্ত সুন্দরীদের শরীরে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই বিষ প্রবিষ্ট করা হত, যার ফলে তারা এত বিষাক্ত হয়ে যেত যে, কোন পুরুষকে কেবল চুম্বন করার দ্বারা তারা তাকে হত্যা করতে পারত। এই বিষ-কন্যাদের ব্যবহার করা হত চুম্বন করার মাধ্যমে শত্রুদের হত্যা করতে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে বড় বড় বীরেরা রমণীদের দ্বারা পরাভূত হয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, জীব স্বভাবতই একজন মহাবীর, কিন্তু সে তার নিজের দুর্বলতার জন্য জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, জীব যখন কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চায়, তৎক্ষণাৎ সে মায়ার শিকার হয়। জীবকে জোর করে এই

জড় জগতে পাঠানো হয় না। সে সুন্দরী রমণীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে, স্বেচ্ছায় এখানে অধঃপতিত হয়। সে জড়া প্রকৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হবে, না একজন বীরের মতো সেই আকর্ষণকে প্রতিহত করবে, সেই স্বাধীনতা প্রতিটি জীবের রয়েছে মূল প্রশ্ন হচ্ছে জীব মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে, কি হবে না। এই জড় জগতের বন্ধনে জোর করে আবদ্ধ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যে-ব্যক্তি প্রকৃতির আকর্ষণ প্রতিরোধ করে স্থির থাকতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত বীর এবং তিনিই গোস্বামী পদবাচ্য। ইন্দ্রিয়ের প্রভু না হলে, কেউ গোস্বামী হতে পারে না। জীব এই জগতে এই দুটি স্থিতির যে-কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। হয় সে ইন্দ্রিয়ের দাস হতে পারে, অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রভু হতে পারে ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে, এই জড় জগতের একজন মস্ত বড় বীর হওয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভু হয়ে, গোস্বামীরূপে একজন আধ্যাত্মিক বীর হওয়া যায়।

শ্লোক ২৬

কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কস্যাসীহ কুতঃ সতি ।
ইমামুপ পুরীং ভীরু কিং চিকীর্ষসি শংস মে ॥ ২৬ ॥

কা—কে; **ত্বম্**—তুমি; **কঞ্জ-পলাশ**—কমল-দলের মতো; **অক্ষি**—চক্ষু; **কস্য**—কার, **অসি**—তুমি হও, **ইহ**—এখানে, **কুতঃ**—কোথা থেকে, **সতি**—হে সাধ্বী, **ইমাম্**—এই; **উপ**—নিকটে; **পুরীম্**—নগরী, **ভীরু**—হে ভয়ভীতা; **কিম্**—কি; **চিকীর্ষসি**—তুমি করতে চাইছ; **শংস**—দয়া করে বল, **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

হে পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে, কার কন্যা এবং কোথা থেকে তুমি এখানে এসেছ, তা দয়া করে আমাকে বল। তোমাকে দেখে মনে হয় যে, তুমি অতি সাধ্বী। কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ? তুমি এখানে কি করার চেষ্টা করছ? দয়া করে তুমি আমাকে তা বল।

তাৎপর্য

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম সূত্র হচ্ছে *অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা* মনুষ্যদেহ পাওয়ার পর, নিজেকে ও নিজের বুদ্ধিকে অনেক প্রশ্ন করা উচিত। মনুষ্যেতর জীবনে বুদ্ধি আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। কুকুর, বিড়াল, বাঘ ইত্যাদি

পশুরা সর্বদাই আহারের জন্য কোন খাদ্য অথবা নিদ্রা যাওয়ার জন্য কোন স্থান পাওয়ার আশায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে আত্মরক্ষা ও মৈথুনের চেষ্টাতেই সব সময় ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা লাভ করা যায়, যার ফলে প্রশ্ন করা যায় সে কে, কেন সে এই পৃথিবীতে এসেছে, তার কর্তব্য কি, পরম ঈশ্বর কে, জড় পদার্থ ও চেতন জীবের মধ্যে পার্থক্য কি, ইত্যাদি। কত রকমের প্রশ্ন রয়েছে, এবং যে মানুষ যথার্থই বুদ্ধিমান, তাঁর কর্তব্য সব কিছুর আদি উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা—*অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।* প্রতিটি জীবেরই কিছু না কিছু বুদ্ধি রয়েছে, কিন্তু মনুষ্য-জীবনে জীবের কর্তব্য হচ্ছে, তার চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মনুষ্যোচিত বুদ্ধি। বলা হয় যে, কেবল তার দেহচেতনাতেই মগ্ন থাকে যে-ব্যক্তি, সে মনুষ্য-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও পশুতুল্য। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" পশুশরীরে জীব ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত থাকে। তাকে বলা হয় *অপোহনম্* বা বিস্মৃতি। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে চেতনা অত্যন্ত বিকশিত, এবং তার ফলে মানুষ ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পায়। মনুষ্য জীবনে জীবের কর্তব্য হচ্ছে পুরঞ্জনের মতো প্রশ্ন করা—সে কে, সে কোথা থেকে এসেছে, তার কর্তব্য কি, তার উপস্থিতির কারণ কি, ইত্যাদি প্রশ্নগুলি করার মাধ্যমে তার বুদ্ধির যথার্থ সদ্ব্যবহার করা। এগুলি হচ্ছে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে শুরু করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে একটি পশু ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্লোক ২৭

ক এতেঽনুপথা যে ত একাদশ মহাভটাঃ।
এতা বা ললনাঃ সুভ্রু কোঽয়ং তেঽহিঃ পুরঃসরঃ ॥ ২৭ ॥

কে—কে; ***এতে***—এই সমস্ত; ***অনুপথাঃ***—অনুগামীগণ; ***যে***—যারা; ***তে***—তোমার; ***একাদশ***—একাদশ; ***মহা-ভটাঃ***—অত্যন্ত শক্তিশালী দেহরক্ষী; ***এতাঃ***—এই সব; ***বা***—ও; ***ললনাঃ***—রমণী; ***সু-ভ্রু***—হে সুন্দরনয়না; ***কঃ***—কে; ***অয়ম্***—এই; ***তে***—তোমার; ***অহিঃ***—সর্প; ***পুরঃ***—সম্মুখে; ***সরঃ***—গমন করছে।

অনুবাদ

হে কমল-নয়না! তোমার সঙ্গে এই যে এগারজন শক্তিশালী দেহরক্ষী রয়েছে, এরা কে? আর ঐ দশজন বিশিষ্ট সেবকেরা কে? যে-সমস্ত রমণীরা সেই দশজন সেবকের অনুগমন করছে, তারা কে? আর তোমার সম্মুখে গমন করছে যে সাপটি, সেটিই বা কে?

তাৎপর্য

মনের দশটি বলবান সেবক হচ্ছে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দশটি ইন্দ্রিয় মনের নির্দেশ অনুসারে ক্রিয়া করে। মন ও দশেন্দ্রিয় একত্রে মিলিত হয়ে হচ্ছে এগারজন বলবান দেহরক্ষী। ইন্দ্রিয়ের শত শত বৃত্তিকে এখানে *ললনাঃ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মন বুদ্ধির অধীনে ক্রিয়া করে, এবং মনের অধীনে রয়েছে দশটি ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয়ের অধীনে রয়েছে অসংখ্য বাসনা। কিন্তু এরা সকলেই প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে, যাকে এখানে একটি সর্পরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকে, মন সক্রিয় হয়, মনের অধীনে ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলি থেকে বহু কামনা-বাসনার উদয় হয়। প্রকৃতপক্ষে জীব, যাকে এখানে পুরঞ্জনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সে এই সমস্ত বিষয়ের ভারে বিহ্বল হয়। এই সমস্ত বিষয়গুলি কেবল উদ্বেগেরই উৎস। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত, এবং যিনি সব কিছু তাঁকে নিবেদন করেছেন, তিনি এই প্রকার উদ্বেগ থেকে মুক্ত। তাই ভগবানের শরণাগত হয়ে এই সমস্ত অনিত্য বিষয়ের চিন্তা তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বিষয়াসক্ত মানুষদের উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ২৮

ত্বং হ্রীর্ভবান্যস্যথ বাগ্রমা পতিং
বিচিন্বতী কিং মুনিবদ্রহো বনে ।
ত্বদঙ্ঘ্রিকামাপ্তসমস্তকামং
ক্ব পদ্মকোশঃ পতিতঃ করাগ্রাৎ ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—তুমি; **হ্রীঃ**—লজ্জা, **ভবানী**—শিবের পত্নী; **অসি**—হও; **অথ**—অথবা; **বাক্**—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীদেবী, **রমা**—লক্ষ্মীদেবী, **পতিম্**—পতি, **বিচিন্বতী**—খুঁজছ,

চিন্তা করছ; কিম্—তুমি কি; মুনি-বৎ—মুনির মতো; রহঃ—এই নির্জন স্থানে, বনে—বনে, ত্বৎ-অঙ্ঘ্রি—তোমার চরণ, কাম—বাসনা করে; আপ্ত—লাভ করেছে; সমস্ত—সমস্ত; কামম্—বাঞ্ছিত বস্তু, ক্ব—কোথায়; পদ্ম-কোশঃ—পদ্মফুল, পতিতঃ—পড়ে গেছে; কর—হাতের, অগ্রাৎ—অগ্রভাগ বা তালু থেকে

অনুবাদ

হে সুন্দরী! তুমি কি লক্ষ্মীদেবী, না শিবের পত্নী ভবানী, না ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী? যদিও তুমি অবশ্যই তাঁদের একজন, তবুও আমি দেখছি যে, তুমি এই নির্জন অরণ্যে বিচরণ করছ। মুনির মতো সংযত হয়ে, তুমি কি তোমার পতির অন্বেষণ করছ? তোমার পতি যেই হোন না কেন, তুমি যে তাঁর প্রতি এত অনুগত, তার ফলে তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হবেন। আমি মনে করি যে, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীদেবী, কিন্তু তোমার হাতে তো পদ্মফুল নেই। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেই পদ্মফুলটি কোথায় পড়ে গেল?

তাৎপর্য

সকলেই নিজেকে সবচাইতে বুদ্ধিমান বলে মনে করে। মানুষ কখনও সুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভের জন্য শিবপত্নী উমার পূজায় তার বুদ্ধি নিয়োজিত করে, কখনও বা সে ব্রহ্মার মতো জ্ঞানবান হওয়ার আশায় সরস্বতীদেবীর পূজায় তার বুদ্ধিকে নিয়োজিত করে, কখনও বা বিষ্ণুর মতো ঐশ্বর্যশালী হওয়ার বাসনায় লক্ষ্মীদেবীর পূজা করে। এই শ্লোকে রাজা পুরঞ্জন বা মোহাচ্ছন্ন জীব সেই সমস্ত প্রশ্ন করেছে, এবং সে বুঝতে পারছে না যে, কিভাবে সে তার বুদ্ধিকে নিয়োজিত করবে। পরমেশ্বর ভগবানের সেবাতেই কেবল বুদ্ধিকে নিয়োগ করা উচিত। এইভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করার ফলে, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীদেবী তার প্রতি অনুকূল হন। লক্ষ্মীদেবী কখনও তাঁর পতি ভগবান শ্রীবিষ্ণু থেকে আলাদা থাকেন না। তার ফলে কেউ যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, তখন তিনি আপনা থেকেই লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করেন। কারও রাবণের মতো একা লক্ষ্মীদেবীর পূজা করা কখনই উচিত নয়, কারণ তিনি তাঁর পতিবিহীন হয়ে বেশিদিন থাকতে পারেন না। তাই তাঁর আর একটি নাম হচ্ছে চঞ্চলা। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে প্রতীত হয় যে, সেই রমণীর সঙ্গে পুরঞ্জনের বাক্যালাপ আমাদের বুদ্ধির প্রতীক। তিনি কেবল সেই রমণীর লজ্জার প্রশংসাই করেননি, তাঁর সেই লজ্জার জন্য তিনি তাঁর

প্রতি অধিক থেকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর পতি হওয়ার বাসনা পোষণ করছিলেন এবং তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ পতির কথা চিন্তা করছেন কি না অথবা তিনি বিবাহিতা কি না। এটিই হচ্ছে ভোগ-ইচ্ছার একটি দৃষ্টান্ত। যে-ব্যক্তি এই প্রকার বাসনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং যিনি আকৃষ্ট হন না, তিনি মুক্তিলাভ করেন। রাজা পুরঞ্জন সেই রমণীর রূপের প্রশংসা করছিলেন, যেন তিনি ছিলেন লক্ষ্মীদেবী, অথচ সেই সঙ্গে তিনি এও জানতেন যে ভগবান শ্রীবিষ্ণু ছাড়া আর কেউই লক্ষ্মীদেবীকে ভোগ করতে পারেন না। যেহেতু তাঁর সন্দেহ হয়েছিল তিনি লক্ষ্মীদেবী কি না, তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর হাতে পদ্মফুল নেই কেন। জড় জগৎও লক্ষ্মীদেবী কারণ জড় প্রকৃতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশনায় পরিচালিত হয়, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)

জড় জগৎ কোন জীবের ভোগ্য নয়। কেউ যদি তা ভোগ করতে চায়, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ রাবণ, হিরণ্যকশিপু অথবা কংসের মতো অসুরে পরিণত হয়। রাবণ যেহেতু লক্ষ্মী সীতাদেবীকে ভোগ করতে চেয়েছিল, তাই সে সবংশে তার ধনসম্পদ সহ বিনষ্ট হয়েছিল। কিন্তু জীব বিষ্ণু প্রদত্ত মায়াকে ভোগ করতে পারে। নিজের ইন্দ্রিয় ও বাসনার তৃপ্তিসাধন মানে হচ্ছে মায়াশক্তি উপভোগ, লক্ষ্মী-দেবীকে নয়।

শ্লোক ২৯

নাসাং বরোর্বন্যতমা ভুবিস্পৃক্
পুরীমিমাং বীরবরেণ সাকম্ ।
অর্হস্যলঙ্কর্তুমদভ্রকর্মণা
লোকং পরং শ্রীরিব যজ্ঞপুংসা ॥ ২৯ ॥

ন—না; **আসাম্**—এই সবের; **বরোরু**—হে পরম সৌভাগ্যশালিনী; **অন্যতমা**—কেউ; **ভুবি-স্পৃক্**—ভূমি স্পর্শ করে; **পুরীম্**—নগরী; **ইমাম্**—এই; **বীর-বরেণ**—মহাবীর; **সাকম্**—সহ; **অর্হসি**—তুমি যোগ্য; **অলঙ্কর্তুম্**—অলঙ্কৃত করার জন্য; **অদভ্র**—মহিমান্বিত; **কর্মণা**—যার কার্যকলাপ; **লোকম্**—জগৎ; **পরম্**—দিব্য; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ইব**—সদৃশ; **যজ্ঞ-পুংসা**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তার সঙ্গে।

অনুবাদ

হে পরম সৌভাগ্যবতী! আমার মনে হচ্ছে যে, যাদের কথা আমি উল্লেখ করলাম তুমি তাঁদের কেউ নও, কারণ আমি দেখছি যে, তোমার পদযুগল ভূমিস্পর্শ করছে। কিন্তু তুমি যদি এই গ্রহলোকের কোন সুন্দরী হও, তা হলে লক্ষ্মীদেবী যেমন বিষ্ণুর সঙ্গে বিরাজ করে বৈকুণ্ঠলোকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমন তুমিও আমার সঙ্গে এই নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর। তুমি জেনে রাখ যে, আমি হচ্ছি একজন মহান বীর এবং এই পৃথিবীর একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা।

তাৎপর্য

আসুরিক ও দৈবী মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দৈবী মনোভাবাপন্ন ভক্তরা খুব ভালভাবে জানেন যে, বিষ্ণু বা নারায়ণের নিত্য সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীকে জীব কখনও ভোগ করতে পারে না। এই অতি উন্নত স্তরের জ্ঞানকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই নারায়ণের সমৃদ্ধির অনুকরণ করে সুখী হতে চায়। এই শ্লোকে পুরঞ্জন উল্লেখ করেছেন যে, সেই রমণীকে একজন সাধারণ স্ত্রী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু, যেহেতু তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর কাছে প্রস্তাব করেছেন যে, তাঁর সঙ্গিনী হয়ে তিনি লক্ষ্মীদেবীর মতো সুখী হতে পারেন। এইভাবে তিনি একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী মহান রাজারূপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, যাতে তিনি তাঁকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেন এবং লক্ষ্মীদেবীর মতো সুখী হন। ভগবানের আনুগত্য স্বীকার করে এই জগৎ ভোগ করার বাসনা হচ্ছে দৈব। কিন্তু অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার না করে, এই জড় জগৎ ভোগ করতে চায়। এটিই হচ্ছে দেবতা ও অসুরের মধ্যে পার্থক্য।

এই শ্লোকে *ভুবি স্পৃক্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেবতারা যখন এই পৃথিবীতে আসেন, তখন তাঁরা এই পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করেন না। পুরঞ্জন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রমণীটি স্বর্গলোক বা উচ্চতর লোকের অধিবাসী ছিলেন না, কারণ তাঁর চরণ ভূমি স্পর্শ করেছিল। যেহেতু এই পৃথিবীতে প্রতিটি স্ত্রীই অত্যন্ত প্রভাবশালী, ধনী ও পরাক্রমশালী পতি বাসনা করে, তাই পুরঞ্জন সেই রমণীকে প্রলুব্ধ করার জন্য নিজেকে তেমন একজন ব্যক্তি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এই জড় জগতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ভোগ করতে চায়। পুরুষ সুন্দরী নারীকে ভোগ করতে চায়, এবং নারী পরাক্রমশালী ও প্রভাবশালী পুরুষকে উপভোগ করতে চায়। এই প্রকার জড় বাসনা সমন্বিত জীবকে বলা হয় পুরুষ বা ভোক্তা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, নারী ভোগ্যা এবং পুরুষ ভোক্তা, কিন্তু অন্তরে সকলেই ভোক্তা। তাই জড় জগতে সব কিছুকেই বলা হয় মায়া।

শ্লোক ৩০

যদেষ মাপাঙ্গবিখণ্ডিতেন্দ্রিয়ং
সব্রীড়ভাবস্মিতবিভ্রমদ্‌ভ্রুবা ।
ত্বয়োপসৃষ্টো ভগবান্মনোভবঃ
প্রবাধতেঽথানুগৃহাণ শোভনে ॥ ৩০ ॥

যৎ—যেহেতু, **এষঃ**—এই; **মা**—আমাকে, **অপাঙ্গ**—তোমার কটাক্ষের দ্বারা; **বিখণ্ডিত**—বিক্ষুব্ধ, **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয় অথবা মন, **স-ব্রীড়**—সলজ্জ, **ভাব**—অনুরাগ, **স্মিত**—হাস্য; **বিভ্রমৎ**—মোহিত হচ্ছে, **ভ্রুবা**—ভ্রূসমন্বিত, **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **উপসৃষ্টঃ**—প্রভাবিত হয়ে, **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **মনঃ-ভবঃ**—কামদেব; **প্রবাধতে**—পীড়িত করছে, **অথ**—অতএব, **অনুগৃহাণ**—সদয় হও; **শোভনে**—হে সুন্দরী।

অনুবাদ

তোমার অপাঙ্গদৃষ্টি আমার চিত্তকে অত্যন্ত বিচলিত করছে। তোমার হাসি লজ্জাযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত কামোদ্দীপক হওয়ার ফলে, আমার অন্তরে পরম শক্তিশালী কামদেবকে জাগরিত করছে। তাই হে সুন্দরী! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমার প্রতি সদয় হও।

তাৎপর্য

সকলেরই অন্তরে কামবাসনা রয়েছে, এবং সুন্দরী রমণীর ভ্রূযুগলের আন্দোলনের ফলে যখনই তা বিক্ষুব্ধ হয়, তখন অন্তরে কামদেব তাঁর শর নিক্ষেপ করে হৃদয়কে বিদ্ধ করেন। এইভাবে মানুষ সুন্দরী রমণীর ভ্রূযুগলের দ্বারা অচিরেই পরাস্ত হন। কেউ যখন কাম-বাসনার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়, তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি সর্বপ্রকার বিষয়ের দ্বারা (যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) আকৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত আকর্ষণীয় বিষয়গুলি মানুষকে রমণীর বশীভূত হতে বাধ্য করে। এইভাবে জীবের বদ্ধ জীবন শুরু হয়। বদ্ধ জীবন মানে হচ্ছে স্ত্রীর বশীভূত হওয়া, এবং জীব নিশ্চিতরূপে সর্বদাই স্ত্রী অথবা পুরুষের কৃপার উপর নির্ভর করে। এইভাবে জীব পরস্পরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং তার ফলে তারা মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে বদ্ধ জীবন যাপন করতে থাকে।

শ্লোক ৩১

ত্বদাননং সুভ্রু সুতারলোচনং
ব্যালম্বিনীলালকবৃন্দসংবৃতম্ ।
উন্নীয় মে দর্শয় বল্গুবাচকং
যদ্‌ব্রীড়য়া নাভিমুখং শুচিস্মিতে ॥ ৩১ ॥

ত্বৎ—তোমার; **আননম্**—মুখ; **সু-ভ্রু**—সুন্দর ভ্রূসমন্বিত; **সু-তার**—সুন্দর চোখের মণি, **লোচনম্**—নয়নযুগল; **ব্যালম্বি**—বিলম্বিত; **নীল**—নীলবর্ণ; **অলক-বৃন্দ**—কেশরাশি; **সংবৃতম্**—পরিবেষ্টন করে রয়েছে; **উন্নীয়**—উন্নত হয়ে, **মে**—আমাকে; **দর্শয়**—দেখাও; **বল্গু বাচকম্**—অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বাক্যসমন্বিত; **যৎ**—যে মুখ; **ব্রীড়য়া**—লজ্জার দ্বারা, **ন**—না; **অভিমুখম্**—মুখোমুখি, **শুচি-স্মিতে**—হে সুহাসিনী।

অনুবাদ

হে সুন্দরী! সুন্দর ভ্রূ ও নয়ন-সমন্বিত তোমার মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং তাকে বেষ্টন করে রয়েছে তোমার শ্যামচিক্কণ কেশরাজি। তোমার মুখ থেকে অতি সুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হচ্ছে। তুমি লজ্জাবশত আমার দিকে তাকাতে পারছ না। তাই আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি, হে সুন্দরী! দয়া করে তুমি তোমার মস্তক উন্নত কর এবং মধুর হাস্য সহকারে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

তাৎপর্য

কেউ যখন কোন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন সে ঠিক এইভাবে কথা বলে। একে বলা হয় জড়া প্রকৃতির বন্ধনজনিত মোহ। কেউ যখন এইভাবে জড়া প্রকৃতির সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন সে তা ভোগ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়। তার বিস্তৃত বর্ণনা পুরঞ্জনের এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যে একজন সুন্দরীর দ্বারা মোহিত হয়েছিল। বদ্ধ জীবনে জীব মুখ, ভ্রূ, চোখ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সব কিছুই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কোন পুরুষ অথবা স্ত্রী যখন পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন সে সুন্দর কি অসুন্দর, সেই সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। প্রেমিক তার প্রেমিকার মুখের সব কিছু সুন্দর বলে দর্শন করে এবং তার ফলে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণ হচ্ছে এই জড় জাগতিক জীবের অধঃপতনের কারণ। তার বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৭) বলা হয়েছে—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

"হে অর্জুন! হে পরন্তপ! সমস্ত জীব ইচ্ছা ও দ্বেষের দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, মোহের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে।"

জীবনের এই বদ্ধ অবস্থাকে অবিদ্যা বলা হয়। অবিদ্যার বিপরীত হচ্ছে বিদ্যা। *শ্রীঈশোপনিষদে* বিদ্যা ও অবিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। অবিদ্যা জীবের বন্ধনের কারণ এবং বিদ্যা জীবের মুক্তির কারণ। এখানে পুরঞ্জন স্বীকার করেছেন যে, তিনি অবিদ্যার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। এখন তিনি অবিদ্যার পূর্ণস্বরূপ দর্শন করতে চাইছেন এবং তাই তিনি সেই রমণীকে অনুরোধ করছেন, তিনি যেন তাঁর মস্তক উন্নত করেন, যাতে তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করতে পারেন। এইভাবে তিনি অবিদ্যার বিভিন্ন অঙ্গ দর্শন করতে চাইছেন, যা অবিদ্যাকে আকর্ষণীয় করে তোলে

শ্লোক ৩২

নারদ উবাচ

ইত্থং পুরঞ্জনং নারী যাচমানমধীরবৎ ।
অভ্যনন্দত তং বীরং হসন্তী বীর মোহিতা ॥ ৩২ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **ইত্থম্**—তার পর; **পুরঞ্জনম্**—পুরঞ্জনকে; **নারী**—রমণী; **যাচমানম্**—প্রার্থনা করে; **অধীর-বৎ**—অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে; **অভ্যনন্দত**—তিনি সম্বোধন করেছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **বীরম্**—বীর; **হসন্তী**—হেসে; **বীর**—হে বীর; **মোহিতা**—তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে রাজন্! পুরঞ্জন যখন সেই রমণীকে স্পর্শ করতে ও উপভোগ করতে অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন, তখন সেই রমণীও তাঁর বাক্যের দ্বারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মৃদু হেসে তাঁর সেই অনুরোধ স্বীকার করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনিও নিঃসন্দেহে রাজার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, কোন মানুষ যখন পূর্বপক্ষ অবলম্বন করে কোন স্ত্রীকে তার প্রেম নিবেদন করে, তখন স্ত্রীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই

প্রক্রিয়াকে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৮) *পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে এই আকর্ষণ যৌন জীবনের স্তরে পর্যবসিত হয়। এইভাবে মৈথুন আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে জড় বিষয়াসক্তির ভিত্তি বদ্ধ জীবন অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রবৃত্তি হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের বিস্মৃতির কারণ। এইভাবে জীবের আদি কৃষ্ণচেতনা আচ্ছাদিত হয় অথবা জড় চেতনায় রূপান্তরিত হয় তার ফলে মানুষ ইন্দ্রিয় সুখভোগে মগ্ন হয়

শ্লোক ৩৩

ন বিদাম বয়ং সম্যক্কর্তারং পুরুষর্ষভ ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি গোত্রং নাম চ যৎকৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

ন—করে না; **বিদাম**—জানা; **বয়ম্**—আমি; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে, **কর্তারম্**—কর্তা, **পুরুষ ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; **আত্মনঃ** আমার; **চ**—এবং; **পরস্য**—অন্যের; **অপি**—ও, **গোত্রম্**—বংশের ইতিহাস; **নাম**—নাম; **চ**—এবং; **যৎ-কৃতম্**—কোন্‌টি কার দ্বারা তৈরি হয়েছে।

অনুবাদ

সেই রমণী বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। কে যে আমাকে উৎপন্ন করেছে তা আমি জানি না। আমি তোমাকে তা যথাযথভাবে বলতে পারব না আমাদের সঙ্গীদের নাম এবং গোত্রও আমি জানি না।

তাৎপর্য

জীব তার উৎস সম্বন্ধে জানে না। সে জানে না এই জড় জগতের সৃষ্টি কেন হয়েছে, অন্যেরা কেন এই জড় জগতে কার্য করছে এবং এই জগতের চরম উৎস কি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কেউই জানে না, এবং একে বলা হয় অজ্ঞান বা অবিদ্যা। জীবনের উৎস সম্বন্ধে গবেষণা করে বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা কিছু রাসায়নিক উপাদান কিংবা কোষের সমন্বয় দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে জীবনের আদি উৎস কি তা কেউই জানে না। *ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* শব্দটি জড় জগতে আমাদের অস্তিত্বের আদি উৎস সম্বন্ধে জানবার ঔৎসুক্য সূচিত করে। কোন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক অথবা রাজনীতিবিদ্ প্রকৃতপক্ষে জানে না আমরা কোথা থেকে এসেছি, বেঁচে থাকার জন্য এখানে আমরা কেন এত কঠোর সংগ্রাম করছি, এবং আমরা কোথায় যাব. সাধারণত মানুষেরা মনে করে যে, ঘটনাক্রমে আমরা

এখানে এসেছি এবং যখন আমাদের শরীর নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা শূন্য হয়ে যাব। এই প্রকার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা হচ্ছে নির্বিশেষবাদী অথবা শূন্যবাদী এই শ্লোকে রমণীটি জীবের প্রকৃত স্থিতি বর্ণনা করেছেন। তিনি পুরঞ্জনকে তাঁর পিতার নাম বলতে পারেননি, কারণ তিনি জানেন না কোথা থেকে তিনি এসেছেন তিনি যে কেন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন তাও তিনি জানেন না। তিনি সরলভাবে বলেছেন যে, সেই সমস্ত বিষয় তিনি কিছুই জানেন না। এই জড় জগতে জীবের এই হচ্ছে অবস্থা। বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও বড় বড় নেতা রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা জানেন না তাঁরা কোথা থেকে এসেছেন, এবং তাঁরা এও জানেন না কেন তাঁরা এই জড় জগতে তথাকথিত সুখলাভের জন্য এত ব্যস্ত। এই জড় জগতে জীবন ধারণের জন্য আমাদের বহু সুন্দর সুন্দর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কিন্তু আমরা এতই মূর্খ যে, আমরা ভুলেও প্রশ্ন করি না, এই পৃথিবীতে আমাদের বসবাসের এত সুন্দর আয়োজন কে করেছেন। এখানে সব কিছুই একটি অতি সুন্দর নিয়ম মেনে চলছে, কিন্তু মূর্খের মতো মানুষেরা মনে করে যে, এই জড় জগতে সব কিছুই ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হয়েছে, এবং তাদের মৃত্যুর পর তারা শূন্যে লীন হয়ে যাবে। তারা মনে করে যে, বসবাসের এই সুন্দর স্থানটি আপনা থেকেই চিরকাল থাকবে।

শ্লোক ৩৪

ইহাদ্য সন্তমাত্মানং বিদাম ন ততঃ পরম্ ।
যেনেয়ং নির্মিতা বীর পুরী শরণমাত্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইহ—এখানে; **অদ্য**—আজ; **সন্তম্**—বিরাজ করছে; **আত্মানম্**—জীবাত্মা সমূহ; **বিদাম**—তা আমরা জানি; **ন**—না; **ততঃ পরম্**—তার অতীত; **যেন**—যার দ্বারা; **ইয়ম্**—এই; **নির্মিতা**—সৃষ্টি হয়েছে; **বীর**—হে মহাবীর; **পুরী**—নগরী; **শরণম্**—বিশ্রামস্থল; **আত্মনঃ**—সমস্ত জীবের।

অনুবাদ

হে মহাবীর! আমরা কেবল এটুকুই জানি যে, এই স্থানে আমরা রয়েছি। কিন্তু তার অতীত কোন কিছুই আমরা জানি না। আমরা এতই মূর্খ যে, আমাদের বসবাসের জন্য এই সুন্দর স্থানটি যে কে সৃষ্টি করেছেন, তাও আমরা জানতে চেষ্টা করি না।

তাৎপর্য

এই কৃষ্ণভাবনার অভাবকে বলা হয় অজ্ঞান। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৫) বলা হয়েছে *পরাভবস্তাবদ্ অবোধ-জাতঃ*। সকলেরই জন্ম হয়েছে অবিদ্যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* বর্ণনা করেছে যে, এই জড় জগতে সকলেই অজ্ঞানরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। আমাদের অজ্ঞানের ফলে আমরা জাতীয়তাবাদ, পরোপকারবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি কত কিছুর সৃষ্টি করেছি। এই সবের মূলে রয়েছে অজ্ঞান। অতএব, অজ্ঞানপ্রসূত এই সমস্ত তথাকথিত জ্ঞানের উন্নতি-সাধনের কি মূল্য? যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসে, ততক্ষণ তার সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ। এই মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে অজ্ঞান দূর করা, কিন্তু কিভাবে সেই অজ্ঞান দূর করতে হয়, তা না জেনেই মানুষ কত কিছু পরিকল্পনা করছে এবং কত কিছু তৈরি করছে। কিন্তু মৃত্যুর পর, সেই সবই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

শ্লোক ৩৫

এতে সখায়ঃ সখ্যো মে নরা নার্যশ্চ মানদ ।
সুপ্তায়াং ময়ি জাগর্তি নাগোহয়ং পালয়ন্ পুরীম্ ॥ ৩৫ ॥

এতে—এই সমস্ত; **সখায়ঃ**—সখা, **সখ্যঃ**—সখীগণ; **মে**—আমার; **নরাঃ**—মানুষ; **নার্যঃ**—নারী, **চ**—এবং, **মান-দ**—হে মাননীয়, **সুপ্তায়াম্**—নিদ্রিত অবস্থায়, **ময়ি**—আমি হই; **জাগর্তি**—জাগ্রত থাকে; **নাগঃ**—সর্প; **অয়ম্**—এই; **পালয়ন্**—রক্ষা করে, **পুরীম্**—এই নগরী।

অনুবাদ

হে মহাশয়! এই সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী, যারা আমার সঙ্গে রয়েছে, তারা আমার সখা ও সখী, এবং এই সর্পটি এই পুরীর রক্ষাকারী, এমন কি আমি নিদ্রিতা হলেও এই সর্পটি জাগরিত থাকে। আমি কেবল এটুকুই জানি। এর অধিক আর কিছুই আমি জানি না।

তাৎপর্য

পুরঞ্জন সেই রমণীকে এগারটি পুরুষ, তাদের পত্নী ও সর্পটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই রমণীটি সংক্ষেপে তাদের কথা বলেছিলেন। তাদের সম্বন্ধে

তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন না। যে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সর্পটি হচ্ছে জীবের প্রাণ। দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি ক্লান্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখনও প্রাণ জাগ্রত থাকে। অচেতন অবস্থায় যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি, তখনও সর্পটি বা প্রাণশক্তি জাগ্রত থাকে। তার ফলে নিদ্রিত অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি। জীব যখন এই জড় দেহ ত্যাগ করে, তখনও প্রাণশক্তি অক্ষত থাকে এবং তা অন্য আর একটি জড় শরীরে স্থানান্তরিত হয়। তাকে বলা হয় দেহান্তর, এবং মানুষ তাকে মৃত্যু বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে কারওই মৃত্যু হয় না। আত্মার সঙ্গে প্রাণশক্তি থাকে, আত্মা যখন তথাকথিত নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে, তখন সে তার এগারজন বন্ধুকে অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের বিবিধ বাসনা (পত্নীগণ) সহ দেখতে পায়। প্রাণশক্তি সব সময় থাকে। এমন কি যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, তখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকে এবং এই সর্পটি শরীরের ভিতর প্রবাহিত বায়ু ভক্ষণ করে জীবিত থাকে। শ্বাসক্রিয়া রূপে বায়ু প্রকট হয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকে, ততক্ষণ আমরা বুঝতে পারি যে, সুপ্ত ব্যক্তিটি জীবিত রয়েছে। স্থূল শরীরটি নিদ্রিত থাকলেও প্রাণ সক্রিয় থাকে এবং দেহকে রক্ষা করে। এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সর্পটি দেহকে জীবিত রাখার জন্য বায়ু ভক্ষণ করে সক্রিয় থাকে।

শ্লোক ৩৬

দিষ্ট্যাগতোঽসি ভদ্রং তে গ্রাম্যান্ কামানভীপ্সসে ।
উদ্বহিষ্যামি তাংস্তেঽহং স্ববন্ধুভিররিন্দম ॥ ৩৬ ॥

দিষ্ট্যা—আমার সৌভাগ্যক্রমে; **আগতঃ অসি**—তুমি এখানে এসেছ; **ভদ্রম্**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল; **তে**—তোমার; **গ্রাম্যান্**—বিষয় ভোগের; **কামান্**—কাম্য বস্তুসমূহ; **অভীপ্সসে**—যা তুমি উপভোগ করতে চাও; **উদ্বহিষ্যামি**—আমি সরবরাহ করব; **তান্**—সেই সমস্ত; **তে**—তোমাকে; **অহম্**—আমি; **স্ব-বন্ধুভিঃ**—আমার বন্ধুগণ সহ; **অরিন্দম**—হে শত্রু-সংহারক।

অনুবাদ

হে শত্রু-সংহারক! তুমি যে এখানে এসেছ, তা অবশ্যই আমার পরম সৌভাগ্য। আমি সর্বতোভাবে তোমার কল্যাণ কামনা করি। তোমার ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সমস্ত অভিলাষ আমি এবং আমার বন্ধুরা সর্বতোভাবে পূর্ণ করার চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

জীব এই জড় জগতে আসে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য, এবং এই রমণীটি যার প্রতীক, সেই বুদ্ধি তাকে তার সেই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য পরিচালিত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি আসে পরমাত্মা থেকে, এবং তিনি জীবকে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪১) বলা হয়েছে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥

"যাঁরা পরমার্থ সাধনের পথে রয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকেন, তাঁদের লক্ষ্য কেবল একটিই। কিন্তু হে কুরুনন্দন, যারা সেই পথে দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ নয়, তাদের বুদ্ধি বহুশাখায় বিভক্ত।"

ভক্ত যখন আত্ম-উপলব্ধির পথে অগ্রসর হন, তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য থাকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। জড় জাগতিক এমন কি আধ্যাত্মিক অন্য কোন বিষয়েও তাঁর কোন উৎসাহ থাকে না। রাজা পুরঞ্জন সাধারণ জীবের প্রতীক, এবং সেই রমণীটি সাধারণ জীবের বুদ্ধির প্রতীক। এই দুই একসাথে মিলে, জীব তার জড় ইন্দ্রিয়গুলি উপভোগ করে, এবং বুদ্ধি তার সেই উপভোগের সমস্ত সামগ্রীগুলি সরবরাহ করে। জীব যখনই মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে বংশ, জাতি, আচার অনুষ্ঠান, ইত্যাদির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেগুলি সরবরাহ করে ভগবানের মায়া। এইভাবে জীব দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য তার বুদ্ধিকে যথাসাধ্য ব্যবহার করে।

শ্লোক ৩৭

ইমাং ত্বমধিতিষ্ঠস্ব পুরীং নবমুখীং বিভো ।
ময়োপনীতান্ গৃহ্ণানঃ কামভোগান্ শতং সমাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইমাম্—এই, **ত্বম্**—তুমি; **অধিতিষ্ঠস্ব**—এখানে থাক; **পুরীম্**—নগরীতে; **নব-মুখীম্**—নবদ্বার-সমন্বিত; **বিভো**—হে প্রভো; **ময়া**—আমার দ্বারা, **উপনীতান্**—আয়োজিত, **গৃহ্ণানঃ**—গ্রহণ করে; **কাম-ভোগান্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রী; **শতম্**—একশ; **সমাঃ**—বছর।

অনুবাদ

হে প্রভু! তুমি যাতে সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন করতে পার, সেই জন্যই আমি নবদ্বার সমন্বিত এই নগরীর আয়োজন করেছি। এখানে তুমি একশ বছর

বাস করতে পার, এবং তোমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য সব কিছু সরবরাহ করা হবে।

তাৎপর্য

ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষানাং দারাঃ সম্প্রাপ্তি-হেতবঃ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সর্বপ্রকার সাফল্যের কারণ হচ্ছে পত্নী। কেউ যখন পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা লাভ করছেন। জীবনের প্রারম্ভে মানুষকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তার পর উপযুক্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করে গৃহস্থ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কেউ যদি যথাযথভাবে গৃহস্থ-আশ্রমের শিক্ষালাভ করেন, তা হলে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা তিনি প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রের বিধিবিধান অনুসারে আচরণ করলে, সব কিছুই লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৮

কং নু ত্বদন্যং রময়ে হ্যরতিজ্ঞমকোবিদম্ ।
অসম্পরায়াভিমুখমশ্বস্তনবিদং পশুম্ ॥ ৩৮ ॥

কম্—কাকে; **নু**—তা হলে; **ত্বৎ**—তুমি ছাড়া; **অন্যম্**—অন্য; **রময়ে**—আমি ভোগ করতে দেব; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অরতি-জ্ঞম্**—সম্ভোগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ; **অকোবিদম্**—অতএব প্রায় মূর্খ; **অসম্পরায়**—পরবর্তী জীবনের জ্ঞানরহিত; **অভিমুখম্**—অভিমুখী; **অশ্বস্তন-বিদম্**—পরে কি হবে তা যে জানে না; **পশুম্**—পশুতুল্য।

অনুবাদ

তুমি ছাড়া আর অন্য কোন্ পুরুষের সঙ্গে আমি বিহার করতে পারি? কারণ তাদের তো রতিজ্ঞান নেই এবং তারা জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পর কিভাবে জীবন উপভোগ করতে হয় তা জানে না। এই প্রকার ব্যক্তিরা পশুতুল্য।

তাৎপর্য

যেহেতু ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন প্রকার যোনি রয়েছে, তাই জীবনের বহু পরিস্থিতিও রয়েছে। নিম্নস্তরের জীবনে (বৃক্ষলতার জীবনে) মৈথুনের সম্ভাবনা থাকে না। উচ্চতর জীবনে (পক্ষী ও পতঙ্গের জীবনে) তাদের মৈথুনের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু

মৈথুন সুখ যে কিভাবে উপভোগ করতে হয়, তা তারা জানে না। মনুষ্য-জীবনে অবশ্য মৈথুন সুখ উপভোগ করার পূর্ণজ্ঞান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত বহু দার্শনিক রয়েছে, যারা মৈথুনসুখ কিভাবে উপভোগ করতে হয় তার উপদেশ দেয়। *কামশাস্ত্র* নামক রতিকলার একটি বিজ্ঞানও রয়েছে মনুষ্য-জীবনে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম বিভাগও রয়েছে গার্হস্থ্য জীবন ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমে যৌন জীবন অনুমোদন করা হয়নি ব্রহ্মচারী-আশ্রমে যৌন জীবন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, বানপ্রস্থী স্বেচ্ছায় যৌন জীবন থেকে বিরত থাকেন এবং সন্ন্যাসী সম্পূর্ণরূপে তাতে বিরক্ত কর্মীরা ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম অনুশীলন করে না, কারণ তারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যধিক রুচিসম্পন্ন, পক্ষান্তরে বলা যায় যে মানুষেরা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবই জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত। তারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আগ্রহী কারণ সেই জীবনে মৈথুন অনুমোদন করা হয়েছে কর্মীরা মনে করে যে, অন্য আশ্রমগুলি পশু জীবনের থেকেও নিকৃষ্ট কারণ পশুরাও মৈথুনসুখ উপভোগ করে, কিন্তু ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদের যৌন জীবন সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে হয়। তাই কর্মীরা আধ্যাত্মিক জীবনের এই সমস্ত আশ্রমগুলিকে ঘৃণা করে।

শ্লোক ৩৯

ধর্মো হ্যত্রার্থকামৌ চ প্রজানন্দোঽমৃতং যশঃ ।
লোকা বিশোকা বিরজা যান্ ন কেবলিনো বিদুঃ ॥ ৩৯ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম অনুষ্ঠান; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অত্র**—এখানে (এই গৃহস্থ-আশ্রমে); **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি, **কামৌ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগ, **চ**—এবং; **প্রজা আনন্দঃ**—সন্তান উৎপাদনের সুখ, **অমৃতম্**—যজ্ঞের ফল; **যশঃ**—যশ, **লোকাঃ**—ভুবন; **বিশোকাঃ**—শোকরহিত; **বিরজাঃ**—রোগরহিত; **যান্**—যা, **ন**—কখনই না; **কেবলিনঃ**—পরমার্থবাদী; **বিদুঃ**—জানেন।

অনুবাদ

সেই রমণী বললেন এই জগতে গৃহস্থ-জীবনেই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের সর্বপ্রকার সুখভোগ করা যায়। তার পর মানুষ মুক্তি অথবা যশও প্রাপ্ত হতে পারেন। গৃহস্থরা যজ্ঞের ফলও ভোগ করতে পারেন, যার ফলে তাঁরা শ্রেষ্ঠ লোকে উন্নীত হতে পারেন এই সমস্ত সুখভোগ

পরমার্থবাদীদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। তাঁরা এই প্রকার সুখের কথা কল্পনাও করতে পারেন না।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে মানুষের কর্মের দুটি মার্গ রয়েছে একটিকে বলা হয় প্রবৃত্তি-মার্গ এবং অন্যটিকে বলা হয় নিবৃত্তি-মার্গ। এই দুটি মার্গেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় জীবন। পশুজীবনে কেবল প্রবৃত্তি-মার্গই রয়েছে প্রবৃত্তি-মার্গের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখভোগ, এবং নিবৃত্তি-মার্গের অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতিসাধন। পশু ও অসুরদের জীবনে নিবৃত্তি-মার্গের কোন ধারণাই নেই, এমন কি প্রবৃত্তি-মার্গের ধারণাও তাদের নেই। প্রবৃত্তি-মার্গে বলা হয়েছে যে, যদিও মানুষের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু সেই প্রবণতা চরিতার্থ করতে হবে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে। যেমন, সকলেরই মৈথুনের প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু আসুরিক সভ্যতায় কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যতীতই সেই সুখ উপভোগ করার চেষ্টা করা হয়। বৈদিক সভ্যতায় বৈদিক নির্দেশের মাধ্যমে যৌন সুখ উপভোগ করা হয়। এইভাবে *বেদ* সভ্য মানুষদের নির্দেশ দেয়, কিভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রবণতা চরিতার্থ করতে হয়

নিবৃত্তি-মার্গে কিন্তু মৈথুন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। সমাজকে চারটি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। তাদের মধ্যে কেবল গার্হস্থ্য জীবনেই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে প্রবৃত্তির মার্গ অনুসরণ করা যায়। ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে যৌন জীবনের কোন অবকাশ নেই।

এই শ্লোকে রমণীটি কেবল প্রবৃত্তি-মার্গের প্রশংসা করে নিবৃত্তি-মার্গের নিন্দা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, *যতি* বা পরমার্থবাদীরা, যারা কেবল আধ্যাত্মিক জীবনের *(কৈবল্য)* বিষয়েই উদ্যোগী, তাঁরা প্রবৃত্তি-মার্গের সুখের কথা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করেন, তাঁরা এই জীবনে সুখভোগ করেন, এবং পরবর্তী জীবনেও স্বর্গলোকে উন্নীত হন। এই জীবনে তিনি নানা রকম ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকার ফলে, সন্তান-সন্ততি আদি নানা রকম জড় ঐশ্বর্য ভোগ করেন। জড় জাগতিক ক্লেশ হচ্ছে—জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। কিন্তু যাঁরা প্রবৃত্তি-মার্গে আগ্রহী, তাঁরা জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সময় নানা প্রকার ধার্মিক কৃত্য অনুষ্ঠান করেন। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির কোন রকম পরোয়া না করে, তাঁরা নানা প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠানে মগ্ন থাকেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তি-মার্গের ভিত্তি হচ্ছে যৌন জীবন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/৪৫) বলা হয়েছে, *যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধি-সুখং হি তুচ্ছম্।* যে গৃহস্থ প্রবৃত্তি-

মার্গে অত্যন্ত অনুরক্ত, তাকে গৃহস্থ বলা হয় না, তাকে বলা হয় গৃহমেধী। যদিও গৃহস্থ ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা করেন, তবুও তিনি বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন কিন্তু গৃহমেধীরা কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয়েই আগ্রহী, তারা কোন রকম বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করে না। গৃহমেধী যৌন জীবনের মহিমা কীর্তন করে তার পুত্র-কন্যাদেরও যৌন জীবনে অনুপ্রাণিত করে এবং জীবনের অন্তিম সময়ে সর্বপ্রকার যশ থেকে বঞ্চিত হয়। গৃহস্থ এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনেও যৌন জীবন উপভোগ করে, কিন্তু গৃহমেধী জানে না তার পরবর্তী জীবনে কি গতি হবে, কারণ সে কেবল এই জীবনেই যৌন সুখ উপভোগে মগ্ন থাকে মোট কথা হচ্ছে, কেউ যখন যৌন জীবনের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়, তখন সে পারমার্থিক জীবনের কোন রকম চেষ্টা করে না। বিশেষ করে এই কলিযুগে কেউই পারমার্থিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। যদিও কখনও কখনও দেখা যায়, কেউ কেউ পারমার্থিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভণ্ডদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিপথগামী হয়

শ্লোক ৪০

পিতৃদেবর্ষিমর্ত্যানাং ভূতানামাত্মনশ্চ হ ।
ক্ষেম্যং বদন্তি শরণং ভবেঽস্মিন্ যদ্ গৃহাশ্রমঃ ॥ ৪০ ॥

পিতৃ—পিতৃগণ, **দেব**—দেবতাগণ; **ঋষি**—ঋষিগণ, **মর্ত্যানাম্**—সাধারণ মানুষদের; **ভূতানাম্**—অসংখ্য জীবদের, **আত্মনঃ**—নিজের; **চ**—ও; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **ক্ষেম্যম্**—লাভপ্রদ; **বদন্তি**—লোকে বলে, **শরণম্**—আশ্রয়; **ভবে**—জড় জগতে **অস্মিন্**—এই, **যৎ**—যা; **গৃহ-আশ্রমঃ** গৃহস্থ-জীবন।

অনুবাদ

সেই রমণী বললেন—মহাজনদের বর্ণনা অনুসারে, গৃহস্থ-জীবন কেবল নিজের জন্যই আনন্দদায়ক নয়, তা পিতৃগণ, দেবতাগণ, মহর্ষিগণ, মহাত্মাগণ এবং অন্য সকলের জন্য শ্রেয়স্কর। এইভাবে গৃহস্থ-আশ্রম সকলের জন্যই লাভজনক।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে, কেউ যখন এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে, তখন তার বহু ঋণ থাকে। সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের কাছে তার ঋণ থাকে, কারণ তাঁরা জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি সরবরাহ করছেন। দেবতাদের কৃপায়

আমরা তাপ, আলোক, জল এবং অন্যান্য আবশ্যক বস্তুগুলি প্রাপ্ত হই। আমরা পিতৃগণের কাছেও ঋণী, কারণ তাঁরা আমাদের এই শরীর, বুদ্ধি, সমাজ, বন্ধুত্ব ও প্রেম প্রদান করেছেন। তেমনই আমরা রাজনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার জন্য জনসাধারণের কাছে ঋণী, এবং আমরা গরু, ঘোড়া, গাধা, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি নিম্নস্তরের পশুদের কাছেও ঋণী এইভাবে মনুষ্যরূপে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করা মাত্রই জীবের বহু ঋণ থাকে এবং সেই সমস্ত ঋণ শোধ করার দায়িত্বও থাকে সে যদি সেই ঋণগুলি শোধ না করে, তা হলে তাকে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। জড় বিষয়ের প্রতি অত্যধিক আসক্ত গৃহমেধীরা কিন্তু জানে না যে, তারা যদি কেবল মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ এই সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত গৃহমেধীদের কৃষ্ণভক্তিতে কোন রকম আসক্তি নেই। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

> *মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা*
> *মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩০)

গৃহব্রত মানে হচ্ছে *গৃহমেধী*। যারা যৌন জীবনকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে তাদের কাছে কৃষ্ণভক্তি বিভ্রান্তিজনক বলে মনে হয়। নিজের ব্যক্তিগত বিবেচনার ফলেই হোক অথবা অন্যদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে কিংবা আলোচনা করেই হোক, সে যৌন জীবনের প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়ে যে, সে আর কৃষ্ণভক্তি করতে পারে না

শ্লোক ৪১

কা নাম বীর বিখ্যাতং বদান্যং প্রিয়দর্শনম্ ।
ন বৃণীত প্রিয়ং প্রাপ্তং মাদৃশী ত্বাদৃশং পতিম্ ॥ ৪১ ॥

কা—কে; **নাম**—যথার্থই; **বীর**—হে বীর, **বিখ্যাতম্**—প্রসিদ্ধ, **বদান্যম্**—উদার, **প্রিয়-দর্শনম্**—সুন্দর; **ন**—না; **বৃণীত**—গ্রহণ করবে; **প্রিয়ম্**—সহজেই; **প্রাপ্তম্**—লব্ধ; **মাদৃশী**—আমার মতো; **ত্বাদৃশম্**—আপনার মতো; **পতিম্**—পতিকে।

অনুবাদ

হে বীর! তুমি বিখ্যাত, উদার চিত্ত এবং অতি সুন্দর পুরুষ। অতএব তোমার মতো পতি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে, আমার মতো কামিনী আর কাকেই বা পতিত্বে বরণ করবে?

তাৎপর্য

প্রত্যেক পতিই তার পত্নীর কাছে এক মহাবীর। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কোন স্ত্রী যখন কোন পুরুষকে ভালবাসে, তখন তার কাছে সেই পুরুষ অত্যন্ত সুন্দর ও উদার বলে মনে হয়। সুন্দর বলে মনে না হলে, নিজেকে তার কাছে সারা জীবনের জন্য উৎসর্গ করা যায় না পতিকে অত্যন্ত উদার বলে মনে হয়, কারণ তিনি পত্নীকে তাঁর ইচ্ছানুসারে সন্তান প্রদান করেন। প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে বাচ্চারা অত্যন্ত প্রিয়; তাই যে পতি যৌন জীবনের দ্বারা এবং সন্তান প্রদান করার দ্বারা তাঁর পত্নীর প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন, তাঁকে অত্যন্ত উদার বলে মনে করা হয়। পতি কেবল সন্তান উৎপাদন করেই উদার হন না, উপরন্তু অলঙ্কার, উপাদেয় খাদ্য ও বসন ইত্যাদি প্রদান করার মাধ্যমে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর বশে রাখেন। এই প্রকার সন্তুষ্ট পত্নী কখনই তাঁর পতির সঙ্গ ত্যাগ করবে না। *মনু-সংহিতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য পতির কর্তব্য হচ্ছে তাকে অলঙ্কার প্রদান করা, কারণ স্ত্রীলোকেরা সাধারণত গৃহ, অলঙ্কার, সাজসজ্জা, সন্তান, ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এইভাবে স্ত্রীই সমস্ত জড় সুখের কেন্দ্রবিন্দু।

এই প্রসঙ্গে *বিখ্যাতম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পুরুষদের সুন্দরী রমণীর পিছু লাগার প্রবণতা রয়েছে এবং কখনও কখনও তাকে ধর্ষণ বলে মনে করা হয়। ধর্ষণ যদিও বৈধ নয়, তবুও স্ত্রীলোকেরা ধর্ষণে অত্যন্ত দক্ষ পুরুষদের পছন্দ করে।

শ্লোক ৪২

কস্যা মনস্তে ভুবি ভোগিভোগয়োঃ
স্ত্রিয়া ন সজ্জেদ্ভুজয়োর্মহাভুজ ।
যোঽনাথবর্গাধিমলং ঘৃণোদ্ধত-
স্মিতাবলোকেন চরত্যপোহিতুম্ ॥ ৪২ ॥

কস্যাঃ—কার; **মনঃ**—মন; **তে**—তোমার; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **ভোগি-ভোগয়োঃ**—সর্পসদৃশ শরীর; **স্ত্রিয়াঃ**—নারীর; **ন**—না; **সজ্জেৎ**—আকৃষ্ট হয়; **ভুজয়োঃ**—বাহুর দ্বারা; **মহা-ভুজ**—হে মহাবীর, **যঃ**—যে; **অনাথ-বর্গা**—আমার মতো দুঃস্থ স্ত্রীলোকদের; **অধিম্**—মনঃ কষ্ট; **অলম্**—সক্ষম; **ঘৃণা-উদ্ধত**—উদ্ধত কৃপার দ্বারা; **স্মিত-অবলোকেন**—আকর্ষণীয় হাসির দ্বারা; **চরতি**—বিচরণ করে; **অপোহিতুম্**—দূর করার জন্য।

অনুবাদ

হে মহাবাহো! পৃথিবীতে এমন কোন্ রমণী আছে, যার মন তোমার সর্পদেহ-সদৃশ বাহুযুগলের আলিঙ্গনের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তুমি তোমার মধুর হাস্য ও উদ্ধত কৃপার দ্বারা আমার মতো অনাথা মহিলাদের সমস্ত সন্তাপ দূর কর। আমরা মনে করি যে, তুমি কেবল আমাদের উপকারের জন্য এই ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করছ।

তাৎপর্য

কোন পতিহীনা স্ত্রী যখন কোন উদ্ধত পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে তা কৃপা বলে মনে করে। নারী সাধারণত পুরুষের দীর্ঘবাহুর দ্বারা অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। সাপের দেহ গোল এবং লেজের দিকে তা ক্রমশ সরু হয়ে আসে। পুরুষের সুন্দর বাহু স্ত্রীর কাছে ঠিক একটি সাপের শরীরের মতো মনে হয়, এবং সে সেই বাহুর আলিঙ্গন গভীরভাবে কামনা করে।

এই শ্লোকে *অনাথ বর্গা* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *নাথ* মানে হচ্ছে 'পতি', এবং *অ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিহীন'। পতিবিহীন যুবতী নারীকে *অনাথ* বলা হয়, অর্থাৎ 'যে সংরক্ষিত নয়'। কৈশোর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই, মেয়েরা যৌন বাসনার দ্বারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়। তাই পিতার কর্তব্য হচ্ছে কৈশোর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া। তা না হলে পতি না থাকার ফলে সে গভীর মনঃপীড়া অনুভব করবে। সেই বয়সে যে তার যৌন বাসনা তৃপ্ত করবে, সে তার পরম প্রেমাস্পদ হয়ে ওঠে। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে দেখা গেছে যে, কৈশোর অবস্থায় কোন মেয়ের যৌন আবেদন যেই পুরুষ তৃপ্ত করে, সে যেই হোক না কেন, মেয়েটি আজীবন তাকে ভালবাসে। এইভাবে এই জড় জগতে তথাকথিত প্রেম কামের পরিতৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্লোক ৪৩

নারদ উবাচ

ইতি তৌ দম্পতী তত্র সমুদ্য সময়ং মিথঃ।
তাং প্রবিশ্য পুরীং রাজন্মুমুদাতে শতং সমাঃ ॥ ৪৩ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **তৌ**—তারা; **দম্পতী**—পতি ও পত্নী; **তত্র**—সেখানে; **সমুদ্য**—সমভাবে উৎসাহী হয়ে; **সময়ম্**—পরস্পরকে

স্বীকার করে, **মিথঃ**—পরস্পর; **তাম্**—সেই স্থানে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে, **পুরীম্**—সেই নগরীতে; **রাজন্**—হে রাজন্; **মুমুদাতে**—তারা জীবন উপভোগ করেছিল; **শতম্**—এক শত; **সমাঃ**—বৎসর।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্! সেই পুরুষ ও নারী পারস্পরিক সৌহার্দ্যের দ্বারা পরস্পরকে অঙ্গীকার করে সেই নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং একশ বছর ধরে জীবন উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে একশ বছর তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ প্রত্যেক মানুষের একশ বছর বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে বিভিন্ন গ্রহলোকে বিভিন্ন প্রকার আয়ু রয়েছে অর্থাৎ, এই গ্রহের একশ বছর অন্য গ্রহের একশ বছর থেকে ভিন্ন। ব্রহ্মলোকের গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু একশ বছর, কিন্তু ব্রহ্মার একদিন এই লোকের কোটি কোটি বছরের সমান। তেমনই, স্বর্গলোকের একদিন এই গ্রহের ছয় মাসের সমান। কিন্তু প্রতিটি লোকে মানুষের আয়ু প্রায় একশ বছর। বিভিন্ন লোকে সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু অনুসারে, সেখানকার জীবনের মানও ভিন্ন।

শ্লোক ৪৪

উপগীয়মানো ললিতং তত্র তত্র চ গায়কৈঃ ।
ক্রীড়ন্ পরিবৃতঃ স্ত্রীভির্হ্রদিনীমাবিশচ্ছুচৌ ॥ ৪৪ ॥

উপগীয়মানঃ—সংস্তুত হয়ে, **ললিতম্**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে; **তত্র তত্র**—স্থানে স্থানে; **চ**—ও; **গায়কৈঃ**—গায়কদের দ্বারা; **ক্রীড়ন্**—খেলা করে; **পরিবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **স্ত্রীভিঃ**—রমণীদের দ্বারা; **হ্রদিনীম্**—সরোবরে, **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **শুচৌ**—যখন খুব গরম হত।

অনুবাদ

গায়কেরা মনোহর সঙ্গীতে মহারাজ পুরঞ্জনের মহিমান্বিত কার্যকলাপের যশোগান করত। গ্রীষ্মকালে যখন অত্যন্ত গরম পড়ত, তখন তিনি কামিনীকুল পরিবৃত হয়ে সরোবরে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন।

তাৎপর্য

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় জীব ভিন্ন ভিন্ন কার্য করে। সেগুলি হচ্ছে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সুষুপ্তি হচ্ছে অচেতন অবস্থা, এবং মৃত্যুর পর আর একটি অবস্থা রয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকে জাগ্রত অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহ করে একশ বছর জীবন উপভোগ করে এই শ্লোকে স্বপ্নাবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ পুরঞ্জন দিনের বেলায় যে কার্য করে, রাত্রে স্বপ্নাবস্থায়ও তা প্রতিফলিত হয়। পুরঞ্জন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য তার পত্নীর সঙ্গে বাস করত, এবং রাত্রে বিভিন্নভাবে সেই ইন্দ্রিয় সুখের স্বপ্ন দেখত। মানুষ যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়, এবং কোন ধনী ব্যক্তি যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়, তখন সে রমণীকুল পরিবৃত হয়ে তার বাগান বাড়িতে গিয়ে জলক্রীড়া করে তাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করে এই সংসারে জীবের প্রবৃত্তিই এই রকম। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শিক্ষালাভ না করলে জীব কখনও স্ত্রীসঙ্গ করে তৃপ্ত হতে পারে না। সাধারণত মানুষ বহু স্ত্রীলোককে উপভোগ করতে চায়, এবং জীবনের অন্তিম সময়েও যৌন আবেদন এতই প্রবল থাকে যে, অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যুবতীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে চায় এইভাবে তীব্র যৌন বাসনার ফলে, জীব এই জড় জগতের বন্ধনে অত্যন্ত প্রবলভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৪৫

সপ্তোপরি কৃতা দ্বারঃ পুরস্তস্যাস্তু দ্বে অধঃ ।
পৃথগ্বিষয়গত্যর্থং তস্যাং যঃ কশ্চনেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥

সপ্ত—সাত; **উপরি**—উপরে; **কৃতাঃ**—নির্মিত; **দ্বারঃ**—দ্বার; **পুরঃ**—নগরীর; **তস্যাঃ**—সেই; **তু**—তখন; **দ্বে**—দুই; **অধঃ**—নিম্নে; **পৃথক্**—ভিন্ন ভিন্ন; **বিষয়**—স্থানে; **গতি-অর্থম্**—যাওয়ার জন্য; **তস্যাম্**—সেই নগরীতে, **যঃ**—যিনি, **কশ্চন**—যে-কেউ; **ঈশ্বরঃ**—রাজ্যপাল।

অনুবাদ

সেই নগরীর নয়টি দ্বারের মধ্যে সাতটি দ্বার উপরিভাগে, এবং দুটি দ্বার অধোভাগে রয়েছে। এই দ্বারগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছে, এবং সেই দ্বারগুলি ব্যবহার করেন সেই নগরীর অধীশ্বর।

তাৎপর্য

উপবিভাগে অবস্থিত সাতটি দ্বার হচ্ছে—দুটি চক্ষু, দুটি নাসারন্ধ্র, দুটি কর্ণ ও একটি মুখ। অধোভাগের দুটি দ্বার হচ্ছে—পায়ু ও উপস্থ। রাজা বা সেই দেহের অধীশ্বর জীবাত্মা বিভিন্ন প্রকার জড় সুখ উপভোগ করার জন্য এই সমস্ত দ্বারগুলি ব্যবহার করে। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরীগুলিতে বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন দ্বারের প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। পূর্বে রাজধানীর চারপার্শ্বে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত, এবং বিভিন্ন নগরীতে অথবা বিভিন্ন দিকে যেতে হলে, ভিন্ন দ্বারের মধ্য দিয়ে যেতে হত। পুরানো দিল্লীতে এখনও নগরীকে বেষ্টন করে ছিল যে প্রাচীর তার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, এবং কাশ্মীরী গেট, লাহোরী গেট ইত্যাদি বিভিন্ন দ্বার রয়েছে তেমনই আমেদাবাদেও দিল্লী গেট রয়েছে। এই উপমার প্রধান বিষয় হচ্ছে জীব বিভিন্ন প্রকার জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করতে চায়, এবং সেই জন্য প্রকৃতি তার শরীরে বিভিন্ন রন্ধ্র দান করেছে, যাতে সে ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য সেগুলির ব্যবহার করতে পারে।

শ্লোক ৪৬

পঞ্চ দ্বারস্তু পৌরস্ত্যা দক্ষিণৈকা তথোত্তরা ।
পশ্চিমে দ্বে অমূষাং তে নামানি নৃপ বর্ণয়ে ॥ ৪৬ ॥

পঞ্চ—পাঁচ; **দ্বারঃ**—দ্বার; **তু**—কিন্তু; **পৌরস্ত্যাঃ**—পূর্বমুখী; **দক্ষিণা**—দক্ষিণমুখী; **একা**—এক; **তথা**—ও; **উত্তরা**—উত্তর দিকে একটি; **পশ্চিমে**—তেমনই, পশ্চিম দিকে; **দ্বে**—দুটি; **অমূষাম্**—তাদের; **তে**—আপনাকে; **নামানি**—নামগুলি; **নৃপ**—হে রাজন্; **বর্ণয়ে**—আমি বর্ণনা করব।

অনুবাদ

হে রাজন্! সেই নয়টি দ্বারের মধ্যে পাঁচটি দ্বার পূর্বমুখী, একটি উত্তরমুখী, একটি দক্ষিণমুখী এবং দুটি পশ্চিমমুখী। আমি সেই সমস্ত দ্বারগুলির নাম আপনার কাছে বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসারন্ধ্র এবং একটি মুখ, উপবিভাগের এই সাতটি দ্বারের মধ্যে পাঁচটি সম্মুখভাগে রয়েছে, এবং সেগুলিকে পূর্বমুখী বলে বর্ণনা করা হয়েছে যেহেতু সম্মুখভাগে দর্শন করার অর্থ হচ্ছে সূর্যের দিকে মুখ করা, তাই সেগুলিকে

পূর্বমুখী দ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণের দুটি দ্বার হচ্ছে দুটি কর্ণ, এবং পশ্চিমমুখী দুটি দ্বার হচ্ছে পায়ু ও উপস্থ। এই সমস্ত দ্বারগুলির বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৪৭

খদ্যোতাবির্মুখী চ প্রাগ্‌দ্বারাবেকত্র নির্মিতে ।
বিভ্রাজিতং জনপদং যাতি তাভ্যাং দ্যুমৎসখঃ ॥ ৪৭ ॥

খদ্যোতা—খদ্যোতা নামক; **আবির্মুখী**—আবির্মুখী নামক; **চ**—ও, **প্রাক্**—পূর্বদিকস্থ; **দ্বারৌ**—দুটি দ্বার, **একত্র**—একস্থানে, **নির্মিতে**—নির্মিত হয়েছিল; **বিভ্রাজিতম্**—বিভ্রাজিত নামক, **জন-পদম্**—নগরী, **যাতি**—যেত; **তাভ্যাম্**—তাদের দ্বারা; **দ্যুমৎ**—দ্যুমান্ নামক; **সখঃ**—বন্ধুর সঙ্গে।

অনুবাদ

খদ্যোতা ও আবির্মুখী নামক দুটি দ্বার পূর্বদিকে স্থিত ছিল, কিন্তু তারা একস্থানেই নির্মিত ছিল। এই দুটি দ্বার দিয়ে রাজা তাঁর বন্ধু দ্যুমানের সঙ্গে বিভ্রাজিত নামক নগরীতে যেতেন।

তাৎপর্য

খদ্যোতা এবং আবির্মুখী নাম দুটির অর্থ যথাক্রমে 'জোনাকি' ও 'মশাল'। তা ইঙ্গিত করে যে, দুটি চোখের মধ্যে বাম চোখটির দর্শনের ক্ষমতা কম। যদিও দুটি চোখ একই স্থানে নির্মিত হয়েছে, তবুও একটি দর্শন-ক্ষমতা অন্যটির থেকে অধিক। রাজা বা জীব যথাযথভাবে বস্তুসমূহ দর্শন করার জন্য এই দুটি দ্বার ব্যবহার করেন। কিন্তু দ্যুমান্ নামক তাঁর বন্ধু যদি তাঁর সঙ্গে না থাকেন, তা হলে তিনি যথাযথভাবে দর্শন করতে পারেন না। এই বন্ধুটি হচ্ছেন সূর্য। দুটি চক্ষু যদিও একস্থানে অবস্থিত, তবুও সূর্যকিরণ ব্যতীত তাদের দর্শন করার ক্ষমতা নেই। *বিভ্রাজিতং জনপদম্।* কেউ যদি স্পষ্টভাবে (*বিভ্রাজিতম্*) কোন কিছু দর্শন করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই দুটি চক্ষু এবং তার বন্ধু সূর্য কিরণের সহায়তায় তা দর্শন করতে হয়। প্রতিটি ব্যক্তিই তার শরীরের রাজা, কারণ সে তার ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন দ্বার ব্যবহার করে। যদিও মানুষ তার দেখার অথবা শোনার ক্ষমতার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত, তবুও সে প্রকৃতির সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ৪৮

নলিনী নালিনী চ প্রাগ্‌দ্বারাবেকত্র নির্মিতে ।
অবধূতসখস্তাভ্যাং বিষয়ং যাতি সৌরভম্ ॥ ৪৮ ॥

নলিনী—নলিনী নামক, **নালিনী**—নালিনী নামক, **চ**—ও; **প্রাক্**—পূর্বদিক; **দ্বারৌ**—দুটি দ্বার; **একত্র**—একস্থানে, **নির্মিতে**—নির্মিত হয়েছে; **অবধূত**—অবধূত নামক; **সখঃ**—তাঁর বন্ধুর সঙ্গে; **তাভ্যাম্**—সেই দুটি দ্বারের মাধ্যমে; **বিষয়ম্**—স্থান; **যাতি**—যেতেন; **সৌরভম্**—সৌরভ নামক।

অনুবাদ

তেমনই পূর্বদিকে নলিনী ও নালিনী নামক আরও দুটি দ্বার রয়েছে, এবং তারাও একস্থানে নির্মিত হয়েছে। এই দ্বার দুটি দিয়ে রাজা অবধূত নামক তাঁর বন্ধুর সঙ্গে সৌরভ নামক নগরীতে গমন করতেন।

তাৎপর্য

নলিনী এবং নালিনী নামক দ্বার হচ্ছে দুটি নাসারন্ধ্র। জীব এই দুটি দ্বার ব্যবহার করেন বিভিন্ন *অবধূত* বা বায়ুর সহযোগিতায়, যা হচ্ছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া এই দুটি দ্বার দিয়ে জীব সৌরভ নামক নগরীতে গমন করেন। অর্থাৎ, নাসিকা তার সখা বায়ুর সহযোগিতায়, এই জড় জগতে বিভিন্ন সৌরভ উপভোগ করে। নলিনী ও নালিনী হচ্ছে নাসিকার নালী, যার মাধ্যমে জীব নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং সৌরভ গ্রহণের আনন্দ আস্বাদন করে।

শ্লোক ৪৯

মুখ্যা নাম পুরস্তাদ্ দ্বাস্তয়াপণবহূদনৌ ।
বিষয়ৌ যাতি পুররাড্রসজ্ঞবিপণান্বিতঃ ॥ ৪৯ ॥

মুখ্যা—মুখ্যা; **নাম**—নামক; **পুরস্তাৎ**—পূর্বদিকে; **দ্বাঃ** দ্বার; **তয়া**—তার দ্বারা; **আপণ**—আপণ নামক; **বহূদনৌ**—বহূদন নামক; **বিষয়ৌ**—দুটি স্থান; **যাতি**—যেতেন; **পুররাট্**—সেই নগরীর রাজা (পুরঞ্জন); **রস-জ্ঞ**—রসজ্ঞ নামক; **বিপণ**—বিপণ নামক; **অন্বিতঃ**—সঙ্গে।

অনুবাদ

পূর্বদিকে অবস্থিত পঞ্চম দ্বারটির নাম মুখ্যা, অর্থাৎ প্রধান। এই দ্বার দিয়ে তিনি রসজ্ঞ ও বিপণ নামক তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে বহূদন ও আপণ নামক দুটি স্থানে গমন করতেন।

তাৎপর্য

এখানে মুখকে মুখ্যা বা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মুখ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বার, কারণ মুখের দ্বারা দুটি কার্য সম্পন্ন হয়। প্রথমটি হচ্ছে আহার এবং অন্যটি হচ্ছে বাণী। আহার কার্য সম্পাদিত হয় রসজ্ঞ বা জিহ্বারূপ বন্ধুর দ্বারা, যা বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। কথা বলার জন্য জিহ্বার ব্যবহার হয়, এবং সে হয় জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয় অথবা বৈদিক জ্ঞানের বিষয়ে কথা বলতে পারে। এখানে অবশ্য জড় ইন্দ্রিয় সুখের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাই *রসজ্ঞ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্লোক ৫০

পিতৃহূর্নৃপ পুর্যা দ্বার্দক্ষিণেন পুরঞ্জনঃ ।
রাষ্ট্রং দক্ষিণপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥

পিতৃহূঃ—পিতৃহূ নামক; **নৃপ**—হে রাজন্; **পুর্যাঃ**—নগরীর; **দ্বাঃ**—দ্বার; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **রাষ্ট্রম্**—দেশ; **দক্ষিণ**—দক্ষিণ দিকের; **পঞ্চালম্**—পঞ্চাল নামক; **যাতি**—গমন করতেন; **শ্রুত-ধর-অন্বিতঃ**—শ্রুতধর নামক তাঁর বন্ধুর সঙ্গে।

অনুবাদ

সেই নগরীর দক্ষিণ দিকের দ্বারটির নাম পিতৃহূ, এবং সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তার বন্ধু শ্রুতধরের সঙ্গে দক্ষিণ-পঞ্চাল নামক নগরীতে গমন করতেন।

তাৎপর্য

দক্ষিণ কর্ণের ব্যবহার হয় কর্মকাণ্ডীয় বা সকাম কর্মের জন্য। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখ উপভোগে আসক্ত থাকে, ততক্ষণ সে তার দক্ষিণ কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করে এবং পিতৃ আদি উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে। তাই এখানে দক্ষিণ কর্ণকে পিতৃহূদ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে.

শ্লোক ৫১

দেবহূর্নাম পুর্যা দ্বা উত্তরেণ পুরঞ্জনঃ ।
রাষ্ট্রমুত্তরপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ ॥ ৫১ ॥

দেবহূঃ—দেবহূ; **নাম**—নামক; **পুর্যাঃ**—নগরীর; **দ্বাঃ**—দ্বার; **উত্তরেণ**—উত্তর দিকে; **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **রাষ্ট্রম্**—রাষ্ট্র; **উত্তর**—উত্তর দিক; **পঞ্চালম্**—পঞ্চাল নামক; **যাতি**—যেতেন; **শ্রুত-ধর-অন্বিতঃ**—তাঁর বন্ধু শ্রুতধরের সঙ্গে।

অনুবাদ

উত্তর দিকে ছিল দেবহূ নামক দ্বার। সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সখা শ্রুতধরের সঙ্গে উত্তর-পঞ্চাল নামক স্থানে গমন করতেন।

তাৎপর্য

দুটি কান দেহের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকের কানটি অত্যন্ত প্রবল এবং তা সর্বদা ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয় সম্বন্ধে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। উত্তর দিকের দ্বারটি কিন্তু ব্যবহার করা হয় চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করার জন্য। দক্ষিণ দিকস্থ দক্ষিণ কর্ণটিকে বলা হয় পিতৃহূ, যা ইঙ্গিত করে যে, তা পিতৃলোক নামক উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু দেবহূ নামক বাম কর্ণটির ব্যবহার হয় তার থেকেও উচ্চতর লোক, যথা—মহর্লোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক—এমন কি তার থেকেও উচ্চতর চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার জন্য, যেখানে জীব নিত্যকালের জন্য অবস্থান করতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা দেবদেবীদের পূজা করে, তারা সেই দেবদেবীদের লোকে জন্মগ্রহণ করবে; যারা ভূত-প্রেতদের পূজা করে, তারা তাদের লোকে জন্মগ্রহণ করবে; যারা পিতৃদের পূজা করে, তারা পিতৃলোকে গমন করবে, আর যারা আমার আরাধনা করে, তারা আমার লোক প্রাপ্ত হয়ে আমার সঙ্গে বাস করবে।"

যারা এই গ্রহলোকে সুখী হতে চায় এবং মৃত্যুর পরেও সুখভোগ করতে আগ্রহান্বিত, তারা সাধারণত পিতৃলোকে উন্নীত হতে চায়। সেই সমস্ত মানুষেরা বৈদিক নির্দেশ শ্রবণ করার জন্য তাদের দক্ষিণ কর্ণ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু,

যারা তপোলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক অথবা কৃষ্ণলোকে যেতে চায়, তারা সেই সমস্ত লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য, শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

শ্লোক ৫২

আসুরী নাম পশ্চাদ্ দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ ।
গ্রামকং নাম বিষয়ং দুর্মদেন সমন্বিতঃ ॥ ৫২ ॥

আসুরী—আসুরী, **নাম**—নামক; **পশ্চাৎ**—পশ্চিম দিকে, **দ্বাঃ**—দ্বার; **তয়া**—যার দ্বারা; **যাতি**—যেতেন, **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **গ্রামকম্**—গ্রামক, **নাম**—নামক; **বিষয়ম্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের নগরীতে; **দুর্মদেন**—দুর্মদ দ্বারা; **সমন্বিতঃ**—সঙ্গে।

অনুবাদ

পশ্চিম দিকে ছিল আসুরী নামক দ্বার। সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সখা দুর্মদের সঙ্গে গ্রামক নামক নগরীতে যেতেন।

তাৎপর্য

নগরীর পশ্চিম দিকের দ্বারটিকে বলা হয় আসুরী, কারণ তা বিশেষ করে অসুরদের জন্য। অসুর হচ্ছে তারা, যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী, বিশেষ করে যৌন সুখ, যার প্রতি তারা অত্যন্ত আসক্ত। পুরঞ্জন বা জীব তার উপস্থের দ্বারা চরম সুখ উপভোগ করে, তাই সে গ্রামক নামক স্থানে যায়। জড় সুখভোগকে বলা হয় *গ্রাম্য*, এবং যেখানে মানুষ গভীরভাবে যৌন সুখভোগে লিপ্ত হয়, সেই স্থানটিকে বলা হয় গ্রামক। পুরঞ্জন যখন গ্রামক নামক স্থানে যেতেন, তখন তাঁর সঙ্গে থাকত তাঁর বন্ধু দুর্মদ। *বিষয়* বলতে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, দেহের এই চারটি প্রয়োজনকে বোঝায়। *দুর্মদেন* শব্দটি এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়—*দুর্* মানে দুষ্ট, বা 'পাপী' এবং *মদ* মানে 'মত্ততা'। জড় জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জীবকে বলা হয় *মদ* বা উন্মত্ত। বলা হয়েছে—

> *পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় ।*
> *মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥* (*প্রেমবিবর্ত*)

কেউ যখন পিশাচগ্রস্ত হয়, তখন সে উন্মাদ হয়ে যায়। উন্মত্ত অবস্থায় মানুষ আবোল-তাবোল কথা বলে। তাই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়ে লিপ্ত হতে হলে, অত্যন্ত প্রবলভাবে ভবরোগের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়।

আসুরী নাম পশ্চাদ্ দ্বাঃ শব্দগুচ্ছটির আর একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। সূর্যকে প্রথম দেখা যায় পূর্ব দিকে, বঙ্গোপসাগরে—এবং ধীরে ধীরে তা পশ্চিম দিকে গমন করে। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, পশ্চিম দিকের মানুষেরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের ব্যাপারে অধিক আসক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই সম্বন্ধে বলেছেন—পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার (*চৈঃ চঃ আদি* (১০/৮৯)। যতই পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই দেখা যায় যে মানুষেরা পারমার্থিক জীবনের প্রতি উদাসীন। দেখা যায় যে, তারা বৈদিক আদর্শের প্রতিকূল আচরণ করে। সেই কারণে, পাশ্চাত্যের মানুষেরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অধিক আসক্ত। এই *ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, *আসুরী নাম পশ্চাদ্ দ্বাঃ।* অর্থাৎ, পাশ্চাত্যের মানুষেরা আসুরিক সভ্যতার প্রতি আগ্রহী। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পৃথিবীর পশ্চিম ভাগে যেন প্রচারিত হয়, যাতে জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিরা তাঁর শিক্ষার প্রভাবে লাভবান হতে পারে।

শ্লোক ৫৩

নির্ঋতির্নাম পশ্চাদ্ দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ ।
বৈশসং নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমন্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥

নির্ঋতিঃ—নির্ঋতি, **নাম**—নামক; **পশ্চাৎ**—পশ্চিম দিকস্থ; **দ্বাঃ**—দ্বার; **তয়া**—যার দ্বারা, **যাতি**—যেতেন, **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন, **বৈশসম্ নাম**—বৈশস নামক; **বিষয়ম্**—স্থানে, **লুব্ধকেন**—লুব্ধক নামক বন্ধুর দ্বারা; **সমন্বিতঃ**—সঙ্গে।

অনুবাদ

পশ্চিম দিকস্থ আর একটি দ্বারের নাম নির্ঋতি। পুরঞ্জন সেই দ্বার দিয়ে তাঁর সখা লুব্ধকের সঙ্গে বৈশস নামক স্থানে গমন করতেন।

তাৎপর্য

এখানে পায়ু সম্বন্ধে বলা হয়েছে। চক্ষু, মুখ ও নাসিকার বিপরীত দিকে পায়ু অবস্থিত। এই দ্বারটি বিশেষভাবে মৃত্যুর দ্বার। সাধারণত মানুষ যখন তার দেহত্যাগ করে, তখন সে পায়ুর দ্বারা বহির্গত হয়। তাই তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কেউ যখন মলত্যাগ করে, তখনও সে বেদনা অনুভব করে। জীবের যে-সখাটি

এই দ্বার দিয়ে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে থাকে, তার নাম হচ্ছে লুব্ধক, অর্থাৎ, 'লোভ'। লোভের ফলে আমরা অনর্থক আহার করি, এবং এই অত্যাহারের ফলে মলত্যাগ করার সময় বেদনা অনুভব হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, জীব যদি যথাযথভাবে মলত্যাগ করে, তা হলে সে সুস্থ অনুভব করে। এই দ্বার হচ্ছে *নির্ঋতি* বা বেদনাদায়ক দ্বার।

শ্লোক ৫৪

অন্ধাবমীষাং পৌরাণাং নির্বাক্‌পেশস্কৃতাবুভৌ ।
অক্ষণ্বতামধিপতিস্তাভ্যাং যাতি করোতি চ ॥ ৫৪ ॥

অন্ধৌ—অন্ধ; **অমীষাম্**—তাদের মধ্যে; **পৌরাণাম্**—অধিবাসীদের; **নির্বাক্**—নির্বাক নামক; **পেশস্কৃতৌ**—পেশস্কৃৎ নামক; **উভৌ**—তারা উভয়ে; **অক্ষণ্-বতাম্**—যে ব্যক্তিদের চোখ আছে; **অধিপতিঃ** শাসক, **তাভ্যাম্** তাদের দুজনের সঙ্গে, **যাতি**—যেতেন; **করোতি**—করতেন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সেই নগরীর বহু অধিবাসীর মধ্যে নির্বাক্ ও পেশস্কৃৎ নামক দুই ব্যক্তি ছিলেন। যদিও রাজা পুরঞ্জন ছিলেন চক্ষুষ্মান নাগরিকদের শাসক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি এই অন্ধদের সঙ্গ করতেন। তাদের সঙ্গে ইতস্তত বিচরণ করে তিনি নানা প্রকার কার্য করতেন।

তাৎপর্য

এখানে জীবের হাত ও পায়ের কথা বলা হয়েছে। পা দুটি কথা বলে না এবং সেগুলি অন্ধ কেউ যদি কেবল তার পায়ের উপর নির্ভর করে বিচরণ করে, তা হলে কূপের মধ্যে পতিত হতে পারে অথবা পাথরে হোঁচট লাগতে পারে। এইভাবে অন্ধ পায়ের দ্বারা পরিচালিত হলে, মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

কর্মেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে হাত ও পা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি নেই। অর্থাৎ, হাত ও পায়ে কোন ছিদ্র নেই। তাই এখানে হাত ও পাগুলিকে অন্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও জীবের দেহে বহু ছিদ্র রয়েছে, তবুও তাকে হাত ও পায়ের সাহায্যে কাজ করতে হয়। জীব যদিও অন্য বহু ইন্দ্রিয়ের প্রভু, তবু যখন তাকে কোথাও যেতে হয় অথবা কোন কিছু স্পর্শ করতে হয়, তখন তাকে অন্ধ পা ও হস্তকে ব্যবহার করতে হয়।

শ্লোক ৫৫

স যর্হ্যন্তঃপুরগতো বিষূচীনসমন্বিতঃ ।
মোহং প্রসাদং হর্ষং বা যাতি জায়াত্মজোদ্ভবম্ ॥ ৫৫ ॥

সঃ—তিনি; **যর্হি**—যখন; **অন্তঃ-পুর**—অন্তঃপুরে; **গতঃ**—যেতেন; **বিষূচীন**—মনের দ্বারা; **সমন্বিতঃ**—সাথে; **মোহম্**—মোহ; **প্রসাদম্**—সন্তোষ; **হর্ষম্**—হর্ষ; **বা**—অথবা; **যাতি**—উপভোগ করতেন; **জায়া**—পত্নী; **আত্ম-জ**—সন্তান; **উদ্ভবম্**—তাদের থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

কখনও কখনও তিনি বিষূচীন (মন) নামক তাঁর প্রধান ভৃত্যের সাথে তাঁর গৃহের অন্তঃপুরে যেতেন। তখন তাঁর পত্নী ও পুত্রদের প্রভাবে মোহ, সন্তোষ ও হর্ষ উৎপন্ন হত।

তাৎপর্য

বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে, আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বৈদিক ভাষায় বলা হয়েছে, *হৃদ্যয়ম্ আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ*—আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত। জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় কিন্তু আত্মা সত্ত্ব, রজ ও তম—এই জড় গুণগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই তিনটি গুণের প্রতিক্রিয়া হয়। যেমন কেউ যখন সত্ত্বগুণে থাকেন, তখন তিনি সুখ অনুভব করেন, কেউ যখন রজোগুণে থাকেন, তখন তিনি জড় সুখভোগের মাধ্যমে প্রসন্নতা অনুভব করেন, এবং কেউ যখন তমোগুণে থাকেন, তখন তিনি মোহাচ্ছন্ন হন। এই সমস্ত মনের কার্যকলাপ, এবং সেগুলি চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার স্তরে কার্য করে।

জীব যখন স্ত্রী, পুত্র ও কলত্রাদির দ্বারা পরিবৃত থাকে, তখন সে মানসিক স্তরে কার্য করে। কখনও সে অত্যন্ত সুখী হয়, কখনও সে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়, কখনও সে অপ্রসন্ন হয়, এবং কখনও সে মোহাচ্ছন্ন হয়। সমাজ, মৈত্রী ও প্রেমের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব মনে করে যে, তার সেই তথাকথিত সমাজ, মৈত্রী, প্রেম, জাতীয়তাবাদ, গোষ্ঠী, ইত্যাদি তাকে রক্ষা করবে। সে জানে না যে, তার মৃত্যুর পর সে অত্যন্ত প্রবল জড়া প্রকৃতির হস্তে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তার বর্তমান কর্ম অনুসারে তাকে একটি বিশেষ শরীর ধারণ করতে প্রকৃতি তাকে বাধ্য করবে। সেই শরীরটি মানুষের শরীর নাও হতে পারে। অতএব সমাজ, স্ত্রীপুত্র ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে জীবের এই যে নিরাপত্তার অনুভূতি, তা মোহ ছাড়া আর কিছু

নয়। বিভিন্ন প্রকার জড় শরীরে অবরুদ্ধ সমস্ত জীব জড় সুখভোগের জন্য তাদের বর্তমান কার্যকলাপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন। তারা তাদের আসল উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গেছে, যা হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

যারা কৃষ্ণভক্ত নয়, তারা সকলেই মোহাচ্ছন্ন বলে বুঝতে হবে। জড় বস্তুর মাধ্যমে তথাকথিত সুখ ও তৃপ্তির অনুভূতিকেও মোহ বলে বুঝতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজ, বন্ধুত্ব, প্রেম অথবা অন্য কোন কিছুই মানুষকে ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতির জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে একটি জীবকেও উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"ত্রিগুণাত্মিকা আমার দৈবী মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত, তারা অনায়াসে তা অতিক্রম করতে পারে।" অতএব সম্পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত না হলে, জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ৫৬

এবং কর্মসু সংসক্তঃ কামাত্মা বঞ্চিতোঽবুধঃ ।
মহিষী যদ্যদীহেত তত্তদেবান্ববর্তত ॥ ৫৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **সংসক্তঃ**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **কাম-আত্মা**—কামুক; **বঞ্চিতঃ**—প্রতারিত; **অবুধঃ**—নির্বোধ; **মহিষী**—রাণী; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **ঈহেত**—তিনি কামনা করতেন; **তৎ তৎ**—সেই সবই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্ববর্তত**—তিনি অনুকরণ করতেন।

অনুবাদ

এইভাবে বিভিন্ন প্রকার মানসিক জল্পনা-কল্পনা এবং সকাম কর্মে আসক্ত হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি তাঁর মহিষীর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতেন।

তাৎপর্য

জীব যখন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন সে তার পত্নী বা জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। তখন তাকে ঠিক তার নির্দেশ অনুসারে আচরণ করতে হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, জাগতিক সুখের জন্য পত্নীকে গয়নাগাটি দিয়ে এবং তার কথামতো আচরণ করে, সর্বদা তাকে সুখী রাখা কর্তব্য। তা হলে আর পারিবারিক জীবনে কোন রকম অসুবিধা থাকবে না তাই নিজের লাভের জন্য স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখার উপদেশ দেওয়া হয়েছে এইভাবে কেউ যখন তার পত্নীর ভৃত্যে পরিণত হয়, তখন তাকে তার পত্নীর ইচ্ছা অনুসারে কার্য করতে হয় তার ফলে মানুষ জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। বাংলায় একটি প্রবাদ রয়েছে যে, "কেউ যখন তার পত্নীর বিশ্বস্ত সেবকে পরিণত হয়, তখন তার মানসম্মান ধূলিসাৎ হয়।" কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে, পত্নীর আজ্ঞাকারী দাস না হলে, পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দেয় পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এই অশান্তির ফলে, বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন হয়েছে, এবং ভারতবর্ষের মতো আদি প্রাচ্যের দেশগুলিতেও স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যাচ্ছে সম্প্রতি ভারতবর্ষেও বিবাহ বিচ্ছেদের আইন প্রচলিত হওয়ার ফলে, সেই অশান্তিটি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার মাধ্যমে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে মন কাজ করছে, এবং পত্নীর বশীভূত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড় বুদ্ধির বশীভূত হওয়া এইভাবে মানুষ তার পত্নীর মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে এবং মানসিক জল্পনা কল্পনার বশীভূত হয়ে, নানা প্রকার কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়

শ্লোক ৫৭-৬১

ক্বচিৎপিবন্ত্যাং পিবতি মদিরাং মদবিহ্বলঃ ।
অশ্নন্ত্যাং ক্বচিদশ্নাতি জক্ষত্যাং সহ জক্ষিতি ॥ ৫৭ ॥
ক্বচিদ্গায়তি গায়ন্ত্যাং রুদত্যাং রুদতি ক্বচিৎ ।
ক্বচিদ্ধসন্ত্যাং হসতি জল্পন্ত্যামনু জল্পতি ॥ ৫৮ ॥
ক্বচিদ্ধাবতি ধাবন্ত্যাং তিষ্ঠন্ত্যামনু তিষ্ঠতি ।
অনু শেতে শয়ানায়ামন্বাস্তে ক্বচিদাসতীম্ ॥ ৫৯ ॥
ক্বচিচ্ছৃণোতি শৃণ্বন্ত্যাং পশ্যন্ত্যামনু পশ্যতি ।
ক্বচিজ্জিঘ্রতি জিঘ্রন্ত্যাং স্পৃশন্ত্যাং স্পৃশতি ক্বচিৎ ॥ ৬০ ॥

ক্বচিচ্চ শোচতীং জায়ামনুশোচতি দীনবৎ ।
অনু হৃষ্যতি হৃষ্যন্ত্যাং মুদিতামনু মোদতে ॥ ৬১ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **পিবন্ত্যাম্**—পান করার সময়; **পিবতি**—তিনি পান করতেন; **মদিরাম্**—মদিরা; **মদ-বিহ্বলঃ**—নেশাচ্ছন্ন হয়ে; **অশ্নন্ত্যাম্**—তিনি যখন আহার করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অশ্নাতি**—তিনি আহার করতেন; **জক্ষত্যাম্**—তিনি যখন চর্বণ করতেন; **সহ**—তাঁর সঙ্গে; **জক্ষিতি**—তিনি চর্বণ করতেন, **ক্বচিৎ** কখনও কখনও; **গায়তি**—তিনি গান করতেন; **গায়ন্ত্যাম্**—তাঁর পত্নী যখন গান করতেন; **রুদত্যাম্**—তাঁর পত্নী যখন ক্রন্দন করতেন; **রুদতি**—তিনিও কাঁদতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও, **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও, **হসন্ত্যাম্**—তিনি যখন হাসতেন; **হসতি**—তিনিও হাসতেন, **জল্পন্ত্যাম্**—তিনি যখন গল্প করতেন, **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **জল্পতি**—তিনিও প্রজল্প করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **ধাবতি**—তিনিও গমন করতেন, **ধাবন্ত্যাম্**—যখন তিনি গমন করতেন, **তিষ্ঠন্ত্যাম্**—তিনি যখন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতেন, **অনু** তাঁকে অনুসরণ করে, **তিষ্ঠতি** তিনি দাঁড়াতেন; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **শেতে**—তিনি শয়ন করতেন; **শয়ানায়াম্**—তিনি যখন বিছানায় শয়ন করতেন; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **আস্তে**—তিনি উপবেশন করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **আসতীম্**—তিনি যখন উপবেশন করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও, **শৃণোতি**—তিনি শ্রবণ করতেন; **শৃণ্বত্যাম্**—তিনি যখন শ্রবণ করতেন; **পশ্যন্ত্যাম্**—তিনি যখন কোন কিছু দেখতেন; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **পশ্যতি**—তিনিও দেখতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **জিঘ্রতি**—তিনি ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন, **জিঘ্রন্ত্যাম্**—যখন তাঁর পত্নী ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন, **স্পৃশন্ত্যাম্**—তাঁর পত্নী যখন স্পর্শ করতেন, **স্পৃশতি**—তিনিও স্পর্শ করতেন, **ক্বচিৎ**—সেই সময়, **ক্বচিৎ চ**—কোন সময়ও; **শোচতীম্**—তিনি যখন অনুশোচনা করতেন; **জায়াম্**—তাঁর পত্নী; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **শোচতি**—তিনিও শোক করতেন; **দীন-বৎ**—অনাথের মতো, **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে, **হৃষ্যতি** তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন; **হৃষ্যন্ত্যাম্**—তিনি যখন আনন্দিত হতেন; **মুদিতাম্** তিনি যখন প্রসন্ন হতেন; **অনু**—তাঁকে অনুসরণ করে; **মোদতে**—তিনি সন্তুষ্ট হতেন।

অনুবাদ

রাণী যখন মদিরা পান করতেন, তখন রাজা পুরঞ্জনও তাঁর সঙ্গে মদিরা পান করতেন। রাণী যখন আহার করতেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে আহার করতেন,

এবং রাণী যখন চর্বণ করতেন, তখন রাজা পুরঞ্জনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চর্বণ করতেন। রাণী যখন গান করতেন, তখন তিনিও গান করতেন। তেমনই, রাণী যখন ক্রন্দন করতেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে কাঁদতেন, এবং রাণী যখন হাসতেন, তখন তিনিও হাসতেন। রাণী যখন প্রজল্প করতেন, তখন তিনিও প্রজল্প করতেন, এবং রাণী যখন গমন করতেন, তখন রাজাও তাঁর পিছনে পিছনে গমন করতেন। রাণী যখন দাঁড়াতেন, তখন রাজাও দাঁড়াতেন, এবং রাণী যখন শয্যায় শয়ন করতেন, তখন তিনিও তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে শয়ন করতেন। রাণী যখন বসতেন, তখন তিনিও বসতেন, এবং রাণী যখন কোন কিছু শ্রবণ করতেন, তখন তিনিও তাঁকে অনুসরণ করে তা-ই শ্রবণ করতেন। রাণী যখন কোন কিছু দেখতেন, তখন রাজাও তা দেখতেন, এবং রাণী যখন কোনও কিছুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন, তখন রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে সেই বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন। রাণী যখন কোন কিছু স্পর্শ করতেন, তখন রাজাও তা স্পর্শ করতেন এবং প্রিয়তমা রাণী যখন শোক করতেন, তখন বেচারি রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে অনাথের মতো শোক করতেন। তেমনই রাণী যখন আনন্দিত হতেন, তখন তিনিও আনন্দিত হতেন, এবং রাণী সন্তুষ্ট হলে, রাজাও সন্তোষ অনুভব করতেন।

তাৎপর্য

মন হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে আত্মা অবস্থিত, এবং মন পরিচালিত হয় বুদ্ধির দ্বারা জীবাত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়ে, বুদ্ধিকে অনুসরণ করে। বুদ্ধিকে এখানে রাণীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং আত্মা মনের নিয়ন্ত্রণাধীনে জড় বুদ্ধিকে অনুসরণ করে, ঠিক যেভাবে রাজা তাঁর পত্নীকে অনুসরণ করেন। তার অর্থ হচ্ছে জড় বুদ্ধিই জীবের বন্ধনের কারণ। তাই এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

মহারাজ অম্বরীষের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, সেই মহান রাজা সর্বপ্রথমে তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত করেছিলেন তার ফলে তাঁর বুদ্ধি নির্মল হয়েছিল। মহারাজ অম্বরীষ তাঁর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছিলেন। তাঁর চক্ষুকে তিনি মন্দিরে সুন্দরভাবে ফুলের দ্বারা সজ্জিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে যুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত ফুল ও তুলসীর সৌরভ আঘ্রাণে যুক্ত করেছিলেন, এবং তিনি তাঁর পা দুটিকে ভগবানের মন্দিরে গমন করার কার্যে যুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর হাত দুটিকে ভগবানের মন্দির মার্জন করার কাজে যুক্ত করেছিলেন, এবং

তিনি তাঁর কর্ণদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করার কার্যে যুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর জিহ্বাকে দুভাবে যুক্ত করেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের কথা বলার ব্যাপারে এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত প্রসাদ আস্বাদনের ব্যাপারে। সম্পূর্ণরূপে জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা এই সমস্ত কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারে না। এইভাবে তারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। সেই তত্ত্বের সারমর্ম পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে

শ্লোক ৬২

বিপ্রলব্ধো মহিষ্যৈবং সর্বপ্রকৃতিবঞ্চিতঃ ।
নেচ্ছন্নমনুকরোত্যজ্ঞঃ ক্লৈব্যাৎক্রীড়ামৃগো যথা ॥ ৬২ ॥

বিপ্রলব্ধঃ—বন্দি; **মহিষ্যা**—মহিষীর দ্বারা; **এবম্** এইভাবে, **সর্ব**—সমস্ত; **প্রকৃতি**—অস্তিত্ব; **বঞ্চিতঃ**—প্রতারিত হয়ে; **ন ইচ্ছন্**—বাসনা না করে; **অনুকরোতি**—অনুকরণ করতেন; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ রাজা; **ক্লৈব্যাৎ**—বলপূর্বক; **ক্রীড়া-মৃগঃ**—পোষা জন্তু; **যথা**—ঠিক যেমন

অনুবাদ

এইভাবে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সুন্দরী পত্নীর দ্বারা বন্দি হয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, এই জড় জগতে তিনি সর্বতোভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। সেই মূর্খ রাজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পত্নীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি পোষা জন্তু তার প্রভুর ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিপ্রলব্ধঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *বি* মানে 'বিশেষভাবে', এবং *প্রলব্ধ* মানে 'প্রাপ্ত হয়েছিলেন'। রাজা তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য রাণীকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি জড় জগতের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। না চাইলেও তিনি জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পোষা জন্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। একটি পোষা বানর যেমন তার প্রভুর ইচ্ছানুসারে নাচে, রাজাও ঠিক তেমন তাঁর রাণীর ইচ্ছানুসারে নাচতেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/২) বলা হয়েছে, *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ*—কেউ যদি ভগবদ্ভক্ত সাধুর সঙ্গ করে, তা হলে তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হয় কিন্তু কেউ যদি স্ত্রীসঙ্গ করে অথবা রমণীদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ করে, তা হলে তার বন্ধনের পথ প্রশস্ত হয়।

মোট কথা হচ্ছে যে, পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা উচিত। সেটিই হচ্ছে সন্ন্যাস-আশ্রমের তাৎপর্য। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পূর্বে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করার অভ্যাস করতে হয়। যৌন জীবন, তা সে বৈধই হোক বা অবৈধই হোক, পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে, মানুষ জড়-জাগতিক বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে, কামবাসনা অথবা স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করার একটি সুযোগ পাওয়া যায়। তা যদি করা যায়, তা হলে অনায়াসে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিসাধন করা যায়।

মানুষ যে কিভাবে তার প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গ প্রভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেই কথা নারদ মুনি এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন। নিজের পত্নীর প্রতি আকর্ষণের অর্থ হচ্ছে জড-জাগতিক গুণের প্রতি আকর্ষণ। যারা তমোগুণের দ্বারা আকৃষ্ট, তারা জীবনের সর্ব নিম্ন স্তরে রয়েছে, আর যারা সত্ত্বগুণের দ্বারা আকৃষ্ট, তারা উন্নততর স্থিতিতে রয়েছে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা জ্ঞানের অনুশীলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটি অবশ্যই উন্নততর স্থিতি, কারণ জ্ঞান মানুষকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে। জ্ঞানের স্তর বা *ব্রহ্মভূত* স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত, ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতিসাধন করা যায় না। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে ব্রহ্মভূত স্তরে বা আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরে স্থিত হয়েছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং তার ফলে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন। তিনি কখনও কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী। সেই অবস্থায় তিনি আমার প্রতি শুদ্ধভক্তি লাভ করেন।"

জ্ঞানের স্তর শুভ কারণ তার ফলে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু, কেউ যদি সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে পৃথক প্রয়াস ব্যতীতই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আমাদের জড় অস্তিত্বের প্রকৃত জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। যথেষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তথাকথিত সমাজ, পরিবার, প্রেম এবং অন্যান্য সব কিছুর প্রতি বিরক্ত হন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সমাজ, পরিবার ও জড় জাগতিক প্রেমের প্রতি আসক্ত থাকি, ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের কোন প্রশ্নই ওঠে না; ভগবদ্ভক্তিরও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার ফলে, হৃদয় জ্ঞান ও বৈরাগ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে মানুষের জীবন সার্থক হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষড়বিংশতি অধ্যায়

পুরঞ্জনের মৃগয়ায় গমন এবং তাঁর মহিষীর ক্রোধ

শ্লোক ১-৩

নারদ উবাচ

স একদা মহেষ্বাসো রথং পঞ্চাশ্বমাশুগম্ ।
দ্বীষং দ্বিচক্রমেকাক্ষং ত্রিবেণুং পঞ্চবন্ধুরম্ ॥ ১ ॥
একরশ্ম্যেকদমনমেকনীড়ং দ্বিকূবরম্ ।
পঞ্চপ্রহরণং সপ্তবরূথং পঞ্চবিক্রমম্ ॥ ২ ॥
হৈমোপস্করমারুহ্য স্বর্ণবর্মাক্ষয়েষুধিঃ ।
একাদশচমূনাথঃ পঞ্চপ্রস্থমগাদ্বনম্ ॥ ৩ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন, **সঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **একদা**—এক সময়; **মহা-ইষ্বাসঃ**—তাঁর বিশাল ধনুক ও বাণ নিয়ে, **রথম্**—রথ; **পঞ্চ-অশ্বম্**—পাঁচটি ঘোড়া, **আশু-গম্**—অত্যন্ত দ্রুতগামী; **দ্বি-ঈষম্**—দুটি বাণ; **দ্বি-চক্রম্**—দুটি চক্র; **এক**—একটি, **অক্ষম্**—অক্ষ, **ত্রি**—তিন; **বেণুম্**—ধ্বজদণ্ড, **পঞ্চ**—পাঁচ; **বন্ধুরম্**—বন্ধন; **এক**—এক, **রশ্মি**—রজ্জু, লাগাম **এক**—এক; **দমনম্**—সারথি; **এক**—এক; **নীড়ম্**—উপবেশনের স্থান; **দ্বি**—দুই, **কূবরম্**—জোয়াল বাঁধার স্থান; **পঞ্চ**—পাঁচ; **প্রহরণম্**—অস্ত্র; **সপ্ত**—সাত; **বরূথম্**—আবরণ বা শরীরের সপ্ত ধাতু, **পঞ্চ**—পাঁচ; **বিক্রমম্**—পন্থা, **হৈম**—স্বর্ণনির্মিত, **উপস্করম্**—অলঙ্কার ; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **স্বর্ণ**—স্বর্ণনির্মিত; **বর্ম**—বর্ম; **অক্ষয়**—অক্ষয়; **ইষু-ধিঃ**—তূণীর, **একাদশ**—একাদশ; **চমূনাথ**—সেনাপতি; **পঞ্চ**—পাঁচ; **প্রস্থম্**—লক্ষ্য; **অগাৎ**—গমন করেছিলেন, **বনম্**—বনে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্! এক সময় পুরঞ্জন তাঁর মহৎ ধনুক ও অক্ষয় তূণীর গ্রহণ করে এবং স্বর্ণনির্মিত বর্মে সজ্জিত হয়ে, একাদশ সেনাপতি সহ পাঁচটি দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে গমন করেছিলেন। সেই রথে তিনি দুটি বিস্ফোরক বাণ তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই রথটির দুটি চক্র এবং একটি ঘূর্ণায়মান অক্ষ ছিল। সেই রথে তিনটি পতাকা, একটি রজ্জু, একজন সারথি, একটি উপবেশন স্থান, জোয়াল লাগানোর দুটি দণ্ড, পাঁচটি অস্ত্র এবং সাতটি আবরণ ছিল। সেই রথের গতি পঞ্চবিধ, এবং তার সম্মুখে পাঁচটি বাধা ছিল। সেই রথের সমস্ত সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ স্বর্ণনির্মিত ছিল।

তাৎপর্য

এই তিনটি শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, জীবের জড় দেহটি কিভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেহটি হচ্ছে রথ, এবং জীবাত্মা সেই রথের রথী। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) বলা হয়েছে—*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে।* দেহের যিনি মালিক তাঁকে বলা হয় দেহী, এবং তিনি দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে অবস্থিত। জীবের দেহরূপ সেই রথটি পরিচালিত হয় একজন সারথির দ্বারা. সেই রথটি তিনটি গুণের দ্বারা নির্মিত, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলা হয়েছে—*যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*। যন্ত্র শব্দটির অর্থ 'শকট' এই যন্ত্র বা দেহটি জড়া প্রকৃতি প্রদান করেছে, এবং সেই রথের সারথি হচ্ছেন পরমাত্মা। সেই রথের রথী হচ্ছে জীবাত্মা। এটিই হচ্ছে বাস্তবিক অবস্থা।

জীব সর্বদাই সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে *ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ*—জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত এই তিনটি গুণকে এই শ্লোকে তিনটি পতাকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পতাকার মাধ্যমে বোঝা যায় রথের মালিক কে; তেমনই প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে সহজেই বোঝা যায় কোন্দিকে সেই রথটি চলছে। অর্থাৎ, যাঁর চোখ আছে তিনি বুঝতে পারেন, প্রকৃতির কোন বিশেষ গুণের দ্বারা এই শরীর কোন্দিকে চলেছে। এই তিনটি শ্লোকে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ ধার্মিক হতে চাইলেও কিভাবে তার দেহ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, রাজা যদিও আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন, তবুও তিনি কিভাবে তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিলেন।

কর্মকাণ্ড অনুসারে মানুষ বেদবিহিত বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, এবং সেই সমস্ত যজ্ঞে পশুবলির নির্দেশ রয়েছে। যদিও যজ্ঞে পশুবলির উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদিক মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করা, তবুও পশুবলি অবশ্যই তামসিক আচার। কেবল বৈদিক শাস্ত্রেই নয়, আধুনিক অন্য সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেও পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধর্মের নামে এই সমস্ত পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তামসিক মানুষদের জন্যই এই পশুবলির নির্দেশ। এই সমস্ত মানুষেরা যখন পশুবলি দেয়, তখন তারা অন্তত ধর্মের নামে তা করে। কিন্তু, জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত যে ধর্ম, যেমন বৈষ্ণব ধর্ম, সেখানে পশুবলির কোন অবকাশ নেই। এই প্রকার গুণাতীত ধর্মের কথা শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় করো না।" যেহেতু মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন যাতে পশুবধ হচ্ছিল, তাই নারদ মুনি তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, এই প্রকার যজ্ঞ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/১/২) শুরুতেই বলা হয়েছে—*প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র।* যে সমস্ত ধর্মে প্রতারণা রয়েছে, সেই সমস্ত ধর্ম *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেই ধর্মে ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেই ভগবদ্ধর্মে পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ —সমবেতভাবে এই মহামন্ত্র কীর্তনে পশুবলির কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এই তিনটি শ্লোকে, মৃগয়ার উদ্দেশ্যে রাজা পুরঞ্জনের বনগমন তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টার প্রতীক। জড় দেহটি স্বয়ং ইঙ্গিত করে যে, জীব প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জাগতিক বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেহটি যখন তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন ভবরোগ অত্যন্ত প্রবল হয়। যখন তা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখনও তার রোগটি বেশ কঠিন। কিন্তু, দেহ যখন সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন ভবরোগের উপশম হয়। শাস্ত্রে যে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই - গুণের স্তরে, কিন্তু যেহেতু এই জড় জগতে সত্ত্বগুণও কখনও

কখনও রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত হয়, তাই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষেরাও কখনও কখনও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাজা পুরঞ্জন এক সময় বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। তা জীবের তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকে ইঙ্গিত করছে। রাজা পুরঞ্জন যেই বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন, তার নাম হচ্ছে *পঞ্চপ্রস্থ*। এই বনটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়কে ইঙ্গিত করে। দেহে হস্ত, পদ, উদর, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। এই সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে দেহ জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করে। রথটি পাঁচটি অশ্বের দ্বারা চালিত, সেগুলি হচ্ছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অতি সহজেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অশ্বগুলি অত্যন্ত দ্রুতগামী। রথে রাজা পুরঞ্জন দুটি বিস্ফোরক অস্ত্র রেখেছেন, সেগুলি হচ্ছে *অহঙ্কার* অর্থাৎ 'আমি এই শরীর', এবং *মমতা* অর্থাৎ 'এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার'।

রথের দুটি চাকা হচ্ছে পাপ ও পুণ্য। রথটি তিনটি পতাকার দ্বারা সজ্জিত, যেগুলি প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতীক। পাঁচ প্রকার প্রতিবন্ধক হচ্ছে দেহাভ্যন্তরের পাঁচটি বায়ুর প্রতীক। সেগুলি হচ্ছে—প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান। দেহটি সপ্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। সেই সাতটি আবরণ হচ্ছে—চর্ম, মাংস, মেদ, মজ্জা, রক্ত, অস্থি ও শুক্র। জীব তিনটি সূক্ষ্ম জড় উপাদান এবং পাঁচটি স্থূল জড় উপাদানের দ্বারা আবৃত। এগুলি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথে জীবের প্রতিবন্ধক।

এই শ্লোকে *রশ্মি* ('রজ্জু') শব্দটি মনকে ইঙ্গিত করে। *নীড়* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ *নীড়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পাখির বাসা। এখানে *নীড়* হচ্ছে হৃদয়, যেখানে জীবাত্মা অবস্থিত। জীবাত্মা কেবল এক স্থানে বসে থাকে। তার বন্ধনের কারণ দুটি—শোক ও মোহ। এই জড় জগতে জীব সর্বদা সেই বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে, যা সে কখনই পেতে পারে না। তাই তা হচ্ছে মোহ। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকার ফলে, জীব সর্বদা শোক করে। তাই শোক ও মোহকে এখানে *দ্বিকূবর* বা বন্ধনের দুটি দণ্ড বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

জীব পাঁচটি বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা তার বিবিধ বাসনা চরিতার্থ করে, যেগুলি হচ্ছে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। স্বর্ণ অলঙ্কার ও শয্যা হচ্ছে জীবের রজো গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রতীক। যার কাছে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে, সে বিশেষভাবে রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ এই

জড় জগতে কত কিছু ভোগ বাসনা করে। এগারজন সেনাপতি হচ্ছে দশটি ইন্দ্রিয় ও মন। মন সর্বদা দশজন সেনাপতির সঙ্গে পরিকল্পনা করে, কিভাবে জড় জগৎকে উপভোগ করা যায়। পঞ্চপ্রস্থ নামক যে বনে রাজা মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন, তা হচ্ছে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ—ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়ের বন। এইভাবে এই তিনটি শ্লোকে নারদ মুনি জড় দেহ এবং তার মধ্যে জীবের বদ্ধ অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪

চচার মৃগয়াং তত্র দৃপ্ত আত্তেষুকার্মুকঃ ।
বিহায় জায়ামতদর্হাং মৃগব্যসনলালসঃ ॥ ৪ ॥

চচার—সম্পাদন করেছিলেন; **মৃগয়াম্**—শিকারে, **তত্র**—সেখানে; **দৃপ্তঃ**—গর্বিত হয়ে; **আত্ত**—গ্রহণ করে **ইষু** -বাণ, **কার্মুকঃ**—ধনুক; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **জায়াম্**—তাঁর পত্নীকে; **অ-তৎ-অর্হাম্**—যদিও অসম্ভব; **মৃগ**—শিকারে; **ব্যসন**—পাপকর্ম, **লালসঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে।

অনুবাদ

যদিও রাজা পুরঞ্জনের পক্ষে এক পলকের জন্যও তাঁর মহিষীর সঙ্গ ত্যাগ করা অসম্ভব ছিল, তবুও, মৃগয়া করার বাসনায় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি মহাগর্বে তাঁর ধনুক ও বাণ গ্রহণ করে, তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা না করে বনে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এক প্রকার শিকার হচ্ছে স্ত্রী-শিকার। বদ্ধ জীব কখনই এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট হয় না যাদের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত অসংযত, বিশেষ করে তারা বহু স্ত্রী শিকার করার চেষ্টা করে। রাজা পুরঞ্জন যে তাঁর ধর্মপত্নীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন, তা বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য বহু রমণী-শিকার করার চেষ্টার প্রতীক। রাজা যেখানেই যান না কেন, সব সময় তাঁর মহিষীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু রাজা বা বদ্ধ জীব যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তখন আর তার ধর্মনীতির কথা মনে থাকে না। পক্ষান্তরে সে তখন মহাগর্বে আসক্তি ও বিরক্তিরূপ ধনুক ও বাণ গ্রহণ করে। আমাদের চেতনা সর্বদাই এই দুইভাবে কাজ করছে—ঠিকভাবে এবং ভুলভাবে। মানুষ যখন

রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার মর্যাদার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়, তখন সে ঠিক পথ পরিত্যাগ করে ভুল পথ গ্রহণ করে। ক্ষত্রিয় রাজাদের কখনও কখনও বনে গিয়ে হিংস্র পশুদের বধ করার উপদেশ দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা কিভাবে বধ করতে হয় তা শিখতে পারেন। তার উদ্দেশ্য কখনই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন নয়। পশুমাংস আহার করার জন্য পশুহত্যা করা মানুষদের জন্য নিষিদ্ধ।

শ্লোক ৫

আসুরীং বৃত্তিমাশ্রিত্য ঘোরাত্মা নিরনুগ্রহঃ ।
ন্যহনন্নিশিতৈর্বাণৈর্বনেষু বনগোচরান্ ॥ ৫ ॥

আসুরীম্—আসুরিক; **বৃত্তিম্**—বৃত্তি; **আশ্রিত্য**—অবলম্বন করে; **ঘোর**—ভয়ঙ্কর, **আত্মা**—চেতনা, হৃদয়, **নিরনুগ্রহঃ**—নির্দয়; **ন্যহনৎ**—হত্যা করেছিলেন, **নিশিতৈঃ**—তীক্ষ্ণ; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা, **বনেষু**—বনে; **বন-গোচরান্**—বন্য পশুদের।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তখন আসুরিক বৃত্তির দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কঠিন ও নির্দয় হয়ে উঠেছিল, এবং তিনি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা নির্বিচারে বনের বহু নিরীহ পশু বধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষ যখন তার পদগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়, তখন সে রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, অসংযতভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টা করে। মানুষের এই প্রবৃত্তিকে এখানে আসুরিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ যখন আসুরিক ভাবাপন্ন হয়, তখন নিরীহ পশুদের প্রতি তার কোন রকম দয়া থাকে না। তার ফলে তারা পশুহত্যা করার জন্য বিভিন্ন কসাইখানা খোলে। তাকে বলা হয় *সূনা* বা *হিংসা*, অর্থাৎ জীব হত্যা। কলিযুগে রজ ও তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, সমস্ত মানুষেরাই আসুরিক হয়ে গেছে; তাই পশুমাংস আহার তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন প্রকার কসাইখানা খুলেছে।

এই কলিযুগে দয়ার বৃত্তি প্রায় লোপ পেয়েছে। তার ফলে মানুষে-মানুষে এবং রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে। মানুষেরা বোঝে না যে, যেহেতু তারা অবাধে

পশুহত্যা করছে, তাই তারাও মহাযুদ্ধে পশুর মতো বলি হবে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে কসাইখানায় অবাধে পশুহত্যা হচ্ছে, এবং তার ফলে প্রতি পাঁচ-দশ বছর অন্তর মহাযুদ্ধ হয়, যাতে অসংখ্য মানুষ পশুর থেকেও নিষ্ঠুরভাবে বধ হয়। কখনও কখনও যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা তাদের শত্রুদের বন্দিশিবিরে রাখে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করে। এটি হচ্ছে কসাইখানায় অথবা জঙ্গলে অবাধে পশুহত্যা করার প্রতিক্রিয়া গর্বান্ধ ও আসুরিক মানুষেরা প্রকৃতির নিয়ম অথবা ভগবানের আইন জানে না। তাই তারা কোন রকম বিবেচনা না করে, অবাধে নিরীহ পশুদের হত্যা করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে পশুহত্যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এই আন্দোলনে সদস্যদের চারটি নিয়ম পালন করার প্রতিজ্ঞা করতে হয়; সেগুলি হচ্ছে —পশুহত্যা বর্জন, সব রকম নেশা বর্জন, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন এবং জুয়া পাশা ইত্যাদি খেলা বর্জন। এই চারটি নিয়ম পালন না করলে, এই সংস্থার সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় না কলিযুগের মানুষদের পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন

শ্লোক ৬

তীর্থেষু প্রতিদৃষ্টেষু রাজা মেধ্যান্ পশূন্ বনে ।
যাবদর্থমলং লুব্ধো হন্যাদিতি নিয়ম্যতে ॥ ৬ ॥

তীর্থেষু—তীর্থস্থানে; **প্রতিদৃষ্টেষু**—বেদের নির্দেশ অনুসারে; **রাজা**—রাজা; **মেধ্যান্**—বলি দেওয়ার যোগ্য; **পশূন্**—পশুদের; **বনে**—বনে; **যাবৎ**—যতখানি; **অর্থম্**—প্রয়োজন, **অলম্**—তার থেকে অধিক নয়, **লুব্ধঃ** লোভবশত; **হন্যাৎ**—হত্যা করতে পারে; **ইতি**—এইভাবে; **নিয়ম্যতে**—নিয়ন্ত্রিত।

অনুবাদ

রাজা যদি মাংস আহারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, তা হলে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে বনে গিয়ে, কেবল বধ্য পশুদের হত্যা করতে পারেন। অনর্থক ও অবাধে পশুহত্যা কখনই অনুমোদিত হয়নি। রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মূর্খ মানুষেরা যাতে অসংযতভাবে অবাধে পশুহত্যা না করে, সেই জন্যই বেদে পশুবধের সুনিয়ন্ত্রিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-সাধনের ব্যাপারে কেন জীবকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় রাজা যদি হত্যা করার কৌশল শিক্ষা লাভের জন্য বনে গিয়ে পশুহত্যা করতে পারে, তা হলে ইন্দ্রিয়-সমন্বিত জীবদের কেন অবাধে ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে দেওয়া হবে না? আজকাল তথাকথিত সমস্ত স্বামী ও যোগীরাও প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করছে যে, যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয় রয়েছে, তাই ইন্দ্রিয় সুখভোগের মাধ্যমে সেগুলির তৃপ্তিসাধন করতে হবে। এই সমস্ত মূর্খ স্বামী ও যোগীরা কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত নয়। কখনও কখনও এই সমস্ত মূর্খেরা শাস্ত্রের বিরোধিতা পর্যন্ত করে তারা প্রকাশ্যভাবে জনসাধারণের কাছে ঘোষণাও করে যে, শাস্ত্রগ্রন্থের কোন আবশ্যকতা নেই। তারা বলে, "তোমরা আমার কাছে এসো, এবং আমি তোমাদের স্পর্শ করলেই, তোমরা তৎক্ষণাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করবে।"

যেহেতু আসুরিক ব্যক্তিরা প্রতারিত হতে চায়, তাই তাদের প্রতারণা করার জন্য বহু প্রতারক এসেছে। এই কলিযুগের বর্তমান সময়ে, সমগ্র মানব সমাজ প্রতারক ও প্রতারিতের সমাজে পরিণত হয়েছে। সেই জন্য বৈদিক শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় সুখভোগের যথাযথ পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে এই যুগে সকলেই প্রায় মাছ-মাংস খেতে চায়, মদ্যপান করতে চায় এবং মৈথুনসুখ উপভোগ করতে চায়, তাই বৈদিক শাস্ত্রে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীসঙ্গ করার, মা কালীর কাছে যথাযথভাবে বলি দেওয়ার মাধ্যমে পশুমাংস আহার করার এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আসবপান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই শ্লোকে *নিয়মাত্তে* শব্দটি সেই কথাই ইঙ্গিত করে পশু হত্যা, আসবপান ও স্ত্রীসঙ্গ—সুনিয়ন্ত্রিতভাবে করা উচিত।

নিয়ম মানুষের জন্য, পশুদের জন্য নয়। রাস্তায় পরিবহণের নিয়ম মানুষদের বলে দেয়, রাস্তার ডান দিকে অথবা বাঁ দিকে থাকতে। এই নিয়ম কেবল মানুষদের জন্য, তা পশুদের জন্য নয়। কোন পশু যদি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তা হলে তাকে কখনও দণ্ড দেওয়া হয় না, কিন্তু কোন মানুষ যদি তা করে, তা হলে তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। *বেদ* পশুদের জন্য নয়, মানুষদের উপলব্ধির জন্য। কোন মানুষ যদি কোন রকম বিচার-বিবেচনা না করে *বেদের* বিধি-নিষেধগুলি লঙ্ঘন করে, তা হলে যথাসময় তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। তাই কাম-বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ইন্দ্রিয় সুখভোগ করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে বেদের নির্দেশ অনুসারে নিজেকে সংযত করা উচিত। রাজাকে যে বনে গিয়ে পশুহত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য নয়। হত্যা করার কলা নিয়ে আমরা কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি না। রাজা যদি চোর ও বদমাশদের

সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ভয় পায়, এবং ঘরে বসে আরামে নিরীহ পশুদের হত্যা করে তাদের মাংস আহার করে, তা হলে সে অবশ্যই তার পদ থেকে বিচ্যুত হবে যেহেতু এই যুগে রাজারা এইভাবে আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, তাই প্রকৃতির নিয়মে প্রতিটি দেশেই রাজতন্ত্র লোপ পেয়েছে।

এই যুগে মানুষেরা এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, একদিক দিয়ে তারা বহু বিবাহ বন্ধ করছে এবং অন্য দিকে তারা কতভাবে স্ত্রী শিকার করছে। বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে যে, অমুক ক্লাবে অথবা অমুক দোকানে অর্ধনগ্ন যুবতী পাওয়া যায়। এইভাবে যুবতীরা আধুনিক সমাজের ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু *বেদের* নির্দেশ অনুসারে, কোন মানুষের যদি একাধিক স্ত্রী উপভোগ করার প্রবণতা থাকে, যা অনেক সময় উচ্চতর বর্ণের মানুষদের মধ্যে দেখা যায়, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এমন কি কখনও কখনও শূদ্রদের মধ্যেও, তখন তাকে একাধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিবাহের অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে, লাম্পট্য পরিত্যাগ করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা। কিন্তু বর্তমান সময়ে লাম্পট্য অনিয়ন্ত্রিত। তা সত্ত্বেও সমাজে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে যে মানুষ একজনের বেশি পত্নী বিবাহ করতে পারবে না। এটিই হচ্ছে আদর্শ আসুরিক সমাজ

শ্লোক ৭

য এবং কর্ম নিয়তং বিদ্বান্ কুর্বীত মানবঃ ।
কর্মণা তেন রাজেন্দ্র জ্ঞানেন ন স লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

যঃ—যিনি; **এবম্**—এইভাবে; **কর্ম**—কার্য, **নিয়তম্**—নিয়ন্ত্রিত, **বিদ্বান্**—বিদ্বান, **কুর্বীত**—করা উচিত; **মানবঃ**—মানুষ; **কর্মণা**—এই প্রকার কর্মের দ্বারা; **তেন**—এর দ্বারা; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজন্; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা; **ন**—কখনই না; **সঃ**—তিনি; **লিপ্যতে**—লিপ্ত হন।

অনুবাদ

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে বলতে লাগলেন—হে রাজন্! যে ব্যক্তি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করেন, তিনি কখনও সকাম কর্মে লিপ্ত হন না।

তাৎপর্য

সরকার যেমন নাগরিকদের বিশেষভাবে কার্য করার জন্য বাণিজ্যিক অনুমতি (Trade Licenses) প্রদান করেন, তেমনই আমাদের সমস্ত সকাম কর্মগুলিকে নিয়ন্ত্রিত এবং সংযত করার জন্য *বেদে* নানা প্রকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত জীবই এই জড় জগতে এসেছে উপভোগ করার জন্য। তাই এই উপভোগ করার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য *বেদ* প্রদান করা হয়েছে। যিনি বৈদিক বিধান অনুসারে তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেন, তিনি কখনও তাঁর কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) বলা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ*—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য অথবা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। *অন্যত্র লোকঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—তা না হলে যে কোন কর্মই ফল উৎপাদন করবে, যার দ্বারা জীব আবদ্ধ হয়ে পড়বে। মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন বৈদিক বিধিনিষেধ অনুসারে এমন ভাবে কর্ম করেন, যাতে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয় সুখভোগের সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই প্রকার নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্মকে বলা হয় জ্ঞান। বাস্তবিকপক্ষে, *বেদ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান'। *জ্ঞানেন ন স লিপ্যতে* উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যে, বৈদিক নিয়ম অনুসরণ করার ফলে, মানুষ সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। তাই দায়িত্বহীনভাবে আচরণ না করে, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্ম করার জন্য সকলকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি যখন সরকারের আইন এবং অনুমোদন অনুসারে কর্ম করে, তখন সে কোন অপরাধমূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ে না। মানুষের তৈরি আইন অবশ্য সর্বদাই ত্রুটিপূর্ণ, কারণ মানুষের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু বৈদিক নির্দেশগুলি তেমন নয়, কারণ সেগুলি এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত। বৈদিক নির্দেশে কোন ত্রুটি থাকতে পারে না। বৈদিক জ্ঞান সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে প্রাপ্ত, এবং তাই তাতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সমস্ত বৈদিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত, কারণ তা পরম্পরার ধারায় সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/১) বলা হয়েছে—*তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা, তাঁর আর একটি নাম হচ্ছে আদিকবি, তাঁর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপদেশ প্রদান করেছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এই বৈদিক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর, ব্রহ্মা পরম্পরার ধারায় নারদকে

সেই জ্ঞান দান করেছিলেন, এবং নারদ তা ব্যাসদেবকে প্রদান করেছিলেন। এইভাবে বৈদিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত আমরা যদি বৈদিক জ্ঞান অনুসারে আচরণ করি, তা হলে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ৮

অন্যথা কর্ম কুর্বাণো মানারূঢ়ো নিবধ্যতে ।
গুণপ্রবাহপতিতো নষ্টপ্রজ্ঞো ব্রজত্যধঃ ॥ ৮ ॥

অন্যথা—তা না হলে; **কর্ম** সকাম কর্ম; **কুর্বাণঃ**—করার সময়; **মান-আরূঢ়ঃ**—অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **নিবধ্যতে**—আবদ্ধ হয়ে পড়ে; **গুণ-প্রবাহ**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবের দ্বারা; **পতিতঃ**—অধঃপতিত; **নষ্ট-প্রজ্ঞঃ**—বুদ্ধিভ্রষ্ট; **ব্রজতি**—গমন করে; **অধঃ**—নিম্নে।

অনুবাদ

আর যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, সে তার অহঙ্কারের প্রভাবে অধঃপতিত হয়, এবং এইভাবে প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার ফলে জীব তার প্রকৃত বুদ্ধি বর্জিত হয়ে জন্মমৃত্যুর চক্রে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। এইভাবে সে মলের কীটাণু থেকে শুরু করে, ব্রহ্মলোকে অতি উন্নত পদ পর্যন্ত বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বহু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে *অন্যথা*, যা বৈদিক বিধি-নিষেধের পরোয়া করে না যারা, তাদের ইঙ্গিত করছে। বেদের বিধি-নিষেধগুলিকে বলা হয় *শাস্ত্রবিধি*। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা এই *শাস্ত্রবিধি* স্বীকার না করে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিজের খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, তারা কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, এমন কি সুখী হতে পারে না অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

"যারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে নিজের খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, তারা কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, সুখী হতে পারে না এবং পরম গতি লাভ করতে

পারে না।" (*ভগবদ্গীতা* ১৬/২৩) এইভাবে যারা জেনে শুনে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করবে, তারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই মানব সমাজের কর্তব্য বৈদিক বিধি নিষেধগুলি পালন করা, যার সারমর্ম *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। তা না হলে এই ভবসাগর থেকে কখনও উদ্ধার পাওয়া যাবে না। মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, আত্মা চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করছে। জীবনের ক্রম-বিবর্তনের ফলে, জীব যখন মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন প্রত্যাশা করা হয় যে, সে বৈদিক নির্দেশগুলি পালন করবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, অনাদিকাল ধরে জীব ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আসুরিক প্রবৃত্তির জন্য জড় জগতে ত্রিতাপ দুঃখভোগ করছে। শ্রীকৃষ্ণও সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) বলেছেন

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

'এই জড় জগতের বদ্ধ জীবেরা আমার শাশ্বত অংশ। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই জড় জগৎকে ভোগ করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে।" প্রতিটি জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তাই এই জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে ত্রিতাপ দুঃখভোগ করার কোন কারণই তার নেই, কিন্তু ভোক্তা হওয়ার ভ্রান্ত প্রচেষ্টার ফলে, সে স্বেচ্ছায় এই বন্ধন স্বীকার করেছে। সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য ভগবান ব্যাসদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র দান করেছেন। তাই বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

"শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে জীব বহির্মুখ হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি তাকে এই জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ দিচ্ছে।" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২০/১১৭)

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান ।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

"জীব যখন মায়ার শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে নিজে-নিজে তার কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করতে পারে না। তাই কৃপাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ তাকে চতুর্বেদ এবং অষ্টাদশ *পুরাণ* আদি বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করেছেন।" (*চৈ চঃ মধ্য* ২০/১২২) তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক নির্দেশের সদ্ব্যবহার করা; তা না হলে,

সে তার খেয়াল খুশিমতো কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং কোন পথ খুঁজে পাবে না।

এই শ্লোকে *মানারূঢ়ঃ* শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মস্ত বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হওয়ার অভিলায়, সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষেরা তাদের মানসিক স্তরে কার্য করছে। প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে দেওয়া ভগবানের নির্দেশের কোন গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে, এই সমস্ত মানুষেরা হচ্ছে অভক্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) তাই বলা হয়েছে—

হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের কোন সদ্‌গুণ থাকতে পারে না, কারণ তারা মানসিক স্তরে কার্য করে। যারা মানসিক স্তরে কার্য করে, তাদের সময়ে সময়ে জ্ঞানের মান পরিবর্তন করতে হয়। আমরা তাই দেখতে পাই যে, একজন দার্শনিকের সঙ্গে অন্য দার্শনিকের মতের মিল হয় না, এবং একজন বৈজ্ঞানিক অন্য আর একজন বৈজ্ঞানিকের মতবাদের বিরোধিতা করে তার মতবাদ উপস্থাপন করে। প্রকৃত জ্ঞানরহিত হয়ে মনোধর্মের স্তরে কার্য করার ফলে, এই সব হয়। কিন্তু *বেদের* উপদেশের মাধ্যমে আমরা আদর্শ জ্ঞানলাভ করতে পারি। বেদের বাণী কখনও কখনও পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হলেও তা অভ্রান্ত। যেহেতু *বেদ* হচ্ছে জ্ঞানের আদর্শ মান, আপাতদৃষ্টিতে কখনও কখনও তাদের পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হলেও, তা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা উচিত কেউ যদি তা স্বীকার না করে, তা হলে সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।

এই শ্লোকে জড় জাগতিক পরিস্থিতিকে *গুণ-প্রবাহ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এই জড় জগৎ প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রবাহস্বরূপ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই তাঁর একটি গানে বলেছেন, *মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে', খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই*—"তুমি দুঃখকষ্ট ভোগ করছ কেন? কেন তুমি কখনও সংসার সমুদ্রের তরঙ্গে নিমজ্জিত হচ্ছ এবং কখনও জলের উপর ভেসে উঠছ?" *জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস, করলে ত আর দুঃখ নাই*—"তুমি যদি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে গ্রহণ করতে পার, তা হলে তুমি এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারবে।" জীব যখনই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে আদর্শ জ্ঞান গ্রহণ করে, যা *ভগবদ্গীতায়* যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে, তখন সে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং তখন আর সে অধঃপতিত হয়ে সেই জ্ঞান হারায় না।

নষ্ট-প্রজ্ঞঃ। *প্রজ্ঞ* মানে 'পূর্ণ জ্ঞান', এবং *নষ্ট-প্রজ্ঞ* মানে হচ্ছে 'যার পূর্ণ জ্ঞান নেই'। যার পূর্ণজ্ঞান নেই, সে কেবল মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা-কল্পনা করে। এই প্রকার মানসিক জল্পনা কল্পনার ফলে, মানুষ নারকীয় অবস্থায় অধঃপতিত হতে থাকে। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করলে, হৃদয় কখনও নির্মল হয় না। হৃদয় যদি নির্মল না হয়, তা হলে জীব প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবে কর্ম করে। সেই সমস্ত কর্ম *ভগবদ্গীতার* সপ্তদশ অধ্যায়ের এক থেকে ছয় শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৫) আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। হে অর্জুন। তুমি সেই সমস্ত গুণের অতীত হও। সমস্ত দ্বন্দ্বভাব থেকে এবং লাভ ও সুরক্ষার সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হও, এবং আত্মায় অবস্থিত হও।" সারা জগৎ এবং সমস্ত জাগতিক জ্ঞান প্রকৃতির এই তিন গুণের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত গুণগুলি অতিক্রম করা কর্তব্য, এবং সেই নির্গুণ স্তর প্রাপ্ত হতে হলে, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে মানুষ তার জীবন সার্থক করতে পারে। তা না হলে, সে তিন গুণের তরঙ্গের আঘাতে সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে। সেই তত্ত্ব *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩০) প্রহ্লাদ মহারাজের বাণীতে স্পষ্টীকৃত হয়েছে—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥

জড় সুখভোগের চেষ্টায় গভীরভাবে যুক্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের জড় অভিজ্ঞতার অতীত আর কিছুই জানে না, এবং তারা প্রকৃতির তরঙ্গে প্রবাহিত হয়। তাদের সুখভোগের প্রচেষ্টা চর্বিত বস্তু চর্বণ করার মতো, এবং তারা তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। এইভাবে তারা নারকীয় জীবনের অন্ধতম প্রদেশে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৯

তত্র নির্ভিন্নগাত্রানাং চিত্রবাজৈঃ শিলীমুখৈঃ ।
বিপ্লবোঽভূদ্দুঃখিতানাং দুঃসহঃ করুণাত্মনাম্ ॥ ৯ ॥

তত্র—সেখানে; **নির্ভিন্ন**—বিদ্ধ হয়ে; **গাত্রাণাম্**—শরীর; **চিত্র-বাজৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার পালক সমন্বিত; **শিলী মুখৈঃ**—বাণের দ্বারা; **বিপ্লবঃ**—ধ্বংস; **অভূৎ**—করা হয়েছিল; **দুঃখিতানাম্**—অত্যন্ত দুঃখিতদের; **দুঃসহঃ**—অসহ্য; **করুণ-আত্মনাম্**—যাঁরা অত্যন্ত দয়ালু তাঁদের জন্য।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন যখন এইভাবে শিকার করছিলেন, তখন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে, সেই বনের বহু পশু অসহ্য বেদনায় তাদের প্রাণ ত্যাগ করেছিল। রাজার এই বীভৎস বিনাশকার্য দর্শন করে, দয়ালু ব্যক্তিরা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা এই প্রকার হত্যাকার্য দর্শন করে সহ্য করতে পারেননি।

তাৎপর্য

আসুরিক মানুষেরা যখন পশুহত্যা করে, তখন দেবতা বা ভগবদ্ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখিত হন। আধুনিক যুগের আসুরিক সভ্যতা সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য ধরনের কসাইখানা খুলেছে। সমস্ত ভণ্ড স্বামী ও যোগীরা মূর্খ মানুষদের পশুহত্যা করে তাদের মাংস আহার করতে অনুপ্রাণিত করছে এবং সেই সঙ্গে তাদের তথাকথিত ধ্যান ও যোগ অভ্যাস করে যেতে বলছে। এই সমস্ত কার্য অত্যন্ত বীভৎস, এবং তা দর্শন করে স্বাভাবিকভাবে দয়ালু ভগবদ্ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখিত হন। শিকার করার পন্থাও বিভিন্নভাবে চলছে, যা আমরা ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ করেছি। নারী শিকার, বিভিন্ন প্রকার সুরাপান, নেশাগ্রস্ত হওয়া, পশু হত্যা করা এবং অবৈধ যৌনসঙ্গ—এই সবই আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। পৃথিবীর এই অবস্থা দর্শন করে বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং তাই তাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করতে অত্যন্ত ব্যস্ত হন।

বনে পশু বধ হতে দেখে, কসাইখানায় অসংখ্য পশুহত্যা হতে দেখে, এবং বিভিন্ন ক্লাব ও সোসাইটি নামক বেশ্যালয়ে যুবতী মেয়েদের অন্যায়ভাবে ভোগ করতে দেখে, ভগবদ্ভক্তরা অত্যন্ত ব্যথিত হন। যজ্ঞে পশুহত্যা হতে দেখে মহর্ষি নারদ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন, এবং কৃপাপরবশ হয়ে তিনি রাজা প্রাচীনবর্হিষৎকে উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন। তাঁর এই উপদেশের মাধ্যমে, নারদ মুনি বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, মানব-সমাজে প্রচলিত এই প্রকার বধের ফলে, তাঁর মতো ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখিত হন। এই প্রকার হত্যাকার্যের ফলে কেবল সাধু ব্যক্তিরাই দুঃখিত হন না, এমন কি ভগবান স্বয়ং দুঃখিত হয়ে বুদ্ধদেবরূপে অবতরণ করেছিলেন। জয়দেব গোস্বামী তাই গেয়েছেন—

সদয়-হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্ । যজ্ঞের নামে পশুহত্যা হতে দেখে, ভগবানের সদয় হৃদয় ব্যথিত হয়েছিল, এবং সেই পশুহত্যা বন্ধ করার জন্য তিনি কৃপাপূর্বক বুদ্ধদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কখনও কখনও কিছু মূর্খ মানুষেরা বলে যে, পশুদের আত্মা নেই, অথবা তারা পাথরের মতো জড়। এইভাবে তারা যুক্তি প্রয়োগ করে যে, পশুহত্যার ফলে কোন পাপ হয় না। প্রকৃতপক্ষে পশুরা পাথরের মতো জড় নয়, বরং যারা পশুদের হত্যা করে, তারা পাথরের মতো কঠিন হৃদয়। তাই কোন যুক্তি অথবা দর্শন তাদের মর্মকে স্পর্শ করতে পারে না। তারা কসাইখানাগুলি চালিয়ে যেতে থাকে এবং বনে পশুহত্যা করতে থাকে। মূল কথা হচ্ছে যে, যারা নারদ মুনির মতো মহাত্মা এবং তাঁর পরম্পরার উপদেশ গ্রাহ্য করে না, তারা অবশ্যই *নষ্টপ্রজ্ঞ* এবং তাদের অপকর্মের ফলে তারা নরকগামী হচ্ছে।

শ্লোক ১০

শশান্ বরাহান্ মহিষান্ গবয়ান্ রুরুশল্যকান্ ।
মেধ্যানন্যাংশ্চ বিবিধান্ বিনিঘ্নন্ শ্রমমধ্যগাৎ ॥ ১০ ॥

শশান্—শশক; **বরাহান্**—শূকর; **মহিষান্**—মহিষ, **গবয়ান্**—গবয়; **রুরু**—কৃষ্ণসার মৃগ; **শল্যকান্**—শজারু; **মেধ্যান্**—যজ্ঞের উপযুক্ত পশু, **অন্যান্**—অন্য; **চ**—এবং, **বিবিধান্**—বিভিন্ন; **বিনিঘ্নন্**—হত্যা করে; **শ্রমম্ অধ্যগাৎ**—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা পুরঞ্জন বহু শশক, বরাহ, মহিষ, গবয়, কৃষ্ণসার মৃগ, শজারু এবং শিকার করার উপযুক্ত অন্যান্য পশু সংহার করে, শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষেরা নানা প্রকার পাপকর্ম করে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে, শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, অজ্ঞানের ফলেই মানুষ পাপকর্ম করে। পাপকর্মের পরিণাম হচ্ছে দুঃখ-কষ্ট ভোগ। যারা অজ্ঞান, যারা আইন লঙ্ঘন করে, তারা রাষ্ট্রের আইন অনুসারে দণ্ডভোগ করে। তেমনই, প্রকৃতির আইনও অত্যন্ত কঠোর। একটি শিশু যদি অজ্ঞানতাবশত আগুনে হাত দেয়, তা হলে যদিও সে একটি শিশু, তবুও তার হাত পুড়ে যায়। একটি শিশুও যদি

প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করবে, তা হলেও প্রকৃতি তাকে করুণা করে না। অজ্ঞানের বশেই কেবল মানুষ প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে, এবং সে যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন আর সে পাপকর্ম করে না।

বহু পশু বধ করে রাজা পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন। মানুষ যখন সাধু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে, তখন সে প্রকৃতির কঠোর নিয়ম সম্বন্ধে অবগত হয় এবং তার ফলে ধর্মপরায়ণ হয়। অধার্মিক ব্যক্তিরা পশুর মতো, কিন্তু এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সেই প্রকার মানুষেরাও চেতনা লাভ করে জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংসাহার, দ্যূতক্রীড়া ও আসবপান এই চারটি পাপকর্ম বর্জন করছে। এটিই হচ্ছে ধার্মিক জীবনের শুরু। তথাকথিত যে সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তিরা এই চারটি নিয়ম পালন করে না, তারা ভণ্ড। ধর্মজীবন ও পাপকর্ম একসঙ্গে চলতে পারে না। কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে ধার্মিক জীবন অথবা মুক্তির পথ অবলম্বন করতে চান, তা হলে তাঁকে এই চারটি বিধিনিষেধ পালন করতেই হবে। মানুষ যতই পাপী হোক না কেন, সে যদি সদ্গুরুর কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং তার পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত বোধ করে তা করা বন্ধ করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হয়। তা সম্ভব হয় কেবল শাস্ত্রের বিধিনিষেধ পালন করার ফলে এবং সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে।

এখন সারা পৃথিবী অন্ধ জড় সভ্যতা থেকে অবসর গ্রহণে আগ্রহী হতে চলেছে। এই অন্ধ জড় সভ্যতাকে বনে পশু শিকারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানুষের কর্তব্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে, হত্যা করার ক্লেশদায়ক জীবন পরিত্যাগ করা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পশু-ঘাতকদের বাঁচা উচিত নয় এবং মরাও উচিত নয়। তারা যদি কেবল পশুহত্যা করার জন্য এবং স্ত্রী সম্ভোগ করার জন্য বেঁচে থাকে, তা হলে সেই জীবনে কোন রকম উন্নতি সম্ভব নয়। আর পশু-ঘাতককে তার মৃত্যুর পর নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সেটিও বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, হত্যাকারীদের হত্যা করার বৃত্তি পরিত্যাগ করে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করে, তাদের জীবনকে সার্থক করা উচিত। উদ্ভ্রান্ত ও নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যক্তি আত্মহত্যা করে কখনও তার নৈরাশ্য ও বেদনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে না, কারণ আত্মহত্যা করার ফলে, তাকে নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় অথবা স্থূল জড় দেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে, ভূতপ্রেত হয়ে থাকতে হয়। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়ে, কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা। এইভাবে পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করে মানুষ তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ১১

ততঃ ক্ষুত্তৃট্‌পরিশ্রান্তো নিবৃত্তো গৃহমেয়িবান্ ।
কৃতস্নানোচিতাহারঃ সংবিবেশ গতক্লমঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ—তার পর, **ক্ষুৎ**—ক্ষুধার দ্বারা; **তৃট্**—তৃষ্ণা; **পরিশ্রান্তঃ**—অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে; **নিবৃত্তঃ**—বিরত হয়ে, **গৃহম্ এয়িবান্**—তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **কৃত**—করে; **স্নান**—স্নান; **উচিত-আহারঃ**—উপযুক্ত খাদ্য, **সংবিবেশ** বিশ্রাম করেছিলেন; **গত-ক্লমঃ**—শ্রান্তি দূর করেছিলেন।

অনুবাদ

তার পর রাজা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, তাঁর রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছিলেন। গৃহে ফিরে আসার পর, তিনি স্নান করেছিলেন এবং উপযুক্ত খাদ্য আহার করেছিলেন। তার পর তিনি বিশ্রাম করে তাঁর সমস্ত শ্রান্তি দূর করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত মানুষ সারা সপ্তাহ ধরে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে। সে সব সময় অনুসন্ধান করে, "কোথায় টাকা? কোথায় টাকা?" তার পর, সপ্তাহ শেষে, সে তার এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করে কোন নির্জন স্থানে গিয়ে বিশ্রাম করতে চায়। রাজা পুরঞ্জন তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কারণ তিনি বনে মৃগয়া করে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর বিবেক তাঁকে আরও পাপকর্ম করা থেকে বিরত করে, তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। *ভগবদ্গীতায়* বিষয়াসক্ত মানুষদের *দুষ্কৃতিনঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ইঙ্গিত করে। মানুষের যখন চৈতন্যের উদয় হয় এবং বুঝতে পারে যে, সে পাপকর্ম করছে, তখন সে তার চেতনায় ফিরে আসে, যাকে এখানে আলঙ্কারিক ভাষায় প্রাসাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত বিষয়াসক্ত মানুষেরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। রজ এবং তমোগুণের পরিণাম হচ্ছে কাম ও লোভ বিষয়াসক্ত মানুষদের কার্যকলাপের অর্থ হচ্ছে কাম ও লোভের জন্য কর্ম। কিন্তু তাদের যখন চৈতন্য হয়, তখন তারা অবসর গ্রহণ করতে চায়। বৈদিক সভ্যতায় এই প্রকার অবসরের প্রশংসা করা হয়েছে, এবং জীবনের সেই অবস্থাকে বলা হয় বানপ্রস্থ যে-সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি পাপময় জীবন থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদের পক্ষে অবসর গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।

রাজা পুরঞ্জন গৃহে ফিরে এসে স্নান করেছিলেন এবং উচিত আহার করেছিলেন তা ইঙ্গিত করে যে, বিষয়াসক্ত মানুষদের পাপকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করা এবং সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে পবিত্র হওয়া এবং তাঁর কাছ থেকে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি তা করেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে নবীনতা অনুভব করবেন, ঠিক যেভাবে স্নানের পর অনুভব হয়। সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের পর, সমস্ত পাপকর্ম বর্জন করা উচিত, যথা—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, দ্যূতক্রীড়া ও আমিষাহার।

এই শ্লোকে *উচিতাহারঃ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। *উচিত* মানে 'উপযুক্ত'। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে উপযুক্ত খাদ্য আহার করা এবং শূকরের মতো বিষ্ঠা ভোজন করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৭/৮) মানুষের আহারকে সাত্ত্বিক আহার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজসিক ও তামসিক আহার করা মানুষের উচিত নয়। তাকে বলা হয় *উচিতাহার* বা উপযুক্ত আহার। যারা সর্বদা আমিষ আহার করছে বা সুরাপান করছে, যা হচ্ছে রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত খাদ্য ও পানীয়, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সেগুলি বর্জন করা, যাতে তার প্রকৃত চেতনা জাগরিত হতে পারে। এইভাবে মানুষ শান্তিলাভ করতে পারে এবং নবীনতা অনুভব করতে পারে। কেউ যদি অশান্ত অথবা পরিশ্রান্ত থাকে, তা হলে সে ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/২০) বলা হয়েছে—

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

রজ ও তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হলে, প্রসন্ন হওয়া যায় না, এবং প্রসন্ন না হতে পারলে, ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পুরঞ্জনের গৃহে প্রত্যাবর্তন কৃষ্ণভাবনামৃত নামক মানুষের আদি চেতনায় প্রত্যাবর্তনের সূচক। যারা বহু পাপ করেছে, বিশেষ করে পশুহত্যা অথবা বনে পশুশিকার, তাদের পক্ষে এই কৃষ্ণভাবনামৃত বা কৃষ্ণভক্তি পরম আবশ্যক।

শ্লোক ১২

আত্মানমর্হয়াঞ্চক্রে ধূপালেপস্রগাদিভিঃ ।
সাধ্বলঙ্কৃতসর্বাঙ্গো মহিষ্যামাদধে মনঃ ॥ ১২ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **অর্হয়াম্**—করা উচিত; **চক্রে**—করেছিলেন; **ধূপ**—ধূপ; **আলেপ**—শরীরে চন্দন-লেপন; **স্রক্**—মালা; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **সাধু**—সাধু, সুন্দরভাবে; **অলঙ্কৃত**—সজ্জিত হয়ে; **সর্ব-অঙ্গঃ**—সারা শরীর; **মহিষ্যাম্**—রাণীকে; **আদধে**—তিনি দিয়েছিলেন; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

তার পর রাজা পুরঞ্জন উপযুক্ত অলঙ্কারে তাঁর দেহকে সাজিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দেহে চন্দনও লেপন করেছিলেন এবং গলায় ফুলমালা ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রান্তিমুক্ত হয়েছিলেন। তার পর তিনি তাঁর পত্নীর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন কোন মানুষের শুভ চেতনা জাগরিত হয়, তখন তিনি কোন মহাত্মাকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেন। তিনি তখন দর্শন, কাহিনী, মহান ভক্তদের আখ্যান এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তের মধ্যে আদান-প্রদানের সমস্ত বর্ণনা থেকে বৈদিক উপদেশ শ্রবণ করেন। এইভাবে মানুষের মন নবীনতা লাভ করে, ঠিক যেভাবে কোন ব্যক্তি তার সারা শরীরে সুগন্ধ চন্দন লেপন করে এবং নিজেকে অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত করে। এই সমস্ত অলঙ্কারগুলিকে ধর্ম ও আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই প্রকার জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ বৈষয়িক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হন এবং সর্বদা *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণে যুক্ত হন। এই শ্লোকে *সাধ্বলঙ্কৃত* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সাধুদের উপদেশের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানে মগ্ন হওয়া। সাধু ব্যক্তিদের উপদেশের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা যিনি অলঙ্কৃত হয়েছেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে রাজা পুরঞ্জন যেভাবে তাঁর মহিষীর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন, সেইভাবে তাঁর আদি চেতনা অর্থাৎ কৃষ্ণ-চেতনার অন্বেষণ করা। সাধুদের উপদেশরূপ কৃপালাভ না করলে, কৃষ্ণ-চেতনায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য*। আমরা যদি সাধু হতে চাই, অথবা আমাদের প্রকৃত কৃষ্ণভাবনায় ফিরে যেতে চাই, তা হলে সাধু, শাস্ত্র ও গুরুর সঙ্গ করা অবশ্য কর্তব্য। এটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ১৩

তৃপ্তো হৃষ্টঃ সুদৃপ্তশ্চ কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ ।
ন ব্যচষ্ট বরারোহাং গৃহিণীং গৃহমেধিনীম্ ॥ ১৩ ॥

তৃপ্তঃ—সন্তুষ্ট; **হৃষ্টঃ**—আনন্দিত; **সু-দৃপ্তঃ**—অত্যন্ত গর্বিত; **চ**—ও; **কন্দর্প**—কামদেবের দ্বারা; **আকৃষ্ট**—আকৃষ্ট; **মানসঃ**—তাঁর মন; **ন**—করেনি; **ব্যচষ্ট**—চেষ্টা; **বর-আরোহাম্**—উচ্চতর চেতনা; **গৃহিণীম্**—পত্নী; **গৃহ-মেধিনীম্**—যিনি তাঁর পতিকে বৈষয়িক জীবনে সন্তুষ্ট রাখেন।

অনুবাদ

আহার করার পর তাঁর ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন তাঁর হৃদয়ে হর্ষ অনুভব করেছিলেন। উচ্চতর চেতনায় উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে, তিনি কামদেবের দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর গৃহমেধী জীবনে যিনি তাঁকে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন, তাঁর সেই পত্নীর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

যাঁরা কৃষ্ণভক্তির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে চান, তাঁদের জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গুরুদেবের কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পর, শিষ্য তাঁর অভ্যাসগুলির পরিবর্তন করেন এবং আমিষাহার, আসবপান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও দ্যূতক্রীড়া বর্জন করেন। শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাত্ত্বিক আহার হচ্ছে অন্ন, শাক-সবজি, ফল, দুধ, চিনি ও দুগ্ধজাত দ্রব্য। অন্ন, ডাল, চাপাটি, শাক-সবজি, দুধ, চিনি আদি সাধারণ আহার অত্যন্ত পুষ্টিকর, কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, দীক্ষিত ব্যক্তিরা প্রসাদের নামে অত্যন্ত উপাদেয় সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করে। তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে কামদেবের দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় খাদ্য ভোজন করে। স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে, কৃষ্ণভক্তির মার্গে নবীন ভক্ত যদি অত্যধিক আহার করে, তা হলে তার অধঃপতন হয়। শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে, সে কামদেবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তথাকথিত ব্রহ্মচারী স্ত্রীরূপ দর্শন করে বিচলিত হয়, এবং বানপ্রস্থীরা তার স্ত্রীকে সম্ভোগ করার জন্য পুনরায় আকৃষ্ট হয়। অথবা সে অন্য আর একজন পত্নীর অন্বেষণ করতে শুরু করে। ভাবের আবেগে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে সাধু ও গুরুর সঙ্গ করতে আসে, কিন্তু তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে থাকতে পারে না। কৃষ্ণভক্তির স্তরে

উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে, কামদেবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তার অধঃপতন হয়, এবং মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য পুনরায় দার পরিগ্রহ করে। নবা ভক্তদের কৃষ্ণভক্তির পথ থেকে জড় জাগতিক জীবনে অধঃপতনের বর্ণনা নারদ মুনি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১৭) করেছেন—

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

তা ইঙ্গিত করে যে, নবীন ভক্ত যদিও ভক্তির অপরিপক্কতাহেতু কৃষ্ণভক্তির পথ থেকে অধঃপতিত হতে পারে, কিন্তু তার কৃষ্ণসেবা কখনও ব্যর্থ হয় না। কিন্তু গৃহস্থ-জীবনে অথবা তথাকথিত সামাজিক বা পারিবারিক দায়দায়িত্ব সম্পাদনে যে অটল থাকে কিন্তু কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে না, প্রকৃতপক্ষে তার কোন লাভ হয় না। কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা যিনি অবলম্বন করেছেন, তাঁর অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত এবং বর্জনীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা উচিত, যে কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী *উপদেশামৃতে* বর্ণনা করেছেন—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

নবীন ভক্তের অত্যধিক আহার করা উচিত নয় অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করা উচিত নয়। অত্যধিক আহার করা এবং ধন সংগ্রহ করাকে বলা হয় *অত্যাহার।* এই প্রকার *অত্যাহারের* জন্য মানুষকে অত্যন্ত প্রয়াস করতে হয়। উপর উপর তারা দেখায় যে, তারা যেন কত নিষ্ঠাসহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের সংকল্প মোটেই দৃঢ় নয়। তাকে বলা হয় *নিয়মাগ্রহ।* অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গ করাকে বলা হয় *জনসঙ্গ।* এই প্রকার অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গ করার ফলে, সাধক কাম ও লোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তির পথ থেকে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ১৪

অন্তঃপুরস্ত্রিয়োঽপৃচ্ছদ্বিমনা ইব বেদিষৎ ।
অপি বঃ কুশলং রামাঃ সেশ্বরীণাং যথা পুরা ॥ ১৪ ॥

অন্তঃ-পুর—অন্তঃপুর **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী; **অপৃচ্ছৎ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **বিমনাঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে, **ইব**—সদৃশ; **বেদিষৎ**—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি, **অপি**—কি, **বঃ**—আপনার; **কুশলম্**—মঙ্গল; **রামাঃ**—হে সুন্দরীগণ; **স-ঈশ্বরীণাম্**—তোমাদের অধীশ্বরী-সহ; **যথা**—যেমন; **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

তখন রাজা পুরঞ্জন একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, এবং তিনি অন্তঃপুরের রমণীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে সুন্দরীগণ! তোমাদের অধীশ্বরীর সঙ্গে তোমরা পূর্বের মতো কুশলে আছ তো?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বেদিষৎ* শব্দটি মহারাজ প্রাচীনবর্হিকে ইঙ্গিত করছে। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁর কৃষ্ণভক্তিকে জাগরিত করেন, তখন তিনি চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা—মনের এই কার্যকলাপগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করেন, এবং স্থির করেন যে, তিনি কি জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে যাবেন, না আধ্যাত্মিক চেতনায় অটল থাকবেন। *কুশলম্* শব্দটি মঙ্গলের সূচক। কেউ যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর গৃহ সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। কিন্তু কেউ যখন বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত অন্য কার্যকলাপে যুক্ত হয়, অর্থাৎ জড় জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তখন সে সর্বদা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য তার মনের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা—মনের এই সমস্ত কার্যকলাপগুলিকে কিভাবে সদ্ব্যবহার করা যায় তা স্থির করা। কেউ যদি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, কিভাবে তাঁর সেবা করবেন সেই কথা ভাবেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পালন করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি তাঁর বুদ্ধির সদুপদেশ গ্রহণ করছেন, যাকে বলা হয় মাতা। যদিও রাজার শ্রান্তি দূর হয়েছিল, তবুও তিনি তাঁর পত্নীর খোঁজ করছিলেন। এইভাবে তিনি পরামর্শ করছিলেন, চিন্তা করছিলেন এবং ইচ্ছা করছিলেন কিভাবে তিনি তাঁর উত্তম চেতনায় ফিরে যেতে পারেন। মন পরামর্শ দিতে পারে যে, বিষয়-ভোগের ফলে সুখী হওয়া যায়, কিন্তু যিনি কৃষ্ণভক্তির মার্গে অগ্রসর হয়েছেন, তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সুখভোগ করার চেষ্টা করেন না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

"জীবাত্মা বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়ের প্রতি তার আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু কেউ যখন উচ্চতর রস আস্বাদন করে নিম্নতর বিষয়ের কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়, তখন তার চেতনা স্থির হয়।" ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠ কার্যকলাপে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, বিষয় ভোগের প্রতি অনাসক্ত হওয়া যায় না *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।* কেউ যখন বাস্তবিকভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই কেবল তিনি জড় জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হতে পারেন।

শ্লোক ১৫

ন তথৈতর্হি রোচন্তে গৃহেষু গৃহসম্পদঃ।
যদি ন স্যাদ্ গৃহে মাতা পত্নী বা পতিদেবতা।
ব্যঙ্গে রথ ইব প্রাজ্ঞঃ কো নামাসীত দীনবৎ ॥ ১৫ ॥

ন—না; **তথা**—পূর্বের মতো; **এতর্হি**—এখন; **রোচন্তে**—রুচিকর; **গৃহেষু**—গৃহে; **গৃহ-সম্পদঃ**—গৃহের সমস্ত সম্পদ; **যদি**—যদি; **ন**—না; **স্যাৎ**—হয়; **গৃহে**—গৃহে; **মাতা**—মাতা; **পত্নী**—পত্নী; **বা**—অথবা; **পতি-দেবতা**—পতিপরায়ণ; **ব্যঙ্গে**—চক্রবিহীন; **রথে**—রথে; **ইব**—সদৃশ; **প্রাজ্ঞঃ**—বিদ্বান ব্যক্তি; **কঃ**—কে; **নাম**—বাস্তবিকপক্ষে; **আসীত**—বসবে; **দীন-বৎ**—দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন বললেন—আমি বুঝতে পারছি না আমার গৃহের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম পূর্বের মতো আমাকে আর কেন আকর্ষণ করছে না। আমার মনে হয় যে, গৃহে যদি মাতা ও পতিপরায়ণা পত্নী না থাকে, তা হলে সেই গৃহ চক্রবিহীন রথের মতো। কোন্ মূর্খ সেই অচল রথে উপবেশন করবে?

তাৎপর্য

মহান রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

"যার গৃহে মাতা নেই এবং পত্নী অপ্রিয়-ভাষিণী, তার গৃহত্যাগ করে বনে যাওয়াই কর্তব্য, কারণ তার গৃহ অরণ্যসদৃশ।" প্রকৃত *মাতা* হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি এবং প্রকৃত

পত্নী হচ্ছেন তিনি, যিনি ভগবানের সেবায় তাঁর পতিকে সহায়তা করেন সুখী গৃহের জন্য এই দুটি বস্তু অত্যন্ত আবশ্যক।

প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী হচ্ছেন পুরুষের শক্তি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মহান ব্যক্তির পিছনে রয়েছেন হয় তাঁর মাতা অথবা পত্নী। ঘরে যদি সুশীলা পত্নী ও স্নেহময়ী মাতা থাকেন, তা হলে গৃহস্থ জীবন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই অবস্থায় গৃহস্থলির সমস্ত কার্যকলাপ এবং সমস্ত সাজ সরঞ্জাম অত্যন্ত সুখদায়ক হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্নেহময়ী মাতা এবং সুশীলা পত্নী দুই ছিল, এবং তিনি তাঁর গৃহে অত্যন্ত সুখী ছিলেন, তবুও সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর মাতা ও পত্নীকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন পক্ষান্তরে বলা যায় যে, গৃহে পূর্ণরূপে সুখী হতে হলে, স্নেহময়ী মাতা ও পত্নী উভয়েরই আবশ্যক। তা না হলে, গৃহস্থ জীবনের কোন অর্থ থাকে না। বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ধর্মপরায়ণ হয়ে ভগবানে ভক্তি না করলে, সাধু ব্যক্তির কাছে তাঁর সেই গৃহ কখনই সুখকর হতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, গৃহে যদি স্নেহময়ী মাতা ও সুশীলা পত্নী থাকে, তা হলে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যকতার জন্যই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

ক্ব বর্ততে সা ললনা মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে ।
যা মামুদ্ধরতে প্রজ্ঞাং দীপয়ন্তী পদে পদে ॥ ১৬ ॥

ক্ব—কোথায়; **বর্ততে**—অবস্থান করছে; **সা**—সেই; **ললনা**—রমণী; **মজ্জন্তম্**—নিমজ্জিত হওয়ার সময়; **ব্যসন-অর্ণবে**—বিপদের সমুদ্রে; **যা**—যে; **মাম্**—আমাকে; **উদ্ধরতে**—উদ্ধার করে; **প্রজ্ঞাম্**—সদ্‌বুদ্ধি; **দীপয়ন্তী**—আলোকে উদ্ভাসিত করে; **পদে পদে**—প্রতি পদে

অনুবাদ

দয়া করে আমাকে বল, বিপদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হলে, যে আমাকে সর্বদা উদ্ধার করে, সেই সুন্দরী ললনা কোথায় অবস্থান করছে? প্রতি পদে আমাকে সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করে সে সর্বদা আমাকে রক্ষা করে।

তাৎপর্য

সুশীলা পত্নী ও সদ্‌বুদ্ধির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যাঁর সদ্‌বুদ্ধি রয়েছে, তিনি যথাযথভাবে বিবেচনা করতে পারেন এবং বহু বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। এই সংসারে প্রতিপদে বিপদ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৫৮) বলা হয়েছে—*পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্।* এই জড় জগৎ প্রকৃতপক্ষে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অথবা ভগবদ্ভক্তের থাকার উপযুক্ত স্থান নয়, কারণ এখানে প্রতি পদে বিপদ রয়েছে বৈকুণ্ঠ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের প্রকৃত আলয়, কারণ সেখানে কোন উৎকণ্ঠা নেই এবং বিপদ নেই। সদ্‌বুদ্ধি মানে হচ্ছে কৃষ্ণচেতনা লাভ করা। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* বলা হয়েছে—*যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।* কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ না হলে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না

এখানে আমরা দেখছি যে, রাজা পুরঞ্জন তাঁর সুশীলা পত্নীর অন্বেষণ করছিলেন, যিনি এই জড় জগতের সমস্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সর্বদা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, প্রকৃত পত্নী হচ্ছেন ধর্মপত্নী, অর্থাৎ, ধর্ম অনুসারে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যখন স্ত্রীকে অঙ্গীকার করা হয়, তখন তাঁকে বলা হয় ধর্মপত্নী, কারণ ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মপত্নী থেকে উৎপন্ন সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু অবিবাহিতা পত্নী থেকে উৎপন্ন সন্তানের পিতার সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না। ধর্মপত্নী শব্দটি পতিব্রতা পত্নীকেও বোঝায় পতিব্রতা পত্নী হচ্ছেন তিনি, যাঁর বিবাহের পূর্বে কোন পুরুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না স্ত্রীদের যদি যৌবনে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তা হলে তার সতীত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন হয় সাধারণত তাদের সতীত্ব থাকে না আগুনের সামনে মাখন আনলে তা গলবেই। স্ত্রী হচ্ছে আগুনের মতো এবং পুরুষ মাখনের মতো। কিন্তু কেউ যদি ধর্ম অনুসারে বিবাহের মাধ্যমে পতিব্রতা স্ত্রী প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি তাঁকে জীবনের বহু বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার পত্নী সমস্ত সদ্‌বুদ্ধির উৎস হতে পারেন। এই প্রকার সুশীলা পত্নীসহ সমস্ত পরিবার যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন সেই গৃহ গৃহস্থ-আশ্রমে পরিণত হয়

শ্লোক ১৭

রামা ঊচুঃ

নরনাথ ন জানীমস্ত্বৎপ্রিয়া যদ্ব্যবস্যতি ।
ভূতলে নিরবস্তারে শয়ানাং পশ্য শত্রুহন্ ॥ ১৭ ॥

রামাঃ ঊচুঃ—সেই রমণীরা বললেন; **নর-নাথ**—হে রাজন্, **ন জানীমঃ**—আমরা জানি না; **ত্বৎ-প্রিয়া**—আপনার প্রিয়া; **যৎ ব্যবস্যতি**—কেন এই প্রকার জীবন অবলম্বন করেছেন; **ভূ-তলে**—মাটিতে; **নিরবস্তারে**—শয্যাবিহীন; **শযানাম্**—শয়ন করেছেন, **পশ্য**—দেখুন, **শত্রু-হন্**—হে শত্রু হত্যাকারী।

অনুবাদ

সেই রমণীরা তখন রাজাকে বললেন—হে নরনাথ! আপনার স্ত্রী যে কেন এইভাবে অবস্থান করছেন, তা আমরা জানি না। হে শত্রুহন্! দয়া করে দেখুন! বিনা শয্যায় তিনি ভূমিতে শয়ন করে রয়েছেন। তিনি যে কেন এইভাবে আচরণ করছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি না।

তাৎপর্য

মানুষ যখন বিষ্ণুভক্তি রহিত হয়, তখন সে বহু পাপকর্মে লিপ্ত হয়। রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীকে উপেক্ষা করে গৃহত্যাগ করে পশুহত্যায় লিপ্ত হয়েছিলেন। এটি হচ্ছে সমস্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের অবস্থা তারা বিবাহিতা পতিব্রতা পত্নীর প্রতি যত্নবান হয় না তারা পত্নীকে ভগবদ্ভক্তি সাধনের অবলম্বন বলে মনে না করে, তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের একটি যন্ত্র বলে মনে করে। অসংযত যৌন জীবন উপভোগ করার জন্য কর্মীরা কঠোর পরিশ্রম করে। তারা স্থির করেছে যে, কিছু পয়সা দিয়ে যে কোন স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সুখ উপভোগ করাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা, যেন স্ত্রীলোকেরা হচ্ছে বাজারের পণ্যদ্রব্য। তাই এই সমস্ত জড় জাগতিক সম্পদ উপার্জন করার জন্য তারা কঠোর পরিশ্রমে তাদের শক্তি ক্ষয় করে। এই প্রকার জড়বাদী মানুষেরা তাদের শুভ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। তাদের হৃদয়ে সেই বুদ্ধির অন্বেষণ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে ব্যক্তি পতিব্রতা পত্নী লাভ করেনি, তার বুদ্ধি সর্বদাই বিভ্রান্ত।

মহারাজ পুরঞ্জনের পত্নী ভূতলে শয়ন করেছিলেন কারণ তাঁর পতি তাঁকে অবহেলা করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে পতির কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা স্ত্রীকে রক্ষা করা আমরা সব সময় বলি যে, লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষে অবস্থিত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পত্নীকে তাঁর পতির আলিঙ্গনে থাকা কর্তব্য। তার ফলে তিনি তাঁর পতির প্রেমে ধন্য হন এবং তাঁর কাছে সুরক্ষিত থাকেন মানুষ যেমন তার ধন সঞ্চয় করে ব্যক্তিগতভাবে তা রক্ষা করেন, তেমনই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পত্নীকে নিজের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত রাখা। বুদ্ধি যেমন সর্বদা হৃদয়ের অভ্যন্তরে

থাকে, তেমনই পতির কর্তব্য হচ্ছে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে সর্বদা তাঁর বক্ষে রাখা সেটিই হচ্ছে পতি-পত্নীর আদর্শ সম্পর্ক। তাই পত্নীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী। এক পা, এক হাত অথবা শরীরের অর্ধঅঙ্গ নিয়ে কেউ থাকতে পারে না। তাঁর উভয় অঙ্গই প্রয়োজন। তেমনই, প্রকৃতির নিয়মে, পতি ও পত্নীর একত্রে থাকা উচিত নিম্নতর যোনিতে, পক্ষী ও পশুসমাজে দেখা যায় যে, প্রকৃতির নিয়মে পতি পত্নী একত্রে বাস করে. এইভাবে মানব-জীবনেও পতি ও পত্নীর একসাথে বাস করাই আদর্শ জীবন। গৃহটি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের স্থান হওয়া উচিত, এবং পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে পতিব্রতা হয়ে ধর্ম অনুষ্ঠান সম্পাদন করা. এইভাবে মানুষ তার গৃহে সুখী হতে পারে।

শ্লোক ১৮

নারদ উবাচ

পুরঞ্জনঃ স্বমহিষীং নিরীক্ষ্যাবধূতাং ভুবি ।
তৎসঙ্গোন্মথিতজ্ঞানো বৈক্লব্যং পরমং যযৌ ॥ ১৮ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন, **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **স্ব-মহিষীম্**—তাঁর রাণীকে; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অবধূতাম্**—অবধূতের মতো; **ভুবি**—ভূমির উপর, **তৎ**—তাঁর, **সঙ্গ**—সঙ্গে; **উন্মথিত**—অনুপ্রাণিত; **জ্ঞানঃ**—যার জ্ঞান; **বৈক্লব্যম্**—ব্যাকুল; **পরমম্**—পরম; **যযৌ**—হয়েছিলেন

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! রাজা পুরঞ্জন তাঁর মহিষীকে অবধূতের মতো ভূতলে পতিতা দেখে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অবধূতাম্* শব্দটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা দেহের প্রতি উদাসীন তপস্বীকে বোঝায়। রাণীকে আলুলায়িত বেশে শয্যাবিহীন ভূমিতে শায়িত দেখে, রাজা পুরঞ্জনের অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি যে তাঁকে অবহেলা করে বনে পশুবধ করতে গিয়েছিলেন, সেই জন্য তাঁর অনুতাপ হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মানুষ যখন তার শুভ বুদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অথবা শুভ বুদ্ধিকে অবহেলা করে, তখন সে পূর্ণরূপে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। শুভ বুদ্ধি বা কৃষ্ণভাবনামৃতকে অবহেলা করার ফলে, মানুষ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হয়।

মানুষ যখন সেই কথা বুঝতে পারে, তখন সে অনুতপ্ত হয়। এই প্রকার অনুতাপের বর্ণনা করে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন —

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য-জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করা, জেনে শুনে বিষপান করারই মতো। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, মানুষ যখন তার সুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে হারায়, অর্থাৎ সে যখন তার শুভ বুদ্ধি হারিয়ে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে না, তখন সে নিশ্চিতভাবে পাপকর্মে আসক্ত হয়ে পড়ে

শ্লোক ১৯

সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হৃদয়েন বিদূয়তা ।
প্রেয়স্যাঃ স্নেহসংরম্ভলিঙ্গমাত্মনি নাভ্যগাৎ ॥ ১৯ ॥

সান্ত্বয়ন্—সান্ত্বনা দিয়ে; **শ্লক্ষ্ণয়া**—মধুর; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **হৃদয়েন**—হৃদয়ের দ্বারা, **বিদূয়তা**—অত্যন্ত অনুতাপ করে; **প্রেয়স্যাঃ**—তাঁর প্রেয়সীর **স্নেহ**—স্নেহ থেকে; **সংরম্ভ**—ক্রোধের; **লিঙ্গম্**—লক্ষণ; **আত্মনি**—তাঁর হৃদয়ে; **ন**—করেনি; **অভ্যগাৎ**—উত্থিত হয়েছিল।

অনুবাদ

দুঃখিত অন্তরে, রাজা তাঁর পত্নীকে মধুর বচনে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলেন যদিও তাঁর অন্তর অনুশোচনায় পূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তাঁর প্রিয় পত্নীর প্রণয়জনিত কোপের উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

তাৎপর্য

রাজা তাঁর মহিষীকে ত্যাগ করে পাপকর্ম করার উদ্দেশ্যে বনে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন কেউ যখন কৃষ্ণভক্তি ও শুভবুদ্ধি পরিত্যাগ করে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত হন তখন তাঁর জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বার খুলে যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*পরাভবস্তাবদবোধজাতো যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।* মানুষ যখন তার কৃষ্ণচেতনা

হারায় এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রতি আর আগ্রহ থাকে না, তখন তার পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণভাবনা বিহীন সমস্ত কার্যকলাপই জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই মনুষ্য জীবনে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। এই পন্থার দ্বারাই কেবল অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২০

অনুনিন্যেঽথ শনকৈর্বীরোঽনুনয়কোবিদঃ ।
পস্পর্শ পাদযুগলমাহ চোৎসঙ্গলালিতাম্ ॥ ২০ ॥

অনুনিন্যে—অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করেছিলেন; **অথ**—এইভাবে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **বীরঃ**—বীর; **অনুনয়-কোবিদঃ**—অনুনয়-বিনয়ে অত্যন্ত নিপুণ; **পস্পর্শ**—স্পর্শ করে; **পাদ-যুগলম্**—পদযুগল; **আহ**—তিনি বলেছিলেন; **চ**—ও; **উৎসঙ্গ**—ক্রোড়ে; **লালিতাম্**—আলিঙ্গন করেছিলেন।

অনুবাদ

অনুনয়-বিনয়ে অত্যন্ত নিপুণ রাজা ধীরে ধীরে তাঁর মহিষীকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর পদযুগল স্পর্শ করেছিলেন, তারপর তাঁকে তাঁর ক্রোড়ে স্থাপন করে, গভীর আবেগে আলিঙ্গন করেছিলেন, এবং তাঁকে এইভাবে বলতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষকে প্রথমে তার পূর্বকৃত কর্মের জন্য অনুতাপ করে, তার কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করতে হয়। রাজা পুরঞ্জন যেভাবে তাঁর মহিষীর কাছে অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে পূর্বের মতো আর ভগবদ্বিমুখ কার্যকলাপ না করার সংকল্প করে, কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হয়। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে, প্রণতি নিবেদন করতে হয়। নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা কখনই কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায় না। তাই শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সমীপবর্তী হয়ে তাঁর চরণ কমল স্পর্শ করতে হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই বলেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।

মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/৩২)

মহাত্মা বা মহান ভগবদ্ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের রেণু মস্তকে ধারণ না করা পর্যন্ত, ভগবদ্ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। এটিই হচ্ছে শরণাগতির শুরু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চান যে, সকলেই যেন তাঁর শরণাগত হয়, এবং এই শরণাগতির পন্থার শুরু হয় যখন মানুষ সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করে। নিষ্ঠা সহকারে সদ্‌গুরুর সেবা করার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তিময় পারমার্থিক জীবনের শুরু হয়। শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড় জগতে নিজের পদগর্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ করা। যারা এই জড় জগতে তাদের উচ্চ পদের জন্য বৃথা গর্বিত হয়—যেমন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা—তারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক। তারা সব কিছুর পরম কারণকে জানে না। যদিও তারা মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু তারা সেই ব্যক্তির শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হতে চায় না, যিনি সব কিছু সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মানসিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কখনও কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করা যায় না। সেই জন্য অবশ্যই সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হয়। সেটিই হচ্ছে এক মাত্র পন্থা।

শ্লোক ২১

পুরঞ্জন উবাচ

নূনং ত্বকৃতপুণ্যাস্তে ভৃত্যা যেষ্বীশ্বরাঃ শুভে।
কৃতাগঃস্বাত্মসাৎকৃত্বা শিক্ষাদণ্ডং ন যুঞ্জতে ॥ ২১ ॥

পুরঞ্জনঃ উবাচ—পুরঞ্জন বললেন; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **তু**—তা হলে; **অকৃত-পুণ্যাঃ**—যারা পুণ্যবান নয়; **তে**—সেই প্রকার; **ভৃত্যাঃ**—সেবকেরা; **যেষু**—থাকে; **ঈশ্বরাঃ**—প্রভুগণ; **শুভে**—হে কল্যাণী; **কৃত-আগঃসু**—অপরাধ করে; **আত্মসাৎ**—নিজের বলে গ্রহণ করা; **কৃত্বা**—তা করে; **শিক্ষা**—শিক্ষণীয়; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **ন যুঞ্জতে**—দেয় না।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন বললেন—হে কল্যাণী! প্রভু যখন তাঁর ভৃত্যকে নিজের লোক বলে মনে করেন, কিন্তু তার অপরাধের জন্য তাকে দণ্ড দেন না, তখন সেই ভৃত্য অবশ্যই মন্দভাগ্য।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় গৃহপালিত পশু ও ভৃত্যদের নিজের সন্তানের মতো বলে মনে করা হয়। পশু ও শিশুদের অনেক সময় দণ্ড দেওয়া হয়। সেই দণ্ড প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাব নিয়ে দেওয়া হয় না, অনুরাগবশত দেওয়া হয়। তেমনই প্রভু কখনও কখনও ভৃত্যকে দণ্ড দেন, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়, পক্ষান্তরে তার প্রতি অনুরাগবশত তাকে সংশোধন করার জন্য। এইভাবে পুরঞ্জন তাঁর প্রতি তাঁর মহিষীর দণ্ডকে তাঁর কৃপা বলে মনে করেছিলেন। তিনি নিজেকে রানীর সব চাইতে বিশ্বস্ত সেবক বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মহিষী তাঁর পাপকর্মের জন্য, অর্থাৎ তাঁকে গৃহে ফেলে রেখে বনে মৃগয়ায় যাওয়ার জন্য তাঁর প্রতি কুপিতা হয়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জন সেই দণ্ডকে তাঁর পত্নীর প্রকৃত প্রেম ও অনুরাগ বলে মনে করেছিলেন। তেমনই, কেউ যখন প্রকৃতির নিয়মে, ভগবানের ইচ্ছায় দণ্ডিত হয়, তখন বিচলিত হওয়া উচিত নয়। সেটি হচ্ছে প্রকৃত ভক্তের বিচার ভক্ত যখন কোন অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়েন, তখন তিনি সেটিকে ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্ত জীবনের দুঃখ-দুর্দশাগুলিকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন তিনি মনে করেন যে, তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে তাঁকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু কৃপাপূর্বক ভগবান তাঁর দণ্ডকে লাঘব করে দিয়েছেন, এবং তাই তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে অধিকতর প্রার্থনা ও প্রণতি নিবেদন করেন। কারও অপরাধের জন্য যদি রাষ্ট্র অথবা ভগবান তাকে দণ্ড দেন, তা হলে সেটি তার পক্ষে লাভজনক। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, রাজা যখন হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তখন সেই রাজাকে দয়ালু বলে মনে করা উচিত কেননা হত্যাকারী এই জীবনে দণ্ডভোগ করে তার পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তী জীবনে নিষ্পাপরূপে জন্মগ্রহণ করে প্রভুর দেওয়া দণ্ডকে কেউ যদি পুরস্কার বলে মনে করেন, তা হলে সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর কখনও সেই ভুল করেন না।

শ্লোক ২২

পরমোঽনুগ্রহো দণ্ডো ভৃত্যেষু প্রভুণার্পিতঃ ।
বালো ন বেদ তত্তন্বি বন্ধুকৃত্যমমর্ষণঃ ॥ ২২ ॥

পরমঃ—পরম, **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **দণ্ডঃ**—দণ্ড, **ভৃত্যেষু**—ভৃত্যদের উপর, **প্রভুণা**—প্রভুর দ্বারা; **অর্পিতঃ**—প্রদত্ত, **বালঃ**—মূর্খ; **ন**—করে না, **বেদ**—জানা, **তৎ**—তা; **তন্বি**—হে কৃশাঙ্গী, **বন্ধু কৃত্যম্**—বন্ধুর কর্তব্য; **অমর্ষণঃ**—ক্রুদ্ধ।

অনুবাদ

হে কৃশাঙ্গী! প্রভু যখন ভৃত্যকে দণ্ড দেন, তখন ভৃত্যের কর্তব্য হচ্ছে তা পরম অনুগ্রহ বলে মনে করা। যে ভৃত্য তাতে ক্রোধ করে, সে নিশ্চয়ই অজ্ঞ; কারণ সে জানে না যে, সেটিই হচ্ছে বন্ধুর কর্তব্য।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, মূর্খকে যদি সদুপদেশ দেওয়া হয়, তা হলে সে তা গ্রহণ করতে পারে না। উল্টে সে ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধকে সাপের বিষের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ সাপকে যখন দুধকলা খাওয়ানো হয় তখন তার বিষ বৃদ্ধি পায়। সাপকে ভাল ভাল খাদ্য খেতে দিলে, দয়ালু ও বিনম্র হওয়ার পরিবর্তে সাপের বিষ বৃদ্ধি পায়। তেমনই, মূর্খকে যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন সে নিজেকে সংশোধন করার পরিবর্তে ক্রুদ্ধ হয়।

শ্লোক ২৩

সা ত্বং মুখং সুদতি সুভ্রনুরাগভার-
ব্রীড়াবিলম্ববিলসদ্ধসিতাবলোকম্ ।
নীলালকালিভিরুপস্কৃতমুন্নসং নঃ
স্বানাং প্রদর্শয় মনস্বিনি বল্গুবাক্যম্ ॥ ২৩ ॥

সা—সেই (তুমি, আমার পত্নী); **ত্বম্**—তুমি, **মুখম্**—তোমার মুখ; **সু-দতি**—হে সুদশনে; **সু-ভ্রু**—সুন্দর ভ্রূসমন্বিতা, **অনুরাগ**—আসক্তি; **ভার**—ভার, **ব্রীড়া**—স্ত্রীসুলভ লজ্জা; **বিলম্ব**—বিলম্বিত; **বিলসৎ**—উজ্জ্বল; **হসিত**—হাস্য; **অবলোকম্**—কটাক্ষ, **নীল**—নীল, **অলক**—কেশযুক্ত, **অলিভিঃ**—ভ্রমরের মতো; **উপস্কৃতম্**—ভূষিত; **উন্নসম্**—উন্নত নাসিকা, **নঃ**—আমাকে; **স্বানাম্**—যে তোমার; **প্রদর্শয়**—দেখাও, **মনস্বিনি**—হে মনস্বিনী; **বল্গু-বাক্যম্**—মধুর বাক্যের দ্বারা

অনুবাদ

হে প্রিয়ে, হে সুদর্শনে! তোমার আকর্ষণীয় কার্যকলাপের ফলে, তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীল বলে মনে হচ্ছে। দয়া করে তোমার এই ক্রোধ পরিত্যাগ করে আমার প্রতি কৃপাপরবশ হও, এবং অনুরাগ ভরে একটু হাস। তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে যখন আমি তোমার মধুর হাসি দর্শন করি, এবং তোমার ঘন নীল সুন্দর কেশদাম ও তোমার উন্নত নাসিকা দর্শন করি এবং তোমার মধুর বাক্যালাপ শ্রবণ করি, তখন তুমি আমার কাছে আরও অধিক সুন্দর হয়ে ওঠ এবং তার ফলে তুমি আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ কর এবং কৃতার্থ কর। তুমি হচ্ছ আমার পরম আদরিণী প্রিয়তমা।

তাৎপর্য

স্ত্রৈণ পতি তার পত্নীর বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে, তার আজ্ঞাকারী দাস হতে চায়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন একটা রক্ত ও মাংসের পিণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট না হই। একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এক সময় কোন পুরুষ এক সুন্দরী রমণীর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে, তার কাছে এমনভাবে প্রেম নিবেদন করে যে, তখন সেই রমণীটি তার সৌন্দর্যের উপাদানগুলি তাকে দেখাবার এক পরিকল্পনা করে। সে সেই পুরুষটিকে একটি নির্দিষ্ট দিনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলে, এবং ইতিমধ্যে সে জোলাপ নিয়ে দিনরাত কেবল মলত্যাগ করতে থাকে, এবং সেই মল সে একটি পাত্রে সংগ্রহ করে রাখে। পরের দিন রাত্রে সেই পুরুষটি যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে তখন সেই সুন্দরী রমণীর পরিবর্তে সে এক রুগ্ন কুৎসিত স্ত্রীলোককে দেখতে পায়। সে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে, যার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ করার কথা ছিল, সেই সুন্দরী রমণীটি কোথায়, তখন সে উত্তর দেয়, "আমিই সেই রমণী।" তার সেই কথায় পুরুষটির বিশ্বাস হয়নি। তাঁর জোলাপের প্রভাবে যে তার সমস্ত সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে, তা সে বুঝতে পারেনি। পুরুষটি যখন তার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে থাকে, তখন রমণীটি বলে যে, সে তার সৌন্দর্যের উপাদানগুলি আলাদা করে রেখে দিয়েছে বলে, তাকে আর সুন্দর দেখাচ্ছে না। পুরুষটি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করে, তার থেকে তার সৌন্দর্য আলাদা হওয়া কি করে সম্ভব, তখন রমণীটি বলে, "আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাকে দেখাব।" এইভাবে সে তখন তাকে তরল দাস্ত ও বমিতে পূর্ণ সেই পাত্রটি দেখায়। এইভাবে পুরুষটি তখন বুঝতে পারে যে সেই সুন্দরী রমণীটি কেবল রক্ত, মল, মূত্র আদি ঘৃণ্য সমস্ত উপাদানের একটি পিণ্ড

মাত্র। এটিই হচ্ছে বাস্তব সত্য, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ মায়িক সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মায়ার শিকার হয়।

রাজা পুরঞ্জন তাঁর মহিষীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর পূর্বসৌন্দর্য প্রকাশ করেন। তিনি তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক যেভাবে জীব তার আদি চেতনা বা কৃষ্ণ-চেতনা পুনর্জাগরিত করার চেষ্টা করে, যা অত্যন্ত সুন্দর। কৃষ্ণভক্তির সুন্দর অঙ্গের সঙ্গে মহিষীর সমস্ত সুন্দর অঙ্গের তুলনা করা যেতে পারে। কেউ যখন তাঁর মূল কৃষ্ণ-চেতনায় ফিরে যায়, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাপরায়ণ হন, এবং তাঁর জীবন তখন সার্থক হয়।

শ্লোক ২৪

তস্মিন্দধে দমমহং তব বীরপত্নি
যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎকৃতকিল্বিষস্তম্ ।
পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যা-
মন্যত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাৎ ॥ ২৪ ॥

তস্মিন্—তাকে; **দধে**—দেব; **দমম্**—দণ্ড; **অহম্**—আমি; **তব**—তোমাকে; **বীর-পত্নি**—হে বীরের পত্নী; **যঃ**—যে; **অন্যত্র**—অন্যথা; **ভূ-সুর-কুলাৎ**—এই পৃথিবীতে দেবতাদের কুল থেকে (ব্রাহ্মণ); **কৃত**—অনুষ্ঠিত; **কিল্বিষঃ**—অপরাধ; **তম্**—তাকে; **পশ্যে**—আমি দেখি; **ন**—না; **বীত**—ব্যতীত; **ভয়ম্**—ভয়; **উন্মুদিতম্**—উৎকণ্ঠা রহিত; **ত্রি-লোক্যাম্**—ত্রিভুবনে; **অন্যত্র**—অন্য কোথাও; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **মুর-রিপোঃ**—মুর নামক অসুরের শত্রু (কৃষ্ণের); **ইতরত্র**—পক্ষান্তরে; **দাসাৎ**—ভৃত্য অপেক্ষা।

অনুবাদ

হে বীরপত্নী! আমাকে তুমি বল কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে? সেই ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত না হন, তা হলে আমি তাকে দণ্ড দিতে প্রস্তুত। মুররিপু শ্রীকৃষ্ণের সেবক ব্যতীত, এই ত্রিলোকে আমি অন্য আর কাউকে ক্ষমা করব না। তোমার চরণে অপরাধ করে কেউই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারবে না, কারণ আমি তাকে প্রচণ্ড দণ্ডদান করব।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় ব্রহ্মজ্ঞান সমন্বিত ব্রাহ্মণ এবং মুর নামক অসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত রাষ্ট্রের আইনের অতীত অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব যদি রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করেন, তবুও তাঁরা দণ্ডনীয় নন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা কখনও রাষ্ট্রের অথবা প্রকৃতির আইন অমান্য করেন না, কারণ তাঁরা এইভাবে আইন ভঙ্গ করার পরিণতি খুব ভালভাবেই জানেন। যদিও কখনও কখনও মনে হতে পারে যে, তাঁরা আইন ভঙ্গ করেছেন, তবুও তাঁরা দণ্ডনীয় নন। নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে সেই উপদেশ দিয়েছেন। রাজা পুরঞ্জন ছিলেন রাজা প্রাচীনবর্হিষতের প্রতীক, এবং নারদ মুনি রাজা প্রাচীনবর্হিষৎকে তাঁর পূর্বপুরুষ পৃথু মহারাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি কখনও ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবকে দণ্ডদান করেননি।

মানুষের শুদ্ধ বুদ্ধি বা শুদ্ধ কৃষ্ণ চেতনা জড় জাগতিক কার্যকলাপের প্রভাবে দূষিত হয়ে যেতে পারে। দান, ধ্যান, যজ্ঞ, পুণ্যকর্ম ইত্যাদির দ্বারা শুদ্ধ চেতনাকে জাগরিত করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ করার ফলে কৃষ্ণচেতনা যখন দূষিত হয়ে যায়, তখন তা পুনর্জাগরিত করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব অপরাধকে 'হাতী মাতা' অপরাধ বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পাগলা হাতি কোন বাগানে ঢুকলে যেমন বাগানটি তচনচ হয়ে যায়, তেমনই বৈষ্ণব অপরাধের ফলে ভক্তিলতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের চরণে যাতে অপরাধ না হয়, সেই জন্য অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। বৈষ্ণব মহারাজ অম্বরীষের চরণে অপরাধ করার ফলে মহাযোগী দুর্বাসাও সুদর্শন চক্রের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, যদিও মহারাজ অম্বরীষ ব্রাহ্মণ অথবা সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সাধারণ গৃহস্থ। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন বৈষ্ণব, এবং তাই তাঁর চরণে অপরাধ করার ফলে, দুর্বাসা মুনিকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল।

মূল কথা হচ্ছে যে, কৃষ্ণ-চেতনা যদি জড়-জাগতিক পাপকর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তা হলে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সেই পাপ দূর করা যায়, কিন্তু কারও কৃষ্ণ-চেতনা যদি ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করার ফলে কলুষিত হয়ে যায়, তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণের চরণে ক্ষমাভিক্ষা করে এবং তার প্রসন্নতা-বিধান করে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কৃষ্ণচেতনা পুনর্জাগরিত করা যায় না। দুর্বাসা মুনিকে সেই পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছিল—তাঁকে মহারাজ অম্বরীষের শরণাগত হতে হয়েছিল। যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়েছে, তাঁর কাছ থেকে ক্ষমাভিক্ষা করা ছাড়া, অন্য কোন উপায়ে বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ২৫

বক্ত্রং ন তে বিতিলকং মলিনং বিহর্ষং
সংরম্ভভীমমবিমৃষ্টমপেতরাগম্ ।
পশ্যে স্তনাবপি শুচোপহতৌ সুজাতৌ
বিম্বাধরং বিগতকুঙ্কুমপঙ্করাগম্ ॥ ২৫ ॥

বক্ত্রম্—মুখ; **ন**—কখনই না; **তে**—তোমার; **বিতিলকম্**—অলঙ্কার-বিহীন, **মলিনম্**—মলিন; **বিহর্ষম্**—বিষণ্ণ; **সংরম্ভ**—ক্রোধে; **ভীমম্**—ভয়ঙ্কর; **অবিমৃষ্টম্**—কান্তিহীন, **অপেত-রাগম্**—অনুরাগশূন্য, **পশ্যে**—আমি দেখেছি; **স্তনৌ**—তোমার স্তন যুগল, **অপি**—ও; **শুচা উপহতৌ**—অশ্রুসিক্ত; **সু-জাতৌ**—অত্যন্ত সুন্দর; **বিম্ব-অধরম্**—রক্তিম অধর; **বিগত**—রহিত; **কুঙ্কুম-পঙ্ক**—কেশর; **রাগম্**—রং।

অনুবাদ

প্রিয়ে! ইতিপূর্বে আমি তোমার মুখ কখনও তিলকবিহীন দেখিনি, এই রকম বিষণ্ণ, অনুজ্জ্বল ও স্নেহশূন্য মুখ কখনও দর্শন করিনি। তোমার সুন্দর স্তনযুগল আমি কখনও অশ্রুসিক্ত দেখিনি, এবং বিম্বফলের মতো রক্তিম তোমার অধর এইভাবে রক্তিম আভাশূন্য হতে ইতিপূর্বে আমি কখনই দেখিনি।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকেরা যখন তিলক ও সিঁদুরের দ্বারা ভূষিতা থাকেন, তখন তাঁদের খুব সুন্দর দেখায়। তাঁদের ঠোঁট যখন কেশর ও তাম্বুলের রাগে রক্তিম হয়ে ওঠে, তখন তা খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের চেতনা ও বুদ্ধি যখন উজ্জ্বল কৃষ্ণচেতনা-বিহীন হয়, তখন তা এতই বিষণ্ণ ও কান্তিহীন হয়ে যায় যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তা থেকে কোন লাভ হয় না

শ্লোক ২৬

তস্মে প্রসীদ সুহৃদঃ কৃতকিল্বিষস্য
স্বৈরং গতস্য মৃগয়াং ব্যসনাতুরস্য ।
কা দেবরং বশগতং কুসুমাস্ত্রবেগ-
বিস্রস্তপৌংস্নমুশতী ন ভজেত কৃত্যে ॥ ২৬ ॥

তৎ—অতএব; **মে**—আমার প্রতি; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হও; **সু-হৃদঃ**—অন্তরঙ্গ বন্ধু; **কৃত-কিল্বিষস্য**—পাপকর্ম করার ফলে; **স্বৈরম্**—স্বতন্ত্রভাবে; **গতস্য**—যে গিয়েছিল; **মৃগয়াম্**—শিকার করতে; **ব্যসন-আতুরস্য**—পাপপূর্ণ বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **কা**—কোন্ স্ত্রী; **দেবরম্**—পতি; **বশ-গতম্**—তার বশীভূত; **কুসুম-অস্ত্র-বেগ**—কামদেবের বাণের দ্বারা বিদ্ধ; **বিস্রস্ত**—বিক্ষিপ্ত; **পৌংস্নম্**—ধৈর্য; **উশতী**—অত্যন্ত সুন্দর; **ন**—কখনই না; **ভজেত**—ভজনা করবে; **কৃত্যে**—যথাযথ কর্তব্য অনুসারে।

অনুবাদ

হে রাণী! আমার পাপপূর্ণ বাসনার ফলে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে বনে শিকার করতে গিয়েছিলাম। তাই আমি তোমার কাছে অপরাধ করেছি। তবুও আমাকে তোমার সবচাইতে অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলে মনে করে, আমার ত্রুটি মার্জনা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বাস্তবিকপক্ষে আমি অত্যন্ত দুঃখী, কিন্তু কামদেবের বাণের আঘাতে আমি অত্যন্ত কামার্ত হয়েছি। কোন্ সুন্দরী রমণী তার কামুক পতিকে ত্যাগ করে তার সঙ্গে মিলিত হতে অস্বীকার করবে?

তাৎপর্য

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরস্পরকে চায়, এটিই হচ্ছে জড় জাগতিক অস্তিত্বের ভিত্তি। স্ত্রীলোকেরা সর্বদা সুন্দরভাবে নিজেদের সাজায়, যাতে তারা তাদের কামার্ত পতিদের আকৃষ্ট করতে পারে। কামার্ত পতি যখন পত্নীর কাছে আসে, তখন পত্নী তার আক্রমণাত্মক আচরণ উপভোগ করে। স্ত্রীলোকেরা যখন পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত, তা সে তার পতি হোক অথবা অন্য কোন পুরুষ হোক, অত্যন্ত কামুক হওয়ার ফলে তারা সেই আক্রমণ উপভোগ করে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যখন বুদ্ধির যথাযথ সদ্ব্যবহার হয়, তখন বুদ্ধি ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি উভয়েই গভীর তৃপ্তি অনুভব করেন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/৪৫) বলা হয়েছে—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্ ।

কর্মীদের প্রকৃত সুখ হচ্ছে যৌন জীবন। তারা গৃহের বাইরে কঠোর পরিশ্রম করে, এবং সেই পরিশ্রমের তৃপ্তিসাধনের জন্য তারা গৃহে ফিরে মৈথুনসুখ উপভোগ করে। রাজা পুরঞ্জন বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন, এবং কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কোন মানুষ যদি গৃহ থেকে দূরে থেকে কোন শহরে বা অন্য কোথাও সপ্তাহব্যাপী কার্য করে, তা

হলে সপ্তাহ অন্তে সে গৃহে ফিরে তার পত্নীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*। কর্মীরা কেবল মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে। আধুনিক মানব-সমাজ বিভিন্নভাবে অসংযত যৌন জীবন উপভোগ করার উপায় উদ্ভাবন করে, সেটিকে তাদের উন্নতি বলে মনে করে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে তা অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকট হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পুরঞ্জনের মৃগয়ায় গমন এবং তাঁর মহিষীর ক্রোধ' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

পুরঞ্জনের নগরীতে চণ্ডবেগের আক্রমণ; কালকন্যার উপাখ্যান

শ্লোক ১

নারদ উবাচ

ইত্থং পুরঞ্জনং সধ্র্যগ্বশমানীয় বিভ্রমৈঃ ।
পুরঞ্জনী মহারাজ রেমে রময়তী পতিম্ ॥ ১ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **পুরঞ্জনম্**—রাজা পুরঞ্জন; **সধ্র্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **বশমানীয়**—বশীভূত করে; **বিভ্রমৈঃ**—তার মোহময়ী প্রভাবের দ্বারা; **পুরঞ্জনী**—রাজা পুরঞ্জনের পত্নী; **মহা-রাজ**—হে মহারাজ; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **রময়তী**—পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্! বিভিন্নভাবে তাঁর পতিকে মোহিত করে এবং তাঁকে বশীভূত করে, রাজা পুরঞ্জনের পত্নী সর্বপ্রকারে তাঁর সন্তোষবিধান করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বনে শিকার করার পর, রাজা পুরঞ্জন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, এবং স্নান করে ও উপাদেয় খাদ্য আহার করে তাঁর শ্রম উপশম করার পর, তিনি তাঁর পত্নীর অন্বেষণ করেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পত্নী অবহেলিতার মতো বিনা শয্যায় এবং অবিন্যস্ত বসনে ভূমিতে শয়ন করে রয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি তখন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করতে শুরু করেছিলেন। জীব এইভাবে জড় জগতে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। জীবের পাপকর্মকে রাজা পুরঞ্জনের বনে শিকার করার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

যজ্ঞ, ব্রত, দান ইত্যাদি ধার্মীয় আচরণের মাধ্যমে পাপময় জীবনের প্রতিকার করা যায়। এইভাবে মানুষ পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে এবং সেই সঙ্গে তার স্বাভাবিক কৃষ্ণচেতনাকে জাগরিত করতে পারে। গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর স্নান করে, এবং উপাদেয় খাদ্য আহারের দ্বারা নবীনতা লাভ করে, পুরঞ্জন যখন তাঁর পত্নীর অন্বেষণ করছিলেন, তখন তাঁর পারিবারিক জীবনে শুভ চেতনার উদয় হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বেদবিহিত সুনিয়ন্ত্রিত পারিবারিক জীবন দায়িত্বহীন পাপপূর্ণ জীবন থেকে অনেক ভাল। পতি ও পত্নী যদি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করে, তা হলে তা খুবই ভাল। কিন্তু, পতি যদি তার পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়, তা হলে সে আবার জড় জগতের বন্ধনে জড়িয়ে পড়বে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই উপদেশ দিয়েছেন *অনাসক্তস্য বিষয়ান্* (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৫৫)। মৈথুন-সুখের প্রতি আসক্ত না হয়ে, পতি ও পত্নী পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের জন্য একত্রে বসবাস করতে পারে। পতির কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া এবং পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পতিব্রতা ও ধর্মপরায়ণ হওয়া। এই সমন্বয় অত্যন্ত শুভ। কিন্তু, পতি যদি মৈথুন-সুখের জন্য পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে তাদের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সাধারণত স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত কামুক। বলা হয় যে, স্ত্রীলোকদের যৌন বাসনা পুরুষদের থেকে নয়গুণ বেশি। তাই পুরুষদের কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীদের শাড়ি, গয়না, ভাল ভাল খাবার ইত্যাদি দিয়ে এবং তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপে যুক্ত করার মাধ্যমে বশীভূত রাখা। স্ত্রীলোকদের অবশ্যই কয়েকটি সন্তান থাকা উচিত, তা হলে তারা পুরুষদের বিচলিত করবে না। দুর্ভাগ্যবশত, পুরুষেরা যদি কেবল যৌনসুখ উপভোগ করার জন্যই স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা হলে পারিবারিক জীবন অত্যন্ত জঘন্য হয়ে ওঠে।

মহান রাজনীতিবিদ চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *ভার্যা রূপবতী শত্রুঃ*—সুন্দরী স্ত্রী হচ্ছে শত্রু। অবশ্য প্রত্যেক পতির দৃষ্টিতেই তার স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দর। অন্যদের কাছে সে সুন্দর বলে মনে না হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তার পতি তার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই সে সর্বদা তাকে অত্যন্ত সুন্দররূপে দর্শন করে। পতি যদি তার পত্নীকে অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে তার পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই আসক্তি হচ্ছে যৌন জীবনের প্রতি আসক্তি। সারা জগৎ রজ ও তমোগুণের দ্বারা মোহিত। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে অত্যন্ত কামুক এবং তমোগুণের প্রভাবে অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন; তাই পুরুষদের কখনও তাদের সেই রজ ও তমোগুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া

উচিত নয়। ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করার ফলে, মানুষ সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে পারে। পতি যদি সত্ত্বগুণে স্থিত হন, তা হলে তিনি রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত পত্নীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তার ফলে তাঁর কল্যাণ হয়। রজ ও তমোগুণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা বিস্মৃত হয়ে, তিনি তখন তাঁর সাত্ত্বিক পতির অনুগত হন এবং নিষ্ঠাপরায়ণ হন। এই প্রকার জীবন সকলের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক তখন পুরুষ ও স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে একত্রে কাজ করে, এবং তাঁরা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু পতি যদি সত্ত্বগুণকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর পত্নীর বশীভূত হন, তা হলে তিনি রজ ও তমোগুণের দাসত্ব করতে শুরু করেন, এবং তার ফলে সমস্ত পরিস্থিতি অত্যন্ত কলুষিত হয়ে যায়।

মূল কথা হচ্ছে যে, দায়িত্বহীন পাপময় জীবন থেকে গৃহস্থ জীবন অনেক ভাল, কিন্তু গৃহস্থ জীবনে পতি যদি পত্নীর অধীন হয়, তা হলে পুনরায় বৈষয়িক জীবন প্রবল হয়ে ওঠে এইভাবে মানুষের জড় বন্ধন দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। তাই, বৈদিক পন্থায় এক বিশেষ বয়সে পুরুষদের সংসার জীবন পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ ও সন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২

স রাজা মহিষীং রাজন্ সুস্নাতাং রুচিরাননাম্ ।
কৃতস্বস্ত্যয়নাং তৃপ্তামভ্যনন্দদুপাগতাম্ ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি; **রাজা**—রাজা, **মহিষীম্**—রাণী; **রাজন্**—হে রাজন্; **সু-স্নাতাম্**—সুন্দরভাবে স্নান করে; **রুচির-আননাম্**—সুন্দর মুখ; **কৃত-স্বস্তি-অয়নাম্** মঙ্গলজনক বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে; **তৃপ্তাম্**—সন্তুষ্ট; **অভ্যনন্দৎ**—তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন; **উপাগতাম্**—সমীপে আগতা

অনুবাদ

রাণী স্নান করে মঙ্গলময় বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে, পান-ভোজনাদির দ্বারা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে রাজার কাছে এসেছিলেন। রাজা তাঁর সুন্দরভাবে সজ্জিত আকর্ষণীয় মুখমণ্ডল দেখে, তাঁকে সাদরে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকেরা সাধারণত সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারের দ্বারা নিজেদের সাজাতে চায়। কখনও কখনও তারা ফুল দিয়ে তাদের চুল সাজায়। তারা বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের সুন্দরভাবে সাজায়, কারণ তখন তাদের পতি সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত হওয়া স্ত্রীলোকেদের কর্তব্য, কারণ তাদের পতিরা যখন গৃহে ফিরে আসেন, তখন যাতে তাঁরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, স্ত্রী হচ্ছে সমস্ত শুভ বুদ্ধির অনুপ্রেরণা। পত্নীকে সুন্দরভাবে সজ্জিত দেখে, মানুষ তার পারিবারিক কর্তব্য সম্বন্ধে সংযত চিত্তে বিচার করতে পারে। মানুষ যখন পারিবারিক বিষয়ে অত্যন্ত বিচলিত থাকে, তখন সে তার কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে না। তাই পত্নীকে পতির অনুপ্রেরণার উৎস বলে মনে করা হয়, এবং তার কর্তব্য হচ্ছে পতির বুদ্ধিকে আদর্শ অবস্থায় রাখা, যাতে তাঁরা উভয়ে মিলে নির্বিঘ্নে পারিবারিক কার্য সম্পাদন করতে পারেন

শ্লোক ৩

তয়োপগূঢ়ঃ পরিরব্ধকন্ধরো
রহোঽনুমন্ত্রৈরপকৃষ্টচেতনঃ ।
ন কালরংহো বুবুধে দুরত্যয়ং
দিবা নিশেতি প্রমদাপরিগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

তয়া—রাণীর দ্বারা; **উপগূঢ়ঃ**—আলিঙ্গিত; **পরিরব্ধ**—বেষ্টন করেছিলেন; **কন্ধরঃ**—স্কন্ধদেশ; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **অনুমন্ত্রৈঃ**—গুহ্য ভাষণের দ্বারা; **অপকৃষ্ট-চেতনঃ**—চেতনা অধঃপতিত হয়েছিল; **ন**—না; **কাল-রংহঃ**—কালের প্রবাহ; **বুবুধে**—বোধ ছিল; **দুরত্যয়ম্**—দুরতিক্রম্য; **দিবা**—দিন; **নিশা**—রাত্রি; **ইতি**—এইভাবে; **প্রমদা**—রমণীর দ্বারা; **পরিগ্রহঃ**—বিমোহিত।

অনুবাদ

রাণী পুরঞ্জনী যখন রাজাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন রাজাও তাঁর বাহুযুগলের দ্বারা তাঁর স্কন্ধদেশ বেষ্টন করেছিলেন। এইভাবে এক নির্জন স্থানে তাঁরা গুহ্য

ভাষণ করতে লাগলেন। তখন রাজা পুরঞ্জন তাঁর সুন্দরী পত্নীর দ্বারা অত্যন্ত বিমোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শুভ চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভুলে গিয়েছিলেন যে, দিন ও রাত্রি অতিবাহিত হয়ে কেবল তাঁর অনর্থক আয়ু ক্ষয় হচ্ছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রমদা* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুন্দরী স্ত্রী অবশ্যই তাঁর পতিকে অনুপ্রেরণা প্রদান করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাঁর অবনতিরও কারণ। *প্রমদা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রেরণাদায়িনী' এবং 'প্রমত্তকারিণী'। সাধারণত গৃহস্থরা দিন ও রাত্রির প্রবাহকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষেরা মনে করে যে, স্বাভাবিকভাবেই দিন আসে এবং তারপর দিন শেষ হয়ে গেলে রাত্রি আসে। সেটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, সকাল বেলা যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন তা তার অবশিষ্ট আয়ু হরণ করে নিতে থাকে। এইভাবে দিনের পর দিন আয়ু ক্ষয় হতে থাকে, এবং মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে, মূর্খ মানুষেরা কেবল নির্জন স্থানে তার পত্নীর সঙ্গসুখ উপভোগ করতে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় *অপকৃষ্ট চেতন* বা অধঃপতিত চেতনা। মনুষ্য-চেতনা কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু মানুষ যখন তার পত্নী এবং পারিবারিক বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, তখন সে কৃষ্ণভক্তিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। তার ফলে কোটি কোটি টাকার বিনিময়েও যে জীবনের একটি পলকও আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সেই কথা না জেনে সে অধঃপতিত হয়। জীবনের সবচাইতে বড় ক্ষতি হচ্ছে কৃষ্ণকে উপলব্ধি না করে জীবন অতিবাহিত করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং জীবনের যথাযথ সদ্ব্যবহার হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করা। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত জীবন কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। *শ্রম এব হি কেবলম্।* কেবল কর্তব্যনিষ্ঠ হলে জীবনে কোন লাভ হয় না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৮) বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

খুব সুন্দরভাবে নিজের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও যদি কারও কৃষ্ণভক্তির পথে প্রগতি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, ব্যর্থ পরিশ্রমে কেবল তার সময় নষ্ট হয়েছে

শ্লোক ৪

শয়ান উন্নদ্ধমদো মহামনা
মহার্হতল্পে মহিষীভুজোপধিঃ ।
তামেব বীরো মনুতে পরং যত-
স্তমোঽভিভূতো ন নিজং পরং চ যৎ ॥ ৪ ॥

শয়ানঃ—শয়ন করে; **উন্নদ্ধ-মদঃ**—অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে; **মহা-মনাঃ**—উন্নতচেতা; **মহা-অর্হ-তল্পে**—মূল্যবান শয্যায়; **মহিষী**—রানীর; **ভুজ**—বাহু; **উপধিঃ**—বালিশ; **তাম্**—তাঁর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বীরঃ**—বীর; **মনুতে**—তিনি মনে করেছিলেন; **পরম**—জীবনের লক্ষ্য; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **তমঃ**—অজ্ঞানের দ্বারা **অভিভূতঃ**—আচ্ছন্ন; **ন**—না; **নিজম্**—তাঁর প্রকৃত সত্তা; **পরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **চ**—এবং; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

এইভাবে অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে, রাজা পুরঞ্জন উন্নত চেতনা সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পত্নীর বাহুকে উপাধান করে মহামূল্য শয্যায় সর্বদা শয়ন করে রইলেন। এইভাবে তিনি সেই রমণীকে তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করতে লাগলেন। অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হওয়ার ফলে, তিনি আত্মোপলব্ধির তাৎপর্য, এবং নিজেকে ও পরমেশ্বর ভগবানকে জানার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। প্রথমে নিজেকে উপলব্ধি করতে হয়, যা এই শ্লোকে *নিজম্* বলে বর্ণিত হয়েছে। তারপর পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু কেউ যখন জড় বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, তখন সে স্ত্রীসঙ্গকেই পরমার্থ বলে মনে করে। সেটিই হচ্ছে জড় আসক্তির মূল। সেই অবস্থায় মানুষ নিজেকে অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/২) তাই বলা হয়েছে—*মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।* কেউ যদি মহাত্মাদের বা ভক্তদের সঙ্গ করে, তা হলে তার মুক্তির দ্বার খুলে যায়, কিন্তু সে যদি স্ত্রীসঙ্গের প্রতি অথবা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের প্রতি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, তা হলে *তমোদ্বারম্* বা নরকের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশের দ্বার খুলে যায়।

রাজা পুরঞ্জন ছিলেন একজন মহান আত্মা, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং উন্নত চেতনা-সমন্বিত, কিন্তু রমণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ার ফলে, তাঁর চেতনা আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক যুগে মানুষের চেতনা মদ, মাংস ও মেয়ে-মানুষের দ্বারা অত্যন্ত আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। তার ফলে মানুষ আত্ম-উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আত্ম উপলব্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নিজেকে দেহের অতীত চিন্ময় আত্মারূপে জানা। আত্ম-উপলব্ধির পরবর্তী স্তরে মানুষ জানতে পারে যে, প্রতিটি আত্মা বা প্রতিটি জীব হচ্ছে পরমাত্মার বা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় প্রকৃতিতে সমস্ত জীবেরাই হচ্ছে আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে, তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই প্রকৃতিতে অত্যন্ত কঠোর সংগ্রাম করছে।"

সমস্ত জীবেরাই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক সভ্যতায় স্ত্রী পুরুষ উভয়কে জীবনের শুরু থেকেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেওয়া হচ্ছে, এবং তার ফলে তারা আত্ম-উপলব্ধির পথে উন্নীত হতে সম্পূর্ণ অক্ষম তারা জানে না যে, মনুষ্য-জীবনের সবচাইতে বড় ক্ষতি হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি লাভ না করতে পারা। সর্বদা অন্তরে মেয়েদের কথা চিন্তা করা মূল্যবান শয্যায় স্ত্রীসঙ্গে শয়ন করারই সামিল। হৃদয়টি হচ্ছে শয্যা, এবং সেটি হচ্ছে সবচাইতে মূল্যবান শয্যা। মানুষ যখন মেয়েমানুষ ও টাকা পয়সার কথা চিন্তা করে, তখন সে প্রেমিকা অথবা পত্নীর ভুজলতায় শয়ন করে। এইভাবে প্রবলভাবে যৌন জীবনে লিপ্ত হওয়ার ফলে, সে আত্ম-উপলব্ধির অযোগ্য হয়ে যায়।

শ্লোক ৫

তয়ৈবং রমমাণস্য কামকশ্মলচেতসঃ ।
ক্ষণার্ধমিব রাজেন্দ্র ব্যতিক্রান্তং নবং বয়ঃ ॥ ৫ ॥

তয়া—তাঁর সঙ্গে; **এবম্**—এইভাবে; **রমমাণস্য**—রতিসুখ উপভোগ করে; **কাম**—কামপূর্ণ; **কশ্মল**—পাপপূর্ণ; **চেতসঃ**—তাঁর হৃদয়; **ক্ষণ-অর্ধম্**—অর্ধক্ষণ; **ইব**—সদৃশ; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজন্; **ব্যতিক্রান্তম্**—অতিক্রান্ত; **নবম্**—নবীন; **বয়ঃ**—জীবন।

অনুবাদ

হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! এইভাবে রাজা পুরঞ্জন কাম ও পাপপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর পত্নীর সঙ্গে রতিসুখ উপভোগ করতে লাগলেন, এবং এইভাবে তাঁর নবযৌবন ক্ষণার্ধের মতো অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

তাৎপর্য

শ্রীল গোবিন্দ দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

এ ধন, যৌবন পুত্র, পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে ।
কমলদলজল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে ॥

এই শ্লোকটিতে শ্রীল গোবিন্দ দাস ঠাকুর বলেছেন যে, যৌবনের যে কামভোগ তাতে কোন আনন্দ নেই। যৌবনে মানুষ নানা প্রকার ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অত্যন্ত কামার্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হচ্ছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়, অথবা বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রগতি এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে উপভোগ করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা সুন্দর রূপ দর্শন করতে, রেডিওতে জড়-জাগতিক সংবাদ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনক গান শুনতে, সুন্দর ফুলের সৌরভ গ্রহণ করতে, এবং যুবতী রমণীর কোমল শরীর বা স্তন স্পর্শ করতে এবং ক্রমে ক্রমে জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। এগুলি পশুদের কাছেও অত্যন্ত সুখদায়ক; তাই মানব-সমাজে ইন্দ্রিয়ের এই পাঁচটি বিষয় উপভোগের বিধিনিষেধ রয়েছে। কেউ যদি সেগুলি অনুসরণ না করে, তা হলে সে ঠিক একটি পশুর মতো হয়ে যায়।

তাই এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *কাম-কশ্মল-চেতসঃ*—রাজা পুরঞ্জনের চেতনা কামবাসনা ও পাপকর্মের দ্বারা কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরঞ্জন যদিও উন্নতচেতা ছিলেন, তবুও তিনি সর্বক্ষণ তাঁর পত্নীর সঙ্গে কোমল শয্যায় শয়ন করে থাকতেন। তা ইঙ্গিত করে যে, তিনি রতিক্রিয়ায় অত্যধিক লিপ্ত ছিলেন। এই শ্লোকে *নবং বয়ঃ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। নবযৌবন বলতে জীবনের ষোল থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বয়সকে বোঝায়। জীবনের এই চৌদ্দ-পনের বছর অত্যন্ত প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে উপভোগ করা যায়। এই বয়সে মানুষ মনে করে যে, সে এইভাবে চিরকাল

ইন্দ্রিয় সুখভোগ করে যেতে পারবে, কিন্তু 'কাল ও জোয়ার কারও প্রতীক্ষা করে না।' যৌবনকাল অতি শীঘ্র অতিবাহিত হয়ে যায়। যে মানুষ যৌবনকালে পাপকর্ম করে জীবন অতিবাহিত করে, যৌবন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে সে অত্যন্ত নিরাশ এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যারা কোন রকম পারমার্থিক শিক্ষালাভ করেনি, তাদের কাছেই যৌবনের জড় সুখ বিশেষভাবে সুখকর বলে মনে হয়। যারা কেবল দেহাত্ম বুদ্ধিরই শিক্ষালাভ করেছে, তাদের জীবন প্রবল নিরাশায় পর্যবসিত হয়, কারণ জড় সুখ চল্লিশ বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। চল্লিশ বছরের পর তাকে এক নৈরাশ্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে হয়, কারণ তার কোন রকম পারমার্থিক জ্ঞান নেই। এই প্রকার মানুষদের কাছে যৌবন ক্ষণার্ধের মতো অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ঠিক তেমনই রাজা পুরঞ্জনের পত্নীর ভুজলতায় শয়ন করার সুখ অতি শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়েছিল।

কাম-কশ্মল-চেতসঃ শব্দটি সূচিত করে যে, প্রকৃতির নিয়মে মনুষ্য জীবনে অসংযতভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কেউ যদি অসংযতভাবে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগ করে, তা হলে তা পাপে পর্যবসিত হয়। পশুরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে না। বছরের কোন বিশেষ মাসে পশুদের যৌন আবেদন অত্যন্ত প্রবল হয়। সিংহ অত্যন্ত শক্তিশালী। সে মাংসাশী এবং অত্যন্ত বলবান, কিন্তু সে বছরে কেবল একবার যৌনসঙ্গ উপভোগ করে। তেমনই, ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে স্ত্রী ঋতুমতী হলে, মানুষের কেবল মাসে একবার স্ত্রীসঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তা হলে তাকে সম্ভোগ করা নিষিদ্ধ। সেটিই হচ্ছে মানুষের নিয়ম। মানুষকে একাধিক পত্নী গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ পত্নী গর্ভবতী হলে তার সঙ্গে যৌনসুখ উপভোগ করা যায় না। সে যদি তখন মৈথুনসুখ উপভোগ করতে চায়, তা হলে সে অন্য পত্নীর কাছে যেতে পারে, যে গর্ভবতী নয়। এই নিয়মগুলি *মনুসংহিতা* ও অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সমস্ত নিয়ম এবং শাস্ত্র মানুষদের জন্য। কেউ যদি এই নিয়মগুলি লঙ্ঘন করে, তা হলে তার পাপ হয়। অর্থাৎ, অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সুখ হচ্ছে পাপকর্ম। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বলতে শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করে স্ত্রীসঙ্গ করাকে বোঝায়। কেউ যখন শাস্ত্র বা *বেদের* নিয়ম লঙ্ঘন করে, তখন সে পাপকর্ম করে। যারা পাপকর্মে লিপ্ত, তারা তাদের চেতনার পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে *কশ্মল* বা পাপপূর্ণ চেতনাকে পরম পবিত্র কৃষ্ণচেতনায় পরিবর্তিত করা। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং*

পরমং ভবান্), শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পবিত্র, এবং আমরা যদি আমাদের চেতনাকে জড় সুখ থেকে কৃষ্ণতে পরিবর্তন করি, তা হলে আমরা পবিত্র হতে পারি। এই পন্থাটিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *চেতোদর্পণ-মার্জনম্* বা চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন করার পন্থা বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৬

তস্যামজনয়ৎপুত্রান্ পুরঞ্জন্যাং পুরঞ্জনঃ ।
শতান্যেকাদশ বিরাড়ায়ুষোঽর্ধমথাত্যগাৎ ॥ ৬ ॥

তস্যাম্—তাঁর থেকে; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **পুত্রান্**—পুত্র; **পুরঞ্জন্যাম্**—পুরঞ্জনীতে; **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **শতানি**—শত; **একাদশ**—এগারো; **বিরাট্**—হে রাজন; **আয়ুষঃ**—জীবনের; **অর্ধম্**—অর্ধেক; **অথ**—এইভাবে; **অত্যগাৎ**—অতিবাহিত করেছিলেন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ তখন মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে বলেছিলেন—হে বিরাট (দীর্ঘ আয়ুষ্মান)। এইভাবে রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নী পুরঞ্জনীর গর্ভে এগারো শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। কিন্তু এই কার্যে তাঁর জীবনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ রয়েছে। তার প্রথমটি হচ্ছে *একাদশ শতানি।* পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর গর্ভে এগারো শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এবং সেই কার্যে তাঁর জীবনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই তাই হয়। কেউ যদি বড় জোর একশ বছর বাঁচে, তা হলে সে তার গৃহস্থ-জীবনে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত কেবল সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে। দুর্ভাগ্যবশত এখন মানুষ একশ বছর পর্যন্ত বাঁচে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ষাট বছর বয়স পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন করে। আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, পূর্বে মানুষ একশ থেকে দুইশ পুত্রকন্যা উৎপাদন করতেন। পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখব যে, রাজা পুরঞ্জন কেবল এগারো শত পুত্রই উৎপাদন করেননি, একশ দশটি কন্যাও উৎপাদন করেছিলেন। এইভাবে বহু সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করার পরিবর্তে মানব-সমাজ এখন গর্ভনিরোধক পন্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত।

বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, যদিও তখনকার দিনে মানুষেরা শত শত সন্তান উৎপাদন করতেন, তবুও তাঁরা কখনও গর্ভ-নিরোধনের পন্থা অবলম্বন করেননি। গর্ভনিরোধক পন্থায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আর একটি পাপকর্ম, কিন্তু এই কলিযুগে মানুষ এতই পাপী হয়ে গেছে যে, তাদের পাপকর্মের ফল যে কি হবে, সেই সম্বন্ধে গ্রাহ্যও করে না। রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নী পুরঞ্জনীর সঙ্গে শয়ন করে বহু সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, কিন্তু এই শ্লোকে তাঁদের গর্ভনিরোধক পন্থা অবলম্বন করার কোন উল্লেখ নেই। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে গর্ভ-নিরোধনের উপায় হচ্ছে যৌন জীবন থেকে নিবৃত্ত থাকা। এমন নয় যে, মানুষ অবাধে স্ত্রীসম্ভোগ করবে এবং কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে গর্ভনিরোধ করবে। মানুষের চেতনা যদি সুস্থ থাকে, তা হলে তিনি তাঁর ধর্মপত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে, এবং সেই পরামর্শের ফলে বুদ্ধিমত্তা সহকারে জীবনের মান নির্ধারণের যোগ্যতা অর্জন করে জীবনপথে অগ্রসর হন। অর্থাৎ, কেউ যদি সৌভাগ্যবশত সুশীলা ও বিবেকবতী পত্নী প্রাপ্ত হন, তা হলে পরস্পর আলোচনা করে তাঁরা স্থির করতে পারেন যে, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া, বহু সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করা নয় সন্তানদের *পরিণাম* বলা হয়, এবং মানুষ যখন তার শুভ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, এই পরিণাম তাঁর কৃষ্ণভক্তির বিস্তার হওয়া উচিত।

শ্লোক ৭

দুহিতৄর্দশোত্তরশতং পিতৃমাতৃযশস্করীঃ ।
শীলৌদার্যগুণোপেতাঃ পৌরঞ্জন্যঃ প্রজাপতে ॥ ৭ ॥

দুহিতৄঃ—কন্যাগণ; **দশ-উত্তর** দশটি অধিক, **শতম্** এক শত; **পিতৃ**—পিতা, **মাতৃ**—এবং মাতার মতো; **যশস্করীঃ**—যশস্বী; **শীল**—উত্তম আচরণ; **ঔদার্য**—উদারতা; **গুণ**—সদ্‌গুণাবলী; **উপেতাঃ**—সমন্বিত; **পৌরঞ্জন্যঃ**—পুরঞ্জনের কন্যাগণ; **প্রজা-পতে**—হে প্রজাপতি।

অনুবাদ

হে প্রজাপতি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! এইভাবে পুরঞ্জনের একশ দশটি কন্যাও উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের পিতা ও মাতার মতো যশস্বী। তাঁরা সুশীলা, উদার ও অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী সমন্বিতা ছিলেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রের বিধি অনুসারে উৎপন্ন সন্তান সাধারণত পিতা ও মাতার মতো সদ্‌গুণ-সমন্বিত হয়, কিন্তু অবৈধভাবে উৎপন্ন সন্তান প্রধানত বর্ণসংকর হয়। বর্ণসংকর সন্তান পরিবার, সমাজ এবং নিজেদের প্রতিও দায়িত্বহীন হয়। প্রাচীনকালে বর্ণসংকর রোধ করা হত গর্ভাধান সংস্কার পালন করার মাধ্যমে, অর্থাৎ ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করার মাধ্যমে। এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা পুরঞ্জন যদিও বহু সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, তবুও তারা বর্ণসংকর ছিল না। তারা সকলেই ছিল সৎ, সুশীল সন্তান, এবং তারা তাদের পিতামাতার মতোই সদ্‌গুণ সমন্বিত ছিল।

বহু সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করলেও, শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত মৈথুনসুখ উপভোগের বাসনা পাপময় বলে বিবেচনা করা হয়। কেবল মৈথুন-সুখই নয়, মাত্রাতিরিক্ত যে-কোন ইন্দ্রিয়-সুখই পরিণামে পাপজনক। তাই জীবনের শেষে স্বামী বা গোস্বামী হতে হয়। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ সন্তান উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পর সন্তান উৎপাদন বন্ধ করে, বানপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। এইভাবে আমাদের গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সন্ন্যাসীর উপাধি হচ্ছে স্বামী অথবা গোস্বামী, অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সুখভোগ থেকে বিরত থাকেন। খামখেয়ালীর বশে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করতে হলে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করার ব্যাপারে পূর্ণরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। রাজা পুরঞ্জনের গৃহস্থ-জীবন অবশ্যই অত্যন্ত সুখের ছিল। এই শ্লোকগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর এগারো শত পুত্র এবং একশ দশজন কন্যা ছিল। সকলেই কন্যার থেকে অধিক সংখ্যক পুত্র বাসনা করে, এবং যেহেতু পুরঞ্জনের কন্যার সংখ্যা পুত্রের থেকে কম ছিল, তাই মনে হয় রাজা পুরঞ্জন তাঁর গৃহস্থ-জীবনে অত্যন্ত সুখী ছিলেন।

শ্লোক ৮

স পঞ্চালপতিঃ পুত্রান্ পিতৃবংশবিবর্ধনান্ ।
দারৈঃ সংযোজয়ামাস দুহিতৄঃ সদৃশৈর্বরৈঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি; **পঞ্চাল-পতিঃ**—পঞ্চালের রাজা; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **পিতৃ-বংশ**—পিতার বংশে; **বিবর্ধনান্**—বর্ধন করে; **দারৈঃ**—পত্নীসহ; **সংযোজয়াম্ আস**—বিবাহ করেছিল; **দুহিতৄঃ**—কন্যাগণ; **সদৃশৈঃ**—যোগ্য; **বরৈঃ**—পতিদের সঙ্গে।

অনুবাদ

তারপর পঞ্চালপতি রাজা পুরঞ্জন তাঁর পিতৃবংশ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্রদের উপযুক্ত পত্নীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন, এবং তাঁর কন্যাদেরও যোগ্য বরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে প্রত্যেকেরই বিবাহ করা উচিত। সন্তান উৎপাদনের জন্য পত্নীর পাণিগ্রহণ করা উচিত, এবং সন্তানেরা কালক্রমে পিণ্ডদান, দাহ আদি ঔর্ধ্বদেহিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করার মাধ্যমে, পূর্বপুরুষরা যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেন শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য অর্পণ করাকে বলা হয় পিণ্ডোদক, এবং বংশধরদের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা।

পঞ্চালের রাজা পুরঞ্জন কেবল তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবনেই তৃপ্ত হননি, তিনি তাঁর এগারো শত পুত্র এবং একশ দশ কন্যার দাম্পত্য জীবনেরও আয়োজন করে গিয়েছিলেন। এইভাবে সম্ভ্রান্ত পরিবার রাজবংশের স্তরে উন্নীত হতে পাবে। এই শ্লোকের দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে যে, পুরঞ্জন তাঁর সমস্ত পুত্র ও কন্যাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের পুত্র ও কন্যাদেব বিবাহের আয়োজন করা। বৈদিক সমাজে এটি পিতামাতার একটি দায়িত্ব। বিবাহের পূর্বে পুত্র ও কন্যাদের স্বাধীনভাবে অন্য পুরুষ ও মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া উচিত নয়। এই বৈদিক সামাজিক রীতিটি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ অথবা বর্ণসংকর, যা বর্তমান সময়ে বিভিন্ন নামে প্রবলভাবে প্রচলিত হচ্ছে, তা বোধ করবাব ব্যাপারে খুব সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত এই যুগে পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কিন্তু তাঁদের পুত্রকন্যারা পিতামাতার ব্যবস্থা অনুসারে বিবাহ করতে চায় না। তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে বর্ণসংকর প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

শ্লোক ৯

পুত্রাণাং চাভবন্ পুত্রা একৈকস্য শতং শতম্ ।
যৈর্বৈ পৌরঞ্জনো বংশঃ পঞ্চালেষু সমেধিতঃ ॥ ৯ ॥

পুত্রাণাম্—পুত্রদের ; **চ**—ও; **অভবন্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **এক-একস্য**—তাদের প্রত্যেকের, **শতম্**—শত; **শতম্**—শত, **যৈঃ**—যাদের দ্বারা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **পৌরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জনের; **বংশঃ**—বংশ; **পঞ্চালেষু**—পঞ্চাল রাজ্যে; **সমেধিতঃ**—প্রবলভাবে বর্ধিত হয়েছিল।

অনুবাদ

পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্রদের প্রত্যেকের শত-শত পুত্র হয়েছিল। এইভাবে রাজা পুরঞ্জনের পুত্র ও পৌত্রদের দ্বারা পঞ্চাল রাজ্য ভরে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পুরঞ্জন হচ্ছে জীবাত্মা, এবং পঞ্চাল নগরীটি হচ্ছে দেহ দেহ হচ্ছে জীবের কর্মক্ষেত্র, যাদের সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ।* দুটি অংশ রয়েছে—একটি হচ্ছে জীব (*ক্ষেত্রজ্ঞ*), এবং অন্যটি হচ্ছে জীবের দেহ (*ক্ষেত্র*)। দেহ সম্বন্ধে একটু বিচার করলেই যে-কোন জীব বুঝতে পারে যে, তার দেহটি হচ্ছে একটি আবরণ এবং সেই দেহটি তার সম্পত্তি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা সেই কথা বোঝা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) বলা হয়েছে—*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে।* দেহের মালিক আত্মা দেহের ভিতরে রয়েছে দেহটি হচ্ছে *পঞ্চাল-দেশ* বা কর্মের ক্ষেত্র, যেখানে জীব তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূত থেকে উদ্ভূত গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চ বিষয়কে ভোগ করে। এই জড় জগতে, সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহের আবরণে আচ্ছাদিত প্রতিটি জীব কর্ম ও তার ফল সৃষ্টি করে, যেগুলিকে এখানে রূপক অর্থে পুত্র ও পৌত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দুই প্রকার কর্ম এবং তার ফল রয়েছে—পুণ্য ও পাপ। এইভাবে আমাদের জড় অস্তিত্ব বিভিন্ন প্রকার কর্মফলের দ্বারা আবৃত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

"সকাম কর্ম ও মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞান হচ্ছে দুটি বিষের ভাণ্ড। সেগুলিকে অমৃত বলে মনে করে যে তা পান করে, তাকে জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন শরীরে নানা প্রকার

দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। এই প্রকার জীবেরা নানা প্রকার কদর্য বস্তু ভক্ষণ করে এবং তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের কার্যকলাপের ফলে অধঃপতিত হয়।"

এইভাবে কর্ম ও কর্মফলের ক্ষেত্র, যার দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হয়, তার শুরু হয় যৌন জীবনের ফলে। পুরঞ্জন তার সন্তান উৎপাদন করার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করেছিল, এবং কালক্রমে তাঁর সন্তানেরাও সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করেছিল। এইভাবে জীব মৈথুন-পরায়ণ হয়ে, শত-সহস্র কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবে সে কেবল তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে এই জড় জগতে থাকে এবং এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। অনেক পুত্র ও পৌত্র উৎপাদন করার ফলে, তথাকথিত সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এই সমস্ত জাতি, সমাজ, বংশ, রাষ্ট্র বিস্তৃত হয় কেবল যৌন জীবন থেকে। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—*যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৫) গৃহমেধী হচ্ছে সে, যে এই জড় জগতে থাকতে চায়। অর্থাৎ, সে এই দেহে অথবা সমাজে থেকে বন্ধুত্ব, প্রেম ও প্রীতি উপভোগ করতে চায়। তার একমাত্র সুখ হচ্ছে মৈথুনসুখ উপভোগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সে নিজে মৈথুনসুখ উপভোগ করে সন্তান উৎপাদন করে, এবং তার সন্তানেরা কালক্রমে বিবাহ করে তাদের সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে, এবং তাদের সন্তানেরা কালক্রমে বিবাহ করে তাদের সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে। এইভাবে সারা পৃথিবী জনসাধারণে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তারপর হঠাৎ জড়া প্রকৃতির নিয়মে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে জনসংখ্যা বিনষ্ট হয়, এবং তারপর আবার তাদের সৃষ্টি হয়। সেই পন্থার বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৯) বলা হয়েছে—*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।* কৃষ্ণভাবনামৃতের অভাবে এই সমস্ত সৃষ্টি এবং বিনাশ মানব-সভ্যতার নামে চলছে। আত্মা ও পরমেশ্বর ভগবানের জ্ঞানের অভাবে এই সংসার-চক্র নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে।

শ্লোক ১০

তেষু তদ্রিক্থহারেষু গৃহকোশানুজীবিষু ।
নিরূঢ়েন মমত্বেন বিষয়েম্বন্ববধ্যত ॥ ১০ ॥

তেষু—তাদের প্রতি, **তৎ-রিক্থ-হারেষু**—তাঁর ধন লুণ্ঠনকারী; **গৃহ**—ঘর; **কোশ**—ধনাগার; **অনুজীবিষু**—অনুগামীদের; **নিরূঢ়েন**—গভীর; **মমত্বেন**—আসক্তির দ্বারা; **বিষয়েষু**—বিষয়ের প্রতি; **অন্ববধ্যত**—আবদ্ধ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্র ও পৌত্রেরা প্রকৃতপক্ষে তাঁর গৃহ, কোষ, ভৃত্য, সহকারী আদি সমস্ত ধন-সম্পদের লুণ্ঠনকারী ছিল। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি পুরঞ্জনের আসক্তি অত্যন্ত গভীর ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *রিক্থ-হারেষু* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী' পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য বংশধরেরা চরমে মানুষের সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠন করে। অনেক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি রয়েছেন, যাঁরা প্রভূত ধনসম্পদ উপার্জন করেছেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু চরমে তাঁদের সমস্ত ধনসম্পদ তাঁদের পুত্র ও পৌত্রেরা লুণ্ঠন করেছে। আমরা ভারতবর্ষে একজন শিল্পপতিকে দেখেছি, যিনি রাজা পুরঞ্জনের মতো যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং তার ছয় জন পত্নী ছিল। প্রত্যেক পত্নীর জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল, যার জন্য তাঁকে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হত। আমি যখন এক সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে, তাঁর প্রতিটি পুত্র ও কন্যার জন্য কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা জোগাড় করার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তাই শাস্ত্রে এই প্রকার শিল্পপতি, ব্যবসায়ী অথবা কর্মীদের মূঢ় বলা হয়েছে। তারা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে ধন সঞ্চয় করে, এবং তাদের পুত্র ও পৌত্রদের সেই ধন অপচয় করতে দেখে তারা তৃপ্তি অনুভব করে। এই সমস্ত মানুষেরা প্রকৃত মালিককে তার ধন ফিরিয়ে দিতে চায় না। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা। তথাকথিত ধন উপার্জনকারীরা কেবল তাদের ব্যবসা ও উদ্যোগের নামে ভগবানের ধন চুরি করছে। সেই ধন সঞ্চয় করার পর, তা তাদের পুত্র ও পৌত্রদের দ্বারা লুণ্ঠিত হতে দেখে তারা আনন্দ উপভোগ করে। সেটিই হচ্ছে বৈষয়িক জীবন। জড়-জাগতিক জীবনে জীব দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়। তার ফলে তারা মনে করে, "এই শরীরটি হচ্ছে আমি", "আমি মানুষ", "আমি আমেরিকান", "আমি ভারতীয়" অহঙ্কারের প্রভাবে এই দেহাত্মবুদ্ধির উদয় হয়। অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব নিজেকে কোন বংশের, দেশের অথবা জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। এইভাবে জড় জগতের প্রতি তার আসক্তি

গভীর থেকে গভীরতর হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এই প্রকার মানুষদের বর্ণনা করে ভগবদ্‌গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে (১৬/১৩-১৫) বলা হয়েছে—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥

"আসুরিক মানুষেরা মনে করে—'আজ আমার কাছে এত ধন রয়েছে, এবং কাল আমার পরিকল্পনার দ্বারা আমি আরও ধন লাভ করব। এখন আমার এত রয়েছে, এবং ভবিষ্যতে তা আরও বর্ধিত হবে। সে আমার শত্রু ছিল, এবং আমি তাকে সংহার করেছি, আমার অন্যান্য শত্রুরাও নিহত হবে। আমিই হচ্ছি সব কিছুর অধীশ্বর, আমি ভোক্তা, আমি সিদ্ধ, বলবান ও সুখী। আমার অভিজাত আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা পরিবৃত আমিই হচ্ছি সবচাইতে ধনী ব্যক্তি। আমার মতো শক্তিশালী ও সুখী আর কেউ নেই। আমি যজ্ঞ করব, কিছু দান করব, এবং এইভাবে আমি সুখভোগ করব।' এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা এইভাবে অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত।"

এইভাবে মানুষ বিভিন্ন শ্রমসাপেক্ষ কার্যকলাপে যুক্ত হয়, এবং তাদের দেহ, গৃহ, পরিবার, রাষ্ট্র ও জাতির প্রতি তাদের আসক্তি ক্রমশই অত্যন্ত গভীর হয়।

শ্লোক ১১

ঈজে চ ক্রতুভির্ঘোরৈর্দীক্ষিতঃ পশুমারকৈঃ ।
দেবান্ পিতৄন্ ভূতপতীন্নানাকামো যথা ভবান্ ॥ ১১ ॥

ঈজে—তিনি পূজা করেছিলেন; **চ**—ও; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **ঘোরৈঃ**—বীভৎস; **দীক্ষিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **পশু-মারকৈঃ**—যাতে পশুবধ করা হয়, **দেবান্**—দেবতাগণ; **পিতৄন্**—পিতৃপুরুষগণ; **ভূত-পতীন্**—ভূতপতিগণ; **নানা**—বিভিন্ন; **কামঃ**—সকাম; **যথা**—যেমন; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! আপনার মতো রাজা পুরঞ্জনও বহু কামনাযুক্ত হয়ে বিভিন্ন যজ্ঞের দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতিদের পূজা করেছিলেন। সেই সমস্ত যজ্ঞ ছিল অত্যন্ত বীভৎস, কারণ পশুহত্যা করার বাসনায় সেগুলি সম্পাদিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দেবর্ষি নারদ প্রকাশ করেছেন যে, মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুরঞ্জনের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই বর্ণনাটি ছিল মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের কার্যকলাপেরই রূপক। এই শ্লোকে নারদ মুনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, *যথা ভবান্*—অর্থাৎ ঠিক আপনার মতো, যা ইঙ্গিত করে যে, রাজা পুরঞ্জন হচ্ছেন মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ স্বয়ং। পরম বৈষ্ণব হওয়ার ফলে, নারদ মুনি যজ্ঞে পশুবলি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি জানতেন যে, তিনি যদি রাজাকে যজ্ঞ বন্ধ করার কথা বলতেন, তা হলে রাজা তাঁর কথা শুনতেন না। তাই তিনি তাঁকে পুরঞ্জনের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু এই শ্লোকে, "আপনার মতো" উক্তিটি ব্যবহার করে, পূর্ণরূপে না হলেও, তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতি আসক্ত কর্মীদের সাধারণত তাদের বংশধরদের জন্য বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় এবং বহু দেবদেবীর পূজা করতে হয়, সেই সঙ্গে বহু নেতা, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদেরও সন্তুষ্টিবিধান করতে হয়, যাতে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সমস্ত আয়োজন যথাযথভাবে হয়। আগামী দিনের মানুষেরা যাতে অত্যন্ত সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে, সেই ব্যাপারে তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা অত্যন্ত আগ্রহী, এবং সেই হেতু তারা রেলগাড়ির এঞ্জিন, মোটরগাড়ি, বিমান আদি চালাবার জন্য শক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে, কারণ এখন পেট্রল, কয়লা ইত্যাদি ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত কার্যকলাপের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪১) বলা হয়েছে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥

"যারা আধ্যাত্মিক মার্গে রয়েছে, তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়সংকল্প, এবং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি। হে কুরুনন্দন! যারা দৃঢ়সংকল্প নয়, তাদের বুদ্ধি বহু শাখায় বিভক্ত।"

প্রকৃতপক্ষে, যাঁরা জ্ঞানবান তাঁরা কৃষ্ণভক্তি সম্পাদনে বদ্ধপরিকর, কিন্তু যারা মূর্খ (*মূঢ়াঃ*), পাপী (*দুষ্কৃতিনঃ*) ও নরাধম, যারা বুদ্ধিহীন *(মায়য়াপহৃত জ্ঞানাঃ)* এবং যারা আসুরিক মনোভাবাপন্ন (*আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ*), তারা কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী নয়। তার ফলে তারা নানা প্রকার কর্মে লিপ্ত হয়। তাদের অধিকাংশ কার্যই পশুবধ কেন্দ্রিক। আধুনিক সভ্যতা পশুবধ কেন্দ্রিক। কর্মীরা ঘোষণা করছে যে, আমিষ আহার না করলে, তাদের ভিটামিন অথবা প্রাণশক্তি হ্রাস পাবে; তাই কঠোর পরিশ্রম করার উপযুক্ত স্বাস্থ্যের জন্য মাংস আহার করা অবশ্য কর্তব্য, মাংস হজম করার জন্য সুরা পান করা অবশ্য কর্তব্য, এবং মাংস আহার ও সুরা পানের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্ত্রীসম্ভোগ করা অবশ্য কর্তব্য, যাতে তারা গাধার মতো কঠোর পরিশ্রম করতে পারে।

পশুবধ দুই প্রকার। একটি হচ্ছে ধর্মীয় যজ্ঞের নামে। বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর সব কটি ধর্মে উপাসনার স্থানে পশুবধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। বৈদিক সভ্যতায় মাংসাহারীদের জন্য নির্দিষ্ট বিধি নিষেধের মাধ্যমে কালী মন্দিরে পাঁঠা বলি দিয়ে, মাংস আহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেমনই দেবী চণ্ডিকার পূজা করে, সুরাপান করার নির্দেশ রয়েছে। এই সমস্ত নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত আচরণগুলির নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষ এই সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি বর্জন করেছে। এখন তারা সর্বত্র চোলাই মদের কারখানা আর কসাইখানা খুলে অবাধ মদ্যপান করছে এবং পশুমাংস আহার করছে। নারদ মুনির মতো বৈষ্ণব আচার্য খুব ভালভাবে জানেন যে, ধর্মের নামে যারা এইভাবে পশুহত্যা করে, তারা অবশ্যই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে, জন্মমৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকবে।

তাই দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে *শ্রীমদ্ভাগবত* সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সময়, বেদের কর্মকাণ্ড শাখার নিন্দা করেছিলেন। নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলেছিলেন—

জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥

"সাধারণত মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ভোগ করতে চায়, এবং তুমি ধর্মের নামে তাদের সেই বিষয়ে উৎসাহিত করেছ। তা নিন্দনীয় ও অযৌক্তিক। যেহেতু তারা তোমার নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে, তাই তারা এই প্রকার কার্যকলাপকে ধর্ম অনুষ্ঠান বলে মনে করবে এবং এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কথা কখনও ভাববে না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৫)

শ্রীল নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বেদের অনুগামী বহু শাস্ত্র সংকলন করার জন্য তিরস্কার করেছিলেন, কারণ সেই সমস্ত শাস্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে ভগবদ্ভক্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। নারদ মুনির নির্দেশে ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণয়ন করেছিলেন, সেখানে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের আরাধনা করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ও তাঁর ভক্তরা কখনও ধর্মের নামে পশুহত্যা অনুমোদন করেন না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের নামে পশুহত্যা বন্ধ করার জন্য বুদ্ধদেবরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তমোগুণের প্রভাবে ধর্মের নামে যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া হয়, সেই কথা *ভগবদ্গীতার* অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮/৩১-৩২) ইঙ্গিত করা হয়েছে—

যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যং চাকার্যমেব চ ।
অযথাবৎপ্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥

"হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্‌রূপে স্থিরীকৃত হয়, সেই বুদ্ধি রাজস। যে বুদ্ধি অজ্ঞান ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে এবং ধর্মকে অধর্ম বলে মনে করে, এবং সব কিছু বিপরীতভাবে বোঝে, তা তামসী বুদ্ধি বলে জানবে।"

যারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা পশুবধ করার জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান তৈরি করে। প্রকৃত ধর্ম জড় জাগতিক কার্যকলাপের অতীত। শ্রীকৃষ্ণ সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন—সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁর শরণাগত হতে হবে (*সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য*)। এইভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্ত ও প্রতিনিধিরা পরম ধর্মের শিক্ষা দেন, যাতে পশুহত্যার কোন স্থান নেই। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমান সময়ে ভারতের বহু তথাকথিত মিশনারীরা ধর্মের নামে অধর্মের প্রচার করছে। তারা একজন সাধারণ মানুষকে ভগবান সাজিয়ে সকলকে, এমন কি তথাকথিত সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত মাংস আহার করতে উপদেশ দিচ্ছে।

শ্লোক ১২

যুক্তেম্বেবং প্রমত্তস্য কুটুম্বাসক্তচেতসঃ ।
আসসাদ স বৈ কালো যোঽপ্রিয়ঃ প্রিয়যোষিতাম্ ॥ ১২ ॥

যুক্তেষু—হিতকর কার্যকলাপে; **এবম্**—এইভাবে; **প্রমত্তস্য**—অমনোযোগী হয়ে; **কুটুম্ব**—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; **আসক্ত**—অনুরক্ত; **চেতসঃ**—চেতনা; **আসসাদ**—

উপস্থিত হয়েছিল, সঃ—সেই, বৈ নিশ্চিতভাবে; কালঃ—সময়; যঃ—যা; অপ্রিয়ঃ—প্রীতিজনক নয়; প্রিয়-যোষিতাম্—কামিনীর প্রিয় ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা পুরঞ্জন সকাম কর্মের প্রতি ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে, এবং কলুষিত চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবনের সেই অবস্থায় এসে উপনীত হলেন, যা কামিনীপ্রিয় ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রিয়যোষিতাম্* ও *অপ্রিয়ঃ* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *যোষিৎ প্রিয়* কথাটির অর্থ 'যারা মেয়েদের সঙ্গ করতে ভালবাসে'। জড় সুখভোগের চরম অবস্থা হচ্ছে মৈথুন, এবং যারা সেই জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের কাছে মৃত্যু মোটেই প্রিয় নয়। এই সম্পর্কে একটি শিক্ষাপ্রদ কাহিনী রয়েছে। এক সাধু যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এক রাজকুমারের সাক্ষাৎ হয়, এবং সাধু তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন, "রাজকুমার, তুমি চিরজীবী হও।" তারপর সেই সাধুর সঙ্গে এক ভক্তের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁকে বলেন, "তুমি জীবিত থাকতে পার অথবা মরে যেতে পার।" তারপর সাধুর সঙ্গে এক ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন, "তোমার এখনই মৃত্যু হোক।" অবশেষে সাধুর সঙ্গে এক ব্যাধের সাক্ষাৎ হয়, এবং তিনি তাকে আশীর্বাদ করে বলেন, "তুমি জীবিত থেকো না এবং মরেও যেও না।" এই কাহিনীর সারমর্ম হচ্ছে যে, যারা অত্যন্ত কামুক এবং ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে লিপ্ত, তারা মরতে চায় না। রাজপুত্রের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যথেষ্ট ধনসম্পদ ছিল, তাই সেই মহান ঋষিটি তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি যেন চিরজীবী হন, কারণ যতক্ষণ তিনি বেঁচে থাকবেন, ততক্ষণ তিনি জীবনকে উপভোগ করতে পারবেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁকে নরকে যেতে হবে। যেহেতু ব্রহ্মচারী ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করছিলেন, তাই সেই ঋষি তাঁকে বলেছিলেন তাঁর যেন তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, কারণ তাঁর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন সমাপ্তি হয়ে, তিনি যেন ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পক্ষে বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়া দুই সমান, কারণ জীবিত অবস্থায় তিনি ভগবানের সেবা করবেন এবং মৃত্যুর পরেও তিনি ভগবানের সেবা করতে থাকেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তের কাছে ইহকাল ও পরকাল দুই সমান, কারণ উভয় অবস্থাতেই তিনি ভগবানের সেবা করেন। ব্যাধ যেহেতু পশুহত্যা করে অত্যন্ত জঘন্য জীবন যাপন করে, তাই তাকে মৃত্যুর পর নরকে যেতে হবে,

তাই তাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল সে যেন জীবিত না থাকে এবং তার মৃত্যু যেন না হয়।

রাজা পুরঞ্জন অবশেষে বার্ধক্যে পদার্পণ করেছিলেন। বার্ধক্যে ইন্দ্রিয়গুলি দুর্বল হয়ে যায়, এবং যদিও বৃদ্ধরাও ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায়, বিশেষ করে মৈথুনসুখ, কিন্তু যেহেতু ইন্দ্রিয়-সুখের যন্ত্রটি আর কাজ করে না, তাই তারা অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করে। এই প্রকার কামুক ব্যক্তিরা মৃত্যুর জন্য কখনই প্রস্তুত হয় না, তারা কেবল তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রগতির মাধ্যমে তাদের আয়ু বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। কিছু মূর্খ রুশদেশীয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি দাবি করেছে যে, তারা বৈজ্ঞানিক প্রগতির মাধ্যমে মানুষকে অমরত্ব দান করতে চলেছে। এই প্রকার উন্মাদ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে আজকের সভ্যতা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু, চিরকাল বেঁচে থাকার বাসনা সত্ত্বেও, নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে তাদের অন্য লোকে নিয়ে চলে যায়। এই প্রকার মনোভাব হিরণ্যকশিপু প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু যথা সময়ে ভগবান স্বয়ং এসে নিমেষের মধ্যে তাকে সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

চণ্ডবেগ ইতি খ্যাতো গন্ধর্বাধিপতির্নৃপ।
গন্ধর্বাস্তস্য বলিনঃ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥ ১৩ ॥

চণ্ডবেগঃ—চণ্ডবেগ; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বলোক-বাসী; **অধিপতিঃ**—রাজা; **নৃপ**—হে রাজন্; **গন্ধর্বাঃ**—অন্য গন্ধর্বগণ; **তস্য**—তাঁর; **বলিনঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী সৈনিক; **ষষ্টি**—ষাট; **উত্তর**—অধিক; **শত**—শত; **ত্রয়ম্**—তিন।

অনুবাদ

হে রাজন্! গন্ধর্বলোকের অধিপতি হচ্ছেন চণ্ডবেগ নামক রাজা। তাঁর অধীনে তিনশ ষাটজন অত্যন্ত শক্তিশালী গন্ধর্ব সৈনিক রয়েছে।

তাৎপর্য

কালকে এখানে চণ্ডবেগরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু সময় কারও প্রতীক্ষা করে না, তাই এখানে সময়কে চণ্ডবেগ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'প্রচণ্ড বেগে প্রবহমান'। কালের গতি বৎসররূপে গণনা করা হয়। এক

বছরে তিনশ ষাট দিন, এবং চণ্ডবেগের সৈন্যেরা সেই দিনগুলির প্রতীক। কাল অতি দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়, চণ্ডবেগের অত্যন্ত বলবান গন্ধর্ব সৈনিকেরা আমাদের জীবনের দিনগুলি দ্রুত গতিতে হরণ করে নেয়। সূর্য তার উদয় ও অস্তের মাধ্যমে আমাদের আয়ু ছিনিয়ে নেয়। এইভাবে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে, আমাদের সকলের আয়ু কিছুটা ক্ষয় হয়। তাই বলা হয় যে, আয়ু রক্ষা করা যায় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তা হলে সূর্য তাঁর সময় হরণ করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১৭) বলা হয়েছে *আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।* মূল কথা হচ্ছে যে, কেউ যদি অমর হতে চায়, তা হলে তাকে ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হবে, তা হলে সে কালক্রমে ভগবানের নিত্যধামে প্রবেশ করতে পারবে।

মরীচিকা ও অন্যান্য মায়িক বস্তুকে কখনও কখনও গন্ধর্ব বলা হয়। আয়ুক্ষয়কে বার্ধক্য বলা হয়। কালের এই অদৃশ্য গতি যা আয়ু হরণ করে, তাকে এই শ্লোকে আলঙ্কারিক ভাষায় গন্ধর্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এই সমস্ত গন্ধর্বেরা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই। তার অর্থ হচ্ছে যে, চণ্ডবেগরূপে বর্ণিত কালের অদৃশ্য প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই আয়ু ক্ষয় হয়।

শ্লোক ১৪

গন্ধর্ব্যস্তাদৃশীরস্য মৈথুন্যশ্চ সিতাসিতাঃ ।
পরিবৃত্ত্যা বিলুম্পন্তি সর্বকামবিনির্মিতাম্ ॥ ১৪ ॥

গন্ধর্ব্যঃ—গন্ধর্বীরা; **তাদৃশীঃ**—তেমনই; **অস্য**—চণ্ডবেগের; **মৈথুন্যঃ**—মৈথুন-সঙ্গিনীরা; **চ**—ও; **সিত**—শ্বেত; **অসিতাঃ**—কৃষ্ণ; **পরিবৃত্ত্যা**—পরিবেষ্টিত; **বিলুম্পন্তি**—তারা লুণ্ঠন করেছিল; **সর্ব-কাম**—সর্বপ্রকার ঈপ্সিত বস্তু; **বিনির্মিতাম্**—নির্মিত।

অনুবাদ

চণ্ডবেগের গন্ধর্ব-সৈনিকদের মতো সমসংখ্যক গন্ধর্বী ছিল, এবং তারা বারবার ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রীগুলি লুণ্ঠন করেছিল।

তাৎপর্য

দিনগুলিকে চণ্ডবেগের সৈনিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাত্রি সাধারণত মৈথুনসুখ উপভোগের সময়। দিনকে শ্বেতবর্ণ বলে মনে করা হয়, এবং রাত্রিকে

কৃষ্ণবর্ণ বলে মনে করা হয়। আর এক দিক দিয়ে বিচার করলে, রাত্রি দুই প্রকার—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি এবং শুক্লপক্ষের রাত্রি। এই সমস্ত দিন ও রাত্রি একত্রে মিলিত হয়ে, আমাদের আয়ু হরণ করে এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য আমরা যা কিছু সংগ্রহ করি তা লুণ্ঠন করে। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ মানে হচ্ছে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সমস্ত বস্তু নির্মাণ করা। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করছে কিভাবে আরও বেশি করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা যায়। এই কলিযুগে মানুষের আসুরিক মনোভাব ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবনের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। সাধারণ গৃহস্থালির কার্যকলাপের জন্য কত প্রকার যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। বাসন ধোওয়ার জন্য মেসিন, মেঝে পরিষ্কার করার মেসিন, দাড়ি কামাবার মেসিন, চুল কাটার মেসিন—আজকাল সব কিছুই মেসিনের দ্বারা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে এই শ্লোকে *সর্বকাম-বিনির্মিতাম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কাল এতই প্রবল যে, সে কেবল আমাদের আয়ুই হরণ করে না, আমাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য যে-সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধাগুলির আয়োজন করা হয়েছে, সেগুলিও ধ্বংস করে। তাই এই শ্লোকে *বিলুম্পন্তি* ('লুণ্ঠন') শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের জীবনের শুরু থেকেই সবকিছু লুণ্ঠন করা হচ্ছে।

আমাদের সম্পত্তির এই লুণ্ঠন শুরু হয় আমাদের জন্মের ক্ষণ থেকে। অবশেষে একদিন আসবে যখন মৃত্যু সবকিছু শেষ করে দেবে, এবং জীবকে পুনরায় জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের চক্র শুরু করার জন্য আর একটি দেহে প্রবেশ করে আর একটি জীবন শুরু করতে হবে। প্রহ্লাদ মহারাজ এই পন্থাটিকে *পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩০) বলে বর্ণনা করেছেন। জড়-জাগতিক জীবন মানে হচ্ছে চর্বিত বস্তুকে পুনরায় চর্বণ করা। জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন। বিভিন্ন দেহে জীব বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়সমূহ উপভোগ করে, এবং বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধার উদ্ভাবন করে সে চর্বিত বস্তু পুনরায় চর্বণ করতে থাকে। আখের রস দাঁত দিয়ে চিবিয়ে বার করা হোক অথবা মেসিনে বার করা হোক, তার ফল একই—তা আখেরই রস। আখের রস বার করার নানা রকম পন্থা আমরা বার করতে পারি, কিন্তু তার ফল একই।

শ্লোক ১৫

তে চণ্ডবেগানুচরাঃ পুরঞ্জনপুরং যদা ।
হর্তুমারেভিরে তত্র প্রত্যষেধৎপ্রজাগরঃ ॥ ১৫ ॥

তে—তারা সকলে; **চণ্ডবেগ**—চণ্ডবেগের; **অনুচরাঃ**—অনুচরেরা; **পুরঞ্জন**—রাজা পুরঞ্জনের; **পুরম্**—নগরী; **যদা**—যখন; **হর্তুম্**—লুণ্ঠন করতে; **আরেভিরে**—আরম্ভ করেছিল; **তত্র**—সেখানে; **প্রত্যষেধৎ**—রক্ষা করেছিল; **প্রজাগরঃ**—সেই বিশাল সর্প।

অনুবাদ

গন্ধর্বরাজ চণ্ডবেগ ও তাঁর অনুচরেরা যখন পুরঞ্জনের নগরী লুণ্ঠন করতে শুরু করেছিল, তখন পঞ্চফণা বিশিষ্ট সর্পটি তাদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

কেউ যখন নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, তখন তার প্রাণবায়ু বিভিন্ন স্বপ্নের মাধ্যমে সক্রিয় থাকে। সর্পের পাঁচটি ফণা ইঙ্গিত করে যে, প্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পাঁচটি বায়ুর দ্বারা পরিবৃত। শরীর নিষ্ক্রিয় থাকলেও প্রাণবায়ু সক্রিয় থাকে। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ ইন্দ্রিয় সুখভোগের কার্যকলাপে সক্রিয় থাকতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পর শক্তি হ্রাস পেতে থাকে, যদিও বহু কষ্টে আরও দু-তিন বছর, বড় জোর পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত কর্মক্ষমতা বজায় থাকতে পারে। তাই সরকারি নিয়মে সাধারণত অবসর গ্রহণের বয়স হচ্ছে পঞ্চান্ন বছর। পঞ্চাশ বছরের পর যে শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে, তাকে এখানে আলংকারিক ভাষায় পঞ্চফণা-বিশিষ্ট সর্প বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

স সপ্তভিঃ শতৈরেকো বিংশত্যা চ শতং সমাঃ।
পুরঞ্জন পুরাধ্যক্ষো গন্ধর্বৈর্যুযুধে বলী ॥ ১৬ ॥

সঃ—তিনি; **সপ্তভিঃ**—সাত; **শতৈঃ**—শত; **একঃ**—একাকী; **বিংশত্যা**—কুড়িটিসহ; **চ**—ও; **শতম্**—শত; **সমাঃ**—বৎসর; **পুরঞ্জন**—রাজা পুরঞ্জনের; **পুর-অধ্যক্ষঃ**—নগরীর অধ্যক্ষ; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বদের সঙ্গে; **যুযুধে**—যুদ্ধ করেছিল; **বলী**—অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে।

অনুবাদ

গন্ধর্বদের সংখ্যা সাতশ কুড়ি হলেও, রাজা পুরঞ্জনের নগরীর অধ্যক্ষ পঞ্চফণা-বিশিষ্ট সর্পটি একাকী তাদের সঙ্গে একশ বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

৩৬০দিন এবং ৩৬০রাত্রি একত্রে চণ্ডবেগের (কালের) ৭২০জন সৈন্য। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে সেই সমস্ত সৈন্যদের সঙ্গে আজীবন যুদ্ধ করতে হয়। সেই যুদ্ধকে বলা হয় জীবন-সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম সত্ত্বেও কিন্তু জীবের মৃত্যু হয় না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) বলা হয়েছে যে, জীবাত্মা শাশ্বত—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

"আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যুও হয় না। সে রয়েছে এবং কখনও তার অস্তিত্ব লুপ্ত হবে না। সে অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং চিরপুরাতন। দেহকে হত্যা করা হলেও আত্মাকে কখনও হত্যা করা যায় না।" প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার কখনও জন্ম হয় না অথবা মৃত্যু হয় না, কিন্তু তাকে আজীবন প্রকৃতির কঠোর নিয়মের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় তাকে নানা প্রকার দুঃখদায়ক পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব মনে করে যে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে সে খুব ভালভাবে অবস্থিত রয়েছে।

শ্লোক ১৭

ক্ষীয়মাণে স্বসম্বন্ধে একস্মিন্ বহুভির্যুধা ।
চিন্তাং পরাং জগামার্তঃ সরাষ্ট্রপুরবান্ধবঃ ॥ ১৭ ॥

ক্ষীয়মাণে—সে যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল; **স্ব-সম্বন্ধে**—তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু; **একস্মিন্**—একাকী; **বহুভিঃ**—বহু যোদ্ধার সঙ্গে; **যুধা**—যুদ্ধে; **চিন্তাম্**—দুশ্চিন্তা;

পরাম্—অত্যন্ত প্রবল; **জগাম**—লাভ করেছিল; **আর্তঃ**—দুঃখিত হয়ে; **স**—সঙ্গে; **রাষ্ট্র**—রাজ্যের; **পুর**—নগরীর; **বান্ধবঃ**—আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব

অনুবাদ

যেহেতু তাকে বহু সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, এবং তারা সকলেই ছিল এক-একজন বড় যোদ্ধা, তাই পঞ্চফণা-বিশিষ্ট সর্পটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রিয়তম বন্ধুকে এইভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়তে দেখে, রাজা পুরঞ্জন এবং সেই নগরবাসী তাঁর সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

জীব শরীরের অভ্যন্তরে বাস করে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সহ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে। সেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে এখানে সেই নগরীর নাগরিক এবং বন্ধুবান্ধব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বহু সৈন্যের সঙ্গে একাকী কিছুক্ষণ ধরে সংগ্রাম করা যায়, কিন্তু সর্বক্ষণ করা যায় না। জীব যদি ভাগ্যবান হয়, তা হলে সে এই শরীরে একশ বছর ধরে জীবন সংগ্রাম করতে পারে, কিন্তু তারপর আর তার পক্ষে সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তখন জীব পরাজয় স্বীকার করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*বৃদ্ধকাল আওল সব সুখ ভাগল।* কেউ যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন আর জড় সুখভোগ করা সম্ভব হয় না। মানুষ সাধারণত মনে করে যে, ধর্ম আচরণ এবং পুণ্যকর্ম করতে হয় জীবনের শেষ পর্যায়ে। সেই সময় মানুষ সাধারণত চিন্তাশীল হয়ে ওঠে এবং ধ্যান করার নামে অবসর কাটাতে কিছু তথাকথিত যোগ অভ্যাস করে। কিন্তু যারা সারা জীবন ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় অতিবাহিত করেছে, তাদের পক্ষে ধ্যান করা একটি হাস্যকর প্রচেষ্টা মাত্র। *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধ্যান একটি অত্যন্ত কঠিন পন্থা এবং তার অভ্যাস শুরু করতে হয় যৌবন থেকেই। ধ্যান করতে হলে, সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রয়াস থেকে বিরত থাকতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত আজকাল যারা কামভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের কাছে ধ্যান করা একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন-সংগ্রামে এই প্রকার ধ্যান ব্যর্থ হয়। কখনও কখনও এই ধরনের ধ্যানের পন্থাকে transcendental meditation বলা হয়। রাজা পুরঞ্জন বা জীবাত্মা তাঁর কঠোর জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে, তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন সহ এই transcendental meditation-এর পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

স এব পুর্যাং মধুভুক্‌পঞ্চালেষু স্বপার্ষদৈঃ ।
উপনীতং বলিং গৃহ্নন্ স্ত্রীজিতো নাবিদদ্ভয়ম্ ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুর্যাম্**—নগরীর মধ্যে; **মধু-ভুক্**—মৈথুনসুখ উপভোগ করে; **পঞ্চালেষু**—পঞ্চাল (পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়) রাজ্যে, **স্ব-পার্ষদৈঃ**—তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে; **উপনীতম্**—নিয়ে আসত; **বলিম্**—কর; **গৃহ্নন্**—গ্রহণ করে; **স্ত্রী-জিতঃ**—স্ত্রীর বশীভূত; **ন**—করেনি; **অবিদৎ**—উপলব্ধি; **ভয়ম্**—মৃত্যুভয়।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন পঞ্চাল নামক তাঁর রাজ্যে কর সংগ্রহ করে, নানা প্রকার মৈথুনসুখে মগ্ন থাকতেন। সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর বশীভূত হয়ে তিনি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি মৃত্যুর সমীপবর্তী হচ্ছেন।

তাৎপর্য

রাজা, রাষ্ট্রপতি, সচিব, মন্ত্রী আদি রাজকর্মচারীদের প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে, তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করার ক্ষমতা রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, এই কলিযুগে রাজকর্মচারীরা *(রাজন্যাস্)* এবং সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা, এমন কি মন্ত্রী, সচিব ও রাষ্ট্রপতিরাও কেবল তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করবে। সরকারের উপরওয়ালাদের ব্যয় অনেক বেশি, এবং তাই প্রতি বছর কর বৃদ্ধি না করলে সরকার চলতে পারে না। যে কর সংগ্রহ করা হয় তা সরকারি কর্মচারীদের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় করা হয়। এই প্রকার দায়িত্বহীন রাজনীতিবিদেরা ভুলে যায় যে, এক সময় মৃত্যু এসে তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখভোগ হরণ করে নেবে। তাদের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা যে, মৃত্যুর সময় সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এই প্রকার নাস্তিক্যবাদ চার্বাক নামক দার্শনিক বহুকাল পূর্বে প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর মত হচ্ছে, *"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"* তিনি আরও বলেছেন মানুষের মৃত্যু, পরবর্তী জীবন, পূর্বজীবন অথবা পাপজীবন সম্বন্ধে ভীত হওয়া উচিত নয়; কারণ দেহটি ভস্মীভূত হলে, সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। যারা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এটিই হচ্ছে তাদের দর্শন। এই প্রকার দার্শনিক বিচার কাউকে মৃত্যু-ভয় থেকে রক্ষা করতে পারে না, এবং পরবর্তী জন্মের জঘন্য জীবন থেকেও রক্ষা করতে পারে না।

শ্লোক ১৯

কালস্য দুহিতা কাচিৎত্রিলোকীং বরমিচ্ছতী ।
পর্যটন্তী ন বর্হিষ্মন্ প্রত্যনন্দত কশ্চন ॥ ১৯ ॥

কালস্য—ভয়ঙ্কর কালের; **দুহিতা**—কন্যা; **কাচিৎ**—কোন; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিভুবনে; **বরম্**—পতি; **ইচ্ছতী**—বাসনা করে; **পর্যটন্তী**—সারা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে; **ন**—কখনই না; **বর্হিষ্মন্**—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ; **প্রত্যনন্দত**—তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, **কশ্চন**—কেউ।

অনুবাদ

হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! ভয়ঙ্কর কালের কন্যা তখন পতির অন্বেষণে ত্রিলোক ভ্রমণ করছিল, কিন্তু কেউই তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি।

তাৎপর্য

যথাসময়ে যখন শরীর বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং প্রকৃতপক্ষে অক্ষম হয়ে যায়, তখন জরা বা বার্ধক্যের কষ্ট দেখা দেয়। এই জগতে চার প্রকার কষ্ট রয়েছে—জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক কখনও এই চার প্রকার ক্লেশের সমাধান করতে পারেনি। জরা বা বার্ধক্যের অক্ষমতাকে এখানে আলংকারিক ভাষায় কালের কন্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউই তাকে চায় না, কিন্তু সে যে-কোন ব্যক্তিকে তার পতিত্বে বরণ করতে উৎসুক। কেউই বৃদ্ধ ও অক্ষম হতে চায় না, তবুও সকলেরই জন্য তা অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ২০

দৌর্ভাগ্যেনাত্মনো লোকে বিশ্রুতা দুর্ভগেতি সা ।
যা তুষ্টা রাজর্ষয়ে তু বৃতাদাৎপূরবে বরম্ ॥ ২০ ॥

দৌর্ভাগ্যেন—দুর্ভাগ্যবশত, **আত্মনঃ**—তার নিজের; **লোকে**—জগতে; **বিশ্রুতা**—বিখ্যাত; **দুর্ভগা**—অত্যন্ত ভাগ্যহীনা; **ইতি**—এইভাবে; **সা**—সে; **যা**—যে; **তুষ্টা**—সন্তুষ্ট হয়ে, **রাজ-ঋষয়ে**—মহান রাজাকে; **তু**—কিন্তু; **বৃতা**—স্বীকৃত হয়ে; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **পূরবে**—রাজা পুরুকে, **বরম্**—বর।

অনুবাদ

কালকন্যা (জরা) তার দুর্ভাগ্যবশত এই জগতে দুর্ভগা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রাজর্ষি পুরু তাকে বরণ করেছিলেন বলে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে কালকন্যা তাঁকে বর প্রদান করেছিল।

তাৎপর্য

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, *সব সুখ ভাগল*—বার্ধক্যে সমস্ত সুখ লুপ্ত হয়ে যায়। তার ফলে কেউই বার্ধক্য বা জরাকে পছন্দ করে না তাই কালকন্যা জরা *দুর্ভগা* নামে বিখ্যাত। কিন্তু এক সময় মহান রাজা যযাতি জরাকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্বশুর শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতির জরাকে বরণ করতে হয়েছিল। শুক্রাচার্যের কন্যার সঙ্গে যখন মহারাজ যযাতির বিবাহ হয়, তখন শর্মিষ্ঠা নামক এক বান্ধবী শুক্রাচার্যের কন্যার সঙ্গে গিয়েছিলেন। কালক্রমে মহারাজ যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন, এবং শুক্রাচার্যের কন্যা সেই বিষয়ে তাঁর পিতার কাছে অভিযোগ করেন। তার ফলে শুক্রাচার্য মহারাজ যযাতিকে অকালে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। মহারাজ যযাতির পাঁচটি যুবক পুত্র ছিল, এবং তাঁর জরা গ্রহণ করে তাঁদের যৌবন বিনিময় করার জন্য তিনি তাঁদের সকলের কাছে আবেদন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ব্যতীত সকলেই সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পুরু যযাতির জরা গ্রহণ করেছিলেন বলে, যযাতি তাঁকে তাঁর রাজ্য প্রদান করেন। বলা হয় যে, যযাতির অন্য দুই পুত্র তাঁর অবাধ্য হয়েছিল বলে, তিনি তাঁদের ভারতের বাইরে, খুব সম্ভবত তুরস্ক ও গ্রীস রাজ্যে রাজ্যশাসন করতে দেন। এখান থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ যত ধনসম্পদই সংগ্রহ করুক না কেন, বার্ধক্যে তা উপভোগ করা যায় না। পুরু যদিও তাঁর পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর সেই ঐশ্বর্য তখন ভোগ করতে পারেননি, কারণ তিনি তাঁর যৌবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন। মানুষের কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার জন্য বার্ধক্য পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়। বার্ধক্যের অক্ষমতার ফলে, কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতিসাধন করা যায় না, তা তিনি জড়-জাগতিক বিচারে যতই ঐশ্বর্যশালী হোন না কেন।

শ্লোক ২১

কদাচিদটমানা সা ব্রহ্মলোকান্মহীং গতম্ ।
বব্রে বৃহদ্ব্রতং মাং তু জানতী কামমোহিতা ॥ ২১ ॥

কদাচিৎ—এক সময়; **অটমানা**—ভ্রমণ করার সময়; **সা**—সে; **ব্রহ্মলোকাৎ**—সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোক থেকে; **মহীম্**—পৃথিবীতে; **গতম্**—এসে, **বব্রে**—প্রস্তাব করেছিল; **বৃহৎ-ব্রতম্**—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, **মাম্**—আমাকে; **তু**—তখন; **জানতী**—জেনে, **কাম-মোহিতা**—কামাসক্ত হয়ে।

অনুবাদ

আমি যখন সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক থেকে এক সময় এই পৃথিবীতে এসেছিলাম, তখন কালকন্যা ব্রহ্মাণ্ড পর্যটন করছিল, এবং আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। আমাকে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জেনে, তাঁকে অঙ্গীকার করার জন্য সে কামাসক্ত হয়ে আমার কাছে প্রস্তাব করে।

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদ ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ তিনি কখনও স্ত্রীসঙ্গ করেননি। তার ফলে তিনি চিরতরুণ, জরা কখনও তাঁকে আক্রমণ করতে পারে না। বার্ধক্যের অক্ষমতা কেবল সাধারণ মানুষকেই আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু নারদ মুনি ছিলেন সর্বতোভাবে ভিন্ন। নারদ মুনিকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে কালকন্যা কামাসক্ত হয়ে তাঁর কাছে প্রস্তাব করেছিল। নারীর আকর্ষণ প্রতিহত করতে হলে, প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন। তা বৃদ্ধদের পক্ষেও দুরূহ, অতএব যুবকদের আর কি কথা। যাঁরা ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করছেন, তাঁদের দেবর্ষি নারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, যিনি জরার প্রস্তাব সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যারা যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা জরার শিকার হয়, এবং তাদের আয়ু অতি শীঘ্র ক্ষয় হয়ে যায়। কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার না করা হলে, জরার শিকার হয়ে অচিরেই মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।

শ্লোক ২২

ময়ি সংরভ্য বিপুলমদাচ্ছাপং সুদুঃসহম্ ।
স্থাতুমর্হসি নৈকত্র মদ্‌যাচ্ঞাবিমুখো মুনে ॥ ২২ ॥

ময়ি—আমার প্রতি; **সংরভ্য**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **বিপুল**—অন্তহীন; **মদাৎ**—মোহবশত; **শাপম্**—অভিশাপ; **সু-দুঃসহম্**—অসহনীয়; **স্থাতুম্ অর্হসি**—আপনি থাকতে পারবেন;

ন—কখনই না; **একত্র**—এক স্থানে; **মৎ**—আমার; **যাচ্ঞা**—অনুরোধ; **বিমুখঃ**—প্রত্যাখ্যান করার ফলে; **মুনে**—হে মহান ঋষি।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন—আমি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম বলে, সে আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, এক দুঃসহ অভিশাপ প্রদান করেছিল। সে বলেছিল, "হে মুনে! যেহেতু আপনি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন, সেই জন্য আপনি কখনও এক স্থানে স্থির হয়ে অবস্থান করতে পারবেন না।"

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদের দেহ চিন্ময়। তাই জরা, ব্যাধি, জন্ম ও মৃত্যু তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। নারদ মুনি হচ্ছেন ভগবানের পরম দয়ালু ভক্ত, এবং তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে সর্বত্র ভ্রমণ করে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করা অর্থাৎ, তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সকলকে বৈষ্ণবে পরিণত করা। তাই ভগবদ্ভক্তির সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন হয়, তার অতিরিক্ত সময় এক স্থানে থাকার প্রয়োজন তাঁর হয় না। যেহেতু তিনি স্বেচ্ছায় ইতিমধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করছেন, তাই কালকন্যার অভিশাপ সৌভাগ্যপূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নারদ মুনির মতো ভগবানের অন্য বহু ভক্তরাও বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ভগবানের মহিমা প্রচারের কার্যে যুক্ত রয়েছেন। এই প্রকার মহাপুরুষেরা জড়া প্রকৃতির নিয়মের অতীত।

শ্লোক ২৩

ততো বিহতসঙ্কল্পা কন্যকা যবনেশ্বরম্ ।
ময়োপদিষ্টমাসাদ্য বব্রে নাম্না ভয়ং পতিম্ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তারপর; **বিহত-সঙ্কল্পা**—নিরাশ হয়ে; **কন্যকা**—কালকন্যা; **যবন-ঈশ্বরম্**—যবনদের রাজা; **ময়া উপদিষ্টম্**—আমার উপদেশ অনুসারে; **আসাদ্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **বব্রে**—গ্রহণ করেছিল; **নাম্না**—নামক; **ভয়ম্**—ভয়; **পতিম্**—তাঁর পতিরূপে।

অনুবাদ

এইভাবে আমার দ্বারা নিরাশ হয়ে, আমার উপদেশক্রমে সে ভয় নামক যবন রাজার সমীপবর্তী হয়েছিল, এবং তাঁকে তার পতিরূপে বরণ করেছিল।

তাৎপর্য

পরম বৈষ্ণব হওয়ার ফলে, শ্রীনারদ মুনি সর্বদাই অন্যের উপকার করেন, এমন কি যে তাঁকে অভিশাপ দেয় তারও উপকার করেন। নারদ মুনি যদিও কালকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তবুও কালকন্যা একটি আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কেউই তাকে আশ্রয় প্রদান করতে পারে না, কিন্তু বৈষ্ণব এই প্রকার হতভাগিনীকেও কোথাও না কোথাও আশ্রয় প্রদান করেন। জরা যখন আক্রমণ করে, তখন সকলেই দুর্বল হয়ে ক্লিষ্ট হয়। নারদ মুনি একাধারে কালকন্যাকে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন এবং সাধারণ কর্মীদের প্রতি-আক্রমণ করেছিলেন। কেউ যদি নারদ মুনির উপদেশ গ্রহণ করেন, তা হলে সেই মহান বৈষ্ণবের কৃপায় ভয়ের সাগর অচিরেই দূর হয়ে যায়।

শ্লোক ২৪

ঋষভং যবনানাং ত্বাং বৃণে বীরেপ্সিতং পতিম্ ।
সঙ্কল্পস্ত্বয়ি ভূতানাং কৃতঃ কিল ন রিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

ঋষভম্—শ্রেষ্ঠ; **যবনানাম্**—অস্পৃশ্যদের; **ত্বাম্**—আপনাকে; **বৃণে**—আমি বরণ করি; **বীর**—হে বীর, **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত, **পতিম্**—পতি; **সঙ্কল্পঃ**—সঙ্কল্প, **ত্বয়ি**—আপনাকে; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **কৃতঃ**—যদি করা হয়; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **ন**—কখনই না; **রিষ্যতি**—বিফল হয়

অনুবাদ

যবন রাজার কাছে গিয়ে কালকন্যা তাঁকে বলেছিল, "হে বীর! আপনি যবনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাকে ভালবাসি, তাই আমি আপনাকে আমার পতিরূপে বরণ করতে চাই। আমি জানি যে, আপনার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলে, কেউ নিরাশ হয় না।

তাৎপর্য

যবনানাম্ ঋষভম্ শব্দ দুটি যবনদের রাজাকে বোঝায়। যবন ও ম্লেচ্ছ সংস্কৃত শব্দ দুটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা বৈদিক নিয়ম পালন করে না। বৈদিক নিয়ম অনুসারে, মানুষের খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, শ্রীবিগ্রহকে মঙ্গল-আরতি নিবেদন করা, বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করা,

ভগবানের শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার করা এবং ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করা কর্তব্য। মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও কর্তব্য, এবং যাঁরা গৃহস্থ তাঁদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রের বৃত্তি অনুসারে কর্ম করা কর্তব্য। এইভাবে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিত্তিতে জীবন যাপন করা উচিত, এবং সেটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা। যারা এই সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে না, তাদের বলা হয় *যবন* অথবা *ম্লেচ্ছ।* ভ্রান্তিবশত কখনও মনে করা উচিত নয় যে, এই শব্দগুলি অন্য দেশের কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে সূচিত করে। ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে কোন প্রকার সংকীর্ণতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ ভারতবর্ষে বাস করুক অথবা ভারতের বাইরে বাস করুক, সে যদি বৈদিক বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ না করে, তা হলে তাকে *ম্লেচ্ছ* বা *যবন* বলে সম্বোধন করা হবে। যে ব্যক্তি বৈদিক বিধির শাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলি পালন করে না, তার নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি হয়। যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অনুসরণকারীরা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করে, তাই তারা স্বভাবতই সুস্থ এবং নীরোগ থাকে।

যদি কেউ কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে তিনি পঁচাত্তর অথবা আশি বছর বয়সেও একজন যুবকের মতো কার্য করতে পারেন। এইভাবে কালকন্যা কোন বৈষ্ণবকে পরাভূত করতে পারেন না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* লিখতে শুরু করেন, তবুও তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে এক অপূর্ব সাহিত্য প্রদান করে গেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করেছিলেন বেশ বৃদ্ধ বয়সে, অর্থাৎ তাঁদের কার্য থেকে এবং পারিবারিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর, তবুও তাঁরা পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার জন্য বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য *শ্রীশ্রীষড় গোস্বামীর অষ্টকে* লিখেছেন—

> *নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম সংস্থাপকৌ*
> *লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ ।*
> *রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ*
> *বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ ॥*

"আমি শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী—এই ষড়গোস্বামীবর্গকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত শাস্ত্র বিচার করে সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে

গেছেন। তাই তাঁরা ত্রিভুবনে সম্মানিত হয়েছেন, এবং তাঁরা শরণ গ্রহণের যোগ্য কারণ তাঁরা ব্রজগোপিকাদের ভাবে মগ্ন হয়ে, সর্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন।"

এইভাবে বার্ধক্যের পরিণাম জরা ভক্তকে বিচলিত করতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে ভক্ত নারদ মুনির আদেশ এবং দৃঢ়সংকল্প অনুসরণ করেন। সমস্ত ভক্তরা নারদ মুনির পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত, কারণ তাঁরা নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে, অর্থাৎ *নারদ পঞ্চরাত্র* বা *পাঞ্চরাত্রিক-বিধি* অনুসারে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন। ভগবদ্ভক্ত *পাঞ্চরাত্রিক-বিধি* এবং *ভাগবত-বিধি* অনুসরণ করেন। *ভাগবত-বিধি* মানে হচ্ছে প্রচারকার্য—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করা। পাঞ্চরাত্রিক-বিধি হচ্ছে *অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্।* ভক্ত যেহেতু নিষ্ঠা সহকারে নারদ মুনির নির্দেশ অনুসরণ করেন, তাই তাঁর জরা, ব্যাধি অথবা মৃত্যুর কোন ভয় থাকে না। আপাতদৃষ্টিতে ভক্ত বৃদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো বার্ধক্যের লক্ষণগুলির দ্বারা তিনি পরাভূত হন না। তাই বার্ধক্য ভক্তকে সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যুভয়ে ভীত করতে পারে না। জরা যখন ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন কালকন্যা ভক্তের ভয় হ্রাস করে। ভক্ত জানেন যে, মৃত্যুর পর তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, তাই তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হন না। তাই বার্ধক্য ভক্তকে হতাশ করার পরিবর্তে নির্ভয় হতে সাহায্য করে এবং তার ফলে তিনি সুখী হন।

শ্লোক ২৫

দ্বাবিমাবনুশোচন্তি বালাবসদবগ্রহৌ ।
যল্লোকশাস্ত্রোপনতং ন রাতি ন তদিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

দ্বৌ—দুই প্রকার; **ইমৌ**—এই; **অনুশোচন্তি**—শোক করে; **বালৌ**—অজ্ঞ; **অসৎ**—মূর্খ, **অবগ্রহৌ**—পন্থা অবলম্বন করে, **যৎ**—যা, **লোক** প্রথা অনুসারে, **শাস্ত্র**—শাস্ত্র অনুসারে; **উপনতম্**—দান করা; **ন**—কখনই না; **রাতি**—অনুসরণ করে; **ন**—নয়; **তৎ**—তা; **ইচ্ছতি**—বাসনা করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি লৌকিক প্রথা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দান করে না এবং কেউ দান করতে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করে না, তারা উভয়েই তমোগুণের দ্বারা

আচ্ছন্ন। এই প্রকার ব্যক্তিরা অজ্ঞানের পথ অনুসরণ করছে। তাদের অবশ্যই পরিণামে শোক করতে হবে।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কেউ মঙ্গলময় জীবনযাপন করতে চান, তা হলে তাঁকে নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করতে হবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (১৬/২৩) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

"যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে নিজের খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, সে কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, সুখভোগ করতে পারে না, এবং পরম গতি প্রাপ্ত হতে পারে না।" যে ব্যক্তি নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করে না, সে জীবনে কখনও সাফল্য লাভ করতে পারে না অথবা সুখী হতে পারে না। অতএব তার ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় পত্নী হওয়ার জন্য অনুরোধ করে, তা হলে গৃহস্থ, ক্ষত্রিয় বা শাসকের তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। যেহেতু নারদ মুনি কালকন্যাকে যবন রাজার কাছে সমর্পণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন, তাই যবনরাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। শাস্ত্র-নির্দেশের আলোকে সমস্ত আচরণ করা উচিত। শাস্ত্রনির্দেশ নারদ মুনির মতো মহাজনদের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। সেই সম্বন্ধে নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য।* সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর নির্দেশ পালন করা উচিত। তার ফলে নিশ্চিতভাবে জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায়। কালকন্যা সাধু, শাস্ত্র ও গুরুর নির্দেশ অনুসারে যবন রাজার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল, তাই তাকে অস্বীকার করার কোন কারণ ছিল না।

শ্লোক ২৬

অথো ভজস্ব মাং ভদ্র ভজন্তীং মে দয়াং কুরু ।
এতাবান্ পৌরুষো ধর্মো যদার্তাননুকম্পতে ॥ ২৬ ॥

অথো—অতএব; **ভজস্ব**—গ্রহণ কর; **মাম্**—আমাকে; **ভদ্র**—হে ভদ্র; **ভজন্তীম্**—সেবা করতে ইচ্ছুক; **মে**—আমাকে; **দয়াম্**—দয়া; **কুরু**—কর; **এতাবান্**—এই

প্রকার, **পৌরুষঃ**—পুরুষের; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **যৎ**—যা; **আর্তান্**—দুর্দশাগ্রস্তকে; **অনুকম্পতে**—করুণা প্রকাশ করে।

অনুবাদ

কালকন্যা বলল—হে ভদ্র। আমি আপনার সেবা করবার জন্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত। দয়া করে আমাকে গ্রহণ করে, আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হচ্ছে আর্তের প্রতি করুণা প্রকাশ করা।

তাৎপর্য

যবনরাজ কালকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি নারদ মুনির আদেশে কালকন্যার অনুরোধ বিবেচনা করেছিলেন। তাই তিনি অন্য আর একভাবে কালকন্যাকে অঙ্গীকার করছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নারদ মুনির আদেশ বা ভক্তির পন্থা ত্রিভুবনের সকলেরই পালনীয়, এমন কি যবন রাজেরও। ভক্তিযোগের পন্থা পৃথিবীর সর্বত্র, প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে প্রচার করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সকলকে অনুরোধ করেছেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকেরা বাস্তবিকভাবে দেখেছেন যে, নারদ মুনির *পাঞ্চরাত্রিক বিধির* বলে যবন এবং ম্লেচ্ছরাও আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেছেন। মানব-সমাজ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, গুরুপরম্পরার ধারা অনুসরণ করে, তখন সারা জগৎ লাভবান হয়।

শ্লোক ২৭

কালকন্যোদিতবচো নিশম্য যবনেশ্বরঃ ।
চিকীর্ষুর্দেবগুহ্যং স সস্মিতং তামভাষত ॥ ২৭ ॥

কাল-কন্যা—কালের কন্যা; **উদিত**—উক্ত; **বচঃ**—বাণী; **নিশম্য**—শ্রবণ করে, **যবন-ঈশ্বরঃ**—যবনরাজ, **চিকীর্ষুঃ**—সম্পাদন করার ইচ্ছায়, **দেব**—দেবতাদের; **গুহ্যম্**—গোপনীয় কর্তব্য; **সঃ**—তিনি, **স-স্মিতম্**—ঈষৎ হেসে; **তাম্**—তাকে; **অভাষত**—বলেছিল।

অনুবাদ

কালকন্যার কথা শুনে যবনরাজ ঈষৎ হেসে, দৈবের বিধান অনুসারে তাঁর গোপনীয় কর্তব্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে এক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। কালকন্যাকে সম্বোধন করে তিনি তখন বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (আদি ৫/১৪২) বলা হয়েছে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

প্রকৃতপক্ষে পরম ঈশ্বর হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং অন্য সকলেই হচ্ছেন তাঁর ভৃত্য যবনরাজও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দাস। তার ফলে তিনিও কালকন্যার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণেরই উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন. যদিও কালকন্যা মানে হচ্ছে জরা বা বার্ধক্য, তাই যবনরাজ কালকন্যাকে সর্বত্র প্রবর্তন করিয়ে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ বার্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়। মূর্খ মানুষেরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপেই লিপ্ত থাকে, যেন তারা চিরকাল জীবিত থেকে জড়-জাগতিক উন্নতি উপভোগ করতে পারবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় জাগতিক উন্নতি বলে কিছু নেই। মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ মনে করে যে, জড় ঐশ্বর্য তাকে রক্ষা করবে, কিন্তু যদিও জড় বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তবুও মানব-সমাজের সমস্যাগুলির কোন সমাধান হয়নি—জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি. কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, তারা অনেক জড়-জাগতিক উন্নতিসাধন করেছে। কালকন্যা বা বার্ধক্যের জরা যখন তাদের আক্রমণ করে, তখন তারা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়, যদি তারা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যারা বিকৃতমস্তিষ্ক, তারা মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না, এবং মৃত্যুর পর যে কি হবে তাও তারা জানে না. ভ্রান্তিবশত তারা মনে করে যে. মৃত্যুর পর আর জীবন নেই, এবং তাই তারা এই জীবনে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে আচরণ করে অবাধে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায়। বার্ধক্য বুদ্ধিমান মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবনে অনুপ্রাণিত করে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ভীত যবনরাজ তাই কালকন্যাকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ময়া নিরূপিতস্তুভ্যং পতিরাত্মসমাধিনা ।
নাভিনন্দতি লোকোঽয়ং ত্বামভদ্রামসম্মতাম্ ॥ ২৮ ॥

ময়া—আমার দ্বারা, **নিরূপিতঃ**—নির্ধারিত, **তুভ্যম্**—তোমার জন্য; **পতিঃ**—পতি; **আত্ম**—মনের, **সমাধিনা**—ধ্যানের দ্বারা; **ন**—কখনই না; **অভিনন্দতি**—সাদরে গ্রহণ

করে; **লোকঃ**—মানুষ; **অয়ম্**—এই সমস্ত; **ত্বাম্**—তুমি, **অভদ্রাম্**—অশুভ, **অসম্মতাম্**—অস্বীকার্য।

অনুবাদ

যবনরাজ বললেন—বহু বিবেচনা করে আমি জানতে পেরেছি কে তোমার পতি হবে। প্রকৃতপক্ষে সকলের কাছে তুমি অমঙ্গলরূপা এবং অপ্রিয়া। তাই যেহেতু কেউই তোমাকে চায় না, তা হলে কেই বা তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবে?

তাৎপর্য

বহু বিচার বিবেচনা করার পর যবনরাজ স্থির করেছিলেন, কিভাবে সেই অশুভ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা যায়। কালকন্যা ছিল অমঙ্গল-স্বরূপা, এবং তাই কেউই তাকে চায়নি, কিন্তু ভগবানের সেবায় সকলকেই ব্যবহার করা যায়। তাই যবনরাজ কালকন্যাকেও ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই উদ্দেশ্য পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে—অর্থাৎ মানুষের মনে ভয় উৎপাদনের দ্বারা কৃষ্ণভক্তিতে তাদের যুক্ত করে, পরবর্তী জীবনের জন্য তাদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তিনি জরারূপী কালকন্যাকে নিযুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

ত্বমব্যক্তগতির্ভুঙ্‌ক্ষ্ব লোকং কর্মবিনির্মিতম্ ।
যাহি মে পৃতনাযুক্তা প্রজানাশং প্রণেষ্যসি ॥ ২৯ ॥

ত্বম্—তুমি; **অব্যক্ত-গতিঃ**—যার গতিবিধি অদৃশ্য; **ভুঙ্‌ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **লোকম্**—এই জগৎ; **কর্ম-বিনির্মিতম্**—সকাম কর্মের দ্বারা নির্মিত; **যা**—যে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মে**—আমার; **পৃতনা**—সৈনিক; **যুক্তা**—সহায়তার দ্বারা; **প্রজা-নাশম্**—জীবদের সংহার ; **প্রণেষ্যসি**—বিনা বাধায় তুমি করতে পারবে।

অনুবাদ

এই জগৎ সকাম কর্মের ফলস্বরূপ। তাই তুমি অলক্ষিতভাবে জীবদের আক্রমণ কর। আমার সৈনিকদের সহায়তায় তুমি নির্বিঘ্নে তাদের সংহার করতে পারবে।

তাৎপর্য

কর্ম-বিনির্মিতম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সকাম কর্মের দ্বারা নির্মিত।' সমগ্র জড়-জগৎ, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, সকাম কর্মের ফলস্বরূপে প্রকাশিত সকলেই

এই পৃথিবীকে বড় বড় রাস্তা, গাড়ি, বিদ্যুৎ-শক্তি, গগনচুম্বী অট্টালিকা, উদ্যোগ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির দ্বারা সাজাতে ব্যস্ত। যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে মগ্ন এবং তাদের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাদের কাছে এগুলি অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৪) বর্ণনা করা হয়েছে—

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি ।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়ম্
অসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥

যারা আত্মজ্ঞানবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে উন্মাদের মতো আগ্রহী, তারা কেবল তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সব রকম পাপকর্ম করে। ঋষভদেবের মতে, এই সমস্ত কার্যকলাপ অমঙ্গলজনক কারণ তা মানুষকে পরবর্তী জীবনে এক ঘৃণ্য শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সকলেই দেখতে পায় যে, যদিও তারা জড় দেহটির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার বহু চেষ্টা করছে, তবুও তা সর্বদা ত্রিতাপ দুঃখ এবং নানা প্রকার বেদনা দিচ্ছে। তা না হলে, এত হাসপাতাল, জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবং জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের কি আবশ্যকতা? প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতে সুখ নেই। মানুষেরা কেবল দুঃখের নিবৃত্তি-সাধনের চেষ্টা করছে। মূর্খ মানুষেরা দুঃখকে সুখ বলে মনে করে; তাই যবনরাজ অলক্ষিতভাবে মূর্খ মানুষদের জরা, ব্যাধি এবং চরমে মৃত্যুর দ্বারা আক্রমণ করতে স্থির করেছিলেন। নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পর জন্ম হয়। তাই যবনরাজ স্থির করেছিলেন যে, কালকন্যার মাধ্যমে কর্মীদের হৃদয়ে মৃত্যুভয় উৎপাদন করা, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, জড়-জাগতিক উন্নতি প্রকৃতপক্ষে উন্নতি নয়। প্রতিটি জীব হচ্ছে চিন্ময় আত্মা, এবং তাই আধ্যাত্মিক প্রগতিসাধন না করলে, মনুষ্য-জীবন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

শ্লোক ৩০

প্রজ্বারোঽয়ং মম ভ্রাতা ত্বং চ মে ভগিনী ভব ।
চরাম্যুভাভ্যাং লোকেঽস্মিন্নব্যক্তো ভীমসৈনিকঃ ॥ ৩০ ॥

প্রজ্বারঃ—প্রজ্বার নামক; **অয়ম্**—এই; **মম**—আমার; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—ও; **মে**—আমার; **ভগিনী**—ভগিনী; **ভব**—হও; **চরামি**—আমি বিচরণ করব; **উভাভ্যাম্**—তোমাদের উভয়ের দ্বারা; **লোকে**—এই জগতে; **অস্মিন্**—এই; **অব্যক্তঃ**—অলক্ষিত; **ভীম**—ভয়ঙ্কর; **সৈনিকঃ**—সৈনিক।

অনুবাদ

যবনরাজ বললেন—এই প্রজ্বার আমার ভ্রাতা। আমি এখন তোমাকে আমার ভগিনীরূপে গ্রহণ করছি। আমি তোমাদের দুজনকে এবং আমার ভয়ঙ্কর সৈনিকদের নিযুক্ত করব এই জগতে অলক্ষিতভাবে কার্য করার জন্য।

তাৎপর্য

নারদ মুনি কালকন্যাকে যবনরাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার পরিবর্তে, যবনরাজ তাকে তাঁর ভগিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যারা বৈদিক বিধি অনুসরণ করে না, তারা অসংযতভাবে স্ত্রীসঙ্গ করে। তার ফলে তারা কখনও কখনও তাদের ভগ্নীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে ইতস্তত করে না। এই কলিযুগে তার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যবনরাজ যদিও নারদ মুনির প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁর অনুরোধ অঙ্গীকার করেছিলেন, তবু তিনি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের কথা চিন্তা করছিলেন। তার কারণ হচ্ছে যে, তিনি যবন ও ম্লেচ্ছদের রাজা ছিলেন।

প্রজ্বার শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার অর্থ হচ্ছে 'ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা প্রেরিত জ্বর'। এই জ্বর সর্বদা ১০৭ডিগ্রী তাপমাত্রায় থাকে, যে তাপমাত্রায় মানুষের মৃত্যু হয়। এইভাবে ম্লেচ্ছ ও যবনদের রাজা কালকন্যাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর ভগিনী হতে। তাঁকে পত্নী বানাবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কারণ যবন ও ম্লেচ্ছরা যৌন সঙ্গ করবার ব্যাপারে কোন রকম বাছবিচার করে না। তারা তাদের বোন, মা অথবা কন্যার সঙ্গেও যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। যবনরাজের ভ্রাতা ছিল প্রজ্বার, এবং কালকন্যা ছিল জরা। যবনরাজের সংঘবদ্ধ সৈন্যশক্তির দ্বারা, অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, অবৈধ যৌনসঙ্গ, এবং চরমে মারাত্মক জ্বর ইত্যাদির সহায়তায় তারা জড়-জাগতিক জীবনকে বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, নারদ মুনির উপর জরার কোন প্রভাব ছিল না। তেমনই জরা বা ধ্বংসাত্মক শক্তি নারদ মুনি বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনুগামীদের উপরও আক্রমণ করতে পারে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পুরঞ্জনের নগরীতে চণ্ডবেগের আক্রমণ; কালকন্যার উপাখ্যান' নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টবিংশতি অধ্যায়

পরবর্তী জন্মে পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি

শ্লোক ১

নারদ উবাচ

সৈনিকা ভয়নাম্নো যে বর্হিষ্মন্ দিষ্টকারিণঃ ।
প্রজ্বারকালকন্যাভ্যাং বিচেরুরবনীমিমাম্ ॥ ১ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **সৈনিকাঃ**—সৈনিকেরা; **ভয়-নাম্নঃ**—ভয়ের, **যে**—তারা সকলে, **বর্হিষ্মন্**—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ, **দিষ্ট-কারিণঃ**—মৃত্যুর আজ্ঞাবাহক; **প্রজ্বার**—প্রজ্বারসহ; **কাল-কন্যাভ্যাম্**—কালকন্যা-সহ; **বিচেরুঃ**—ভ্রমণ করছিলেন, **অবনীম্**—পৃথিবীতে; **ইমাম্**—এই

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! তারপর ভয় নামক যবনরাজ প্রজ্বার, কালকন্যা এবং তার সৈনিকগণ সহ সারা পৃথিবী বিচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর ঠিক পূর্বে জীবনের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়, কারণ সেই সময় মানুষ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এবং নানা প্রকার রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। যে-সমস্ত রোগ শরীরকে আক্রমণ করে, তাদের এখানে সৈনিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সমস্ত সৈনিকেরা সাধারণ সৈনিক নয়, কারণ তাদের সেনাপতি হচ্ছেন যবনরাজ এবং তাঁর দ্বারা তারা পরিচালিত হয়। এখানে *দিষ্টকারিণঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি হচ্ছেন তাদের সেনাপতি। যৌবন অবস্থায় মানুষ বার্ধক্যের পরোয়া না করে, যথাসম্ভব স্ত্রীসম্ভোগ করার চেষ্টা করে। সে জানে না যে, এই স্ত্রীসম্ভোগের ফলে তার নানা প্রকার রোগ হবে এবং তার ফলে শরীরে এমন যন্ত্রণা সৃষ্টি হবে যে, সে তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, যাতে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। মানুষ যৌবনে যত স্ত্রীসম্ভোগ করে, বার্ধক্যে তাকে ততই কষ্ট পেতে হয়।

শ্লোক ২

ত একদা তু রভসা পুরঞ্জনপুরীং নৃপ ।
রুরুধুর্ভৌমভোগাঢ্যাং জরৎপন্নগপালিতাম্ ॥ ২ ॥

তে—তারা; **একদা**—এক সময়; **তু**—তখন; **রভসা**—প্রচণ্ড বেগে; **পুরঞ্জন-পুরীম্**—পুরঞ্জনের নগরী; **নৃপ**—হে রাজন; **রুরুধুঃ**—অবরোধ করেছিল; **ভৌম-ভোগ-আঢ্যাম্**—ইন্দ্রিয়ভোগে পূর্ণ; **জরৎ**—বৃদ্ধ; **পন্নগ**—সর্পের দ্বারা; **পালিতাম্**—রক্ষিত

অনুবাদ

এক সময় সেই ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা প্রবলভাবে পুরঞ্জনের নগরী আক্রমণ করেছিল। যদিও সেই নগরীটি ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তা রক্ষিত হচ্ছিল একটি বৃদ্ধ সর্পের দ্বারা।

তাৎপর্য

দেহ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে মগ্ন হলে, তা প্রতিদিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। অবশেষে প্রাণশক্তি এতই ক্ষীণ হয়ে যায় যে তাকে এখানে একটি বৃদ্ধ সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণশক্তিকে পূর্বেই একটি সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণশক্তি যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন দেহও দুর্বল হয়ে যায়। এই সময় মৃত্যুর লক্ষণগুলি, অর্থাৎ, যমরাজের ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা অত্যন্ত প্রবলভাবে আক্রমণ করে। বৈদিক প্রথা অনুসারে, এই অবস্থা প্রাপ্ত হবার পূর্বেই, জীবনের বাকি সময় ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য গৃহত্যাগ করে, সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু মানুষ যদি গৃহেই বসে থাকে এবং প্রিয়তমা পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের দ্বারা সেবিত হয়, তা হলে অবশ্যই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার ফলে, সে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। অবশেষে যখন মৃত্যু আসে, তখন আধ্যাত্মিক সম্পদবিহীন হয়ে তাকে দেহত্যাগ করতে হয়। বর্তমান সময়ে পরিবারের সবচাইতে বৃদ্ধ মানুষও পত্নী, সন্তান-সন্ততি, ধনসম্পদ, গৃহ ইত্যাদি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে গৃহত্যাগ করে না। তার ফলে জীবনের অন্তিম সময়েও তারা চিন্তা করে কে তার পত্নীকে রক্ষা করবে এবং সে কিভাবে বিশাল পরিবারের দায়দায়িত্ব সামলাবে। এইভাবে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে সাধারণত তার পত্নীর কথা চিন্তা করে। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) বর্ণনা করা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময় মানুষ যে বিষয়ে চিন্তা করে, নিঃসন্দেহে সে সেই ভাব প্রাপ্ত হবে।"

মানুষ সারা জীবন যা করে, সেই কথাই সে অন্তিম সময়ে চিন্তা করে, তার ফলে তার চিন্তা এবং অন্তিম সময়ের বাসনা অনুসারে, সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। যারা গৃহস্থ জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা স্বাভাবিকভাবেই জীবনের অন্তিম সময়ে তার প্রিয়তমা পত্নীর কথা মনে করে। তার ফলে পরবর্তী জীবনে সে একটি স্ত্রী শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং সে তার পাপ অথবা পুণ্য কর্মের ফলভোগ করে এই অধ্যায়ে রাজা পুরঞ্জনের স্ত্রীদেহ প্রাপ্তির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৩

কালকন্যাপি বুভুজে পুরঞ্জনপুরং বলাৎ।
যয়াভিভূতঃ পুরুষঃ সদ্যো নিঃসারতামিয়াৎ ॥ ৩ ॥

কাল-কন্যা—কালকন্যা; **অপি**—ও; **বুভুজে**—অধিকার করেছিল; **পুরঞ্জন-পুরম্**—পুরঞ্জনের নগরী; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **যয়া**—যার দ্বারা; **অভিভূতঃ**—পরাভূত হয়ে; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি, **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **নিঃসারতাম্**—নির্জীবত্ব; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ভয়ঙ্কর সৈনিকদের সহায়তায়, কালকন্যা ধীরে ধীরে পুরঞ্জনের নগরীর সমস্ত অধিবাসীদের আক্রমণ করেছিল এবং তাদের সর্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় করেছিল।

তাৎপর্য

জীবনের শেষে যখন জরা মানুষকে আক্রমণ করে, তখন তার শরীর সর্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তাই বৈদিক প্রথায় মানুষকে বাল্যকাল থেকেই ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দেওয়া হয়, অর্থাৎ তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন এবং মেয়েদের সঙ্গে তখন আর কোন রকম সম্পর্ক থাকে না মানুষ যখন বাল্যাবস্থা থেকে যৌবন প্রাপ্ত হয়, তখন কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে সে বিবাহ করে। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করলে, সুস্থ সবল পুত্রের জন্ম হয়। এখন মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ পুরুষেরা তাদের পুরুষত্ব হারিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। পতি যখন পত্নী থেকে অধিক বলবান হয়, তখন পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়, কিন্তু পত্নী যদি অধিক বলবান হয়, তা হলে কন্যার জন্ম হয়। বিবাহের ফলে পুত্র সন্তান লাভ করতে হলে, ব্রহ্মচর্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য পঞ্চাশ বছর বয়সে

পারিবারিক জীবন পরিত্যাগ করা উচিত। তখন সন্তানেরাও বড় হয়ে যায় এবং পিতা তখন পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করতে পারেন। তখন পতি ও পত্নী দূর দেশে গিয়ে অবসর গ্রহণ করতে পারেন এবং বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণ করতে পারেন। পতি ও পত্নী উভয়েই যখন গৃহ ও পরিবারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন, তখন পত্নী গৃহে ফিরে এসে, উপযুক্ত পুত্রদের সংরক্ষণে গৃহস্থালির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গৃহে বাস করতে পারেন। তখন পতি ভগবানের সেবা করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এটিই হচ্ছে সভ্য মানব-সমাজের রীতি। মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ উপলব্ধি। জীবনের শুরু থেকেই যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করা যায়, তা হলে অন্তত জীবনের শেষ সময়ে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত, শৈশবে সেই সম্বন্ধে কোন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, এবং জীবনের শেষ সময়েও মানুষ তার পারিবারিক জীবন ত্যাগ করতে পারছে না। পুরঞ্জনের নগরীর আখ্যান বর্ণনায় রূপক ছলে, এই শ্লোকগুলিতে সেই পরিস্থিতিরই বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪

তয়োপভুজ্যমানাং বৈ যবনাঃ সর্বতোদিশম্ ।
দ্বার্ভিঃ প্রবিশ্য সুভৃশং প্রার্দয়ন্ সকলাং পুরীম্ ॥ ৪ ॥

তয়া—কালকন্যার দ্বারা; **উপভুজ্যমানাম্**—অধিকৃত হয়ে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **যবনাঃ**—যবনেরা; **সর্বতঃ-দিশম্**—চারদিক থেকে; **দ্বার্ভিঃ**—দ্বার দিয়ে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **সু-ভৃশম্**—অত্যন্ত; **প্রার্দয়ন্**—কষ্ট দিয়ে; **সকলাম্**—সর্বত্র; **পুরীম্**—নগরী।

অনুবাদ

কালকন্যা যখন দেহ আক্রমণ করল, তখন যবনরাজের ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা বিভিন্ন দ্বার দিয়ে সেই নগরীতে প্রবেশ করেছিল, এবং তারা সমস্ত নাগরিকদের প্রবলভাবে পীড়ন করতে শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

দেহের নটি দ্বার—দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখ, পায়ু ও উপস্থ। মানুষ যখন জরাগ্রস্ত হয়, তখন দেহের বিভিন্ন দ্বারে নানা রকম ব্যাধি দেখা দেয়। যেমন,

দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ হয়ে যায় যে, চশমার প্রয়োজন হয়, শ্রবণ শক্তি এত দুর্বল হয়ে যায় যে, স্পষ্টভাবে কিছু শোনা যায় না, এবং তাই তখন শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। শ্লেষ্মায় নাক বন্ধ হয়ে যায়, এবং তাই সর্বদা নাক পরিষ্কার করার জন্য শিশিতে অ্যামোনিয়া নিয়ে তা শুঁকতে হয়, তেমনই খাদ্য চর্বণ করার জন্য নকল দাঁতের আবশ্যকতা হয়। পায়ুতে নানা প্রকার গোলযোগের জন্য মলত্যাগ করতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। কখনও কখনও তাই এনিমা নিতে হয় এবং প্রস্রাব করার জন্য সার্জিকাল নজেল ব্যবহার করতে হয়। এইভাবে পুরঞ্জনের নগরীর বিভিন্ন দ্বার সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এইভাবে বার্ধক্যে বিভিন্ন রোগের দ্বারা শরীরের সমস্ত দ্বারগুলি রুদ্ধ হয়ে যায়, এবং তখন নানা প্রকার ঔষধ এবং শল্য উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

শ্লোক ৫

তস্যাং প্রপীড্যমানায়ামভিমানী পুরঞ্জনঃ ।
অবাপোরুবিধাংস্তাপান্ কুটুম্বী মমতাকুলঃ ॥ ৫ ॥

তস্যাম্—সেই নগরী যখন; **প্রপীড্যমানায়াম্**—বিবিধ প্রকার পীড়া অনুভব করছিল; **অভিমানী**—অত্যন্ত লিপ্ত; **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **উরু**—বহু; **বিধান্**—প্রকার; **তাপান্**—বেদনা; **কুটুম্বী**—স্বজনপ্রিয় ব্যক্তি; **মমতা-আকুলঃ**—পারিবারিক আসক্তির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

অনুবাদ

নগরীটি যখন এইভাবে কালকন্যা ও সৈনিকদের দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছিল, তখন রাজা পুরঞ্জন তার আত্মীয়-স্বজনদের মমতায় অত্যন্ত আকুল হয়ে, যবনরাজ ও কালকন্যার আক্রমণে বহু প্রকার ক্লেশ ভোগ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

আমরা যখন শরীরের উল্লেখ করি, তখন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত স্থূল দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকারকে বোঝান হয়। যখন এগুলি বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন বার্ধক্যে সেগুলি দুর্বল হয়ে যায়। দেহের মালিক জীবাত্মা তখন যথাযথভাবে তার কর্মের ক্ষেত্রকে ব্যবহার করতে না পারার ফলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জীব হচ্ছে এই দেহের মালিক (*ক্ষেত্রজ্ঞ*) এবং দেহটি হচ্ছে তার কর্মের ক্ষেত্র। ক্ষেত্র যখন

নানা প্রকার আগাছায় ভরে যায়, তখন মালিকের পক্ষে সেখানে কাজ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে ওঠে। দেহ যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন আত্মার পক্ষে দেহের ভার বহন করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। তখন দুশ্চিন্তা এবং দেহের কার্যকলাপের অবনতির ফলে, দেহটি আত্মার পক্ষে একটি মস্ত বড় বোঝার মতো হয়ে দাঁড়ায়।

শ্লোক ৬

কন্যোপগূঢ়ো নষ্টশ্রীঃ কৃপণো বিষয়াত্মকঃ ।
নষ্টপ্রজ্ঞো হৃতৈশ্বর্যো গন্ধর্বযবনৈর্বলাৎ ॥ ৬ ॥

কন্যা—কালকন্যার দ্বারা; **উপগূঢ়ঃ**—আলিঙ্গিত হয়ে; **নষ্ট-শ্রীঃ**—সমস্ত সৌন্দর্য-রহিত হয়ে; **কৃপণঃ**—কৃপণ; **বিষয়-আত্মকঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত; **নষ্ট-প্রজ্ঞঃ**—বুদ্ধিবিহীন; **হৃত-ঐশ্বর্যঃ**—ঐশ্বর্যহীন; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বদের দ্বারা, **যবনৈঃ**—যবনদের দ্বারা; **বলাৎ**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

কালকন্যার দ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেন। রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, তাঁর বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছিল এবং সমস্ত ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে সবকিছু হারিয়ে, তিনি গন্ধর্ব ও যবনদের দ্বারা বলপূর্বক পরাভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যখন মানুষ জরা ও বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, সে তখন ধীরে-ধীরে তার সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলে। তার ফলে সে কালকন্যার প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না।

শ্লোক ৭

বিশীর্ণাং স্বপুরীং বীক্ষ্য প্রতিকূলাননাদৃতান্ ।
পুত্রান্ পৌত্রানুগামাত্যাঞ্জায়াং চ গতসৌহৃদাম্ ॥ ৭ ॥

বিশীর্ণাম্—জীর্ণ হয়ে গেছে; **স্ব-পুরীম্**—তাঁর নগরী, **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **প্রতিকূলান্**—প্রতিকূল বিষয় সমূহ; **অনাদৃতান্**—শ্রদ্ধাহীন হয়েছে; **পুত্রান্**—পুত্র;

পৌত্র—পৌত্র; **অনুগ**—ভৃত্য; **অমাত্যান্**—মন্ত্রী; **জায়াম্**—পত্নী, **চ**—এবং; **গত-সৌহৃদাম্**—উদাসীন।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তখন দেখলেন যে, তাঁর নগরীর সমৃদ্ধি নষ্ট হয়েছে এবং তাঁর পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য ও অমাত্যেরা ধীরে ধীরে তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তিনি এও দেখলেন যে, তাঁর পত্নী তাঁর প্রতি প্রীতিরহিত এবং উদাসীন হয়ে গেছে।

তাৎপর্য

কেউ যখন জরাগ্রস্ত হয়, তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দুর্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তখন আর তার সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে না। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি তখন তার বিরোধিতা করতে শুরু করে , মানুষ যখন কষ্টে থাকে, তখন তার আত্মীয়-স্বজনেরা, পুত্র, পৌত্র এবং পত্নীও তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শুরু করে। তারা তখন আর গৃহস্বামীর কর্তৃত্বাধীনে থাকে না। মানুষ যেমন তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করে, তেমনই ইন্দ্রিয়গুলিরও শরীর থেকে শক্তির আবশ্যকতা হয়। মানুষ সুখভোগের জন্য তার পরিবার গড়ে তোলে, তেমনই তার পরিবারের সদস্যেরাও পরিবারের কর্তার কাছ থেকে সুখ দাবি করে। তারা যখন তার কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা পয়সা পায় না, তখন তারা তার প্রতি উদাসীন হয়ে তাকে অবজ্ঞা করে এবং তার আদেশ অমান্য করে। সেই সবের কারণ হচ্ছে যে, সে একটি কৃপণ। ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যবহৃত এই *কৃপণ* শব্দটি *ব্রাহ্মণ* শব্দটির বিপরীত মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হলে, জীবের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়া, অর্থাৎ, পরম সত্য পরম ব্রহ্মের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে, বৈষ্ণবরূপে তাঁর সেবা করা। মনুষ্য জীবনে আমরা এই সুযোগটি পাই, কিন্তু আমরা যদি এই সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার না করি, তা হলে আমরা কৃপণে পরিণত হই। কৃপণ হচ্ছে সে, যার ধন থাকা সত্ত্বেও যথাযথভাবে তা ব্যয় করে না। মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা, ব্রাহ্মণ হওয়া, কিন্তু আমরা যদি সেই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার না করি, তা হলে আমরা কৃপণ হয়ে থাকি। আমরা দেখতে পাই যে, ধন থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি তা ব্যয় না করে, তা হলে সেই কৃপণ কখনও সুখী হতে পারে না। তেমনই, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলে বুদ্ধি যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে আজীবন কৃপণ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৮

আত্মানং কন্যয়া গ্রস্তং পঞ্চালানরিদূষিতান্ ।
দুরন্তচিন্তামাপন্নো ন লেভে তৎপ্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৮ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **কন্যয়া**—কালকন্যার দ্বারা; **গ্রস্তম্**—আলিঙ্গিত হয়ে; **পঞ্চালান্**—পঞ্চাল; **অরি-দূষিতান্**—শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত; **দুরন্ত**—দুর্লঙ্ঘ্য; **চিন্তাম্**—দুশ্চিন্তা; **আপনঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **ন**—না; **লেভে**—লাভ করেছে; **তৎ**—তার; **প্রতিক্রিয়াম্**—প্রতিক্রিয়া

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন যখন দেখলেন যে, তাঁর আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য, অমাত্য আদি সকলেই তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই পরিস্থিতির সংশোধন করতে পারলেন না, কারণ তিনি কালকন্যার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষ যখন বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য ও অমাত্যেরা তাকে আর গ্রাহ্য করে না। তখন সে সেই পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারে না। এইভাবে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে, সে তার শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য অনুতাপ করতে থাকে।

শ্লোক ৯

কামানভিলষন্দীনো যাতযামাংশ্চ কন্যয়া ।
বিগতাত্মগতিস্নেহঃ পুত্রদারাংশ্চ লালয়ন্ ॥ ৯ ॥

কামান্—ইন্দ্রিয় সুখের বিষয়; **অভিলষন্**—সর্বদা অভিলাষ করে; **দীনঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি; **যাত-যামান্**—বাসী; **চ**—ও; **কন্যয়া**—কালকন্যার প্রভাবের দ্বারা; **বিগত**—হারিয়ে; **আত্ম-গতি**—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য; **স্নেহঃ**—আসক্তি; **পুত্র**—পুত্র; **দারান্**—পত্নী; **চ**—এবং; **লালয়ন্**—স্নেহভরে পালন করেছিলেন।

অনুবাদ

কালকন্যার প্রভাবে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সমস্ত বিষয়গুলি বিস্বাদ হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হৃদয়ে কামবাসনা থাকার ফলে, রাজা পুরঞ্জন সর্বতোভাবে অত্যন্ত

দরিদ্র হয়ে যান। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি তা তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পত্নী ও পুত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হওয়ার ফলে, তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে অবিকল বর্তমান সভ্যতার পরিস্থিতি। সকলেই তার দেহ, গেহ ও পরিবার-পরিজন প্রতিপালনে ব্যস্ত। তার ফলে সকলেই জীবনের অন্তিম সময়ে, আধ্যাত্মিক জীবন কি এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়ার ফলে, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যেই সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখভোগ, সেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন সম্ভব নয়, কারণ মানুষ কেবল তাদের বর্তমান জীবন সম্বন্ধেই চিন্তা করে। জন্মান্তর যদিও বাস্তব সত্য, তবুও সেই সম্বন্ধে তাদের কোন তত্ত্ব প্রদান করা হয় না।

শ্লোক ১০

গন্ধর্বযবনাক্রান্তাং কালকন্যোপমর্দিতাম্ ।
হাতুং প্রচক্রমে রাজা তাং পুরীমনিকামতঃ ॥ ১০ ॥

গন্ধর্ব—গন্ধর্ব সৈনিকদের দ্বারা; **যবন**—এবং যবন সৈনিকদের দ্বারা; **আক্রান্তাম্**—আক্রান্ত হয়ে; **কাল-কন্যা**—কালকন্যার দ্বারা; **উপমর্দিতাম্**—বিধ্বস্ত হয়ে; **হাতুম্**—পরিত্যাগ করতে; **প্রচক্রমে**—প্রস্তুত হয়েছিলেন; **রাজা**—রাজা পুরঞ্জন; **তাম্**—সেই; **পুরীম্**—নগরী; **অনিকামতঃ**—অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

অনুবাদ

গন্ধর্ব ও যবন সৈনিকদের দ্বারা পুরঞ্জনের নগরী বিধ্বস্ত হয়েছিল, এবং সেই নগরী পরিত্যাগ করার বাসনা না থাকলেও, পরিস্থিতিবশত তাঁকে তা করতে হয়েছিল, কারণ তা কালকন্যার দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

জীব ভগবদ্বিমুখ হয়ে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে কীটাণু পর্যন্ত কোন একটি বিশেষ শরীরের মাধ্যমে তাকে এই জগৎ ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। বেদে সৃষ্টির ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি প্রজা বৃদ্ধির জন্য সপ্তর্ষি এবং অন্যান্য প্রজাপতিদের সৃষ্টি করেছিলেন. এইভাবে প্রতিটি জীব তার কর্ম ও বাসনা অনুসারে

বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, যা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পুরীষের কীট পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ প্রকার শরীরের সঙ্গে দীর্ঘকালের সঙ্গের প্রভাবে এবং কালকন্যা ও তার মায়ার কৃপায় জীব জড় শরীরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই শরীরটি হচ্ছে দুঃখভোগের স্থান। কেউ যদি একটি পুরীষের কীটকে পুরীষ থেকে আলাদা করতে চায়, তা হলেও কীটটি কিছুতেই তা ছেড়ে যেতে চায় না সে আবার পুরীষে ফিরে আসে। তেমনই, শূকর সাধারণত অত্যন্ত নোংরা স্থানে থাকে, বিষ্ঠা আহার করে, কিন্তু কেউ সেই অবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে এনে খুব সুন্দর কোন স্থানে থাকতে দেয়, শূকরটি কিন্তু তাতে রাজি হয় না। এইভাবে আমরা যদি প্রতিটি জীবকে পরীক্ষা করি, তা হলে আমরা দেখতে পাব যে, সে অধিকতর আরামদায়ক পরিস্থিতিতে থাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যদিও রাজা পুরঞ্জন চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সেই নগরী ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীব যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার দেহটি সে ত্যাগ করতে চায় না। কিন্তু তা হলেও তাকে দেহত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়, কারণ এই জড় দেহটি চিরস্থায়ী নয়

জীব বিভিন্নভাবে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, এবং তাই প্রকৃতির নিয়মে তাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, ঠিক যেভাবে মানুষ একটি শিশুর শরীর থেকে বালকের শরীর প্রাপ্ত হয়, বালকের শরীর থেকে যুবকের শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং যুবকের শরীর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শরীর প্রাপ্ত হয়। এই পন্থা নিরন্তর চলছে অন্তিম অবস্থায় যখন শরীর বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে যায়, তখনও দেহটি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হলেও জীব তা ত্যাগ করতে চায় না। জড় অস্তিত্ব এবং জড় দেহ যদিও আরামদায়ক নয়, তবুও জীব কেন তা ত্যাগ করতে চায় না? জড় দেহ পাওয়া মাত্রই জীবকে তা পালন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন এবং যে কার্যেই লিপ্ত থাকুক না কেন, তার জড় দেহটি পালন করার জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান মানব-সমাজে আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে কারোরই কোন জ্ঞান নেই যেহেতু জীব সৎ-চিৎ-আনন্দময় ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার প্রত্যাশী নয়, তাই সে তার বর্তমান শরীরটিকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, যদিও তা সম্পূর্ণরূপে অকেজো। তাই এই জড় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জনকল্যাণমূলক কার্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার করা।

এই আন্দোলন মানুষকে ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব প্রদান করছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন, এবং তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে সকলেই নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময়

জীবন যাপন করতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত দেহত্যাগ করতে ভয় করেন না, কারণ তিনি জানেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি নিত্য। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি চিরকাল ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত; তাই যতদিন তিনি তাঁর বর্তমান শরীরে থাকেন, ততদিন তিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে সুখী থাকেন, এবং যখন তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করেন, তখনও তিনি স্থায়ীভাবে ভগবানের সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকেন। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই মুক্ত। কিন্তু কর্মীরা, যাদের আধ্যাত্মিক জীবন বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা তাদের পচা জড় দেহটি ত্যাগ করার ভয়ে অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়।

শ্লোক ১১

ভয়নাম্নোঽগ্রজো ভ্রাতা প্রজ্বারঃ প্রত্যুপস্থিতঃ ।
দদাহ তাং পুরীং কৃৎস্নাং ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১১ ॥

ভয়-নাম্নঃ—ভয় নামক; **অগ্র-জঃ**—জ্যেষ্ঠ; **ভ্রাতা**—ভাই; **প্রজ্বারঃ**—প্রজ্বার নামক; **প্রত্যুপস্থিতঃ**—সেখানে উপস্থিত হয়ে; **দদাহ**—আগুন জ্বালিয়েছিল; **তাম্**—সেই; **পুরীম্**—নগরীতে; **কৃৎস্নাম্**—সম্পূর্ণরূপে; **ভ্রাতুঃ**—তার ভ্রাতা; **প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—প্রসন্ন করার জন্য।

অনুবাদ

তখন ভয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রজ্বার তার ভ্রাতার প্রসন্নতা বিধানের জন্য সেই নগরীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায়, মৃত দেহ দহন করা হয়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে দেহে আর এক প্রকার আগুন লাগে, যা হচ্ছে *প্রজ্বার* বা *বিষ্ণুজ্বার* নামক জ্বর। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারা দেখা গেছে যে, দেহের তাপমাত্রা যখন ১০৭ডিগ্রীতে পৌঁছায়, তখন মানুষের মৃত্যু হয়। জীবনের অন্তিম সময়ে, এই প্রজ্বার জীবকে এক জ্বলন্ত অগ্নিতে স্থাপন করে।

শ্লোক ১২

তস্যাং সন্দহ্যমানায়াং সপৌরঃ সপরিচ্ছদঃ ।
কৌটুম্বিকঃ কুটুম্বিন্যা উপাতপ্যত সান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

তস্যাম্—সেই নগরীটি যখন; **সন্দহ্যমানায়াম্**—দগ্ধ হচ্ছিল; **স-পৌরঃ**—সমস্ত পুরবাসীগণ সহ, **স-পরিচ্ছদঃ**—সমস্ত অনুগামী এবং ভৃত্যগণ সহ; **কৌটুম্বিকঃ**—বহু আত্মীয়স্বজন সমন্বিত রাজা, **কুটুম্বিন্যা**—তাঁর পত্নীসহ; **উপাতপ্যত**—সেই অগ্নির তাপে দগ্ধ হতে লাগল; **স-অন্বয়ঃ**—তাঁর বংশধরগণ সহ।

অনুবাদ

সেই নগরী যখন দগ্ধ হচ্ছিল, তখন সমস্ত নাগরিকেরা, রাজার ভৃত্যরা, আত্মীয়-স্বজনেরা, পুত্র, পৌত্র, পত্নী এবং অন্যান্য কুটুম্বগণ সেই আগুনে দগ্ধ হতে লাগল। রাজা পুরঞ্জন তার ফলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শরীরের অনেক অঙ্গ রয়েছে—ইন্দ্রিয়, হাত, পা, ত্বক, মাংসপেশী, রক্ত, মজ্জা, ইত্যাদি—এবং সেগুলিকে এখানে আলংকারিকভাবে পুত্র, পৌত্র, নাগরিক, অনুচরবর্গ, ইত্যাদিরূপে দর্শন করা হয়েছে। দেহ যখন *বিষ্ণুজ্বরের* দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সেই প্রচণ্ড তাপের ফলে, কখনও কখনও মানুষ মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, দেহ তখন এত প্রবল বেদনা অনুভব করে যে, মানুষ অচেতন হয়ে যায় এবং তার দেহের কষ্ট অনুভব করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর সময় জীব এতই অসহায় হয়ে যায় যে, তার ইচ্ছা না থাকলেও তাকে দেহত্যাগ করে আর একটি দেহে প্রবেশ করতে বাধ্য করা হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা মানুষ সাময়িকভাবে জীবনের পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে পারে, কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। এগুলি জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে ভগবান নিয়ন্ত্রণ করেন। মূর্খ মানুষেরা এই সরল সত্যটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। মানুষেরা এখন সমুদ্রের তলদেশে পেট্রোলের অনুসন্ধানের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। তারা ভবিষ্যতের পেট্রোল সাপ্লাই সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ থেকে তারা নিবৃত্তি লাভ করতে পারে না। এইভাবে অজ্ঞতাবশত যারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাদের সমস্ত কার্যকলাপই ব্যর্থ।

শ্লোক ১৩

যবনোপরুদ্ধায়তনো গ্রস্তায়াং কালকন্যয়া।
পুর্যাং প্রজ্বারসংসৃষ্টঃ পুরপালোঽন্বতপ্যত ॥ ১৩ ॥

যবন—যবনদের দ্বারা; **উপরুদ্ধ**—আক্রান্ত; **আয়তনঃ**—তার আবাস, **গ্রস্তায়াম্**—যখন অধিকৃত হয়েছিল; **কাল-কন্যয়া**—কালকন্যার দ্বারা; **পুর্যাম্**—নগরী, **প্রজ্বার-সংসৃষ্টঃ**—প্রজ্বার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে; **পুর-পালঃ**—নগরাধ্যক্ষ; **অন্বতপ্যত**—অত্যন্ত শোককাতর হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই নগরীর রক্ষক সর্পটি যখন দেখল যে, নাগরিকেরা কালকন্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, এবং যবনেরা তার গৃহে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তখন অত্যন্ত শোকে সে কাতর হয়ে পড়েছিল।

তাৎপর্য

জীব দুই প্রকার শরীরের দ্বারা আবৃত—স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ। মৃত্যুর সময় স্থূল শরীর নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা বাহিত হয়ে জীব আর একটি স্থূল শরীরে প্রবেশ করে। আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারে না, কিভাবে সূক্ষ্ম শরীর আত্মাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে বহন করে নিয়ে যায়। সূক্ষ্ম দেহকে এখানে একটি সর্প বা নগর-রক্ষকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন নগরীর সর্বত্র আগুন লাগে, তখন প্রধান নগর-রক্ষকও তা থেকে রক্ষা পায় না। যখন নগর সুরক্ষিত থাকে এবং সারা নগরী জুড়ে আগুন লাগার মতো সংকট থাকে না, তখন নগর-রক্ষক নাগরিকদের উপর তার অধিকার বিস্তার করতে পারে, কিন্তু যখন নগর চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়, তখন সে সর্বতোভাবে অক্ষম হয়ে যায়। প্রাণবায়ু যখন দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন সূক্ষ্ম শরীরও বেদনা অনুভব করতে থাকে।

শ্লোক ১৪

ন শেকে সোঽবিতুং তত্র পুরুকৃচ্ছ্রোরুবেপথুঃ ।
গন্তুমৈচ্ছত্ততো বৃক্ষকোটরাদিব সানলাৎ ॥ ১৪ ॥

ন—না; **শেকে**—সক্ষম হয়েছিল; **সঃ**—তিনি; **অবিতুম্**—রক্ষা করতে; **তত্র**—সেখানে; **পুরু**—অত্যন্ত; **কৃচ্ছ্র**—ক্লেশ; **উরু**—অত্যন্ত; **বেপথুঃ**—কম্প; **গন্তুম্**—বেরিয়ে যাওয়ার জন্য; **ঐচ্ছৎ**—বাসনা করেছিল; **ততঃ**—সেখান থেকে; **বৃক্ষ**—বৃক্ষের; **কোটরাৎ**—কোটর থেকে; **ইব**—সদৃশ, **স-অনলাৎ**—অগ্নিতে।

অনুবাদ

বনে আগুন লাগলে বৃক্ষের কোটরস্থ সর্প যেমন সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, তেমনই নগরীর অধ্যক্ষ সর্পটিও অগ্নির প্রচণ্ড তাপের ফলে, সেই নগরী ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল।

তাৎপর্য

বনে যখন আগুন লাগে, তখন সাপেদের পক্ষে সেই বন থেকে বেরিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়। অন্যান্য পশুরা তাদের দীর্ঘ পায়ের সাহায্যে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভুজঙ্গ সাধারণত সেই আগুনে দগ্ধ হয়। জীবনের অন্তিম সময়ে, প্রাণবায়ু যেভাবে প্রভাবিত হয়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলি ততটা হয় না।

শ্লোক ১৫

শিথিলাবয়বো যর্হি গন্ধর্বৈর্হৃতপৌরুষঃ ।
যবনৈররিভী রাজন্নুপরুদ্ধো রুরোদ হ ॥ ১৫ ॥

শিথিল—শিথিল; **অবয়বঃ**—তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **যর্হি**—যখন; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **হৃত**—পরাজিত; **পৌরুষঃ**—তাঁর দৈহিক শক্তি; **যবনৈঃ**—যবনদের দ্বারা; **অরিভিঃ**—শত্রুদের দ্বারা; **রাজন্**—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ; **উপরুদ্ধঃ**—রুদ্ধ হওয়ায়; **রুরোদ**—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে থাকে; **হ**—বাস্তবিকপক্ষে।

অনুবাদ

যখন গন্ধর্ব ও যবন সৈনিকেরা তাঁর দেহের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে ফেলছিল, তখন সেই সর্পটির শরীর শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সে যখন তার দেহটি ত্যাগ করার চেষ্টা করে, তখন তার শত্রুরা তাকে আটকে ফেলে। এইভাবে তার সমস্ত প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন সে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

জীবনের অন্তিম সময়ে ব্যাধির প্রভাবে, কফ, পিত্ত ও বায়ুর দ্বারা শরীরের বিভিন্ন দ্বারগুলি রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন জীব তার কষ্ট ব্যক্ত করতে পারে না, এবং তার

চারপাশে দণ্ডায়মান আত্মীয়-স্বজনেরা মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যক্তির কণ্ঠ থেকে 'ঘুর্‌ঘুর্' শব্দ শুনতে পায়। *মুকুন্দমালা-স্তোত্রে* রাজা কুলশেখর বর্ণনা করেছেন—

কৃষ্ণ! ত্বদীয়-পদপঙ্কজপঞ্জরান্তম্
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥

"হে কৃষ্ণ! আমাকে এখনই মৃত্যুবরণ করতে দাও, যাতে আমার মনরূপী হংস তোমার চরণ-কমলের নালের দ্বারা আলিঙ্গিত হতে পারে। তা না হলে, প্রাণত্যাগ করার সময় যখন আমার কণ্ঠ কফ, বায়ু ও পিত্তের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমি কিভাবে তোমার কথা চিন্তা করব?" হংস গভীর জলে ডুব দিয়ে কমল-নালের দ্বারা বেষ্টিত হতে খুব ভালবাসে। এই বন্ধন তার এক প্রকার আনন্দ বিলাস। আমরা যদি সুস্থ অবস্থায় ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে মৃত্যুবরণ করতে পারি, তা হলে সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর সময়, কণ্ঠ কখনও কখনও কফ অথবা বায়ুর দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে তার ফলে সে কৃষ্ণকে ভুলে যেতে পারে। অবশ্য যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিত, তাঁদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে অভ্যস্ত, বিশেষ করে যখন মৃত্যুর সংকেত আসে।

শ্লোক ১৬

দুহিতৄঃ পুত্রপৌত্রাংশ্চ জামিজামাতৃপার্ষদান্ ।
স্বত্বাবশিষ্টং যৎকিঞ্চিদ্ গৃহকোশপরিচ্ছদম্ ॥ ১৬ ॥

দুহিতৄঃ—কন্যা; **পুত্র**—পুত্র; **পৌত্রান্**—পৌত্র; **চ**—এবং; **জামি** পুত্রবধূ; **জামাতৃ**—জামাতা; **পার্ষদান্**—পার্ষদ; **স্বত্ব**—সম্পত্তি; **অবশিষ্টম্**—অবশিষ্ট; **যৎ কিঞ্চিৎ**—যা কিছু; **গৃহ**—গৃহ; **কোশ**—সঞ্চিত ধন; **পরিচ্ছদম্**—গৃহের উপকরণ।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তখন তাঁর কন্যা, পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ, জামাতা, ভৃত্য, অন্যান্য পার্ষদ, গৃহ, গৃহের উপকরণ এবং যৎসামান্য সঞ্চিত ধন-সম্পদের কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

প্রায়ই দেখা যায় যে, জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুর সময় ডাক্তারের কাছে অনুরোধ করে, আর কিছুক্ষণের জন্য তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। তথাকথিত ডাক্তারেরা অক্সিজেন বা অন্যান্য ওষুধের সাহায্যে কয়েক মিনিটের জন্য যদি রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তা হলে তারা তাদের সেই প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে করে, কিন্তু চরমে রোগীকে মৃত্যুবরণ করতেই হয়। একে বলা হয় জীবন সংগ্রাম। মৃত্যুর সময় রোগী ও ডাক্তার দুজনেই জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার কথা চিন্তা করে, যদিও দেহটি প্রায় মরে গেছে এবং আত্মা তা থেকে প্রায় বেরিয়ে গেছে।

শ্লোক ১৭

অহং মমেতি স্বীকৃত্য গৃহেষু কুমতিগৃহী ।
দধ্যৌ প্রমদয়া দীনো বিপ্রয়োগ উপস্থিতে ॥ ১৭ ॥

অহম্—আমি, **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে, **স্বী-কৃত্য**—স্বীকার করে; **গৃহেষু**—গৃহে; **কু-মতিঃ**—যার মন কদর্য চিন্তায় পূর্ণ; **গৃহী**—গৃহস্থ; **দধ্যৌ**—চিন্তা করে; **প্রমদয়া**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে; **দীনঃ**—অত্যন্ত দরিদ্র, **বিপ্রয়োগে**—যখন বিচ্ছেদ; **উপস্থিতে**—উপস্থিত হলে

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তাঁর পরিবার এবং 'আমি' ও 'আমার' ধারণার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, তাই তিনি ইতিপূর্বেই অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখন তার সঙ্গে বিচ্ছেদের সময় উপস্থিত হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মৃত্যুর সময়েও মনে জড় সুখভোগের চিন্তা থাকে। তা ইঙ্গিত করে যে, মন, বুদ্ধি ও অহংকার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহ আত্মাকে বহন করে নিয়ে যায়। অহংকারের ফলে জীব জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, এবং জড় সুখভোগের অভাবে সে অত্যন্ত বিষণ্ণ অথবা কাতর হয়ে পড়ে। সে তার বুদ্ধি দিয়ে পরিকল্পনা করে, কিভাবে তার আয়ু বাড়ানো যায়, এবং তাই

স্থূল শরীর পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও, সে তার সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা অন্য আর একটি স্থূল শরীরে বাহিত হয়. জড় চক্ষুর দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের দেহান্তর দেখা যায় না; তাই কেউ যখন তার স্থূল দেহটি ত্যাগ করে, তখন আমরা মনে করি যে, তার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে জড় সুখভোগের পরিকল্পনাগুলি করে সূক্ষ্ম দেহ, এবং স্থূল দেহ হচ্ছে সেই পরিকল্পনাগুলি উপভোগ করার যন্ত্র। সেই সূত্রে স্থূল দেহকে পত্নীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ পত্নী হচ্ছে পতির সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রধান সহায়ক স্থূল দেহের সঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ সম্পর্ক থাকার ফলে, জীব তার বিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে। জীবের মানসিক কার্যকলাপ তাকে অন্য আর একটি স্থূল দেহ ধারণ করে তার জড়-জাগতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে বাধ্য করে।

সংস্কৃত ভাষায় *স্ত্রী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিস্তার' স্ত্রীর মাধ্যমে মানুষ পুত্র, কন্যা, পৌত্র ইত্যাদি আকর্ষণের বস্তুগুলি বিস্তার করে। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আসক্তি মৃত্যুর সময় অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকট হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, দেহত্যাগ করার ঠিক পূর্বে মানুষ তার প্রিয় পুত্রকে ডেকে তার হাতে তার পত্নী এবং অন্যান্য বস্তুর দায়িত্বভার অর্পণ করে সে বলে, "প্রিয় পুত্র। আমি তো এখন চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি দয়া করে তুমি পরিবারের দায়দায়িত্ব গ্রহণ কর" সে যে কোথায় যাচ্ছে সেই সম্বন্ধে কিছুই না জেনে, সে এইভাবে বলে।

শ্লোক ১৮

লোকান্তরং গতবতি মষ্যনাথা কুটুম্বিনী ।
বর্তিষ্যতে কথং ত্বেষা বালকাননুশোচতী ॥ ১৮ ॥

লোক-অন্তরম্—অন্য জীবনে; **গতবতি ময়ি**—আমি চলে গেলে; **অনাথা**—পতিবিহীনা; **কুটুম্বিনী**—আত্মীয়স্বজন পরিবৃতা; **বর্তিষ্যতে**—অবস্থান করবে; **কথম্**—কিভাবে; **তু**—তখন; **এষা**—এই নারী; **বালকান্**—শিশুদের; **অনুশোচতী**—শোক করতে করতে

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, "হায়, আমার পত্নী এতগুলি সন্তানের ভারে ভারাক্রান্ত। আমি দেহত্যাগ করে অন্য লোকে চলে গেলে, সে কিভাবে পরিবারের এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের পালন করবে? হায়। পরিবার প্রতিপালনের দুশ্চিন্তায় সে না জানি কত কষ্ট পাবে।"

তাৎপর্য

তাঁর পত্নীর বিষয়ে তাঁর এত চিন্তা দেখে বোঝা যায় যে, রাজা স্ত্রীলোকদের চিন্তায় অত্যন্ত মগ্ন ছিলেন সাধারণত সতী নারী অত্যন্ত পতিব্রতা পত্নী হন। তার ফলে পতি তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন, এবং পরিণামে মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর পত্নীর কথা অত্যধিক চিন্তা করেন। এটি একটি অত্যন্ত ভয়ংকর পরিস্থিতি, যা রাজা পুরঞ্জনের জীবন থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কেউ যদি মৃত্যুর সময় শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে না গিয়ে, একটি স্ত্রী-শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে, আর একটি জড়-জাগতিক জীবন যাপনের নতুন অধ্যায় শুরু করবেন।

শ্লোক ১৯

ন ময্যনাশিতে ভুঙ্‌ক্তে নাস্নাতে স্নাতি মৎপরা ।
ময়ি রুষ্টে সুসন্ত্রস্তা ভর্ৎসিতে যতবাগ্‌ভয়াৎ ॥ ১৯ ॥

ন—কখনই না; **ময়ি**—যখন আমি; **অনাশিতে**—আহার না করলে; **ভুঙ্‌ক্তে**—সে ভোজন করত; **ন**—কখনই না, **অস্নাতে**—আমি স্নান না করলে, **স্নাতি**—সে স্নান করত; **মৎ-পরা**—সর্বদা আমার প্রতি অনুরক্ত; **ময়ি**—আমি যখন; **রুষ্টে**—ক্রুদ্ধ হতাম; **সু-সন্ত্রস্তা**—অত্যন্ত ভীত হত; **ভর্ৎসিতে**—আমি যখন তাকে ভর্ৎসনা করতাম; **যত-বাক্**—পূর্ণরূপে বাণী সংযত করে; **ভয়াৎ**—ভয়বশত।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর সঙ্গে তাঁর পূর্ব আচরণের কথা মনে করতে লাগলেন। রাজা ভাবতে লাগলেন "আমি আহার না করা পর্যন্ত সে আহার করত না, আমি স্নান না করা পর্যন্ত সে স্নান করত না, এবং সে আমার প্রতি এতই অনুরক্ত ছিল যে, কখনও কখনও আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করলে, সে নীরবে আমার সেই দুর্ব্যবহার সহ্য করত।"

তাৎপর্য

পত্নীর কর্তব্য সর্বদা পতির প্রতি বিনম্র থাকা। বিনম্রতা, মৃদু ব্যবহার এবং আনুগত্য হচ্ছে পত্নীর গুণ, যা পতিকে তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তাশীল করে তোলে। পারিবারিক জীবনে পত্নীর প্রতি পতির আসক্তি খুব ভাল লক্ষণ, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তা ভাল নয়। তাই প্রতিটি গৃহে কৃষ্ণভক্তির প্রতিষ্ঠা

হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যদি পতি ও পত্নী কৃষ্ণভক্তিতে পরস্পরের প্রতি আসক্ত থাকে, তা হলে তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে শ্রীকৃষ্ণ থাকার ফলে, তাঁরা উভয়েই লাভবান হবেন। তা না হলে, পতি যদি তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, তা হলে তাঁকে তাঁর পরবর্তী জীবনে স্ত্রী-শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হবে। স্ত্রী যদি তাঁর পতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকেন, তা হলে তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে পুরুষ-শরীর প্রাপ্ত হবেন। স্ত্রীর পক্ষে অবশ্য পুরুষ হয়ে জন্মানো লাভজনক, কিন্তু পুরুষের স্ত্রী-শরীর লাভ করাটা মোটেই লাভজনক নয়।

শ্লোক ২০

প্রবোধয়তি মাবিজ্ঞং ব্যুষিতে শোককর্শিতা ।
বর্ত্মৈতদ্ গৃহমেধীয়ং বীরসূরপি নেষ্যতি ॥ ২০ ॥

প্রবোধয়তি—সৎ পরামর্শ দেয়; **মা**—আমাকে; **অবিজ্ঞম্**—মূর্খ; **ব্যুষিতে**—আমি বাইরে গেলে; **শোক**—শোকের দ্বারা; **কর্শিতা**—শোকের ফলে ম্রিয়মাণ; **বর্ত্ম**—পথ; **এতৎ**—এই; **গৃহ-মেধীয়ম্**—গৃহের দায়দায়িত্ব; **বীর-সূঃ**—বীরদের জননী; **অপি**—যদিও; **নেষ্যতি**—সে কি সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন ভাবতে লাগলেন—"আমি যখন মোহাচ্ছন্ন হতাম, তখন আমার পত্নী কিভাবে আমাকে সৎ পরামর্শ প্রদান করত এবং আমি গৃহ থেকে বাইরে চলে গেলে, সে অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হত। যদিও সে বহু সন্তানের জননী, তবুও আমার আশঙ্কা এই যে, গৃহস্থালির দায়-দায়িত্বগুলি বহন করতে সে কি সক্ষম হবে?"

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময় রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করছিলেন। তাকে বলা হয় কলুষিত চেতনা। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) বিশ্লেষণ করেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে যত জীব রয়েছে, তারা সকলেই আমার শাশ্বত বিভিন্ন অংশ। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে, তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করছে।"

জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং জীবের স্বরূপ গুণগতভাবে এক একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, জীব নিত্যকাল ভগবানের অণুসদৃশ অংশ *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*। এই জড় জগতের বদ্ধ জীবনে, ভগবানের অণুসদৃশ অংশ জীবাত্মা তার কলুষিত মন এবং চেতনার দরুন সংগ্রাম করছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে জীবের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, রাজা পুরঞ্জন (জীব) একজন স্ত্রীর কথা চিন্তা করছেন। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে এইভাবে মগ্ন হওয়ার ফলে, জীব এই জড় জগতে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। রাজা পুরঞ্জন যেহেতু তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করছিলেন, তাই তাঁর মৃত্যুতে এই জড় জগতে তাঁর সংগ্রাম সমাপ্ত হবে না পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁর পত্নীর চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, রাজা পুরঞ্জনকে তাঁর পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর গ্রহণ করতে হয়েছিল। এইভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, কপট ধর্ম, জাতি এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাই বন্ধনের কারণ হয়। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষকে এই জীবনেই তার কার্যকলাপের পরিবর্তন করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) তা প্রতিপন্ন হয়েছে। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।* আমরা যদি এই জীবনে আমাদের চেতনার পরিবর্তন সাধন না করি, তা হলে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম অথবা সম্প্রদায় এবং জাতির কল্যাণ সাধনের নামে আমরা যা ই করি, তা সবই আমাদের বন্ধনের কারণ হবে। অর্থাৎ আমাদের এই জড় জগতে বদ্ধ জীবন চলতে থাকবে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) সেই সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।* মন ও ইন্দ্রিয়গুলি যখন জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, তখন সুখলাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয় প্রতিটি জীবনেই জীব সুখী হওয়ার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে কেউই সুখী নয় কিন্তু এই সংগ্রাম তাকে সুখের ভ্রান্ত অনুভূতি প্রদান করে মানুষকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, এবং সে যখন তার সেই কঠোর পরিশ্রমের ফল লাভ করে, তখন সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে প্রকৃত সুখ যে কি তা এই জড় জগতে কেউই জানে না। *সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্* (*ভগবদ্গীতা* ৬/২১)। প্রকৃত সুখ অনুভব করতে হয় দিব্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। পবিত্র না হলে, দিব্য ইন্দ্রিয়গুলি প্রকাশিত হয় না, তাই ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয়। তখন প্রকৃত সুখ এবং মুক্তিলাভ হবে।

ভগবদ্গীতায় (১৫/৮) বলা হয়েছে—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥

"এই জড় জগতে জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণা বহন করে, ঠিক যেভাবে বায়ু গন্ধ বহন করে " গোলাপ বাগিচার উপর দিয়ে যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সেই বায়ু গোলাপের গন্ধ বহন করে নিয়ে যায়, এবং তা যদি নোংরা স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তা নানা রকম কদর্য বস্তুর দুর্গন্ধ বহন করে। তেমনই, রাজা পুরঞ্জন বা জীব তাঁর জীবনের বায়ু তাঁর পত্নীর উপর দিয়ে প্রবাহিত করছিলেন, তাই তাঁকে তাঁর পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর ধারণ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ২১

কথং নু দারকা দীনা দারকীর্বাপরায়ণাঃ ।
বর্তিষ্যন্তে ময়ি গতে ভিন্ননাব ইবোদধৌ ॥ ২১ ॥

কথম্—কিভাবে; **নু**—প্রকৃতপক্ষে; **দারকাঃ**—পুত্রগণ; **দীনাঃ**—অসহায়; **দারকীঃ**—কন্যাগণ, **বা**—অথবা , **অপরায়ণাঃ**—নিরাশ্রয়; **বর্তিষ্যন্তে**—জীবন ধারণ করবে; **ময়ি**—আমি যখন ; **গতে**—এই পৃথিবী থেকে চলে গেলে; **ভিন্ন**—ভগ্ন, **নাবঃ**—নৌকা; **ইব**—সদৃশ; **উদধৌ**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন দুশ্চিন্তা করতে লাগলেন—"আমি পরলোকে গমন করলে, সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভরশীল আমার পুত্র ও কন্যারা কিভাবে জীবন ধারণ করবে? মাঝসমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হলে আরোহীদের যে অবস্থা হয়, তাদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম হবে।"

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময় প্রতিটি জীবই চিন্তা করে, তার পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের কি হবে। তেমনই রাজনীতিবিদেরাও চিন্তা করে, তাদের মৃত্যু হলে, তাদের দেশের এবং রাজনৈতিক দলের কি অবস্থা হবে। পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় না হলে, তাকে তার

বিশেষ চেতনা অনুসারে, পরবর্তী জীবনে একটি বিশেষ দেহ ধারণ করতে হবে। যেহেতু পুরঞ্জন তাঁর পত্নী ও পুত্র-কন্যাদের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, বিশেষ করে তিনি তাঁর পত্নীর চিন্তায় অত্যন্ত মগ্ন ছিলেন, তাই তাঁকে পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর ধারণ করতে হবে। তেমনই রাজনীতিবিদ অথবা তথাকথিত জাতীয়তাবাদীরা, যারা তাদের জন্মভূমির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা অবশ্যই তাদের জীবনান্তে পুনরায় সেই দেশেই জন্মগ্রহণ করবে। মানুষের এই জীবনের কর্মের দ্বারা তার পরবর্তী জীবন প্রভাবিত হয়। কখনও কখনও রাজনীতিবিদেরা তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য অত্যন্ত জঘন্য পাপকর্ম করে। বিরোধী দলের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। রাজনীতিবিদেরা যদি তাদের তথাকথিত মাতৃভূমিতে জন্মগ্রহণ করেও, তবুও তাদের পূর্বজন্মের পাপকর্মের ফলে, তাদের নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়।

দেহান্তরের এই বিজ্ঞান আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না, কারণ তারা যদি এই সূক্ষ্ম বিষয়টি এবং জীবনের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করে, তা হলে তারা দেখতে পাবে যে, তাদের ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই তারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সমস্ত বিবেচনা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতার নামে সব সময় পাপকর্ম করতে থাকে।

শ্লোক ২২

এবং কৃপণয়া বুদ্ধ্যা শোচন্তমতদর্হণম্ ।
গ্রহীতুং কৃতধীরেনং ভয়নামাভ্যপদ্যত ॥ ২২ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃপণয়া**—কার্পণ্যের দ্বারা; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধি, **শোচন্তম্**—শোক করে, **অ-তৎ-অর্হণম্**—যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়; **গ্রহীতুম্**—গ্রেফতার করার জন্য; **কৃত-ধীঃ**—দৃঢ়সংকল্প যবনরাজ, **এনম্**—তাঁকে; **ভয়-নামা**—ভয় নামক; **অভ্যপদ্যত**—তৎক্ষণাৎ সেখানে এসেছিলেন।

অনুবাদ

যদিও পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাজা পুরঞ্জনের শোক করা উচিত ছিল না, তবুও তাঁর দীন বুদ্ধির ফলে তিনি তা করেছিলেন। সেই সময় ভয় নামক যবনরাজ তাঁকে বন্দি করার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, প্রতিটি জীবাত্মা তার কর্ম ও ফলের জন্য দায়ী। শিশু অথবা বালক অবস্থায় জীব যখন অবোধ থাকে, তখন পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে তাকে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া। শিশু যখন বড় হয়ে যায়, তখন তার জীবনের কর্তব্যগুলি যথাযথভাবে সম্পাদন করার দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। পিতামাতার মৃত্যুর পর, তাঁদের সন্তানদের সাহায্য করতে পারেন না। সন্তানদের সাময়িক সাহায্যের জন্য পিতা কিছু সম্পত্তি রেখে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পরিবারের ভরণপোষণ কিভাবে হবে, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত নয়। এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের রোগ। সে কেবল তার নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্যই পাপকর্ম করে না, তার সন্তান-সন্ততিরা যাতে মহা আড়ম্বরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে পারে, সেই জন্যও প্রচুর ধনসম্পদ রেখে যেতে চায়।

সে যাই হোক, সকলেই মৃত্যুর ভয়ে ভীত, এবং তাই মৃত্যুকে বলা হয় *ভয়*। পুরঞ্জন যদিও তাঁর পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তবুও মৃত্যু তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করেনি। মৃত্যু কারোরই জন্য প্রতীক্ষা করে না; সে তৎক্ষণাৎ তার কর্তব্য সম্পাদন করে। মৃত্যু যেহেতু নির্দ্বিধায় সমস্ত জীবদের এখান থেকে নিয়ে যাবে, তাই যে সমস্ত নাস্তিকেরা ভগবদ্ভক্তিকে অবহেলা করে তাদের দেশ, সমাজ, আত্মীয়-স্বজনদের চিন্তায় তাদের জীবনের অপচয় করে, তাদের কাছে মৃত্যুই হচ্ছে চরম ভগবৎ-উপলব্ধি। এই শ্লোকে *অতদ্-অর্হণম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার অর্থ হচ্ছে, আত্মীয়স্বজন, দেশবাসী, সমাজ এবং জাতির কল্যাণজনক কার্যে অত্যধিক আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। সেগুলি মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে সাহায্য করে না। দুর্ভাগ্যবশত এখন সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদেরও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। যদিও মনুষ্য-জীবন লাভ করার ফলে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের সুযোগ পেয়েছে, তবুও তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায় না। ধন থাকা সত্ত্বেও যে সেই ধন ব্যবহার করে না, তাকে বলা হয় কৃপণ। তাই এই সমস্ত মানুষেরা হচ্ছে এক-একটি মস্ত বড় কৃপণ। তারা তাদের জীবনের অপব্যবহার করে, এবং তাদের আত্মীয়স্বজন, দেশবাসী, সমাজ ইত্যাদি জাগতিক কল্যাণের চিন্তায় মগ্ন থেকে মনুষ্য জীবনের অমূল্য সুযোগটির অপচয় করে। মানুষের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে কিভাবে মৃত্যুকে জয় করতে হয়, সেই শিক্ষা লাভ করা। মৃত্যুকে জয় করার পন্থা বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) উল্লেখ করেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন! যে ব্যক্তি জানেন যে, আমার আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ অপ্রাকৃত, তিনি দেহত্যাগ করার পর, পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেন না তিনি আমার নিত্য ধাম প্রাপ্ত হন।"

যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনি এই দেহ ত্যাগ করার পর, পুনরায় আর একটি জড় শরীর ধারণ করেন না, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। প্রত্যেকেরই এই পূর্ণতা লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত তা না করে, মানুষ তার সমাজ, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়তমা এবং আত্মীয়-স্বজনদের চিন্তায় মগ্ন থাকে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষদের শিক্ষা দিচ্ছে, কিভাবে মৃত্যুকে জয় করতে হয়। *হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি।* পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করলে, মৃত্যুকে জয় করা যায় না।

শ্লোক ২৩

পশুবদ্‌যবনৈরেষ নীয়মানঃ স্বকং ক্ষয়ম্ ।
অন্বদ্রবন্ননুপথাঃ শোচন্তো ভৃশমাতুরাঃ ॥ ২৩ ॥

পশু-বৎ—পশুর মতো, **যবনৈঃ**—যবনদের দ্বারা; **এষঃ**—পুরঞ্জন; **নীয়মানঃ**—বন্ধন করে নিয়ে গেল; **স্বকম্**—তাদের; **ক্ষয়ম্**—বাসস্থানে; **অন্বদ্রবন্**—পশ্চাদ্‌বর্তী হল; **অনুপথাঃ**—তাঁর অনুচরেরা; **শোচন্তঃ**—শোক করে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **আতুরাঃ**—ব্যাকুল হয়ে।

অনুবাদ

যবনেরা যখন রাজা পুরঞ্জনকে একটি পশুর মতো বন্ধন করে তাঁকে তাদের স্থানে নিয়ে যেতে লাগল, তখন রাজার অনুচরেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। তারা যখন শোক করছিল, তখন তাদেরও তার সঙ্গে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তাৎপর্য

যমরাজ ও যমদূতেরা যখন জীবকে যমালয়ে নিয়ে যান, তখন প্রাণ, বাসনা আদি জীবের অনুচরেরাও তার সঙ্গে যায়। সেই সত্য বেদে প্রতিপন্ন হয়েছে। যমরাজ

যখন জীবকে বন্দি করে নিয়ে যান (*তম্ উৎক্রামন্তম্*), প্রাণও তখন তার সঙ্গে যায় (*প্রাণোঽনূৎক্রামতি*), এবং প্রাণ যখন যায় (*প্রাণম্‌অনূৎক্রামন্তম্*), সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও (*সর্বে প্রাণাঃ*) তার সঙ্গে যায় (*অনূৎক্রামন্তি*)। জীব এবং প্রাণবায়ু যখন চলে যায়, তখন মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতের তৈরি জড় পিণ্ডটি এখানে পড়ে থাকে। জীব তখন বিচারের জন্য যমালয়ে যায়, এবং যমরাজ স্থির করেন সে তার পরবর্তী জীবনে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে। এই পন্থাটি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে অজ্ঞাত প্রতিটি জীবই এই জীবনে তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী, এবং মৃত্যুর পর তাকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে স্থির করা হয় তার পরবর্তী শরীরটি কি রকম হবে তার স্থূল জড় দেহ ত্যাগ করলেও, তার বাসনা এবং বিগত কর্মের ফল জীবাত্মার সঙ্গে যায়। যমরাজ স্থির করেন জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ২৪

পুরীং বিহায়োপগতঃ উপরুদ্ধো ভুজঙ্গমঃ ।
যদা তমেবানু পুরী বিশীর্ণা প্রকৃতিং গতা ॥ ২৪ ॥

পুরীম্—নগরী; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **উপগতঃ**—চলে গেলে; **উপরুদ্ধঃ**—অবরুদ্ধ, **ভুজঙ্গমঃ**—সর্প, **যদা**—যখন, **তম্** তাকে, **এব** নিশ্চিতভাবে, **অনু**—পশ্চাৎ, **পুরী**—নগরী; **বিশীর্ণা**—বিধ্বস্ত; **প্রকৃতিম্**—পঞ্চভূতে; **গতা**—পরিণত হয়েছিল।

অনুবাদ

তখন সেই সর্পটিও, যাকে যবনরাজের সৈন্যরা বন্দি করে পূর্বেই নগরী থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল, অন্যদের সঙ্গে সেও তার প্রভুকে অনুসরণ করতে লাগল। তারা যখন সেই নগরীটি ত্যাগ করল, তখনই তা বিশীর্ণ হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হল।

তাৎপর্য

জীবকে যখন যমদূতেরা বন্দি করে নিয়ে যায়, তখন প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় আদি তার অনুগামীরাও তৎক্ষণাৎ জড় দেহটিকে ত্যাগ করে জীব ও তার অনুচরেরা যখন দেহটি ছেড়ে চলে যায়, তখন দেহটি আর কোন কর্ম করতে পারে না এবং তা পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায়। শত্রুরা যখন কোন নগরী আক্রমণ

করে, তখন সেই নগরীর অধিবাসীরা সেই নগরী ছেড়ে চলে যায়, এবং শত্রুরা তখন বোমা বর্ষণ করে সেই নগরীটিকে ধূলিসাৎ করে। আমরা যখন বলি, "তুমি মৃত্তিকা, এবং মৃত্তিকাতেই তুমি পরিণত হবে," তখন আমরা এই দেহটিকে বোঝাই। শত্রুরা যখন কোন নগরী আক্রমণ করে তাতে বোমা বর্ষণ করে, তখন নাগরিকেরা সেই নগরী ত্যাগ করে চলে যায়, এবং সেই নগরীর আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

মূর্খ ব্যক্তি কেবল নগরবাসীদের মঙ্গল বিবেচনা না করে নগরীর উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করে। তেমনই যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়ার ফলে, দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাই যে প্রধান তত্ত্ব তা জানে না, সে কেবল দেহটিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। মানুষ যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখন আত্মা নিত্য দেহান্তরের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। যারা তাদের দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের *শ্রীমদ্ভাগবতে* গরু ও গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (*স এব গোখরঃ*)। গাভী অত্যন্ত অবোধ পশু, আর গাধা হচ্ছে ভারবাহী পশু। যে সমস্ত ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধির ফলে কঠোর পরিশ্রম করে, তারা গাধার মতো। তারা তাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত নয়। তাই বলা হয়েছে—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে মানুষ কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই তিনটি ধাতু দিয়ে তৈরি দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, যে তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন বলে মনে করে, যেই স্থানটিতে তার দেহের জন্ম হয়েছে, সেই স্থানটিকে পূজ্য বলে মনে করে, এবং দিব্য জ্ঞানসমন্বিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পরিবর্তে যে কেবল স্নান করার জন্য তীর্থস্থানে যায়, সেই ব্যক্তি একটি গাধা বা গরুর মতো।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৮৪/১৩)

কৃষ্ণ-ভাবনাবিহীন মানব-সভ্যতা নিম্ন স্তরের পশুদের সভ্যতা মাত্র। কখনও কখনও এই সভ্যতা মৃত শরীর সম্বন্ধে গবেষণা করে, এবং মস্তিষ্ক অথবা হৃদয় সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে। কিন্তু আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত দেহের কোন অঙ্গেরই কোন রকম গুরুত্ব থাকে না। গরু ও গাধার আধুনিক সভ্যতায় বৈজ্ঞানিকেরা মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক অথবা হৃদয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে মাত্র।

শ্লোক ২৫

বিকৃষ্যমাণঃ প্রসভং যবনেন বলীয়সা ।
নাবিন্দত্তমসাবিষ্টঃ সখায়ং সুহৃদং পুরঃ ॥ ২৫ ॥

বিকৃষ্যমাণঃ—টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **যবনেন**—যবনদের দ্বারা; **বলীয়সা**—অত্যন্ত বলবান; **ন অবিন্দৎ**—স্মরণ করতে পারেননি; **তমসা**—অজ্ঞানের অন্ধকারের দ্বারা; **আবিষ্টঃ**—আচ্ছন্ন হয়ে; **সখায়ম্**—তার বন্ধু; **সুহৃদম্**—নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী; **পুরঃ**—প্রথম থেকে।

অনুবাদ

অত্যন্ত বলবান যবনেরা যখন বলপূর্বক রাজা পুরঞ্জনকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার ফলে, তিনি তাঁর সখা এবং নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

মানুষ যদি কেবল তিনটি বিষয়ে জানেন—যথা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা, তিনি সব কিছুর মালিক, এবং তিনি সমস্ত জীবের পরম বন্ধু, তা হলে তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে সর্বতোভাবে শান্তিলাভ করতে পারেন এবং সুখী হতে পারেন। কেউ যদি তা না জেনে দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আচরণ করেন, তা হলে তিনি সর্বদাই জড়া প্রকৃতির দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে, নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই পাশে বসে রয়েছেন। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১)। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষে পাশাপাশি বসে রয়েছেন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও, মূর্খ জীব সেই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য ভগবন্মুখী হয় না। পক্ষান্তরে সে মনে করে যে, সে জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। জীবকে ভগবন্মুখী হয়ে তাঁর শরণাগত হতে হয়। তখনই কেবল সে বলবান যবন বা যমরাজের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এই শ্লোকে *সখায়াম্* ('সখা') শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ভগবান চিরকাল জীবের পাশে উপস্থিত থাকেন। ভগবানকে *সুহৃদম্* ('শুভাকাঙ্ক্ষী') বলেও বর্ণনা করা হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী, ঠিক পিতা অথবা মাতার মতো। পুত্রের শত অপরাধ সত্ত্বেও পিতা ও মাতা সর্বদাই পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী। তেমনই আমাদের সমস্ত অপরাধ সত্ত্বেও এবং ভগবানের ইচ্ছার অবাধ্যতা করা সত্ত্বেও, আমরা যদি কেবল ভগবানের শরণাগত হই, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*), তা হলে তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে আমাদের তৎক্ষণাৎ পরিত্রাণ করবেন দুর্ভাগ্যবশত, অসৎ সঙ্গের ফলে এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের প্রতি প্রবল আসক্তির ফলে, আমরা আমাদের পরম বন্ধু পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে পারি না।

শ্লোক ২৬

তং যজ্ঞপশবোঽনেন সংজ্ঞপ্তা যেঽদয়ালুনা ।
কুঠারৈশ্চিচ্ছিদুঃ ক্রুদ্ধাঃ স্মরন্তোঽমীবমস্য তৎ ॥ ২৬ ॥

তম্ তাঁকে; **যজ্ঞ-পশবঃ** যজ্ঞে বলি দেওয়ার পশু, **অনেন**—তাঁর দ্বারা, **সংজ্ঞপ্তাঃ**—নিহত; **যে**—যারা; **অদয়ালুনা**—অত্যন্ত নির্দয় ব্যক্তির দ্বারা; **কুঠারৈঃ**—কুঠারের দ্বারা; **চিচ্ছিদুঃ**—খণ্ড-খণ্ড করলেন; **ক্রুদ্ধাঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করে, **অমীবম্**—পাপকর্ম; **অস্য**—তাঁর; **তৎ**—সেই।

অনুবাদ

সেই অত্যন্ত নির্দয় রাজা পুরঞ্জন বিভিন্ন যজ্ঞে বহু পশুহত্যা করেছিলেন। এখন সেই সমস্ত পশুরা সুযোগ পেয়ে তাদের শিং-এর দ্বারা তাঁকে বিদীর্ণ করতে লাগল। যেন তারা কুঠার দিয়ে তাঁকে খণ্ড-খণ্ড করে কাটতে লাগল।

তাৎপর্য

যারা ধর্মের নামে অথবা আহার করার জন্য পশুহত্যা করে, মৃত্যুর পর তাদের এই প্রকার দণ্ডভোগ করতে হয়। *মাংস* শব্দটি 'মাম্' (আমাকে) এবং 'স' (সে) এই শব্দ দুটির সমন্বয়; অর্থাৎ, যে পশুগুলিকে আমরা হত্যা করি, আবার আমাদেরকে হত্যা করার জন্য তাদের সুযোগ দিতে হবে। যদিও বাস্তবিকপক্ষে কোন জীবাত্মাকে হত্যা করা যায় না, তবুও মৃত্যুর পর সেই সমস্ত পশুদের

শিং-এর দ্বারা বিদীর্ণ হওয়ার বেদনা অনুভব করতে হয়। তা না জেনে, মূর্খেরা অসহায় পশুদের নির্বিবাদে হত্যা করে। তথাকথিত সভ্য মানব-সমাজ ধর্মের নামে অথবা আহারের জন্য বহু কসাইখানা খুলেছে। যারা একটু ধর্মপরায়ণ তারা মন্দিরে, মসজিদে অথবা উপাসনাস্থলে পশুহত্যা করে, আর যারা আরও অধঃপতিত তারা কসাইখানায় পশুহত্যা করে। ঠিক যেমন মানব-সমাজের আইন হচ্ছে জীবনের জন্য জীবন, তেমনই ভগবানের আইনেও অন্য কোন জীবের জীবন নেওয়ার অধিকার কারও নেই। পরম পিতা ভগবানের রাজ্যে বেঁচে থাকার অধিকার সকলেরই রয়েছে, এবং তাই ধর্মের নামে অথবা আহারের জন্য পশুহত্যাকে ভগবান সর্বদাই নিন্দা করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"যারা হিংসাপরায়ণ ও ক্রূর এবং যারা নরাধম, তাদের আমি এই ভবসাগরে বিভিন্ন আসুরিক যোনিতে নিক্ষেপ করি।" পশু-ঘাতকেরা (*দ্বিষতঃ*) পরমেশ্বর ভগবান ও অন্যান্য জীবদের প্রতি হিংসাপরায়ণ বলে তাদের অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয় এবং তাই তারা জীবনের উদ্দেশ্য কখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৭

অনন্তপারে তমসি মগ্নো নষ্টস্মৃতিঃ সমাঃ ।
শাশ্বতীরনুভূয়ার্তিং প্রমদাসঙ্গদূষিতঃ ॥ ২৭ ॥

অনন্ত-পারে—অপার; **তমসি**—জড় অস্তিত্বের অন্ধকারে; **মগ্নঃ**—নিমজ্জিত হয়ে; **নষ্ট-স্মৃতিঃ**—সমস্ত বুদ্ধিরহিত হয়ে, **সমাঃ**—বহু বছর; **শাশ্বতীঃ**—প্রায় অনন্তকাল; **অনুভূয়**—অনুভব করে; **আর্তিম্**—ত্রিতাপ দুঃখ, **প্রমদা**—রমণীর, **সঙ্গ**—সঙ্গের দ্বারা, **দূষিতঃ**—কলুষিত হয়ে।

অনুবাদ

রমণীর দূষিত সঙ্গ প্রভাবে, রাজা পুরঞ্জনের মতো জীবেরা নিত্যকাল সংসারের কষ্টভোগ করে, এবং বহু বহু বছর ধরে স্মৃতিরহিত হয়ে, তারা জড়-জাগতিক জীবনের অন্ধকার প্রদেশে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ-মহাভূতের মাধ্যমে জীব জড় জগতে প্রবেশ করে, এবং এইভাবে তার দেহ সৃষ্টি হয়। জীব যদিও দেহের ভিতর থেকে কার্য করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে অজ্ঞাত। জীব জড় সৃষ্টিতে প্রবেশ করে, কিন্তু মায়ার দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে, তাকে আচ্ছাদিত বলে মনে হয়। অবিদ্যার ফলে (*নাববুধ্যতে*) দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হয়। বুদ্ধিকে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তার কার্যকলাপের প্রাধান্যের জন্য তাকে এই শ্লোকে *অধীশঃ* বা অধীশ্বরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জীব অগ্নি, জল এবং অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করে। এই তিনের সমন্বয়ের মাধ্যমে দেহের পালন হয়। তাই দেহকে বলা হয় *প্রকৃতি*। এই উপাদানগুলির সমন্বয়ের ফলে ক্রমশ মাংস, অস্থি, রক্ত ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এগুলিকে বিভিন্ন বাসগৃহ বলে মনে হয়। *বেদে* বলা হয়েছে যে, পচনের পর খাদ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়। কঠিন অংশ মলে পরিণত হয়, এবং অর্ধতরল অংশ মাংসে পরিণত হয়। তরল অংশ পীতবর্ণে পরিণত হয় এবং তারপর তা পুনরায় তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়। তার এক অংশ হচ্ছে মূত্র। তেমনই আগ্নেয় ভাগ তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়, এবং তার একটিকে বলা হয় অস্থি। পঞ্চভূতের মধ্যে অগ্নি, জল ও অন্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে এই তিনটির উল্লেখ হয়েছে, কিন্তু আকাশ ও বায়ুর উল্লেখ হয়নি। এই সবের ব্যাখ্যা *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২০) এইভাবে করা হয়েছে—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥

"জড়া প্রকৃতি ও জীব উভয়েই অনাদি। তাদের রূপান্তর এবং প্রকৃতির গুণ জড়া প্রকৃতিজাত।" প্রকৃতি এবং পুরুষ (জীব) শাশ্বত। তারা যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয় এবং বিভিন্ন রূপের প্রকাশ হয়। এই সবই প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার প্রতিফল বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৫৯

তস্মিংস্ত্বং রাময়া স্পৃষ্টো রমমাণোঽশ্রুতস্মৃতিঃ ।
তৎসঙ্গাদীদৃশীং প্রাপ্তো দশাং পাপীয়সীং প্রভো ॥ ৫৯ ॥

তস্মিন্—সেই অবস্থায়; **ত্বম্**—তুমি; **রাময়া**—রমণীর সঙ্গে; **স্পৃষ্টঃ**—সম্পর্কযুক্ত হয়ে; **রমমাণঃ**—উপভোগ করে; **অশ্রুত-স্মৃতিঃ**—চিন্ময় অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে;

তাম্—তার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **গৃহ্ন্**—গ্রহণ করে; **বভূব**—হয়েছিলেন; **প্রমদা**—নারী; **উত্তমা**—অতি উন্নত স্তরে অবস্থিত; **অনন্তরম্**—মৃত্যুর পর; **বিদর্ভস্য**—বিদর্ভের; **রাজ-সিংহস্য**—অত্যন্ত শক্তিশালী রাজার; **বেশ্মনি**—গৃহে।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি এক অতি সুন্দরী এবং উত্তম ললনা হয়েছিলেন। রাজারই গৃহে তিনি পরজন্মে বিদর্ভরাজের কন্যা হন।

তাৎপর্য

যেহেতু রাজা পুরঞ্জন তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করেছিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতার* (৮/৬) নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময় যে অবস্থা চিন্তা করে জীব দেহত্যাগ করে, সে তার পরবর্তী জীবনে নিঃসন্দেহে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে।"

যে বিশেষ বিষয়ের চিন্তায় জীব মগ্ন থাকে, মৃত্যুর সময় সে সেই বিষয়েই চিন্তা করবে। জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্নাবস্থায় অথবা সুষুপ্তিতে যে চিন্তা জীবের জীবনকে ঘিরে থাকে, মৃত্যুর সময় সে সেই বিষয় চিন্তা করবে। ভগবানের সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর, জীব এইভাবে প্রকৃতির নিয়মে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে থাকে। অবশেষে সে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। এই মনুষ্য-জীবনে যদি সে আধ্যাত্মিক জীবনকে অবহেলা করে জড়-জাগতিক চিন্তায় মগ্ন থাকে, এবং জন্ম-মৃত্যুর সমস্ত সমস্যার সমাধানকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তা হলে সে তার পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হবে, বিশেষ করে সে যদি তার পত্নীর কথা চিন্তা করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩১/১) বলা হয়েছে—*কর্মণা দৈব-নেত্রেণ।* জীব কখনও পুণ্যকর্ম করে এবং কখনও পাপকর্ম করে, আবার কখনও দুইভাবে আচরণ করে। তার সমস্ত কর্মেরই হিসাব-নিকাশ রাখা হয়, এবং দৈবের তত্ত্বাবধানে জীব একটি নতুন শরীর প্রাপ্ত হয়। রাজা পুরঞ্জন যদিও তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত

ছিলেন, তবুও তিনি বহু পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাই একটি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হলেও, তিনি রাজকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪১) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥

"অসফল যোগী বহু বছর ধরে পুণ্য জীবাত্মাদের লোকে সুখ উপভোগ করার পর, ধর্মপরায়ণ পরিবারে অথবা সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।"

কেউ যদি সকাম কর্ম, মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞান অথবা যোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকার ফলে, ভক্তিযোগের মার্গ থেকে অধঃপতিত হয়, তা হলে তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের নিযুক্ত করেছেন, যাতে তাঁরা জীবদের বাসনা অনুসারে, তাদের পূর্বকৃত কর্মের ন্যায্য ফল প্রদান করেন। যদিও রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তাঁর পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে, তিনি এক রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মূল কথা হচ্ছে যে, আর একটি শরীর দান করার পূর্বে, আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের মূল্যায়ন হয়। নারদ মুনি তাই ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে অন্য সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে, কেবল কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা। সেই উপদেশ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও দিয়েছিলেন। ভক্ত যদি আধ্যাত্মিক চেতনার স্তর থেকে বিচ্যুতও হন, তবুও পরবর্তী জীবনে তিনি ভগবদ্ভক্ত বা কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হবেন। এইভাবে তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান

শ্লোক ২৯

উপযেমে বীর্যপণাং বৈদর্ভীং মলয়ধ্বজঃ।
যুধি নির্জিত্য রাজন্যান্ পাণ্ড্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ২৯ ॥

উপযেমে—বিবাহ করেছিলেন; **বীর্য**—বীরত্বের; **পণাম্**—পুরস্কার; **বৈদর্ভীম্**—বিদর্ভ-দুহিতার; **মলয়-ধ্বজঃ**—মলয়ধ্বজ; **যুধি**—যুদ্ধে; **নির্জিত্য**—জয় করে; **রাজন্যান্**—অন্য রাজকুমারদের; **পাণ্ড্যঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, অথবা পাণ্ডু নামক দেশে যাঁর জন্ম হয়েছে; **পর**—দিব্য; **পুরম্**—নগরী; **জয়ঃ**—বিজেতা।

অনুবাদ

বিদর্ভরাজের দুহিতা বৈদর্ভীর বিবাহ হয়েছিল পাণ্ড্য দেশের মলয়ধ্বজ নামক এক অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে। অন্যান্য রাজকুমারদের পরাজিত করে তিনি বিদর্ভ-রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের বিবাহের সময় কতকগুলি শর্ত প্রদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন, দ্রৌপদীর বিবাহের সময় শর্ত ছিল যে, জলে একটি মাছের প্রতিবিম্ব দেখে, সেই মাছটিকে বাণবিদ্ধ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ সাতটি অত্যন্ত প্রবল বৃষকে পরাজিত করে, তাঁর এক মহিষীকে বিবাহ করেছিলেন। বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থায় রাজকন্যাদের সম্প্রদান করার সময় এই রকম প্রথার প্রচলন ছিল। বিদর্ভরাজের কন্যা বৈদর্ভীকে সম্প্রদান করা হয়েছিল একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী ভগবদ্ভক্ত রাজার সঙ্গে। যেহেতু রাজা মলয়ধ্বজ ছিলেন একজন পরাক্রমশালী রাজা এবং মহান ভক্ত, তাই তিনি সব কটি শর্ত পূর্ণ করেছিলেন মলয়ধ্বজ নামটি একজন মহান ভগবদ্ভক্তকে সূচিত করে, যিনি মলয় পর্বতের মতো অটল এবং তাঁর প্রচারের দ্বারা তিনি অন্য ভক্তদেরও দৃঢ়ভাবে ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রকার মহাভাগবত অন্য সমস্ত মতবাদের ঊর্ধ্বে ভগবদ্ভক্তির মহিমা স্থাপন করতে পারেন সুদৃঢ় ভক্ত জ্ঞান-কর্ম-যোগ আদি অন্য সমস্ত আধ্যাত্মিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। তাঁর ভক্তি-পতাকা উড়িয়ে, তিনি সর্বদা অন্যান্য আধ্যাত্মিক মতবাদকে খণ্ডন করতে দৃঢ় সংকল্প থাকেন। যখনই ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে অভক্তের শাস্ত্রবিচার হয়, তখন ভক্ত সর্বদা বিজয়ী হন।

পাণ্ড্য শব্দটি আসছে *পণ্ডা* থেকে, যার অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান'। অত্যন্ত পণ্ডিত না হলে, অভক্তদের মতবাদ খণ্ডন করা যায় না। *পর* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'দিব্য', এবং *পুর* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নগরী'। *পর-পুর* হচ্ছে বৈকুণ্ঠ বা ভগবদ্ধাম অতএব *পর-পুর-জয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, শুদ্ধ ভক্ত তাঁর প্রবল ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সমস্ত অভক্তিপূর্ণ মতবাদকে খণ্ডন করেন, এবং তিনি ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠকেও জয় করতে পারেন। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল বৈকুণ্ঠলোক জয় করা যায়। পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় অজিত, অর্থাৎ যাঁকে কেউ জয় করতে পারে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাঁর প্রবল ভক্তির দ্বারা এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তির দ্বারা অনায়াসে তাঁকে জয় করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভয়ও ভয় পায়, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় মা যশোদার হাতের যষ্ঠি দেখে ভয়

পেয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ভক্ত ছাড়া আর কেউই জয় করতে পারে না এই প্রকার একজন ভক্ত কৃপাপূর্বক বিদর্ভরাজের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

তস্যাং স জনয়াঞ্চক্র আত্মজামসিতেক্ষণাম্ ।
যবীয়সঃ সপ্ত সুতান্ সপ্ত দ্রবিড়ভূভৃতঃ ॥ ৩০ ॥

তস্যাম্—তাঁর থেকে, **সঃ**—রাজা; **জনয়াম্ চক্রে**—উৎপাদন করেছিলেন; **আত্মজাম্**—কন্যা, **অসিত**—নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ, **ঈক্ষণাম্**—যার চক্ষু, **যবীয়সঃ** কনিষ্ঠ, অত্যন্ত শক্তিশালী; **সপ্ত**—সাত; **সুতান্**—পুত্র, **সপ্ত**—সাত; **দ্রবিড়**—দ্রাবিড় দেশের বা দক্ষিণ ভারতের; **ভূ**—ভূখণ্ড; **ভৃতঃ**—রাজা।

অনুবাদ

রাজা মলয়ধ্বজের একটি কন্যা হয়েছিল, যার চক্ষু ছিল অতি কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর সাতটি পুত্র-সন্তানও হয়েছিল, যারা পরবর্তী কালে দ্রাবিড়দেশের রাজা হয়েছিলেন। এইভাবে সেই ভূখণ্ডে সাতজন রাজা ছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা মলয়ধ্বজ ছিলেন একজন মহান ভক্ত, এবং বিদর্ভ-রাজার কন্যার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর, তিনি তাঁকে একটি অতি সুন্দরী কন্যা দান করেছিলেন, যার চোখ ছিল কৃষ্ণবর্ণ। আলংকারিকরূপে তার অর্থ হচ্ছে যে, তাঁর কন্যাও ছিলেন ভক্তিমতী, কারণ তাঁর চক্ষু সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল। ভক্তের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাঁর সাতটি পুত্র হচ্ছেন সাত প্রকার ভক্তির অঙ্গ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন ও দাস্য। নবধা ভক্তির মধ্যে কেবল সাতটি প্রথমে দেওয়া হয়েছিল। অন্য দুটি—সখ্য এবং আত্মনিবেদনের বিকাশ পরবর্তী কালে হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। ভগবানের সখা হওয়া এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন রাগ-মার্গের অন্তর্গত। নবীন ভক্তের পক্ষে শ্রবণ, কীর্তন, কৃষ্ণস্মরণ, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা, বন্দনা, নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া, এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

যবীয়সঃ শব্দটি সূচিত করে যে, এই পন্থা অত্যন্ত শক্তিশালী। ভক্ত যখন *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ অর্চনং বন্দনং দাস্যম্*-এর পন্থায় ভগবানের

সেবায় যুক্ত হয়ে, এই পন্থাগুলিকে আয়ত্ত করেন, তখন ধীরে ধীরে রাগানুগা ভক্তি প্রাপ্ত হয়ে, *সখ্যম্* এবং *আত্মনিবেদনম্*ও প্রাপ্ত হন। সাধারণত যে-সমস্ত মহান আচার্য সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেন, তাঁরা *সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্* স্তরের ভক্ত। নবীন ভক্ত প্রকৃতপক্ষে প্রচারক হতে পারে না। *শ্রবণং কীর্তনম্* আদি অন্য সাতটি ক্ষেত্রে ভক্তির অনুশীলন করতে নবীন ভক্তকে উপদেশ দেওয়া হয়। প্রাথমিক সাতটি অঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করতে পারলে, ভবিষ্যতে *সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*-এর স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

দ্রাবিড়দেশের বিশেষ উল্লেখ দক্ষিণ ভারতের পঞ্চ-দ্রাবিড়দেশ সম্বন্ধে হয়েছে। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক পন্থাগুলি (*শ্রবণং কীর্তনম্*) সম্পন্ন করতে সেই স্থানগুলি অত্যন্ত অনুকূল। রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য প্রমুখ অনেক মহান আচার্য দ্রাবিড়দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মহান প্রচারকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই *সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*-এর স্তরে অবস্থিত ছিলেন।

শ্লোক ৩১

একৈকস্যাভবত্তেষাং রাজন্নর্বুদমর্বুদম্ ।
ভোক্ষ্যতে যদ্বংশধরৈর্মহী মন্বন্তরং পরম্ ॥ ৩১ ॥

এক-একস্য—প্রত্যেকের; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **তেষাম্**—তাঁদের; **রাজন্**—হে রাজন্; **অর্বুদম্**—দশ কোটি; **অর্বুদম্**—দশ কোটি; **ভোক্ষ্যতে**—শাসন করেছিলেন; **যৎ**—যাঁর; **বংশ-ধরৈঃ**—বংশধরদের দ্বারা; **মহী**—সারা পৃথিবী; **মনু-অন্তরম্**—এক মনুর অন্ত পর্যন্ত; **পরম্**—এবং তার পর।

অনুবাদ

হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! মলয়ধ্বজের পুত্রেরা হাজার হাজার সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, এবং তাঁরা সকলে মন্বন্তর এবং তার পরেও সারা পৃথিবী পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। এক মন্বন্তর বা একজন মনুর আয়ু হচ্ছে ৭১ × ৪৩,২০,০০০ বছর। এক মনুর পর আর এক মনুর আগমন হয়। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের জীবনচক্র চলতে থাকে। যেহেতু এক মনু আর এক মনুকে

অনুসরণ করেন, তাই কৃষ্ণভক্তির সম্প্রদায় চলতে থাকে, যা *ভগবদ্গীতায়* (৪/১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

শ্রীভগবানুবাচ
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

"শ্রীভগবান বললেন—আমি এই অবিনাশী যোগের বিজ্ঞান সূর্যদেব বিবস্বানকে দিয়েছিলাম এবং বিবস্বান তা মানব সমাজের পিতা মনুকে দান করেছিলেন, এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে দান করেন।" বিবস্বান *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান একজন মনুকে দিয়েছিলেন, এবং সেই মনু তা তাঁর পুত্রকে দান করেছিলেন, যিনি তা আর একজন মনুকে দান করেছিলেন। এইভাবে কৃষ্ণভক্তির প্রগতি কখনও প্রতিহত হয় না। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি নতুন আন্দোলন। *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এটি একটি অতি প্রাচীন আন্দোলন, কারণ তা এক মনু থেকে আর এক মনুতে পরম্পরা-ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে।

বৈষ্ণবদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তিগত বৈষম্য সত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তির ধারা অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলে। আমরা দেখতে পাই যে, বিগত একশ বছরের ভিতরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সুসংবদ্ধভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার শুরু করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্যেরা সকলেই আমার গুরুভ্রাতা, এবং যদিও আমাদের মধ্যে কিছু মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং যদিও আমরা যৌথভাবে প্রচার করছি না, তবুও আমাদের সকলেই নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার করছেন এবং সারা পৃথিবী জুড়ে বহু শিষ্য গ্রহণ করছেন। আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ শুরু করেছি এবং হাজার হাজার ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। নবধা ভক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভাবনামৃত সম্প্রদায় কখনই প্রতিহত হবে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ অথবা দেশের ভেদাভেদ বিচার না করে, তা প্রসারিত হতে থাকবে। কেউই তা প্রতিহত করতে পারবে না

এই শ্লোকে *ভোক্ষ্যতে* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক যেমন রাজা তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেন, তেমনই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করে, এই সমস্ত ভগবদ্ভক্তরা সারা পৃথিবীর মানুষদের রক্ষা করবেন। পৃথিবীর মানুষেরা আজ

তথাকথিত সমস্ত ধর্ম প্রচারক—স্বামী, যোগী, কর্মী ও জ্ঞানীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু তারা কেউই পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তির প্রচারকারী চারটি সম্প্রদায় এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে রামানুজ-সম্প্রদায়, মধ্ব-সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়। মধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বিশেষভাবে আসছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে। এই সমস্ত ভক্তরা ব্যাপকভাবে কৃষ্ণভক্তির প্রচার করে ভণ্ড অবতার, স্বামী, যোগী এবং অন্যান্যদের হাত থেকে নিরীহ মানুষদের রক্ষা করছে।

শ্লোক ৩২

অগস্ত্যঃ প্রাগ্‌দুহিতরমুপয়েমে ধৃতব্রতাম্ ।
যস্যাং দৃঢ়চ্যুতো জাত ইধ্‌মবাহাত্মজো মুনিঃ ॥ ৩২ ॥

অগস্ত্যঃ—মহর্ষি অগস্ত্য; **প্রাক্**—প্রথম; **দুহিতরম্**—কন্যা; **উপয়েমে**—বিবাহ করেছিলেন; **ধৃত-ব্রতাম্**—ব্রত ধারণকারী; **যস্যাম্**—যাঁর থেকে; **দৃঢ়চ্যুতঃ**—দৃঢ়চ্যুত নামক; **জাতঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ইধ্মবাহ**—ইধ্‌মবাহ নামক; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **মুনিঃ**—মহান ঋষি।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত মলয়ধ্বজের প্রথমা কন্যাকে অগস্ত্য মুনি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর থেকে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যার নাম ছিল দৃঢ়চ্যুত, এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল ইধ্‌মবাহ।

তাৎপর্য

অগস্ত্য মুনি নামটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অগস্ত্য মুনি মনের দ্যোতক। *অগস্ত্য* শব্দটি সূচিত করে যে, ইন্দ্রিয়গুলি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে না, এবং *মুনি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মন'। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র, তাই ইন্দ্রিয়গুলি মন ছাড়া কাজ করতে পারে না। মন যখন ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, তখন তা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। ভক্তির পন্থা (ভক্তিলতা) হচ্ছেন মলয়ধ্বজের প্রথমা কন্যা, এবং পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর চক্ষু সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল (*অসিতেক্ষণাম্*)। কোন দেব-দেবীদের ভক্তি করা যায় না। ভক্তি কেবল বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতে পারে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*)। পরমতত্ত্বকে নির্বিশেষ

মনে করে মায়াবাদীরা বলে যে, যে-কোন প্রকার পূজার ক্ষেত্রেই ভক্তি প্রযুক্ত হতে পারে। তা যদি হত, তা হলে ভক্ত যে-কোন দেব দেবীর রূপ কল্পনা করে তাঁর পূজা করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে কেবল শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর অবতারদেরই ভক্তি অর্পণ করা যায়। তাই ভক্তিলতা হচ্ছে দৃঢ়ব্রত, কারণ মন যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন মন আর বিচ্যুত হয় না কেউ যদি অন্য কোন পন্থায়, কর্মযোগ অথবা জ্ঞানযোগের দ্বারা আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হতে চায়, তা হলে তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কেউ যদি ভক্তিতে স্থির হয়, তা হলে তার আর পতন হয় না।

এইভাবে ভক্তিলতা থেকে দৃঢ়চ্যুতের জন্ম হয়, এবং দৃঢ়চ্যুত থেকে তাঁর পুত্র ইধ্মবাহের জন্ম হয়। *ইধ্মবাহ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি যজ্ঞের সমীধ নিয়ে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হন এর তাৎপর্য হচ্ছে ভক্তিলতা মানুষকে আধ্যাত্মিক পদে স্থির করে। এইভাবে স্থির হলে তার আর কখনও অধঃপতন হয় না, এবং তাঁর পুত্র নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রনির্দেশ পালন করেন, যে-সম্বন্ধে *বেদে* বলা হয়েছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

ভগবদ্ভক্তির মার্গে যাঁরা দীক্ষিত, তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক শাস্ত্রনির্দেশ অনুসরণ করেন

শ্লোক ৩৩

বিভজ্য তনয়েভ্যঃ ক্ষ্মাং রাজর্ষির্মলয়ধ্বজঃ ।
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং স জগাম কুলাচলম্ ॥ ৩৩ ॥

বিভজ্য—ভাগ করে; **তনয়েভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের মধ্যে; **ক্ষ্মাম্**—সারা পৃথিবীকে; **রাজ-ঋষিঃ**—মহান ঋষিসদৃশ রাজা; **মলয়ধ্বজঃ**—মলয়ধ্বজ নামক; **আরিরাধয়িষুঃ**—আরাধনা করার বাসনায়; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **সঃ**—তিনি; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **কুলাচলম্**—কুলাচলে।

অনুবাদ

তার পর রাজর্ষি মলয়ধ্বজ তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য ভাগ করে দিয়ে, একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার উদ্দেশ্যে কুলাচল নামক নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ মলয়ধ্বজ নিশ্চিতরূপে একজন মহাভাগবত ছিলেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা, ভক্তি সম্প্রদায় (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*) বিস্তার করার জন্য তিনি বহু পুত্র এবং শিষ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার শিষ্যদের মধ্যে সারা পৃথিবী ভাগ করে দেওয়া উচিত। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রচারে যুক্ত হওয়া। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শিষ্য যখন উপযুক্ত হয় এবং প্রচার করতে সক্ষম হয়, তখন শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে অবসর গ্রহণ করে কোন নির্জন স্থানে বসে শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করা এবং নির্জন-ভজন করা নির্জন-ভজনের অর্থ হচ্ছে কোন নির্জন স্থানে বসে নীরবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা এই নির্জন-ভজন নবীন ভক্তদের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নবীন ভক্তদের নির্জন স্থানে গিয়ে ভজন করতে কখনও উপদেশ দেননি। প্রকৃতপক্ষে, এই সম্বন্ধে তিনি একটি গীত লিখেছেন—

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে,　　নির্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥

এইভাবে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সুদক্ষ গুরুদেবের নির্দেশনায় সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা পরিপক্ক অবস্থাতেই কেবল সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার থেকে অবসর গ্রহণ করে নির্জন স্থানে ভজন করা যায় এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ভক্তরা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবানের বাণীর প্রচারকরূপে ভগবানের সেবা করছেন। এখন তাঁরা তাঁদের গুরুদেবকে সক্রিয় প্রচারকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করতে দিতে পারেন। শ্রীগুরুদেবের জীবনের অন্তিম অবস্থায়, ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা এইভাবে শ্রীগুরুদেব নির্জন স্থানে বসে নির্জন ভজন করতে পারেন।

শ্লোক ৩৪

হিত্বা গৃহান্ সুতান্ ভোগান্ বৈদর্ভী মদিরেক্ষণা ।
অন্বধাবত পাণ্ড্যেশং জ্যোৎস্নেব রজনীকরম্ ॥ ৩৪ ॥

হিত্বা—পরিত্যাগ করে; **গৃহান্**—গৃহ; **সুতান্**—সন্তান, **ভোগান্**—জড় সুখ; **বৈদর্ভী**—বিদর্ভরাজের কন্যা, **মদির-ঈক্ষণা**—মদির-নয়না; **অন্বধাবত**—অনুগমন

করেছিলেন; **পাণ্ড্য-ঈশম্**—রাজা মলয়ধ্বজ; **জ্যোৎস্না ইব**—চন্দ্রিকার মতো; **রজনী-করম্**—চন্দ্র।

অনুবাদ

চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে, তেমনই মদির-নয়না বিদর্ভনন্দিনীও গৃহসুখ, পুত্র এবং ভোগ্যসামগ্রী পরিত্যাগ করে, তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে কুলাচলে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন বানপ্রস্থ আশ্রমে পত্নী পতির অনুগমন করেন, তেমনই শ্রীগুরুদেব যখন নির্জন-ভজনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কিছু উন্নত ভক্ত তাঁর সেবা করার উদ্দেশ্যে তাঁর অনুগমন করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যারা পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সুত, মিত এবং রমণী-সমাজের তথাকথিত সুখ পরিত্যাগ করে শ্রীগুরুদেবের সেবা করার জন্য এগিয়ে আসা। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর রচিত *গুর্বষ্টকের* একটি শ্লোক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদঃ।* শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা মনে রাখা যে, শ্রীগুরুদেবের সেবা করার মাধ্যমে তিনি অনায়াসে কৃষ্ণভাবনামৃতের পথে অগ্রসর হতে পারেন। সমস্ত শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা এবং তাঁর সেবা করার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়

এই শ্লোকে *মদিরেক্ষণা* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *সন্দর্ভে* *মদির* শব্দটির অর্থ 'মাদক' বলে বর্ণনা করেছেন। যদি কারো চক্ষু ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে প্রমত্ত হয়, তা হলে তাকে *মদিরেক্ষণ* বলা যায়। রাণী বৈদর্ভীর চক্ষু অত্যন্ত মোহজনক ছিল, ঠিক যেমন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে চক্ষু *মদিরেক্ষণা* হয়। উন্নত স্তরের ভক্ত না হলে, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় না।

শ্লোক ৩৫-৩৬

তত্র চন্দ্রবসা নাম তাম্রপর্ণী বটোদকা ।
তৎপুণ্যসলিলৈর্নিত্যমুভয়ত্রাত্মনো মৃজন্ ॥ ৩৫ ॥
কন্দাষ্টিভির্মূলফলৈঃ পুষ্পপর্ণৈস্তৃণোদকৈঃ ।
বর্তমানঃ শনৈর্গাত্রকর্শণং তপ আস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র—সেখানে; **চন্দ্রবসা**—চন্দ্রবসাল নদী; **নাম**—নামক; **তাম্রপর্ণী**—তাম্রপর্ণী নদী; **বটোদকা**—বটোদকা নদী; **তৎ**—সেই সমস্ত নদীর; **পুণ্য**—পবিত্র; **সলিলৈঃ**—জলের দ্বারা; **নিত্যম্**—প্রতিদিন; **উভয়ত্র**—উভয়ভাবে; **আত্মনঃ**—নিজের; **মৃজন্**—ধৌত করে; **কন্দ**—কন্দ; **অষ্টিভিঃ**—বীজের দ্বারা; **মূল**—মূল; **ফলৈঃ**—এবং ফলের দ্বারা; **পুষ্প**—ফুল; **পর্ণৈঃ**—এবং পত্রের দ্বারা; **তৃণা**—ঘাস; **উদকৈঃ**—এবং জলের দ্বারা; **বর্তমানঃ**—নির্বাহ করে; **শনৈঃ**—ধীরে-ধীরে; **গাত্র**—তাঁর দেহ; **কর্শনম্**—কৃশ হয়েছিল; **তপঃ**—তপস্যা; **আস্থিতঃ**—করেছিলেন।

অনুবাদ

কুলাচলে চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী এবং বটোদকা নামক নদী প্রবাহিত ছিল। রাজা মলয়ধ্বজ নিয়মিতভাবে সেই পবিত্র নদীগুলিতে গিয়ে স্নান করতেন। তার ফলে তিনি অন্তরে ও বাহিরে উভয়ত পবিত্র হয়েছিলেন। তিনি স্নান করে কন্দ, বীজ, পাতা, ফুল, মূল, ফল ও ঘাস খেয়ে এবং জলপান করে জীবনধারণ করছিলেন। এইভাবে তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আমরা নিশ্চিতরূপে দেখতে পাই যে, কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতিসাধন করতে হলে, দেহের ভার নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কেউ যদি অত্যন্ত স্থূলকায় হয়ে যায়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর স্থূলকায় শিষ্যদের অত্যন্ত প্রবলভাবে সমালোচনা করতেন। অর্থাৎ যাঁরা কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতিসাধন করতে চান, তাঁদের পক্ষে অত্যধিক আহার করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তরা বনে, পাহাড়ে অথবা পর্বতে তীর্থ করতে যেতেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে এই প্রকার কঠোর তপস্যা করা সম্ভব নয়। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কেবল ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার না করা। বৈষ্ণব দিনপঞ্জীতে একাদশী এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তদের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিতে উপবাস করার দিন রয়েছে। সেগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের মেদ হ্রাস করা, যাতে মানুষকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমাতে না হয় এবং তারা নিষ্ক্রিয় ও অলস না হয়ে যায়। অত্যধিক আহার করলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমাতে হয়। এই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তপশ্চর্যা এবং তপশ্চর্যা মানে হচ্ছে যৌন জীবন, আহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। এইভাবে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের জন্য সময় বাঁচানো যাবে, এবং মানুষ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়ভাবেই নিজেকে পবিত্র করতে পারবে। তার ফলে শরীর ও মন উভয়ই শুদ্ধ হতে পারবে।

শ্লোক ৩৭

শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি ক্ষুৎপিপাসে প্রিয়াপ্রিয়ে ।
সুখদুঃখে ইতি দ্বন্দ্বান্যজয়ৎসমদর্শনঃ ॥ ৩৭ ॥

শীত—ঠাণ্ডা; **উষ্ণ**—গরম; **বাত**—বায়ু; **বর্ষাণি**—এবং বর্ষা ঋতু; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **পিপাসে**—এবং পিপাসা; **প্রিয়**—আনন্দদায়ক; **অপ্রিয়ে**—অপ্রীতিকর; **সুখ**—সুখ; **দুঃখে**—এবং দুঃখে; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বন্দ্বানি**—দ্বৈতভাব; **অজয়ৎ**—তিনি জয় করেছিলেন; **সম-দর্শনঃ**—সমদর্শী

অনুবাদ

তপস্যার দ্বারা রাজা মলয়ধ্বজ তাঁর দেহে এবং মনে ধীরে ধীরে শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, বায়ু ও বর্ষা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, প্রিয় ও অপ্রিয় ইত্যাদি দ্বৈতভাবের প্রতি সমদর্শী হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত দ্বন্দ্বভাব জয় করেছিলেন।

তাৎপর্য

মুক্তি মানে হচ্ছে জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হওয়া। আত্ম-উপলব্ধি লাভ না করা পর্যন্ত, মানুষকে এই আপেক্ষিক জগতের দ্বন্দ্বভাব ভোগ করতে হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সহ্য করার মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বভাবকে জয় করতে উপদেশ দিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন যে, শীত ও উষ্ণ এই দ্বন্দ্বভাব আমাদের এই জড় জগতে কষ্ট দেয়। শীতের সময় আমরা স্নান করতে চাই না, কিন্তু গরমের সময় আমরা দুই-তিন বারেরও বেশি স্নান করতে ইচ্ছা করি। তাই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, এই প্রকার আপেক্ষিকতা এবং দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা বিচলিত না হতে, কারণ তারা আসে আবার চলে যায়।

এই দ্বন্দ্বভাবের প্রতি সমদর্শী হতে হলে, সাধারণ মানুষকে অনেক তপস্যা করতে হয়। যারা জীবনের এই দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা বিচলিত হয়, তারা একটি আপেক্ষিক স্থিতি গ্রহণ করেছে এবং তাই দেহাত্মবুদ্ধির অতীত হওয়ার জন্য এবং জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি-সাধন করার জন্য তাদেরকে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তপস্যা করতে হয়। রাজা মলয়ধ্বজ গৃহত্যাগ করে কুলাচলে গিয়ে, পবিত্র নদীতে স্নান করে এবং কোনও রকম রন্ধন করা অন্ন আহার না করে, কেবল কন্দ, মূল, বীজ, ফুল ও পাতা খেয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এগুলি অত্যন্ত কঠোর তপস্যা। এই যুগে তপস্যা করার জন্য গৃহত্যাগ করে, বনে অথবা হিমালয় পর্বতে যাওয়া

অত্যন্ত দুষ্কর। বাস্তবিকপক্ষে, তা প্রায় অসম্ভব। কাউকে যদি কেবল আমিষ আহার, নেশা, দ্যূতক্রীড়া এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাও তারা করতে পারে না। অতএব হিমালয় বা কুলাচল পর্বতে গিয়ে তারা কি করবে? এই যুগে এই প্রকার ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগের পন্থা গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তিযোগ আপনা থেকেই মানুষকে জীবনের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত করবে। ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু, এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অতীত। তাই এই জড় জগতের দ্বৈতভাবের অতীত হতে হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্বদা যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

"পূর্ণ ভক্তি সহকারে যিনি আমার সেবায় যুক্ত হন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনি অচিরেই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।"

কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে আপনা থেকেই তাঁর জিহ্বা আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হয়ে যায়। পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিযোগে একবার যুক্ত হলে, আর অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। কারও যদি অধঃপতন হয়ও, তবুও তাতে কোন ক্ষতি নেই। সাময়িকভাবে তাঁর ভক্তি স্তব্ধ হলেও, শীঘ্রই তিনি আবার তাঁর ভক্তি শুরু করার সুযোগ পাবেন, এবং যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকে তিনি আবার তাঁর ভক্তি শুরু করতে পারবেন।

শ্লোক ৩৮

তপসা বিদ্যয়া পক্বকষায়ো নিয়মৈর্যমৈঃ।
যুযুজে ব্রহ্মণ্যাত্মানং বিজিতাক্ষানিলাশয়ঃ॥ ৩৮॥

তপসা—তপস্যার দ্বারা; **বিদ্যয়া**—বিদ্যার দ্বারা; **পক্ব**—দগ্ধ; **কষায়ঃ**—সমস্ত কলুষ; **নিয়মৈঃ**—বিধি বিধানের দ্বারা, **যমৈঃ**—আত্ম সংযমের দ্বারা; **যুযুজে**—তিনি নিবদ্ধ করেছিলেন; **ব্রহ্মণি**—আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **বিজিত**—সম্পূর্ণরূপে সংযত; **অক্ষ**—ইন্দ্রিয়; **অনিল**—প্রাণ; **আশয়**—চেতনা

অনুবাদ

উপাসনা, তপস্যা, যম ও নিয়মাদির দ্বারা রাজা মলয়ধ্বজ তাঁর অন্তরের সমস্ত মল দগ্ধ করে, তাঁর ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্তকে জয় করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মাকে পরমব্রহ্ম (কৃষ্ণ) রূপী কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখনই *ব্রহ্মন্* শব্দটির উল্লেখ হয়, তখনই নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, তা হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি*— বাসুদেবই নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত। নির্বিশেষ 'কোন কিছুতে' মনকে কখনও স্থির করা যায় না ভগবদ্গীতায় (১২/৫) তাই বলা হয়েছে, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্*—"যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত, নিরাকার রূপে আসক্ত, তাদের পক্ষে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর।" তাই, এখানে যখন বলা হয়েছে যে, রাজা মলয়ধ্বজ তাঁর মনকে ব্রহ্মে স্থির করেছিলেন, সেই 'ব্রহ্ম' হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান বা বাসুদেব।

শ্লোক ৩৯

আস্তে স্থাণুরিবৈকত্র দিব্যং বর্ষশতং স্থিরঃ ।
বাসুদেবে ভগবতি নান্যদ্বেদোদ্বহন্ রতিম্ ॥ ৩৯ ॥

আস্তে—অবস্থান করেছিলেন; **স্থাণুঃ**—অচল; **ইব**—সদৃশ; **একত্র**—এক স্থানে; **দিব্যম্**—দেবতাদের; **বর্ষ**—বৎসর; **শতম্**—এক শত; **স্থিরঃ**—স্থির; **বাসুদেবে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **বেদ**—জানা; **উদ্বহন্**—অধিকার করে; **রতিম্**—আকর্ষণ।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি এক শত দিব্য বৎসর এক স্থানে স্থাণুর মতো স্থির হয়েছিলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিময়ী আসক্তি লাভ করেছিলেন, এবং সেই অবস্থায় স্থির হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, যিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে, আমার শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৭/১৯) বাসুদেব বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছু, এবং যিনি তা জানেন তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী। *ভগবদ্‌গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। এই শ্লোকেও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে *দিব্যং বর্ষশতম্* ('দেবতাদের গণনা অনুসারে একশ বছর')। দেবতাদের গণনা অনুসারে তাঁদের একদিন (বারো ঘণ্টা) হচ্ছে পৃথিবীর ছয় মাসের সমান। দেবতাদের একশ বছর এই পৃথিবীর ছত্রিশ হাজার বছরের সমান। অতএব রাজা মলয়ধ্বজ ছত্রিশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। তারপর তিনি ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হয়েছিলেন। এই পৃথিবীতে এত বছর বাঁচতে হলে, মানুষকে বহুবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। তা শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করছে। কৃষ্ণভক্তির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে, স্থির নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছু এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই হচ্ছে পরম সিদ্ধি। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* (*মধ্য লীলা* ২২/৬২) বলা হয়েছে *কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।* কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার দ্বারা অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার দ্বারা স্থির নিশ্চিত রূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সবকিছু, তখন তিনি সর্বতোভাবে পরম সিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সবকিছু, সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই কেবল যথেষ্ট নয়, সেই উপলব্ধিতে স্থির থাকা অবশ্য কর্তব্য সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি, এবং রাজা মলয়ধ্বজ চরমে সেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

স ব্যাপকতয়াত্মানং ব্যতিরিক্ততয়াত্মনি ।
বিদ্বান্ স্বপ্ন ইবামর্শসাক্ষিণং বিররাম হ ॥ ৪০ ॥

সঃ—রাজা মলয়ধ্বজ; **ব্যাপকতয়া**—সর্বব্যাপী হওয়ার ফলে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **ব্যতিরিক্ততয়া**—পৃথকত্বের দ্বারা; **আত্মনি**—আত্মায়; **বিদ্বান্**—সুশিক্ষিত; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **ইব**—সদৃশ; **অমর্শ**—বিশেষ বিবেচনা; **সাক্ষিণম্**—সাক্ষী; **বিররাম**—উদাসীন হয়েছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে

অনুবাদ

রাজা মলয়ধ্বজ আত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। আত্মা একস্থানে অবস্থিত কিন্তু পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। তিনি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, জড়-দেহ আত্মা নয়, কিন্তু আত্মা হচ্ছে জড় দেহের সাক্ষী।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবেরা প্রায়ই জড়-দেহ, আত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে নিরাশ হয়। দুই প্রকার মায়াবাদী রয়েছে—বৌদ্ধ-দর্শনের অনুগামী এবং শঙ্কর-দর্শনের অনুগামী। বুদ্ধদেবের অনুগামীরা জড় দেহের অতীত আর কিছু রয়েছে বলে মানতে চায় না; শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা সিদ্ধান্ত করে যে, পরমাত্মার কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। শঙ্কর মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে, চরমে আত্মা ও পরমাত্মা এক। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানসমন্বিত বৈষ্ণব দার্শনিকেরা জানেন যে, জড় দেহটি বহিরঙ্গা শক্তি থেকে সৃষ্ট এবং পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান জীবদেহে আত্মার সঙ্গে অবস্থান করছেন, কিন্তু তিনি আত্মা থেকে ভিন্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বলেছেন—

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥

"হে অর্জুন! তুমি অবগত হও যে, আমি সমস্ত দেহ সম্বন্ধে জানি। এই দেহ এবং তার দেহীকে জানাই হচ্ছে জ্ঞান। সেটিই আমার মত।"

দেহটিকে ক্ষেত্র বলে মনে করা হয়, এবং জীবাত্মা সেই ক্ষেত্রে কার্য করে, কিন্তু আর একটি আত্মা রয়েছে, যাকে বলা হয় পরমাত্মা, যিনি আত্মার সঙ্গে সাক্ষীরূপে বিরাজ করছেন। জীবাত্মা দেহের মাধ্যমে কর্ম করে তার ফল ভোগ করে, কিন্তু পরমাত্মা কেবল সাক্ষীরূপে জীবাত্মার কার্যকলাপ দর্শন করেন, তিনি কর্মফল ভোগ করেন না। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে পরমাত্মা উপস্থিত রয়েছেন, কিন্তু জীবাত্মা কেবল তার দেহেই বিরাজমান। রাজা মলয়ধ্বজ সেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে আত্মা, পরমাত্মা এবং জড় দেহের পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪১

সাক্ষাদ্ভগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা নৃপ ।
বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন স্ফুরতা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৪১ ॥

সাক্ষাৎ—স্বয়ং; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **উক্তেন**—উপদিষ্ট; **গুরুণা**—শ্রীগুরুদেব; **হরিণা**—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা; **নৃপ**—হে রাজন্; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **দীপেন**—আলোকের দ্বারা; **স্ফুরতা**—প্রকাশ করে; **বিশ্বতঃ-মুখম্**—সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

রাজা মলয়ধ্বজ পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন কারণ তাঁর শুদ্ধ স্থিতিতে তিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই প্রকার দিব্য জ্ঞানের আলোকে তিনি সর্বতোভাবে সব কিছু উপলব্ধি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সাক্ষাদ্ভাগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা* শব্দগুচ্ছটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীবাত্মা যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন ভগবান স্বয়ং সেই ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন। ভগবান সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/১০) প্রতিপন্ন করেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে আসতে পারে।"

পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করছেন, এবং তিনি হচ্ছেন *চৈত্যগুরু।* কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদেরই কেবল তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ দেন। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে, নিষ্ঠাবান এবং ঐকান্তিক ভক্তকে ভগবান অন্তর থেকে অনুপ্রেরণা দেন সদ্গুরুর শরণাগত হতে। বৈধীভক্তির বিধান অনুসারে, শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করার পর, শিষ্য যখন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে ভগবানের প্রতি আসক্ত হন (*রাগভক্তি*), তখন ভগবান তাঁকে তাঁর অন্তর থেকে উপদেশ দেন। *তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।* এই কৃপা মুক্ত-জীবেরাই কেবল লাভ করতে পারেন। এই স্তর প্রাপ্ত হয়ে, রাজা মলয়ধ্বজ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪২

পরে ব্রহ্মণি চাত্মানং পরং ব্রহ্ম তথাত্মনি ।
বীক্ষমাণো বিহায়েক্ষামস্মাদুপররাম হ ॥ ৪২ ॥

পরে—পরম; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—আত্মা; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **তথা**—ও; **আত্মনি**—আত্মায়; **বীক্ষমাণঃ**—দর্শন করে; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **ঈক্ষাম্**—দৃষ্টি; **অস্মাৎ**—এই পন্থা থেকে; **উপররাম**—অবসর গ্রহণ করেছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা মলয়ধ্বজ দর্শন করেছিলেন যে, পরমাত্মা তাঁর পাশে বসে রয়েছেন, এবং জীবাত্মা রূপে তিনিও পরমাত্মার পাশে বসে রয়েছেন। তাঁরা উভয়ে একত্রে থাকার ফলে, তাঁদের ভিন্ন স্বার্থ ছিল না; এইভাবে তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির উন্নত স্তরে, ভক্ত তাঁর নিজের স্বার্থ এবং ভগবানের স্বার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। উভয় স্বার্থই তখন একাকার হয়ে যায়, কারণ ভক্ত তখন ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কার্য করেন না। তিনি যা কিছুই করেন, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের স্বার্থে। সেই সময় তিনি সব কিছুই ভগবানে দর্শন করেন এবং ভগবানকে সব কিছুতে দর্শন করেন। উপলব্ধির এই স্তর প্রাপ্ত হয়ে, তিনি চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। এই জড় জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি হওয়ার ফলে, তাঁর চিন্ময় দৃষ্টিতে, এই জড় জগৎও চিন্ময় জগতে পর্যবসিত হয়। শুদ্ধ ভক্তের কাছে শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন। তাই তথাকথিত জড় জগৎ তাঁর কাছে চিন্ময় হয়ে যায় (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*)। সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সেবার নিমিত্ত, এবং নিপুণ ভক্ত তথাকথিত যে-কোন জড় বস্তুকে ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে পারেন। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, ভগবানের সেবা করা যায় না। তাই তথাকথিত জড় বস্তুকে যদি ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যায়, তা হলে আর তার জড়ত্ব থাকে না এইভাবে বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে, শুদ্ধ ভক্ত সবকিছুই চিন্ময়রূপে দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৩

পতিং পরমধর্মজ্ঞং বৈদর্ভী মলয়ধ্বজম্ ।
প্রেম্না পর্যচরদ্ধিত্বা ভোগান্ সা পতিদেবতা ॥ ৪৩ ॥

পতিম্—তাঁর পতি; **পরম**—পরম; **ধর্ম-জ্ঞম্**—ধর্মজ্ঞ; **বৈদর্ভী**—বিদর্ভরাজের কন্যা, **মলয়ধ্বজম্**—মলয়ধ্বজ নামক; **প্রেম্না**—প্রীতি এবং অনুরাগ সহকারে, **পর্যচরৎ**—ভক্তিপূর্বক সেবা করেছিলেন, **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ভোগান্**—ইন্দ্রিয়সুখ; **সা**—তিনি; **পতি-দেবতা**—তাঁর পতিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে।

অনুবাদ

বৈদর্ভী তাঁর পতিকে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করে, সর্বতোভাবে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক তাঁর মহাভাগবত পতিকে অনুসরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সেবায় যুক্ত ছিলেন।

তাৎপর্য

আলঙ্কারিকভাবে, রাজা মলয়ধ্বজ হচ্ছেন গুরুদেব, এবং তাঁর পত্নী বৈদর্ভী হচ্ছেন শিষ্য। শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গুর্বষ্টকে উল্লেখ করেছেন, *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন*—"শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানরূপে মনে করেন।" মায়াবাদীরা যেভাবে গুরুকে গ্রহণ করে, সেইভাবে গুরু গ্রহণ না করে, এখানে উল্লেখিত নির্দেশ অনুসারে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের সবচাইতে বিশ্বস্ত সেবক, তাই তাঁকে ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের মতো বলে মনে করা উচিত। শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে কখনও তাঁকে অবহেলা করা উচিত নয় বা তাঁর আদেশ অমান্য করা উচিত নয়।

বহু ভাগ্যের ফলে কোন স্ত্রী যদি শুদ্ধ ভক্তের পত্নী হন, তা হলে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে তিনি তাঁর পতির সেবায় যুক্ত হতে পারেন। তিনি যদি তাঁর পতির সেবায় যুক্ত থাকেন, তা হলে তাঁর পতির আধ্যাত্মিক সিদ্ধি তিনি আপনা থেকেই লাভ করবেন শিষ্য যদি সদ্গুরু প্রাপ্ত হন, তা হলে কেবল তাঁর প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা তিনি ভগবানের সেবা করার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৪৪

চীরবাসা ব্রতক্ষামা বেণীভূতশিরোরুহা ।
বভাবুপপতিং শান্তা শিখা শান্তমিবানলম্ ॥ ৪৪ ॥

চীর-বাসা—জীর্ণ বসন পরিহিতা, **ব্রত-ক্ষামা**—ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে শীর্ণ কলেবর; **বেণী-ভূত**—জটাবদ্ধ; **শিরোরুহা**—তাঁর চুল; **বভৌ**—উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিতা; **উপ-পতিম্**—পতির নিকটে, **শান্তা**—প্রশান্ত, **শিখা**—অগ্নিশিখা, **শান্তম্**—বিচলিত না হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **অনলম্**—অগ্নি।

অনুবাদ

ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে বিদর্ভরাজের কন্যার শরীর ক্ষীণ হয়েছিল, এবং তিনি জীর্ণ বসন পরিধান করেছিলেন। তাঁর কেশকলাপের যত্ন না নেওয়ার ফলে তা জটাবদ্ধ হয়েছিল। যদিও তিনি সর্বদা তাঁর পতির নিকটে থাকতেন, তবুও তিনি অবিচল দীপশিখার মতো মৌন এবং উজ্জ্বলরূপে অবস্থান করতেন।

তাৎপর্য

যখন কাঠে আগুন জ্বালানো হয়, তখন প্রথমে ধোঁয়া ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। কিন্তু প্রথমে নানা রকম অসুবিধা থাকলেও, একবার যখন আগুন জ্বলে ওঠে, তখন কাঠ দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। তেমনই পতি ও পত্নী উভয়ই যখন তপশ্চর্যার জীবন পালন করেন, তখন তাঁরা নীরব থাকেন এবং যৌন আবেদনের দ্বারা বিচলিত হন না তখন পতি ও পত্নী উভয়েই পারমার্থিক প্রগতির ফলে লাভবান হন। বিলাসবহুল জীবন পূর্ণরূপে ত্যাগ করার ফলে, এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই শ্লোকে *চীরবাসা* শব্দটি অত্যন্ত জীর্ণ বসন বোঝায়। বিশেষ করে পত্নীর মূল্যবান সাজ-পোশাকের বাসনা এবং বিলাসবহুল জীবনের মান পরিত্যাগ করে, তপস্বিনীর জীবন যাপন করতে হয়। জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু গ্রহণ করে এবং আহার ও নিদ্রার পরিমাণ যতখানি হ্রাস করা সম্ভব তা করে জীবন যাপন করতে হয়। যৌনসঙ্গমের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। পত্নী যদি কেবল মাত্র মহান শুদ্ধ ভক্ত পতির সেবায় যুক্ত থাকেন, তা হলে তিনি কখনও যৌন বাসনার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হন না। বানপ্রস্থ আশ্রমের অবস্থা ঠিক এই রকম। পত্নী যদিও পতির সঙ্গে থাকেন, তবুও তিনি কঠোর তপশ্চর্যা পালন করেন, যাতে পতি-পত্নী একসঙ্গে থাকলেও যৌন জীবনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। এইভাবে পতি

ও পত্নী একত্রে নিরন্তর বাস করতে পারেন। যেহেতু পত্নী পতির থেকে দুর্বল, তাই সেই দুর্বলতা এই শ্লোকে *উপ পতিম্* শব্দে ব্যক্ত হয়েছে। *উপ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নিকটে', অথবা 'প্রায় সমান' পুরুষ হওয়ার ফলে, পতি সাধারণত পত্নীর থেকে পারমার্থিক দিক দিয়ে অধিক উন্নত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পত্নীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় যে, তিনি সব রকম বিলাসবহুল অভ্যাসগুলি বর্জন করবেন। তিনি কখনও সুন্দর বসন পরিধান করবেন না অথবা তাঁর চুল আঁচড়াবেন না চুল আঁচড়ানো মেয়েদের একটি প্রধান কাজ। বানপ্রস্থ আশ্রমে পত্নী তাঁর কেশকলাপের কোন প্রকার যত্ন নেবেন না এইভাবে তাঁর কেশকলাপ জটাবদ্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে পত্নী আর তাঁর পতির কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হবে না, এবং তিনি নিজেও যৌন আবেদনের দ্বারা বিচলিত হবেন না। এইভাবে পতি ও পত্নী উভয়েই পারমার্থিক চেতনায় অগ্রসর হতে পারেন। এই অতি উন্নত স্তরকে বলা হয় *পরমহংস* স্তর, এবং তা একবার প্রাপ্ত হলে, পতি ও পত্নী উভয়েই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে পারেন শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ থাকেন, তা হলে আর তাঁর মায়ার বন্ধনে অধঃপতিত হওয়ার ভয় থাকে না

শ্লোক ৪৫

অজানতী প্রিয়তমং যদোপরতমঙ্গনা ।
সুস্থিরাসনমাসাদ্য যথাপূর্বমুপাচরৎ ॥ ৪৫ ॥

অজানতী—অজ্ঞান; **প্রিয়-তমম্** তাঁর প্রিয়তম পতি, **যদা**—যখন, **উপরতম্**—পরলোকে গমন করেছিলেন; **অঙ্গনা**—নারী; **সুস্থির**—স্থিরভাবে; **আসনম্**—আসনে; **আসাদ্য**—তাঁর কাছে গিয়ে; **যথা-পূর্বম্**—পূর্বের মতো; **উপাচরৎ**—তাঁর সেবা করতে থাকেন।

অনুবাদ

বিদর্ভনন্দিনী তাঁর পতি যে দেহত্যাগ করেছেন তা বুঝতে না পারা পর্যন্ত, স্থির আসনে উপবিষ্ট তাঁর পতির সেবা করে যেতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, রাণী যখন তাঁর পতির সেবা করতেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতেন না। তিনি নিঃশব্দে তাঁর কর্তব্যকর্ম করে

যেতেন। এইভাবে তিনি তাঁর সেবা করেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পতি দেহত্যাগ করেছেন।

শ্লোক ৪৬

যদা নোপলভেতাঙ্ঘ্রাবূষ্মাণং পত্যুরর্চতী।
আসীৎসংবিগ্নহৃদয়া যূথভ্রষ্টা মৃগী যথা ॥ ৪৬ ॥

যদা—যখন; **ন**—না; **উপলভেত**—অনুভব করেছিলেন; **অঙ্ঘ্রৌ**—পায়ে; **ঊষ্মাণম্**—তাপ; **পত্যুঃ**—তাঁর পতির; **অর্চতী**—সেবা করার সময়; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **সংবিগ্ন**—উদ্বিগ্ন; **হৃদয়া**—অন্তরে; **যূথভ্রষ্টা**—পতিবিহীনা; **মৃগী**—হরিণী; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তিনি যখন তাঁর পতির পদসেবা করছিলেন, তখন তিনি উষ্ণতা অনুভব না করার ফলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তখন তিনি তাঁর পতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকিনী হওয়ার ফলে, যূথভ্রষ্টা হরিণীর মতো ব্যাকুল হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যখনই শরীরে রক্ত এবং বায়ুর সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়, তখন বোঝা যায় যে, আত্মা দেহত্যাগ করেছে। রক্ত সঞ্চালন যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দেহ জীবিত না মৃত তা বোঝা যায় হৃদয়ের স্পন্দন এবং হাত ও পায়ের উষ্ণতা থেকে।

শ্লোক ৪৭

আত্মানং শোচতী দীনমবন্ধুং বিক্লবাশ্রুভিঃ।
স্তনাবাসিচ্য বিপিনে সুস্বরং প্ররুরোদ সা ॥ ৪৭ ॥

আত্মানম্—নিজের সম্বন্ধে; **শোচতী**—শোক করতে করতে; **দীনম্**—দুঃখী; **অবন্ধুম্**—বন্ধুহীন; **বিক্লব**—ভগ্নহৃদয়; **অশ্রুভিঃ**—অশ্রুর দ্বারা; **স্তনৌ**—স্তনযুগল; **আসিচ্য**—সিক্ত করে; **বিপিনে**—অরণ্যে; **সুস্বরম্**—উচ্চস্বরে; **প্ররুরোদ**—ক্রন্দন করতে লাগলেন; **সা**—তিনি।

অনুবাদ

সেই বিদর্ভনন্দিনী অরণ্যে তাঁর বৈধব্য দশার নিমিত্ত শোক করতে করতে অবিরাম অশ্রুধারায় স্তনযুগল সিক্ত করে, উচ্চস্বরে রোদন করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

রূপক অর্থে রাণী হচ্ছেন শিষ্য এবং রাজা হচ্ছেন গুরু; এইভাবে শ্রীগুরুদেব যখন দেহত্যাগ করেন, তখন শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে রাজার বিরহে রাণী যেভাবে ক্রন্দন করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে ক্রন্দন করা। কিন্তু, গুরু ও শিষ্যের কখনও বিচ্ছেদ হয় না, কারণ শিষ্য যতক্ষণ শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন, ততক্ষণ শ্রীগুরুদেব সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকেন। তাকে বলা হয় *বাণীর* সঙ্গ। দৈহিক উপস্থিতিকে বলা হয় *বপুঃ।* শ্রীগুরুদেব যতক্ষণ প্রকট থাকেন, ততক্ষণ শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের বপুর সেবা করা, এবং শ্রীগুরুদেব যখন অপ্রকট হন, তখন শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের বাণীর সেবা করা।

শ্লোক ৪৮

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে ইমামুদধিমেখলাম্ ।
দস্যুভ্যঃ ক্ষত্রবন্ধুভ্যো বিভ্যতীং পাতুমর্হসি ॥ ৪৮ ॥

উত্তিষ্ঠ—দয়া করে উঠুন; **উত্তিষ্ঠ**—দয়া করে উঠুন; **রাজ-ঋষে**—হে রাজর্ষি, **ইমাম্**—এই পৃথিবী, **উদধি**—সমুদ্রের দ্বারা; **মেখলাম্**—বেষ্টিত; **দস্যুভ্যঃ**—দস্যুদের; **ক্ষত্র-বন্ধুভ্যঃ**—দুষ্ট রাজাদের; **বিভ্যতীম্**—অত্যন্ত ভীত; **পাতুম্**—রক্ষা করা; **অর্হসি**—উচিত।

অনুবাদ

হে রাজর্ষে! উঠুন! উঠুন! দেখুন, জলধি বেষ্টিতা ধরিত্রী দস্যু এবং তথাকথিত রাজাতে ভরে গেছে। তাই ধরিত্রী অত্যন্ত ভীতা হয়েছেন, এবং আপনার কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে রক্ষা করা।

তাৎপর্য

ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধির আদেশে যখন কোন আচার্য এই পৃথিবীতে আসেন, তখন তিনি ধর্ম সংস্থাপন করেন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* ঘোষণা করা হয়েছে।

ধর্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের আদেশ পালন করা। কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন থেকেই তার ধর্ম অনুশীলন শুরু হয়। আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে সদ্ধর্মের প্রচার করে, সকলকে ভগবানের শরণাগত হতে অনুপ্রাণিত করা। ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা, বিশেষ করে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি নবধা ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা ধর্মের আচরণ হয়। দুর্ভাগ্যবশত যখন আচার্য অপ্রকট হন, তখন সেই সুযোগে তথাকথিত স্বামী, যোগী পরোপকারী, সমাজসেবক ইত্যাদি রূপে দুর্বৃত্ত এবং অভক্তরা অপসিদ্ধান্ত প্রচার করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করা। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৩৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

"তোমার মনের দ্বারা সর্বদা আমার বিষয়ে চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমাকে প্রণতি নিবেদন কর, আমার আরাধনা কর। সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে, তুমি অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে।"

মানব-সমাজের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবানের বিষয় চিন্তা করা, তাঁর ভক্ত হওয়া, তাঁর আরাধনা করা এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা ভগবানের প্রতিনিধি বা আচার্য এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, কিন্তু তিনি যখন অপ্রকট হন, তখন পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আচার্যের প্রকৃত শিষ্য নিষ্ঠা সহকারে আচার্যের নির্দেশ অনুসরণ করার দ্বারা সেই পরিস্থিতির সংশোধন করার চেষ্টা করেন। বর্তমানে সারা পৃথিবী দুর্বৃত্ত এবং অভক্তদের ভয়ে ভীত; তাই অধর্মের প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ এবং শান্তি স্থাপন করার জন্য এই আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

শ্লোক ৪৯

এবং বিলপন্তী বালা বিপিনেঽনুগতা পতিম্ ।
পতিতা পাদয়োর্ভর্তুঃ রুদত্যশ্রূণ্যবর্তয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিলপন্তী**—বিলাপ করে; **বালা**—অবলা রমণী, **বিপিনে**—সেই নির্জন অরণ্যে; **অনুগতা**—নিষ্ঠাভরে অনুগামিনী; **পতিম্**—পতির; **পতিতা**—পতিত

হয়ে; **পাদয়োঃ**—পদযুগলে; **ভর্তুঃ**—পতির; **রুদতী**—ক্রন্দন করতে লাগলেন; **অশ্রূণি**—অশ্রু; **অবর্তয়ৎ**—বিসর্জন করেছিলেন।

অনুবাদ

পতির অনুগামিনী সেই পতিব্রতা স্ত্রী সেই নির্জন অরণ্যে তাঁর পতির পদযুগলে পতিতা হয়ে, করুণ স্বরে রোদন করতে লাগলেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

তাৎপর্য

পতির বিরহে পতিব্রতা স্ত্রী যেভাবে বেদনা অনুভব করেন, শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটে শিষ্যের সেইভাবে শোকসন্তপ্ত হওয়া উচিত।

শ্লোক ৫০

চিতিং দারুময়ীং চিত্বা তস্যাং পত্যুঃ কলেবরম্ ।
আদীপ্য চানুমরণে বিলপন্তী মনো দধে ॥ ৫০ ॥

চিতিম্—চিতা; **দারু-ময়ীম্**—কাঠ দিয়ে তৈরি; **চিত্বা**—রচনা করে; **তস্যাম্**—তাতে, **পত্যুঃ**—পতির, **কলেবরম্**—দেহ; **আদীপ্য**—প্রদীপ্ত করে; **চ**—ও; **অনুমরণে**—সহমরণে; **বিলপন্তী**—বিলাপ করতে করতে; **মনঃ**—তাঁর মন; **দধে**—স্থির করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর তিনি কাঠ দিয়ে চিতা রচনা করে তাতে তাঁর পতির কলেবর প্রদীপ্ত করে, বিলাপ করতে করতে তাঁর পতির অনুসরণে সহমরণে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সমাজে পতিব্রতা স্ত্রীর মৃত পতির অনুগামিনী হয়ে, সহমরণ বরণ করা একটি অতি প্রাচীন প্রথা। ব্রিটিশদের রাজত্বকালেও ভারতবর্ষে এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল। তখন অবশ্য পত্নী স্বেচ্ছায় পতির সঙ্গে মরতে চাইত না, এবং কখনও কখনও তাদের আত্মীয়রা জোর করে তাদের পুড়িয়ে মারত। বৈদিক প্রথাটি কিন্তু সেই রকম ছিল না। স্ত্রী স্বেচ্ছায় পতির চিতাগ্নিতে প্রবেশ করতেন। ব্রিটিশ

সরকার এই প্রথাটিকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে করে তা রদ করেছিল। কিন্তু, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, তাঁর দুই পত্নী মাদ্রী ও কুন্তী বিবেচনা করেছিলেন যে, তাঁরা দুজনেই সহমৃতা হবেন কি না, এবং অবশেষে তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, একজন সহমৃতা হবেন এবং অন্য আর একজন তাঁদের শিশু-সন্তানদের পালনের জন্য এই পৃথিবীতে থাকবেন। মাদ্রী দাবি করেছিলেন যে, যেহেতু তাঁর কারণে তাঁর পতির মৃত্যু হয়েছে, তাই তিনি সহমৃতা হবেন এবং কুন্তী যেন এখানে থেকে তাঁদের পঞ্চপুত্রকে পালন করেন। ১৯৩৬ সালেও আমরা এক পতিব্রতা স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় পতির চিতাগ্নিতে সহমৃতা হতে দেখেছি।

তা সূচিত করে যে, পতিব্রতা স্ত্রীর এইভাবে আচরণ করতে প্রস্তুত থাকা অবশ্য কর্তব্য। তেমনই, গুরুগতপ্রাণ শিষ্যও মনে করেন যে, শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনে অক্ষম হওয়ার থেকে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে পরলোকে গমন করা শ্রেয়। পরমেশ্বর ভগবান যেমন ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য এই পৃথিবীতে আসেন, তেমনই তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে আসেন। শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করার দায়িত্বভার গ্রহণ করা। শিষ্য যদি তা করতে না পারেন, তা হলে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে তাঁর কৃতসংকল্প হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা বিবেচনা না করে, শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে শিষ্যের প্রস্তুত থাকা উচিত।

শ্লোক ৫১

তত্র পূর্বতরঃ কশ্চিৎসখা ব্রাহ্মণ আত্মবান্ ।
সান্ত্বয়ন্ বল্গুনা সাম্না তামাহ রুদতীং প্রভো ॥ ৫১ ॥

তত্র—সেখানে; **পূর্বতরঃ**—পূর্বতন; **কশ্চিৎ**—কোন; **সখা**—বন্ধু; **ব্রাহ্মণঃ**—একজন ব্রাহ্মণ; **আত্মবান্**—অত্যন্ত বিদ্বান; **সান্ত্বয়ন্**—সান্ত্বনা দিয়ে; **বল্গুনা**—অত্যন্ত সুন্দর; **সাম্না**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **তাম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **রুদতীম্**—রোরুদ্যমানা; **প্রভো**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্! তখন রাজা পুরঞ্জনের এক পূর্বতন সখা ব্রাহ্মণ সেখানে এসে, মধুর বাক্যের দ্বারা রানীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণরূপে পুরাতন এক সখার এই আগমন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই পুরাতন সখা। বৈদিক বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের সঙ্গে রয়েছেন। শ্রুতি মন্ত্রের বর্ণনা অনুসারে (*দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ*), ভগবান প্রতিটি জীবের *সুহৃৎ* বা প্রিয়তম বন্ধুরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। জীবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান সর্বদাই অত্যন্ত আকুল হয়ে রয়েছেন। সাক্ষীরূপে জীবের সঙ্গে বিরাজ করে ভগবান জীবকে সমস্ত জড়-জাগতিক সুখভোগ করার সুযোগ প্রদান করেন, কিন্তু সুযোগ পেলেই ভগবান জীবকে জড় জগতে সুখভোগ করার চেষ্টা পরিত্যাগ করে, ভগবৎ-মুখী হওয়ার এবং ভগবানের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেন। কেউ যখন শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তখন তাঁর এই সংকল্প ভগবানকে দর্শন করারই সামিল পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, তার অর্থ হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশের মধ্যেই ভগবানকে সাক্ষাৎ করা। তাকে বলা হয় *বাণীসেবা। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪১) শ্লোকটির ভাষ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীগুরুদেবের বাণীর সেবা করা উচিত। শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। কেবলমাত্র তা করার ফলেই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়।

পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মা রাণীর সম্মুখে একজন ব্রাহ্মণরূপে এসেছিলেন। তিনি কেন তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত হলেন না? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবৎ-প্রেমের অতি উন্নত স্তরে উন্নীত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্বরূপে তাঁকে দর্শন করা যায় না। কিন্তু, কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করতে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি কোন না কোনও ভাবে ভগবানের সঙ্গে রয়েছেন। ভগবান যেহেতু হৃদয়ে বিরাজমান, তাই তিনি ঐকান্তিক শিষ্যকে অন্তর থেকে উপদেশ দিতে পারেন. সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর প্রীতি সহকারে আমার আরাধনা করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

মূল কথা হচ্ছে, শিষ্য যদি ঐকান্তিকতা সহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাণী অথবা বপুর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার একমাত্র রহস্য। ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনে যুক্ত থেকে এবং সেই সঙ্গে বৃন্দাবনের কোন কুঞ্জে ভগবানকে দর্শন করার জন্য আকুল হওয়ার পরিবর্তে, যদি কেবল শ্রীগুরুদেবের বাণীর অনুসরণ করা যায়, তা হলে অনায়াসে ভগবানকে দর্শন করা যায়। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাই বলেছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

"হে ভগবান! আমি যদি আপনার ভক্তিতে যুক্ত হই, তা হলে অনায়াসে আমি সর্বত্র আপনার উপস্থিতি অনুভব করতে পারব। আর মুক্তিদেবী তো করজোড়ে আমার সেবা করার সুযোগের প্রতীক্ষা করে আমার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এবং ধর্ম, অর্থ, কাম আদি সমস্ত জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে।" (*কৃষ্ণকর্ণামৃত* ১০৭) কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির মার্গে অত্যন্ত উন্নত হন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবানকে দর্শন করতে পারবেন। কেউ যদি শ্রীগুরুদেবের সেবায় যুক্ত থাকেন, তা হলে তিনি কেবল ভগবানকেই দর্শন করবেন তাই নয়, তিনি মুক্তিও লাভ করবেন। জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি আপনা থেকেই লাভ হবে, ঠিক যেমন রাণীর পরিচারিকারা সর্বদা রাণীর অনুসরণ করে থাকে। শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে মুক্তি কোন সমস্যাই নয়, এবং সমস্ত জড় সুযোগ সুবিধাগুলি জীবনের সব কটি স্তরেই তাঁর সেবা করার জন্য প্রতীক্ষা করে।

শ্লোক ৫২

ব্রাহ্মণ উবাচ

কা ত্বং কস্যাসি কো বায়ং শয়ানো যস্য শোচসি ।
জানাসি কিং সখায়ং মাং যেনাগ্রে বিচচর্থ হ ॥ ৫২ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ বললেন; **কা**—কে; **ত্বম্**—তুমি; **কস্য**—কার; **অসি**—হও; **কঃ**—কে; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **শয়ানঃ**—শায়িত; **যস্য**—যার জন্য,

শোচসি—তুমি শোক করছ; **জানাসি কিম্**—তুমি কি জান; **সখায়ম্**—বন্ধু; **মাম্**—আমাকে; **যেন**—যাঁর সঙ্গে; **অগ্রে**—পূর্বে; **বিচচর্থ**—পরামর্শ করতে; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? তুমি কার পত্নী অথবা কন্যা? এই শায়িত পুরুষটি কে? মনে হচ্ছে যেন তুমি এই মৃত শরীরের জন্য শোক করছ। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমার চিরকালের বন্ধু। তোমার স্মরণ হতে পারে যে, পূর্বে তুমি বহুবার আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলে।

তাৎপর্য

যখন কারও আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তখন আপনা থেকেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সঙ্গে পরামর্শ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে জড় আসক্তির কলুষ থেকে মুক্ত হন। যিনি ঐকান্তিক এবং শুদ্ধ, তিনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ পান। পরমাত্মা সর্বদাই জীবের চৈত্ত্যগুরু বা অন্তরে বিরাজমান শ্রীগুরুদেব, এবং তিনিই বাইরে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুরূপে আবির্ভূত হন। ভগবান হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং তিনি জীবের সম্মুখে এসে তাকে উপদেশও দিতে পারেন। তাই শ্রীগুরুদেব হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা থেকে অভিন্ন। কলুষমুক্ত আত্মা বা জীব প্রত্যক্ষভাবে পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। ঠিক যেভাবে অন্তরে স্থিত পরমাত্মার সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ পাওয়া যায়, তেমনই সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মাকে দর্শন করারও সুযোগ পাওয়া যায়। তখন প্রত্যক্ষভাবে পরমাত্মার থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সদ্গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার সঙ্গে পরামর্শ করা।

ব্রাহ্মণ যখন স্ত্রীলোকটিকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, ভূমিতে শয়ান ব্যক্তিটি কে, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন তাঁর গুরুদেব এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে কি করা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছেন। এই রকম সময়, শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করার ফলে অন্তরে নির্মল হন, তা হলে পরমাত্মা তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন। যে ভক্ত নিষ্ঠা সহকারে গুরুদেবের আদেশ পালন করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর হৃদয় থেকে অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রত্যক্ষ নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তার ফলে ঐকান্তিক ভক্ত সর্বদাই প্রত্যক্ষভাবে

অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীগুরুদেব এবং পরমাত্মার সাহায্য প্রাপ্ত হন। সেই কথা *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ*। ভক্ত যদি নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন—*যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎ প্রসাদঃ*। শ্রীগুরুদেবের সন্তুষ্টি-বিধানের ফলে শ্রীকৃষ্ণ আপনা থেকেই প্রসন্ন হন। এইভাবে ভক্ত শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের দ্বারাই লাভবান হন। পরমাত্মা জীবের নিত্য সখা এবং সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকেন। পরমাত্মা সর্বদাই জীবকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, এমন কি এই জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও। তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে *যেনাগ্রে বিচচর্থ*। *অগ্রে* বলতে সৃষ্টির পূর্বে বোঝানো হয়েছে। এইভাবে পরমাত্মা সৃষ্টির পূর্ব থেকেই জীবের সঙ্গে রয়েছেন।

শ্লোক ৫৩

অপি স্মরসি চাত্মানমবিজ্ঞাতসখং সখে।
হিত্বা মাং পদমন্বিচ্ছন্ ভৌমভোগরতো গতঃ ॥ ৫৩ ॥

অপি স্মরসি—তোমার কি মনে পড়ে; **চ**—ও; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **অবিজ্ঞাত**—অজ্ঞাত; **সখম্**—সখা; **সখে**—হে বন্ধু; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **মাম্**—আমাকে; **পদম্**—পদ; **অন্বিচ্ছন্**—কামনা করে; **ভৌম**—জড়; **ভোগ**—সুখ; **রতঃ**—আসক্ত; **গতঃ**—হয়েছ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—হে বন্ধু! যদিও তুমি আমাকে এখনও চিনতে পারছ না, তোমার কি মনে পড়ে না যে, পূর্বে তোমার এক অতি অন্তরঙ্গ সখা ছিল? দুর্ভাগ্যবশত তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, এই জগতের ভোক্তার পদ গ্রহণ করেছ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২৭) বর্ণনা করা হয়েছে—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

"হে ভারত (অর্জুন)! হে পরন্তপ! সকলেই ইচ্ছা ও বিদ্বেষের দ্বারা অভিভূত এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে।" জীব যে কিভাবে এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়, এটি হচ্ছে তার একটি বিশ্লেষণ। চিৎ-জগতে কোন দ্বৈতভাব

নেই এবং সেখানে বিদ্বেষভাবও নেই। অধিক থেকে অধিকতর আনন্দ আস্বাদন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। *বরাহ পুরাণে* উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব *(স্বাংশ)* এবং তাঁর তটস্থা শক্তি (*বিভিন্নাংশ* বা জীব) রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। এই প্রকার জীবেদের সংখ্যা অসংখ্য, ঠিক যেমন সূর্যের কিরণকণা হচ্ছে অসংখ্য। ভগবানের তটস্থা শক্তিজাত বিভিন্নাংশ হচ্ছে জীব। জীব যখন স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করতে চায়, তখন তার দ্বৈতভাবের উদয় হয়, এবং সে ভগবানের সেবার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়। এইভাবে জীব জড় জগতে অধঃপতিত হয়। *প্রেমবিবর্তে* বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবহির্মুখ হএগ ভোগবাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

জীবের স্বাভাবিক স্থিতি হচ্ছে দিব্য প্রেমে ভগবানের সেবা করা। জীব যখন নিজেই কৃষ্ণ হতে চায় অথবা শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করে, তখন সে এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পিতা তাই জীবের প্রতি তাঁর স্নেহ নিত্য। জীব যখন জড় জগতে অধঃপতিত হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর স্বাংশ (পরমাত্মা) বিস্তারের দ্বারা জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। এইভাবে জীব কোন না কোনদিন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে ।

তার স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে, জীব ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত হয়ে, এই জড় জগতে ভোক্তা হওয়ার পদ গ্রহণ করে। অর্থাৎ, জীব জড়দেহ গ্রহণ করে। অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়ার আশায়, জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে জড়িয়ে পড়ে। মানুষ, দেবতা, বিড়াল, কুকুর, বৃক্ষ, ইত্যাদি রূপে সে তার পদ মনোনয়ন করে। এইভাবে ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন দেহধারণ করে, জীব জড়সুখ ভোগের মাধ্যমে সুখী হওয়ার চেষ্টা করে। পরমাত্মা কিন্তু চান না যে, জীব এই সমস্ত কর্মে লিপ্ত হোক তাই পরমাত্মা তাকে ভগবানের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেন। ভগবান তখন জীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু জীব যতক্ষণ জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ সে ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) ভগবান বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"ঋষিরা আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের ও দেবতাদের পরম ঈশ্বররূপে জেনে, এবং সমস্ত জীবের পরম

শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে জেনে, জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করেন।”

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ; কিন্তু, কেউ যখন স্বয়ং সুখী হওয়ার পরিকল্পনা করে জড়া প্রকৃতির গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন সে তার পরম সুহৃদের উপদেশের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। যখন সৃষ্টি শুরু হয়, তখন জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে, সমস্ত যোনি অথবা জীবের রূপ একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। ডারউইন তার বিবর্তনবাদে বলেছে যে, শুরুতে মানুষ ছিল না, বহু বছরের ক্রম বিবর্তনের ফলে মানুষের উদ্ভব হয়েছে, তা একটি অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা। সব চাইতে বুদ্ধিমান হওয়ার ফলে ব্রহ্মা এই জগতে যত সমস্ত যোনি রয়েছে, সেগুলির সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন

শ্লোক ৫৪

হংসাবহং চ ত্বং চার্য সখায়ৌ মানসায়নৌ ।
অভূতামন্তরা বৌকঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥ ৫৪ ॥

হংসৌ—দুটি হংস; **অহম্**—আমি; **চ**—এবং; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—ও; **আর্য**—হে মহাত্মা; **সখায়ৌ**—দুটি বন্ধু; **মানস-অয়নৌ**—মানস সরোবরে একসঙ্গে; **অভূতাম্**—হয়েছিল; **অন্তরা**—পৃথক; **বা**—প্রকৃতপক্ষে; **ওকঃ**—প্রকৃত গৃহ থেকে; **সহস্র**—হাজার-হাজার; **পরি**—ক্রমান্বয়ে; **বৎসরান্**—বৎসর

অনুবাদ

হে প্রিয় সখা! তুমি আর আমি ঠিক দুটি হংসের মতো। আমরা দুজনে একত্রে একই হৃদয়ে বাস করি, যা ঠিক মানস সরোবরের মতো। যদিও আমরা বহু সহস্র বৎসর ধরে একসঙ্গে রয়েছি, তবুও আমরা আমাদের প্রকৃত আলয় থেকে বহু দূরে।

তাৎপর্য

জীব ও ভগবানের প্রকৃত আলয় হচ্ছে চিৎ-জগৎ। চিৎ-জগতে ভগবান ও জীব উভয়েই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বাস করেন। জীব যেহেতু ভগবানের সেবায়

যুক্ত থাকে, তাই তাঁরা উভয়েই চিৎ-জগতে আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু জীব যখন একা আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তখন সে এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। সেই অবস্থাতেও ভগবান পরমাত্মারূপে, তার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে, তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বিস্মৃতির ফলে জীব জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে তার সঙ্গে রয়েছেন। এইভাবে জীব প্রতি কল্পে বদ্ধ অবস্থায় থাকে ভগবান যদিও তার সখারূপে তাকে অনুসরণ করেন, তবুও সে বিস্মৃতির প্রভাবে তাঁকে চিনতে পারে না।

শ্লোক ৫৫

স ত্বং বিহায় মাং বন্ধো গতো গ্রাম্যমতির্মহীম্ ।
বিচরন্ পদমদ্রাক্ষীঃ কয়াচিন্নির্মিতং স্ত্রিয়া ॥ ৫৫ ॥

সঃ—সেই হংস, **ত্বম্**—তুমি; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **মাম্**—আমাকে; **বন্ধো**—হে সখে; **গতঃ**—চলে গিয়েছ; **গ্রাম্য**—জড়; **মতিঃ**—চেতনা; **মহীম্**—পৃথিবীকে; **বিচরন্**—ভ্রমণ করে, **পদম্**—পদ; **অদ্রাক্ষীঃ**—তুমি দেখেছ; **কয়াচিৎ**—কারোর দ্বারা; **নির্মিতম্** নির্মিত, **স্ত্রিয়া**—একটি স্ত্রীর দ্বারা।

অনুবাদ

হে সখে! তুমি আমার সেই বন্ধু। যখন থেকে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ, তখন থেকে তুমি ক্রমশ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়েছ, এবং আমাকে বিস্মৃত হয়ে, কোন স্ত্রীর দ্বারা রচিত এই জড় জগতে বিভিন্ন দেহে তুমি ভ্রমণ করছ।

তাৎপর্য

জীব যখন চিৎ-জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়, তখন সে এই জড় জগতে পতিত হয়, যা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সৃষ্ট। এই বহিরঙ্গা শক্তিকে এখানে 'কোন স্ত্রী' বা *প্রকৃতি* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় জগৎ মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত ভৌতিক উপাদানগুলির দ্বারা গঠিত। বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সৃষ্ট জড় জগৎ বদ্ধ জীবের তথাকথিত গৃহে পরিণত হয়। এই জড় জগতে বদ্ধ জীব বিভিন্ন বাসস্থান বা বিভিন্ন প্রকার শরীর গ্রহণ করে ভ্রমণ করে। কখনও সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, আবার কখনও সে নিম্নতর লোকে পতিত হয়। কখনও সে উচ্চতর যোনিতে ভ্রমণ করে, কখনও বা নিম্নতর যোনিতে। অনাদিকাল ধরে সে এই জড় জগতে ভ্রমণ করছে। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)

জীব এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন প্রকার যোনিতে ভ্রমণ করছে কিন্তু সে যদি পুনরায় তার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে অথবা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে মিলিত হয়, তা হলে সে ভাগ্যবান।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠান, যিনি তাঁর বাণী প্রচার করে সমস্ত জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে অনুপ্রাণিত করেন। দুর্ভাগ্যবশত জীব জড়সুখ ভোগের প্রতি এতই আসক্ত যে, সে শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর প্রতিনিধির উপদেশের খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। এই প্রবৃত্তিকে এই শ্লোকে *গ্রাম্যমতিঃ* (ইন্দ্রিয় সুখভোগ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *মহীম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'এই জড় জগতে'। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ইন্দ্রিয় সুখভোগ পরায়ণ। তাই তারা বিভিন্ন প্রকার যোনিতে আবদ্ধ হয়ে সংসারের দুঃখ ভোগ করে।

শ্লোক ৫৬

পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ত্রিকোষ্ঠকম্ ।
ষট্কুলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রকৃতি স্ত্রীধবম্ ॥ ৫৬ ॥

পঞ্চ-আরামম্—পাঁচটি বাগান, **নব-দ্বারম্**—নয়টি দ্বার; **এক**—একটি; **পালম্**—রক্ষক, **ত্রি**—তিন; **কোষ্ঠকম্**—বাসস্থান; **ষট্**—ছয়; **কুলম্**—পরিবার; **পঞ্চ**—পাঁচ, **বিপণম্**—দোকান, **পঞ্চ**—পাঁচ; **প্রকৃতি**—ভৌতিক উপাদান; **স্ত্রী**—নারী; **ধবম্**—অধীশ্বরী

অনুবাদ

সেই নগরীর (জড় শরীরের) পাঁচটি উদ্যান, নয়টি দ্বার, একজন রক্ষক, তিনটি কোষ্ঠ, ছয়টি পরিবার, পাঁচটি দোকান, পাঁচটি উপাদান, এবং একজন স্ত্রী তার অধীশ্বরী।

শ্লোক ৫৭

পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা আরামা দ্বারঃ প্রাণা নব প্রভো ।
তেজোঽবন্নানি কোষ্ঠানি কুলমিন্দ্রিয়সংগ্রহঃ ॥ ৫৭ ॥

পঞ্চ—পাঁচ, **ইন্দ্রিয়-অর্থাঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়, **আরামাঃ**—উদ্যান, **দ্বারঃ**—দ্বার, **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়ের ছিদ্র; **নব**—নয়; **প্রভো**—হে রাজন্; **তেজঃ-অপ্**—অগ্নি, জল; **অন্নানি**—অন্ন বা পৃথিবী, **কোষ্ঠানি**—কোষ্ঠ; **কুলম্**—পরিবার, **ইন্দ্রিয় সংগ্রহঃ** পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন।

অনুবাদ

হে সখে! পাঁচটি উদ্যান হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখভোগের পাঁচটি বিষয়, এবং তার রক্ষক হচ্ছে প্রাণবায়ু, যা নয়টি দ্বার দিয়ে প্রবাহিত হয়। তিনটি কোষ্ঠ হচ্ছে তিনটি প্রধান উপাদান—অগ্নি, জল ও মাটি। ছয়টি পরিবার হচ্ছে মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়।

তাৎপর্য

দৃষ্টি, স্বাদ, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—এই পাঁচটি তন্মাত্র দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, একটি মুখ, দুটি নাসারন্ধ্র, একটি উপস্থ ও একটি পায়ু—এই নয়টি দ্বারের মাধ্যমে কার্য করে। এই নয়টি ছিদ্রকে নগরীর দ্বারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রধান উপাদানগুলি হচ্ছে মাটি, জল ও আগুন, এবং প্রধান কর্তা হচ্ছে মন, যা বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শ্লোক ৫৮

বিপণস্তু ক্রিয়াশক্তির্ভূতপ্রকৃতিরব্যয়া ।
শক্ত্যধীশঃ পুমাংস্ত্বত্র প্রবিষ্টো নাববুধ্যতে ॥ ৫৮ ॥

বিপণঃ—দোকান; **তু**—তখন; **ক্রিয়া-শক্তিঃ**—কার্য করার শক্তি অথবা কর্মেন্দ্রিয়; **ভূত**—পঞ্চভূত; **প্রকৃতিঃ**—জড় উপাদান; **অব্যয়া**—শাশ্বত; **শক্তি**—শক্তি; **অধীশঃ**—নিয়ন্তা; **পুমান্**—মানুষ; **তু**—তখন, **অত্র**—এখানে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছে; **ন**—না; **অববুধ্যতে**—জানা যায়।

অনুবাদ

পাঁচটি বিপণি হচ্ছে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। সেগুলি পঞ্চ-মহাভূতের সংযুক্ত শক্তির দ্বারা তাদের ব্যবসা করে। সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে রয়েছে আত্মা। আত্মা হচ্ছে ভোক্তা এবং সে হচ্ছে পুরুষ। কিন্তু শরীর-রূপী নগরীতে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, সে তার স্বরূপ জানতে পারে না।

তৎ তার সঙ্গে, **সঙ্গাৎ**—সঙ্গ করার ফলে, **ঈদৃশীম্**—এই প্রকার, **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছ; **দশাম্**—অবস্থা; **পাপীয়সীম্**—পাপকর্মে পূর্ণ, **প্রভো**—হে সখা।

অনুবাদ

হে সখে। তুমি যখন বিষয়-বুদ্ধিরূপা রমণীর সঙ্গে এই শরীরে প্রবেশ করেছ, তখন থেকেই তুমি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছ। এই কারণে, তুমি তোমার চিন্ময় জীবনের কথা ভুলে গেছ। তার ফলে তুমি এই প্রকার পাপীয়সী দশা প্রাপ্ত হয়ে, নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছ।

তাৎপর্য

মানুষ যখন জড় বিষয়ে মগ্ন হয়, তখন তার আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে শ্রবণ করবার শক্তি থাকে না। চিন্ময় অস্তিত্বের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে, মানুষ ক্রমশ জড় বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। এটিই হচ্ছে পাপীয়সী জীবনের পরিণতি। নানা প্রকার পাপকর্মের ফলে, জড় উপাদানের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার দেহের বিকাশ হয়। রাজা পুরঞ্জন তাঁর পাপকর্মের ফলে, বৈদর্ভী-নামক স্ত্রী-শরীর ধারণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (*স্ত্রীয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ*) এই প্রকার শরীর অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরের কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন আধ্যাত্মিক বুদ্ধির হ্রাস হওয়ার ফলে, নিকৃষ্ট স্তরের যোনিতে জন্ম হয়।

শ্লোক ৬০

ন ত্বং বিদর্ভদুহিতা নায়ং বীরঃ সুহৃত্তব ।
ন পতিস্ত্বং পুরঞ্জন্যা রুদ্ধো নবমুখে যয়া ॥ ৬০ ॥

ন—না; **ত্বম্**—তুমি; **বিদর্ভ-দুহিতা**—বিদর্ভের কন্যা, **ন**—না; **অয়ম্** এই, **বীরঃ**—বীর, **সু-হৃৎ**—হিতৈষী পতি, **তব**—তোমার; **ন**—না, **পতিঃ**—পতি; **ত্বম্**—তুমি; **পুরঞ্জন্যাঃ**—পুরঞ্জনীর, **রুদ্ধঃ**—অবরুদ্ধ, **নব-মুখে**—নবদ্বার সমন্বিত দেহে, **যয়া**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে, তুমি বিদর্ভরাজের কন্যা নও, এই মলয়ধ্বজ তোমার হিতকারী পতি নয়। তুমি পুরঞ্জনীরও পতি নও তুমি কেবল নবদ্বার সমন্বিত এই দেহে অবরুদ্ধ হয়েছ।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে বহু জীব পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, এবং পিতা, পতি মাতা, পত্নী ইত্যাদিরূপে সম্পর্কিত হয়ে, সে তার বিশেষ শরীরের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই স্বতন্ত্র, এবং জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শের ফলে সে অন্যান্য দেহের সংস্পর্শে আসে এবং ভ্রান্তভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় পরিবার, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদির নামে, দেহের মিথ্যা পরিচয় বিভিন্ন প্রকার সংগঠন সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু জীবেরা তাদের জড় শরীরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে *ভগবদ্গীতা* এবং বৈদিক সাহিত্যরূপে উপদেশ দেন। ভগবান জীবদের এই সমস্ত উপদেশ দেন কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের নিত্য সখা তাঁর উপদেশগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলির দ্বারা জীব তার দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে নদীর প্রবাহে তট থেকে বহু খড়কুটা ভেসে যায় ক্ষণিকের জন্য সেগুলি একত্রিত হয়, আবার তরঙ্গের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তেমনই, এই জড় জগতে অসংখ্য জীব জড়া প্রকৃতির প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে কখনও তারা একত্রিত হয়, এবং দেহের ভিত্তিতে সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র ইত্যাদি গঠন করে পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। অবশেষে জড়া প্রকৃতির তরঙ্গাঘাতে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই পন্থা চলে আসছে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টির সময় থেকে সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে',
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই ।
জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই ॥

এই শ্লোকে সুহৃৎ এবং তব কথা দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তথাকথিত পতি, আত্মীয়স্বজন, পুত্র, পিতা, এরা কেউই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিতৈষী হতে পারে না একমাত্র হিতৈষী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যে-কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলেছেন *সুহৃদং সর্বভূতানাম্।* সমাজ, বন্ধুত্ব, প্রেম, হিতৈষী, এই সবই বিভিন্ন দেহে আবদ্ধ হওয়ার পরিণতি। সেই কথা ভালভাবে অবগত হয়ে, জন্ম জন্মান্তরে বিভিন্ন দেহে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া উচিত

শ্লোক ৬১

**মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎপুমাংসং স্ত্রিয়ং সতীম্ ।
মন্যসে নোভয়ং যদ্বৈ হংসৌ পশ্যাবয়োর্গতিম্ ॥ ৬১ ॥**

মায়া—মায়া; **হি**—নিশ্চিতভাবে, **এষা**—এই, **ময়া**—আমার দ্বারা, **সৃষ্টা**—সৃষ্ট; **যৎ**—যা থেকে; **পুমাংসম্**—পুরুষ **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী, **সতীম্**—সাধ্বী, **মন্যসে**—তুমি মনে কর; **ন**—না, **উভয়ম্**—উভয়; **যৎ**—যেহেতু **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **হংসৌ**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত, **পশ্য**—দেখ; **আবয়োঃ**—আমাদের; **গতিম্**—বাস্তবিক স্থিতি।

অনুবাদ

কখনও তুমি নিজেকে একজন পুরুষ বলে মনে কর, কখনও বা একজন সতী স্ত্রী বলে মনে কর, আবার কখনও নপুংসক বলে মনে কর। তার কারণ হচ্ছে শরীর, যা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট। এই মায়া আমারই শক্তি, এবং প্রকৃতপক্ষে তুমি ও আমি, আমরা দুজনেই শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। আমি তোমাকে আমাদের বাস্তবিক স্থিতি সম্বন্ধে বোঝাতে চেষ্টা করছি, তা বুঝতে চেষ্টা কর।

তাৎপর্য

ভগবান এবং জীবের বাস্তবিক স্থিতি গুণগতভাবে এক। ভগবান হচ্ছেন পরম আত্মা আর জীব হচ্ছে স্বতন্ত্র আত্মা। যদিও তাঁদের উভয়েরই আদি স্বরূপ হচ্ছে চিন্ময়, কিন্তু জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন সে তার পরিচয় ভুলে যায়। তখন সে নিজেকে জড়া প্রকৃতিজাত বলে মনে করে। জড় দেহের ফলে সে ভুলে যায় যে, সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত (*সনাতন*) বিভিন্ন অংশ। সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।* *ভগবদ্‌গীতার* কয়েকটি স্থানে *সনাতন* শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। ভগবান এবং জীব উভয়েই সনাতন (নিত্য), এবং জড়া প্রকৃতির অতীত সনাতন বলে একটি স্থানও রয়েছে। জীব এবং ভগবান উভয়েরই প্রকৃত আলয় হচ্ছে সেই সনাতন ধামে, এই জড় জগতে নয়। এই জড় জগৎ হচ্ছে ভগবানের অনিত্য বহিরঙ্গা প্রকৃতি, এবং ভগবানকে অনুকরণ করতে চাওয়ার ফলে, জীবকে এই জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়েছে। এই জড় জগতে সে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বিভিন্ন রকম দেহের মাধ্যমে এই জড় জগতে বদ্ধ জীবের সমস্ত কার্যকলাপ নিরন্তর সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু জীবের চেতনা

যখন বিকশিত হয়, তখন তার কর্তব্য হচ্ছে তার পরিস্থিতির সংশোধন করে পুনরায় চিৎ-জগতের সদস্য হওয়া। যে পন্থার দ্বারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। কখনও কখনও তাকে সনাতন ধর্মও বলা হয়। জড় দেহের ভিত্তিতে অনিত্য বৃত্তি গ্রহণ না করে সনাতন ধর্ম বা ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে জড় দেহের বন্ধনের সমাপ্তি সাধন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। মানব সমাজ যতক্ষণ ভ্রান্ত জড় পরিচিতির ভিত্তিতে আচরণ করতে থাকবে, ততক্ষণ বিজ্ঞান অথবা দর্শনের তথাকথিত প্রগতি সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। সেগুলি কেবল মানব সমাজকে বিপথে পরিচালিত করবে। *অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ।* এই জড় জগতে অন্ধেরা অন্ধদের পরিচালিত করে।

শ্লোক ৬২

অহং ভবান্ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি ॥ ৬২ ॥

অহম্—আমি, **ভবান্**—তুমি; **ন**—না; **চ**—ও, **অন্যঃ**—ভিন্ন; **ত্বম্**—তুমি, **ত্বম্**—তুমি, **এব**—নিশ্চিতভাবে, **অহম্**—আমি যেমন; **বিচক্ষ্ব**—দেখ, **ভোঃ**—হে প্রিয় সখা, **ন**—না, **নৌ**—আমাদের, **পশ্যন্তি**—দেখে, **কবয়ঃ**—জ্ঞানী ব্যক্তিরা, **ছিদ্রম্**—দোষ, **জাতু**—যে কোন সময়, **মনাক্**—কিঞ্চিৎ, **অপি**—ও।

অনুবাদ

হে প্রিয় সখা! আমি এবং তুমি, পরমাত্মা এবং আত্মা গুণগতভাবে অভিন্ন, কারণ আমরা উভয়েই চিন্ময়। হে সখে! প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রকৃত স্বরূপে তুমি গুণগতভাবে আমার থেকে ভিন্ন নও। সেই কথাটি বোঝার চেষ্টা কর। যারা প্রকৃতই বিদ্বান এবং জ্ঞানবান, তারা তোমার এবং আমার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য দর্শন করে না।

তাৎপর্য

ভগবান এবং জীব উভয়েই গুণগতভাবে এক। তাঁদের মধ্যে কোন বাস্তবিক পার্থক্য নেই। মায়াবাদীরা বার বার মায়ার দ্বারা পরাভূত হয়, কারণ তারা মনে করে যে, পরমাত্মা এবং আত্মা এক, অথবা পরমাত্মা নেই। তারা ভ্রান্তিবশত এমনও মনে করে যে, সব কিছুই পরমাত্মা। কিন্তু যাঁরা *কবয়ঃ* বা বিদ্বান তাঁরা বাস্তবিক

সত্য অবগত. তাঁরা কখনও এই প্রকার ভুল করেন না। তাঁরা জানেন যে, ভগবান এবং জীবাত্মা গুণগতভাবে এক, কিন্তু জীবাত্মা অধঃপতিত হয়ে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মায়ার ঈশ্বর। মায়া ভগবানের সৃষ্টি (*ময়া সৃষ্টা*); তাই ভগবান হচ্ছেন মায়ার নিয়ন্তা। গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হলেও, জীবাত্মা মায়ার নিয়ন্ত্রণাধীন। মায়াবাদীরা নিয়ন্তা এবং নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৬৩

যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ ।
দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োঃ ॥ ৬৩ ॥

যথা—যেমন; **পুরুষঃ**—জীব; **আত্মানম্**—তার দেহ, **একম্**—এক, **আদর্শ**—দর্পণে, **চক্ষুষোঃ**—চক্ষুর দ্বারা; **দ্বিধা-আভূতম্**—দুই রূপে; **অবেক্ষেত**—দর্শন করে; **তথা**—তেমনই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তরম্**—পার্থক্য; **আবয়োঃ**—আমাদের মধ্যে।

অনুবাদ

মানুষ যেমন দর্পণে তার নিজের প্রতিবিম্বকে তার থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করে, কিন্তু অন্যেরা দুটি শরীর দর্শন করে, তেমনই জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে, যাতে জীব লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও লিপ্ত নয়, ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, মায়াবাদীরা ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করতে পারে না। সূর্য যখন এক পাত্র জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সূর্য জানে যে, সেই প্রতিবিম্ব এবং তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু যারা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা প্রতিটি পাত্রে বহু ছোট ছোট সূর্য দর্শন করে। মূল সূর্য এবং প্রতিবিম্ব দুয়েরই দীপ্তি রয়েছে, কিন্তু প্রতিবিম্বের দীপ্তি অল্প আর সূর্যের দীপ্তি বিশাল। বৈষ্ণব দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব ভগবানের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। গুণগতভাবে ভগবান এবং জীব এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে জীব হচ্ছে ভগবানের ক্ষুদ্র অংশ। পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ, শক্তিমান এবং ঐশ্বর্যবান। পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান বলেছেন, "হে সখে! তুমি এবং আমি অভিন্ন।" এই অভিন্নত্ব গুণগত, কারণ জীব যে আয়তনগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক নয়, সেই কথা বদ্ধ জীবকে

স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পরমাত্মা বোধ করেননি। আত্ম-তত্ত্ববেত্তা পুরুষ কখনও মনে করেন না যে, তিনি এবং ভগবান সর্বতোভাবে এক। জীব যদিও ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক, তবুও জীবের মধ্যে তার চিন্ময় পরিচিতি ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কখনও তা ভুলে যান না এটিই হচ্ছে লিপ্ত এবং অলিপ্তের মধ্যে পার্থক্য পরমেশ্বর ভগবান নিত্যকাল অলিপ্ত, বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা কলুষিত নন কিন্তু বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির সংসর্গের ফলে তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে যায়, তাই যখন সে বদ্ধ অবস্থায় নিজেকে দর্শন করে, তখন সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দেহ এবং দেহীতে কোন ভেদ নেই তিনি পূর্ণরূপে আত্মা; তাঁর কোন জড় দেহ নেই। পরমাত্মা এবং জীবাত্মা যদিও দেহের অভ্যন্তরে একত্রে রয়েছেন, পরমাত্মা উপাধিমুক্ত, কিন্তু বদ্ধ জীবাত্মা তার বিশেষ শরীরের পরিচিতির দ্বারা প্রভাবিত। পরমাত্মাকে বলা হয় অন্তর্যামী, এবং তিনি সর্বব্যাপ্ত। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বলা হয়েছে, *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*—"হে ভারত! তুমি জেনে রেখো যে, আমি সমস্ত শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞ।"

পরমাত্মা সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু জীবাত্মা কেবল একটি বিশেষ শরীরে আবদ্ধ। অন্যের শরীরে কি হচ্ছে তা জীবাত্মা বুঝতে পারে না, কিন্তু পরমাত্মা জানেন সমস্ত শরীরে কি হচ্ছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমাত্মা সর্বদাই তাঁর পূর্ণ চিন্ময় পদে বিরাজ করেন, কিন্তু জীবাত্মার নিজেকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তা ছাড়া জীবাত্মা সর্বব্যাপ্তও নয়। সাধারণত বদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কিন্তু যখন সে তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়, তখন সে পরমাত্মার সঙ্গে তার প্রকৃত পার্থক্য দর্শন করতে পারে। পরমাত্মা যখন বদ্ধ জীবকে বলেন, "তুমি এবং আমি এক," তা কেবল তার চিন্ময় স্বরূপে গুণগতভাবে সে যে ভগবানের সঙ্গে এক, সেই কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/২৮/৪০) উল্লেখ করা হয়েছে—

> *যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ ।*
> *অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্‌যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥*

অগ্নির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শিখা, স্ফুলিঙ্গ এবং ধূম যদিও গুণগতভাবে সে সবই এক, তবুও অগ্নি, অগ্নিশিখা, স্ফুলিঙ্গ এবং ধূমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে জীব জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু ভগবান কখনও আবদ্ধ হন না, সেটিই হচ্ছে পার্থক্য। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*আত্মা তথা পৃথগ্ দ্রষ্টা ভগবান্*

ব্রহ্মসংহিতঃ। আত্মা হচ্ছে জীবাত্মা এবং সব কিছুর দ্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান। যদিও উভয়েই আত্মা, তবুও তাদের মধ্যে নিত্য ভেদ রয়েছে। শ্রুতিতে বলা হয়েছে—*যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি।* ঠিক যেমন আগুনে স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়, তেমনই বৃহৎ চিন্ময় অগ্নিরূপ ভগবানে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসদৃশ জীবাত্মা রয়েছে *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ*—"সমস্ত জীবেরা আমার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই।" স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুনের আশ্রয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবে যদিও সমস্ত জীব তাঁর আশ্রয়ে বিরাজ করছে, তবুও উভয়েই পৃথক পৃথকভাবে অবস্থিত। তেমনই, *বিষ্ণুপুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্ অখিলং জগৎ ॥

"অগ্নি এক স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, যেমন তার তাপ এবং আলোক বিতরণ করে, তেমনই ভগবান বিভিন্নভাবে তাঁর শক্তি বিতরণ করছেন।" জীবেরা তাঁর এমনই একটি শক্তি (তটস্থা শক্তি)। এক অর্থে শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, কিন্তু তাঁরা শক্তি এবং শক্তিমানরূপে পৃথকভাবে অবস্থিত। তেমনই *ব্রহ্মসংহিতায় সচ্চিদানন্দ* বলে বর্ণিত রূপ (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*) মুক্ত এবং বদ্ধ জীব থেকে ভিন্ন। নাস্তিকেরাই কেবল মনে করে যে জীবাত্মা এবং ভগবান সর্বতোভাবে এক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, *মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ*—"কেউ যদি মায়াবাদী দর্শন অনুসরণ করে বিশ্বাস করে যে, ভগবান এবং জীবাত্মা এক, তা হলে তার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে।"

শ্লোক ৬৪

এবং স মনসো হংসো হংসেন প্রতিবোধিতঃ ।
স্বস্থস্তদ্ব্যভিচারেণ নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্ ॥ ৬৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি (জীবাত্মা); **মানসঃ**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে একত্রে অবস্থানকারী; **হংসঃ**—হংসের মতো; **হংসেন**—অন্য হংসের দ্বারা; **প্রতিবোধিতঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **স্ব-স্থঃ**—আত্ম উপলব্ধিতে অবস্থিত; **তৎ-ব্যভিচারেণ**—পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হয়ে; **নষ্টাম্**—যা হারিয়ে গিয়েছিল; **আপ**—প্রাপ্ত; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্মৃতিম্**—প্রকৃত স্মৃতি।

অনুবাদ

এইভাবে উভয় হংসই হৃদয়ে বিরাজ করে। একটি হংস যখন অন্য হংসের দ্বারা উপদিষ্ট হয়, তখন সে তার স্বরূপে অবস্থিত হয়। অর্থাৎ সে তার কৃষ্ণচেতনা ফিরে পায়, যা সে জড় আসক্তির ফলে হারিয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*হংসো হংসেন প্রতিবোধিতঃ।* জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়কেই হংসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কারণ তারা উভয়েই শ্বেত বা নিষ্কলুষ। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি হংস শ্রেষ্ঠ এবং তিনি অন্য হংসটির উপদেষ্টা নিকৃষ্ট হংসটি যখন অন্য হংসটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেটিই হচ্ছে তার অধঃপতনের কারণ. সে যখন অন্য হংসটির উপদেশ শ্রবণ করে, তখন সে তার প্রকৃত স্থিতি বুঝতে পারে এবং পুনরায় তার শুদ্ধ চেতনায় জাগরিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য অবতরণ করেন। *ভগবদ্গীতার* আকারে তিনি তাঁর পরম মহিমামণ্ডিত উপদেশও প্রদান করেন। ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জীবাত্মাকে তার স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হতে হয়, কারণ *ভগবদ্গীতার* বাণী কেবল পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা লাভ করতে হয় আত্ম তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষের কাছ থেকে।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা কর। বিনম্রতাপূর্বক তাঁর কাছে ঐকান্তিকভাবে প্রশ্ন কর এবং তাঁর সেবা কর আত্ম তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করতে পারেন কারণ তিনি তত্ত্বকে দর্শন করেছেন।"

(*ভগবদ্গীতা* ৪/৩৪)

এইভাবে সদ্গুরুর সন্ধান লাভ করে শুদ্ধ চেতনা প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এইভাবে জীবাত্মা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে সর্বদাই পরমাত্মার অধীন। যেই মুহূর্তে জীব অধীন থাকতে না চেয়ে ভোক্তা হওয়ার চেষ্টা করে, তৎক্ষণাৎ তার ভববন্ধন শুরু হয়। যখন সে প্রভু হওয়ার এবং ভোক্তা হওয়ার মনোভাব পরিত্যাগ করে, তখন সে মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়

এই শ্লোকে স্বস্থঃ শব্দটির অর্থ 'স্বরূপে অবস্থিত' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যখন মানুষ তার প্রভুত্বের অবাঞ্ছিত মনোবৃত্তি বর্জন করে, তখন সে তার স্বরূপে অবস্থিত হয়। *তদ্ব্যভিচারেণ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা সূচিত করে যে, কেউ যখন ভগবানের অবাধ্য হওয়ার ফলে ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তার প্রকৃত চেতনা হারিয়ে যায়। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সে যথাযথভাবে মুক্ত অবস্থায় অবস্থিত হতে পারে। এই শ্লোকগুলি নারদ মুনির উক্তি, এবং আমাদের চেতনাকে জাগরিত করার জন্যই তিনি এই কথাগুলি বলেছেন। যদিও জীব এবং পরমাত্মা গুণগতভাবে এক, কিন্তু জীবাত্মাকে পরমাত্মার নির্দেশ পালন করতে হয়। সেটিই হচ্ছে মুক্ত অবস্থা

শ্লোক ৬৫

বর্হিষ্মন্নেতদধ্যাত্মং পারোক্ষ্যেণ প্রদর্শিতম্ ।
যৎপরোক্ষপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ॥ ৬৫ ॥

বর্হিষ্মন্—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি; **এতৎ**—এই; **অধ্যাত্মম্**—আত্ম উপলব্ধির বর্ণনা, **পারোক্ষ্যেণ**—পরোক্ষভাবে; **প্রদর্শিতম্**—উপদিষ্ট হয়েছে; **যৎ**—যেহেতু, **পরোক্ষ-প্রিয়ঃ**—পরোক্ষ বর্ণনায় আগ্রহী; **দেবঃ**—পরমেশ্বর; **ভগবান্**—ভগবান; **বিশ্ব-ভাবনঃ**—সর্ব-কারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! সর্ব-কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান পরোক্ষরূপে উপলব্ধ হন বলে বিখ্যাত। তাই আমি আপনার কাছে এই পুরঞ্জনের কাহিনী বর্ণনা করেছি প্রকৃতপক্ষে এটি আত্ম-উপলব্ধির উপদেশ।

তাৎপর্য

পুরাণে আত্ম-উপলব্ধির এই প্রকার অনেক কাহিনী রয়েছে। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*পরোক্ষ-প্রিয়া ইব হি দেবাঃ। পুরাণে* বহু কাহিনী রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উৎসাহিত করা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি বাস্তবিক তত্ত্বের বর্ণনা। সেগুলিকে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যবিহীন কতকগুলি গল্প বলে মনে করা উচিত নয়। তাদের মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে ঐতিহাসিক তত্ত্বের বর্ণনা; কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কাহিনীর প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আগ্রহী হওয়া। সাধারণ মানুষের পক্ষে পরোক্ষ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগের

পন্থা হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা শ্রবণ করার পন্থা (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*), কিন্তু যারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুনতে আগ্রহী নয়, অথবা যারা তা বুঝতে পারে না, তারা নারদ মুনি বর্ণিত এই প্রকার কাহিনী অথবা নীতিকথা শ্রবণ করে লাভবান হতে পারে।

এই অধ্যায়ের কতকগুলি মহত্ত্বপূর্ণ শব্দের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

আদেশকারী—পাপকর্মজাত ক্রিয়া।

অগস্ত্য—মন।

অমাত্য—ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ, মন।

অর্বুদ-অর্বুদ—ভগবানের নাম, গুণ, রূপ আদি শ্রবণ এবং কীর্তন।

অরি—রোগাদি বিঘ্ন।

ভোগ—সুখ এখানে এই শব্দটি পারমার্থিক জীবনের প্রকৃত সুখ বোঝাচ্ছে।

ভৃত্য—দেহের সেবক, যথা ইন্দ্রিয়সমূহ।

দ্রবিড়-রাজ—ভক্তি অথবা ভক্তি সম্পাদনে যোগ্য ব্যক্তি

দ্বার—চক্ষু, কর্ণ আদি শরীরের দ্বার।

গৃহ—গৃহ। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য নির্জন স্থান অথবা ভগবদ্ভক্তের সৎসঙ্গ প্রয়োজন হয়।

ইধ্ম-বাহ—শ্রীগুরুদেবের শরণাগত ভক্ত। *ইধ্ম* শব্দটি আগুনের ইন্ধনকে বোঝায়। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে এই *ইধ্ম* দ্বারা যজ্ঞাগ্নি জ্বালানো আধ্যাত্মিক উপদেশের দ্বারা ব্রহ্মচারী সকালবেলা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে, আহুতি দেওয়ার শিক্ষালাভ করেন। তার কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের কাছে গিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করা, এবং বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে যে, শিষ্য যখন গুরুর সমীপবর্তী হয়, তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সমিধ্ নিয়ে যেতে হয়। বৈদিক উপদেশটি হচ্ছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

"আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করার জন্য শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে যজ্ঞ-সমিধ্ হাতে নিয়ে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া। এই প্রকার গুরুদেবের লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি বৈদিক সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গমে নিপুণ, এবং তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত।" (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/২/১২) এই প্রকার সদ্গুরুর সেবা করার ফলে, বদ্ধ জীব ক্রমশ জড় সুখের প্রতি বিরক্ত হয় এবং সদ্গুরুর পরিচালনায় পারমার্থিক উপলব্ধির পথে উন্নতিসাধন করে। যারা মায়ার দ্বারা মোহিত, তারা তাদের জীবন

সার্থক করার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে কখনই আগ্রহী হয় না।

জায়া—বুদ্ধি।

জীর্ণ সর্প—পরিশ্রান্ত প্রাণবায়ু।

কালকন্যা—বার্ধক্যের অক্ষমতা

কাম—অতি তীব্র জ্বর।

কুলাচল—নির্জন স্থান।

কুটুম্বিনী—বুদ্ধি

মদিরেক্ষণা—*মদিরেক্ষণা* বলতে সেই রমণীকে বোঝায়, যার চোখ এত সুন্দর যে, তাকে দেখা মাত্রই মানুষ মোহিত হয়ে যায় অর্থাৎ *মদিরেক্ষণা* মানে হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দরী তরুণী। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে *মদিরেক্ষণা* মানে হচ্ছে ভক্তির মূর্তিমতী বিগ্রহ। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন, তা হলে তিনি ভগবান এবং গুরুদেবের সেবায় যুক্ত হন, এবং তার ফলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। বৈদর্ভী তাঁর পতির অনুগামিনী হয়েছিলেন। তিনি যেভাবে তাঁর পতির সেবা করার জন্য গৃহসুখ পরিত্যাগ করেছিলেন, নিষ্ঠাবান শিষ্যের তেমনই পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য শ্রীগুরুদেবের সেবার উদ্দেশ্যে সব কিছু পরিত্যাগ করা কর্তব্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন *যস্য প্রসাদাদ্‌ভগবৎপ্রসাদঃ*—কেউ যদি জীবনে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে চান, তা হলে নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে আদেশ পালন করার ফলে, পারমার্থিক জীবনে দ্রুত উন্নতিসাধন করা যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের এই উক্তিটি *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* (৬/২৩) উক্তিটির অনুবর্তী—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যে মহাত্মা ভগবান এবং গুরুদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাঁর কাছেই কেবল সমস্ত বৈদিক জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" *ছান্দোগ্য উপনিষদে* বলা হয়েছে, *আচার্যবান্ পুরুষো বেদ*—"যিনি সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়েছেন, তিনিই সর্বতোভাবে পারমার্থিক উপলব্ধি প্রাপ্ত হন।"

মলয়ধ্বজ—চন্দনের মতো স্নিগ্ধ ভক্ত।

পঞ্চাল—ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়।

পরিচ্ছদ—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়

পৌরজন—শরীর নির্মাণকারী সাতটি ধাতু

পৌত্র—ধৈর্য এবং গাম্ভীর্য।

প্রজ্বার—বিষুজ্বার নামক এক প্রকার জ্বর।

প্রতিক্রিয়া—মন্ত্র এবং ঔষধি আদি প্রতিষেধক।

পুর পালক—প্রাণবায়ু।

পুত্র—বিবেক।

সৈনিক—ত্রিতাপ দুঃখ।

সপ্ত-সুত—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, অর্চন এবং দাস্য নামক সাত পুত্র।

সৌহৃদ্য—প্রচেষ্টা।

সুত—বৈদর্ভীর পুত্র, অর্থাৎ, যিনি সকাম কর্মে উন্নতি লাভ করেছেন এবং ভগবদ্ভক্ত গুরুদেবের সান্নিধ্যে এসেছেন। এই প্রকার ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিতে আগ্রহী হন।

বৈদর্ভী—যে রমণী পূর্বে পুরুষ ছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, পরবর্তী জীবনে স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন। *দর্ভ* মানে হচ্ছে কুশঘাস। সকাম কর্মে অথবা কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে কুশঘাসের প্রয়োজন হয়। তাই *বৈদর্ভী* শব্দটি তাঁকে বোঝায়, যিনি কর্মকাণ্ড পরায়ণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের ফলে, কেউ যদি সৌভাগ্য বশে ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে আসেন, ঠিক যেভাবে মলয়ধ্বজের সঙ্গে বৈদর্ভীর বিবাহ হয়েছিল, তা হলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করেন। কেবল সদ্গুরুর আদেশ পালন করার ফলে, বদ্ধজীব মুক্ত হতে পারে।

বিদর্ভ রাজসিংহ—কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

বীর্য—কৃপালু।

যবন—যমদূত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পরবর্তী জন্মে পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি' নামক অষ্টবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ঊনত্রিংশতি অধ্যায়

নারদ ও রাজা প্রাচীনবর্হির কথোপকথন

শ্লোক ১

প্রাচীনবর্হিরুবাচ

ভগবংস্তে বচোঽস্মাভির্ন সম্যগবগম্যতে ।
কবয়স্তদ্বিজানন্তি ন বয়ং কর্মমোহিতাঃ ॥ ১ ॥

প্রাচীনবর্হিঃ উবাচ—মহারাজ প্রাচীনবর্হি বললেন; **ভগবন্**—হে প্রভো; **তে**—আপনার; **বচঃ**—বাণী ; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **ন**—কখনই না; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **অবগম্যতে**—বোঝা যায়; **কবয়ঃ**—অত্যন্ত পারদর্শী; **তৎ**—তা; **বিজানন্তি**—বুঝতে পারেন; **ন**—কখনই না; **বয়ম্**—আমরা; **কর্ম**—সকাম কর্মের দ্বারা; **মোহিতাঃ**—বিমোহিত।

অনুবাদ

মহারাজ প্রাচীনবর্হি বললেন—হে প্রভু! রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনীর তাৎপর্য আমরা পূর্ণরূপে বুঝতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা বুঝতে পারেন, কিন্তু সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত আমাদের মতো মানুষদের পক্ষে আপনার এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥

'জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ) মোহিত হয়ে সমগ্র জগৎ গুণাতীত এবং পরম অব্যয় আমাকে জানে না।" মানুষ সাধারণত

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হয়, এবং তাই তারা বুঝতে পারে না যে, জড় জগতের সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সাধারণত মানুষ যখন পাপকর্মে অথবা পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান তাদের থাকে না। নারদ মুনি রাজা বর্হিষ্মানের কাছে যে-রূপক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। রূপকছলে বর্ণিত এই কাহিনীটি ভগবদ্ভক্তের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু যারা ভগবদ্ভক্তির পরিবর্তে ইন্দ্রিয়-সুখভোগে লিপ্ত, তারা তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই কথা রাজা বর্হিষ্মান স্বীকার করেছেন।

এই ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যন্ত আসক্তির ফলে, মানুষ পরবর্তী জন্মে স্ত্রীশরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যাঁরা ভগবান অথবা ভগবানের প্রতিনিধির সঙ্গ করেন, তাঁরা সমস্ত জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২

নারদ উবাচ

পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাদ্যদ্ ব্যনক্ত্যাত্মনঃ পুরম্ ।
একদ্বিত্রিচতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকম্ ॥ ২ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **পুরুষম্**—জীব, ভোক্তা; **পুরঞ্জনম্**—রাজা পুরঞ্জন; **বিদ্যাৎ**—জানা উচিত, **যৎ**—যেহেতু; **ব্যনক্তি**—তৈরি করে; **আত্মনঃ**—নিজের; **পুরম্**—বাসস্থান; **এক**—এক; **দ্বি**—দুই; **ত্রি**—তিন; **চতুঃ-পাদম্**—চতুষ্পদ-বিশিষ্ট; **বহু-পাদম্**—বহু পদসমন্বিত, **অপাদকম্**—পদশূন্য।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—পুরঞ্জনকে জীব বলে জানবেন। সে তার কর্ম অনুসারে এক পদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহু পদ অথবা পদহীন বিভিন্ন শরীরে দেহান্তরিত হয়। এই সমস্ত শরীরে দেহান্তরিত হয় বলে জীব তথাকথিত ভোক্তারূপে পুরঞ্জন নামে পরিচিত হয়।

তাৎপর্য

জীবাত্মা কিভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, তা এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে *একপাদ* শব্দটি ভূতদের ইঙ্গিত করেছে,

কারণ বর্ণিত হয় যে, ভূতেরা এক পায়ে চলে। *দ্বিপাদ* শব্দটি মানুষদের বোঝায়। মানুষ যখন বৃদ্ধ বা অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তাকে *ত্রিপাদ* বলা হয়, কারণ তিনি একটি যষ্টির সাহায্যে অথবা ছড়ির সাহায্যে চলেন। *চতুষ্পাদ* শব্দটি পশুদের বোঝায়। যে-সমস্ত প্রাণীর চারটির অধিক পা রয়েছে, তাদের বলা হয় *বহুপাদ*। বহু কীট-পতঙ্গ বা জলচর প্রাণী রয়েছে যাদের অনেকগুলি পা। *অপাদক* বলতে সাপদের বোঝায়। পুরঞ্জন নামটি তাকে বোঝায়, যে বিভিন্ন প্রকার শরীর ভোগ করতে চায়।

শ্লোক ৩

যোঽবিজ্ঞাতাহৃতস্তস্য পুরুষস্য সখেশ্বরঃ ।
যন্ন বিজ্ঞায়তে পুম্ভির্নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ ॥ ৩ ॥

যঃ—যে; **অবিজ্ঞাত**—অজ্ঞাত; **আহৃতঃ**—বর্ণিত, **তস্য**—তার; **পুরুষস্য**—জীবের; **সখা**—চিরকালের বন্ধু, **ঈশ্বরঃ**—প্রভু, **যৎ**—যেহেতু; **ন**—কখনই না; **বিজ্ঞায়তে**—জানা যায়, **পুম্ভিঃ**—জীবদের দ্বারা; **নামভিঃ**—নামের দ্বারা; **বা**—অথবা; **ক্রিয়া-গুণৈঃ**—কর্ম অথবা গুণের দ্বারা।

অনুবাদ

অবিজ্ঞাত বলে আমি যাঁকে বর্ণনা করেছি, তিনি হচ্ছেন জীবের নিত্য সুহৃৎ এবং প্রভু। জীব যেহেতু জড় নাম, কার্যকলাপ অথবা গুণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই ভগবান বদ্ধ জীবের কাছে চিরকাল অবিজ্ঞাত থাকেন।

তাৎপর্য

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান বদ্ধ-জীবের কাছে অজ্ঞাত, তাই বৈদিক শাস্ত্রে তাঁকে কখনও কখনও *নিরাকার, অবিজ্ঞাত* অথবা *অবাঙ্‌মনসগোচর* বলে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রূপ, নাম, গুণ, লীলা, পরিকর ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। অবশ্য, পারমার্থিক উন্নতি হলে, মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, নাম, গুণ, লীলা ও পরিকর বুঝতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে তত্ত্বত জানা যায়। পাপ এবং পুণ্য কর্মে লিপ্ত সাধারণ মানুষেরা ভগবানের রূপ, নাম, লীলা ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে

না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা নানাভাবে ভগবানকে জানতে পারেন। তাঁরা জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের ঠিকানা হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সর্বতোভাবে চিন্ময়। যেহেতু বিষয়াসক্ত মানুষেরা ভগবানের রূপ এবং লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাই শাস্ত্রে তাঁকে নিরাকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবানের কোন রূপ নেই। পক্ষান্তরে তার অর্থ হচ্ছে যে, বিষয়াসক্ত কর্মীরা তাঁকে জানতে পারে না। *ব্রহ্মসংহিতায়* সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে তাঁর রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। *পদ্মপুরাণেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"কেউই তার জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তের প্রেমময়ী সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।"

যেহেতু ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাই তাঁকে বলা হয় অধোক্ষজ, অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত'। ভগবদ্ভক্তি বা ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন ভগবানের কৃপায় ভক্ত ভগবান সম্বন্ধে সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই শ্লোকে *পুম্ভির্নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ* বাক্যাংশটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু নাম, লীলা এবং গুণাবলী রয়েছে, যদিও সেগুলির কোনটিই জড় নয়। তাঁর এই সমস্ত নাম, কার্যকলাপ এবং লীলা যদিও শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং ভক্তেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তবুও কর্মীরা তা বুঝতে পারে না। এমন কি জ্ঞানীরা তা বুঝতে পারে না। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর যদিও হাজার-হাজার নাম রয়েছে, তবুও কর্মী ও জ্ঞানীরা ভগবানের সেই সমস্ত নামকে দেব-দেবীদের নামের সঙ্গে এবং মানুষদের নামের সঙ্গে একাকার করে ফেলে। যেহেতু তারা ভগবানের বাস্তবিক নাম বুঝতে পারে না, তাই তারা মনে করে যে, যে-কোন নামকেই ভগবানের নাম বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তারা মনে করে যে, যেহেতু পরম সত্য হচ্ছেন নিরাকার, তাই তারা তাঁকে যে-কোন নামে ডাকতে পারে। আর তা না হলে, তারা মনে করে যে, তাঁর কোন নামই নেই। সেটি তাদের মস্ত বড় ভুল। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ।* রাম, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ, বিষ্ণু, অধোক্ষজ ইত্যাদি ভগবানের বিশেষ নাম রয়েছে। বাস্তবিকই ভগবানের বহু নাম রয়েছে, কিন্তু বদ্ধ জীবেরা তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৪

যদা জিঘৃক্ষন্ পুরুষঃ কার্ৎস্ন্যেন প্রকৃতের্গুণান্ ।
নবদ্বারং দ্বিহস্তাঙ্ঘ্রি তত্রামনুত সাধ্বিতি ॥ ৪ ॥

যদা—যখন; **জিঘৃক্ষন্**—উপভোগ করার বাসনায়; **পুরুষঃ**—জীব; **কার্ৎস্ন্যেন**—পূর্ণরূপে; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণান্**—গুণ; **নব-দ্বারম্**—নয়টি দ্বারসমন্বিত; **দ্বি**—দুই; **হস্ত**—হাত; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **তত্র**—সেখানে; **অমনুত**—তিনি চিন্তা করেছিলেন; **সাধু**—অতি উত্তম; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

জীব যখন পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির গুণগুলি ভোগ করতে চায়, তখন সে বহু শরীরের মধ্যে সেই শরীরটি প্রাপ্ত হতে চায়, যাতে নয়টি দ্বার, দুটি হাত এবং দুটি পা রয়েছে। এইভাবে সে মানুষ অথবা দেবতা হতে চায়।

তাৎপর্য

এখানে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ চিন্ময় জীব কিভাবে তার বাসনা অনুসারে জড় দেহ ধারণ করে। দুহাত, দু'পা ইত্যাদি গ্রহণ করে জীব সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির গুণগুলিকে ভোগ করে। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৭) বলেছেন—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

"হে ভারত (অর্জুন), হে পরন্তপ! ইচ্ছা এবং দ্বেষের দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমস্ত জীব মোহের অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করে।"

মূলত জীব চিন্ময়, কিন্তু সে যখন জড় জগৎকে উপভোগ করতে চায়, তখন সে অধঃপতিত হয়। এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জীব প্রথমে মনুষ্য-শরীর ধারণ করে, এবং তারপর তার জঘন্য কার্যকলাপের ফলে সে ক্রমশ অধঃপতিত হয়ে, নিম্নতর জীবদেহরূপে পশু, বৃক্ষ, জলচর ইত্যাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। ক্রম-বিবর্তনের ফলে জীব পুনরায় মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়ে সংসারচক্র থেকে উদ্ধার লাভের একটি সুযোগ পায়। কিন্তু সেই সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে যদি তার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, তা হলে তাকে পুনরায় বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

জীবের জড় জগতে আসার বাসনা হৃদয়ঙ্গম করা খুব একটা কঠিন নয়। কেউ হয়তো আর্য পরিবারে জন্ম গ্রহণ করতে পারে, যেখানে আমিষাহার, আসবপান, দ্যূতক্রীড়া এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ, তবুও মানুষ এই সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু ভোগ করতে চাইতে পারে। সব সময় কেউ না কেউ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করার জন্য বেশ্যালয়ে যেতে চায় অথবা মাংস আহার এবং সুরাপান করার জন্য হোটেলে যেতে চায়, কিংবা জুয়া খেলার জন্য নাইট ক্লাবে যেতে চায়। জীবের হৃদয়ে এই সমস্ত প্রবণতাগুলি রয়েছে, কিন্তু কোন কোন জীব এই সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে চায়। আর যারা এই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত, তারা অধঃ পতিত হয়। জীব যতই পতিত জীবনের অভিলাষ করে, ততই সে কুৎসিত রূপ ধারণ করে। এটিই হচ্ছে জন্মান্তর এবং বিবর্তনের পন্থা। পশুদের মধ্যে কোন বিশেষ প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল থাকে, কিন্তু মানুষ সব কটি ইন্দ্রিয় উপভোগ করতে পারে। মানুষের মধ্যে সুখভোগের জন্য সব কটি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। যথাযথভাবে শিক্ষালাভ না করলে, মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের শিকার হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবে মোহিত হয়ে, জীব নিজেকে সমস্ত কর্মের কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সম্পন্ন হয় প্রকৃতির দ্বারা।" জীব যখনই তার ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের বাসনা করে, তৎক্ষণাৎ সে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং জন্মমৃত্যুর চক্রে পতিত হয়।

শ্লোক ৫

বুদ্ধিং তু প্রমদাং বিদ্যান্মমাহমিতি যৎকৃতম্ ।
যামধিষ্ঠায় দেহেঽস্মিন্ পুমান্ ভুঙ্‌ক্তেঽক্ষভির্গুণান্ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিম্—বুদ্ধি; **তু**—তখন; **প্রমদাম্**—তরুণী (পুরঞ্জনী); **বিদ্যাৎ**—জানা উচিত; **মম**—আমার; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ-কৃতম্**—বুদ্ধির দ্বারা কৃত; **যাম্**—যে বুদ্ধি; **অধিষ্ঠায়**—শরণ গ্রহণ করে; **দেহে**—শরীরে; **অস্মিন্**—এই; **পুমান্**—জীব; **ভুঙ্‌ক্তে**—সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে; **অক্ষভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির গুণ।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত প্রমদা শব্দটি জড়-বুদ্ধি বা অবিদ্যাকে বোঝায়। বুঝতে হবে যে, কেউ যখন এই বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। "আমি" এবং "আমার" এই জড় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে শুরু করে। এইভাবে জীব বদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

জড় অস্তিত্বের তথাকথিত বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা। বুদ্ধি যখন নির্মল হয়, তখন তাকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ. পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বুদ্ধি যখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার অধীন হয়, তখন তাকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগ। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/১০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং প্রীতিসহকারে আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে আসতে পারে।"

প্রকৃত বুদ্ধি হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তা যখন হয়, তখন অন্তর থেকে ভগবান প্রকৃত বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা জীব তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এই শ্লোকে জড়-জাগতিক বুদ্ধিকে *প্রমদা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ জড় জগতে জীব সবকিছুর উপর প্রভুত্ব করার মিথ্যা অভিমান করে। সে মনে করে, "আমি হচ্ছি সারা জগতের একচ্ছত্র সম্রাট।" এটিই হচ্ছে অবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে, কোন কিছুই তার নয়। এমন কি তার দেহ এবং তার ইন্দ্রিয়গুলিও তার নয়, কারণ সেগুলি তার বিভিন্ন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কৃপা করে ভগবান জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে তাকে দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই জীবের নয়, কিন্তু জীব "এগুলি আমার। এগুলি আমার। এগুলি আমার" বলে পাগলের মতো সব কিছু দাবি করে। *জনস্য মোহহয়ম্ অহং মমেতি।* এটিই হচ্ছে মোহ। কোন কিছুই জীবের নয়, কিন্তু সে দাবি করে যে, সব কিছু তার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, এই ভ্রান্ত বুদ্ধি যেন নির্মল করা হয় (*চেতো-দর্পণ-মার্জনম্*)। চিত্তরূপ দর্পণ যখন পরিষ্কার করা হয়, তখন জীবের প্রকৃত কার্যকলাপ শুরু হয়। অর্থাৎ কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসে,

তখন তার প্রকৃত বুদ্ধি ক্রিয়া করে। তখন সে বুঝতে পারে যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের এবং কোন কিছুই তার নয়। যতক্ষণ সে মনে করে যে, সব কিছুই তার, ততক্ষণ সে জড় চেতনায় থাকে, এবং যখন সে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের, তখন সে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৬

সখায় ইন্দ্রিয়গণা জ্ঞানং কর্ম চ যৎকৃতম্ ।
সখ্যস্তদ্বৃত্তয়ঃ প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তির্যথোরগঃ ॥ ৬ ॥

সখায়ঃ—সখা, **ইন্দ্রিয়-গণাঃ**—ইন্দ্রিয় সমূহ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—ও; **যৎ-কৃতম্**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত; **সখ্যঃ**—সখী; **তৎ**—ইন্দ্রিয়ের; **বৃত্তয়ঃ**—বৃত্তি; **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু; **পঞ্চ-বৃত্তিঃ**—পাঁচটি বৃত্তি সমন্বিত; **যথা**—যেমন, **উরগঃ**—সর্প।

অনুবাদ

পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পুরঞ্জনীর সখা। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি হচ্ছে তার সখী, এবং যে পঞ্চশিরা সর্পের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে পঞ্চবৃত্তিশালী প্রাণবায়ু।

তাৎপর্য

কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥ (*প্রেমবিবর্ত*)

জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনার ফলে, জীব সূক্ষ্ম এবং স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে তাকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সুযোগ দেওয়া হয়। তাই ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে জড় জগৎকে ভোগ করার যন্ত্র; সেই জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে এখানে সখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও অত্যধিক পাপকর্ম করার ফলে জীব স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয় না, তাই তাকে সূক্ষ্ম স্তরে বিচরণ করতে হয়। তাদের বলা হয় প্রেতাত্মা। স্থূল শরীব না পাওয়ার ফলে, তারা তাদের সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে নানা রকম উৎপাত করে। তাই স্থূল শরীরবিশিষ্ট মানুষদের কাছে ভূতপ্রেতের উপস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১০) উল্লেখ করা হয়েছে—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥

"মূর্খ মানুষেরা বুঝতে পাবে না জীব কিভাবে দেহত্যাগ করে এবং জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে তারা যে কি রকম শরীর উপভোগ করে, তাও তারা বুঝতে পাবে না। কিন্তু যাঁদের জ্ঞানচক্ষু রয়েছে, তাঁরা এই সব কিছুই দর্শন করতে পারেন।"

জীব প্রাণবায়ুতে লীন হয়ে আছে, যা সঞ্চালনের জন্য বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। সেই পঞ্চ বায়ু হচ্ছে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান, এবং যেহেতু প্রাণবায়ু এই পাঁচভাবে ক্রিয়া করে, তাই পঞ্চশিরা সর্পের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। আত্মা কুণ্ডলিনীচক্র দিয়ে সাপের মতো বক্র-গতিতে গমন করে। প্রাণবায়ুকে উরগ বা সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। *পঞ্চবৃত্তি* হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করার বাসনা। ইন্দ্রিয়ের সেই বিষয়গুলি হচ্ছে—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ এবং স্পর্শ।

শ্লোক ৭

বৃহদ্বলং মনো বিদ্যাদুভয়েন্দ্রিয়নায়কম্ ।
পঞ্চালাঃ পঞ্চ বিষয়া যন্মধ্যে নবখং পুরম্ ॥ ৭ ॥

বৃহৎ-বলম্—অত্যন্ত শক্তিশালী, **মনঃ**—মন; **বিদ্যাৎ**—জানা উচিত; **উভয়-ইন্দ্রিয়**—উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়; **নায়কম্**—অধিপতি, **পঞ্চালাঃ**—পঞ্চাল রাজ্য; **পঞ্চ**—পাঁচ; **বিষয়াঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **যৎ**—যার; **মধ্যে**—ভিতরে; **নব-খম্**—নয়টি ছিদ্র সমন্বিত; **পুরম্**—নগরী।

অনুবাদ

একাদশতম সেবক হচ্ছে অন্যদের অধিপতি মন। এই মন কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়েরই অধিপতি। পঞ্চালরাজ্য হচ্ছে সেই পরিবেশ, যেখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগ করা হয়। এই পঞ্চালরাজ্যের ভিতরে রয়েছে নবদ্বার সমন্বিত এই দেহরূপ নগরী।

তাৎপর্য

মন সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র, এবং তাই তাকে এখানে *বৃহদ্বল* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, মানুষকে মনের সংযম করতে হয়।

শিক্ষা অনুসারে মন জীবের বন্ধু হতে পারে আবার শত্রুও হতে পারে। কেউ যদি একজন ভাল কার্যাধ্যক্ষ পায়, তা হলে তার ব্যবসা খুব ভালভাবে চলে, কিন্তু কার্যাধ্যক্ষ যদি চোর হয়, তা হলে তার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়। তেমনই, এই জড় জগতে বদ্ধ জীব তার মনকে আমমোক্তারনামা (power of attorney) দিয়েছে। তার ফলে তার মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। শ্রীল অম্বরীষ মহারাজ তাই প্রথমে তাঁর মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিযুক্ত করেছেন। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ।* মন যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় *যম,* যার অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়-দমন'। যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে পারেন, তাঁকে বলা হয় *গোস্বামী,* কিন্তু যে তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাকে বলা হয় *গোদাস।* মন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ পরিচালনা করে, যা বিভিন্ন ছিদ্রের দ্বারা ব্যক্ত হয়। তার বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৮

অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ মুখং শিশ্নগুদাবিতি ।
দ্বে দ্বে দ্বারৌ বহির্যাতি যস্তদিন্দ্রিয়সংযুতঃ ॥ ৮ ॥

অক্ষিণী—দুটি চক্ষু, **নাসিকে**—দুটি নাসারন্ধ্র, **কর্ণৌ**—দুটি কর্ণ, **মুখম্**—মুখ; **শিশ্ন**—উপস্থ, **গুদৌ**—মলদ্বার; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বে**—দুটি; **দ্বে**—দুটি; **দ্বারৌ**—দ্বার; **বহিঃ**—বাইরে, **যাতি**—যায়; **যঃ**—যে; **তৎ**—দ্বারগুলি দিয়ে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **সংযুতঃ**—সঙ্গে।

অনুবাদ

চক্ষু, নাসিকা এবং কর্ণ—এই দ্বারগুলি দুটি দুটি করে একস্থানে অবস্থিত। মুখ, উপস্থ এবং পায়ুও হচ্ছে বিভিন্ন দ্বার। এই নবদ্বার সমন্বিত শরীরে স্থিত হয়ে, জীব এই জড় জগতে বহির্মুখী কার্য করে এবং রূপ, রস আদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে।

তাৎপর্য

জীব তার চিন্ময় স্থিতি বিস্মৃত হয়ে মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, জড় বিষয় ভোগ করার জন্য এই নয়টি দ্বার দিয়ে বহির্মুখী হয়। দীর্ঘকাল জড় বিষয়ের সঙ্গ করার

ফলে, সে তার প্রকৃত চিন্ময় কর্তব্যের কথা ভুলে যায় এবং এইভাবে বিভ্রান্ত হয়। সারা পৃথিবী আজ বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের মতো তথাকথিত নেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে, যাদের আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। তার ফলে বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের বন্ধনে আরও গভীরভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

শ্লোক ৯

অক্ষিণী নাসিকে আস্যমিতি পঞ্চপুরঃ কৃতাঃ ।
দক্ষিণা দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরা চোত্তরঃ স্মৃতঃ ।
পশ্চিমে ইত্যধোদ্বারৌ গুদং শিশ্নমিহোচ্যতে ॥ ৯ ॥

অক্ষিণী—দুটি চক্ষু; **নাসিকে**—দুটি নাসিকা; **আস্যম্**—মুখ, **ইতি**—এইভাবে; **পঞ্চ**—পাঁচ; **পুরঃ**—সম্মুখে; **কৃতাঃ**—নির্মিত; **দক্ষিণা**—দক্ষিণ দ্বার; **দক্ষিণঃ**—দক্ষিণ; **কর্ণঃ**—কান; **উত্তরা**—উত্তর দিকস্থ দ্বার; **চ**—ও; **উত্তরঃ**—বাম কর্ণ; **স্মৃতঃ**—বলা হয়; **পশ্চিমে**—পশ্চিম দিকে; **ইতি**—এইভাবে; **অধঃ**—নিম্নদিকে; **দ্বারৌ**—দুটি দ্বার; **গুদম্**—পায়ু; **শিশ্নম্**—উপস্থ; **ইহ**—এখানে; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

দুটি চক্ষু, দুটি নাসারন্ধ্র এবং একটি মুখ, এই পাঁচটি দ্বার সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। দক্ষিণ কর্ণকে দক্ষিণ দিকস্থ দ্বার বলে মনে করা হয়, বাম কর্ণকে উত্তর দিকস্থ দ্বার বলা হয়। পশ্চিম দিকস্থ দুটি দ্বার হচ্ছে পায়ু এবং উপস্থ।

তাৎপর্য

সমস্ত দিকের মধ্যে পূর্বদিককে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়, তার মুখ্য কারণ হচ্ছে যে, পূর্বদিকে সূর্যোদয় হয়। তাই শরীরের পূর্বদিকস্থ দ্বারগুলি—চক্ষু, নাসিকা এবং মুখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ১০

খদ্যোতাবির্মুখী চাত্র নেত্রে একত্র নির্মিতে ।
রূপং বিভ্রাজিতং তাভ্যাং বিচষ্টে চক্ষুষেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

খদ্যোতা—খদ্যোতা নামক; **আবির্মুখী**—আবির্মুখী নামক; **চ**—ও; **অত্র**—এখানে; **নেত্রে**—দুটি চক্ষু; **একত্র**—এক স্থানে; **নির্মিতে**—নির্মিত; **রূপম্**—রূপ;

বিভ্রাজিতম্—বিভ্রাজিত (উজ্জ্বল); **তাভ্যাম্**—চক্ষুর দ্বারা; **বিচষ্টে**—উপলব্ধি করে; **চক্ষুষা**—দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

খদ্যোতা এবং আবির্মুখী নামক যে দুটি দ্বারের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে শরীরের এক স্থানে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি চক্ষু। বিভ্রাজিত নামক যে জনপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে রূপ বলে জানবে। এইভাবে চক্ষু দুটি সর্বদা বিভিন্ন প্রকার রূপ দর্শনে মগ্ন।

তাৎপর্য

চক্ষু দুটি আলোক ইত্যাদি উজ্জ্বল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, পতঙ্গ আগুনের ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাতে প্রবেশ করে। তেমনই, জীবের চক্ষু দুটি উজ্জ্বল এবং সুন্দর রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পতঙ্গ যেমন আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, মানুষও তেমন রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১১

নলিনী নালিনী নাসে গন্ধঃ সৌরভ উচ্যতে ।
ঘ্রাণোঽবধূতো মুখ্যাস্যং বিপণো বাগ্রসবিদ্রসঃ ॥ ১১ ॥

নলিনী—নলিনী নামক; **নালিনী**—নালিনী নামক; **নাসে**—দুটি নাসারন্ধ্র; **গন্ধঃ**—সুগন্ধ; **সৌরভঃ**—সৌরভ; **উচ্যতে**—বলা হয়; **ঘ্রাণঃ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **অবধূতঃ**—অবধূত নামক; **মুখ্যা**—মুখ্যা নামক; **আস্যম্**—মুখ; **বিপণঃ**—বিপণ নামক; **বাক্**—বাণী; **রস-বিৎ**—রসজ্ঞ, **রসঃ**—রসনেন্দ্রিয়।

অনুবাদ

নলিনী এবং নালিনী নামক যে দুটি দ্বারের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে দুটি নাসারন্ধ্র। সৌরভদেশ বলে যার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে গন্ধ। অবধূত নামে তার যে সঙ্গীর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। মুখ্যা নামক যে দ্বারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে মুখ এবং বিপণ হচ্ছে বাগিন্দ্রিয়। রসজ্ঞ হচ্ছে রসনেন্দ্রিয়।

তাৎপর্য

অবধূত শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বতোভাবে মুক্ত'। কেউ যখন *অবধূত* স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি সমস্ত বিধিবিধানের অতীত হন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তখন তিনি তাঁর ইচ্ছামতো আচরণ করতে পারেন। এই *অবধূত* অবস্থা ঠিক বায়ুর মতো, যা কোন রকম প্রতিবন্ধকের দ্বারা প্রতিহত হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৩৪) বলা হয়েছে—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥

"মন অত্যন্ত চঞ্চল, দুর্দান্ত, দুর্দম এবং অত্যন্ত বলবান, হে কৃষ্ণ! আমার মনে হয় যে, এই মনকে বশ করা বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার থেকেও কঠিন।"

ঠিক যেমন বায়ুকে কেউই রোধ করতে পারে না, তেমনই একত্রে অবস্থিত দুটি নাসারন্ধ্রও অপ্রতিহতভাবে সৌরভ উপভোগ করে। জিহ্বার উপস্থিতির ফলে, মুখ সব রকম খাদ্যের স্বাদ নিরন্তর উপভোগ করে।

শ্লোক ১২

আপণো ব্যবহারোঽত্র চিত্রমন্ধো বহূদনম্ ।
পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥

আপণঃ—আপণ নামক; **ব্যবহারঃ**—জিহ্বার কার্য, **অত্র**—এখানে, **চিত্রম্**—সর্বপ্রকার; **অন্ধঃ**—খাদ্য; **বহূদনম্**—বহূদন নামক; **পিতৃ-হূঃ**—পিতৃহূ নামক; **দক্ষিণঃ**—দক্ষিণ; **কর্ণঃ**—কর্ণ; **উত্তরঃ**—বাম; **দেব-হূঃ**—দেবহূ; **স্মৃতঃ**—কথিত।

অনুবাদ

আপণ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাষণ, এবং বহূদন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য। দক্ষিণ কর্ণকে বলা হয় পিতৃহূ দ্বার, এবং বাম কর্ণকে বলা হয় দেবহূ দ্বার।

শ্লোক ১৩

প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ শাস্ত্রং পঞ্চালসংজ্ঞিতম্ ।
পিতৃযানং দেবযানং শ্রোত্রাচ্ছ্রুতধরাদ্‌ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥

প্রবৃত্তম্—ইন্দ্রিয় সুখভোগের পন্থা; **চ**—ও; **নিবৃত্তম্**—অনাসক্ত হওয়ার পন্থা, **চ**—ও; **শাস্ত্রম্**—শাস্ত্র; **পঞ্চাল**—পঞ্চাল; **সংজ্ঞিতম্**—নামে অভিহিত; **পিতৃ-যানম্**—পিতৃলোকে গমন করে; **দেব-যানম্**—দেবলোকে গমন করে; **শ্রোত্রাৎ**—শ্রবণ করার দ্বারা, **শ্রুত-ধরাৎ**—শ্রুতধর নামক সঙ্গীর দ্বারা, **ব্রজেৎ**—উন্নীত হতে পারে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—দক্ষিণ পঞ্চাল নামক যে নগরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার দ্বারা সকাম কর্মজনিত ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের কর্মকাণ্ডাত্মক প্রবৃত্তি মার্গের শাস্ত্রসমূহকে বুঝানো হয়েছে। উত্তর পঞ্চাল নামক অন্য নগরীটির দ্বারা নিবৃত্তি প্রতিপাদক জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রসমূহকে বোঝানো হয়েছে। জীব দুই কর্ণের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এবং কোন জীব পিতৃলোকে এবং কোন জীব দেবলোকে উন্নীত হয়। তা সম্ভব হয় দুটি কর্ণের দ্বারা।

তাৎপর্য

বেদকে বলা হয় *শ্রুতি*, এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে বলা হয় *শ্রুতধর*। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মানুষ কেবল শ্রবণের মাধ্যমে দেবলোক, পিতৃলোক, এমন কি বৈকুণ্ঠলোকে পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

আসুরী মেঢ্রমর্বাগ্দ্বার্ব্যবায়ো গ্রামিণাং রতিঃ ।
উপস্থো দুর্মদঃ প্রোক্তো নির্ঋতির্গুদ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

আসুরী—আসুরী নামক; **মেঢ্রম্**—উপস্থ, **অর্বাক্**—মূর্খ এবং দুষ্টদের; **দ্বাঃ**—দ্বার, **ব্যবায়ঃ**—স্ত্রীসঙ্গ; **গ্রামিণাম্**—সাধারণ মানুষদের; **রতিঃ**—আসক্তি, **উপস্থঃ**—জননেন্দ্রিয়; **দুর্মদঃ**—দুর্মদ; **প্রোক্তঃ**—বলা হয়; **নির্ঋতিঃ**—নির্ঋতি; **গুদঃ**—পায়ু, **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

আসুরী (মেঢ্র) নামক নিম্নবর্তী দ্বার দিয়ে গ্রামক নামক যে জনপদে গমন করা হয়, তা হচ্ছে স্ত্রীসঙ্গজনিত সুখ, যা মূর্খ ও নীচ সাধারণ মানুষদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। জননেন্দ্রিয়কে বলা হয় দুর্মদ, এবং পায়ুকে বলা হয় নির্ঋতি।

তাৎপর্য

মানব-সমাজ যখন অধঃপতিত হয়, তখন সভ্যতা আসুরিক হয়ে যায়, এবং সাধারণ মানুষ উপস্থ ও পায়ুকে তাদের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করে। এমন কি বৃন্দাবনের মতো পবিত্র স্থানেও মূর্খ মানুষেরা পায়ু এবং উপস্থের ব্যবসাকে আধ্যাত্মিক কার্য বলে প্রচার করে। এই প্রকার মানুষদের বলা হয় সহজিয়া। তাদের মত হচ্ছে যে, মৈথুনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, মৈথুন সুখ কেবল *অর্বাক্* অর্থাৎ সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের জন্য। এই সমস্ত দুষ্কৃতকারী ও মূর্খদের সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন। এই শ্লোকগুলিতে সাধারণ মানুষের যৌন সুখভোগের বাসনার নিন্দা করা হয়েছে। *দুর্মদ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিপথগামী', এবং *নির্ঋতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পাপকর্ম'। এই শ্লোকে যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণ মানুষের পরিপ্রেক্ষিতেও স্ত্রীসঙ্গ নিন্দনীয় এবং তা তাদের বিপথে পরিচালিত করে, তবুও সহজিয়ারা নিজেদেরকে পারমার্থিক কার্যকলাপে লিপ্ত ভগবদ্ভক্ত বলে প্রচার করতে চেষ্টা করে। তাই আজকাল আর বুদ্ধিমান মানুষেরা বৃন্দাবনে যায় না। অনেক সময় অনেকে আমাদের প্রশ্ন করবে, কেন আমরা বৃন্দাবনে আমাদের কেন্দ্র স্থাপন করেছি। বাহ্যিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, এই সমস্ত সহজিয়াদের কার্যকলাপের ফলে বৃন্দাবন আজ অধঃপতিত হয়েছে, তবুও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, বৃন্দাবন হচ্ছে একমাত্র স্থান যেখানে এই সমস্ত পাপীরা কুকুর, শূকর এবং বানররূপে জন্মগ্রহণ করে তাদের বিকৃত মনোবৃত্তির সংশোধন করার সুযোগ লাভ করতে পারে। বৃন্দাবনে কুকুর, শূকর অথবা বানররূপে বাস করে জীব পরবর্তী জীবনে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ১৫

বৈশসং নরকং পায়ুর্লুব্ধকোঽন্ধৌ তু মে শৃণু ।
হস্তপাদৌ পুমাংস্তাভ্যাং যুক্তো যাতি করোতি চ ॥ ১৫ ॥

বৈশসম্—বৈশস নামক; **নরকম্**—নরক; **পায়ুঃ**—পায়ু নামক কর্মেন্দ্রিয়; **লুব্ধকঃ**—লুব্ধক নামক (অত্যন্ত লোভী); **অন্ধৌ**—অন্ধ; **তু**—তখন; **মে**—আমাকে; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **হস্ত-পাদৌ**—হস্ত এবং পদ; **পুমান্**—জীব; **তাভ্যাম্**—তাদের সঙ্গে; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **যাতি**—যায়; **করোতি**—করে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পুরঞ্জন বৈশস নামক স্থানে যেতেন বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি নরকে যেতেন। তাঁর সহচর লুব্ধক হচ্ছে পায়ু নামক কর্মেন্দ্রিয়। পূর্বে আমি দুজন অন্ধ সহচরের কথাও বলেছি। তারা হচ্ছে হাত এবং পা। হাত এবং পায়ের সাহায্যে জীব সব রকম কর্ম করে এবং ইতস্তত বিচরণ করে।

শ্লোক ১৬

অন্তঃপুরং চ হৃদয়ং বিষূচির্মন উচ্যতে ।
তত্র মোহং প্রসাদং বা হর্ষং প্রাপ্নোতি তদ্‌গুণৈঃ ॥ ১৬ ॥

অন্তঃ-পুরম্—অন্তঃপুর; **চ**—এবং; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **বিষূচিঃ**—বিষূচীন নামক ভৃত্য; **মনঃ**—মন; **উচ্যতে**—বলা হয়; **তত্র**—সেখানে; **মোহম্**—মোহ; **প্রসাদম্**—সন্তোষ; **বা**—অথবা; **হর্ষম্**—হর্ষ; **প্রাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **তৎ**—মনের; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণের দ্বারা।

অনুবাদ

অন্তঃপুর বলতে হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে। বিষূচীন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বত্রগামী', এবং তা এখানে মনকে বুঝাচ্ছে। জীব তার মনের মধ্যে প্রকৃতির গুণের প্রভাবসমূহ ভোগ করে। এই প্রভাবগুলি কখনও মোহ, কখনও সন্তোষ এবং কখনও হর্ষ উৎপাদন করে।

তাৎপর্য

জড় জগতে জীবের মন ও বুদ্ধি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং গুণের প্রভাবে মন ইতস্তত বিচরণ করে। সেই অনুসারে হৃদয় সন্তোষ, হর্ষ অথবা মোহ অনুভব করে। প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় জীব নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণগুলি তার মন ও হৃদয়ে কার্য করে, এবং তার ফলে জীব সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করে। সেই কথা স্পষ্টভাবে *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীবাত্মা নিজেকে কর্তা বলে অভিমান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই সম্পাদিত হয় প্রকৃতির দ্বারা।"

শ্লোক ১৭

যথা যথা বিক্রিয়তে গুণাক্তো বিকরোতি বা ।
তথা তথোপদ্রষ্টাত্মা তদ্‌বৃত্তীরনুকার্যতে ॥ ১৭ ॥

যথা যথা—ঠিক যেভাবে; **বিক্রিয়তে**—বিক্ষুব্ধ হয়; **গুণ-অক্তঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণে লিপ্ত, **বিকরোতি**—যেভাবে তা করে; **বা**—অথবা; **তথা তথা**—তেমন, তদনুরূপ; **উপদ্রষ্টা**—দর্শক; **আত্মা**—আত্মা; **তৎ**—বুদ্ধির; **বৃত্তীঃ**—বৃত্তি; **অনুকার্যতে**—অনুকরণ করে।

অনুবাদ

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মহিষী হচ্ছেন বুদ্ধি। স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় থেকে বুদ্ধি বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কলুষিত বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব দর্শকরূপে বুদ্ধিরই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অনুকরণ করে।

তাৎপর্য

পুরঞ্জনের মহিষীকে এখানে বুদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বপ্ন এবং জাগরণ উভয় অবস্থাতেই বুদ্ধি ক্রিয়া করে, কিন্তু তা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত। বুদ্ধি যেহেতু কলুষিত, তাই জীবও কলুষিত। বদ্ধ অবস্থায় জীব তার কলুষিত বুদ্ধি অনুসারে কার্য করে। যদিও সে কেবল দর্শক মাত্র, তবুও তার কলুষিত বুদ্ধির প্রভাবে সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে নিষ্ক্রিয়।

শ্লোক ১৮-২০

দেহো রথস্ত্বিন্দ্রিয়াশ্বঃ সংবৎসররয়োঽগতিঃ ।
দ্বিকর্মচক্রস্ত্রিগুণধ্বজঃ পঞ্চাসুবন্ধুরঃ ॥ ১৮ ॥
মনোরশ্মির্বুদ্ধিসূতো হৃন্নীড়ো দ্বন্দ্বকূবরঃ ।
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ ॥ ১৯ ॥
আকূতির্বিক্রমো বাহ্যো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ।
একাদশেন্দ্রিয়চমূঃ পঞ্চসূনাবিনোদকৃৎ ॥ ২০ ॥

দেহঃ—শরীর; **রথঃ**—রথ; **তু**—কিন্তু; **ইন্দ্রিয়**—জ্ঞানেন্দ্রিয়; **অশ্বঃ**—ঘোড়া; **সংবৎসর**—সমগ্র বৎসর; **রয়ঃ**—আয়ু; **অগতিঃ**—গতিহীন; **দ্বি**—দুই; **কর্ম**—কর্ম;

চক্রঃ—চক্র, **ত্রি**—তিন, **গুণ**—প্রকৃতির গুণ, **ধ্বজঃ**—পতাকা, **পঞ্চ**—পাঁচ, **অসু**—প্রাণবায়ু; **বন্ধুরঃ**—বন্ধন, **মনঃ**—মন, **রশ্মিঃ**—রজ্জু; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি, **সূতঃ**—সারথি, **হৃৎ**—হৃদয়, **নীড়ঃ**—বসার স্থান, **দ্বন্দ্ব**—দ্বৈতভাব, **কূবরঃ**—যূপবন্ধন দণ্ড, **পঞ্চ**—পাঁচ; **ইন্দ্রিয় অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়, **প্রক্ষেপঃ**—অস্ত্র, **সপ্ত**—সাত; **ধাতু**—ধাতু; **বরূথকঃ**—আবরণ, **আকৃতিঃ**—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের প্রচেষ্টা, **বিক্রমঃ**—শৌর্য বা পন্থা, **বাহ্যঃ**—বাহ্যিক, **মৃগ-তৃষ্ণাম্**—মিথ্যা আশা, **প্রধাবতি**—ধাবিত হয়, **একাদশ**—এগার, **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **চমূঃ**—সৈন্য; **পঞ্চ**—পাঁচ, **সূনা**—ঈর্ষা; **বিনোদ**—আনন্দ, **কৃৎ**—করে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—যাকে আমি রথ বলে বর্ণনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে এই শরীর। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে সেই রথের ঘোড়া। সংবৎসরের মতো তাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাদের কোন গতি নেই। পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে সেই রথের দুটি চাকা। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সেই রথের পতাকা। পঞ্চ প্রাণেন্দ্রিয় জীবের বন্ধন, এবং মন হচ্ছে তার রশ্মি। বুদ্ধি সেই রথের সারথি। হৃদয় রথের উপবেশন স্থান, এবং সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বভাব যূপবন্ধনের স্থান। সপ্তধাতু সেই রথের আবরণ, এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় তার বাহ্য বিক্রম। একাদশ ইন্দ্রিয় সেই পুরুষের সৈনিক। ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হয়ে জীব সেই রথে আরূঢ় হয়ে তার ভ্রান্ত বাসনা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা করে, এবং জন্ম-জন্মান্তর ধরে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে জীবের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনাজনিত বন্ধন খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। *সংবৎসর* শব্দটি যার অর্থ হচ্ছে 'কালের প্রগতি', অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, জীব রথের প্রগতিতে জড়িয়ে পড়ে। রথ দুটি চাকার উপর স্থিত, যা হচ্ছে পুণ্য এবং পাপকর্ম। জীব তার পাপ এবং পুণ্যকর্ম অনুসারে বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিভিন্ন দেহে তার দেহান্তরকে প্রগতি বলে মনে করা উচিত নয়। যথার্থ প্রগতির বিশ্লেষণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) করা হয়েছে। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—প্রকৃত প্রগতি তখনই হয় যখন অন্য আর একটি জড় শরীর গ্রহণ করতে হয় না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ১৯/১৩৮) বলা হয়েছে—

এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥

জীব বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীরে জন্মগ্রহণ করে, সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে। এইভাবে কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কখনও নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়, কিন্তু সেটি প্রকৃত প্রগতি নয়। প্রকৃত প্রগতি হচ্ছে সর্বতোভাবে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৮/১৬) বলা হয়েছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"এই জড় জগতে সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত সবই হচ্ছে দুঃখভোগের স্থান, সেখানে পুনঃপুনঃ জন্ম এবং মৃত্যু হয়। কিন্তু, হে কৌন্তেয়! আমার ধাম প্রাপ্ত হলে, আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।" কেউ যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও উন্নীত হয়, তা হলেও তাকে পুনরায় নিম্নতর লোকে ফিরে আসতে হয়। এইভাবে জীব প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবে নিরন্তর উপরে-নীচে ভ্রমণ করছে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে সে মনে করে যে, তার প্রগতি হচ্ছে। তার অবস্থা দিবারাত্র পৃথিবী পরিক্রমাকারী একটি বিমানের মতো যেটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যেতে অক্ষম। প্রকৃতপক্ষে সেই বিমানের কোন প্রগতি হচ্ছে না, কারণ তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আবদ্ধ।

রাজা যেমন রথে উপবেশন করেন, তেমনই জীবও দেহে উপবিষ্ট। এই দেহে জীবের উপবেশন স্থান হচ্ছে হৃদয়, এবং সেখানে উপবিষ্ট হয়ে সে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন প্রগতি হয় না। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের বর্ণনায়—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের প্রভাবে জীব অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে, এবং জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। সে নানা প্রকার গর্হিত খাদ্য ভক্ষণ করে, এবং ইন্দ্রিয়-সুখভোগের কার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে নিন্দিত হয়। কেউ যদি সত্য-সত্যই প্রগতিসাধন করতে চায়, তা হলে তাকে কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ডের পন্থা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। কৃষ্ণভাবনায় স্থিত হলে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন এবং অর্থহীন জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে *মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি*

শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ জীব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তৃষ্ণার্ত। তার অবস্থা ঠিক মরুভূমিতে জলের অন্বেষণকারী মৃগের মতো। মরুভূমিতে কোনও পশুর জলের অন্বেষণ করা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে মরুভূমিতে জল নেই, এবং মরুভূমিতে জলের অন্বেষণ করতে করতে পশুকে অবশেষে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সকলেই ভবিষ্যৎ সুখের পরিকল্পনা করে মনে করছে যে, কোন না কোনভাবে যদি কোন স্তরে আসা যায়, তা হলে সে সুখী হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে যখন সেই স্তর প্রাপ্ত হয়, তখন সে দেখতে পায় যে, সেখানে কোন সুখ নেই। এইভাবে সে ক্রমশ এক স্তর থেকে আর এক স্তরে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করে। তাকে বলা হয় *মৃগতৃষ্ণা*, এবং তার ভিত্তি হচ্ছে এই জড় জগতে ইন্দ্রিয় সুখভোগ।

শ্লোক ২১

সংবৎসরশ্চণ্ডবেগঃ কালো যেনোপলক্ষিতঃ ।
তস্যাহানীহ গন্ধর্বা গন্ধর্ব্যো রাত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ।
হরন্ত্যায়ু পরিক্রান্ত্যা ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥ ২১ ॥

সংবৎসরঃ—বছর; **চণ্ড-বেগঃ**—চণ্ডবেগ নামক; **কালঃ**—কাল; **যেন**—যার দ্বারা; **উপলক্ষিতঃ**—প্রতীকস্বরূপ; **তস্য**—আয়ুর; **অহানি**—দিন, **ইহ**—এই জীবনে; **গন্ধর্বাঃ**—গন্ধর্বগণ; **গন্ধর্ব্যঃ**—গন্ধর্বীগণ; **রাত্রয়ঃ**—রাত্রি; **স্মৃতাঃ**—মনে করা হয়; **হরন্তি**—হরণ করে; **আয়ুঃ**—আয়ু; **পরিক্রান্ত্যা**—ভ্রমণ করে; **ষষ্টি**—ষাট; **উত্তর**—অধিক; **শত**—শত; **ত্রয়ম্**—তিন।

অনুবাদ

যাকে চণ্ডবেগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী কাল। দিন এবং রাত্রিকে যথাক্রমে গন্ধর্ব এবং গন্ধর্বী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিন শত ষাট দিন এবং রাত্রি সমন্বিত সংবৎসর ক্রমশ মানুষের আয়ু হরণ করে।

তাৎপর্য

পরিক্রান্ত্যা শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভ্রমণ করে'। জীব তার রথে চড়ে তিন শত ষাট দিন এবং রাত্রি সমন্বিত বছর ধরে ভ্রমণ করে। জীবনের এই তিন শত ষাট দিন এবং রাত্রি অতিবাহিত করার বৃথা শ্রমকে জীবনের প্রগতি বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ২২

কালকন্যা জরা সাক্ষাল্লোকস্তাং নাভিনন্দতি ।
স্বসারং জগৃহে মৃত্যুঃ ক্ষয়ায় যবনেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥

কাল-কন্যা—কালের কন্যা; **জরা**—বার্ধক্য; **সাক্ষাৎ**—প্রকটরূপে; **লোকঃ**—সমস্ত জীব; **তাম্**—তার; **ন**—কখনই না; **অভিনন্দতি**—স্বাগত জানায়; **স্বসারম্**—তাঁর ভগিনীরূপে; **জগৃহে**—গ্রহণ করে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ক্ষয়ায়**—বিনাশ করার জন্য; **যবন-ঈশ্বরঃ**—যবনরাজ।

অনুবাদ

যাকে কালকন্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে বৃদ্ধাবস্থা। কেউই জরাগ্রস্ত হতে চায় না, কিন্তু সাক্ষাৎ যবনরাজ মৃত্যু জরাকে তাঁর ভগিনীরূপে স্বীকার করেছেন।

তাৎপর্য

দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীব কালকন্যা বা জরাকে মৃত্যুর পূর্বে স্বীকার করে। যবনরাজ হচ্ছেন মৃত্যুর প্রতীক যমরাজ। যমালয়ে যাওয়ার পূর্বে জীবকে জরা অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা স্বীকার করতে হয়। মানুষকে তার পাপকর্মের ফলে যবনরাজ এবং তাঁর ভগ্নীর দ্বারা প্রভাবিত হতে হয়। নারদ মুনির নির্দেশে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁদের কখনও যমরাজ এবং তাঁর ভগ্নী জরার দ্বারা প্রভাবিত হতে হয় না। কেউ যদি কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেন, তা হলে তিনি মৃত্যুকে জয় করতে পারেন। জড় দেহ ত্যাগ করার পর, তাঁকে আর অন্য একটি জড় শরীর ধারণ করতে হয় না। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। তা *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৩-২৫

আধয়ো ব্যাধয়স্তস্য সৈনিকা যবনাশ্চরাঃ ।
ভূতোপসর্গাশুরয়ঃ প্রজ্বারো দ্বিবিধো জ্বরঃ ॥ ২৩ ॥
এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্দৈবভূতাত্মসম্ভবৈঃ ।
ক্লিশ্যমানঃ শতং বর্ষং দেহে দেহী তমোবৃতঃ ॥ ২৪ ॥
প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্মানাত্মন্যধ্যস্য নির্গুণঃ ।
শেতে কামলবান্ধ্যায়ন্মমাহমিতি কর্মকৃৎ ॥ ২৫ ॥

আধয়ঃ—মানসিক ক্লেশ; **ব্যাধয়ঃ**—শারীরিক ক্লেশ বা ব্যাধি; **তস্য**—যবনেশ্বরের; **সৈনিকাঃ**—সৈন্যগণ; **যবনাঃ**—যবনগণ; **চরাঃ**—অনুচরগণ; **ভূত**—জীবের; **উপসর্গ**—দুঃখের সময়; **আশু**—অতি শীঘ্র; **রয়ঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী, **প্রজ্বারঃ**—প্রজ্বার নামক; **দ্বি-বিধঃ**—দুই প্রকার; **জ্বরঃ**—জ্বর; **এবম্**—এইভাবে; **বহু-বিধৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার; **দুঃখৈঃ**—দুঃখের দ্বারা; **দৈব**—দৈবের দ্বারা; **ভূত**—অন্যান্য জীবদের দ্বারা; **আত্ম**—দেহ এবং মনের দ্বারা; **সত্তবৈঃ**—উৎপন্ন; **ক্লিশ্যমানঃ**—দুঃখকষ্ট ভোগ করে; **শতম্**—শত; **বর্ষম্**—বৎসর; **দেহে**—দেহে, **দেহী**—জীব; **তমঃ-বৃত**—জড় অস্তিত্বের দ্বারা আবৃত; **প্রাণ**—জীবনের; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **মনঃ**—মনের; **ধর্মান্**—গুণ; **আত্মনি**—আত্মাকে; **অধ্যস্য**—ভ্রান্তিপূর্বক মনে করে; **নির্গুণঃ**—চিন্ময় হওয়া সত্ত্বেও; **শেতে**—শয়ন করে; **কাম**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের; **লবান্**—ক্ষুদ্র অংশকে; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **মম**—আমার, **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **কর্ম-কৃৎ**—কর্তা।

অনুবাদ

যবনেশ্বরের (যমরাজের) অনুচরদের বলা হয় মৃত্যুসেনা, এবং সেগুলি হচ্ছে দেহ ও মন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার পীড়া। প্রজ্বার হচ্ছে দুই প্রকার জ্বর—অত্যধিক গরম এবং অত্যধিক ঠাণ্ডা—যেমন টাইফয়েড এবং নিউমোনিয়া। শরীরের ভিতরে শায়িত জীব আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক বিভিন্ন প্রকার ক্লেশের দ্বারা বিচলিত। সর্বপ্রকার ক্লেশ সত্ত্বেও জীব দেহধর্ম, মনোধর্ম ও ইন্দ্রিয়ধর্মের বশীভূত হয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির দ্বারা ক্লিষ্ট হয়ে, এই জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনায় বহু পরিকল্পনা করে। যদিও সে নির্গুণ, তবুও অজ্ঞানের বশে জীব 'আমি' ও 'আমার' অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এইভাবে সে তার জড় শরীরে একশ বছর অবস্থান করে।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে—*অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ।* জীব প্রকৃতপক্ষে জড় জগৎ থেকে ভিন্ন, কারণ আত্মা জড় নয়। *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে যে, জীব হচ্ছে ভগবানের পরা প্রকৃতিসম্ভূত, এবং মাটি, জল, আগুন, বায়ু আদি জড় উপাদানগুলি হচ্ছে অপরা প্রকৃতি। জড় উপাদানগুলিকে ভিন্না প্রকৃতি বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। যখন অন্তরঙ্গা বা উৎকৃষ্টা শক্তি বহিরঙ্গা শক্তির সংস্পর্শে আসে, তখন তা নানা প্রকার ক্লেশের বশবর্তী হয়। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) ভগবান বলেছেন, *মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ*—জড় শরীরের ফলে জীবাত্মাকে নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করতে হয়, যা বায়ু, জল, অগ্নি, অত্যন্ত গরম, অত্যন্ত ঠাণ্ডা,

রৌদ্র, অত্যাহার, অস্বাস্থ্যকব ভোজন, ত্রিধাতুর (কফ, পিত্ত এবং বায়ু) বৈষম্য ইত্যাদিব প্রভাবে উৎপন্ন। অন্ত্র, কণ্ঠ, মস্তিষ্ক আদি দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি নানা প্রকার ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তার ফলে জীব অত্যন্ত ক্লেশভোগ করে। জীব কিন্তু এই সমস্ত জড় উপাদান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই শ্লোকে যে দুই প্রকার জ্বরেব উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় নিউমোনিয়া ও টাইফয়েড বলে বর্ণনা করা যায়। দেহে যখন প্রবল জ্বর হয়, তখন টাইফয়েড ও নিউমোনিয়া হয়, এবং সেগুলিকে এখানে প্রজ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য জীবদের থেকেও নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ হয়। যেমন, রাষ্ট্র কর আদায় করে, আর চোর-ডাকাত এবং বাটপারদের থেকে যে কত রকম দুঃখকষ্ট ভোগ হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। অন্য জীবদের থেকে যে ক্লেশ তাকে বলা হয় আধিভৌতিক ক্লেশ। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অভাব, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ইত্যাদি থেকেও নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ হয়। এই সমস্ত দুঃখকষ্টেব সৃষ্টি হচ্ছে দেবতা অথবা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত অন্যান্য কারণ থেকে। প্রকৃতপক্ষে জীবের অনেক শত্রু রয়েছে, এবং এখানে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এই সংসার কত কষ্টদায়ক।

এই সংসারের মৌলিক কষ্ট সম্বন্ধে অবগত হয়ে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে জীব এই জড় দেহেব বন্ধনে মোটেই সুখী নয়। তার দেহের ফলে, সে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দুঃখকষ্ট ভোগ করে এবং মন, বাক্য, ক্রোধ, উদর, উপস্থ, পায়ু ইত্যাদিব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এই জড় জগতে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনার ফলে, চিন্ময় জীব নানাবিধ দুঃখকষ্টেব দ্বারা পরিবৃত হয়। সে যদি কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগের কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করে, তা হলে এই সংসারের সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে, এবং কৃষ্ণভক্তিতে প্রগতির ফলে, সে সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে, এই শরীর ত্যাগ কবার পর ভগবানের ধামে ফিরে যেতে পারবে।

শ্লোক ২৬-২৭

যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্ ।
পুরুষস্তু বিষজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্ ॥ ২৬ ॥
গুণাভিমানী স তদা কর্মাণি কুরুতেঽবশঃ ।
শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথাকর্মাভিজায়তে ॥ ২৭ ॥

যদা—যখন; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **অবিজ্ঞায়**—ভুলে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম্**—পরম; **গুরুম্**—উপদেষ্টা; **পুরুষঃ**—জীব; **তু**—তখন, **বিষজ্জেত**—আসক্ত হয়; **গুণেষু**—গুণের প্রতি; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **স্ব-দৃক**—যে তার নিজের মঙ্গল দর্শন করতে পারে; **গুণ-অভিমানী**—জড়া প্রকৃতির গুণের মাধ্যমে যে নিজের পরিচয় অন্বেষণ করে; **সঃ**—সে; **তদা**—তখন, **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **কুরুতে**—অনুষ্ঠান করে; **অবশঃ**—স্বতঃস্ফূর্তভাবে; **শুক্লম্**—শ্বেত; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **লোহিতম্**—লাল; **বা**—অথবা; **যথা**—অনুসারে, **কর্ম**—কর্ম; **অভিজায়তে**—জন্মগ্রহণ করে।

অনুবাদ

জীবের নিজের ভাল অথবা মন্দ ভাগ্য বেছে নেওয়ার অল্প একটু স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু সে যখন তার পরম প্রভু পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যায়, তখন সে জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত হয়। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং দেহের জন্য নানা প্রকার কর্মে আসক্ত হয়। কখনও সে তমোগুণের দ্বারা, কখনও রজোগুণের দ্বারা এবং কখনও সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে জীব জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৩/২২) এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার শরীরের বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

"জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত জীব প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে। জড়া প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে তার এই বন্ধন। তার ফলে সে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ভাল এবং মন্দের সঙ্গে বোঝাপড়া করে।"

জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে জীব চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। এখানে *স্বদৃক্* অর্থাৎ 'যে তার নিজের মঙ্গল দর্শন করতে পারে', এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জীবের ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। জীব তার স্বরূপে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং সে তার ভ্রান্ত বাসনার দ্বারা বিপথগামী হতে পারে। সে ভগবানের অনুকরণ করার চেষ্টা করতে পারে। ভৃত্য তার প্রভুর অনুকরণ করে নিজের ব্যবসা শুরু করার বাসনা করতে পারে, এবং সে যখন তা করতে চায়, তখন তাকে তার প্রভুর আশ্রয় ত্যাগ করতে হয়। কখনও

সে ব্যর্থ হয়, এবং কখনও সে সফল হয়। তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ জীব ভগবানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তার নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারে। ভগবানের পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বহু প্রতিযোগী রয়েছে, কিন্তু কারও পক্ষেই ভগবান হওয়া সম্ভব নয়। এই জড় জগতে সকলে ভগবানের অনুকরণ করার চেষ্টা করছে বলে এখানে এই প্রচণ্ড জীবন সংগ্রাম। ভগবানের সেবা থেকে বিমুখ হয়ে ভগবানকে অনুকরণ করার চেষ্টা করছে বলে জীবের এই ভববন্ধন। মায়াবাদীরা কৃত্রিমভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ভগবানকে অনুকরণ করে। মায়াবাদীরা যখন নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে, সেটি হচ্ছে তাদের মানসিক জল্পনা-কল্পনার চরম বিভ্রান্তি। কেউই ভগবান হতে পারে না অথবা ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। সেই কথা কল্পনা করার ফলে জড় জগতের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

শ্লোক ২৮

শুক্লাৎপ্রকাশভূয়িষ্ঠাঁল্লোকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাংস্তমঃশোকোৎকটান্ ক্বচিৎ ॥ ২৮ ॥

শুক্লাৎ—সত্ত্বগুণের দ্বারা, **প্রকাশ**—প্রকাশের দ্বারা, **ভূয়িষ্ঠান্**—বৈশিষ্ট্য সমন্বিত, **লোকান্**—লোকসমূহ, **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়, **কর্হিচিৎ**—কখনও, **দুঃখ**—কষ্ট, **উদর্কান্**—পরিণাম; **ক্রিয়া-আয়াসান্**—কঠিন কার্যে পূর্ণ; **তমঃ**—অন্ধকার; **শোক**—শোকে, **উৎকটান্**—পরিপূর্ণ; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও।

অনুবাদ

যাঁরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত তাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পুণ্যকর্ম করেন, এবং তার ফলে তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন, যেখানে দেবতারা বাস করেন। যাঁরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা মনুষ্যলোকে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনশীল কার্য করেন। আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা বিভিন্ন প্রকার কষ্টভোগ করে এবং পাশবিক জগতে বাস করে।

তাৎপর্য

তিন প্রকার গ্রহলোক রয়েছে—উচ্চ, মধ্য এবং অধঃ। যাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা ব্রহ্মালোক (সত্যলোক), তপোলোক, জনলোক, এবং মহর্লোক এই সমস্ত উচ্চতর লোকে স্থান লাভ করেন। যাঁরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা

ভূর্লোক এবং ভুবর্লোকে স্থান প্রাপ্ত হন। যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল বা পশুজগতে স্থান লাভ করে। গুণগতভাবে জীব ভগবানের সঙ্গে এক, কিন্তু বিস্মৃতির ফলে সে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে মনুষ্য-সমাজ রজোগুণের দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত, এবং তার ফলে মানুষেরা বড় বড় কারখানায় কর্মব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে। এই রকম স্থানে বাস করা যে কত কষ্টকর, তা তারা ভুলে গেছে। *ভগবদ্গীতায়* এই প্রকার কার্যকলাপকে *উগ্রকর্ম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ অত্যন্ত কষ্টদায়ক কার্যকলাপ। যারা শ্রমিকদের শ্রমের উপযোগ করে, তাদের বলা হয় পুঁজিবাদী, এবং যারা প্রকৃতপক্ষে কর্ম সম্পাদন করে, তাদের বলা হয় শ্রমিক। বাস্তবিকপক্ষে তারা উভয়েই পুঁজিবাদী, এবং শ্রমিকেরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তার ফলে সর্বদাই অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তার বিপরীত হচ্ছে সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত কর্মী এবং জ্ঞানী। কর্মীরা *বেদের* নির্দেশ অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে, উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করে। জ্ঞানীরা ভগবানের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে এই জগতে বহু প্রকার যোনিভুক্ত বিভিন্ন রকমের জীব রয়েছে। তা এই জড় জগতে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট স্তরের জীবনের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে।

শ্লোক ২৯

ক্বচিৎপুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ ।
দেবো মনুষ্যস্তির্যগ্বা যথাকর্মগুণং ভবঃ ॥ ২৯ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **পুমান্**—পুরুষ; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **চ**—ও; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **ন**—না; **উভয়ম্**—উভয়; **অন্ধ**—অন্ধ, **ধীঃ**—বুদ্ধি; **দেবঃ**—দেবতা; **মনুষ্যঃ**—মানুষ; **তির্যক্**—পশু, পক্ষী ইত্যাদি; **বা**—অথবা; **যথা**—অনুসারে; **কর্ম**—কর্ম; **গুণম্**—গুণ; **ভবঃ**—জন্ম।

অনুবাদ

অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে জীব কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও নপুংসক, কখনও মানুষ, কখনও দেবতা, কখনও পশু, কখনও পক্ষী ইত্যাদি হয়। এইভাবে সে এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে থাকে। প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার কর্ম অনুসারে সে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ; তাই গুণগতভাবে সে চিন্ময়। জীব কখনই জড় নয়। তার জড় চেতনা কেবল তার ভ্রান্তি এবং বিস্মৃতি থেকে উদ্ভূত। সে ভগবানেরই মতো জ্যোতির্ময়। সূর্য এবং সূর্যকিরণ উভয়েই জ্যোতির্ময়। ভগবান পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো, আর জীব হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত সূর্যের কিরণ কণা-সদৃশ। এই ক্ষুদ্র অংশগুলি মায়ারূপী মেঘের দ্বারা যখন আচ্ছন্ন হয়, তখন তার দীপ্তি হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন মায়ারূপী মেঘ দূর হয়ে যায়, তখন সেই অংশগুলি পুনরায় তাদের ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়ে দীপ্তিমান হয়। জীব যখন মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত হয়, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। কিন্তু কোনক্রমে যদি সে ভগবানের সম্মুখে আসে, তখন সে ভগবানের মতো বিশাল না হলেও, নিজেকে ভগবানেরই মতো উজ্জ্বলরূপে দর্শন করতে পারে। জীব যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের অনুকরণ করার বাসনা করে, তাই সে মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। আমরা ভগবানের অনুকরণ করতে পারি না, এমন কি আমরা পরম ভোক্তাও হতে পারি না। তা কখনই সম্ভব নয়, এবং যখন আমরা মনে করি যে তা সম্ভব, তখন আমরা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়ার ফলেই, জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

মায়ার প্রভাবে জীব পিশাচগ্রস্ত মানুষের মতো হয়ে যায়। সে তখন সব রকম অনর্থক প্রলাপ বকে। জীব যখন মায়াচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন সে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ অথবা সমাজসেবকে পরিণত হয়, এবং সর্বক্ষণ মানব সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য নানা রকম পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। এই সমস্ত পরিকল্পনা চরমে ব্যর্থ হয় কেননা সেগুলি অলীক। এইভাবে জীব ভগবানের নিত্যদাসরূপে তার প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হয়। তার পরিবর্তে সে মায়ার দাসে পরিণত হয়। সর্ব অবস্থাতেই তাকে কারও না কারও দাসত্ব করতে হয়। সে যে ভগবানের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে মায়ার দাসে পরিণত হয়, তা তার চরম দুর্ভাগ্য। মায়ার দাসরূপে, কখনও সে রাজা হয়, কখনও সে প্রজা হয়, কখনও সে ব্রাহ্মণ হয়, কখনও সে শূদ্র ইত্যাদি হয়। এইভাবে বিভিন্ন উপাধিতে দূষিত হয়ে সে মায়ার দাসত্ব করে। কখনও সে সুখী, কখনও সে ঐশ্বর্যশালী, কখনও সে একটি ক্ষুদ্র কীট। কখনও সে স্বর্গে উন্নীত হয়, আবার কখনও সে নরকে অধঃপতিত হয়। কখনও সে দেবতা, কখনও সে দানব। কখনও সে দাস, কখনও সে প্রভু। এইভাবে জীব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করছে।

যখন সে সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে আসে, তখনই কেবল সে তার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। তখন সে জড় জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়। সেই সময় পূর্ণ কৃষ্ণচেতনার ফলে, সে তার পূর্বকৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। এই অনুতাপ অত্যন্ত কল্যাণকর, কারণ তা জীবকে সংসার কলুষ থেকে পবিত্র করে। তখন সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, তিনি যেন তাকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেন, এবং তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৪) সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবান বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আমার দিব্য শক্তি, এবং তাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত হয়, তারা অনায়াসে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই কেবল মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মনোধর্মী জ্ঞান অথবা অন্যান্য কার্যকলাপের দ্বারা কখনও তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। জীব যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখন সে নিজেকে সর্বদা কৃষ্ণভাবনার উপযুক্ত করে, এবং সেই অনুসারে কার্য করে। এইভাবে সে ধীরে ধীরে মায়ার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। সে যখন কৃষ্ণভাবনায় দৃঢ়রূপে স্থিত হয়, তখন মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এইভাবে কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ প্রভাবে জীব জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে। সেই সম্পর্কে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২২/২৫)

শ্লোক ৩০-৩১

ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্ ।
চরন্ বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা ॥ ৩০ ॥
তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচপথা ভ্রমন্ ।
উপর্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥

ক্ষুৎ-পরীতঃ—ক্ষুধায় কাতর; **যথা**—যেমন; **দীনঃ**—দরিদ্র; **সারমেয়ঃ**—কুকুর, **গৃহম্**—এক গৃহ থেকে, **গৃহম্**—অন্য গৃহে, **চরন্**—বিচরণ করে; **বিন্দতি**—প্রাপ্ত

হয়; **যৎ**—যার; **দিষ্টম্**—অদৃষ্ট অনুসারে; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **ওদনম্**—খাদ্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **তথা**—তেমনই; **কাম-আশয়ঃ**—বিভিন্ন প্রকার বাসনা অনুসারে, **জীবঃ**—জীব, **উচ্চ**—উচ্চ, **অবচ**—নিম্ন; **পথা**—পথে; **ভ্রমন্**—ভ্রমণ করে, **উপরি**—উচ্চ, **অধঃ**—নিম্ন, **বা**—অথবা; **মধ্যে**—মধ্যে; **বা**—অথবা, **যাতি**—গমন করে, **দিষ্টম্**—অদৃষ্ট অনুসারে; **প্রিয়**—সুখকর; **অপ্রিয়ম্**—দুঃখদায়ক।

অনুবাদ

ক্ষুধায় কাতর, দীন কুকুর যেমন গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে তার প্রারব্ধ অনুসারে কোথাও বা দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয়, এবং কোথায়ও একমুষ্টি অন্ন প্রাপ্ত হয়, তেমনই বিভিন্ন বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব তার অদৃষ্ট অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং কখনও নিম্নতর জীবন। কখনও সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, কখনও নরকে অধঃপতিত হয়, আবার কখনও মধ্যবর্তী লোকে অবস্থান করে। এইভাবে সে কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

এখানে জীবের অবস্থা একটি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভাগ্যবশত কুকুরের মালিক ধনী হতে পারে, আবার ভাগ্যবশত সে একটি পথের কুকুরও হতে পারে ধনী ব্যক্তির কুকুর রূপে সে ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে কখনও কখনও শোনা যায় যে, কোন ধনী ব্যক্তি তার উইলে তার কুকুরের জন্য কোটি-কোটি টাকা রেখে গেছে। আবার বহু কুকুর রাস্তা ঘাটে অনাহারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই, কুকুরের সঙ্গে জীবের এই তুলনাটি অত্যন্ত উপযুক্ত। একজন বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু বুঝতে পারেন যে, তাঁকে যদি একটি কুকুরের মতো জীবন যাপন করতে হয়, তা হলে তাঁর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কুকুর হওয়াই সব চাইতে ভাল। জড় জগতে একটি কুকুর কখনও কখনও উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে এবং কখনও কখনও পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু চিৎ জগতে কৃষ্ণের কুকুর নিরন্তর দিব্য সুখ উপভোগ করে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন—*বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে।* এইভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণবের কুকুর হতে চেয়েছেন। কুকুর সর্বদা তার প্রভুর দরজায় মোতায়েন থাকে এবং তার প্রভুর অবাঞ্ছিত কোন ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করতে দেয় না। তেমনই, বৈষ্ণবের সেবায় যুক্ত হয়ে, সর্বতোভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত তা না হলে, পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করা যায় না। আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন

ছাড়াও এই জড় জগতে যদি কেউ সত্ত্বগুণের বিকাশ সাধন না করে, তা হলে সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৪/১৮)বলা হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"যারা সত্ত্বগুণে অবস্থিত তারা ক্রমশ উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়; যারা রজোগুণে অবস্থিত তারা ভূর্লোকে বিরাজ করে; আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা নরকে অধঃপতিত হয়।"

বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে, এবং জীবের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিকাশ সাধনের জন্য সেগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হন; রাজসিক ব্যক্তিরা মধ্যবর্তী লোকে অবস্থান করে; এবং তামসিক ব্যক্তিরা নিম্নতর জঘন্য জীবনে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৩২

দুঃখেষ্বেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতুষু ।
জীবস্য ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেত্তত্তৎপ্রতিক্রিয়া ॥ ৩২ ॥

দুঃখেষু—দুঃখে; **একতরেণ**—এক প্রকার থেকে; **অপি**—ও; **দৈব**—দৈব; **ভূত**—অন্য জীব; **আত্ম**—দেহ এবং মন; **হেতুষু**—কারণে; **জীবস্য**—জীবের; **ন**—কখনই না; **ব্যবচ্ছেদঃ**—নিবৃত্তি; **স্যাৎ**—সম্ভব; **চেৎ**—যদিও, **তৎ-তৎ**—সেই সমস্ত দুঃখ কষ্টের; **প্রতিক্রিয়া**—প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

জীব তার ভাগ্যজনিত ক্লেশ, অন্যান্য জীবের দ্বারা প্রদত্ত ক্লেশ অথবা তার দেহ এবং মন সম্পর্কিত ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা সর্বদা করে। কিন্তু, প্রতিকারের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা তাদের বদ্ধ থাকতে হয়।

তাৎপর্য

একটি কুকুর যেমন এক টুকরো রুটির জন্য অথবা শাস্তি পাওয়ার ভয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, ঠিক তেমনই জীবও সুখভোগের জন্য এবং তার জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্য নানাভাবে পরিকল্পনা করে নিরন্তর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটিকে বলা হয় জীবন-সংগ্রাম। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই

যে, আমাদের দুঃখজনক পরিস্থিতি দুব করার উদ্দেশ্যে কত রকমের পরিকল্পনা কবতে আমাদের বাধ্য হতে হয়। এক প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের আর এক প্রকার দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাবে কত কষ্টভোগ কবে, কিন্তু সে যদি ধনী হতে চায়, তা হলে তাকে নানাভাবে কষ্ট করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রতিকাবের প্রকৃত পন্থা নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে মায়ার বন্ধন। কেউ যদি তার পরিস্থিতির প্রতিকারের চেষ্টা না করে, তার পূর্বকৃত কর্মের প্রভাবেই সব কিছু লাভ হচ্ছে বলে জেনে সমস্ত পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকে, এবং কৃষ্ণভক্তির বিকাশের জন্য তার শক্তির সদ্ব্যবহার করে, তা হলেই সে প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্ট হতে পারে। সেই কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥

"যাবা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান এবং দার্শনিক মনোভাবাপন্ন, তাদের কর্তব্য হচ্ছে উচ্চতর (ব্রহ্মলোক) থেকে নিম্নতম (পাতাল) লোক পর্যন্ত ভ্রমণ করেও যা লাভ করা যায় না, সেই বস্তুটি প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা। ইন্দ্রিয়সুখ তো কালের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়, ঠিক যেমন কামনা না করলেও কালের প্রভাবে দুঃখভোগ হয়ে থাকে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৮) তাই জড় জাগতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় সময়ের অপচয় না করে কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত বিকাশের চেষ্টা কবাই উচিত। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। এক প্রকার উন্নতি সাধনের অর্থ হচ্ছে অন্য আর এক প্রকার দুঃখময় পরিস্থিতি স্বীকার কবা। কিন্তু আমবা যদি আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত বিকাশেব চেষ্টা করি, তা হলে কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই জড় জাগতিক দুঃখ দুর্দশাব নিবৃত্তি হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি* "হে কুন্তীপুত্র! উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমাব ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩১) যিনি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, সব রকম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ক্লেশ সত্ত্বেও তিনি কখনও বিনষ্ট হবেন না।

শ্লোক ৩৩

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্ ।
তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা—যেমন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষঃ**—মানুষ; **ভারম্**—ভার, **শিরসা**—মাথার উপর; **গুরুম্**—ভারী, **উদ্বহন্**—বহন করে; **তম্**—তা; **স্কন্ধেন**—কাঁধের উপর; **সঃ**—সে; **আধত্তে**—রাখে; **তথা**—তেমনই, **সর্বাঃ**—সমস্ত, **প্রতিক্রিয়াঃ**—প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

মানুষ মস্তকে গুরুভার বহন করতে করতে যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই ভার কাঁধে বহন করে সে মস্তককে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে সে তার ভার বহনের শ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভার বহনের শ্রান্তি দূর করার যত কিছু উপায় আছে, সেগুলির মাধ্যমে সে কেবল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বোঝার ভার স্থানান্তরিত করা ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছুই করতে পারে না।

তাৎপর্য

বোঝার ভার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করার প্রচেষ্টা—এটি একটি সুন্দর বর্ণনা। কেউ যখন মস্তকে বোঝা বহন করার ফলে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে তা তার কাঁধের উপর রাখে। তার অর্থ এই নয় যে, সে বোঝা বহনের ভার থেকে মুক্ত হয়েছে। তেমনি মানব সমাজ সভ্যতার নামে এক প্রকার দুঃখ অপনোদন করতে গিয়ে, আর এক প্রকার দুঃখ সৃষ্টি করে। বর্তমান সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই যে, এক স্থান থেকে দ্রুত গতিতে আর এক স্থানে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু গাড়ি তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু তার ফলে আমরা আরও অন্য প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করেছি। কত রাস্তাঘাট তৈরি করতে হয়েছে, এবং তা সত্ত্বেও সেগুলি যথেষ্ট না হওয়ার ফলে, গাড়ির ভিড়ে পথ অবরোধ হচ্ছে। দূষিত আবহাওয়া এবং ইন্ধনের অভাব আদি বহু সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে। এইভাবে দেখা যায় যে, আমাদের দুঃখ অপনোদনের যত সমস্ত পন্থা আমরা উদ্ভাবন করি, তা প্রকৃতপক্ষে দুঃখর নিবৃত্তি সাধন করে না। তা কেবল মায়া। আমরা কেবল মাথার বোঝা কাঁধে রাখি। আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের প্রকৃত উপায় হচ্ছে কেবল ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা। ভগবান সর্বশক্তিমান হওয়ার ফলে, এই জড় জগতে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের সমস্ত আয়োজন তিনি করতে পারেন।

শ্লোক ৩৪

নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্মণাং কর্ম কেবলম্ ।
দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ ॥ ৩৪ ॥

ন—কখনই না; **একান্ততঃ**—চরমে; **প্রতীকারঃ**—প্রতিকার; **কর্মণাম্**—বিভিন্ন কার্যকলাপের; **কর্ম**—অন্য কর্ম; **কেবলম্**—একমাত্র; **দ্বয়ম্**—উভয়; **হি**—কারণ; **অবিদ্যা**—মোহবশত; **উপসৃতম্**—স্বীকৃত; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **ইব**—সদৃশ; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে নিষ্পাপ। কেউই কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কর্মের দ্বারা তার সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে না। অজ্ঞানতাবশত মানুষ সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। দুঃস্বপ্নের প্রতিকার যেমন কেবল জাগরণের দ্বারাই হয়ে থাকে, তেমনই কৃষ্ণভক্তির দ্বারা আমাদের স্বরূপে জেগে ওঠা ব্যতীত অজ্ঞান এবং মোহজনিত সংসার-দুঃখ থেকে নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই, কারণ সমস্ত সমস্যার চরম সমাধান হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় জেগে ওঠা।

তাৎপর্য

দুই প্রকার সকাম কর্ম রয়েছে। আমরা বোঝা মাথায় রাখতে পারি অথবা কাঁধে রাখতে পারি। প্রকৃতপক্ষে উভয় স্থানে বোঝা রাখার অর্থ একই। কিন্তু বোঝার ভার অপনোদনের জন্যই বোঝার স্থানান্তর হয়ে থাকে। এই সম্পর্কে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, এই জড় জগতে মূর্খ মানুষেরাই কেবল মহা আড়ম্বরে দেহ সুখের জন্য সমস্ত পরিকল্পনা করে, কিন্তু তারা জানে না যে, এই সমস্ত আয়োজন যদি সফলও হয়, তবুও তা হচ্ছে কেবল মায়া। মানুষ দেহের মায়িক সুখের জন্য দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করছে। কিন্তু প্রকৃত সুখভোগের পন্থা এটি নয়। মানুষ যদি প্রকৃত সুখ উপভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হবে। *বেদে* তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ*—"এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় জগতে থেকো না। জ্যোতির্ময় চিৎ-জগতে ফিরে যাও।" জড় দেহের দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার করতে গিয়ে, মানুষকে আর একটি দুঃখময় পরিস্থিতি স্বীকার করতে হয়। উভয় পরিস্থিতি মায়িক এক প্রকার দুঃখের প্রতিকার করতে গিয়ে আর এক প্রকার দুঃখ ডেকে আনার ফলে কোন লাভ হয় না। অর্থাৎ, এই জড় জগতে নিত্য আনন্দ লাভ করা যায় না। সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধন করে নিত্য আনন্দ আস্বাদনের একমাত্র উপায় হচ্ছে, এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

শ্লোক ৩৫

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো যথা ॥ ৩৫ ॥

অর্থে—বাস্তবিক কারণ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবিদ্যমানে**—অস্তিত্বহীন; **অপি**—যদিও; **সংসৃতিঃ**—সংসার; **ন**—না; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **মনসা**—মনের দ্বারা; **লিঙ্গ-রূপেণ**—সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **বিচরতঃ**—কার্য করে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

কখনও কখনও আমরা স্বপ্নে একটি বাঘ অথবা সাপ দেখে ভয় পাই, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেখানে বাঘ অথবা সাপ নেই। তেমনই আমরা সূক্ষ্মরূপে কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তার পরিণামে দুঃখকষ্ট ভোগ করি। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা ব্যতীত এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তিসাধন সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে, জীব সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়-শরীর থেকে সর্বদা ভিন্ন। আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ হচ্ছে এই জড় শরীর। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) বলা হয়েছে—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়! সুখ ও দুঃখের অনিত্য প্রাকট্য এবং যথাসময়ে তাদের অন্তর্ধান, ঠিক শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুব গমনাগমনেব মতো। হে ভাবত! ইন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে তাদের উৎপত্তি হয়, তাই অবিচলিত থেকে সেগুলি সহ্য করতে চেষ্টা করা কর্তব্য।" এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে, দেহজনিত সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান হয়। সেগুলি কিভাবে সহ্য করতে হয় তা শেখা উচিত। জড়-জাগতিক অস্তিত্ব হচ্ছে আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। আমরা যখন এই জড় জগৎ থেকে বেবিয়ে যাই, তখন আর কোন রকম দুঃখ-দুর্দশা থাকে না। *বেদে* তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমাদের যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, আমরা জড় দেহ নই, আমরা হচ্ছি ব্রহ্ম (অহং *ব্রহ্মাস্মি*)। ব্রহ্মকর্মে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত না হলে, সেই সত্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হয়। সেটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

শ্লোক ৩৬-৩৭

অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থপরম্পরা ।
সংসৃতিস্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ ॥ ৩৬ ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ জনয়িষ্যতি ॥ ৩৭ ॥

অথ—অতএব; **আত্মনঃ**—জীবের; **অর্থ-ভূতস্য**—তার প্রকৃত পুরুষার্থ; **যতঃ**—যা থেকে, **অনর্থ**—সমস্ত অবাঞ্ছিত বস্তুর; **পরম্-পরা**—একের পর এক; **সংসৃতিঃ**—সংসার; **তৎ**—তার; **ব্যবচ্ছেদঃ**—বিচ্ছেদ; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **পরময়া**—শুদ্ধ; **গুরৌ**—পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে; **বাসুদেবে**—বাসুদেব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তি-যোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **সমাহিতঃ**—প্রযুক্ত; **সধ্রীচীনেন**—সম্পূর্ণরূপে; **বৈরাগ্যম্**—বিরক্তি; **জ্ঞানম্**—পূর্ণ জ্ঞান; **চ**—এবং, **জনয়িষ্যতি**—প্রকাশিত হবে।

অনুবাদ

জীবের প্রকৃত পুরুষার্থ হচ্ছে, যে অজ্ঞান তাকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ক্লেশ প্রদান করে, সেই অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া। তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধির মাধ্যমে ভগবানের শরণাগত হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভগবান শ্রীবাসুদেবের প্রতি ভক্তি না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে এই জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হওয়া এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

কৃত্রিম জড় অবস্থা থেকে বিরক্ত হওয়ার এটিই হচ্ছে উপায়। ভবরোগ নিরাময়ের একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা এবং নিরন্তর ভগবান বাসুদেবের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা। সকলেই সুখী হওয়ার চেষ্টা করে, এবং সেই সুখ লাভের যে উপায় তাকে বলা হয় পুরুষার্থ। দুর্ভাগ্যবশত এই জড় জগতে বিচরণশীল বদ্ধ জীবেরা জানে না যে, তার পরম পুরুষার্থ হচ্ছেন বাসুদেব। *সংসৃতি* বা সংসার-বন্ধনের শুরু হয় দেহাত্মবুদ্ধি থেকে, এবং তার ফলে একের পর এক অনর্থের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত অনর্থগুলি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা। তার ফলে জীব এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে। তাই সর্বপ্রথমে মনকে সংযত করতে হয়, যাতে মনের বাসনাগুলিকে পবিত্র করা যায়। সেই পন্থার বর্ণনা করে *নারদপঞ্চরাত্রে* বলা

হয়েছে—*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।* মানুষ যদি তার মনকে পবিত্র না করে, তা হলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৭/৬) বলা হয়েছে—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

"জীবের জড়-জাগতিক ক্লেশ, যা তার পক্ষে অনাবশ্যক, তার নিরাময় কেবল ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলেই সম্ভব। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই কথা জানে না, এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরম সত্যসমন্বিত এই বৈদিক শাস্ত্র সংকলন করেছেন।" অনর্থের ফলে জীবকে সংসারচক্রে একের পর এক দেহ ধারণ করতে হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত হতে হয় এবং তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে হয়। এই সম্পর্কে গুরু শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ। গুরু শব্দটির অর্থ 'ভারী' অথবা 'শ্রেষ্ঠ'। অন্যভাবে, 'গুরু' মানে পারমার্থিক গুরু। শ্রীল ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়েছেন, *গুরুর্ন স স্যাৎ .....ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্*—"শিষ্যকে জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে না পারলে, গুরুর পদ গ্রহণ করা উচিত নয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/১৮) এই সংসার প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র। সেটিই হচ্ছে জন্ম এবং মৃত্যুর কারণ। কেবলমাত্র বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলেই তার নিবৃত্তিসাধন সম্ভব।

ভক্তি বলতে ভগবান বাসুদেবের সেবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যকে বোঝায়। যেহেতু বাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই দেব-দেবীদের সেবায় যুক্ত না হয়ে, তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। ভগবদ্ভক্তি শুরু হয় কনিষ্ঠ অধিকারির স্তর থেকে—বিধিনিষেধ পালন করার স্তর থেকে, এবং তার চরম স্তর হচ্ছে ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময়ী সেবা। সব কটি স্তরেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান বাসুদেবের সন্তুষ্টিবিধান করা। কেউ যখন বাসুদেবের সেবায় সম্পূর্ণরূপে উন্নতিসাধন করেন, তখন তিনি দেহসুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হন, অর্থাৎ তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে জড়-জাগতিক উপাধি থেকে মুক্ত হন। এইভাবে বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হওয়ার ফলে, তিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণরূপে ভগবান বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।* ভগবান বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হওয়াব ফলে, জীব তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থাকে বলা হয় মুক্ত অবস্থা। *মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*

—মুক্তি মানে হচ্ছে কৃষ্ণভক্ত রূপে নিজের প্রকৃত স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। তিনি তখন জড় বিষয়ের সেবা, সমাজসেবা, দেশের সেবা, জাতির সেবা, কুকুরের সেবা, গাড়ির সেবা ইত্যাদি 'আমি' এবং 'আমার' এই মোহের অন্তর্গত যত রকম সেবা রয়েছে তা সবই পরিত্যাগ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করার ফলে, অহৈতুকী জ্ঞান এবং জড় জগতের প্রতি বিরক্তি অচিরেই লাভ হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭) এইভাবে সব রকম জড় বাসনা, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা এবং সকাম কর্মকে পরিত্যাগ করে বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৩৮

সোঽচিরাদেব রাজর্ষে স্যাদচ্যুতকথাশ্রয়ঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্যদা স্যাদধীয়তঃ ॥ ৩৮ ॥

সঃ—সেই; **অচিরাৎ**—শীঘ্র; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **রাজ-ঋষে**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **স্যাৎ**—হয়; **অচ্যুত**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কথা**—আখ্যান; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রিত; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণকারী; **শ্রদ্দধানস্য**—শ্রদ্ধাবান; **নিত্যদা**—সর্বদা; **স্যাৎ**—হয়; **অধীয়তঃ**—অনুশীলনের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজর্ষি। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, যিনি সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, যিনি সর্বদা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে যুক্ত এবং যিনি সর্বদা ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তিনি অচিরেই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

তাৎপর্য

বাসুদেবের নিত্য প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সর্বদা তাঁর মহিমা শ্রবণ করা। ভক্তিযোগের পন্থা হচ্ছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্—

এই পন্থার দ্বারাই কেবল প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করা যায়। কেবলমাত্র ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার ফলে, চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৯-৪০

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ ।
ভগবদ্গুণানুকথনশ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥ ৩৯ ॥
তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি ।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ৪০ ॥

যত্র—যেখানে; **ভাগবতাঃ**—মহান ভগবদ্ভক্তগণ; **রাজন্**—হে রাজন; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **বিশদ-আশয়াঃ**—উদার মনোভাবাপন্ন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গুণ**—গুণাবলী; **অনুকথন**—নিয়মিতভাবে পাঠ করা, **শ্রবণ**—শ্রবণ করা; **ব্যগ্র**—উৎসুক; **চেতসঃ**—চেতনা; **তস্মিন্**—সেখানে; **মহৎ**—মহাপুরুষদেব; **মুখরিতাঃ**—মুখনিঃসৃত; **মধু-ভিৎ**—মধু নামক দৈত্যকে হত্যাকারী; **চরিত্র**—কার্যকলাপ বা চরিতাবলী; **পীযূষ**—অমৃতের; **শেষ**—অবশেষ; **সরিতঃ**—নদী; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **স্রবন্তি**—প্রবাহিত হয়; **তাঃ**—তাঁরা সকলে; **যে**—যাঁরা; **পিবন্তি**—পান করে; **অবিতৃষঃ**—অতৃপ্ত; **নৃপ**—হে রাজন; **গাঢ়**—সাবধান; **কর্ণৈঃ**—কর্ণের দ্বারা; **তান্**—তাদের; **ন**—কখনই না; **স্পৃশন্তি**—স্পর্শ করে, **অশন**—ক্ষুধা; **তৃৎ**—তৃষ্ণা; **ভয়**—ভয়; **শোক**—শোক; **মোহাঃ**—মোহ।

অনুবাদ

হে রাজন, যে স্থানে সদাচার-সম্পন্ন বিশুদ্ধ চিত্ত এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে ব্যাকুলিত চিত্ত শুদ্ধ ভক্তগণ অবস্থান করেন, সেই স্থানে যদি কেউ অমৃত ধারাবাহিনী সরিৎস্বরূপ ভগবানের লীলামৃত শ্রবণ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি বিস্মৃত হন, এবং তিনি সমস্ত ভয়, শোক ও মোহ থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন সেখানেই সম্ভব, যেখানে মহান ভগবদ্ভক্তেরা একত্রে বাস করে নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করেন। বৃন্দাবনের মতো পবিত্র স্থানে অনেক ভক্ত নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করেন। কেউ যদি এই রকম স্থানে শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে নিরন্তর স্রোতস্বিনীর মতো প্রবাহিত অমৃতের ধারা শ্রবণ করার সুযোগ পান, তা হলে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। কেউ যখন নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে সব রকম দেহ-চেতনার অতীত হন। কেউ যখন দেহ-চেতনায় থাকেন, তখন তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ ইত্যাদির বেদনা অনুভব করেন। কিন্তু তিনি যখন ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে যুক্ত হন, তখন তিনি দেহাত্মবুদ্ধির অতীত হন।

এই শ্লোকে *ভগবদ্-গুণানুকথন-শ্রবণ-ব্যগ্র-চেতসঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'সর্বদা যেখানে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, সেই স্থানের প্রতি অত্যন্ত উৎসুক'। যেখানে ব্যবসার লেনদেন হয়, ব্যবসায়ীরা সেই স্থানে যেতে অত্যন্ত উৎসুক। তেমনই ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী। মুক্ত ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা মাত্রই, তিনি কৃষ্ণভক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* একটি শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

"শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলা ও কার্যকলাপের আলোচনা শ্রবণ করা কর্ণ এবং হৃদয়ের পক্ষে অত্যন্ত সুখদায়ক। এই প্রকার জ্ঞানের অনুশীলনের ফলে, ক্রমশ মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, এবং তারপর মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাঁর আসক্তি স্থির হয়। তারপর প্রকৃত ভক্তি শুরু হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২৫) শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের মাধ্যমে, ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রতি আসক্তির উদয় হয়। এইভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন সম্ভব, এবং এই অনুশীলনের উন্নতির ফলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, ভগবানের সেবা শুরু হয় এবং ভগবানের প্রতি আসক্তির উদয় হয়, এবং এইভাবে অচিরেই পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়।

কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে সাফল্য লাভের রহস্য হচ্ছে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রবণ করা। কৃষ্ণভক্ত কখনও আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—এই সমস্ত শারীরিক আবশ্যকতার দ্বারা বিচলিত হন না।

শ্লোক ৪১

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥ ৪১ ॥

এতৈঃ—এই সবের দ্বারা; **উপদ্রুতঃ**—বিচলিত; **নিত্যম্**—সর্বদা; **জীব-লোকঃ**—জড় জগতে বদ্ধ জীব; **স্ব-ভাব-জৈঃ**—স্বাভাবিক; **ন করোতি**—করে না; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **কথা**—বাণীর; **অমৃত**—অমৃতের; **নিধৌ**—সমুদ্রে; **রতিম্**—আসক্তি।

অনুবাদ

যেহেতু বদ্ধ জীবেরা সর্বদাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি দেহের আবশ্যকতাগুলির দ্বারা উপদ্রুত, তাই ভগবানের অমৃতময় কথা শ্রবণে আসক্তি উৎপাদনের জন্য তাদের সময় প্রায় নেই।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন সম্ভব হয় না। নির্জন ভজন—নির্জন স্থানে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন—নবীন ভক্তের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ সে দেহের আবশ্যকতাগুলির (আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন) দ্বারা বিচলিত হবে। এইভাবে বিচলিত হওয়ার ফলে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন সম্ভব নয়। আমরা তাই দেখতে পাই যে, সহজিয়ারা, যারা সবকিছুই অত্যন্ত সহজ করে তোলে, তারা উন্নত স্তরের ভক্তদের সঙ্গ করে না। ভগবদ্ভক্তির নামে এই প্রকার ব্যক্তিরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, নেশা, দ্যূতক্রীড়া, আমিষ আহার আদি সব রকম পাপকর্মের প্রতি আসক্ত হয়। তথাকথিত অনেক ভক্ত রয়েছে, যারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের নামে এই সমস্ত পাপকর্মে লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যারা পাপকর্মে আসক্ত তাদের কখনও কৃষ্ণভক্ত বলে স্বীকার করা যায় না। পাপকর্মে রত ব্যক্তি কখনও কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করতে পারে না, যে কথা এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্লোক ৪২-৪৪

প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ ।
দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয় ॥ ৪২ ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্য পুলহঃ ক্রতুঃ ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪৩ ॥
অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রজাপতি-পতিঃ—সমস্ত প্রজাপতিদের পিতা ব্রহ্মা, **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **গিরিশঃ**—শিব; **মনুঃ**—মনু; **দক্ষ-আদয়ঃ**—রাজা দক্ষ ইত্যাদি; **প্রজা-অধ্যক্ষাঃ**—মানব-জাতির শাসক, **নৈষ্ঠিকাঃ**—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; **সনক-আদয়ঃ**—সনক আদি; **মরীচিঃ**—মরীচি; **অত্রি-অঙ্গিরসৌ**—অত্রি এবং অঙ্গিরা; **পুলস্ত্যঃ**—পুলস্ত্য; **পুলহঃ**—পুলহ; **ক্রতুঃ**—ক্রতু; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **বসিষ্ঠঃ**—বসিষ্ঠ; **ইতি**—এইভাবে; **এতে**—তাঁরা সকলে; **মৎ-অন্তাঃ**—যাঁদের শেষে আমি; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—ব্রাহ্মণ, বৈদিক শাস্ত্রের বক্তা; **অদ্য অপি**—আজ পর্যন্ত; **বাচঃ-পতয়ঃ**—বাণীর পতি; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **সমাধিভিঃ**—সমাধির দ্বারা; **পশ্যন্তঃ**—দর্শন করে; **অপি**—যদিও; **ন পশ্যন্তি**—দেখে না; **পশ্যন্তম্**—দর্শক; **পরম-ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

সমস্ত প্রজাপতিদের পিতা পরম শক্তিমান ব্রহ্মা; মহাদেব, মনু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ; সনক, সনাতন আদি সর্বোচ্চ স্তরের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বসিষ্ঠ আদি মহর্ষিগণ; এবং আমার মতো অন্যান্য ব্রহ্মবাদী ও বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায় দ্বারা নিরন্তর অনুসন্ধান করেও আজ পর্যন্ত সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে নি।

তাৎপর্য

ডারউইনের মতো মূর্খ নৃতত্ত্ববিৎদের মতে, চল্লিশ হাজার বছর আগে এই লোকে বুদ্ধিমান প্রাণীর আবির্ভাব হয়নি, কারণ বিবর্তনের পন্থা তখনও সেই স্তরে পৌঁছায়নি। কিন্তু, বৈদিক ইতিহাসে—পুরাণ এবং মহাভারতে কোটি কোটি বছর পূর্বে মানুষের

ইতিহাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। সৃষ্টির শুরুতে রয়েছেন একজন পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্রহ্মা, এবং তাঁর থেকে সমস্ত মনুদের, সনক, সনাতন আদি ব্রহ্মচারীদের, মহাদেবের এবং নারদ মুনির মতো মহর্ষির উদ্ভব হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তিরা কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা বৈদিক জ্ঞানের অধিকারি হয়েছেন। *বেদে* মানুষ এবং অন্য সমস্ত জীবদের পূর্ণজ্ঞান নিহিত রয়েছে। উপরোক্ত সমস্ত মহাপুরুষেরা কেবল ত্রিকালজ্ঞ শক্তিমানই ছিলেন না, তাঁরা ভগবদ্ভক্তও ছিলেন। মহাজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভ করা সত্ত্বেও, তাঁরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে জীবের সম্পর্ক পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। অর্থাৎ, অসীম সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান সীমিত। তা থেকে বোঝা যায় যে, কেবলমাত্র জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না, তাঁকে জানতে হয় শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) উল্লেখ করা হয়েছে—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—শুদ্ধ, দিব্য, প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত তত্ত্বতভাবে ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান সম্বন্ধে সকলেরই কিছু অপূর্ণ ধারণা রয়েছে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা তাদের জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে অক্ষম। ভগবদ্ভক্তির স্তরে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান পূর্ণ হয় না। সেই কথা বেদের বাণীতে প্রতিপন্ন হয়েছে—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/২৯)

জ্ঞানীরা হাজার হাজার বছর ধরে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অনুমান করে চলে, কিন্তু ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পরম মহিমা উপলব্ধি করা যায় না। এই শ্লোকে যে সমস্ত মহর্ষিদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ব্রহ্মলোকের নিকটবর্তী লোকে বাস করেন, যে ব্রহ্মলোকে সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার—এই চারজন ঋষির সঙ্গে ব্রহ্মা বাস করেন। এই সমস্ত ঋষিরা দক্ষিণী নক্ষত্র নামক বিভিন্ন নক্ষত্রে বাস করেন, যেগুলি ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করে। এই ধ্রুবলোক হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, এবং সমস্ত গ্রহলোকগুলি ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ঘুরছে। যতদূর আমরা দেখতে পাই, সমস্ত নক্ষত্রগুলি হচ্ছে এক-একটি গ্রহলোক,

এবং সেগুলি সবই এই একটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। পাশ্চাত্যের মতবাদ অনুসারে, সমস্ত নক্ষত্রগুলিই হচ্ছে বিভিন্ন সূর্য; কিন্তু বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে, এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে কেবলমাত্র একটি সূর্যই অবস্থান করছে। তথাকথিত সমস্ত নক্ষত্রগুলি হচ্ছে বিভিন্ন গ্রহলোক। এই ব্রহ্মাণ্ডের অতিরিক্ত কোটি কোটি অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং তাদের প্রত্যেকটিতে এই প্রকার অসংখ্য গ্রহ ও নক্ষত্র রয়েছে।

শ্লোক ৪৫

শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥

শব্দ-ব্রহ্মণি—বৈদিক শাস্ত্রে; **দুষ্পারে**—অনন্ত; **চরন্তঃ**—লিপ্ত হয়ে; **উরু**—অত্যন্ত; **বিস্তরে**—বিস্তৃত; **মন্ত্র**—বৈদিক মন্ত্র; **লিঙ্গৈঃ**—লক্ষণের দ্বারা; **ব্যবচ্ছিন্নম্**—আংশিক শক্তিসম্পন্ন (দেবতা); **ভজন্তঃ**—পূজা করে; **ন বিদুঃ**—তারা জানে না; **পরম্**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

অনন্ত বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন এবং বৈদিক মন্ত্রের লক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করা সত্ত্বেও, তাঁরা পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৭/২০) বলা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং *নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥*

"যাদের মন জড়-জাগতিক বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ পন্থায় তাঁদের পূজা করে।" অধিকাংশ মানুষ শক্তিলাভের জন্য দেব-দেবীদের পূজা করতে আগ্রহী। প্রত্যেক দেবতার বিশেষ শক্তি রয়েছে। যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের পৃথিবীর উপর বারিবর্ষণ করার শক্তি রয়েছে, যার ফলে ভূপৃষ্ঠে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়। *বেদে* এই দেবতার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ।* ইন্দ্র তাঁর হস্তে বজ্র ধারণ করে জল সরবরাহের ব্যবস্থার পরিচালনা করেন। ইন্দ্রের দ্বারা বজ্র

নিয়ন্ত্রিত হয়। তেমনই, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য আদি অন্যান্য দেবতাদের বিশিষ্ট শক্তি রয়েছে। এই সমস্ত দেবতারা তাঁদের প্রতীকস্বরূপ অস্ত্রের মাধ্যমে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা পূজিত হন। তাই এখানে বলা হয়েছে—*মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নম্।* এই প্রকার পূজার দ্বারা কর্মীরা পশু, ধন, সুন্দরী পত্নী, বহু অনুগামী ইত্যাদি জড় ঐশ্বর্য লাভের বর প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না।

শ্লোক ৪৬

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ৪৬ ॥

যদা—যখন; **যস্য**—যাঁকে, **অনুগৃহ্ণাতি**—অহৈতুকী কৃপার দ্বারা অনুগ্রহ করেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-ভাবিতঃ**—ভক্তের দ্বারা অনুভূত; **সঃ**—এই প্রকার ভক্ত; **জহাতি**—পরিত্যাগ করেন; **মতিম্**—চেতনা, **লোকে**—জড় জগতে, **বেদে**—বৈদিক অনুষ্ঠানে; **চ**—ও; **পরিনিষ্ঠিতাম্**—স্থির।

অনুবাদ

কেউ যখন পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তিনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপারূপ অনুগ্রহ লাভ করেন। তখন চিন্ময় চেতনায় জাগরিত হয়ে, ভগবদ্ভক্ত বেদের কর্মকাণ্ডে বর্ণিত সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ এবং আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জ্ঞানীরা ভগবানকে জানতে অক্ষম। তেমনই, এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা বৈদিক আচার এবং সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে, তারাও ভগবানকে দর্শন করতে অক্ষম। এই দুটি শ্লোকে কর্মী এবং জ্ঞানীদের ভগবানকে জানার অযোগ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, মানুষ যখন জ্ঞান এবং কর্মের আবরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*), তখনই কেবল তিনি জড়-জাগতিক বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত হতে পারেন। এই শ্লোকে *আত্ম-ভাবিতঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, কেউ যখন নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন, তখন ভগবান তাঁর মনে জাগরিত হন। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবানের

শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করবেন (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। শুদ্ধ ভক্ত ক্ষণিকের জন্যও ভগবানের চিন্তায় মগ্ন না হয়ে থাকতে পারেন না। নিরন্তর ভগবানের এই চিন্তার কথা বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *সততযুক্তানাম্*, সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত। *ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্*—এটিই হচ্ছে প্রেমভক্তি। ভগবান যেহেতু ভক্তের অন্তর থেকে তাঁকে নির্দেশ দেন, তাই ভক্ত সমস্ত জড় জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হন। বৈদিক আচার অনুষ্ঠান গুলিকেও জড় জাগতিক কার্যকলাপ বলে মনে করা হয়, কারণ এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা কেবল দেবলোকে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বলেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করবে; যারা ভূতপ্রেত এবং পিশাচদের পূজা করে, তারা তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে; যারা পিতৃদের পূজা করে, তারা পিতৃলোকে যাবে; আর যারা আমার পূজা করে, তারা আমার সঙ্গে বাস করবে।"

আত্মভাবিতঃ শব্দটি এও ইঙ্গিত করে যে, ভক্ত সর্বদা বদ্ধ জীবদের উদ্ধারের জন্য ভগবানের বাণী প্রচার করেন। ষড়্গোস্বামীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম সংস্থাপকৌ লোকানাং হিতকারিণৌ।* ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা চিন্তা করেন কিভাবে অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করা যায়। কৃপাময় ভক্তদের দ্বারা বদ্ধ জীবদের উদ্ধারের প্রচেষ্টায় প্রভাবিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার দ্বারা মানুষের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করেন। ভক্ত যখন অন্য ভক্তের আশীর্বাদ লাভ করেন, তখন তিনি কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হন। *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *বেদেষু দুর্লভম্*—পরমেশ্বর ভগবানকে কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। *অদুর্লভম্ আত্মভক্তৌ*—কেবল ঐকান্তিক ভক্তই ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

এই জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টি, এবং জীবেরা এখানে এসেছে সুখভোগ করার জন্য। বিভিন্ন বিধিনিষেধ অনুসারে, বৈদিক নির্দেশাবলী তাদেরকে পথপ্রদর্শন করে, এবং বুদ্ধিমান মানুষ এই সমস্ত উপদেশের সদ্ব্যবহার করে। এইভাবে তারা নির্বিঘ্নে তাদের জড় জাগতিক জীবন উপভোগ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে মায়িক, এবং নিজের চেষ্টায় মায়ার এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সাধারণ মানুষেরা জড় জাগতিক কার্যকলাপে ব্যস্ত, এবং যখন তাদের কিছুটা উন্নতি সাধন

হয়, তখন তারা বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সে যখন এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, তখন সে পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসে। এইভাবে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের অনুগামীগণ এবং জড় জাগতিক কার্যকলাপের অনুগামীগণ উভয়েই বদ্ধ জীবনে আবদ্ধ। এই সমস্ত মানুষেরা শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির বীজ প্রাপ্ত হয়। সেই কথা *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*।

কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন আর তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন না। মানুষ যখন বিভিন্ন উপাধির আবরণে আচ্ছাদিত থাকে, তখন সে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে না। এই সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে (*সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম্*), বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করার জন্য শুদ্ধ হতে হয়। *হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা ভগবদ্ভক্তি। নিষ্ঠাবান ভক্ত সর্বদাই প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সহায়তা প্রাপ্ত হন, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ দান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

এটি হচ্ছে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর। সেই সময় ভগবদ্ভক্ত অন্য ভক্তদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হন, এবং তাঁর জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। তখন তিনি ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং জড়-জাগতিক সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন, যার শুরু হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে। মানব সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তর বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টরূপে বলেছেন। তখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের নিত্যদাস বলে অনুভব হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই পদ গ্রহণ করেছিলেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

(*পদ্যাবলী* ৬৩)

"আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই অথবা শূদ্র নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই অথবা সন্ন্যাসী নই। তা হলে আমি কি? আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাসের অনুদাসের নিত্যদাস।" গুরু পরম্পরার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যা হচ্ছে পূর্ণ চিন্ময় স্থিতি।

শ্লোক ৪৭

তস্মাৎকর্মসু বর্হিষ্মন্নজ্ঞানাদর্থকাশিষু ।
মার্থদৃষ্টিং কৃথাঃ শ্রোত্রস্পর্শিষ্বস্পৃষ্টবস্তুষু ॥ ৪৭ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **বর্হিষ্মন্**—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ, **অজ্ঞানাৎ**—অজ্ঞানবশত; **অর্থ-কাশিষু**—সকাম কর্মফলের আকর্ষণে; **মা**—কখনই না; **অর্থ-দৃষ্টিম্**—জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করে; **কৃথাঃ**—কর; **শ্রোত্র-স্পর্শিষু**—শ্রুতিমধুর; **অস্পৃষ্ট**—স্পর্শ না করে; **বস্তুষু**—প্রকৃত স্বার্থ।

অনুবাদ

হে মহারাজ বর্হিষ্মান! বৈদিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান অথবা সকাম কর্ম যতই শ্রুতিমধুর অথবা জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে হোক না কেন, কখনও সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন না। সেগুলিকে কখনই পরমার্থ বলে মনে করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৪২-৪৩) বলা হয়েছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥

"অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা বেদের পুষ্পিত বাণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, যা স্বর্গলোকে উন্নতি, উচ্চকুলে জন্ম, বলবীর্য লাভ, ইত্যাদি বিভিন্ন সকাম কর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেয়। ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং ঐশ্বর্যময় জীবন লাভের বাসনায় তারা বলে যে, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই।"

সাধারণত মানুষ বৈদিক কর্মকাণ্ডে অনুমোদিত সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। কেউ রাজা বর্হিষ্মানের মতো মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে স্বর্গলোকে উন্নীত

হওয়ার প্রতি আসক্ত হতে পাবেন, কিন্তু নাবদ মুনি রাজা বর্হিষ্মানকে এই প্রকাব সকাম কর্ম অনুষ্ঠান থেকে বিবত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তিনি এখানে তাঁকে সরাসরিভাবে বলছেন, "কখনও এই প্রকার অনিত্য লাভের অভিলাষী হবেন না।" আধুনিক সভ্যতায় মানুষ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পন্থার মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির সম্পদগুলি উপভোগ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু এটি প্রকৃত উন্নতি নয়, তা কেবল শুনতেই মধুর লাগে। যদিও এই প্রকার কৃত্রিম পন্থায় আমরা তথাকথিতভাবে উন্নতিসাধন কবছি, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েছি। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, *জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমাব ভজনে বাধা* ।

এই লোকে অথবা অন্যান্য লোকে জীবনের যে ক্ষণিক সুখ অনুভব হয় তা অলীক, কারণ তা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পর্শ পর্যন্ত করে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। জীবনের সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত মানুষ হয় স্থূল জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অথবা বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। রাজা বর্হিষ্মানকে এখানে অনুরোধ কবা হয়েছে এই প্রকার কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত না হতে। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর্যসমাজ নামক একটি সংস্থা বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। কিন্তু এই শ্লোকে উল্লেখ কবা হয়েছে যে, এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান মায়িক। প্রকৃতপক্ষে মানব-জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবৎ-উপলব্ধি বা কৃষ্ণভক্তি। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান অবশ্যই অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং শ্রুতিমধুর, কিন্তু সেগুলি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করে না।

শ্লোক ৪৮

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দনঃ ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্মকমতদ্বিদঃ ॥ ৪৮ ॥

স্বম্—নিজের; **লোকম্**—আলয়; **ন**—কখনই না; **বিদুঃ**—জানে; **তে**—সেই প্রকার ব্যক্তিরা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **যত্র**—যেখানে, **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **জনার্দনঃ**—শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু; **আহুঃ**—বলে; **ধূম্র-ধিয়ঃ**—অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা, **বেদম্**—চতুর্বেদ; **স-কর্মকম্**—কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে পূর্ণ; **অ-তৎ-বিদঃ**—অজ্ঞান মানুষেরা।

অনুবাদ

যারা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন তারা বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলিকে বেদের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে। তারা জানে না যে, বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে জানিয়ে দেওয়া। তাদের প্রকৃত আবাসের কথা ভুলে গিয়ে, মোহবশত তারা অন্য গৃহের অন্বেষণ করে।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষ জানে না যে, তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তাদের প্রকৃত আলয় যে চিৎ জগৎ সেই কথা মানুষ ভুলে গেছে। চিৎ-জগতে বহু বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে এবং সেখানকার সর্বোচ্চ লোক হচ্ছে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবন। সভ্যতার তথাকথিত উন্নতি সত্ত্বেও বৈকুণ্ঠলোক বা চিন্ময় জগৎ সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান নেই। তথাকথিত সভ্য মানুষেরা এখন অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা জানে না যে, তারা যদি সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও যায়, তবুও তাদের পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) বলা হয়েছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত সব কটি স্থানই বারংবার জন্মমৃত্যুর দুঃখময় সংসারচক্র। কিন্তু কেউ যখন আমার ধাম প্রাপ্ত হয়, হে কৌন্তেয়। তখন আর তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না।"

কেউ যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকেও যায়, তবুও তার পুণ্যকর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে, পুনরায় তাকে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। মহাকাশযান আকাশের অনেক ঊর্ধ্বে যেতে পারে, কিন্তু ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে সেগুলিকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় মোহবশত। জীবনের প্রকৃত প্রয়াস হচ্ছে প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া. সেই পন্থা *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে। *যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*—যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যান। মনুষ্য-জীবন অত্যন্ত দুর্লভ, এবং অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার অর্থহীন প্রচেষ্টায় তার অপব্যবহার করা উচিত নয়। যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। চিন্ময়

বৈকুণ্ঠলোক, এবং বিশেষ করে গোলোক বৃন্দাবন নামক লোকের তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া উচিত, এবং শ্রবণের মাধ্যমে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*) যে অতি সরল ভগবদ্ভক্তির পন্থা রয়েছে, সেই পন্থাটি আয়ত্ত করার শিক্ষালাভ করা উচিত। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১২/৩/৫১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে পরম ধামে ফিরে যাওয়া যায় (*পরং ব্রজেৎ*)। এই পন্থাটি বিশেষ করে এই যুগের মানুষদের জন্য (*কলের্দোষনিধে*)। এই কলিযুগের এটি হচ্ছে একটি বিশেষ সুবিধা—কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, সমস্ত জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৪৯

আস্তীর্য দর্ভৈঃ প্রাগগ্রেঃ কার্ৎস্ন্যেন ক্ষিতিমণ্ডলম্ ।
স্তব্ধো বৃহদ্বধান্মানী কর্ম নাবৈষি যৎপরম্ ।
তৎকর্ম হরিতোষং যৎসা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ॥ ৪৯ ॥

আস্তীর্য—আচ্ছাদিত করে; **দর্ভৈঃ**—কুশের দ্বারা; **প্রাক্-অগ্রেঃ**—পূর্বমুখী; **কার্ৎস্ন্যেন**—সমগ্র; **ক্ষিতি-মণ্ডলম্**—পৃথিবীর উপরিভাগ; **স্তব্ধঃ**—গর্বান্ধ ভুঁইফোড় ব্যক্তি; **বৃহৎ**—মহান; **বধাৎ**—হত্যাজনিত; **মানী**—নিজেকে অত্যন্ত মহান বলে মনে করে, **কর্ম**—কার্যকলাপ; **ন অবৈষি**—তুমি জান না; **যৎ**—যা; **পরম্**—পরম; **তৎ**—তা; **কর্ম;**—কর্ম; **হরি-তোষম্**—ভগবানকে সন্তুষ্ট করে; **যৎ**—যা; **সা**—তা; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **তৎ**—ভগবানকে; **মতিঃ**—চেতনা; **যয়া**—যার দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন! সারা পৃথিবী পূর্বমুখী তীক্ষ্ণাগ্র কুশের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে, এবং তার ফলে যজ্ঞে বহু পশু বধ করার দরুন আপনি অত্যন্ত গর্বিত হয়েছেন। আপনার এই মূর্খতাবশত আপনি জানেন না যে, ভক্তিই হচ্ছে ভগবানকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়। ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানই আপনার একমাত্র কর্তব্যকর্ম হওয়া উচিত। ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়াই হচ্ছে যথার্থ বিদ্যার ফল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে নারদ মুনি বহু পশুবলি দিয়ে যজ্ঞ করার জন্য রাজাকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাজা মনে করেছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত মহান কারণ তিনি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন, কিন্তু দেবর্ষি নারদ তাঁকে সরাসরিভাবে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন যে, এই পশুবলির ফলে তাঁর মিথ্যা পদমর্যাদাই কেবল বর্ধিত হবে। প্রকৃতপক্ষে যে কর্ম মানুষকে কৃষ্ণভক্তির পথে পরিচালিত করে না তা পাপ কর্ম, এবং যে বিদ্যা কৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে না তা ভ্রান্ত। যদি কৃষ্ণভাবনামৃতের অভাব হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেই কর্ম এবং সেই বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।

শ্লোক ৫০

হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ ॥ ৫০ ॥

হরিঃ—শ্রীহরি; **দেহ-ভৃতাম্**—দেহধারী জীবের; **আত্মা**—পরমাত্মা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতি; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **তৎ**—তাঁর; **পাদ-মূলম্**—পদ; **শরণম্**—আশ্রয়; **যতঃ**—যা থেকে; **ক্ষেমঃ**—সৌভাগ্য; **নৃণাম্**—মানুষের; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি পরমাত্মারূপে এই জগতে জড় দেহধারী সমস্ত জীবের পথপ্রদর্শক। তিনি হচ্ছেন জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের পরম নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের পরম বন্ধু, এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা। তা করা হলে, মানুষের জীবন মঙ্গলময় হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—"হে অর্জুন। পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।" শরীরের ভিতর জীবাত্মা রয়েছে, এবং পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানও সেখানে রয়েছেন। তাঁকে বলা হয় *অন্তর্যামী* এবং *চৈত্যগুরু।* *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।"

অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার দ্বারাই সব কিছু পরিচালিত হয়। তাই তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হয়ে সুখী হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাঁর নির্দেশ প্রাপ্ত হতে হলে, তাঁর ভক্ত হতে হয়। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রীতিপূর্বক আমার আরাধনা করে, তাদের আমি বাস্তবিক উপলব্ধি প্রদান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

পরমাত্মা যদিও সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান (*ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*), তবুও তিনি কেবল সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তেরই সঙ্গে কথা বলেন। *শ্রীচৈতন্য ভাগবতে* (*অন্ত্যলীলা* ৩/৪৫) বলা হয়েছে—

তাহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন ।
কৃষ্ণপাদ-পদ্মে যে করয়ে স্থির মন ॥

"যিনি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করেছেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভ করেছেন এবং সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেছেন বলে বুঝতে হবে।" *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* সেই সম্বন্ধে আরও কয়েকটি খুব সুন্দর শ্লোক রয়েছে—

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয় ।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বৃত্তি রয়' ॥ (*আদিলীলা* ১৩/১৭৮)
'দিগ্বিজয় করিব,' বিদ্যার কার্য নহে ।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে ॥ (*আদিলীলা* ১৩/১৭৩)
পড়ে কেনে লোক? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে ।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে? (*আদিলীলা* ১২/৪৯)
তাহারে সে বলি ধর্ম, কর্ম সদাচার ।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার ॥ (*অন্ত্যলীলা* ৩/৪৪)

সকলেরই হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, এবং সদাচার, সৎকর্ম, ধর্ম ও বিদ্যার প্রভাবে তা জাগরিত করতে হয়। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের

উদ্দেশ্য। এক সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোন বিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং তার উত্তরে রামানন্দ রায় বলেছিলেন যে, কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধনই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

শ্লোক ৫১

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি ।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ॥ ৫১ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রিয়-তমঃ**—সর্বাপেক্ষা প্রিয়; **চ**—ও; **আত্মা**—পরমাত্মা; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **ন**—কখনই না; **ভয়ম্**—ভয়; **অণু**—অল্প; **অপি**—ও; **ইতি**—এইভাবে; **বেদ**—(যিনি) জানেন; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **বিদ্বান্**—বিদ্বান, **যঃ**—যিনি; **বিদ্বান্**—বিদ্বান; **সঃ**—তিনি; **গুরুঃ**—গুরু, **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি থেকে অভিন্ন।

অনুবাদ

যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁর এই সংসারে ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। তার কারণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা এবং সকলের পরম সুহৃৎ। যিনি এই রহস্য জানেন তিনিই প্রকৃত বিদ্বান, এবং এই বিদ্যার প্রভাবেই তিনি সারা জগতের গুরু হতে পারেন। যিনি প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গুরু, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।* সমস্ত শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। শ্রীগুরুদেব পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের সব চাইতে বিশ্বস্ত সেবক (*কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য*)। অর্থাৎ পরমাত্মা এবং আত্মা সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়। সকলেই নিজেকে ভালবাসে, এবং যখন মানুষ পারমার্থিক মার্গে উন্নতি সাধন করেন, তখন তিনি পরমাত্মাকেও ভালবাসেন। যিনি আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কারোর পূজা করার উপদেশ দেন না। তিনি জানেন যে, কাম এবং জড় সুখভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করা থেকে ভগবানের আরাধনা করা

অনেক সহজ। তাই ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন। এই প্রকার ব্যক্তিই হচ্ছেন প্রকৃত গুরু। *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্‌বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

"ব্রাহ্মণের ষড়্‌বিধ কর্মে নিপুণ এবং বৈদিক মন্ত্রতন্ত্রে অত্যন্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণও যদি ভগবানের ভক্ত না হন, তা হলে তিনি গুরু হতে পারেন না। কিন্তু, শ্বপচ বা চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, তা হলে তিনি গুরু হওয়ার উপযুক্ত।" অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে গুরু হওয়া যায় না। উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ভগবদ্ভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যিনি গুরু, তাঁর সান্নিধ্য লাভ হলে বুঝতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবান সাক্ষাৎ উপস্থিত হয়েছেন। এখানে *গুরুর্হরিঃ* শব্দটির বর্ণনা অনুসারে, সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা সাক্ষাৎ ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করারই সমতুল্য। অতএব, এই প্রকার সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যিনি একমাত্র প্রেমাস্পদ বলে জানেন, সেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করাই জীবনের চরম সাফল্য। ভগবানের এই প্রকার অন্তরঙ্গ ভক্তকে পূজা করা উচিত।

শ্লোক ৫২

নারদ উবাচ

প্রশ্ন এবং হি সংছিন্নো ভবতঃ পুরুষর্ষভ ।
অত্র মে বদতো গুহ্যং নিশাময় সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫২ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **এবম্**—এইভাবে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সংছিন্নঃ**—উত্তর, **ভবতঃ**—আপনার; **পুরুষ-ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; **অত্র**—এখানে, **মে বদতঃ**—আমি যেভাবে বলছি; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **নিশাময়**—শ্রবণ কর; **সু-নিশ্চিতম্**—সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর আমি প্রদান করলাম। এখন সাধুসম্মত এবং অত্যন্ত গোপনীয় আর একটি বিষয় আমি বলছি, সেই কথা শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি স্বয়ং রাজা বর্হিষ্মানের গুরুরূপে আচরণ করছেন। নারদ মুনি চেয়েছিলেন যে, তাঁর উপদেশের ফলে রাজা অচিরেই তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডীয় কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করবেন। কিন্তু রাজা যদিও সবকিছু বুঝতে পেরেছিলেন, তবুও তিনি সেই সমস্ত কার্যকলাপ ত্যাগ করতে তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাবে যে, রাজা তাঁর তপস্যারত পুত্রদের গৃহে ফিরিয়ে আনার কথা বিবেচনা করছিলেন। তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর, তাঁদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি গৃহত্যাগ করবেন। এটিই অধিকাংশ মানুষের মনোভাব। তারা সদ্গুরু গ্রহণ করে তাঁর উপদেশ শ্রবণ করে, কিন্তু শ্রীগুরুদেব যখন ইঙ্গিত করেন গৃহত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে, তখন তারা ইতস্তত করে। শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে শিষ্য যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে যে, জড়-জাগতিক জীবন, সকাম কর্ম, তার পক্ষে মোটেই লাভপ্রদ নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে উপদেশ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে জীবনের শুরু থেকেই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা উচিত। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন—*কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৬/১)। বেদের সমস্ত নির্দেশ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণভাবনামৃত এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জড় জগতে সকাম কর্মে অনর্থক সময়ের অপচয় হয়। নারদ মুনি তাই স্থির করেছিলেন যে, তিনি রাজাকে আর একটি রূপক শোনাবেন, যাতে তিনি এই জড় জগতে তাঁর সংসার জীবন পরিত্যাগ করেন।

শ্লোক ৫৩

ক্ষুদ্রশ্চরং সুমনসাং শরণে মিথিত্বা
রক্তং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামসু লুব্ধকর্ণম্ ।
অগ্রে বৃকানসুতৃপোঽবিগণয্য যান্তং
পৃষ্ঠে মৃগং মৃগয় লুব্ধকবাণভিন্নম্ ॥ ৫৩ ॥

ক্ষুদ্রম্—ঘাসের উপর; **চরম্**—বিচরণ করে, **সুমনসাম্**—সুন্দর পুষ্পোদ্যানের; **শরণে**—আশ্রয়ে; **মিথিত্বা**—স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে, **রক্তম্**—আসক্ত; **ষট্-অঙ্ঘ্রি**—ভ্রমরের; **গণ**—সমূহের; **সামসু**—সঙ্গীতে; **লুব্ধ-কর্ণম্**—যার কর্ণ আকৃষ্ট হয়েছে, **অগ্রে**—সম্মুখে; **বৃকান্**—ব্যাঘ্র, **অসু-তৃপঃ**—অন্যকে আহার করে যে জীবন ধারণ

করে; **অবিগণয্য**—উপেক্ষা করে; **যান্তম্**—গমন করে; **পৃষ্ঠে**—পশ্চাতে; **মৃগম্**—হরিণ; **মৃগয়**—অন্বেষণ করে; **লুব্ধক**—ব্যাধের; **বাণ**—বাণের দ্বারা; **ভিন্নম্**—বিদ্ধ হতে পারে।

অনুবাদ

হে রাজন্! ঐ হরিণটিকে দেখুন, যে সুন্দর পুষ্পোদ্যানে তার স্ত্রীর সঙ্গে মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছে। সেই উদ্যানে সে লুব্ধকর্ণ হয়ে ভ্রমরের মধুর গীত শ্রবণ করছে। তার অবস্থা একবার বিবেচনা করে দেখুন। সে জানে না তার সম্মুখে একটি বাঘ, যে অন্যের মাংস আহার করে জীবন ধারণ করে। সেই হরিণটির পশ্চাতে এক ব্যাধ, যে তার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাকে বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে। এইভাবে সেই হরিণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তাৎপর্য

এই রূপকটির মাধ্যমে হরিণের অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার কথা বিচার করতে রাজাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। হরিণটি যদিও চারদিক থেকে বিপদগ্রস্ত হয়েছে, তবুও সে সেই বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে, সেই সুন্দর পুষ্পোদ্যানে মনের আনন্দে ঘাস খেতে থাকে। সমস্ত জীবেরাই, বিশেষ করে মানুষেরা, তাদের আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে নিজেদের অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে। যেন পুষ্পোদ্যানে বাস করে এবং মধুর ভ্রমরগীত শ্রবণ করে সকলেই গৃহস্থ জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ স্ত্রীকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করছে। ভ্রমরের গুঞ্জন শিশুদের আধো আধো বুলির সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানুষের অবস্থা ঠিক সেই হরিণের মতো, যার সম্মুখে রয়েছে একটি বাঘ। এই বাঘ হচ্ছে সর্বগ্রাসী কালের প্রতীক। জীবের সকাম কর্ম আর এক প্রকার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যার ফলে তাকে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়। হরিণেরা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বৃথাই মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়। হরিণেরা অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত। যারা এইভাবে হরিণের মতো জীবন যাপন করে, তারা অচিরেই কালের প্রভাবে নিহত হবে। বৈদিক শাস্ত্রে তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের সকলের কর্তব্য হচ্ছে মৃত্যুর পূর্বে আমাদের স্বরূপ অবগত হওয়া এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা। *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুসারে (১১/৯/২৯)—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥

বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর আমরা এই মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছি, তাই মৃত্যুর পূর্বে আমাদের ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা

শ্লোক ৫৪

সুমনঃসমধর্মণাং স্ত্রীণাং শরণ আশ্রমে পুষ্পমধুগন্ধবৎক্ষুদ্রতমং কাম্যকর্মবিপাকজং কামসুখলবং জৈহ্ব্যৌপস্থ্যাদি বিচিন্বন্তং মিথুনীভূয় তদভিনিবেশিতমনসং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামগীতবদতি-মনোহরবনিতাদিজনালাপেষ্বতিতরামতিপ্রলোভিতকর্ণমগ্রে বৃকযূথবদাত্মন আয়ুর্হরতোঽহোরাত্রান্তান্ কাললববিশেষানবিগণয্য গৃহেষু বিহরন্তং পৃষ্ঠত এব পরোক্ষমনুপ্রবৃত্তো লুব্ধকঃ কৃতান্তোঽন্তঃশরেণ যমিহ পরাবিধ্যতি তমিমমাত্মানমহো রাজন্ ভিন্নহৃদয়ং দ্রষ্টুমর্হসীতি ॥ ৫৪ ॥

সুমনঃ—পুষ্প, **সম-ধর্মণাম্**—ঠিক এক রকম, **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **শরণে**—আশ্রয়ে; **আশ্রমে**—গৃহস্থ-জীবনে; **পুষ্প**—ফুলে, **মধু**—মধুর, **গন্ধ**—সৌরভ, **বৎ**—সদৃশ, **ক্ষুদ্রতমম্**—সব চাইতে নগণ্য; **কাম্য**—বাসনা; **কর্ম**—কার্যকলাপের, **বিপাক-জম্** ফলস্বরূপ প্রাপ্ত, **কাম-সুখ**—ইন্দ্রিয়সুখের, **লবম্**—কণিকা, **জৈহ্ব্য**—জিহ্বার সুখ, **ঔপস্থ্য**—মৈথুনসুখ; **আদি**—ইত্যাদি, **বিচিন্বন্তম্**—সর্বদা চিন্তা করে, **মিথুনী-ভূয়**—মৈথুনরত, **তৎ**—তার পত্নীতে; **অভিনিবেশিত**—সর্বদা মগ্ন হয়ে; **মনসম্**—যার মন, **ষট্-অঙ্ঘ্রি**—ভ্রমরের; **গণ**—সমূহ; **সাম**—মধুর; **গীত**—সঙ্গীত; **বৎ**—সদৃশ, **অতি**—অত্যন্ত, **মনোহর**—আকর্ষণীয়, **বনিতা-আদি**—পত্নী ইত্যাদি; **জন**—মানুষের; **আলাপেষু**—আলাপে, **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **অতি**—অত্যধিক, **প্রলোভিত**—আসক্ত, **কর্ণম্**—কর্ণ, **অগ্রে**—সম্মুখে, **বৃক-যূথ**—বাঘের দল; **বৎ**—সদৃশ, **আত্মনঃ**—নিজের; **আয়ুঃ**—আয়ু; **হরতঃ**—হরণ করে; **অহঃ-রাত্রান্**—দিবারাত্র, **তান্**—তাদের সকলের, **কাল-লব-বিশেষান্**—ক্ষণকাল; **অবিগণয্য**—বিবেচনা না করে; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-জীবনে; **বিহরন্তম্**—উপভোগ করে; **পৃষ্ঠতঃ**—পিছন থেকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পরোক্ষম্**—অদৃশ্যরূপে, **অনুপ্রবৃত্তঃ**—পশ্চাদ্ধাবন করে; **লুব্ধকঃ**—ব্যাধ, **কৃত-**

অন্তঃ—যম; **অন্তঃ**—হৃদয়ে; **শরেণ**—বাণের দ্বারা; **যম্**—যাকে; **ইহ**—এই জগতে; **পরাবিধ্যতি**—বিদ্ধ করে, **তম্**—তা; **ইমম্**—এই; **আত্মানম্**—আপনি, **অহো রাজন্**—হে রাজন, **ভিন্ন-হৃদয়ম্**—যার হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **অর্হসি**—উচিত; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন! স্ত্রীলোকেরা ঠিক পুষ্পের মতো প্রথমে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিন্তু চরমে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। জীব স্ত্রীলোকের প্রতি কামাসক্ত হয়ে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মানুষ যেভাবে ফুলের সৌরভ উপভোগ করে, ঠিক সেইভাবে সে মৈথুনসুখ উপভোগ করে। এইভাবে সে জিহ্বা থেকে উপস্থ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখের জীবন উপভোগ করে এবং তার ফলে সে তার গৃহস্থ-জীবনকে অত্যন্ত সুখদায়ক বলে মনে করে। পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সে সর্বদা ইন্দ্রিয়সুখের চিন্তায় মগ্ন থাকে। তার পত্নী ও শিশুদের আলাপ তার কাছে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বলে মনে হয়, যা ঠিক ফুলে ফুলে মধু আহরণকারী ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনের মতো। সে ভুলে যায় যে তার সম্মুখে রয়েছে কাল, যা দিন ও রাত্রির মাধ্যমে তার আয়ু হরণ করছে। সে দেখতে পায় না যে, ধীরে ধীরে তার আয়ু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, এবং সে মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে একেবারেই গ্রাহ্য করে না, যিনি পশ্চাৎ দিক থেকে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন। এই কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। আপনি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছেন এবং চতুর্দিক থেকে সঙ্কটাপন্ন হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হওয়াই হচ্ছে জড় জাগতিক জীবন, এবং বিশেষ করে গৃহস্থ আশ্রমে এই বিস্মৃতি অত্যন্ত প্রবল হয়। গৃহস্থ আশ্রমে যুবা পুরুষ একজন যুবতী স্ত্রীর পাণিগ্রহন করে, যে প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরী থাকে। কিন্তু কালক্রমে, বহু সন্তান প্রসব করার ফলে এবং বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে, এবং সারা পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য সে তার পতির কাছে নানা প্রকার বস্তু দাবি করে। যৌবনে যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যাকে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই পত্নীকে তখন অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে মনে হয়। মানুষ দুটি কারণেই কেবল গৃহস্থ আশ্রমের প্রতি আসক্ত হয়—পতির জিহ্বার তৃপ্তিসাধনের জন্য পত্নী

নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য রন্ধন করে, এবং রাত্রে পত্নী তাকে মৈথুনসুখ প্রদান করে। গৃহস্থ আশ্রমের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি সর্বদা এই দুটি বিষয়ের কথা চিন্তা করে—সুস্বাদু খাদ্য এবং মৈথুনসুখ। পত্নীর কথাবার্তা যা পরিবারের বিনোদ প্রদানকারী বলে সুখদায়ক, এবং শিশুদেব আধো আধো বুলি, দুই-ই জীবকে আকৃষ্ট করে। তার ফলে সে ভুলে যায় যে, একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং পরবর্তী জীবনে অনুকূল শরীর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে।

পুষ্পোদ্যানে হরিণের রূপকটির মাধ্যমে দেবর্ষি নারদ রাজাকে বুঝিয়েছেন যে, রাজাকেও একদিন এই প্রকার পরিস্থিতিতে আটকে পড়তে হবে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ব্যক্তিই এই প্রকার গৃহস্থ-জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ, যা তাদের ভ্রান্ত পথে পবিচালিত করে। এইভাবে জীব ভুলে যায় যে, তাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হবে। সে কেবল তার পারিবারিক জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই ইঙ্গিত করেছেন—*হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত।* গৃহস্থ-জীবন ঠিক একটি অন্ধকূপের মতো যাতে পতিত হলে মানুষ অসহায় হয়ে মৃত্যুবরণ করে। প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি যখন সক্রিয় থাকে এবং শরীরে যখন যথেষ্ট বল থাকে, তখন গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করে, বৃন্দাবনে গিয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। বৈদিক সভ্যতায়, পঞ্চাশ বছর বয়সে গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করতে হয়, এবং তার পর বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার পরে অবশেষে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করতে হয়। সেটিই হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামক বৈদিক সভ্যতা। কেউ যখন গৃহস্থ-জীবন উপভোগ করার পর সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করেন।

গৃহস্থ-জীবনে বা সংসার জীবনে নিজের অবস্থা উপলব্ধি করা কর্তব্য। তাকেই বলা হয় বুদ্ধিমত্তা। স্ত্রীর সঙ্গে জিহ্বা ও উপস্থের সুখ উপভোগ করার জন্য গৃহস্থ-জীবনে সর্বদা আবদ্ধ হয়ে থাকা উচিত নয়। তার ফলে জীবন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়। বৈদিক সভ্যতায়, জীবনের বিশেষ স্তরে গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে, প্রয়োজন হলে জোব করেও তা করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত আজকালকার তথাকথিত বৈদিক সভ্যতার অনুসরণকারীরা তাদের জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্তও তাদের পরিবার পরিত্যাগ করে না। অবশেষে মৃত্যু জোর করে তাদের পরিবার থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে। তাই সমাজ-ব্যবস্থার এক আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন, এবং বৈদিক প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়োজন, অর্থাৎ, চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমেব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

শ্লোক ৫৫

স ত্বং বিচক্ষ্য মৃগচেষ্টিতমাত্মনোঽন্ত-
শ্চিত্তং নিযচ্ছ হৃদি কর্ণধুনীং চ চিত্তে ।
জহ্যঙ্গনাশ্রমমসত্তমযূথগাথং
প্রীণীহি হংসশরণং বিরম ক্রমেণ ॥ ৫৫ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **ত্বম্**—আপনি; **বিচক্ষ্য**—বিবেচনা করে; **মৃগচেষ্টিতম্**—হরিণের কার্যকলাপ, **আত্মনঃ**—নিজের; **অন্তঃ**—অন্তরে; **চিত্তম্**—চেতনা; **নিযচ্ছ**—স্থির করে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **কর্ণ-ধুনীম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **চ**—এবং; **চিত্তে**—চেতনাকে; **জহি**—পরিত্যাগ করে; **অঙ্গনা-আশ্রমম্**—গৃহস্থ-জীবন; **অসৎ-তম**—অত্যন্ত ঘৃণ্য; **যূথ-গাথম্**—পুরুষ এবং স্ত্রীর কাহিনীতে পূর্ণ; **প্রীণীহি**—গ্রহণ করুন; **হংস-শরণম্**—মুক্ত পুরুষের শরণ; **বিরম**—বিরক্ত হও; **ক্রমেণ**—ক্রমশ।

অনুবাদ

হে রাজন! আপনি হরিণের রূপকটি কেবল হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। আত্ম-চেতনায় মগ্ন হয়ে, সকাম কর্মের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার শ্রবণসুখ পরিত্যাগ করুন। মৈথুন আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করুন, এবং স্ত্রীপুরুষের আখ্যান শ্রবণের বাসনা পরিত্যাগ করে জীবন্মুক্ত ভগবদ্ভক্তের কৃপায় ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করুন। এইভাবে জড় জগতের আসক্তি থেকে মুক্ত হোন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর একটি গানে লিখেছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

মানুষ সাধারণত সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট। তারা সাধারণত স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, অথবা ব্রহ্মে লীন হতে চায়, কিংবা জিহ্বা এবং উপস্থের সুখে মোহিত হয়ে সংসার-জীবনে আবদ্ধ থাকতে চায়। দেবর্ষি নারদ স্পষ্টভাবে মহারাজ বর্হিষ্মানকে উপদেশ দিয়েছেন আজীবন গৃহস্থ-আশ্রমে আবদ্ধ

না থাকতে। গৃহস্থ-আশ্রমে থাকার অর্থ, স্ত্রীর অধীন হয়ে থাকা। এই সব ত্যাগ করে পরমহংস-আশ্রমে অবস্থিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় অবলম্বন করা উচিত। পরমহংস-আশ্রম হচ্ছে শ্রীগুরুদেব যাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রম। সদ্গুরুর লক্ষণ বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৩/২১) উল্লেখ করা হয়েছে—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

"যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে চায়, তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সদ্গুরুর অন্বেষণ করা এবং তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শরণাগত হওয়া। শ্রীগুরুদেবের যোগ্যতা হচ্ছে যে, তিনি বিচার-বিবেচনার দ্বারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করেছেন এবং তাই তিনি সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অন্যদেরও প্রত্যয় উৎপাদনে সক্ষম। এই প্রকার মহাত্মা, যিনি সমস্ত জড়-জাগতিক বিচার পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সদ্গুরু।"

পরমহংস হচ্ছেন তিনি, যিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করেছেন। কেউ যদি পরমহংস গুরুদেবের আশ্রয় অবলম্বন করেন, তা হলে তাঁর শিক্ষা এবং উপদেশের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে সংসার-জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে, চরমে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। এই শ্লোকে *অঙ্গনাশ্রমম্-অসত্তম-যূথ-গাথম্* উক্তিটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সারা জগৎ স্ত্রীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষ কেবল তার বিবাহিত স্ত্রীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না, সে মৈথুন-কেন্দ্রিক সাহিত্য এবং উপন্যাসের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার এটিই হচ্ছে কারণ। মানুষ তার নিজের চেষ্টায় এই জঘন্য সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু সে যদি পরমহংস সদ্গুরুর আশ্রয় অবলম্বন করে, তা হলে সে ক্রমশ আধ্যাত্মিক জীবনের স্তরে উন্নীত হয়।

বৈদিক শাস্ত্রের যে পুষ্পিত বাণী স্বর্গলোকে উন্নীত হতে অথবা ব্রহ্মে লীন হতে অনুপ্রাণিত করে তা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের জন্য, *ভগবদ্গীতায়* যাদের *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান, যার প্রভাবে জড় জগতের দুঃখময় পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মুক্ত সদ্গুরুর আশ্রয় অবলম্বন করে ক্রমশ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত, এবং তার ফলে জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হওয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে *হংসশরণম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে কুটিরে মহাপুরুষেরা অবস্থান করেন। সন্তপুরুষেরা সাধারণত দূরে নির্জন অরণ্যে অথবা অত্যন্ত সাধারণ কুটিরে বাস করেন। কিন্তু, আমাদের

বিচার করে দেখতে হবে যে, সময়েব পরিবর্তন হয়েছে। বনে অথবা কুটিরে বাস করা হয়তো সন্তপুরুষদের ব্যক্তিগত স্বার্থে শ্রেয় হতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের বাণী প্রচার করতে চান, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে, তা হলে তাঁকে বিভিন্ন স্তরের মানুষদের আমন্ত্রণ কবতে হবে যারা আরামদায়ক গৃহে বাস করতে অভ্যস্ত। তাই এই যুগে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রতি মানুষদের আকৃষ্ট করার জন্য সন্তপুরুষদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বড় বড় শহরের জনসাধারণকে আকৃষ্ট কবার জন্য মোটর গাড়ির ব্যবহার এবং সন্তপুরুষদের থাকার জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন। তিনি সম্ভবত প্রথম সন্ত পুরুষ, যিনি ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য এই সমস্ত আয়োজন করেছিলেন। মূল কথা হচ্ছে সাধুসঙ্গ করা। এই যুগে মানুষেরা বনে গিয়ে সাধুদের অন্বেষণ করবে না, তাই সাধু এবং মহাপুরুষদের বড় বড় শহরে গিয়ে আধুনিক যুগের জড় জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত মানুষদের আমন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করতে হয়। ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পারবে যে, প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং আরামদায়ক বাসগৃহের প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃত প্রয়োজন হচ্ছে যেন-তেন প্রকারেণ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। শ্রীল রূপ গোস্বামীর আদেশ হচ্ছে—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

"কেউ যখন বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সব কিছু স্বীকার কবেন, তখন তিনি প্রকৃত বৈরাগ্যের স্তরে অধিষ্ঠিত হন।"

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব* ২/২৫৫)

জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য এই ঐশ্বর্য স্বীকার করা যেতে পাবে। পক্ষান্তবে বলা যায় যে, যুক্ত বৈরাগ্যের জন্য অর্থাৎ ত্যাগের জন্য জড় ঐশ্বর্য স্বীকার করা যেতে পাবে।

শ্লোক ৫৬

রাজোবাচ

শ্রুতমন্বীক্ষিতং ব্রহ্মন্ ভগবান্ যদভাষত ।
নৈতজ্জানন্ত্যুপাধ্যায়াঃ কিং ন ব্রূয়ুর্বিদুর্যদি ॥ ৫৬ ॥

রাজা উবাচ—রাজা বললেন, **শ্রুতম্**—শোনা গেছে, **অন্বীক্ষিতম্**—বিবেচনা করা হয়েছে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **যৎ**—যা; **অভাষত**—আপনি বলেছেন, **ন**—না, **এতৎ**—এই, **জানন্তি**—জানেন, **উপাধ্যায়াঃ**—কর্মকাণ্ডের উপদেষ্টাগণ; **কিম্**—কেন, **ন ব্রূয়ুঃ**—তারা উপদেশ দেননি, **বিদুঃ**—তাঁরা জানতেন; **যদি**—যদি।

অনুবাদ

রাজা বললেন—হে ব্রাহ্মণ। আপনি যা বলেছেন তা আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছি, এবং সেই সম্বন্ধে বিচার করে আমি স্থির করেছি যে, কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন যে সমস্ত আচার্যগণ, তাঁরা এই গুহ্য জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত নন। তাঁরা যদি সেই সম্বন্ধে অবগত হতেন, তা হলে কেন তাঁরা আমাকে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেননি?

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত গুরু অথবা সমাজের নেতারা জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নয়। *ভগবদ্গীতায়* তাদের *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের মহাপণ্ডিত বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মায়ার প্রভাবে তাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। বাস্তবিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করা। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর উৎস। *জন্মাদ্যস্য যতঃ।* *ভগবদ্গীতায়* (১০/২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহম্ আদির্হি দেবানাং*—"আমি সমস্ত দেবতাদের উৎস।" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিবাদি সমস্ত দেবতাদের উৎস। বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন দেব দেবীদের প্রসন্নতা বিধান করা, কিন্তু আধ্যাত্মিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত না হলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না যে, আদি পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।* নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করার পর রাজা বর্হিষ্মানের চৈতন্য হয়েছিল। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। রাজা তাই স্থির করেছিলেন তথাকথিত যে সমস্ত পুরোহিতেরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ না দিয়ে তাদের অনুগামীদের কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করে, তাদের পরিত্যাগ করতে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র গির্জা, মন্দির এবং মসজিদগুলি মানুষদের আকর্ষণ করতে পারছে না, কারণ সেখানকার মূর্খ পুরোহিতেরা তাদের অনুগামীদের যথার্থ জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে পারে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত

না হওয়ার ফলে তারা তাদের অনুগামীদের অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে না। তার ফলে শিক্ষিত মানুষেরা আচার অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে তারা প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই সর্বস্তরের মানুষদের জ্ঞানের আলোক প্রদান করার জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, এবং তাই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহারাজ বর্হিষ্মানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেরই কর্তব্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা, এবং ধর্মের নামে যে-সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান হচ্ছে সেগুলি পরিত্যাগ করা। গোস্বামীগণ শুরু থেকেই অনুষ্ঠান পরায়ণ পুরোহিতদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবদের মার্গ দর্শন করানোর জন্য *হরিভক্তিবিলাস* সংকলন করেছিলেন বৈষ্ণবেরা পুরোহিত সম্প্রদায়ের অসার কার্যকলাপের কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে, পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন এবং এই জীবনেই সিদ্ধিলাভ করেন। সেই কথা পূর্ববর্তী শ্লোকে *পরমহংস-শরণম্* শব্দটিতে, অর্থাৎ মুক্ত পরমহংসের শরণাগত হওয়ার উপদেশের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৭

সংশয়োঽত্র তু মে বিপ্র সংছিন্নস্তৎকৃতো মহান্ ।
ঋষয়োঽপি হি মুহ্যন্তি যত্র নেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

সংশয়ঃ—সংশয়; **অত্র**—এখানে; **তু**—কিন্তু; **মে**—আমার; **বিপ্র**—হে ব্রাহ্মণ; **সংছিন্নঃ**—দূর হয়েছে; **তৎ-কৃতঃ**—তার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে; **মহান্**—মহান; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **অপি**—ও; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মুহ্যন্তি**—মোহাচ্ছন্ন; **যত্র**—যেখানে; **ন**—না; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **বৃত্তয়ঃ**—কার্যকলাপ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! আমার কর্ম-উপদেষ্টা গুরুগণের বাক্যের সঙ্গে আপনার বাক্যের বিরোধ রয়েছে। আমি এখন ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। পূর্বে আমার সেই সম্বন্ধে কিছু সংশয় ছিল, কিন্তু আপনি কৃপাপূর্বক সেই সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছেন। আমি এখন বুঝতে পারছি মহান ঋষিরাও কিভাবে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন। নিঃসন্দেহে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাৎপর্য

রাজা বর্হিষ্মান স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন মানুষ সাধারণত এই প্রকার কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং কদাচিৎ কোন ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, অত্যন্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই কেবল ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন। তথাকথিত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরাও ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন। তারা সাধারণত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিপ্রদ কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট। ভগবদ্ভক্তিতে ইন্দ্রিয় সুখভোগ নেই, তাতে কেবল ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা রয়েছে। তার ফলে ইন্দ্রিয় তর্পণপরায়ণ তথাকথিত পুরোহিতেরা ভগবদ্ভক্তিকে খুব একটা পছন্দ করে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেন, তখন থেকে ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতেরা তার বিরোধিতা করে আসছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই আন্দোলন শুরু করেন, তখন ব্রাহ্মণেরা মুসলমান সরকারের ন্যায়াধীশ কাজির কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। বৈদিক ধর্মের তথাকথিত অনুগামীদের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তখন এক আইন-অমান্য আন্দোলন করতে হয়েছিল। এই সমস্ত ব্যক্তিদের কর্ম-জড়-স্মার্ত বলে বর্ণনা করা হয়, অর্থাৎ তারা হচ্ছে কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান-পরায়ণ পুরোহিত। এখানে বলা হয়েছে যে, এই প্রকার মানুষেরা মোহাচ্ছন্ন (*ঋষয়োঽপি হি মুহ্যন্তি*) এই সমস্ত কর্ম জড়-স্মার্তদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নিম্নলিখিত নির্দেশটি পালন করতে হয়।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার করব। ভয় পেয়ো না।"

(*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬)

শ্লোক ৫৮

কর্মাণ্যারভতে যেন পুমানিহ বিহায় তম্ ।
অমুত্রান্যেন দেহেন জুষ্টানি স যদশ্নুতে ॥ ৫৮ ॥

কর্মাণি—সকাম কর্ম; **আরভতে**—অনুষ্ঠান করতে শুরু করে; **যেন**—যার দ্বারা; **পুমান্**—জীব; **ইহ**—এই জীবনে, **বিহায়**—পরিত্যাগ করে, **তম্**—সেই,

অমুত্র—পরবর্তী জীবনে; **অন্যেন**—অন্য; **দেহেন**—দেহের দ্বারা; **জুষ্টানি**—পরিণাম; **সঃ**—সে; **যৎ**—যা; **অশ্নুতে**—উপভোগ করে।

অনুবাদ

জীব এই জীবনে যা কিছু করে, তার ফল সে পরবর্তী জীবনে ভোগ করে।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ জানে না কিভাবে এক শরীর পরবর্তী শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই জীবনে কৃত কর্মের ফল পরবর্তী জীবনে অন্য আর একটি শরীরে ভোগ করা কি করে সম্ভব? নারদ মুনির কাছে রাজা এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন। যে এই জীবনে মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, পরবর্তী জীবনে মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত না হওয়া তার পক্ষে কি করে সম্ভব? বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরাও এক দেহ থেকে আর এক দেহে কর্মের স্থানান্তর কি করে সম্ভব তা বুঝতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি জীবাত্মার একটা স্বতন্ত্র দেহ রয়েছে, এবং এক ব্যক্তির কর্ম বা এক শরীরের কার্যকলাপ অন্য আর একটি শরীর অথবা অন্য ব্যক্তি ভোগ করে না। প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, এক শরীরের কর্মের ফলস্বরূপ পরবর্তী শরীরে সুখ অথবা দুঃখভোগ হয় কি করে।

শ্লোক ৫৯

ইতি বেদবিদাং বাদঃ শ্রূয়তে তত্র তত্র হ।
কর্ম যৎক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্ষং ন প্রকাশতে ॥ ৫৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **বেদ-বিদাম্**—বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তির; **বাদঃ**—মতবাদ, **শ্রূয়তে**—শোনা যায়, **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **যৎ**—যা; **ক্রিয়তে**—অনুষ্ঠিত হয়; **প্রোক্তম্**—যা বলা হয়েছে; **পরোক্ষম্**—অজ্ঞাত; **ন প্রকাশতে**—প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয় না।

অনুবাদ

বেদবিদ্‌দের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে এও দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী জন্মে যে শরীরের দ্বারা কর্ম করা হয়েছে তা ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব অন্য শরীরে তার ফলভোগ করা কি করে সম্ভব?

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা পূর্বকৃত কর্মের ফলভোগের প্রমাণ চায়। তাই তারা বলে, "পূর্বকৃত কর্মের ফলে যে দুঃখ এবং সুখ ভোগ হচ্ছে,তার প্রমাণ কোথায়?" সূক্ষ্ম শরীর যে কিভাবে বর্তমান শরীরের কর্মের ফল পরবর্তী স্থূল শরীরে বহন করে নিয়ে যায়, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। বর্তমান স্থূল শরীরটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ হয় না; তা আত্মাকে পরবর্তী স্থূল শরীরে বহন করে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরের উপর নির্ভরশীল। তাই সূক্ষ্ম শরীর অনুসারে পরবর্তী স্থূল শরীরে সুখ এবং দুঃখ ভোগ হয়ে থাকে। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সূক্ষ্ম দেহ আত্মাকে বহন করে নিয়ে যায়।

শ্লোক ৬০

নারদ উবাচ

যেনৈবারভতে কর্ম তেনৈবামুত্র তৎপুমান্ ।
ভুঙ্‌ক্তে হ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্ ॥ ৬০ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন, **যেন**—যার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আরভতে**—শুরু হয়; **কর্ম**—সকাম কর্ম, **তেন**—সেই শরীরের দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে, **অমুত্র**—পরবর্তী জীবনে; **তৎ**—তা, **পুমান্**—জীব; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **হি**—কারণ; **অব্যবধানেন**—কোন রকম পরিবর্তন ব্যতীত, **লিঙ্গেন**—সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা, **মনসা**—মনের দ্বারা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—জীব এই জীবনে স্থূল শরীরের মাধ্যমে কর্ম করে। এই স্থূল শরীর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা কর্ম করতে বাধ্য হয়। স্থূল শরীরের বিনাশের পরেও সূক্ষ্ম শরীর থাকে, এবং তা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। এইভাবে কোন পরিবর্তন হয় না।

তাৎপর্য

জীবের দুই প্রকার শরীর রয়েছে—সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল শরীর। প্রকৃতপক্ষে সে মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যমে সুখ দুঃখ ভোগ করে।

স্থূল শরীরটি হচ্ছে সুখ-দুঃখ ভোগের যন্ত্রস্বরূপ বাহ্য আবরণ। স্থূল দেহের যখন বিনাশ হয় অর্থাৎ মৃত্যু হয়, তখন সেই স্থূল শরীরের মূল কারণ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার তখনও থাকে, এবং আর একটি স্থূল শরীর প্রদান করে। যদিও স্থূল শরীরের পরিবর্তন হয়, কিন্তু সেই স্থূল শরীরের মূল কারণ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব সর্বদা থাকে। সূক্ষ্ম শরীরের কার্যকলাপ, সেগুলি পাপই হোক বা পুণ্যই হোক—পরবর্তী স্থূল শরীরে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করার জন্য আর একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে। এইভাবে একের পর এক স্থূল দেহের পরিবর্তন হলেও সূক্ষ্ম দেহ নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে।

যেহেতু আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা অত্যন্ত জড়বাদী, এবং যেহেতু তাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে, তাই স্থূল দেহের যে কিভাবে পরিবর্তন হয় তার বিশ্লেষণ তারা করতে পারে না। জড়বাদী দার্শনিক ডারউইন স্থূল দেহের পরিবর্তন অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেহেতু তার সূক্ষ্ম শরীর এবং আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তাই সে বিবর্তনের পন্থা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। জীবের স্থূল শরীরের পরিবর্তন হলেও তার সূক্ষ্ম শরীরে সে সক্রিয় থাকে। সূক্ষ্ম শরীরের কার্যকলাপ মানুষ বুঝতে পারে না, এবং তাই এক স্থূল শরীরের কার্যকলাপ যে কিভাবে অন্য আর একটি স্থূল শরীরকে প্রভাবিত করে, তা তারা বুঝতে পারে না। সূক্ষ্ম শরীরের কার্যকলাপও পরিচালিত হয় পরমাত্মার দ্বারা, যার বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।

"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।"

যেহেতু পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদাই জীবাত্মাকে পরিচালিত করছেন, তাই জীবাত্মা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমাত্মা তাকে বিশেষভাবে আচরণ করার কথা মনে করিয়ে দেন। তাই আপাত দৃষ্টিতে স্থূল শরীরের পরিবর্তন হলেও, জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

শ্লোক ৬১

শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং পুরুষো যথা।
কর্মাত্মন্যাহিতং ভুঙ্‌ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা ॥ ৬১ ॥

শয়ানম্—শয্যায় শায়িত; **ইমম্**—এই শরীর; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করার পর; **শ্বসন্তম্**—শ্বাস গ্রহণ করে; **পুরুষঃ**—জীব; **যথা**—যেমন; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **আত্মনি**—মনে, **আহিতম্**—সম্পাদিত; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **তাদৃশেন**—সেই শরীরের দ্বারা; **ইতরেণ**—ভিন্ন শরীরের দ্বারা; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

স্বপ্নাবস্থায় জীব তার প্রকৃত শরীর ত্যাগ করে। তার মন এবং বুদ্ধির কার্যকলাপের দ্বারা সে অন্য একটি দেব-শরীরে অথবা পশু-শরীরে সক্রিয় হয়। ঠিক তেমনই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করার পর, জীব এই লোকে অথবা অন্য লোকে দেব, তির্যক আদি যোনি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সে তার পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগ করে।

তাৎপর্য

যদিও দুঃখ এবং সুখের মূল হচ্ছে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, তবুও তা ভোগ করার যন্ত্রস্বরূপ একটি স্থূল শরীরের প্রয়োজন হয়। স্থূল শরীরের পরিবর্তন হলেও সূক্ষ্ম শরীর সক্রিয় থাকে। জীব যদি আর একটি স্থূল শরীর প্রাপ্ত না হয়, তা হলে তাকে সূক্ষ্ম শরীরে বা ভূতপ্রেতের শরীরে থাকতে হয়। স্থূল শরীরের সহায়তা ব্যতীত সূক্ষ্ম শরীর যখন সক্রিয় হয়, তখন জীব ভূত বা প্রেতে পরিণত হয়। *সেই কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং।* স্থূল শরীর শয্যায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শায়িত থাকতে পারে, এবং স্থূল শরীরের যান্ত্রিক কার্যকলাপ চলতে থাকলেও, জীব স্থূল শরীর ত্যাগ করে স্বপ্নে বিচরণ করতে পারে, এবং পুনরায় সে স্থূল শরীরে ফিরে আসে। সে যখন স্থূল শরীরে ফিরে আসে, তখন সে তার স্বপ্নের কথা ভুলে যায়। তেমনই, জীব যখন আর একটি স্থূল শরীর গ্রহণ করে, তখন সে তার পূর্ববর্তী স্থূল শরীরের কথা ভুলে যায়। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীর তার বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে, এবং সেই পরিবেশে সূক্ষ্ম শরীর সুখ উপভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে জীবের স্থূল দেহের পরিবর্তন হলেও এবং বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার স্থূল দেহে বাস করলেও, জীব তার সূক্ষ্ম দেহে থাকে। সূক্ষ্ম দেহে জীবের সমস্ত কার্যকলাপকে বলা হয় মায়িক, কারণ তা নিত্য নয়। মুক্তির অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীরের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা। স্থূল দেহ থেকে মুক্ত হলেও আত্মা একটি স্থূল শরীর থেকে অন্য আর একটি স্থূল শরীরে দেহান্তরিত হয়। মন যখন কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা লাভ করে অথবা সত্ত্বগুণে উচ্চতর চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন

সে উচ্চতর স্বর্গলোকে অথবা চিৎ-জগতে বৈকুণ্ঠলোকে স্থানান্তরিত হয়। তাই গুরুপরম্পরার মাধ্যমে ভগবৎ প্রদত্ত বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা চেতনার পরিবর্তন সাধন করতে হয়। আমরা যদি এই জীবনে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার মাধ্যমে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরকে শিক্ষিত করি, তা হলে আমরা স্থূল শরীর ত্যাগ করার পর কৃষ্ণলোকে স্থানান্তরিত হব। সেই কথা ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন। যিনি আমার আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ দিব্য বলে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তিনি আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হন।" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৯)

স্থূল দেহের পরিবর্তন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সূক্ষ্ম দেহের পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষের সূক্ষ্ম শরীরকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার শিক্ষা দান করছে। তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে অম্বরীষ মহারাজ, যিনি সর্বদা তাঁর মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে যুক্ত করেছিলেন। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* । তেমনই, এই জীবনে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মনকে সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত করা, যিনি মন্দিরে তাঁর অর্চা-বিগ্রহরূপে বিরাজমান। সর্বদা তাঁর পূজাতেও যুক্ত হওয়া কর্তব্য। আমরা যদি আমাদের বাগিন্দ্রিয় ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপের বর্ণনায়, এবং কর্ণেন্দ্রিয় তাঁর লীলা শ্রবণে যুক্ত করি, এবং কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে মনকে স্বচ্ছ রাখার জন্য বিধি নিষেধগুলি পালন করি, তা হলে আমরা নিশ্চিতভাবে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারব। তা হলে মৃত্যুর সময় মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আর জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হবে না। জীবাত্মা উপস্থিত রয়েছে, আর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারও রয়েছে। যখন মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার নির্মল হয়, তখন জীবের ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এইভাবে জীব তার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপে রয়েছেন, কিন্তু জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়া সত্ত্বেও, যখন জড়সুখ ভোগের জন্য এই জড় জগতে আসার বাসনা করে, তখন সে জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপায় ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) দিয়েছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার আরাধনা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর। সর্বতোভাবে আমার ভাবনায় মগ্ন হওয়ার ফলে, তুমি অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে।"

শ্লোক ৬২

মমৈতে মনসা যদ্‌যদসাবহমিতি ব্রুবন্ ।
গৃহ্ণীয়াত্তৎপুমান্ রাদ্ধং কর্ম যেন পুনর্ভবঃ ॥ ৬২ ॥

মম—আমার; **এতে**—এই সমস্ত; **মনসা**—মনের দ্বারা; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **অসৌ**—তা; **অহম্**—আমি (হই); **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবন্**—গ্রহণ করে; **গৃহ্ণীয়াৎ**—তার সঙ্গে নিয়ে যায়; **তৎ**—তা; **পুমান্**—জীব; **রাদ্ধম্**—সিদ্ধ; **কর্ম**—কর্ম; **যেন**—যার দ্বারা; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভবঃ**—জড়-জাগতিক অস্তিত্ব।

অনুবাদ

জীব দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে "আমি এই, আমি ঐ, এটি আমার কর্তব্য, তাই আমি এটি করব"—এই প্রকার ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করে। এগুলি সবই হচ্ছে মনোধর্ম, এবং এই সমস্ত কার্যকলাপ অনিত্য, তা সত্ত্বেও ভগবানের কৃপায় জীব তার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করার সুযোগ পায়। এইভাবে সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

জীব যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তার সমস্ত কার্যকলাপ সেই স্তরে সম্পন্ন হয়। সেই কথা বুঝা খুব একটা কঠিন নয়। এই জগতে আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি রাষ্ট্র অন্য সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে অতিক্রম করতে চায়, এবং প্রতিটি মানুষ তার সতীর্থকে অতিক্রম করতে চায়। সভ্যতার প্রগতির নামে এই সমস্ত কার্যকলাপ চলছে। দেহের আরামের জন্য বহু পরিকল্পনা হচ্ছে, এবং এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি স্থূল দেহের বিনাশের পর সূক্ষ্ম দেহে বহন করে নিয়ে যায়। স্থূল শরীরের বিনাশের পর জীবের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায় না। যদিও এই পৃথিবীর বহু বড় বড় পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা মনে করে যে, শরীরের বিনাশ হলে সব কিছু শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সেই কথা সত্য নয়। এই শ্লোকে নারদ মুনি বলেছেন যে, মৃত্যুর পর মানুষ তার পরিকল্পনাগুলি সঙ্গে নিয়ে যায় (*গৃহ্ণীয়াৎ*), এবং সেই

সমস্ত পরিকল্পনাগুলি সম্পাদন করার জন্য সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। একে বলা হয় *পুনর্ভবঃ* । স্থূল শরীরের যখন বিনাশ হয়, তখন জীবের সেই পরিকল্পনাগুলি তার মন বহন করে নিয়ে যায়, এবং ভগবানের কৃপায় জীব তার পরবর্তী জীবনে সেই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি রূপদান করবার আর একটি সুযোগ পায়। একে বলা হয় কর্মের বিধান। মন যতক্ষণ এই সকাম কর্মে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাকে একের পর এক শরীর ধারণ করতে হয়।

এই শরীরকে সুখী অথবা দুঃখী বানাবার জন্য যে কার্য করা হয়, তার সমষ্টি হচ্ছে কর্ম। আমরা বাস্তবিকভাবে দেখেছি যে, মৃত্যুর সময় কোন মানুষ ডাক্তারকে অনুরোধ করেছে তিনি যেন তাকে আরও চার বছর বেঁচে থাকার সুযোগ দেন, যাতে সে তার পরিকল্পনাগুলি সম্পন্ন করতে পারে। তা থেকে বোঝা যায় যে, মৃত্যুর সময় সে তার পরিকল্পনাগুলি চিন্তা করছিল। দেহের বিনাশের পর সে নিঃসন্দেহে মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা তার পরিকল্পনাগুলিকে তার সঙ্গে নিয়ে যায়। এইভাবে সে অন্তর্যামী পরমাত্মার কৃপায় আর একটি সুযোগ পায়।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

পরবর্তী জীবনে সে পরমাত্মা থেকে স্মৃতিলাভ করে এবং তার পূর্ববর্তী জীবনে যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি শুরু করেছিল, সেগুলি সম্পাদন করতে শুরু করে। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* আর একটি শ্লোকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন। পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, এবং জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত যন্ত্রে আরোহী জীবের পরিভ্রমণ পরিচালনা করছেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) প্রকৃতি প্রাপ্ত যন্ত্রে অবস্থিত হয়ে এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে অন্তর্যামী পরমাত্মা কর্তৃক স্মৃতি প্রাপ্ত হয়ে, জীব তার সমস্ত পরিকল্পনাগুলি সফল রূপদানের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সংগ্রাম করছে। সে ভাবছে "আমি ব্রাহ্মণ", "আমি ক্ষত্রিয়", "আমি আমেরিকান", "আমি ভারতীয়", ইত্যাদি। এই সমস্ত উপাধিগুলি মূলত একই। একজন আমেরিকান থেকে ব্রাহ্মণ হওয়া ভাল অথবা একজন নিগ্রো হওয়ার থেকে আমেরিকান হওয়া ভাল, এই মনোভাবের কোন বাস্তবিক সার্থকতা নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই সবই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন দেহাত্মবুদ্ধি।

শ্লোক ৬৩

যথানুমীয়তে চিত্তমুভয়ৈরিন্দ্রিয়েহিতৈঃ ।
এবং প্রাগ্‌দেহজং কর্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ ॥ ৬৩ ॥

যথা—যেমন; **অনুমীয়তে**—অনুমান কবা যায়; **চিত্তম্**—চেতনা বা মনোভাব, **উভয়ৈঃ**—উভয়; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **ঈহিতৈঃ**—কার্যকলাপেব দ্বাবা; **এবম্**—তেমনই, **প্রাক্**—পূর্ব, **দেহজম্**—দেহের দ্বাবা অনুষ্ঠিত; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **লক্ষ্যতে**—অনুমান কবা যেতে পারে; **চিত্ত**—চেতনার; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তিব দ্বারা

অনুবাদ

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়—এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের দ্বারা জীবের চেতনা বা মনোভাব বোঝা যায়। তেমনই, মনোবৃত্তি বা চেতনার দ্বারা মানুষের পূর্ববর্তী জীবনের কার্যকলাপ অনুমান করা যায়।

তাৎপর্য

বলা হয় যে "মুখ হচ্ছে মনের দর্পণ"। কেউ যদি ক্রুদ্ধ হয়, তা হলে সেই ক্রোধ তৎক্ষণাৎ তার মুখে প্রকাশ পায়। তেমনই মনের অন্যান্য অবস্থাগুলি স্থূল শরীরের কার্যকলাপে প্রতিবিম্বিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, স্থূল দেহের কার্যকলাপ মানসিক অবস্থাব প্রতিক্রিয়া। মনের কার্য হচ্ছে চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা। মনের ইচ্ছা শবীরেব ক্রিয়ায় প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের দ্বারা আমবা মনের অবস্থা উপলব্ধি কবতে পারি। পূর্ববর্তী শবীরেব কর্মেব দ্বারা মানসিক অবস্থা প্রভাবিত হয়। মন যখন কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ তা কোন বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন, মনে যখন ক্রোধেব উদ্রেক হয়, তখন জিহ্বা কত বকম গালিগালাজ কবতে থাকে। তেমনই মনেব ক্রোধ যখন হাতেব মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন মাবামাবি হয়। যখন তা পায়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন পদাঘাত কবা হয়। এইভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়েব মাধ্যমে মনের সূক্ষ্ম কার্যকলাপের অভিব্যক্তি হয়। কৃষ্ণভক্তের মনও এইভাবে ক্রিয়া করে। তাঁর জিহ্বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, তাঁব হাত আনন্দে উপবের দিকে উঠে যায়, তাঁব পা নৃত্য করে। এই সমস্ত লক্ষণগুলিকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকাব বলা হয় সাত্ত্বিক বিকার হচ্ছে সত্ত্বগুণ বা দিব্য আনন্দের প্রভাবে মানসিক অবস্থার রূপান্তর।

শ্লোক ৬৪

নানুভূতং ক্ব চানেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতম্ ।
কদাচিদুপলভ্যেত যদ্রূপং যাদৃগাত্মনি ॥ ৬৪ ॥

ন—কখনই না, **অনুভূতম্**—অনুভব করা হয়; **ক্ব**—যে-কোন সময়; **চ**—ও; **অনেন দেহেন**—এই দেহের দ্বারা; **অদৃষ্টম্**—কখনও দেখা যায়নি; **অশ্রুতম্**—কখনও শোনা যায়নি; **কদাচিৎ**—কখনও কখনও; **উপলভ্যেত**—অনুভব করা যেতে পারে; **যৎ**—যা; **রূপম্**—রূপ; **যাদৃক্**—যে-কোন প্রকার; **আত্মনি**—মনে।

অনুবাদ

কখনও কখনও হঠাৎ এমন কোন অনুভূতি হয়, যা বর্তমান শরীরের মাধ্যমে কখনও দেখা বা শোনা যায়নি। কখনও কখনও হঠাৎ স্বপ্নে আমরা তা দর্শন করি।

তাৎপর্য

স্বপ্নে আমরা কখনও কখনও এমন অনেক কিছু দেখি, যার অভিজ্ঞতা বর্তমান শরীরে কখনও হয়নি। কখনও কখনও স্বপ্নে আমরা দেখি যে, আমরা আকাশে উড়ছি, যদিও উড়ার কোন অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তার অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী কোন জীবনে দেবতারূপে অথবা মহাকাশচারীরূপে আমরা আকাশে বিচরণ করেছি। মনের মধ্যে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে, এবং হঠাৎ তার প্রকাশ হয়। তা জলের গভীরে বুদ্বুদের মতো, যা এক সময় জলের উপরিভাগে প্রকাশ পায়। কখনও কখনও স্বপ্নে আমরা এমন কোন স্থান দর্শন করি, যা এই জীবনে কখনও আমরা দেখিনি। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী জীবনে সেই স্থানের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল। মনের স্মৃতিপটে তা সঞ্চিত থাকে এবং স্বপ্নে অথবা চিন্তায় কখনও কখনও প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, মন হচ্ছে পূর্ববর্তী জীবনের বিভিন্ন চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। এইভাবে, পূর্ববর্তী জীবন থেকে এই জীবনে এবং এই জীবন থেকে পরবর্তী জীবনে এক ধারাবাহিকতা থাকে। কখনও কখনও বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি জন্মগত কবি বা বৈজ্ঞানিক বা ভক্ত, তা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। আমরা যদি এই জীবনে মহারাজ অম্বরীষের মতো নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*), তা হলে আমরা নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর পর ভগবদ্ধামে যেতে পারব। আমাদের কৃষ্ণভক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা যদি পূর্ণ নাও হয়,

তা হলেও পরবর্তী জীবনে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন চলতে থাকবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥

"ভ্রষ্ট যোগী পুণ্যাত্মাদের লোকে বহু বছর ধরে সুখভোগ করার পর, ধর্মপরায়ণ সদাচারী পরিবারে অথবা ধনী অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।"

আমরা যদি নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অনুসরণ করি, তা হলে যে পরবর্তী জীবনে আমরা কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যাব, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৬৫

তেনাস্য তাদৃশং রাজঁল্লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্ ।
শ্রদ্ধৎস্বাননুভূতোঽর্থো ন মনঃ স্প্রষ্টুমর্হতি ॥ ৬৫ ॥

তেন—অতএব; **অস্য**—জীবের; **তাদৃশম্**—সেই প্রকার; **রাজন্**—হে রাজন; **লিঙ্গিনঃ**—সূক্ষ্ম মানসিক আবরণ সমন্বিত; **দেহ-সম্ভবম্**—পূর্ববর্তী শরীরে উৎপন্ন; **শ্রদ্ধৎস্ব**—তা বাস্তব বলে মনে করে; **অননুভূতঃ**—অনুভূত হয়নি; **অর্থঃ**—বস্তু; **ন**—কখনই না; **মনঃ**—মনে; **স্প্রষ্টুম্**—প্রকাশ করার জন্য; **অর্হতি**—সক্ষম।

অনুবাদ

অতএব হে রাজন্! সূক্ষ্ম মানসিক আবরণ সমন্বিত জীব তার পূর্বদেহ সম্বন্ধজনিত নানা প্রকার চিন্তা এবং অনুভূতি অনুভব করে। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, পূর্ববর্তী শরীরের অভিজ্ঞতা ব্যতীত মনের দ্বারা কোন কিছুর কল্পনা করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥　(*প্রেমবিবর্ত*)

প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা। জীব যখন তাঁর অনুসরণ করতে চায়, তখন তার সেই বিকৃত অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তাকে

এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার সুযোগ দেওয়া হয়। সেটিই হচ্ছে তার অধঃপতনের শুরু। যতক্ষণ সে এই জড় পরিবেশে থাকে, ততক্ষণ মনরূপে তার একটি সূক্ষ্ম বাহন থাকে, যা হচ্ছে সব রকম জড় বাসনার ভাণ্ডার। তার এই সমস্ত বাসনাগুলি বিভিন্ন প্রকার দেহরূপে প্রকাশিত হয়। নারদ মুনি রাজাকে বলেছেন সেই কথা ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে, কারণ নারদ মুনি হচ্ছেন একজন মহাজন। অতএব আমাদের নিশ্চিতরূপে বুঝতে হবে যে, মন হচ্ছে আমাদের সমস্ত পূর্ববর্তী বাসনার ভাণ্ডার, এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাসনা অনুসারে আমরা আমাদের বর্তমান শরীর প্রাপ্ত হয়েছি। তেমনই, এই শরীরে আমরা যে বাসনা করব তা আমাদের পরবর্তী শরীরে প্রকাশিত হবে। এইভাবে মন হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার শরীরের উৎস।

মন যদি কৃষ্ণভক্তির দ্বারা পবিত্র হয়, তা হলে আমরা ভবিষ্যতে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ কৃষ্ণভক্তিময় চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হব। এই ধরনের শরীরই হচ্ছে আমাদের আদি রূপ, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয় —কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে, এই জীবনেই তিনি মুক্ত। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যিনি তাঁর কায়, মন এবং বাক্যের দ্বারা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি এই জড় জগতে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে জীবন্মুক্ত বলে মনে করতে হবে।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব* ২/১৮৭) কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সকলকে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার শিক্ষা দান করা, কারণ সেটিই হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক স্থিতি। যিনি সর্বদা ভগবানের সেবা করেন, বুঝতে হবে যে তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি সর্বদা অনন্য ভক্তি সহকারে চিন্ময় সেবাপরায়ণ, তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন।" ভগবদ্ভক্ত তাই জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অতীত। এমন কি তিনি ব্রাহ্মণ স্তরেরও অতীত। ব্রাহ্মণ রজ ও

তম—এই দুটি নিকৃষ্ট গুণের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। মানসিক স্তরের সমস্ত বাসনা এবং মনোধর্মী জ্ঞান অথবা সকাম কর্মের কলুষ থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অতীত এবং সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত

শ্লোক ৬৬

মন এব মনুষ্যস্য পূর্বরূপাণি শংসতি ।
ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রং তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ ॥ ৬৬ ॥

মনঃ—মন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মনুষ্যস্য**—মানুষের; **পূর্ব**—পূর্ব; **রূপাণি**—রূপসমূহ; **শংসতি**—ইঙ্গিত করে; **ভবিষ্যতঃ**—যে জন্মগ্রহণ করবে; **চ**—ও; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তে**—আপনার; **তথা**—এইভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ন**—না; **ভবিষ্যতঃ**—ভবিষ্যতে যে জন্মগ্রহণ করবে তার।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হোক! প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে এই মন জীবের বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হওয়ার কারণ। মানুষের মানসিক অবস্থা থেকে বোঝা যায় সে পূর্ব জন্মে কি রকম ছিল এবং ভবিষ্যতে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে। এইভাবে মন অতীত এবং ভবিষ্যৎ শরীরসমূহ ইঙ্গিত করে।

তাৎপর্য

মন পূর্ববর্তী জীবন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত করে। কেউ যদি ভগবদ্ভক্ত হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন। তেমনই কারও যদি অপরাধ করার প্রবণতা থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে তার পূর্ববর্তী জীবনে অপরাধী ছিল। এইভাবে মন থেকে বোঝা যায় ভবিষ্যৎ জীবনে কি হবে। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/১৮) বলা হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"যাঁরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাঁরা ক্রমশ উচ্চতর লোকে উন্নীত হবেন; যারা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা এই ভূর্লোকে থাকবে, আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা নিম্নগামী হয়ে নরকে যাবে।"

কোন মানুষ যদি সত্ত্বগুণে থাকেন, তা হলে তাঁর মানসিক কার্যকলাপ তাঁকে উচ্চতর লোকে উন্নীত করবে। তেমনই, কারও মনোবৃত্তি যদি নীচ হয়, তা হলে

তার ভবিষ্যৎ জীবন অত্যন্ত জঘন্য হবে। জীবের অতীত এবং ভবিষ্যৎ জীবন তার মানসিক অবস্থার দ্বারা সূচিত হয়। নারদ মুনি এখানে রাজার মঙ্গল কামনা করে আশীর্বাদ করেছেন, যাতে তিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন বাসনা অথবা পরিকল্পনা না করেন রাজা ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভের আশায় কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন। নারদ মুনি চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর সর্বপ্রকার মনোধর্ম ত্যাগ করেন। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, স্বর্গলোকে ও নরকে সমস্ত শরীরই মনোধর্ম-প্রসূত, এবং জড়-জাগতিক জীবনের সমস্ত সুখ ও দুঃখ কেবল মানসিক স্তরের। সেগুলি সংগঠিত হয় কেবল মনোরথে। তাই বলা হয়েছে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"যিনি ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ হয়েছেন, দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি তাঁর রয়েছে। কিন্তু যে ভগবদ্ভক্ত নয়, তার গুণগুলি কেবল জড়-জাগতিক এবং তার মূল্য অতি অল্প। তার কারণ সে মনোরথে বিচরণ করছে এবং সে নিশ্চিতভাবে জড়া প্রকৃতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হবে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভগবদ্ভক্ত না হয়, অথবা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিশ্চিতভাবে মনের স্তরে বিচরণ করবে, এবং বিভিন্ন প্রকার শরীরে কখনও ঊর্ধ্বগামী হবে এবং কখনও অধোগামী হবে। জড় বিচারে যে-সমস্ত গুণগুলিকে ভাল বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলির কোন মূল্য নেই, কারণ সেই সমস্ত তথাকথিত সদ্‌গুণগুলি মানুষকে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার করতে পারে না। তাই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, মনোবাসনা থেকে মানুষকে মুক্ত হতে হবে। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*—সমস্ত জড় বাসনা, মনোধর্মী জ্ঞান এবং সকাম কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই মানুষের পক্ষে দিব্য ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। সেটিই হচ্ছে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

শ্লোক ৬৭

অদৃষ্টমশ্রুতং চাত্র ক্বচিন্মনসি দৃশ্যতে ।
যথা তথানুমন্তব্যং দেশকালক্রিয়াশ্রয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

অদৃষ্টম্—যা কখনও দেখা যায়নি; **অশ্রুতম্**—যা কখনও শোনা যায়নি ; **চ**—এবং; **অত্র**—এই জীবনে; **ক্বচিৎ**—কোন সময়; **মনসি**—মনে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **যথা**—যেমন; **তথা**—সেই প্রকার; **অনুমন্তব্যম্**—বুঝতে হবে; **দেশ**—স্থান; **কাল**—সময়; **ক্রিয়া**—কার্যকলাপ; **আশ্রয়ম্**—আশ্রিত।

অনুবাদ

কখনও স্বপ্নে আমরা এমন কিছু দর্শন করি, যা এই জীবনে কখনও দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি, কিন্তু ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সমস্ত ঘটনাগুলির অভিজ্ঞতা হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত অভিজ্ঞতা হয়, তা রাত্রে স্বপ্নে দর্শন হয়। কিন্তু কখনও কখনও আমরা এমন কোন স্বপ্ন কেন দেখি, যা এই জীবনে কখনও আমরা শুনিনি বা দেখিনি? এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই জীবনে সেই সমস্ত ঘটনার অভিজ্ঞতা না হলেও পূর্বজীবনে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে। স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে সেগুলির সমন্বয় হয়ে আমরা এমন আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখি, যার অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্বে কখনও হয়নি। যেমন আমরা স্বপ্নে পর্বতের চূড়ায় একটি সমুদ্র দর্শন করতে পারি, অথবা দর্শন করতে পারি যে, সমুদ্রের জল শুকিয়ে গেছে এগুলি কেবল কাল এবং স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয়। আমরা কখনও সোনার পাহাড় দেখতে পারি, এবং তার কারণ হচ্ছে আমাদের আলাদাভাবে সোনা এবং পাহাড়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মায়ার প্রভাবে, স্বপ্নে আমরা এই বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির সমন্বয়-সাধন করি। এইভাবে আমরা স্বপ্নে সোনার পাহাড়, অথবা দিনের বেলা তারা দর্শন করতে পারি। মূল কথা হচ্ছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এগুলির অভিজ্ঞতা হলেও, সেই সবই মনের কল্পনা। সেগুলি কেবল স্বপ্নে একত্রিত হয়েছে। সেই তত্ত্ব পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬৮

সর্বে ক্রমানুরোধেন মনসীন্দ্রিয়গোচরাঃ ।
আয়ান্তি বহুশো যান্তি সর্বে সমনসো জনাঃ ॥ ৬৮ ॥

সর্বে—সমস্ত; **ক্রম-অনুরোধেন**—ক্রমানুসারে; **মনসি**—মনে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **গোচরাঃ**—অনুভূত; **আয়ান্তি**—আসে; **বহুশঃ**—বহু প্রকারে; **যান্তি**—চলে যায়; **সর্বে**—সমস্ত; **সমনসঃ**—মনের সঙ্গে; **জনাঃ**—জীব।

অনুবাদ

জীবের মন বিভিন্ন স্থূল শরীরে অবস্থান করে, এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা অনুসারে মন বিভিন্ন চিন্তা অঙ্কিত করে। মনে সেগুলি বিভিন্ন প্রকার সমন্বয়ের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়; তাই এই সমস্ত দৃশ্যগুলি এমনভাবে প্রকট হয়, যেন মনে হয় পূর্বে কখনও সেগুলি দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি।

তাৎপর্য

কোন জীব যখন একটি কুকুরের শরীরে ছিল, তার তখনকার কার্যকলাপ একটি ভিন্ন শরীরের মনে অনুভূত হতে পারে, তাই মনে হয় যে, সেই সমস্ত কার্যকলাপ কখনও শোনা যায়নি অথবা দেখা যায়নি। দেহের বিনাশ হলেও মনের অস্তিত্ব থাকে। এই জীবনেও কখনও কখনও আমরা আমাদের শৈশবের স্বপ্ন দেখি। এই সমস্ত ঘটনাগুলি যদিও আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়, তবুও বুঝতে হবে যে, সেগুলি মনে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। তাই সেগুলি স্বপ্নে দর্শন হয়। সমস্ত জড় বাসনার ভাণ্ডার সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আত্মার দেহান্তর হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জড় বাসনাগুলির গমনাগমন হবে। চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছা —এই হচ্ছে মনের ধর্ম। মন যতক্ষণ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা নানা প্রকার জড়সুখ ভোগের বাসনা করবে। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলি মনের মধ্যে ক্রমানুসারে অঙ্কিত হয়ে থাকে, এবং সেগুলি একের পর এক প্রকাশিত হয়; তাই জীবকে এক দেহের পর আর একটি দেহ ধারণ করতে হয়। মন জড়-সুখের পরিকল্পনা করে, এবং সেই সমস্ত বাসনা ও পরিকল্পনাগুলি উপলব্ধি করার যন্ত্র হচ্ছে স্থূল শরীর। মনের স্তরে সমস্ত বাসনার গমনাগমন হয়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।

শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করার জন্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, এবং তা ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা করা উচিত নয়। যদি গুরুদেবের

আদেশ অনুসারে বিধি-নিষেধগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হয়, তা হলে মন কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কিছু বাসনা না করার শিক্ষা ধীরে ধীরে লাভ করবে। এই প্রকার অভ্যাসই জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি।

শ্লোক ৬৯

সত্ত্বৈকনিষ্ঠে মনসি ভগবৎপার্শ্ববর্তিনি ।
তমশ্চন্দ্রমসীবেদমুপরজ্যাবভাসতে ॥ ৬৯ ॥

সত্ত্ব-এক-নিষ্ঠে—পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময়; **মনসি**—মনে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সহ; **পার্শ্ব-বর্তিনি**—নিরন্তর সঙ্গলাভ করে; **তমঃ**—তমসাবৃত লোক, **চন্দ্রমসি**—চন্দ্রে; **ইব**—সদৃশ; **ইদম্**—এই জগৎ; **উপরজ্য**—সম্পর্কযুক্ত হয়ে; **অবভাসতে**—প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

কৃষ্ণভক্তির অর্থ হচ্ছে এমন মানসিক অবস্থা নিয়ে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করা, যাতে ভগবান যেভাবে জড় জগৎকে দর্শন করেন, ঠিক সেই ভাবে ভক্ত তা দর্শন করতে পারেন। এই প্রকার দর্শন সর্বদা সম্ভব নয়, কিন্তু তা ঠিক তমসাবৃত গ্রহ রাহুর মতো, যা কেবল পূর্ণ চন্দ্রের উপস্থিতিতেই দেখা যায়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মনের সমস্ত বাসনাগুলি একে একে গোচরীভূত হয়। কিন্তু কখনও কখনও, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে স্মৃতির সম্ভার একসাথে দর্শন হতে পারে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫৪) বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্।* কেউ যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হন, তখন তাঁর মানসিক বাসনার সম্ভার বা কর্মফল ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর বাসনাগুলি আর স্থূল শরীররূপে ফলপ্রসূ হয় না। পক্ষান্তরে, তাঁর বাসনার সম্ভার পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় মনের পর্দায় প্রকাশিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, চন্দ্রগ্রহণের কারণ হচ্ছে রাহু নামক একটি গ্রহ, বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্রে রাহু নামক অদৃশ্য একটি গ্রহের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। কখনও কখনও পূর্ণচন্দ্রের আলোকে রাহুর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। তা থেকে মনে হয় যে, রাহু নামক গ্রহটি চন্দ্রের কক্ষপথের নিকটে কোথাও অবস্থান

করে। আধুনিক চন্দ্রযাত্রীদেব বিফলতার কারণ রাহুগ্রহ হতে পারে। অর্থাৎ, যারা চন্দ্রলোকে গিয়েছে বলে দাবি করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে এই অদৃশ্য রাহুগ্রহেই গিয়েছে চন্দ্রলোকে যাওযাব পরিবর্তে তারা রাহু গ্রহে গিয়েছে, এবং সেখান থেকে ফিবে এসেছে। আসল কথা হচ্ছে যে, জীবেব জড়সুখ ভোগেব অসংখ্য তীব্র বাসনা রযেছে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বাসনার নিবৃত্তি না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে একটি স্থূল শবীর থেকে অন্য আর একটি স্থূল শরীবে দেহান্তবিত হতে হবে।

কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করা পর্যন্ত, কোন জীবই জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে পারে না; তাই এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ কবা হযেছে যে, (*সকৃৎ নিষ্ঠে*) পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হওয়ার ফলে, এক নিমেষে অতীত এবং ভবিষ্যতেব সমস্ত মানসিক বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তখন পবমেশ্বব ভগবানের কৃপায়, তাব মনে সবকিছু যুগপৎ প্রকাশিত হয় এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভিতব সমগ্র জগৎ দর্শন কবার দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায মা যশোদা কৃষ্ণেব মুখের ভিতর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং গ্রহ নক্ষত্রগুলি দেখতে পান। তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেব কৃপায় ভক্ত একসঙ্গে তাঁর সমস্ত সুপ্ত বাসনাগুলি দর্শন কবতে পারেন এবং তার ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ দেহান্তবেব সমাপ্তি হয়। এই সুযোগটি বিশেষ কবে ভগবদ্ভক্তদের দেওয়া হয়, যাতে তাঁব প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এই জীবনে যে অভিজ্ঞতা হয়নি সেই বিষয়ে কেন আমবা দর্শন করি, তা এখানে বিশ্লেষণ কবা হযেছে। যা আমরা দর্শন করি তা হচ্ছে মনেব ভাণ্ডাবে সঞ্চিত স্থূল শরীরের ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তি। যেহেতু কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিকে আর ভবিষ্যতে স্থূল দেহ ধারণ কবতে হবে না, তাই তার বাসনাগুলি স্বপ্নের মাধ্যমে চরিতার্থ হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই আমবা কখনও কখনও স্বপ্নে এমন কিছু দর্শন করি, যা আমাদের বর্তমান জীবনে কখনও অনুভব করিনি।

শ্লোক ৭০

**নাহং মমেতি ভাবোঽয়ং পুরুষে ব্যবধীয়তে ।
যাবদ্ বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থগুণব্যূহো হ্যনাদিমান্ ॥ ৭০ ॥**

ন—না; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **ভাবঃ**—চেতনা; **অয়ম্**—এই; **পুরুষে**—জীবে; **ব্যবধীয়তে**—বিচ্ছিন্ন; **যাবৎ**—যতক্ষণ, **বুদ্ধি**—বুদ্ধি, **মনঃ**—

মন; **অক্ষ**—ইন্দ্রিয়; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **গুণ**—জড় গুণের; **ব্যূহঃ**—প্রকাশ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনাদি-মান্**—সূক্ষ্ম শরীর (অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান)।

অনুবাদ

যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র, এবং জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের পরিণাম সূক্ষ্ম দেহ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অহঙ্কার এবং স্থূল দেহ বর্তমান থাকে।

তাৎপর্য

মাটি, জল আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ-মহাভূত দ্বারা গঠিত স্থূল শরীর ব্যতীত মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম দেহের বাসনাপূর্তি সম্ভব হয় না। যখন স্থূল শরীর প্রকাশিত হয় না, তখন জীব প্রকৃতপক্ষে জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে কার্য করতে পারে না। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জীবের সূক্ষ্ম শরীরের সুখ এবং দুঃখের ফলে, মন এবং বুদ্ধির ক্রিয়া চলতে থাকে। জড় অহঙ্কার (অর্থাৎ 'আমি' এবং 'আমার' চেতনা) চলতে থাকে, কারণ এই চেতনা অনাদি কাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করার ফলে চিৎ-জগতে ফিরে যায়, তখন আর স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জীবকে বিচলিত করে না।

শ্লোক ৭১

সুপ্তিমূর্চ্ছোপতাপেষু প্রাণায়নবিঘাততঃ ।
নেহতেঽহমিতি জ্ঞানং মৃত্যুপ্রজ্বারয়োরপি ॥ ৭১ ॥

সুপ্তি—গভীর নিদ্রা; **মূর্চ্ছা**—মূর্চ্ছা; **উপতাপেষু**—অত্যন্ত ক্লেশ; **প্রাণ-অয়ন**—প্রাণবায়ু সঞ্চারণের; **বিঘাততঃ**—প্রতিহত; **ন**—না; **ঈহতে**—চিন্তা করে; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **মৃত্যু**—মৃত্যুর সময়; **প্রজ্বারয়োঃ**—অথবা প্রবল জ্বরের সময়; **অপি**—ও।

অনুবাদ

গভীর নিদ্রা, মূর্চ্ছা, প্রবল ক্ষতির ফলে প্রচণ্ড শোক, মৃত্যুর সময়, অথবা যখন প্রবল জ্বর হয় তখন প্রাণবায়ুর সঞ্চারণ প্রতিহত হয়। তখন জীবের দেহাত্মবুদ্ধি হারিয়ে যায়, অর্থাৎ সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে না।

তাৎপর্য

মূর্খ মানুষেরা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, কিন্তু যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি, তখন আর আমাদের স্থূল জড় দেহের কথা মনে থাকে না, আর যখন আমরা জেগে উঠি, তখন সূক্ষ্ম শরীরের কথা আমরা ভুলে যাই অর্থাৎ নিদ্রিত অবস্থায় আমরা স্থূল শরীরের কার্যকলাপের কথা ভুলে যাই, এবং যখন আমরা স্থূল শরীরে সক্রিয় হই, তখন আমরা আমাদের নিদ্রিত অবস্থার কথা ভুলে যাই প্রকৃতপক্ষে নিদ্রা এবং জাগরণ উভয় অবস্থাই মায়ার সৃষ্টি। বস্তুত সুপ্ত অবস্থার কার্য অথবা তথাকথিত জাগরিত অবস্থার কার্য, উভয়ের সঙ্গে জীবের কোন সম্পর্ক নেই। কেউ যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে অথবা মূর্ছিত হয়, তখন সে তার স্থূল শরীরের কথা ভুলে যায়। তেমনই, ক্লোরোফর্ম অথবা অন্যান্য সংজ্ঞানাশক ওষুধের প্রভাবে জীব তার স্থূল শরীরের কথা ভুলে যায় এবং অপারেশনের সময় কোন বেদনা অনুভব করে না। তেমনই, কেউ যখন মস্ত বড় ক্ষতি হওয়ার ফলে হঠাৎ আঘাত পায়, তখন সে তার স্থূল শরীরের পরিচয় ভুলে যায়। মৃত্যুর সময় যখন দেহের তাপ ১০৭ডিগ্রিতে উঠে যায়, তখন জীব অচেতন হয়ে পড়ে এবং স্থূল শরীরের কথা বিস্মৃত হয়। তখন স্থূল শরীরের মধ্যে বিচরণশীল প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়, এবং জীব তার স্থূল শরীরের কথা ভুলে যায়। চিন্ময় শরীর সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার ফলে আমরা চিন্ময় শরীরের কার্যকলাপের কথা জানি না, এবং অজ্ঞানতাবশত একটি ভ্রান্ত স্তর থেকে আর একটি ভ্রান্ত স্তরে লাফালাফি করি। কখনও আমরা স্থূল শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে কার্য করি, এবং কখনও আবার সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে কার্য করি। যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমরা আমাদের চিন্ময় শরীরের স্তরে সক্রিয় হই, তা হলে আমরা স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শরীরেরই অতীত হতে পারি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমরা ক্রমশ চিন্ময় শরীরের স্তরে আচরণ করার শিক্ষা লাভ করতে পারি। সেই সম্বন্ধে *নারদপঞ্চরাত্রে* বলা হয়েছে, *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে চিন্ময় দেহ এবং চিন্ময় ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। আমরা যখন এই প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত হই, তখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

শ্লোক ৭২

গর্ভে বাল্যেঽপ্যপৌষ্কল্যাদেকাদশবিধং তদা ।
লিঙ্গং ন দৃশ্যতে যূনঃ কুহ্বাং চন্দ্রমসো যথা ॥ ৭২ ॥

গর্ভে—গর্ভে, **বাল্যে**—বাল্যকালে; **অপি**—ও; **অপৌষ্কল্যাৎ**—অসম্পূর্ণতার ফলে, **একাদশ**—দশ ইন্দ্রিয় এবং মন, **বিধম্**—রূপে, **তদা**—সেই সময়; **লিঙ্গম্**—সূক্ষ্ম দেহ অথবা অহঙ্কার; **ন**—না; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **যূনঃ**—যুবকের, **কুহ্বাম্**—অমাবস্যার রাত্রে; **চন্দ্রমসঃ**—চন্দ্র; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

যৌবনে দশটি ইন্দ্রিয় এবং মন সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু মাতৃগর্ভে ও বাল্যাবস্থায় সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন অমাবস্যার চাঁদের মতো আবৃত থাকে।

তাৎপর্য

গর্ভাবস্থায় জীবের স্থূল দেহ, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন পূর্ণরূপে বিকশিত হয় না। সেই সময় ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি তাকে বিচলিত করে না। কোন যুবক স্বপ্নে কোন যুবতীর উপস্থিতি দর্শন করতে পারে, কারণ তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয়। কিন্তু একটি শিশু বা বালক কোন যুবতীর স্বপ্ন দেখে না। যৌবনাবস্থায় স্বপ্নেও ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়, এবং কোন যুবতী উপস্থিত না থাকলেও, ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়া করে এবং তার ফলে বীর্যস্খলন হতে পারে। সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের কার্যকলাপ নির্ভর করে সেগুলি কতখানি বিকশিত তার উপর। এই সম্পর্কে চন্দ্রের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। অমাবস্যার রাত্রে পূর্ণ আলোকিত চাঁদ উপস্থিত থাকলেও, তখনকার অবস্থার ফলে তাকে দেখা যায় না। তেমনই, জীবের ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, কিন্তু সেগুলি কেবল তখনই সক্রিয় হয়, যখন স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ বিকশিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত স্থূল শরীরে ইন্দ্রিয়গুলি বিকশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি সূক্ষ্ম শরীরের উপর ক্রিয়া করে না। তেমনই, সূক্ষ্ম শরীরে যদি বাসনা না থাকে, তা হলে স্থূল শরীরে তা আর বিকশিত হবে না।

শ্লোক ৭৩

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৭৩ ॥

অর্থে—ইন্দ্রিয়ের বিষয়, **হি**—নিশ্চিতভাবে, **অবিদ্যমানে**—অনুপস্থিত, **অপি**—যদিও, **সংসৃতিঃ**—সংসার; **ন**—কখনই না; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করে; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের; **অস্য**—জীবের; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে, **অনর্থ**—অবাঞ্ছিত বস্তুর; **আগমঃ**—আবির্ভাব; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

জীব যখন স্বপ্ন দেখে, তখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি প্রকৃতপক্ষে থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গের ফলে সেগুলি প্রকাশিত হয়। তেমনই, অবিকশিত ইন্দ্রিয়-সমন্বিত জীব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সংস্পর্শে না থাকলেও, সংসার থেকে তার মুক্তি হয় না।

তাৎপর্য

কখনও কখনও বলা হয় যে, শিশু যেহেতু অবোধ, তাই সে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। সূক্ষ্ম শরীরে কর্মের প্রভাব তিনটি স্তরে থাকে। সেগুলি হচ্ছে বীজ, কূটস্থ (বাসনা), এবং ফলোন্মুখ। প্রকাশিত অবস্থাকে বলা হয় প্রাবব্ধ (ইতিমধ্যেই সক্রিয়)। চেতন অথবা অচেতন অবস্থায়, সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের কার্যকলাপ প্রকাশিত নাও হতে পারে, কিন্তু তা বলে সেই অবস্থাকে মুক্ত অবস্থা বলা যায় না। শিশু অবোধ হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে মুক্ত পুরুষ। তার পূর্বকৃত সমস্ত কর্ম সঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে, এবং যথাসময়ে সেগুলি প্রকাশিত হবে। সূক্ষ্ম শরীরে প্রকাশ না হলেও, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি কার্য করতে পারে। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে স্বপ্নদোষ, যাতে বস্তুর উপস্থিতি না থাকলেও ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়। প্রকৃতির তিনটি গুণ সূক্ষ্ম শরীরে প্রকাশিত না হতে পারে, কিন্তু তার কলুষ সঞ্চিত থাকে, এবং যথাসময়ে তা প্রকাশিত হয় সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত না হলেও, জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় না। তাই একটি শিশু আপাতদৃষ্টিতে নির্বোধ বলে মনে হলেও, তাকে একজন মুক্ত পুরুষের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা ভুল।

শ্লোক ৭৪

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্ ।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **পঞ্চ-বিধম্**—পঞ্চ তন্মাত্র; **লিঙ্গম্**—সূক্ষ্ম শরীর; **ত্রি-বৃৎ**—তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত; **ষোড়শ**—ষোল; **বিস্তৃতম্**—বিস্তৃত; **এষঃ**—এই; **চেতনয়া**—জীবের সঙ্গে; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **জীবঃ**—বদ্ধ জীব; **ইতি**—এইভাবে, **অভিধীয়তে**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন—এই ষোলটি জড় বিস্তার। এগুলি জীবের সঙ্গে একত্রে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের অস্তিত্ব।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ হওয়ার ফলে, আমার অংশ জীবাত্মারা মন সমেত ছয়টি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।"

এই শ্লোকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জীব ষোলটি জড় তত্ত্বের সংস্পর্শে আসে এবং প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। জীব এবং এই তত্ত্বসমূহের সমন্বয়কে বলা হয় *জীবভূত* বা বদ্ধ জীব, যারা এই জড় জগতে কঠোর সংগ্রাম করে। প্রথমে মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়, এবং তার ফলে জীবেব বদ্ধ জীবন শুরু হয়। এইভাবে সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর এবং পঞ্চ-মহাভূত ইত্যাদির উদ্ভব হয়। শ্রীল মধ্বাচার্যের মতে, যখন চেতনা বা হৃদয়ের জীবনী শক্তি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়, তখন মন, তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সমন্বিত জীবের সূক্ষ্ম শরীর সম্ভব হয়।

শ্লোক ৭৫

অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি ।
হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখং চানেন বিন্দতি ॥ ৭৫ ॥

অনেন—এই পন্থার দ্বারা; **পুরুষঃ**—জীব; **দেহান্**—স্থূল শরীর; **উপাদত্তে**—প্রাপ্ত হয়; **বিমুঞ্চতি**—পরিত্যাগ করে; **হর্ষম্**—হর্ষ; **শোকম্**—শোক; **ভয়ম্**—ভয়; **দুঃখম্**—দুঃখ; **সুখম্**—সুখ; **চ**—ও; **অনেন**—স্থূল শরীরের দ্বারা; **বিন্দতি**—উপভোগ করে।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা জীব স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তা ত্যাগ করে। তাকে বলা হয় আত্মার দেহান্তর। এইভাবে আত্মা বিভিন্ন প্রকার হর্ষ, শোক, ভয়, সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মূলত জীব তার শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপে ভগবানেরই মতো ছিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার দ্বারা মন কলুষিত হয়ে যাওয়ার ফলে, জীব জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় পতিত হয়েছে। তার ফলে তার জড় জাগতিক অস্তিত্বের শুরু হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে সে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে, দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর বন্ধনযুক্ত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা স্মরণ করার চিন্ময় পন্থা কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা জীব তার চিন্ময় স্বরূপে ফিরে যেতে পারে। ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর। তা হলে তুমি নিশ্চিতভাবে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তোমাকে এই প্রতিজ্ঞা করছি কারণ তুমি আমার অতি প্রিয় সখা।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৬৫)

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। অর্চনমার্গে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা এবং শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবিগ্রহকে নিরন্তর প্রণতি নিবেদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত নির্দেশ তাদের জন্য দেওয়া হয়েছে, যারা প্রকৃতই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনের কার্যকলাপ চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা অধ্যয়ন করতে পারে, কিন্তু তারা এই বিষয়ে গভীরে যেতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে তাদের জ্ঞানের অভাব এবং জীবন্মুক্ত আচার্যের সঙ্গলাভের অক্ষমতা

ভগবদ্‌গীতায় (৪/২) উল্লেখ করা হয়েছে—

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

"এই পরম বিজ্ঞান গুরুপরম্পরা ধারায় লাভ করতে হয়, এবং ঋষিসদৃশ রাজারা তা সেভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে সেই গুরুপরম্পরার ধারা ছিন্ন হয়েছিল, এবং তাই এই জ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।" তথাকথিত মনোবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আধুনিক যুগের মানুষেরা সূক্ষ্ম শরীরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, এবং তার ফলে তারা আত্মার দেহান্তর বলতে যে কি বুঝায় তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই বিষয়ে আমাদের *ভগবদ্গীতার* (২/১৩) প্রামাণিক বিবৃতি গ্রহণ করতে হবে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"বদ্ধ জীব যেভাবে এই দেহে ক্রমশ কৌমার থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যদশা প্রাপ্ত হয়, তেমনই আত্মা মৃত্যুর পর অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয়। আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত জীব এই প্রকার পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র মানব সমাজ *ভগবদ্গীতার* এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারছে, ততক্ষণ অজ্ঞানের প্রগতি হবে, জ্ঞানের নয়।

শ্লোক ৭৬-৭৭

যথা তৃণজলূকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ ।
ন ত্যজেন্ম্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্দেহাভিমতিং জনঃ ॥ ৭৬ ॥
যাবদন্যং ন বিন্দেত ব্যবধানেন কর্মণাম্ ।
মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবভাবনম্ ॥ ৭৭ ॥

যথা—যেমন; **তৃণ-জলূকা**—শুঁয়াপোকা; **ইয়ম্**—এই; **ন অপযাতি**—যায় না, **অপযাতি**—যায়; **চ**—ও; **ন**—না; **ত্যজেৎ**—পরিত্যাগ করবে, **ম্রিয়মাণঃ**—মৃত্যুর সময়; **অপি**—ও; **প্রাক্**—পূর্ব; **দেহ**—শরীরে; **অভিমতিম্**—পরিচয়; **জনঃ**—ব্যক্তি; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **অন্যম্**—অন্য; **ন**—না; **বিন্দেত**—প্রাপ্ত হয়; **ব্যবধানেন**—সমাপ্তির দ্বারা; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মের; **মনঃ**—মন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মনুষ্য-ইন্দ্র**—হে নরপতি; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ভব**—জড় অস্তিত্বের; **ভাবনম্**—কারণ।

অনুবাদ

শুঁয়াপোকা যেমন একটি পাতা অবলম্বন করে পূর্ববর্তী পাতা পরিত্যাগ করে, তেমনই, জীব তার পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে, অন্য আর একটি শরীর অবলম্বন করে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। তার কারণ, মন হচ্ছে সর্বপ্রকার বাসনার আগার।

তাৎপর্য

জড় কার্যকলাপে মগ্ন জীব জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে এমন কি, মৃত্যুর সময়ও সে তার শরীর এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজনদের কথা চিন্তা করে তার ফলে সে দেহাত্মবুদ্ধিতে এতই মগ্ন থাকে যে, মৃত্যুর সময়ও সে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করতে চায় না। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তি দেহত্যাগ করার পূর্বে বহুদিন মূর্ছিত অবস্থায় থাকে তা বিশেষভাবে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা মনে করে যে তাদের ছাড়া সারা দেশ অথবা সমাজ অচল হয়ে পড়বে। একে বলা হয় মায়া। রাজনৈতিক নেতারা তাদের পদ ছাড়তে চায় না। হয় শত্রুর গুলিতে অথবা মৃত্যুর আগমনে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। দৈবের আয়োজনে জীব আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তার বর্তমান শরীরের প্রতি আকর্ষণের ফলে, সে অন্য আর একটি শরীরে দেহান্তরিত হতে চায় না তখন তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে প্রকৃতি তাকে বাধ্য করে

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে বিমূঢ় জীবাত্মা নিজেকে কর্তা বলে অভিমান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সবই সম্পাদিত হয় প্রকৃতির দ্বারা "

(*ভগবদ্গীতা* ৩/২৭)

জড়া প্রকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং জড়া প্রকৃতির গুণগুলি জীবকে অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। তা বোঝা যায় যখন জীবকে উন্নততর শরীর থেকে নিকৃষ্ট শরীরে দেহান্তরিত হতে হয়। যে বর্তমান শরীরে একটি কুকুর অথবা একটি শূকরের মতো আচরণ করে, সে অবশ্যই তার পরবর্তী জীবনে একটি কুকুর অথবা শূকরের শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কোন ব্যক্তি একজন প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতির শরীর উপভোগ করতে পারে, কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে যে, তাকে একটি কুকুর অথবা শূকরের শরীর গ্রহণ করতে হবে, তখন সে তার বর্তমান শরীরটি পরিত্যাগ করতে চায় না তাই সে মৃত্যুর পূর্বে বহুদিন

মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকে। বহু রাজনীতিবিদের মৃত্যুর সময় তা দেখা গেছে। মূল কথা হচ্ছে যে, পরবর্তী শরীরটি দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। জীব এক দেহ ত্যাগ করার পরই আর একটি দেহে প্রবেশ করে। কখনও কখনও জীব অনুভব করে যে, তার বর্তমান শরীরের মাধ্যমে তার অনেক বাসনা এবং কল্পনা পূর্ণ হয়নি। যারা তাদের শরীরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের প্রেত শরীরে থাকতে হয় এবং তারা অন্য আর একটি স্থূল শরীর ধারণ করতে পারে না। প্রেত শরীরে তারা প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের নানা রকম উপদ্রব করে। এই প্রকার পরিস্থিতির মূল কারণ হচ্ছে মন। মন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর তৈরি হয়, এবং জীবকে তা ধারণ করতে বাধ্য করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"শরীর ছাড়ার সময় মানুষ যে অবস্থা স্মরণ করবে, নিঃসন্দেহে সে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে।" মানুষ তার শরীর এবং ব দ্বারা কুকুরের মতো আচরণ করতে পারে অথবা দেবতার মতো আচরণ করতে পারে, এবং সেই অনুসারে সে তার পরবর্তী জীবন প্রাপ্ত হবে। তার বিশ্লেষণ *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২২) করা হয়েছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

"জড় প্রকৃতিতে জীব প্রকৃতির তিনটি গুণ ভোগ করে। গুণের এই সঙ্গ প্রভাবে সে উত্তম অথবা অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।" জীব গুণের সঙ্গ অনুসারে উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট শরীরে দেহান্তরিত হয়। সে যদি তমোগুণের সঙ্গ করে, তা হলে সে পশু অথবা নিকৃষ্ট স্তরের মানুষের শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে যদি সত্ত্বগুণ অথবা রজোগুণের সঙ্গ করে, তা হলে সেই অনুসারে সে দেহ প্রাপ্ত হয়। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১৪/১৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তারা ক্রমশ উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়; যারা রজোগুণে রয়েছে, তারা ভূর্লোকে অবস্থান করে; আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা নরকে যায়।"

সঙ্গের মূল কারণ হচ্ছে মন। এই মহান কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, কারণ তা মানুষকে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার শিক্ষা দান করছে. এইভাবে, জীবনের অন্তে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে পারবে। একে বলা হয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট, অর্থাৎ গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) সেই কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে তত্ত্বত জানা যায় এবং কেউ যখন এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পূর্ণরূপে ভগবৎ চেতনা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।" মন যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়, তখন গোলোক বৃন্দাবন নামক লোকে প্রবেশ করা যায় ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে জানার পন্থা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানার পর, কৃষ্ণলোকে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গ করার যোগ্যতা লাভ হয়। এই প্রকার অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়ার কারণও হচ্ছে মন। মনের দ্বারা কেউ কুকুর অথবা শূকরের শরীর প্রাপ্ত হতে পারে, আবার ভগবানের নিত্য পার্ষদের শরীর লাভ করতে পারে। তাই মনকে সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন রাখাই হচ্ছে মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

শ্লোক ৭৮

যদাক্ষৈশ্চরিতান্ ধ্যায়ন্ কর্মাণ্যাচিনুতেঽসকৃৎ ।
সতি কর্মণ্যবিদ্যায়াং বন্ধঃ কর্মণ্যনাত্মনঃ ॥ ৭৮ ॥

যদা—যখন; **অক্ষৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, **চরিতান্**—সুখভোগ; **ধ্যায়ন্**—চিন্তা করে; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ, **আচিনুতে**—অনুষ্ঠান করে; **অসকৃৎ**—সর্বদা; **সতি কর্মণি**—যখন জড়-জাগতিক কার্যকলাপ হতে থাকে; **অবিদ্যায়াম্**—মোহবশত; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **কর্মণি**—কর্মে; **অনাত্মনঃ**—জড় দেহের।

অনুবাদ

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই, ততক্ষণ আমরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সৃষ্টি করি। জীব যখন জড় ক্ষেত্রে কর্ম করে, তখন সে ইন্দ্রিয়সুখ

উপভোগ করতে চায়, এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার সময় সে জড় কর্মের শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এইভাবে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সূক্ষ্ম শরীরে থাকার সময়, আমরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অনেক প্রকার পরিকল্পনা করি। এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি সকাম কর্মের বীজ রূপে পর্দায় অঙ্কিত হয়ে থাকে। বদ্ধ জীবনে জীব একের পর এক শরীর সৃষ্টি করে, এবং তাকে বলা হয় কর্মবন্ধন। *ভগবদ্‌গীতায়* (৩/৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—আমরা যদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কেবল কর্ম করি, তা হলে আমাদের আর জড় জাগতিক কার্যকলাপের জন্য কর্মবন্ধন সৃষ্টি হবে না, কিন্তু আমরা যদি তা না করি, তা হলে আমরা একের পর এক কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ব। এই অবস্থায় অনুমান করতে হবে যে, চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার দ্বারা আমরা আমাদের পরবর্তী জড় দেহের সৃষ্টি করছি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*অনাদি করমফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে*। পূর্বকৃত কর্মের ফলে জীব ভবসমুদ্রে পতিত হয়ে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হওয়ার পরিবর্তে, কেবল দেহধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জড়-জাগতিক কার্যকলাপ করে, বাকি সময় ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই মানুষের কর্তব্য। এইভাবে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৭৯

অতস্তদপবাদার্থং ভজ সর্বাত্মনা হরিম্ ।
পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ ॥ ৭৯ ॥

অতঃ—অতএব; **তৎ**—তা; **অপবাদ-অর্থম্**—প্রতিকারের জন্য; **ভজ**—ভগবানের সেবায় যুক্ত হও; **সর্ব-আত্মনা**—তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **তৎ**—ভগবানের; **আত্মকম্**—নিয়ন্ত্রণাধীনে; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **স্থিতি**—পালন; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অপ্যয়াঃ**—এবং বিনাশ; **যতঃ**—যাঁর থেকে।

অনুবাদ

সর্বদা মনে রাখুন যে, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত হয়। তার ফলে এই জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবানের

নিয়ন্ত্রণাধীন। এই দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

বদ্ধ অবস্থায় আত্ম-উপলব্ধি অথবা নিজেকে ব্রহ্ম বা আত্মা বলে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আমরা যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করি, তা হলে ভগবান ধীরে ধীরে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্ত ধীরে ধীরে তাঁর চিন্ময় স্থিতি উপলব্ধি করতে পারবেন। রাত্রের অন্ধকারে কোন কিছুই দেখা যায় না, এমন কি আমরা নিজেদেরও দেখতে পারি না; কিন্তু যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন আমরা সেই আলোকে কেবল সূর্যকেই দর্শন করতে পারি, তাই নয়, অধিকন্তু এই জগতের সব কিছু দর্শন করতে পারি। *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে (৭/১) সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

"হে পার্থ! এখন শোন, কিভাবে পূর্ণরূপে আমার ভাবনায় মগ্ন হয়ে যোগ অভ্যাস করার ফলে, তোমার মনকে আমার প্রতি আসক্ত করে নিঃসংশয়ে তুমি পূর্ণরূপে আমাকে জানতে পারবে।"

আমরা যখন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হই, তখন আমরা কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই নয়, কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু সম্বন্ধে জানতে পারি। অর্থাৎ, কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে আমরা কেবল কৃষ্ণ এবং এই জগৎ সম্বন্ধেই জানতে পারি না, অধিকন্তু আমরা আমাদের স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারি। কৃষ্ণভাবনায় আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, ভগবান সারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তা পালন করছেন এবং তাঁরই দ্বারা তা সংহার হবে। আমরাও ভগবানের বিভিন্ন অংশ। সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন হওয়া।

শ্লোক ৮০

মৈত্রেয় উবাচ

ভাগবতমুখ্যো ভগবান্নারদো হংসয়োর্গতিম্ ।
প্রদর্শ্য হ্যমুমামন্ত্র্য সিদ্ধলোকং ততোঽগমৎ ॥ ৮০ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ভাগবত**—ভক্তদের; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **হংসয়োঃ**—জীব এবং ভগবানের; **গতিম্**—স্বরূপ; **প্রদর্শ্য**—প্রদর্শন করে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অমুম্**—তাঁকে (রাজাকে); **আমন্ত্র্য**—আমন্ত্রণ করে, **সিদ্ধ-লোকম্**—সিদ্ধলোকে; **ততঃ**—তারপর; **অগমৎ**—প্রস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, মহাভাগবত ভগবান নারদ এইভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হির কাছে জীব এবং ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, রাজাকে আমন্ত্রণ করে সিদ্ধলোকে গমন করলেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধলোক এবং ব্রহ্মলোক উভয়ই এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। ব্রহ্মলোক হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক, সিদ্ধলোক হচ্ছে ব্রহ্মলোকের একটি উপগ্রহ। সিদ্ধলোকের অধিবাসীদের সব রকম যোগসিদ্ধি রয়েছে। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, নারদ মুনি হচ্ছেন সিদ্ধলোকের অধিবাসী, যদিও তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করেন। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা সকলেই তাঁদের যোগসিদ্ধির প্রভাবে এক লোক থেকে অন্য লোকে বিচরণ করতে পারেন। মহারাজ প্রাচীনবর্হিকে উপদেশ প্রদান করার পর, নারদ মুনি তাঁকেও সিদ্ধলোকে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৮১

প্রাচীনবর্হী রাজর্ষিঃ প্রজাসর্গাভিরক্ষণে ।
আদিশ্য পুত্রানগমত্তপসে কপিলাশ্রমম্ ॥ ৮১ ॥

প্রাচীনবর্হিঃ—রাজা প্রাচীনবর্হি; **রাজ-ঋষিঃ**—ঋষিসদৃশ রাজা; **প্রজা-সর্গ**—প্রজাসমূহ; **অভিরক্ষণে**—রক্ষা করার জন্য; **আদিশ্য**—আদেশ দিয়ে; **পুত্রান্**—তাঁর পুত্রদের; **অগমৎ**—প্রস্থান করেছিলেন; **তপসে**—তপস্যা করার জন্য; **কপিল-আশ্রমম্**—কপিলাশ্রম নামক পুণ্য তীর্থে।

অনুবাদ

তাঁর মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে রাজর্ষি প্রাচীনবর্হি তাঁর পুত্রদের জন্য নাগরিকদের রক্ষা করার আদেশ রেখে, গৃহত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য কপিলাশ্রম তীর্থে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রজাসর্গ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজা প্রাচীনবর্হি যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করার জন্য নারদ মুনি কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর পুত্ররা জলে তাঁদের তপস্যা সমাপন করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেননি। কিন্তু, তিনি তাঁর পুত্রদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা না করেই, মন্ত্রীদের কাছে তাঁদের প্রজা রক্ষা করার আদেশ দিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। বীররাঘব আচার্যের মত অনুসারে, এই প্রকার রক্ষার অর্থ হচ্ছে নাগরিকদের চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম অনুসারে বিভক্ত করে জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করা। রাজাদের কর্তব্য ছিল প্রজারা চতুর্বর্ণ (যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) এবং চতুরাশ্রম (যথা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) বিধি অনুসরণ করছে কি না তা দেখা বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে প্রজাদের সংগঠিত না করে রাজ্যশাসন করা অত্যন্ত কঠিন কেবল বিধানসভায় প্রতি বছর কতকগুলি আইন তৈরি করে রাজ্যে প্রজাদের শাসন করা এবং তাদের উন্নতিসাধন করা কখনই সম্ভব নয়। সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম অপরিহার্য। এক শ্রেণীর মানুষের (ব্রাহ্মণ) বুদ্ধিমান এবং ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া অবশ্য কর্তব্য, অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষকে ক্ষত্রিয়োচিত প্রশাসনিক কার্যে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, আর এক শ্রেণী হচ্ছে বৈশ্য-সম্প্রদায় এবং অন্য আর একটি শ্রেণী হচ্ছে শূদ্র বা শ্রমিক। প্রকৃতির নিয়মে এই চার শ্রেণীর মানুষ মানব-সমাজে রয়েছে, কিন্তু সরকারের কর্তব্য হচ্ছে এই চারটি শ্রেণী তাদের বর্ণের ধর্ম সুসংবদ্ধভাবে পালন করছে কি না তা দেখা। তাকে বলা হয় *অভিরক্ষণ।*

নারদ মুনির উপদেশের প্রভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হি যখন তাঁর জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন, তখন যে তিনি তাঁর পুত্রদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করার অপেক্ষা না করে গৃহত্যাগ করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাঁর পুত্ররা গৃহে ফিরে এলে তাঁর অনেক কিছু করণীয় ছিল, কিন্তু তিনি কেবল তাঁদের জন্য একটি আদেশ রেখে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর প্রধান কর্তব্য যে কি তা তিনি জানতেন। তিনি কেবল তাঁর পুত্রদের জন্য কতকগুলি উপদেশ রেখে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছিলেন। এটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা।

শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, কপিলাশ্রম বঙ্গোপসাগর এবং গঙ্গার সংযোগ স্থলে অবস্থিত, যা এখন গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। সেই স্থানটি এখনও এক মহা পবিত্র তীর্থরূপে বিখ্যাত, এবং প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে সেখানে স্নান করবার জন্য লক্ষ-লক্ষ লোকের সমাগম হয়। এই স্থানটিকে বলা হয় কপিলাশ্রম, কারণ কপিল মুনি এখানে তপস্যা করেছিলেন। কপিলদেব হচ্ছেন সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্তক।

শ্লোক ৮২

তত্রৈকাগ্রমনা ধীরো গোবিন্দচরণাম্বুজম্ ।
বিমুক্তসঙ্গোঽনুভজন্ ভক্ত্যা তৎসাম্যতামগাৎ ॥ ৮২ ॥

তত্র—সেখানে; **এক-অগ্র-মনাঃ**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে, **ধীরঃ**—ধীর; **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের; **চরণ-অম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্মে, **বিমুক্ত**—মুক্ত হয়ে, **সঙ্গঃ**—জড় সঙ্গ; **অনুভজন্**—ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর যুক্ত হয়ে; **ভক্ত্যা**—শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা, **তৎ**—ভগবানের সঙ্গে; **সাম্যতাম্**—গুণগতভাবে সমান, **অগাৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন

অনুবাদ

কপিলাশ্রমে তপস্যা করে রাজা প্রাচীনবর্হি সমস্ত জড় উপাধি থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে, ভগবৎ-সারূপ্য লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

তৎসাম্যতাম্ অগাৎ পদটির একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রাজা ভগবৎ সারূপ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তা থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান একজন সবিশেষ পুরুষ। তাঁর নির্বিশেষ রূপ হচ্ছে তাঁর দিব্য দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। জীব যখন আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনিও সেই প্রকার দেহ প্রাপ্ত হন, যাকে বলা হয় *সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ*। এই চিন্ময় দেহ কখনও জড় তত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত হয় না। বদ্ধ অবস্থায় জীব যদিও জড় উপাদানগুলির (মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) দ্বারা পরিবৃত থাকে, তবুও সে সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র থাকে। অর্থাৎ, জীব যদি ইচ্ছা করে তা হলে সে যে কোন মুহূর্তে তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে। জড় পরিবেশকে বলা হয় মায়া। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত হয়, তারা অনায়াসে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৪)

জীব যখনই ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখনই সে সমস্ত জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হয় (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। জড় জগতে জীব *জীবভূত* স্তরে রয়েছে, কিন্তু সে যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে, তখন সে *ব্রহ্মভূত* স্তরে উন্নীত হয়। *ব্রহ্মভূত* স্তরে জীব জড় বন্ধন থেকে মুক্ত, এবং সে তখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। এই শ্লোকে *ধীব* শব্দটি কখনও কখনও *বীর* রূপে পাঠ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি শব্দের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। যিনি মায়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তিনি *বীর*, এবং যিনি তাঁর প্রকৃত স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন *ধীব*। *ধীব* অথবা *বীর* না হলে, কেউই মুক্তিলাভ করতে পারে না।

শ্লোক ৮৩

এতদধ্যাত্মপারোক্ষ্যং গীতং দেবর্ষিণানঘ ।
যঃ শ্রাবয়েদ্ যঃ শৃনুয়াৎ স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥

এতৎ—এই, **অধ্যাত্ম**—আধ্যাত্মিক; **পারোক্ষ্যম্**—প্রামাণিক বর্ণনা; **গীতম্**—বর্ণিত; **দেব-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ বিদুর; **যঃ**—যিনি; **শ্রাবয়েৎ**—বর্ণনা করেন; **যঃ**—যিনি; **শৃনুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **সঃ**—তিনি, **লিঙ্গেন**—দেহাত্মবুদ্ধি থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

হে বিদুর! জীবের আধ্যাত্মিক স্থিতি সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদ বর্ণিত এই আখ্যান যিনি শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ হচ্ছে আত্মার স্বপ্ন। প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতের সমস্ত অস্তিত্ব হচ্ছে মহাবিষ্ণুর স্বপ্ন, যে-কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে—

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ॥

এই জড় জগৎ মহাবিষ্ণুর স্বপ্ন থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বাস্তব জগৎ হচ্ছে চিৎ-জগৎ, কিন্তু জীবাত্মা যখন পরমেশ্বর ভগবানের অনুকরণ করতে চায়, তখন তাকে জড় সৃষ্টির স্বপ্নলোকে স্থাপন করা হয়। জড়া প্রকৃতির গুণের সংস্পর্শে থাকার পর, জীবের সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের উৎপত্তি হয়। জীব যখন সৌভাগ্যক্রমে শ্রীনারদ মহামুনি বা তাঁর সেবকদের সঙ্গ লাভ করে, তখন সে জড় জগতের স্বপ্নলোক এবং দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়

শ্লোক ৮৪

এতন্মুকুন্দযশসা ভুবনং পুনানং
দেবর্ষিবর্যমুখনিঃসৃতমাত্মশৌচম্ ।
যঃ কীর্ত্যমানমধিগচ্ছতি পারমেষ্ঠ্যং
নাস্মিন্ ভবে ভ্রমতি মুক্তসমস্তবন্ধঃ ॥ ৮৪ ॥

এতৎ—এই উপাখ্যান; **মুকুন্দ-যশসা**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশে; **ভুবনম্**—এই জড় জগৎ; **পুনানম্**—পবিত্রকারী; **দেব-ঋষি**—দেবর্ষিদের; **বর্য**—মুখ্য; **মুখ**—মুখ থেকে; **নিঃসৃতম্**—নিঃসৃত; **আত্ম-শৌচম্**—হৃদয় পবিত্রকারী; **যঃ**—যিনি; **কীর্ত্যমানম্**—কীর্তিত হয়; **অধিগচ্ছতি**—ফিরে যান; **পারমেষ্ঠ্যম্**—চিৎ-জগতে; **ন**—কখনই না; **অস্মিন্**—এই; **ভবে**—জড় জগতে; **ভ্রমতি**—ভ্রমণ করে; **মুক্ত**—মুক্ত; **সমস্ত**—সমস্ত; **বন্ধঃ**—বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদের মুখনিঃসৃত এই উপাখ্যান ভগবান মুকুন্দের যশে পরিপূর্ণ। তাই এই উপাখ্যান যখন বর্ণিত হয়, তখন তা নিশ্চিতভাবে এই জড় জগৎকে পবিত্র করে। তা জীবের হৃদয় পবিত্র করে এবং তাকে তার চিন্ময় স্বরূপ লাভ করতে সাহায্য করে। যিনি এই দিব্য আখ্যান বর্ণনা করেন, তিনি সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং তাঁকে আর এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে হয় না।

তাৎপর্য

ঊনআশী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিকে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে সময় নষ্ট না করে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন এই অধ্যায়ে সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের অতি উজ্জ্বল বর্ণনা অত্যন্ত

বিজ্ঞানসম্মত, এবং যেহেতু তা দেবর্ষি নারদ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে, তাই তা সর্বতোভাবে প্রামাণিক। এই আখ্যান ভগবানের মহিমায় পূর্ণ হওয়ার ফলে, তা মনের শুদ্ধির জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—*চেতোদর্পণ-মার্জনম্।* আমরা যতই শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি, শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করি, ততই আমরা পবিত্র হই। তার অর্থ হচ্ছে যে, তখন আর আমাদের মোহ-সৃষ্টিকারী স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হবে না, পক্ষান্তরে আমরা আমাদের চিন্ময় স্বরূপ লাভ করব। যিনি এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, তিনি এই অজ্ঞানের সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করবেন। এই সূত্রে *পারমেষ্ঠ্যম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেই লোকে ব্রহ্মা বাস করেন, সেই ব্রহ্মলোককেও *পারমেষ্ঠ্যম্* বলা হয়। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা সর্বদা এই প্রকার আখ্যানের আলোচনা করেন, যাতে তাঁরা জড় জগতের বিনাশের পর, চিৎ-জগতে ফিরে যেতে পারেন। যাঁরা চিৎ-জগতে ফিরে যান, তাঁদের এই সংসারে উপর্যধ বিচরণ করতে হয় না। কখনও কখনও চিন্ময় কার্যকলাপকেও *পারমেষ্ঠ্যম্* বলা হয়।

শ্লোক ৮৫

অধ্যাত্মপারোক্ষ্যমিদং ময়াধিগতমদ্ভুতম্ ।
এবং স্ত্রিয়াশ্রমঃ পুংসশ্ছিন্নোঽমুত্র চ সংশয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

অধ্যাত্ম—আধ্যাত্মিক; **পারোক্ষ্যম্**—মহাজনের দ্বারা বর্ণিত; **ইদম্**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অধিগতম্**—শুনেছি; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **এবম্**—এইভাবে; **স্ত্রিয়া**—স্ত্রীর সঙ্গে; **আশ্রমঃ**—আশ্রয়; **পুংসঃ**—জীবের; **ছিন্নঃ**—সমাপ্ত; **অমুত্র**—পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে; **চ**—ও; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ মহারাজ পুরঞ্জনের এই প্রামাণিক রূপকটি আমি আমার গুরুদেবের কাছে শ্রবণ করেছি। কেউ যদি এই রূপকের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তিনি অবশ্যই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হবেন এবং পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত হতে পারবেন। কেউ যদি আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে অজ্ঞও হন, তবুও তিনি এই আখ্যানটি অধ্যয়ন করার ফলে তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *স্ত্রিয়া,* অর্থাৎ 'স্ত্রীসহ' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্ত্রী পুরুষের সহবাস হচ্ছে সংসার বন্ধনের মূল। এই জড় জগতে পুরুষ এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। সমস্ত যোনিতেই এই আকর্ষণ জড় অস্তিত্বের মূল কারণ। এই আকর্ষণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে, কিন্তু মানব-সমাজে তা নিয়ন্ত্রিতরূপে রয়েছে। জড় অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে স্ত্রী এবং পুরুষ রূপে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। কিন্তু, কেউ যখন পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জীবন হৃদয়ঙ্গম করেন, তখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। এই আকর্ষণের ফলে, জড় জগতের প্রতি প্রবল আসক্তি হয়। এটি হৃদয়ের ভিতর একটি অত্যন্ত দৃঢ় গ্রন্থি।

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৮)

এই জড় জগতে সকলেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত হয়ে এসেছে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনের এই অত্যন্ত সুদৃঢ় গ্রন্থিটি হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। এই আকর্ষণের ফলে জীব গৃহ, ক্ষেত্র, সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধব, ধনসম্পদ ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। এইভাবে সে 'আমি' এবং 'আমার' এই দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ যখন মহারাজ পুরঞ্জনের আখ্যানটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং বুঝতে পারেন কিভাবে যৌন আকর্ষণের ফলে পুরঞ্জন তাঁর পরবর্তী জীবনে স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি দেহান্তরের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

বিশেষ টিপ্পনী—মধ্ব সম্প্রদায়ের শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থের মত অনুসারে, পরবর্তী শ্লোক দুটি এই অধ্যায়ের পঁয়তাল্লিশ শ্লোকের পরে আসে এবং অন্য দুটি শ্লোক উনআশী শ্লোকের পর আসে।

শ্লোক ১ক-২ক

সর্বেষামেব জন্তুনাং সততং দেহপোষণে ।
অস্তি প্রজ্ঞা সমায়ত্তা কো বিশেষস্তদা নৃণাম্ ॥
লব্ধেহান্তে মনুষ্যত্বং হিত্বা দেহাদ্যসদ্গ্রহম্ ।
আত্মসৃত্যা বিহায়েদং জীবাত্মা স বিশিষ্যতে ॥

সর্বেষাম্—সমস্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **জন্তুনাম্**—পশুদের, **সততম্**—সর্বদা; **দেহ-পোষণে**—দেহ প্রতিপালনের জন্য; **অস্তি**—রয়েছে; **প্রজ্ঞা**—বুদ্ধি; **সমায়ত্তা**—আধারিত, **কঃ**—কি; **বিশেষঃ**—পার্থক্য; **তদা**—তা হলে; **নৃণাম**—মানুষদেব, **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **ইহ**—এখানে, **অন্তে**—বহু জন্মের পর; **মনুষ্যত্বম্**—মনুষ্য-জীবন; **হিত্বা**—ত্যাগ করার পর; **দেহ-আদি**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরে; **অসৎ-গ্রহম্**—জীবনের ভ্রান্ত ধারণা; **আত্ম**—আধ্যাত্মিক জ্ঞানের; **সৃত্যা**—পন্থার দ্বারা; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **ইদম্**—এই; **জীব-আত্মা**—জীবাত্মা; **সঃ**—সেই; **বিশিষ্যতে**—প্রাধান্য লাভ করে।

অনুবাদ

শরীর, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের প্রতিপালনের চেষ্টা পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। এই সমস্ত ব্যাপার সামলানোর বুদ্ধি পশুদের মধ্যেও পূর্ণরূপে রয়েছে। মানুষ যদি কেবল এই সমস্ত বিষয়ে উন্নত হয়, তা হলে তার সঙ্গে একটি পশুর পার্থক্য কোথায়? ক্রমবিবর্তনের পন্থায় বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর যে এই মনুষ্য-জীবন লাভ হয়েছে, তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যে বুদ্ধিমান মানুষ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করেছেন, তিনি চিন্ময় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে, ভগবানেরই মতো চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, মানুষ হচ্ছে একটি বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন পশু, কিন্তু এই শ্লোক থেকে আমরা এও বুঝতে পারি যে, পশু-জীবনেও বিচারবুদ্ধি রয়েছে। বিচারবুদ্ধি না থাকলে, একটি পশু তার দেহধারণের জন্য এত কঠোর পবিশ্রম কবে কেন? পশুদের বিচারবুদ্ধি নেই বলে মনে করাটি ভুল। তবে তাদের বিচাববুদ্ধি ততটা উন্নত নয়। কোন মতেই আমবা তাদের বিচারশক্তিকে অস্বীকার করতে পারি না। মূল কথা হচ্ছে যে, মানুষের কর্তব্য ভগবানকে জানার জন্য তাব বিচারবুদ্ধি প্রযোগ করা, কারণ সেটিই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা।

শ্লোক ১খ

ভক্তিঃ কৃষ্ণে দয়া জীবেষ্বকুণ্ঠজ্ঞানমাত্মনি ।
যদি স্যাদাত্মনো ভূয়াদপবর্গস্তু সংসৃতেঃ ॥

ভক্তিঃ—ভগবদ্ভক্তি; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **দয়া**—দয়া, **জীবেষু**—অন্য জীবদের প্রতি; **অকুণ্ঠ-জ্ঞানম্**—পূর্ণ জ্ঞান; **আত্মনি**—আত্মার; **যদি**—যদি; **স্যাৎ**—হয়; **আত্মনঃ**—

আত্মার; **ভূয়াৎ**—অবশ্যই হবে; **অপবর্গঃ**—মুক্তি; **তু**—তা হলে, **সংসৃতেঃ**—জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

জীবের যদি কৃষ্ণে ভক্তি, জীবে দয়া এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *দয়া জীবেষু* শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে 'অন্যান্য জীবদের প্রতি দয়া', এবং তা ইঙ্গিত করে যে, কেউ যদি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই অন্যান্য জীবদের প্রতি দয়াপরায়ণ হতে হবে অর্থাৎ কৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে সেই জ্ঞান অন্যদের প্রদান করতে হবে। এই প্রচারই জীবে প্রকৃত দয়া। অন্যান্য প্রকার লোকহিতকর কার্য সাময়িকভাবে দেহের জন্য লাভপ্রদ হতে পারে, কিন্তু জীব যেহেতু তার স্বরূপে চিন্ময় আত্মা, তাই তাদের প্রতি প্রকৃত দয়া তখনই প্রদর্শন করা যায়, যখন তাদের সেই আত্মিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। এই সত্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত এবং সেই জ্ঞান জনসাধারণের কাছে প্রচার করা উচিত। কেউ যখন উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস কিন্তু সেটি প্রচার করেন না, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁর সেই উপলব্ধি অপূর্ণ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাই গেয়েছেন, *দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব? প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব*—"দুষ্ট মন, তুমি কি রকম বৈষ্ণব? কেবল প্রতিষ্ঠা আর নামযশের আশায় তুমি নির্জন স্থানে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছ।" যারা প্রচার করে না তাদের এইভাবে সমালোচনা করা হয়েছে বৃন্দাবনে অনেক বৈষ্ণব রয়েছে যারা প্রচার করতে চায় না; তারা প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করে। কিন্তু তাদের নির্জন স্থানে তথাকথিত ভজনের ফল হচ্ছে নিদ্রা এবং কামিনী-কাঞ্চনের চিন্তা তেমনই, যিনি কেবল মন্দিরে পূজা করেন কিন্তু জনসাধারণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন না অথবা ভক্তদের চিনতে পারেন না, তাকে বলা হয় কনিষ্ঠ অধিকারী—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৪৭)

শ্লোক ২৭

অদৃষ্টং দৃষ্টবন্নঙ্ক্ষেদ্ভূতং স্বপ্নবদন্যথা ।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ সুপ্তং সর্বরহোরহঃ ॥

অদৃষ্টম্—ভবিষ্যৎ সুখ; **দৃষ্ট-বৎ**—প্রত্যক্ষ অনুভূতির মতো, **নঙ্ক্ষেৎ**—বিনাশ হয়; **ভূতম্**—জড় অস্তিত্ব, **স্বপ্নবৎ**—স্বপ্নের মতো, **অন্যথা**—অন্যথায়; **ভূতম্**—যা অতীতে ঘটেছে; **ভবৎ**—বর্তমান; **ভবিষ্যৎ**—ভবিষ্যৎ; **চ**—ও; **সুপ্তম্**—স্বপ্ন; **সর্ব**—সকলের; **রহঃ-রহঃ**—গূঢ় সিদ্ধান্ত।

অনুবাদ

কালের অন্তর্গত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হয় তা সবই স্বপ্নবৎ। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের গূঢ় সিদ্ধান্ত।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে সারা সংসার একটি স্বপ্নের মতো। তাই অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যারা কর্মকাণ্ড বিচারের প্রতি আসক্ত, অর্থাৎ 'সকাম কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ সুখের জন্য কার্য করে' তারাও স্বপ্ন দেখছে। তেমনই অতীতের সুখ এবং বর্তমানের সুখও কেবল স্বপ্নবৎ। প্রকৃত বাস্তব হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা, যা আমাদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান বলেছেন, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—"যারা আমার শরণাগত হয়, তারা অনায়াসে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'নারদ ও রাজা প্রাচীনবর্হির কথোপকথন' নামক ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রিংশতি অধ্যায়

প্রচেতাদের কার্যকলাপ

শ্লোক ১

বিদুর উবাচ

যে ত্বয়াভিহিতা ব্রহ্মন্ সুতাঃ প্রাচীনবর্হিষঃ ।
তে রুদ্রগীতেন হরিং সিদ্ধিমাপুঃ প্রতোষ্য কাম্ ॥ ১ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন, **যে**—যাঁরা; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অভিহিতাঃ**—কথিত হয়েছে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **প্রাচীনবর্হিষঃ**—রাজা প্রাচীনবর্হির, **তে**—তাঁরা সকলে; **রুদ্র-গীতেন**—মহাদেব রচিত সঙ্গীতের দ্বারা, **হরিম্**—ভগবান, **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি, **আপুঃ**—লাভ করেছিলেন, **প্রতোষ্য**—সন্তুষ্ট করে; **কাম্**—কি।

অনুবাদ

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ। পূর্বে আপনি প্রাচীনবর্হির পুত্রদের কথা বর্ণনা করে বলেছিলেন যে, তাঁরা রুদ্রগীত নামক স্তোত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা কি লাভ করেছিলেন?

তাৎপর্য

মৈত্রেয় ঋষি প্রথমে প্রাচীনবর্হির পুত্রদের কার্যকলাপ বর্ণনা করেছিলেন। তাঁরা সমুদ্রের মতো বিশাল একটি সরোবরের তীরে গিয়েছিলেন, এবং সৌভাগ্যক্রমে মহাদেবের দর্শন লাভ করে তাঁর কাছ থেকে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন, কিভাবে শিব রচিত রুদ্রগীত নামক স্তোত্রের দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা যায়। তারপর নারদ মুনি কিভাবে পুরঞ্জনের রূপক আখ্যানের দ্বারা কৃপাপূর্বক প্রাচীনবর্হিকে উপদেশ প্রদান করার মাধ্যমে তাঁর সকাম কর্মের আসক্তি ছিন্ন করেছিলেন, তার

বর্ণনা করা হয়েছে। এখন বিদুর পুনরায় প্রাচীনবর্হির পুত্রদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। ভগবানের প্রসন্নতাবিধান করার ফলে তাঁরা কি লাভ করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে জানতে চেয়েছেন। এখানে *সিদ্ধিম্ আপুঃ* পদটি অর্থাৎ 'সিদ্ধিলাভ করেছিলেন', অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৩) ভগবান বলেছেন, *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*—লক্ষ-লক্ষ মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের প্রয়াসী হন। পরম সিদ্ধি সম্বন্ধে উল্লেখ করে *ভগবদ্গীতাতেও* (৮/১৫) বলা হয়েছে—

> *মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।*
> *নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥*

"আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পর ভক্তিযোগী মহাত্মাগণ দুঃখ দুর্দশায় মগ্ন এই অনিত্য জড় জগতে ফিরে আসেন না, কারণ তাঁরা পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন।" আর এই পরম সিদ্ধি কি? সেই কথাও এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, যার ফলে জীবকে আর এই জড় জগতে ফিরে এসে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয় না। শিবের কৃপায় প্রচেতারা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং জড়-জাগতিক সুখ-সুবিধা পূর্ণরূপে উপভোগ করার পর, তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। মৈত্রেয় ঋষি সেই কথা এখন বিদুরের কাছে বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ২

কিং বার্হস্পত্যেহ পরত্র বাথ
কৈবল্যনাথপ্রিয়পার্শ্ববর্তিনঃ ।
আসাদ্য দেবং গিরিশং যদৃচ্ছয়া
প্রাপুঃ পরং নূনমথ প্রচেতসঃ ॥ ২ ॥

কিম্—কি; **বার্হস্পত্য**—হে বৃহস্পতির শিষ্য; **ইহ**—এখানে; **পরত্র**—অন্যান্য গ্রহলোকে; **বা**—অথবা; **অথ**—এই প্রকার; **কৈবল্য-নাথ**—মুক্তি প্রদানকারী; **প্রিয়**—প্রিয়; **পার্শ্ব-বর্তিনঃ**—পার্শ্ববর্তী হয়ে; **আসাদ্য**—সাক্ষাৎ করার পর; **দেবম্**—মহান দেবতা, **গিরিশম্**—কৈলাস পর্বতের অধিপতি; **যদৃচ্ছয়া**—ভাগ্যক্রমে; **প্রাপুঃ**—লাভ করেছিলেন; **পরম্**—পরম; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **অথ**—অতএব; **প্রচেতসঃ**—বর্হিষতের পুত্রগণ।

অনুবাদ

হে বার্হস্পত্য! রাজা বর্হিষতের প্রচেতা নামক পুত্রগণ ভগবানের প্রিয় পার্ষদ এবং মুক্তিদাতা মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ করার পর, কি লাভ করেছিলেন? নিশ্চিতভাবে তাঁরা চিৎ-জগতে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু তা ছাড়া, এই জড় জগতে, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে তাঁরা কি ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

সর্বপ্রকার জড় সুখ এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে, এই লোকে অথবা অন্য লোকে লাভ করা যায়। জীব এই ব্রহ্মাণ্ডে অনেক যোনিতে এবং অনেক লোকে ভ্রমণ করছে জীবনকালে প্রাপ্ত সুখ ও দুঃখকে ইহ বলা হয়, এবং পরবর্তী জীবনের সুখ ও দুঃখকে বলা হয় পবত্র।

প্রকৃতপক্ষে, শিব হচ্ছেন এই জগতের একজন মহান দেবতা। সাধারণত তাঁর আশীর্বাদের ফলে মানুষ জড় জাগতিক সুখ প্রাপ্ত হয়। এই জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী হচ্ছেন দুর্গাদেবী, এবং তিনি মহাদেব বা গিরিশের অধীন। মানুষ সাধারণত জড়-জাগতিক সুখ লাভের জন্য গিরিশের ভক্ত হতে চায়, কিন্তু প্রচেতারা ভাগ্যক্রমে মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। মহাদেব তাঁদের পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং ভগবানের প্রার্থনা করার মাধ্যমে তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিবের দ্বারা বিষ্ণুর স্তুতি (রুদ্রগীত) কীর্তন করার ফলে, প্রচেতারা চিৎ জগতে ফিরে গিয়েছিলেন। কখনও কখনও ভক্তরা জড় সুখ ভোগ করতে চান, তাই চিৎ জগতে প্রবেশ করার পূর্বে, ভগবানের আয়োজনে তাঁরা জড় জগতে সুখভোগ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ভক্ত কখনও কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হন, এবং সেখান থেকে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সিদ্ধলোক ইত্যাদিতে গমন করেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কখনও কোন প্রকার জড়-জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। শুদ্ধ ভক্ত তাই সরাসরিভাবে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন, এখানে যা পরম্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে বিদুর বৃহস্পতির শিষ্য মৈত্রেয়ের কাছে প্রচেতাদের বিভিন্ন প্রাপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন।

শ্লোক ৩

মৈত্রেয় উবাচ

প্রচেতসোঽন্তরুদধৌ পিতুরাদেশকারিণঃ ।
জপযজ্ঞেন তপসা পুরঞ্জনমতোষয়ন্ ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতাগণ; **অন্তঃ**—অভ্যন্তরে; **উদধৌ**—সমুদ্রের; **পিতুঃ**—তাঁদের পিতার, **আদেশ-কারিণঃ**—আজ্ঞাকারী; **জপ-যজ্ঞেন**—মন্ত্রজপের দ্বারা; **তপসা**—কঠোর তপস্যার দ্বারা, **পুরম্-জনম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অতোষয়ন্**—সন্তুষ্ট করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণ তাঁদের পিতার আদেশ পালন করার জন্য সমুদ্রগর্ভে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব প্রদত্ত মন্ত্র জপের দ্বারা তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা-বিধান করতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

সরাসরিভাবে ভগবানের প্রার্থনা করা যায়, কিন্তু কেউ যদি শিব, ব্রহ্মাদি মহান ভক্তদের দ্বারা নিবেদিত প্রার্থনা পুনরাবৃত্তি করেন, অথবা মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে অনায়াসে ভগবানের প্রসন্নতা-বিধান করা যায়। যেমন আমরা কখনও কখনও *ব্রহ্মসংহিতার* (৫/২৯) এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করি—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি চিন্তামণির দ্বারা রচিত এবং লক্ষ-লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবৃত তাঁর ধামে সুরভি গাভীদের পালন করেন। শত-সহস্র লক্ষ্মীরা বা গোপীগণ সর্বদা অত্যন্ত সম্ভ্রম এবং অনুরাগ সহকারে তাঁর সেবা করেন।" যেহেতু এই প্রার্থনা ব্রহ্মার দ্বারা নিবেদিত, তাই আমরা তা আবৃত্তি করি, তাঁকে অনুসরণ করি। ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানের এটি হচ্ছে সবচাইতে সরল উপায়। শুদ্ধ ভক্ত কখনও সরাসরিভাবে ভগবানের কাছে যাওয়ার প্রয়াস করেন না। ভগবানের আরাধনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিধি হচ্ছে ভক্ত পরম্পরার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। দেবাদিদেব মহাদেব ভগবানকে যে প্রার্থনা করেছিলেন, প্রচেতারা সেই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করে ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানে সফল হয়েছিলেন।

এখানে পরমেশ্বর ভগবানকে *পুরঞ্জন* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্বাচার্যের মতে, জীবকে *পুরঞ্জন* বলা হয়, কারণ সে এই জড় জগতের অধিবাসী হয়েছে, এবং জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবে এই জড় জগতে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগৎ (*পুর*) সৃষ্টি করেন, এবং তিনি তার মধ্যে প্রবেশও করেন। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্।* ভগবান জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি পরমাণুতেও প্রবেশ করেন, তাই জীব এবং ভগবান উভয়কেই *পুরঞ্জন* বলা হয়। এক *পুরঞ্জন* জীব পরম *পুরঞ্জনের* নিয়ন্ত্রণাধীন; তাই নিয়ন্ত্রণাধীন *পুরঞ্জনের* কর্তব্য হচ্ছে পরম *পুরঞ্জনের* প্রসন্নতা-বিধান করা। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। রুদ্র বা শিব হচ্ছেন *রুদ্র-সম্প্রদায়* নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল আচার্য *রুদ্রগীতেন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, *রুদ্র-সম্প্রদায়ের* প্রচেতারা পারমার্থিক সাফল্য লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

দশবর্ষসহস্রান্তে পুরুষস্তু সনাতনঃ ।
তেষামাবিরভূৎকৃচ্ছ্রং শান্তেন শময়ন্ রুচা ॥ ৪ ॥

দশ-বর্ষ-সহস্র-অন্তে—দশ হাজার বছর পর; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **তু**—তারপর; **সনাতনঃ**—শাশ্বত; **তেষাম্**—প্রচেতাদের; **আবিরভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **কৃচ্ছ্রম্**—কঠোর তপস্যা; **শান্তেন**—সন্তুষ্ট করে; **শময়ন্**—প্রশমিত করে; **রুচা**—তাঁর সৌন্দর্যের দ্বারা।

অনুবাদ

প্রচেতারা দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের পুরস্কৃত করার জন্য তাঁর অত্যন্ত মনোহর রূপে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার ফলে প্রচেতাদের তপক্লেশ প্রশমিত হয়েছিল, এবং তাঁরা তাঁদের তপস্যা সার্থক হয়েছে বলে মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করা সহজ নয় তবুও পারমার্থিক উন্নতি লাভের ঐকান্তিক প্রয়াসী ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য এইভাবে তপস্যা করেন। সেই সময়, যখন মানুষের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল, তখন তাঁরা হাজার-

হাজার বছর ধরে তপস্যা করতে পারতেন। বলা হয় যে *রামায়ণের* রচয়িতা বাল্মীকি ষাট হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। প্রচেতাদের তপস্যায় পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর মনোহর রূপ নিয়ে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁদের কঠোর তপস্যার ক্লেশ বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই জড় জগতে কঠোর পরিশ্রম করার পর কেউ যখন সফল হয়, তখন সে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। তেমনই ভগবদ্ভক্তরা ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই তাঁদের সমস্ত পরিশ্রম এবং তপশ্চর্যার ক্লেশ বিস্মৃত হন। ধ্রুব মহারাজ যদিও ছিলেন পাঁচ বছর বয়স্ক একটি বালক, তবুও তিনি কেবল বনের শুকনো পাতা খেয়ে, জলপান করে এবং অবশেষে কিছু না খেয়েও কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে ছয় মাস পর, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যখন ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁর সমস্ত তপক্লেশ বিস্মৃত হয়ে তিনি বলেছিলেন, *স্বামীন্ কৃতার্থোঽস্মি*—"হে প্রভু! আমি অত্যন্ত কৃতার্থ হয়েছি।"

এই প্রকার তপস্যা সত্যযুগ, দ্বাপরযুগ এবং ত্রেতাযুগেই সম্ভব ছিল, এই কলিযুগে তা সম্ভব নয়। কলিযুগে, কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, একই ফল লাভ করা যায়। যেহেতু এই যুগের মানুষেরা অত্যন্ত পতিত, তাই ভগবান কৃপাপূর্বক তাদের সবচাইতে সরল পন্থা প্রদান করেছেন। কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে যে-কেউ একই ফল লাভ করতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে-কথা ইঙ্গিত করে গেছেন, আমরা এতই দুর্ভাগা যে, এই মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তনে আমাদের কোন রুচি নেই।

শ্লোক ৫

সুপর্ণস্কন্ধমারূঢ়ো মেরুশৃঙ্গমিবাম্বুদঃ ।
পীতবাসা মণিগ্রীবঃ কুর্বন্ বিতিমিরা দিশঃ ॥ ৫ ॥

সুপর্ণ—ভগবানের বাহন গরুড়; **স্কন্ধম্**—কাঁধে; **আরূঢ়ঃ**—আসীন; **মেরু**—মেরু নামক পর্বতের; **শৃঙ্গম্**—শৃঙ্গে; **ইব**—সদৃশ; **অম্বুদঃ**—মেঘ; **পীত-বাসাঃ**—পীত বসন পরিহিত; **মণি-গ্রীবঃ**—কৌস্তুভ মণির দ্বারা সুশোভিত কণ্ঠ; **কুর্বন্**—করে; **বিতিমিরাঃ**—অন্ধকার থেকে মুক্ত; **দিশঃ**—সর্বদিক।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তখন গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করে সুমেরু-শিখরলগ্ন মেঘের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। ভগবানের দিব্য শরীর অত্যন্ত মনোহর পীত বসনে আচ্ছাদিত ছিল, এবং তাঁর গলদেশ কৌস্তুভ-মণির দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অন্ধকার দূর করেছিল।

তাৎপর্য

চৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য ২২/৩১) উল্লেখ করা হয়েছে—

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার ।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তার ফলে যেখানেই ভগবান উপস্থিত থাকেন, সেখানে অন্ধকার বা অবিদ্যা থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয় সূর্যের দ্বারা, কিন্তু সূর্য এবং চন্দ্র কেবলমাত্র ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা প্রতিফলিত করে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৮) ভগবান বলেছেন, *প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ*—"আমি সূর্য এবং চন্দ্রের প্রভা।" মূল কথা হচ্ছে যে, সমস্ত জীবনের উৎস হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে—*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি।* ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার দ্বারা আলোকিত হওয়ার ফলে সবকিছু অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৬

কাশিষ্ণুনা কনকবর্ণবিভূষণেন
ভ্রাজৎকপোলবদনো বিলসৎকিরীটঃ ।
অষ্টায়ুধৈরনুচরৈর্মুনিভিঃ সুরেন্দ্রৈ-
রাসেবিতো গরুড়কিন্নরগীতকীর্তিঃ ॥ ৬ ॥

কাশিষ্ণুনা—প্রকাশমান; **কনক**—স্বর্ণ; **বর্ণ**—বর্ণ; **বিভূষণেন**—অলঙ্কারের দ্বারা; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **কপোল**—কপোল; **বদনঃ**—মুখমণ্ডল; **বিলসৎ**—উজ্জ্বল; **কিরীটঃ**—মুকুট; **অষ্ট**—আট; **আয়ুধৈঃ**—অস্ত্রের দ্বারা; **অনুচরৈঃ**—অনুচরদের দ্বারা; **মুনিভিঃ**—মুনিগণ দ্বারা; **সুর-ইন্দ্রৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **আসেবিতঃ**—সেবিত; **গরুড়**—গরুড়ের দ্বারা; **কিন্নর**—কিন্নর; **গীত**—গেয়েছিলেন; **কীর্তিঃ**—তাঁর মহিমা।

অনুবাদ

ভগবানের মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর মস্তক অতি উজ্জ্বল মুকুট এবং স্বর্ণ অলংকারে বিভূষিত ছিল। তাঁর মুকুটটি উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার করছিল এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর মস্তকে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর আট হাতে আট প্রকার অস্ত্র। তিনি দেববৃন্দ, মুনিগণ এবং অন্যান্য পার্ষদদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের বাহন গরুড় তাঁর পক্ষধ্বনির দ্বারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন। গরুড়কে তখন ঠিক কিন্নরের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

সাধারণত বিষ্ণুর রূপ হচ্ছে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী চতুর্ভুজ। কিন্তু এখানে বিষ্ণুকে অষ্ট আয়ুধধারী অষ্টভুজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বীররাঘব আচার্যের মতে, শঙ্খ এবং পদ্মও অস্ত্র। ভগবান যেহেতু পরম নিয়ন্তা, তাই তিনি তাঁর হাতে যাই ধারণ করেন, তাকেই আয়ুধ বলে মনে করা যেতে পারে। তাঁর চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এবং অন্য চার হাতে ছিল ধনুক, বাণ, ত্রিশূল এবং সর্প। শ্রীবীবরাঘব আচার্যের বর্ণনা অনুসারে, অষ্ট আয়ুধ হচ্ছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ, শর, ইত্যাদি।

রাজার সঙ্গে যেমন তাঁর মন্ত্রী, সচিব, সেনাপতি আদি পার্ষদেবা সর্বদাই থাকেন, ভগবান বিষ্ণুও তেমন দেবতা, ঋষি, মহাত্মাদি অনুচরদের দ্বারা পরিবৃত থাকেন। তিনি কখনই একলা থাকেন না। তাব ফলে ভগবানের নির্বিশেষ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি সর্বদাই পরম পুরুষ ভগবান, এবং তাঁর পার্ষদেরাও পুরুষ। এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, গরুড় হচ্ছেন কিন্নরলোকেব অধিবাসী। কিন্নরদের আকৃতি গরুড়ের মতো। তাঁদের দেহ মানুষের মতো কিন্তু তাঁদের পাখা বয়েছে। *গীতকীর্তিঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, কিন্নরেরা ভগবানের মহিমা কীর্তনে অত্যন্ত নিপুণ। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—*জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষ বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।* প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন প্রকার গ্রহলোক রয়েছে, এবং প্রতিটি গ্রহলোকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই শ্লোকের ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি যে, কিন্নরলোকের অধিবাসীরা তাঁদের পাখার সাহায্যে উড়তে পারেন. সিদ্ধলোক নামেও একটি গ্রহলোক রয়েছে, যেখানকার অধিবাসীরা পাখা ছাড়াই উড়তে পারে। এইভাবে প্রত্যেক গ্রহলোকের কিছু বৈশিষ্ট্যসূচক সুবিধা রয়েছে। সেইটিই হচ্ছে ভগবানের বিবিধ সৃষ্টির সৌন্দর্য।

শ্লোক ৭

পীনায়তাষ্টভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা
স্পর্ধচ্ছ্রিয়া পরিবৃতো বনমালয়াদ্যঃ ।
বর্হিষ্মতঃ পুরুষ আহসুতান্ প্রপন্নান্
পর্জন্যনাদরুতয়া সঘৃণাবলোকঃ ॥ ৭ ॥

পীন—বলিষ্ঠ, **আয়ত**—দীর্ঘ, **অষ্ট**—আট, **ভুজ**—বাহু, **মণ্ডল**—বেষ্টন; **মধ্য**—মধ্যে; **লক্ষ্ম্যা**—লক্ষ্মীদেবী সহ, **স্পর্ধৎ**—স্পর্ধা করে; **শ্রিয়া**—যাঁর সৌন্দর্য, **পরিবৃতঃ**—পরিবৃত; **বন-মালয়া**—ফুলের মালায়; **আদ্যঃ**—আদি পুরুষ ভগবান; **বর্হিষ্মতঃ**—রাজা প্রাচীনবর্হির, **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **আহ**—সম্বোধন করেছিলেন, **সুতান্**—পুত্রদের; **প্রপন্নান্**—শরণাগত; **পর্জন্য**—মেঘের মতো, **নাদ**—ধ্বনি, **রুতয়া**—বাণীর দ্বারা; **স-ঘৃণ**—কৃপাপূর্বক; **অবলোকঃ**—দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

ভগবানের গলদেশের বনমালা তাঁর জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। মালার দ্বারা শোভিত তাঁর আটটি বলিষ্ঠ ও আয়ত বাহু লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকে স্পর্ধা করছিল। করুণায়ত দৃষ্টির দ্বারা অবলোকন করে ভগবান তাঁর অত্যন্ত শরণাগত মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্রদের জলদগম্ভীর স্বরে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *আদ্যঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা এবং ব্রহ্মেরও উৎস। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—পরম সত্যের মূল নির্বিশেষ ব্রহ্ম নয়, আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন এইভাবে—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥

"আপনি হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম সত্য এবং সনাতন দিব্য পুরুষ। আপনি হচ্ছেন আদি দেব, অজ এবং সর্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য।"

(*ভগবদ্গীতা* ১০/১২)

ব্রহ্মসংহিতাতেও বলা হয়েছে *অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্*—"পরমেশ্বর ভগবান অনাদি, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।" *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—"পরম সত্য থেকেই সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে।" পরম সত্যকে *আদি পুরুষ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব পরম সত্য সবিশেষ পুরুষ, নির্বিশেষ নিরাকার নন।

শ্লোক ৮

শ্রীভগবানুবাচ

বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বো যূয়ং মে নৃপনন্দনাঃ ।
সৌহার্দেনাপৃথগ্ধর্মাস্তুষ্টোঽহং সৌহৃদেন বঃ ॥ ৮ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বরম্**—বর, **বৃণীধ্বম্**—প্রার্থনা কর; **ভদ্রম্**—কল্যাণ; **বঃ**—তোমাদের; **যূয়ম্**—তোমরা, **মে**—আমার কাছ থেকে, **নৃপ নন্দনাঃ**—হে রাজপুত্রগণ; **সৌহার্দেন**—বন্ধুত্বের দ্বারা, **অপৃথক্**—অভিন্ন; **ধর্মাঃ**—বৃত্তি; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন; **অহম্**—আমি; **সৌহৃদেন**—বন্ধুত্বের দ্বারা; **বঃ**—তোমাদের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের পরস্পরের সৌহার্দ্য দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমরা সকলেই একই ধর্ম—ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত। তোমাদের সৌহার্দ্য দর্শন করে আমি এত প্রসন্ন হয়েছি যে, আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। এখন তোমরা আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।

তাৎপর্য

যেহেতু রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রেরা সকলেই কৃষ্ণভাবনায় ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, তাই ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। রাজা প্রাচীনবর্হিষতের প্রতিটি পুত্রই স্বতন্ত্র জীবাত্মা, কিন্তু তাঁরা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অথবা ভগবানের সেবা করার জন্য যখন জীবাত্মারা ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন সেটিই হচ্ছে প্রকৃত ঐক্য। জড় জগতে এই প্রকার ঐক্য সম্ভব নয়। মানুষ আপাতদৃষ্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তাদের সকলেরই স্বার্থ ভিন্ন। যেমন, রাষ্ট্রসংঘে সব কটি রাষ্ট্রেরই ভিন্ন স্বার্থ

রয়েছে, এবং তার ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। এই জড় জগতে জীবের অনৈক্য এতই প্রবল যে, কৃষ্ণভক্তের সমাজেও কখনও কখনও ভিন্ন মত এবং জড় বিষয়ের প্রতি প্রবণতার ফলে, সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তিতে কখনও দুটি মত থাকতে পারে না। সেখানে উদ্দেশ্য কেবল একটি—যথাসাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। যদি সেবা নিয়ে মতভেদ হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেই মতভেদ চিন্ময়। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা কোন পরিস্থিতিতেই বিচ্ছিন্ন হতে পারেন না। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং তাঁর ভক্তদের সব রকম বর প্রদান করতে ইচ্ছা করেন, যা এই শ্লোকে সূচিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, ভগবান তৎক্ষণাৎ রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রদের সমস্ত বর দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

শ্লোক ৯

যোঽনুস্মরতি সন্ধ্যায়াং যুষ্মাননুদিনং নরঃ ।
তস্য ভ্রাতৃষ্বাত্মসাম্যং তথা ভূতেষু সৌহৃদম্ ॥ ৯ ॥

যঃ—যিনি; **অনুস্মরতি**—সর্বদা স্মরণ করেন; **সন্ধ্যায়াম্**—সন্ধ্যাকালে; **যুষ্মান্**—তোমাদের; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **নরঃ**—মানুষ; **তস্য ভ্রাতৃষু**—তাদের ভ্রাতাদের প্রতি; **আত্ম-সাম্যম্**—আত্মসম জ্ঞান; **তথা**—এবং; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবদের প্রতি, **সৌহৃদম্**—বন্ধুত্ব।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যারা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তোমাদের স্মরণ করবে, তারা তাদের ভ্রাতাদের প্রতি এবং সমস্ত জীবদের প্রতি সৌহার্দ্য-পরায়ণ হবে।

শ্লোক ১০

যে তু মাং রুদ্রগীতেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ ।
স্তুবন্ত্যহং কামবরান্ দাস্যে প্রজ্ঞাং চ শোভনাম্ ॥ ১০ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **মাম্**—আমাকে; **রুদ্র-গীতেন**—রুদ্রগীতের দ্বারা; **সায়ম্**—সন্ধ্যাবেলা; **প্রাতঃ**—প্রভাতে; **সমাহিতাঃ**—একাগ্রচিত্তে; **স্তুবন্তি**—স্তব করে, **অহম্**—আমি, **কাম-বরান্**—সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার আশীর্বাদ; **দাস্যে**—প্রদান করব; **প্রজ্ঞাম্**—বুদ্ধি; **চ**—ও; **শোভনাম্**—দিব্য।

অনুবাদ

যারা একাগ্রচিত্তে সকালে এবং সন্ধ্যায় রুদ্রগীতের দ্বারা আমার স্তব করবে, আমি তাদের অভিলষিত বর প্রদান করি। এইভাবে তাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে এবং তারা সদ্বুদ্ধি লাভ করতে পারবে।

তাৎপর্য

সদ্বুদ্ধির অর্থ হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রীতিপূর্বক আমার আরাধনা করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

যাঁরা তাঁদের বিবিধ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তাঁদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, বাসনার চরম পূর্তি হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাঁরা মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের পুত্র প্রচেতাদের কার্যকলাপ স্মরণ করেন, তাঁরা উদ্ধার লাভ করবেন এবং আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেন। অতএব মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রেরা, যাঁরা সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, তাঁদের আর কি কথা? এটি হচ্ছে পরম্পরার পদ্ধতি। আমরা যদি আচার্যদের অনুসরণ করি, তা হলে তাঁরা যা প্রাপ্ত হয়েছেন আমরাও তা প্রাপ্ত হতে পারব। কেউ যদি অর্জুনের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনিও সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করছেন। সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করা এবং অর্জুনের মতো ব্যক্তি, যিনি পূর্বে সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করেছিলেন তাঁর অনুসরণ করা—এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কখনও কখনও মূর্খ মানুষেরা তর্ক করে যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু এখন উপস্থিত নেই, তাই তাঁর কাছ থেকে সরাসরিভাবে উপদেশ গ্রহণ করা সম্ভব নয় এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, ভগবদ্ভক্ত *ভগবদ্গীতার* উপদেশ যদি যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়, তা হলে সরাসরিভাবে তা শ্রবণ করা এবং তা পাঠ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু কেউ যদি তার ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে *ভগবদ্গীতা* হৃদয়ঙ্গম করতে চায়, তা হলে *ভগবদ্গীতার* রহস্য তার কাছে কখনই উদ্ঘাটিত হবে না, তা জড় জাগতিক বিচারে সে যত বড় পণ্ডিতই হোক না কেন।

শ্লোক ১১

**যদ্‌যূয়ং পিতুরাদেশমগ্রহীষ্ট মুদান্বিতাঃ ।
অথো ব উশতী কীর্তির্লোকাননু ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥**

যৎ—যেহেতু; **যূয়ম্**—তোমরা; **পিতুঃ**—তোমাদের পিতার; **আদেশম্**—আজ্ঞা; **অগ্রহীষ্ট**—পালন করেছ; **মুদা-অন্বিতাঃ**—অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে; **অথো**—অতএব; **বঃ**—তোমাদের; **উশতী**—আকর্ষণীয়; **কীর্তিঃ**—মহিমা; **লোকান্-অনু**—সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে; **ভবিষ্যতি**—সম্ভব হবে।

অনুবাদ

যেহেতু তোমরা আনন্দিত চিত্তে তোমাদের পিতার আদেশ শিরোধার্য করেছ এবং নিষ্ঠা সহকারে তা অনুষ্ঠান করেছ, তাই তোমাদের মনোহর কীর্তি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

যেহেতু প্রতিটি জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কখনও কখনও বুদ্ধিহীন মানুষেরা বলে, সকলেই যদি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তা হলে জীবকে কেন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। তার কারণ, ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের ফলে জীব ভগবানের আদেশ পালন করতে পারে অথবা অমান্য করতে পারে। সে যদি ভগবানের আদেশ পালন করে, তা হলে সুখী হয়। কিন্তু সে যদি তা না করে, তা হলে সে দুঃখী হয়। এইভাবে জীব নিজেই তার সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করে। ভগবান কাউকে তাঁর আদেশ পালন করতে বাধ্য করেন না। ভগবান প্রচেতাদের প্রশংসা করেছেন কারণ তাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পিতার আদেশ পালন করেছেন, তাই তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করেছেন।

শ্লোক ১২

**ভবিতা বিশ্রুতঃ পুত্রোঽনবমো ব্রহ্মণো গুণৈঃ ।
য এতামাত্মবীর্যেণ ত্রিলোকীং পূরয়িষ্যতি ॥ ১২ ॥**

ভবিতা—হবে; **বিশ্রুতঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অনবমঃ**—ন্যূন নয়; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **গুণৈঃ**—গুণাবলীর দ্বারা; **যঃ**—যিনি; **এতাম্**—এই সমস্ত; **আত্ম-বীর্যেণ**—তাঁর সন্তানের দ্বারা; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিভুবন; **পূরয়িষ্যতি**—পূর্ণ করবে।

অনুবাদ

তোমাদের একটি অতি উত্তম পুত্র হবে, যার গুণ ব্রহ্মার থেকে কোন অংশে ন্যূন হবে না। অতএব সেই পুত্র সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করবে, এবং তার পুত্র ও পৌত্রেরা ত্রিভুবন পূর্ণ করবে।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে বিবৃত হয়েছে, প্রচেতাগণ মহর্ষি কণ্ডুর কন্যাকে বিবাহ করবেন। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুত্রটির নাম হবে বিশ্রুত এবং তার সচ্চরিত্র হেতু সে পিতা ও মাতা উভয়েরই মুখোজ্জ্বল করবে। বস্তুত, সে ব্রহ্মার চেয়েও মহীয়ান্ হবে। মহা রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য বলেছিলেন যে, বাগানে কিংবা বনে যদি একটা ভাল গাছ থাকে, তা হলে তার ফুলের সুগন্ধে সমস্ত বন আমোদিত হয়ে উঠবে। তেমনই, বংশের মধ্যে একটি সুসন্তান সারা পৃথিবীতে সমগ্র বংশকে বিখ্যাত করে তোলে। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং পরিণামে যদুবংশ জগদ্বিখ্যাত হয়েছে।

শ্লোক ১৩

কণ্ডোঃ প্রম্লোচয়া লব্ধা কন্যা কমললোচনা ।
তাং চাপবিদ্ধাং জগৃহুর্ভূরুহা নৃপনন্দনাঃ ॥ ১৩ ॥

কণ্ডোঃ—কণ্ডু ঋষির, **প্রম্লোচয়া**—প্রম্লোচা নামক অপ্সরার দ্বারা, **লব্ধা**—লাভ করেছে; **কন্যা**—কন্যা, **কমল-লোচনা**—কমল-নয়না, **তাম্**—তার; **চ**—ও; **অপবিদ্ধাম্**—পরিত্যাগ করেছে, **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছে; **ভূরুহাঃ**—বৃক্ষ, **নৃপ-নন্দনাঃ**—হে রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রগণ।

অনুবাদ

হে রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রগণ! প্রম্লোচা নামক অপ্সরা কণ্ডু ঋষির সহযোগে একটি কমল-নয়না কন্যা লাভ করে, তাকে বনের বৃক্ষদের তত্ত্বাবধানে রেখে স্বর্গলোকে ফিরে যান।

তাৎপর্য

যখন কোন ঋষি জাগতিক শক্তি লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য সমস্ত দেবতাদের দায়িত্বশীল পদ রয়েছে এবং পুণ্য কর্মের প্রভাবে তাঁরা অত্যন্ত

যোগ্যতাসম্পন্ন। যদিও তাঁরা সাধারণ জীব, তবুও ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ তাঁরা লাভ করতে পারেন। কোন ঋষি যখন কঠোর তপস্যা করেন, তখন ইন্দ্র জড় জগতের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। সারা জগৎ এই প্রকার ঈর্ষালু ব্যক্তিতে এতই পূর্ণ যে, সকলেই তার প্রতিবেশীর ভয়ে ভীত। প্রতিটি ব্যবসায়ী তার সহকর্মীর ভয়ে ভীত, কারণ এই জগৎ সর্বপ্রকার ঈর্ষালু ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র, যারা এখানে ভগবানের ঐশ্বর্য নিয়ে ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এসেছে। তাই ইন্দ্র কণ্ডু ঋষিকে কঠোর তপস্যা করতে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, এবং তাঁর ব্রত ও তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য প্রম্লোচাকে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের ক্ষেত্রেও এই প্রকার ঘটনা ঘটেছিল। শাস্ত্রে বর্ণিত অন্যান্য ঘটনা থেকে মনে হয় যে, ইন্দ্র সর্বদাই ঈর্ষাপরায়ণ। পৃথু মহারাজ যখন ইন্দ্রকে অতিক্রম করে বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখনও ইন্দ্র অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন, এবং পৃথু মহারাজের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন। সেই কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র কণ্ডু মুনির তপস্যা ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কণ্ডু মুনি প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন, এবং তাদের সহবাসের ফলে একটি কন্যা উৎপন্ন হয়েছিল। এই কন্যাটিকে এখানে কমল-নয়না এবং অতি সুন্দরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে নবজাত সন্তানটিকে বৃক্ষের তত্ত্বাবধানে রেখে প্রম্লোচা স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত বৃক্ষরা সেই শিশুটিকে গ্রহণ করে তার পালন-পোষণ করতে সম্মত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

ক্ষুৎক্ষামায়া মুখে রাজা সোমঃ পীযূষবর্ষিণীম্ ।
দেশিনীং রোদমানায়া নিদধে স দয়ান্বিতঃ ॥ ১৪ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধার দ্বারা; **ক্ষামায়াঃ**—যখন সে কাতর হয়েছিল; **মুখে**—তার মুখে; **রাজা**—রাজা; **সোমঃ**—চন্দ্র; **পীযূষ**—অমৃত; **বর্ষিণীম্**—বর্ষণ করে; **দেশিনীম্**—তর্জনী; **রোদমানায়াঃ**—যখন সে ক্রন্দন করেছিল, **নিদধে**—স্থাপন করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **দয়া-অন্বিতঃ**—দয়াপরবশ হয়ে।

অনুবাদ

তারপর বৃক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিত্যক্ত শিশুটি যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল, তখন বনের রাজা অর্থাৎ চন্দ্রলোকের রাজা সদয় হয়ে তাঁর তর্জনী

শিশুটির মুখের মধ্যে স্থাপন করে অমৃত বর্ষণ করেছিলেন। এইভাবে শিশুটি চন্দ্রদেবের কৃপায় প্রতিপালিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

অপ্সরা যদিও শিশুটিকে বৃক্ষরাজির তত্ত্বাবধানে রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু বৃক্ষগুলি যথাযথভাবে শিশুটির পালন-পোষণ করতে পারেনি; তাই বৃক্ষগুলি শিশুটিকে চন্দ্রদেবের হস্তে অর্পণ করেছিল। চন্দ্রদেব শিশুটির মুখে তাঁর আঙুল স্থাপন করে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি সাধন করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

প্রজাবিসর্গ আদিষ্টাঃ পিত্রা মামনুবর্ততা ।
তত্র কন্যাং বরারোহাং তামুদ্বহত মাচিরম্ ॥ ১৫ ॥

প্রজা-বিসর্গে—সন্তান উৎপাদন করতে; **আদিষ্টাঃ**—আদিষ্ট হয়ে, **পিত্রা**—তোমাদের পিতার দ্বারা, **মাম্**—আমার আদেশ; **অনুবর্ততা**—পালন করে; **তত্র**—সেখানে, **কন্যাম্**—কন্যাকে, **বর-আরোহাম্**—অত্যন্ত গুণবতী এবং অপূর্ব সুন্দরী, **তাম্**—তাকে, **উদ্বহত**—বিবাহ কর; **মা**—বিনা; **চিরম্**—সময় নষ্ট।

অনুবাদ

যেহেতু তোমরা সকলে আমার অত্যন্ত অনুগত, তাই আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, তোমরা এখনই সেই অত্যন্ত গুণবতী এবং অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটিকে বিবাহ কর, এবং তোমাদের পিতার আদেশ অনুসারে তার থেকে প্রজা সৃষ্টি কর।

তাৎপর্য

প্রচেতারা কেবল ভগবানের মহান ভক্তই ছিলেন না, তাঁরা তাঁদের পিতারও অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তাই ভগবান তাঁদের প্রম্লোচার কন্যাকে বিবাহ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

অপৃথগ্ধর্মশীলানাং সর্বেষাং বঃ সুমধ্যমা ।
অপৃথগ্ধর্মশীলেয়ং ভূয়াৎপত্ন্যর্পিতাশয়া ॥ ১৬ ॥

অপৃথক্—পার্থক্যহীন; **ধর্ম**—বৃত্তি; **শীলানাম্**—যার চরিত্র; **সর্বেষাম্**—সকলে; **বঃ**—তোমরা; **সু-মধ্যমা**—ক্ষীণ কটিসমন্বিতা সুন্দরী; **অপৃথক্**—পার্থক্যরহিত, **ধর্ম**—বৃত্তি; **শীলা**—সুন্দর ব্যবহার; **ইয়ম্**—এই; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **পত্নী**—পত্নী, **অর্পিত-আশয়া**—পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পিত।

অনুবাদ

তোমরা সমস্ত ভাইয়েরা সকলেই ভগবদ্ভক্ত, এবং পিতার আজ্ঞাকারী পুত্র হওয়ার ফলে সমশীল। তেমনই সেই কন্যাটিও তোমাদের সকলের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করার ফলে, ধর্মে ও চরিত্রে তোমাদেরই অনুরূপ। সেই সুমধ্যমা সুন্দরীকে তোমাদের পত্নীরূপে গ্রহণ কর।

তাৎপর্য

বৈদিক নিয়ম অনুসারে, একজন পুরুষ যদিও বহু স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে কিন্তু স্ত্রীর একাধিক পতি থাকতে পারে না। কিন্তু কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে একাধিক পতি গ্রহণ করতে দেখা গেছে যেমন দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবকে বিবাহ করেছিলেন। ভগবান তেমনই প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রদের মহর্ষি কণ্ডু এবং প্রম্লোচার কন্যাকে বিবাহ করার আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, কন্যাকে একাধিক পুরুষ বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যদি তিনি সমস্ত পতিদের সমানভাবে সেবা করতে পারেন। সাধারণ স্ত্রীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। যাঁরা বিশেষভাবে গুণান্বিতা তাঁদেরই কেবল একাধিক পতিকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই কলিযুগে এই প্রকার সমদর্শী কন্যা বিরল. তাই শাস্ত্রের মতে *কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ*। এই যুগে দেবরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে এখনও এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ভগবান বলেছেন *অপৃথগ্ধর্মশীলেয়ং ভূয়াৎ পত্ন্যর্পিতাশয়া*। ভগবানের আশীর্বাদে সব কিছুই সম্ভব. ভগবান কন্যাটিকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন সমস্ত ভাইদের প্রতি সমশীল হওয়ার জন্য *ভগবদ্গীতায়* অপৃথক্-ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে *ভগবদ্গীতার* তিনটি প্রধান বিভাগ রয়েছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। *যোগ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করা।' সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

"ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে সেই কর্ম এই জড় জগতে বন্ধনের কারণ হয়। তাই, হে কৌন্তেয়! তাঁর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য

তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর, এবং তার ফলে তুমি সর্বদাই অনাসক্ত থাকবে এবং বন্ধনমুক্ত হবে।"

যজ্ঞপুরুষ বা পরমেশ্বর ভগবানের তৃপ্তিসাধনের জন্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা যায়, তাকে বলা হয় *অপৃথগ্-ধর্ম*। দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে, কিন্তু সেগুলির চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র শরীরের পালন করা। তেমনই, আমরা যদি ভগবানের তৃপ্তিসাধনের জন্য কর্ম করি, তা হলে আমরা দেখব যে, সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রচেতাদের অনুসরণ করা, যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের তৃপ্তিসাধন। তাকে বলা হয় *অপৃথগ্-ধর্ম*। *ভগবদ্গীতা* (১৮/৬৬) অনুসারে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" এটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ভগবানের তৃপ্তিসাধনের জন্য কৃষ্ণভাবনায় কর্ম করা। সেটিই হচ্ছে একতা বা *অপৃথগ্-ধর্ম*।

শ্লোক ১৭

দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রমহতৌজসঃ ।
ভৌমান্ ভোক্ষ্যথ ভোগান্ বৈ দিব্যাংশ্চানুগ্রহান্মম ॥ ১৭ ॥

দিব্য—দেবলোকের; **বর্ষ**—বর্ষ; **সহস্রাণাম্**—হাজার হাজার; **সহস্রম্**—এক হাজার, **অহত**—অপ্রতিহতভাবে; **ওজসঃ**—তোমাদের প্রভাব; **ভৌমান্**—এই পৃথিবীর; **ভোক্ষ্যথ**—তোমরা উপভোগ করবে; **ভোগান্**—ভোগসমূহ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **দিব্যান্**—দেবলোকের; **চ**—ও; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার প্রভাবে; **মম**—আমার।

অনুবাদ

ভগবান তখন প্রচেতাদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"হে রাজপুত্রগণ! আমার কৃপায়, তোমরা দিব্য সহস্র-সহস্র বর্ষ অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন হয়ে, পার্থিব ও দিব্য ভোগসমূহ উপভোগ করতে পারবে।"

তাৎপর্য

প্রচেতাদের জন্য ভগবান যে দীর্ঘ আয়ু নির্ধারণ করেছিলেন, তার গণনা স্বর্গলোকের কালের পরিমাপ অনুসারে হয়েছিল। এই পৃথিবীর ছয় মাস স্বর্গলোকের বারো ঘণ্টার সমান। সেই অনুসারে, ত্রিশ দিনে এক মাস এবং বার মাসে এক বছর। এই অনুসারে, দিব্য সহস্র-সহস্র বছর ধরে প্রচেতারা সব রকম জড়সুখ ভোগ করার

আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যদিও এই আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, কিন্তু প্রচেতারা পূর্ণরূপে দৈহিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে, এই দীর্ঘ আয়ু অতিবাহিত করার আশীর্বাদ ভগবানের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। জড় জগতে কেউ যদি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে চায়, তা হলে তাকে বার্ধক্য, জরা এবং অন্যান্য অনেক শোচনীয় দুরবস্থা সহ্য করতে হয়. কিন্তু প্রচেতারা এই অতি দীর্ঘকাল ধরে জড়সুখ ভোগ করার জন্য পূর্ণ দৈহিক শক্তি লাভ করেছিলেন। প্রচেতাদের এই বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তাঁরা পূর্ণরূপে ভগবানের সেবা সম্পাদন করতে পারেন। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

অথ ময্যনপায়িন্যা ভক্ত্যা পক্বগুণাশয়াঃ ।
উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্বিদ্য নিরয়াদতঃ ॥ ১৮ ॥

অথ—অতএব; **ময়ি**—আমাকে; **অনপায়িন্যা**—অবিচলিতভাবে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা, **পক্ব-গুণ**—জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত; **আশয়াঃ**—তোমার মন; **উপযাস্যথ**—তুমি লাভ করবে; **মৎ-ধাম**—আমার ধাম; **নির্বিদ্য**—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে; **নিরয়াৎ**—জড়-জাগতিক অস্তিত্ব থেকে; **অতঃ**—এইভাবে

অনুবাদ

তারপর আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তির প্রভাবে তোমরা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হবে। তখন তথাকথিত স্বর্গীয় এবং নারকীয় সমস্ত জড় সুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে, তোমরা আমার ধামে ফিরে আসবে।

তাৎপর্য

ভগবানের কৃপায় প্রচেতারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যদিও তাঁরা জড়সুখ ভোগ করার জন্য লক্ষ-লক্ষ বছর বেঁচে থাকতে পারতেন, তবুও তাঁরা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা থেকে বিচ্যুত হননি। এইভাবে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে, প্রচেতারা সমস্ত জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন জড় আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। জীবদ্দশায় বিষয়াসক্ত মানুষ গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, জন, বন্ধুবান্ধব, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। সে দেহান্তে স্বর্গসুখও ভোগ করতে চায়। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জড় জাগতিক সুখ-দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হন। জড়

জগতে যারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়, তারা সব রকম জড়-জাগতিক সুখভোগ করে বলে মনে করা হয়, আর যারা নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়, তারা নারকীয় পরিস্থিতিতে দুঃখভোগ করে বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত এই স্বর্গীয় এবং নারকীয় উভয় পরিস্থিতিরই অতীত। *ভগবদ্গীতা* (১৪/২৬) অনুসারে ভগবদ্ভক্তের স্থিতি এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যে ব্যক্তি পূর্ণ ভক্তি সহকারে আমার সেবায় যুক্ত, তিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না। তিনি অচিরেই জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।"

ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত। জড়-জাগতিক সুখ অথবা দুঃখের জন্য তাঁকে কিছুই করতে হয় না। কেউ যখন অবিচলিতভাবে ভক্তিপরায়ণ হন এবং সমস্ত জড় আসক্তি ও জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন। যদিও বিশেষ আশীর্বাদের ফলে প্রচেতারা লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে জড়-জাগতিক সুখভোগের সুযোগ পেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা তার প্রতি আসক্ত হননি। তাই জড় সুখভোগ অন্তে তাঁরা ভগবানের চিন্ময় ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

এখানে *পক্বগুণাশয়াঃ* শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার অর্থ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, ততক্ষণ সে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে না। এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে পাতাললোক পর্যন্ত জড় জগতের সব কটি গ্রহলোকই ভগবদ্ভক্তের বাসের অযোগ্য। *পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্।* যেখানে প্রতি পদে বিপদ, সেই স্থানটি অবশ্যই সুখকর নয়। ভগবান তাই *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) বলেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত সব কটি স্থানই দুঃখময়, যেখানে বারবার জন্ম এবং মৃত্যু হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়! যে আমার ধাম প্র প্ত হয়েছে, তাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না।"

অতএব কেউ যদি এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও উন্নীত হন, তাতেও কোন লাভ নেই। কিন্তু কেউ যদি কোন না কোনও ভাবে ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারেন, তা হলে তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে না।

শ্লোক ১৯

গৃহেষ্বাবিশতাং চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্ ।
মদ্বার্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥ ১৯ ॥

গৃহেষু—গৃহস্থ জীবনে; **আবিশতাম্**—যে প্রবেশ করেছে; **চ**—ও; **অপি**—ও, **পুংসাম্**—মানুষের; **কুশল-কর্মণাম্**—শুভ কর্মে যুক্ত; **মৎ-বার্তা**—আমার বিষয়ে; **যাত**—যাপন করে; **যামানাম্**—প্রতিক্ষণ; **ন**—না; **বন্ধায়**—বন্ধনের জন্য; **গৃহাঃ**—গৃহস্থ-জীবন; **মতাঃ**—বিবেচনা করা হয়।

অনুবাদ

যাঁরা ভগবদ্ভক্তির শুভ কর্মে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, সমস্ত কর্মের পরম ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাই এই প্রকার ব্যক্তি যখনই কোন কার্য করেন, তখন সেই কর্মের ফল তিনি ভগবানকে অর্পণ করেন। তাঁর সমস্ত জীবন তিনি ভগবানের কথা আলোচনা করে অতিবাহিত করেন। এই প্রকার ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে থাকলেও, গৃহ তাঁর বন্ধনের কারণ হয় না।

তাৎপর্য

গৃহস্থ-ব্যক্তিরা সাধারণত সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, অর্থাৎ তারা সর্বদা তাদের কর্মের ফল ভোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা এবং পরম ঈশ্বর (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম্*)। তাই, ভগবদ্ভক্ত কখনও নিজেকে কোন কিছুর মালিক বলে মনে করেন না। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভগবানকে সব কিছুর মালিক বলে মনে করেন, তাই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের ফল তিনি ভগবানকে অর্পণ করেন। যে ব্যক্তি এইভাবে জীবন যাপন করেন, তিনি এই জড় জগতে গৃহস্থ-আশ্রমে তাঁর পরিবার এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে বাস করলেও, জড় জগতের কলুষের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হন না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

যে ব্যক্তি তার কর্মের ফল ভোগ করতে চায়, সে তার কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু যিনি তাঁর কর্মের ফল বা লাভ ভগবানকে অর্পণ করেন, তিনি কখনও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। এটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। মানুষ সাধারণত সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে। কিন্তু যিনি তাঁর কর্মের ফল নিজে গ্রহণ না করে ভগবানকে নিবেদন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্ত অবস্থায় থাকেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*তে শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

কেউ যদি তাঁর জীবন, ধন, বাণী, বুদ্ধি এবং তাঁর যা কিছু সবই ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তা হলে তিনি সর্ব অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত। কিন্তু যারা কৃষ্ণভক্তিবিহীন, যারা কেবল জড়-জাগতিক কার্যকলাপেই লিপ্ত, তারা এই জড় জগতের বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদেরকে সমস্ত কর্মের ফলস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হচ্ছে মানব-সমাজের কাছে সবচাইতে বড় আশীর্বাদ, কারণ তা মানুষকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করছে। ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্য আহার করেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিদ্রা যান এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্য পরিশ্রম করেন। এইভাবে সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়। পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন মানুষকে জড় জগতের কলুষ থেকে রক্ষা করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলেছেন—

কৃষ্ণভজনে যাহা হয় অনুকূল ।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে তাহা হয় ভুল ॥

কেউ যদি এতই পারদর্শী হন যে, তিনি সবকিছু কৃষ্ণসেবায় যুক্ত করতে পারেন, তাঁর পক্ষে জড় জগৎ ত্যাগ করা মস্ত বড় ভুল হবে। মানুষকে শিখতে হবে কিভাবে সবকিছু ভগবানের সেবায় যুক্ত করা যায়, কারণ সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেটিই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সাফল্যের রহস্য। *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৯) তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

"অতএব কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে, কর্তব্যবোধে সবকিছু কবা উচিত, কাবণ এইভাবে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য জড় জাগতিক কার্যকলাপ এবং ভগবানের তৃপ্তিসাধনেব জন্য ভৌতিক কার্যকলাপেব বিশেষভাবে বিবেচনা কবা হয়েছে। এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, এই দুটি এক নয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কার্যকলাপ ভববন্ধনেব কারণ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিসাধনের জন্য কার্যকলাপ মুক্তির কারণ হয়। একই কর্ম কিভাবে বন্ধন এবং মুক্তির কারণ হয়, সেই কথা এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—কেউ ক্ষীর, পায়েস ইত্যাদি দুগ্ধজাত খাদ্য অত্যধিক আহার কবার ফলে অজীর্ণ রোগে ভুগতে পারে, কিন্তু দুগ্ধজাত আর একটি খাদ্য দইয়ের সঙ্গে যখন গোলমরিচ আর নুন মিশিয়ে তাকে খেতে দেওয়া হয়, তার ফলে তার অজীর্ণতা রোগ তৎক্ষণাৎ সেরে যায়। অর্থাৎ, এক প্রকাব দুগ্ধজাত খাদ্য অজীর্ণতা বোগের কারণ হতে পারে, এবং অন্য আর এক প্রকাব দুগ্ধজাত বস্তু সেই রোগ থেকে তাকে নিরাময় করতে পারে।

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় কেউ যদি জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন, তা হলে সেই ঐশ্বর্যকে বন্ধনের কারণ বলে মনে করা উচিত নয়। পবিণত ভক্ত যখন জড় ঐশ্বর্য লাভ কবেন, তখন তিনি তার দ্বারা প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হন না, কাবণ তিনি জানেন কিভাবে জড় ঐশ্বর্য ভগবানের সেবায় ব্যবহাব কবতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। পৃথু মহাবাজ, প্রহ্লাদ মহাবাজ, জনক, ধ্রুব, বৈবস্বত মনু, মহারাজ ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি বহু রাজা বিশেষভাবে ভগবানেব কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভক্ত যদি পরিণত না হয়, তা হলে ভগবান তার সমস্ত ঐশ্বর্য হরণ করে নেবেন। সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—*যস্যাহম্ অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ*—"আমার ভক্তের প্রতি আমার প্রথম কৃপা প্রদর্শন কবে, আমি তার সমস্ত জড় ঐশ্বর্য হবণ করে নিই।" জড় ঐশ্বর্য যদি ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল হয়, তা হলে ভগবান তা হবণ করে নেবেন, কিন্তু ভক্ত যদি যথেষ্টভাবে পবিণত হন, তা হলে ভগবান তাঁকে সব রকম জড় জাগতিক সুযোগ-সুবিধা দেবেন।

শ্লোক ২০

নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ ॥ ২০ ॥

নব্য-বৎ—নিত্য নব-নবায়মান; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **যৎ**—যেমন; **জ্ঞঃ**—পরম জ্ঞাতা, পরমাত্মা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **এতৎ**—এই; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—ব্রহ্মবাদীদের দ্বারা, **ন**—কখনই না; **মুহ্যন্তি**—মোহাচ্ছন্ন হয়; **ন**—কখনই না; **শোচন্তি**—শোক করে; **ন**—কখনই না; **হৃষ্যন্তি**—হরষিত হয়; **যতঃ**—যখন; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর সমস্ত কার্যকলাপে নব-নবায়মান আনন্দ অনুভব করেন। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের হৃদয়ে থেকে তাঁর জন্য সবকিছুই নব-নবায়মান করে তোলেন। পরম তত্ত্ববেত্তা পুরুষেরা এই অবস্থাকে ব্রহ্মভূত বলেন। এই ব্রহ্মভূত (মুক্ত) স্তরে মানুষ কখনও মোহাচ্ছন্ন হন না। তিনি কোন কিছুর জন্য অনর্থক শোক করেন না অথবা হরষিত হন না। এটিই হচ্ছে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফল।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার দ্বারা বিভিন্নভাবে ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত ভক্তির অনুশীলনকে কখনও নীরস বা একঘেয়ে বলে মনে করেন না। জড় জগতে কেউ যদি কোন জড় নাম বার বার উচ্চারণ করে, তা হলে কিছুক্ষণ পরেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু ভগবানের দিব্য নামসমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দিনরাত জপ করলেও ক্লান্তি আসে না। জপ যত বৃদ্ধি পায়, ততই তা নব-নবায়মান বলে মনে হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, তিনি যদি কোটি-কোটি কর্ণ এবং অর্বুদ-অর্বুদ জিহ্বা লাভ করতে পারতেন, তাহলে হয়তো তিনি যথাযথভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করার চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করতে পারতেন। উন্নত স্তরের ভক্তের কাছে কোন কিছুই প্রেরণাহীন বলে মনে হয় না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করে তিনি তাদের ভুলে যেতে এবং স্মরণ করতে সাহায্য করছেন। ভগবানের কৃপায় ভক্ত অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমাকে উপলব্ধি করতে পেরে, আমার কাছে ফিরে আসে।"
(*ভগবদ্গীতা* ১০/১০)

বলা হয়েছে যে, যাঁরা ভগবদ্ভক্তির শুভ কার্যে যুক্ত (*কুশল-কর্মণাম্*), পরমাত্মা তাঁদের পরিচালিত করেন। এই শ্লোকে তাকে *জ্ঞ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সবকিছু জানেন। নিষ্ঠাপরায়ণ ঐকান্তিক ভক্ত কিভাবে আরও ঘনিষ্ঠভাবে ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারেন, সেই সম্বন্ধে পরমাত্মা তাঁকে উপদেশ দেন। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবানের অংশ পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে তিনি নিত্য নব-নবায়মানরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। ভক্ত ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর প্রেমময়ী সেবায় দিব্য আনন্দ ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে বলে অনুভব করেন।

শ্লোক ২১

মৈত্রেয় উবাচ

এবং ব্রুবাণং পুরুষার্থভাজনং
জনার্দনং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রচেতসঃ ।
তদ্দর্শনধ্বস্ততমোরজোমলা
গিরাগৃণন্ গদ্‌গদয়া সুহৃত্তমম্ ॥ ২১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলে; **পুরুষ-অর্থ**—জীবনের পরম লক্ষ্য, **ভাজনম্**—প্রদানকারী; **জন-অর্দনম্**—যিনি ভক্তের সমস্ত অসুবিধা দূর করেন; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—বদ্ধাঞ্জলি হয়ে; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতাগণ; **তৎ**—তাঁকে, **দর্শন**—দর্শন করে; **ধ্বস্ত**—দূরীভূত; **তমঃ**—তমোগুণের; **রজঃ**—রজোগুণের; **মলাঃ**—কলুষ, **গিরা**—বাণীর দ্বারা; **অগৃণন্**—প্রার্থনা করেছিলেন; **গদ্‌গদয়া**—গদ্‌গদ স্বরে, **সুহৃৎ-তমম্**—সকলের প্রিয়তম বন্ধুকে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ভগবান এইভাবে বললে প্রচেতাগণ তাঁর প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। ভগবান হচ্ছেন জীবনের সমস্ত সিদ্ধি প্রদানকারী এবং পরম মঙ্গল প্রদাতা। তিনি সকলের পরম বন্ধু, যিনি ভক্তের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন। আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে প্রচেতারা তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভের ফলে তাঁরা পবিত্র হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে *পুরুষার্থ ভাজনম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম লক্ষ্য প্রদাতা। আমাদের জীবনে আমরা যে সাফল্য চাই, তা

ভগবানের কৃপায় লাভ হতে পারে। যেহেতু প্রচেতারা ইতিমধ্যেই ভগবানের কৃপা লাভ করেছিলেন, তাই তাঁরা জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। সূর্যের উদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়, তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁদের থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু ভগবান তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই রজ এবং তমোগুণের কলুষ আপনা থেকেই সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গিয়েছিল। তেমনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তিনিও সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যান, যেহেতু ভগবানের নাম ভগবান থেকে অভিন্ন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) বলা হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তিনি তাঁর সত্যনিষ্ঠ ভক্তের সুহৃৎ। তাই তাঁর বাণী শ্রবণ এবং কীর্তনে আগ্রহী ভক্তের হৃদয়ের জড়সুখ-ভোগের সমস্ত বাসনা তিনি পবিত্র করে দেন।"

ভগবানের দিব্য নাম হচ্ছে ভগবান স্বয়ং। যদি কেউ ভগবানের নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তা হলে তিনি পবিত্র হন। তখন তাঁর জড়-জাগতিক সমস্ত কলুষ ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। ভগবানের উপস্থিতির ফলে প্রচেতারা ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁরা তাই বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্ত যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যান, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে না পারার ফলে, ভক্ত কখনও কখনও অসন্তুষ্ট হন। প্রচেতারা যখন ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁদের সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ২২

প্রচেতস ঊচুঃ

নমো নমঃ ক্লেশবিনাশনায়
নিরূপিতোদারগুণাহ্বয়ায় ।
মনোবচোবেগপুরোজবায়
সর্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ ॥ ২২ ॥

প্রচেতসঃ উচুঃ—প্রচেতাগণ বললেন, **নমঃ**—প্রণতি; **নমঃ**—প্রণাম, **ক্লেশ**—জড়-জাগতিক দুঃখ দুর্দশা; **বিনাশনায়**—বিনাশকারীকে; **নিরূপিত**—নির্ণয়, **উদার**—উদার, **গুণ**—গুণাবলী. **আহ্বয়ায়**—যাঁর নাম; **মনঃ**—মনের; **বচঃ**—বাণীর; **বেগ**—গতি; **পুরঃ**—পূর্বে; **জবায়**—যাঁর গতি; **সর্ব-অক্ষ**—সমস্ত জড় ইন্দ্রিয়ের; **মার্গৈঃ**—পন্থার দ্বারা; **অগত**—অগোচর; **অধ্বনে**—যাঁর মার্গ; **নমঃ**— এরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

অনুবাদ

প্রচেতাগণ বললেন—হে ভগবান! আপনি সমস্ত ক্লেশের বিনাশকর্তা। আপনার উদার গুণ এবং নাম সর্বমঙ্গল প্রদানকারী বলে নিরূপিত হয়েছে। আপনি মন ও বাক্যের থেকেও দ্রুত গতিতে গমন করতে পারেন। আপনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাই আমরা আপনাকে বার বার আমাদের প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নিরূপিত* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানকে খোঁজার জন্য অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রগতি লাভের জন্য কোন রকম গবেষণা করার প্রয়োজন নেই। *বেদে* সমস্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে নিরূপিত হয়েছে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেববেদ্যঃ*—*বেদের* মাধ্যমে ভগবানকে জানার পন্থা হচ্ছে পূর্ণ এবং চূড়ান্ত। *বেদে* বলা হয়েছে, অতঃ *শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*—ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলা আমাদের ভোঁতা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*—ভক্ত যখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে অনুকূলভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। সেটিই হচ্ছে *বেদের* চূড়ান্ত পন্থা। *বেদেও* ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে, নিঃসন্দেহে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা যায়। মনের গতিতে অথবা বাক্যের গতিতে আমরা ভগবানের কাছে যেতে পারি না, কিন্তু আমরা যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করি, তা হলে আমরা অনায়াসে এবং অতি শীঘ্রই তাঁর কাছে যেতে পারি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান ভগবদ্ভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হন, এবং আমাদের মনের জল্পনা-কল্পনার গতির থেকেও অধিক দ্রুত গতিতে তিনি আমাদের কাছে আসতে পারেন। ভগবান উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মন এবং চিন্তার গতিরও অতীত, তবুও তাঁর অহৈতুকী

কৃপার প্রভাবে অনায়াসে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। এইভাবে কেবল তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁকে পাওয়া যায়। অন্যান্য সমস্ত পন্থা সেই বিষয়ে কার্যকরী হবে না।

শ্লোক ২৩

শুদ্ধায় শান্তায় নমঃ স্বনিষ্ঠয়া
মনস্যপার্থং বিলসদ্দ্বয়ায় ।
নমো জগৎস্থানলয়োদয়েষু
গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায় ॥ ২৩ ॥

শুদ্ধায়—বিশুদ্ধ; **শান্তায়**—পরম শান্তকে; **নমঃ**—আমরা আমাদের প্রণতি নিবেদন করি; **স্ব-নিষ্ঠয়া**—তার নিজের স্থিতিতে অবস্থিত হওয়ার দ্বারা; **মনসি**—মনে; **অপার্থম্**—অর্থহীন, **বিলসৎ**—আবির্ভূত হয়ে; **দ্বয়ায়**—দ্বৈত জগতে; **নমঃ**—প্রণতি; **জগৎ**—জগতের; **স্থান**—পালন; **লয়**—বিনাশ; **উদয়েষু**—এবং সৃষ্টির জন্য; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছেন; **মায়া**—জড়; **গুণ**—প্রকৃতির গুণের; **বিগ্রহায়**—রূপ।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। মন যখন আপনাতে স্থির হয়, তখন এই জড় জগৎ যা জড়সুখ ভোগের দ্বৈতভাব সমন্বিত স্থান, তা অর্থহীন বলে মনে হয়। আপনার চিন্ময় রূপ দিব্য আনন্দময়। তাই আমরা আপনাকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব রূপে আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত, যাঁর মন সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি নিশ্চিতভাবে এই জড় জগতের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। এই প্রকার ভক্ত জড-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হলেও, সেই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই স্তবকে বলা হয় *অনাসক্তি* । সেই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন—*অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।* ভগবদ্ভক্ত সর্বদা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি অনাসক্ত, কারণ মুক্ত অবস্থায় তাঁর মন সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন থাকে।

এই জড় জগৎকে বলা হয় দ্বৈত ভগবদ্ভক্ত খুব ভালভাবেই জানেন যে, এই জড জগতে সবকিছুই ভগবানের শক্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের পরিচালনা করার জন্য ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপ পরিগ্রহ করেন। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন। মূল সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যদিও ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবার জন্য জড-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছেন বলে মনে হয়, তবুও তাঁর কাছে জড়-জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

শ্লোক ২৪

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় হরয়ে হরিমেধসে ।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় প্রভবে সর্বসাত্বতাম্ ॥ ২৪ ॥

নমঃ—প্রণতি; **বিশুদ্ধ-সত্ত্বায**—যাঁর অস্তিত্ব সমস্ত জড় প্রভাব থেকে মুক্ত তাঁকে, **হরয়ে**—যিনি ভক্তের সমস্ত কষ্ট হরণ করেন, **হরি-মেধসে**—যাঁর বুদ্ধি কেবল বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য কার্য করে; **বাসুদেবায়**—সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানকে, **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **প্রভবে**—প্রভাব বর্ধনকারী, **সর্ব-সাত্বতাম্**—সর্বপ্রকার ভক্তদের।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সমস্ত জড় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আপনি সর্বদা ভক্তদের দুঃখকষ্ট হরণ করেন, কারণ আপনার মেধা তা সম্পাদন করার পরিকল্পনা করে। পরমাত্মারূপে আপনি সর্বত্র বিরাজমান, তাই আপনি বাসুদেব নামে পরিচিত। আপনি বসুদেবকে আপনার পিতারূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেই জন্য আপনার নাম বাসুদেব, এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ। আপনি এতই দয়ালু যে, আপনি আপনার সর্বপ্রকার ভক্তদের প্রভাব সর্বদা বর্ধন করেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভগবান জড় জগৎকে সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের উদ্দেশ্যে (*গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায*) তিন প্রকার শরীর (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব) ধারণ করেন। জড় জগতের এই তিনজন প্রধান দেবতাদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব)

বলা হয় *গুণাবতার।* ভগবানের বহু প্রকার অবতার রয়েছেন, এবং এই জড় জগতে প্রথম অবতার হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (শিব)। এই তিনজনের মধ্যে ব্রহ্মা এবং শিব জড় শরীর ধারণ করেন, কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু তা করেন না তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণু *বিশুদ্ধ সত্ত্ব* নামে পরিচিত তাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষ থেকে মুক্ত। তাই বিষ্ণুকে ব্রহ্মা এবং শিবের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। শাস্ত্রে সেইভাবে চিন্তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে অথবা ব্রহ্মা এবং শিবকে শ্রীবিষ্ণুর সমকক্ষ বলে মনে করে, সে একটি পাষণ্ডী (নাস্তিক)।" তাই এই শ্লোকে বিষ্ণুকে *নমো বিশুদ্ধ সত্ত্বায়* বলে ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাদের থেকে পৃথক করা হয়েছে আমাদের মতো জীব হলেও, ব্রহ্মা তাঁর পুণ্যকর্মের প্রভাবে অত্যন্ত মহান; তাই তাঁকে ব্রহ্মার পদ প্রদান করা হয়েছে শিব প্রকৃতপক্ষে জীব নন, আবার তিনি পরমেশ্বর ভগবানও নন। তাঁর স্থিতি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু এবং জীবাত্মা ব্রহ্মার মাঝখানে। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৫) শিবের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

দধি যেমন দুধের বিকার হলেও তা দুধ নয়, তেমনই শিব যদিও বিষ্ণুর প্রায় সমস্ত শক্তি ধারণ করেন এবং যদিও তিনি জীবের গুণাবলীর অতীত, তবুও তিনি ঠিক বিষ্ণু নন। ঠিক যেমন দধি দুধের বিকার হলেও ঠিক দুধ নয়।

পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *বাসুদেবায় কৃষ্ণায়* বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান, এবং সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব হচ্ছেন তাঁর অংশ এবং কলা। তাঁর অংশকে বলা হয় স্বাংশ এবং অংশের অংশকে বলা হয় কলা। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নামেও পরিচিত কারণ তিনি বসুদেবের পুত্ররূপে এই জড় জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনই তিনি দেবকীনন্দন, যশোদানন্দন, নন্দনন্দন ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

ভগবান সব সময় তাঁর ভক্তের প্রভাব বৃদ্ধি করতে চান। তাই তাঁকে এখানে প্রভবে *সর্বসাত্বতাম্‌* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *সাত্বত* সম্প্রদায় হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সম্প্রদায়। ভগবানের শক্তি অসীম, এবং তিনি চান যে, তাঁর ভক্তরাও যেন অসীম শক্তিসম্পন্ন হয়। তাই ভগবানের ভক্তরা সর্বদাই অন্য সমস্ত জীবদের থেকে স্বতন্ত্র।

হরি শব্দটির অর্থ হচ্ছে, "যিনি সমস্ত ক্লেশ হরণ করেন," এবং *হরিমেধসে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান সর্বদাই মায়ার বন্ধন থেকে বদ্ধ জীবদের মুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য স্বয়ং অবতরণ করেন, এবং যখনই তিনি আসেন, তখনই তিনি তাঁর পরিকল্পনা করেন।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের উদ্ধার করার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে-যুগে আবির্ভূত হই।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৪/৮)

ভগবান যেহেতু সমস্ত বদ্ধ জীবদের মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন, তাই তাঁর নাম *হরিমেধস্‌*। অবতারদের তালিকায় শ্রীকৃষ্ণকে পরম এবং আদি পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

(*ভাগবত* ১/৩/২৮)

ভগবানের ভক্ত দেবতারা যখন অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ২৫

নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে ।
নমঃ কমলপাদায় নমস্তে কমলেক্ষণ ॥ ২৫ ॥

নমঃ—আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **কমল-নাভায়**—যাঁর নাভি থেকে আদি কমল পুষ্প উদ্ভূত হয়েছে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—প্রণতি;

কমল-মালিনে—যিনি পদ্মফুলের মালায় সর্বদা শোভিত, **নমঃ**—প্রণতি; **কমল-পাদায়**—যাঁর চরণ পদ্মফুলের মতো সুন্দর এবং সৌরভযুক্ত, **নমঃ তে**—আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি, **কমল-ঈক্ষণ**—যাঁর নয়ন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনার নাভি থেকে সমস্ত জীবের উৎসস্বরূপ পদ্মফুল উদ্‌গত হয়েছে। আপনি সর্বদা পদ্মফুলের মালায় শোভিত, এবং আপনার পদযুগল সুরভিত পদ্মফুলের মতো। আপনার নয়নও পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। তাই আমরা সর্বদা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

কমলনাভায় শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন এই জড় সৃষ্টির উৎস। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি পদ্মফুল উদ্‌গত হয়েছে। সেই পদ্মফুলে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম প্রাণী ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে, এবং তারপর ব্রহ্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তাই সমস্ত সৃষ্টির উৎস হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, এবং সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুর উৎস। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতাতেও* (১০/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি সমগ্র জড় এবং চেতন জগতের উৎস। আমার থেকেই সবকিছুর উদ্ভব হয়েছে। যে জ্ঞানবান ব্যক্তি এই কথা পূর্ণরূপে জানেন, তিনি সর্বান্তঃকরণে ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমার সেবায় যুক্ত হন এবং আমার আরাধনা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'আমি সবকিছুর উৎস।' তাই আমরা যা কিছু দেখি, তা সবই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেই কথা *বেদান্ত-সূত্রেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—পরম সত্য হচ্ছেন তিনি যাঁর থেকে সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে।"

শ্লোক ২৬

নমঃ কমলকিঞ্জল্কপিশঙ্গামলবাসসে ।
সর্বভূতনিবাসায় নমোঽযুঙ্ক্ষ্মহি সাক্ষিণে ॥ ২৬ ॥

নমঃ—প্রণাম; **কমল-কিঞ্জল্ক**—পদ্মফুলের কেশরের মতো, **পিশঙ্গ**—পীত, **অমল**—নির্মল; **বাসসে**—যাঁর বসন; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবের; **নিবাসায়**—আশ্রয়, **নমঃ**—প্রণতি; **অযুঙ্ক্ষ্মহি**—আমরা নিবেদন করি; **সাক্ষিণে**—পরম সাক্ষীকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার বসন পদ্মফুলের কেশরের মতো পীতবর্ণ, কিন্তু তা কোন জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়নি। আপনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং আপনি সমস্ত জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। আমরা বারংবার আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানের বসন এবং তাঁর সর্ব-ব্যাপকতার বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান পীত বসন ধারণ করেন, কিন্তু এই প্রকার বসন কখনও জড় বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবানের বসনও ভগবান। তা ভগবান থেকে অভিন্ন, কেননা তা চিন্ময়।

সর্বভূতনিবাসায় শব্দটি বর্ণনা করে কিভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং বদ্ধ জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষীরূপে কার্য করেন। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা তাদের বাসনা অনুসারে কার্য করে। ভগবান সেই সমস্ত কার্যকলাপ দর্শন করেন। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ॥

"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তিনি জীবদের বুদ্ধি প্রদান করেন জীবের বাসনা অনুসারে, ভগবান তাকে স্মরণ করান অথবা ভুলিয়ে দেন। জীব যদি আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে ভগবানকে ভুলে যেতে চায়, তা হলে ভগবান তাকে সেই প্রকার বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে সে ভগবানকে ভুলে যেতে পারে। তেমনই, ভক্ত যখন ভগবানের সেবা করতে চান, তখন পরমাত্মারূপে ভগবান সেই ভক্তকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধন করতে পারেন। ভগবান প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কার্যকলাপের সাক্ষী এবং আমাদের বাসনা অনুভব করেন। ভগবান আমাদের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করার সুযোগ প্রদান করেন।

শ্লোক ২৭

রূপং ভগবতা ত্বেতদশেষক্লেশসংক্ষয়ম্ ।
আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাং কিমন্যদনুকম্পিতম্ ॥ ২৭ ॥

রূপম্—রূপ; **ভগবতা**—আপনার দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **এতৎ**—এই; **অশেষ**—অনন্ত; **ক্লেশ**—দুঃখকষ্ট; **সংক্ষয়ম্**—ক্ষয়কারী; **আবিষ্কৃতম্**—প্রকাশিত; **নঃ**—আমাদের; **ক্লিষ্টানাম্**—জড়-জাগতিক অবস্থার দ্বারা যারা কষ্টভোগ করছে; **কিম্ অন্যৎ**—অন্যদের আর কি কথা; **অনুকম্পিতম্**—যাদের প্রতি আপনি কৃপাপরায়ণ।

অনুবাদ

হে ভগবান! বদ্ধ জীব আমরা দেহাত্মবুদ্ধির অন্ধকারে সর্বদা আচ্ছন্ন। তাই আমরা সংসার ক্লেশকে সর্বদা প্রিয় বলে মনে করি। আমাদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য আপনি এই দিব্য রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের মতো যারা এইভাবে কষ্টভোগ করছে, তাদের প্রতি আপনার এটি অন্তহীন কৃপার প্রকাশ। অতএব যে সমস্ত ভক্তদের প্রতি আপনি সর্বদা কৃপাপরায়ণ, তাদের আর কি কথা?

তাৎপর্য

সাধুদের পবিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য ভগবান তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন (*ভগবদ্গীতা* ৪/৮)। যদিও তিনি অসুরদের সংহার করেন, তা সত্ত্বেও তাদের লাভ হয় বলা হয় যে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা অর্জুনের রথের সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, আপাতদৃষ্টিতে দুটি কার্য হচ্ছিল—অসুরদের সংহার হচ্ছিল, এবং অর্জুনের মতো ভক্তের রক্ষা হচ্ছিল। কিন্তু তার পরিণাম সকলের জন্য সমান ছিল, তাই বলা হয় যে, ভগবানের আবির্ভাবের ফলে জড়-জাগতিক অস্তিত্বজনিত সর্বপ্রকার ক্লেশ ক্ষয় হয়।

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই রূপ কেবল ভক্তদেরই নয়, অন্যান্য সকলেরও সমস্ত ক্লেশ ক্ষয় করার জন্য (*অশেষক্লেশসংক্ষয়ম্*)। *আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাম্* । প্রচেতারা নিজেদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করেছিলেন। *কিমন্যদনুকম্পিতম্* । ভগবান ভক্তদের প্রতি সর্বদাই কৃপাপরায়ণ।

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে মুক্ত ভক্তদের প্রতিই কেবল ভগবান তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন না, তিনি বদ্ধ জীবদেরও সর্বতোভাবে কৃপা করেন।

মন্দিরে ভগবানের যে রূপের পূজা হয়, তাকে বলা হয় অর্চাবিগ্রহ বা অর্চাবতার নবীন ভক্তদের এই সুযোগটি দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা সাক্ষাৎভাবে ভগবানের প্রকৃত রূপ দর্শন করতে পারেন, তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করতে পারেন এবং আত্ম-নিবেদন করতে পারেন এই সুযোগের মাধ্যমে নবীন ভক্ত ক্রমশ তাঁর আদি কৃষ্ণভাবনাকে জাগরিত করতে পারেন। মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা নবীন ভক্তদের প্রতি ভগবানের সবচাইতে মূল্যবান আশীর্বাদ। তাই সমস্ত নবীন ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গৃহে অথবা মন্দিরে ভগবানের অর্চাবিগ্রহ রেখে, সেই অর্চাবতারের পূজায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ২৮

এতাবত্ত্বং হি বিভুভির্ভাব্যং দীনেষু বৎসলৈঃ ।
যদনুস্মর্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাভদ্ররন্ধন ॥ ২৮ ॥

এতাবৎ—এইভাবে; **ত্বম্**—আপনি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বিভুভিঃ**—অংশ বিস্তারের দ্বারা; **ভাব্যম্**—অনুভব করার জন্য; **দীনেষু**—দীন ভক্তকে; **বৎসলৈঃ**—কৃপাপরায়ণ; **যৎ**—যা; **অনুস্মর্যতে**—সর্বদা স্মরণ করা হয়; **কালে**—যথাসময়ে; **স্ব-বুদ্ধ্যা**—স্বীয় ভক্তির দ্বারা; **অভদ্র-রন্ধন**—হে সর্ব অমঙ্গলহারী।

অনুবাদ

হে ভগবান। আপনি সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করেন। আপনি আপনার অর্চাবিগ্রহ প্রকাশ করে আপনার দীন ভক্তদের কৃপা করেন। আপনি দয়া করে আমাদের আপনার নিত্য সেবক বলে মনে করুন।

তাৎপর্য

অর্চাবিগ্রহ নামক ভগবানের রূপ তাঁর অনন্ত শক্তির বিস্তার। ভগবান যখন তাঁর ভক্তের সেবায় সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি যথাসময়ে তাঁকে তাঁর নিত্যদাস রূপে অঙ্গীকার করেন। ভগবান স্বভাবতই অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ; তাই তিনি তাঁর নবীন ভক্তদের সেবা গ্রহণ করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"কেউ যদি প্রেম এবং ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, ফল অথবা জল প্রদান করে, তা হলে আমি তা গ্রহণ করব " ভক্ত অর্চাবিগ্রহকে আহার্যরূপে শাকসবজি, ফল, পাতা এবং জল নিবেদন করেন ভগবান ভক্তবৎসল হওয়ার ফলে সেই সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। নাস্তিকেরা মনে করতে পারে যে, ভক্তরা মূর্তিপূজা করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয় পরমেশ্বর ভগবান জনার্দন ভাবগ্রাহী, তিনি ভক্তের সেবাবৃত্তি গ্রহণ করেন। ভগবানের পূজার এই মাহাত্ম্য নবীন ভক্ত বুঝতে নাও পারে, কিন্তু ভগবান ভক্তবৎসল হওয়ার ফলে তাঁর ভক্তকে অঙ্গীকার করেন, এবং যথাসময়ে তাঁকে তাঁর ধামে নিয়ে যান।

এই সম্পর্কে এক ব্রাহ্মণের কাহিনী রয়েছে, যিনি তাঁর মনে মনে পায়েস রন্ধন করে ভগবানকে নিবেদন করছিলেন সেই ব্রাহ্মণের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করার মতো টাকা-পয়সা ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁর মনে মনে সবকিছুর সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি সোনার কলসিতে করে পবিত্র নদী থেকে জল নিয়ে এসে শ্রীবিগ্রহকে স্নান করাতেন, এবং তাঁকে নানা রকম উপাদেয় খাদ্য নিবেদন করতেন এক সময় পায়েস নিবেদন করার সময় তাঁর মনে হয়েছিল যে, তা হয়তো তখনও অত্যন্ত গরম ছিল এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন, "ওঃ আমি একটু দেখি তো এটা খুব বেশি গরম কি না।" এইভাবে তিনি যখন তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পায়েস স্পর্শ করেছিলেন, তখন তাঁর আঙ্গুল পুড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল যদিও তিনি মানসে ভগবানকে তা নিবেদন করছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান তা গ্রহণ করেছিলেন. ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি রথ পাঠিয়েছিলেন। এইভাবে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে গৃহে অথবা মন্দিরে প্রামাণিক শাস্ত্র এবং শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে অর্চাবিগ্রহের পূজা করা।

শ্লোক ২৯

যেনোপশান্তির্ভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্ ।
অন্তর্হিতোঽন্তর্হৃদয়ে কস্মান্নো বেদ নাশিষঃ ॥ ২৯ ॥

যেন—যেই পন্থার দ্বারা; **উপশান্তিঃ**—সমস্ত বাসনার তৃপ্তি; **ভূতানাম্**—জীবদের; **ক্ষুল্লকানাম্**—অত্যন্ত অধঃপতিত; **অপি**—যদিও; **ঈহতাম্**—বহু বস্তুর বাসনা করে;

অন্তর্হিতঃ—গুপ্ত; **অন্তঃ-হৃদয়ে**—হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; **কস্মাৎ**—কেন; **নঃ**—আমাদের; **বেদ**—জানেন; **ন**—না; **আশিষঃ**—বাসনা।

অনুবাদ

ভগবান যখন তাঁর স্বাভাবিক করুণার প্রভাবে তাঁর ভক্তের কথা চিন্তা করেন, তখন তাঁর নবীন ভক্তের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়। ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তা সেই জীব যত নগণ্যই হোক না কেন। ভগবান জীবের সবকিছু জানেন, এমন কি তার অন্তরের বাসনাগুলি পর্যন্ত জানেন। আমরা যদিও অত্যন্ত নগণ্য, তবুও ভগবান আমাদের ইচ্ছাগুলি কেন জানবেন না?

তাৎপর্য

মহাভাগবত কখনও নিজেকে মহাভাগবত বলে মনে করেন না। তিনি সর্বদাই অত্যন্ত বিনীত। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং তিনি তাঁর ভক্তের মনোভাব ও বাসনা বুঝতে পারেন। ভগবান অভক্তদেরও তাদের বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)।

জীব যতই নগণ্য হোক, সে যে বাসনাই করে, ভগবান তা জানতে পারেন, এবং তিনি তাকে তার সেই বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেন। ভগবান যদি অভক্তদের বাসনা চরিতার্থ করেন, তা হলে তিনি ভক্তদের বাসনা চরিতার্থ করবেন না কেন? শুদ্ধ ভক্ত কোন রকম জড়-জাগতিক কামনা ব্যতীত ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে চান, এবং তিনি যদি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তা চান, যেখানে ভগবান বিরাজ করছেন, এবং তাঁর যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তা হলে ভগবান তা বুঝতে পারবেন না কেন? ঐকান্তিক ভক্ত যদি ভগবান অথবা তাঁর অর্চাবিগ্রহের সেবা করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত কার্য সফল হবে, কারণ ভগবান তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং তিনি তাঁর ঐকান্তিক ভাব অবগত হতে পারেন। এইভাবে ভক্ত যদি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বিধিপূর্বক ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে থাকেন, তা হলে তিনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করবেন।

শ্লোক ৩০

অসাবেব বরোঽস্মাকমীপ্সিতো জগতঃ পতে ।
প্রসন্নো ভগবান্ যেষামপবর্গগুরুর্গতিঃ ॥ ৩০ ॥

অসৌ—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বরঃ**—বর; **অস্মাকম্**—আমাদের; **ঈপ্সিতঃ**—বাঞ্ছিত; **জগতঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **পতে**—হে প্রভু; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান, **যেষাম্**—যার প্রতি; **অপবর্গ**—দিব্য প্রেমময়ী সেবার; **গুরুঃ**—শিক্ষক; **গতিঃ**—জীবনের চরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি! আপনি ভক্তিযোগের প্রকৃত গুরু। আপনি যে আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য হয়েছেন, তাই আমরা অত্যন্ত প্রসন্নতা অনুভব করছি, এবং আমরা প্রার্থনা করি যে, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সেটিই আমাদের প্রার্থনা। আপনার প্রসন্নতা বিধান ব্যতীত অন্য আর কোন বাসনা আমাদের নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অপবর্গ-গুরুগতিঃ* শব্দগুলি অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/১১) বর্ণনা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম সত্যের চরম প্রকাশ। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।* পরম সত্যকে তিনরূপে উপলব্ধি করা যায়—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান। *অপবর্গ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মুক্তি'। *প বর্গ* মানে 'সংসার'। জড় জগতে সকলেই সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু চরমে তারা নিরাশ হয়। তারপর তার মৃত্যু হয় এবং পুনরায় তাকে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য আর একটি শরীর ধারণ করতে হয়। এটিই হচ্ছে সংসার-চক্র। *অপবর্গ* মানে হচ্ছে তার ঠিক বিপরীত। কুকুর-বিড়ালের মতো কঠোর পরিশ্রম না করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মুক্তি শুরু হয়। এটি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের ধারণা, কিন্তু ভগবানকে উপলব্ধি করা তার অনেক উপরের বিষয়। ভক্ত যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, ভগবান প্রসন্ন হয়েছেন, তখন মুক্তি বা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে হয়, ঠিক যেভাবে সূর্যকিরণের মাধ্যমে সূর্যকে দেখা যায়। ভগবানকে যদি প্রসন্ন করা যায়, তা হলে তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়।

শ্লোক ৩১

বরং বৃণীমহেঽথাপি নাথ ত্বৎপরতঃ পরাৎ ।
ন হ্যন্তস্ত্বদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে ॥ ৩১ ॥

বরম্—বর; **বৃণীমহে**—আমরা প্রার্থনা করব; **অথ অপি**—অতএব; **নাথ**—হে ভগবান; **ত্বৎ**—আপনার থেকে; **পরতঃ পরাৎ**—যা প্রকৃতির অতীত; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তঃ**—শেষ; **ত্বৎ**—আপনার; **বিভূতীনাম্**—ঐশ্বর্যের; **সঃ**—আপনি; **অনন্তঃ**—অন্তহীন; **ইতি**—এইভাবে; **গীয়সে**—কীর্তিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সর্বকারণেরও কারণ পরাৎপর পুরুষ এবং যেহেতু আপনার বিভূতির অন্ত নেই বলে আপনি অনন্ত নামে কীর্তিত, তাই আমরা আপনার কাছে একটি বর প্রার্থনা করব।

তাৎপর্য

প্রচেতাদের ভগবানের কাছ থেকে কোন বর প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ ভক্ত কেবল ভগবানের উপস্থিতিতেই তৃপ্ত হন। ধ্রুব মহারাজ ভগবানের দর্শন লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর কাছ থেকে বর প্রার্থনা করা। তিনি তাঁর পিতার সিংহাসন লাভ করতে চেয়েছিলেন, অথবা তার থেকেও উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান যখন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি সেই সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে ভগবান, আমি আপনার কাছে কোন বর প্রার্থনা করতে ইচ্ছা করি না।" এটিই হচ্ছে ভক্তের প্রকৃত স্থিতি। ভক্ত কেবল এই জগতে অথবা পরলোকে ভগবানের সান্নিধ্যে থাকতে চান, এবং তাঁর সেবায় যুক্ত হতে চান। সেটিই হচ্ছে ভক্তের চরম লক্ষ্য এবং প্রার্থনা।

ভগবান প্রচেতাদের বর চাইতে বলেছিলেন, এবং তাঁরা বলেছিলেন, "আমরা আপনার কাছে কি বর চাইব? আপনি অনন্ত এবং আপনার বরও অনন্ত।" অর্থাৎ, যদি বর চাইতে হয়, তা হলে অনন্ত বর চাওয়া উচিত। এই শ্লোকে *ত্বৎ পরতঃ* শব্দ দুটি অতীব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান *পরতঃ পরাৎ*। *পর* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জড় প্রকৃতির অতীত'। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি এই জড় জগতের অতীত, এবং তাকে বলা হয় *পরং পদম্*। *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)। ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াকে বলা হয় *পরং পদম্*, কিন্তু তারও ঊর্ধ্বে একটি দিব্য স্থিতি রয়েছে, যা হচ্ছে ভগবানের সান্নিধ্য। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১১)। পরমতত্ত্বকে প্রথমে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, তারপর পরমাত্মারূপে এবং চরমে ভগবানরূপে উপলব্ধি করা যায়। তাই ভগবান হচ্ছেন *পরতঃ পরাৎ*, অর্থাৎ ব্রহ্ম

এবং পরমাত্মা উপলব্ধির অতীত। এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী ইঙ্গিত করেছেন যে, *পরতঃ পরাৎ* শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বশ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ'। সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে চিৎ-জগৎ এবং তাকে বলা হয় ব্রহ্ম। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরব্রহ্ম। তাই *পরতঃ পরাৎ* মানে হচ্ছে 'ব্রহ্ম উপলব্ধির থেকেও শ্রেষ্ঠ'।

পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, প্রচেতারা ভগবানের কাছে এমন কিছু চাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন যা অনন্ত। ভগবানের লীলা, গুণাবলী, রূপ এবং নাম সবই অনন্ত। তাঁর নামের অন্ত নেই, রূপের অন্ত নেই, লীলার অন্ত নেই, সৃষ্টির অন্ত নেই এবং পরিকরের অন্ত নেই। জীব সেই অনন্তের অনন্তত্ব অনুভব করতে পারে না। কিন্তু জীবেরা যদি ভগবানের অনন্ত শক্তির বিষয়ে শ্রবণে মগ্ন হয়, তা হলে তারা সরাসরিভাবে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা অনন্তের এই উপলব্ধি অনন্ত হয়ে যায়।

শ্লোক ৩২

পারিজাতেঽঞ্জসা লব্ধে সারঙ্গোঽন্যন্ন সেবতে ।
ত্বদঙ্ঘ্রিমূলমাসাদ্য সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি ॥ ৩২ ॥

পারিজাতে—দিব্য পারিজাত পুষ্প; **অঞ্জসা**—সম্পূর্ণরূপে; **লব্ধে**—লাভ করে; **সারঙ্গঃ**—ভ্রমর; **অন্যৎ**—অন্য; **ন সেবতে**—সেবা করে না; **ত্বৎ-অঙ্ঘ্রি**—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; **মূলম্**—সবকিছুর মূল; **আসাদ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **কিম্**—কি; **কিম্**—কি; **বৃণীমহি**—আমরা প্রার্থনা করতে পারি।

অনুবাদ

হে ভগবান! ভ্রমর যেমন পারিজাত ফুল প্রাপ্ত হলে আর অন্য ফুলে যায় না, তেমনই আমরা যখন আপনার শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়ে তার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখন আর কি বর প্রার্থনা করব?

তাৎপর্য

ভক্ত যখন প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি এমনই পরিপূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করেন যে, আর কোন বর প্রার্থনা করার প্রয়োজন থাকে না। ভ্রমর যখন পারিজাত বৃক্ষের কাছে যায়, তখন সেখানে সে এত মধু পায় যে, তার আর অন্য বৃক্ষে যাওয়ার আবশ্যকতা থাকে না। যদি কেউ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি যে অন্তহীন আনন্দ আস্বাদন করেন,

তার ফলে আর তাকে অন্য কোন বর প্রার্থনা করতে হয় না। পারিজাত বৃক্ষ সাধারণত এই জগতে পাওয়া যায় না। পারিজাত বৃক্ষকে কল্পবৃক্ষও বলা হয়। এই প্রকার বৃক্ষ থেকে যা আকাঙ্ক্ষা করা যায়, তাই পাওয়া যায়। এই জগতে কমলা গাছ থেকে কমলা পাওয়া যায় অথবা আম গাছ থেকে আম পাওয়া যায়, কিন্তু আম গাছ থেকে কমলা অথবা কমলা গাছ থেকে আম পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পারিজাত বৃক্ষের কাছে কমলা, আম, কলা ইত্যাদি যা কিছু চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। এই বৃক্ষ চিৎ-জগতে রয়েছে। *চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু।* চিন্ময় জগৎ বা চিন্তামণি ধাম কল্পবৃক্ষ পরিবৃত, কিন্তু পারিজাত বৃক্ষ ইন্দ্রলোক বা স্বর্গলোকেও পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহিষীদের অন্যতমা সত্যভামার প্রীতিসাধনের জন্য স্বর্গলোক থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে এসেছিলেন, এবং সেটি তাঁর প্রাসাদে রোপণ করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ঠিক পারিজাত বা কল্পবৃক্ষের মতো, এবং ভক্তরা ঠিক ভ্রমরের মতো। তাঁরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট।

শ্লোক ৩৩

যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্মভিঃ ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে ॥ ৩৩ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **তে**—আপনার; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **স্পৃষ্টাঃ**—কলুষিত; **ভ্রমামঃ**—আমরা ভ্রমণ করি; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **তাবৎ**—ততক্ষণ, **ভবৎ-প্রসঙ্গানাম্**—আপনার প্রেমিক ভক্তদের; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ; **স্যাৎ**—হোক; **নঃ**—আমাদের; **ভবে ভবে**—জন্মে-জন্মে।

অনুবাদ

হে ভগবান! জড় জগতের কলুষের ফলে, যতদিন আমাদের এই জড় জগতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হবে, ততদিন যেন আমরা আপনার লীলা শ্রবণ-কীর্তনে মগ্ন ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পারি। জন্ম-জন্মান্তরে আমরা কেবল এই প্রার্থনাই করি।

তাৎপর্য

এটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বর, যা ভগবানের কাছে ভক্ত প্রার্থনা করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—*স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৩)। জীব তার ভাগ্য অনুসারে এক অথবা অন্য স্থিতিতে

থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক স্থিতিতেই ভগবানের কার্যকলাপ এবং লীলা শ্রবণে নিমগ্ন থাকা উচিত। শুদ্ধ ভক্ত কখনও মুক্তি বা জন্ম-মৃত্যুর চক্রের সমাপ্তি প্রার্থনা করেন না, কারণ তা তাঁর কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভক্তের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করা। এই জগতে ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্ত চিৎ-জগতেও সেই সুযোগ পাবেন এইভাবে, যতক্ষণ ভগবানের লীলা শ্রবণ করা যায় অথবা ভগবানের মহিমা কীর্তন করা যায়, ভক্তের কাছে তা সবই হচ্ছে চিৎ-জগতের অন্তর্গত, কারণ ভগবান স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকেন। *তত্র তিষ্ঠামি নারদ যত্র গায়ন্তি মদ্ভক্তাঃ।* ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা যখন সমবেত হয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, সেই স্থান বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়। তাই ভক্তের বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন হয় না। শুদ্ধ ভক্ত কেবল নিরপরাধে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে, যে-কোন স্থানকে বৈকুণ্ঠে অথবা বৃন্দাবনে পরিণত করতে পারেন।

প্রচেতারা প্রতি জন্মে (ভবে ভবে) ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ লাভের প্রার্থনা করেছিলেন। জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়। ভগবদ্ভক্ত এই প্রস্থার নিবৃত্তিসাধনে বিশেষ উদ্গ্রীব নন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*—"হে ভগবান! জন্ম-জন্মান্তরে আমি যেন আপনার শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত থাকতে পারি।" বিনয়বশত ভক্ত নিজেকে চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়ার অযোগ্য বলে মনে করেন। তিনি নিজেকে সর্বদা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে কলুষিত বলে মনে করেন। ভক্তের জড়া প্রকৃতির গুণের থেকে মুক্ত হওয়ারও কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবদ্ভক্তি আপনা থেকেই সেই চিন্ময় স্তরে সম্পাদিত হয়; তাই এই বিশেষ সুযোগের প্রার্থনা করার আর কোন প্রয়োজন হয় না মূল কথা হচ্ছে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জন্মমৃত্যুর চক্রের নিবৃত্তিসাধনে উৎসুক নন, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে মগ্ন ভক্তদের সঙ্গলাভ করতে আগ্রহী।

শ্লোক ৩৪

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৩৪ ॥

তুলয়াম—তুলনা করি; **লবেন**—অতি অল্পক্ষণ (লব); **অপি**—ও; **ন**—না; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোক প্রাপ্তি; **ন**—না; **অপুনঃ-ভবম্**—ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া; **ভগবৎ**—

পরমেশ্বব ভগবানেব; **সঙ্গি**—সঙ্গীদের; **সঙ্গস্য**—সঙ্গের; **মর্ত্যানাম্**—মবণশীল ব্যক্তিদেব; **কিম্ উত**—কি কম রয়েছে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ

অনুবাদ

ভগবৎ সঙ্গী ভক্তদের লবমাত্র সময়ের সঙ্গ প্রভাবে জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তার সঙ্গে স্বর্গলোক প্রাপ্তি এমন কি ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তিরও তুলনা করা যায় না। কারণ মরণশীল জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ বর হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন—*কৈবল্যং নবকায়তে ত্রিদশপূবাকাশপুষ্পায়তে*। শুদ্ধ ভক্তের কাছে *কৈবল্য* বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া নরকবাসেরই তুল্য। তেমনই স্বর্গলোকে (*ত্রিদশপূব*) উন্নীত হওয়াও তার কাছে আকাশ-কুসুমের মতো। অর্থাৎ, শুদ্ধ ভক্ত কর্মীদের চরম লক্ষ্য (স্বর্গলোক) অথবা জ্ঞানীদের চরম লক্ষ্যকে (ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া) মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কবেন না। শুদ্ধ ভক্ত অন্য শুদ্ধ ভক্তের ক্ষণকালের সঙ্গকে স্বর্গলোকে বাস অথবা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার থেকে অনেক অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। এই জড় জগতের জন্মমৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের পক্ষে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বর। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের অন্বেষণ করে তাঁদের সঙ্গে থাকতে হয়। তার ফলেই, এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও, পূর্ণরূপে সুখী হওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। যাবা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে তাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পাবেন। এইভাবে এই জড় জগতের বিভ্রান্ত এবং নৈবাশ্যগ্রস্ত মানুষেরা ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে পরম সুখ লাভ কবতে পাববে।

শ্লোক ৩৫

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ ।
নির্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন ॥ ৩৫ ॥

যত্র—যেখানে; **ঈড্যন্তে**—পূজা করা হয় অথবা আলোচনা করা হয়; **কথাঃ**—কথা; **মৃষ্টাঃ**—শুদ্ধ, **তৃষ্ণায়াঃ**—জড় আকাঙ্ক্ষার; **প্রশমঃ**—সন্তুষ্টি; **যতঃ**—যার দ্বাবা;

নির্বৈরম্—নির্মৎসরতা; **যত্র**—যেখানে; **ভূতেষু**—জীবদের মধ্যে; **ন**—না; **উদ্বেগঃ**—উৎকণ্ঠা, **যত্র**—যেখানে; **কশ্চন**—কোন।

অনুবাদ

যখনই চিৎ-জগতের বিশুদ্ধ কথা আলোচনা হয়, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী অন্তত তখনকার মতো সমস্ত জড় আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে যান। কেবল তাই নয়, তাঁদের তখন আর পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব থাকে না এবং তাঁদের কোন রকম উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা থাকে না।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বিগত কুণ্ঠা যেখানে', এবং জড়-জগতের অর্থ হচ্ছে উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—*সদা সমুদ্বিগ্নধিয়াম্ অসদ্গ্রহাৎ*। যারা এই জড় জগৎকে তাদের বাসস্থান বলে গ্রহণ করেছে, তারা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। যে-স্থানে শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা ভগবানের পবিত্র কথা আলোচনা করা হয়, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়। সেটিই হচ্ছে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ,* অর্থাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণ এবং কীর্তনের পন্থা। ভগবান স্বয়ং সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েষু বা ।
তত্র তিষ্ঠামি নারদ যত্র গায়ন্তি মদ্ভক্তাঃ ॥

"হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না, কিন্তু যেখানে আমার শুদ্ধ ভক্তরা আমার দিব্য নাম কীর্তন করে এবং আমার রূপ, লীলা এবং গুণের কথা আলোচনা করে, সেখানে আমি থাকি।" চিন্ময় শব্দ-তরঙ্গরূপে ভগবান উপস্থিত থাকেন বলে বৈকুণ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশ ভয় এবং উদ্বেগ থেকে মুক্ত। এক জীব অন্য জীবকে ভয় করে না। ভগবানের দিব্য নাম ও মহিমা শ্রবণের দ্বারা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হতে থাকে। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৭)। এইভাবে তার জড় আকাঙ্ক্ষার তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ যে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জড় জগতেও কুণ্ঠাবিহীন চিন্ময় লোক বা বৈকুণ্ঠ সৃষ্টি করা। তার উপায় হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রবণং কীর্তনম্*-এর পন্থা প্রচার করা। জড় জগতে সকলেই তার সতীর্থের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। মানব সমাজে

যতক্ষণ পর্যন্ত সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান না হয়, অর্থাৎ ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রের কীর্তন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পাশবিক বিদ্বেষ থাকে। প্রচেতারা তাই সর্বদা ভক্তসমাজে থাকতে মনস্থ করেছিলেন, এবং তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন যে, সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

শ্লোক ৩৬

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ন্যাসিনাং গতিঃ ।
সংস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥

যত্র—যেখানে; **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ন্যাসিনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **গতিঃ**—পরম লক্ষ্য; **সংস্তূয়তে**—পূজিত হন; **সৎ-কথাসু**—চিন্ময় বিষয়ের আলোচনা; **মুক্ত-সঙ্গৈঃ**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা; **পুনঃ পুনঃ**—বারংবার।

অনুবাদ

যেখানে ভক্তদের মধ্যে ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, সেখানে ভগবান নারায়ন উপস্থিত থাকেন। নারায়ণ হচ্ছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের পরম গতি, এবং যাঁরা জড় কলুষ থেকে মুক্ত, তাঁরা সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে নারায়ণের পূজা করেন। তাঁরা বাস্তবিকপক্ষে পুনঃ পুনঃ তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন।

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নারায়ণের বাস্তবিক সঙ্গ থেকে বঞ্চিত। তার কারণ হচ্ছে যে, তারা ভ্রান্তভাবে নিজেদের নারায়ণ বলে দাবি করে। তাদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা হচ্ছে পরস্পরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করা। যদি বলা হয় সকলেই নারায়ণের মন্দির, তা হলে সেই কথা ঠিক, কিন্তু অন্য আর একজন মানুষকে নারায়ণ বলে মনে করা একটি মহা অপরাধ। দরিদ্র নারায়ণের ধারণাটি, অর্থাৎ দরিদ্র মানুষদের নারায়ণ বলে মনে করার প্রচেষ্টাটিও একটি মহা অপরাধ। এমন কি নারায়ণকে ব্রহ্মা এবং শিবের সমতুল্য বলে মনে করাও একটি অপরাধ।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মা এবং শিবের সমকক্ষ বলে মনে করে, তাকে তৎক্ষণাৎ একজন নাস্তিক বা পাষণ্ডী বলে গণনা করা হয়।" মূল কথা হচ্ছে যে, সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তৎক্ষণাৎ ভগবানের প্রসন্নতাবিধান করা যায়। তখন নারায়ণ স্বয়ং অবতরণ করে সেখানে উপস্থিত থাকেন। এই কলিযুগে নারায়ণ তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে উপস্থিত হন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"কলিযুগে বুদ্ধিমান মানুষেরা নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তনকারী ভগবানের অবতারের পূজা করার জন্য সমবেতভাবে ভগবানের নাম কীর্তনরূপ সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যদিও তাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণবর্ণ, তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তিনি তাঁর পার্ষদ, সেবক, অস্ত্র এবং অন্তরঙ্গ সঙ্গী পরিবৃত হয়ে থাকেন।" প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান করা, এবং সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা তা অনায়াসে সম্পাদন করা যায়। যখনই ভগবানের দিব্য নামের সংকীর্তন হয়, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভগবানের অবতার গৌর নারায়ণ তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভূত হন এবং সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পূজিত হন।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, নারায়ণ হচ্ছে *ন্যাসিনাং গতিঃ* অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের পরম গতি। যাঁরা জড় জগৎকে ত্যাগ করেছেন, তাঁদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তাই নারায়ণের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন; তিনি কখনও ভ্রান্তভাবে নারায়ণ হওয়ার দাবি করেন না। *নির্বৈর,* অর্থাৎ অন্যান্য জীবদের প্রতি নির্মৎসর হওয়ার পরিবর্তে, যে নারায়ণ হওয়ার চেষ্টা করে, সে ভগবানের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ। তাই নারায়ণ হওয়ার প্রচেষ্টাটি হচ্ছে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ। প্রকৃতপক্ষে কেউ যখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন অথবা ভগবানের দিব্য কার্যকলাপের আলোচনা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ নির্মৎসর হয়ে যান। এই জড় জগতে সকলেই অন্যদের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ, কিন্তু ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করার ফলে অথবা আলোচনা করার ফলে নির্মৎসর হওয়া যায় এবং জড় আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানের প্রতি আমাদের মাৎসর্যের ফলে আমরা অন্য সমস্ত জীবদের প্রতিও মাৎসর্য-পরায়ণ হয়েছি আমরা যখন ভগবানের প্রতি নির্মৎসর হই, তখনি মানব-সমাজে প্রকৃত শান্তি, ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হবে। নারায়ণ অথবা সংকীর্তন যজ্ঞ ব্যতীত এই জড় জগতে কখনও শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

শ্লোক ৩৭

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া ।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥ ৩৭ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **বিচরতাম্**—বিচরণকারী; **পদ্ভ্যাম্**—তাঁদের পায়ের দ্বারা; **তীর্থানাম্**—পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে; **পাবন-ইচ্ছয়া**—পবিত্র করার বাসনায়; **ভীতস্য**—সর্বদা ভয়ভীত বিষয়ী ব্যক্তির; **কিম্**—কেন; **ন**—না; **রোচেত**—ভাল লাগে; **তাবকানাম্**—আপনার ভক্তদের; **সমাগমঃ**—সাক্ষাৎ।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার পার্ষদ এবং ভক্তরা পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করে তীর্থস্থানগুলিকে পর্যন্ত পবিত্র করেন। অতএব সংসার ভয়ে ভীত কোন্ ব্যক্তি তাঁদের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ করবে না?

তাৎপর্য

দুই প্রকার ভক্ত রয়েছেন—গোষ্ঠানন্দী এবং ভজনানন্দী। ভজনানন্দীরা কোথাও ভ্রমণ না করে এক স্থানে থাকেন। এই প্রকার ভক্তরা সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন। তাঁরা আচার্যদের নির্দেশ অনুসারে মহামন্ত্র জপ করেন এবং কখনও কখনও কেবল প্রচার-কার্যের উদ্দেশ্যে বাইরে যান। আর গোষ্ঠানন্দী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবদ্ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান। তাঁরা পৃথিবীকে এবং পৃথিবী-বাসীদের পবিত্র করার জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, তাঁর অনুগামীরা যেন সর্বত্র ভ্রমণ করে প্রতিটি নগরে গ্রামে তাঁর বাণী প্রচার করেন। চৈতন্য-সম্প্রদায়ে যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা, যা *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* শ্রীকৃষ্ণেরই বাণীর প্রচার। ভক্তরা যতই কৃষ্ণকথা প্রচার করবেন, সারা পৃথিবীর মানুষ ততই লাভবান হবে।

দেবর্ষি নারদের মতো ভক্ত, যিনি সর্বত্র ভ্রমণ করে ভগবানের বাণী প্রচার করেন, তাঁকে বলা হয় গোষ্ঠানন্দী। নারদ মুনি ভক্ত তৈরি করার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করেন। নারদ মুনি এমন কি একজন ব্যাধকে পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তে পরিণত

করেছিলেন। তিনি ধ্রুব মহারাজ এবং প্রহ্লাদ মহারাজকেও ভক্তে পরিণত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভক্তরাই নারদ মুনির কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি স্বর্গ এবং নরক উভয় স্থানেই বিচরণ করেছেন। ভগবদ্ভক্ত নরকে যেতেও কুণ্ঠিত হন না। ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন, এমন কি নরকে পর্যন্ত তিনি যান, কারণ ভক্তের কাছে স্বর্গ এবং নরকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

"নারায়ণের শুদ্ধ ভক্ত কোথাও যেতে ভয় পান না। তাঁর কাছে স্বর্গ এবং নরক সমান।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮) এই প্রকার ভক্তরা পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে সংসার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন। কিছু মানুষ জড়সুখ ভোগে বিভ্রান্ত হয়ে এবং নিরাশ হয়ে, ইতিমধ্যেই সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, আর কিছু মানুষ যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে আগ্রহী। তাঁরা উভয়েই পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণকারী শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে লাভবান হতে পারেন।

যখন শুদ্ধ ভক্ত কোন তীর্থস্থানে যান, তখন তিনি সেই পবিত্র তীর্থকে পবিশুদ্ধ করেন। তীর্থস্থানের পবিত্র জলে বহু পাপী স্নান করে। তারা প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরাদি স্থানে গঙ্গা এবং যমুনার জলে স্নান করে। এইভাবে পাপীরা পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু তাদের পাপ সেই পবিত্র তীর্থে থেকে যায়। ভগবদ্ভক্ত যখন সেই সমস্ত পবিত্র তীর্থে গিয়ে স্নান করেন, তখন ভক্তের প্রভাবে পাপীদের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। *তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১৩/১০)। যেহেতু ভক্ত ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে সর্বদা বহন করেন, তাই তিনি যেখানেই যান সেই স্থান পবিত্র তীর্থস্থানে বা পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার পীঠস্থানে পরিণত হয়। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া। সকলেরই কর্তব্য মায়ার বন্ধন থেকে বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করছেন যে ভগবদ্ভক্তগণ, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে লাভবান হওয়া।

শ্লোক ৩৮

বয়ং তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন ।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম ॥ ৩৮ ॥

বয়ম্—আমরা; **তু**—তা হলে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ভবস্য**—শিবের; **প্রিয়স্য**—অত্যন্ত প্রিয়, **সখ্যুঃ**—আপনার সখা; **ক্ষণ**—ক্ষণিকের জন্য; **সঙ্গমেন**—সঙ্গ প্রভাবে; **সুদুশ্চিকিৎস্যস্য**—যার চিকিৎসা করা অত্যন্ত কঠিন; **ভবস্য**—জড় অস্তিত্বের; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **ভিষক্-তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য; **ত্বা**—আপনি; **অদ্য**—আজ; **গতিম্**—গতি; **গতাঃ**—লাভ করেছি, **স্ম**—নিশ্চিতভাবে.

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার অত্যন্ত প্রিয় সখা শিবের ক্ষণকাল মাত্র সঙ্গ প্রভাবে আপনাকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য এবং আপনি দুশ্চিকিৎস্য ভবরোগের নিরাময় করতে পারেন। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে—*হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি*। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করে, কখনও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি সমন্বিত মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। প্রচেতারা মহাদেবের কৃপায় ভগবানের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। মহাদেব হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম ভক্ত। *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*। বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবের স্থান সর্বোচ্চ, এবং যাঁরা প্রকৃতপক্ষে শিবের ভক্ত, তাঁরা শিবের উপদেশ অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিবের তথাকথিত ভক্তরা, যারা কেবল জড়-জাগতিক উন্নতি সাধন করতে চায়, তারা পরোক্ষভাবে শিবের দ্বারা প্রতারিত হয়। শিব প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতারণা করেন না, কারণ প্রতারণা করা তাঁর কার্য নয় কিন্তু তথাকথিত ভক্তরা যেহেতু প্রতারিত হতে চায়, তাই শিব, যিনি অতি সহজে প্রসন্ন হন, তিনি তাদের সব রকম জড় জাগতিক বর প্রদান করেন। এই সমস্ত বরগুলি পরিণামে তথাকথিত ভক্তদের বিনাশের কারণ হতে পারে। যেমন, রাবণ শিবের কাছ থেকে সব রকম জড় আশীর্বাদ লাভ করেছিল, কিন্তু পরিণামে শিবের আশীর্বাদের অপব্যবহার করার ফলে, সে তার পরিবার, রাজ্য এবং অন্য সবকিছু সহ ধ্বংস হয়েছিল। জড়-জাগতিক ক্ষমতার ফলে তার এতই গর্ব হয়েছিল যে, সে রামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করার সাহস করেছিল। এইভাবে তার সর্বনাশ হয়। শিবের কাছ থেকে জড় জাগতিক আশীর্বাদ লাভ করা খুব একটা কঠিন নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আশীর্বাদ নয়। প্রচেতারা শিবের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত আশীর্বাদ। গোপীরাও বৃন্দাবনে শিবের পূজা করেছিলেন, এবং শিব এখনও সেখানে গোপীশ্বররূপে রয়েছেন। গোপীরা কিন্তু শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন তাঁদের আশীর্বাদ করেন, যাতে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করতে পারেন। দেবতাদের পূজা করতে কোন বাধা নেই, যদি তার লক্ষ্য হয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সাধারণত মানুষ জড়-জাগতিক লাভের জন্য দেবতাদের কাছে যায়, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"যাদের মন জড়-বাসনার দ্বারা বিকৃত হয়েছে, তারা দেবতাদের শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে বিশেষ বিধি-বিধানের দ্বারা দেবতাদের পূজা করে।" জড় জাগতিক লাভের আশায় মোহিত ব্যক্তিকে বলা হয় *হৃতজ্ঞান* ('যার বুদ্ধি হারিয়ে গেছে')। এই সম্পর্কে লক্ষ্যণীয় যে, শাস্ত্রে কখনও কখনও শিবকে ভগবান থেকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে, শিব এবং বিষ্ণু এতই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, তাঁদের বিচারধারায় কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য* (*চৈঃ চঃ আদি* ৫/১৪২)। শাস্ত্রের কোথাও শিবকে বিষ্ণুর সমকক্ষ হওয়ার দাবি করতে দেখা যায় না। এটি কেবল তথাকথিত শিবভক্তদের মনগড়া কথা, যারা বলে যে, শিব এবং বিষ্ণু এক। বৈষ্ণবতন্ত্রে সেই সম্বন্ধে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে—*যস্তু নারায়ণং দেবম্।* ভগবান বিষ্ণু, শিব এবং ব্রহ্মা প্রভু ও ভৃত্যরূপে অতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। *শিববিরিঞ্চিনুতম্* । শিব এবং ব্রহ্মা শ্রদ্ধা সহকারে বিষ্ণুকে প্রণতি নিবেদন করেন। তাঁদের সকলকে সমান বলে মনে করা মহা অপরাধ। তাঁরা সমান এই অর্থে যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্য সকলে তাঁর নিত্য দাস।

শ্লোক ৩৯-৪০

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা
বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা ।
আর্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ
সর্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥ ৩৯ ॥

যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ
নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু ।
সর্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো
বৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥ ৪০ ॥

যৎ—যা; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **স্বধীতম্**—অধ্যয়ন করা হয়েছে; **গুরবঃ**—গুরুজন, গুরুদেব; **প্রসাদিতাঃ**—প্রসন্ন; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **চ**—এবং; **বৃদ্ধাঃ**—বৃদ্ধগণ; **চ**—এবং; **সৎ-আনুবৃত্ত্যা**—আমাদের স্নিগ্ধ আচরণের দ্বারা; **আর্যাঃ**—যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত; নতাঃ—প্রণতি নিবেদন করা হয়েছে; **সু-হৃদঃ**—বন্ধুগণ; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **চ**—এবং, **সর্বাণি**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীবগণ; **অনসূয়য়া**—নির্মৎসর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যৎ**—যা; নঃ—আমাদের; **সু-তপ্তম্**—কঠোর; **তপঃ**—তপস্যা; **এতৎ**—এই; **ঈশ**—হে ভগবান, **নিরন্ধসাম্**—আহার গ্রহণ না করে; **কালম্**—কাল; **অদভ্রম্**—দীর্ঘ; **অপ্সু**—জলের ভিতরে; **সর্বম্**—সমস্ত; **তৎ**—তা; **এতৎ**—এই; **পুরুষস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ভূম্নঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **বৃণীমহে**—এই বর প্রার্থনা করি; **তে**—আপনার; **পরিতোষণায়**—সন্তোষের জন্য।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমরা বেদ অধ্যয়ন করেছি, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি এবং ব্রাহ্মণদের, ভক্তদের ও পারমার্থিক জ্ঞানে অতি উন্নত বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। আমরা ভ্রাতা, বন্ধু অথবা অন্য কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইনি। আমরা দীর্ঘকাল কোন কিছু আহার না করে, জলের মধ্যে কঠোর তপস্যা করেছি। আমাদের এই সমস্ত পারমার্থিক সম্পদগুলি কেবল আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করতে চাই, এটিই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। এ ছাড়া আমরা আর কিছু চাই না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে *সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*—জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বেদের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। যিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জানতে পেরেছেন, তিনি বহু বহু জন্মের পর তাঁর শরণাগত হন। এই সমস্ত গুণগুলি আমরা প্রচেতাদের মধ্যে দেখতে পাই। তাঁরা দীর্ঘকাল কোন কিছু আহার না করে, জলের ভিতর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁরা কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আশায়

এইভাবে তপস্যা করেননি, কেবল ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্যই তা করেছিলেন। মানুষ জড় অথবা চেতন যে-কোন কার্যে যুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতাবিধান। এই শ্লোকে বৈদিক সভ্যতার একটি আদর্শ চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। যাঁরা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তাঁদের কেবল ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়াই উচিত নয়, অধিকন্তু যাঁরা জ্ঞানে প্রবীণ, যাঁরা আর্য এবং ভগবানের প্রকৃত ভক্ত, তাঁদেরও শ্রদ্ধা করা উচিত। যে নিজেকে আর্য বলে গর্ব করে, সে আর্য নয়। প্রকৃত আর্য হচ্ছেন ভগবানের ভক্ত। *আর্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'উন্নত'। পূর্বে ভগবদ্ভক্তদেরই আর্য বলা হত। যেমন, *ভগবদ্গীতায়* (২/২) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করে বলেছেন যে, তিনি অনার্যের মতো কথা বলছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥

"পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে অর্জুন! এই কলুষ তোমার মধ্যে এলো কোথা থেকে? তা জীবনের উন্নত মান সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তির উপযুক্ত নয়। তা মানুষকে উচ্চতর লোকে উন্নীত করে না, পক্ষান্তরে অখ্যাতির কারণ হয়।" ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয় অর্জুন যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই ভগবান তাঁকে তিরস্কার করে অনার্য বলেছিলেন। যিনি ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নত, তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে অবগত। তাঁর সেই কর্তব্য হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক তাতে কিছু যায় আসে না। তা যদি ভগবানের আদেশ হয় বা ভগবান কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তা হলে তা অবশ্য করণীয়। আর্য তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন। এমন নয় যে আর্যরা জীবদের প্রতি অনর্থক শত্রুভাবাপন্ন। আর্যরা কখনও কসাইখানা খোলেন না, এবং তাঁরা অসহায় জন্তুদের প্রতি কখনও বৈরীভাবাপন্ন নন। প্রচেতারা দীর্ঘকাল ধরে এমন কি জলের ভিতরেও তপস্যা করেছিলেন। যাঁরা উন্নত সভ্যতায় আগ্রহী, তাঁদের এই প্রকার তপস্যা করা কর্তব্য।

নিরন্ধসাম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নিরাহার'। অধিক ভোজন করা এবং বৃথা আহার করা আর্যদের কার্য নয়। পক্ষান্তরে, আহার যতখানি সম্ভব সীমিত করা উচিত। আর্যরা কেবল অনুমোদিত খাদ্যই আহার করেন। এই সম্বন্ধে, ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"কেউ যদি প্রেম এবং ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, ফল অথবা জল প্রদান করে, আমি তা গ্রহণ করি।" এইভাবে উন্নত আর্যদের জন্য অনেক বিধিবিধান রয়েছে। ভগবান যদিও সবকিছুই আহার করতে পারেন, তবুও তিনি কেবল শাকসবজি, ফল, দুধ ইত্যাদি আহার কবেন। এই শ্লোকে এইভাবে আর্যদেব কার্যকলাপের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪১

মনুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ভবশ্চ
যেহন্যে তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ ।
অদৃষ্টপারা অপি যন্মহিম্নঃ
স্তুবন্ত্যথো ত্বাত্মসমং গৃণীমঃ ॥ ৪১ ॥

মনুঃ—স্বায়ম্ভুব মনু; **স্বয়ম্ভুঃ**—ব্রহ্মা, **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **ভবঃ**—শিব; **চ**—ও; **যে**—যিনি; **অন্যে**—অন্যরা; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **সত্ত্বাঃ**—যাঁর অস্তিত্ব; **অদৃষ্ট-পারাঃ**—যে অন্ত দেখতে পায় না; **অপি**—যদিও; **যৎ**—আপনার; **মহিম্নঃ**—মহিমার; **স্তুবন্তি**—প্রার্থনা করে; **অথো**—এই; **ত্বা**—আপনাকে; **আত্ম-সমম্**—যথাসাধ্য; **গৃহীমঃ**—আমরা প্রার্থনা করি।

অনুবাদ

হে ভগবান। তপস্যা এবং জ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত যোগীগণ, এমন কি মনু, ব্রহ্মা, শিবাদি মহাপুরুষগণও আপনার মহিমা এবং শক্তি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যথাসাধ্য আপনার স্তব করেছেন। এই সমস্ত মহাপুরুষদের থেকে অনেক নিকৃষ্ট হলেও আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আপনার স্তব করছি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, শিব, মনু (মানব জাতির পিতা), মহাপুরুষগণ এবং মহর্ষিগণ যাঁরা তপস্যা এমন কি ভক্তির দ্বারা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন, ভগবানেব জ্ঞানের তুলনায় তাঁদের সকলের জ্ঞানই অপূর্ণ। এই জড় জগতে সকলেরই অবস্থা এই রকম।

কেউই কোন বিষয়ে ভগবানের সমকক্ষ নয়, জ্ঞানের ব্যাপারে তো নয়ই। তার ফলে ভগবানের প্রতি কারও প্রার্থনা কখনই পূর্ণ নয়। ভগবান অনন্ত, তাই কারও পক্ষেই তাঁর মহিমার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এমন কি ভগবান নিজেও অনন্ত বা শেষরূপে তাঁর অবতারে, তাঁর নিজের মহিমা পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারেন না। অনন্তের যদিও হাজার-হাজার মুখ রয়েছে এবং তিনি হাজার হাজার বছর ধরে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছেন, তবুও তিনি ভগবানের মহিমার অন্ত খুঁজে পান না। তাই ভগবানের পূর্ণ শক্তি ও মহিমা অনুমান করা সম্ভব নয়।

তা সত্ত্বেও, সকলেই ভক্তি সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রার্থনা করতে পারে। সকলেই তার আপেক্ষিক পদে রয়েছে, এবং তাই ভগবানের মহিমা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ব্রহ্মা, শিব থেকে শুরু করে আমরা পর্যন্ত সকলেই ভগবানের সেবক। আমরা সকলেই আমাদের কর্ম অনুসারে স্ব-স্ব পদে অবস্থিত রয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সকলে ভগবানের মহিমা যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি, সেই অনুসারে তাঁর স্তব করতে পারি। সেটিই আমাদের সিদ্ধি। এমন কি সংসারের অন্ধতম প্রদেশে অবস্থান করলেও জীব তার সাধ্য অনুসারে ভগবানের স্তব করতে পারে। ভগবান তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ! আমার শরণ গ্রহণ করার ফলে, নিকৃষ্ট যোনিসম্ভূত—স্ত্রী, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রেরা পর্যন্ত পরম গতি প্রাপ্ত হয়।"

কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি ভগবান এবং ভগবানের দাসের কৃপায় পবিত্র হবেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—*যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৪/১৮)। যে ব্যক্তি ভগবানের দাস শ্রীগুরুদেবের প্রচেষ্টায় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নীত হয়েছেন, তিনি যতই নিম্নকুলোদ্ভূত হোন না কেন, তৎক্ষণাৎ তিনি পবিত্র হয়ে যান। তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন।

শ্লোক ৪২

নমঃ সমায় শুদ্ধায় পুরুষায় পরায় চ ।
বাসুদেবায় সত্ত্বায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৪২ ॥

নমঃ—আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **সমায়**—যিনি সকলের প্রতি সমদর্শী; **শুদ্ধায়**—যিনি পাপকর্মের দ্বারা কখনও কলুষিত হন না; **পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **পরায়**—চিন্ময়; **চ**—ও; **বাসুদেবায়**—সর্বত্র বিরাজমান; **সত্ত্বায়**—যিনি শুদ্ধ সত্ত্বে স্থিত; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **নমঃ**—নমস্কার।

অনুবাদ

হে ভগবান! কেউই আপনার শত্রু নয় অথবা মিত্র নয়। তাই আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী। আপনি পাপকর্মের দ্বারা কখনও কলুষিত হতে পারেন না, এবং আপনার চিন্ময় রূপ জড়া প্রকৃতির অতীত। আপনি পরমেশ্বর ভগবান কারণ আপনি সর্বব্যাপ্ত। তাই আপনি বাসুদেব নামে পরিচিত। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান বাসুদেব নামে পরিচিত কারণ তিনি সর্বত্র বাস করেন। এই নামটির উদ্ভব হয়েছে *বস্* শব্দটি থেকে, যার অর্থ 'বাস করা'। *ব্রহ্মসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *একোহপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিম্*—ভগবান তাঁর অংশ বিস্তারের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়েও প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি পরমাণুর ভিতরেও প্রবেশ করেন (*পরমাণুচয়ান্তরস্থম্*)। যেহেতু ভগবান সর্বত্র বাস করেন, তাই তিনি *বাসুদেব* নামে পরিচিত। যদিও তিনি এই জড় জগতের সর্বত্র বাস করেন, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তাই *ঈশোপনিষদে* ভগবানকে *অপাপ-বিদ্ধম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। ভগবান যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি নানাভাবে কার্য করেন। তিনি অসুরদের সংহার করেন, এবং এমন সমস্ত কার্য করেন যা *বেদে* অনুমোদিত হয়নি, অর্থাৎ যে-সমস্ত কার্যকে পাপকর্ম বলে মনে করা হয়। কিন্তু যদিও তিনি এইভাবে কার্য করেন, তবুও তিনি তাঁর কর্মের দ্বারা কলুষিত হন না। তাই তাঁকে এখানে শুদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান *সম,* অর্থাৎ তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী। এই সম্বন্ধে তিনি *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) বলেছেন, *সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ*—ভগবানের কাছে কেউই মিত্র নয় অথবা শত্রু নয়। তিনি সকলের প্রতিই সমদর্শী।

সত্ত্বায় শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের রূপ জড় নয়। তাঁর রূপ *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। তাঁর দেহ আমাদের জড় দেহ থেকে ভিন্ন। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবানের শরীর আমাদের মতো।

শ্লোক ৪৩

মৈত্রেয় উবাচ
ইতি প্রচেতোভিরভিষ্টুতো হরিঃ
প্রীতস্তথেত্যাহ শরণ্যবৎসলঃ ।
অনিচ্ছতাং যানমতৃপ্তচক্ষুষাং
যযৌ স্বধামানপবর্গবীর্যঃ ॥ ৪৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে, **প্রচেতোভিঃ**—প্রচেতাদের দ্বারা; **অভিষ্টুতঃ**—বন্দিত হয়ে, **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **তথা**—তেমন; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **শরণ্য**—শরণাগতদের; **বৎসলঃ**—স্নেহপরায়ণ; **অনিচ্ছতাম্**—ইচ্ছা না করে; **যানম্**—তাঁর প্রস্থান; **অতৃপ্ত**—অতৃপ্ত; **চক্ষুষাম্**—নেত্র; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন; **স্ব-ধাম**—তাঁর ধামে; **অনপবর্গ-বীর্যঃ**—যাঁর শক্তি কখনও পরাভূত হয় না।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! শরণাগত-বৎসল ভগবান প্রচেতাদের দ্বারা এইভাবে বন্দিত এবং পূজিত হয়ে বলেছিলেন, "তোমরা যা প্রার্থনা করেছ তা পূর্ণ হবে।" তারপর সেই অকুণ্ঠপ্রভাব ভগবান সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। প্রচেতারা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি, কারণ তাঁদের চক্ষু তখনও তাঁর দর্শনে অতৃপ্ত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অনপবর্গবীর্য* শব্দটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। *অন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিনা', *প-বর্গ* মানে হচ্ছে 'জড়-জাগতিক জীবন', এবং *বীর্য* মানে হচ্ছে 'শক্তি'। ভগবান সর্বদাই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, যার একটি হচ্ছে বৈরাগ্য। প্রচেতারা যদিও প্রাণভরে ভগবানকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তবুও ভগবান সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, এটি অন্যান্য অসংখ্য ভক্তদের প্রতি ভগবানের কৃপা প্রদর্শন।

যদিও তিনি প্রচেতাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তিনি প্রস্থান করেছিলেন। এটি তাঁর ত্যাগের একটি দৃষ্টান্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ত্যাগের এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন, যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর অদ্বৈত প্রভুর গৃহে অবস্থান করেছিলেন। সমস্ত ভক্তরা চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন আরও কয়েকদিন সেখানে থাকেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন রকম দ্বিধা না করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান যদিও তাঁর ভক্তদের প্রতি অপার করুণাময়, তবুও তিনি কারও প্রতি আসক্ত নন। তিনি সারা জগৎ জুড়ে তাঁর অসংখ্য ভক্তদের প্রতি সমানভাবে কৃপাপরায়ণ।

শ্লোক ৪৪

অথ নির্যায় সলিলাৎ প্রচেতস উদন্বতঃ ।
বীক্ষ্যাকুপ্যন্দ্রুমৈশ্ছন্নাং গাং গাং রোদ্ধুমিবোচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ—তারপর; **নির্যায়**—বেরিয়ে এসে; **সলিলাৎ**—জল থেকে; **প্রচেতসঃ**—সমস্ত প্রচেতারা; **উদন্বতঃ**—সমুদ্রের; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অকুপ্যন্**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষের দ্বারা; **ছন্নাম্**—আচ্ছাদিত; **গাম্**—পৃথিবী; **গাম্**—স্বর্গ, **রোদ্ধুম্**—বোধ করাব জন্য; **ইব**—যেন; **উচ্ছ্রিতৈঃ**—অতি উচ্চ।

অনুবাদ

তারপর প্রচেতারা সিন্ধুসলিল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, সমস্ত বৃক্ষগুলি অত্যন্ত উন্নত হয়ে যেন স্বর্গলোকে যাওয়ার পথ রোধ করতে উদ্যত হয়েছে এবং সেই বৃক্ষাদির দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তখন প্রচেতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা প্রাচীনবর্হিষৎ তাঁর পুত্রদেব তপস্যান্তে গৃহে ফিবে আসাব পূর্বেই গৃহত্যাগ করেছিলেন। ভগবান প্রচেতাদেব আদেশ দিযেছিলেন জল থেকে বেবিয়ে এসে তাঁদের পিতার রাজ্যেব ভার গ্রহণ করার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে। কিন্তু যখন তাঁরা জল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁরা দেখেছিলেন, রাজাব অনুপস্থিতিতে সব অবহেলিত হয়েছে. তাঁরা প্রথমে দেখেছিলেন যে, কৃষিকার্য হচ্ছে না এবং শস্য উৎপাদন হচ্ছে না। তার ফলে মহীমণ্ডল সুউচ্চ বৃক্ষের দ্বাবা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে. তা দেখে মনে হযেছিল যেন বৃক্ষগুলি মানুষেব স্বর্গলোকে

যাওয়ার পথ রোধ করতে বদ্ধপরিকর। মহীমণ্ডল এইভাবে আচ্ছাদিত হতে দেখে প্রচেতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন শস্য উৎপাদনের জন্য ভূতল যেন পরিষ্কৃত হয়।

অরণ্য এবং বৃক্ষ যে মেঘ আকর্ষণ করে বলে মনে করা হয় তা সত্য নয়, কারণ আমরা দেখতে পাই যে, সমুদ্রের উপরেও বৃষ্টি হয়। কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে বন পরিষ্কার করে, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে মানুষ বাস করতে পারে। মানুষ গো-পালন করতে পারে এবং তার ফলে তার সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। মানুষকে কেবল শস্য উৎপাদনের জন্য এবং গোরক্ষার জন্য কার্য করতে হয়। বনের গাছ থেকে যে কাঠ পাওয়া যায়, তা দিয়ে কুটির তৈরি করা যায় এইভাবে মানব-সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র বহু জমি খালি পড়ে রয়েছে এবং সেগুলির যদি যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহলে খাদ্যাভাব থাকবে না। আর বৃষ্টি হবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৪) বলা হয়েছে—

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

"সমস্ত জীব অন্ন আহার করে জীবন ধারণ করে। এই অন্ন উৎপন্ন হয় বৃষ্টির ফলে। আর বৃষ্টি হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, আর যজ্ঞের উদ্ভব হয়েছে কর্তব্য কর্ম থেকে।" যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ যথেষ্ট বৃষ্টি এবং শস্য প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ৪৫

ততোঽগ্নিমারুতৌ রাজন্নমুঞ্চন্মুখতো রুষা ।
মহীং নির্বীরুধং কর্তুং সংবর্তক ইবাত্যয়ে ॥ ৪৫ ॥

ততঃ—তারপর; **অগ্নি**—আগুন; **মারুতৌ**—এবং বায়ু; **রাজন্**—হে রাজন্; **অমুঞ্চন্**—তাঁরা নির্গমন করেছিলেন; **মুখতঃ**—তাঁদের মুখ থেকে; **রুষা**—ক্রোধভরে; **মহীম্**—পৃথিবী; **নির্বীরুধম্**—বৃক্ষশূন্য; **কর্তুম্**—করবার জন্য, **সংবর্তকঃ**—প্রলয়াগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **অত্যয়ে**—প্রলয়ের সময়।

অনুবাদ

হে রাজন্! প্রলয়কালে রুদ্র যেভাবে তাঁর মুখ থেকে অগ্নি নির্গমন করেন, প্রচেতারাও তেমন মহীমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে তরুলতাশূন্য করবার উদ্দেশ্যে, ক্রোধভরে তাঁদের মুখ থেকে অগ্নি এবং বায়ু নির্গমন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিদুরকে *রাজন্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তিতে সর্বদা স্থিত থাকার ফলে *ধীর* কখনও ক্রুদ্ধ হন না। মহান ভক্তরা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখতে পারেন; তাই ভক্তকে *রাজন্* বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। রাজা বিভিন্ন উপায়ে প্রজাদের বশে রেখে তাদের শাসন করেন, তেমনই, যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন, তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলির রাজা। তিনি *স্বামী* অথবা *গোস্বামী।* তাই *স্বামী* এবং *গোস্বামীদের* কখনও কখনও *মহারাজ* বলে সম্বোধন করা হয়।

শ্লোক ৪৬

ভস্মসাৎ ক্রিয়মাণাংস্তান্ দ্রুমান্ বীক্ষ্য পিতামহঃ ।
আগতঃ শময়ামাস পুত্রান্ বর্হিষ্মতো নয়ৈঃ ॥ ৪৬ ॥

ভস্মসাৎ—ভস্মীভূত; **ক্রিয়মাণান্**—হচ্ছে; **তান্**—সেই সব; **দ্রুমান্**—বৃক্ষ; **বীক্ষ্য**—দেখে, **পিতামহঃ**—ব্রহ্মা; **আগতঃ**—সেখানে এসে; **শময়াম্ আস**—শান্ত করেছিলেন; **পুত্রান্**—পুত্রদের, **বর্হিষ্মতঃ**—রাজা বর্হিষ্মানের; **নয়ৈঃ**—যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ ভস্মসাৎ হচ্ছে দেখে, পিতামহ ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা রাজা বর্হিষ্মানের পুত্রদের শান্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখনই কোন গ্রহলোকে কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটে, তখন ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ ব্রহ্মা সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। হিরণ্যকশিপু যখন তার কঠোর তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকম্পিত করেছিল, তখনও ব্রহ্মা সেখানে এসেছিলেন। যে কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সেই প্রতিষ্ঠানের শান্তি ও সমন্বয় বজায় রাখার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকেন। তেমনই, ব্রহ্মার উপর এই ব্রহ্মাণ্ডের শান্তি ও সমন্বয় বজায় রাখার দায়িত্ব রয়েছে। তার ফলে তিনি রাজা বর্হিষ্মানের পুত্রদের সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা শান্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

তত্রাবশিষ্টা যে বৃক্ষা ভীতা দুহিতরং তদা ।
উজ্জহ্রুস্তে প্রচেতোভ্য উপদিষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪৭ ॥

তত্র—সেখানে; **অবশিষ্টাঃ**—অবশিষ্ট; **যে**—যে; **বৃক্ষাঃ**—বৃক্ষসমূহ; **ভীতাঃ**—ভীত হয়ে; **দুহিতরম্**—তাদের কন্যাকে; **তদা**—তখন; **উজ্জহ্রুঃ**—সমর্পণ করেছিল; **তে**—তারা; **প্রচেতোভ্যঃ**—প্রচেতাদের; **উপদিষ্টাঃ**—উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **স্বয়ম্ভুবা**—ব্রহ্মার দ্বারা।

অনুবাদ

সেই বৃক্ষদের মধ্যে যেগুলি অবশিষ্ট ছিল, তারা ভীত হয়ে ব্রহ্মার উপদেশে তাদের কন্যাটিকে প্রচেতাদের সমর্পণ করেছিল।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বৃক্ষদেব কন্যাটির উল্লেখ করা হয়েছে। এই কন্যাটির জন্ম হয়েছিল কণ্ডু এবং প্রম্লোচা থেকে। এই শিশুটির জন্মদানের পর অপ্সরা প্রম্লোচা স্বর্গলোকে চলে গিয়েছিল। শিশুটি যখন ক্রন্দন করছিল, তখন চন্দ্রদেব তার প্রতি অনুকম্পাবশত তার মুখের মধ্যে নিজের আঙ্গুল প্রদান করার মাধ্যমে অমৃত দান করে তার জীবন রক্ষা করেছিলেন। বৃক্ষরা এই কন্যাটির পালন-পোষণ করেছিল, এবং সে পরিণত বয়স প্রাপ্ত হলে, ব্রহ্মার আদেশে তারা তাকে প্রচেতাদের কাছে তাঁদের পত্নীরূপে সমর্পণ করেছিল। সেই কন্যাটির নাম ছিল মারিষা, যা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে। বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কন্যাটিকে সমর্পণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, *বৃক্ষাঃ তদ্-অধিষ্ঠাতৃ দেবতাঃ*—"বৃক্ষের অর্থ হচ্ছে বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।" বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রয়েছেন; তেমনই বৃক্ষদেরও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রয়েছেন। প্রচেতারা সমস্ত বৃক্ষগুলিকে ভস্মসাৎ করেছিলেন। প্রচেতাদের শান্ত করার জন্য বৃক্ষদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মার উপদেশে মারিষা নাম্নী কন্যাকে তাঁদের কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

তে চ ব্রহ্মণ আদেশান্মারিষামুপযেমিরে ।
যস্যাং মহদবজ্ঞানাদজন্যজনযোনিজঃ ॥ ৪৮ ॥

তে—প্রচেতারা; **চ**—ও; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **আদেশাৎ**—আদেশে; **মারিষাম্**—মারিষাকে; **উপযেমিরে**—বিবাহ করেছিলেন; **যস্যাম্**—যাঁর গর্ভে; **মহৎ**—মহাপুরুষকে; **অবজ্ঞানাৎ**—অবজ্ঞা করার ফলে; **অজনি**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **অজন-যোনি-জঃ**—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ।

অনুবাদ

ব্রহ্মার আদেশে প্রচেতারা কন্যাটিকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দক্ষ মহাদেবকে অবজ্ঞা এবং অপমান করেছিলেন বলে মারিষার গর্ভে তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তার ফলে তাঁকে দুবার দেহত্যাগ করতে হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *মহদবজ্ঞানাৎ* শব্দটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রাজা দক্ষ ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র; অতএব পূর্বজন্মে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু মহাদেবকে অবজ্ঞা অথবা অপমান করে অব্রাহ্মণের মতো আচরণ করার ফলে, তাঁকে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি প্রচেতাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেবল তাই নয়, মহাদেবকে অবজ্ঞা করার ফলে তাঁকে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। দক্ষের যজ্ঞস্থলে তাঁকে একবার শিবের অনুচর বীরভদ্র কর্তৃক নিহত হতে হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তা যথেষ্ট ছিল না, তাই তাঁকে আবার মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হওয়ার পর, দক্ষ শিবের স্তব করেছিলেন। যদিও তাঁকে দেহত্যাগ করে ক্ষত্রিয়ের বীর্যে স্ত্রীগর্ভবাসের যন্ত্রণাভোগ করে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল, তবুও তিনি শিবের কৃপায় সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়ম। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক যুগের মানুষেরা জানে না কিভাবে এই নিয়ম কার্য করে। আত্মার নিত্যত্ব এবং তার দেহান্তর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকার ফলে, আধুনিক যুগের মানুষেরা গভীরতম অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন। সেই কারণে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/১০) বলা হয়েছে—*মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ*। এই কলিযুগের সমস্ত মানুষ অত্যন্ত মন্দ, অলস, দুর্ভাগা এবং জড় জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা উপদ্রুত।

শ্লোক ৪৯

চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌সর্গে কালবিদ্রুতে।
যঃ সসর্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥ ৪৯ ॥

চাক্ষুষে—চাক্ষুষ নামক; **তু**—কিন্তু; **অন্তরে**—মন্বন্তর; **প্রাপ্তে**—আগমনে; **প্রাক্**—পূর্ব; **সর্গে**—সৃষ্টি; **কাল-বিদ্রুতে**—কালক্রমে ধ্বংস হয়েছিল; **যঃ**—যিনি; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **প্রজাঃ**—জীব; **ইষ্টাঃ**—ঈপ্সিত; **সঃ**—তিনি; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **দৈব**—ভগবানের দ্বারা; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত।

অনুবাদ

তাঁর পূর্বদেহ বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তিনি, সেই দক্ষই চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর অভিলষিত প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/১৭) বলা হয়েছে—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥

"মানুষের গণনা অনুসারে, এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়, এবং তাঁর রাত্রিকালও তেমনই।" এক হাজার চতুর্যুগে (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি) ব্রহ্মার একদিন হয়। সেই একদিনে চতুর্দশ মন্বন্তর রয়েছে, এবং তার মধ্যে এই চাক্ষুষ মন্বন্তর হচ্ছে ষষ্ঠ মন্বন্তর। ব্রহ্মার একদিনে যে বিভিন্ন মনু রয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি (১১) ধর্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি।

এইভাবে ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দজন মনু রয়েছেন। এক বছরে ৫,০৪০জন মনু রয়েছেন। ব্রহ্মার আয়ু একশ বছর; তার ফলে, ব্রহ্মার জীবনে যে সমস্ত মনুর আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়, তাঁদের সংখ্যা হচ্ছে ৫,০৪,০০০। এই হচ্ছে একটি ব্রহ্মাণ্ডের গণনা, এবং এই জগতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এই সমস্ত মনুদের গমনাগমন হয় কেবল মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে। সেই সম্বন্ধে ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

জগদণ্ডনাথ মানে হচ্ছে ব্রহ্মা। অসংখ্য *জগদণ্ডনাথ ব্রহ্মা* রয়েছেন, এবং এইভাবে আমরা গণনা করতে পারি কত মনু রয়েছেন। বর্তমান সময়টি বৈবস্বত মনুর নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রত্যেক মনুর আয়ু ৪৩,২০,০০০ বছর × ৭১। বর্তমান মনুর আয়ু ইতিমধ্যে ৪৩,২০,০০০ × ২৮ বছর গত হয়েছে। এত দীর্ঘ আয়ুও প্রকৃতির নিয়মে অবশেষে শেষ হয়ে যায়। দক্ষযজ্ঞের বিবাদ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়েছিল। এই বিবাদের ফলে দক্ষ শিব কর্তৃক দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু শিবের স্তব করার ফলে, তিনি তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য ফিরে পেয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, দক্ষ পঞ্চম মন্বন্তর পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তার ফলে চাক্ষুষ মন্বন্তর নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরের প্রারম্ভে তিনি শিবের আশীর্বাদে তাঁর পূর্ব ঐশ্বর্য ফিরে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০-৫১

যো জায়মানঃ সর্বেষাং তেজস্তেজস্বিনাং রুচা ।
স্বয়োপাদত্ত দাক্ষ্যাচ্চ কর্মণাং দক্ষমব্রুবন্ ॥ ৫০ ॥
তং প্রজাসর্গরক্ষায়ামনাদিরভিষিচ্য চ ।
যুযোজ যুযুজেঽন্যাংশ্চ স বৈ সর্বপ্রজাপতীন্ ॥ ৫১ ॥

যঃ—যিনি; **জায়মানঃ**—জন্মের ঠিক পর; **সর্বেষাম্**—সকলের; **তেজঃ**—ঔজ্জ্বল্য; **তেজস্বিনাম্**—তেজস্বীদের; **রুচা**—ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা; **স্বয়া**—তাঁর; **উপাদত্ত**—আচ্ছাদিত করেছিলেন, **দাক্ষ্যাৎ**—নিপুণ হওয়ার ফলে; **চ**—এবং; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মে; **দক্ষম্**—দক্ষ; **অব্রুবন্**—বলা হত; **তম্**—তাঁকে; **প্রজা**—জীব; **সর্গ**—সৃষ্টি করার জন্য; **রক্ষায়াম্**—পালনকার্যে; **অনাদিঃ**—প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা, **অভিষিচ্য**—নিযুক্ত করে; **চ**—ও; **যুযোজ**—নিযুক্ত করেছিলেন; **যুযুজে**—নিযুক্ত করেছিলেন; **অন্যান্**—অন্যদের; **চ**—এবং; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **সর্ব**—সমস্ত; **প্রজা-পতীন্**—প্রজাপতিদের।

অনুবাদ

দক্ষ তাঁর জন্মের পর, তাঁর দেহের জ্যোতির দ্বারা অন্য সমস্ত তেজস্বীদের তেজ আচ্ছাদিত করেছিলেন। সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত দক্ষ হওয়ার ফলে, তাঁকে দক্ষ বলা হত। ব্রহ্মা তাই তাঁকে প্রজাসৃষ্টি ও রক্ষণকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে দক্ষ অন্যান্য প্রজাপতিদেরও প্রজাসৃষ্টি এবং রক্ষণকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

দক্ষ প্রায় ব্রহ্মারই মতো শক্তিশালী হয়েছিলেন। তার ফলে ব্রহ্মা তাঁকে প্রজাসৃষ্টির কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। দক্ষ অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ঐশ্বর্যবান ছিলেন। পরে দক্ষ মরীচি আদি প্রজাপতিদের প্রজাসৃষ্টি এবং রক্ষণের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের প্রজাসংখ্যা বর্ধিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'প্রচেতাদের কার্যকলাপ' নামক ত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একত্রিংশতি অধ্যায়

প্রচেতাদের প্রতি নারদের উপদেশ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

তত উৎপন্নবিজ্ঞানা আশ্বধোক্ষজভাষিতম্ ।
স্মরন্ত আত্মজে ভার্যাং বিসৃজ্য প্রাব্রজন্ গৃহাৎ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ততঃ**—তারপর; **উৎপন্ন**—উদিত; **বিজ্ঞানাঃ**—পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত হয়ে; **আশু**—অতি শীঘ্র; **অধোক্ষজ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **ভাষিতম্**—বাণী, **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করে; **আত্ম-জে**—তাঁদের পুত্রের নিকট; **ভার্যাম্** তাঁদের পত্নী; **বিসৃজ্য**—সমর্পণ করে; **প্রাব্রজন্**—বহির্গত হয়েছিলেন; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—প্রচেতারা বহু সহস্র বৎসর গৃহে অবস্থান করেছিলেন, এবং তারপর তাঁদের দিব্য জ্ঞান উদিত হয়েছিল। তখন তাঁরা ভগবানের আশীর্বাদ স্মরণ করে এবং তাঁদের ভার্যাকে আদর্শ পুত্রের হস্তে সমর্পণপূর্বক গৃহ থেকে বহির্গত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

তপস্যান্তে প্রচেতারা পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। ভগবান তাঁদের এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, তাঁদের গৃহস্থ-জীবনের পর তাঁরা যথাসময়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। দিব্য সহস্র বৎসর গৃহস্থ-জীবন যাপন করার পর, প্রচেতারা তাঁদের পত্নীকে দক্ষ নামক পুত্রের হস্তে অর্পণ করে গৃহত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন। এটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা। জীবনের শুরুতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য ব্রহ্মচারীরূপে কঠোর তপস্যা করতে হয়। মেয়েদের সঙ্গে

ব্রহ্মচারীদের মেলামেশা করতে দেওয়া হয় না এবং জীবনের শুরু থেকেই যৌনসুখ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে দেওয়া হয় না। আধুনিক সভ্যতার সবচাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে যে, ছেলে-মেয়েদের স্কুল এবং কলেজ জীবনেই যৌন জীবন উপভোগ করার স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে, অধিকাংশ সন্তানই বর্ণসঙ্কর, অর্থাৎ 'অবাঞ্ছিত পিতামাতা থেকে উৎপন্ন'। তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মানব-সভ্যতা বৈদিক নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, জীবনের প্রারম্ভে ছেলে-মেয়েরা তপস্যা করবে। যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তখন তারা বিবাহ করবে এবং কিছুকালের জন্য গৃহে অবস্থান করে সন্তান সন্ততি উৎপাদন করবে। তারপর সন্তানেরা যখন বড় হয়ে যাবে, মানুষ তখন গৃহত্যাগ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের অন্বেষণ করবে. এইভাবে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে মানুষ তার জীবন সার্থক করতে পারে।

বিদ্যার্থীর জীবনে যদি তপস্যা না করা হয়, তা হলে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি না করে জীবন সার্থক করা যায় না অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, সন্তানেরা বড় হয়ে গেলে তাদের তত্ত্বাবধানে পত্নীকে রেখে, কৃষ্ণভাবনামৃতের বিকাশের জন্য পতি গৃহত্যাগ করতে পারে। সবকিছুই নির্ভর করে উন্নত জ্ঞানের বিকাশের উপর। প্রচেতাদের পিতা রাজা প্রাচীনবর্হিষৎ জলের ভিতরে তপস্যারত পুত্রদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই গৃহত্যাগ করেছিলেন। সময় উপযুক্ত হলে, অথবা পূর্ণ কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হলে, সমস্ত দায় দায়িত্বগুলি সম্পাদন না হলেও, গৃহত্যাগ করা উচিত। প্রাচীনবর্হিষৎ তাঁর পুত্রদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু নারদের উপদেশে যখন তাঁর বুদ্ধি যথাযথভাবে বিকশিত হয়েছিল, তখন তিনি কেবল তাঁর মন্ত্রীদের কাছে তাঁর পুত্রদের প্রতি আদেশ রেখে, তাঁদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা না করে, গৃহত্যাগ করেছিলেন।

সুখদায়ক গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন, *হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপম্*—সংসার জীবনের সমাপ্তি সাধনের জন্য তথাকথিত সুখদায়ক গৃহস্থ-জীবন, যা কেবল আত্মাকে হনন করার উপায় মাত্র (*আত্ম-পাতম্*), তা ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। গৃহকে ঘাসপাতায় ঢাকা অন্ধকূপ বলে মনে করা হয়, এবং কেউ যদি এই অন্ধকূপে পতিত হয়, তা হলে কারও সাহায্য বিনা তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাই গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অধিক আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ তার ফলে কৃষ্ণভক্তির প্রগতি প্রতিহত হবে।

শ্লোক ২

দীক্ষিতা ব্রহ্মসত্রেণ সর্বভূতাত্মমেধসা ।
প্রতীচ্যাং দিশি বেলায়াং সিদ্ধোঽভূদ্‌যত্র জাজলিঃ ॥ ২ ॥

দীক্ষিতাঃ—কৃতসংকল্প হয়ে; **ব্রহ্ম-সত্রেণ**—পরমাত্ম জ্ঞানের দ্বারা; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূত**—জীব; **আত্ম-মেধসা**—নিজের মতো বলে মনে করে, **প্রতীচ্যাম্**—পশ্চিম; **দিশি**—দিকে, **বেলায়াম্**—সমুদ্রতটে; **সিদ্ধঃ**—সিদ্ধি; **অভূৎ**—লাভ করেছিলেন, **যত্র**—যেখানে; **জাজলিঃ**—মহর্ষি জাজলি।

অনুবাদ

প্রচেতারা পশ্চিম দিকে সমুদ্রতটে গিয়েছিলেন, যেখানে জীবন্মুক্ত মহর্ষি জাজলি অবস্থান করছিলেন। যেই দিব্য জ্ঞানের দ্বারা সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া যায়, পূর্ণরূপে সেই জ্ঞান লাভ করে প্রচেতারা কৃষ্ণভক্তিতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসত্র শব্দটির অর্থ, 'আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন' প্রকৃতপক্ষে *বেদ* এবং কঠোর তপস্যা উভয়কেই বলা হয় *ব্রহ্ম। বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম। ব্রহ্ম* শব্দের আর একটি অর্থ হচ্ছে 'পরমতত্ত্ব'। পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় *বেদ* অধ্যয়ন এবং তপস্যার অনুশীলনের দ্বারা। প্রচেতারা সেই কার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা সমস্ত জীবের প্রতি সমভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যে ব্যক্তি এইভাবে দিব্য স্থিতিতে অবস্থিত, তিনি তৎক্ষণাৎ পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করে পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন তিনি কখনও কোন কিছুর জন্য শোক করেন না অথবা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সর্বভূতের প্রতি সমভাবাপন্ন। এই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।"

কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করেন, তখন তিনি বিভিন্ন জীবের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। এই পথ দৃঢ়সংকল্পের দ্বারা লাভ করা যায়। যখন প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন তিনি আর জীবের বাহ্যিক আবরণ

দর্শন করেন না তখন তিনি দেহের অভ্যন্তরে আত্মাকে দর্শন করেন। তার ফলে তিনি আর মানুষ ও পশু এবং ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেন না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"যথার্থ পণ্ডিত তাঁর প্রকৃত জ্ঞানের প্রভাবে, একজন বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৫/১৮)

বিদ্বান ব্যক্তি সকলকেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সমভাবে দর্শন করেন, এবং প্রকৃত পণ্ডিত বা ভগবদ্ভক্ত চান যে, সকলেই যেন কৃষ্ণভক্তির বিকাশ করেন। প্রচেতারা যেখানে বাস করছিলেন, সেই স্থানটি আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদনের জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিল, কারণ মহর্ষি জাজলি সেখানে মুক্তিলাভ করেছিলেন। সিদ্ধি অথবা মুক্তিলাভের অভিলাষী ব্যক্তিদের জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করা কর্তব্য। তাকে বলা হয় সাধুসঙ্গ বা আদর্শ ভক্তের সঙ্গ

শ্লোক ৩

তান্নির্জিতপ্রাণমনোবচোদৃশো
জিতাসনান্ শান্তসমানবিগ্রহান্ ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি যোজিতাত্মনঃ
সুরাসুরেড্যো দদৃশে স্ম নারদঃ ॥ ৩ ॥

তান্—তাঁরা সকলে; **নির্জিত**—পূর্ণরূপে সংযত; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু (প্রাণায়ামের দ্বারা); **মনঃ**—মন; **বচঃ**—বাণী; **দৃশঃ**—দৃষ্টি; **জিত-আসনান্**—আসনে জয়পূর্বক; **শান্ত**—শান্ত; **সমান**—ঋজু; **বিগ্রহান্**—যাঁদের শরীর; **পরে**—দিব্য; **অমলে**—সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **যোজিত**—যুক্ত; **আত্মনঃ**—যাঁদের মন; **সুর-অসুর-ঈড্যঃ**—দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা পূজিত; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **স্ম**—অতীতে; **নারদঃ**—নারদ মুনি।

অনুবাদ

প্রচেতারা যোগাসন অভ্যাস করে তাঁদের প্রাণবায়ু, মন, বাণী এবং বাহ্যদৃষ্টি সংযত করেছিলেন। এইভাবে প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ঋজুভাবে উপবিষ্ট হয়ে তাঁরা পরমব্রহ্মে তাঁদের

মনকে একাগ্রীভূত করেছিলেন। তাঁরা যখন এইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করছিলেন, তখন দেবতা এবং অসুর উভয়েরই দ্বারা পূজিত নারদ মুনি তাঁদের দেখতে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পরে অমলে* শব্দ দুটি বৈশিষ্ট্যসূচক *শ্রীমদ্ভাগবতে* ব্রহ্ম-উপলব্ধির বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরমতত্ত্ব তিনভাবে উপলব্ধ হয়—নির্বিশেষ জ্যোতি (ব্রহ্ম), অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান শিব তাঁর প্রার্থনায় পরমব্রহ্মের সবিশেষরূপে মনকে একাগ্রীভূত করে, তাঁর রূপকে *স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্ঘনশ্যামম্* বলে বর্ণনা করেছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/২৪/৪৫)। শিবের নির্দেশ অনুসারে প্রচেতারাও তাঁদের মনকে ভগবানের শ্যামসুন্দর রূপে একাগ্রীভূত করেছিলেন যদিও নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ব্রহ্ম এবং পরম পুরুষরূপে ব্রহ্ম—সবই একই চিন্ময় স্তরে, তবুও পরব্রহ্মের সবিশেষ রূপ হচ্ছে চিন্ময় স্তরের সর্বোচ্চ লক্ষ্য এবং চরম প্রকাশ।

নারদ মুনি সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তিনি অসুর ও দেবতা উভয়ের কাছেই যান এবং তারা উভয়েই তাঁকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করে। তাই এখানে তাঁকে *সুরাসুরেড্য*, সুর এবং অসুর উভয়েরই দ্বারা পূজিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে নারদ মুনির কাছে প্রতিটি গৃহের দরজাই উন্মুক্ত। অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে যদিও চিরশত্রুতা রয়েছে, তবুও নারদ মুনিকে সর্বত্রই সমাদর করা হয়। নারদ মুনিকে একজন দেবতা বলে মনে করা হয়, এবং তাই তাঁকে দেবর্ষি বলা হয়। কিন্তু অসুরেরাও নারদ মুনির প্রতি হিংসা করে না; তাই তিনি দেবতা এবং অসুর উভয়েরই দ্বারা সমানভাবে পূজিত হন আদর্শ বৈষ্ণবের স্থিতি ঠিক নারদ মুনির মতো হওয়া উচিত, সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ।

শ্লোক ৪

তমাগতং ত উত্থায় প্রণিপত্যাভিনন্দ্য চ ।
পূজয়িত্বা যথাদেশং সুখাসীনমথাব্রুবন্ ॥ ৪ ॥

তম্—তাঁকে; **আগতম্**—আগত; **তে**—প্রচেতারা, **উত্থায়**—উঠে, **প্রণিপত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **অভিনন্দ্য**—স্বাগত জানিয়ে; **চ**—ও; **পূজয়িত্বা**—পূজা করে; **যথা আদেশম্**—বিধিপূর্বক; **সুখ-আসীনম্**—সুখে উপবিষ্ট; **অথ**—এইভাবে; **অব্রুবন্**—তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

অনুবাদ

নারদ মুনিকে আসতে দেখে প্রচেতারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। বিধিপূর্বক তাঁরা প্রণতি নিবেদন করে তাঁর পূজা করেছিলেন, এবং যখন তাঁরা দেখলেন যে তিনি সুখে আসন গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রচেতারা যে পরমেশ্বর ভগবানে মন একাগ্র করার জন্য যোগ অভ্যাস করছিলেন তা উল্লেখযোগ্য

শ্লোক ৫

প্রচেতস ঊচুঃ

স্বাগতং তে সুরর্ষেঽদ্য দিষ্ট্যা নো দর্শনং গতঃ।
তব চঙ্ক্রমণং ব্রহ্মন্নভয়ায় যথা রবেঃ ॥ ৫ ॥

প্রচেতসঃ ঊচুঃ—প্রচেতারা বললেন; **সু-আগতম্**—স্বাগত; **তে**—আপনাকে; **সুর ঋষে**—হে দেবর্ষি, **অদ্য**—আজ, **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যক্রমে, **নঃ**—আমাদের, **দর্শনম্**—দর্শন; **গতঃ**—আপনি এসেছেন; **তব**—আপনার, **চঙ্ক্রমনম্**—পর্যটন; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ, **অভয়ায়**—অভয়ের জন্য; **যথা**—যেমন; **রবেঃ**—সূর্যের।

অনুবাদ

প্রচেতারা নারদ মুনিকে সম্বোধন করে বললেন—হে দেবর্ষি, হে ব্রাহ্মণ। আশা করি এখানে আসার সময় আপনার কোন অসুবিধা হয়নি। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে আমরা আপনার দর্শন লাভ করেছি। সূর্যদেবের ভ্রমণ যেমন মানুষকে রাত্রির অন্ধকারের ভয় থেকে, দস্যু-তস্করদের ভয় থেকে মুক্ত করে, তেমনই আপনার পর্যটনও সূর্যের মতো, কারণ আপনি সমস্ত ভয় দূর করেন।

তাৎপর্য

রাত্রির অন্ধকারে সকলেই দস্যু-তস্করদের ভয়ে ভীত হয়, বিশেষ করে বড় বড় শহরে মানুষেরা রাস্তায় বেরোতে ভয় পায়, এবং আমরা দেখেছি যে, নিউইয়র্কের মতো বড় শহরেও মানুষ রাত্রে বেরোতে চায় না। শহরেই হোক অথবা গ্রামেই

হোক, রাত্রিবেলা সকলেরই কিছু না কিছু ভয় হয়। কিন্তু সূর্যের উদয় হওয়া মাত্রই সকলেই আশ্বস্ত হয়। তেমনই এই জড় জগৎ স্বভাবতই অন্ধকার। সকলেই প্রতিক্ষণ বিপদের ভয়ে ভীত, কিন্তু কেউ যখন নারদ মুনির মতো ভক্তের দর্শন লাভ করেন, তখন তাঁর সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায়। সূর্য যেমন অন্ধকার দূর করে, নারদ মুনির মতো মহান ঋষির আগমনে অজ্ঞান দূর হয়ে যায়। কেউ যখন মুনি অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তখন তিনি অজ্ঞানজনিত সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৬

যদাদিষ্টং ভগবতা শিবেনাধোক্ষজেন চ ।
তদ্ গৃহেষু প্রসক্তানাং প্রায়শঃ ক্ষপিতং প্রভো ॥ ৬ ॥

যৎ—যা, **আদিষ্টম্**—উপদেশ দেওয়া হয়েছিল; **ভগবতা**—মহাপুরুষ; **শিবেন**—শিবের দ্বারা; **অধোক্ষজেন**—ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা; **চ**—ও; **তৎ**—তা, **গৃহেষু**—পারিবারিক বিষয়ের প্রতি, **প্রসক্তানাম্**—অত্যন্ত আসক্ত আমাদের দ্বারা, **প্রায়শঃ**—প্রায়; **ক্ষপিতম্**—বিস্মৃত; **প্রভো**—হে প্রভু

অনুবাদ

হে প্রভু! গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, শিব এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে আমরা যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তা প্রায় ভুলে গেছি।

তাৎপর্য

গৃহস্থ-আশ্রম ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের এক প্রকার অনুমোদন। মানুষের বোঝা উচিত যে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আবশ্যকতা নেই, কিন্তু মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ তাকে কিছু না কিছু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ স্বীকার করতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতিঃ* । গোস্বামী হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা উচিত। ইন্দ্রিয়গুলিকে কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্যই ব্যবহার করা উচিত নয়; পক্ষান্তরে জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই কেবল ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার করা উচিত। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—*অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ* । ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত

নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ স্বীকার করা উচিত নয়। কেউ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়, তা হলে সে সংসার জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, যার অর্থ হচ্ছে বন্ধন প্রচেতারা গৃহস্থ-আশ্রমে থাকার ফলে তাঁদের যে ভুল হয়েছে, তা স্বীকার করেছিলেন।

শ্লোক ৭

তন্নঃ প্রদ্যোতয়াধ্যাত্মজ্ঞানং তত্ত্বার্থদর্শনম্ ।
যেনাঞ্জসা তরিষ্যামো দুস্তরং ভবসাগরম্ ॥ ৭ ॥

তৎ—তাই; **নঃ**—আমাদের জন্য, **প্রদ্যোতয়**—কৃপা করে জাগরিত করুন; **অধ্যাত্ম**—দিব্য, **জ্ঞানম্**—জ্ঞান, **তত্ত্ব**—পরমতত্ত্ব, **অর্থ**—উদ্দেশ্যে; **দর্শনম্**—দর্শন, **যেন**—যার দ্বারা, **অঞ্জসা**—অনায়াসে, **তরিষ্যামঃ**—আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি; **দুস্তরম্**—দুরতিক্রম্য; **ভব-সাগরম্**—অবিদ্যার সমুদ্র।

অনুবাদ

হে প্রভু! দয়া করে আমাদের দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রদান করুন, যা প্রদীপস্বরূপ, এবং যার দ্বারা আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে পারি।

তাৎপর্য

প্রচেতারা নারদ মুনিকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সাধারণত যখন কোন সাধারণ ব্যক্তি কোন মহাত্মার দর্শন লাভ করে, তখন সে তাঁর কাছ থেকে কোন জড় জাগতিক আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। কিন্তু প্রচেতারা কোন জড় জাগতিক লাভের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না, কারণ তাঁরা তা যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের জড় বাসনা চরিতার্থ করতে চাননি। তাঁরা কেবল ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে আগ্রহী ছিলেন সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা। এই বিষয়ে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সাধু মহাত্মার শরণাগত হওয়া। জড়সুখ ভোগের জন্য আশীর্বাদ লাভের আশায় সাধুদের বিরক্ত করা উচিত নয়। সাধারণত গৃহস্থেরা তাদের গৃহে সাধুদের স্বাগত জানায় তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভের জন্য, কিন্তু তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জড় জগতে সুখভোগ করা। এই প্রকার জড় জাগতিক আশীর্বাদ লাভের প্রার্থনা করা শাস্ত্রে অনুমোদিত হয় নি।

শ্লোক ৮

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি প্রচেতসাং পৃষ্টো ভগবান্নারদো মুনিঃ ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোক আবিষ্টাত্মাব্রবীন্নৃপান্ ॥ ৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে, **প্রচেতসাম্**—প্রচেতাদের দ্বারা, **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে, **ভগবান্**—ভগবানের মহান ভক্ত; **নারদঃ**—নারদ, **মুনিঃ**—অত্যন্ত চিন্তাশীল, **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে, **উত্তম-শ্লোকে**—সর্বোৎকৃষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন; **আবিষ্ট**—মগ্ন, **আত্মা**—যাঁর মন; **অব্রবীৎ**—উত্তর দিয়েছিলেন, **নৃপান্**—রাজাদের।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! প্রচেতাদের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে পরম ভাগবত নারদ মুনি, যিনি সর্বদা উত্তমশ্লোক ভগবানে আসক্তচিত্ত, তিনি বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভগবান্ নারদঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, নারদ মুনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। *ভগবত্যুত্তমশ্লোক আবিষ্টাত্মা* । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করা ছাড়া নারদ মুনির আর অন্য কোন কাজ নেই, তাই কখনও কখনও তাঁকে *ভগবান্* বলা হয়। *ভগবান্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ'। কেউ যখন তাঁর ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকেও কখনও কখনও ভগবান বলা হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈঃ*—প্রত্যেক শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে স্বীকার করা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, শ্রীগুরুদেব অথবা নারদ মুনির মতো মহাত্মা প্রকৃতপক্ষে ভগবান হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁকে এইভাবে স্বীকার করা হয়, কারণ তাঁর হৃদয়ে ভগবান নিরন্তর বিরাজ করেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন কেউ কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন (*আবিষ্টাত্মা*), তাঁকেও ভগবান বলা হয়। ভগবান সর্ব ঐশ্বর্যসমন্বিত। ভগবান যদি সর্বদা কারও হৃদয়ে থাকেন, তা হলে তিনিও কি আপনা থেকেই সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ করবেন না? এই অর্থে নারদ মুনির মতো মহান ভক্তকেও ভগবান বলা

যেতে পারে। কিন্তু যখন কোন দুরাচারী ভণ্ডকে ভগবান বলা হয়, তখন আমরা তা সহ্য করতে পারি না। হয় তাকে সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারি হতে হবে অথবা সর্ব ঐশ্বর্যপুর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের অধিকারি হতে হবে, তা হলেই কেবল তাকে ভগবান বলা যায়।

শ্লোক ৯

নারদ উবাচ

তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **তৎ জন্ম**—সেই জন্ম **তানি**—সেই সমস্ত; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম, **তৎ**—তা, **আয়ুঃ**—আয়ু, **তৎ**—তা; **মনঃ**—মন; **বচঃ**—বাণী; **নৃণাম্**—মানুষদের; **যেন**—যার দ্বারা; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বিশ্ব-আত্মা**—পরমাত্মা; **সেব্যতে**—সেবিত হয়; **হরিঃ** পরমেশ্বর ভগবান, **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—যখন কোন জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর জন্ম, তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর আয়ু, তাঁর মন এবং তাঁর বাণী—সবই প্রকৃতপক্ষে সার্থক হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নৃণাম্* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য বহু প্রকার জন্ম রয়েছে, কিন্তু নারদ মুনি এখানে বিশেষভাবে মনুষ্য-জন্মের কথা বলেছেন মানব-সমাজে বিভিন্ন প্রকার মানুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনা বা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নত, তাঁদের বলা হয় আর্য আর্যদের মধ্যে যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তাঁদের জীবন সবচাইতে সার্থক। *নৃণাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মনুষ্যেতর পশুরা যে ভগবানের সেবায় যুক্ত হবে, তা আশা করা যায় না। কিন্তু আদর্শ মানব-সমাজে সকলেরই কর্তব্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া মানুষ ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক, সাদা হোক অথবা কালো হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। মানব-সমাজে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নানা প্রকার জড় বৈষম্য থাকতে পারে, কিন্তু সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায়

যুক্ত হওয়া। বর্তমান সভ্য দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য ভগবৎ-চেতনা ত্যাগ করেছে। ভগবৎ চেতনা বিকাশ করার জন্য তাদের কোন রকম আগ্রহ নেই। তাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্ম অনুষ্ঠান করত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি নির্বিশেষে সকলেই কোন না কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবৎ-চেতনা লাভ করা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী হন, তখনই তাঁর জন্ম সার্থক হয়। কেউ যখন ভগবানের সেবা করেন, তখন তাঁর কর্ম সার্থক হয়। দার্শনিক মতবাদ অথবা মনোধর্মী জ্ঞান তখনই সার্থক হয় যখন তা ভগবানকে জানার ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি তখন ধন্য হয়, যখন তা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। বর্তমানে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ নয়, তাই সেগুলি সমাজ, বন্ধুত্ব, প্রেম, রাজনীতি ইত্যাদির সেবায় যুক্ত। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন ভক্তি লাভ হয় পরবর্তী শ্লোকে তার বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছিলেন—

"আজি মোর জন্ম-কর্ম—সকল সফল ।
আজি মোর উদয়—সকল সুমঙ্গল ॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার ।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার ॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা ।
তাঁরে দেখি—যাঁর শ্রীচরণ সেবে রমা ॥"

শ্লোক ১০

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ ।
কর্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥ ১০ ॥

কিম্—কি লাভ; **জন্মভিঃ**—জন্মের; **ত্রিভিঃ**—তিন; **বা**—অথবা; **ইহ**—এই জগতে, **শৌক্র**—শুক্রের দ্বারা; **সাবিত্র**—দীক্ষার দ্বারা; **যাজ্ঞিকৈঃ**—পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ হওয়ার দ্বারা; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা, **বা**—অথবা; **ত্রয়ী**—বেদে; **প্রোক্তৈঃ**—উপদেশ দেওয়া হয়েছে; **পুংসঃ**—মানুষের; **অপি**—ও; **বিবুধ**—দেবতাদের; **আয়ুষা**—আয়ুতে।

অনুবাদ

সভ্য মানুষদের তিন প্রকার জন্ম হয়। প্রথম জন্মটি হচ্ছে শুদ্ধ পিতামাতা থেকে, এবং এই জন্মকে বলা হয় শৌক্র জন্ম। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে যখন দীক্ষালাভ হয়, সেই জন্মকে বলা হয় সাবিত্র জন্ম। যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার সুযোগ হয়, তখন তাকে বলা হয় যাজ্ঞিক জন্ম। এই প্রকার জন্মগ্রহণের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, দেবতাদের মতো দীর্ঘ আয়ু লাভ করা সত্ত্বেও, কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয়, তা হলে সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়। তেমনই কারও কার্যকলাপ পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক হতে পারে, কিন্তু তা যদি ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য না হয়, তা হলে তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

তাৎপর্য

শৌক্র জন্মের অর্থ হচ্ছে 'পিতার ঔরসে মাতৃজঠরে জন্ম'। পশুদেরও এইভাবে জন্ম হয়। কিন্তু বৈদিক সভ্যতা অনুসারে, শৌক্র জন্ম থেকে সংস্কার সম্ভব। জন্মের পূর্বে, অর্থাৎ পিতামাতার সঙ্গমের পূর্বে, গর্ভাধান সংস্কার বলে একটি সংস্কার রয়েছে, সেটি পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এই সংস্কারটি উচ্চতর বর্ণের জন্য, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের জন্য। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যদি উচ্চতর বর্ণের পিতামাতা গর্ভাধান সংস্কার না করে, তাহলে সমগ্র বংশ শূদ্র হয়ে যায়। এও বলা হয়েছে যে, গর্ভাধান সংস্কারের অভাবে কলিযুগে সকলেই শূদ্র। এটিই হচ্ছে বৈদিক পদ্ধতি। কিন্তু গর্ভাধান সংস্কারের অভাবে শূদ্র হওয়া সত্ত্বেও, পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে কারও যদি কৃষ্ণভক্ত হওয়ার একটুও প্রবৃত্তি থাকে তা হলে তাকে ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উপদেশ অনুসারে, আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পাঞ্চরাত্রিক বিধি অবলম্বন করেছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

"কাঁসা যেমন পারদের মিশ্রণে স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়, তেমনই সোনার মতো শুদ্ধ না হলেও, কেবল দীক্ষা-বিধানের দ্বারা মানুষ ব্রাহ্মণত্ব বা দ্বিজত্ব লাভ করতে পারে।" (*হরিভক্তিবিলাস* ২/১২) কেউ যদি এইভাবে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা দীক্ষিত হন, তাহলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ দ্বিজ বলে স্বীকার করা যেতে পারে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, আমরা তাই শিষ্যদের প্রথমে দীক্ষা দিয়ে হরেকৃষ্ণ

মহামন্ত্র জপ করার যোগ্যতা প্রদান করি। নিয়মিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার ফলে এবং বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করার ফলে, সে ব্রাহ্মণ দীক্ষা লাভের যোগ্য হয়। কারণ যোগ্য ব্রাহ্মণ না হওয়া পর্যন্ত, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না এটিকে বলা হয় *যাজ্ঞিক-জন্ম* আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে দুবার দীক্ষালাভ না করা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথমে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা এবং দ্বিতীয়বার গায়ত্রীমন্ত্র লাভ না করা পর্যন্ত তাকে রন্ধনশালায় অথবা পূজার ঘরে সেবা করার অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু কেউ যখন শ্রীবিগ্রহের পূজা করার স্তরে উন্নীত হন, তখন তাঁর পূর্বজন্মের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

"চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তাহলে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে পরিণত হন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ভক্তিহীন হয়, তাহলে সে চণ্ডালেরও অধম।" যদি কেউ ভগবদ্ভক্তিতে উন্নত হন, তা হলে চণ্ডালকুলে তাঁর জন্ম হলেও তাতে কিছু যায় আসে না তিনি তখন পবিত্র হয়ে যান। এই সম্বন্ধে শ্রী প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/১০)

কেউ যদি ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণে গুণান্বিত ব্রাহ্মণ হন অথচ ভগবানের পূজায় বিমুখ হন, তা হলে তাঁকে অধঃপতিত বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তিনি চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হলেও মহিমামণ্ডিত হন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার চণ্ডাল কেবল নিজেকেই নন, তাঁর পূর্ব-পুরুষদেরও উদ্ধার করতে পারেন। অথচ ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত দাম্ভিক ব্রাহ্মণ পর্যন্ত নিজেকে উদ্ধার করতে পারে না, তার পরিবারের আর কি কথা। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ বা অব্রাহ্মণ হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি অন্ত্যজেরও আট বছর অতিক্রান্ত হলে, দীক্ষা বিধানের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই নারদ মুনি বলেছেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১১/৩৫)

ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই যে আপনা থেকেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় তা নয়। সে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হওয়ার একটি সুন্দর সুযোগ পায়, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করা পর্যন্ত তাকে ব্রাহ্মণ বলে গ্রহণ করা যায় না। পক্ষান্তরে, যদি শূদ্রের মধ্যেও ব্রাহ্মণোচিত গুণগুলি দেখা যায়, তা হলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা উচিত। তার বহু প্রমাণ *শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, ভরদ্বাজ সংহিতা, পঞ্চরাত্র* এবং অন্যান্য বহু শাস্ত্রে রয়েছে।

দেবতাদের আয়ুর বিষয়ে, বিশেষ করে ব্রহ্মার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সহস্রযুগ পর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ৮/১৭)

ব্রহ্মার এক দিন এক সহস্র চতুর্যুগের (৪৩,২০,০০০ বৎসর) সমান ব্রহ্মার রাত্রির দৈর্ঘ্যও সেই পরিমাণ। ব্রহ্মার আয়ু এই দিনরাত্রির আয়তন অনুসারে একশত বৎসর। *বিবুধায়ুষা* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, এত দীর্ঘ আয়ু সত্ত্বেও মানুষ যদি ভগবদ্ভক্ত না হয়, তা হলে তার জীবন ব্যর্থ। জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস, এবং ভগবদ্ভক্তির স্তরে না আসা পর্যন্ত তার আয়ু, উচ্চকুলে জন্ম, মহিমান্বিত কার্যকলাপ এবং অন্য সবকিছুই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ১১

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা ॥ ১১ ॥

শ্রুতেন—বেদ অধ্যয়ন দ্বারা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা, **বা**—অথবা, **কিম্** কি লাভ, **বচোভিঃ**—বাণীর দ্বারা, **চিত্ত**—চেতনার, **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তির দ্বারা; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **বা**—অথবা; **কিম্**—কি লাভ; **নিপুণয়া**—নৈপুণ্যের দ্বারা; **বলেন**—দৈহিক শক্তির দ্বারা, **ইন্দ্রিয়-রাধসা**—ইন্দ্রিয়-পটুতার দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কঠোর তপস্যা, বেদ-শ্রবণ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি, বাক্-বিলাস, মনোধর্মী জ্ঞান, উন্নত বুদ্ধিমত্তা, বল এবং ইন্দ্রিয়-পটুতার কি ফল?

তাৎপর্য

উপনিষদ থেকে (*মুণ্ডক উপনিষদ* ৩/২/৩) আমরা জানতে পারি

> *নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।*
> *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥*

কেবল *বেদ* অধ্যয়নের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নতিসাধন কখনই হয় না। বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসী রয়েছে, যারা *বেদ, বেদান্ত-সূত্র* এবং *উপনিষদ* অধ্যয়নে রত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা সেই জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। অর্থাৎ তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানে না *বেদের* সারাতিসার শ্রীকৃষ্ণকে যদি তারা না জানতে পারে, তা হলে সেই *বেদ* অধ্যয়নে কি লাভ? *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—"সমস্ত বেদের দ্বারা আমি জ্ঞাতব্য।"

এমন অনেক ধর্মীয় পদ্ধতি রয়েছে, যেখানে তপস্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চরমে তারা কেউই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানে না তাই এই প্রকার তপস্যার ফলে কোন লাভ হয় না কেউ যদি সত্যি-সত্যি ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারে, তা হলে তার আর কঠোর তপস্যা করার কোন প্রয়োজন হয় না ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে জানা যায় *ভগবদ্গীতার* নবম অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তিকে *রাজগুহ্যম্,* সমস্ত গোপনীয় জ্ঞানের রাজা বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের অনেক উত্তম পাঠক রয়েছে, যারা খুব সুন্দর ঢঙে *রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতা* পাঠ করতে পারে। কখনও কখনও এই সমস্ত পেশাদারি পাঠকেরা অনেক পাণ্ডিত্য এবং বাক্‌পটুতা প্রদর্শন করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা ভগবানের ভক্ত নয়। তাই তারা শ্রোতাদের কাছে সেই জ্ঞানের সারাতিসার শ্রীকৃষ্ণকে তুলে ধরতে পারে না বহু চিন্তাশীল লেখক এবং সৃজনশীল দার্শনিক রয়েছে, কিন্তু তাদের সমস্ত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও যদি তারা ভগবানের সমীপবর্তী না হতে পারে, তা হলে তা কেবল অনর্থক ভ্রান্তিবিলাস এই জড় জগতে বহু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ রয়েছে, এবং তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য কত কিছু আবিষ্কার করে তারা সমস্ত জড় উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণও করে, কিন্তু তাদের এত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং জড় জগতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন, কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না।

ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধেও বলা যায় যে, বহু পশু-পক্ষী রয়েছে, যারা তাদের ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহারে মানুষদের থেকেও অনেক বেশি দক্ষ। যেমন, শকুন অথবা বাজপাখি আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে গিয়েও মাটিতে একটি ছোট্ট বস্তুকে অতি স্পষ্টরূপে দেখতে পায়। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি এতই প্রখর যে, বহু দূর থেকেও তারা তাদের আহার্য মৃতদেহ দেখতে পায়। তাদের দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই মানুষদের থেকে অনেক বেশি প্রখর, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাদের অস্তিত্ব মানুষের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তেমনই কুকুরেরা বহু দূর থেকে বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে। মাছেরা শব্দের দ্বারা বুঝতে পারে যে শত্রু আসছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি যদি জীবনের পরম সিদ্ধিলাভে অর্থাৎ ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য না করে, তাহলে সেগুলি অর্থহীন।

শ্লোক ১২

কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি ।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥ ১২ ॥

কিম্—কি লাভ; **বা**—অথবা; **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **সাংখ্যেন**—সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়নের দ্বারা; **ন্যাস**—সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা; **স্বাধ্যায়য়োঃ**—বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; **অপি**—ও; **কিম্**—কি লাভ; **বা**—অথবা; **শ্রেয়োভিঃ**—শুভ কর্মের দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্য; **চ**—এবং; **ন**—কখনই না; **যত্র**—যেখানে; **আত্ম-প্রদঃ**—আত্মার পূর্ণ তৃপ্তি; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

যে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চরমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে না, তা সে যোগ অভ্যাস হোক, সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন হোক, কঠোর তপস্যা হোক, সন্ন্যাস গ্রহণ হোক অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন হোক, তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। এগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু যদি তা ভগবান শ্রীহরিকে জানতে সাহায্য না করে, তা হলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (*মধ্য* ২৪/১০৯) বলা হয়েছে—

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে 'মুক্তি' নাহি হয় ।
ভক্তি সাধন করে যেই 'প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়' ॥

নির্বিশেষবাদীরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে, সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ ইত্যাদির পন্থা অবলম্বন করে। এগুলির উপযোগিতা কেবল ভগবদ্ভক্তি লাভের সহায়করূপে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন যে, ভক্তি বিনা জ্ঞান, যোগ, সাংখ্য-দর্শন ইত্যাদি কোন ফল প্রদান করতে পারে না নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়, কিন্তু ভক্তি বিনা ব্রহ্মে লীন হওয়াও সম্ভব নয়। পরমতত্ত্বকে তিনভাবে উপলব্ধি করা যায় ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। এই সব কটি উপলব্ধিতেই ভক্তির প্রয়োজন, কখনও কখনও মায়াবাদীদেরও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে দেখা যায়, যদিও তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া যোগীরাও কখনও কখনও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ভক্তদের থেকে ভিন্ন। কর্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি সমস্ত পন্থাতেই ভক্তির প্রয়োজন। সেটিই এই শ্লোকের তাৎপর্য।

শ্লোক ১৩

শ্রেয়সামপি সর্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ ।
সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রেয়সাম্—মঙ্গলজনক কার্যকলাপের; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সর্বেষাম্**—সমস্ত; **আত্মা** আত্মা, **হি** নিশ্চিতভাবে, **অবধিঃ** পরাকাষ্ঠা, **অর্থতঃ**—বস্তুত, **সর্বেষাম্**—সবকিছুর, **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ভূতানাম্**—জীবদের; **হরিঃ**—ভগবান; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্ম-দঃ**—যিনি আমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করতে পারেন; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে ভগবানই সমস্ত আত্ম-উপলব্ধির মূল উৎস। তাই কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ইত্যাদি সমস্ত শুভ কার্যের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি, এবং জড় জগৎ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি। অতএব সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন জড় এবং চেতন

উভয়েরই মূল উৎস। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে (৭/৪-৫) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটি তত্ত্ব দিয়ে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি রচিত হয়েছে। হে অর্জুন! এই অপরা প্রকৃতির অতীত আমার একটি পরা প্রকৃতি রয়েছে. সমস্ত জীবেরা সেই পরা প্রকৃতিসম্ভূত, এবং তারা এই জড় জগতে সংগ্রাম করছে এবং এই জগৎকে ধারণ করে আছে।"

সমগ্র জড় সৃষ্টি জড় এবং চেতনের সমন্বয়। চেতন অংশটি হচ্ছে জীব, এবং এই সমস্ত জীবদের এখানে প্রকৃতি বা শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবকে কখনই *পুরুষ* অর্থাৎ পরম পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়নি; তাই জীবকে ভগবান বলে মনে করা হচ্ছে অবিদ্যা যদিও শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নেই, তবুও জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি। জীবের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রকৃত পরিচয় অবগত হওয়া। সে যখন তা করে, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভগবদ্ভক্তির স্তরে আসার সমস্ত সুযোগ প্রদান করেন। সেই স্তরে উন্নীত হওয়াই জীবনের সার্থকতা। বৈদিক *উপনিষদে* তা ইঙ্গিত করা হয়েছে—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়ও* (১০/১০) প্রতিপন্ন করেছেন

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্‌ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর আমার ভক্তি করে এবং প্রীতিপূর্বক আমার আরাধনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।" মূল কথা হচ্ছে যে, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ অথবা অষ্টাঙ্গযোগ দিয়ে শুরু করলেও, চরমে মানুষকে ভক্তিযোগের স্তরে আসতেই হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভক্তিযোগের স্তরে না আসে, ততক্ষণ আত্ম উপলব্ধি বা পরমতত্ত্ব উপলব্ধি সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৪

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; **তরোঃ**—বৃক্ষের, **মূল**—মূল; **নিষেচনেন**—জল সিঞ্চনের দ্বারা; **তৃপ্যন্তি**—তৃপ্ত হয়; **তৎ**—তার; **স্কন্ধ**—কাণ্ড; **ভুজ**—শাখা; **উপশাখাঃ**—উপশাখা; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **উপহারাৎ**—আহার্যদ্রব্য প্রদানের দ্বারা; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **তথা এব**—তেমনই; **সর্ব**—সমস্ত দেবতাদের; **অর্হণম্**—পূজা; **অচ্যুত**—পরমেশ্বর ভগবানের, **ইজ্যা**—পূজা।

অনুবাদ

বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও মানুষ প্রশ্ন করে, কেন এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন দেব-দেবীদের পূজা না করে, কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা করার কথা বলে। তার উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে. গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১) বলা হয়েছে, *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্*—এই জড় জগৎ নীচের দিকে বিস্তৃত, এবং তাঁর মূল হচ্ছেন ভগবান যে-কথা ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) প্রতিপন্ন করেছেন—*অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি সমগ্র চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের উৎস " শ্রীকৃষ্ণই সবকিছুর উৎস; তাই তাঁর সেবা করা হলে আপনা থেকেই সমস্ত দেবদেবীর সেবা হয়ে যায় কখনও কখনও তর্ক উত্থাপন করা হয় যে, কর্ম ও জ্ঞানের সার্থক সম্পাদনের জন্য ভক্তির মিশ্রণের প্রয়োজন, এবং কখনও তর্ক উত্থাপন করা হয় যে, ভক্তির সার্থক সম্পাদনের জন্য কর্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজন। আসল কথা হচ্ছে যে, ভক্তি ব্যতীত যদিও কর্ম এবং জ্ঞান সফল হয় না, কিন্তু ভক্তি, কর্ম এবং জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীল রূপ

গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে, *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*—শুদ্ধ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা কলুষিত হওয়া উচিত নয়। আধুনিক সমাজ নানা প্রকার জনকল্যাণকর কার্য, মানবতাবাদী কার্য ইত্যাদিতে ব্যস্ত; কিন্তু মানুষ জানে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত কার্য সম্পাদিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি কখনই সফল হবে না। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা না করে তাঁরই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দেব দেবীদের পূজা করলে ক্ষতি কি, এবং তার উত্তরও এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। উদরকে খাদ্য দেওয়া হলে, ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়। কেউ যদি স্বতন্ত্রভাবে তার চক্ষু অথবা কর্ণকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে, তা হলে কেবল বিড়ম্বনারই সৃষ্টি হবে কেবল উদরকে আহার্যদ্রব্য প্রদান করে আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করি। ইন্দ্রিয়গুলিকে আলাদাভাবে সেবা করার প্রয়োজন হয় না অথবা তা সম্ভবও নয়। মূল কথা হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার দ্বারা সবকিছুই সম্পূর্ণ হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৬২) বলা হয়েছে—*কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়* ॥

শ্লোক ১৫

যথৈব সূর্যাৎ প্রভবন্তি বারঃ
পুনশ্চ তস্মিন্ প্রবিশন্তি কালে ।
ভূতানি ভূমৌ স্থিরজঙ্গমানি
তথা হরাবেব গুণপ্রবাহঃ ॥ ১৫ ॥

যথা—যেমন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সূর্যাৎ**—সূর্য থেকে; **প্রভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **বারঃ**—জল; **পুনঃ**—পুনরায়; **চ**—এবং; **তস্মিন্**—তাতে; **প্রবিশন্তি**—প্রবেশ করে; **কালে** যথাসময়; **ভূতানি**—সমস্ত জীব, **ভূমৌ**—পৃথিবীতে; **স্থির**—স্থাবর; **জঙ্গমানি**—এবং জঙ্গম; **তথা**—তেমনই; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে, **গুণ-প্রবাহঃ**—জড়া প্রকৃতির উদ্ভব।

অনুবাদ

বর্ষার জলের উদ্ভব হয় সূর্য থেকে, কালক্রমে গ্রীষ্মকালে সূর্যই আবার জল শোষণ করে নেয়। তেমনই, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব পৃথিবী থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং কিছুকাল পর তারা পুনরায় পৃথিবীর ধূলিতেই মিশে যাবে।

তেমনই, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং কালক্রমে সবই আবার ভগবানে লীন হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

জ্ঞানের অভাবেই নির্বিশেষবাদীরা বুঝতে পারে না, কি করে সবকিছু ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়ে আবার তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪০) বলা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মজ্যোতি শ্রীকৃষ্ণের দেহ থেকে নির্গত হয়, এবং সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে সবকিছু বিরাজ করছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—*মৎস্থানি সর্বভূতানি* । যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বত্র উপস্থিত নন, তবুও তাঁর শক্তি সমস্ত সৃষ্টির কারণ। সমগ্র জড় জগৎ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই শ্লোকে দুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি পৃথিবীর বনস্পতিকে সজীব করে, মানুষ এবং পশুদের জীবনীশক্তি লাভের সহায়ক হয়। যখন বৃষ্টি হয় না তখন খাদ্যাভাবে মানুষ এবং পশু মরে যায়। সমস্ত বনস্পতি, স্থাবর ও জঙ্গম সবই মূলত পৃথিবী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তারা পৃথিবী থেকে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় পৃথিবীতেই লীন হয়ে যায়। তেমনই, মহত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের দেহ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থায় সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর শক্তি সংবরণ করে নেন, তখন সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যায়। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৮) সেই কথা ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এই জড় সৃষ্টি ভগবানের দেহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এবং প্রলয়ের সময় তা পুনরায় তাঁরই দেহে লীন হয়ে যায়। এই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের পন্থা সম্ভব হয় মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের একটি অংশ মাত্র।

শ্লোক ১৬

এতৎপদং তজ্জগদাত্মনঃ পরং
সকৃদ্বিভাতং সবিতুর্যথা প্রভা ।
যথাসবো জাগ্রতি সুপ্তশক্তয়ো
দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানভিদাভ্রমাত্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥

এতৎ—এই জগৎ; **পদম্**—নিবাসস্থান; **তৎ**—তা; **জগৎ-আত্মনঃ**—ভগবানের; **পরম্**—দিব্য; **সকৃৎ**—কখনও কখনও; **বিভাতম্**—প্রকাশিত; **সবিতুঃ**—সূর্যের; **যথা**—যেমন; **প্রভা**—কিরণ; **যথা**—যেমন; **অসবঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি; **জাগ্রতি**—প্রকাশিত হয়; **সুপ্ত**—নিষ্ক্রিয়; **শক্তয়ঃ**—শক্তিসমূহ; **দ্রব্য**—ভৌতিক উপাদান; **ক্রিয়া**—কার্যকলাপ; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **ভিদা-ভ্রম**—ভ্রম থেকে উৎপন্ন ভেদ; **অত্যয়ঃ**—দূর হয়।

অনুবাদ

সূর্যকিরণ যেমন সূর্য থেকে অভিন্ন, এই জগৎও তেমন পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবান এই জড় জগতে সর্বব্যাপ্ত। ইন্দ্রিয়গুলি যখন সক্রিয় থাকে, তখন সেইগুলিকে দেহের বিভিন্ন অংশ বলে মনে হয়, কিন্তু দেহ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তাদের কার্যকলাপ প্রকট হয় না। তেমনই সারা জগৎ ভগবান থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হলেও তা ভিন্ন নয়।

তাৎপর্য

এই দৃষ্টান্তগুলি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বকে* প্রতিপন্ন করে—ভগবান এই জগৎ থেকে যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন। পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবান একটি গাছের মূলের মতো সবকিছুর পরম কারণ। ভগবান যে কিভাবে সর্বব্যাপ্ত তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি এই জড় জগতে সবকিছুর মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। যেহেতু ভগবানের শক্তি ভগবান থেকে অভিন্ন, তাই এই জগৎও আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বলে মনে হলেও তাঁর থেকে অভিন্ন। সূর্যকিরণ সূর্য থেকে ভিন্ন নয়, কিন্তু যুগপৎ তা ভিন্ন। কেউ সূর্যের আলোকে থাকতে পারে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে সূর্যে রয়েছে। যারা এই জড় জগতে বাস করে, তারা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় বাস করে, কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় তারা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দর্শন করতে পারে না।

এই শ্লোকে *পদম্* শব্দটি ভগবানের নিবাসস্থানকে ইঙ্গিত করে। *ঈশোপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্* । একটি বাড়ির মালিক বাড়ির একটি ঘরে

থাকতে পারে, কিন্তু সারা বাড়িটি তারই সম্পত্তি। রাজা তাঁর প্রাসাদের একটি কক্ষে থাকতে পারেন, কিন্তু সারা প্রাসাদটি তাঁর সম্পত্তি। এমন নয় যে, রাজাকে তাঁর মালিকানা জাহির করার জন্য প্রাসাদের প্রত্যেকটি ঘরে থাকতে হবে। সেই ঘরগুলি থেকে অনুপস্থিত থাকলেও সারা প্রাসাদটি তাঁর সম্পত্তি।

সূর্যকিরণ আলোকময়, সূর্যমণ্ডল আলোকময় এবং সূর্যদেবও আলোকময়। কিন্তু সূর্যকিরণ এবং সূর্যদেব বিবস্বান এক নয়। এটিই *অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বের* অর্থ। সমস্ত গ্রহগুলি সূর্যকিরণে রয়েছে, এবং সূর্যের শক্তির প্রভাবে তারা তাদের কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটি গ্রহে, সূর্যকিরণের প্রভাবে গাছপালাগুলি বর্ধিত হচ্ছে এবং তাদের রং পরিবর্তন হচ্ছে। সূর্য থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে, সূর্যকিরণ সূর্য থেকে অভিন্ন। তেমনই সূর্যকিরণে আশ্রিত সমস্ত গ্রহগুলিও সূর্য থেকে অভিন্ন। সারা জগৎ সূর্যের উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করছে, কারণ তা সূর্য থেকে উৎপন্ন এবং কারণরূপে সূর্য তার কার্যের মধ্যে নিহিত। তেমনই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, এবং সমস্ত কার্য সেই মূল কারণ থেকে প্রকাশিত। সারা জগৎ ভগবানের শক্তির বিস্তার বলে বুঝতে হবে।

কেউ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইন্দ্রিয়গুলি আর নেই। সে যখন জেগে ওঠে, তখন ইন্দ্রিয়গুলি পুনরায় সক্রিয় হয়। তেমনই এই জগৎ কখনও ব্যক্ত এবং কখনও অব্যক্ত, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*)। যখন জড় জগতের প্রলয় হয়, তখন তা এক প্রকার নিদ্রিত অবস্থা বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা। জড় জগৎ সক্রিয় হোক্ বা নিষ্ক্রিয় হোক, তা সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের শক্তি। তাই জড় জগতের ক্ষেত্রে 'প্রকট' এবং 'অপ্রকট' শব্দগুলির ব্যবহার হয়।

শ্লোক ১৭

যথা নভস্যভ্রতমঃপ্রকাশা
ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ ।
এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়স্ত্বমূ
রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রবাহঃ ॥ ১৭ ॥

যথা—যেমন; **নভসি**—আকাশে; **অভ্র**—মেঘ; **তমঃ**—অন্ধকার; **প্রকাশাঃ**—এবং আলোক; **ভবন্তি**—হয়; **ভূ-পাঃ**—হে রাজাগণ; **ন ভবন্তি**—আবির্ভূত হয় না;

অনুক্রমাৎ—পর্যায়ক্রমে; **এবম্**—এইভাবে, **পরে**—পরম; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে, **শক্তয়ঃ**—শক্তিসমূহ; **তু**—তখন; **অমূঃ**—সেই সমস্ত; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ, **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **ইতি**—এইভাবে, **প্রবাহঃ**—প্রবাহ্

অনুবাদ

হে রাজাগণ। আকাশে যেমন কখনও মেঘ, কখনও অন্ধকার এবং কখনও বা আলোক পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে, তেমনই পরমব্রহ্মে রজ, তম ও সত্ত্বগুণ শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। কখনও তাদের প্রকাশ হয় এবং কখনও তা লীন হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

অন্ধকার, আলোক এবং মেঘ কখনও প্রকাশিত হয়, আবার কখনও অপ্রকট হয়, কিন্তু তারা অপ্রকট হলেও শক্তি সর্বদাই থাকে। আকাশে কখনও আমরা মেঘ দেখতে পাই, কখনও বৃষ্টি এবং কখনও তুষার। কখনও আমরা দেখি রাত্রি, কখনও দিন, কখনও আলোক এবং কখনও অন্ধকার এই সবেরই অস্তিত্ব সূর্যের প্রভাবে, কিন্তু সূর্য এই সমস্ত পরিবর্তনের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হয় না। তেমনই, ভগবান যদিও সমগ্র জগতের মূল কারণ, তবুও তিনি এই জড় জগতের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"মাটি, জল আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটি তত্ত্বের দ্বারা আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি রচিত হয়েছে।"

যদিও জড় উপাদানগুলি ভগবানের শক্তি, তবুও সেগুলি ভগবান থেকে ভিন্ন। ভগবান তাই জড়-জাগতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন না। *বেদান্ত সূত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় ভগবানেরই অস্তিত্বের ফলে সম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জড় উপাদানের এই সমস্ত পরিবর্তনের দ্বারা ভগবান কখনও প্রভাবিত হন না। সেই কথাটি *প্রবাহ* শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। সূর্য সর্বদাই উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত এবং তা কখনই মেঘ অথবা অন্ধকারের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানও সর্বদা তাঁর পরা প্রকৃতিতে বিরাজ করেন এবং তিনি কখনও জড় প্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত হন না। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোবিন্দ নামে পরিচিত, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সবকিছুর আদি উৎস। তাঁর কোন উৎস নেই এবং তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।" যদিও তিনি সর্বকারণের পরম কারণ, তবুও তিনি পরম, এবং তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময়। শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুর আশ্রয় এবং সেটিই হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের অভিমত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই জড় জগতের নিমিত্ত কারণ এবং জড়া প্রকৃতি হচ্ছে উপাদান কারণ। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, প্রকৃতিকে সবকিছুর কারণ বলে মনে করা, ছাগলের গলার স্তনকে দুধের কারণ বলে মনে করার মতো। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে জড় জগতের গৌণ কারণ, কিন্তু মূল কারণ হচ্ছেন নারায়ণ বা কৃষ্ণ। কখনও কখনও মানুষ মনে করে, মৃৎপাত্রের কারণ হচ্ছে মাটি। কুমোরের চাকায় মাটির পিণ্ড থেকে অনেক ঘট তৈরি হতে দেখা যায়, এবং যদিও নির্বোধ মানুষেরা মনে করতে পারে যে, চাকার উপরকার মাটি হচ্ছে ঘটের কারণ, কিন্তু যাঁরা প্রকৃতই জ্ঞানবান তাঁরা জানেন যে, তার মূল কারণ হচ্ছে কুমোর, যে মাটি সংগ্রহ করেছে এবং চাকা ঘোরাচ্ছে। জড়া প্রকৃতি এই জড় জগতের সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা পরম কারণ নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) ভগবান তাই বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

"হে কৌন্তেয়! এই প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে, এবং স্থাবর ও জঙ্গম জীবদের উৎপন্ন করছে।"

ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন, এবং তাঁর ঈক্ষণের প্রভাবে প্রকৃতির তিনগুণ ক্ষোভিত হয়। তখন সৃষ্টি হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, জড়া প্রকৃতি জড় জগতের কারণ নয়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১৮

তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং
কালং প্রধানং পুরুষং পরেশম্ ।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহ-
মাত্মৈকভাবেন ভজধ্বমদ্ধা ॥ ১৮ ॥

তেন—অতএব; **একম্**—এক; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **অশেষ**—অনন্ত; **দেহিনাম্**—জীবাত্মার; **কালম্**—কাল; **প্রধানম্**—উপাদান কারণ; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ, **পর ঈশম্**—পরমেশ্বর; **স্ব-তেজসা**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **ধ্বস্ত**—পৃথক; **গুণ-প্রবাহম্**—জড় প্রবাহ থেকে; **আত্ম**—আত্মা; **এক-ভাবেন**—গুণগতভাবে এক বলে স্বীকার করে; **ভজধ্বম্**—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে

অনুবাদ

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা, এবং নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। যেহেতু তিনি গুণ-প্রবাহরূপ সংসার থেকে পৃথক, তাই তিনি তাঁর মিথস্ক্রিয়া থেকে মুক্ত এবং জড়া প্রকৃতির ঈশ্বর। অতএব তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, গুণগতভাবে নিজেদের তাঁর সঙ্গে এক বলে মনে করে, তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

তাৎপর্য

বৈদিক বিচারে, সৃষ্টির তিনটি কারণ রয়েছে—কাল, উপাদান এবং স্রষ্টা। মিলিতভাবে তাদের বলা হয়, ত্রিতয়াত্মক বা ত্রিবিধ কারণ। এই তিনটি কারণ থেকে জড় জগতের সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত কারণগুলি ভগবানের মধ্যে পাওয়া যায়। *ব্রহ্মসংহিতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*সর্বকারণ কারণম্*। নারদ মুনি তাই প্রচেতাদের উপদেশ দিয়েছেন, সেই পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তার সমস্ত অংশগুলিও সঞ্জীবিত হয়, নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হওয়া। তার মধ্যে সমস্ত পুণ্যকর্ম নিহিত রয়েছে। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* উল্লেখ করা হয়েছে—*কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়*। এই শ্লোকে *স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহম্* পদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণগুলি ভগবানের চিন্ময় শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তবুও তাদের দ্বারা ভগবান কখনও প্রভাবিত হন না। যাঁরা এই জ্ঞানে প্রকৃতই পারঙ্গত, তাঁরা সবকিছু ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে পারেন কারণ এই জড় জগতে কোন কিছুই ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

শ্লোক ১৯

দয়য়া সর্বভূতেষু সন্তুষ্ট্যা যেন কেন বা।
সর্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দনঃ ॥ ১৯ ॥

দয়য়া—দয়া প্রদর্শন দ্বারা; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবের প্রতি; **সন্তুষ্ট্যা**—সন্তুষ্ট হওয়ার দ্বারা, **যেন কেন বা**—কোন না কোন ভাবে; **সর্ব-ইন্দ্রিয়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **উপশান্ত্যা**—নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা; **চ**—ও; **তুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হয়, **আশু**—অতি শীঘ্র; **জনার্দনঃ**—সমস্ত জীবের প্রভু।

অনুবাদ

সর্বভূতে দয়া, যথালাভে সন্তোষ এবং বিষয় থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ—এই সবের দ্বারা ভগবান জনার্দন শীঘ্রই প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

এইগুলি হচ্ছে কয়েকটি উপায়, যার দ্বারা ভক্ত ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারেন। এখানে সর্বপ্রথমে *দয়য়া সর্বভূতেষু* কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ সমস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, দয়া প্রদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রচার। এই জ্ঞানের অভাবে সারা জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত। মানুষের জানা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবকিছুরই মূল কারণ। সেই কথা জেনে, সকলেরই তাঁর সেবায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়া উচিত যাঁরা প্রকৃতই জ্ঞানবান, এবং পারমার্থিক উপলব্ধিতে উন্নত, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তির প্রচার করা, যাতে মানুষেরা এই পন্থা অবলম্বন করে তাদের জীবন সার্থক করতে পারে।

এখানে *সর্বভূতেষু* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা বলতে কেবল মানুষকেই বোঝায় না, চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির অন্তর্গত সব কটি প্রাণীকেও বোঝায়। ভগবদ্ভক্ত কেবল মানব সমাজেরই কল্যাণ সাধন করেন না, তিনি সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধন করেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, সকলেই পারমার্থিক সুফল লাভ করতে পারে। যখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের চিন্ময় শব্দতরঙ্গ ধ্বনিত হয়, তখন পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ, এমন কি গাছপালারাও লাভবান হয় এইভাবে কেউ যখন উচ্চস্বরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তখন তিনি সমস্ত জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া প্রদর্শন করেন। সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রসার করতে ভক্তদের সমস্ত পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

শুদ্ধ ভক্তকে যদি প্রচার করার জন্য নরকেও যেতে হয়, তাতে তার কিছু যায় আসে না। ভগবান যদিও বৈকুণ্ঠে রয়েছেন, তবু তিনি একটি শূকরের হৃদয়েও

রয়েছেন। নরকে প্রচার করার সময়েও শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের নিরন্তর সঙ্গ প্রভাবে শুদ্ধ ভক্তই থাকেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মানুষকে তার ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করতে হয়। মন যখন ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকে, তখন ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই সংযত হয়ে যায়।

শ্লোক ২০

অপহতসকলৈষণামলাত্ম-
ন্যবিরতমেধিতভাবনোপহূতঃ ।
নিজজনবশগত্বমাত্মনোঽয়-
ন্নসরতি ছিদ্রবদক্ষরঃ সতাং হি ॥ ২০ ॥

অপহত—নিরস্ত; **সকল**—সমস্ত; **এষণ**—বাসনা; **অমল**—নির্মল, **আত্মনি**—মনে; **অবিরতম্**—নিরন্তর, **এধিত**—বর্ধমান, **ভাবনা**—অনুভূতি-সহ, **উপহূতঃ**—আহূত হয়ে, **নিজ-জন**—তাঁর ভক্তদের; **বশ**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **গত্বম্**—গিয়ে, **আত্মনঃ**—তাঁর; **অয়ন্**—জেনে; **ন**—কখনই না; **সরতি**—চলে যায়; **ছিদ্র-বৎ**—আকাশের মতো; **অক্ষরঃ**—ভগবান; **সতাম্**—ভক্তদের, **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

জড় বাসনার কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়ে, ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। এইভাবে তাঁরা নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করতে পারেন এবং আন্তরিক অনুভূতি সহকারে তাঁকে সম্বোধন করতে পারেন। ভগবান তখন তাঁর ভক্তের বশীভূত হয়ে ক্ষণিকের জন্যও তাঁকে ত্যাগ করেন না, ঠিক যেমন আকাশ কখনও অদৃশ্য হয়ে যায় না।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় যে পরমেশ্বর ভগবান জনার্দন তাঁর ভক্তের কার্যকলাপে অতি শীঘ্র প্রসন্ন হন। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ*। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে, শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় সব রকম বাসনা থেকে মুক্ত। জড় জগতে জীবের হৃদয় জড় বাসনায় পূর্ণ। জীব যখন নির্মল হয়, তখন আর সে কোন জড় বিষয়ের কথা চিন্তা করে না। মন যখন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়, তখন যোগসিদ্ধি লাভ হয়, কারণ তখন যোগী তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে সর্বদা দর্শন

করেন (*ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*)। ভগবান যখন ভক্তের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন, তখন ভক্ত আর জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হতে পারেন না জড়া প্রকৃতির গুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া মাত্রই, জীব বহু বাসনা করতে আরম্ভ করে এবং জড়সুখ ভোগের জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করতে শুরু করে, কিন্তু হৃদয়ে ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই, সমস্ত জড় বাসনা দূর হয়ে যায়। মন যখন সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়, তখন ভক্ত নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করতে পারেন। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস, কিন্তু জানি না কি কারণে আমি এই ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি। দয়া করে তুমি আমাকে উদ্ধার করে, তোমার শ্রীপাদপদ্মে ধূলিকণা-সদৃশ মনে করে স্থান দাও।" (*শিক্ষাষ্টক* ৫) তেমনই, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন—

হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানু সুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাসে কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তের অধীন হন। ভগবান অজিত, কিন্তু তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা পরাজিত হন। তিনি তাঁর ভক্তের অধীন হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে আনন্দ অনুভব করেছিলেন নিজেকে ভক্তের অধীন বলে মনে করে ভগবান অত্যন্ত আনন্দিত হন। রাজা কখনও কখনও তাঁর সভায় বিদূষককে রাখেন, এবং পরিহাসছলে বিদূষক কখনও কখনও রাজাকে অপমান করে। কিন্তু রাজা তাতে ক্রুদ্ধ না হয়ে আনন্দিত হন। ভগবানকে সকলেই গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে; তাই ভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তের তিরস্কার উপভোগ করতে চান। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের সম্পর্ক নিত্য বিরাজমান, ঠিক মাথার উপরে আকাশের মতো।

শ্লোক ২১

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ ।
শ্রুতধনকুলকর্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥ ২১ ॥

ন—কখনই না, **ভজতি**—গ্রহণ করেন, **কু-মনীষিণাম্**—কলুষিত হৃদয় ব্যক্তিদের, **সঃ**—তিনি; **ইজ্যাম্**—নৈবেদ্য, **হরিঃ**—ভগবান; **অধন**—নির্ধন; **আত্ম-ধন**—কেবলমাত্র ভগবানের উপর নির্ভরশীল; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **রসজ্ঞঃ**—রসগ্রাহী; **শ্রুত**—বিদ্যা, **ধন**—ঐশ্বর্য **কুল**—আভিজাত্য, **কর্মণাম্**—এবং সকাম কর্মের, **মদৈঃ**—গর্বের ফলে; **যে**—যারা; **বিদধতি**—অনুষ্ঠান করে; **পাপম্**—অসম্মান, **অকিঞ্চনেষু**—দরিদ্র, **সৎসু**—ভক্তদের।

অনুবাদ

যাঁদের কাছে কোন ধন নেই, কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্তিরূপ সম্পদ লাভ করার ফলে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন, সেই ভক্তরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান এই প্রকার ভক্তের ভক্তি তৃপ্তিসহকারে আস্বাদন করেন। যারা পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য এবং কর্মের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কখনও কখনও ভক্তদের উপহাস করে, তারা যদি ভগবানের পূজাও করে, তবুও ভগবান কখনই সেই পূজা গ্রহণ করেন না।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের উপর নির্ভরশীল। তিনি অভক্তদের নৈবেদ্য কখনও গ্রহণ করেন না। শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন তিনি যিনি অনুভব করেন যে, তাঁর কাছে কোন জাগতিক সম্পদ নেই। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভক্তিরূপ ধন লাভ করার ফলে প্রসন্ন থাকেন। জাগতিক দৃষ্টিতে ভক্তদের কখনও কখনও দরিদ্র বলে মনে হয়, কিন্তু যেহেতু তাঁরা পারমার্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত এবং ধনী, তাই তাঁরা ভগবানের সবচাইতে প্রিয়। এই প্রকার ভক্তরা পরিবার, সমাজ, বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত থাকেন। তাঁরা সবরকম জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়কেই তাঁদের একমাত্র সম্পদ বলে মনে করে সব সময় সুখী থাকেন। পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের স্থিতি বুঝতে পারেন। কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তকে উপহাস করে, তাহলে ভগবানের দ্বারা

তিনি কখনও স্বীকৃত হন না। অর্থাৎ, শুদ্ধ ভক্তের চরণে যে অপরাধ করে, ভগবান কখনও তাঁকে ক্ষমা করেন না ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। দুর্বাসা মুনি মহান ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করেছিলেন, এবং তার ফলে ভগবানের সুদর্শন চক্র দুর্বাসা মুনিকে দণ্ডদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন মহাযোগী দুর্বাসা ভগবানের কাছে পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁকে ক্ষমা করেননি যাঁরা মুক্তির পথে রয়েছেন, তাঁদের সব সময় সাবধান থাকা উচিত যাতে শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধ না হয়ে যায়।

শ্লোক ২২

শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ
দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যৎ স্বপূর্ণঃ ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ
কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ ॥ ২২ ॥

শ্রিয়ম্—লক্ষ্মীদেবী; **অনুচরতীম্**—অনুসরণকারিণী; **তৎ**—তাঁর; **অর্থিনঃ**—কৃপাকাঙ্ক্ষী, **চ**—এবং, **দ্বিপদ-পতীন্**—নৃপতি, **বিবুধান্**—দেবতাগণ, **চ**—ও; **যৎ**—যেহেতু, **স্ব-পূর্ণঃ**—স্বয়ংসম্পূর্ণ, **ন**—কখনই না, **ভজতি**—গ্রাহ্য করেন, **নিজ**—নিজের, **ভৃত্য-বর্গ**—তাঁর ভক্তদের; **তন্ত্রঃ**—নির্ভরশীল, **কথম্**—কিভাবে, **অমুম্**—তাঁকে; **উদ্বিসৃজেৎ**—ত্যাগ করতে পারেন **পুমান্**—ব্যক্তি, **কৃতজ্ঞঃ**—কৃতজ্ঞ।

অনুবাদ

যদিও পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবুও তিনি তাঁর ভক্তদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি লক্ষ্মীদেবীর, শ্রীকামী রাজা এবং দেবতাদেরও অনুবর্তন করেন না। এমন কোন্ ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও, সেই ভগবানের আরাধনা করবেন না?

তাৎপর্য

জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা, এমন কি বড় বড় রাজা মহারাজা এবং স্বর্গের দেবতারাও লক্ষ্মীদেবীর পূজা করেন। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই ভগবানের সেবা করেন, যদিও ভগবানের তাঁর সেবার কোন প্রয়োজন নেই। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, ভগবান শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেব্যমান, কিন্তু ভগবানের তাঁদের সেবার কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি যদি চান তা হলে তিনি তাঁর হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা

কোটি কোটি লক্ষ্মীদেবীকে সৃষ্টি করতে পারেন। সেই ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত তাঁর ভক্তের বশীভূত হন অতএব ভগবান যাঁকে এইভাবে কৃপা করেন, সেই ভক্ত কত ভাগ্যবান। কোন্ অকৃতজ্ঞ ভক্ত সেই ভগবানের পূজা করবে না এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবা করবে না? প্রকৃতপক্ষে ভক্ত ক্ষণিকের জন্যও ভগবানের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা ভুলতে পারেন না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, ভগবান এবং তাঁর ভক্ত উভয়েই রসজ্ঞ। ভগবান এবং ভক্তের সম্পর্ককে কখনও জড় বলে মনে করা উচিত নয় সেই সম্পর্ক সর্বদাই দিব্য ভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব ইত্যাদি আট প্রকার দিব্য ভাব রয়েছে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে সেগুলির আলোচনা করা হয়েছে। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং জীবের স্থিতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তারা ভগবান এবং ভক্তের পরস্পরের প্রতি আসক্তিকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আসক্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক, এবং তাকে জড় বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ২৩

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি প্রচেতসো রাজন্নন্যাশ্চ ভগবৎকথাঃ ।
শ্রাবয়িত্বা ব্রহ্মলোকং যযৌ স্বায়ম্ভুবো মুনিঃ ॥ ২৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতাগণ; **রাজন্**—হে রাজন; **অন্যাঃ**—অন্যেরা; **চ**—ও; **ভগবৎ-কথাঃ**—ভগবান বিষয়ক কথা; **শ্রাবয়িত্বা**—উপদেশ দিয়ে; **ব্রহ্ম-লোকম্**—ব্রহ্মলোকে; **যযৌ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **স্বায়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার পুত্র; **মুনিঃ**—মহান ঋষি।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে মহারাজ বিদুর! ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি এইভাবে প্রচেতাদের ভগবান সম্বন্ধীয় কথা উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হয়। প্রচেতারা নারদ মুনির কাছ থেকে সেই সুযোগটি পেয়েছিলেন, যিনি তাঁদের কাছে ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

তেঽপি তন্মুখনির্যাতং যশো লোকমলাপহম্ ।
হরের্নিশম্য তৎপাদং ধ্যায়ন্তস্তদ্গতিং যযুঃ ॥ ২৪ ॥

তে—প্রচেতাগণ; **অপি**—ও; **তৎ**—নারদেব; **মুখ**—মুখ থেকে; **নির্যাতম্**—নির্গত; **যশঃ**—মহিমা, **লোক**—জগতের; **মল**—পাপ; **অপহম্**—বিনাশ করে, **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহবির; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **তৎ**—ভগবানের, **পাদম্**—পা, **ধ্যায়ন্তঃ**—ধ্যান কবে; **তৎ-গতিম্**—তাঁর ধামে; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

নাবদ মুনির শ্রীমুখ থেকে জগতের দুর্ভাগ্য বিনাশকারী ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে, প্রচেতারাও ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে করতে, তাঁরা ভগবদ্ধামে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে দেখা গেছে যে, তত্ত্ববেত্তা ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে, প্রচেতাবা অনায়াসে ভগবানের প্রতি দৃঢ় আসক্তি লাভ করেছিলেন। তাবপর, জীবনের অন্তিম সময়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে, তাঁরা পরম ধাম বিষ্ণুলোকে গমন করেছিলেন। যাঁরা ভগবানের মহিমা নিরন্তর শ্রবণ করেন এবং তাঁব শ্রীপাদপদ্মেব ধ্যান করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে সেই পবম ধাম প্রাপ্ত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৫) বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমাব পূজা কর এবং আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন কর তা হলে তুমি নিশ্চিতভাবে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তোমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কাবণ তুমি আমাব অতি প্রিয় ভক্ত।"

শ্লোক ২৫

এতত্তেঽভিহিতং ক্ষত্তর্যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্ ।
প্রচেতসাং নারদস্য সংবাদং হরিকীর্তনম্ ॥ ২৫ ॥

এতৎ—এই; **তে**—তোমাকে; **অভিহিতম্**—উপদেশ দেওয়া হয়েছে; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **যৎ**—যা কিছু; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—তুমি; **পরিপৃষ্টবান্**—প্রশ্ন করেছ; **প্রচেতসাম্**—প্রচেতাদের; **নারদস্য**—নারদের; **সংবাদম্**—বার্তালাপ; **হরি-কীর্তনম্**—ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে।

অনুবাদ

হে বিদুর! ভগবানের মহিমা বর্ণনাকারী নারদ এবং প্রচেতাদের কথোপকথন সম্বন্ধে তুমি যা জানতে চেয়েছিলে, সেই সম্বন্ধে আমি সবকিছু তোমাকে বললাম। আমি যথাসাধ্য তা বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে যেহেতু সমগ্র বিষয়টিই ভগবানের মহিমা বর্ণনা, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ভক্তের বর্ণনা আপনা থেকেই এসে যায়।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

য এষ উত্তানপদো মানবস্যানুবর্ণিতঃ ।
বংশঃ প্রিয়ব্রতস্যাপি নিবোধ নৃপসত্তম ॥ ২৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন, **যঃ**—যা; **এষঃ**—এই বংশ; **উত্তানপদঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের; **মানবস্য**—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র; **অনুবর্ণিতঃ**—পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসারে বর্ণিত; **বংশঃ**—বংশ; **প্রিয়ব্রতস্য**—রাজা প্রিয়ব্রতের; **অপি**—ও; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা করুন; **নৃপ-সত্তম**—হে রাজশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে নৃপশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিৎ)। আমি স্বায়ম্ভুব মনুর প্রথম পুত্র উত্তানপাদের বংশ বর্ণনা করলাম। এখন আমি স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধরদের কার্যকলাপ বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। দয়া করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন রাজা উত্তানপাদের পুত্র। ধ্রুব মহারাজ এবং রাজা উত্তানপাদের বংশধরদের কার্যকলাপ প্রচেতাগণ পর্যন্ত বর্ণিত হল। এখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধরদের বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ২৭

যো নারদাদাত্মবিদ্যামধিগম্য পুনর্মহীম্ ।
ভুক্ত্বা বিভজ্য পুত্রেভ্য ঐশ্বরং সমগাৎপদম্ ॥ ২৭ ॥

যঃ—যিনি; **নারদাৎ**—নারদ মুনির কাছ থেকে; **আত্ম-বিদ্যাম্**—আধ্যাত্মিক জ্ঞান; **অধিগম্য**—শিক্ষা লাভ করার পর; **পুনঃ**—পুনরায়; **মহীম্**—পৃথিবীকে; **ভুক্ত্বা**—ভোগ করার পর; **বিভজ্য**—ভাগ করে; **পুত্রেভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **ঐশ্বরম্**—দিব্য; **সমগাৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পদম্**—পদ।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও নারদ মুনির কাছ থেকে আত্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন, তবুও তিনি পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ণরূপে জড়সুখ ভোগ করার পর, তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ইমাং তু কৌষারবিণোপবর্ণিতাং
ক্ষত্তা নিশম্যাজিতবাদসৎকথাম্ ।
প্রবৃদ্ধভাবোঽশ্রুকলাকুলো মুনে-
র্দধার মূর্ধ্না চরণং হৃদা হরেঃ ॥ ২৮ ॥

ইমাম্—এই সব; **তু**—তখন; **কৌষারবিণা**—মৈত্রেয়ের দ্বারা; **উপবর্ণিতাম্**—বর্ণিত; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **অজিতবাদ**—ভগবানের মহিমা; **সৎ-কথাম্**—দিব্য বাণী; **প্রবৃদ্ধ**—উন্নত; **ভাবঃ**—প্রেম; **অশ্রু**—অশ্রু; **কলা**—বিন্দু; **আকুলঃ**—ব্যাকুল; **মুনেঃ**—মহর্ষির; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **চরণম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **হৃদা**—হৃদয়ের দ্বারা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

হে রাজন্! এইভাবে মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের চিন্ময় আখ্যান শ্রবণ করে বিদুর আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি তখন তাঁর গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে মহাভাগবতের সঙ্গের প্রভাব। ভক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং তার ফলে ভগবৎ প্রেমানন্দে বিহ্বল হন। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩২)

মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ ব্যতীত শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না। এই জগতে যাঁর কোন কিছু করণীয় নেই, তাঁকে বলা হয় নিষ্কিঞ্চন। আত্ম-উপলব্ধি এবং ভগবদ্ধামে যাওয়ার পন্থা হচ্ছে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের রেণু মস্তকে ধারণ করা। তার ফলে চিন্ময় উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। মৈত্রেয়ের সঙ্গে বিদুরের সেই সম্পর্ক ছিল, এবং তার ফলে তিনি বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

বিদুর উবাচ

সোঽয়মদ্য মহাযোগিন্ ভবতা করুণাত্মনা ।
দর্শিতস্তমসঃ পারো যত্রাকিঞ্চনগো হরিঃ ॥ ২৯ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **সঃ**—সেই; **অয়ম্**—এই; **অদ্য**—অদ্য; **মহা-যোগিন্**—হে মহাযোগী; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **করুণ-আত্মনা**—অত্যন্ত করুণাময়; **দর্শিতঃ**—আমাকে দেখানো হয়েছে; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পারঃ**—পরপার; **যত্র**—

যেখানে; **অকিঞ্চন-গঃ**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত ব্যক্তিদেরই দ্বারা দর্শনযোগ্য; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীবিদুর বললেন—হে পরম যোগী, হে শ্রেষ্ঠ ভক্ত! আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আমি এই তমসাচ্ছন্ন জগৎ থেকে মুক্তির পথ দর্শন করতে পেরেছি। এই পথ অনুসরণ করে, ভব-বন্ধনমুক্ত পুরুষ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎকে বলা হয় তমঃ, এবং চিৎ-জগৎকে বলা হয় জ্যোতি। বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সকলেই যেন এই অন্ধকার থেকে জ্যোতির্ময় লোকে ফিরে যেতে চেষ্টা করে। সেই জ্যোতির্ময় লোকের কথা আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষের কৃপায় জানা যায়। সেই জন্য সমস্ত জড় বাসনা থেকেও মুক্ত হতে হয়। কেউ যখন জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত পুরুষের সঙ্গ করেন, তখন তাঁর ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

শ্লোক ৩০

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যানম্য তমামন্ত্র্য বিদুরো গজসাহ্বয়ম্ ।
স্বানাং দিদৃক্ষুঃ প্রযযৌ জ্ঞাতীনাং নির্বৃতাশয়ঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আনম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **তম্**—মৈত্রেয়কে; **আমন্ত্র্য**—অনুমতি নিয়ে; **বিদুরঃ**—বিদুর; **গজ-সাহ্বয়ম্**—হস্তিনাপুর; **স্বানাম্**—স্বীয়; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার বাসনায়; **প্রযযৌ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **জ্ঞাতীনাম্**—তাঁর আত্মীয়দের; **নির্বৃত-আশয়ঃ**—জড় বাসনা থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে মহর্ষি মৈত্রেয়কে প্রণতি নিবেদন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে, সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিদুর তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার জন্য হস্তিনাপুরে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন মহাত্মা যখন তাঁর আত্মীয়দের দর্শন করতে যান, তখন কোন জড়-জাগতিক বাসনা নিয়ে তিনি তাদের দর্শন করেন না। তিনি কেবল তাদের মঙ্গলের জন্য সৎ উপদেশ প্রদান করতে চান। বিদুর ছিলেন কৌরব রাজ-বংশজাত, এবং যদিও তিনি জানতেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেই বংশের সকলেই নিহত হয়েছে, তবুও তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে, তাঁকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায় কি না। বিদুরের মতো মহাত্মা যখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করেন, তখন তিনি কেবল তাদের মায়ার বন্ধন থেকেই মুক্ত করতে চান। বিদুর এইভাবে তাঁর শ্রীগুরুদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

এতদ্যঃ শৃণুয়াদ্রাজন্ রাজ্ঞাং হর্যর্পিতাত্মনাম্ ।
আয়ুর্ধনং যশঃ স্বস্তি গতিমৈশ্বর্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১ ॥

এতৎ—এই; **যঃ**—যিনি; **শৃনুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **হরি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অর্পিত-আত্মনাম্**—যাঁরা তাঁদের আত্মা ভগবানকে নিবেদন করেছেন; **আয়ুঃ**—আয়ু; **ধনম্**—ধন; **যশঃ**—খ্যাতি; **স্বস্তি**—সৌভাগ্য; **গতিম্**—জীবনের চরম লক্ষ্য; **ঐশ্বর্যম্**—জাগতিক ঐশ্বর্য; **আপ্নুয়াৎ**—লাভ করেন।

অনুবাদ

হে রাজন্! যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত রাজাদের এই সমস্ত আখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁরা অনায়াসে দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য, যশ ও সৌভাগ্য লাভ করেন, এবং চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'প্রচেতাদের প্রতি নারদের উপদেশ' নামক একত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত